# দশটি উপন্যাস। হুমায়ূন আহমেদ

# দশটি উপন্যাস

## হুমায়ূন আহমেদ

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রকাশক ☐ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

গ্রাফিক্স ☐ গ্রাফিক্স স্ক্যান
৫৫/১, পুরানা পল্টন ঢাকা

কম্পোজ ☐ ওয়াটার ফ্লাওয়ার
২৮/এ, কাকরাইল ঢাকা

মুদ্রণ ☐ হেরা প্রিন্টার্স
২৭ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা

## উৎসর্গ

বাবু ও আদিল

এরা দু'জন তাদেব জীবনকে নিয়ে
একটা 'এক্সপেরিমেন্ট' করছে। আমি খুব আগ্রহ
নিয়ে তাদেব 'এক্সপেবিমেন্ট' দেখছি।

## প্রসঙ্গ কথা

আমার দশটি উপন্যাস আলাদা করে বের করা হচ্ছে। আমাকে বলা হয়েছে 'অনন্যা' সব লেখকদেরই দশটি করে উপন্যাস এক মোড়কে করে বের করবে। আমি খুব যে আগ্রহের সঙ্গে রাজি হয়েছি তা না। এ জাতীয় সংকলন আমার পছন্দ না। দশটি উপন্যাস আলাদা করা হচ্ছে কোন মাপকাঠিতে? নিকৃষ্ট দশটি উপন্যাস না সেরা দশটি উপন্যাস? সেরা-নিকৃষ্ট এই বিচারই-বা কে করছেন। অনন্যার স্বত্বাধিকারী মনিরুল হককে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, পাঠকদের পছন্দের দশটি উপন্যাস।

সংকলনটি কবে প্রকাশিত হবে তার জন্যে অপেক্ষা করছি। আমার নিজেরও জানার ইচ্ছা পাঠকরা কোন দশটি উপন্যাস পছন্দ করলেন।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর

A feeling of sadness and longing
That is not akin to pain,
And resembles sorrow only
As the mist resembles the rain.

Edgar Allan Poe



অচিনপুর

হুমায়ূন ১০ ২

মরবার পর কী হয়?

আট-ন' বছর বয়সে এর উত্তর জানবার ইচ্ছে হল। কোনো গূঢ় তত্ত্ব নিয়ে চিন্তার বয়স সেটি ছিল না, কিন্তু সত্যি সত্যি সেই সময়ে আমি মৃত্যু রহস্য নিয়ে ভাবিত হয়ে পড়েছিলাম।

সন্ধ্যাবেলা নবুমামাকে নিয়ে গা ধুতে গিয়েছি পুকুরে। চারদিক ঝাপসা করে অন্ধকার নামছে। এমন সময় হঠাৎ করেই আমার জানবার ইচ্ছে হল, মরবার পর কী হয়? আমি ফিসফিস করে ডাকলাম,

'নবুমামা, নবুমামা!'

নবুমামা সাঁতরে মাঝ-পুকুরে চলে গিয়েছিলেন। তিনি আমাব কথা শুনতে পেলেন না। আমি আবার ডাকলাম,

'নবুমামা, রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'আর একটু।'

'ভয় লাগছে আমার।'

একা একা পাড়ে বসে থাকতে সত্যি আমাব ভয় লাগছিল। নবুমামা উঠে আসতেই বললাম, মরবার পর কি হয় মামা? নবুমামা রেগে গিয়ে বললেন, সন্ধ্যাবেলা কী বাজে কথা বলিস? নবুমামা ভীষণ ভীতু ছিলেন, আমার কথা শুনে তাঁর ভয় ধরে গেল। সে সন্ধ্যায় দু'জনে চুপি-চুপি ফিরে চলেছি। রইসুদ্দিন চাচার কবরের পাশ দিয়ে আসবার সময় দেখি, সেখানে কে দুটি ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রেখে গেছে। দুটি লিকলিকে ধোঁয়ার শিখা উড়ছে সেখান থেকে। ভয় পেয়ে নবুমামা আমার হাত চেপে ধরলেন।

শৈশবের এই অতি সামন্য ঘটনাটি আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। পরিণত বয়সে এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। ছোট একটি ছেলে মৃত্যুর কথা মনে করে একা কষ্ট পাচ্ছে। এ ভাবতেও আমার খারাপ লাগত।

সত্যি তো, সামান্য কোনো ব্যাপার নিয়ে ভাববার মত মানসিক প্রস্তুতিও যার নেই, সে কেন কবরে ধূপের শিখা দেখে আবেগে টলমল করবে? কেন সে একা একা চলে যাবে সোনাখালি? সোনাখালির খালের বাঁধানো পুলের উপর বসে থাকতে থাকতে এক সময় তার কাঁদতে ইচ্ছে হবে?

আসলে আমি মানুষ হয়েছি অদ্ভুত পরিবেশে। প্রকাণ্ড একটি বাড়ির অগুণতি রহস্যময় কোঠা। বাড়ির পেছনে জড়াজড়ি করা বাঁশবন। দিন-মানেই শেয়াল ডাকছে চারিদিকে। সন্ধ্যা হব-হব সময়ে বাঁশবনের এখানে-ওখানে জ্বলে উঠছে ভূতের আগুন। দোতলার বারান্দায় পা ছড়িয়ে বিচিত্র সুরে কোরান পড়তে শুরু করছে কানাবিবি। সমস্তই অবিমিশ্র ভয়ের।

আবছা অন্ধকারে কানাবিবির দুলে দুলে কোরান পাঠ শুনলেই বুকের ভেতর ধক্ করে উঠত। নানিজান বলতেন, 'কানার কাছে এখন কেউ যেয়ো না গো।' শুধু কানাবিবির কাছেই নয়, মোহরের মা পা ধোয়াতে এসে বলত, 'পুলাপান কূয়াতলায় কেউ যেও না।' কূয়াতলায় সন্ধ্যাবেলায় কেউ যেতাম না। সেখানে খুব-একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল। ওখানে সন্ধ্যাবেলায় যেতে নেই।

চারিদিকেই ভয়ের আবহাওয়া। নানিজানের মেজাজ ভাল থাকলে গল্প ফাঁদতেন। সেও ভূতের গল্প : হাট থেকে শোল মাছ কিনে ফিরছেন তাঁর চাচা। চারদিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। শ্রাবণ মাস, বৃষ্টি পড়ছে টিপ টিপ। ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ছেড়ে বাড়ির পথ ধরেছেন, ওমনি পেছন থেকে নাকিসুরে কে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মাঁছটা আঁমারে দিঁয়ে যাঁ।'

রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়া ছেলেমেয়েদের জাগিয়ে এনে ভাত খাওয়াত মোহরের মা। লম্বা পাটিতে সারি সারি থালা পড়ত। ঘুম-ঘুম চোখে ভাত মাখাচ্ছি, এমন সময় হয়ত ঝুপ করে শব্দ হল বাড়ির পেছনে। মোহরের মা খসখসে গলায় চেঁচিয়ে উঠল,

'পেতত্নি নাকি? পেতত্নি নাকি রে?'

নবুমামা প্রায় আমার গায়ের উপর হুমড়ি খেয়ে চাপা সুরে বলত, ভয় পাচ্ছি, ও মোহরের মা, আমার ভয় লাগছে।

নানাজানের সেই প্রাচীন বাড়িতে যা ছিল সমস্তই রক্ত জমাট-করা ভয়ের। কানাবিবি তার একটি মাত্র তীক্ষ্ণ চোখে কেমন করেই-না তাকাত আমাদের দিকে। নবুমামা বলত, ঐ বুড়ি আমার দিকে তাকালে কঞ্চি দিয়ে চোখ গেলে দেব। কানাবিবি কিছু না বলে ফ্যালফ্যালিয়ে হাসত। মাঝে-মধ্যে বলত, 'পুলাপান ডরাও কেন? আমি কিতা? পেত্নী?' পেত্নী না হয়েও সে আমাদের কাছে অনেক বেশি ভয়াবহ ছিল। শুধু আমরা নই, বড়রাও তাকে সমীহ করে চলতেন। আর সমীহ করবে নাই-বা কেন? বড় নানিজানের নিজের মুখ থেকে শোনা গল্প।

তাঁর বাপের দেশের মেয়ে কানাবিবি। বিয়ের সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন। ফাই-ফরমাস খাটে। হেসে-খেলে বেড়ায়। একদিন দুপুরে সে পেটের ব্যথায় মরো-মরো। কিছুতেই কিছু হয় না, এখন-যায় তখন-যায় অবস্থা। নানাজান লোক পাঠিয়েছেন আশু কবিরাজকে আনতে। আশু কবিরাজ এসে দেখে সব শেষ। বরফের মত ঠাণ্ডা শরীর। খাটিয়ায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাঁশ কাটতে লোক গেল। নানিজান মরার মাথার কাছে বসে কোরান পড়তে লাগলেন। অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল ঠিক তখনই—আমার নানিজান ভয়ে ফিট হয়ে গেলেন। নানাজান আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ইয়া মাবুদ', 'ইয়া মাবুদ'! কারণ কানাবিবি সে সময়ে ভাল মানুষের মত উঠে বসে পানি খেতে চাচ্ছে। এর পর থেকে স্বভাব-চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হল তার। দিনরাত নামাজ-রোজা। আমরা যখন কিছু কিছু জিনিস বুঝতে শিখেছি, তখন থেকে দেখছি, সে পাড়ার মেয়েদের তাবিজ-কবজ দিচ্ছে। সন্ধ্যা হতে-না-হতেই দোতলার বারান্দায় কুপি জ্বালিয়ে বিচিত্র সুরে কোরান পড়ছে। ভয় তাকে পাবে না কেন?

এ তো গেল রাতের ব্যাপার। দিনের বেলাও কি নিস্তার আছে? গোল্লাছুট খেলতে গিয়ে যদি ভুলে কখনো পূর্বের ঘরের কাছাকাছি চলে গিয়েছি, অমনি রহমত মিয়া বাঘের মতন গর্জন করে উঠেছে, 'খাইয়া ফেলুম। ঐ পোলা, কাঁচা খাইয়া ফেলামু। কচ কচ কচ।' ভয়ানক জোয়ান একটা পুরুষ শিকল দিয়ে বাঁধা, ব্যাপারটা ভয়াবহ। বদ্ধ পাগল ছিল রহমত মিয়া, নানাজানের নৌকার মাঝি। তিনি রহমতকে স্নেহ করতেন খুব, সারিয়ে তুলতে চেষ্টাও করেছিলেন। লাভ হয়নি।

এ সমস্ত মিলিয়ে তৈরি হয়েছে আমার শৈশব। গাঢ় রহস্যের মত ঘিরে রয়েছে আমার চারদিক। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, অল্প বয়সের ভয়-কাতর একটি ছেলে তার নিত্যসঙ্গী নবুমামার হাত ধরে ঘুমুতে যাচ্ছে দোতলার ঘরে। নবুমামা বলছেন, 'তুই ভিতরের জানালা দু'টি বন্ধ করে আয়, আমি দাঁড়াচ্ছি বাইরে।' আমি বলছি, 'আমার ভয় করছে, আপনিও আসেন।' মামা মুখ ভেংচে বলছেন, 'এতেই ভয় ধরে গেল!' টেবিলে রাখা হ্যারিকেন থেকে আবছা আলো আসছে। আমি আর নবুমামা কুকুর-কুণ্ডুলি হয়ে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি। নবুমামা শুতে-না-শুতেই ঘুম। একা একা ভয়ে আমার কান্না আসছে। এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে হৈচৈ শোনা গেল। শুনলাম, খড়ম পায়ে খট খট করে কে যেন এদিকে আসছে। মোহরের মা মিহি সুরে কাঁদছে, আমি অনেকক্ষণ সেই কান্না শুনে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। জানতেও পারিনি সে-রাতে আমার মা মারা গিয়েছিলেন।

সে-রাতে আমার ঘুম ভেঙেছিল ফজরের নামাজের সময়। জেগে দেখি, বাদশা মামা চুপচাপ বসে আছেন চেয়ারে। আমাকে বললেন, 'আর ঘুমিয়ে কি করবি, আয় বেড়াতে যাই।' আমরা সোনাখালির খাল পর্যন্ত চলে গেলাম। সেখানে পাকা পুলের উপর দু'জনে বসে বসে সূর্যোদয় দেখলাম। প্রচণ্ড শীত পড়েছিল সেবার। কুয়াশার চাদরে গাছপালা ঢাকা। সূর্যের আলো পড়ে শিশির-ভেজা পাতা চকচক করছে। কেমন অচেনা লাগছে সব কিছু। মামা অন্যমনস্কভাবে বললেন, বগু, আজ তোর খুব দুঃখের দিন। দুঃখের দিনে কি করতে হয় জানিস?

'না।'

'হা হা করে হাসতে হয়। হাসলেই আল্লা বলেন, ভুলেও দুঃখ দিয়ে কোনো লাভ নেই। একে সুখ দিতে হবে। বুঝেছিস?'

'বুঝেছি।'

'বেশ, তাহলে হাসি দে আমার সঙ্গে।'

এই বলে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বাদশা মামার খুব মোটা গলা ছিল। তাঁর হাসিতে চারদিক গম গম করতে লাগল। আমিও তাঁর সঙ্গে গলা মিলালাম। বাদশা মামা বললেন, আজ

আর বাসায় ফিরে কাজ নেই, চল শ্রীপুর যাই। সেখানে আজ যাত্রা হবে। আমি মহাখুশি হয়ে তাঁর সঙ্গে চললাম।

কতদিনকার কথা, কিন্তু সব যেন চোখের সামনে ভাসছে।

## দুই

বাদশা মামার সঙ্গে আমার কখনো অন্তরঙ্গতা হয়নি। অথচ আমরা একই ঘরে থাকতাম। দোতলার সবচেয়ে দক্ষিণের ঘরে দুটো খাটের একটিতে বাদশা মামা, অন্যটিতে আমি আর নবুমামা। সারাদিন বাদশা মামার দেখা নেই। রাতে কখন যে ফিরতেন, তা কোনোদিনই জানিনি। ঘুম ভাঙার আগে-আগেই চলে গেছেন। কোনো কোনো রাতে ঘুম ভেঙে গেলে দেখেছি গুনগুন করে কী পড়ছেন। যেদিন মেজাজ ভালো থাকত সেদিন খুশি-খুশি গলায় বলতেন, রঞ্জু, শুন তো দেখি, কেমন হচ্ছে বলবি। আমি হঠাৎ ঘুম-ভাঙা অবস্থায় কী হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না। মামা দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে নেড়ে বলা শুরু করেছেন

এ রাজ্যপাঠ যায় যাক,
কোনো ক্ষতি নাই
কিন্তু ত্রিদীব তুমি
কোথা যাবে?'

ভরাট গলা ছিল তাঁর, সমস্ত ঘর কেঁপে কেঁপে উঠত। মাঝপথে থেমে গিয়ে বলতেন, দাঁড়া, পোশাকটা পরে নেই, পোশাক ছাড়া ভাল হয় না। তোল, নবুকে ঘুম থেকে তোল।' নবুমামার ঘুম ভাঙালেই প্রথম কিছুক্ষণ নাকি সুরে কাঁদত। বাদশা মামা বিরক্ত হয়ে বলতেন-- 'গাধা! দেখ না কী করছি।' তারপর দু'জনেই হাঁ করে তাকিয়ে থাকি বাদশা মামার দিকে। আলমারি খুলে তিনি মুকুট বের করেছেন, জড়িদার পোশাক পরেছেন। তারপর একা একাই অভিনয় করে চলেছেন। আমরা দুই শিশু মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছি।

বাদশা মামা প্রথম থেকেই আমাদের কাছে দূরের মানুষ। যিনি জরির পোশাক পরে রাত-দুপুরে আমাদের অভিনয় দেখান, তিনি কাছের মানুষ হতে পারেন না। বাড়ির মানুষের কাছেও তিনি দল-ছাড়া। খুব ছোটবেলায় নানাজান তাকে একবার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। যে ছেলে স্কুল পালিয়ে যাত্রাদলে চলে যায়, নানাজানের মতো লোক তাকে ঘরে রাখতে পারেন না। খবর শুনে ছোট নানিজান খাওয়া-দাওয়া ছাড়লেন। মরো-মরো অবস্থা। নানাজান লোক পাঠিয়ে বাদশা মামাকে ফিরিয়ে আনলেন। সেই থেকে তিনি বাদশা মামাকে ঘাঁটান না। বাদশা মামাও আছেন আপন মনে।

বাদশা মামা আমার শিশুচিত্তকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। শিল্পীরা সব সময়ই শিশুদের আকর্ষণ করে। হয়ত শিশুরাই প্রতিভার খবর পায় সবার আগে, কিন্তু বাদশা মামা দারুণ অসুখী ছিলেন। যে সামাজিক পদমর্যাদা তাঁর ছিল তা নিয়ে যাত্রাদলের মানুষদের সঙ্গে সহজে মিশতে পারতেন না। অথচ তাঁর চিন্তা-ভাবনার সমস্ত জগৎ যাত্রাদলকে ঘিরে। মাঝে-মাঝেই তাঁকে দেখেছি, বারান্দায় চেয়ার পেতে চুপচাপ বসে আছেন। যদি গিয়ে বলেছি,

'মামা কি করেন?'

'কিছু না।'

সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়েছে, মামা তেমনি বসেই আছেন। কেউ যদি গিয়ে বলেছে,

'বাদশা, তোর কি হয়েছে রে?

কিছু না।'

মাঝে-মাঝেই এ রকম হত তাঁর। নানাজান তখন ক্ষেপে যেতেন। ছোট নানিজানকে ডেকে বলতেন, 'ভং ধরেছে নাকি? শক্ত মুগুড় দিয়ে পিটালে ঠিক হয়, বুঝেছ?' নানিজান মিনমিন করে কী কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করেন। তারপর একসময় দেখা যায়, তিনি বাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছেন।

নানাজানকে সবাই ভয় করতাম আমরা। দোতলা থেকে একতলায় তিনি নেমে এলে একতলা

নীরব হয়ে যেত। খুব কম বয়সী শিশু, যাদের এখনো বিচার-বুদ্ধিও হয়নি, তারাও নানাজানকে দেখলে ফ্যাকাসে হয়ে যেত। ভয়টাও বহুলাংশে সংক্রামক।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙত নানাজানের কোরান পাঠের শব্দে। মোটা গলা, টেনে টেনে একটু অনুনাসিক সুরে অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন। তখন মাথায় থাকত লাল রংয়ের ঝুটিওয়ালা একটা ফেজ টুপি। খালি গা, পরনে সিল্কের ধবধবে সাদা লুঙ্গি। হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে ঝুঁকে ঝুঁকে অনেকক্ষণ ধরে পড়তেন। পড়া শেষ হয়ে গেলে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতেন। ছোট নানিজান এই সময়ে জাম-বাটিতে বড় এক বাটি চা তৈরি করে নিয়ে যেতেন। নানাজান চুকচুক করে অনেকটা সময় নিয়ে চা খেতেন। তারপর নিজের হাতে হাঁসের খোঁয়াড় খুলে দিতেন। পাশেই মুরগির খোঁয়াড়, সেটিতে হাতও দিতেন না। হাঁসগুলি ছাড়া পেয়ে দৌড়ে যেত পুকুরের দিকে। তিনিও যেতেন পিছু পিছু। সমস্তই রুটিন বাঁধা, একচুলও এদিক-ওদিক হবার জো নেই।

কিছু কিছু মানুষ ভাগ্যকে নিজের হাতে গড়ে, আবার কারো কারো কাছে ভাগ্য আপনি এসে ধরা দেয়। নানাজান এ দুটির কোনোটির মধ্যেই পড়েন না। পূর্বপুরুষের গড়ে যাওয়া সম্পদ ও সম্মানে লালিত হয়েছেন। কিন্তু অসংযমী হননি। অহংকার ছিল খুব, সে অহংকার প্রকাশ পেত বিনয়ে। হয়ত কোনো আত্মীয়-কুটুম্ব এসেছে বেড়াতে : নানাজান ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। বার বার বলছেন, 'গরিবের ঘরে এসেছেন, কী দিয়ে খেদমত করি, বড়ো সরমিন্দায় পড়লাম, বড়ো কষ্ট হল আপনার। ওরে তামুক আন, আর খাসি ধর দেখি একটা ভাল দেখে।' যিনি এসেছেন, আয়োজনের বাহুল্য দেখে তিনি লজ্জায় পড়ে যেতেন।

পঁয়ত্রিশ বছর আগের দেখা চিত্র। স্মৃতি থেকে লিখছি। সে স্মৃতিকে বিশ্বাস করা চলে।

আমরা যারা ছেলে-ছোকড়ার দলে, তাদের প্রতি নানাজানের কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। একা একা থাকতেন সারাক্ষণই। বড়ো নানিজান তো কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতস্থই ছিলেন। তিনি দোতলা থেকে নামতেন কালে-ভদ্রে। ছোট নানিজানও যে কখনো হালকা সুরে নানাজানের সঙ্গে আলাপ করছেন, এমন দেখিনি। খালারাও আমাদের মত দূরে দূরে থাকতেন। ক্ষমতাবান লোকরা সব সময়ই এমন নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়ে যায়।

কেন জানি না, আমার নিজের খুব ইচ্ছে হত নানাজানের সঙ্গে ভাব করি। ঘুমোতে যাবার আগে কতদিন ভেবেছি, নানাজান যেন এসে আমাকে বলছেন, 'আয় রঞ্জু বেড়াতে যাই।' আমি তাঁর হাত ধরে চলেছি বেড়াতে। কতদিন ভেবেছি আজ ঘুম থেকে উঠেই নানাজানের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি। ঘুম ভাঙতেই তাড়া পড়েছে, 'ওজু করে পড়তে যা, ওজু করে পড়তে যা।' মৌলভী সাহেব বসে আছেন বাইরের ঘরে। আমরা সবাই আমপারা হাতে করে একে একে হাজির হচ্ছি। মেয়েরা ডান পাশে, ছেলেরা বাঁপাশে। সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ উঠছে, 'আলিফ দুই পেশ উন, বে দুই পেশ বুন।' নাশতা তৈরি হওয়া মাত্র আরবি পড়া শেষ। তারপর ইংরেজি, বাংলা আর অংকের পড়া। পড়াতে আসতেন রাম মাস্টার। ভারি ভাল মাস্টার। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। নবুমামা ছড়া বনিয়েছিলেন

রাম মাস্টার বুড়া
এক পা তার খোঁড়া

স্কুলে যাবার আগ পর্যন্ত পড়াতেন তিনি। তাঁর কাছে পড়ত শুধু ছেলেরাই। মেয়েদের আরবি ছাড়া অন্য কিছু পড়বার প্রয়োজন ছিল না। তারা ঘরের কাজ করত, জরি দিয়ে লতা-পাতা ফুল বানাত, বালিশের ওয়াড়ে নকশা তুলে লিখত, 'ভুল না আমায়।' রাম মাস্টার চলে যেতে যেতে স্কুলের বেলা হয়ে যেত। স্কুল শেষ হয়ে গেলে তো খেলারই পাঠ। সূর্য ডুবে অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত চলত হৈ হৈ। ফুরসত ফেলার সময় নেই। এর মধ্যেই লিলি এসে আমাকে নিয়ে যেত বাড়ির ভেতর। সে নিজেকে সব সময় ভাবত আমার একজন অভিভাবক। সে যে আমার বড়বোন এবং নানাজানের এই প্রকাণ্ড বাড়িতে আমিই যে তার সবচেয়ে নিকটতম জন, তা জানাতে তার ভারি আগ্রহ ছিল।

শাড়ি-পরা তার হালকা-পাতলা শরীর কোনো ফাঁকে আমার নজরে পড়ে গেলেই মন খারাপ

হয়ে যেত। অবধাবিতভাবে সে হাত ইশারা কবে আমায় ডাকবে। ফিসফিস করে বলবে, কাল সবাই দু'খান করে মাছ ভাজা খেয়েছে, আর তুই যে মোটে একটা নিলি।

'একটাই তো দিয়েছে আমাকে।'

'বোকা কোথাকার। তুই চাইতে পারলি না? আব দুধ দেবার সময় বলতে পারিস না, আরেক হাতা দুধ দাও মোহরের মা?'

'দুধ ভাল লাগে না আমার।'

'ভাল না লাগলে হবে? স্বাস্থ্য ভাল করতে হবে না? বেকুব কোথাকাব।'

এই বলে সে হয়ত কাঁচা-মিঠা গাছেব আম এনে দিল আমার জন্য। আবার কোনোদিন হয়ত ডেকে নিয়ে গেল বাড়ির পেছনে। আগের মতো গলা নেমে গেছে খাদে। ফিসফিস করে বলছে,

'কি ভাবিস তুই, আমরা কী ফ্যালনা? বড় নানীজানেব সম্পত্তির অংশ পাব না আমরা? নিশ্চয়ই পাব। বড় নানিজানের মেলা সম্পত্তি। আব আমাদের মা হচ্ছে তাব একমাত্র মেয়ে। আমরা দু'জনেই শুধু ওয়াবিশান। বুঝলি?'

'হ্যা, বুঝেছি।'

'কাঁচকলাটা বুঝেছিস। হাদাব বেহদ্দ তুই। ছিঃ ছিঃ, এতটুকু বুদ্ধিও নেই। নে, এটা রাখ তোর কাছে।'

তাকিয়ে দেখলাম চকচকে সিকি একটা।

'কই পেয়েছ?'

'আমাব ছিল', বলেই লিলি আবাব ফিসফিস কবে বলল,

'দেখিস আবার, গাধার মত সবাইকে বলে বেড়াবি না।'

'না, বলব না।'

লিলিব ভাবভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, পয়সাটা অন্যভাবে জোগাড় করেছে সে। আমরা দু'ভাইবোন কখনো হাতে পয়সা পেয়েছি, এমন মনে পড়ে না। অল্প বয়সে স্নেহটাকে বন্ধন মনে হত। না চাইতেই যা পাওয়া যায় তা তো সব সময়ই মূল্যহীন।

লিলিকে ভাল লাগত কালে-ভদ্রে। যেদিন সে খেয়ালের বসে সামান্য সাজ কবে লজ্জা-মেশানো গলায় আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে যেত, সেদিন তাকে আমি সত্যি সত্যি ভালবাসতাম। কিংবা কে জানে অল্প বয়সেই হয়ত করুণা করতে শিখে গিয়েছিলাম। সে কিছুক্ষণ ইতস্তত করে নাক-মুখ অল্প লাল করে বলত,

'আমার বিয়ে হয়ে গেলে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব, তুই থাকবি আমার সঙ্গে?'

'কবে বিয়ে?'

'হবে শিগগির।'

তাবপরই যেন নেহায়েত একটা কথাব কথা এমনিভাবে বলে বসত,

'দেখ তো রঞ্জু, শাড়িতে আমাকে কেমন মানায়?'

'ভাল।'

'কিন্তু আমার নাকটা যে একটু থ্যাবড়া।'

এ বাড়িব কাউকেই লিলি দেখতে পারত না। ভেবে পাই না কেমন কবে এত হিংসা পুষে সে বড় হয়েছে। আমি ছাড়া আর একটিমাত্র মানুষের সঙ্গে তার অল্পবিস্তর খাতির ছিল। তিনি আমাদের বড় নানীজান। বড় নানীজান থাকতেন দোতলায় বাঁদিকেব সবচেয়ে শেষের ঘরটায়। অন্ধকার ছোট একটি কুঠুরি। জানালার সামান্য যে ফাঁক দিয়ে আলো-বাতাস আসে, তাও গাবগাছের ঝাঁকড়া ডালপালা অন্ধকার করে রেখেছে। আলো-বাতাসহীন সেই অল্প পরিসর ঘরে বড় নানীজান রাতদিন বসে আছেন। দেখে মনে হবে, নানাজানের দেড়গুণ বেশি বয়স। সমস্ত মাথায় চুল পেকে ধবধব করছে। দাঁত পড়ে গাল বসে গেছে। নিচের মাড়িতে একটি মাত্র নোংরা হলুদ দাঁত। মাঝে-মধ্যে তিনি রেলিং ধরে কাঁপা কাঁপা পায়ে নিচে নেমে আসতেন। কি ফুর্তি তখন আমাদের! সবাই ভিড় করেছি তাঁর চারপাশে। নানীজান মস্ত একটি মাটির গামলায় দু'পয়সা দামের হলুদ রঙের হেনরী সাবান গুলে ফেনা তৈরি করেছেন। ফেনা তৈরি হলেই ঢালাও হুকুম— 'মুরগি ধইরা আন।' মুরগি ধরে আনবার জন্য ছোটাছুটি পড়ে যেত আমাদের মধ্যে। সব মুরগি নয়, শুধু ধবধবে সাদা মুরগি ধরে আনবার পালা। নানীজান সেগুলিকে সাবান-গোলা পানিতে চুবিয়ে পরিষ্কার করতেন। পাশেই

বালতিতে নীল রঙ গোলা থাকত। ধোয়া হয়ে গেলেই নীল রঙ-এ চুবিয়ে ছেড়ে দেয়া। কি তুমুল উত্তেজনা আমাদের মধ্যে।

টগরের সঙ্গে যখন গল্প করলাম সে নিচের ঠোঁট উল্টে দিয়ে বলল, 'এত মিথ্যে কথাও তোমার আসে? ছিঃ ছিঃ!'

মিথ্যে নয় বলে তাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারলাম না। বড় নানীজানকে নিয়ে কত বিচিত্র সব গল্প আছে। তাঁর ভূতে পাওয়ার গল্পটিও আমি টগরকে শুনিয়েছিলাম।

বড় নানীজানের অভ্যেস ছিল, সন্ধ্যাবেলা পুকুরে সাঁতার কেটে নাওয়া। তখন কার্তিক মাস। অল্প-অল্প হিম পড়েছে। নানীজান গিয়েছেন অভ্যেসমত গোসল সারতে। সূর্য ডুবে অন্ধকার হল, তাঁর ফিরবার নাম নেই। মোহরের মা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে পুকুরঘাটে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, কোমর-জলে দাঁড়িয়ে তিনি থর থর করে কাঁপছেন। মোহরের মা ভয় পেয়ে বলল, 'কি হয়েছে গো?'

নানীজান অস্পষ্টভাবে টেনে টেনে বললেন, 'ও মোহরের মা, টেনে তোল আমাকে, আমি উঠতে পারি না, কত চেষ্টা করলাম উঠতে।'

টগর বলল, হিস্টিরিয়া ছিল তোমার নানীর। ভূত-ফুত কিছু নয়। তোমার বড় নানীজানের ছেলেমেয়ে হয়নি নিশ্চয়ই।'

না, হিস্টিরিয়া ছিল না তাঁর। আর ছেলেমেয়ে ছিল না, তাও নয়। বড় নানীজানের একটি মাত্র মেয়ে ছিল, হাসিনা। সবাই ডাকত হাসনা। তিনি আমার আর লিলির মা।

হাসনা তিন মাসের একটি শিশুকে কোলে করে আর চার বছরের একটি মেয়ের হাত ধরে এ বাড়িতে এসে উঠেছিল। কোনো একটি বিশেষ ঘটনার কাল্পনিক চিত্র যদি অসংখ্যবার আঁকা যায়, তাহলে এমন একটি সময় আসে যখন সেই কাল্পনিক চিত্রকেই বাস্তব বলে ভ্রম হয়। আমি মার এ বাড়িতে আসার ঘটনাটি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। প্রতিটি ডিটেল অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হ্যারিকেন আর কুপি মিলিয়ে পনেরো-বিশটি বাতি জ্বলছে এখানে-ওখানে। বিল থেকে ধরে আনা মাছের গাদার চারপাশে বলে বউ-ঝিরা মাছ কুটছেন আর হাসি-তামাশা করছেন। হাসনা এল ঠিক এ সময়ে। অত্যন্ত জেদী ভঙ্গিতে সে উঠোনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখতে পেয়ে সব্বাই অবাক হয়ে নেমে এল উঠোনে। খড়ম খট খট করে নানাজান নেমে এলেন দোতলা থেকে আর হাসনা শুকনো চোখে দেখতে লাগল সবাইকে।

হাসনার বিয়েতে সারা গাঁর দাওয়াত ছিল। হিন্দুরা মুসলমান বাড়িতে এখন ইচ্ছে করে মাংস খেতে আসেন, তখন আসতেন না। হিন্দুদের জন্যে ঢালাও মিষ্টির ব্যবস্থা। নাম-করা কারিগর রমেশ ঠাকুর দু'দিন আগে বাড়িতে ভিয়েন বসালেন।

আত্মীয়-কুটুম্বের জায়গা হয় না ঘরে, নতুন ঘর উঠল এদিকে-ওদিকে। গাঁয়ের দারোগা খেতে এসে আঁৎকে উঠে বলল, 'করছেন কি খান সাহেব? এ যে রাজরাজাদের ব্যাপার!' নানাজান হাসিমুখে বললেন,

'প্রথম মেয়ের বিয়ে, সবাইকে না বললে খারাপ দেখায়, সবাই আত্মীয়-স্বজন।

গ্রামের নিতান্ত গরিব চাষীও মেয়ের বিয়েতে দু'বিঘা জমি বিক্রি করে ফেলে, হালের গুরু বেঁচে দেয়। আর নানাজান তখন টাকার উপর শুয়ে।

হাতি আনতে লোক গেল হালুয়াঘাট। সেখানে কালুশেখের দুটি মাদী হাতি আছে। বন থেকে কাঠের বোঝা টেনে নামায়। বিয়ের আগের রাতে মাহুতকে ঘাড়ে করে মাতু এসে দাঁড়াল। উৎসাহী ছেলেমেয়েরা কলাগাছের পাহাড় বানিয়ে ফেলল উঠোনে। মাহুতের সঙ্গে দুদণ্ড কথা বলার জন্য কী আগ্রহ সবার। 'মাহুত সাহেব কী একটু তামাক খেতে ইচ্ছে করবেন?'

হাতির পিঠে চড়ে বর এসে নামল। লোকে লোকারণ্য। ভিড়ের চাপে গেট ভেঙে পড়ে, এমন অবস্থা। জরীর মালায় বরের মুখ ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কলমা পড়ানোর আগে জরীর মালা সরানো হবে না। সে-ও রাত একটার আগে নয়। বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে বর বন্ধুদের নিয়ে সিগারেট খেতে গেল বাইরে। অমনি হৈ-হৈ করে উঠল সবাই, 'দেখেছি! কী রঙ! যেন সাহেবদের রঙ। রাজপুত্র এসে দাঁড়িয়েছে যেন!'

লিলিরও বিয়ে হল এই বাড়িতে। দশ-পনের জন বন্ধু নিয়ে রোগামত একটি ছেলে বসে রইল

বাইরের ঘরে। নিতান্ত দায়সারা গোছের বিয়ে। ভাল ছেলে পাওয়া গেছে, এই তো ঢের। তাছাড়া গয়না-টয়নাও তো নেহায়েত কম দেওয়া হয়নি। মায়ের গলার হার, হাতের ছ'গাছা চুরি, নানীজান দিলেন কানের দুল, ছোট নানীজান নাম-লেখা আংটি। কবুল বলতে গিয়ে লিলি তবু কেঁদে-কেটে অস্থির। নানাজানের প্রবল ধমকের এক ফাঁকে কখন যে কবুল বলেছে তা শুনতেই পেল না কেউ।

ন'মাইল পালকি করে গিয়ে ট্রেন। ট্রেন পর্যন্ত উঠিয়ে দিয়ে আসব আমি আর নবুমামা। বেডিংপত্তর নিয়ে দু'জন কামলা আগে আগে চলে গিয়েছে। পালকির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারি না, বারবার পিছিয়ে পড়ি। নবুমামা বললেন, পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে, আমি জুতা খুলে ফেললাম।

সজনিতলা এসে পাল্কি থামল। বেহারারা জিরোবে। পান-তামুক খাবে। লিলি পালকির ফাঁক থেকে হাত বাড়িয়ে ডাকল,

এই রঞ্জু, দুষ্টামি করবি না তো?'

'না।'

'আমার জন্য কাঁদবি না তো?'

'না, কাঁদব না।'

'কাঁদবি না কী রে গাধা? বোনের জন্য না কাঁদলে কার জন্য কাঁদবি? আমার কী আর কেউ আছে?'

ট্রেন ছেড়ে দিল।

এই বাড়ি ঐ বাড়ি করে ট্রেন দ্রুত সরে যাচ্ছে। নবুমামা কাঁদছেন হু হু করে। বেহারা এসে বলল, দু'জনে এসে বসেন পালকিতে, ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

লিলিকে ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে এসে আমার বয়স যেন হঠাৎ করে বেড়ে গেল। মনে হল কিছু কিছু চিরন্তন রহস্য যেন বুঝতে পারছি।

## তিন

আশ্বিন মাস আসতেই সাজ সাজ পড়ে গেল স্কুলে।

স্কুলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। গান, আবৃত্তি তো হবেই, সেই সঙ্গে নাটক হবে স্টেজ বেঁধে। 'হিরণ্য রাজা' নাটকের নাম। হিরণ্য রাজার পাঠ করেছেন বাদশা মামা। উৎসাহের সীমা নেই আমাদের। খালারাও ঘ্যান ঘ্যান করতে লাগলেন নাটক দেখবার জন্যে। মেয়েদের জন্যে পর্দাঘেরা আলাদা জায়গা করা হয়েছে এ বাড়ির মেয়েরা আগে কখনো নাটক-ফাটক কিছুই দেখেনি। দেখবার সখ খুব। ছোট নানী আর্জি নিয়ে গেলেন নানাজনের কাছে।

'এ সব কি দেখবে! না, না।' বলে প্রথম দিকে প্রবল আপত্তি তুললেও শেষের দিকে তাঁকে কেমন নরম মনে হল। সুযোগ বুঝে নানীজান বলে চলেছেন,

'একদিনের মোটে ব্যাপার। আমোদ-আহ্লাদ তো কিছু করে না।'

'না করে না, রাতদিনই তো আমোদ চলছে। আচ্ছা যাক। পালকি করে যেন যায়।'

স্কুলঘরে স্টেজ সাজানো হয়েছে। হ্যাজাকের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। হ্যারিকেন হাতে নিয়ে গ্রামের লোকজন আসছে কাতারে কাতারে। পর্দায় আড়াল করা মেয়েদের জায়গায় তিল ধারনের ঠাঁই নেই। আমি আর নবুমামা বসেছি মেয়েদের সঙ্গে। ছোট নানী আর দু'খালা চাদর গায়ে চুপচাপ বসে আছেন। নাটক শুরু হতে হতে রাত হয়ে গেল। বাদশা মামা সেজেছেন হিরণ্য রাজা। এমন মহান রাজা দীন-দুঃখীদের জন্য সমস্ত বিলিয়ে দিচ্ছেন। দুশ্চরিত্র মন্ত্রি ঘোঁট পাকাচ্ছে তলে তলে। রাজা আপন-ভোলা মানুষ, কিছু জানতেও পারছেন না। মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখছি সবাই। এক সময় হিরণ্য রাজা মনের দুঃখে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছেন। রানীও তাঁর পিছু পিছু। নানীজান চমকে বললেন,

'মেয়ে কোত্থেকে এলো। কার মেয়ে?'

'ও হচ্ছে হারু দাদা, মেয়ে সেজেছে।'

'ওমা, হারু নাকি?'

নানীজানের চোখে আর পলক পড়ে না। বিবেকের পাঠ করল আজমল। খালারা কাঁদতে কাঁদতে চাদর ভিজিয়ে ফেলল। শেষ দৃশ্যে হিরণ্য রাজা মন্ত্রীকে বলছেন—

এই রাজ্য তুমি লও ভাই। কাজ নাই রাজ্যপাটে, আমি বনবাসে যাব।
সেইখানে শান্তি অপার।
ছোট খালা বললেন, 'বেকুবটা মন্ত্রীকে মেরে ফেলে না কেন?'
মন্ত্রী বলছে, 'দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হোক রাজা, বৃথা তর্কে কোনো ফল নাই।'

ঝনঝন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। নবুমামা উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়লেন। নানীজান পেছনে থেকে চেঁচাচ্ছেন, 'ও নবু বস, দেখতে পাচ্ছি না। বসে পড়।' কী তীব্র উত্তেজনা! রাজার মৃত্যুতে চোখে জল। বাদশা মামার জয়জয়কার। কী পাঠটাই না করলেন!

নানাজানও যে শেষ পর্যন্ত অভিনয় দেখবেন, তা কেউ ভাবিনি। পালকিতে খালারা উঠতে যাবে, এমন সময় তিনি এসে হাজির। 'বাদশা তো বড় ভালো করেছে' এই বলে পালকিতে উঠবার তাড়া দিয়ে তিনি চলে গেলেন হেডমাস্টার সাহেবের বাড়ি। সেখানে তাঁর রাতের দাওয়াত।

বাড়ি গিয়ে দেখি মেহমানে বাড়ি ভর্তি। নন্দিপুর থেকে নানাজানের ফুপাতো বোন এসেছেন। ছেলেমেয়ে নিয়ে। সকাল-সকালই পৌছতেন, নৌকাব দাঁড় ভেঙে যাওয়ায় দেরি হয়ে গেছে। আমি আর নবুমামা অবাক হয়ে গেলাম মেহমানদের মধ্যে অদ্ভুত সুন্দর একটি মেয়েকে দেখে। নানাজানের ফুপাতো বোনেব বড় মেয়ে। ডাকনাম এলাচি। এমন সুন্দরও মানুষ হয়।

দু'মাসের ভেতর এলাচির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল বাদশা মামাব। আপাত কার্যকারণ ছাড়াই যে সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যাপার ঘটে তা-ই কেমন করে পববর্তী সময়ে মানুষেব সমস্ত জীবন বদলে দেয়, ভাবতে অবাক লাগে।

সে রাতে নাটক দেখে সবাই বাদশা মামার উপর মহাপ্রসন্ন ছিলেন। বাড়ি এসে দেখেন, ফুলেব মত একটি মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাদশার সঙ্গে এর বিয়ে হলে কেমন হয়? এই ভাবনা চকিতে খেলে গেল সবার মনে। এলাচি স্থায়ীভাবে নানাজানের বাড়িতে উঠে এলেন। নাম হয়ে গেল লাল বউ, আমি ডাকতাম লাল মামি, নবুমামা ডাকত লাল ভাবী। টকটকে বর্ণ, পাকা ডালিমের মত গাল। আর কি নামেই-বা ডাকা যায়!

নবুমামা এবং আমি দুজনে একইসঙ্গে লালমামির প্রেমে পড়ে গেলাম। সদা ঘুব ঘুব করি, একটু যদি ফুট-ফরমাস করতে দেন এই আশায়। লালমামি কাকে বেশি খাতির করেন, আমাকে, না নবুমামাকে এই নিয়ে ঝগড়া হয়ে যায় দুজনের। স্কুলে যাবার পথে বইখাতা নামিয়ে হয় হাতাহাতি।

লালমামির বড়ই খাবার ইচ্ছে হয়েছে, খেলা বন্ধ করে দুজনেই ছুটেছি ইন্দু সাহার বাড়ি। ইন্দু সাহার বাড়িতে দুটি বড়ই গাছ, মিষ্টি যেন গুড়। লালমামির ইচ্ছে হয়েছে কামরাঙ্গা খাবেন, ঝাল লংকা মাখিয়ে। বাড়ির পেছনে বিস্তৃত বন। এখানে-ওখানে গাছ আছে লুকিয়ে। দুজনেই গেছি বনে।

মেয়েরা খুব সহজেই ভালবাসা বুঝতে পারে। লালমামি আমাদের দুজনকেই বুঝে ফেললেন। পোষা বেড়ালের মত আমরা তাঁর সঙ্গে বেড়াই। মোহরের মা বলে, 'পুলা দুটা মাইয়া স্বভাবের, এসব ভাল না গো।'

আমি আর নবুমামা তখন নির্বাসিত হয়েছি পাশের ঘরে। কতটুকুই বা দূরে? লালমামি হাসছেন, আমরা শুনতে পারছি। লালমামি বলছেন, 'উঁহু, চুল ছিঁড়ে গেল।' আমরা উৎকর্ণ হয়ে শুনছি। লালমামি যদি কখনো বলেছেন, 'এই যা, আজ খাওয়ার পানি আনি নাই,' ওমনি নবুমামা তড়াক করে লাফিয়ে পড়েছে বিছানা ছেড়ে, 'ভাবী, পানি নিয়ে আসছি আমি।'

একঘেয়ে কোনো আকর্ষণেই আকর্ষণ থাকে না। মায়ের প্রতি মানুষের অন্ধ ভালবাসা ফিকে হয়ে আসে একঘেয়েমির জন্যেই। ভাই-বোনের ভালবাসার ধরনও বদলাতে থাকে। লালমামির প্রতি আমাদের ভালবাসা ফিকে হওয়ার কোনো ভয় ছিল না। তাঁর মত বিচিত্র স্বভাবের মেয়ে আমি পরবর্তী জীবনে আর একটিমাত্র দেখেছিলাম।

যে কথা বলছিলাম— লালমামি আমাদের বিচিত্রভাবে আকর্ষণ করলেন। হয়ত আমি আর নবুমামা দুজনে বসে আছি তাঁর ঘরে। মামি হুকুম করলেন,

'নবু, দরজা বন্ধ করে দে। খোল, এবার আলমারি খোল। রাজার পোশাকটা বের করত।'

আমি আঁৎকে উঠে বলেছি, বাদশা মামা মেরে ফেলবে। ঠোঁট উল্টে মামি তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করেছেন,

'নে, তুই এই মুকুটটা পরে ফেল। নবু, তুই কী সাজবি, সন্ন্যাসী?'

নবুমামা বললেন, তুমি কী সাজবে আগে বল?

'আমি রানী সাজব।'

'তাহলে আমি রাজা সাজব।'

ততক্ষণে আমি ঢলঢলে মুকুটটা মাথায় পরে ফেলেছি। তারস্বরে চেঁচাচ্ছি, না, আমি রাজা সাজব।

মামি বললেন, যুদ্ধ হোক দু'জনার মধ্যে। যে জিতবে, সেই রাজা। কথা শেষ না হতেই নবুমামা ঝাঁপিয়ে পড়েন আমার উপর। দুজন ধুলোমাখা মেঝেতে গড়াগড়ি খেতে থাকি। যেন এই যুদ্ধে জীবন-মরণ নির্ভর করছে। আল্লাহ্ জানেন, নবুমামা এই লিকলিকে শরীরে এত জোর পান কী করে?

জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতে দীর্ঘ সময় লাগে। মুখে নখের রক্তাভ আঁচড়ে, ধূলি-ধূসরিত শার্ট নিয়ে যখন যুদ্ধজয়ী রাজা দাঁড়ান তখন মামি নির্বিকার ভঙ্গিতে বলেন,

'আজ আর না, আজ থাক, যা, তোরা আমার জন্য তেঁতুল নিয়ে আয়।'

'বল তো তুই, টানলে ছোট হয় কোন জিনিস'?

লালমামি বিছানায় শুয়ে পা দোলাতে দোলাতে বলেন। হাজার চিন্তাতেও মাথায় সে জিনিসটার নাম আসে না, টানলে যা ছোট হতে থাকে।

'পারলি না? দেশলাই আন আমি দেখাচ্ছি।'

নবুমামা দৌড়ে দেশলাই নিয়ে আসেন। মামি আমাদের দুজনের স্তম্ভিত চোখের সামনে ফস করে একটা বার্ডসাই সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকেন। কোন ফাঁকে জানি বাদশা মামার কাছ থেকে জোগাড় করে রেখেছিলেন। আমাদের দুজনের নিঃশ্বাস পড়ে না। মামি বলেন, এই দেখ, যতই টানছি, ততই ছোট হচ্ছে। আমরা হা করে তাকিয়ে থাকি মামির দিকে। মামি আধ-খাওয়া সিগারেট বাড়িয়ে ধরেন আমাদের দিকে, শান্ত গলায় বলেন, নে এবাব তোরা টান। হাঁ করে দেখছিস কি? কসে টান দে। নাইলে তো বাড়িতে বলে দিবি। মামিব মুখেব গন্ধ দূব করবাব জন্যে পানি আনতে হয়, এলাচ দানা আনতে হয়। সেই সঙ্গে মামির প্রতি আমাদের এক নিষিদ্ধ আকর্ষণ জড় হতে থাকে।

বাড়িব বউ-ঝিবা লালমামিকে বিষ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল। এ কেমন ধাবা বউ? লাজ নেই, সহবত নেই।

কোথায় শাশুড়ীকে দেখে একহাত ঘোমটা দিয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, তা নয়, টগবগিয়ে ঘোড়ার মত চলে যায়। নতুন বউ রান্নাঘরে গিয়ে বসুক না দুদণ্ড। ননদের হাত থেকে আনাজ নিয়ে জোর করে কুটে দিক, তা নয়, গলায় বাঁশ দিয়ে হাসছে হি হি হি হি। মোহারের মা সময় বুঝে ছড়া কাটে --

"রূপ আর কয়দিনের?
নিমতা ফুল যায়দিনেব।"

নিমতা ফুল সক্কাল বেলাতেই ফোটে, রোদ একটু উঠতেই ঝর ঝর করে ঝড়ে পড়ে। কিন্তু যার জন্যে বলা সে শুনছে কই? শাশুড়ি মুখের ওপর কিছু বলেন না। লোকে বলবে, 'বউ কাটকী শাশুড়ী।' কী লজ্জার কথা!

একমাত্র চাবিকাঠি বাদশা মামা। সে-ই তো পারে বউয়ের রীতিনীতি শুধরে দিতে। কিন্তু দেখেশুনে মনে হয়, বউ জাদু করেছে বাদশা মামাকে।

বিয়ের পর পরই বাদশা মামা ভয়ানক বদলে গেছেন। চাল-চলনে, কথা-বার্তায় ভয়ানক অস্থিরতা এসেছে। আগে সমস্ত দিন বাইরে পড়ে থাকতেন। রাতের বেলা খেতে আসতেন, বাড়ির সঙ্গে এইটুকুই যা সংযোগ। এখন সমস্ত দিন বাড়িতে থাকেন। কিন্তু সে-ও অন্যরকম থাকা। হয়ত মিনিট খানিকের জন্যে লাল মামির ঘরে এসেছেন, চোখে-মুখে ব্যস্ততার ভার। যেন কোনো দরকারী জিনিস খুঁজে পাচ্ছেন না। লাল মামি ভ্রূ কুঁচকে বললেন,

'কি চাও?'

'কি না, কিছু না।'

বলে মামা বিব্রত ভঙ্গিতে চলে গেলেন। বসে রইলেন বাইরের ঘরে একা একা। আবার হয়ত আসলেন কিছুক্ষণের জন্যে, আবার বাইরে গিয়ে বসে থাকা। নানীজান একদিন বললেন— বাদশা,

কী হয়েছে রে?

বাদশা মামা কিছু বললেন না। ফ্যালফ্যালিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

সবাই অবাক হল, যেদিন বাদশা মামা কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেলেন। নানাজান সে দিনই প্রথম লালমামির ঘরে এসে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, এলাচি বাদশার কী হয়েছে?

লালমামি চুপ করে রইলেন। নানাজান বললেন, তোমাদের মিল হয় না কেন? কি ব্যাপার?

মামি চুপ করে রইলেন। নানাজান শান্ত গলায় বললেন,

'এলাচি, সরফরাজ খানের বাড়িতে কোনো বেচাল হয় না। খেয়াল থাকে যেন।'

নানাজান বেরিয়ে এসে ছোট নানীজানকে কিছুক্ষণ বকে নিচে নেমে গেলেন। সারাদিন বাড়ি থম থম করতে লাগল। সে সন্ধ্যায় কানাবিবি যখন সাপ-খেলানো সুরে কোরান পড়তে শুরু করল তখন কেন জানি না ভয়ে আমার বুক কাঁপতে লাগল।

তৃতীয় দিনের দিন সকালবেলা বাদশা মামা ফিরে এলেন। ভেতরের বাড়িতে না এসে বাইরের ঘরে বসে রইলেন। নানীজান এসে তাকে নিয়ে গেলেন ভেতর বাড়িতে। নানা সারক্ষণই সংকুচিত হয়ে রইলেন। যখন লালমামির সঙ্গে তাঁর দেখা হল তিনি ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন।

সবচেয়ে অবাক হওয়ার ব্যাপারটি হল রাতে। বাদশা মামা লালমামির ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। মামি বললেন,

'কে?'

বাদশা মামা নিষ্প্রাণ গলায় বললেন, আমি।

এদিকে পাশের ঘরে আমি আর নবুমামা কান খাড়া করে বসে আছি। কিন্তু আর কোনো সাড়া-শব্দ পাচ্ছি না। বাদশা মামা নিচু গলায় বললেন, দরজাটা খোল।

লালমামি কোনো সাড়া-শব্দ করলেন না। শেষ পর্যন্ত বাদশা মামা আমাদের ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলেন। আমরা তিনজন একখাটে শুয়ে রইলাম। মামা বার বার বলছেন, 'কাউকে বলবি না, খবরদার।'

'না।'

'বললে কান ছিঁড়ে ফেলব। দুজনের মনে থাকে যেন।'

## চার

ভাদ্রমাসের প্রথমদিকে নবুমামা অসুখে পড়লেন, কালান্তক ম্যালেরিয়া। হাত-পা শুকিয়ে কাঠি, পেট ফুলে ঢোল। উঠোনে ছেলেমেয়েরা হুল্লোড় করে বেড়ায়, নবুমামা চাদর গায়ে দিয়ে জলচৌকিতে বসে বসে দেখে। ম্যালেরিয়ার তখন খুব ভাল ওষুধ বেরিয়েছে। গাঢ় হলুদ রঙের কুইনাইন ট্যাবলেট। সেকালের এক পয়সার মত বড়ো, আস্ত গেলা যায় না। গলায় আটকে থাকে। সপ্তাহে একদিন খাবার নিয়ম, ম্যালেরিয়া হোক আর না-হোক। ওষুধ খেলেই কান ভোঁ ভোঁ করত, মাথা হাল্কা হয়ে যেত।

কুইনাইন খেয়ে খেয়ে এসময় নবুমামার জ্বর সারল। শরীর খুব দুর্বল। নিজে নিজে দাঁড়াতে পারে না। মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সারাদিন ঘ্যান ঘ্যান করে, এটা খাবে, ওটা খাবে। খিটখিটে মেজাজ। যদি কোনো কারণে লালমামি আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছেন, অমনি তার রাগ হয়ে গেছে। ওর দিকে তাকিয়ে হাসছ কেন? আমার দিকে তাকিয়ে হাস। শুনে লালমামি নিষ্ঠুরের মত বলে বসেন, তোর দিকে তাকিয়ে হাসব কি রে, তুই তো চামচিকা হয়ে গেছিস।

নবুমামার আকাশ-ফাটানো কান্না থামাবার জন্যে লালমামিকে অনেকক্ষণ নবুমামার দিকে তাকিয়ে হাসতে হয়। স্বাস্থ্যের জন্যে নবুমামার স্কুলে যাওয়াও বন্ধ। রোগা শরীর পেয়ে বিভিন্ন রোগ ইচ্ছেমত ছেঁকে ধরেছে। আজ সর্দি তো কাল জ্বর, পরশু পেট নেমেছে।

কানাবিবির দেওয়া তাবিজের বোঝা গলায় নিয়ে নবুমামা বেচারার মতো ঘুরে বেড়ায়। রাতের বেলা বড়ো জ্বালাতন করে। কিছুক্ষণ পর পর পানি খেতে চায়। পানি খাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার তার পেচ্ছাবের বেগ হয়। পেচ্ছাব করানোও কী কম হাঙ্গামা? হ্যারিকেন জ্বালাতে হয়, নবুমামা হাতে নেন একটা টর্চ। আমাকে গিয়ে ডেকে তুলতে হয় নানীজানকে। নানীজান আর আমি বসে থাকি বারান্দায়। নবুমামা টর্চ ফেলে ভয়ে ভয়ে যান। তাতেও রক্ষা নেই, ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠেছেন,

'ওটা কী, ঐ যে গেল?'

'কিছু না, শেয়াল।'

'শেয়াল? তবে ছায়া পড়ল না কেন?'

'অন্ধকারে ছায়া পড়বে কি রে হাঁদা?' নানীজান বিরক্ত হয়ে বলেন।

এই হল নিত্যকার রুটিন।

খাওয়া নিয়েও কী কম হাঙ্গামা। আজ ইচ্ছে হয়েছে কইমাছ ভাজা খাবেন। কইমাছ জোগাড় না হওয়া পর্যন্ত খাওয়া বন্ধ। সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত পীর-ফকির ধরা হল। ধর্মনগরের সুফি সাহেবের পানিপড়া আনবার জন্যে আমি আর বাদশা মামা নৌকা করে ধর্মনগর রওনা হলাম। দু'দিনের পথ। উজান ঠেলে যেতে হয়। সঙ্গে চাল ডাল নিয়ে নিয়েছি। নৌকাতেই খাওয়া-দাওয়া। বাদশা মামা এই দীর্ঘ সময় চুপচাপ কাটালেন। সন্ধ্যার পর নৌকার ছাদে উঠে বসেন। নেমে আসেন অনেক রাতে। সারাদিন শুয়ে শুয়ে ঘুমান। দেখলেই বোঝা যায় ভরসা হারানো মানুষ। কিন্তু কী জন্যে ভরসা হারিয়েছেন তা বুঝতে না পেরে আমার খারাপ লাগে।

সপ্তম দিনে ফিরলাম। সুফি সাহেব খুব খাতির-যত্ন করলেন আমাদের। তাঁর অনুরোধে বাড়িতে চারদিন থেকে যেতে হল। কথা নেই বার্তা নেই, বাদশা মামা সুফি সাহেবের মুরিদ হয়ে গেলেন। মাথায় সব সময় টুপি, নিয়ম করে নামাজ পড়ছেন। যতই দেখি ততই অবাক হই।

আমার অবাক হওয়ার আরো কিছু বাকি ছিল। বাড়িতে ফিরে জানলাম, নবুমামা খুলনা জেলার মনোহরদীপুরে চলে যাচ্ছেন। কিছুদিন সেখানে থাকবেন। খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা, শরীর ফিরলে চলে যাবেন রাজশাহী। নানাজানের খালাতো ভাই থাকেন সেখানে। সরকারি জরিপ বিভাগের কানুনগো। নবুমামা সেখানে থেকেই পড়াশুনা করবেন। নানাজান নিজে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িতে তারই আয়োজন চলছে। নবুমামা আগের চেয়েও মিইয়ে গিয়েছেন। আমাকে ধরা গলায় বললেন,

'লাল ভাবীকে ছাড়া আমি থাকতে পারব না।'

আমি ভেবেই পেলাম না একা একা আমি কী করে থাকব। নবুমামা আমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী। তাকে ছাড়া একা একা স্কুলে যাচ্ছি এই দৃশ্য কল্পনা করলেও চোখে পানি এসে যায়। নবুমামার আমার জন্যে কোনো মাথাব্যথা নেই, তার মুখে শুধুই লাল ভাবীর কথা। আমি বললাম,

নবুমামা, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান।

'আমি কী করে নিয়ে যাব? তুই বাবাকে বল।'

নানাজানকে বলবার সাহস আমার নেই। আমি লালমামিকে ধরলাম। মামি তখন বারান্দায় বসে সুঁচ-সুতো নিয়ে কী যেন করছিলেন। আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে সমস্ত খুলে বললাম। চুপ করে তিনি সমস্ত শুনলেন। আমার কথা শেষ হতেই বললেন, 'যা তো, দৌড়ে তোর ছোট খালার কাছ থেকে একটা সোনামুখী সুঁচ নিয়ে আয়। বলবি আমি চাইছি।'

সুঁচ এনে দিয়ে আমার কাতর অনুরোধ জানালাম।

'বলবেন তো মামি? আজই বলতে হবে। আজ সন্ধ্যা বেলাতেই।'

মামি বিরক্ত হয়ে বললেন,

'কি ঘ্যান ঘ্যান করিস, পরের বাড়িতে আছিস যে হুঁশ নেই? ইচ্ছে হয় নিজে গিয়ে বল।'

এর কিছুদিন পরই পানশী নৌকা করে নানাজান আর নবুমামা চলে গেলেন। যাবার সময় নবুমামার সে কী কান্না! কিছুতেই যাবে না। লালমামির শাড়ি চেপে ধরেছে। তারস্বরে চেঁচাচ্ছে,

'আমি যাব না, যাব না।'

লালমামি শুকনো গলায় বললেন,

'শাড়ি ছাড়, শাড়ি ধরে চেঁচাচ্ছিস কেন?

## পাঁচ

নবুমামা চলে যাবার পর আমার কিছু করবার রইল না। আম-কাঁঠালের ছুটি হয়ে গেছে স্কুল। সারাদিন বাড়িতে ঘুরে বেড়াই। বিকেল বেলাটা আর কিছুতেই কাটে না। রোদের তাপ একটু কমতেই হাঁটতে হাঁটতে চলে যাই সোনাখালী। হেঁটে যেতে যেতে কত আজগুবি চিন্তা মনে আসে। যেন কোন অপরাধ ছাড়াই দেশের রাজা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। হুকুম হয়েছে, আমার ফাঁসি

হবে। রাজ্যের সমস্ত লোক ফাঁসির মঞ্চের চারদিকে জড় হয়েছে। আমি তাকিয়ে দেখি, এদের মধ্যে লাল রঙের পোশাক পরা একটি মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে, 'না, এ ছেলে কোনো দোষ করেনি, এর ফাঁসি হবে না।' বলতে বলতে মেয়েটি কেঁদে ফেলেছে। আমি বলছি, 'না, হোক, আমার ফাঁসি হোক।' মেয়েটি অপলকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তার মুখের গড়ন অনেকটা লালমামির মত।

সোনাখালী পাকাপুলে অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকতাম। সেই সময় আমার মন থেকে ভূতের ভয় কেটে গিয়েছিল। একেক দিন নিশীথ রাতে একা একা ফিরেছি। অন্ধকারে একা ফিরতে ফিরতে কতবার চমকে উঠেছি নাম-না-জানা পাখির ডাকে। কিন্তু ভয় পাইনি কখনো। রান্নাঘরে গিয়ে দাঁড়ালেই মোহরের মা ভাত বেড়ে দেয়, নাও, খেয়ে গুষ্ঠী উদ্ধার কর। এইসব কথা কখনো গায়ে মাখি না।

আমি সে সময় অনেক বড়ো দুঃখে ডুবে ছিলাম। ছোটখাটো কষ্টের ব্যাপার, যা প্রতিদিন ঘটত, এই নিয়ে সেই কারণেই কোনো মাথাব্যথা ছিল না।

দিন আর কাটতে চায় না কিছুতেই। স্নেহ, ভালবাসা ছাড়া কোনো মানুষই বাঁচতে পারে না। আমি সেই কারণেই হয়ত অসুস্থ হয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে সময় কাটাই। কেন জানি না, অসুখটাই ভাল লাগে। সকাল থেকে সন্ধ্যা শুয়ে শুয়ে ঘুমানো ছাড়া অন্য কাজ নেই। মাঝে-মধ্যে বাদশামামা এসে বসেন। নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক কিছু কথাবার্তা হয়। মামা হয়ত বললেন,

'বেশি করে দুধ খা, শরীরে জোর হবে।'

'আচ্ছা মামা, খাব।'

'পীরপুরে জন্মাষ্টমির মেলা, যাবি নাকি দেখতে?'

'অসুখ সারলে যাব।'

মামা থাকেন অল্পক্ষণ। কথা বলেন ছাড়া-ছাড়া ভঙ্গিতে। দেখে-শুনে বড় অবাক লাগে। তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। গাল বসে গিয়ে কেমন প্রৌঢ় মানুষের মত দেখায়।

লালমামি বড়-একটা আসেন না। হয়ত দরজার বাইরে থেকে বললেন,

'রঞ্জুর জ্বর আবার এসেছে নাকি?'

'না মামি, জ্বর নেই।'

'না থাকলেই ভাল।' এই বলে তিনি ব্যস্তভাবে চলে যান। তাঁর যাওয়ার পথে তৃষিত নয়নে তাকিয়ে থাকি। সে সময়ে লালমামিকে আমি একইসঙ্গে ভালবাসি আর ঘৃণাও করি। কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এ ধরনের দ্বৈত অনুভূতি— সে-ই আমার প্রথম। পরবর্তী সময়ে অবশ্যি আরো অনেকের জন্যেই এমন হয়েছে।

ঠিক এ সময়ে আমার সফুরা খালার সঙ্গে অল্পমাত্রায় ঘনিষ্ঠতা হল। তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হবে এ আমার খুব ছোটবেলাকার বাসনা। তিনি আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়ো হবেন। খুব চুপচাপ ধরনের মানুষ। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, তিনি একা-একা হেঁটে বেড়াচ্ছেন বারান্দায়। হাতে একটা লাঠি। মাঝে মাঝে ঠক ঠক করে শব্দ করছে আর মুখে বলছেন, 'উড়ে গেল পাখি।' প্রথমদিন এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার দেখে আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি! তিনি আমাকে দেখতে পাননি, কাজেই তিনি লাঠি হাতে ঠক ঠক করতে লাগলেন আর পাখি ওড়াতে লাগলেন। আমি যখন গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

'খালা, কী করেন?'

লজ্জায় খালার চোখে পানি এসে গেল। কোনো রকমে বললেন,

'কিছু না, আমি খেলি।' তারপরও খালাকে এমন অদ্ভুত খেলা খেলতে দেখেছি। লজ্জা পাবেন এই জন্যে আমি তাঁর সামনে পড়িনি। তাঁর সঙ্গে ভাব করবার আমার খুব ইচ্ছে হত। কিন্তু তিনি আমাকে দেখলেই ভারি লজ্জা পেতেন।

অসুখের সময় প্রায়ই সফুরা খালা এসে দাঁড়াতেন আমার দরজায়। আমি ডাকতাম,

'খালা, ভেতরে আসেন।'

'না, আমি এখানেই থাকি।'

এই বলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন দরজায়। অনেক রকম কথা হত তাঁর সাথে। কী ধরনের কথা তা আজ আর মনে নেই, মনে আছে, খালা সারাক্ষণই মুখ টিপে টিপে হাসতেন।

খালা মাঝে-মাঝে অদ্ভুত সব গল্প করতেন।

একদিন এসে বললেন, "কাল রাতে ভারি আশ্চর্য একটি ব্যাপার হয়েছে রঞ্জু। ঘুমিয়ে আছি, হঠাৎ হাসির শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলতেই দেখি একটি ফুটফুটে পরী আমার খাটে বসে আছে। আমি তো অবাক! তারপর পরীটি অনেক গল্প করল আমার সঙ্গে। ভোর হয়ে আসছে যখন তখন সে বলল, 'আমি যাই।' আমি বললাম, 'ও ভাই পরী, তোমার পাখায় একটু হাত দেব?' সে বলল, 'দাও না। আমি পরীর পাখায় হাত বুলিয়ে দেখলাম, কী তুলতুলে পাখা। আর সেই থেকে আমার হাতে মিষ্টি গন্ধ। দেখ না শুঁকে।"

আমি সফুরা খালার হাত শুকতেই বকুল ফুলের গন্ধ পেলাম। খালা হয়ত অনেকক্ষণ বকুল ফুলের মালা হাতে করে ঘুরে বেড়িয়েছেন, তারই গন্ধ। সফুরা খালা সত্যি ভারি অদ্ভুত মেয়ে ছিল।

এক রাতে ভারি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল। আমি লিলিকে স্বপ্নে দেখলাম। সে ঠিক আগেকার মত অভিভাবকসুলভ ভঙ্গি করে বলছে, 'রঞ্জু, তোর একটুও যত্ন হচ্ছে না এখানে। তুই আমার কাছে চলে আয়।'

আমি লিলির কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। কত দিন হয়েছে সে চলে গেছে। এ দীর্ঘদিনেও তার কথা কেন যে মনে পড়ল না! স্বপ্ন ভেঙে আমার খুব অবাক লাগল। লিলি যে দেখতে কেমন ছিল তাও পর্যন্ত আমার মনে নেই। শুধু মনে আছে, তার চিবুকটা লম্বাটে ধরনের ছিল। সেখানে একটা লাল রঙের তিল ছিল। লিলি ছোটবেলায় আমাকে এই তিল দেখিয়ে বলত, রঞ্জু, এই তিলটা যদি কপালে থাকত, তাহলে আমি রাজরানী হতাম।

দর্ঘীদিন পর লিলিকে স্বপ্নে নিখুঁতভাবে দেখলাম। এবং সে রাতেই ঠিক করলাম, ঘুম ভাঙতেই নানাজানের কাছ থেকে ঠিকানা জেনে লিলিকে চিঠি দেব। এই মনে করে আমার খুব ভাল লাগতে লাগল। মনে হল শরীর সেরে গেছে, একটু বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খাই।

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই জোছনা দেখে চোখ ছলছলিয়ে উঠল। এমন উথাল-পাথাল আলো দেখলে মানুষের মনে এত দুঃখ আসে কেন কে জানে?

অনেকক্ষণ দাাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। পা যখন ধরে এলো তখন দেয়াল ঘেঁষে বসে রইলাম। হঠাৎ শুনি পাশের ঘরে লালমামি কাঁদছেন।

কোনো ভুল নেই, স্পষ্ট শুনতে পেলাম। মামাও যেন নিচু গলায় কি একটা বললেন। মামি কান্না থামিয়ে ধমকে উঠলেন, কোনো কথা শুনব না আমি।

বাইরের এই অপূর্ব জোছনার সঙ্গে এই ঘটনা কেমন যেন মিশ খায় না। আমার মন খারাপ হয়ে গেল।

## ছয়

নানাজান বললেন, ঠিকানা নিয়ে কী করবি?

'চিঠি লিখব।'

'এতদিন পর চিঠি লেখার কথা মনে পড়ল?'

আমি চুপ করে রইলাম। নানাজান একটু কেশে বললেন,

'শরীরের হাল কেমন? জ্বর আছে?"

'জি, না।'

'নবু তোর কাছে চিঠি-ফিঠি লেখে।'

'জি লেখে।'

'পূজার বন্ধে বাড়ি আসবে বলে চিঠি লিখেছে আমার কাছে।' বলতে বলতে নানাজান হঠাৎ কথা থামিয়ে বলেন,

'লিলিরা আগে যেখানে থাকত এখন সেখানে নাই। নতুন ঠিকানা তো আমার জানা নাই। আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে বলব।'

লিলি আপনার কাছে চিঠি লেখে নানাজান?'

নানাজান একটু ইতস্তত করে বললেন, কম লেখে।

আশ্বিনের গোড়াতেই নবুমামা এসে পড়লেন।

তাকে দেখে আমার চোখে পলক পড়ে না। লম্বায় বেড়েছেন, স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। ঠোঁটের ওপর

হালকা নীল গোঁফের রেখা। নবুমামা আমাকে দেখেই হৈ হৈ করে উঠলেন, তোর এ কি হাল রঞ্জু!

'অসুখ করেছিল আমার। আপনাকে আর চেনা যায় না মামা।'

স্বাস্থ্য দেখেছিস? দেখ, হাতের মাসল টিপে দেখ।'

মাসল টিপে দেখার দরকার পড়ে না। নবুমামার স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য দেখে ঈর্ষা হয় আমার। লালমামি তো নবুমামাকে চিনতেই পারেন না, কে এসেছে ভেবে থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। ওমনি নবুমামা খপ করে তার হাত চেপে ধরলেন। মামি বললেন,

'নবু নাকি? তুমি তো বদলে গেছ।'

মামি নবুমামাকে আজ প্রথম তুমি করে বললেন। নবুমামা হেসেই কূল পান না। হাসি থামিয়ে কোনমতে বললেন,

'ভাবী, তুমি আগের মতই আছ। না, আগের মত নয়, আগের চেয়ে সুন্দর।'

অনেক দিন পর নবুমামাকে দেখে কি যে ভাল লাগল! তাছাড়া, মামা এত বেশি বদলে গেছেন কি করে সেও এক বিস্ময়। ছোটবেলায় দুজনকে তো একই রকম দেখাত। আমি পরম বিস্ময় নিয়ে নবুমামার পিছু পিছু ফিরতে লাগলাম। নবুমামার গল্প আব ফুরোয় না। স্কুলের গল্প, স্কুলের বন্ধুদের গল্প। রাজশাহীর গল্প। এর মধ্যে রাজশাহী থেকে নাটোর রাজবাড়িতে গিয়েছিলেন তার গল্প। আমি শুনি আর অবাক হই।

নবুমামা ক্লান্ত হয়ে এসেছিলেন। দুপুবে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমিও বেশ শুয়ে আছি কখন নবুমামা জাগবেন সেই আশায়। ঘুম ভাঙতে ভাঙতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত। ছোট নানিজান এসে ডেকে তুললেন। দুজনে চলে গেলাম লালমামির ঘরে। মামির প্রতি নবুমামার শৈশবেব যে টান ছিল তা দেখলাম এতদিনের অদর্শনে এতটুকু কমেনি, ববং বেড়েছে।

লাল মামি বললেন, নবু, আমার ভীষণ মাথা ধরেছে, পরে গল্প কবব তোমাব সাথে। নবুমামা হো হো করে হাসেন।

'না, গল্প এখনি করতে হবে। আর আগের মত তুই করে ডাকতে হবে।'

এই বলে নবুমামা দবজায় খিল এঁটে দিলেন। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, নবুমামা রহস্যময ভঙ্গিতে তার প্যান্টের পকেটে হাত দিচ্ছেন,

'তোমার জন্যে কি এনেছি, দেখ ভাবী।'

'বল তো দেখি কি? আন্দাজ কর।'

লালমামি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। নবুমামা বললেন,

ছোটবেলায় আমাদের সিগারেট খাইয়েছিলে। আজ আমি সিগারেট নিয়ে এসেছি। আজকে আবার খেতে হবে।'

'তুমি কি এর মধ্যেই সিগারেট ধরেছ নাকি?

'না, ধরিনি। তোমার জন্য এনেছি।'

বলেই নবুমামা নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে লালমামির দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। লালমামি বললেন,

'আমি সিগারেট খাব না।'

'খেতেই হবে।'

নবুমামা জোর করে মামির মুখে সিগারেট গুঁজে দিলেন। থু থু করে ফেলে দিয়ে মামি শুকনো গলায় বললেন,

'তুমি বড়ো বেয়াড়া হয়ে গেছ নবু।'

নবুমামা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কায়দা করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন। এক সময় বললেন,

'ভাবী, তোমার কাছে আমি এত চিঠি লিখলাম, জবাব দাওনি কেন?'

'একটা তো দিয়েছি।'

'না, এবার থেকে সব চিঠির জবাব দিতে হবে।'

এই বলে নবুমামা বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'রঞ্জু, চল মাঠে বেড়াই। খুব বাতাস দিচ্ছে, মাঠে হাঁটলে খিদে হবে।'

মাঠে সে রাতে প্রচুর জোছনা হয়েছে। চকচক করছে চারদিক। ঠাণ্ডা একটা বাতাস বইছে।

নবুমামা চেঁচিয়ে বলল, কি জোছনা! খেতে ইচ্ছে হয়। মনে হয় কপ কপ করে খেয়ে ফেলি। নবুমামা মুখ হা করে খাবার ভঙ্গি করতে লাগল। বিস্মিত হয়ে আমি তার আনন্দ দেখলাম।

অনেক রাতে বাড়ি ফিরে দেখি বাদশা মামা জলচৌকিতে চুপচাপ বসে আছেন। নবুমামাকে দেখে নির্জীব কণ্ঠে শুধালেন,

'কখন এসেছিস?'

'সকালে। তুমি কোথায় ছিলে?'

বাদশা মামা বিড়বিড় করে কি বললেন, বোঝা গেল না। নবুমামা বললেন, 'তোমার কি হয়েছে?'

বাদশা মামা এর উত্তরেও বিড়বিড় করলেন।

ভাত খেতে খেতে নবুমামা বললেন, বাদশা ভাইয়ের কি হয়েছে?

নানীজান বললেন, 'জাদু করেছে তাকে।'

'কে জাদু করেছে?'

'কে আবার। বউ।'

নবুমামা রেগে গিয়ে বলল, কি সব সময় বাজে কথা বলেন।

নানীজান বললেন, কি যে গুণের বউ, তা কি আর এতদিনে জানতে বাকি আছে আমার? বাদশার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না।

লালমামি কখন যে নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন জানতে পারিনি। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কে যাদু করেছে, মা?

নানীজান বললেন, 'বউ, তুমি চোখ রাঙিয়ে কথা বল কার সঙ্গে?'

'আমি চোখ রাঙিয়েছি?'

'তুমি কার ওপর গরম দেখাও বউ, রূপের দেমাগে তো পা মাটিতে পড়ে না। এদিকে আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখাতে পারি না আমি। বাঁজা মেয়েমানুষ বলে সারা দুনিয়ার লোকে তোমাকে ডাকে।'

নবুমামা বললেন, মা, আপনি চুপ করেন।

'কেন চুপ করব? কাকে ডরাই আমি? বাদশাকে আজ বললে কাল সে তিন তালাক দেয়।'

লালমামি বললেন, তাই বলেন না কেন? ঐ তো বসে আছে চৌকিতে। যান, গিয়ে বলেন।

নবুমামা আর আমি দোতলায় উঠে দেখি মামি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন বারান্দায়। আমাদের দেখে উঁচু গলায় বললেন,

'নবু, তুমি কালকে আমাকে বাবার বাড়িতে রেখে আসবে?'

নবুমামা চুপ করে রইলেন।

নবুমামা এক মাস রইলেন আমাদের সঙ্গে। তিনি অনেক গল্পের বই নিয়ে এসেছিলেন, প্রতিদিন সেগুলি পড়া হত। লোহারামের কেচ্ছা বলে একটি বই ছিল। এমন হাসির! নবুমামা পড়তেন, আমি আর লালমামি শুনে হেসে গড়াগড়ি। ছোট নানীজান এক একদিন রেগে ভূত হতেন।

'আস্তে হাসতে পার না বউ? তোমার শ্বশুর শুনলে কি হবে?'

মোহরের মা আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বলত—

যত হাসি তত কান্না
কহে গেল রাম সন্না।

নবুমামা শুনতে পেলে বলতেন, মোহরের মা, তোমার রাম সন্নাকে এই বইটা একটু পড়তে দিও। দেখি ব্যাটা হাসে কি কাঁদে।

একদিন হাসির শব্দ শুনে লাজুক পায়ে সফুরা খালা এসে হাজির। দরজার ওপাশ থেকে ফিকফিক করে বলছে,

'ভাবী, তোমরা কি নিয়ে হাসছ?'

'গল্প শুনে হাসছি। হাসির গল্প।'

সফুরা খালা ভেতরে এসে দাঁড়িয়ে মিটমিট হাসি হাসতে লাগলেন। যেন আমাদের কোনো

গোপন অভিসন্ধি টের পেয়ে গিয়েছেন। তারপর আগের মত ফিকফিক গলায় বললেন,

হাসির গল্প আমার ভাল লাগে না।

তবু তিনি অনেক্ষণ পর্যন্ত বসে বসে নবুমামার গল্প পড়া শুনলেন। তারপর বললেন, চল না, সবাই মিলে দীঘির ঘাট থেকে বেড়িয়ে আসি। এখন তো আর লোকজন নেই।

সেদিন থেকে আমাদের রুটিন হল, গল্প-টল্প পড়ার পর দীঘির ঘাটে বেড়াতে যাওয়া। বেড়াতে বেড়াতে একদিন নবুমামার উল্লাসের কোনো সীমা থাকত না। স্কুল থেকে শিখে আসা একটা হিন্দি গান বেসুরো গলায় ধরে বসতেন। প্রথম লাইনটি বোধ হয় এরকম ছিল—

"মাটি মে পৌরণ
মাটি মে শ্রাবণ
মাটি মে তেনবন যায়গা।"

পাখির ডানায় ভর করে সময় কাটতে লাগল। অবশ্যি বেড়াতে এসে মাঝে মধ্যে লালমামির ভীষণ মেজাজ খারাপ হয়ে যেত। সেগুলি ঘটত তখনি যখন মামি দেখতে পেতেন বাদশা মামা ঘাটের উল্টোদিকে চুপচাপ বসে আছেন। দেখে মনে হয়, যেন মানুষ নয়, উইয়ের টিবি। এতটুকু নড়াচড়াও নেই।

দেখতে দেখতে নবুমামার ছুটির দিন ফুরিয়ে গেল। আমার মনে হতে লাগল, একা একা আমার থাকতে হলে আমি আর বাঁচব না। যতই যাওয়ার দিন এগিয়ে আসে ততই আমার কষ্ট বাড়তে থাকে। যাবার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যাবেলা ভারি মন নিয়ে লালমামির ঘরে বসে আছি। নবুমামাও কথা বলছেন না। এমন সময় নিচে থেকে কানাবিবি ডাকল, 'ও এলাচি বেগম! ও এলাচি বেগম!'

লালমামি বললেন, আসছি, কেন ডাকে দেখে না।

নবু মামা বললেন— তোমার নাম এলাচি কেমন ভাবী?

'আমার মুখে সব সময় এলাচির গন্ধ থাকে, এই জন্যেই এলাচি নাম।'

নবু মামা এগিয়ে এসেছেন, 'আগে তো কোনোদিন বলনি— শুঁকে দেখতাম। দেখি ভাবী, মাথাটা একটু নিচু করত।

'কি পাগলামি কর নবু।'

বলার আগেই নবু মামা লালমামির মাথা ঝাপটে ধরেছে এবং হৈ হৈ করে উঠেছে। আরে সত্যি তাই। এলাচির গন্ধ।

ছোট নানীজান ঢুকলেন এ সময়, শুকনো গলায় বললেন, 'ও বউ, তোমাকে এক ঘণ্টা ধরে ডাকছে কানাবিবি। কানে শুনতে-টুনতে পাও তো?

লালমামি বললেন, কি জন্যে ডাকছে?

'সে যে তোমাকে গলায় আর কোমরে বাঁধবার জন্যে তাবিজ দিয়েছিল, সেগুলি কি করেছ?'

'ফেলে দিয়েছি।'

'কেন ফেলে দিয়েছ?'

'তাবিজ দিলে কি হবে?'

নানীজান রেগে আগুন হয়ে বললেন, কি, অত বড়ো সাহস তোমার বউ? আল্লার কোরআন কালামকে অবিশ্বাস। রোজা নাই, নামায নাই! বেহায়া বেপর্দা মেয়ে!

নবুমামা বললেন, মা, আপনি চুপ করেন।

'না, চুপ করব কেন? বউ শেষ কথা আমার, তাবিজ দিবা কি-না কও।'

লালমামি বললেন, আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন। সে যদি বলে তাবিজ দিলেই আমার ছেলেমেয়ে হবে, তাহলে দিব।

এমন সময় নিচে হৈচৈ শুনা গেল। আমি আর নবুমামা দৌড়ে গিয়ে দেখি, রহমত মিয়া শিকল খুলে কিভাবে যেন বেরিয়ে পড়েছে। হাতে শিকল নাচাচ্ছে, আর বলছে 'কাঁচা খাইয়া ফেলামু! কাঁচা খাইয়া ফেলামু!'

লোকজন ঘিরে ফেলেছে তাকে। কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। দু'একজন লম্বা বাঁশ বাগিয়ে

ধরে আছে। নানাজান বললেন,

'কেউ ওরে মারবে না, খবরদার। সাবধানে ধর।'

বহু কসরত করতে হল ধরতে গিয়ে। শিকলের বাড়ি খেয়ে হারিস সর্দার তো প্রায় মরো-মরো। নানাজান বললেন, যাও, নৌকায় করে পাগল হারামজাদাটাকে এক্ষুণি নান্দিপুরের বাজারে ছেড়ে দিয়ে আস। এঁটো কাঁটা খেয়ে বেশ বেঁচে থাকবে।

ঘাটে নৌকা তৈরি ছিল। বহু উৎসাহী সহযাত্রী তৈরি হয়ে পড়ল। একটি জলজ্যান্ত পাগলকে অন্যগ্রামের বাজারে ছেড়ে আসা এ্যাডভেঞ্চারের মত।

পাগল তো কিছুতেই নৌকায় উঠবে না। চেঁচামেচি চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলেছে। কিন্তু নৌকায় উঠেই তার ভাবান্তর হল। হাত ডুবিয়ে দিল নদীর পানিতে, তারপর খুশিতে হেসে ফেলল।

'আহা! পাগলটার কারবার দেখে বড়ো মায়া লাগে রে।'

তাকিয়ে দেখি, ঘাটের উপর বসে থেকে বাদশা মামা আফসোস করছেন। তার চোখ স্নেহ ও মমতায় চক চক করছে।

পরবর্তী দু'দিন বাড়ির আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত রইল। নবু মামা যে সকালে চলে যাবেন সে সকালে লালমামির সঙ্গে কানাবিবির একটা ছোটখাটো সংঘর্ষ হয়ে গেল। ঘুম ভেঙেই শুনি লালমামী বলেছেন—

'এ কানাবিবির কাজ। কানাবিবি, তোমার এমন সাহস।'

কানাবিবি বলছে---

'বাড়ির বউ মানুষ কেমন গলায় কথা কয় গো।'

বিষয় আর কিছু নয়। লালমামি ঘুমোতে গিয়ে দেখেছেন, তার বালিশের নিচে শাড়ির পাড়ের টুকরো, মাথার চুল, একখণ্ড ছোট হাড়— এই জাতীয় জিনিস সুতো দিয়ে বেঁধে রেখে দেয়া। বশীকরণের জিনিসপত্র হয়ত। সেই থেকেই এ বিপত্তি।

নবুমামাকে স্টেশনে দিয়ে আসতে আমি সঙ্গে চলেছি। রাত দুটোয় ট্রেন। সন্ধ্যাবেলা খেয়ে-দেয়ে রওনা হয়েছি। হ্যারিকেন দুলিয়ে একটি কামলা যাচ্ছে আগে আগে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে হু হু করে। নবুমামা আর আমি গল্প করতে করতে যাচ্ছি। হঠাৎ মামা বললেন,

'ও তোকে বলা হয়নি, লিলির সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার। শান্তাহার স্টেশনে। প্লাটফরমে বসেছিল, আমি তাকে চিনতে পারিনি। হঠাৎ ডাকল,

'নবুমামা, না?'

নবুমামা কিছুক্ষণ থেকে বললেন, খুব গরিব হয়ে গেছে। রোগা হয়েছে খুব। ময়লা কাপড়-চোপড়। এমন খারাপ লাগল দেখে।

'লিলির বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না, লিলি বলল, আমাকে দেখে লজ্জা পেয়ে নাকি লুকিয়ে আছে কোথায়।'

'আর কিছু বলেনি?'

'তোর কথা জিজ্ঞেস করল। তার অবস্থা একটু ভালো হলেই তোকে নাকি তার কাছে নিয়ে যাবে।'

নবুমামা বললেন, 'তোর মন খারাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমারো হয়েছে। বিয়ের পর যখন লিলি শ্বশুরবাড়ি গেল, মনে আছে, রঞ্জু?'

'আছে।'

'ট্রেনে উঠে কি কাঁদাটাই-না কাঁদল।'

নবুমামা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

## সাত

সেবার আমি খুব অর্থকষ্টে পড়লাম।

স্কুলের বেতন দিতে হয়। মাঝে-মধ্যে চাঁদা দিতে হয়। আগে নবুমামা যখন দিতেন সে সঙ্গে আমারটাও দিয়ে দিতেন। এখন আমি একলা পড়েছি। নিজ থেকে কারো কাছে কিছু চাইতে পারি না। পোশাকের বেলায়ও তাই। নবুমামার কাপড়-জামা বরাবর পরে এসেছি। লিলিও প্রায়ই বানিয়ে

দিয়েছে। অসুবিধে হয়নি কিছু। এখন অসুবিধে হতে লাগল। কি করব ভেবে পাই না। বাদশা মামার কাছে কিছু চাইতে লজ্জা করে। আমি খুব মুশকিলে পড়ে গেলাম। নিজেকে অবাঞ্ছিত ভাবা খুব কষ্ট ও লজ্জার ব্যাপার। আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। খুব ইচ্ছে হতে লাগল লিলির কাছে চলে যাই। কিন্তু তার কাছে চিঠি লিখে জবাব পাই না। পুরোনো জায়গা ছেড়ে তারা নতুন যেখানে গিয়েছে, তার ঠিকানাও জানায়নি কাউকে।

তাছাড়া নানাজানের সংসারেও নানারকম অশান্তি শুরু হয়েছে। তাঁর জন্মশত্রু হালিম শেখ জমি নিয়ে মামলা শুরু করেছে। টাকা খরচ হচ্ছে জলের মত। বৃদ্ধ বয়সে নানাজানকে কোর্ট-কাচারিতে দৌড়াদৌড়ি করতে হচ্ছে। বাদশা মামাকে দিয়ে তো কোন কাজ করাবার উপায় নেই। তিনি জড় পদার্থের মত হয়ে গিয়েছেন। সুফি সাহেবের বাড়ি থেকে ফিরবার পর বেশ কিছুদিন ধর্ম-কর্ম নিয়ে ছিলেন। লোকে ভালই বলেছে। এখন সেসব ছেড়েছেন। নেশা-ভাঙও নাকি করেন আজকাল।

সফুরা খালাকে নিয়েও অনেক রকম অশান্তি হচ্ছে। তখন তিনি দেখতে দেখতে বড় হয়ে উঠেছিলেন। তার বিয়ের কথাবার্তাও হচ্ছে। একবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। ছেলের বাবা মেয়ে দেখে মহাখুশি। এমন ভাল স্বভাবের মেয়ে সে নাকি তার সমস্ত জীবনে দেখেনি। কিন্তু বিয়ে হল না। সফুরা খালাকে নিয়ে নানারকম রটনা। তার না-কি মাথা খারাপ। রাতে-বিরেতে মেয়ে না-কি পুকুরঘাটে হেঁটে বেড়ায়। একবার কোনো মেয়ে সম্পর্কে এ জাতীয় কথা ছড়িয়ে পড়াটা খুব খারাপ লক্ষণ। এ নিয়ে ঘরেও অশান্তির শেষ নেই। নানিজান বিনিয়ে-বিনিয়ে গানের মত সুরে কাঁদেন। মাঝে মাঝে আপন মনে বলেন, আমার  নসীব, বিয়ে করালাম ছেলে, বউটা বাঁজা— মেয়েটাও আধ-পাগলা।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত অশান্তি সেই সফুরা খালা নির্বিকার। আমি একদিন সফুরা খালাকে জিজ্ঞেস করলাম, খালা, আপনি নাকি রাতে-বিরেতে একা একা ঘুরে বেড়ান?'

খালা মৃদু গলায় বললেন,

'একা একা পুকুর ঘাটে বসে থাকতে এত ভাল লাগে!'

তাকে নিয়ে চারিদিকে যে এত অশান্তি সেদিকে কিছুমাত্র খেয়াল নেই। আছে আপন মনে। তার জন্যে আমার খুব কষ্ট হতে শুরু করল। খালাকে আমি তখন ভালবেসে ফেলেছি।

আসলে খালাকে আমি একটুও বুঝে উঠতে পারিনি। যাবতীয় দুর্বোধ্য বস্তুর জন্যে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। সেই জন্যেই তার প্রতি আমার প্রবল ভালবাসা গড়ে উঠল। আমার ইচ্ছে হল, তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব গড়ে উঠুক।

কিন্তু তিনি নিজের চারদিকে একটি দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন। এই দেয়াল ভেদ করে তার নৈকট্য লাভের উপায় নেই। নিজের সৃষ্টি জগতেই তিনি ডুবে আছেন। বাইরের প্রতি একটুও খেয়াল নেই। ইচ্ছে হল তো চলে গেলেন পুকুর পাড়ে। একা বেড়াতে গেলেন বাগানে।

এসব দেখে-শুনে কেন জানি না আমার একটা ধারণা হয়েছিল, সফুরা খালা বড় রকমের দুঃখ পাবে জীবনে। এ রকম মনে করবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু আমার মনে হত, একেই হয়ত intuition বলে।

পরবর্তী জীবনে দেখেছি আমার ধারণা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। দুঃখ এসেছে এবং অত্যন্ত সহজভাবে জীবনের প্রাত্যহিক ঘটনার মত দুঃখকে তিনি গ্রহণ করেছেন। এই মেয়ের গল্প আমি অন্য কোথাও বলব। আজ শুধু হাসান আলীর কথাটাই বলি।

হাসান আলী বাজারে কিসের যে ঠিকাদারী করত। ছাব্বিশ-সাতাশ বছর বয়স। ভীষণ গরিব। নানাজানের কি রকম যেন আত্মীয়। থাকত নানাজানের বাংলাঘরে (বাড়ির বহির্মহলে অতিথি অভ্যাগতদের জন্যে নির্মিত ঘরকেই বাংলাঘর বলা হত)।

অত্যন্ত নিরীহ ধরনের ছেলে। যতক্ষণ ঘরে থাকত ততক্ষণ বসে বসে হিসেবপত্র করত। আমরা সে সময় তার ঘরে হাজির হলে বিনা কারণে আঁৎকে উঠত। তারপরই সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে চোখ লাল করে এক বিশ্রি কাণ্ড। প্রতি হাটবার দিন দেখতাম সে অল্প কিছু মিষ্টি কিনে এনেছে। মিষ্টি আনা হয়েছে নানাজানের বাড়ির মানুষদের জন্যেই কিন্তু দেওয়ার সাহস নেই। অনেক রাতে কাউকে ডেকে হয়ত ফিসফিস করে বলল, 'একটু মিষ্টি এনেছিলাম।' বাড়ির প্রায় মানুষই তখন ঘুমে।

সফুরা খালা একদিন বললেন, ও রঞ্জু, হাসান আলী বলে একটা লোক নাকি থাকে বাইরের ঘরে। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে?

'ও আল্লা, মজার ব্যাপার হয়েছে। পরশুদিন দিঘির পাড়ে একা একা গিয়েছি, দেখি কে একজন লোক চুপচাপ বসে আছে। আমি বললাম, 'কে ওখানে।' লোকটা বলল, 'আমার নাম হাসান আলী, আমি আপনাদের বাংলা ঘরে থাকি।' আমি তখন ভাবলাম, ফিরে যাই। লোকটা বলল, 'এত রাতে আপনি একা একা আসেন কেন? কত সাপ-খোপ আছে।' আমি বললাম, 'আপনি তো আসছেন, আপনার সাপের ভয় নাই?'

'লোকটা তখন কি বললেন জান রঞ্জু?'

'না।'

'বলল, আপনি বড় ভাল মেয়ে এই বলেই হন হন করে চলে গেল। কি কাণ্ড দেখেছ?'

এর কিছুদিন পরই শুনলাম হাসান আলী নানাজানের কাছে তার ছোট মেয়েটিকে বিয়ে করার প্রস্তাব করছে। নানাজান তো রেগেই আগুন। বাড়িতে হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল। সফুরা খালা শুধু বলেন, 'আহা, বেচারা গরিব বলে কি সবাই এ রকম করবে। ছিঃ!' লালমামি ওকথা শুনে বললেন, 'আমাদের সফুরার ভাতারকে নিয়ে কেউ তামাশা করবে না, খবরদার। সফুরা মনে কষ্ট পায়।' নানীজান লালমামির কথা শুনে রেগে যান। চেঁচিয়ে বলেন, 'এ কি কথা বলার ঢং বউ!'

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। নানাজান হাসান আলীকে এখানকার বাস উঠিয়ে চলে যেতে বললেন। শরৎকালের এক সকালে নৌকা করে হাসান আলী চলে গেল। দুটি ট্রাঙ্কের উপর বিবর্ণ সতরঞ্জিতে ঢাকা একটি বিছানা, তার পাশে মুখ নিচু করে বসা হাসান আলী।

সফুরা খালা এর পর থেকেই অস্থির হয়ে পড়লেন। মুখে শুধু এক বুলি, 'বিনা দোষে কষ্ট পেল লোকটা!' নবুমামা অনেক পরে এ ঘটনা শুনে বলেছিলেন, 'আমি থাকলে দিতাম শালার ঘাড়ে গদাম করে এক ঘুঁসি।' সফুরা খালা বিষণ্ন কণ্ঠে বলছেন, 'ছিঃ নবু, ছিঃ!'

## আট

অচিনপুরের গল্প লিখতে গভীর বিষাদে মন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। অনুভব করছি, সুখ এবং দুঃখ আসলে একই জিনিস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সুখ বদলে গিয়ে দুঃখ হয়ে যায়। দুঃখ হয় সুখ। জীবনের প্রবল দুঃখ ও বেদনার ঘটনাগুলি মনে পড়লে আজ আমার ভাল লাগে। প্রাচীন সুখের স্মৃতিতে বুক বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়।

হাসনার কোলে তিন মাস বয়সের যে শিশুটি এ সংসারে প্রবেশ করেছিল তার ভূমিকা তো যুক্তিসঙ্গত কারণেই তৃতীয় পুরুষের ভূমিকা হবে। তার উপস্থিতি হবে ছায়ার মত। সরফরাজ খানের এই পরিবারটির সুখ-দুঃখ তাকে স্পর্শ করবে না। কিন্তু আমি তাদের জীবনের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবেই না জড়িয়ে পড়লাম। বাদশা মামার মলিন চেহারা দেখলে আমার মন কাঁদে। সফুরা খালা যখন হেসে হেসে বলেন,

'রঞ্জু, আমার খুব ইচ্ছে একদিন অনেক রাত্রে পুকুরে একা একা সাঁতার কেটে গোসল করি। পুকুর-ঘাটে তুমি আমার জন্যে একটুখানি দাঁড়াবে রঞ্জু? কেউ যেন জানতে না পারে।'

তখন সফুরা খালার জন্যে আমার গাঢ় মমতা বোধ হয়। অথচ আমি নিশ্চিত জানি একদিন লিলির চিঠি আসবে। আমি এদের সবাইকে পেছনে ফেলে চলে যাব।

হালিম শেখের সঙ্গে পর পর দুটি মামলাতে নানাজানের হার হল। এতদিন যে জমিতে নানাজানের দখলিস্বত্ব ছিল, হালিম শেখের লোকজন লাল নিশান উঠিয়ে ঢোল আর কাঁসার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে সে জমির দখল নিল। গ্রামের লোকজনকে গরু জবাই করে খাওয়াল হালিম শেখ।

জমির পরিমাণ তেমন কিছু নয়। অর্থ ব্যয়ও হয়েছে সামান্য। নানাজানের মত লোকের কাছে সে টাকা কিছুই নয়। কিন্তু তিনি ভেঙে পড়লেন। রোজকার মত উঠোনে বসে কোরান পাঠ করতে বসেন না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন। অত্যন্ত অল্প সময়ের ভেতর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল। খাওয়া কমে গেল। রাতে ঘুমুতে পারেন না। উঠোনে অনেক রাত পর্যন্ত চেয়ার পেতে বসে থাকেন। নানীজান মাথায় হাওয়া করেন। পায়ে তেল মালিশ করে দেন।

দিন সাতেক পর নানাজান ঘোষণা করলেন, তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। সম্পত্তির বিলি-

বন্দোবস্ত করতে চান। নবুমামার কাছে চিঠি গেল তিনি যেন পত্রপাঠ চলে আসেন, পড়াশুনার আর প্রয়োজন নাই। লোক পাঠিয়ে দামি কাফনের কাপড় কেনালেন। কবরের জন্য জায়গা ঠিক করা হল। কবর পাকা করবার জন্য ইট আনানো হল। মৌলানা ডাকিয়ে তওবা করলেন। বাড়ির সবাই এই নিঃশব্দ মৃত্যুর প্রস্তুতি দেখতে লাগল। ঠিক এই সময় বুড়ো নানীজান মারা গেলেন।

মোহরের মা রোজ সকালে দুধ নিয়ে যায় নানিজানের ঘরে। সেদিন কি কারণে যে দেরি হয়েছে। দুপুরের দিকে বাটিভর্তি দুধ নিয়ে গিয়েছেন। ঘরে ঢুকেই বিকট চিৎকার। মৃত্যু এসেছে নিঃশব্দে। কেউ জানতেও পারেনি কখন কিভাবে মারা গেলেন।

আমরা সবাই তার ঘরের সামনে ভিড় করে দাঁড়ালাম। পরিপাটি বিছানা পাতা। বালিশের চাদর পর্যন্ত একটুও কুঁচকায়নি। বড়ো নানীজান সেই পরিপাটি বিছানায় শক্ত হয়ে পড়ে আছেন। ইঁদুর কিংবা অন্য কোন কিছু তার ঠোঁট আর একটি চোখ খেয়ে গিয়েছে। বিকট হা করা সেই মৃত্যু দেখে সুফুরা খালা 'ও মাগো' 'ও মাগো' বলে কাঁদতে লাগলেন। লালমামি সফুরা খালার হাত ধরে তাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলেন।

নানাজানের জন্য কেনা কাফনের কাপড়ে তাঁব কাফন হল। নানাজানের জন্যে ঠিক করে রাখা জায়গায় কবর হল তার। যে ইট নানাজান নিজের জন্যে আনিয়েছিলেন, সেই ইট দিয়ে কবব বাঁধিয়ে দেওয়া হল।

সপ্তাহ খানিকের মধ্যে আমরা সব্যই বড় নানীজানের কথা ভুলে গেলাম। আগের মত ঝগড়া, রঙ-তামাশা চলতে লাগল। বড় নানীজানের ঘর থেকে তার সমস্ত জিনিস সরিয়ে ফেলে সংসারের প্রয়োজনীয় পেঁয়াজ রসুন রাখা হল গাদা করে।

দিন কেটে যেতে লাগল। একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন জীবন। সেই একা একা হাঁটতে হাঁটতে সোনাখালী চলে যাওয়া। পুকুরঘাটে রাতের বেলা চুপচাপ বসে থাকা। এর বাইরে যেন আমার জন্যে কোনো জগৎ নেই। সমস্ত বাসনা-কামনা এইটুকুতেই কেন্দ্রীভূত। এর মধ্যে একদিন নানাজান আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেছেন। বলেছেন,

'তোমার বড় নানীজান তার নিজের সম্পত্তি তোমাকে আব লিলিকে দিয়ে গিযেছেন দানপত্র করে।'

বড় নানীজান তার বাবার কাছ থেকে প্রচুর সম্পত্তি পেয়েছিলেন জানতাম, তার পরিমাণ যে কত তা কেউ জানত না। নানাজান বললেন, 'অনেক জায়গা-জমি, লিলির আসা দরকার। কিন্তু তাব ঠিকানা তো জানা নেই।'

## নয়

রাজশাহী থেকে খবর এল, স্কুল ফাইন্যাল দিয়েই নবুমামা কাউকে কিছু না বলে কলকাতা চলে গেছেন। নানাজানের মুখ গম্ভীর হল। নানীজানের কেন জানি ধারণা, নবুমামা আর কখনো ফিরবে না। তিনি গানের মত সুরে যখন কাঁদতে থাকেন তখন বলেন, 'এক মেয়ে পাগল, এক ছেলে বিরাগী, এক বউ বাঁজা।'

শুনলে হাসি পায়, আবার দুঃখও লাগে। বাদশা মামা মাঝে-মধ্যে গিয়ে নানীজানকে ধমক দেন, কি মা, আপনি সব সময় বাঁজা বউ বাঁজা বউ করেন!

নানীজান ক্ষেপে গিয়ে বলেন,

'ও বাঁজা বউকে আমি আর কি বলে ডাকব?'

'আহা, এলাচি মনে কষ্ট পায়।'

নানীজান কপালে করাঘাত করেন আর বলেন,

'হা রে বউ, তুই কি জাদুটাই না করলি!'

বাদশা মামা চিন্তিত, বিরক্ত আর ক্লান্তমুখে চলে আসেন।

নবুমামা হঠাৎ করে কলকাতা চলে যাওয়ায় খুশি মনে হয় শুধু সফুরা খালাকে। আমাকে ডেকে বলেন, আমি ছেলে হলে নবুর মত কাউকে না বলে আমিও চলে যেতাম।

আট-দশ দিন পর নবুমামা কলকাতা থেকে টাকা চেয়ে পাঠাল। নানাজান লোক মারফত টাকা পাঠালেন। নির্দেশ রইল, ঘাড় ধরে যেন তাকে নিয়ে আসা হয়। বাড়িতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, নবুমামাকে বিয়ে দেওয়া হবে। নানাজান মেয়ে দেখতে লাগলেন। নানীজান মহাখুশি। লালমামিকে

শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন, নতুন বউয়ের এক বৎসরের ভিতর ছেলে হবে— আমি স্বপ্ন দেখেছি।

টাকা নিয়ে লোক যাওয়ার কয়েকদিন পরেই নবুমামা এসে পড়লেন। সরাসরি এসে বাড়িতে তিনি উঠলেন না, লোক মারফত খবর পাঠালেন কাউকে কিছু না বলে আমি যেন আজিজ খাঁর বাড়িত চলে আসি।

আজিজ খাঁর বাইরের ঘরের চেয়ারে নবুমামা গম্ভীর হয়ে বসে ছিলেন। মাথায় বেড়েছেন কিছু। গায়ের রঙ ফর্সা হয়েছে। আমাকে দেখে রহস্যময় হাসি হাসলেন, বাড়িতে কেউ জানে না তো আমি এসেছি যে?

'না।'

'গুড।'

'কি ব্যাপার নবুমামা?'

'একটা প্ল্যান করেছি রঞ্জু। লালমামিকে একবার চমকে দেব। গ্রামোফোন কিনেছি একটা। ঐ দেখ টেবিলে।

আমি হ্যাঁ করে টেবিলে রেখে দেয়া বিচিত্র যন্ত্রটি তাকিয়ে দেখি। নবুমামা হাসি মুখে বলেন, পাঁচটা রেকর্ড আছে। একশ' পনের টাকা দাম।

নবুমামার প্ল্যান শুনে আমার উৎসাহের সীমা থাকে না। রাতের বেলায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লে নবুমামা গ্রামোফোন নিয়ে চুপি চুপি যাবেন। যে ঘরটায় আমি আর নবুমামা থাকি সেই ঘরটায় চুপ চুপি এসে গ্রামোফোন বাজানোর ব্যবস্থা করা হবে। গান শুনে হকচকিয়ে বেরিয়ে আসবেন লালমামি। অবাক হয়ে বলবেন,

'রঞ্জু কি হয়েছে রে, গান হয় কোথায়?'

তখন হো হো করে হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসবেন নবুমামা। উৎসাহে নবুমামা টগবগ করছেন। আমি বললাম,

'নবু মামা, এখন একটা গান শুনি।'

নবুমামা হা হা করে ওঠেন, 'না না, এখন না। পরে শুনবি। ফাস্টে কোনটা বাজাব বল ত?'

'কি করে বলব, কোনটা?'

সেদিন সন্ধ্যার আগে-ভাগেই ঝুমঝুম করে বৃষ্টি নামল। সে কি বৃষ্টি! ঘরদোর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগল। নবুমামা বিরক্ত মুখে বসে রইলেন। রাতের খাওয়া-দাওয়া আজিজ খাঁর ওখানেই হল।

রাত যখন অনেক হয়েছে, লোকজন শুয়ে পড়েছে, সবখানে, তখন আমরা উঠলাম। বৃষ্টি থামেনি, গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছেই। মাথায় ছাতা ধরে আধভেজা হয়ে বাড়িতে উঠলাম। কাদায়-পানিতে মাখামাখি। বাড়িতে জেগে কেউ নেই। শুধু নানাজানের ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। দুজনে নিঃশব্দে দোতলায় উঠে এলাম। দরজা খোলা হল অত্যন্ত সাবধানে। একটু ক্যাঁচ শব্দ হতেই দুজনে চমকে উঠছি।

অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে বের করলেন নবুমামা। বহু কষ্ট করে চোঙ্গ ফিট করা হল। দম দিতে গিয়ে বিপত্তি, ঘ্যাস ঘ্যাস শব্দ হয়। তবে ভরসার কথা, ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। নবুমামা ফিসফিসিয়ে বললেন, 'কোন গানটা দিয়েছি কে জানে। একটা খুব বাজে গান আছে। এটা প্রথমে এসে গেলে খারাপ হবে খুব।

আমি বললাম, 'নবুমামা, দেরি করছ কেন?

'দিচ্ছি। বৃষ্টিটা একটু কমুক, নয়ত শুনবে না।'

বৃষ্টির বেগ একটু কমে আসতেই গান বেজে উঠল,

'আমার ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো
তোরে আমি কোথায় রাখি বল।'

লালমামি গান শুনে মুগ্ধ হবে কি, আমি নিজেই মোহিত হয়ে গেলাম। কি অপূর্ব কিন্নর কণ্ঠে গান হচ্ছে। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। আবেগে আমার চোখ ভিজে উঠল।

নবুমামা ফিসফিসিয়ে বললেন, কি ব্যাপার, ভাবী আসে না যে? ও রঞ্জু।'

আমি সে কথায় জবাব দিলাম না। বাইরে তখন ঝড় উঠেছে। জানালার কপাটে শব্দ খট খট। নবুমামা জানালা বন্ধ করবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি লালমামি ডাকলেন,

রঞ্জু, রঞ্জু!

নবুমামা ফিসফিস করে বললেন, চুপ করে থাক, কথা বলবি না। আমি চুপ করে রইলাম। নবুমামা অন্য রেকর্ড চালিয়ে দিল—

'যদি ভাল না লাগে তো দিও না মন'

লালমামি দরজায় ঘা দিলেন, ও রঞ্জু, কি ব্যাপার, গান হয় কোথায়? নবুমামা উত্তেজনায় চেপে রাখতে না পেরে হো হো করে হেসে উঠলেন, 'ভাবী তোমার জন্য আনলাম। তোমার জন্য আনলাম।' নবুমামা লালমামির হাত ধরে টেনে ভেতরে নিয়ে গেল। কি ফুর্তি তার! লালমামি বললেন, 'কলের গান না? ছোটবেলায় দেখেছিলাম একবার। চোঙ আছে? বাতি জ্বালাও না।'

বাতি জ্বালানো হল। লালমামিকে দেখব কি? নবুমামার দিকেই তাকিয়ে আছি। আনন্দে উত্তেজনায় নবুমামার চোখ জ্বল জ্বল করছে। মামি বললেন, 'ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো গানটা আরেকবার দাও।'

সেই অপূর্ব গান আবার বেজে উঠল। বাইরে তখন ঝড়-বৃষ্টি।

সে রাতের কথা আমার খুব মনে আছে।

একটি মানুষের সামগ্রিক জীবনে মনে রাখবার মত ঘটনা তো খুব সীমিত। কত মানুষ আছে, সমস্ত জীবন কেটে যায় কোনো ঘটনাই মনে রাখার মত আবেগ তার ভেতরে সৃষ্টি করে না। আমি নিজে কত কিছুই তো ভুলে বসে আছি। কিন্তু মনে আছে, সে রাতে গান শুনতে নিজের অজান্তেই আমার চোখে পানি এসেছিল। নবুমামা আর লালমামি যেন দেখতে না পায় সে জন্যে মাথা ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রয়েছি। নবুমামা বললেন,

'ভাবী, আমার নাচতে মন চাইছে।'

'নাচ না।'

নবুমামা বললেন,

'রঞ্জু, তুই নাচবি আমার সঙ্গে?'

আমি সে কথার জবাব দিলাম না। মামি বললেন,

'নবু, ঐ রেকর্ডটা আবার।'

'সারারাত হবে আজকে। বুঝলে ভাবী।'

ক্লান্তি নেই নবুমামার। লালমামির উৎসাহও সীমাহীন। শুনতে শুনতে আমার ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। নবুমামা বললেন, গাধা! এত ফাইন গান আর ঘুমায় কেমন দেখ।

লালমামি বললেন,

'আজ তাহলে থাক। ঘুমো তোরা।'

'না না, থাকবে না। যতক্ষণ ঝড়-বৃষ্টি হবে ততক্ষণই গান হবে। কথা শেষ হতে-না হতেই কড় কড় করে বাজ পড়ল।

ফুর্তিতে নবুমামা হো হো করে হেসে ফেললেন। মামি বললেন, 'রঞ্জু, ঘুম পাচ্ছে। এগুলি নিয়ে আমার ঘরে এসে পড়, নবু আমাকে ভাঙা ঘরের চাঁদের আলো গানটা শুনে শুনে লিখে দিতে পারবি কাগজে?'

'নিশ্চয়ই পারব। নিশ্চয়ই।'

জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাঁট আসছিল, উঠে বন্ধ করতে গিয়ে দেখি বড় নানীজানের ঘরের লাগোয়া গাব গাছটি ভেঙে পড়ে গেছে। কেমন নেড়া দেখাচ্ছে জায়গাটা। ভালই ঝড়-বৃষ্টি হয়েছে। বাতাস থেমে গেলেও বৃষ্টি পড়ছে মুষলধারে। কে জানে গতবারের মত এবারেও হয়ত বান ডাকবে। গতবার এ রকম সময়ে বাড়ি থেকে নদীর শো শো শব্দ শোনা গেছে। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনি, নবুমামা বলছেন, 'ভাবী, তুমিও গাও। সঙ্গে, সঙ্গে—

'না না, আমি পারব না। তুই গা, মাটি সে পৌরনটা গা।'

নবুমামা হেঁড়ে গলায় গান ধরলেন—

'মাটি মে পৌরন, মাটি মে শ্রাবণ
মাটি মে তনবন যায়গা
যব মাটি সে সব মিল জায়গা।'

গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লালমামি বললেন, দক্ষিণের জানালা বন্ধ কর নবু, ভিজে যাচ্ছি।

নবুমামা বললেন, বাদশা ভাই কোথায়?

'দু'দিন ধরে দেখা নেই। কোথায় কে জানে। যদি ভাল না লাগে গানটা দে। ঘুম আসছে যে আবার। ও নবু, তোর ঘুম পায় না?'

শুনতে শুনতে ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। ঘুমুতে ইচ্ছে করছিল। শুয়ে শুয়ে গান শুনতে কি ভালোই না লাগে! ক্রমে ক্রমে ঝড়ের মত বাতাসের বেগ হল। বাড়ির লম্বা থামে বাতাসের শো শো শব্দ উঠতে লাগল। ধবাম ধরাম শব্দ করে দরজা নড়তে লাগল। উঠে দাঁড়িয়েছি হ্যারিকেন জ্বালাব বলে, ওমনি সফুরা খালা ডাকলেন,

'রঞ্জু, ও রঞ্জু!'

দরজা খুলে দেখি সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে সফুরা খালা বৃষ্টির ছাঁটে ভিজছেন। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'এদিকে গান হচ্ছে না-কি রঞ্জু?'

'হ্যাঁ, নবুমামা কলের গান বাজাচ্ছিলেন। কলের গান এনেছেন নবুমামা।'

'নবু কোথায়?'

লালমামি আর নবুমামা গান বাজাচ্ছেন।

সফুরা খালা আরো একটু এগিয়ে এসে বললেন, 'কই, গান শুনছি না তো?

আমরা দুজন কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। সফরা খালা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, রঞ্জু, আমার ভীষণ ভয় লাগছে।

## দশ

সেই অপূর্ব বৃষ্টিস্নাত রাতে যে ভয় করবার মত কিছু-একটি লুকিয়ে ছিল তা আমি বুঝতে পারি নি। সফুরা খালা শীতে কাঁপছিলেন, তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না, তবু শুধুমাত্র তার কথা শুনেই ধারণা হল, কোথাও নিশ্চয়ই ভয় লুকিয়ে আছে।

সফুরা খালা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দ্রুত চলে গেলেন যেন কোন হিংস্র জন্তু তাকে তাড়া করছে। মাতালের মত বেসামাল পদক্ষেপ। আমি এসে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। মেঘ কেটে গেছে, রোদ উঠছে ঝকঝকে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই মনের সব গ্লানি কেটে যায়। আরো কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব কি-না ভাবছি, তখন নবুমামা এসে ডাকলেন, আয়, মাছ ধরতে যাই। নতুন পানিতে মেলা মাছ এসেছে।

ছিপ, কানিজাল ইত্যাদি সরঞ্জাম নিয়ে নৌকা করে চললাম দুজনে হলদাপোতা। কিন্তু নবুমামার মাছ মারার মন ছিল না। অপ্রাসঙ্গিক নানা কথা বলতে লাগল। দুপুর পর্যন্ত আমরা ইতস্তত ঘুরে বেড়ালাম। নবুমামার ভাবভঙ্গি আমার কাছে কেমন কেমন লাগল। তিনি যেন বিশেষ কোন কারণে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিয়ের কথা বললে কিশোরী মেয়েরা যেমন পালিয়ে গিয়ে লজ্জায় লাল হয় অনেকটা সে রকম। নবুমামা বললেন, রঞ্জু, আমি আর পড়াশুনা করব না।

'কেন?'

'ভাল লাগে না।'

'কি করবেন তবে?'

'ব্যবসা করব। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াব।'

'নানাজান মানবে না।'

'আমি কারো ধার ধারি না-কি?'

বলতে বলতে নবুমামা ঈষৎ হাসলেন। দুপুরে খাওয়ার জন্যে চিড়া আর নারিকেল আনা হয়েছিল। তা-ই খাওয়া হল। হলদাপোতা থেকে আমরা আরো উত্তরে সরে গেলাম।

আমার আর ভাল লাগছিল না, রোদে গা তেতে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছে ফিরে যাই কিন্তু নবুমামা বার বার বলছেন, একটা বড় মাছ ধরি আগে।

সন্ধ্যার আগে আগে প্রকাণ্ড একটা কাতলা মাছ ধরা পড়ল। সুগঠিত দেহে কালচে আঁশ বেলাশেষের রোদে ঝকমক করছে। নৌকার পাটাতনে মাছটা ধড়ফড় করতে লাগল। দুজনেই মহাখুশি। নবুমামা খুব যত্নে বড়শি খুলে নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমি বললাম, চলুন ফিরে চলি।

'চল'।

ভাটার টানে নৌকা ভেসে চলেছে। হঠাৎ করে নবুমামার ভাবান্তর হল। আমার দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, মাছটা ছেড়ে দেই রঞ্জু?

'কেন মামা!'

'না, ছেড়ে দি।'

বলেই মাছটা জলে ফেললেন। আমি চুপ করে রইলাম। নবুমামা বললেন, 'একবার আমি একটা পাখি ধরেছিলাম। টিয়া পাখি। তারপর কি মনে করে ছেড়ে দিয়েছি। আমার খুব লাভ হয়েছিল।

'কি লাভ?'

'হয়েছিল। আজকে মাছটা ছেড়ে দিলাম। দেখিস, মাছটা দোয়া করবে আমার জন্যে।'

নবুমামা পাটাতনে শুয়ে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

বাড়ি এসে হুলস্থূল কাণ্ড। লালমামির সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছে সফুরা খালার। লালমামি টেনে সফুরা খালার একগোছা চুল তুলে ফেলেছেন, গাল আচড়ে দিয়েছেন। সফুরা খালা বিষম দৃষ্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। লালমামি তাঁর দরজা বন্ধ করে রেখেছেন। কারো সঙ্গে কথাবার্তা নেই। বাদশা মামা আধময়লা একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাঝে মাঝে বলছেন, সবাই যদি এলাচির সঙ্গে ঝগড়া করে তাহলে বেচারি কি কববে? কেউ দেখতে পারে না। ছোট নানীজান শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। এবার ধমকে দিলেন, যা তুই, খামাখা ঘ্যান ঘ্যান। ভাল্লাগে না।

বাদশা মামা উঠানে গিয়ে বসে রইলেন। বোকাব মত তাকাতে লাগলেন এদিক-সেদিক। নবুমামাকে দেখে বললেন, দেখলি নবু? সফুরা কি ঝগড়া করল। এলাচির সারাদিন খাওয়া নাই।

রাতের খাওয়া শেষ হতে অনেক রাত হল। রান্না হতে দেরি হয়েছে। সংসার যাত্রা কিছু পরিমাণে বিপর্যস্ত। খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমুতে এসে দেখি, সফুরা খালা বসে আছেন আমাদের ঘরে। সফুরা খালা বললেন, তোমাদেব জন্যে বাইরের বাংলাঘরে বিছানা হয়েছে। এ ঘরে আমি থাকব। তাকিয়ে দেখি পরিপাটি করে ঘর সাজানো। আমার আব নবুমামার ব্যবহারিক জিনিসপত্র কিছুই নেই। নবুমামা বললেন, তুই থাকবি কেন এখানে? তোর নিজের ঘব কি হল?

আমার ঘরে পানি পড়ে, বিছানা ভিজে যায়।

নবুমামা কিছুক্ষণ উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হন হন করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। সফুরা খালা বললেন, রঞ্জু, তুমি নবুকে চোখে চোখে রাখবে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে বাদশা মাম্মার সঙ্গে দেখা। বাদশা মামা বললেন, রঞ্জু, এলাচি ভাত খেয়েছে কিনা জানিস?

'জানি না।'

'মোহরের মা বলল, খেয়েছে। তুই একটু খোঁজ নিয়ে আয়।'

'আপনি নিজে যান না মামা।'

'আচ্ছা, আচ্ছা আমি নিজেই যাই।'

লালমামি সেদিন না খেয়ে ছিলেন। রাতেও খেলেন না, দুপুরেও ভাত নিয়ে গিয়ে মোহরের মা ফিরে এল। সফুরা খালা অনেক অনুনয়-বিনয় করলেন। কিছু লাভ হল না। শেষ পর্যন্ত নানাজান আসলেন। বিরক্ত ও দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, এ সব কি বউ?

লালমামি কথা বললেন না। নানাজান বললেন,

'খাও খাও, ভাত খাও।'

'না, খাব না।'

সমস্ত দিন কেটে গেল। সফুরা খালা কাঁদতে লাগলেন। কি বিশ্রী অবস্থা! বাদশা মামা নৌকা করে গিয়েছে শ্রীপুরে। লালমামির মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন একেবারে।

কানাবিবি বার বার বলে, বউ-এর কোনো খারাপ বাতাস লেগেছে, না হলে এমন হয়। মুকন্দ ওঝাকে খবর দেও না একবার।

লালমামির মা খবর পেয়েই এসে পড়লেন। লালমামি বলল, না আমি কিছুতেই খাব না। এ বাড়িতে কিছু খাব না আমি। নানাজান বললেন, আচ্ছা, মেয়েকে না হয় নিয়েই যান। কদিন থেকে সুস্থ হয়ে আসুক।

ধরাধরি করে লালমামিকে নৌকায় তোলা হল। নৌকার পাটাতনে বাদশা মামা তার স্যুটকেস নিয়ে আগে থেকেই বসে আছেন। লালমামি বাদশা মামাকে দেখেই জ্বলে উঠলেন।

ও গেলে আমি যাব না। আল্লাহর কসম আমি যাব না।

বাদশা মামা চুপচাপ নেমে পড়ে দাঁড়িয়ে বোকার মত সবার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। যেন কিছুই হয়নি। তার কাণ্ড দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল।

## এগার

নবুমামার বিয়ের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সবাই। মেয়ে তো আগেই ঠিক করা ছিল। এবার কথাবার্তা এগুতে লাগল। নানাজান অনেক রকম মিষ্টি, হলুদ রঙের শাড়ি ও কানের দুল নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ে দেখতে গেলেন। সঙ্গে গেলেন হেড মাস্টার সাহেব, আজিজ আলী সাহেব। আমিও গেলাম তাঁদের সঙ্গে। কি মিষ্টি মেয়ে' শ্যামলা রঙ, বড় বড় চোখ। এক নজর দেখলেই মন ভরে ওঠে। দেখে আমার বড় ভাল লাগল। পৌষ মাসের মাঝামাঝি দিন ফেলে নানাজান উঠে এলেন।

বাড়িতে একটি চাপা আনন্দের স্রোত বইতে লাগল। সবচেয়ে খুশি সফুরা খালা। হাসি-হাসি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সবার সঙ্গে বিয়ে নিয়ে গল্প করছেন। নবুমামার কিন্তু ভাবান্তর নেই। কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মাথাব্যথাও নেই। মাছ ধরতে যান। কোথাও যাত্রা টাত্রার খবর পেলে যাত্রা শুনতে যান।

গ্রামের মাঠে ফুটবল নেমে গেছে। সারা বিকাল কাটান ফুটবল খেলে। সেনটার ফরোয়ার্ডে তিনি দাঁড়ালে প্রতিপক্ষ তটস্থ হয়ে থাকে। শিল্ডের অনেক খেলা শুরু হয়ে গেছে। গ্রামের টিম খুব শক্ত। ফাইন্যালে উঠে যাবে, সন্দেহ নেই। নবুমামা প্রাণপণে খেলেন। মরণপণ খেলা। বল নিয়ে দৌড়ে যাবার সময় তাঁর মাথার লম্বাচুল বাতাসে থরথরিয়ে কাঁপে। মাঠের বাইরে বসে বসে মুগ্ধ নয়নে আমি তাই দেখি। রাতের বেলা গরম পানি করে আনি, নবুমামা গরম পানিতে পা ডুবিয়ে অন্যমনস্কভাবে নানা গল্প করেন। লালমামির প্রসঙ্গে কোনো আলাপ হয় না। তিনি সেই যে গিয়েছিলেন আর ফেরার নাম নেই। বাদশা মামা প্রতি হাটবারে নৌকা নিয়ে চলে যান। আবার সেদিনই ফিরে আসেন। লালমামির ঘরেই বাকি সময়টা কাটে তাঁর। আমি বুঝতে পারি, কোথায়ও সুর কেটে গিয়েছে। ভাল লাগে না। কবে লিলির চিঠি আসবে, কবে আমি চলে যেতে পারব, তাই ভাবি। তখন আমি অনেক স্বপ্ন দেখতে শিখেছি। পরগাছা হয়ে বেঁচে থাকতে ঘেন্না বোধ হচ্ছে অথচ বেরিয়ে আসতে পারছি না। বড় নানীজান অনেক সম্পত্তি না-কি আমাকে আর লিলিকে দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতে আমার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

তাছাড়া সে সময় আমি প্রেমেও পড়েছিলাম। অচিনপুরের এই কাহিনীতে সে প্রেমের উল্লেখ না করলেও চলে, কারণ তার ভূমিকা নেই এখানে। তবে প্রচণ্ড পরিবতন হচ্ছিল আমার মধ্যে . এইটুকু বলা আবশ্যক।

নবুমামার স্কুল ফাইন্যালের রেজাল্ট হল তখন। খুবই ভাল রেজাল্ট। ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পেলেন। কলেজে ভর্তি হবার জন্যে টাকা-পয়সা নিয়ে নবুমামা রওনা হলেন। নানাজানের ইচ্ছা ছিল নবুমামা যেন আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু নবুমামার ইচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজ।

নবুমামার বিয়ের তারিখ ঠিকই থাকল। নবুমামা নিজেও একদিন মেয়ে দেখে এলেন। সফুরা খালা যখন বললেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে? নবুমামা ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে।

বারোই ভাদ্র তারিখে নবুমামা চলে গেলেন। আর তেরোই ভাদ্র বাদশা মামা শ্রীপুর থেকে আধ-পাগল হয়ে ফিরে এলেন। আমি ভাসা ভাসা ভাবে শুনলাম, লালমামি শ্বশুরবাড়ি ফিরে যাবার নাম করে নবুমামার সঙ্গে চলে গিয়েছেন।

কেউ যেন জানতে না পারে সেই জন্যে বাদশা মামাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হল। তার ঠিক নেই, কখন কাকে কি বলে বসেন। ছোট নানিজানের ফিটের ব্যারাম হয়ে গেল। সফুরা খালাকে দেখে কোন পরিবর্তন নজরে পড়ে না। শুধু তার চোখে কালি পড়েছে। মুখ শুকিয়ে তাকে দেখায় বাচ্চা ছেলের মত।

নানাজান সেই বৎসরেই হজ করতে গেলেন। যাওয়ার আগে সব সম্পত্তি বিলি বন্দোবস্ত হল। বাদশা মামাকে সব লিখে-পড়ে দিয়ে গেলেন।

একটি প্রচণ্ড প্রাচীন বটগাছ যেন চোখের সামনে শুকিয়ে উঠেছে। সবুজ পাতা ঝরে যাচ্ছে,

কাণ্ড হয়েছে অশক্ত। আমি তাই দেখছি তাকিয়ে তাকিয়ে। শৈশবের যে অবুঝ ভালবাসায় নানাজানের বাড়িটিকে আমি ঘিরে রেখেছিলাম, সেই ভালবাসা করুণ নয়নে চেয়ে আছে আমার দিকে। কিন্তু আমি তো এখানের কেউ নই। একদিন চুপচাপ চলে যাব। কেউ জানতেও পারবে না রঞ্জু নামের আবেগপ্রবণ ছেলেটি কোথায় চলে গেল।

এ বাড়ির সব কিছুই বদলে গেছে। লাল ফেজটুপি পরা নানাজান সূর্য উঠার আগেই উঠোনের চেয়ারে এসে আর বসে না। "ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বি কুমা তুকাজ্জিবান" ঘুম-ঘুম চোখে অর্ধ-জাগ্রত কানে কতবার শুনেছি এই সুর। এখন সকালটা বড়ো চুপচাপ।

ভোরের আলোয় মনের সব গ্লানি কেটে যায়। আমি চাই এ বাড়ির সবার মনের গ্লানি কেটে যাক। নবুমামা ফিরে এসে আগের মত জোছনা দেখে উল্লাসে চিৎকার করুক। 'কি জোছনা! খেতে ইচ্ছে করে।' সফুরা খালা ঠিক আগের মত লাঠি হাতে 'পাখি উড়ে গেল' বলে এ সংসারের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট উড়িয়ে দিক। বাদশা মামা তার সাজ-পোশাক পরে হিরণ্য রাজার পাঠ করুক। কিন্তু তা আর হবে না, তা হবার নয়। আমি সংসারের মন্থর স্রোতে গা এলিয়ে দিলাম। কারো সঙ্গেই আজ আমার যোগ নেই। দিন কেটে যেতে লাগল।

## বার

টিনের কানেস্তারায় বাড়ি পড়েছে। উচ্চকণ্ঠে কি যেন ঘোষণা করা হচ্ছে। কৌতূহলী হয়ে দাঁড়াতেই দেখি, বাদশা মামা বিব্রত মুখে সারা গায়ে চাদর জড়িয়ে হাঁটছেন। তার আগে আরেকজন টিনে বাড়ি দিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে কি বলছে। আমি বললাম, কি ব্যাপার মামা?

'কিছু না, কিছু না।'

'ঢোল দিচ্ছে কে? আপনি নাকি?'

'হুঁ।'

'কিসের জন্যে?'

বাদশা মামা দাঁড়িয়ে পড়লেন। জড়িত কণ্ঠে বললেন, রহমত পাগলের জন্যে ঢোল দিচ্ছি, যদি কেউ পায় তাহলে পাঁচ টাকা পুরস্কার।

'কেন, কি হয়েছে?'

বাদশা মামা এড়িয়ে যেতে চাইলেন কিন্তু আমি ততক্ষণে তাঁর হাত চেপে ধরেছি। মামা অসহায়ভাবে তাকালেন আমার দিকে। আমি দৃষ্ট গলায় বললাম, বলেন কি ব্যাপার।

'রঞ্জু, পাগলটাকে খেদিয়ে দেবার পর থেকে যত অশান্তি শুরু হয়েছে। ফিরিয়ে আনলে যদি সব মিটে

মামা আমার হাত ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। বাদশা মামা আরো অনেক রকম পাগলামি করতে লাগলেন। নানাজানের একটি আম-কাঁঠালের প্রকাণ্ড বাগান ছিল। জলেব দরে সেটি বেঁচে দিলেন। বিক্রির টাকা দিয়ে নাকি মসজিদ করবেন। ছোট নানীজান কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, এসব কী রে বাদশা?

বাদশা মামা কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বললেন, তিনি নাকি স্বপ্নে দেখেছেন সাদা পোশাক পরা এক জ্যোতির্ময় পুরুষ তাঁকে বললেন, 'মসজিদ কর, সব ঠিক হবে'। ছোট নানীজান বললেন, বাদশা, তুই মিথ্যা কথা বলছিস। বাদশা মামা মাথা নিচু করে চলে গেলেন। মসজিদের জন্য ইট পুড়ানো হতে লাগল। ময়মনসিংহ থেকে রাজমিস্ত্রি আসল। বিরাট মিলাদ মহফিলের মধ্যে মসজিদের কাজ শুরু হল।

নানাজানের দুটি বিল ছিল। বিলের মাছ থেকে পয়সা আসত বিস্তর। সেই টাকায় সংসার খরচ গিয়েও বেশ মোটা অংশ জমত। বিল দুটি একইসঙ্গে হাতছাড়া হয়ে গেল। কী ভাবে হল কেউ বলতে পারল না। নানীজান সারাদিন চোখের পানি ফেলতে লাগলেন।

রহিম শেখ একসঙ্গে বেশ কয়েকটি মামলা রুজু করল। সমস্তই মিথ্যা মামলা। বাদশা মামা নির্বিকার বসে আছেন মসজিদের সামনে। দেখছেন কী করে ইটের পর ইট বিছিয়ে ভিত তৈরি হচ্ছে। মামলার তদবীরের জন্য ছোট নানীজানকে নিয়ে আমিই যাওয়া-আসা করতে লাগলাম। দীর্ঘদিন মামলা চলল। দুটিতে জিত হল আমাদের, একটি রহিম শেখ পেল।

নানাজান হজ থেকে ফিরে এলেন এই সময়ে। সংসারের তখন ভরাডুবি ঘটেছে। রোজকার

বাজারের টাকাতেও টানাটানি পড়তে শুরু করেছে। নানাজান কিছুই বলল না। ছয় মাসেই তাঁর বয়স ছ'বছর বেড়ে গেছে। চোখের দৃষ্টি হয়েছে নিষ্প্রভ, একা একা হাঁটতে পারেন না। লাঠিতে ভর না দিয়ে দাঁড়াতে পারেন না। চোখের সামনে সংসারকে ভেঙে পড়তে দেখলেন। তবু সকালবেলায় কোরান শরীফ ধরে বিলম্বিত সুরে পড়তে লাগলেন, "ফাবিয়ায়ে আলা রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান।" অতএব তুমি আমার কোন কোন নিয়ামত অস্বীকার করিবে?

বৎসর যাবার আগেই সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ বিক্রি করে দিতে হল। বাদশা মামার মসজিদ ততদিনে শেষ হয়েছে। মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে চমৎকার নকশি কাটা গম্বুজ। ধব ধব সাদা দেয়ালে নীল হরফে লেখা কলমায়ে তৈয়ব। পাড়ার ছেলেমেয়েরা আমপারা হাতে সকালবেলাতেই মসজিদে ছবক নিতে আসে। দেখে-শুনে বাদশা মামা মহাখুশি। মহাজনের কাছ থেকে টাকা ধার করে মসজিদের সামনে পুকুর কাটিয়ে দিলেন। কি সুন্দর টলটলে জল, পুকুরে পাথরে বাঁধানো প্রশস্ত ঘাট।

বাদশা-মামাকে দেখে আমার নিজেরও ভাল লাগে। সাদা গোল টুপি পরে চোখে সুরমা দিয়ে কেমন গর্বিত ভঙ্গিতে নামাজ পড়তে যান। একদিন আমাকে ডেকে একটু ইতস্তত করে বললেন, রঞ্জু, জুমার রাত্রে তাহায্তের নামাজ পড়ে শুয়েছি, অমনি দেখি তোর লালমামি যেন নৌকায় করে ফিরে আসছে। আসবে ফিরে, দেখিস তুই। বাদশা মামার চোখ আনন্দে চক্‌চক্ করে।

লালমামির কথা ভাবতে চাই না আমি। তবু বড়ো মনে পড়ে। কে জানে কোথায় সংসার পেতেছে তারা। নাকি যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে দেশময়? কোনোদিন কী সত্যি ফিরে আসবে ধসে যাওয়া পরিবারটিকে শেষবারের মত দেখে যেতে?

নিজের কথাও আজকাল খুব ভাবি। আজন্ম যে রহস্যময়তার ভেতর বড় হয়েছি তা সরে সরে যায়। মনে হয় কিছুই রহস্য নয়। চাঁদের আলো, ভোরের প্রথম সূর্য সমস্তই রহস্যের অতীত প্রাকৃতিক নিয়মাবলী। যে নিয়মের ভেতর আমরা জন্মাই, বড় হই, দুঃখ-কষ্ট পাই। দুঃখ ও সুখ কী তা নিয়েও ভাবতে চেষ্টা করি। মোহরের মা যখন তার আজীবন-সঞ্চিত পটুলা-পুটলি নিয়ে অশ্রুসজল চোখে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলে, ও ব্যাটা রঞ্জু যাই গো ব্যাটা। তোমার দুঃসময়ে একটা মানুষের বোঝা আর বাড়াইতাম না গো। তখন আমার কোন দুঃখবোধ হয় না। এ যেন ঘটতই। তাহলে দুঃখ কী? নতুন করে আবার সম্পত্তি বিক্রি হচ্ছে শুনে ছোট নানীজান যখন উন্মাদের মত কাঁদেন তখন বুঝি এই দুঃখ, অথচ সফুরা খালা তখন হাসিমুখে বলেন, গরিব মানুষ হওয়ার অনেক রকম মজা আছে রঞ্জু, তুমি ইচ্ছামত ঘুরে বেড়াতে পারবে কেউ কিছু বলবে না। তখন সব ভাবনা-চিন্তা জট পাকিয়ে যায়।

সন্ধ্যাবেলা আমি নানাজানের হাত ধরে তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যাই। হিম গেলে তাঁর কাশি হয়। খুক খুক করে কাশেন। আমি যদি বলি, 'চলেন ঘরে যাই।' নানাজান আঁৎকে ওঠেন, 'না, না, আরেকটু, আরেকটু, বেড়াই।' পরম নির্ভরতার সঙ্গে তিনি আমার হাত ধরে হাঁটেন। বেলাশেষের সূর্যরশ্মি তাঁর সফেদ দাড়িতে চক্‌চক্ করে।

## তের

লিলির যে চিঠির জন্যে পরম আগ্রহে প্রতীক্ষা করেছিলাম, সে চিঠি এসে গেছে। লিলি গোটা গোটা হরফে লিখছে, 'আমি জানি তুই রাগ করেছিস। কতদিন হল গিয়েছি কিন্তু কখনো তোর কাছে চিঠি লিখিনি। কি করব বল? এমন খারাপ অবস্থা গেছে আমার। তোর দুলাভাইয়ের চাকরি নেই। বসতবাটিও পদ্মায় ভেঙে নিয়েছে। একেবারে ভিক্ষা করবার মত অবস্থা। কতদিন যে মাত্র একবেলা খেয়েছি। তারপর আবার তোর দুলাভাইয়ের অসুখ হল। মরো-মরো অবস্থা। এখন অবশ্যি ঠিক হয়ে গেছে সব। তুই অতি অবশ্যি এসে যা রঞ্জু।'

লিলির চিঠি পকেটে নিয়ে আমি ঘুরে বেড়াই। সবাইকে ছেড়ে যেতে বড় মায়া লাগে। আশৈশব পরিচিত এ বাড়িঘর। বাদশা মামা, নানাজান, লালমামি, নবুমামা এদের সবার স্মৃতির গন্ধ নিয়ে যে বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তাকে ছেড়ে কী করে যাই? আমি উদ্দেশ্যবিহীন ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। সোনাখালির পুলের উপর অনেক রাত পর্যন্ত বসে থাকি। নৌকা নিয়ে চলে যাই হলদিপোতা। খুব জোছনা হলে সফুরা খালাকে নিয়ে পুকুরঘাটে বেড়াতে চাই। সফুরা খালা বলেন, তুমি কবে যাবে রঞ্জু?

'যে কোনো একদিন যাব।'

'সেই যে কোনো একদিনটা কবে?'

'হবে একদিন।'

একেক রাতে সফুরা খালা কাঁদেন। তাঁর গভীর বিষাদ বুঝবার ক্ষমতা আমার নেই। বুঝতে চাই না। যে বন্ধন আমাকে এখানে আটকে রেখেছে কবে তা কাটবে, কবে চলে যাব, তাই ভাবি। নানাজানও মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করেন,

'তোমার যাওয়ার দিন ঠিক হয়েছে?'

'না'

'তোমার আর লিলির নামে যে জমি-জমা আছে তার কী হবে?''

'যেমন আছে তেমন থাকবে।'

নানাজান কথা বললেন না। আমি জানি এই জমিটুকুই তাদের অবলম্বন।

সে রাতে ভীষণ শীতই পড়েছিল। সন্ধ্যা না নামতেই ঘন কুয়াশা চারদিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। রাতের খাওয়ার পর হ্যারিকেন হাতে বাইরের ঘরে আসছি, হঠাৎ দেখি মামা দারুণ উত্তেজিত হয়ে দ্রুত আসছেন। আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

'রঞ্জু, দেখ দেখ।'

আমি তাকিয়ে দেখলাম একটু দূরে, লালমামি একটি বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। বাদশা মামা বলে চলেছেন, নৌকা করে সন্ধ্যার আগেই এরা দুজন এসেছে। চুপচাপ বসেছিল। আমি মসজিদে যাব বলে ওজু করতে গিয়েছি এমন সময়...

লালমামি বাচ্চা মেয়েটির হাত ধরে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন (যে উঠানে অনেক অনেক দিন আগে আমার মা তার দুটি ছেলেমেয়ের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলেন)। কেউ কোনো কথা বলল না। নাজান চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট নানীজান যেন কিছুই বুঝছেন না এমন ভঙ্গিতে তাকাতে লাগলেন। সফুরা খালা দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি নিচে নেমে এলেন। বাদশা মামা ব্যস্ত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোর গরম শালটা কোথায় সফুরা? এলাচির শীত করছে।

নবুমামার কথা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। সবাই চুপ করে রইল। এক সময় দেখলাম লালমামি কাঁদছেন।

আমি চুপচাপ বাইরের ঘরে বসে বসে ঝিঁঝি ডাক শুনতে লাগলাম। অনেক রাতে বাদশা মামা আমাকে ডেকে নিলেন। মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বললেন, তোরা সবাই যদি দূরে দূরে থাকিস তাহলে এলাচি কী মনে করবে বল? চল রঞ্জু।

বাদশা মামা আমার হাত ধরলেন।

বহুদিন পর লালমামির ঘরে এসে ঢুকলাম। পালঙ্কে লালমামি আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর কোলের কাছে কুণ্ডুলি পাকিয়ে বাচ্চা মেয়েটি ঘুমিয়ে। আমি এসে বসতেই লালমামি একটু সরে গেলেন। আমি বললাম, কেমন আছেন মামি?

মামি মাথা নাড়লেন। বাদশা মামা বললেন, মোটেই ভাল না রঞ্জু। দেখ না স্বাস্থ্য কী খারাপ হয়ে গেছে। আমি চুপচাপ বসে রইলাম। বাদশা মামা ব্যস্ত হয়ে পুরোনো গ্রামোফোন খুঁজে বের করলেন।

আমি বললাম—

'আজ থাক মামা।'

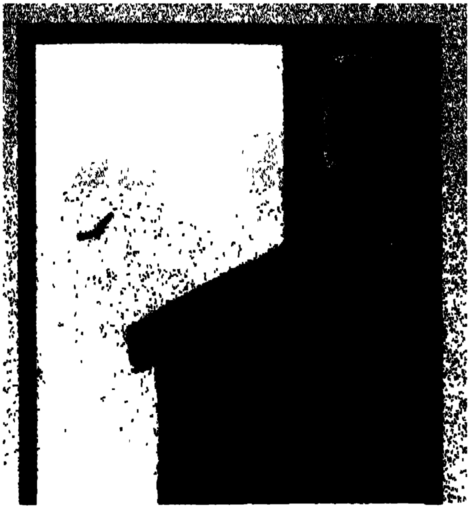
'না-না শুনি। আমার শোনার ইচ্ছা হচ্ছে।'

লালমামি মৃদু কণ্ঠে বললেন, না-না থাকুক। গান বাজাতে হবে না।

তবু গান বেজে উঠল--

"আমার ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো
তোরে আমি কোথায় রাখি বল।"

আমি চলে আসলাম। এই অচিনপুরীতে থাকবার কাল আমার শেষ হয়েছে।



অন্যদিন

## এক

পান্থনিবাস বোর্ডিং হাউস
১১-বি কাঁঠাল বাগান লেন (দোতালা)
ঢাকা-৯

চিঠি লিখলে এই ঠিকানায় চিঠি আসে। খুঁজে বের করতে গেলেই মুশকিল। সফিক লিখেছিল অবশ্যি, তোর কষ্ট হবে খুঁজে পেতে। লোকজনদের জিজ্ঞেস করতে পারিস কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না। একটা ম্যাপ এঁকে দিলে ভাল হত। তা দিলাম না, দুর্লভ জিনিস পেতে কষ্ট করতেই হয়।

এই সেই দুর্লভ জিনিস? দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলতে পারে না এরকম একটা গলির পাশে ঘুপসি ধরনের দোতলা বাড়ি। কত দিনের পুরনো বাড়ি সেটি কে জানে। চিতি পরে সমস্ত বাড়ি কালচে সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। দোতলায় একটি ভাঙা জানালায় ছেঁড়া চট ঝুলছে। বাড়িটির ডান পাশের দেয়ালের একটি অংশ সম্পূর্ণ ধসে গিয়েছে। সামনের নর্দমায় একটি মরা বেড়াল; দূষিত গন্ধ আসছে সেখান থেকে। মন ভেঙে গেল আমার। স্যুটকেস হাতে এদকি-ওদিক তাকাচ্ছি— দোতলায় যাবার পথ খুঁজছি, সিঁড়ি-ফিড়ি কিছুই দেখছি না। নিচ তলা তালাবন্ধ। নোটিশ ঝুলছে—

**'এই দোকান ভাড়া দেওয়া হবে।'**

দোতলার জানালার চটের পর্দার ফাঁক দিয়ে কে যেন দেখছিল আমাকে। তার দিকে চোখ পরতেই সে বলল, জ্যোতিষী খুঁজছেন? হাত দেখাবেন? উপরে যান. বাড়ির পেছন দিকে সিঁড়ি।

পান্থ নিবাস বোর্ডিং হাউসের লোকজন আমার চেনা। সফিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখেছে আমাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে যার সঙ্গে দেখা হল তিনি যে নিশানাথ জ্যোতির্ষাণব তা সফিকের চিঠি ছাড়াও বলে দিতে পারতাম। প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা ঝাকড়া ঘন চুলের একজন মানুষ কপালে প্রকাণ্ড এক সিঁদুরের ফোঁটা, মুখ ভর্তি দাড়ি। গায়ে গেরুয়া রঙের একটি চাদর। পরনে খাটো করে পরা একটি ধবধবে সাদা সিল্কের লুঙ্গি। পায়ে রুপোর বোলের খরম। প্রথম দর্শনেই হকচকিয়ে যেতে হয়। জ্যোতির্ষাণব সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'হস্ত গণনা করাতে এসেছেন? পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন, উঁহু স্যুটকেস হাতে কেউ জ্যোতিষীর কাছে আসে না। লক্ষণ বিচারে ভুল হয়েছে। তুমি সফিকের কাছে এসেছ?'

জি।

সফিক সারা সকাল অপেক্ষা করেছিল। তোমার না ভোরবেলা আসার কথা?

ট্রেন ফেল করলাম। ঢাকা মেইলে আসা লাগল।

জ্যোতির্ষাণব মহা গম্ভীর হয়ে বললেন,

আমি জানতাম। সফিককে বললাম আশাভঙ্গ হওয়ার কারণ ঘটবে। সে সারা সকাল রাস্তার মোড়ে তোমার জন্য দাঁড়িয়েছিল। আশাভঙ্গ তো হলই ঠিক কিনা তুমি বল?

হ্যাঁ তা ঠিক।

ঠিক তো হবেই। তিন পুরুষ ধরে গুহ্য বিদ্যার চর্চা আমাদের হুঁ হুঁ।

জ্যোতির্ষাণব আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। তাঁর ঘরের বর্ণনা সফিকের চিঠিতে পড়েছি। বাড়িয়ে লিখেনি কিছুই-- ঘরে ঢুকলে যে কোন সুস্থ লোকের মাথা গুলিয়ে যাবে। তিনি জানালা বন্ধ করে ঘরটা সব সময় অন্ধকার করে রাখেন। অন্ধকার ঘরে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে। ধূপদানী আছে, কেউ হাত দেখাতে আসছে টের পেলেই ধূপদানীতে এক গাদা ধূপ ফেলে নিমিষের মধ্যে গা ছমছমানো আবহাওয়া তৈরি করে ফেলেন। কিন্তু এতসব করেও তাঁর পসার নেই মোটেও।

জ্যোতির্ষাণব আমাকে চৌকিতে বসিয়ে ধূপদানীতে ধূপ ঢেলে দিলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার জোগাড়। থমথমে গলায় বললেন,

উদ্দেশ্য সফল হবে তোমার। বি.এ. পাস করবে ঠিকমত। কপালে রাজানুগ্রহের যোগ আছে। গ্রহ শান্তির একটা কবচ নিও আমার কাছ থেকে। সফিকের বন্ধু তুমি। নামমাত্র মূল্যে পাবে। আমি বললাম,

কোথায়ও একটু গোসল করা যাবে? আশপাশে চায়ের দোকান আছে? বড় চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

জ্যোতির্ষাণব আঁৎকে উঠলেন। যেন এমন অদ্ভুত কথা কখনো শুনেন নি। রাগী গলায় বললেন, স্বাস্থ্য বিধির কিছুই দেখি জান না। গায়ের ঘাম না মরতেই গোসল চা। ঠাণ্ডা হয়ে বস দেখি।

তিনি একটি টেবিল ফ্যান চালু করলেন। ফ্যানটি নতুন। ভয়ানক গম্ভীর স্বরে বললেন,

আমার এক ভক্ত দিয়েছে। এই সব বিলাস সামগ্রী দুই চক্ষে দেখতে পারি না। তান্ত্রিক মানুষ আমরা — এসব কী আমাদের লাগে? শীত গ্রীষ্ম সব আমাদের কাছে সমান।

ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করবার পর জ্যোতির্ষাণব আমাকে গোসলখানা দেখিয়ে দিলেন।

খুব সাবধানে গোসল সারবে রঞ্জু। দারুণ পিছল মেঝে। মেসের অন্য বোর্ডাররা কেউ নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা থাক গোসলখানায়। চা আমি বানিয়ে রাখব এসেই গরম পাবে। কয় চামচ চিনি খাও চায়ে?

গায়ে পানি ঢালতেই শরীর জুড়িয়ে গেল। বরফের মত ঠাণ্ডা পানি। পথের ক্লান্তি, নতুন জায়গায় আসার উদ্বেগ সব মুছে গিয়ে ভাল লাগতে শুরু করল। হঠাৎ করেই মনে হল নীলগঞ্জের পুকুরে যেন ভরদুপুরে সাঁতার কাটছি। আমি অনেকবার লক্ষ্য করেছি সুখী হওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মানুষের। অতি সামান্য জিনিসও মানুষকে অভিভূত করে ফেলতে পারে।

আমার বাবার কথাই ধরা যাক। তাঁর মত সুখী লোক এ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই বলেই আমার ধারণা। অথচ গত ছয় বছর ধরে তাঁর কোন চাকরি-বাকরি নেই। তিনি ভোর বেলা উঠেই স্টেশনে যান। সেখানকার চায়ের স্টলটি নাকি 'ফাস ক্লাস' চা বানায়। খালি পেটে ঐ চা পর পর দু'কাপ খাবার পর তিনি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে গল্প-গুজব করেন। কি গল্প করেন তিনিই জানেন। ন'টার দিকে স্কুলের ভাত রান্না হয় বাড়িতে। সে সময় তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। আনজু এবং পারুলের সঙ্গে অতি দ্রুত ভাত খেয়ে নেন। সময় তাঁর হাতে খুব অল্প কারণ সাড়ে দশটার দিকে পোস্টাপিসে খবরের কাগজ আসে। কাগজটি পড়া তাঁর কাছে ভাত খাওয়ার মতই জরুরি। সন্ধ্যাবেলা তিনি হারু গায়েনের ঘরে বেহালা বাজানো শিখেন। বর্তমানে এই দিকেই তাঁর সমস্ত মন প্রাণ নিবেদিত। মহাসুখী লোক তিনি। মা যদি বলেন,

পারুলের তো নাম কাটা গেছে স্কুলে। তিন মাসের বেতন বাকি।

বাবা চোখে-মুখে দারুণ দুঃশ্চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে বলেন, বড়ই মুসিবত দেখছি। গভীর সমুদ্র। হুঁ যত মুশকিল তত আহ্‌সান। হাদিস কোরানের কথা। চিন্তার কিছু দেখি না। সমস্যার সমাধানও বের করেন সঙ্গে সঙ্গে, দরকার নাই স্কুলে পড়ার। পারুল মা, প্রাইভেটে মেট্রিক দিবে তুমি। আমি পড়াব তোমাকে। বইগুলি সব নিয়ে আয় তো মা এবং তিন নম্বরি একটা খাতা আন, রুটিনটা লেখি আগে।

মা ছাড়া আমরা কেউ বিরক্ত হই না বাবার ওপর। আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি বাবা এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। এই জগতের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ নেই।

আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে বাবা স্টেশনে এসেছিলেন। ট্রেন ছাড়বার আগে আগে আমাকে বললেন,

রঞ্জু, একটু এদিকে শুনে যা তো।

পারুল আর আনজুর কাছে থেকে অনেকটা দূরে নিয়ে গেলেন আমাকে। গলার স্বর যথাসম্ভব নিচু করে বললেন,

একটা ভাল বেহালার দাম কত, খোঁজ নিবি তো। ভুলিস না যেন।

খোঁজ নিব। ভুলব না।

আমার নিজের জন্যে না। বুড় বয়সে কী আর গান বাজনা হয়? তোর মাও পছন্দ করে না। অন্য লোকের জন্য।

আমি খোঁজ নিব।

ট্রেন ছাড়ার সময়ও এক কাণ্ড করলেন। ট্রেনের সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করলেন। ট্রেনের গতি যত বাড়ে তাঁর গতিও বাড়ে। ট্রেনের লোকজন গলা বাড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

গোসল সেরে দোতলায় উঠে এসে দেখি জ্যোতির্ষাণবের ঘর জমজমাট। দু'তিন জন লোক বসে আছে পাংশু মুখে। জ্যোতির্ষাণব একজনের হাতের তালুর দিকে অখণ্ড মনযোগে তাকিয়ে আছেন। আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, পর্দা ঠেলে ভেতরে চলে যাও। চা পিরিচে ঢাকা।

আগে লক্ষ্য করিনি যে পায়রায় খুপড়ির মত ঘরও পর্দা দিয়ে দু'ভাগ করা। ভেতরে ঢুকে দেখি দড়ির খাটিয়ার উপর ধবধবে সাদা চাদরে চমৎকার বিছানা করা । বিছানার লাগোয়া একহাত বাই একহাত সাইজের টেবিল একটি। তার উপরও ধবধবে সাদা ঢাকনি। খাটিয়াটার মাথার পাশে বেতের শেলফ। শেলফের উপর চমৎকার একটি কাচের ফুলদানীতে ফুল। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। জ্যোতির্ষাণব দেখি দারুণ সৌখিন লোক।

শুধু চা নয়। পিরিচে খাবার ঢাকা আছে। একটি লাড্ডু এবং একটি সিঙ্গারা। আমি চা খেতে খেতে শুনলাম জ্যোতির্ষাণব গম্ভীর গলায় বলছেন,

গ্রহ শান্তি কবচ নিতে পারেন আমার কাছ থেকে। রত্নও ধারণ করতে পারেন। তবে রত্ন অনেক দামী। তাছাড়া আসল জিনিস মিলবে না, চারদিকে জুয়াচুরি।

গ্রহ শান্তিতে কত খরচ পড়বে?

বিশ টাকা নেই আমি. তবে আপনার জন্যে দশ।

দশ যে বড় বেশি হয়ে যায় সাধুজী।

জ্যোতির্ষাণব হাসেন।

পঞ্চ ধাতুর কবজের দামই মশাই পাঁচ টাকা। তাম্র স্বর্ণ রৌপ্য পারা ও দস্তা। তঞ্চকতা পাবেন না আমার কাছে। একবার ধারণ করে দেখুন টাকাটা জলে যায় কিনা। টাকাই তো জীবনের সব নয়। হুঁ হুঁ।

বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি ধরে যায় আমার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে, ঘর অন্ধকার। সুইচ আছে একটি। আলো জ্বালাতে ঠিক সাহস হয় না। সাধুজী পাশের ঘরে প্রদীপ জ্বেলে বসে আছেন। কে জানে ইলেকট্রিসিটির আলোতে তাঁর হয়ত অসুবিধা হবে। সফিক কত রাতে ফিরবে কে জানে? শুয়ে পড়লাম সাধুজীর বিছানাতেই।

শুয়ে শুয়ে কত কি মনে হয়। বাবা যেন ম্যাকমিলান কোম্পানির তাঁর সেই পুরানো চাকরিটা আবার ফিরে পেয়েছেন। গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরেছেন প্রকাণ্ড একটা মাছ হাতে নিয়ে। পারুলের বিছানার পাশে ঝুঁকে ডাকছেন,

ওরে পারুল, ওরে টুনটুনি, ওরে কুট কুট, ওরে ভুট ভুট।

মা কপট রাগের ভঙ্গি করে বলছেন, কি যে পাগলামী তোমার। এই দুপুর রাতে মাছ কুটতে বসব নাকি?

বাবার মুখ ভর্তি হাসি।

একশ বার বসবে। হাজার বার বসবে।

পারুল ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। বার বার বলছে,

বইটা এনেছ বাবা? 'দেশ বিদেশের রূপকথা' নাম লিখে চিঠি দিয়েছিলাম যে তোমাকে?

উঁহু বড্ড ভুল হয়ে গেছে রে। একটুও মনে নেই। সামনের শনিবার ঠিক দেখিস...

পারুলের নিচের ঠোঁট বেঁকে যেতে শুরু করতেই বাবা ম্যাজিসিয়ানের ভঙ্গিতে বলে উঠেছেন,

টেবিলের উপর রূপকথার বইটা আবার কে আনল?

ঝিমুনি ধরলেও ঘুম আসে না আমার। বিছানায় এপাশ ওপাশ করি। ধূপের গন্ধে দম আটকে আসে একেকবার। কী যে কাণ্ড সাধুজীর। সফিক চিঠিতে লিখেছিল, 'দুনিয়াতে মন্দ মানুষ এত বেশি বলেই ভাল মানুষদের জন্য আমাদের এত মন কাঁদে। আমাদের নিশানাথ এমন একজন ভাল মানুষ। মানুষকে দেওয়াই যার জীবিকা— সে এমন ভাল মানুষ হয় কি করে কে জানে?

রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও সফিকের দেখা পাওয়া গেল না। নিশানাথ বাবু আমাকে বসিয়ে রেখে নিচে খেতে গেলেন। খাওয়ার পর আমাকে হোটেল থেকে খাইয়ে আনবেন।

হোটেলটি বেশ খানিকটা দূরে। নানান প্রসঙ্গে গল্প করতে করতে সাধুজী হাঁটছেন। অনেকেই

দেখি তাঁকে চেনে। একটি পানওয়ালা দাঁত বের করে বললো,

সাধুজীর শইলটা বালা নাকি?

তিনি থেমে বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললেন পানওয়ালার সঙ্গে। তাঁর গল্প বলার ঢং চমৎকার। মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। সফিক প্রসঙ্গে বলেন,

সফিক ছেলেটা ভাল তবে বড় ফাজিল। ফাজলামী করে আমার সঙ্গে। আমি নাকি লোক ঠকিয়ে খাই। ছিঃ ছিঃ কি কুৎসিত চিন্তা। আমরা হচ্ছি তিন পুরুষের জ্যোতিষী। আমার ঠাকুরদা তারানাথ চক্রবর্তী ছিলেন সাক্ষাৎ বিভূতি। মানুষের হাত দেখে জন্মবার বলতে পারতেন। আজকালকার ছেলেপুলেরা এসবের কী জানবে?

কথা বলতে বলতে সাধুজীর মুখের ভাব বদলায়। রশীদ মিয়ার কথা বলতে বলতে তিনি চোখ-মুখ কুঁচকে এমন ভাবে তাকান যেন রশীদ মিয়া ছুরি হাতে মারতে আসছে। 'রশীদ মিয়া, বুঝলে নাকি রঞ্জু? নরকের কীট। দেখা হলেই বলবে— বিজনেস কেমন চলছে আপনার?'

আমি চুপ করে থাকি। সাধুজী রাগী গলায় বললেন,

হাত দেখা বিজনেস হলে আজ আমার গাড়ি বাড়ি থাকত। সুসং দুর্গাপুরের জমিদার ভূপতি সিংহ আমার ঠাকুরদাকে আশি বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তি দিতে চাইলেন। ঠাকুরদা বললেন, 'ক্ষমা করবেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সম্পত্তির মোহে পড়তে চাই না।' রশীদ মিয়া কী বুঝবে আমাদের ধারা?

সফিক ফিরতেই তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল জ্যোতির্ষাণবের সঙ্গে। সফিক গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, 'আমার ঘরের চাবি দিয়ে গেলাম আপনার কাছে। বললাম, রঞ্জু আসামাত্র আমার ঘর খুলে দেবেন তা না নিজের অন্ধ কূপের ধোঁয়ার মধ্যে নিয়ে...

তাতে তোমার বন্ধুর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে?

না হোক মেসে রঞ্জুর জন্যে রান্না করতে বলে গেছি। টাকা খরচ করে তাকে হোটেল থেকে খাইয়ে এনেছেন। টাকা সস্তা হয়েছে?

টাকার মূল্য আমার কাছে কোনো কালেই নেই সফিক।

বড় বড় কথা বলবেন না। লম্বা লম্বা বাত শুনতে ভাল লাগে না।

সামান্য ব্যাপার নিয়ে সফিক এত হৈচৈ করছে কেন বুঝতে পারলাম না। আমার লজ্জার সীমা রইল না।

সফিকের ঘরে দুটি চৌকি পাতা। আবর্জনার স্তূপ চারদিকে। দীর্ঘ দিন সম্ভবত ঝাঁট দেয়া হয় না। একপাশে একটি থালায় অভুক্ত ভাত পড়ে আছে। সফিক আমাকে বলল,

লম্বা হয়ে শুয়ে পড়। সকালে কথা বলব।

তুই কোথায় যাস?

খেয়ে আসি। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। খেয়ে এসেই বিছানায় কাত হব। কথাবার্তা যা হবার সকালে হবে। তুই ঘুমো।

সফিক নিচে নেমেও খুব হৈচৈ করতে লাগল,

হারামজাদা ডাল শেষ হয়ে গেছে মানে? পয়সা দেই না আমি? আমি মাগনা খাই? যেখান থেকে পারিস ডাল নিয়ে আয়।

সাধু বাবা ডাল খেয়ে ফেলেছে।

সাধু বাবার বাপের ডাল।

সফিক বড্ড বদলে গেছে। এ রকম ছিল না। কখনো শরীরও খুব খারাপ হয়েছে। কোনো অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়েছে কিনা কে জানে। আমি তো প্রথম দেখে চিনতেই পারিনি। চমৎকার চেহারা ছিল সফিকের। স্কুলে 'মুকুট' নাটক করেছিলাম আমরা। সফিক হয়েছিল মধ্যম রাজকুমার। সত্যিকার রাজপুত্রের মত লাগছিল। কমিশনার সাহেবের বৌ সফিককে ডেকে পাঠিয়ে কত কি বলেছিলেন।

## দুই

সকাল বেলা সফিক আমাকে নিয়ে গেল রশীদ মিয়ার কাছে। রশীদ মিয়া তাঁর রেজিস্ট্রি খাতায় আমার নাম তুলবেন। লোকটি ছোটখাটো। সামনের দুটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। সেই দাঁত

দুটি ছাড়া আর সমস্ত দাঁতে কুৎসিত হলুদ রঙ। আমি পান্থনিবাসে বোর্ডার হব শুনে তিনি এমন ভাব করলেন যেন এমন অদ্ভুত কথা এর আগে শোনেননি।

না সাহেব বোর্ডার আর নেব না। শুধু শুধু ঝামেলা।

সফিক গম্ভীর হয়ে বলল,

কিসের ঝামেলা?

টাকা পয়সা নিয়ে খেঁচামেচি করে।

আমি, আমি খেঁচামেচি করি?

আপনি না করেন অন্য লোকে করে।

আমাকে নিয়ে কথা। আমি যদি না করি এও করবে না। মাসের তিন তারিখে খ্যাচাং করে টাকা ফেলে দিবে। নবী সাহেবের ঘরটা দেন তার নামে।

নবী সাহেব গেলে তবে তো দিব?

যতদিন না যান ততদিন থাকবে আমার ঘরে।

রশীদ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন,

ঐ ঘরের ভাড়া এই মাস থেকে পাঁচ টাকা বেশি।

সফিক প্রায় তেড়ে গেল।

পাঁচ টাকা বেশি কেন? মোজাইক করে দিচ্ছেন ঘরটা?

রশীদ মিয়া নির্লিপ্ত সুরে বলল,

জানালা দুইটা। ঐ ঘরে আলো বাতাস বেশি খেলে।

একটা জানালা পেরেক মেরে বন্ধ করে দিবেন। সাফ কথা। খুলেন আপনার খাতা।

নিতান্ত গোমড়া মুখে খাতা খুললো রশীদ মিয়া।

পেশা কী?

আমি আমতা আমতা করে বললাম,

পেশা কিছু নাই— আমি ছাত্র।

ঝপাং করে খাতা বন্ধ করে রশীদ মিয়া আতংকিত স্বরে বললেন,

ছাত্র মানুষ ঘর ভাড়া পাবে কোথায়?

সফিক থমথমে গলায় বলল.

যেখান থেকে পারে জোগাড় করবে। দরকার হয় চুরি করবে।

চুরি করবে?

হ্যাঁ, চুরি করবে। অসুবিধা আছে কিছু? আপনি করেন না?

আমি চুরি করি?

মালিকের পান্থ নিবাস তো ফাঁকা করে দিচ্ছেন।

রশীদ মিয়ার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এলো।

কে, কে বলেছে?

বলা বলির তো কিছু নেই। সবাই জানে। সাধুজী তো পরিষ্কার বলেছেন, তীক্ষ্ণ চিবুক, ছোট কান এবং বর্তুলাকার চক্ষুর জাতক চোর স্বভাববিশিষ্ট হয়।

নিশানাথ এই কথা বলে?

হ্যাঁ বলবে না কেন? সাধুজী স্পষ্ট কথার লোক।

এরপর আর আমার নাম-ধাম খাতায় তুলতে অসুবিধা হয় না। রশীদ মিয়া গম্ভীর গলায় উপদেশও কিছু দেন, 'ঘরে মেয়ে ছেলে আনতে পারবেন না। ভদ্রলোকের মেস এইটা। ধান্ধাবাজির জায়গা না। বিশিষ্ট লোকজন থাকে।'

অগ্রিম এক মাসের খাওয়া খরচের টাকা দেয় সফিক। তারপর খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রশীদ মিয়ার পেটে হাত দিয়ে বলে, 'মাশআল্লাহ পেট তো আপনার আরো পাঁচ গিরা বড় হয়ে গেছে রশীদ মিয়া।' সফিককে যতই দেখি ততই অবাক হই। এ কোন সফিক? দু'বৎসরে তার এ কি পরিবর্তন!

মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার। দেখি ঘরের মধ্যে লালচে আলো। সমুদ্র গর্জনের মত শাঁ শাঁ আওয়াজ হচ্ছে। ধর মড় করে জেগে উঠে দেখি সফিক স্টোভ জ্বালিয়েছে।

কি ব্যাপাব সফিক?

ব্যাপার কিছু না, চা খাব।

চা এই সময়? কয়টা বাজে?

তিনটা দশ। তুই খাবি নাকি?

না।

রোজ এই সময় চা খাস নাকি?

না দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলো, ভাবলাম একটু চা খাই।

আমি চুপ করে থাকলাম। সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল,

বড় স্ট্রাগল করতে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়েছি জানিস না বোধ হয়?

আমি জানতাম না। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কী করে পড়ব বল? দিনে কম্পোজিটারের চাকবি। বিকালে টিউশনি আছে দুটো। এব পব আর এনার্জি থাকে না। নাইট কলেজে পাস কোর্সে নাম তোলা আছে। এই বছব আর হবে না।

সফিক দুটি কাপে চা ঢালল। আমি বললাম,

এত রাতে চা খাব না সফিক।

তোর জন্যে না, নিশানাথকে ডেকে আনছি।

কিছুক্ষণ পরই নিশানাথ জ্যোতির্ষাণবেব গজগজানি শোনা গেল, বাত দুপুবে চা? এই সব কী শুরু করেছ? যাও চা খাব না।

সফিকের গলা আরেক ধাপ উঁচুতে,

বানানো হয়েছে চা খাবেন না মানে? খেতেই হবে।

আরে হুকুম নাকি তোমার?

একশ বার হুকুম? বানালাম এত কষ্ট করে আব তিনি খাবেন না। আলবত খাবেন।

সফিকের কাণ্ড কারখানা দেখে আমি স্তম্ভিত। জ্যোতির্ষাণব অবশ্যি খবম খট খট কবে ঘবে এলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন, চা কোথায়? ওয়াক থু। এ তো ইঁদুব মাবা বিষ।

সফিক সে কথার উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপ চাপ থেকে শান্ত স্বরে বলল,

একটা গল্প বলুন নিশানাথ বাবু।

জ্যোতির্ষাণব চায়ের কাপ নামিয়ে বেখে উদ্বিগ স্ববে বললেন,

কী হয়েছে তোমার?

কিছু হয় নাই।

না, বল কি হয়েছে?

সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল,

একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম আমার ছোট বোন অনু মবে পড়ে আছে। সাত আটটা কাক তাব পাশে বসে আছে।

নিশানাথ গম্ভীর হয়ে বললেন,

শেষ প্রহরের স্বপ্ন। তার উপর এখন শুক্ল পক্ষ-- স্বপ্নের কোনই মানে নেই। নাক ডাকিযে ঘুমাও।

একেবারে যে মানে নেই তা না নিশানাথ বাবু। অনুব হাসবেন্ডটা আরেকটা বিয়ে কবছে। সোমবার চিঠি পেয়েছি। মনটা বড় অস্থির। সন্ধ্যাবেলা আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, কিছু মনে করবেন না। আমার মাথা ঠিক নাই। নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না। চা শেষ করে নিঃশব্দে চলে গেলেন। আমি শুয়েই ছিলাম, ঘুম আসছিল না। সফিক জেগে রইল অনেকক্ষণ।

এই সফিক কী যে ক্যাবলা ছিল। একা একা স্কুলে আসতে ভয় পেত বলে রোজ তার বাবা স্কুলে দিয়ে যেতেন। টিফিনের সময় আমরা সবাই যখন ছোটাছুটি করে কুমীর কুমীর খেলি, তখন সে উদাস চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। অংক স্যার একদিন বেগে গিয়ে বললেন,

সবাই খেলছে আর তুই বসে আছিস? রহমান যা তো ওর কান মলে দে।

রহমান আমাদের ক্লাস ক্যাপটেন। সে গিয়ে কান চেপে ধরতেই সফিকের নিঃশব্দ কান্না। আমরা হেসে বাঁচি না। একদিন সফিকের বাসায় গিয়ে দেখি তার মা ভাত খাইয়ে দিচ্ছেন। ক্লাস ফোরে পড়ে ছেলে, মায়ের হাত ছাড়া খেতে পারে না। কি কাণ্ড কী কাণ্ড।

আমার ঘুম ভাঙলো খুব সকালে। বাইরে এসে দেখি একটি লোক হাফ পেন্ট পড়ে উঠ বস করছে। আমাকে দেখে সে মনে হল একটু লজ্জা পেল। ইতস্তত করে বলল,

সফিক সাহেবের বন্ধু আপনি?

জি।

আমি আজীজ। রেলে চাকবি করি। শরীরটা ঠিক রাখতে হয় ভাই। যা খাটনি।

আমি কিছু বললাম না। আজীজ সাহেব গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন,

আপনার মত রোগা পটকা হলে এত দিনে যক্ষ্মা হয়ে মরে যেতাম। শরীরের জন্যে টিকে আছি। ওয়াগন বুকিং-এর চাকরি যে করে সেই জানে।

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম লোকটির স্বাস্থ্য সত্যি ভাল। সচরাচর এমন চোখে পড়ে না। আমি হাসি মুখে বললাম,

বেশ স্বাস্থ্য আপনার।

আর স্বাস্থ্য। খাওয়া জুটাতে পারি না ভাই। শুধু ভিজা ছোলা খেয়ে কী স্বাস্থ্য হয়? সারাক্ষণ ক্ষিধে লেগে থাকে। আসলাম পালোয়ান সকাল বেলা দশটা ডিম আর এক সের গোস্তের কিমা খায়। এই সব জিনিস পাব কোথায় বলেন?

আজীজ সাহেব জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন বেলের সরবত খাওয়ার জন্যে। এতে নাকি পেট ঠাণ্ডা থাকে। আজীজ সাহেবের ঘরটি বেশ বড়। তিনি এবং করিম সাহেব দু'জনে মিলে থাকেন। করিম সাহেব লোকটি কংকালসার। মাথায় কোন চুল নেই। কিন্তু মুখ ভর্তি প্রকাণ্ড গোঁফ।

করিম সাহেব ইনি সফিক ভায়ের বন্ধু. এখানে থাকবেন।

করিম সাহেব হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে নিচে নেমে গেলেন। তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল তার পরই। করিম সাহেব বাঁশীর মত চিকন গলায় চিৎকার করছেন,

এত বড় বালতিটা চোখে পরল না?

বালতির মধ্যে নাম লেখা আছে, যে দেখলেই চিনব?

টেরা টেরা কথা বলবেন না।

টেরা কথা কে বলে, আমি না আপনি?

যত ছোট লোকের আড্ডা হয়েছে।

মুখ সামলে কথা বলবেন সাহেব।

একজন অতি বৃদ্ধ লোক দেখলাম, কী বলে যেন দু'জনকেই থামাতে চেষ্টা করছেন। আজীজ সাহেব বললেন,

উনি নবী সাহেব। গার্লস স্কুলের এ্যাসিসটেন্ট হেড মাস্টার ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। অবস্থাটা দেখেছেন? রাতে চোখে একেবারেই দেখতে পান না। হাত ধরে বাথরুমে নিতে হয়।

উনি নাকি ঘর ছেড়ে দিবেন, সফিক বলল।

আজীজ সাহেব গলা নিচু করে বললেন,

পাগল হয়েছেন, শিকড় গজিয়ে গেছে। এই ঘর ছেড়ে যাবেন না কোথাও। দুই মেয়ে থাকে ঢাকা-- জামাইরা বড় চাকুরে, তারা নেবার চেষ্টা কম করে নাই, নিজের চোখে দেখা। ছোট মেয়েটার কত কান্না কাটি...।

নবী সাহেব ঝগড়াটা থামিয়ে ফেললেন। তারপর নিচু গলায় ডাকতে লাগলেন, 'এই কাদের। এই কাদের।' কাদের এই মেসের বাবুর্চি-টাবুর্চি হবে। সে এসে হাত ধরে তাঁকে উপরে নিয়ে এল। আজীজ সাহেব ফিসফিস করে বললেন,

বুড়ার দিন শেষ হয়ে আসছে। হাঁপানি আছে, ডায়াবেটিস আছে, সারারাত খক খক করে কাশে। কিন্তু তেজ কী-- মেয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকবে না। এত তেজ ভাল না রে ভাই। এখন আরাম নেয়ার সময়, কী বলেন?

তা তো ঠিকই।

বুড়া হলে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু থাকে না।

সফিক ঘুম থেকে উঠে অন্য মানুষ। হাসি-খুশি ভাবভঙ্গি। চা খেতে খেতে বলল,

তোর কোনো চিন্তা নাই, প্রাইভেট টিউশনি ঠিক করে রেখেছি। সপ্তায় পাঁচ দিন যাবি। চোখ বন্ধ করে কলেজে ভর্তি হয়ে যা। শ'চারেক টাকাও জমিয়েছি। অসুবিধা হবে না। তা ছাড়া আরেকটা

বুদ্ধি বের করেছি।

কী বুদ্ধি?

ছুটির দিনে কাটা কাপড়ের ব্যবসা করব। তুইও থাকবি।

সেটা কী রকম ব্যবসা?

সস্তা দরে দোকান থেকে কাটা কাপড়ের পিস কিনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বিক্রি করব। লাভের ব্যবসা। লালু সব ঠিক ঠাক করে দিবে।

লালু কে?

কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে। ধুরন্ধর লোক। আমাকে খুব খাতির করে।

আমি হাসি মুখে বললাম,

তুই বদলে গেছিস খুব।

সফিক ঘর ফাটিয়ে হা হা করে হাসতে লাগলো।

বদলাবনা তো কী? তুইও বদলাবি। দু'বেলা না খেয়ে থাকলেই সব উলট পালট হয়ে যায় বুঝলি। একদিন তো রাস্তায় সুঁচ বিক্রি করলাম। মজার ব্যাপার খুব।

সফিক সিগারেট ধরিয়ে ফুস ফুস করে টানতে লাগল। ওর আগের সেই সুন্দর চেহারা আর নেই। চোখের নিচে কালি পড়েছে, গালের চোয়ালে উঁচু হয়ে সমস্ত চেহারাটাই কেমন যেন রুক্ষ হয়ে পড়েছে। সফিক হাসি মুখে বলল,

সুঁচ বিক্রির গল্পটা শোন। একেবারে মরণ দশা তখন। চাকরি-বাকরি কিছুই নেই। হাতে জমানো টাকা-পয়সা যা ছিল সব শেষ। পুরা একটা দিন উপোস। দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কাঁদলাম। সন্ধ্যাবেলা বেরিয়েছি রাস্তায়। এমনি সময় এক লোক এসে বলল,

সুঁচ নিবেন ভাই? ছয়টা চাইর আনা। আমি অবাক হয়ে বললাম,

সুঁচ বিক্রি করে চলে তোমার? সেই লোক আমতা আমতা করে 'না স্যার চলে কই? ঘরে চারজন খানেওয়ালা।' সেই রাত্রেই শুরু হল আমার সুঁচের ব্যবসা। মূলধন জোগাড় করলাম জ্যোতির্ষাণবের কাছ থেকে। খুব লাভের ব্যবসা। পাঁচ টাকার সুঁচে দশটাকা লাভ।

লজ্জা লাগত না তোর?

না লজ্জা লাগবে কেন?

পরিচিত কারোর সঙ্গে দেখা হয় নাই?

বেশি দিন সুঁচ বিক্রি করলে হয়ত হত। বেশি দিন করি নাই। তবে আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল একদিন। পেছন থেকে চিনতে পারিনি। যথারীতি বলেছি, 'আপা সুঁচ নেবেন, সস্তা করে দিচ্ছি।' মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অনেক্ষণ কথাই বলতে পারল না। শেষটায় বলল, কাল সন্ধ্যায় একবার আমার বাসায় আসবেন? আসেন না। ঠিকানা রাখেন। আসবেন কিন্তু।

গিয়েছিলি?

গেলাম। রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি। দেখলেই বুকের মধ্যে হু হু করে। মেয়েটিকে দেখে কে বলবে ওদের এত পয়সা। দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল।

মেয়েটি সেই রাত্রেই কম্পোজিটারের একটা চাকরি জোগাড় করে দিল। প্রেসের মালিককে কী বলেছিল কে জানে, যাওয়া মাত্র এক মাসের এডভান্স বেতন।

মেয়েটা তো খুব ভাল।

হুঁ ভাল মেয়ে। তোকে একদিন নিয়ে যাব।

সফিককে নিয়ে সেই দিনই কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। কলেজের প্রিন্সিপাল গম্ভীর মুখে বললেন,

তিন বছর লস দিয়েছ দেখছি। এই তিন বৎসর করেছ কী?

কান টান লাল হয়ে গেল আমার। নিজের অভাব অনটনের কথা আমি নিজে মুখ ফুটে কখনো বলতে পারি না।

পুরানো বইয়ের দোকান থেকে কিছু বইপত্র জোগাড় করলাম। যে বাড়িতে প্রাইভেট টিউশনি জোগাড় হয়েছে সে বাড়িতেও সফিক আমাকে নিয়ে গেল। নয় দশ বছরের একটি মেয়ে আর ক্লাস ওয়ানের একটি ছেলেকে পড়াতে হবে। এদের মা নেই। বাবা ব্যস্ততার মধ্যে সময় করতে পারেন

না। ভদ্রলোক বললেন, 'দুটিই ভীষণ শয়তান, অস্থির হয়ে পড়েছি আমি। দেখেন ভাই যদি কিছু করতে পারেন।' বাচ্চা দু'টিকে ভাল লাগল। ছোটটি দেখি একটি পেনসিল দিয়ে বোনকে খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করছে। বড়টির মুখের ভাব এরকম যে এই সব ছেলেমানুষী ব্যাপার দেখে সে বড়ই বিরক্ত। বাচ্চা দুটির খুব মায়া কাড়া চেহারা।

পান্থ নিবাসে ফিরে এলাম অনেক রাতে। জ্যোতির্ষাণবের ঘরে প্রদীপ জ্বলছে, তাঁর মোটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, 'আপনার রবির ক্ষেত্রে ত্রিশুল চিহ্ন আছে। অতি শুভ লক্ষণ। হাজারে একটা পাওয়া যায় না। তবে মঙ্গলের ক্ষেত্র ভাল না। গ্রহ কুপিত হয়েছেন।'

আজীজ সাহেবের ঘরে হৈ হৈ করে তাস খেলা হচ্ছে। তীক্ষ্ণ গলায় কে যেন চেঁচাচ্ছে, 'এটা নো ট্রাম্পের কল? মাথার মধ্যে কিছু আছে আপনার? গোবর পুরা মাথায় অফিসের কাজকর্ম করেন কী ভাবে?

বারান্দায় পাটি পেতে লম্বা শুয়ে শুয়ে আছেন করিম সাহেব। কাদের তার গায়ে তেল মাখাচ্ছে। আরামে চোখ ছোট হয়ে আসছে করিম সাহেবের। আমাদের দেখে টেনে টেনে বললেন, 'তেল মালিশের মত উপকারী কিছু নাই। দুইটাই চিকিৎসা আছে, 'জল চিকিৎসা আর তেল চিকিৎসা।'

পান্থ নিবাসে আমার জীবন শুরু হল। ১১ই মার্চ উনিশশো পয়ষট্টি সন।

## তিন

বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে।

বাবা এবং মা দুজনেই দু'টি পৃথক খামে চিঠি দিয়েছেন। বাবার চিঠি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সে চিঠিতে নিজের ছেলে-মেয়ের কথা কিছুই নেই। স্টেশন মাস্টার এবং পোস্ট মাস্টারের কথা বিশদভাবে লেখা। বাবা লিখেছেন,

> বেহালার দাম কত তা নিশ্চয়ই খোঁজ নিয়াছ। ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবে এবং রেজিস্টারি চিঠি দিয়া আমাকে জানাইবে। এদিকের খবর ভাল তবে স্টেশন মাস্টার সাহেবের বড় বিপদ। তাঁর চাকরি নিয়া ঝামেলা হইতেছে। হেড অফিস হইতে ইন্সপেকশন হইবে। বড় উদ্বিগ্ন আছি। আমাদের পোস্টমাস্টার সাহেবের মেজো মেয়ের বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছে। ছেলে কাস্টমসে চাকুরি করে। তিনশত পঁচাত্তর টাকা বেতন। পনরই ফাল্গুন ইনশাল্লাহ বিবাহ, দেনা-পাওনা নিয়ে ছেলের এক মামার সহিত কিঞ্চিৎ মানো-মালিন্য হইয়াছে। মামাটি অতি অভদ্র। সাক্ষাতে সমস্ত বলিব।

মায়ের চিঠিটাও ছোট আমার পড়াশুনা নিয়ে উদ্বেগ। স্বাস্থ্য কেমন আছে। এখানকার খাওয়া দাওয়া কেমন. এই সব। কিন্তু শেষের দিকে লিখেছেন,

> তোমার বাবার স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল না। খাওয়া দাওয়ায় ইদানীং খুব অনিয়ম করেন। আমার সন্দেহ হয় তাহার অল্প অল্প মাথার দোষ দেখা দিয়াছে। পরে বিস্তারিত লিখিব।

চিঠি পড়ে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। মা নিশ্চয়ই অনেক কিছু গোপন করেছেন। খুব অস্থির লাগল। সফিকের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু সে আসবে রাত এগারোটার দিকে। বারান্দায় চেয়ার টেনে চুপচাপ বসে রইলাম। চার পাঁচ মাসে বাবার এমন কী হতে পারে যাতে মা ভেবে বসেছেন বাবার মাথার দোষ হয়েছে। তা ছাড়া সংসার চলছে কি ভাবে সেই প্রসঙ্গেও কেউ কিছু লিখেন নি। জমির আয় অতি সামান্য। মামারা মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। এখনো করছেন কিনা কে জানে? পারুলের স্কুলের বেতন দেয়া হয়েছে কী? না নাম কাটিয়ে বাড়িতে বসে আছে। কিছু দিন আগে পারুলের চিঠি পেয়েছি সেখানে এসব কিছুই লেখা নেই। বাড়ির জন্যে বড় মন কাঁদতে লাগল।

জ্যোতির্ষাণবের কাছে একটু যে বসব সে উপায় নেই। তাঁর নাকি আবার কি এক মৌনব্রত শুরু হয়েছে। এক সপ্তাহ কারো সঙ্গে কথা বলবেন না । হাত দেখাতে যারা আসছে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। সফিক মৌনব্রতের প্রথম দিন চেঁচিয়ে বলেছে,

শুধু ভড়ং. রোজগার পাতি নাই কিনা তাই একটা নতুন ফিকির বের করেছে।

এর উত্তরে জ্যোতির্ষাণব শ্লেটে বড় বড় করে লিখেছেন, মৌনব্রত অবস্থায় আমাকে রাগাইও না।

সেই শ্লেট রেখে এসেছেন সফিকের বিছানায়। সফিক রেগে মেগে অস্থির। তার এরকম রাগের অর্থও ঠিক বুঝতে পারি না। রোজগার বাড়াবার ফন্দিই যদি হয় তাতে ক্ষতি কী? ফন্দি ফিকির তো সবাই করে। তা এমনিতেও তার খুব তিরিক্ষি মেজাজ হয়েছে। কোন কারণ ছাড়াই রেগে ওঠে। করিম সাহেবের সঙ্গে অকারণে একটা ঝগড়া করল। করিম সাহেব রোজকার মত সন্ধ্যা বেলা গায়ে তেল মাখাচ্ছিলেন। সফিক গম্ভীর হয়ে বলল,

এই কুৎসিত অভ্যাসটা ছাড়েন দেখি।

আপনার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

ঘরের সামনে একটা লোক নেংটা হয়ে তেল মাখায়— এটা সহ্য করা যায় না।

আমি নেংটা হয়ে তেল মাখাই। আমি?

তুমুল হৈচৈ বেঁধে গেল। নবী সাহেব এসে থামালেন।

সফিকের প্রেসের চাকরিটা নেই। কী নিয়ে গোলামাল করেছে কে জানে? লালুর সঙ্গে কাটা কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছে। সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে। সন্ধ্যার পর যায় বয়স্কদের কী একটা স্কুলে। এই চাকরিটা সে কি করে যেন ধাঁ করে জোগাড় করে ফেলেছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে মাসে তাকে একশ টাকা করে যাতায়াত খরচ দেয়। এর বিনিময়ে বস্তির লোকদের সে বর্ণ পরিচয় পড়ায়। এই চাকরিতে সে খুব সন্তুষ্ট। হাসি মুখে আমাকে বলে,

সব গুণ্ডা-পাণ্ডাদের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে অনেকেই আমার ছাত্র কিনা। খুব মানে। দেখবি ওদের দিয়ে 'নিউ প্রেসের' মালিককে রাম ধোলাই দিব একদিন। আর আমাদের রশীদ মিয়াকেও।

রশীদ মিয়া আবার কী করেছে?

মস্ত বড় চোর। দেখ না কী করি শালাকে।

আমার মনে হয় সফিকের কোনো একটা অসুখ করেছে। রাতে তার ভাল ঘুম হয় না- ছট ফট করে। প্রায়ই দেখা যায় অন্ধকার ঘরে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করছে। রাতের বেলা তার চা খাওয়ার সঙ্গী নিশানাথ বাবু। দুজনে চুক চুক করে অন্ধকারে চা খায়—আবার ঝগড়াও করে।

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি পড়াশুনা করতে। কিন্তু কিছুতেই মন বসে না। ক্লাসে বড্ড ঘুম পায়। প্রফেসররা একঘেয়ে সুরে কি বলেন তাঁরাই জানেন। একেক সময় এমন নির্বোধ মনে হয় তাদের। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই চলে যাই সদরঘাট। লঞ্চ টার্মিনালের কাছে সফিক লালুকে নিয়ে কাটা কাপড় বিক্রি করে। জায়গাটা নাকি ভাল। ঘরে ফেরা মানুষেরা বেশি দরদাম করে না। ঝটপট কিনে ফেলে। আমাকে দেখলেই সফিক বিরক্ত হয়। গম্ভীর হয়ে বলে, 'ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আসলি? মুশিবত দেখি।' ক্লাসে যেতে সত্যি আমার ভাল লাগে না। কলেজের ছেলেগুলিকে আপন মনে হয় না কখনো। অনেক বেশি ভাল লাগে পান্থ নিবাসের লোকজনদের। এদের সাথে আমার পরিচয় অল্পদিনের-তবু মনে হয় যেন কত কালের চেনা। সিরাজ সাহেবের কথাই ধরা যাক। বয়সে আমার চেয়ে দশ বারো বৎসরের বড়। কিন্তু আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলেন, যেন আমি তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু। পঁয়ত্রিশের মত বয়স হয়েছে। বিয়ে করেছেন মাত্র গত বৎসর। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই লাজুক ভঙ্গিতে বলেন,

শুধু পয়সার অভাবে দেরি করলাম। কিন্তু বড় বেশি দেরি করে ফেলেছি। বউটার বয়স অল্প রে ভাই। মনে মনে বোধহয় কষ্ট পায়—বুড়ো হাসবেন্ড।

সিরাজ সাহেব প্রতি শনিবারে দেশে যান। সোমবার সকালে এসে অফিস ধরেন। শুক্রবার বিকালে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে হয় আমাকে। খুটিনাটি কত কি যে দরদাম করেন। মুখে কপট বিরক্তির রেখা।

বুঝলেন ভাই বিয়ে করার যন্ত্রণা! বাজারে ঘুরতে ভাল লাগে বলেন দেখি? গতবার যে নিয়ে গেলাম লাল ফিতা? পছন্দ হয় নাই। রঙটা নাকি কটা। মেয়েদের মনের ঠিক পাওয়া মুশকিল রে ভাই।

সিরাজ সাহেবের বৌটির আবার গল্পের বই পড়ার নেশা। মাঝে মাঝেই বই নিয়ে যাওয়ার ফরমাশ থাকে। বইয়ের দোকান ঘুরতে ঘুরতে ঘাম বেরিয়ে যায় আমার, বই আর সিরাজ সাহেবের পছন্দ হয় না। যে বই দেখানো হয়, সিরাজ সাহেব ঘাড় নাড়েন, — 'উঁহু' মলাটে এটা পাখির ছবি নাকি? এই বই ভাল হবে কী করে ভাই? একটা ট্র্যাজিক বই দেখান না।'

এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস কেনার কথা মনে হয় সিরাজ সাহেবের। একবার কিনবেন সন্দেশ তৈরির ছাঁচ। সদরঘাট আর নিউ মার্কেট চষে ফেললাম দুজনে— কোথাও পাওয়া যায় না। সিরাজ সাহেবের মুখ শুকিয়ে পাংশু।

খুব করে বলে দিয়েছে নিতে। সখ হয়েছে একটা, ছেলেমানুষ তো। শেষ পর্যন্ত চক বাজারে পাওয়া গেল। সিরাজ সাহেবের গাল ভর্তি হাসি, যেন গুপ্তধন পেয়েছেন।

রাতে টিউশনি থেকে ফিরার পর সিরাজ সাহেব একবার আসবেনই আমার ঘরে। হাসি মুখে বলবেন, 'বারান্দায় হাওয়ার মধ্যে খানিকক্ষণ বসবেন নাকি রঞ্জু ভাই? পড়াশুনার ক্ষতি হলে থাক।'

আমি রোজই গিয়ে বসি। এ-কথা সে-কথার পর সিরাজ সাহেব এক সময় বৌয়ের কথা এনে ফেলেন।

কোয়ার্টার পেলে নিয়ে আসতে হবে। ছেলেমানুষ একা একা থাকতে পারে বলেন দেখি? তার ওপর তার আবার ভূতের ভয়।

শিগগিরই পাবেন কোয়ার্টার?

অফির্সাস গ্রেডে গেলেই পাব। সুন্দর কোয়ার্টার। বেড রুম দুইটা। বারান্দা আছে। ফুলের টব রাখা যায়। আপনার ভাবীর আবার গাছের সখ।

তাই নাকি?

আর বলেন কেন! গাছের নামে অজ্ঞান। এইবার হুকুম হয়েছে রজনীগন্ধার চারা নিতে হবে। বিয়ে করার যে কি ঝামেলা, বিয়ে না করলে বুঝবেন না।

সিরাজ সাহেব কপট বিরক্তিতে মুখ অন্ধকার করতে চেষ্টা করেন। বারান্দার আবছায়া অন্ধকারেও কিন্তু তাঁর হাসিমুখ ঢাকা পড়ে না। বড় ভাল লাগে আমার।

একবার ভাবীকে দেখতে যাব আমি আপনার সঙ্গে।

অবশ্যই অবশ্যই। এই শনিবারেই চলেন। কী যে খুশি হবে। না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। ওর কাছে আপন পর কিছু নাই— সবাই আপন। যেতে হবে কিন্তু ভাই, ছাড়ব না আমি।

শনিবারে কিন্তু সিরাজ সাহেব যেতে পারলেন না। অফিসের কাজ পড়ে গেল হঠাৎ করে। মুখ কালো করে ঘুরতে লাগলেন। রাতে খেতে পারলেন না। মোটেই নাকি ক্ষিধে নেই। রোববার ভোরে দেখি তার চোখ বসে গেছে। দিশেহারা ভাব। সারারাত নাকি ঘুম হয়নি। খুব আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছেন,

দেখেছেন যেন একটা মস্ত বড় সাপ রেখাকে ছোবল দিচ্ছে। মনটা বড় অস্থির ভাই। চলেন দেখি নিশানাথের কাছে যাই।

নিশানাথ গম্ভীর মুখে শুনলেন সব কিছু। তাঁর ভাব দেখে মনে ভরসা পাওয়া যায় না। কিন্তু কথা বললেন খুব নরম গলায়,

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন তো— তাই এই সব দেখেছেন। এই সব কিছু না। শনিবার তো এলো বলে। বড় সাহেবকে বলে এই বার একদিন বেশি থেকে আসবেন।

কিন্তু পরের শনিবারে সিরাজ সাহেবকে অফিসের কাজে খুলনা চলে যেতে হল। সোমবার সন্ধ্যায় ফিরলেন। আমরা সিরাজ সাহেবের দিকে তাকাতে পারি না। নবী সাহেবের মত মানুষ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন,

দেশে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। চিন্তা করবে তো।

সিরাজ সাহেব দার্শনিকের মত মুখ করে বললেন,

টেলিগ্রাম আর করে কি হবে?

পান্থ নিবাসের জীবনযাত্রা খুব একঘেয়ে বলেই বোধ হয়। সোমবার ভোরে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সবাই অবাক হয়ে দেখলাম রিকশা থেকে একটি ফুট ফুটে মেয়ে নামছে। এমন মায়া কাড়া চেহারা। হলুদ রঙের একটি শাড়িতে দারুণ মানিয়েছে। যদিও কেউ আমাকে কিছু

বলেনি তবু বুঝলাম এই মেয়েটিই সিরাজ সাহেবের বৌ। একটা হুলস্থুল পড়ে গেল আমাদের মধ্যে। নিশানাথ জ্যোতির্ষাণব সিরাজ সাহেবকে ভাই বলে ডাকেন। তিনি অবলীলায় বলতে লাগলেন,

এসো মা এসো। আসবে সিরাজ। যাবে কোথায়? অফিসের কাজে আটকা পড়ায় যেতে পারেনি। আজও সকাল সকাল চলে গেছে। এক্ষুণি আনতে লোক যাবে।

সিরাজ সাহেবের বৌটি অল্প সময়ের মধ্যে সহজ হয়ে গেল। নিশানাথ বাবু এবং নবী সাহেব দুজনকেই সে এমন সুরে চাচাজান ডাকতে লাগল যেন বহু দিন পর হারানো চাচা ফিরে পেয়েছে। নবী সাহেব দু'বার রান্নাঘরে গিয়ে তদারক করলেন নাস্তা পানি কি দেয়া হবে। সফিক চলে গেল সিরাজ সাহেবের অফিসে। করিম সাহেব গম্ভীর হয়ে ঘোষণা করলেন, আজ আর তিনি অফিসে যাবেন না। দুপুরের খাবারটা যেন ভাল হয় সেটা দেখাশোনা করা দরকার। কাদেরের ওপর ভরসা করা যায় না। মেয়েটি মনে হল অভিভূত হয়ে পড়েছে। সে কখনো ভাবেনি এমন একটা সমাদর তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সবার সঙ্গে সে এমন ভাব করতে লাগল যেন সেই পান্থ নিবাসে দীর্ঘদিন ধরে আছে। এখানকার সবাই তার চেনা।

সফিক সিরাজ সাহেবকে সঙ্গে করে এগারোটার দিকে এল। সিরাজ সাহেবকে কিছুই বলেনি সে। সিরাজ সাহেবের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তিনি কাঁপা গলায় বললেন,

আমার নাকি দুঃসংবাদ আছে?

জ্যোতির্ষাণবের দাড়ির ফাঁকে হাসি খেলে গেল। তিনিও যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় বললেন,

যান দেখি সাহেব আমার ঘরে। দুঃসংবাদ তো আছেই। ঘরে গিয়ে বসেন ঠাণ্ডা হয়ে বলছি।

সিরাজ সাহেব ঘরে ঢুকতেই ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে ফেলা হল। জ্যোতির্ষাণবের হাতে তালা মজুদ ছিল। তালা লাগিয়ে দেয়া হল দরজায়। আমাদের সমবেত হাসির শব্দে রাস্তায় লোক জমে গেল।

রাতের বেলা খেতে গিয়ে দেখি ফিস্টের ব্যবস্থা। এ মাসের বাজারের ভার আজীজ সাহেবের হাতে। তিনি কাউকে না জানিয়ে ফিস্টের ব্যবস্থা করেছেন। বাকি মাস সাবধানে বাজার করে তিনি নাকি সব পুষিয়ে নেবেন।

পান্থ নিবাসে নিজেদের দুঃখ কষ্ট আমরা ভুলে থাকার চেষ্টা করি। তবু এককে বার মন ভেঙে যেতে চায়। বাড়ির চিঠি পড়ে আমার আজ বড় কষ্ট হচ্ছে। হাতে একেবারেই টাকা-পয়সা নেই। থাকলে আজ রাতেই বাড়ি চলে যেতাম। প্রাইভেট মাস্টারিটা ভাল লাগছে না। ভদ্রলোক কিছুতেই টাকা দিতে চান না। বেতন দেবার সময় হলেই অম্লান বদনে বলেন,

এই মাসে একটা ঝামেলা আছে—সামনের মাসে নেন।

পরের মাসেও তাঁর হাতে টাকা থাকে না। অল্প কিছু দিয়ে বলে,

বাঁকি টাকাটা দিন সাতেক পরে চেয়ে নেবেন।

দিন সাতেক পর টাকা চাইলে মহা বিরক্ত হয়ে বলেন,

মাসের মাঝখানে আমি টাকা পাই কোথায় বলেন দেখি? বিচার বিবেচনা তো কিছু আপনার থাকা দরকার।

পড়াবার সময় কাছে বসে থাকেন। বাচ্চা দুটি এক সময় ঘুমে ঢুলতে থাকে। আমি উঠতে চাইলেই গম্ভীর হয়ে বলেন,

এখনই উঠবেন কি দশটা তো বাজে নাই! হাতের লেখাটা আর একবার লেখান।

বাচ্চাদের উঠিয়ে নিয়ে চোখে পানির ঝাপ্টা দিয়ে আবার এনে বসান। মেয়েটি করুণ চোখে তাকায় আমার দিকে। বড় মায়া লাগে।

সফিকের সঙ্গে কথা বলে মাস্টারিটা ছেড়ে দিতে হবে। ওর সঙ্গে দিনের বেলা কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে রাতে নাইট কলেজে পড়ব। সফিকের যদি লজ্জা না লাগে আমার লাগবে কেন? বাড়িতে সাহায্য করতে হবে।

আজ আর পড়াতে না গিয়ে সফিকের জন্য বারান্দায় মোড়া পেতে বসে রইলাম। করিম সাহেব আজও গায়ে তেল মেখে বারান্দায় মাদুরের উপর শুয়ে আছেন। আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন,

নিশানাথের মাথায় এক বালতি ঠাণ্ডা পানি ঢাললে দেখবেন, মৌনব্রত কোথায় গেছে। ফর ফর

করে কথা বলবে বুঝলেন, এসব ধান্ধাবাজি আমার কাছে বলবে না।
আমি চুপ করে রইলাম। করিম সাহেব বললেন,
আরে ভাই লোক চরিয়ে খাই, আমার সঙ্গে চালাকি? মৌনব্রতের পাছায় লাথি।

সফিক ফিরল অনেক রাতে। চোখে-মুখে দিশেহারা ভাব। গায়ে আকাশ পাতাল জ্বর। জ্যোতির্ষাণব তার গায়ে হাত দিয়েই মৌনব্রত ভেঙে ফেললেন, চেঁচিয়ে বললেন,
পানি ঢালতে হবে মাথায়। আর ডাক্তার লাগবে একজন।
সফিক চিঁচিঁ করে বলল,
ডাক্তার দেখিয়েই এসেছি। প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছে, টাকা থাকলে ওষুধ আনান। আমার কাছে নাই কিছু।
জ্বর বাড়তেই থাকল। সফিক আরক্ত চোখে নিশানাথের দিকে তাকিয়ে বলল,
আয়ু রেখাটা দেখেন দেখি ভাল করে। এত সকাল সকাল মরলে হবে না। কাজ অনেক বাকি আছে।
নবী সাহেব, আজীজ সাহেব, করিম সাহেব সবাই এসে ভীড় করে দাঁড়াল। আমি জ্বরের গতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।
কিন্তু আশ্চর্য শেষ রাতের দিকে ঘাম দিয়েই জ্বর ছেড়ে গেল। সফিক ভাল মানুষের মত উঠে বসে বলল,
ক্ষিধে লেগেছে, কি খাওয়া যায় বলেন দেখি নিশানাথ বাবু।
নিশানাথ জ্যোতির্ষাণব আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন,
বড্ড ঝামেলা হয়ে গেছে রঞ্জু। ভয়ের চোটে মানত করে ফেলেছিলাম। আজ রাতে জ্বর কমলে কাল দুপুরেই কাঙালী ভোজন করাব। হাতে পয়সা-কড়ি মোটেই নাই। এদিকে জ্বর তো দেখি কমেই গেছে। তারা মা ব্রহ্মময়ী একি বিপদে ফেললে আমাকে!

## চার

শীতের শুরুতে বাবা এসে হাজির।
খোঁচা খোঁচা দাড়ি সারা মুখে। গায়ে একটা ময়লা কোট। স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। চেনা যায় না এমন।
মায়ের চিঠিতে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা যে এতটা কল্পনাও করিনি। নিচের পাটির একটি দাঁত পড়ে গিয়ে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে!
ও রঞ্জু কেমন আছিস তুই? কতদিন পর দেখলাম।
আমি অনেকক্ষণ কোন কথাই বলতে পারলাম না। বার বার মনে হল বাবার মাথার দোষটা হয়তো সেরে গেছে। না সারলে এত দূরে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এলেন কী করে? তবু সন্দেহ যায় না। বার বার জিজ্ঞেস করি,
মাকে বলে এসেছেন তো বাবা? না বলে আসিনি তো?
বাবা পরিষ্কার কোন উত্তর দেন না। একবার বলেন,
হ্যাঁ বলেছি তো। আবার বলেন.
বলব কি করে? তোর মা কথা বলে না আমার সঙ্গে। ভাত খাওয়ার সময় আমি সামনে থাকলেও বলে, পারুল তোর বাবাকে খেতে বল।
আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাবাকে লক্ষ্য করি। কথাবার্তা বেশ স্বাভাবিক। আমার পরীক্ষা কবে, পড়াশুনা কি রকম করছি, এইসব খুব আগ্রহ করে জিজ্ঞেস করলেন।
রাতে হোটেলে ভাত খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। সারাপথ গল্প করতে করতে চললেন। এখন আর গল্পের ধরন সে রকম স্বাভাবিক মনে হল না। যেন নিজের মনেই কথা বলছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম,
বাড়ির সবাই ভাল আছেন বাবা?
বাবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন,
হ্যাঁ সবাই ভাল। স্টেশন মাস্টারের ছোট ছেলেটার হুপিং কফ হয়েছে।

পারুল, পারুল কেমন আছে? তাঁর পরীক্ষা কবে?

জানি না তো। ভাল আছে নিশ্চয়ই।

আমি অবাক হয়ে বলি,

পারুল কেমন আছে জানেন না বাবা? কী বলছেন এসব?

কী করে জানব, বোকার মত কথা বলিস? পারুলের বিয়ে হয়ে গেছে না?

আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকি। এসব কী শুনছি?

কী বলছেন আপনি? কিসের বিয়ে?

গত শুক্রবার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। তোর মার এমন ভ্যাজর ভ্যাজর— পুলিশে খবর দাও, পুলিশে খবর দাও। মেয়েছেলেদের বুদ্ধি তো।

আমি বেশ খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। ভাবতেও পারছিলাম না তারা আমাকে একটা খবর জানানোর প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করল না।

ছেলেটা ভাল। বেশ ভাল। পারুলকে নেত্রকোনায় নিয়ে গেছে। আমি ওদের কেন সঙ্গে গৌরীপুর পর্যন্ত গেলাম। আমার টিকিট লাগে না। ট্রেনের চেকাররা সবাই আমাকে চিনে। খুব খাতির করে।

বাবার কথাবার্তা শুনে চোখে পানি এসে গেল আমার। পারুলের মত মেয়ে এই করবে? পনের বছর যার বয়স! 'খবর দিলেন না কেন বাবা?

একটা টেলিগ্রাম তো করতে পারতেন। বাবা শান্ত স্বরে বললেন,

তোর মা বলল, টেলিগ্রাম করলে শুধু শুধু দুঃশ্চিন্তা হবে। আমি চিঠি লিখব। মেয়ে মানুষের এরচে বেশি বুদ্ধি কী হবে? হলে তো আর মেয়েছেলে থাকত না। পুরুষই হয়ে যেত।

মায়ের চিঠি পৌঁছবার আগেই পারুলের চিঠি এল। নেত্রকোনা থেকে লিখেছে। লম্বা চিঠি। কিন্তু কোথাও নিজের বিয়ের কথা কিছু নেই। একবারও লিখেনি যে সে একটা ভুল করে ফেলেছে। তার দীর্ঘ চিঠির মূল বক্তব্য হচ্ছে, বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ। মামারা টাকা পয়সা দেয়া বন্ধ করেছেন। আমি যেন যে ভাবেই হোক প্রতি মাসে মাকে টাকা পাঠাই। প্রয়োজন হলে কলেজ ছেড়ে দিয়েও যেন একটা চাকরি জোগাড় করি। বড় ডাক্তার দেখিয়ে যেন অতি অবশ্যি বাবার ভাল চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লেখা,

'দাদা দেখবে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আজকে আমার ওপর রাগ হলেও— সেদিন আর রাগ থাকবে না।'

মায়ের চিঠিটি পাঁচ পাতার। ব্যাপারটি কি ভাবে ঘটল তা নিখুঁতভাবে লেখা। বৃহস্পতিবার সারাদিন পারুল নাকি শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে। মাকে বলেছে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। শুক্রবার সকালে পরিষ্কার দেখে একটা শাড়ি পরে অঞ্জুকে পুকুর ঘাটে নিয়ে একটি টাকা দিয়ে বলেছে ইচ্ছেমত খরচ করতে। মা একবার খুব ধমক দিলেন। পরিষ্কার শাড়িটা নষ্ট করছে সেই জন্যে। পারুল কিছু বলে নাই। দুপুরে খাওয়ার পর মাকে গিয়ে বলেছে, 'মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে বড্ড মাথা ধরেছে। মা ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন। তারপর বিকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন পারুল ঘরে নেই।...'

সফিক সব কিছু শুনে বলল,

তোর বোনটার তাহলে বুদ্ধি আছে দেখি?

বুদ্ধির কী আছে এর মধ্যে?

বিয়ে করে নিজে বেঁচেছে তোদেরও রিলিফ দিয়েছে।

পরক্ষণেই সে পারুল প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বললো, প্রতি মাসে তোর মাকে টাকা পাঠাতে হবে। এইটি খুবই জরুরি। আমি অবাক হয়ে বললাম, কোথেকে পাঠাব? টাকা কোথায়?

সবাই মিলে একটা চায়ের স্টল দিয়ে ফেলি আয়। খোঁজ নিয়েছি ভাল লাভ হবে। ম্যানেজার করে দেব নিশানাথকে। নিশানাথের দাড়ি গোঁফ দেখেই দেখবি হুড় হুড় করে কাস্টমার আসবে। চা বানিয়ে কূল পাওয়া যাবে না।

বলে কী সফিক! নিশানাথ জ্যোতির্ষাণব চায়ের দোকান দেবে? সফিককে দেখে মনে হল তার মাথার প্ল্যান খুব পাকা।

কাটা কাপড়ের ব্যবসাটা মাঠে মারা গেছে। ভাত খাওয়ার পয়সা নাই লোকে কাপড় কিনবে কী?

আমি বললাম,

জ্যোতির্ষাণব বুঝি চায়ের দোকান খুলবে তোর সাথে?

না খুলে যাবে কোথায়? একটা লোক আসে না তার কাছে। ব্যাটার এখন ধূপ কেনার পয়সা নাই।

সফিক ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। যেন খুব একটা হাসির ব্যাপার হয়ে গেছে।

জ্যোতির্ষাণবের এমন দুর্দিন যায়নি কখনো। সঞ্চয় যা ছিল উড়ে গেছে। সখের টেবিল ফ্যানটি বিক্রি করেছেন করিম সাহেবের কাছে। আমাকে গম্ভীর হয়ে বললেন,

সাধু সন্ন্যাসী মানুষদের জন্যে এই সব কিছু দরকার নাই। আমাদের কাছে হিমালয়ের গুহাও যা আবার সাহারা মরুভূমিও তা, ফ্যানের কোন প্রয়োজন নাই।

মিল চার্জ বাকি পড়ায় গত শনিবার থেকে খাওয়া বন্ধ। পরশু দুপুবে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি একটা শুকনো পাউরুটি চিবোচ্ছেন। আমাকে দেখে দারুণ লজ্জা পেয়ে গেলেন। কান টান লাল করে বললেন,

আমিষ বর্জন করলাম রঞ্জু। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মত গূঢ় বিদ্যার চর্চা করলে মাছ মাংস সমস্ত বর্জন করতে হয়। আমার ঠাকুর দা শ্রী শ্রী তারানাথত চক্রবর্তী সমস্ত দিনে এক মুঠি আলো চালের ভাত আর একবাটি দুধ খেতেন। কি বিশ্বাস হয়? আমিষ একবার বর্জন করে দেখ শরীর ঝর ঝরে হয়ে যাবে।

রশীদ মিয়া উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে। নিশানাথ বাবুর নাকি তিন মাসের সিট রেন্ট বাকি। জ্যোতির্ষাণব শুনলাম অতি গম্ভীর ভঙ্গিতে বলছেন,

আর একটি মাস রশীদ মিয়া। এর মধ্যেই আমার মঙ্গল হোরায় প্রবেশ করবে। রবির ক্ষেত্র আবার...

আরে রাখেন সাহেব মঙ্গল আর রবি। পনেরো দিন সময়। এর মধ্যে পারেন দিবেন না পারেন বিসমিল্লাহ্ বিদায়। তিন মাসের সিট রেন্ট আপনার দেওয়া লাগবে না।

জ্যোতির্ষাণবের এমন খারাপ সময় যাবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। তাঁকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা যাবে না। দান এবং ঋণ গ্রহণ, এই দুই জিনিস নাকি তাঁর জন্যে নিষিদ্ধ। সফিক সবার সঙ্গে পরামর্শ করে 'বাংলা দৈনিক' সব কটিতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিল। একদিন পর পর সে বিজ্ঞাপন ছাপা হল এক সপ্তাহ্ পর্যন্ত।

> 'পাক ভারত উপমহাদেশেব প্রখ্যাত জ্যোতিষ—
> শ্রী নিশানাথ চক্রবর্তী, জ্যোতির্ষাণব। এম. এ. (ফলিত
> গণিত) বহু রাজা মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। আসুন
> পরীক্ষা করুন। দশর্নী নামমাত্র।'

নিশানাথ বাবু বিজ্ঞাপন দেখে খুবই রেগে গেলেন। সফিককে গিয়ে বললেন, 'এম. এ. (ফলিত গণিত) এটা কোথায় পেলে? মিথ্যাচার করা হল। উফ কী তঞ্চকতা।' সফিক বলল,

সবটাই তো তঞ্চকতা নিশানাথ বাবু। সবটাই যখন মিথ্যার ওপর কাজেই মিথ্যাটাকে আরেকটু বাড়ানো হল।

হাজার বৎসরের পণ্ডিতের সাধনালব্ধ জ্ঞান সবই মিথ্যা?

নিতান্ত মূঢ়ের মত কথাবার্তা। জ্ঞানহীন্ মূর্খের বাচালতা।

"হিম কুন্দ মৃণালাভং দেত্যাং পরং গুরু, সর্ব্ব শাস্ত্র প্রবক্তা ভার্গবং।"

অং বং করে লাভ কিছু নাই নিশানাথ বাবু। এসব এখন ছাড়ার সময় এসে পড়েছে।

এত করেও নিশানাথ বাবুর অবস্থা ফেরানো গেল না। ঢাকা শহরের সব লোক হঠাৎ হাত দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে কী না কে জানে। এমন খারাপ অবস্থা হবে জ্যোতির্ষাণবের স্বপ্নেও ভাবিনি। একদিন অনেক ভনিতা করে সফিককে বললেন,

আমার একটা ভাল ঘড়ি আছে। এক ভক্ত দিয়েছিল। শুধু শুধু পড়ে আছে কোন কাজে লাগে না।

কাজে লাগে না কেন?

এই সব কলকব্জার ঘড়িতে কী আমাদের হয়? আমাদের দরকার বালি ঘড়ি কিংবা সূর্য ঘড়ি।

সেই সব ঘড়িতে পল অনুপল এই সব হিসাবও সূক্ষ্ম ভাবে করা যায়। পল বুঝ তো? পল হচ্ছে এক দণ্ডের ষাট ভাগের এক ভাগ।

সফিক নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। জ্যোতির্ষাণব হাসি মুখে বলে চলেন— তাই ভাবলাম কাজে যখন লাগে না তখন আর ঘড়ি রেখে লাভ কী? রোজ চাবি দেয়া যন্ত্রণার এক শেষ। সফিক তুমি ঘড়িটা নিয়ে বিক্রি করে ফেল। সফিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

বিক্রি করে ফেলব?

হ্যাঁ। সাধু সন্ন্যাসী মানুষ আমি, এই সব বিলাস সামগ্রী দুই চোখে দেখতে পারি না। তান্ত্রিক সাধনাতে মোহ মুক্তির প্রয়োজন সবচে বেশি। তোমরা এই সব বুঝবে না। বিষয়ী লোকদের বোঝা খুব মুশকিল।

জ্যোতির্ষাণব পকেট থেকে ভেলভেটের বাক্সে সযত্নে রাখা হাত ঘড়িটি বের করে টেবিলে রেখেই দ্রুত চলে গেলেন। বেশ ভাল ঘড়ি সেটি। সফিক ঘড়ির বাক্স হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল,

ব্যাটার তো খুবই খারাপ অবস্থা রঞ্জু। ঘড়িটা তাঁর খুব সখের। সফিক চিন্তিত মুখে ঘড়ি হাতে বেরিয়ে গেল।

জ্যোতির্ষাণবের ভাগ্য বদলাল দুপুরের একটু পর। সম্ভবত মঙ্গল হোরায় প্রবেশ করেছে, রবির ক্ষেত্র আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম প্রকাণ্ড একটি সাদা রঙের গাড়ি এসে থামল পান্থ নিবাসের সামনে। গাঢ় নীল রঙ্গের শাড়ি পরা একটি মেয়ে সেই গাড়ি থেকে নেমে সোজা উঠে এসেছে পান্থ নিবাসের দোতলায়। সাধুজী নিশানাথ জ্যোতির্ষাণবের খোঁজ করছে সেই মেয়ে। আমাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। রশীদ মিয়া পর্যন্ত একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল। অনেকদিন পর জ্যোতির্ষাণবের ভারী গলা পাওয়া গেল,

অতি সুলক্ষণা মেয়ে মা তুমি, অতি সুলক্ষণা। চন্দ্র ও রবির মিলিত প্রভাব, কেতুর মঙ্গলে অবস্থান। এরকম হয় না, খুব কম দেখা যায়। হুঁ হুঁ। বিদ্যা ও ধন। লক্ষ্মী-স্বরস্বতী এক মালায় গাঁথা। বড় ভাগ্যবতী তুমি।

যাবার সময় সেই মেয়ে একশ টাকার দুটি নোট দিয়ে জ্যোতির্ষাণবের কণ্ঠরোধ করে দিল। নিশানাথ বাবু দু'মাসের সিট রেন্ট মিটিয়ে দিলেন। সন্ধ্যাবেলা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ধূপ কিনে আনলেন। অনেক দিন পর তাঁর ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বললো, ধূপ পুড়তে লাগল। করিম সাহেব একবার অবাক হয়ে বললেন,

এককথায় দুশো টাকা দিয়ে দিল। পাগল নাকি মেয়েটা?

নিশানাথ গম্ভীর হয়ে বললেন,

দুশো টাকা খুব বেশি লাগল আপনার কাছে? হাজার টাকা নিয়েও মানুষ একদিন আমাদের সাধা সাধি করেছে। টাকা অতি তুচ্ছ জিনিস মশাই আমাদের কাছে।

অনেক দিন পর জ্যোতির্ষাণব মেসের এক তলায় সবার সঙ্গে খেতে গেলেন। মাছের তরকারীতে নুন কম হয়েছে কেন তাই নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু করলেন কাদেরের সঙ্গে।

সফিক সন্ধ্যাবেলা এসে জিজ্ঞেস করল, আভাকে আসতে বলেছিলাম— এসেছিল? আমি অবাক হয়ে বললাম,

আভা কে?

ঐ যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম, চাকরি দিয়েছিল আমাকে। আসে নাই?

এসেছিল।

বলেছিলাম আজকেই আসতে। টাকা পয়সা কত দিয়েছে জানিস নাকি? একশো টাকা দিতে বলেছিলাম।

দুশো টাকা দিয়েছে।

মেয়েটার নজর খুব উঁচু। সাধু ব্যাটা কিছু বুঝতে পারে নাই নিশ্চয়ই।

আমি কিছু বললাম না। সফিক হাসি মুখে বলল,

যাক ঘড়িটি বিক্রি করতে হয় নাই। নিশানাথের খুব সখের ঘড়ি।

সফিক ঘড়ি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বাঁধিয়ে বসল। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া। নিশানাথ বাবু সফিককে হাসতে হাসতে বলছেন, 'আমার কেতু এবং মঙ্গলের যে দোষটা ছিল সেটা কেটে গেছে সফিক। হুড় হুড় করে টাকা আসা শুরু হয়েছে। তোমার দরকার হলে বলবে লজ্জার

কিছু নাই।'

সফিক বলেছে,

এইসব ধান্ধাবাজী এখন ছাড়েন নিশানাথ বাবু। অনেক তো করলেন।

নিশানাথ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন,

পুত্রবৎ জ্ঞান করি তোমাকে আর তোমার মুখে এত বড় কথা। রাগের মাথায় ব্রহ্মশাপ দিয়ে ফেলব সফিক।

এ আমার দুর্বাশা মুণি! ব্রহ্মশাপ দেবেন।

খবরদার বলছি। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে।

হাতাহাতি হয়ে যাবার মত অবস্থা।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনি চুক চুক শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারে বসে তিনমূর্তি চা খাচ্ছে। সফিক, জ্যোতির্ষাণব আর আমার বাবা। ফিসফিস করে তাদের কি সব কথাবার্তাও হচ্ছে। বাবা এখানেই আছেন, কিছুতেই ফিরে যেতে চাচ্ছেন না। রাত্রে জ্যোতির্ষাণবের ঘরে গিয়ে ঘুমান। দিনের বেলাটা কাটান সফিকের ঘরে। আমি দেশে ফেরানোর কথা বলে বলে হার মেনেছি। সফিক অবিশ্য বলছে, 'থাকুক না তিনি। মেডিকেলে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাটা করি আগে।'

মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা অনেক কথাবার্তা বলেও কোনো অসুখ-বিসুখ ধরতে পারলেন না। রাগী চেহারার একজন বুড়ো মত ডাক্তার শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন,

অসুবিধাটা কি আপনার বুঝতে পারছিনা তো।

বাবা বললেন, 'অসুবিধা তো কিছু নাই ডাক্তার সাহেব।'

রাত্রে ঘুম হয়?

ঘুম হবে না কেন?

বাবা মহাসুখেই আছেন। পান্থ নিবাসের সবার সঙ্গেই তাঁর খাতির। আজীজ সাহেব সকাল বেলা ব্যায়াম করেন। তিনি বসে থাকেন পাশে। আমাকে প্রায়ই বলেন,

রঞ্জু স্বাস্থ্য হচ্ছে সমস্ত সুখের মূল। স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখা দরকার। তুই বেলের শরবত খাবি। খুব উপকারী। আজীজ বলেছে আমাকে।

বাবার সবচেয়ে বেশি খাতির সিরাজ সাহেবের সঙ্গে। সিরাজ সাহেব কোনো এক বিচিত্র কারণে বাবাকে পছন্দ করেন। অফিস থেকে এসেই তিনি বাবাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে যাবেন। তারপর দরজা বন্ধ করে গুজ গুজ করে আলাপ। এক শনিবারে বাবা সিরাজ সাহেবের সঙ্গে তাঁর গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। আমি কিছু বললাম না। পরের শনিবারে দেখি আবার যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। বাবা শান্ত স্বরে বললেন,

আমার জন্যে বৌটা কৈ মাছ জোগাড় করে রাখবে বলেছে-- না গেলে কেমন করে হয়?

কৈ মাছ খাওয়ার জন্য এত দূর যাবেন?

নারিকেলের চিড়া করে রাখবে। এখন না যাই কী করে?

এইবার ফিরে এসে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যেন অত্যন্ত রহস্যময় একটি ব্যাপার তিনি জেনে ফেলেছেন। ব্যাপারটি দু'দিন পর আমরাও জানলাম। রাতের খাওয়ার পর বাবা আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ের ছবি সফিকের টেবিলের উপর রেখে গম্ভীর হয়ে সফিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সফিক অবাক হয়ে বললো,

এ ছবি কার? আর এই মেয়েটিই বা কে?

বাবা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,

রেবার ছবি।

রেবা? রেবা কে?

যেই হোক তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

সফিক এবং আমি দুজনেই মুখ চাওয়া চাওয়ি করি। বাবা নিজেই খোলসা করেন,

রেবা হচ্ছে সিরাজ সাহেবের বোন। ওর সঙ্গেই তোমার বিয়ে ঠিক করে এসেছি। পাকা কথা দিয়ে ফেলেছি।

সফিকের চেয়ে বেশি হকচকিয়ে যাই আমি। বাবার যে কি সব লোক হাসানো কাণ্ড কারখানা।

সফিক কিন্তু সহজ ভাবেই বলে,

পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন চাচা?

হ্যাঁ তা বলতে গেলে দিয়েই ফেলেছি। তোমার বাবা বেঁচে নাই। আমাকেই তো দেখতে হবে সব। ঠিক কিনা তুমিই বল?

তা ঠিক।

বাবা মহা উৎসাহী হয়ে ওঠেন। হাসি হাসি মুখ। তোমাকেও ওদের খুব পছন্দ। সিরাজের বৌ এখানে এসে দেখে গেছে তোমাকে। বড় ভাল মেয়ে বড় ভাল। সফিক চুপ করে থাকে। বাবা উৎসাহ এবং উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকেন।

তোমাদের বিয়ের পর আমি কিন্তু তোমাদের বাসাতেই থাকব। রেবাকেও বললাম এই কথা।

সফিক আঁতকে উঠে বলে, 'তাকেও বলেছেন এই কথা?'

বলব না কেন? সংসারের মাথা তো মেয়েরাই হয়। হয় না?

তা হয়।

আমার ধারণা ছিল সফিক রেগেমেগে একটা কাণ্ড করবে। বাবাকে নিয়ে আমি মহা লজ্জায় পড়ব। সে রকম কিছু হল না। সে যেন লজ্জায় পড়েই উঠে গেল সামনে থেকে।

আমি পরের সপ্তাহেই বাবাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসলাম। ঢাকায় রেখে চিকিৎসাও কিছু হচ্ছে না। শুধু শুধু টাকা নষ্ট। মা একটির পর একটি উদ্বিগ্ন চিঠি পাঠাচ্ছেন। ট্রেন ছাড়বার আগে আগে দেখি সিরাজ সাহেব আজীজ সাহেব আর আমাদের জ্যোতির্ষাণব এসে হাজির। তারা বিদায় জানাতে এসেছেন। আজীজ সাহেবের হাতে আবার প্রকাণ্ড একটা খাবারের ঠোঙ্গা। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ছেলে মানুষের মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কী যে অস্বস্তিকব অবস্থা।

## পাঁচ

মা'র নামে একশ টাকা মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিলাম। আমার আর্থিক টানাটানি কিছু দূর হয়েছে। কলেজে বেতন মাফ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা একটা ভাল টিউশনি জোগাড় হয়েছে। ক্লাস নাইনের একটি মেয়েকে সপ্তাহে চার দিন পড়াই। মেয়েটি খুবই শান্ত স্বভাবের। বড়ই লাজুক। সারাক্ষণ মুখ নিচু করে পড়ে। যদি কিছু জিজ্ঞেস করি বইয়ের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়। মুখ তুলে তাকায় না। পড়ানো শেষ করে যখন যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াই তখন লাজুক মুখে বলে, 'স্যার একটু বসেন।'

মেয়েটি দ্রুত চলে যায় ভেতরে। ফিরে আসে বরফ দেয়া এক গ্লাস পানি এবং ঝক ঝকে একটি কাচের বাটিতে কিছু খাবার নিয়ে। বিকালে আমার কিছুই খাওয়া হয় না। ক্ষিধায় নাড়ি মোচড় দিতে থাকে। লোভীর মত খাবারটা খাই। মেয়েটা নরম গলায় বলে, 'স্যার আরো খানিকটা আনি?' আমার লজ্জা লাগে তবু অপেক্ষা করি খাবারের জন্যে। মাসের এক তারিখে মেয়েটি অতি সংকোচে টাকা দেয় আমার হাতে। যেন স্যারকে টাকা দেয়াটা একটা লজ্জার ব্যাপার। এত ভাল লাগে আমার। মাঝে মাঝে ছোটখাটো দু'একটা উপহার কিনে আনতে ইচ্ছা হয়। সাহস হয় না হয়ত মেয়েটির মা কিছু মনে করবেন। মেয়ের মা কখনো আমার সামনে আসেন না। পর্দার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে কথা বলেন,

শেলী অংকে খুব কাঁচা। দেখবেন ভাল করে।

জি দেখব।

বাড়ির কাজ ঠিকমত করে না। ধমক দেবেন। আপনাকে ভাল মানুষ পেয়ে শুধু ফাঁকি দিচ্ছে বোধ হয়।

মেয়েটির বাবার সঙ্গে দেখা প্রায় হয় না বললেই হয়। তিনি সারাক্ষণ ব্যস্ত। যখন হঠাৎ এক আধদিন দেখা হয় তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন.

চিনতে পারলাম না তো। কে আপনি?

আমি সংকোচে বলি, আমি শেলীর মাস্টার।

তাই তো তাই তো। আমি গত সপ্তাহেই তো দেখলাম। একটুও মনে নাই। লজ্জার ব্যাপার।

ভদ্রলোক দারুণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন,

মাস্টার সাহেবকে চা দেয়া হয়েছে? আফজাল আফজাল।

চা খেয়েছি আমি।

তাতে কী আরেকবার খাবেন। আপনি নিজেও তো ছাত্র?

জি।

শেলী বলেছে আমাকে। একটিই টিউশনি আপনার?

আমার দারুণ লজ্জা লাগে। কান টান লাল করে বলি,

বিকালেও একটা টিউশনি আছে।

আমি নিজেও খুব কষ্ট করে পড়েছি। তিন চারটা টিউশনি করতাম। একটুও ভাল লাগত না। সারাক্ষণ ভাবতাম কখন তারা চা টা খেতে দেবে। আপনাকে চা টা ঠিকমত দেয় তো?

হা হা করে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। হাসি থামতেই গম্ভীর হয়ে বললেন,

এক বাড়িতে পড়াতাম একটা ছেলেকে। মহা মূর্খ। তিনবার ফেল করেছে মেট্রিক--- দেখেন অবস্থা। একেক বার ফেল করত আর ছেলের বাবা এসে আমাকে ধমকধামক--- কেন ফেল করল. কেন ফেল করল।

আমার মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা বোধ আছে। সব সময় নিজেকে ছোট মনে হয়। কলেজে সংকোচে থাকি। একেক দিন সফিকের সঙ্গে তার কাটা কাপড়ের স্তূপের কাছে যেতে হয়। টাকা পয়সা গুণে গুণে রাখতে আমার কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। সব সময় মনে হয় এই বুঝি ক্লাসের কোন ছেলে বলে বসবে কে রঞ্জুনা? কিন্তু এই বাড়িতে এসে সেই ভাবটা আমার থাকে না। শেলী যেদিন জিজ্ঞেস করল,

স্যার আপনি ফুটপাতে কাপড় বিক্রি করেন?

তখন কেন জানি আমার লজ্জা লাগল না। আমি খুবই সহজ ভাবেই বললাম,

হ্যাঁ। আমার বন্ধুর সঙ্গে মাঝে মাঝে যাই. তুমি জানলে কী করে?

আমি হঠাৎ দেখলাম।

তোমার খারাপ লাগছিল নাকি?

না তো! মজা লেগেছে।

মেয়েটিকে দেখলেই পারুলের কথা মনে হয়। কোথায় যেন পারুলের সঙ্গে এর মিল আছে। স্পষ্ট কোনো মিল নয় এক ধরনের সূক্ষ্ম অস্পষ্ট মিল।

অনেক দিন পারুলের কোন খোঁজখবর জানি না। একবার শুনেছিলাম তারা নাকি নেত্রকোনা থেকে বরিশাল চলে গেছে। নেত্রকোনায় শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে বনিবনা হয়নি। বরিশালের ঠিকানা জানা না থাকায় চিঠিও দিতে পারি না। অনেকদিন পারুলকে দেখি না। শুধু পারুল কেন মা'র সঙ্গেও দেখা নাই অনেকদিন। যেতে আসতে অনেকগুলি টাকা খরচ হয়। প্রাণে ধরে এতগুলি টাকা খরচ করতে পারি না।

পান্থ নিবাসে একঘেয়ে জীবন কাটাই। সফিক সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তার দেখা পাওয়া যায় না। অনেক রাতে ঘরে ফিরেই ঘুমুতে শুরু করে। সফিকের সেই মাস্টারিটা আর নাই। কাটা কাপড়ের ব্যবসা আবার শুরু করেছে। মনে হয় খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। তার স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে। ঘুমের মধ্যে ছটফট করে। কে জানে বড় ধরনের কোন অসুখ নিশ্চয়ই বাঁধিয়েছে। রাতের বেলা হঠাৎ জেগে উঠে বলে, 'শীত লাগছে রঞ্জু জানালাটা বন্ধ কর তো।' ভাদ্র মাসের পঁচা গরমে তার শীত লাগে কেন কে জানে?

মাঝে মাঝে হঠাৎ সফিককে খুব খুশি খুশি লাগে। ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলে, 'এই বার বিয়ে করে ফেলব। দুজন থাকলে যুদ্ধে অনেক এডভানটেজ পাওয়া যায়। অভাবের সঙ্গে কী আর একা একা ফাইট চলে?'

রেবার ছবিটা বের করা হয় তখন। সফিক লাজুক স্বরে বলে,

বেশ মেয়েটি, কী বলিস? ভাল মানুষের মত দেখতে।

কিন্তু রঞ্জু এই মেয়ের অনেক বুদ্ধি। দেখ চোখের দিকে তাকিয়ে।

সফিক রেবার ছবিটি যত্ন করে একটা খামে ভরে রাখে। সেই খামটি তার টিনের ট্রাঙ্কে তালাবন্ধ থাকে। সফিকের লজ্জা টজ্জা একটু কম কিন্তু রেবার প্রসঙ্গ উঠলেই সে কেমন লজ্জা পায়। সে প্রসঙ্গ ওঠে কম। আমি নিজে থেকে কখনো তুলি না। নিশানাথ বাবু অনেকবার বলেন, সিরাজ সাহেবের বোনের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করা দরকার। ভাল মেয়ে দেবী অংশে জন্ম। এই সব মেয়ে

হাতছাড়া করা ঠিক না। বলতে বলতে আড় চোখে তাকান সফিকের দিকে। সফিক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে,

বিয়ে নিশ্চয়ই হয়ে গেছে এতদিনে?

জিজ্ঞেস করব সিরাজ সাহেবকে?

না না থাক।

নিশানাথ বাবু গম্ভীর হয়ে বলেন,

এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে আর অসুবিধা কী?

সফিক চুপ করে থাকে। নিশানাথ বাবু বলেন,

বড়ই বোকামী করছ সফিক। তোমার হচ্ছে স্ত্রী— ভাগ্যে উন্নতি। কথা তো শুনবে না কিছু।

নিশানাথ জ্যোতির্ষাণবের দিনকাল বড়ই খারাপ। লোকজন হাত দেখাতে আসে কালে ভদ্রে। পান্থ নিবাসের টাকা আবার বাকি পড়ে। রশীদ মিয়া রোজ সকালে টাকার জন্যে তাগাদা দিতে আসে। সরু চোখে তাকিয়ে থেকে হিস হিস করে কথা বলে,

ঘর কবে ছাড়বেন বলেন দেখি? আবার তিন মাসের বাকি।

জ্যোতির্ষাণব মুখ নিচু করে থাকেন। কোন কোন দিন রশীদ মিয়ার গালাগালি চরমে ওঠে, 'আর এক মাস দেখব তারপর বিসসিল্লাহ ইস্ক্রু টাইট দিব বুঝছেন। সোজা আঙুলে না হলে আঙুল বেঁকা করা লাগে।' জ্যোতির্ষাণব কিছুই বলেন না। নবী সাহেব মৃদু গলায় বলেন, 'এই সব কী বলেন রশীদ মিয়া? মানুষের অভাব হয় না। এই সব কথা বলা কী ঠিক?'

ঠিক বেঠিক জানি না। আমার কথা পরিষ্কার। আমি কী দানসাগর খুলেছি নাকি? না এটা সাধুজীর বাপের হোটেল?

করিম সাহেবের সঙ্গে জ্যোতির্ষাণবের মোটেই মিল নেই। জ্যোতির্ষাণবের কোন একটা ঝামেলা হলে করিম সাহেবের আনন্দে দাঁত বের হয়ে যায়। সেই করিম সাহেবও একদিন রেগে গেলেন,

এইটা কী কাণ্ড রোজ রোজ, ভদ্রলোকের অপমান।

রশীদ মিয়া চোখ লাল করে বলল,

ভদ্রলোকটা কে? আমি তো কোন ভদ্রলোক দেখি না।

চুপ শালা। তোমাকে আজ আমি ভদ্রলোক গিলায়ে খাওয়াব।

রশীদ মিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। শুকনা গলায় বলল,

আপনে এই সব কী বলছেন করিম সাহেব?

চুপ একদম চুপ। শালা তোমার পাছায় লাথথি মেরে পাইখানার মধ্যে তোমারে কূপে ফেলব। ভদ্রলোক চিনবা তখন। হৈচৈ শুনে নিচ থেকে কাদের মিয়া ছুটে এল। নবী সাহেব বের হয়ে আসলেন। জ্যোতির্ষাণব বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন,

থামেন করিম সাহেব। কী সব বলছেন।

আপনে থামেন। আমি থামার লোক না। শালাকে খুন করে ফাঁসি যাব আমি।

করিম সাহেব লোকটিকে আমি কোনো দিনই পছন্দ করি নাই। করিম সাহেব এমন লোক, যাকে কোন কারণেই পছন্দ করা যায় না। পান্থ নিবাসের কেউ তার সঙ্গে হাসি মুখে কথা বলে না। কিন্তু সেই রাতে সিরাজ সাহেব তাঁকে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর আজীজ সাহেব তাঁকে তাস খেলার জন্যে ডাকতে আসলেন। নবী সাহেবের মেয়ের বাড়ি থেকে ডিমের হালুয়া এসেছিল। নবী সাহেব সেই হালুয়ার বাটি পাঠিয়ে দিলেন করিম সাহেবের ঘরে। সবাইকে ভাগ করে দেয়ার দায়িত্ব করিম সাহেবের।

## ছয়

জ্যোতির্ষাণব ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

রাত আটটায় ফিরে এসে দেখি নিশানাথ বাবুর ঘর খালি। চৌকিটা বাইরে টেনে এনে রাখা হয়েছে। রশীদ মিয়া চৌকির উপর গম্ভীর হয়ে বসে সিগারেট টানছে। কাদের বালতি বালতি পানি এনে ঘরের মেঝেতে ঢালছে এবং ঝাঁটা দিয়ে সশব্দে ঝাঁট দিচ্ছে। ছুটির দিন বলেই মেসে লোকজন কেউ নেই। নবী সাহেবও মেয়ের বাড়ি বেড়াতে গিয়েছেন। নয় নম্বর ঘরে যে ছেলেটি থাকে শুধু

তার ঘরে বাতি জ্বলছে। আমি অবাক হয়ে বললাম,

কী ব্যাপার রশীদ সাহেব?

কিসের কী ব্যাপার?

সাধুজী কোথায়?

চলে গেছে।

কোথায় চলে গেছে?

আমি কি জানি কোথায় গেছে। আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেন?

কখন গেছেন?

দুপুরে।

হঠাৎ চলে গেলেন যে?

কী মুশিবত আমি তার কী জানি। যেতে চাইলে আমি ধরে রাখব নাকি? শ্বশুর বাড়ি এইটা?

আমি বেশ অবাক হলাম। নিশানাথ বাবু কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে চলে যাবেন এটা ভাবা যায় না। তা ছাড়া তাঁর যাওয়ার কোনো জায়গাও সম্ভবত নেই। কে জানে হয়ত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিংবা হয়ত চায়ের দোকানে বসে আছে একা একা। আমি কাপড় না ছেড়েই চায়ের দোকানে চলে গেলাম। না সেখানে সাধুজী যাননি। রাস্তার মোড়ে যে ছেলেটি পান সিগারেট বিক্রি করে সে বলল— সাধুজী স্যুটকেস হাতে নিয়ে উত্তর দিকে গেছেন। তার দোকান থেকে দু'প্যাকেট স্টার সিগারেট কিনেছেন।

মেসে ফিরে যেতেই নয় নম্বরের ছেলেটির সঙ্গে দেখা হল। এই ছেলেটি এক পত্রিকার অফিসে কাজ করে। তার সব সময় নাইট ডিউটি। সারাদিন দরজা বন্ধ করে ঘুমায়, কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। মেসে সে খায় না। ছুটি-ছাটার দিন তার কেরোসিন চুলায় নিজেই দেখি রান্না করে। আমাকে দেখেই ছেলেটি বলল,

সফিক সাহেব কখন ফিরবেন?

জানি না কখন।

সফিক সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কী ব্যাপার?

ছেলেটি আড় চোখে রশীদ মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল,

আসেন আমার ঘরে বসি। আপনি তো আসেন নাই কখনো। আমি নিজেই অবশ্যি কাউকে বলি না। আমার একা একা থাকতে ভাল লাগে। সিঙ্গেল রুম নিয়েছি এই জন্যে।

তার ঘর নবী সাহেবের ঘরের মতো গোছানো। দেখেই মনে হয় নারীর স্পর্শ আছে। দেয়ালে আবার নীলরঙ্গা একটি তৈলচিত্র। জ্যোৎস্না রাত্রির ছবি। অসম্ভব সুন্দর এই ছবিটি ঘরের চেহারা পাল্টে ফেলেছে। তাকালেই মন বিষণ্ন হয়।

আমার ছোট ভাইয়ের আঁকা। আর্ট কলেজে পড়ে ফোর্থ ইয়ার। আপনি কী চা খাবেন? চায়ের ব্যবস্থা আছে।

না চা খাব না আমি, ভাত খাই নাই এখনো। আপনি কী জন্যে ডাকছিলেন।

ছেলেটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল,

সাধুজী আজ দুপুরে আমার কাছে একটি ঘড়ি রেখে গেছেন সফিক সাহেবকে দেয়ার জন্যে। খুব দামী ঘড়ি।

আমি চুপ করে রইলাম। ছেলেটি বলল,

তিনি যাওয়ার সময় কাঁদছিলেন। আমার এমন খারাপ লাগল বুঝলেন। বিকালে এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, যাই নাই দরজা বন্ধ করে বসেছিলাম।

আমি বললাম, 'আপনার নাম আমি জানি না। কী নাম ভাই?'

সুলতান। সুলতান উদ্দিন। সাধুজী ছাড়া কেউ আমার নাম জানে না। কারো কাছে যাইনা তো। সাধুজীর কাছে একবার গিয়েছিলাম। মনটা খুব খারাপ সেই সময়। হঠাৎ গেলাম। তিনি অনেক কথা বললেন এখনো মনে আছে।

কী বললেন?

এই সান্ত্বনার কথা আর কি! অন্য রকম করে বললেন। সান্ত্বনার কথা বলা তো খুব কঠিন।

সবাই বলতে পারে না। খুব হৃদয়বান মানুষ লাগে।

আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম তার ঘরে। কথাবার্তা না— চুপচাপ বসে থাকা। ছেলেটি একেবারেই কথাবার্তা বলে না যতবার বললাম,

উঠি? ততবারই বলে, বসেন না আরেকটু বসেন। সফিক সাহেব আসলে যাবেন। রাত এগারোটা পর্যন্ত সফিকের জন্যে অপেক্ষা করে খেতে গেলাম। এত রাত পর্যন্ত কাদের থাকে না। টেবিলে ভাত তরকারী ঢেকে রেখে ঘুমাতে যায়। কিন্তু আজ দেখি জেগে আছে। ভাত তরকারী বাড়তে বাড়তে ফিসফিস করে বলল, 'হুনছেন স্যার? করিম সাব মাল খাইছে আইজ।'

কী বললি?

মাথা ফট্টি নাইন। বমি কইরা ঘর ভাসাইয়া দিছে। আমারে সাফ করতে কয়। আমি কইছি মাল খাওয়া বমি আমি সাফ করি না। ভদ্রলোকের ছেলে আমি কী কন স্যাব? অন্যায় কইলাম।

উপরে উঠেই করিম সাহেবের সঙ্গে দেখা। বারান্দায় রাখা চৌকিব উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। আমাকে দেখেই মাথা তুলে বললেন,

সাধুজী চলে গেছে শুনেছেন? শালা রশীদ মিয়ার পেটে আমি একটা তিন নম্বরী চাকু যদি না ঢুকাই তাহলে আমি বেজন্মা কুত্তা। শালার মাকে আমি...

করিম সাহেব অনর্গল কুৎসিত কথা বলতে লাগলেন। তারপর এক সময় হড় হড় কবে বমি করে ফেললেন।

আপনার কী শরীর খারাপ করিম সাহেব?

না শরীর ঠিকই আছে। শালার সস্তার তিন অবস্থা। সস্তা জিনিস খেয়ে এখন মরণ দশা। ছয় টাকা করে বোতল বুঝলেন? বলতে বলতে আবার বমি।

সফিক আসল বারোটার দিকে। নিশানাথ বাবু চলে গেছেন এই খবরে তার কোনো ভাবান্তব হল না। ভেলভেটের বাক্সে মোড়া ঘড়ি ফেলে রাখল টেবিলের এক কোণায়। তার ভাবভঙ্গি এ রকম যেন নিশানাথ বাবুর ঘর ছেড়ে যাওয়া তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপাব না। বোজই এবকম হয়। রাতে ঘুমতে যাবার সময় বলল,

চায়ের দোকান স্টার্ট দিয়ে দিব এইবার। খোঁজখবব শুরু করেছি। দু'হাজাব টাকা সেলামী দিলে শ্যামলীতে একটা ঘর পাওয়া যায়। ভাল ঘর। আভাকে বলব টাকাটা ধাব দিতে।

দিবে সে?

দিবে নিশ্চয়ই। আর না দিলে কী আছে, ছোট করে শুরু করব। নবী সাহেবকে বলব কিছু দিতে।

নবী সাহেব অবশ্যি দিবেন।

সবাই দিবে। দেখিস না কী করি।

আমি বললাম, 'শুধু আমাদের ম্যানেজারই নেই।'

সফিক কোন উত্তর দিল না। বাতি নিবিয়ে মশারি ফেলে শুয়ে পড়ল। বাইরে করিম সাহেব মস মস করে হাঁটতে লাগলেন। বমি টমি করলে শুনেছি মাতালদেব নেশা কেটে যায়। কিন্তু বাত যত গভীর হচ্ছে করিম সাহেবের নেশাও মনে হয় ততই গাঢ় হচ্ছে।

তিনি উঁচু গলায় বলছেন,

ভয় পাওয়ার লোক না আমি। কাউকে ভয় পাই না। লাথ দিলে সব ঠিক ঠাক। এমন লাথ ঝাড়ব পাছায় বাপের নাম ভুলিয়ে দিব।

এক সময় সফিক বিরক্ত হয়ে বলল,

ঘুমাতে যান করিম সাহেব।

কেন? তোমার হুকুম নাকি? আমি কী তোমার হুকুমের গোলাম?

চুপ করেন করিম সাহেব।

তুই চুপ কর শালা।

সফিক আর কথা বাড়াল না। আমার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসল না। এপাশ ওপাশ করতে লাগলাম। বুঝতে পারছি সফিকও জেগে আছে। সফিক একবার ডাকল,

জেগে আছিস নাকি রঞ্জু?

আমি জবাব দিলাম না। বাইরে করিম সাহেবেরও আর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সফিক এক সময় মশারির ভেতরেই একটা সিগারেট ধরিয়ে খক খক করে কাশতে লাগল। অন্ধকার

ঘরে একটা লাল ফুলকি উঠানামা করছে। দেখতে দেখতে ঘুম এসে গেল।

ঘুম ভাঙলো শেষ রাত্রে। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বৃষ্টির ছাঁটে বিছানা ভিজে একাকার। আমি ডাকলাম, 'সফিক এই সফিক।'

কোন উত্তর নাই। বাইরে বেরিয়ে দেখি সে সিগারেট হাতে নিয়ে বারান্দায় বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজছে। আমাকে আসতে দেখে ক্লান্ত স্বরে বলল, 'ঘুম আসেছে নারে।'

বৃষ্টিতে ভিজছিস তো।

সফিক একটু সরে বলল,

জ্যোতির্ষাণবের জন্যে খারাপ লাগছে। বেশ খাবাপ লাগছে। সকাল হলেই খুঁজতে বের হব। ঢাকাতেই আছে নিশ্চয়ই।

সফিক খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল,

অনু মাবা গেছে। গত পরশু চিঠি পেয়েছি। একটা টেলিগ্রাম করার দরকার মনে করে নাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তুই তো আমাকে কিছু বলিস নাই সফিক।

এই সব বলতে ভাল লাগে না।

কি ভাবে মারা গেল?

সাপে কেটেছিল। তাই লেখা। ওঝা টঝা নাকি এসেছিল। আমি সফিকের হাত ধরালাম। আশ্চর্য জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। অথচ সহজ স্বাভাবিক মানুষের মত বসে আছে।

তোর তো ভয়ানক জ্বর সফিক।

হ্যাঁ শরীরটা খাবাপ।

আয় শুযে থাকবি? মাথায় জল পট্টি দেব?

নাহ এইসব কিছু লাগবে না। আমার ভালুক জ্বব; সকালবেলা থাকবে না দেখবি।

জ্যোতির্ষাণবকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজা হয়। ছিন্ন মুল মানুষেবা যে সব জায়গায় রাতে ঘুমায়, সফিক গভীব বাতে সেই সব জায়গায় খুঁজতে যায়। কমলাপুব বেল স্টেশন, লঞ্চ টার্মিনাল লাভ হয় না কিছু। ফুটপাতে যে সব পামিস্টরা হাতেব ছবি আঁকা সাইন বোর্ড টানিয়ে বসে থাকে তাদেবকে জিজ্ঞেস করা হয়,

লম্বা চুল দাড়ির এক সাধু — হাত দেখেন, তাঁকে কেউ দেখেছেন? নিশানাথ নাম।

কেউ কিছু বলতে পারে না। নবী সাহেবের কথামত পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয় :

**লম্বা চুল দাড়ি পরনে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি প্রখ্যাত**
**জ্যোতিষ নিশানাথ জ্যোতির্ষাণবের সন্ধান প্রার্থী।**

বিজ্ঞাপন ছাপার তিন দিনের দিন হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয় আভা। আপনাদের জ্যোতিষী কোথায় গেছে?

সফিক বিরক্ত হয়ে বলে, কোথায় গেছে জানলে বিজ্ঞাপন দেই নাকি?

আমি ভাবলাম আপনাদের কোন পাবলিসিটির ব্যাপার বুঝি।

তাঁর পাবলিসিটি লাগে না। সে অনেক বড় দরের জ্যোতিষ।

আভা শান্ত স্বরে বলে,

তিনি বড় জ্যোতিষী ছিলেন। আমার হাত দেখে জন্মবার বলে দিয়েছিলেন। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম।

শুধু নিশানাথ নয় নবী সাহেবও পান্থ নিবাস ছেড়ে চলে গেলেন। স্কুল থেকে মহাসমারোহে তাঁকে বিদায় দেয়া হয়েছে। আমরাও তাঁর বিদায় উপলক্ষে একটু বিশেষ খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করেছিলাম। খেতে পারলেন না। মুখে নাকি কিছুই রুচছে না। খাওয়া বন্ধ করে একবার ফিসফিস করে বললেন,

আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। পান্থ নিবাসে শিকড় গজিয়ে গেছে। বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে পানি পরতে লাগল।

সিরাজ সাহেবের প্রমোশন হয়েছে। অফির্সাস গ্রেড পেয়েছেন। অফিস থেকে তাঁকে কোয়ার্টার দেয়া হয়েছে। সুন্দর কোয়ার্টার। তাঁর সঙ্গে একদিন গিয়ে দেখে আসলাম। দক্ষিণ দিকে চমৎকার বারান্দা। হু হু করে হাওয়া বয়। সিরাজ সাহেবও পান্থ নিবাস ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগের দিন রাতে বিদায় নিতে এলেন আমাদের কাছ থেকে। কথা সরে না তাঁর মুখে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপ চাপ। এক সময় বললেন,

সুখেই ছিলাম ভাই আপনাদের সাথে। আনন্দেই ছিলাম। নিশানাথ বাবুর খালি ঘরটা দেখলে চোখে পানি আসে। আমার স্ত্রীকে তিনি বড় স্নেহ করতেন।

সত্যি সত্যি চোখে পানি ছলছলিয়ে উঠল। সফিক শুয়ে ছিল। সফিকের মাথায় হাত রেখে বললেন, জ্বর কী আবার এসেছে?

আছে অল্প।

অবহেলা করবেন না ভাই। ভাল ডাক্তার দেখাবেন।

ক্ষাণিকক্ষণ চুপ থেকে আমতা আমতা করে বললেন,

আমি অতি দরিদ্র মানুষ তবু যদি কখনো কোন প্রয়োজন হয়...

সফিক কথার মাঝখানে আমচকা জিজ্ঞেস করল,

আপনার ছোট বোন রেবা, তাঁর কী বিয়ে হয়েছে?

হ্যাঁ গত বৈশাখ মাসে বিয়ে দিয়েছি। ঢাকাতেই থাকে। ভাল বিয়ে হয়েছে। ছেলেটা অতি ভাল। আমি ভাবি নাই এত ভাল বিয়ে দিতে পারব।

সফিক আর কিছু বলল না। সিরাজ সাহেব বললেন,

আপনারা দুজন একদিন গিয়ে যদি দেখে আসেন সে খুব খুশি হবে। আপনাদেবকে চিনে খুব। সেই দিনও জিজ্ঞেস করল আপনার অসুখের কথা।

নতুন কোন বোর্ডার এল না পান্থ নিবাসে। শুনেছি রশীদ মিয়া মেস ভেঙে বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দেবেন। মেসে নাকি তেমন আয় হয় না। এর মধ্যে মা'র চিঠি পেলাম :

> তোমার পাঠানো একশত টাকা পাইয়াছি। আমি শুনিয়া মর্মাহত হইলাম যে তুমি পড়াশুনা ছাড়িয়া কাপড় ফেরি করিয়া বেড়াও। তোমার দুই মামা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তোমাব মনে রাখা উচিত তোমার নানা অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তুমি ছোটলোকের মত ফেরিওয়ালা হইয়াছ এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি। পারুলের মত তুমিও যে বংশের মান ডুবাইবে তাহা ভাবি নাই। দোয়া জানিও। অতি অবশ্য একবার আসিবে। তোমার বাবার একটি পা অচল। হাঁটা চলা করিতে পারে না...

চিঠি পড়ে আমি দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকি। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়।

## সাত

আজকাল বড় অস্থির লাগে।

সব যেন অগোছালো হয়ে গেছে। সুর কেটে গেছে। সফিকেব সেই হাসি খুশি ভাব নেই। তার জ্বর কখনো থাকে কখনো থাকে না। মেডিকেল কলেজ থেকে এক্সরে করিয়ে এসেছে যক্ষা-পক্ষা কিছু নেই। তার ব্যবসা খুব মন্দা যাচ্ছে। কিন্তু কেমন করে যেন প্রেসের পুরনো চাকরিটা আবার জোগাড় করেছে। আজকাল সে কৃপণের মত টাকা জমায়। তার খরচপাতি এমনিতেই অবশ্যি কমে গেছে। বোনকে টাকা পাঠাতে হয় না। আদর করে একটি পয়সাও খরচ করে না। মেডিকেল কলেজের ছোকড়া ডাক্তারটি বার বার বলেছিল,

ভাল ভাল খাবার খাবেন। দুধ টুধ নিয়মিত খাবেন। আপনার এখন হাই প্রোটিন ডায়েট দরকার। ডাক্তারের কথা সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

হাই প্রোটিন ডায়েট খাব পয়সা কোথায়? পাঁজর বুকের পাই পয়সাও খরচ করব না।

সেই একটি সাইন বোর্ড লিখিয়ে এনেছে—

"নীলগঞ্জ হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্ট"

প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড। খবরের কাগজে মুড়ে সেই সাইন বোর্ডটি রাখা হয়েছে চৌকির নিচে। মাঝে মাঝে রাত জেগে সে টাকা পয়সার হিসাব মিলায়। হাসি মুখে বলে,

দেরি নাই আর। শুরু করে দিতে হবে।

তার চোখ জ্বল জ্বল করে। গম্ভীর হয়ে বলে, 'ছোট থেকে শুরু হবে। প্রথমে থাকবে সাদামাটা চায়ের দোকান। তার পর বড় একটা হোটেল দেব। একটা হুলস্থূল কাণ্ড করব দেখবি।'

সেই হুলস্থূল কাণ্ড করবার জন্যে সে প্রায়ই না খেয়ে থাকে।

একদিন বলল, চায়ের চিনি দেবার দবকার কী? চীনারা বিনা চিনিতে দিব্যি চা খাচ্ছে। না চিনিটা আমি উঠিয়েই দেব, অনেকগুলি টাকা বাচে বুঝলি?

পান্থ নিবাসের নাম ফলক রশীদ মিয়া সরিয়ে ফেলেছে। তিন তলায় নতুন নতুন ঘর উঠছে। জানালায় নতুন শিক বসানো হচ্ছে। চুনকাম হচ্ছে। একদিন দেখি 'রোকেয়া ভিলা' নামে একটা সাইন বোর্ড শোভা পাচ্ছে। আমাদের কাছে নোটিশ দিয়েছে, 'দুই মাসের ভেতর বাড়ি খালি করে দিতে হবে। অন্যথায় আইনের আশ্রয় নেয়া হবে' এই জাতীয় কথা লেখা।

করিম সাহেব এই নিয়ে খুব হৈচৈ কবছেন, উঠিয়ে দিবে বললেই হল? হাইকোর্টে কেইস করে শালার পাতলা পায়খানা বের করে দিব না? উঠিয়ে দেয়া খেলা কথা না। হুঁ হুঁ।

করিম সাহেব আজকাল প্রায় রাতেই মদটদ খেয়ে এসে বিশ্রী সব কাণ্ড কারখানা করেন। কেউ কিছু বললেই আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করেন,

নিজের পয়সায় খাই। কারোর বাপেব পয়সায় না। কারোর সাহস থাকে বলুক দেখি মুখের সামনে। জুতিয়ে দাঁত খুলে ফেলব না? ভদ্রলোক চিনা আছে আমার।

সত্য মিথ্যা জানি না, শুনছি অফিসে কী একটা টাকা পয়সার গণ্ডগোলেব জন্য করিম সাহেবকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তদন্ত-টদন্ত হচ্ছে। কথাটা সত্যি হতেও পারে। কয়েক দিন ধরে দেখছি অফিসে যান না। গতকাল আমি জিজ্ঞেস কবেছিলাম, কী ব্যাপার করিম সাহেব অফিসে যান না দেখি!

করিম সাহেব রেগে আগুন।

যাই না যাই সেটা আমার ব্যাপার। আপনে কোথাকার কে? আপনার খাই? না আপনার পরি?

বি.এ. পরীক্ষার ফিস জমা দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। নবী সাহেবের ঘরটিতে এখন একা একা থাকি। দিনরাত পড়তে চেষ্টা করি। নীরস পাঠ্য বইয়ের স্তূপ একেক সময় অসহ্য বোধ হয়। কোথায়ও হাঁফ ছাড়বার জন্যে যেতে ইচ্ছে হয়। যাওয়ার জায়গা নেই কোনো। আমার ছাত্রীটির বাসায় যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিনা দরকারে শুধু শুধু যাওয়া। শেলীর বাবা-মা কেউ কিছু মনে করেন কী না তাই ভেবে যাওয়া হয় না।

মাকে দেখতে গিয়েছিলাম এর মধ্যে। মা আগের মতই আছেন। এতদিন ধারণা ছিল বোধহয় খুব কষ্টে আছেন। কিন্তু দেখা গেল অবস্থা মোটেই সে রকম নয়। বাড়ির পেছনে সব্জী বাগান করেছেন। হাঁস-মুরগী পালছেন। ধান-চাল রাখার জন্য নতুন একটি ঘর তোলা হয়েছে। এমন অবাক লাগল দেখে! বাবার প্যারালিসিসও তেমন কিছু নয়। দেয়াল ধবে বেশ দাঁড়াতে পারেন।

অঞ্জু দেখলাম অনেক বড় হয়েছে। তাকে অতি কড়া শাসনে রাখা হয়। অঞ্জুর কাছেই শুনলাম সে ঘুমিয়ে পড়লে মা তার বই খাতা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেন। যেন পারুলের মত কিছু আবার না ঘটে। অঞ্জু অনেক চালাক চতুর হয়েছে। অনেক কথা বলল সে। গল্প বলাও বেশ শিখেছে।

পারুল আপা ভালই করেছে দাদা। কী যে দিন গেছে আমাদের। কতদিন শুধু একবেলা রান্না হয়েছে। মা'র মেজাজ তো জানই। সব সময় আগুনের মত তেতে থাকতেন। একদিন কী করেছেন শোন— বাবা দেরি করে ফিরেছেন। এগারোটার মত বাজে প্রায়। মা দরজা খুললেন না কিছুতেই।

খুললেন না কেন?

কে জানে কেন? কে যাবে জিজ্ঞেস করতে?

অঞ্জু এক ফাঁকে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নাকি দাদা বাড়ি বাড়ি কাপড় ফেরি করে বেড়াও? কত কাণ্ড হল এই নিয়ে। মামারা রেগে আগুন।' বাবা বেচারা সরল মানুষ। ছোট মামাকে বলেছেন, 'তুমি নিজেও তো মানুষের বাড়ি গিয়ে রোগী দেখ। তাতে দোষ হয় না?'

অঞ্জু হাসতে লাগল খিলখিল করে। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, ছোট মামা তখন একেবারে হাউইয়ের মত নাচতে লাগলেন। মা'র সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হল তখন। মায়ের সঙ্গে ঝগড়ায় কে পারবে বল? ছোট মামা হেরে ভূত।

মা'র সঙ্গে ঝগড়া কী নিয়ে?

জমি নিয়ে। নানার সম্পত্তির ওয়ারিশান চাইলেন মা। তাতেই লেগে গেল।

ওয়ারিশান পেয়েছেন?

পাবেন না মানে? মাকে তুমি এখনো চেন নাই দাদা।

অঞ্জুব কাছে শুনলাম মা আজকাল কারো সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। আমার সঙ্গেও বললেন না। অভাবে অনটনে এরকম হয় নাকি মানুষ? আবেগ শূন্য কথাবার্তা। সেই চরম অভাব এখন তো আর নেই। এখন এরকম হবে কেন? বাবার ধারণা মায়ের সঙ্গে জ্বীন থাকে। আমাকে একবার একা পেয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'সব জ্বীনের কাণ্ড কাবখানা।'

কিসের কাণ্ড কারখানা?

জ্বীনের। তোর মাকে জ্বীন ধরেছে।

কী যে বলেন আপনি!

বাবার পাগলামী মনে হল সেরে গেছে। সহজ স্বাভাবিক কথাবার্তা। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার কথা জিজ্ঞেস করলেন,

সফিক কেমন আছে? রেবাকে বিয়ে করেছে নাকি? আহা কেন করল না' নিশানাথ কই? সন্ন্যাসী হয়ে গেছে? আহারে বড় ভাল মানুষ ছিল! সন্ন্যাসী তো হবেই। ভালো মানুষ সংসারে থাকতে পারে?

অঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বাবার বেহালাব সখ মিটে গেছে নাকি বে?'

অঞ্জু লাফিয়ে উঠল, 'সবচে দারুণ খবরটা তোমাকে দেয়া হয়নি দাদা। বাবা চমৎকার বেহালা বাজায়। যা চমৎকার! যা চমৎকার!'

সে কী?

হ্যাঁ দাদা, তুমি বিশ্বাস করবে না কী চমৎকার! মা পর্যন্ত হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

বেহালা কিনেছেন নাকি বাবা?

না হারু— গায়েনকে খবর দিলেই সে বেহালা দিয়ে যায়। তুমি আজ বল বাবাকে বাজাতে। সন্ধ্যার পর সবাই গোল হয়ে বসব। বেশ হবে দাদা। বলবে তো?

বাবাকে বেহালা বাজানোর কথা বলতেই তিনি আঁৎকে উঠলেন, পূর্ণিমা আজকে। পূর্ণিমার সময় বেহালা বাজালে পরী নামে এটাও জানিস না, গাধা নাকি? পরক্ষণেই গলার স্বর নামিয়ে বললেন, তুই তো বিশ্বাস করলি না যখন বললাম তোর মার সঙ্গে জ্বীন আছে। জ্বীন আছে বলেই তো যখন বাজাই তখন এমন করে তাকায় আমার দিকে— ভয়ে আমার বুক কাঁপে। এই দেখ হাতের লোম খাড়া হয়ে গেছে।

ঢাকায় ফিরে আসার দিন মা আমাকে একশ টাকার একটি নোট দিয়ে বললেন, তুমি যে টাকা পাঠিয়েছিলে সেই টাকা। সাথে নিয়ে যাও। ফেরিওয়ালা হবার দরকার নেই। যখন টাকার দরকার হবে লিখবে।

আমার চোখে পানি এসে গেল। মা এরকম হয়ে গেলেন কী করে? দু'দিন ছিলাম। এর মধ্যে একবার মাত্র তিনি আগের মত সহজ স্বাভাবিক ভাবে কথা বললেন। আগের মত নরম স্বরের মিষ্টি কথা, 'তোর বাবার বেহালা শুনে যা। মানুষের মধ্যে যে কী গুণ আছে তা বোঝা বড় কষ্ট। এখন বড় আফসোস হয়।' কে জানে তাঁর এই আফসোস কী জন্যে?

বাবার কাছে যখন বিদায় নিতে গেলাম তিনি যেন কেমন কেমন ভঙ্গিতে তাকালেন। যেন আমাকে চিনতে পারছেন না। খানিকক্ষণ পর গম্ভীর হয়ে বললেন,

চলে যাবেন যে চা টা খেয়েছেন? চা না খেয়ে যাবেন না যেন। অঞ্জু খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আপনি আপনি করছে কেন বাবা?

চিনতে পারছ না?

বাবা রাগী গলায় বললেন,

হাসিস না শুধু শুধু, চিনব না কেন? না চেনার কী আছে?

বাবা ঘোর লাগা চোখে তাকালেন। আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। সত্যি তাহলে আমাকে চিনতে পারছেন না। অঞ্জু বলল, তুমি মনে হয় ঘাবড়ে গেছ দাদা। মাঝে মাঝে বাবার এরকম হয়। কাউকে চিনতে পারেন না। আবার ঠিক হয়ে যায়।

ঢাকায় এসে দুটি চিঠি পেলাম। একটি পারুলের। পারুলের চিঠিতে একটা দারুণ মজার খবর আছে। তার জমজ মেয়ে হয়েছে। পারুলের সব কাণ্ড কারখানাই অদ্ভুত। দ্বিতীয় চিঠিটি লিখেছে শেলী। তিন লাইনের চিঠি।

পরম শ্রদ্ধেয় স্যার,
আমার সালাম জানবেন। মা আপনাকে চিঠি লিখতে বললেন। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। আপনি আর আসেন না কেন?

বিনীতা
শেলী

## আট

এত বড় বাড়ি খাঁ খাঁ করছে।

কেউ কোথাও নেই। গেটের পাশে দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকত আজ সেও নেই। দরজার সামনে ভারী পর্দা দুলছে। পর্দা টেনে ভেতরে ঢুকতে সংকোচ লাগলো। কে জানে হয়তো শেলীর মা ভেতরে বসে আছেন। তিনি কখনো আসেন না আমার সামনে। হয়ত বিরক্ত হবেন। হয়ত লজ্জা পাবেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম এগারোটা বাজার ঘণ্টা দিচ্ছে। এদের বসবার ঘরে অদ্ভুত একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। বাজনার মত শব্দে ঘণ্টা বাজে।

কাকে চান?

আমি চমকে দেখি চশমা পড়া একজন মহিলা পর্দা সরিয়ে উঁকি দিচ্ছেন। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। কে জানে ইনিই হয়তো শেলীর মা। থেমে থেমে বললাম,

আমি শেলীর মাস্টার।

হ্যাঁ আমি চিনতে পারছি। কী ব্যাপার?

আমাকে আসতে বলেছিলেন।

কে আসতে বলেছিলেন?

শেলীর মা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন।

ভদ্রমহিলার ভ্রূ কুঞ্চিত হল। অবাক হয়ে তাকালেন।

আমি, আমি খবর দিয়েছিলাম? কেন, আমি খবর দেব কেন? ঘাম বেরিয়ে গেল আমার। পিপাসা বোধ হল। শেলীর মা শান্ত স্বরে বললেন,

ঘরে এসে বসুন। কেউ নেই আজকে। শেলী তার ফুপার বাসায় গেছে। ফিরতে রাত হবে। আচ্ছা খবর দিয়েছে কে?

আমি ঘামতে ঘামতে বললাম,

তাহলে হয়ত ভুল হয়েছে আমার। আচ্ছা আমি তাহলে যাই।

না না চা খেয়ে যাবেন। চা দিতে বলছি। খবর কে দিয়েছে আপনাকে?

আমি শুকনো গলায় বললাম,

শেলী চিঠি দিয়েছিল।

ও তাই। আছে চিঠিটা? দেখি একটু।

শেলীর মা ভ্রূ কুঁচকে সে চিঠি পড়লেন। বন্ধ করে খামে ভরলেন আবার খুলে পড়লেন। আমার মনে হল তাঁর ঠোঁটের কোণায় একটু যেন হাসির আভাস।

চা আসতে দেরি হল না। চায়ের সঙ্গে দুটি সন্দেশ। ঝক ঝকে রুপোর গ্লাসে বরফ মেশানো ঠাণ্ডা পানি। ভদ্রমহিলা খুব কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। এক সময় যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এই ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ একবার অবিশ্য বলেছিলাম শেলীকে তোমাকে এখানে

আসবার কথা লিখতে। তেমন কোনো কারণে নয়।

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। ভদ্রমহিলা বললেন, বয়সে অনেক ছোট তুমি। তুমি করে বলছি বলে আবার রাগ করছ না তো?

জি না।

তুমি আজ রাতে ন'টার দিকে একবার আসবে? শেলীর বাবা বাসায় থাকবেন তখন। আসতে পারবে?

যদি বলেন আসতে আসব।

হ্যাঁ। আসবে তুমি। আমি বরংচ গাড়ি পাঠাব।

গাড়ি পাঠাতে হবে না। আমি আসব।

আর শোন, শেলীর চিঠিটা থাকুক আমার কাছে।

সমস্ত দিন কাটল এক ধরনের আতঙ্কের মধ্যে। একি কাণ্ড করল শেলী? কেন করল? বোধহয় কিছু না ভেবেই করেছে। সারা দুপুর শুয়ে রইলাম। কিছুই ভাল লাগছে না। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। এর মধ্যে করিম সাহেব এসে খ্যান খ্যান শুরু করেছেন। তাঁর বক্তব্য -- সফিক কোন সাহসে তাকে চায়ের দোকানে যোগ দিতে বলল। চাকুরি নাই বলেই রিকশাওয়ালাদের জন্যে চা বানাতে হবে? সফিক ভেবেছেটা কী? মান-সম্মান বলে একটা জিনিস আছে ইত্যাদি। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। করিম সাহেব বক বক করতেই লাগলেন,

আমার দাদার বাবা ছিলেন জমিদার বুঝলেন? তিনটা হাতী ছিল আমাদের। জুতা হাতে নিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ হাঁটতে পারত না। জুতা বগলে নিতে হত। আমাদের বসত বাড়ির ইট বিক্রি করলেও লাখ দুই লাখ টাকা হয় বুঝলেন?

সফিক আসলো সন্ধ্যাবেলা। অতিব্যস্ত সে। এসেই এক ধমক লাগাল,

সন্ধ্যাবেলা শুয়ে আছিস। কাপড় পর। 'নীলগঞ্জ হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্ট' দেখিয়ে আনি।

আরেক দিন দেখব। আজ কাজ আছে এক জায়গায়। ন'টার সময় যেতে হবে।

ন'টা বাজতে দেরি আছে উঠ দেখি। করিম সাহেব আপনিও চলেন দেখি। সবাই মিলে রেস্টুরেন্টটা দাঁড় করিয়ে দেই।

করিম সাহেব মুখ লম্বা করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সফিক হাসি মুখে বলল,

ঘর ভাড়া নিয়ে নিয়েছি। সাইন বোর্ড আজ সকালে টাঙ্গিয়ে দিয়ে আসলাম। জিনিসপত্তর কেনাকাটা বাকি আছে। লালুকে সাথে নিয়ে সেই সব কিনব, এক্সপার্ট আদমি সে।

সফিকের উৎসাহের সীমা নেই। আমি শুনছি কী শুনছি না সেই দিকেও খেয়াল নেই। নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছে,

ঘরের মধ্যে পার্টিসন দিয়ে থাকার জায়গা করেছি। দিব্যি পড়াশুনা করতে পারবি তুই। ইলেকট্রিসিটি আছে, অসুবিধা কিছু নাই। তুই আর করিম সাহেব তোরা দুইজন কাল পরশুর মধ্যে চলে আয়।

করিম সাহেব?

হ্যাঁ ও আর যাবে কোথায়? পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কী আর নতুন করে চাকরি করা যায়? দুই একদিন গাঁই গুঁই করবে তারপর দেখবি ঠিকই লেগে পড়েছে হা হা হা।

ঘরের সামনে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। নড়বড়ে একটা ঘর কোনো মতে দাঁড়িয়ে আছে।

এই তোর ঘর?

সফিক বিরক্ত হয়ে বলল,

তুই কী ভেবেছিলি? একটা সাত মহল রাজপ্রাসাদ?

কে আসবে তোর এখানে চা খেতে?

আসবে না কেন সেইটা শুনি আগে?

একটা ছেলে এসে ঘরের তালা খুলে দিল। সফিক হৃষ্ট চিত্তে বলল, এর নাম কাল্লু। দারুণ কাজের ছেলে।

কি রে ব্যাটা আছিস কেমন?

বালা আছি স্যার।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম সব। সারি সারি বেঞ্চ পাতা। ফাঁকে ফাঁকে আবার টুল কাঠের চেয়ার। মেঝেতে ইঁদুর কিংবা সাপের গর্ত। দরমার বেড়ায় এক চিলতে জায়গা আবার আলাদা করা। তার মধ্যে গাদাগাদি করে রাখা দুটি জরাজীর্ণ চৌকি।

সফিক বলল,

কি রে পছন্দ হয়েছে?

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, ভালই তো।

বুঝতে পারছি তোর পছন্দ হয়নি। দেখবি সব হবে। আমি না খেয়ে দিন কাটিয়েছি। রাস্তায় রাস্তায় সুঁচ পর্যন্ত বিক্রি করেছি আমি, কী ভেবেছিস ছেড়ে দিব? আয় চা খাই।

কোথায় চা খাবি?

পাশেই চায়ের দোকান আছে একটা।

চায়ের দোকানের মালিক সফিককে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল।

সফিক হাসিমুখে বলল,

ভাল আছেন নাকি রহমান সাব?

ভাল আর কেমনে থাকুম কন। আমার দোকানের পিছে দোকান দিছেন, ভাল থাকন যায়?

এই তো ভালরে ভাই কম্পিটিশন হবে। যেটা ভাল সেটা টিকবে।

সফিক ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে বলল,

রহমান সাব সব বি. এ. এম. এ পাস ছেলেরা কাজ করবে আমার দোকানে। এই দেখেন একজন বি. এ.পাস।

রহমান সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। সফিক গম্ভীর হয়ে বলল,

আর আমাদের ম্যানেজার কে জানেন নাকি? নিশানাথ জ্যোতির্ষাণব। জ্যোতিষ সাগর। বুঝেন কাণ্ড ইয়া দাড়িইয়া গোঁফ।

রহমান সাহেব নিস্পৃহ সুরে বললেন,

ভদ্রলোক আপনেরা সাবধানে থাকবেন। পাড়াটা গুণ্ডা বদমাইশের পাড়া। আমি থাকতে পারি না আর আপনেরা নতুন মানুষ।

সফিক হেসেই উড়িয়ে দিল,

গুণ্ডা বদমাইশ কী করবে আমাদের? আমাদের ম্যানেজার সাক্ষাত দুর্বাষা মুণি। কাঁচা গিলে ফেলবে।

কাঁচা গিললে তো ভালই। আপনেরা চা খাইবেন? এই চা দে দেখি।

রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে বিড়ি ধরালেন। সফিক ফিসফিস করে বলল, ব্যাটা তখন থেকেই ভয় দেখাচ্ছে শুধু। একবার মিনো গুণ্ডাকে নিয়ে আসব। মিনো গুণ্ডাকে দেখলে রহমান সাহেবের দিল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে দেখিস।

মিনোটা কে?

আছে আছে। আমার কাছেও জিনিসপত্র আছে। হা হা হা । মিনো গুণ্ডা আমার ছাত্র ছিল।

পান্থ নিবাসে ফিরলাম রাত আটটার দিকে। বাড়ির সামনের জায়গাটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে কে যেন বসে আছে। সফিক কড়া গলায় বলল,

কে ওখানে কে?

কোনো সাড়া শব্দ নেই। আরেকটু এগিয়ে যেতেই বুকের মধ্যে কী ধরনের যেন অনুভূতি হল। দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে চেঁচালাম,

কে কে?

আমি নিশানাথ।

আমরা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। সফিক প্রথম বলল, ভাবলেশহীন গলা,

এইখানে কী মনে করে নিশানাথ বাবু? কিছু ফেলে গিয়েছিলেন নাকি?

নিশানাথ বাবু শান্ত গলায় বললেন,

তুমি ভাল সফিক?

আমি কেমন আছি তা দিয়ে আপনার কোন দরকার নিশানাথ বাবু? আমি দৌড়ে গিয়ে নিশানাথ বাবুর হাত ধরে ফেললাম। গাঢ় স্বরে বললাম,

আসেন ঘরে আসেন।

প্রায় দু'মাস পর দেখছি জ্যোতির্ষাণবকে। গেরুয়া পাঞ্জাবি ছাড়া সব কিছু আগের মতই আছে। পাঞ্জাবির বদলে সাদা রঙের একটি শার্ট। বেশ খানিকটা রোগা লাগছে। চোখ দুটি যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। নাকি আমার দেখার ভুল।

সফিক এমন একটা ভাব করতে লাগল যেন জ্যোতির্ষাণবের ফিরে আসাটা তেমন কোন ব্যাপার নয়। সাধুজী যেন চা খেতে গিয়েছিল। চা খেয়ে ফিরে এসেছে। সে গুন গুন করে কী একটা গানের কলি ভাঁজল। তারপর গভীর মনোযোগের সঙ্গে হিসাবপত্রের খাতা বের করে কী যেন দেখতে লাগল। এমন সব ছেলেমানুষী কাণ্ড সফিকের। শেষ পর্যন্ত আমার অসহ্য বোধ হল। চেঁচিয়ে বললাম,

বন্ধ কর তো খাতাটা।

সফিক খাতা বন্ধ করে গম্ভীর স্বরে বলল,

নিশানাথ জ্যোতির্ষাণব, আপনাকে আমাদের ম্যানেজার করা হয়েছে।

কিসের ম্যানেজার?

চায়ের দোকান দিয়েছি আমরা।

জ্যোতির্ষাণবের ঠোঁটের কোণায় হাসি খেলে গেল। হালকা গলায় বললেন, সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত রেস্টুরেন্ট দিয়েছ?

হ্যাঁ ঘর ভাড়া হয়ে গেছে।

ঘর ভাড়া হয়ে গেছে।

হুঁ।

জ্যোতির্ষাণব হাসি মুখে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ আর কেউ কোন কথা বলল না। সফিক মৃদু স্বরে বলল,

নৈশব্দের পরী উড়ে গেছে তাই না নিশানাথ বাবু? হঠাৎ সবাই চুপ করলে পরী উড়ে যায় তাই না?

জ্যোতির্ষাণব মৃদু স্বরে বললেন, তোমার অসুখটা সেড়েছে সফিক?

হ্যাঁ সেরেছে।

জ্বর আসেনা আর?

আর কোনোদিন আসবে না।

আমি বললাম,

আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন?

জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম।

খেতেন কী?

আশ্চর্যের কথা কী জান? খাওয়া জুটে গেছে। না খেয়ে থাকিনি কখনো। পান্থ নিবাসে বরং আমার কষ্ট হয়েছে বেশি।

সফিক দৃঢ় স্বরে বলল,

আর কষ্ট হবে না। আর কখনো না খেয়ে থাকতে হবে না। দেখবেন দিনকাল পাল্টে ফেলব।

নিশানাথ বাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। যেন সফিকের কথাটি ঠিক নয়। সফিক ভুল বলছে। আমি বললাম,

আমাদের কিছু না বলে চলে গেলেন কেন?

খুব মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। মায়া কাটানোর জন্যেই এটা করেছি।

সফিক কড়া গলায় বলল,

মায়া কেটেছে?

নিশানাথ বাবু থেমে বললেন,

মায়া কাটছে সফিক।

তাহলে ফিরে আসলেন কেন?

জ্যোতির্ষাণব তার জবাব না দিয়ে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। যেন খুব একটি ছেলেমানুষী প্রশ্ন তাঁকে করা হয়েছে। কিন্তু ন'টা বেজে যাচ্ছে আমি আর থাকতে পারি না। আমি উঠে দাঁড়ালাম,

এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আসব। একটা খুব জরুরি কাজ আছে না গেলেই নয়।

জ্যোতির্ষাণব আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন।

আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা।

শেলীর বাবা বললেন, 'তোমার দেরি দেখে ভাবলাম হয়তো আসবে না। গাড়ি পাঠাব কিনা তাই ভাবছিলাম।' শেলীর মা কোণার দিকে একটি সোফায় বসেছিলেন, তিনি গলা উঁচিয়ে ডাকলেন,

শেলী শেলী।

শেলী এসে দাঁড়াল পর্দার ও পাশে। হয়ত সে এখানে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। সে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল,

কী জন্যে ডাকছ মা।

ভেতরে আস। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?

বল না কী জন্য ডাকছ?

তোমার স্যারকে চা দাও।

শেলীর বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, দুপুর রাতে চা কেন? টেবিলে খাবার দিতে বল। তুমি নিশ্চয়ই খেয়ে আসনি? আর খেয়ে এসে থাকলেও বস।

খাবার টেবিলে অনেক কথা বললেন ভদ্রলোক। কত কষ্ট করে পড়াশুনা করেছেন। মানুষের বাড়িতে আশ্রিত হিসেবে থাকতেন। সেই সব কথা বলছেন গর্ব এবং অহংকারের সঙ্গে। একজন সফল মানুষের মুখে তার দুর্ভাগ্যের দিনের কথা শুনতে ভালই লাগে। শেলীর মা একবার শুধু বললেন,

এই সব কথা ছাড়া তোমার অন্য গল্প নাই?

ভদ্রলোক হা হা করে হাসতে লাগলেন। যেন মজার একটি কথা বলা হয়েছে। শেলী একটি কথাও বলল না একবার ফিরেও তাকাল না আমার দিকে। একটি গাঢ় নীল রঙের শাড়িতে তাকে জলপরীর মত লাগছিল। শাড়িতে কখনো দেখিনি তাকে। এ যেন অন্য একটি মেয়ে। শেলীর মা খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করছিলেন,

ক ভাই বোন আমরা। কী তাদের নাম। কী করছে। পান্থ নিবাসে থেকে পড়াশুনা করতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়। পড়াশুনা শেষ করে কী করব?

খাওয়া শেষ হতেই আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি কী এখন যাব?

ভদ্রলোক আবার হা হা করে হেসে উঠলেন। যেন এই কথাটিও অত্যন্ত মজার। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন,

নিশ্চয়ই যাবে। তবে তুমি একটা কাজ কর আমার এখানে অনেক খালি ঘর পড়ে আছে। তুমি আমার এখানে এসে থাক।

শেলীর মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন. 'আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি চলে আস এখানে পড়াশুনার তোমার খুব সুবিধা হবে। তা ছাড়া শেলী বেচারী খুব একলা হয়ে পড়েছে। তুমি থাকলে ওর একজন সঙ্গী হয়।' বলতে বলতে মুখ টিপে হাসলেন। শেলীর দিকে ফিরে বললেন,

ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বল তো মা। তোমার স্যারকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। রাত হয়ে গেছে।

শেলী আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে আসল। কিছু একটা বলা উচিত তাকে। কিন্তু কোন কথাই বলতে পারলাম না। গাড়িতে ওঠার সময় শেলী শান্ত স্বরে বললো,

আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে।

ঘরে ফিরে দেখি সফিক শুয়ে আছে। তার চোখ ঈষৎ রক্তাভ। বোধহয় আবার জ্বর আসছে। সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল,

নিশানাথ চলে গেছে। বিদায় নিতে এসেছিল আমাদের কাছে।

কোথায় গেছে?

প্রথমে বারহাট্টা। সেখান থেকে যাবেন মেঘালয়ে। তাঁর কোন জ্ঞাতি খুঁড়ো থাকেন তাঁর কাছে যাচ্ছে। ঐখানেই থাকবে।

আমার অবাক হওয়ার ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। সফিক বললো,

কী জন্যে থাকবে সে? তিন পুরুষের কুলধর্ম ছাড়তে পারে কেউ?

আর আসবে না ফিরে?

না।

সফিক হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে উত্তেজিত স্বরে বলল,

নিশানাথ না থাকুক তুই তো আছিস। দুজনে মিলে দেখ্‌না কী কাণ্ড করি।

আমি চুপ করে রইলাম। সফিক শুয়ে পড়ল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি বেশ জ্বর। সফিক আচ্ছন্নের মত বলল,

জ্যোতির্ষাণব কিন্তু সত্যি ভাল হাত দেখে। আজ আমি অবাক হয়েছি -- খুব অবাক হয়েছি তাঁর ক্ষমতা দেখে।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'কী বলেছে জ্যোতির্ষাণব?'

সফিক সে কথার জবাব দিল না। আমি অবাক হয়ে দেখি তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। অশ্রু গোপন করবার জন্যে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃদু স্বরে বলল,

শুধু জ্যোতির্ষাণব কেন তুই নিজেও যদি আমাকে ছেড়ে চলে যাস আমার তাতে কিছুই যাবে আসবে না। আমি ঠিক উঠে দাঁড়াব।

সেই রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। যেন আদিগন্ত বিস্তৃত একটি সবুজ মাঠ। মাঠের ঠিক মাঝখানে সফিক দাঁড়িয়ে আছে একা একা। তার গায়ে 'মুকুট' নাটকের মধ্যম রাজকুমারের পোশাক। আকাশ ভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না ভেজা সেই রাতে সবুজ মাঠের মাঝখান থেকে সফিক যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল।

ঘুম ভেঙে গেল আমার। বাইরে এসে দেখি ফকফকা জ্যোৎস্না হয়েছে। বারান্দার মেঝেতে অপূর্ব সব নকশা। পায়ে পায়ে এগিয়ে উঁকি দিলাম সফিকের ঘরে।

সফিক অন্ধকারে বসে চা খাচ্ছে একা একা। আমাকে দেখে সে হাসি মুখে ডাকল, চা খাবি রঞ্জু? আয় না, জ্বরটা সেরে গেছে। আমার বেশ লাগছে এখন।

অকারণেই আমার চোখে জল আসল।



তোমাকে

হুমায়ূন ১০ ১০

নীলু বয়সে আমার চেয়ে এগারো মিনিটের বড়। তার জন্মের এগারো মিনিট পর আমার জন্ম হয় এবং দারুণ একটা হৈচৈ শুরু হয়। ডাক্তার শমসের আলি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, আরে যমজ বাচ্চা দেখি। ঠিক তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। আমরা দুই বোন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকি। ডাক্তার শমসের আলি হারিকেনের জন্যে চেঁচাতে থাকেন। আমার নানিজান ছুটে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে পানির একটা গামলা উল্টে ফেলেন।

আমার জন্মের সময় চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বলে বাবা আমার নাম রাখেন রাত্রি। নীলু জন্মের পর পর খুব কাঁদছিল, তাই তার নাম কান্না। এইসব কাব্যিক নাম অবশ্যি টিকল না। একজন হল নীলু। তার সাথে মিলে রেখে আমি হলাম বিলু। তার চার বছর পর আমাদের তিন নম্বর বোনটি হল। মিল দিয়ে নাম রাখলে শুধু মেয়েই হতে থাকবে এই জন্যে তার নাম হল সেতারা। নীলু, বিলু এবং সেতারা।

বাবার রাখা নাম না টিকলেও বাবা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। সুযোগ পেলেই চেঁচিয়ে ডাকতেন, কোথায় আমার বড় বেটি কান্না? কোথায় আমার মেজো বেটি রাত্রি? জন্মদিনে বই উপহার দেবার সময় বইয়ের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় গোটা গোটা হরফে লিখতেন, 'মামণি রাত্রিকে ভালবাসার সহিত দিলাম' কিংবা 'মামণি কান্নাকে পরম আদরের সহিত দেওয়া হইল।'

বইয়ের সঙ্গে সব সময় একটা করে তাঁর স্বরচিত কবিতা থাকত। সে কবিতা তিনি তাঁর প্রেস থেকে ছাপিয়ে ফ্রেম করে বাঁধিয়ে আনতেন। আট বছরেব জন্মদিনে আমি এবং নীলু যে কবিতাটি পেলাম সেটা শুরু হয়েছে এভাবে---

"সাতটি বছর গেল পর পর
আজকে পড়েছে আটে
তব জন্মদিন নয়তো মলিন
ভয়াল বিশ্বহাটে।"

যমজ বোন বলেই আমরা দুজন সব সময় একই কবিতা পেতাম। শুধু কবিতা নয় গল্পের বইও একই হত। দুজনের জন্যে দুটি 'শিশু ভোলানাথ' কিংবা 'ঠাকুরমার ঝুলি'।

আমরা দুজন যে দেখতে অবিকল একরকম এ নিয়ে বাবার মধ্যে একটা গোপন গর্ব এবং অহংকার ছিল। নতুব কেউ এলেই হাসিমুখে বলতেন--- "এরা যমজ। একজনের নাম রাত্রি, একজনের নাম কান্না। যার চুল ছোট ছোট ও হচ্ছে কান্না।" মা বড় বিরক্ত হতেন। ভ্রূ কুঁচকে বলতেন— যমজ মেয়ে নিয়ে এত ঢোল পিটানোর কি আছে? যমজ-ফমজ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না, ছিঃ!

আমাদের দুজনকে যাতে দেখতে এক রকম না দেখায় এ জন্যে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। আমার চুল কেটে ছোট ছোট করে দিলেন। একজনের গায়ের রঙ যেন অন্যজনের চেয়ে আলাদা হয় সে জন্যে নীলুকে সপ্তাহে তিন দিন কাঁচা হলুদ দিয়ে গোসল করাতে লাগলেন। কিছুতেই কিছু হল না। আমরা যতই বড় হতে থাকলাম আমাদের চেহারার মিল ততই বাড়তে লাগল। নীলু যেমন লম্বা আমিও তেমন লম্বা। তার চিবুকের নিচে যে রকম একটি লাল রঙের তিল আমারও অবিকল সে রকম তিল। তার যেমন শ্যামলা গায়ের রঙ আমার তাই। মা পর্যন্ত ভুল করতে লাগলেন। যেমন একদিন বারান্দায় বসে তেঁতুলের খোসা ছড়াচ্ছি, মা ঝড়ের মত এসে প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন।

'এক খিলি পান দিতে বললাম কতক্ষণ আগে?'

আমি শান্ত স্বরে বললাম, 'আমাকে বলনি। বোধহয় নীলুকে বলেছ। আমি বিলু।'

আমার ছোট চুল যখন লম্বা হল তখন দেখা গেল বাবা এবং মা ছাড়া আমাদের কেউ আলাদা

করতে পারে না। কেন পারে না সে-ও এক রহস্য। নীলুর সঙ্গে আমার বেশ কিছু অমিল আছে। যেমন নীলুর নাক একটুখানি চাপা। ওর চোখ দুটি একটুখানি উপরের দিকে ওঠানো। তবুও দোতলার নজমুল চাচা আমাদের দু'বোনকে যখনি দেখেন তখনি বলেন, 'কে কোন জন? কে কোন জন?' নীলু তাতে খুব মজা পায়। আমার অবশ্যি রাগ লাগে। এইসব আবার কি ঢং? নজমুল চাচা সব সময়ই ঢং করেন। মা নজমুল চাচাকে সহ্যই করতে পারেন না। নজমুল চাচার গলা শুনলেই মুখ কুঁচকে বলেন, ভাঁড় কোথাকার। সব সময় ভাঁড়ামি।'

আমাদের নিয়ে সবচে বেশি ভাঁড়ামি করেন অবশ্যি আমার বড় মামা। দিনাজপুর থেকে বেড়াতে এলেই মহা উৎসাহে আমাদের দুজনকে সামনে বসিয়ে উঁচু গলায় বলেন, 'দেখা যাক আমি নীলু বিলুকে আলাদা করতে পারি কি-না। ওয়ান টু থ্রি- হুঁ এই জন হচ্ছে আমাদের বিলুমণি।' বড় মামা ভাঁড়ামি করলে মা রাগ করতেন না, বরং একটু যেন খুশিই হতেন। সবচে খুশি হত নীলু। সে হেসে কুটিকুটি। নীলুর নাম কান্না না হয়েই ভালই হয়েছে। সে হাসতেই জানে, কাঁদতে জানে না। আমরা যখন ক্লাস সেভেনে উঠলাম নীলু আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল তার হাসি নিয়ে। যা-ই দেখে তাতেই তার হাসি পায়। মা হয়ত কিছু নিয়ে ধমক দিয়েছেন। সে মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করবার চেষ্টা করছে। মা কঠিন স্বরে বলছেন, 'হাসছ কেন তুমি?'

'কই হাসছি না তো।'

'মুখ ফেরাও। তাকাও আমার দিকে।'

নীলু মুখ ফেরালে আমরা দেখতাম হাসি থামাবার চেষ্টায় তার গাল লালচে হয়ে উঠেছে।

'কেন তুমি শুধু শুধু হাসছ? হাসির কি হয়েছে বল তুমি, তোমাকে বলতে হবে।'

'আর হাসব না মা। এখন থেকে শুধু কাঁদব।'

বলেই সে আমার ফিক করে হেসে ফেলল। মা প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন।

'বাঁদর কোথাকার। তোমার হাসি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি দেখ।'

নীলুর চোখে জল আসছে কিনা মা দেখতে চেষ্টা করতেন। কোথায় কি? নীলু এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন কিছুই হয়নি। মা ক্লান্ত হয়ে বলতেন, 'ঠিক আছে যাও আমার সামনে থেকে।'

নীলু এমনভাবে ছুটে যেত যেন আড়ালে গিয়ে হেসে বুক হালকা করবে। নীলুটা এমন হয়েছে কেন? এ বাড়িতে সবাই একটু গম্ভীর। সেতারা যার বয়স মাত্র পাঁচ সে পর্যন্ত কম কথা বলে। নীলু কার কাছ থেকে এত কথা বলা শিখল? কার কাছ থেকে অকারণে হাসার এই অদ্ভুত অসুখ জোগাড় করল?

আমার এবং নীলুর খাট দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটায়। নীলু ঘুমায় সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে। তার একা একা ভয় করে। আকবরের মা ঘুমায় বারান্দায়। আমরা ডাকাডাকি করলে তার উঠে আসার কথা। সে একবার ঘুমালে নিশ্চিন্ত। সারা রাতে এক সেকেন্ডের জন্যেও জাগবে না। এমনিতে অবশ্যি বলবে, 'ভইন, আমার সজাগ ঘুম। ইটু শব্দ হইলেই চউখ খোলা।' আকবরের মা কোন কাজ ঠিকমত করতে পারে না। প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। অনেকবার তাকে বিদায় দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, লাভ হয়নি কিছুই। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলেছে, 'যাইতাম না। দেহি কেমনে বিদায় দেয়। তামাশা না? এই বুড়ো বয়সে যাইতাম কই?'

আকবরের মা রাতে ভাতটাত খেয়ে ঘুমাতে এসে জিজ্ঞেস করে, 'কইগো মাইয়ারা, ভূতের কিচ্ছা হুনতে চাও?' নীলু ভীতু সে শুনবে না, কিন্তু যেহেতু আমি শুনি কাজেই তাকেও শুনতে হয়।

'আকবরের বাপের গপটা কই। শইলের মইধ্যের লোম খাড়া হইয়া যায় বুঝছনি মাইয়ারা। শীতের সময়। খুব জার। আকবরের বাপের মাছ মারতে যাওনের কথা। আমারে কইল তামুক দে...'

নীলু গল্পের মাঝখানে জিজ্ঞেস করে, 'তুই করে বলত?'

'তা ঠিক। গরিব মাইনষের কথাবার্তা তুই-তুকারি দিয়া।'

আকবরের মা'র ভাষা ঠিক বোঝা না গেলেও গল্প ধরতে কোনো অসুবিধে হয় না। সব গল্পের শেষে আকবরের বাবা। যার সাহসের কোনো সীমা নেই, একটা ভূতের গলা সাপ্টে ধরে কুমড়ো গড়াগড়ি করবে। এবং সব শেষে ভূতটা জঙ্গল ভেঙে ছুটে যাবে। যাবার সময় বলবে, 'এঁই বাঁর ছাঁইরা দিলাম। বুঁঝছস? জাঁনে বাঁচলি।'

গল্প শেষ হলেই নীলু বলবে, 'দূর, ভূত আবার আছে নাকি?'

আকবরের মা চোখ কপালে তুলে বলবে, 'এইটা কেমুন বেকুবের মতো কথা কইলা? দেশটা ভর্তি ভূত আর পেত্নীতে। আমার সাথে একবার যাইও আমরার নীলগঞ্জের বাড়িত। নিজের চউক্ষে

ভূত দেখবা।'

আকবরের মা শুধু যে আমাদের ভূতের গল্প শোনাবার চেষ্টা করে তাই না, মাকেও শোনাতে চেষ্টা করে। সুযোগ পেলেই একটা গল্প টেনে আনতে চায়, 'বুঝছেন আম্মা, একবার হইল কি...।' মা এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন। আজেবাজে গল্প মা একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। শুধু আকবরের মা নয় বাবাকেও এমনিভাবে থামানো হয়, 'যা বলতে চাও সরাসরি বলতে পার না? এত ফেনাও কেন?

'ফেনাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ফেনাও। বেশি রকম ফেনাও। যা বলার তা সহজভাবে বলতে পারা উচিত।'

'ও।'

'রাগ করলে নাকি আবার?'

'না। আমি এত সহজে রাগ করি না।'

বাবার এই কথাটি খুব সত্যি। বাবা রাগ করতে পারেন না। নীলুর ধারণা বাবা মোটা বলেই রাগ করতে জানেন না। মোটা মানুষদের এই একটা বড় অসুবিধে। কথাটা হয়ত সত্যি। আমাদের স্কুলের মোটা আপাগুলিকে কিছুতেই রাগানো যায় না। আর চিকনা আপাগুলি কারণ ছাড়াই চিড়বিড় করছে। আমাদের মা নিজেও রোগা বলেই বোধহয় তাঁর রাগ বেশি। তিনি রাগেন না শুধু আমাদের প্রেসের ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে। তাঁর নাম প্রণব বসু। এঁর অনেক রকম গুণ আছে। চমৎকার গান গাইতে পারেন। এবং চমৎকার গল্প করতে পারেন। তারচে বড় কথা চমৎকার রসিকতা করতে পারেন। এবং রসিকতাগুলি করেন গম্ভীর মুখে।

যেমন একদিন নীলুকে বললেন, 'এই নীলু কাল কি হয়েছে জানিস?'

'না তো কি হয়েছে?'

'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে ওস্তাদ আছেন মুনসি মীর আলি, তিনি কাল জিলা স্কুলের মাঠে রাগ জয়-জয়ন্তী গেয়ে দুটি মেডেল পেয়েছেন। একটা বড় মেডেল। একটা ছোট মেডেল। ছোটটা পেয়েছেন গান গাওয়ার জন্যে আর বড়টা পেয়েছেন গান থামানোর জন্যে।

প্রণব বাবুকে আমরা ডাকি ম্যানেজার কাকু। মা ডাকেন ম্যানেজার। বাবা ডাকেন "বোস"। ভাল কিছু রান্নাটান্না হলে বাবা বলবে, 'দেখি বোসকে একটা খবর দাও তো। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু গান-বাজনা হবে।'

ম্যানেজার কাকু অবশ্যি সহজে গান-বাজনা করেন না। তবে যদি ধরে-বেঁধে একবার বসানো যায় তখন গান চলে গভীর রাত পর্যন্ত। আমরা অবশ্যি এত রাত পর্যন্ত থাকতে পারি না। ধমক দিয়ে মা আমাদের নিচে পাঠিয়ে দেন। তবে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা জেগে গান শুনি। আমাদের নিজের গান শেখার খুবই সখ। মাকে বেশ কয়েকবার বলাতে মা ম্যানেজার কাকুকে বললেন, 'ওদের একটু গান শেখান না।'

ম্যানেজার কাকু গম্ভীর গলায় বললেন, 'বৌদি ওদের বয়স কম।'

'কম বয়স থেকেই তো শুনেছি গান-বাজনা শুরু করতে হয়।'

'উঁহু, সংগীতের জন্যে মমতা ছাড়া কিছু হয় না। সেই মমতাটা অল্প বয়সে হয় না। আপনি যদি শিখতে চান শেখাতে পারি।'

'রক্ষা কর, এই বয়সে আর আঁ আঁ করতে পারব না।

ম্যানেজার কাকুকে একমাত্র নীলু ছাড়া আমরা সবাই বেশ পছন্দ করি। নীলু যদিও ম্যানেজার কাকুর রসিকতায় সবচে উঁচু গলায় হাসে কিন্তু আড়ালে বলে, 'আমার ম্যানেজার কাকুকে ভাল লাগে না।'

'কেন, ভাল না লাগার কি আছে?'

'আছে একটা— কিছু। আমি জানি না কি।'

নীলু মাঝে মাঝে এলোমেলো কথাবার্তা বলে এবং সেগুলি সত্যি হয়ে যায়। সেতারা যেদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে সেদিন সকালবেলাতেই নীলু বলেছে, 'আমি রাতে স্বপ্নে দেখেছি সেতারা খাট থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে।' ম্যানেজার কাকু প্রসঙ্গে নীলুর আশংকাও সত্যি হয়ে গেল।

আমরা স্কুলে গিয়েছি। থার্ড পিরিয়ডে জিওগ্রাফি আপা এসে বললেন, 'নীলু বিলু তোমরা

দুজন বাসায় যাও তো, তোমাদের নিতে এসেছে।' আমরা অবাক হয়ে বাসায় এসে দেখি আকবরের মা সেতারাকে ঘুম পাড়াচ্ছে, বাসায় মা-বাবা কেউ নেই। দোতলার নজমুল চাচা শুধু বসার ঘরে মুখ কালো করে বসে আছেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। মা নাকি ম্যানেজার কাকুর সঙ্গে কোথায় চলে গেছেন। আর আসবেন না— এ রকম একটা চিঠি লিখে গেছেন।

বাবা ফিরলেন রাত এগারোটায়। আমরা জেগে বসে আছি। অনেক লোকজন এসেছে। কেউ যাচ্ছে না। সবাই গম্ভীর মুখে বসে আছেন বসবার ঘরে। বাবা ঘরে ঢুকে এমন ভাব করলেন যেন কিছুই হয়নি। হাসিমুখে বললেন, 'রেণু ঝগড়া করে সকালের ট্রেনে দিনাজপুর তার বাবার বাড়ি চলে গেছে। আমি ছিলাম না। ভাগ্যিস প্রণব বাবু বুদ্ধি করে সঙ্গে গেছেন। নয়তো একা একা মেয়েছেলে এত দূর যাবে, দেখেন না অবস্থাটা। এই মেয়েজাতটার মত রাগ আর কারোর নেই। হা হা হা। এদের নিয়েও চলে না। না নিয়েও চলে না।'

লোকজন সব বারটার মধ্যে চলে গেল। আমরা নিজেদের ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন।

'মামণিরা ঘুমাচ্ছ?'

আমরা কেউ জবাব দিলাম না। বাবা মৃদু স্বরে বললেন, 'আজ রাতে তোমরা আমার সঙ্গে ঘুমাবে মামণিরা?'

নীলু শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সে সময় আমার এবং নীলুর বয়স বার, সেতারার সাত।

মা চলে গিয়েছেন এবং আর কোনোদিন ফিরে আসবে না— এটা আমরা খুব সহজেই বুঝে ফেললাম। শুধু সেতারা বুঝতে চাইল না। সে এমনিতেই কম কথা বলে। এখন কথাবার্তা পুরোপুরি বন্ধ করে দিল। দিনরাত সে শুধু মাকে খুঁজত। মা'র শোবার ঘরের সামনে কতবার যে গিয়ে দাঁড়াত। ডাকাডাকি না কিছু না, শুধু দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা। আমি একদিন দেখতে পেয়ে ডাকলাম, 'এই সেতারা।'

'উ।'

'এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

সেতারা মাথাটা অনেকখানি নিচু করে ফেলল যেন খুব-একটা অপরাধ করেছে।

'কি করছিস তুই?'

'কিছু না।'

'আয় আমার সাথে নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করব, আসবি?'

'না।'

আমি লক্ষ্য করি সে একা একা ঘুরে বেড়াতে চায়। কারো সঙ্গে থাকতে চায় না। সন্ধ্যাবেলা কেউ কিছু বলার আগেই সে 'আমার সাথী' বই নিয়ে বসে একদম নিচু স্বরে পড়তে থাকে

'কমলাফুলি কমলা ফুলি
কমলা লেবুর ফুল
কমলা ফুলির বিয়ে হবে
কানে মোতির দুল'।

যখনি সে পড়তে বসে এই একটি কবিতাই সে পড়ে। তখন যদি বাড়ির সামনে কোনো রিকশা এসে থামে সে পড়া বন্ধ করে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। এক সময় বই বন্ধ করে অপরাধীর মত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে চলে যায় বারান্দায়। আবার ফিরে এসে পড়তে বসে— কমলাফুলি, কমলাফুলি কমলা লেবুর ফুল....।

একদিন নীলু বলল, 'সেতারা মা আমাদের কাউকে পছন্দ করেন না তো তাই চলে গেছেন। আর আসবেন না।'

'আচ্ছা।'

যে আমাদের ভালবাসে না আমরাও তাকে ভালবাসি না, ঠিক না?

'হুঁ।'

'তুই আর মাকে খুঁজবি না— আচ্ছা?'

সেতারা মৃদু স্বরে বলল, 'আমাদের পছন্দ করে না কেন?'

'আমরা সবাই তো মেয়ে এই জন্যে, ছেলে হলে পছন্দ হত। আমাদের তো কোন ভাই নেই। বুঝেছিস?'

'হুঁ।'

সেতারা মায়ের আদর পায়নি বললেই হয়। তার জন্মের পর পর মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেতারা বড় হতে থাকে আকবরের মার কোলে। মার অসুখ যখন সারল তখনো অবস্থার পরিবর্তন হল না। মা মাঝে মাঝেই বিরক্ত স্বরে বলতে লাগলেন, 'ঘর ভর্তি হয়ে যাচ্ছে মেয়ে দিয়ে, ভাল লাগে না।' সেতারা যখন হাঁটতে শিখল, টুকটুক করে হাঁটত। মায়ের ঘরে গিয়ে দাঁড়াত সুযোগ পেলেই। মা গম্ভীর গলায় ডাকতেন, 'আকবরের মা ওকে নিয়ে যাও তো, এখুনি ঘর নোংরা করবে।' তার দু'বছর বয়স হতেই মা ওকে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের ঘরে। রাতে ঘুমাবে নীলুর সঙ্গে। দুধ খাবার জন্যে কাঁদলে আকবরের মা উঠে দুধ বানিয়ে দেবে। সেতারা তখন কোনো ঝামেলা করেনি। এখনো করে না। নীলুর গলা জড়িয়ে ঘুমায়। নীলু বলে, 'গল্প শুনবি?'

'বল।'

'এক দেশে ছিল এক রাজা। তার দুই রানী দুয়ো ও সুয়ো...'

এ পর্যন্ত আসতেই সেতারার চোখ বুজে আসে। কোনোদিন আর সে গল্প শেষ পর্যন্ত শোনা হয় না।

ইদানীং বাবা সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমাতে চান। সেতারাও বেশ ভাল মানুষের মত যায়। কিন্তু মাঝরাতে একা একা চলে আসে আমাদের ঘরে। রোজ এই কাণ্ড। একরাতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল, সেতারা সবাইকে ডাকতে লাগল, 'মা এসেছে রিকশা নিয়ে।' আমরা ধড়মড় করে উঠে বসলাম, 'কোথায়?'

'বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম।'

'বলিস কি?'

হৈচৈ শুনে বাবা উঠে এলেন। কোথায় কি, খা-খা করছে চারদিক! সেতারা দারুণ অবাক হল। বাবা বললেন, 'স্বপ্ন দেখেছ মা।'

'উঁহু স্বপ্ন না। আমি দেখলাম।'

সেতারা চোখ বড় বড় করে সবার দিকে তাকাতে লাগল। সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছে না। বাবা সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। সে রাতে আমি এবং নীলু এক খাটে ঘুমাতে গেলাম। এবং অনেক রাত পর্যন্ত দুজনেই নিঃশব্দে কাঁদলাম। অথচ দুজনই এমন ভাব করতে লাগলাম যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ধীরে ধীরে অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটল বাড়িতে। বাবা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি পরিবর্তনগুলি করলেন খুব সাবধানে। একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি মা'র আলনায় কোনো কাপড় নেই। সব বাবা কোথায় সরিয়ে ফেলেন। তার দিন সাতেক পর বারান্দায় মা'র যে বড় বাঁধাই করা ছবিটি ছিল সেটিকে আর দেখা গেল না। বাবা-মার শোবার ঘরে তাদের বেশ কয়েকটি ছবি ছিল, সেগুলিও সরানো হল।

আমাদের ঘরে মা-বাবা এবং আমাদের তিনজনের যে ছবিটি ছিল সেটি শুধু বাবা সরালেন না। রান্নাবান্না করবার জন্যে রমজান নামের একজন বুড়ো মানুষ রাখা হল। এই লোকটি এসেই প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু করল আকবরের মা'র সঙ্গে। দুজনেরই কি ঝাঁঝাল কথাবার্তা। কিন্তু রমজান লোকটি ভাল। সে সেতারাকে কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ভাত খাওয়াত। আমাদের ওপর তার খবরদারিরও সীমা ছিল না।

'এই সইন্ধ্যা রাইতে বাগানো ঘুরাঘুরি করণ ঠিক না।'

'অত তেঁতুল খাওন বালা না, বুদ্ধি নষ্ট হয়।'

'ভাত খাওনের আগে বিসমিল্লা কইরা এট্টু লবণ মুখের মইধ্যে দেওন দরকার।'

রাতের বেলায় খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সে গম্ভীর হয়ে একটা খবরের কাগজ নিয়ে আমাদের পড়ার ঘরে গিয়ে বসত। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এমন সব কথাবার্তা বলত যে নীলু হেসে উঠত খিলখিল করে।

'হুঁ খুব সংকটময় অবস্থা। বুঝছ নীলু আপা, অবস্থা সংকটময়।'

'কেন?'

'নেপালে পাহাড়ি ঢল। হুঁ।'

এই অবস্থায় ঝগড়া লেগে যেত আকবরের মা'র সঙ্গে, আকবরের মা কোমরে দুই হাত দিয়ে রণরঙ্গিনী মূর্তিতে এসে দাঁড়াত।

'বিদ্যার জাহাজ যে বইছেন পাকঘরের বাসনডি কেডা ধুইব?'

'চুপ থাক। অশিক্ষিত মূর্খ মেয়ে মানুষ, এদের নিয়ে চলাফেরা মুশকিল।'

রমজান ছাড়াও একজন ভয়ংকর রোগা দাঁত নেই ওস্তাদ রাখা হল। এই ওস্তাদটির নাম মুনশী সোভাহান। তিনি আমাদের তিন বোনকে সপ্তাহে তিন দিন গান শেখাবেন। আমরা তিন জনেই গান শিখতে শুরু করলাম। সকাললো হারমোনিয়াম নিয়ে বসে 'সারেগা রেগামা গামাপা'। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। ওস্তাদ সোভাহান বেশিক্ষণ গান শেখাতে পারেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হাঁপানির টান ওঠে। গান থামিয়ে বলেন, 'ঘরে কোনো টিফিন আছে কিনা দেখ তো খুকি। না থাকলে একটা মুরগির ডিম ভেজে দিতে বল। হাঁসের ডিম না। হাঁসের ডিম গন্ধ করে, খেতে পারি না।'

গানের ওপর থেকে আমাদের মন উঠে গিয়েছিল, কাজেই আমাকে দিয়ে গান হল না। সেতারা এবং নীলু শিখতে লাগল। কিছুদিন পর নীলুও কেটে পড়ল। রইল শুধু সেতারা। মাস ছয়েকের মধ্যে দেখা গেল বেণী দুলিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সেতারা গাইছে, 'নবীর দুলালী মেয়ে খেলে মদিনায়। ও ও ও খেলে মদিনায়।'

ওস্তাদ সোভাহান ঘাড়-টান দুলিয়ে বলেছেন, 'মারহাবা মারহাবা কি টনটনে গলা। এইবার লক্ষ্মী ময়না গিয়ে দেখ তো কোনো টিফিন আছে কিনা। না থাকলে মধুর দোকান থেকে যেন একটা আমৃত্তি নিয়ে আসে। আর চা দিতে বল।'

সে বছর শীতের সময় মা আমাদের তিন বোনকে সিরাজগঞ্জ থেকে আলাদা আলাদা চিঠি লিখলেন। বাবা একদিন সন্ধ্যায় পাংশুমুখে তিনটি খামে বন্ধ চিঠি নিয়ে আমাদের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। কাঁপা গলায় বললেন, 'তোমাদের মা চিঠি লিখেছেন। তোমরা কি সেই চিঠি পড়তে চাও?'

বাবার গলা কাঁপছিল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম বাবা চাচ্ছেন আমরা বলি, 'না'। বাবা কপালের ঘাম মুছে নিচু স্বরে বললেন, 'আমরা সবাই তাকে ভুলতে চেষ্টা করছি। এখন আবার চিঠিপত্র শুরু করলে কষ্ট হবে। নতুন করে কষ্ট হবে।'

বাবা থামতেই সেতারা বলল, 'আমার চিঠি দাও।' খানিকক্ষণ চুপ থেকে নীলু বলল, 'আমার চিঠিটাও দাও।' শুধু আমি কিছুই বললাম না। বাবা ধরা গলায় বললেন

'মামণি রাত্রি, তোমারটা?'

'আমি চাই না।'

কি লেখা ছিল নীলু এবং সেতারার চিঠিতে আমি জানি না। নীলু সমস্ত কথাই আমাকে বলে। শুধু চিঠির ব্যাপারে কিছু বলল না। আর সেতারা তো তার খামই খুলল না। বন্ধ খাম হাতে নিয়েই ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আমি বললাম, 'খুলে দেব?'

'না।

'না খুললে পড়বি কি করে?'

'আমি পরে পড়ব।'

যেন পড়লেই চিঠির মজা শেষ হয়ে যাবে। আমি সমস্ত দিন ভাবলাম কি লিখেছেন মা চিঠিতে? ক্লাসে আপারা কি পড়ালেন কিছুই বুঝতে পারলাম না। অংক আপা দু'বার ধমক দিলেন, 'এই বিলু তোমার পড়ায় আজকে মন নেই, কি ব্যাপার?'

'কিছু না আপা।'

'আমি কি বলছি তুমি তো কিছুই শুনছ না।'

'শুনছি আপা।'

'না শুনছ না। বল তো আমি কি বলছিলাম?'

আমি বলতে পারলাম না। সব মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার ক্লাসের মেয়েরা বিচিত্র কারণে আমাকে অপছন্দ করে। সব সময় আমার পেছনে লেগে থাকে। আমাদের বাথরুমের দেয়ালে আমাকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা লেখা। একটা নেংটা মেয়ে এবং একটা নেংটা ছেলের ছবি আঁকা আছে। মেয়েটার গায়ে লেখা বিলু ক্লাস নাইন খ শাখা। অথচ কোথাও নীলুর নামে কিছু লেখা নেই। আমি কখনো বাথরুমে যাই না। যদি যেতেই হয় তাহলে অনেকক্ষণ সেখানে বসে কাঁদি। ইরেজার দিয়ে লেখাগুলি তুলে ফেলতে চেষ্টা করি— কিছুতেই সেগুলি উঠানো যায় না।

'বিলু মন দিয়ে পড়াশুনা করবে, বুঝলে। এরকম করলে তো হবে না।'

ক্লাসের মেয়েগুলি আবার হৈচৈ করে হেসে উঠল। বাড়িতে ফিরে এসে অনেকক্ষণ একা একা বসে রইলাম। রাতে রমজান ভাইকে বলে দিলাম, 'ক্ষিধে নেই, কিছু খাব না।' অনেক রাতে ঘুমাতে গিয়ে দেখি আমার বালিশের নিচে মায়ের পাঠানো খামটা রেখে দেয়া। নিশ্চয়ই বাবার কাণ্ড।

ঘরে কেউ নেই। নীলু এখনো পড়ছে। সেতারা রান্নাঘরে রমজান ভাইয়ের সঙ্গে কি যেন করছে। আমি দরজা বন্ধ করে খাম খুলে ফেললাম। মা আমাকে বিলু নামে সম্বোধন করেননি, প্রথমবারের মত লিখেছেন রাত্রি।

মামণি রাত্রি,

আমি জানি রাগ করেছ তুমি। কিন্তু কি করব মা। উপায় ছিল না। তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝবে। মানুষের মন খুব বিচিত্র জিনিস। একবার কোনো কিছুতে মন বসে গেলে তা ফেরানো যায় না। আমি বহু চেষ্টা করেছি। মানুষ হয়ে জন্মানোর মতো কষ্টের কিছু নেই। আমি তোমাদের ছেড়েছুড়ে এসেছি তবু রাতদিন তোমাদের কথাই ভাবি। রাতদিন প্রার্থনা করি যে কষ্ট আমি পাচ্ছি তা যেন কখনো আমার মামণিদের না হয়।

—তোমার মা

থার্ড পিরিয়ডে অংক আপা ক্লাসে ঢুকেই বললেন, 'বিলু ক্লাস শেষে আজি তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। অংক আপা আজেবাজে প্রশ্ন করবেন। কয়েকদিন আগে হাফ টাইমের সময় অংক আপার সঙ্গে দেখা। আপা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তোমার মা শুনলাম ঐ লোকটার সঙ্গে ইন্ডিয়া চলে গেছে, সত্যি নাকি?'

'না সত্যি না।'

'কোথায় আছে তাহলে?'

আমি চুপ করে রইলাম।

আপা গলা নিচু করে বললেন, 'বলতে পার না, না?'

'সিরাজগঞ্জে আছেন।'

'ও বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে নাকি?'

'আমি জানি না আপা?'

'আমাকে কে যেন বলল একটা ছেলে হয়েছে।'

আমার নিজের ধারণা মেয়েদের মতো হৃদয়হীন পুরুষরা হতে পারে না। ছেলেরা কেউ এখনো আমাকে আমার মা প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। অথচ চেনাজানা মেয়েদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কিছু জানতে চায়নি।

ক্লাসের বন্ধুদের কথা বাদই দিই, বন্ধুদের মা-খালাদের পর্যন্ত কৌতূহলের সীমা নেই। কোনো না কোনো ভাবে টেনেটুনে ঐ প্রসঙ্গ আনবেই।

'বিলু তোমরা আগে কিছু টের প্াওনি? আগেই তো টের পাওয়া উচিত।'

'তোমার মা নাকি যাবার আগে বহু টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে?

মা গিয়েছেন প্রায় দু'বছর আগে। এখনো কেউ সেটা ভুলতে পারে না কেন কে জানে?

অংক ক্লাসটা আমার খুব খারাপভাবে কাটল। ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র গেলাম আপার কাছে। আপার নিজের কোনো ঘর নেই। কমন রুমে একগাদা টিচারের সঙ্গে বসে আছেন। তিনি আমাকে

আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের বাড়িতে বয়স্ক মহিলা কেউ নেই?'

'কাজের একটি মেয়ে আছে। আকবরের মা।'

'সে ছাড়া কেউ নেই?'

'জি না আপা। কেন?'

'তোমরা তো বড় হচ্ছ এখন, কিছু কিছু জিনিস তোমাদেব বলা দরকার, কেউ বলছে না তাই তোমাকে ডাকলাম।'

'আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আপা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'বিলু তোমার এবং নীলুর দুজনেরই এখন ব্রা পরা উচিত।'

আমি চোখ-মুখ লাল করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'তোমার বাবাকে বলবে কিনে দিতে। বাবাকে বলাব মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। আর যদি লজ্জা লাগে তাকে আমি একটি চিঠি লিখে দিতে পারি।'

'দিন, একটা চিঠি লিখে দিন।'

'ঠিক আছে, ক্লাস ছুটির পর চিঠি নিয়ে যেও। আরেকটি কথা, নীলু মোটেই পড়াশোনা করছে না। তোমার বাবাকে বলবে কোনো প্রাইভেট টিচার রেখে দিতে। অংকে সে খুব কাঁচা। অংক জানে না বললেই হয়।'

'আপা আমি বলব।'

'ঠিক আছে তুমি যাও এখন। এই সব বললাম দেখে কিছু মনে করনি তো?'

'জি না।'

'মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। রাগ করার কিছু নেই বিলু। তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি। এত ঝামেলার মধ্যেও যে মেয়ে প্রতি বিষয়ে সবচে' বেশি নাম্বাব পায় তার প্রশংসা তো করতেই হয়।'

অংক আপা একটু হাসলেন।

'বিলু?'

'জি।'

'কখনো কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবে।'

'ঠিক আছে আপা বলব।'

'শোন আরেকটা কথা। ইয়ে কি যেন বলে তোমার বাবা নাকি আবার বিয়ে করছেন?'

'জি না।'

'তুমি বোধহয় জানো না। বাবার বিয়ের কথা তো মেয়েদের জানার কথা নয়।'

বাবার বিয়ের কথা কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। দিনাজপুর থেকে বড় মামা এসেছিলেন। তিনি পর্যন্ত নীলুকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'দুলাভাই নাকি বিয়ে করছেন?' নীলু তার স্বভাবমত হেসে ভেঙে পড়েছে।

'হাসছিস কেন?'

'হাসির কথা বললে হাসব না মামা?'

'আমি কি হাসির কথা বললাম নাকি? বিয়ে করলে তোদের অবস্থাটা কি হবে ভেবেছিস?'

'কি আর হবে। আমার তো মনে হয় ভালই হবে। কথা বলার একজন লোক পাওয়া যাবে।'

'কথা বলার লোকের তোর অভাব?'

'হ্যাঁ মামা। বিলুর সঙ্গে কি আর কথা সব বলা যায়? মা জাতীয় একজন কেউ লাগে। বাবা বিয়ে করলে ভাল হয় মামা।'

'কবছেন নাকি?'

'জানি না মামা। দবে দোতলার নজমুল চাচা একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা এখন একটা বিয়ে করলে মনে হয় সংসার স্বাভাবিক হয়।'

'তুই কি বললি?'

'আমি বললাম, তা তো ঠিকই।'

মামা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। নীলু বলল, 'তারপর একদিন এক বুড়োমত ভদ্রলোক এসে বাড়িটাড়ি ঘুরেটুরে দেখলেন। মার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক কি রকম ছিল জিজ্ঞেস টিজ্ঞেস করলেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ মামা, বিয়ে বোধহয় লেগে যাচ্ছে।'

নীলু খিলখিল করে উঠল। আমি নিজেও অবাক হলাম। এসব কিছুই আমি জানি না। নীলু আজকাল অনেক কথাই আমাকে বলে না। প্রায়ই সে তার বান্ধবীর বাড়ি যাচ্ছে হঠাৎ করে তার সঙ্গে এত খাতির হল কেন-- জিজ্ঞেস করাতে সে গা এলিয়ে হেসেছে। এ বাড়ির সবাই বদলে যাচ্ছে। বাবা বদলেছেন সবচেয়ে বেশি। আমাদের জন্মদিন গেল জুন মাসের দশ তারিখ। বাবা কোনো কবিতা লিখলেন না। কয়েকদিন আগে দেখলাম সেতারাকে কি জন্যে যেন ধমকাচ্ছেন। সেতারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বাবার এরকম আচরণ তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। বাড়িও ফিরছেন আজকাল অনেক রাতে। গতকাল বাড়ি ফিরলেন সাড়ে এগারোটার দিকে। আমি জেগে বসে ছিলাম। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে আছ কেন? আর থাকবে না। দশটা বাজতেই ঘুমাতে যাবে।'

আমি শান্ত স্বরে বললাম, 'তুমি আমার সঙ্গে এত রেগে রেগে কথা বলছ কেন?'

'রেগে রেগে কথা বলছি নাকি?'

আমি উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। বাবা খাওয়া-দাওয়ার পর আমার ঘরে পাশের জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'এই বিলু, বিলু।' আমি ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। বাবা বেশ খানিক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন।

বাবা এরকম ছিলেন না, বাবা বদলে যাচ্ছেন। নীলু তো বদলে গেছে। আমি নিজেও বোধহয় বদলাচ্ছি। একা একা থাকতে ইচ্ছে করে। সেদিন খুব ঝগড়া করলাম নীলুর সঙ্গে। আমি মাঝে মাঝে অচেনা সব মানুষদের মন গড়া চিঠি লিখি, নীলু সেটা জানে। তবু সে একটা চিঠি হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'প্রেমপত্র নাকি রে?' তারপর মুখ বাঁকা করে পড়তে শুরু করল -- 'আপনাকে একটি কথা বলা হয়নি। এখন শ্রাবণ মাস তো, তাই খুব বৃষ্টি হচ্ছে। রাতদিন ঝমঝম বৃষ্টি·।' নীলু বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, 'শ্রাবণ মাস কোথায় রে, এটা তো আশ্বিন মাস। তোর মাথাটা খারাপ। হি-হি-হি।' আমি চিঠি কেড়ে নিয়ে নীলুর গালে একটা চড় কষিয়ে দিলাম। নীলু দারুণ অবাক হয়ে গেল। আমি এরকম ছিলাম না।

বাবা বিয়ে করলে সংসার স্বাভাবিক হলে তো ভালই হয়। নীলু ঠিকই বলেছে. সব বাড়িতে মা জাতীয় একজন কেউ দরকার। সে সময়মত মেয়েদের ব্রা কিনে দেবে।

কিন্তু আমার বড় মামা সেদিকটা দেখছেন না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু-একটা হতে যাচ্ছে। মামা বললেন, 'খোঁজখবর না রাখায় এটা হচ্ছে। নানান ধান্ধায় থাকি।'

খোঁজখবর নেই তা ঠিক। মামার বাড়ির সঙ্গে এখন সম্পর্ক নেই বললেই হয়। মামারা অনেকদিন ধরে আসেন না। আগে ঘনঘন আসতেন এবং যতবার আসতেন ততবারই জিদ করতেন আমাদের দিনাজপুরে নেবার জন্যে। বাবা ব্যবসাপাতির ঝামেলা তুলে এড়িয়ে যেতেন। মা স্পষ্ট বলতেন, 'তোমাদের বৌদের সঙ্গে আমার বনে না। বাবা মা মারা গেলে বাপের বাড়ি থাকে না। সেখানে যাওয়াও যায় না।'

বাবা আবার বিয়ে করবেন কি-না এই প্রসঙ্গে বড় মামার এরকম কৌতূহলের কারণ কি আমি ধরতে পারি না। মামাদের সঙ্গে আমার বাবার তেমন আন্তরিকতা নেই। এইসব নিয়েও মার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হত। মা বলতেন, 'আমার ভাইদের তুমি সহ্য করতে পার না, এর কারণ কি আমাকে বল তো?'

'সহ্য করতে না পারার কি আছে?'

কথা বল না, চুপচাপ থাক।'

'একেক জনেনর একেক রকম স্বভাব। আমার স্বভাবই হচ্ছে কথা কম বলা।'

'দোতলার নজমুল হুদা সাহেবের সঙ্গে তো খুব বকবক কর।'

'আমি বকবক করি না। উনি করেন আমি শুনি।'

'আমার ভাইদের সঙ্গে তো তাও কর না।'

'ওনার বকবকানি শোনা যায়। তোমার ভাইদেরটা শোনা যায় না।'

'ও— তাই বুঝি?'

বাবা চুপ। মা কাটা কাটা গলায় বললেন, 'বেশ তো আমি ওদের বলব যেন আর না আসে।'

মামাদের আসা বন্ধ হয়নি। আমার ধারণা বাবার কাছ থেকে তাঁরা টাকা-পয়সা নিতেন। আমার সব মামারাই ব্যবসা করতেন। টাকার দরকার তাদের লেগেই থাকত। এটা অবশ্যি আমাদের অনুমান। কারণ মামারা হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেই মা গম্ভীর মুখে বলতেন, 'দরকার ছাড়া তো তোদের আসা হয় না, আবার দরকার হয়েছে বুঝি?' মামারা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতেন।

এবারো যখন এলেন সম্ভবত টাকার জন্যেই এলেন। বাবার ব্যবসাপাতির অবস্থা সম্পর্কে খুব ব্যস্ত হয়ে খোঁজখবর শুরু করলেন। আমার ঘরে ঢুকে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'দুলাভাইয়ের ব্যবসা কেমন চলছে রে?'

'ভালই বোধহয়। আমি তো এইসব ঠিক জানি না।'

'না জানলে হবে কেন? খোঁজখবর রাখতে হয়। দুলাভাইয়ের ছেলে নেই। তোদেরই তো খোঁজ করতে হবে। ঠিক না?'

আমি চুপ করে থাকি। বড় মামা সিগারেট ধরান একটা। নিচু গলায় বললেন, 'মনে হল দুলাভাইয়ের ব্যবসা ভালোই হচ্ছে। তোদের গান-বাজনা শেখাচ্ছেন, এসব তো দারুণ খরচান্ত ব্যাপার। হাতি পোষার মতো, লাভ হয় না কিছু।'

'লাভ হবে না কেন?'

'আরে দূর, দুই-একদিন সারেগামা করলেই যদি গান হত তাহলে কি আর কথা ছিল নাকি?'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। বড় মামা হঠাৎ করে বললেন, 'তোদের এখন শাড়ি পরা উচিত, বুঝলি? তোর আর নীলুর। বড় হয়ে গেছিস।'

'কথাটা এমন অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলা যে আমি হকচকিয়ে গেলাম। বড় হয়ে যাচ্ছি। বড় হওয়াটা খুব-একটা কি বাজে ব্যাপার?'

'রাস্তাঘাটে একা একা চলাফেরা করবি না। ঐদিন দেখলাম সন্ধ্যার পব নীলু বাড়ি আসল।'

'বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। জন্মদিন।'

'জন্মদিন-ফন্মদিন যাই হোক একা একা যেন না যায়। সুন্দরী মেয়েদের অনেক রকম যন্ত্রণা।'

'আমরা সুন্দরী বুঝি?'

'হুঁ, ইয়ে সুন্দরী তো বটেই। আয়না দিয়ে নিজেদের দেখিস না?'

আমি হঠাৎ বলে বসলাম, 'কে বেশি সুন্দর মামা? আমি না নীলু?'

মামা জবাব দিলেন না। তাঁকে খুব বেশি চিন্তিত মনে হতে লাগল।

ক্লাস নাইনের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষাতে নীলু অংক এবং ইংরেজিতে পাস করতে পারল না। অংকে পেল তেইশ আর ইংরেজিতে একত্রিশ। তাকে খুব বিচলিত মনে হল না। হাসিমুখে বলল, 'দূর আমি আর পড়াশুনা করব না।'

'করবি না তো কি করবি?'

'বিয়ে করব।'

'বিয়ে করবি মানে? কাকে বিয়ে করবি?'

'বিয়ে করার লোকের অভাব আছে নাকি? আমি 'হ্যাঁ' বললে এক্ষুণি দু'তিনটা ছেলে চলে আসবে।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ, তুই কী ভাবিস আমাকে?'

আমি প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম, 'বাবা পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে রাগ করবেন।'

'রাগ করবার কী আছে? সবাই একরকম হয়? কেউ ভাল করে, কেউ করে না।'

বাবা রাগ করলেন না। প্রগ্রেস রিপোর্টটা দেখলেন অবাক হয়ে।

'এ রকম হয়েছে কেন নীলু?'

'পড়াশুনা করতে আমার ভাল লাগে না বাবা।'

'আগে তো লাগত।'

'আগেও লাগত না। জোর করে পড়ড়াম।'

'ভাল না লাগলেও অনেক কিছু করতে হয় নীলু। তোমাদের জন্যে একজন টিচার রেখে দিলে কেমন হয়?'

নীলু কথা বলে না। বাবা বললেন, 'তোমার কী মনে হয় বিলু মা?'

'ভালই হবে।'

নীলু হালকা স্বরে বলল, 'এখন থেকে আমি একা একটা ঘরে থাকতে চাই বাবা।' পশ্চিমের ঐ ঘরটা পরিষ্কার করে দিলেই হবে। আমি রমজান ভাইকে বলব।'

'একা থাকার দরকার কী? তোমার তো আবার ভূতের ভয়।'

'এখন আমার ভূতের ভয় নেই বাবা।'

'আমার মনে হয় না এটা ভাল হবে।

'ভালই হবে বাবা।'

'ঠিক আছে। সেতারা কার সঙ্গে থাকবে?'

'তোমার সঙ্গে কিংবা বিলুর সঙ্গে।'

নীলু উঠে চলে গেল। বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হয়েছে?'

'জি না।'

নীলু সারা দুপুর জিনিসপত্র সরিয়ে পশ্চিমের ঘরটা গোছাল। আমি কয়েকবার বললাম, 'এই— রাত্রিবেলা ভয় পাবি।' নীলু কোনো উত্তার দিল না। বিকেলের মধ্যে দেখলাম ঘর তৈরি হয়ে গেছে। একটা খাট। পড়ার টেবিল। আলনা। মায়ের ড্রেসিং টেবিল দিয়ে চমৎকার সাজিয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এক ফাঁকে আমাদের ঘর থেকে মায়ের ছবিটাও নিয়ে গেছে।

সেতারা পড়েছে খুব মুশকিলে। সে রাতে কার সঙ্গে ঘুমোবে বুঝতে পাছে না। আমাকে সে ঠিক পছন্দ করে না। বাবার সঙ্গেও থাকতে চায় না। কিন্তু নীলু বলে দিয়েছে সে একা একা ঘুমোবে। আমি সেতারাকে বললাম, 'ওর যা ভূতের ভয়, দেখবি রাত আটটা বাজলেই এই ঘরে চলে আসবে কিংবা তোকে নিয়ে যাবে।'

সেতারা খুব-একটা ভরসা পাচ্ছে না। সে মুখ কালো করে দুপুর থেকেই আমার পেছনে ঘুরছে।

ছুটির দিন বিকালে সাধারণত নজমুল চাচা আমাদের সঙ্গে এসে চা খান। আজ তিনি খবর পাঠালেন তাঁর ঘরে গিয়ে যেন আজকের চা'টা খাওয়া হয়। তিনি মুক্তাগাছার মণ্ডা আনিয়েছেন। নীলু বলল, 'দূর— আমি যাব না।'

'যাবি না কেন?'

'আমার মাথা ধরেছে।'

'দুটো এসপিরিন খা।'

'বললাম তো ভাল লাগছে না।'

নীলু তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

নজমুল চাচার শরীর ভাল ছিল না। চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ছিলেন। নজমুল চাচা, সাধারণত চা খেতে খেতে মজার মজার গল্পগুজব করেন। আজ সে সব কিছুই হল না। নজমুল চাচা বিরসমুখে বললেন, 'তোর বাবার একটা বিয়ের কথা হচ্ছে। মেয়েটির হাসবেন্ড মারা গেছে একাত্তুরের যুদ্ধে। একটি ছেলে আছে। ন'বছর বয়স। ছেলেটা তার নানার কাছে থাকে।'

আমি কিছু বললাম না। নজমুল চাচা বললেন, 'মেয়েটা খুব ভাল। আমি চিনি। প্রাইমারি স্কুলের টিচার। একদিন নিয়ে আসব এখানে। তোরা কথাবার্তা বলিস।'

'জি আচ্ছা।'

'সৎ মায়ের অত্যাচার-টত্যাচার সম্পর্কে যা শোনা যায় সে সব ঠিক না। তাছাড়া তোরা তো যথেষ্ট বড় হয়েছিস। এত বড় বড় মেয়েরা তো সাধারণত বন্ধুর মতো হয়। ঠিক না?'

'জানি না, হয়ত হয়।'

'তোর বাবার অবস্থাটা দেখতে হবে না? রাত-বিরাতে বাড়ি ফেরার বাজে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।'

আমি চুপচাপ বসে রইলাম।

'নীলু আসেনি যে?'

'ওর নাকি মাথা ধরেছে।'

'ও নাকি পরীক্ষা খুব খারাপ করেছে?'

'জি।'

'সংসারে বিশৃঙ্খলা আসার জন্যে এটা হয়েছে। বুঝতে পারছিস তো?'

চাচা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রমজান ভাই এসে বলল, 'ইউনিভার্সিটির একজন মাস্টার নাকি নিচে বসে আছে।'

চাচা অবাক হয়ে বললেন, 'কিসের মাস্টার? মাস্টার এখানে কী জন্যে? বিলু তুই উপরে আমার কাছে পাঠিয়ে দে তো।'

বসার ঘরে গম্ভীর চেহারার একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। বয়স খুব বেশি নয় কিন্তু অন্য রকমের একটি ভারিক্কি ভাব আছে। ভদ্রলোক আমাকে দেখেই বললেন, 'একটু দেরি করে ফেললাম, না?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

'আমি আগেই আসতাম। ভাবলাম জন্মদিনে খালি হাতে আসা ঠিক না। কিন্তু তোমাদের এখানে তো কিছু পাওয়া যায় না। আমি ঘণ্টাখানিক ঘোরাঘুরি করেছি। কবিতার বই পাওয়া যায়। কবিতা তো তুমি পড় না, নাকি পড়?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি বোধহয় নীলুর কাছে এসেছেন। আমি ওর ছোট বোন বিলু। আমরা যমজ বোন।' ভদ্রলোক দীর্ঘ সময় স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

'নীলু আমাকে বলেনি তার যমজ বোন আছে। লোকজন কী সব চলে গেছে নাকি?'

'কিসের লোকজন?'

'আজ নীলুর জন্মদিন না?'

'না তো।'

'ও আমাকে বলেছিল আসতে। সম্ভবত ঠাট্টা। আমি বুঝতে পারিনি। আমি ঠাট্টা বুঝতে পারি না।'

ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা খুলে কাচ মুছতে লাগলেন। আমি বললাম, 'আপনি বসুন, আমি নীলুকে ডেকে নিয়ে আসি।'

'তোমাদের চেহারায় অদ্ভুত মিল। যমজ বোনদের মধ্যেও কিছু ডিফারেন্স থাকে। একজন মোটা হয় অন্যজন রোগা কিন্তু...।'

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

'আপনি বসুন আমি এক্ষুণি ডেকে আনছি।'

নীলুকে ভদ্রলোকের কথা বলতে সে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

'এইসব কী রে নীলু? ভদ্রলোক কে?'

'মুন্নিকে তো চিনিস? মুন্নির দূর-সম্পর্কের ভাই।'

'তাঁকে আসতে বলেছিলি?'

'হুঁ।'

'কেন?'

'এমনি বলেছি।'

'আয় তাহলে। কী যে কাণ্ড।'

'আমি যেতে পারব না। আমার মাথা ধরেছে।'

নীলুর মাথা ধরেছে এবং গায়ে বেশ জ্বর শুনে ভদ্রলোক অল্প হাসলেন।

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই। ওর জন্যে দুটো বই এনেছিলাম— দিয়ে দিও।'

'আপনি বসুন, চা খেয়ে যান।'

'তোমার বাবা আছেন?'

'জি না। উনি রাত করে ফেরেন।'

'তোমার বাবা যখন থাকবেন তখন একদিন আসব।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, 'আমি আসব এটা বোধহয় নীলু ভাবেনি। এসে পড়েছি দেখে হকচকিয়ে গেছে।'

'আপনি বসুন না, চা খেয়ে যান। উপরে নজমুল হুদা চাচা আছেন, তাঁর কাছেও বসতে পারেন।'

'না না, ঠিক আছে।'

আমি ভদ্রলোককে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, 'বেশ একটা অস্বস্তিকর অবস্থা হয়ে গেল তাই না? আমার প্রবলেম হচ্ছে আমি ঠাট্টা-তামাশা ঠিক ধরতে পারি না। মনে হয় আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নিচু স্তরের।'

বলেই ভদ্রলোক উঁচু গলায় হেসে উঠলেন। একজন ভারিক্কি ধরনের গম্ভীর চেহারার ভদ্রলোক এমন ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠবেন আমি কল্পনাও করিনি।

নীলু বলল সে রাতে খাবে না।

'কেন খাবি না রে?'

'বললাম না জ্বর।'

রমজান ভাই কাউকে না খাইয়ে ছাড়ে না। সে ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, 'রাইতে ভাত না খাইলে এক চড়ইয়ের রক্ত পানি হয়।'

নীলু শব্দ করল না। তার ঘরের দরজাও খুলল না। সেতারার মনে ক্ষীণ আশা ছিল হয়তো শেষপর্যন্ত নীলু তাকে ডেকে নেবে। সে সব কিছুই হল না। রাত ন'টা বাজতেই নীলু তার ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল।

খুব বৃষ্টি হল সে রাতে— ঝমঝম করে বৃষ্টি। আকবরের মা বলল, 'আশ্বিন মাসে বিষ্টি, লক্ষণ খুব বালা।'

আমি অনেক রাত পর্যন্ত বাবার জন্যে অপেক্ষ করতে লাগলাম। বাবাকে কী সব খুলে বলা উচিত? বাবা খুব দেরি করতে লাগলেন। ঝড়বৃষ্টিতে এদিকে সব ভাসিয়ে নিচ্ছে।

বাবা ফিরলেন গভীর রাতে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রমজান ভাই আমাকে ডেকে তুলে ফিসফিস করে বলল, 'ছোট আফা, লক্ষণ বেশি বালা না।'

'কেন কী হয়েছে?'

'মদ খাইয়া আইছে।'

সমস্ত রাত আমার ঘুম হল না।

সেতারা এক কাণ্ড করেছে। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে। দুটি পত্রিকার (দৈনিক বাংলা, অবজার্ভার) প্রথম পাতায় তার ছবি ছাপা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাত থেকে শিশুসংগীত সম্মেলনের গ শাখায় স্বর্ণপদক নিচ্ছে।

অথচ বাবা সেতারাকে ঢাকায় যেতেই দিতে চাননি। গানের স্যারের কত ধরাধরি কত সুপারিশ। বাবার এক কথা, 'না, এইসবের দরকার নেই।'

শেষপর্যন্ত নজমুল চাচা যখন সঙ্গে যেতে রাজি হলেন তখনই শুধু গম্ভীর মুখে বাবা রাজি হলেন।

ঢাকায় গিয়ে সে যে এই কাণ্ড করেছে তাও আমরা জানি না। রমজান ভাই পত্রিকা পড়ে প্রথম জানল এবং এমন চেঁচামেচি শুরু করল— ।

সেতারা যে ভেতরে ভেতরে এমন ওস্তাদ হয়ে উঠেছে তা আমরা বুঝতেই পারিনি। সকাল বেলা ঘুম ভেঙেই অবশ্যি শুনতাম—

কোয়েলিয়া বলেরে মাই
অঙ্গনা মোরে বারে বারে
পিয়া পরদেশ গাওন কিনু
সদরঙ্গ পিয়ারাবা তোমাবিনা নয়নানা দরশন বারে বারে।

একই জিনিস সকালে একবার বিকেলে একবার। মাথা ধরে যাওয়ার মত অবস্থা। বাবা পর্যন্ত গানের স্যারকে একদিন বললেন, 'ছয় সাত মাস ধরে একই জিনিস গাচ্ছে শুনতে খুবই বিরক্ত লাগে।'

গানের স্যার একগাল হেসে বললেন, 'সময় হলে দেখবেন। হা হা হা। সময় হোক না।'

ফিরে আসবার পর সেতারার একটা সংবর্ধনাও হল। আমি সেতারাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম।

বাবা কোথাও যানটান না। নীলুও যাবে না।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, 'আরে নীলু, এই মেয়ে তোমার বোন? তুমি তো বলনি তোমার এমন গুণী বোন আছে। আস তুমি, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

একবার ভাবলাম বলি, আমি বিলু। কিন্তু কিছুই বললাম না।

'আমি দিন দশেকের মধ্যে চলে যাব। ইউনিভার্সিটি খুলে যাচ্ছে।'

'ও।'

'পরশুদিন আসতে বলেছিলাম আসনি তো?'

আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

'আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। একবার ভাবলাম যাই তোমাদের বাসায়।'

'আমি বিলু। নীলু আসেনি।'

ভদ্রলোক চশমা খুলে কাচ পরিষ্কার করতে লাগলেন।

'এত পরে বলছ কেন? প্রথমে বললেই হত।'

ভদ্রলোক রাগী চোখে তাকালেন আমার দিকে। আমি এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। একবার পেছন ফিরে দেখলাম তিনি কেমন যেন খড়গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমার কেন জানি খুব কষ্ট হতে লাগল।

আমাকে কেউ তেমন পছন্দ করে না। কেন করে না আমি জানি না। নীলু অন্য ঘরে চলে যাবার পর সেতারাও চলে গিয়েছে তার সঙ্গে। আকবরের মা আগে আমার ঘরের সামনে পাটি পেতে ঘুমাত, এখন ঘুমোচ্ছে ওদের ঘরের সামনে। নজমুল চাচা সব ঈদে আমাদের উপহার দেন। আমি লক্ষ্য করেছি নীলুর উপহারটা হয় অনেক সুন্দর অনেক দামি।

ক্লসের মেয়েরাও আমাকে পছন্দ করে না। টগরেব বোনেব বিয়েতে টগব ক্লাসের পাঁচটি মেয়ে ছাড়া সবাইকে দাওয়াত করল। আমি ঐ চার-পাঁচজন মেয়েদের মধ্যে একজন। সবাই এরকম করে কেন আমার সঙ্গে?

নীলু ইদানীং আমার সঙ্গে কথা বলা ছেড়েই দিয়েছে। নিজের থেকে কিছু জিজ্ঞেস কবলে তবেই জবাব। সেদিন দেখলাম খুব সাজগোজ করছে। আমি বললাম, 'কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'যাচ্ছি এক জায়গায়।'

'কোথায়? কোনো বন্ধু?'

নীলু চুপ করে রইল।

'ঐ ভদ্রলোকের কাছে যাচ্ছিস বুঝি?'

'গেলে কী হয়?'

'প্রায়ই যাস নাকি?'

'মাঝে মাঝে যাই।'

'এরকম যাওয়া ঠিক না। লোকজন খারাপ বলবে।'

খারাপ বললে বলুক না। আমি কী পায়ে ধরে সাধছি— আমাকে খারাপ না বলার জন্যে।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, 'ঐ ভদ্রলোকের নাম কী?'

'রকিব ভাই, অংক পড়ায়। খুব শিগগির আমেরিকা চলে যাবে।'

'উনিই বলেছেন বুঝি?'

'মুন্নি বলেছে। উনি মুন্নির খালাতো ভাই হন।'

'কোন মুন্নি? কালো মুন্নি?'

'হুঁ।'

নীলু কপালে একটা টিপ পরে অনেকক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে আবার টিপটি তুলে ফেলল। হালকা গলায় বলল, 'মুন্নির ধারণা রকিব ভাই ওকে বিয়ে করবে।'

'করবে নাকি?'

'কী জানি করতেও পারে। আমার কিছু যায় আসে না। করতে চাইলে করবে।'

'যায় আসে না, তাহলে যাস কেন?'

নীলু থেমে থেমে বলল, 'আমি ওদের বাড়ি গেলেই মুন্নি রাগ করে। দারুণ রাগ করে। কিন্তু

কিছু বলতে পারে না। আমার খুব মজা লাগে। সেই জন্যে যাই।'
'ছিঃ, নীলু এইসব কী?'
'শুধু মুন্নি না ওর মাও রাগ করেন। সেদিন কি বলছিলেন শুনবি?'
'কি বলছিলেন?'
'বলছিলেন, মুন্নির সঙ্গে রকিব ভাইয়ের বিয়ের কথা সব পাকাপাকি হয়ে আছে, শ্রাবণ মাসে। বিয়ে? ডাহা মিথ্যা। কোনো কথাই হয়নি।'
'তুই জানলি কী করে কোনো কথা হয়নি?'
'আমি জিজ্ঞেস করলাম।'
'কাকে জিজ্ঞেস করলি?'
'রকিব ভাইকে। আবার কাকে?'
'খুব খারাপ হচ্ছে নীলু।'
'খারাপ হলে আমার হচ্ছে, তোর তো হচ্ছে না। তুই আমার সঙ্গে বকবক করিস না। যা ভাগ।'
নীলু আজকাল স্কুলেও নিয়মিত যাচ্ছে না। সকালবেলা স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি টৈরি হয়ে হঠাৎ বলবে, 'আজকে আর যাব না। পেট ব্যথা করছে।'
সেদিন সেলিনা আপা (আমাদের হেড মিসট্রেস) আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। রাগী গলায় বললেন, 'তুমি কী গত শুক্রবার কালোমত রোগা একটা ছেলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিলে? বিউটি লন্ড্রির সামনে?'
'কই না তো আপা।'
'আমিও তাই ভাবছিলাম। ঐটা নীলু। আজেবাজে ছেলের সঙ্গে আজকাল খুব মিশছে মনে হয়। তোমার বাবাকে বলবে। ঐ সব লোফার টাইপের ছেলে। পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়, মেয়ে দেখলে শিস দেয়। বলবে তুমি তোমার বাবাকে।'
'জি বলব।'
'ঠিক আছে তোমার বলার দরকার নেই। তাঁকে বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।'
'জি আচ্ছা।'
'তাছাড়া ও তো রেগুলার ক্লাসেও আসে না। বাড়িতে শাসন না থাকলে যা হয়।'
নীলু এসব শুনে গা দুলিয়ে হাসতে লাগল, 'দূর ঐ ছেলের সঙ্গে আমি ঘষাঘষি করব কেন? আমাকে জিজ্ঞেস করল কটা বাজে। আমি বললাম। তারপর আমি বললাম— আপনার হাতে তো ঘড়ি আছে আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? সে ব্যাটা একদম ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল আমার ঘড়ি নষ্ট। আমি বললাম— মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে, না? ছেলেটার যে কী অবস্থা। দূর থেকে অন্য বন্ধুগুলি তাকে দেখছে। হি-হি-হি। ঐ পাঁজিগুলি আগে আমাকে দেখলেই শিস দিত। এখন আর দেয় না।'
'আর কথা হয়নি ঐ ছেলের সাথে?'
'আর কথা হবে কেন?'
'সেলিনা আপা বাবার সঙ্গে কথা বলবেন।'
'বলুক।'
'বাবা খুব রাগ করবেন।'
'করলে করবে।'

বাবা সত্যি সত্যি রাগ করলেন। বেশ রাগ। চিৎকার চেঁচামেচি। শুধু তাই না, এক পর্যায়ে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন। নজমুল চাচা ছুটে এলেন, 'ছিঃ ছিঃ এসব কী কাণ্ড! মেয়ে বড় হয়েছে না?'
বাবা ঝাঁঝাল স্বরে বললেন, 'ওর স্কুল এখন বন্ধ। তুমি একটা ছেলে দেখ তো, ওর বিয়ে দিয়ে দেব।'
'আচ্ছা সেটা দেখা যাবে। বিয়ে দিতে চাইলে বিয়ে দেবে। বিলু মা, তুমি আমাদের দু'কাপ চা দাও তো। লেবু দিয়ে।'
নীলু যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকেও এক কাপ চা দিস তো।'
পরদিন নীলু স্কুলে গেল না। সন্ধ্যাবেলা বাবার সামনেই তার সমস্ত বই-খাতা বারান্দায় জমা

করতে লাগল। বাবা ইজিচেয়ারে বসে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

'কী করছিস নীলু?'

'বইপত্রগুলি সব ফেলে দিচ্ছি বাবা। পড়াশোনা তো আর করছি না। বই দিয়ে কী হবে?'

'পড়াশোনা করবি না আর?'

'না। তুমি নিষেধ করলে। তাছাড়া আমারও ভাল লাগে না।'

'কী করবি ঠিক করেছিস?'

'এখনো কিছু ঠিক করিনি।'

বাবা আর কিছু বললেন না। রাতে ভাত খাবার সময় হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'রাগে মাথায় অনেকে অনেক কিছু বলে, সে সব মনের মধ্যে পুষে রাখা ঠিক না।'

নীলু মুখ না তুলেই বলল, 'আমি মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখিনি।'

আর কোনো কথাবার্তা হল না।

সে রাতে বাবা বাইরে গেলেন না। গম্ভীর হয়ে সেতারার পড়া দেখিয়ে দিতে বসলেন। সেতারা ক্লাস সিক্সে উঠেছে। নতুন ক্লাসে উঠেছে বলেই পড়াশোনায় খুব আগ্রহ। সে হাসিমুখে তার বইপত্র দেখাতে লাগল। বাবা এক সময় আমার পড়াশোনারও খোঁজ নিলেন, 'পড়াশোনা ঠিকমত হচ্ছে তো?'

'জি হচ্ছে।'

'প্রি-টেস্ট কবে?'

'এখনো দেরি আছে।'

'কোন কলেজে পড়বি কিছু ভেবিছিস? ঢাকায় যেতে চাস নাকি?'

'নাহ।'

'ঢাকা না যাওয়াই ভাল, যা গোলমাল। এই স্ট্রাইক ওই স্ট্রাইক।'

'তা ঠিক।'

নীলু আমাদের কাছেই কি-একটা গল্পের বই নিয়ে উবু হয়ে আছে, যেন কোনো কিছুই তার কানে যাচ্ছে না।

'নীলু এত মন দিয়ে কী পড়ছিস?'

'ভূতের গল্প।'

'নাম কী?'

'ডাকবাংলা রহস্য।'

'খুব ভয়ের নাকি?'

'খুব না। কিছু ভয়ের।'

বাবা হঠাৎ বললেন, 'তোরা সবাই মিলে মামার বাড়ি থেকে ঘুরে আয় না। একটা চেঞ্জ হবে। সেতারার তো বোধহয় মনেই নেই।'

'মনে আছে বাবা, পুকুর পাড়ে দুটো তাল গাছ আছে। আর পুকুরের ঘাটে বসে থাকলে এক রকম মাছ আসে। চোখগুলো বড় বড়। ঠিক না নীলু আপা?'

'হুঁ। চ্যালা মাছ।'

বাবা আবার বললেন, 'কী রে যাবি তোরা? যাস যদি তোর মামাকে লিখি। এসে নিয়ে যাবে।'

'তুমি যাবে না?'

'নাহ। আমার ব্যবসাট্যবসা খুব খারাপ। তোরা তো জানিস না। অবশ্যি আমি নিজেই বলি না কিছু। প্রেসটা আমি খুব সম্ভব বিক্রি করে দেব। বয়স হয়ে গেছে, এইসব ঝামেলা এখন আর ভাল লাগে না।'

নীলু বাবার কথা শুনল, কিন্তু কিছু বলল না।

'যাবি মামার বাড়ি?'

'যাওয়া যায়।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, লিখে দেব তোর মামাকে। পৌষ মাসের দিকে গেলে ধান কাটা দেখবি।'

সে রাতে ঘুমাতে গেলাম দশটার দিকে। সেতারা তার বালিশ নিয়ে এসে হাজির। 'আপা, আজ তোমার সঙ্গে ঘুমাব।'

'আয়। হঠাৎ আমার সঙ্গে যে।'

'নীলু আপা বলেছে আজ সে একা একা ঘুমোতে চায়।'

বাতি নেভাতে সেতারা ফিসফিস করে বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপা, রাগ করবে না তো?'

'না রাগ করব কেন?'

'আগে গা ছুঁয়ে বল রাগ করবে না।'

'রাগ করব না, বল।'

সেতারা বেশ খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'মেয়েদের যখন শরীর খারাপ থাকে তখন কোনো ছেলেকে চুমু খেলে নাকি পেটে বাচ্চা হয়?'

'বলেছে কে এসব?'

'বল না হয় কি না?'

'না হয় না। এই সব জিনিস নিয়ে না ভাবাই ভাল।'

'তাহলে বাচ্চা কিভাবে হয়?'

'জানি না কিভাবে হয়, ঘুমা তো।'

সেতারা ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। সেতারাও অনেকটা আমার মত, এ বাড়িতে তার কথা বলার কেউ নেই। স্কুলে তেমন বন্ধুবান্ধব নেই। সেদিন দেখলাম টিফিনের সময় ওদের ক্লাসের সব মেয়ে মিলে 'চুলটান। বিবিয়ানা সাহেববাবুর বৈঠকখানা' খেলা খেলছে। সেতার দূরে দাঁড়িয়ে তৃষিত নয়নে দেখছে।

আমি সেতারার গায়ে হাত রাখতেই সেতারা বলল, 'মাকে কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি আপা। খুব লম্বা লম্বা চুল।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুই ঘুমাসনি?'

'উঁহু।'

'আয় দুজনে মিলে এক কাজ করি, নীলুকে ভয় দেখিয়ে আসি।'

সেতারা উত্তেজনায় উঠে বসল। 'কিভাবে ভয় দেখাবে? জানালার কাছে গিয়ে "হুঁম" করবে?'

'তা করা যায়। যাবি?'

'চল।'

আমরা দরজা খুলে পা টিপে টিপে বাইরে এসে দেখি বাবা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। তার পাশের মোড়ায় গুটিশুটি মেরে নীলু বসে আছে। বাবা নীলুর মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। নীলু সম্ভবত কাঁদছে। বাবা আমাদের দেখে হালকা গলায় বললেন, 'কিরে সেতারা— বাথরুমে যাবি নাকি?'

'না বাবা, আমরা নীলু আপাকে ভয় দেখাবার জন্যে এসেছি।'

বাবা হেসে উঠেলেন। দীর্ঘদিন পর বাবা এমন উঁচু গলায় হাসলেন।

নীলু চোখ মুছে বলল, 'আমাকে ভয় দেখানো এত সস্তা না!'

আমাদের বাড়িটির একটি নাম আছে 'উত্তর দীঘি'। বাড়ির কত সুন্দর সুন্দর নাম থাকে কিন্তু এ বাড়িটি দেখতে যেমন অদ্ভুত, নামটিও তেমনি। মায়ের খুব সখ ছিল শ্বেত পাথরের একটা নতুন নেম প্লেট লাগাবেন, 'মাধবী ভিলা' লেখা থাকবে সেখানে।

বাড়িটি কিনেছিলেন আমার দাদা। তিনি ধুরন্ধর প্রকৃতির লোক ছিলেন। দাঙ্গার সময় যখন ময়মনসিংহ শহরের বেশির ভাগ ধনী হিন্দু জলের দামে বাড়ি বিক্রি করে কলকাতায় চলে গেল, আমার দাদা তখন 'উত্তর দীঘি' ও 'শ্রীকালী প্রেস' কিনে ফেললেন। টাকা যা দেয়ার কথা তার অর্ধেকও নাকি দেননি। এই সব আমার মায়ের কাছ থেকে শোনা। মা নাকি বিয়ের পর অনেকদিন দেখছেন বাড়ির মালিক বাকি টাকার জন্যে এসে বসে আছে এবং দাদা নানান রকম টালবাহানা করছেন। তার কিছু দিন পর দাদা মারা যান। আমার ধারণা লোকটিকে টাকা-পয়সা না দেয়ার জন্যেই নিদারুণ যন্ত্রণায় দাদার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পেটে ক্যান্সার হয়েছিল।

আমাদের 'উত্তর দীঘি' বাড়িটি প্রকাণ্ড। দোতলা বাড়ি। তবে ছাদে ওঠার কোনো সিঁড়ি নেই। মার খুব সখ ছিল ছাদে ওঠার সিঁড়ি করবেন। জোছনা রাতে ছাদে হাঁটাহাঁটি করা যাবে। হাঁটাহাঁটি করার জায়গার অভাব এ বাড়িতে নেই। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ি। কাঁঠাল পেয়ারা আম এবং

তেঁতুল গাছ দিয়ে বাড়িটা ঘেরা। বাড়ির সামনে ফুলের গাছ আছে বেশ কয়েকটা এবং জায়গায় জায়গায় সিমেন্ট দিয়ে উঁচু বেদীর মত করে বাঁধানো। সেখানে বসে খুব আরাম করে গল্পের বই পড়া যায়। আমার যখন কিছু ভাল লাগে না তখন আমি লাল বেদীগুলোর কোনো-একটিতে বসে থাকি। নীলুর মতে ওগুলো আমার গোসাঘর।

আজ আমার মন খুব ভাল ছিল। মন ভাল হওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। কিন্তু ভালো লাগছিল। তবু আমি গোসাঘরে এসে চুপচাপ বসে রইলাম। সেতারা দোতলার বারান্দায় বসে গলা সাধছিল। বেশ লাগছিল শুনতে। এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। নীলুর সেই রকিব ভাই হঠাৎ করেই যেন আমার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে আসতে হলে গেট খুলে অনেকখানি হাঁটতে হয়। কখন গেট খুললেন এবং কখনই-বা এলেন।

'ভাল আছ?'

'আপনি ভাল আছেন?'

'আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলাম, তুমি পাথরের মূর্তির মত বসে আছ। তোমার বাবা বাসায় আছেন?'

'জি না। সন্ধ্যা নাগাদ আসবেন।'

'আমি তার সঙ্গে দেখা করব আজকে, কী বল?'

'ঠিক আছে।'

'আমি পরশুদিন সকালে ঢাকা চলে যাব। ভাবলাম যাবার আগে দেখা করে যাই। আর আসা হবে কিনা জানি না।'

'আর আসবেন না বুঝি?'

'ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি কী আসতে বল?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'কি, কথা বলছ না যে?'

'আমি কিন্তু বিলু, আপনি আমাকে নীলু ভাবছিলেন।'

ভদ্রলোক চশমা খুলে কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন।

'নীলু কি বাসায় আছে?'

'জি আছে। আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।'

'না ঠিক আছে ডাকতে হবে না।'.

'ডাকতে হবে না কেন? আপনি তো ওর সঙ্গেই কথা বলতে এসেছেন?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

'ঠিক তা না। আমি নদীর ধার দিয়ে অনেকখানি হাঁটি। আজও তাই করছিলাম। হঠাৎ তোমাকে দেখলাম। ভাবলাম নীলু।'

'ও।'

'নীলু অনেকদিন মুন্নিদের বাড়িতে যায় না। মনে হয় ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তুমি জানো কিছু?'

'জি না। ওর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ।'

ভদ্রলোক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা যে বাচ্চা মেয়ে এটাও মনে থাকে না।'

'আমি বুঝি বাচ্চা মেয়ে?'

'হুঁ। তোমরা আড়ি দাও এবং ভাব দাও। ঠিক না?'

'আমি দেই না, নীলু দিতে পারে। আসুন, ভেতরে এসে বসুন। নজমুল চাচা আছেন, দোতলায় তাঁর ঘরেও বসতে পারেন।'

'নজমুল চাচা কে?'

'আমাদের একজন ভাড়াটে দোতলায় একটা ঘব নিয়ে থাকেন।'

'নীলু শোন, আমি এখন আর ঘরে ঢুকব না।'

'আমি কিন্তু বিলু।'

'ও হ্যাঁ বিলু। তুমি এক কাজ কর, আমি নীলুব জন্যে একটা গল্পের বই এনেছিলাম, "ঘনদার গল্প" ওটা ওকে দিয়ে দিও।'

আমি অল্প হাসলাম। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, 'হাসছ কেন?'

'আপনি একটু আগে বলেছিলেন নীলুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসেননি, এখন বলছেন বই নিয়ে এসেছেন তাই হাসছি।'

ঠিক তখন দোতলার বারান্দা থেকে নজমুল চাচা ডাকলেন, 'এই— এই বিলু উনি কে?'

নজমুল চাচার গলা ভয় ধরানো, যেন হঠাৎ ভূত দেখেছেন। অনেকক্ষণ থেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন হয়ত।

পরিচয় করিয়ে দেবার পর নজমুল চাচা অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'আরে আপনি জমির আহমেদ সাহেবের ছেলে? আপনাকে চিনব না বলেন কি? আপনার বাবা ছিলেন কালিনারায়ণ স্কলার।'

'আমি বাবার মত হইনি অবশ্যি।'

'আরে আপনিই কম কি। অংকের প্রফেসর। কি সর্বনাশ।

'প্রফেসর না। লেকচারার।'

'আমার কাছে লেকচারারও যা প্রেফেসরও তা। কী আশ্চর্য কাণ্ড বলেন দেখি! নীলুর সঙ্গে আলাপ হল কিভাবে?'

'ও আমাকে একটা অংক জিজ্ঞেস করেছিল, আমি করতে পারিনি।'

'বলেন কি! কী অংক?'

'ও জিজ্ঞেস করল-- পাঁচের সঙ্গে দুই যোগ করলে কখন ছয় হয়?'

'কখন হয়?'

'যখন ভুল হয় তখন হয়। অংকটা আসলে সহজ।'

নজমুল চাচা ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'যা নীলুকে আসতে বল। বলবি প্রফেসর সাহেব এসেছেন। চা-টার ব্যবস্থা করতে হবে।'

আমি ঘর থেকে বেরোবার সময় শুনলাম ভদ্রলোক বলছেন, 'আপনি কি বুঝতে পারেন কে বিলু কে নীলু?'

'পারি। নীলুটা খুব হাত নেড়ে কথা বলে।'

রকিব সাহেব দোতলায় বসে আছেন শুনে নীলু দারুণ অবাক হল। 'সে কি, আমি তো বলেছি এ বাড়িতে যেন কখনো না আসেন।'

'কি জন্যে বলেছিস?'

'দূর ভাল্লাগে না।'

'ভাল্লাগে না কেন?'

'এমনভাবে কথা বলে যেন আমি বাচ্চা মেয়ে।'

'যাবি না তাহলে?'

'উঁহু।'

নীলু যদিও বলল উঁহু কিন্তু আমি দেখলাম সে কামিজ বদলে শাড়ি পরছে।

'শাড়ি পরছিস কেন?'

'ইচ্ছা হয়েছে পরছি। তোকে জিজ্ঞেস করে কাপড় পরতে হবে?'

নীলু অনেক সময় নিয়ে মুখে পাউডার দিল। এবং এক সময় চিরুনী হাতে এসে বলল, 'চুল বেঁধে দিবি?'

আমি চুল বেঁধে দিয়ে বললাম, 'আজ আর তোকে কেউ বাচ্চা মেয়ে বলবে না।'

নীলু রাগী স্বরে বলল, 'তুই কি ভাবছিস আমি দোতলায় যাচ্ছি? মোটেই না, আমি বাগানে হাঁটতে যাচ্ছি। সেতারার গলা সাধা শেষ হলেই যাব।'

আমি দেখলাম নীলু সত্যি সত্যি সেতারাকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছে। অপূর্ব লাগছে তাকে। আমার মনে হল এমন রূপবতী মেয়ে আমি আর কখনো দেখেনি।

বড় মামার চিঠি এসেছে।

সুদীর্ঘ চিঠি। যার বক্তব্য হচ্ছে— এ সময় গ্রামের বাড়িতে নীলু-বিলুদের বেড়াতে আসা ঠিক হবে না। কি কারণে ঠিক হবে না তা স্পষ্ট করে বলা নেই। শুধু লেখা— গাঁয়ের লোকজন এদের

দেখতে এসে নানান কথা বলবে, এটা ওদের ভাল লাগবে না। মনের ওপর চাপ পড়বে। এইসব। আমার কাছে একটা ব্যাপার খুব অবাক লাগল। চিঠির শেষে পুনশ্চতে লেখা— যা হবার হইয়াছে, এখন দুলাভাই আপনি যদি হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখাইয়া সব ভুলিয়া যান তাহা হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়। ভুল মানুষ মাত্রই করে। ইহাই মানব ধর্ম।

এর মানে কি? নতুন করে এইসব কথা তোলা হচ্ছে কেন?

নীলুকে জিজ্ঞেস করতেই সে হেসে বলল, 'বুঝতে পারছিস না? মা এখন মামার বাড়িতে।'

'তার মানে?'

'মানেটানে জানি না। মা এখন মামার ঘাড়ে চেপে বসে আছে। মামা ঘাড় থেকে নামাতে চাইছে।'

'বুঝলি কি করে?'

'এখানে না বোঝার কিছু আছে নাকি?'

নীলু তরল গলায় হাসল।

'শেষ পর্যন্ত দেখবি বাবা বলবেন, ঠিক আছে চলে আসুক। আর মা তার ছেলে কোলে নিয়ে এ বাড়িতে উঠে আসবেন। খুব কান্নাকাটি হবে কিছুদিন। তারপর সব ঠিকঠাক। মাঝখান থেকে আমরা একটা ভাই পেয়ে যাব।'

'তোর কথার কোনো ঠিকঠিকানা নেই নীলু।'

'না থাকলে কি আর করা। তবে এ রকম হলে মন্দ হয় না। কি বলিস? বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে না?'

'হুঁ।'

'বাবা যে হারে মদ-টদ খাচ্ছে। একেবারে দেবদাসের মতো–

নীলু হেসে উঠল।

'এর মধ্যে হাসির কি আছে?'

'কান্নারও কিছু নেই।'

নীলু গম্ভীর মুখে বই নিয়ে পড়তে বসল। ইদানীং তার পড়াশোনায় খুব মনোযোগ হয়েছে। এই নিয়ে কিছু বললে সে গম্ভীর হয়ে বলে, 'তোরা সব স্টার-ফার পেয়ে পাস করবি আর আমি বুঝি ফেল করব? সেটা হচ্ছে না।'

এখন আমাদের স্কুলটুল নেই। পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে জোরেসোরে। সপ্তাহে তিনদিন কোচিং ক্লাস হয়। সেখানে মেয়েরা সবাই ভান করে যে কিচ্ছু পড়াশোনা হচ্ছে না। কে কোন কলেজে পড়বে সে নিয়েও ক্ষীণ আলোচনা হয়। হলিক্রস কলেজ ভাল না ইডেন ভাল সব মেয়েরাই সেটা জানে।

এমন সিরিয়াস পড়াশোনার সময়টাতেও আমাদের ক্লাসের রুবিনার বিয়ে হয়ে গেল। সেলিনা আপা খুব রাগ করলেন— বাবা-মাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি? সেলিনা আপা খুব কাটা কাটা কথা বলে অপমান করলেন রুবিনার বাবাকে। ঝাঁঝাল গলায় বললেন, 'আপনাদের মত শিক্ষিত মূর্খের জন্যে দেশের এমন খারাপ অবস্থা।'

রুবিনা খুবই কান্নাকাটি করতে লাগল। গায়ে হলুদের দিন দেখি কেঁদে মুখটুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। রুবিনার এক মোটাসোটা খালা পানভর্তি মুখ নিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন, 'মেট্রিক ক্লাসটা হচ্ছে মেয়েদের বিয়ের বয়স। এরপর আর রসকষ থাকে না। নীলুটা ফস করে বলে বসল, 'কেন, তখন রস কি হয়?'

রুবিনার খালা চোখ বড় বড় করে বললেন, 'এই ফাজিল মেয়েটা কে?'

নীলু হাসিমুখে বলল, 'ফাজিল বলছেন কেন?'

খুব হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। রুবিনার খালা রেগেমেগে অস্থির। কয়েকবার বললেন, 'আজকালকার মেয়েগুলি এমন কেন?'

অনেকদিন পর রুবিনার গায়ে হলুদ উপলক্ষে আমরা খুব হৈচৈ করলাম। বিয়েটিয়ে এই জাতীয় অনুষ্ঠান আমার ভাল লাগে না। গাদাগাদি ভিড়। মেয়েদের লোক দেখান আহ্লাদীপনা। খাবার টেবিলে তাড়াহুড়ো করে বসতে গিয়ে শাড়িতে রেজালার ঝোল ফেলে দেয়া। অসহ্য! কিন্তু রুবিনার গায়ে হলুদ আমার কেন যে এত ভাল লাগল। বরের বাড়ি থেকে 'এলা' নামের একটি মেয়ে এসেছিল, সে ঢাকায় 'ও' লেভেলে পড়ে। ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। জন্মের বন্ধুত্ব। এর আগে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হয়নি। আমরা দুজন এক ফাঁকে ছাদে চলে

গেলাম। মেয়েটি নানান কথা বলতে লাগল। একটি ছেলের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। ছেলেটি মেডিক্যালে পড়ে। এক বিয়ে বাড়িতে আলাপ হয়েছিল। খুব নাকি লাজুক ছেলে। আর দারুণ ভদ্র। এলা নিচু স্বরে বলল, 'জানো ভাই, ও একবার যা অসভ্য কথা লিখেছিল আমাকে। আমি খুব রাগ করলাম। ওর সঙ্গে দেখা করাই বন্ধ করে দিলাম। টেলিফোন করলে টেলিফোন নামিয়ে রাখতাম। শেষে কি করল সে জান?'

'কি করল?'

'বলল সে বিষ খাবে। আমি তো জানি তাকে। খাবে বলেছে যখন তখন খাবেই। ছেলেরা দারুণ সেন্টিমেন্টাল হয় ভাই।'

'তখন তুমি কি করলে?'

'কি আর করব, দেখা করলাম।'

আমি ইতস্তত করে বললাম, 'অসভ্য কথাটা কি লিখেছিল?'

এলা তরল গলায় হেসে উঠল, 'দূর তা বলা যায় নাকি? বিয়ের দিন তুমি আসবে তো? ঐ দিন তোমাকে ওর ঐ চিঠিটাই পড়াব। দেখবে ছেলেরা কি রকম অসভ্য হয়।'

রুবিনার বিয়ের দিন আমরা কেউ ও-বাড়িতে গেলাম না। নীলুর জন্যেই যাওয়া হল না। সে কিছুতেই যাবে না এবং আমাকেও যেতে দেবে না।

'তুই না গেলে না যাবি। আমি যাই।'

'না' বললাম তো যেতে পারবি না।'

'কেন অসুবিধেটা কি?'

'ওরা আজেবাজে কথা বলছিল, তোকে বলতে চাই না।'

'বলতে চাস না কেন?'

'কারণ শুনলে তোর খারাপ লাগবে।'

'লাগুক খারাপ।'

নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'ওরা বলছিল সেতারার চেহারার সঙ্গে নাকি ঐ লোকটির খুব মিল। আর সেতারা গান-বাজনাও ঐ লোকটির মত জানে।'

'কখন বলছিল?'

'রুবিনার খালা বলছিল, আমি পাশের ঘরে ছিলাম।'

আমি চুপ করে রইলাম।

নীলু বলল, 'তোর মন খারাপ লাগবে বলেছিলাম না। তবুও তো শোনা চাই।'

আমি সে রাতে ঘুমোতে পারলাম না। বাবা ফিরলেন অনেক রাতে। সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ হতে লাগল। রমজান ভাইয়ের গলা শোনা গেল, 'ছিঃ, আপনের শরম করে না?'

'চুপ থাক।'

'আপনে চুপ থাকেন।'

ধুপ করে একটা শব্দ হল। বাবার গলা।

'ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেব। শুয়োরের বাচ্চা। বেশি সাহস হয়েছে।'

'মেয়েরা বড় হইছে না? হায়া-শরম নাই?'

'চুপ থাক।'

'আপনে চুপ থাকেন।'

পানি ঢালার শব্দ। আকবরের মা উঠে গেল। ঝনঝন করে কি যেন পড়ল। আবার পানি ঢালা হচ্ছে। কি হচ্ছে এসব?

বাবা আজকাল বড্ড ঝামেলা করছেন। আবার একটা বিয়ে করলে তার জন্যে ভালই হত। নজমুল চাচা যাঁকে বাসায় নিয়ে এসেছিলেন সেই মহিলাটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। ছোটখাটো মানুষ, লম্বা চুল। কথা বলেন টেনে টেনে। আমাদের সঙ্গে বেশ আগ্রহ করে কথা বললেন। নীলু যখন বলল, 'আচ্ছা আপনি কি আমাদের দুজনকে আলাদা করতে পারবেন? আমার নাম নীলু ওর নাম বিলু। কিছুক্ষণ পর যদি আমরা দুজন এক রকম কাপড় পরে আসি তাহলে কি বলতে পারবেন কে বিলু কে নীলু?'

তিনি হাসিমুখে বললেন, 'আরে এ মেয়ে তো দেখি খুব পাগলী!'

আমাদের দু'জনারই ভদ্রমহিলাকে খুব পছন্দ হল। শুধু সেতারা মুখ গোঁজ করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি ডাকলেন, 'এই কি যেন নাম তোমার?'

সে উঠে চলে গেল।

আমরা তাঁকে বাগান দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলাম। সেতারা কিছুতেই যাবে না। আমরা সেতারাকে ছাড়াই বাগানে বেড়াতে গেলাম। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তেঁতুল গাছ দুটি দেখে তিনি খুব অবাক হলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বসতবাড়ির কাছে কেউ তেঁতুল গাছ লাগায় নাকি?'

নীলু বলল, 'লাগালে কি হয়?'

'বুদ্ধি কমে যায়। তেঁতুল খেলেও বুদ্ধি কমে।'

'এটা কিন্তু ঠিক না। রকিব ভাই খুব তেঁতুল খান। কিন্তু তাঁর খুব বুদ্ধি।'

'রকিব ভাই কে?'

নীলু চুপ করে গেল। তিনিও আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। একবার শুধু বললেন, 'এত বড় বাড়িতে থাক, ভয় লাগে না?

আমরা কিছু বললাম না। ভদ্রমহিলা যাবার আগে নীলুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন এবং অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমাদের মার সঙ্গে কি তোমাদের যোগাযোগ আছে?'

নীলু বলল, 'না নেই।'

'তোমরা চিঠি লিখেলেই পার। তোমরা কেন লিখবে না? তোমরা লিখবে।'

আমাদের খুব আশা ছিল ভদ্রমহিলার সঙ্গে বাবার বিয়ে হবে কিন্তু বিয়ে হয়নি। বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না। নজমুল চাচার ওপর রেগে গিয়ে আজেবাজে কথা বলতে লাগলেন, 'তোমরা পেয়েছটা কি? আমাকে না বলে এই সব কি শুরু করেছ?'

নজমুল চাচাও কি সব যেন বললেন। তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল।

এক পর্যায়ে বাবা বললেন, 'যাও তুমি আমার বাড়ি থেকে এক্ষুণি বিদেয় হও।'

নজমুল চাচাও চেঁচাতে লাগলেন, 'আমি তোমার দয়ার ওপর আছি নাকি? নগদ ভাড়া দিয়ে থাকি।'

সে এক বিশ্রী অবস্থা। নজমুল চাচা সেই রাতেই ঠেলা গাড়ি নিয়ে এলেন। মালপত্র পাঠানো হতে লাগল। আমরা বসে বসে দেখলাম। ঠেলা গাড়ি এসেছে দুটি। নজমুল চাচার জিনিসপত্র তেমন কিছু নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব তোলা হয়ে গেল। আমরা দেখলাম বাবা দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়ির কাছে আর নজমুল চাচা একটা বেতের ঝুড়ি হাতে নিয়ে নেমে যাচ্ছেন।

নীলু তখন ছুটে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় তাঁকে ঝাপ্টে ধরল।

নজমুল চাচা বললেন, 'আরে মা, কি করিস তুই ছাড় ছাড়।'

নীলু ছাড়ল না।

নজমুল চাচা বললেন, 'এতো বড় মুসিবত হল দেখছি। আরে বেটি কি করিস।'

তাঁর হাত থেকে বেতের ঝুড়ি ছিটকে পড়ে গেল।

নজমুল চাচা ভারী গলায় বললেন, 'এই মালপত্র সব তুলে রাখ। সাবধানে তুলিস।'

নজমুল চাচা আমাদের কোন আত্মীয় নন। দোতলার তিনটি কামড়া ভাড়া নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন পনের বছরের মতো। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন ষোল-সতের বছর আগে। একটিমাত্র মেয়ে, অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মেয়ে নেদারল্যান্ড না কোথায় যেন থাকে। বছরে দু'তিনটি চিঠি দেয়। চিঠিতে খুব স্বাস্থ্যবান কিছু ছেলেমেয়ের ছবি থাকে। নজমুল চাচা সেই চিঠি পড়ে গম্ভীর হয়ে বলেন, 'উফ এ্যারন বাংলাটা এখনো শেখে নাই। খুব খারাপ খুব খারাপ।'

এ্যারন তাঁর নাতনী।

নীলু অনেক কিছুই করতে পারে যা আমি পারি না। নজমুল চাচা যখন চলে যাচ্ছিলেন আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে তাঁকে ফেরাই। কিন্তু আমি গেলাম না, ছুটে গেল নীলু। আমরা দুজনে দেখতে অবিকল এক রকম, কিন্তু দুজন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে উঠছি। আমরা এ রকম কেন?

কাল রাতে আমি চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখেছি। এমন চমৎকার স্বপ্ন যে ঘুম ভেঙে খানিকক্ষণ কাঁদলাম। একবার ইচ্ছে হল নীলুকে ডেকে তুলি। স্বপ্নের কথাটা বলি ওকে। কিন্তু শেষপর্যন্ত কিছুই করলাম না। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে স্বপ্নটার কথা ভাবলাম। ঘুমের মধ্যে

যে স্বপ্নটিকে অর্থবহ মনে হচ্ছিল জেগে থেকে তা আর মনে হল না। আমি দেখেছিলাম একটি নদী। নদীর চারপাশে ঘন বন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বন অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখলাম শুধুই নদী। সেই নদীতে বালি চিকচিক করছে। কোথাও কেউ নেই। আমার একটু ভয় ভয় করছে। তবু আমি নদীতে নামতেই নদীটি আমাদের নানার বাড়ির পুকুর হয়ে গেল। সে পুকুরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কুমীর কুমীর খেলছে। স্বপ্নে নদীর পুকুর হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। আমি একটুও অবাক না হয়ে ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে কুমীর কুমীর খেলতে লাগলাম। একটি পাঁজি ছেলে ডুব সাঁতার দিয়ে কেবলই আমার পা জড়িয়ে গভীর জলের দিকে টেনে নিতে চাচ্ছিল। আমার রাগ লাগছিল কিন্তু কিছুই বলছিলাম না। কারণ স্বপ্নের মধ্যে মনে হচ্ছিল এই ছেলেটি যেন আমার স্বামী। এক সময় ছেলেটি আমাকে মাঝপুকুরে নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'এই সুশী তোমাকে এখন ছেড়ে দেই?'

কেন মানুষ এমন অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে? আমি জেগে এই ছেলেটির মুখ খুব মনে করবার চেষ্টা করলাম, কিছুতেই মনে পড়ল না। শুধু মনে পড়ল ছেলেটির চোখগুলো মেয়েদের চোখের মত টানা টানা। আর ওর হাত দুটি লম্বা এবং খুব ফরসা। কে জানে এ রকম একটি ছেলে সঙ্গেই হয়ত আমার বিয়ে হবে। সে আমাকে আদর করে ডাকবে 'সুশী'। কী আশ্চর্য এরকম একটা অদ্ভুত নাম এল কোত্থেকে? ভাবতে ভাবতে আবার আমার চোখ ভিজে উঠল। বাকি রাত এক ফোঁটা ঘুম এল না।

এত ভোরে কখনো আমি আগে উঠিনি। অদ্ভুত লাগছিল আমার। আলোটাই অন্য রকম। কেমন মায়া মায়া আলো, স্বপ্নের মধ্যে যে রকম আলো দেখা যায় সে রকম। আমি নিচে বাগানে নেমে গেলাম। কদম গাছের নিচটায় তখনো খুব অন্ধকার। আমার একটু ভয় ভয় করছিল। কিন্তু গাছের নিচের এসে দাঁড়ানো মাত্র দেখলাম নীলু জেগে উঠেছে। টুথব্রাশ নিয়ে ঘুমঘুম চোখে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। নীলু সব সময় খুব ভোরে ওঠে। কিন্তু সে যে এ রকম অন্ধকার ভোর তা জানা ছিল না। আমি ডাকলাম, 'এ্যাই নীলু।'

নীলু আমাকে দেখতে পেল না। সে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর একটি কাণ্ড করল, 'মা এসেছে মা এসেছে' বলে ছুটে গেল গেটের দিকে।

আমি এগিয়ে এসে বললাম, 'এ্যাই নীলু কি হয়েছে রে?'

নীলু খুব অবাক হল। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। এক সময় থেমে থেমে বলল, 'আমি ভাবলাম মা বুঝি। গলার স্বর অবিকল সে রকম লাগল।'

নীলুর কি কিছুটা আশাভঙ্গ হয়েছে? কী জানি হয়ত হয়েছে। মা'র কথা সে হয়তো সারাক্ষণই ভাবে। মুখে বলে না।

'আজ এত সকালে উঠেছিস যে?'

'দেখলাম একদিন উঠে কেমন লাগে।'

'কেমন লাগে?'

'ভালই তো।'

নীলু চুপচাপ দাঁত ঘষতে লাগল। আমি বললাম, 'তুই কি মা'র কথা খুব ভাবিস?'

'নাহ।'

'তাহলে আজ এ রকম ছুটে গেলি যে?'

'আমার ইচ্ছে হয়েছে গিয়েছি। তোর তাতে কি?'

'রাগ করছিস কেন?'

নীলু জবাব না দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। তখন মনে পড়ল নীলুর সঙ্গে আমার ঝগড়া চলছে। গত এক সপ্তাহ ধরে কথাবার্তা বন্ধ। ঝগড়ার কারণটি অতি তুচ্ছ। আমি নীলুর একটি চিঠি খুলে পড়ে ফেলেছি। কিছুই নেই সে চিঠিতে। ছয় লাইনের একটা চিঠি। নীলুর পরিচিত প্রফেসরটি লিখেছেন। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার যে বইটি নীলু পড়তে চেয়েছে সেটি তিনি দোকানে খুঁজে পান নি। পেলেই পাঠাবেন।

এমন কী আছে সেই চিঠিতে যে নীলু রাগ করল? কিন্তু সে এমন ভাব করতে লাগল যেন আমি তার কাছে লেখা খুব গোপন একটি প্রেমপত্র পড়ে ফেলেছি। আমি যখন বললাম, 'কি আছে এই চিঠিতে যে তুই এ রকম করছিস?'

'যাই থাকুক, কেন আমার চিঠি পড়বি'?

'বেশ আর পড়ব না।'

'পড়বি না শুধু না, তুই আমার ঘরেও কোনোদিন ঢুকবি না।'

'বেশ ঢুকব না।'

'আর আমার সঙ্গে কথাও বলবি না।'

'ঠিক আছে বলব না।'

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। সন্ধ্যাবেলা বাবা প্রেস থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সে নালিশ করল, 'বাবা বিলু আমার সব চিঠিপত্র পড়ে ফেলে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তুমি ওকে ডেকে নিষেধ করে দাও।'

'ঠিক আছে করব।'

'না এখনই কর।'

বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। শান্তস্বরে বললেন, 'একজনের কাছে লেখা চিঠি অন্যের পড়াটা ঠিক না মা।' আমি লজ্জায় বাঁচি না। নীলুটা এমন হচ্ছে কেন কে জানে। আগে এ রকম ছিল না। তার কাছে চিঠি এলেই আমাকে সে চিঠি পড়তে হত। একবার সে পেনফ্রেন্ডশিপ করল বুলগেরিয়ার কি একটা ছেলের সঙ্গে। সেই ছেলেটা সবুজ রঙের কাগজে লম্বা লম্বা চিঠি লিখত ভুল ইংরেজিতে। চিঠির শেষে একটা ঠোঁটের ছবি এঁকে লিখত "Kiss"। নীলু আমাকে সেই চিঠি পড়তে দিয়ে বলত, 'মা গো কি অসভ্য!' নীলুর সেই সব চিঠির জবাবও লিখে দিতাম আমি। একদিন সে লজ্জায় লাল হয়ে বলল, 'বিলু চিঠির শেষে তুইও লিখে দে "Kiss"। ঐ বাঁদরটার সাথে তো আর দেখা হচ্ছে না। কি বলিস? আমি লিখলাম "Kiss"। নীলু বহু যত্নে একটা ঠোঁটের ছবিও আঁকল। তারপর ঐ ছেলে তার ছবি পাঠাল। মাথায় চুল নেই একটিও। গালে এত বড় একটা আঁচিল। হাতির কানের মত বড় বড় কান। ছবি দেখে দারুণ রেগে গেল নীলু। ছেলেটি লিখেছিল সুযোগ পেলেই সে তার বাংলাদেশী পেনফ্রেন্ড নীলুর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। নীলু বলল, 'লিখে দে হাঁদারাম তুমি বাংলাদেশে এলে তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব। বাঁদর কোথাকার।'

নীলু চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলেও আমি চালিয়ে যেতে লাগলাম। মজাই লাগত আমার। বানিয়ে বানিয়ে কত কিছু যে লিখছি। যেমন একবার লিখলাম, কাল আমরা সমুদ্রে নৌকা নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কি যে সুন্দর সমুদ্র আমাদের। খুব মজা হয়েছে। একবার সে লিখল, তোমার কি কোনো ছেলেবন্ধু আছে? আমি লিখলাম, হ্যাঁ আছে। আমার ছেলে-বন্ধুটি একজন কবি। সে আমাকে নিয়ে কবিতা লিখেছে।

ছেলেটা সত্যি সত্যি হাঁদারাম। যা লিখতাম তাই বিশ্বাস করত। তারপর একদিন সে হঠাৎ লিখে বসল, আসছে সামারে আমি বাংলাদেশে আসব। কী সর্বনাশ! ভয়ে আমি এবং নীলু দুজনই অস্থির। একি ঝামেলা হল। কি যে ভয়ে ভয়ে কেটেছে সেই সময়টা। রাতে ভাল ঘুম পর্যন্ত হত না। নীলু অবশ্যি খুব একটা ভয় পায়নি। ও বলত, 'খামোকা ভয় পাচ্ছিস, আসবে-টাসবে না। আর যদি এসেও পড়ে তাহলে বলব নীলু নামের মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে।'

ছেলেটি অবশ্যি আসেনি। এবং চিঠিপত্রও দেয়নি আর। হয়তো অন্য কোনো দেশের কোনো মেয়ে পেনফ্রেন্ডশিপ করেছে।

নীলুর যন্ত্রণায় আরো সব চিঠি লিখতে হয়েছে আমাকে। একবার সে বলল, 'খুব ভাষা-টাষা দিয়ে একটা চিঠি লিখে দে তো বিলু।' কার কাছে, কী— কিছুই বলবে না। লিখলাম একটা চিঠি। সেটা তার পছন্দ হল না। আবার একটা লিখলাম। কত কাণ্ড হল সে চিঠি নিয়ে। ক্লাসের মেয়েরা সেই চিঠির লাইন বলে বলে নীলুকে খ্যাপাতে লাগল। কোথায় পেয়েছে তারা সেই চিঠি কে জানে! নীলু যে ছেলেকে লিখেছিল সে-ই হয়ত বলে দিয়েছে। নীলু বাসায় এসে কেঁদে-টেঁদে অস্থির। সেই সময় নীলুর সঙ্গে খুব ভাব ছিল আমার। নীলু হঠাৎ করেই অন্য রকম হয়ে গেল। আমার কোনো বন্ধুটন্ধু নেই। নীলু দূরে সরে যেতেই আমি একা হয়ে গেলাম। এরকম একটি অদ্ভুত সুন্দর সকালে একা থাকতে ইচ্ছে করে না। আমি নীলুর খোঁজে বাগানের পেছনের দিকে এসে দেখি নীলু কাঁদছে। কী আশ্চর্য! আমি বললাম, 'কি হয়েছে রে?'

'কিছু হয়নি।'

'কাঁদছিস কেন?'

'তোর কাছে সব কিছু বলতে হবে নাকি?'

'বললে দোষ কি?'

নীলু কোনো জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে বাগান ছেড়ে চলে গেল। সকালটা হঠাৎ করেই অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। লোকজন সবাই জেগে উঠেছে। রমজান ভাই ঘটাং ঘটাং করে টিউবওয়েলের পানি তুলছে। আকবরের মা ময়লা থালা-বাসন এনে জমা করছে টিউবওয়েলের পাশে। এক সময় ঝগড়া লেগে গেল দুজনের মধ্যে। এরা দুজন দুজনকে সহ্যই করতে পারে না। তবু কেমন করে থাকে এক সঙ্গে? এদের চেঁচামেচিতেই বোধ হয় বাবার ঘুম ভাঙল। বাবা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চারদিক আবার চুপচাপ। বাবা বললেন, 'আমাকে চা দাও এক কাপ।' এরা দুজনে কেউ কোনো উত্তর করল না। আকবরের মা বেড়ালের মতো ফ্যাঁসফ্যাঁস করে কি বলতেই আবার বেঁধে গেল রমজান ভাইয়ের সঙ্গে। বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। আজকাল কেউ আর বাবাকে তেমন গ্রাহ্য করে না। আমি এগিয়ে এসে বললাম, 'আমি বানিয়ে আনছি বাবা।'

'তুই আবার চা বানাতেও জানিস নাকি?'

'জানব না কেন?'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কার কাছে শিখলি?'

'কী আশ্চর্য কাণ্ড, চা বানানো আবার শিখতে হয় নাকি?' বাবা এরকম ভান করতে লাগলেন যেন খুব অবাক হয়েছেন।

'আর কি জানিস, রান্নাবান্না করতে পারিস? ভাত-মাছ এইসব?'

'নাহ।'

'এইগুলিও শিখে ফেল। একদিন বিয়েটিয়ে হবে। রান্নাবান্না না জানলে বিয়ে দেয়াই যাবে না, হা হা হা।'

অনেক দিন পর বাবা হাসলেন। মানুষের হাসির মতো সুন্দর কি কিছু আছে? বাবার হাসির সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে রোদ ঝলমল করে উঠল।

মা একটা কথা সব সময় বলতেন, 'মানুষ যখন হাসে তখন তার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী হাসে। কিন্তু সে যখন কাঁদে, তার সঙ্গে আর কেউ কাঁদে না। কাঁদতে হয় একা একা।'

চা বানাতে বানাতেই শুনলাম সেতারা গলা সাধা শুরু করেছে। নিসা গামা পামা গামা। গামা পামা গারে সা। গান-টান কিছু না, সামান্য সারে গামা, কিন্তু কি যে ভাল লাগছে শুনতে।

বাবাকে চা নিয়ে দিতেই বাবা বললেন, 'ভাবছি তোদের নিয়ে কোথাও ঘুরেটুরে আসব। যাবি নাকি?'

'কোথায়?'

'গারো পাহাড়ে গেলে কেমন হয়? জাড়িয়া জাঞ্জাইল লাইনে বেশি দূর হবে না। ছয়-সাত ঘণ্টা লাগবে ট্রেনে। বন বিভাগের একটা রেস্ট হাউস আছে। যাবি নাকি?'

'যাব বাবা।'

'জায়গাটা সুন্দর। রাতের বেলা একটু ভয় ভয় লাগে।'

'কেন?'

'বন্য হাতির শব্দটব্দ পাওয়া যায়। এখন বোধ হয় আর সে রকম নেই। তোরা যদি যেতে চাস তাহলে একটা প্রোগ্রাম করি।'

'যাবে কবে?'

'দুই দিনের মাত্র ব্যাপার, একটা তারিখ করলেই হয়। তুই নীলুকে জিজ্ঞেস করে আয় ও যাবে কি-না।'

নীলু সব শুনে লাফিয়ে উঠল। বেড়ানোর ব্যাপারে নীলুর মতো উৎসাহী আর কেউ নেই। গারো পাহাড় দেখতে যাওয়া হবে শুনেই তার সব রাগ পড়ে গেল। নানান রকম পরিকল্পনা করে ফেললাম আমরা। যেমন শম্পাদের ক্যামেরাটা নিয়ে যাব এবং খুব ছবি তুলব। সেখানে আমরা দুজনেই শাড়ি পরব। এবং এই উপলক্ষে বাবাকে বলব দুটি শাড়ি কিনে দিতে। বন বিভাগের রেস্ট হাউসে রাতের খাবার-টাবার হয়ে যাবার পর বাবাকে বলব গল্প বলার জন্যে। বাবা অবশ্যি গল্পটল্প তেমন বলতে পারে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা হারিকেন জ্বালিয়ে বসে থাকব। হারিকেনের আলো কী যে ভাল লাগে আমার।

একেকটা দিন এমন অন্যরকম হয়। মনে হয় দুঃখ-টুঃখ সব বানানো ব্যাপার। চারদিকে শুধু সুখ এবং সুখ। সন্ধ্যাবেলা আমরা দু'বোন শাড়ি পরে বারান্দায় হাঁটছি, নজমুল চাচা ডেকে পাঠালেন।

'কিরে বেটিরা শুনলাম দল বেঁধে নাকি পাহাড়ে যাচ্ছিস?'

'জি চাচা।'

'তা আমাকে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করিল না? আমারও তো পাহাড়-টাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে।'

'সত্যি সত্যি যাবেন আমাদের সাথে?'

'এরকম পরীর মতো মেয়েদের পাহারা দিয়ে রাখার জন্যেও তো লোকজন দরকার।'

পরের কয়েকটি দিন আমাদের দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কাটল। একদিন শুনলাম বন বিভাগের ডাকবাংলোটা পাওয়া গেছে। তারপর দিন-ক্ষণ ঠিক হল। ন'তারিখে ভোরের ট্রেনে যাব, পৌঁছব বিকাল নাগাদ। নজমুল চাচা যাবেন। রমজান যাবে। বাবার প্রেসের একজন কম্পোজিটর মাখন মিয়া সেও যাবে। কারণ মাখন মিয়ার বাড়ি ঐ অঞ্চলে, সে সব খুব ভাল চেনে।

আট তারিখ রাতে বাবা বাড়ি ফিরলেন না। রাত একটায় নজমুল চাচা খোঁজ নিতে গেলেন। আমরা তিন বোন বসার ঘরে বসে রইলাম চুপচাপ। নজমুল চাচা ফিরলেন দু'টার দিকে এবং হালকা গলায় বললেন, 'কাজে আটকা পড়ে গেছে, সকাল বেলাতেই চলে আসবে। ঘুমিয়ে পড়!' নীলু শান্ত স্বরে বলল, 'বাবার কি হয়েছে বলেন?'

'কি আবার হবে। কাজ থেকে না মানুষের?'

নজমুল চাচা রেগে গেলেন। নীলুও রেগে গেল।

'বাবার কি হয়েছে বলেন।'

'কাল সকালে আসবে, তখন জিজ্ঞেস করিস। কিছু হয়নি, ভালই আছে।'

নীলু তেজী গলায় বলল, 'আপনাকে এখন বলতে হবে।'

'এরকম করে তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস কেন?'

নীলু কেঁদে ফেলল। বাবা ফিরলেন পরদিন দুপুরে। কোর্ট থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে। তাঁর রাত কেটেছিল থানা হাজতে। মদ খেয়ে খুব নাকি হৈচৈ করছিলেন বা এই জাতীয় কিছু। খুবই কেলেংকারি ব্যাপার। আমরা সপ্তাহখানেক কেউ স্কুলে গেলাম না। ঠিক করলাম বাবার সঙ্গে কেউ কোনো কথা বলব না। ডাকলেও সাড়া দেব না। এমন ভাব করব যেন শুনতে পাইনি। কোনো লাভ অবশ্যি তাতে হল না। বাবা আমাদের ডাকাডাকি বন্ধ করে দিলেন। যতক্ষণ বাসায় থাকেন চুপ করে থাকেন।

একদিন দেখি একটি টেলিভিশন কিনে আনলেন। সেতারার খুব সখ ছিল টিভির। কথা ছিল সেতারা আগামী জন্মদিনে ঢাকা থেকে এটি কিনে আনা হবে এবং সেই উপলক্ষে আমরা সবাই দল বেঁধে ঢাকা যাব। তিনি বোধ হয় আমাদের সঙ্গে ভাব করবার জন্যেই আগে-ভাগে কিনে ফেললেন। সন্ধ্যাবেলা টিভি চালু হল। আমরা কেউ দেখতে গেলাম না। আকবরের মা এবং রমজান ভাই মোড়া পেতে টিভির সামনে রাত এগারটা পর্যন্ত বসে রইল।

বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম আমরা। সেই সময় বড় মামার চিঠিতে জানলাম মা'র একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম কাজল।

মায়ের শরীর খুব খারাপ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আছেন। কি যে কষ্ট হল আমার। কত লক্ষ বার যে বললাম— মা ভালো হয়ে যাক। মাকে ভাল করে দাও। রোজ রাত্তে তাঁকে স্বপ্নে দেখতাম। রক্তশূন্য একটি লম্বাটে ফরসা মুখ। চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা। স্বপ্ন দেখে রোজ রাতেই কাঁদতাম। আমরা তিন বোনই নিশ্চিত ছিলাম মা মারা যাবেন। কিন্তু তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। চিঠি লিখল মা নীলুকে। নীলু তার কোনো চিঠি আমাকে পড়তে দেয় না। কী লেখা ছিল সে চিঠিতে তা জানলাম না। নীলু শুধু বলল, 'কাজল খুব বিরক্ত করে রাতে মাকে ঘুমাতে দেয় না।'

এস.এস.সি. পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করলাম। এত ভাল যে সেলিনা আপা একদিনের জন্যে স্কুল ছুটি দিলেন। এবং একটি গোল্ড মেডেল দেবার ব্যবস্থা করলেন। খায়রুন্নেসা গোল্ড মেডেল। খায়রুন্নেসা তাঁর মায়ের নাম। এই গোল্ড মেডেলটি সেবারই প্রথম ঘোষণা করা হল। আমাদের স্কুলের কোনো ছাত্রী যদি এস.এস.সি. পরীক্ষায় সমস্ত বোর্ডে প্রথম তিনজনের মধ্যে থাকতে পারে

তবেই সে এই গোল্ড মেডেল পাবে। ময়মনসিংহ ডিস্টিক্ট বোর্ড থেকে আমাকে পাঁচশ টাকা দেয়া হল। শুধু তাই না, একদিন সকালবেলা একজন স্থানীয় সংবাদদাতা আমার ইন্টারভ্যু নিতে এলেন। নজমুল চাচার উৎসাহের সীমা নেই। 'শাড়ি খুলে একটা কামিজ-টামিজ পর, বয়স কম দেখা যাবে। কানের দুলগুলি খুলে ফেল তো, ভাল ছাত্রীদের এই সব গয়না-টয়না মানায় না। মুখে হালকা করে পাউডার দে।'

ইন্টারভ্যু পর্ব সমাধা হতে অনেক সময় লাগল। বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন নজমুল চাচা। যেমন ভদ্রলোক যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'দৈনিক ক'ঘণ্টা পড়াশুনা করতে?' আমি কিছু বলার আগেই নজমুল চাচা বললেন, 'ঘণ্টার কি কোনো হিসাব আছে ভাই? রাতদিনই পড়ছে। যখনই দেখি তখনি মুখের ওপর একটা বই। হা হা হা।'

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন প্রাইভেট টিচার ছিল?'

নজমুল চাচা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই মেয়ের প্রাইভেট টিচার লাগে। কী যে বলেন ভাই।'

কথাটি পুরোপুরি মিথ্যা। আজিজ স্যার আমাকে আর নীলুকে সপ্তাহে চারদিন অংক করাতেন। নলিনীবাবু স্যার পড়াতেন ইংরেজি।

'পাঠ্য বই ছাড়া বাইরের বই কেমন পড়েছ তুমি?'

'বাইরের বইতো বেশি পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় সব আপনার নিচের ক্লাসেই পড়ে শেষ করেছে। হা হা হা।'

ইন্টারভ্যু হল আসলে নজুমল চাচার সঙ্গে। আমি শুধু হাসিমুখে তাঁর পাশে রইলাম। এবং সেই ইন্টারভ্যু খানিকটা ছাপাও হল একটি ইরেজি পত্রিকায়। তার পরপরই একটি চিঠি পেলাম আমরা দু' বোন।

কল্যানীয়াষু নীলু অথবা বিলু

তোমাদের দু'বোনের একজনের ছবি দেখলুম পত্রিকায়। ছবির সঙ্গে ডাকনাম দেয়া ছিল না। কাজেই বুঝতে পারছি না ছবিটি কার?

যার ছবি তার জন্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। মফস্বলের একটি স্কুল থেকে এমন চমৎকার রেজাল্ট করা দারুণ ব্যাপার। আমার খুবই ভাল লাগছে। এর মধ্যে একবার ময়মনসিংহ এসেছিলাম। তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছি। গেট বন্ধ ছিল। কাজেই ভেতরে আর ঢুকিনি। পরে ভেবেছি গেট খুলে ঢুকলেই হত।

অনেক সময় আমরা যা করতে চাই করতে পারি না। কেন পারি না তাও জানি না। পরে তা নিয়ে কষ্ট পাই। ঠিক না?

আমরা কেন যেন মনে হচ্ছে তোমরা দু'বোন আমার চিঠি পড়ে খুব হাসবে। অবশ্যি একটি ক্ষীণ আশা যে এই চিঠি তোমাদের হাতে পৌছবে না। কারণ তোমাদের ঠিকানা আমার জানা নেই। শুধু জানি তোমাদের দু'বোনের একজন হচ্ছ নীলু, একজন বিলু এবং তোমাদের বাড়িটির নাম 'উত্তর দীঘি'। এ রকম সংক্ষিপ্ত ঠিকানায় চিঠি যাওয়ার কথা নয়। ঠিক না?

রকিব হাসান

কত অসংখ্যবার যে সেই চিঠি আমি পড়লাম। প্রতিবারই আমার মনে হয়েছে এই চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তার বাইরেও কিছু আছে। আর একবার পড়লেই তা বোঝা যাবে।

চিঠিটি নজমুল চাচাও পড়লেন এবং বললেন, 'বিশিষ্ট ভদ্রলোক। খুব আদব-কায়দা। একটা ভাল সংবাদ পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিয়েছে। এইসব ভদ্রতা কি দেশে আজকাল আছে। সংবাদ শুনলে লোকজন আজকাল বিরক্ত হয়। মা সুন্দর করে গুছিয়ে একটা চিঠি লেখ। বানান ভুল যেন না থাকে। সাবধান! ডিকশনারি দেখবে। আর শোন, এই চিঠি যত্ন করে তুলে রাখবে। রেজাল্ট নিয়ে যত চিঠি যত টেলিগ্রাম আসবে সব তুলে রাখবে। আলাদা একটা ফাইল করে রাখবে। আমি অফিস থেকে ফাইল নিয়ে আসব।'

নীলু চিঠিটার শুরুটা পড়েই গম্ভীর মুখে বলল, 'তোর চিঠি আমাকে দিচ্ছিস কেন? আমি অন্যের চিঠি পড়ি না।'

'পড়া যাবে না এমন কিছু এখানে লেখা নেই।'

'না থাকুক।'

নীলু পাশ ফিরে বালিশে মুখ ঢাকল। তার বেশ ক'দিন ধরে জ্বর যাচ্ছে। তেমন কিছু নয়, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠছে না। আমার ধারণা, সে আশা করেছিল তার রেজাল্ট অনেক ভাল হবে। রেজাল্ট মোটেও ভাল হয়নি। ফার্স্ট ডিভিশন দেখা শেষ করে আমরা যখন সেকেন্ড ডিভিশন দেখতে শুরু করেছি সে তখন দৌড়ে পালিয়েছে। নজমুল চাচা তাকে পাসের খবর দিতেই সে কেঁদে-টেদে একটা কাণ্ড করেছে।

'পরের বার অনেক ভাল হবে দেখবি।'

'আর দেখতে হবে না।'

'সবাই কি আর ফার্স্ট-সেকেন্ডে হয় নাকি রে বোকা? আমি নিজে তিন বারের বার মেট্রিক পাস করলাম। কিন্তু আইএ-তে আবার ফার্স্ট ডিভিশন।'

'থাক আপনাকে আর বকবক করতে হবে না।'

বাবা নিজে এসেও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন।

'আরে সেকেন্ড ডিভিশন খারাপ নাকি?'

'খারাপ হবে কেন? খুব ভাল, তুমি যাও তো এখন।'

নীলুকে আমরা খুব শক্ত মেয়ে হিসেবে জানতাম। এই ব্যাপারটায় যে সে এতটা মন খারাপ করবে ভাবতেও পারিনি। কিছু দিন পরই সে জ্বরে পড়ে গেল। অল্পদিনের জ্বরেই শুকিয়ে-টুকিয়ে অন্য রকম হয়ে গেল। এক রাতে ঘুমুতে এল আমার ঘরে। একা একা তার নাকি ভয় লাগছে। কে যেন বারবার তার জানালার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। আমরা দুজন অনেকদিন পর একসঙ্গে ঘুমুতে গেলাম। সেতারা শুয়েছে একা একটি খাটে। আমরা দুজন একটিতে। আমি নরম স্বরে বললাম, 'এত মন খারাপ করেছিস কেন?'

'জানি না কেন।'

'তুই তো পড়াশোনাই করিসনি, রেজাল্ট কোত্থেকে ভাল হবে।'

'তা ঠিক।'

নীলু একটি হাত আমার গায়ের ওপর রেখে বলল, 'দুজন এবার আলাদা হয়ে যাব। তুই যাবি ঢাকায় আর আমি এখানে কোনো ভাঙা কলেজে।'

'আমি ঢাকায় যাব না, এইখানে থাকব।'

'তুই ঢাকায় পড়তে যাবি একটা তো জানা কথা। সেটাই ভাল। তুই এত ভাল ছাত্রী, তোর তো ভাল কলেজেই যাওয়া উচিত।'

আমরা দুজন হালকা গলায় নানান কথাবার্তা বলতে লাগলাম। অনেক রাতে শুনলাম বাবা ঘরে ফিরেছেন। গুনগুন করে কি বলছেন। রমজান ভাই রাগী গলায় কি-সব বলছেন। নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'চল ঘুমিয়ে পড়ি।'

প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছি, তখন নীলু বলল, 'বিলু একটা কথা। জেগে আছিস তো?'

'হুঁ।'

'আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোকে।'

'কী প্রতিজ্ঞা?'

নীলু চুপ করে রইল। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কীসের প্রতিজ্ঞা?'

'ঢাকায় গিয়ে রকিব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবি না।'

'এসব কি বলছিস, আমি দেখা করব কেন?'

'আর ওর চিঠির জবাব দিবি না।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নীলু কাঁদতে শুরু করল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'কথা দে আমাকে আমার গা ছুঁয়ে বল।'

'কী যে কাণ্ড তোর!'

আমি নীলুকে জড়িয়ে ধরলাম। এমন বোকা কেন নীলুটা?

সেদিন আকাশের রঙ ছিল ঘন নীল।

আমরা এমনিত কখনো আকাশ দেখি না। আমরা আকাশের দিকে তাকাই মন খারাপ হলে।

মন বিষণ্ন হলে আকাশও বিষণ্ন হয়। হেমন্তের এই ঝকঝকে সকালে আকাশটা অসম্ভব বিষণ্ন হয়ে গেল। আমি তবু মুখে হাসি টেনে রাখলাম। ভোরবেলা নাশতা খাবার সময় খুব হাসিখুশি থাকতে চেষ্টা করলাম। নজুমল চাচাও আজ আমাদের সঙ্গে নাশতা খেলেন। নীলু বসে রইল পাথরের মত মুখ করে। বাবা একবার সাবধানে চলাফেরার কথা বললেন।

'একা একা কোথাও যাবার দরকার নেই। কোথাও যেতে হলে বন্ধু-বান্ধব কাউকে সঙ্গে নিবি।'

নজমুল চাচা বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই, সফদর সাহেব প্রতি শুক্রবারে এসে বাসায় নিয়ে যাবেন। আর ছুটিছাঁটা হলে নিজে ময়মনসিংহে এসে পৌঁছে দেবেন। অতি ভদ্র সজ্জন ব্যক্তি।'

আমি তাদের কথায় হাঁ-না কিছুই বললাম না। ঠিক যখন যাবার সময় হল তখন ইচ্ছে করল চেঁচিয়ে বলি— আমি এইখানেই থাকব। এখানকার কলেজে ভর্তি হব। কিছুই বলা হল না।

নজমুল চাচা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেন ছাড়তে খুব দেরি করতে লাগল। বাবা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। নীলু সেতারা কেউ আসেনি। ওরা খুব কাঁদছিল। বাবা বলেছিলেন, 'তোরা আসিস না। তোরা থাক এখানে। আর এত কান্নাকাটির কি আছে। দুই মাস পরে তো আসছেই।'

ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় বাবা মনে হল খুব অবাক হয়ে পড়েছেন। যেন ভাবতে পারেননি ট্রেন এক সময় ছেড়ে দেবে। তিনি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলেন। নজমুল চাচা বললেন, 'আরে কর কি, হাত ছেড়ে দাও।' বাবা হাত ছাড়লেন না। যেন শেষমুহূর্তে তাঁর মনে হল আমি চলে যাচ্ছি। তিনি ট্রেনের লোকজন, প্লাটফরমের গাদাগাদি ভিড় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ফুপিয়ে উঠলেন, 'আমার আম্মি। আমার রাত্রিমণি। ওরে বেটি টুনটুন।'

আমি পাথরের মত মুখ করে বসে রইলাম। পৃথিবীতে এত কষ্ট কেন থাকে? কেন এত দুঃখ চারদিকে? জানালার ওপাশে কি সুন্দর সব দৃশ্য। গাঢ় নীল রঙের ডোবা একটি। তার ওপর সাদা মেঘের ছায়া পড়েছে। কঞ্চি হাতে একটি ছোট্ট ছেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ট্রেনের দিকে। পাট বোঝাই একটি গরুর গাড়ির চাকা আটকে গেছে। গরুটি ধবধবে সাদা। এক সময় নজমুল চাচা বললেন, 'ছিঃ মা কাঁদে না।'

বিলু,

তোর দুটি চিঠিই পেয়েছি। প্রথমটির জবাব সঙ্গে সঙ্গে লিখেছিলাম। রমজান ভাইকে পোস্ট করতে দিয়েছি। ওমা দুই দিন পরে দেখি তার বাজারের ব্যাগ থেকে চিঠি বেরুল। ভিজে ন্যাতা ন্যাতা। অথচ রমজান ভাই আমাকে বলেছে সে নিজ হাতে চিঠি ফেলেছে। দেখ অবস্থা। তারপর তোমার দু'নম্বর চিঠিটি এল। ভাবলাম রাতে জবাব লিখব। রাত ছাড়া চিঠি লিখতে ভাল লাগে না। কিন্তু রাতে বাবার খুব জ্বর এল। মাথায় পানি ঢালতে হল, ডাক্তার আনতে হল। ডাক্তার বলছেন ম্যালেরিয়া। দেশে কী এখন ম্যালেরিয়া আছে নাকি যে ম্যালেরিয়া হবে। ডাক্তারটির বয়স খুব কম, আমার মনে হয় নতুন পাস করেছে। আমার মত পাস। বইটই ভালমতো পড়েনি। আমার সঙ্গে গম্ভীর হয়ে কথা বলছিল।

'মিস নীলু, ভয়ের কিছু নেই। আমি আবার এসে দেখে যাব।'

আমি হেসে বাঁচি না। মিস নীলু আবার কি! কলেজে ওঠার পর দেখি অনেকেই সম্মান-টম্মান করছে। বিশেষ করে আমাদের কলেজের একজন লজিকের স্যার— নজিবর রহমান ভুঁইয়া। উনি সব সময় আপনি আপনি করছেন। ছাত্রীরা তাঁর নাম দিয়েছে প্রেমকুমার। কারণ তিনি নাকি সব মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করেন। তাঁকে প্রতি বছর পাঁচ ছ'বছর হাফসোল খেতে হয়। হাফসোল কী জানিস তো? নাকি তোদের কলেজে এসব কথা বলে না?

যাই হোক নজিবর রহমান স্যার কী করল তোকে বলি। ক্লাসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ নজিবর রহমান স্যারের সঙ্গে দেখা। তিনি ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'তুমি ফার্স্ট ইয়ারের না?'

'জি স্যার।'

'গত ক্লাসে আসনি কেন?'

'বাবার জ্বর ছিল তাই আসিনি।'

'লজিকের কতগুলি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন পড়িয়েছি। মিস করলে পরেরগুলি ধরতে পারবে না।'

আমি চুপ করে রইলাম। নজিবর রহমান স্যার গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ মাথা দুলিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে আমার কাছে প্রিপেয়ারড নোট আছে। একাবার এসে নিয়ে যেও।'

আমি অবশ্যি নোট নিতে যাইনি। গেলেই আমার নাম হয়ে যেত প্রেমকুমারী। হি হি হি। উঁচু ক্লাসের মেয়েদের কাছে শুনেছি তাঁর কাছে ক্লাস নোটের দশ-বারোটা কপি তৈরি থাকে। যাদের সঙ্গে তাঁর প্রেম করার ইচ্ছে হয় তাদের তিনি ডেকে ডেকে দেন। ভদ্রলোক কিন্তু পড়ান খুব ভাল। আমাদের আরেকজন স্যার আছে খুব ভাল পড়ান। তাঁর নাম কি জানিস? তাঁর নাম "মুরগির গু"। কী জন্যে বেচারার এই নাম হল। অনেকদিন ধরে তাঁর এই নাম চলছে। ছোটখাটো মানুষ, খুব পান খান। ক্লাস শুরু করবার আগে ডাস্টার দিয়ে টেবিলে একটা প্রচণ্ড বাড়ি দিয়ে বলেন, 'নিস্তব্ধতা! ছাত্রীগণ নিস্তব্ধতা হিরন্ময়!' প্রথম দিন তো আমি বহু কষ্টে হাসি সামলালাম, কিন্তু পরে দেখি সাংঘাতিক ভাল পড়ান। তাঁর একটা ভাল নাম হওয়া দরকার ছিল।

ক্লাসের অনেক কথা লিখলাম। আরো মজার মজার ব্যাপার আছে, পরে লিখব। একজন আপা আছেন তাঁর নাম 'মিস চাটা'। দারুণ অসভ্য অসভ্য সব গল্প তাঁকে নিয়ে। চিঠিতে লেখা যাবে না।

এবার অন্য খবর বলি। মুন্নির বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে পিডিবির ইঞ্জিনিয়ার। খুব নাকি বড়লোক। আমি অবশ্যি বিয়েতে যাইনি। কারণ আমাকে যেতে বলেনি। মুন্নি ক্লাসের প্রায় সব মেয়েকে বলেছে, আমাকে বলেনি। রকিব ভাই এসেছিলেন ঢাকা থেকে। আমার অবশ্যি ধারণা ছিল আসবেন না। বিয়ের পরদিন আমাদের বাড়িতে এলেন। কখন এসেছেন আমি কিছুই জানি না। কি জন্যে যেন বসার ঘরে গিয়েছি, দেখি তিনি বসে বসে বাবার সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁর গায়ে নীল রঙের স্ট্রাইপ দেয়া একটা শার্ট ছিল। এমন মানিয়েছিল তাঁকে কী বলব।

আমাদের গায়ে ছিল বোম্বে প্রিন্টের ঐ জংলি শাড়িটা। আমাকে নিশ্চয় ভূতের মত লাগছিল। কারণ ঐ দিন আমি চুলও বাঁধিনি, কিছুই করিনি। আকবরের মাকে বলেছিলাম চুল বেঁধে দিতে। সে 'দিতাছি আপা' বলে সেই যে গিয়েছে গিয়েছেই। আর দেখা নেই। আমি গিয়ে দেখি দিব্যি ঘুমাচ্ছে। তারপর আমিও ঘুমাতে গেলাম। এখন চিন্তা করে দেখ অবস্থা। চুল বাঁধা নেই। ঘুমঘুম ফোলা মুখ, পরনে জংলি শাড়ি। কি ভাবলেন উনি কে জানে। আমি তো একদম হতভম্ব হয়ে গেছি। উনি বললেন, 'তুমি কে নীলু না বিলু?'

আর বাবার যা কাণ্ড। বাবা বললেন, 'সালাম কর নীলু, সালাম কর।'

সালাম করব কি। আমি বললাম, 'আপনি বসুন, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।'

'উঁহু আমি বেশিক্ষণ বসতে পারব না।'

উনি অবশ্যি অনেকক্ষণ বসলেন। চা-টা খেলেন। যাবার আগে আমাকে দুটো বই দিয়ে গেছেন। একটা হচ্ছে— ঘনাদার গল্প (দেখ না কাণ্ড, ঘনাদার গল্প পড়ার বয়স এখন আছে?) অন্যটি হচ্ছে একটি কবিতার বই, নাম— পালক। আজ আর লিখব না, ঘুম পাচ্ছে।

—নীলু

পুনশ্চঃ তোর সঙ্গে যে রকিব ভাইয়ের দেখা হয়েছিল ঢাকায় এই কথাটি তুই কোনো চিঠিতেই লিখিসনি।

প্রিয় আপা,

আমি তোমাকে চারটি চিঠি দিয়েছি, তুমি মাত্র দুটি চিঠির জবাব দিয়েছ এরকম করলে আমি আড়ি নেব। তখন মজা টের পাবে। বাবার খুব অসুখ। ডাক্তার বলেছেন ম্যালেরিয়া। খুব দুর্বল হয়ে গেছেন। এখন আর বাইরে যান না। আর বাবা তার প্রেসটা বিক্রি করে দিয়েছেন। কিন্তু কাউকে সেটা বলেননি। নজমুল চাচা এটা শুনে খুব রাগ করেছেন।

আরেকটা খুব খারাপ খবর আছে। আমার গানের স্যারের ছোট ছেলেটা পানিতে ডুবে মরে গেছে। ছেলেটার বয়স সাত। তার নাম দীপন। তুমি তাকে দেখেছিলে। তোমার মনে আছে। তবলা বাজিয়েছিল। তুমি বললে ওমা এইটুকু ছেলে আবার তবলা বাজায়। তোমার কলেজ কবে ছুটি হবে?

— সেতারা

প্রিয় মা বিলু,

দোয়া নিও। তোমার বাবার অসুখের সংবাদ পাইয়াছ। এখন কিছুটা সুস্থ, তবে পুরোপুরি সারে নাই। চিন্তার কোনো কারণ নাই। ইতিমধ্যে তোমার লোকাল গার্জেন সফদর সাহেবের একখানি পত্র পাইয়াছি। তুমি নাকি তাঁকে বলেছ— তুমি ছুটির দিনে হোস্টেলেই থাকতে চাও। এটা ঠিক না। সফদর সাহেব অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর কথা শুনিবে। এবং সেই মত চলিবে।

তোমার বাবার ব্যবসা কিঞ্চিৎ মন্দা যাইতেছে। তিনি খুব সম্ভবত প্রেস বিক্রি করিয়া দিয়াছেন। কাজটা ঠিক হয় নাই। চালু প্রেস বিক্রয় করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি কোনরূপ চিন্তা করিও না। তোমাদের অন্য অংশটি ভাড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি। দুই একজনের সঙ্গে কথাবার্তা হইয়াছে। যে কোনো ভাড়াটেকে হুট করিয়া ঢুকানো ঠিক হইব না, তাই বিলম্ব হইতেছে।

ভাল থাকিও ঠিকমত পড়াশুনা করিও।

—তোমার চাচা
নজমুল ইসলাম

নীলু,

তোর চিঠি পেয়েছি আজ বিকেলে।

এখন রাত প্রায় এগারোটা। অনেক রাতে উত্তর লিখতে বসেছি, কারণ আমার রুমমেট কিছু লেখার সময় খুব বিরক্ত করে। ঘাড়ের কাছে মাথা এনে সে চিঠি পড়বে। আমি এতটুকুও পছন্দ করি না, তবু সে এটা করবেই। তার ধারণা আমি কোনো ছেলেকে চিঠি লিখছি। আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

বাবার অসুখের খবর পেয়ে খুব খারাপ লেগেছে। এতদিনে সেরেছে নিশ্চয়ই সব জানাবি। নজমুল চাচা লিখেছেন প্রেস বিক্রি হয়ে গেছে। শুনে যা ভয় লাগছে। এখন আমাদের চলবে কি করে? আজ সমস্ত দিন আমার এইসব ভেবে খুব খারাপ লেগেছে। তার ওপর আজ বায়োলজি ল্যাব ছিল। আমাদের ডেমনেসট্রেটর একটা ব্যাঙ এনে ক্লোরফরমড করলেন। আমরা শুধু দূর থেকে দেখলাম। তারপর উনি সেটা কচ করে কেটে ফেললেন। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডটা তখনো লাফাচ্ছে। কি যে খারাপ লেগেছে।

বিকেলে হোস্টেলে ফিরে এসেও বমি বমি লাগছিল। রাতে ভাত খাইনি। আমার রুমমেট তখন ফ্রেঞ্চ টোস্ট করে খাওয়াল। ওর একটা কেরোসিন কুকার আছে। খাটের নিচে লুকিয়ে রাখে। কারণ হলে এই সব এলাউ করে না। কিন্তু বেচারীর খুব রান্নার সখ। কয়েক দিন আগে গাজরের হালুয়া বানাল। এটা বানানো যে এত সহজ তা জানতাম না। খেতেও খুব ভাল হয়েছিল। মেয়েটির নাম মালা। রাজশাহী থেকে এসেছে। অনেক রকম রান্না জানে। দারুণ স্মার্ট মেয়ে। হোস্টেল সুপারের পারমিশন না নিয়েই সে দু'দিন তার এক আত্মীয় বাড়ি থেকে এসেছে!

এখানে নিয়মের খুব কড়াকড়ি। তবে সিনিয়র মেয়েদের বেলায় এতটা নয়। সিনিয়র মেয়েরা দোতলায় থাকে। ওদের সঙ্গে আমাদের তেমন যোগ নেই। ওরা অনেক রকম কাণ্ড-কারখানা করে। গত শুক্রবারে কি হয়েছে জানিস! রাত একটায় হঠাৎ শুনি দারুণ হৈচৈ হচ্ছে। পরে শোনা গেল দোতলার ক'টি মেয়ে প্ল্যানচেট করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মা নিয়ে এসেছে। সে আত্মা আবার কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। হোস্টেল সুপারটুপার এলেন। হুলুস্থুল কাণ্ড।

তুই লিখেছিস তোর রকিব ভাইয়ের সঙ্গে যে দেখা হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু লিখিনি। ইচ্ছে করেই লিখিনি। তুই আবার কি ভাবতে কি ভাববি। যাক এখন লিখছি। সেদিন কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল খাতা কিনতে ন্যুমার্কেটে গিয়েছি। আমার সঙ্গে আছে আমার রুমমেট মালা। সে চুল বাঁধার রাবার ব্যান্ড আর টিপ কিনবে। কেনাকাটা শেষ হবার পর আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ মালা বলল— দ্যাখ ঐ ভদ্রলোক তখন থেকে আমাদের পিছে পিছে আসছে আর মিচকি মিচকি হাসছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। আমাকে তাকাতে দেখেই সে বলল— তুমি নীলু না বিলু?

আমি তখনো চিনতে পারিনি। তখন ভদ্রলোক রাগী গলায় বললেন— চিঠির জবাব দাওনি কেন? তখন চিনলাম। খুব অবাক হয়েছিলাম। এ রকম দাড়িগোঁফ কল্পনাও করিনি। তারপর উনি আমাদের আইসক্রিম খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। মালা কিছুতেই যাবে না। শেষপর্যন্ত অবশ্যি গেল। তিনি

সারাক্ষণই তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁর কি ধরণা জানিস? তার ধারণা— না বলব না।

শোন নীলু একটা কথা— তুই ঐ ভদ্রলোককে বলবি উনি যেন দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলেন। যা জঘন্য লাগছিল ওঁকে।

এই যা— একটা বেজে যাচ্ছে, শুয়ে পড়ি। কাল পরশু আবার চিঠি লিখব।

—বিলু

মা বিলু,

দোয়া নিও। নীলুর নিকট হইতে শুনিলাম তোমাদের দোতলার মেয়েরা প্ল্যানচেটে আত্মা আনিয়াছে। উহাদের সহিত কোনোরূপ সম্পর্ক রাখিবে না। সব কিছু নিয়া ছেলেখেলা ভাল না।

তোমাদের উপরের তলায় নতুন ভাড়াটে আসিয়াছে। অতি সজ্জন ভদ্রলোক। স্বামী-স্ত্রী ও একটি ছেলে। ছেলেটি ঈষৎ দুরন্ত।

তোমার বাবার অসুখ অল্প বাড়িয়াছে। তবে চিন্তার কারণ নাই। শরীরের ওপর অযত্ন ও অবহেলার এই ফল। কিছুদিন ভুগাইবে। আর সব সংবাদ ভালো। জনৈক লোক মারফত আমি মুক্তাগাছার কিছু মণ্ডা পাঠাইলাম। বন্ধু-বান্ধব নিয়া খাইও। আর তোমাদের হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টের নিকট একটি পৃথক পত্র দিলাম। পত্রটি তাহাকে পৌঁছাইও এবং আমার সালাম দিও। ইতি।

তোমার চাচা
নজমুল ইসলাম

হোস্টেল সুপার।
জনাবা,
সবিনয় নিবেদন এই যে, জানিতে পারিলাম আপনার হোস্টেলের কতিপয় ছাত্রী প্ল্যানচেট না কি যেন করিতেছে। এই সব বিষয় নিয়া ঠাট্টা-তামাশা শুভ নয়। ছাত্রীর অভিভাবক হিসাবে আমি চিন্তাযুক্ত আছি। আপনি যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া চিন্তামুক্ত করিবেন। আপনার নিকট এই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইতি।

নজমুল ইসলাম

আপা,
তুমি নীলু আপাকে এত লম্বা লিখেছ, আমাকে লেখোনি কেন? আমি খুব রাগ করেছি। আর কোনোদিন তোমাকে চিঠি লিখব না। আল্লাহর কসম।

বাবার অসুখ খুব বেড়েছে। আর আকবরের মার হাতের আঙুলের নিচে ঘা হয়েছে। নজমুল চাচা বলেছেন বেশি পানি ঘাঁটাঘাঁটির জন্যে এটা হয়েছে।

দোতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে করিম সাহেব ভদ্রলোক খুব মোটা। তাঁর ছেলেটি দারুণ দুষ্ট। এবং খুব ফাজিল। সে আমাদের কাচের জগটা ভেঙে ফেলেছে। ভেঙে আবার দাঁত বের করে হাসে। এমন ফাজিল।

—সেতারা

পুনশ্চঃ আপা তোমরা যে রবীন্দ্রনাথের আত্মা এনেছ সে কি করেছে? আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ে বলেছে সেও নাকি প্ল্যানচেট করতে পারে। আমার বিশ্বাস হয় না, সে খুব গুল ছাড়ে। এই জন্যে আমরা তার নাম দিয়েছি গুল বাহার।

প্রিয় বিলু,
তোদের হোস্টেলের মেয়েরা ভূত এনেছে শুনে নজমুল চাচা খুব রাগ করেছেন। তিনি বলেছেন তিনি হোস্টেল সুপার এবং প্রিন্সিপ্যালকে চিঠি লিখবেন।

আমাদের দোতালায় নতুন ভাড়াটে এসেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম বীনা। ভদ্রমহিলা নাকি-স্বরে কথা বলেন। প্রথম দিন বাড়িতে এসে বললেন— বাঁড়িত খুঁব বঁড়। তঁবে চাঁরদিকে খুঁব জঁঙ্গলা। আমি বহু কষ্টে হাসি সামলেছি। তবে ভদ্রমহিলা খুব ভাল। বাবার জন্যে স্যুপ করে পাঠান। এবং খুব খোঁজখবর করেন। তবে ভদ্রমহিলার শুচিবায়ু আছে। রোজ তিন চারবার ঘর ধোয়া মোছা করেন।

বিলু তোকে এখন একটা কথা বলি— আমি রকিব ভাইয়ের একটা খুব চমৎকার চিঠি পেয়েছি। এত সুন্দর চিঠি যে আমি খুব কাঁদলাম। কত লক্ষ বার যে পড়লাম সেই চিঠি। আমার কি ইচ্ছে করে জানিস? ইচ্ছে করে একদিন হুট করে ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে খুব চমকে দেই। তারপর তিনি যখন বলবেন— তুমি কে, নীলু না বিলু? আমি তখন বলব, আমি বিলু। এবং অনেকক্ষণ বিলু হিসেবে কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ বলব, আমি কিন্তু নীলু। ভদ্রলোকের মুখের অবস্থাটা কি হবে ভেবে দেখ।

বিলু, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কি করে আমার পরিচয় হল তোকে বলি। মুন্নিদের বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। অপলারাও গিয়েছে। মুন্নি বলল, 'আমার এক ভাই এসেছেন ইউনিভার্সিটির টিচার। অংকের টিচার, যা গম্ভীর। আমরা আড়াল থেকে দেখলাম সত্যি গম্ভীর। মুন্নি তখন করল কি জানিস? আমাকে বলল— এই নীলু, তুই যদি আমার ঐ ভাইয়ের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে খেতে পারিস তো বুঝব তোর সাহস। আমি বললাম— আমি শুধু শুধু তাঁর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে খাব কেন?

তুই তো টেনেছিস সিগারেট। স্কুলের বাথরুমে। এখন দেখি তোর সাহস। যদি সিগারেট চাইতে পারিস তাহলে প্রমাণ হবে আমাদের ক্লাসে তোর চেয়ে সাহসী মেয়ে নেই।

আমি ইতস্তত করে ঢুকে পড়লাম ভদ্রলোকের ঘরে। কোনোমতে বললাম— মুন্নির সঙ্গে আমার একটা বাজি হয়েছে। সেই বাজিতে আমি জিতব, যদি আপনি আমাকে একটা সিগারেট দেন।

ভদ্রলোক কিছুই বুঝতে পারলেন না, একটা সিগারেট বের করে দিলেন। আমি বললাম, 'আপনি রাগ করবেন না। সিগারেটটা আমাকে ধরাতে হবে। ভদ্রলোক দিয়াশলাই বের করে দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি?'

'নীলু।'

'ও নীলু। তোমার কথা বলেছে আমাকে মুন্নি।'

'কি বলেছে?'

'বলেছে যে তুমি খুব তেজী মেয়ে।'

'আরো অনেক কিছু বলেছে নিশ্চয়ই।'

ভদ্রলোক তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি বললাম, 'আর কিছু বলেনি মুন্নি?'

'আর কি বলবে?'

'বলেনি আমার মা পালিয়ে গেছে? আমাদের সম্পর্কে যখন কেউ কিছু বলে সেটাই সবার আগে বলে।'

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, 'মুন্নি বলেনি সে সব?'

'বলেছে।'

আমি দেখলাম জানালার আড়াল থেকে মুন্নি ও অপলা অবাক হয়ে দেখছে আমার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

আমি বললাম, 'আজ উঠি। আপনি আমার ওপর রাগ করেননি তো।'

'রাগ করব কেন?'

'আপনার সামনে সিগারেট টানলাম যে।'

'না রাগ করিনি। মাঝে মাঝে এই সব ছেলেমানুষি দেখতে ভালই লাগে।'

আমি উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক বললেন— নীলু বস, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভাল লাগছে। প্লিজ বস। আমি অবাক হয়েই বসলাম। আর আমার কি যে ভাল লাগল। এখনো মনে আছে সে রাতে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারিনি। শেষ রাতের দিকে ঘুম এল এবং আমি ভদ্রলোককে স্বপ্ন দেখলাম। যেন আমি চা বানাচ্ছি, তিনি এসে বললেন— নীলু আমার আজ

ফিরতে দেরি হবে, তুমি খেয়ে নিও। অপেক্ষা করবার দরকার নেই। আমি রাগের ভঙ্গি করে বললাম— না আজ কোথাও যেতে পারবে না। আজ আমরা বাগানে হাঁটব।

অদ্ভুত মিষ্টি স্বপ্নের ভেতরই আমি কেঁদে বুক ভাসিয়েছি। কাউকে এই স্বপ্নের কথা বলতে পারিনি। তোকে বলার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সাহস হয়নি। যদি তুই হাসাহাসি করিস।

তোকে আমি অনেক কথা বলতে চাই বিলু। ছুটি হতে তো অনেক দেরি। একবার চালে আয় না। তাছাড়া এমনিতেও তোর আসা উচিত। বাবার শরীর খুব খারাপ, কেউ তোকে জানাচ্ছে না। কাল রাতে আমি ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন, 'কে রেনু?' আমি বললাম— 'বাবা আমি নীলু।' বাবা কেমন চোখে তাকালেন আমার দিকে, তারপর বললেন— 'নীলু তোর মা বোধ হয় এসেছে। বসতে-টসতে দে। পুরোনো কথা মনে রেখে লাভ নেই।'

বিলু চলে আয়।

—তোর
নীলু।

বাড়ি ফিরে অবাক হলাম।

সব কিছুই অন্যরকম লাগছে। চারদিকে কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার। সব কিছুই অন্যরকম হয়ে গেছে। সেতারাকেও মনে হল এই তিন মাসে অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। সবচে' বদলেছেন বাবা। কী যে খারাপ হয়েছে তাঁর স্বাস্থ্য। চোখ হলুদ। মাথার সামনের দিকের চুল সব পড়ে গেছে। আমি তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকতেই তিনি বলবেন, 'কে, রেনু?'

আমি অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'বাবা আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'চিনতে পারব না কেন? কখন এসেছিস?'

'এই তো কিছুক্ষণ আগে।'

'বস মা আমার কাছে।'

বাবা তাঁর রোগা একটা হাত আমার কোলে তুলে দিলেন।

'তুমি আমাকে একটা চিঠিও লেখোনি বাবা।'

'শরীরটা খারাপ মা। খুব খারাপ।'

ঠিক তখন নীলু চা নিয়ে ঢুকল। বাবা মাথা তুলে বললেন, 'কে, রেনু?'

নীলু অত্যন্ত যত্নে বাবাকে বালিশে হেলান দিয়ে বসাল। পিরিচে ঢেলে ঢেলে চা খাওয়াল। নীলু দেখি অনেক কাজ শিখেছে। গিন্নি গিন্নি ভাব।

সে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ছুটোছুটি করে অনেক কাজ করছে। এক ফাঁকে বলল, 'সংসারের হাল ধরেছি।'

'তাই দেখছি।'

'কি যে ঝামেলা গেছে তুই তো জানিস না। তোকে জানানো হয়নি।'

'তা জানাবি কেন, আমি কে?

'তাও ঠিক।'

নীলু হাসল।

আমি বললাম— 'তুই খুব সুন্দর হয়ে গেছিস নীলু।' নীলু কিছু বলল না। অন্য সময় হলে সে কিছু-একটা ঠাট্টার কথা বলত। আজ দেখলাম লজ্জা পাচ্ছে।

'নীলু তুই কেমন অন্য রকম হয়ে গেছিস।'

'অন্য রকম মানে কী রকম?'

'তোর মধ্যে কেমন একটা মা মা ভাব চলে এসেছে।'

নীলু এবারও লজ্জিত ভঙ্গিতে আবার হাসল। সত্যি সত্যি সে বদলে গেছে। কিন্তু এই নীলুকেও ভাল লাগছে। আমি মৃদু স্বরে বললাম, 'আজ রাতে আমরা দুজন একসঙ্গে শোব, কেমন নীলু?'

'ঠিক আছে।'

'সারারাত গল্প করব।'

নীলু হাসল। ছোট বোনদের পাগলামী কথাবার্তা শুনে বড় বোনটা যেমন প্রশ্রয়ের হাসি হাসে সে রকম হাসি। ওরা আমার ঘরটি ঠিক আগের মতো করে সাজিয়ে রেখেছে। টেবিলের ওপর বইপত্র যা ছিল সব সে রকমই আছে। একটা বাজারের লিস্ট করেছিলাম, সেই লিস্টটা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখেছে।

'আমার বিছানায় এখন কে শোয় নীলু? সেতারা?'

'হুঁ সেতারা বুঝি সে রকম? ও এখনো আমার সঙ্গে ঘুমায়। আরো অনেক মজার ব্যাপার আছে সেতারার।'

সেতারা বলল, 'ভাল হবে না আপা।'

আমি বললাম, 'কী ব্যাপার?'

'সেতারাকে কে যেন প্রেমপত্র লিখেছে। রুল টানা কাগজে।'

নীলু খিলখিল করে হেসে উঠল। কে বলবে এই বাড়িতে কোনো দুঃখ-কষ্ট আছে?

নীলু বলল, 'নজমুল চাচা তাঁর মেয়ের কাছে যাচ্ছেন জানিস?'

'না তো!'

'সামনের মাসের মাঝামাঝি যাবেন। ওর মেয়ের কি যেন একটা অপারেশন হবে। গল ব্লাডার না কি যেন, ঠিক জানি না। মেয়ে বাবার জন্যে টিকিট পাঠিয়েছেন।'

'নজমুল চাচা নিশ্চয়ই খুব খুশি?'

'না, খুব না। এত দূর একা একা যেতে ভয় পাচ্ছেন।'

'ভয়ের কি?'

'কি জানি চাচার হেনতেন কত কথা, আসলে যাবার ইচ্ছা নেই।'

'যাচ্ছেন তো?'

'তা যাচ্ছেন।'

নজমুল চাচার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। নজমুল চাচা আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে লাগলেন। যেন আমি তাঁর হারিয়ে-যাওয়া একটি মেয়ে, কোনোদিন ফিরে পাবেন ভাবেননি, হঠাৎ ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কাণ্ড দেখে দরজায় পাশে দাঁড়িয়ে নীলু হাসতে লাগল। চাচা রাগী গলায় ধমক দিলেন, 'হাসছিস কেন?'

নীলু মুখ টিপে বলল, 'এমনি হাসছি। কাঁদলে দোষ নেই, হাসলে দোষ।'

'তুই নিচে যা তো নীলু।'

'ঠিক আছে যাচ্ছি। কিন্তু বিলু ভেবে যাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদা হচ্ছে সে কিন্তু বিলু নয়। আমি বিলু।'

নজমুল চাচা হকচকিয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে লাগলেন। তাঁর মনে সন্দেহ ঢুকে গেল।

'তুই কে নীলু না বিলু?'

'আমি বিলু।'

'সত্যি করে বল।'

'সত্যি বলছি।'

'না, তুই নীলু। বড় ফাজিলে হয়েছিস, যা বিলুকে পাঠিয়ে দে।' আমি হাসতে হাসতে নিচে নেমে গেলাম। বাড়িতে এসে বড় ভাল লাগছে।

দোতলার নতুন ভাড়াটেদের সঙ্গেও দেখা হল। নীলু বলেছিল নাকি-স্বরে কথা বলেন। কোথায় কী দিব্যি ভাল মানুষের মত কথাবার্তা। নীলুটা এমন বানাতে পারে। ভদ্রমহিলাকে আমার বেশ পছন্দ হল। তবে একটু কথা বেশি বলেন। আমার সঙ্গে দু'তিন মিনিট কথা হল, এর মধ্যে হড়বড় করে একশ' গণ্ডা কথা বলে ফেললেন। তবে যে সব মেয়েরা বেশি কথা বলে ওদের মনে কোনো ঘোরপ্যাঁচ থাকে না। এইটা খুব সত্যি। বেশি কথা বলা মেয়েরা খুব দিলখোলা হয়।

সমস্ত দিন আমি অন্য এক ধরনের ভাল লাগা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দুপুরে নীলু আমাকে বাগানে নিয়ে গেল। পেয়ারা গাছে নাকি ডাঁসা পেয়ারা হয়েছে। খুব মিষ্টি।

'বাগান পরিষ্কার করেছে কে?'

'দোতলার ঐ ভদ্রমহিলা করিয়েছেন। এখন ভাল লাগছে না?'

'হুঁ। চমৎকার লাগছে।'

'এ ভদ্রমহিলা আর তার হ্যাসবেন্ড প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা বাগানে বসে চা খান। একদিন দেখি হাত ধরাধরি করে হাঁটছেন। খুব রোমান্টিক।

আমি ঘাসের ওপর বসতে বসতে বললাম, 'তোর রকিব ভাই আর চিঠি-ফিঠি লেখে না?'

নীলু লাল হয়ে বলল, 'লেখে মাঝে মাঝে।'

'কী লেখেন?'

'এই সব আজেবাজে তেমন কিছু না।'

'তুমি নিশ্চয়ই খুব লিখিস?'

নীলু জবাব দিল না।

'কী রে, লিখিস না তুই?'

'লিখি মাঝে মাঝে।

'তুই কী লিখিস নীলু?'

নীলু চুপ করে রইল।

'বল না?'

'যা মনে আসে তাই লিখি। বাবার কথা লিখি, মার কথা লিখি। তোব কথা সেতারার কথা সবার কথা লিখি।'

'লিখতে খুব ভাল লাগে?'

'হুঁ।'

আমি একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস গোপন করে হালকা স্বরে বললাম, 'তোদের বিয়ে হলে বেশ মানাবে। দুজনেই চিঠি লেখার ওস্তাদ।'

নীলু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। হয়ত তার চোখে পানি আসছে। চাচ্ছে না আমি দেখে ফেলি।

সন্ধ্যাবেলা আমরা তিন বোন নদীর পাড়ে হাঁটতে গেলাম। মা যখন ছিলেন তখন আমরা প্রায়ই হাঁটতে আসতাম। প্রায় মাইলখানিক হাঁটা হয়ে যেত। এক সময় ক্লান্তিতে পা ভারী হয়ে আসত, তবু মায়ের হাঁটার শেষ নেই।

নীলু বলত, 'আর পারব না। ক্ষমা চাই। আমি এখানে বসে থাকব, তোমরা যাও।' মা বলতেন, 'অল্প কিছু দূর যাব। সামনেই নদীটা খুব সুন্দর।' একই রকম নদী। একই দৃশ্য দু'পাশে। তবু কিছু কিছু জায়গায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলতেন, 'আহ কী সুন্দর!' তেমন বিশেষ সৌন্দর্যের কিছু আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু মা'র মুগ্ধ ভাব আমাদের ও স্পর্শ করত। নীলু হাই তুলে বলত, 'মন্দ না, ভালই।' মা চলে যাবার পর আমরা আর নদীর কাছে আসি নি। না কথাটা ঠিক না। বাবার সঙ্গে এসেছিলাম একদিন। গত শীতে আগের শীতে বাবার হঠাৎ সখ হল আমাদের নিয়ে বেড়াবেন। খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যাব। নদীর পাড়ে বসে চা খাব, কী বলিস?' আমরা কেউ তেমন উৎসাহ দেখলাম না। শুধু সেতারা খুব উৎসাহ দেখাতে লাগল।

প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা বেড়াতে বের হলাম। বাবার কাঁধে ফ্লাস্ক। আমরা তিন বোন হাত ধরাধরি করে তাঁর পিছু পিছু যাচ্ছি। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। দেখার মতো কিছুই নেই। নদীটিও শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। বাবার উৎসাহ মিইয়ে এসেছে। মৃদু স্বরে বললেন, 'ফিরে যাবি নাকি?' নীলু বলল, 'কোথাও বসে চা শেষ করি। এত কষ্ট করে ফ্লাস্কটা আনলে।' কেথাও বসার মত জায়গা পাওয়া গেল না। সব শিশিরে ভিজে আছে। বাবা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। সেই আমাদের শেষবারের মতো যাওয়া।

বাবা সুস্থ থাকলে বাবাকে নিয়ে আসা যেত। তিনি আমাদের তিন বোনকে বেরুতে দেখে আগ্রহ নিয়ে বলেছিলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস তোরা?' সেতারা বলেছে, 'নদীর পাড়ে হাঁটতে যাচ্ছি বাবা।' তিনি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভাল, খুব ভাল।'

'বেশিক্ষণ থাকব না। যাব আর আসব।'

'যতক্ষণ ইচ্ছা থাকিস মা। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি ভালোই আছি। খুব ভাল।'

আমরা হাঁটছি নিঃশব্দে। অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। দু'একজন

বুড়োমত ভদ্রলোক সেতারাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাল আছ?'

নীলু বলল, 'সেতারাকে সবাই চেনে। ইস আগে যদি মন দিয়ে গানটা শিখতাম।'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে শহরের শেষপ্রান্তে চলে এলাম প্রায়। সেখানে প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকড়া রেন্টি গাছ। তার শিকড় নেমে গেছে নদীর দিকে। কয়েকজন কলেজের ছেলে-টেলে হবে গাছের গুঁড়ির ওপর বসে সিগারেট টানছিল। ওরা আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়াল। একজন এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা বসবেন?'

'নাহ।'

'বসুন না একটু আমাদের সঙ্গে। বসুন।'

সেতারা বলল, 'কিন্তু আপনারা গান গাইতে বলতে পারবেন না।'

সব ক'টি ছেলে একসঙ্গে হেসে উঠল। আমরা তিন বোন পাশাপাশি বসলাম। ছেলেগুলি বসল আমাদের সামনে।

নীলু বলল, 'আপনারা রোজ এখানে আসেন? জায়গাটা খুব সুন্দর।'

ছেলেগুলি কোনো উত্তর দিল না।

সেতারা বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাড়ি যাওয়া দরকার।'

'আমরা আপনাদের পৌঁছে দেব।' আমরা 'উত্তর দীঘির' পাশ দিয়েই রোজ যাই।'

আমরা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ছেলেগুলি সেতারাকে গান গাইতে বলল না। কিন্তু সেতারা নিজ থেকেই গুনগুন করতে শুরু করল। খোলা মাঠ। অদূরেই শীর্ণকায় ব্রহ্মপুত্র। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে গাছে গাছে। এর মধ্যে সেতারার কিন্নর কণ্ঠ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল—

'চাহিতে যেমন আগের দিনে
তেমনি মদির চোখে চাহিও
যদি গো সেদিন চোখে আসে জল
লুকাতে সে জল করিও না ছল....'

আমাদের তিন বোনের চোখ ভিজে উঠল। আমরা কতগুলি অপিরিচিত ছেলেকে সামনে বসিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। কান্নার মতো গভীর তো কিছু নেই। একজনের দুঃখ অন্যজনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু একজনের চোখের জল অন্যকে স্পর্শ করে। ছেলেগুলি দেখলাম একে একে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাচ্ছে। পুরুষরা তাদের চোখের জল মেয়েদের দেখাতে চায় না।

একটি ছেলে কোমল স্বরে বলল, 'আরেকটা গাইবেন?'

কোনো অলৌকিক জগৎ থেকে সেতারার গান আসে? বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে শুনলাম সে গাইছে, 'নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি জল।'

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা মিলিয়ে এল। ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে উড়ে আসতে লাগল শীতল হাওয়া। অন্ধকার ঝোপগুলিতে চিকমিক করতে লাগল জোনাকী। ছেলেগুলি আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সেতারা বলল, 'ভেতরে আসবেন?'

'জি না, জি না।'

কিন্তু ওরা চলেও গেল না। গেটে বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

একজন মৃদু স্বরে বলল, 'আপনার বাবার শরীর কী এখন ভাল?'

নীলু বলল, 'একটু ভাল।'

কিন্তু বাবার শরীর ভাল নয়। আমি জানি বাবা মারা যাবেন খুব শিগগিরই। মৃত্যু টের পাওয়া যায়। তার পদশব্দ ক্ষীণ কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বাবা মারা যাবার পরপরই আমরা একা হয়ে যাব। কেউ কি তখন এগিয়ে আসবে আমাদের কাছে? একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে রকিব ভাই হাসিমুখে বলবেন— কে বিলু আর কে নীলু? গাঢ় ভালবাসার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করবে আমাদের দিকে। হয়ত করবেন, হয়ত করবেন না। এখানে কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না।

বসবার ঘরে বাতি জ্বলছিল। আমরা ঘরে ঢুকেই দেখলাম আমাদের লাল রঙের সোফাটিতে মা বসে আছেন। কেমন অদ্ভুত একটি শান্ত বিষণ্ন ভঙ্গি। মা মাথা নিচু করে বললেন, 'তোমাদের বাবাকে দেখতে এলাম। নজমুল সাহেব টেলিগ্রাম করেছিলেন।'

মার পরনে সাদার উপর নীল নকশার একটা শাড়ি। মাথায় আঁচল দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। বয়সের ছাপ পড়েছে চোখে-মুখে। কাপালের কাছে এক গোছ রুপালি চুল। তবুও কি চমৎকারই না লাগছে তাকে।

মা বললেন, 'তোমরা কেমন আছ?'

কেউ কোনো জবাব দিলাম না। মা কি আমাদের তুমি করে বলতেন না তুই করে বলতেন কিছুতেই মনে পড়ল না।

'সবাই অনেক বড় হয়ে গেছে। এবং খুব সুন্দর হয়েছ সবাই। বস। কথা বলি তোমাদের সঙ্গে।'

আমরা বসলাম।

মা বললেন, 'তোমরা নাকি নদীর পাড়ে গিয়েছিলে?'

আমরা সে কথার জবাব দিলাম না।

মা থেমে থেমে বললেন, 'কয়েকদিন আগে সেতাবার গান শুনলাম রেডিওতে। বিশ্বাসই হয় নি আমার একটি মেয়ে এত সুন্দর গান গায়।'

সেতারা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। কিছু-একটা দেখতে চেষ্টা করছে মা'ব মধ্যে। নিজেব মনের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে হয়ত।

'তুমি মা খুব নাম করবে। দেশের মানুষের ভালবাসা তুমি পাবে এখনই অবশ্যি পেয়েছ, আরো পাবে।'

নীলু বলল, 'আপনি কখন এসেছেন?'

'কিছুক্ষণ আগে এসেছি।'

'বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

মা ইতস্তত করে বললেন, 'না।'

'যান বাবার কাছে যান। উনি আপনার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন।'

মা নড়লেন না। বসেই রইলেন।

আমি বললাম, 'আসুন, আপনাকে বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

বাবার ঘরে ঢোকা মাত্র বাবা তার অভ্যাসমত বললেন, 'কে, রেনু?'

মা দরজার পাশে থমকে দাঁড়াল। বাবা বললেন, 'ভাল আছ রেনু?'

সেই রাতেই বাবার অসুখ বেড়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে বহু কষ্টে টেনে টেনে শ্বাস নিতে লাগলেন। কথাবার্তা জড়িয়ে গেল। তবু একটু কোনো শব্দ হতেই মাথা তুলে বলতে লাগলেন, 'কে, রেনু?

মা তাঁর এত পাশে দাঁড়িয়ে কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না।

আমি চলে এলাম আমার ঘরে। নীলুর বিছানার ওপর দেখি একটি নীল খাম পড়ে আছে। রকিব ভাইয়ের লেখা চিঠি নিশ্চয়ই। নীলু হয়ত আজই পেয়েছে। রেখে দিয়েছে গভীর রাতে একা একা পড়বার জন্যে।

চারদিকে সুনসান নীরবতা। আমি বসে আছি চুপচাপ। আমার পাশেই ভালবাসার একটি নীল চিঠি। আমি হাত বাড়িয়ে চিঠিটি স্পর্শ করলাম। ঠিক তখনি নিচ থেকে একটি তীব্র ও তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ ভেসে এল।

মা কাঁদছেন।



# দেবী

১

মাঝরাতের দিকে রানুর ঘুম ভেঙে গেল।

তার মনে হল ছাদে কে যেন হাঁটছে। সাধারণ মানুষের হাঁটা নয়, পা টেনে-টেনে হাঁটা। সে ভয়াৰ্ত গলায় ঢাকল, 'এই, এই।' আনিসের ঘুম ভাঙল না। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অল্প-অল্প বাতাস। বাতাসে জামগাছের পাতায় অদ্ভুত এক রকমের শব্দ উঠছে। রানু আবার ডাকল, 'এই, একটু ওঠ না। এই।'

'কী হয়েছে?'

'কে যেন ছাদে হাঁটছে।'

'কী যে বল! কে আবার ছাদে হাঁটবে? ঘুমাও তো।'

'প্লিজ, একটু উঠে বস। আমার বড় ভয় লাগছে।'

আনিস উঠে বসল। প্রবল বর্ষণ শুরু হল এই সময়। ঝমঝম করে বৃষ্টি। জানালার পর্দা বাতাসে পতপত করে উড়তে লাগল। রানু হঠাৎ দেখল, জানালার শিক ধরে খালি গায়ে একটি রোগামত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটির দু'টি হাতই অসম্ভব লম্বা। রানু ফিসফিস করে বলল, 'ওখানে কে?'

'কোথায় কে?'

'ঐ যে জানালায়।'

'আহ, কী যে ঝামেলা কর! নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে।'

'একটু বাতিটা জ্বালাও না।'

'রানু, তুমি ঘুমোও তো।'

আনিস শোবার উপক্রম করতেই ছাদে বেশ কয়েক বার থপ থপ শব্দ হল। যেন কেউ-একজন ছাদে লাফাচ্ছে।

রানু চমকে উঠে বলল, 'কিসের শব্দ হচ্ছে?'

'বানর। এ জায়গায় বানর আছে। কালই তো দেখলে ছাদে লাফালাফি করছিল।'

'আমার বড় ভয় করছে। একটু উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাও না। পায়ে পড়ি তোমার।'

আনিস বাতি জ্বালাল। ঘড়িতে বাজে দেড়টা। ছাদে আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবু রানুর ভয় কমল না। সে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। আনিস বিরক্ত স্বরে বলল, 'এ-রকম করছ কেন?'

'কেন জানি অন্য রকম লাগছে আমার। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।'

'কী স্বপ্ন?'

'দেখলাম আমি যেন...'

কথার মাঝখানে হঠাৎ রানু থেমে গেল। কে যেন হাসছে। ভারী গলায় হাসছে। রানু কাঁপা স্বরে বলল, 'হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছ? কে যেন হাসছে।'

'কে আবার হাসবে। বানরের শব্দ। কিংবা কেউ হয়ত জেগে উঠেছে দোতলায়।'

আনিস লক্ষ্য করল, রানু খুব ঘামছে। চোখ-মুখ রক্তশূন্য। বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। দেশলাই জ্বালাতে-জ্বালাতে বলল, 'কী স্বপ্ন দেখছিলে?'

'দিনের বেলা বলব।'

'কী যে সব কুসংস্কার তোমাদের। এখনো ভয় লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'ভয়টা কিসের? চোর-ডাকাতের, না ভূতের?'

'বুঝতে পারছি না।'

'ঠিক আছে, বাতি জ্বালানোই থাক। বাতি জ্বালিয়েই ঘুমাব আজকে। এখন বল দেখি, কী স্বপ্ন

দেখলে।'

'দিনের বেলা বলব।'

'আহ, বল না! বললেই ভয় কেটে যাবে।'

রানু আনিসের বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরল। থেমে-থেমে বলল, 'দেখলাম, একটা ঘরে আমি শুয়ে আছি। একটা বেঁটে লোক এসে ঢুকল। তারপব দেখলাম, সে আমার শাড়ি টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে।'

আনিস শব্দ করে হাসল।

রানু বলল, 'হাসছ কেন?'

'হাসব না? এটা কি একটা ভয় পাওয়ার স্বপ্ন?'

'তুমি তো সবটা শোননি।'

'সবটা শুনতে হবে না। পরে কী হবে তা আমার জানা। তুমি যা দেখেছ তা হচ্ছে একটা সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি। যুবক-যুবতীরা এ-রকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখে।'

'আমি দেখি না।'

'তুমিও দেখ। মনে থাকে না তোমার।'

'আমি স্বপ্ন খুব কম দেখি। যা দেখি তা সব সময় সত্যি হয়। তোমাকে তো বলেছি অনেক বার।'

আনিস চুপ করে রইল। রানু এই কথাটি প্রায়ই বলে। বিয়েব বাতে প্রথম বাব বলেছিল। আনিস সেবারও হেসেছে। রানু অবাক হয়ে বলেছে, 'আপনি আমাব কথা বিশ্বাস কবলেন না, না?'

'নাহ।'

'আমি আপনাব গা ছুঁয়ে বলছি, বিশ্বাস করুন আমাব কথা।'

বানু এমন ভাবে বলল, যেন আনিসের বিশ্বাসেব ওপর অনেক কিছু নির্ভব কবছে। আনিস শেষ পর্যন্ত হাসিমুখে বলল, 'ঠিক আছে বিশ্বাস কবলাম, এখন দযা কবে আপনি-আপনি কববে না।' রানু ফিসফিস করে বলল, 'আপনার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হবে, সেটাও আমি জানতাম।'

'এটাও স্বপ্নে দেখেছিলে?'

'হুঁ। দেখলাম, একটি লোক খালিগায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাব পেটেব কাছে একটা মস্ত কাটা দাগ। লোকটিকে দেখেই মনে হয়, এর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমি তাকে বললাম, কেটেছে কী ভাবে? আপনি বললেন, 'সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলাম।'

আনিস সে-রাতে দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেনি। তাব পেটে একটা কাটা দাগ সত্যি-সত্যি আছে, এই মেয়েটির সেটা জানার কথা নয়। তবে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে কাটেনি। জামগাছ থেকে পিছলে পড়ে কেটেছে। ব্যাপারটা কাকতালীয়, বলাই বাহুল্য। মাঝে-মাঝে এমন দু'একটা জিনিস খুব মিলে যায়। তবুও কোথায় যেন একটা ক্ষীণ অস্বস্তি থাকে।

বাইরে বৃষ্টি খুব বাড়ছে। ঝড়টড় হবে বোধ হয়। শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে জানালায়। একটি কাচ ভাঙা। প্রচুব পানি আসছে ভাঙা জানালা দিয়ে, শীত শীত করছে।

'রানু, চল ঘুমিয়ে পড়ি।'

'সিগারেট শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

বিছানায় ওঠামাত্র প্রবল শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল। বাতি চলে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। শুধু এ-অঞ্চল নয়, সমস্ত ঢাকাই বোধ করি অন্ধকার হয়ে গেল। আনিস বলল, 'ভয় লাগছে রানু?'

'হ্যাঁ'

'আচ্ছা, হাসির গল্পটল্প কর। এতে ভয় কমে যায়। বল একটা গল্প।

'তুমি বল।'

আনিস দীর্ঘ সময় নিয়ে একজন পাদ্রী ও তিনটি ইহুদি ও তিনটি মেয়ের গল্প বলল। গল্পেব এক পর্যায়ে শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করতে হয়-- পাদ্রী তখন কী বলল?

এর উত্তরটি হচ্ছে পাঞ্চ লাইন। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না রানু। সে কি শুনছে না? আনিস ডাকল, 'এই রানু, এই!' রানু কথা বলল না। বাতাসের ঝাপটায় সশব্দে জানালার একটি পালা খুলে গেল। আনিস বন্ধ করবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই রানু তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি যেও না। খবরদার, যেও না।'

'কি আশ্চর্য, কেন?'
'একটা-কিছু জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে।'
'কি যে বল!'
'প্লিজ, প্লিজ।'
রানু কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?'
'কিসের গন্ধ!'
'কর্পূরের গন্ধের মতো গন্ধ।'
এটা কী মনের ভুল? সূক্ষ্ম একটা গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে ঘরে। ঝনঝন করে আরেকটা কাচ ভাঙল। রানু বলল, 'ঐ জিনিসটা হাসছে। শুনতে পাচ্ছ না?' বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আনিস কিছু শুনতে পেল না।
'তুমি বস তো। আমি হারিকেন জ্বালাচ্ছি।'
'না, তুমি আমাকে ধরে বসে থাক।'
আনিস অস্বস্তির সঙ্গে বলল, 'তুমি ঐ জানালাটার দিকে আর তাকিও না তো!' আনিস লক্ষ্য করল, রানু থরথর করে কাঁপছে, ওর গায়ের উত্তাপও বাড়ছে। রানুকে সাহস দেবার জন্যে সে বলল, 'কোনো দোয়া-টোয়া পড়লে লাভ হবে? আয়াতুল কুর্সি জানি আমি। আয়াতুল কুর্সি পড়ব?
রানু জবাব দিল না। তার চোখ বড়-বড় হয়ে উঠেছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে নাকি? শ্বাস ফেলছে টেনে-টেনে।
'এই রানু, এই।'
কোনোই সাড়া নেই। আনিস হারিকেন জ্বালাল। রান্নাঘর থেকে খুটখুট শব্দ আসছে। ইঁদুর, এতে সন্দেহ নেই। তবু কেন জানি ভাল লাগছে না। আনিস বারান্দায় এসে ডাকল, 'রহমান সাহেব, ও রহমান সাহেব।' রহমান সাহেব বোধহয় জেগেই ছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বেরুলেন।
'কি ব্যাপার?'
'আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।'
'কী হয়েছে?'
'বুঝতে পারছি না।'
'হাসপাতালে নিতে হবে নাকি?'
'বুঝতে পারছি না।'
'আপনি যান, আমি আসছি। এক্ষুণি আসছি।'
আনিস ঘরে ফিরে গেল। মনের ভুল, নিঃসন্দেহে মনের ভুল। আনিসের মনে হল, সে ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র কেউ-একজন যেন দরজার আড়ালে সরে পড়ল। রোগা, লম্বা একটি মানুষ। আনিস ডাকল, 'রানু।' রানু তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, কি?'
ইলেকট্রিসিটি চলে এল তখনই। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই রহমান সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, 'এখন কেমন অবস্থা?' রানু অবাক হয়ে বলল, 'কিসের অবস্থা? কী হয়েছে?'
রহমান সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। আনিস বলল, 'তোমার শরীর খারাপ করেছিল, তাই ওকে ডেকেছিলাম। এখন কেমন লাগছে?'
'ভাল।'
রানু উঠে বসল। রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'এখন আমি ভাল।'
রহমান সাহেব তবুও মিনিট দশেক বসলেন। আনিস বলল, 'আপনি কী ছাদে দাপাদাপি শুনেছেন?'
'সে তো রোজই শুনি। বাঁদরের উৎপাত।'
'আমি তাই ভাবছিলাম।'
'খুব জ্বালাতন করে। দিনে-দুপুরে ঘর থেকে খাবারদাবার নিয়ে যায়।'
'তাই নাকি?'
'জি। নতুন এসেছেন তো! কয়েক দিন যাক, টের পাবেন। বাড়িঅলাকে বলেছিলাম, গ্রিল দিতে। তা দেবে না। আপনার সঙ্গে দেখা হলে আপনিও বলবেন। সবাই মিলে চেপে ধরতে হবে।'
'জি, আমি বলব। আপনি কী চা খাবেন নাকি এক কাপ?'
'আরে না না! এই রাত আড়াইটার সময় চা খাব নাকি, কি যে বলেন। উঠি ভাই। কোনো অসুবিধা দেখলে ডাকবেন।'

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। রানু চাপা স্বরে বলল, 'এই রাত-দুপুরে ভদ্রলোককে ডেকে আনলে কেন? কি মনে করলেন উনি!'

'তুমি যা শুরু করেছিলে! ভয় পেয়েই ভদ্রলোককে ডাকলাম।'

'ভাল।'

'কী রকম ভাল?'

'বেশ ভাল।'

'ভয় লাগছে না আর?'

'নাহ্।'

রানু বিছানা থেকে নেমে পড়ল। সে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক। ভয়ের কোনো চিহ্নও নেই চোখে-মুখে। শাড়ি কোমরে জড়িয়ে ঘরের পানি সরাবার ব্যবস্থা করছে।

'সকালে যা করবার করবে। এখন এসব রাখ তো।'

'ইস, কী অবস্থা হয়েছে দেখ না!'

'হোক, এস তো এদিকে।'

রানু হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এল।

'এখন আর তোমার ভয় লাগছে না?'

'না।'

'জানালার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল বলেছিলে?'

'এখন কেউ নেই। আর থাকলেও কিছু যায় আসে না।'

আনিস দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাল। হালকা গলায় বলল, 'এক কাপ চা করতে পারবে?'

'চা, এত রাতে!'

'এখন আর ঘুম আসবে না, কর দেখি এক কাপ।'

রানু চা বানাতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি ফোটার শব্দ হল। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝম ঝম করে। রানু একা-একা রান্নাঘরে। কে বলবে এই মেয়েটিই অল্প কিছুক্ষণ আগে ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিল। ছাদে আবার ঝুপঝুপ শব্দ হচ্ছে। এই বৃষ্টির মধ্যে বানর এসেছে নাকি? আনিস উঠে গিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিল। হালকা গলায় বলল, 'ছাদে বড় ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে।' রানু জবাব দিল না।

আনিস বলল, 'এই বাড়িটা ছেড়ে দেব'

'সস্তায় এ-রকম বাড়ি আর পাবে না।'

'দেখি পাই কি না।'

'চায়ে চিনি হয়েছে তোমার?'

'হয়েছে। তুমি নিলে না?'

'নাহ্, রাত-দুপুরে চা খেলে আমার আর ঘুম হবে না।'

রানু হাই তুলল। আনিস বলল, 'এখন বল তো তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।'

'কোন স্বপ্নের কথা?'

'ঐ যে স্বপ্ন দেখলে! একটা বেঁটে লোক।'

'কখন আবার এই স্বপ্ন দেখলাম? কি যে তুমি বল!'

আনিস আর কিছু বলল না। চা শেষ করে ঘুমুতে গেল। শীত-শীত করছিল। রানু পা গুটিয়ে বাচ্চা মেয়ের মত শুয়েছে। একটি হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে আনিসকে। তার ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। জানালায় নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে। মানুষের মতই লাগছে ছায়াটাকে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে। মনে হচ্ছে মানুষটি হাত নাড়ছে। ঘরের ভেতর মিষ্টি একটা গন্ধ। মিষ্টি, কিন্তু অচেনা।

আনিস রানুকে কাছে টেনে আনল। রানুর মুখে আলো এসে পড়েছে। কি যে মায়াবতী লাগছে। আনিস ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র দু'মাস। আনিস এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। প্রতি রাতেই রানুর মুখ তার কাছে অচেনা লাগে। অপরূপ রূপবতী একটি বালিকার মুখ, যাকে কখনো পুরোপুরি চেনা যায় না। আনিস ডাকল, 'রানু রানু।' কোনো জবাব পাওয়া গেল না। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন রানু। আনিসের ঘুম এল না। শুয়ে-শুয়ে ঠিক করে ফেলল, রানুকে ভাল একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অফিসের কমলেন্দুবাবু এক ভদ্রলোকের কথা প্রায়ই

বলেন, খুব নাকি গুণী লোক। মিসির সাহেব। দেখালে হয়ে একবার মিসির সাহেবকে।

রানু ঘুমের ঘোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। অপ্রকৃতিস্থ মানুষের হাসি শুনতে ভাল লাগে না, গা ছমছম করে।

## ২

ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে বের করতে অনেক দেরি হল। কাঁঠাল বাগানেব এক গলির ভেতর পুরোনো ধাঁচের বাড়ি। অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর অসম্ভব রোগা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, 'কাকে চান?'

'মিসির সাহেবকে খুঁজছি।'

'তাকে কী জন্যে দরকার?'

'জি, আছে একটা দরকার। আপনি কী মিসির সাহেব?'

'হ্যাঁ। বলেন, দরকারটা বলেন।'

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সমস্যার কথা বলতে হবে নাকি? আনিস অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি এ-রকম যে, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন, ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। আনিস বলল, 'ভেতরে এসে বলি?'

'ভেতরে আসবেন? ঠিক আছে, আসুন।'

মিসির সাহেব যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় দরজা থেকে সবে দাঁড়ালেন। ঘন অন্ধকার। তিন-চারটা বেতের চেয়ার ছাড়া আসবাবপত্র কিছু নেই।

'বসুন আপনি।'

আনিস বসল। ভদ্রলোক বললেন, 'আজ আমার শরীব ভাল না। আলসার আছে। ব্যথা হচ্ছে এখন। তাড়াতাড়ি বলেন কী বলবেন।'

'আমার স্ত্রীর একটা ব্যাপাবে আপনার কাছে এসেছি। আপনাব নাম শুনেই এসেছি।'

'আমার নাম শুনে এসেছেন?'

'জি।'

'আমার এত নামডাক আছে, তা তো জানতাম না। স্পেসিফিক্যালি বলুন তো কার কাছে শুনেছেন?'

আনিস আমতা-আমতা করতে লাগল। ভদ্রলোক অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, 'বলুন, কে বলল?'

'আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোক। কমলেন্দুবাবু। আপনি নাকি তাঁব বোনের চিকিৎসা করেছিলেন।'

'ও আচ্ছা, চিনেছি, কমলেন্দু। শোনেন, আমি কিন্তু ডাক্তার না, জানেন তো?'

'জি স্যার, জানি।'

'আচ্ছা, আগে এক কাপ চা খান, তারপর কথা বলব। রুগীটি কে বললেন? আপনার স্ত্রী?'

'জি।'

'বয়স কত?'

'ষোল-সতের।'

'বলেন কী! আপনার বয়স তো মনে হয় চল্লিশের মতো, ঠিক না?'

আনিস শুকনো গলায় বলল, 'আমার সাঁইত্রিশ।'

'এ-রকম অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে করেছেন কেন?'

এটা আবার কেমন প্রশ্ন। আনিসের মনে হল, কমলেন্দুবাবুর কথা শুনে এখানে আসাটা ঠিক হয়নি। ভদ্রলোকের নিজেরই মনে হয় মাথার ঠিক নেই। একজন অপরিচিত মানুষকে কেউ এ-রকম কথা জিজ্ঞেস করে?

'বলুন বলুন, এ-রকম অল্পবয়েসী মেয়ে বিয়ে করলেন কেন?

'হয়ে গেছে আর কি।'

'বলতে চান না বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, বলতে হবে না। চা'র কথা বলে আসি। চা খেয়ে তারপর শুরু করব।'

ভদ্রলোক আনিসকে বাইরে বসিয়ে চলে গেলেন। তারপর আর আসার নামগন্ধ নাই। আট-

ন' বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে এক কাপ দারুণ মিষ্টি সর-ভাসা চা দিয়ে চলে গেল। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। দেখতে-দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। আনিস বেশ কয়েক বার কাশল। দু'বার গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'বাসায় কেউ আছেন?' কোনো সাড়া নেই। কী ঝামেলা!

কমলেন্দুবাবু অবশ্য বারবার বলে দিয়েছেন এই লোকের কথাবার্তার ঠিকঠিকানা নেই। তবে লোকটা অসাধারণ। আনিসের কাছে অসাধারণ কিছু মনে হয়নি। তবে চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। এইটি অবশ্য প্রথমেই চোখে পড়ে। আর দ্বিতীয় যে-জিনিসটি চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে তার আঙুল। অস্বাভাবিক লম্বা-লম্বা সব ক'টা আঙুল।

'এই যে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।'

'না, ঠিক আছে।'

'ঠিক থাকবে কেন? ঠিক না।'

লোকটি এই প্রথম বাব হাসল। থেমে-থেমে বলল, আলসাব আছে তো, ব্যথায় কাহিল হয়ে শুয়ে ছিলাম। অমনি ঘুম এসে গেল।'

'আমি তাহলে অন্য একদিন আসি?'

'না, এসেছেন যখন বসুন। চা দিয়েছিল?'

'জি।'

'বেশ, এখন বলুন কি বলবেন।'

আনিস চুপ করে রইল। এটা এমন একটা ব্যাপাব, যা চট করে অপরিচিত কাউকে বলা যায় না। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, 'আপনার স্ত্রীব মাথার ঠিক নেই, তাই তো?'

'জি না স্যার, মাথা ঠিক আছে।'

'পাগল নন?'

'জি না।'

'তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন?'

'মাঝে-মাঝে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে।'

'কী বকম অস্বাভাবিক?'

'ভয় পায়। মাঝে-মাঝেই এ-রকম হয়।'

'ভয় পায়? তার মানে কী? কিসের ভয়?'

'ভূতের ভয়।'

'ঠিক জানেন, ভয়টা ভূতের?'

'জি না, ঠিক জানি না। মনে হয় এ-রকম।'

ভদ্রলোক একটি চুরুট ধরিয়ে খকখক করে কাশতে-কাশতে বললেন, 'বর্মা থেকে আমার এক বন্ধু এনেছে, অতি বাজে জিনিস।' আনিস কিছু বলল না। তবে এই ভদ্রলোকেব স্টাইলটি তার পছন্দ হল। ভদ্রলোক অবলীলায় অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। এবং এমন ভাবে কথা বলছেন, যেন আগের কথাবার্তা তার কিছুই মনে নেই।

'এ-রকম চুরুট চার-পাঁচটা খেলে যক্ষ্মা হয়ে যাবে। আপনাকে দেব একটা?'

'জি না।'

'ফেলে দিতে মায়া লাগে বলে খাই। খাওয়ার জিনিস না। অখাদ্য। তবে হাভানা চুরুটগুলি ভাল। হাভানা চুরুট খেয়েছেন কখনো?'

'জি না।'

'খুব ভাল। মাঝে-মাঝে আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়ে যায়।'

ভদ্রলোক চুরুটে টান দিয়ে আবার ঘর কাঁপিয়ে কাশতে লাগলেন। কাশি থামতেই বললেন, 'এখন আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। যথাযথ জবাব দেবেন।'

'জি আচ্ছা।'

'প্রথম প্রশ্ন, আপনার স্ত্রী কী সুন্দরী?'

'জি।'

'বেশ সুন্দরী?'

'জি।'

'আপনার স্ত্রী কখন ভয় পান—রাতে না দিনে?'

'সাধারণত রাতে। তবে একেবার দুপুরে ভয় পেয়েছিল।'

'ভয়টা কী রকম সেটা বলেন।'

'মনে হয় কিছু-একটা দেখে।'

'সব বার একই জিনিস দেখেন, না একেক বার একেক রকম?'

'এটা আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'এই সময় কী তিনি কোনো রকম গন্ধ পান?'

'আমি ঠিক বলতে পারছি না।'

'যখন সুস্থ হয়ে ওঠেন, তখন কি তাঁর ভয়ের কথা মনে থাকে?'

'বেশির ভাগ সময়ই থাকে না, তবে মাঝে-মাঝে থাকে।'

'আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খারাপ।'

'জি।'

'উনি প্রথম কখন ভয় পেয়েছিলেন, বলতে পারেন?'

'জি না। তবে খুব ছোটবেলায়।'

'প্রথম ভয়ের ঘটনাটা আমাকে বলুন।'

'আমি সেটা ঠিক জানি না।'

'আপনি অনেক কিছুই জানেন না মনে হচ্ছে। আপনার স্ত্রীকে একদিন নিয়ে আসুন।'

আনিস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমি তাকে আনতে চাই না।'

'কেন চান না?'

'সে খুব সেনসিটিভ। সে যদি টের পায় যে, তার এই অস্বাভাবিকতা নিয়ে আমি লোকজনের সাথে আলাপ করছি, তাহলে খুব মন-খারাপ করবে।'

'দেখুন ভাই, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা না-বলে কিছুই করা যাবে না। আপনার স্ত্রী অসুস্থ এবং আমার মনে হচ্ছে এই অসুখ দ্রুত বেড়ে যাবে। আপনি তাঁকে নিয়ে আসবেন।'

আনিস উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনাকে কত দেব?'

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কমলেন্দুবাবু কী আপনাকে বলেননি আমি ফিস নিই না? এই কাজটি আমি সখের খাতিরে করি, বুঝতে পারছেন?'

'জি, পারছি।"

'তবে আপনি যদি ভাল গোলাপের চারা পান, তাহলে আমাকে দিতে পারেন। আমার গোলাপের খুব সখ। সব মিলিয়ে ত্রিশটি ডিফারেন্ট ভেরাইটির চারা আমার কাছে আছে। একটা আছে দারুণ ইন্টারেস্টিং, ঘাসফুলের মত ছোট সাইজের গোলাপ।'

'তাই নাকি?'

'জি। ওরা বলে মাইক্রো রোজ। হল্যান্ডের গোলাপ। কড়া গন্ধ। দেখবেন?'

'আরেক দিন দেখব। আজ দেরি হয়ে গেছে, আমার স্ত্রী একা থাকে।'

'ও, তাই নাকি? শোনেন, একা তাঁকে রাখবেন না। কখনো যেন মেয়েটি একা না থাকে। এটা খুবই জরুরি।'

রাস্তায় নেমে আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। খামোকা সময় নষ্ট। লোকটি তেমন কিছু জানে না। কমলেন্দুবাবু যে-সব আধ্যাত্মিক শক্তি টক্তির কথা বলেছেন সে-সব মনে হয় নেহায়েতেই গালগল্প। তবে লোকটির কথাবার্তা বেশ ফোর্সফুল। রানুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একবার দেখালে হয়। ক্ষতি তো কিছু নেই।

তা ছাড়া ভদ্রলোক খুব সম্ভব ফ্যালনাও নন। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রির টিচার। একেবারে কিছু না-জেনে তো কেউ মাস্টারি করে না। কিছু নিশ্চয়ই জানেন। মানুষের চেহারা দেখে কিছু অনুমান করাটাও ঠিক না।

## ৩

আনিস অফিসে চলে গেলে রানুর খুব একলা লাগে। কিছুই করার থাকে না। গোছানো আলনা আবার নুতন করে গোছায়। বসার ঘরের বেতের সোফা ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়ে। শোবার মেঝে ভেজা

ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে-মুছতে চকচকে করে ফেলে, তবু সময় কাটে না। এক সময় তেতলার বারান্দায় গিয়ে বসে। এ-বাড়ির ছোট বারান্দাটি তার খুব পছন্দ। গ্রিল দেওয়া বারান্দাটি গোলাকার। এখানে বসে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সামনেই একটা মেয়েদের স্কুল। টিফিন টাইমে মেয়েগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখতে এমন মজা লাগে রানু প্রায় সারা দুপুর বারান্দাতেই বসে থাকে। একা-একা ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে না। কেমন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটু যেন ভয়ভয়ও লাগে।

অবশ্য যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামতে থাকে, তখন ভয়ভয় ভাবটা কমে যায়। বিকেল বেলা বাড়িঅলার মেয়ে দু'টি তাদের ভেতরের দিকে বাগানে বসে মজা করে চা খায়। চা খেতে-খেতে দু'জনেই খুব হাসাহাসি করে। একেক দিন ওদের বাবাও সঙ্গে বসেন, রানুর দেখতে বেশ লাগে।

ছোট মেয়েটির সঙ্গে রানুর কিছু দিন আগে আলাপ হয়েছিল। বেশ মেয়েটি! খুব স্মার্ট। দেখতেও সুন্দর। একদিন দুপুরে রানু বারান্দায় এসে বসেছে, মেয়েটি এসে উপস্থিত। মুখে চাপা হাসি। হাতে কি-একটা বই। এসেই বলল, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।'

'কী কথা?'

'আপনি সারা দিন বারান্দায় বসে থাকেন কেন?'

'সারা দিন কোথায়? দুপুরবেলায় বসি। কিছু করার নেই তো, একা-একা লাগে।'

'তা ঠিক। বসব আপনার এখানে? আজ কলেজে যাইনি। বোটানি প্র্যাকটিক্যাল ছিল আজকে।'

মেয়েটি খুব সহজভাবে বলল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে একগাদা কথা বলল। তারপর যাবার সময় হঠাৎ বলল, 'আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কর।'

'আপনি এত সুন্দর কেন? যে আমার চেয়েও সুন্দরী, তাকে আমার ভাল লাগে না।'

রানু কি বলবে ভেবে পেল না। মেয়েটি হাসতে-হাসতে বলল, 'আমাদের ক্লাসের মেয়েদের কি ধারণা জানেন? তাদের ধারণা, আমি হচ্ছি বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। ওদের একদিন এনে আপনাকে দেখিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে, দিও। আরেকটু বস। চা খাবে?'

'না, চা আমি বেশি খাই না। বেশি চা খেলে গায়ের রঙ ময়লা হয়ে যায়।'

মেয়েটি যেমন হুট করে এসেছিল, তেমনি হুট করে নিচে নেমে গেল। বেশ লাগল রানুর। নতুন বাসাটা তার ভালই লাগছে। পুরনো ঢাকায় হলেও বেশ নিরিবিলি। মালিবাগের বাসাটার মত নয়। নিঃশ্বাস নেবার জায়গা ছিল না সেখানে। পাশ দিয়ে রাতদিন রিকশা যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে। জঘন্য। এই বাসাটা ভেতরের দিকে। বাড়িঅলা ভদ্রলোকও বেশ ভালমানুষ। প্রথম দিনেই আনিসকে বলেছেন, 'আমার বাড়ি ভাড়া দেবার দরকার নেই। টাকার জন্যেই তো বাড়ি ভাড়া। টাকা যথেষ্ট আছে। তবু দু'ঘর ভাড়াটে রাখি। কারণ এত বড় বাড়িতে মানুষ না-থাকলে ভাল লাগে না। কবরখানা-কবরখানা ভাব চলে আসে। তবে সবাইকে আমি বাড়ি ভাড়া দিই না। আপনাকে দিচ্ছি, কারণ আপনাকে পছন্দ হয়েছে।

ভাড়াও খুব কম। মাত্র ছয়শ'টাকা। তিন-রুমের এত বড় একটা বাড়ি ছয়শ' টাকায় পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। রানু এখানে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। তার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে বাথরুম। বড় ঝকঝকে একটা বাথরুম। বাসাটা রানুর খুব পছন্দ হয়েছিল। আনিস যখন বলল, 'কী, নেব? পছন্দ হয়?'

'হয়।'

'ভাল করে ভেবে বল নেব কি না। দু'দিন পর যদি বল পছন্দ না, তাহলে মুশকিলে পড়ব। মালিবাগের বাসাটা ভাল ছিল। শুধু-শুধু বদলালাম।'

'এই বাসাটাও ভাল।'

রানু খুব খুশি মনে নতুন বাসা সাজাল। নিজেই পর্দা কিনে আনল, সারা রাত জেগে সেলাই করল। তার উৎসাহের সীমা নেই।

'বুঝলে রানু, সবার সঙ্গে মিলে মিশে থাকবে। অন্যদের বাসায় যাবে-টাবে। একা-একা থাকার অভ্যেসটা ভাল না। যাবে তো?'

'যাব।'

'একা থাকলেই মানুষের মধ্যে নানান রকম প্রবলেম দেখা যায়, বুঝলে? সব ভাড়াটেদের

সঙ্গে খাতির রাখবে।'

'ভাড়াটে তো মাত্র একজন।'

'ঐ ওনার বাসাতেই যাবে। বাড়িঅলার বাসায়ও যাবে।'

'আচ্ছা, যাব।'

রানু অবশ্যি যায়নি কোথাও। তার ভাল লাগে না। অন্যদের মতো সে কারো সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না। অন্যদের সামনে কেমন যেন আড়ষ্ট লাগে। বারান্দায় বেতের চেয়ারটাতে বসে থাকতেই বেশি ভাল লাগে। দুপুরটাই যা কষ্টের। দুপুরটা কেটে গেলেই অন্যরকম একটা শান্তি লাগে।

কিন্তু আজকের দুপুরটা দীর্ঘ। কিছুতেই আর কাটছে না। বারান্দায় বসে থাকলেও ভাল লাগছে না। মেয়েদের স্কুলটাও কি কারণে যেন বন্ধ। চারদিকে চুপচাপ। বড্ড ফাঁকা। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে কেমন হয়?

ঘরের ভেতরটা কেমন যেন অন্যরকম। রানু ভেতরে ঢুকে জানালার পর্দা ফেলে দিল। অনেকখানি অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার ও চুপচাপ। আর তখন স্পষ্ট গলায় কেউ ডাকল, 'রানু, রানু।' কয়েক মুহূর্ত রানু নড়ল না। অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু যে ডেকে উঠেছে, সে দ্বিতীয় বার আর ডাকল না।

রানুর এ-রকম চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে একজন অশরীরী কেউ ডেকে ওঠে। অসংখ্যবার শুনেছে এই ডাক। কে সে! কোত্থেকে আসে সে! রানু ফিসফিস করে বলল, 'কে'? কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

'কে তুমি?'

জানালার পর্দাটা শুধু কাঁপছে। বিকেল হয়ে আসছে। রানু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বাগানে বাড়িঅলার বড় মেয়েটি হাঁটছে। নীলু বোধ হয় ওর নাম। এই মেয়েটি তার বোনের মত নয়। গম্ভীর। কথাবার্তা প্রায় বলেই না। তবুও ওকে দেখলেই রানুর মনে হয়— মেয়েটি বড় ভাল। মায়াবতী মেয়ে।

রানু দেখল— বিষণ্ন ভঙ্গিতে মেয়েটি একা-একা বসে আছে। তার ইচ্ছা হল নিচে নেমে ওর সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু সে গেল না।

## ৪

নীলু দু'বার বিজ্ঞাপনটা পড়ল। বেশ একটা মজার বিজ্ঞাপন।

### কেউ কি আসবেন?

আমি একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একা জীবন যাপন করছি। সময় আর কাটে না। আমার দীর্ঘ দিবস ও দীর্ঘ রজনীর নিঃসঙ্গতা কাটাতে কেউ আমাকে দু'লাইন লিখবেন?

জিপিও বক্স নাম্বার ৭৩

দৈনিক পত্রিকায় এ-রকম বিজ্ঞাপন দেবার মানে কী? সাপ্তাহিক কাগজগুলিতে এইসব থাকে; ছেলেছোকরাদের কাণ্ড। এই লোকটি নিশ্চয় ছেলেছোকরা নয়। বুড়ো-হাবড়াদের একজন।

'বাবা, এটা পড়েছ?'

নীলু জাহিদ সাহেবের হাতে কাগজটা গুঁজে দিল।

'বাবা, এই বিজ্ঞাপনটি পড় তো।'

জাহিদ সাহেব নিজেও ভ্রূ কুঞ্চিত করে দু'বার পড়লেন। তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হল বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

'পড়েছ?'

'হুঁ, পড়লাম।'

'কি মনে হয় বাবা?'

'কি আবার মনে হবে? কিছুই মনে হয় না। দেশটা রসাতলে যাচ্ছে। খবরের কাগজঅলারা এইসব ছাপে কিভাবে!'

নীলু হাসিমুখে বলল, 'ছাপাবে না কেন?'

'দেশটা বিলাত-আমেরিকা নয়, বুঝলি? আর ভাল করে পড়লেই বোঝা যায়, লোকটার একটা বদ মতলব আছে।'

'কই, আমি তো বদ মতলব কিছু বুঝছি না।'

জাহিদ সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, 'দেখিস, তুই আবার চিঠি লিখে বসবি না।'

নীলু মুখ নিচু করে হাসল।

'হাসছিস কেন?'

'এমনি হাসছি।'

'চিঠি লিখবার কথা ভাবছিস না তো মনে-মনে?'

'উঁহু।'

নীলু মুখে উঁহু বললেও মনে-মনে ঠিক করে ফেলল, গুছিয়ে একটা চিঠি লিখবে। দেখা যাক না কী হয়। কী লেখে লোকটি।

রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে সে সত্যি একটা চিঠি লিখে ফেলল। মোটামুটি বেশ দীর্ঘ চিঠি।

*জনাব,*

*আপনার বিজ্ঞাপনটি পড়লাম। লিখলাম কয়েক লাইন। এতে কী আপনার নিঃসঙ্গতা কাটবে? আমার বয়স আঠার। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আমরা দু'বোন। আমার ছোট বোনটির নাম বিলু। সে হলিক্রস কলেজে পড়ে। আমরা দু'বোনই খুব সুন্দরী। এই যা, এটা আপনাকে লেখা তো ঠিক হল না। তাই না? নাকি সুন্দরী মেয়েদের চিঠি পেলে আপনার নিঃসঙ্গতা আরো দ্রুত কাটবে?*

*নীলু*

চিঠিটি লিখেই তার মনে হল যে, এ-রকম লেখাটা ঠিক হচ্ছে না। চিঠির মধ্যে একটা বড় মিথ্যা আছে। সে সুন্দরী নয়। বিলুর জন্য কথাটা ঠিক, তার জন্য নয়। নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে দ্বিতীয় চিঠিটি লিখল।

*জনাব,*

*আমার নাম নীলু। আমার বয়স কুড়ি। আপনার নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে আপনাকে লিখছি। কিন্তু চিঠিতে কী কারো নিঃসঙ্গতা কাটে? আপনার বয়স কত, এটা দয়া করে জানাবেন।*

*নীলু*

দ্বিতীয় চিঠিটিও তার পছন্দ হল না। তার মনে হল, সে যেন কিছুতেই গুছিয়ে আসল জিনিসটি লিখতে পারছে না। রাতে শুয়ে-শুয়ে তার মনে হয়, হঠাৎ করে সে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে কেন? চিঠি লেখারই-বা কী দরকার? সে নিজেও কী খুব নিঃসঙ্গ? হয়তবা। এ-বাড়িতে আর দু'টি মাত্র প্রাণী। বিলু আর বাবা। বাবা দিন-রাত নিজের ঘরেই থাকেন। মাসের প্রথম দিকের কয়েকটা দিন বাড়িভাড়ার টাকা আদায়ের জন্যে অল্প যা নড়াচড়া করেন। তারপর আবার নিজের ঘরেই বন্দি। আর বিলু তো আছে তার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব নিয়ে। শুধু মেয়েবন্ধু নয়, তার আবার অনেক ছেলে বন্ধুও আছে।

মহানন্দে আছে বিলু। তবে সে একটু বাড়াবাড়ি করছে। কাল তার কাছে একটি ছেলে এসেছিল, সে রাত আটটা পর্যন্ত ছিল। এ-সব ভাল নয়। নীলু উঁকি দিয়ে দেখেছে, ছেলেটি ফরফর করে সিগারেট টানছে। হাত নেড়ে-নেড়ে খুব কথা বলছে। আর নীলু হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। ভাত খাওয়ার সময় নীলু কিছু বলবে না বলবে না করেও বলল, 'ছেলেটা কে রে?'

'কোন ছেলে?'

'ঐ যে রাত আটটা পর্যন্ত গল্প করলি?'

'ও, সে তো রুবির ভাই! মহা চালবাজ। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে, আসলে মহা গাধা।' বলতে-বলতে খিলখিল করে হাসে বিলু।

'মহা গাধা হলে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলি কেন?'

'যেতে চাচ্ছিল না তো কি করব?'

বলতে-বলতে বিলু আবার হাসল। বিলু এমন মেয়ে, যার ওপর কখনো রাগ করা যায় না। নীলু কখনো রাগ করতে পারে না. মাঝে-মাঝে বাবা দু'একটা কড়া কথা বলেন। তখন বিলু রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। সে এক মহা যন্ত্রণা! একবার রাগ করে সে পুরো দু'দিন দরজা বন্ধ করে বসে ছিল। কত সাধাসাধি, কত অনুরোধ! শেষ পর্যন্ত মগবাজারের ছোটমামাকে আনতে হল। ছোটমামা বিলুর খুব খাতিরের মানুষ। তাঁর সব কথা সে শোনে। তিনি এসে যখন বললেন, 'দরজা না খুললে মা আমি কিন্তু আর আসব না। এই আমার শেষ আসা— 'তখন দরজা খুলল। এ-রকম জেদী মেয়ে।

নীলুর কোনো জেদ-টেদ নেই। কালো এবং অসুন্দরী মেয়েদের জেদ কখনো থাকে না। এদের জীবন কাটাতে হয় একাকী। নীলু বাতি নিভিয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করল। ছোটবেলায় বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম আসত, এখন আর আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করতে হয়।

পাশের খাটে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালিয়ে চোখের ওপর একটা গল্পের বই ধরে আছে বিলু। অনেক রাত পর্যন্ত সে পড়বে। পড়তে-পড়তে হঠাৎ এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে, বাতি নেভাবে না। মশারি ফেলবে না। নীলুকেই উঠে এসে বাতি নেভাতে হবে, মশারি ফেলতে হবে।

'বিলু ঘুমো, বাতি নেভা।'

'একটু পরে ঘুমাব।'

'কী পড়ছিস?'

'শীর্ষেন্দুর একটা বই। দারুণ!'

'দিনে পড়িস। আলো চোখে লাগছে।'

'দিনে আমার সময় কোথায়? তুমি ঘুমাও না!'

নীলু ঘুমাতে পারল না। শুয়ে-শুয়ে তাকিয়ে রইল বিলুর দিকে। দিনে-দিনে কী যে সুন্দর হচ্ছে মেয়েটা। একই বাবা-মার দু'মেয়ে—একজন এত সুন্দর আর অন্য জন এত অসুন্দর কেন? নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

'আপা?'

'কী?'

'দারুণ বই, তুমি পড়ে দেখ।'

'প্রেমের?'

'হ্যাঁ। প্রেমের হলেও খুব সিরিয়াস জিনিস। দারুণ।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ, একজন খুব রূপবতী মেয়ের গল্প।'

'তোর মত একজন?'

'দূর, আমি আবার সুন্দর নাকি? আমাদের তিনতলার ভাড়াটের বৌটির মতো বলতে পার। রানু নাম, দেখেছ?'

'না তো, খুব সুন্দরী?'

'ওরে ব্বাপ, দারুণ! হেমা মালিনীর চেয়েও সুন্দরী।'

'তুই মেয়েটিকে একবার আসতে বলিস তো আমাদের বাড়িতে! দেখব।'

'বলব। তুমি নিজে একবার গেলেই পার। মেয়েটা ভাল। কথাবার্তায় খুব ভদ্র। ওর বরকে দেখেছ, আনিস সাহেব?'

'হুঁ।'

'এ লোকটা বোকা ধরনের। বোকার মত কথাবার্তা। আমাকে আপনি-আপনি করে বলে।'

'কলেজে পড়িস, তোকে আপনি বলবে না?'

'ফ্রক-পরা কাউকে এ-রকম একজন বুড়ো মানুষ আপনি বলবে নাকি?'

'বুড়ো নাকি?'

'চল্লিশের ওপর বয়স হবে।'

'মেয়েটার বয়স কত?'

'খুব কম। চৌদ্দ-পনের হবে।'

বিলু বাতি নিভিয়ে দিল এবং নিমিষেই ঘুমিয়ে পড়ল। নীলু জেগে রইল অনেক রাত পর্যন্ত। কিছুতেই তার ঘুম এল না। ইদানীং তার ঘুম খুব কমে গেছে। রোজই মাঝরাত না হওয়া অবধি ঘুম আসে না।

বানু চুলায় ভাত চড়িয়ে বসার ঘরে এসে দেখে বাড়িঅলার বড়মেয়েটি ঘরের ভেতর।

'না জিজ্ঞেস করেই ঢুকে পড়লাম ভাই। আমার নাম নীলু।'

'আসুন, আসুন। আপনাকে আমি চিনি। আপনি বাড়িঅলার বড় মেয়ে। আজ ইউনিভার্সিটি যাননি?'

'উঁহু। আজ ক্লাস নেই। আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। কী করছিলেন?'

'ভাত রান্না করছি।'

'চলুন, রান্নাঘরে গিয়ে বসি। বিলুর কাছ থেকে আপনার খুব প্রশংসা শুনি। বিলুর ধারণা, আপনি হচ্ছেন হেমা মালিনী।'

বানু অবাক হয়ে বলল, 'হেমা মালিনীটি কে?'

'আছে একজন। সিনেমা করে। সবাই বলে খুব সুন্দর। আমার কাছে সুন্দর লাগে না। চেহারাটা অহঙ্কারী।'

বানু মুখ টিপে হাসতে-হাসতে বলল, 'সুন্দরী মেয়েরা তো অহঙ্কারীই হয়।'

'আপনিও অহঙ্কারী?'

বানু হাসতে-হাসতে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে আপনি-আপনি বলতে পারবেন না। তুমি করে বলতে হবে।'

নীলু লক্ষ্য করল মেয়েটি বেশ রোগা, কিন্তু সত্যিই রূপসী। সচরাচর দেখা যায় না। চোখ দুটি কপালের দিকে উঠানো বলে দেবী-প্রতিমার চোখের মতো লাগে। সমগ্র চেহারায় খুব সূক্ষ্ম হলেও কোথাও যেন একটি মূর্তি-মূর্তি ভাব আছে।

'কী দেখছেন?'

'তোমাকে দেখছি ভাই। তোমার চেহারায় একটা মূর্তি-মূর্তি ভাব আছে।'

বানু মুখ কালো করে ফেলল। নীলু অবাক হয়ে বলল, 'ও কী! তুমি মনে হয় মন খারাপ করলে?'

'না, মন-খারাপ করব কেন?'

'কিন্তু এমন মুখ কালো করলে কেন? আমি কিন্তু কমপ্লিমেন্ট হিসেবে তোমাকে বলেছি। তোমার মত সুন্দরী মেয়ে আমি খুব বেশি দেখি না। তবে একবার একটি বিহারি মেয়েকে দেখেছিলাম। আমার ছোটমামার বিয়েতে। অবশ্যি সে-মেয়েটি তোমার মত রোগা ছিল না। ওর স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল।'

'আপনি কী একটু চা খাবেন?'

'তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন? তোমার কী মনে হয় আমার বয়স অনেক বেশি?'

'না, তা মনে হয় না।'

'তুমিও আমাকে তুমি বলবে। আর তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি মাঝে-মাঝে তোমার কাছে আসব।'

বানু চায়ের কাপ সাজাতে-সাজাতে মৃদু স্বরে বলল, 'আমাকে মূর্তি-মূর্তি লাগে, এটা বললে কেন?'

নীলু অবাক হয়ে বলল, 'এমনি বলেছি! টানাটানা চোখ তো, সে জন্যে। তুমি দেখি ভাই রাগ করেছ।'

'একটা কারণ আছে নীলু। তোমাকে আমি একদিন সব বলব, তাহলেই বুঝবে। চায়ে কতটুকু চিনি খাও?'

'তিন চামচ।'

নীলু অনেকক্ষণ বসল, কিন্তু কথাবার্তা আর তেমন জমল না। বানু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কিছুতেই মন লাগাতে পারছে না। সহজ হতে পারছে না। নীলু বেশ কয়েক বার অন্য

প্রসঙ্গ আনতে চেষ্টা করল। ভাসা-ভাসা জবাব দিল রানু। এবং একসময় হালকা স্বরে বলল, 'আমার একটা অসুখ আছে নীলু।'

'কী অসুখ?'

'মাঝে-মাঝে আমি ভয় পাই।'

'ভয় পাই মানে?'

রানু মাথা নিচু করে বলল, 'ছোটবেলায় একবার নদীতে গোসল করতে গিয়েছিলাম, তার পর থেকে এ-রকম হয়েছে।'

'কী হয়েছে?'

রানু জবাব দিল না।

'বল, কী হয়েছে?'

'অন্য একদিন বলব। আজ তুমি তোমার কথা বল।'

'আমার তো বলার মত কোনো কথা নেই।'

'তোমার বন্ধুদের কথা বল।'

'আমার তেমন কোনো বন্ধুও নেই। আমি বলতে গেলে একা-একা থাকি। অসুন্দরী মেয়েদের বন্ধুটন্ধু থাকে না।'

'রঙ খারাপ হলে মানুষ অসুন্দর হয় না নীলু।'

'আমি নিজে কি, সেটা আমি ভালই জানি।'

নীলু উঠে পড়ল। রানু বলল, 'আবার আসবে তো?'

'আসব। তুমি তোমার ভয়ের কথাটথা কি বলছিলে, সেই সব বলবে।'

'বলব।'

নীলু পাঠাবে না পাঠাবে না করেও চিঠিটি পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তার পরপরই দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। কে জানে, বুড়ো-হাবড়া লোকটি একদিন হয়ত বাসায় এসে হাজির হবে। দারুণ লজ্জার ব্যাপার হবে সেটা। নিতান্তই ছেলেমানুষি কাজ করা হয়েছে। চার-পাঁচ দিন নীলুর খুব খারাপ কাটল। দারুণ অস্বস্তি। বুড়োমতো কোনো মানুষকে আসতে দেখলেই চমকে উঠত, এটিই সেই লোক নাকি? যদি সত্যি-সত্যি কেউ এসে পড়ে, তাহলে সে ভেবে রেখেছে বলবে— এই চিঠি তো আমার নয়। অন্য কেউ তামাশা করে এই ঠিকানা দিয়েছে। আমি এ-রকম অজানা-অচেনা কাউকে চিঠি লিখি না।

কেউ অবশ্যি এল না। দেখতে-দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। চিঠিরও কোনো উত্তর নেই। লোকটি হয়ত চিঠি পায়নি। ডাক বিভাগের কল্যাণে আজকাল তো বেশির ভাগ চিঠিই প্রাপকের হাতে পৌঁছায় না। এতে ক্ষতি যেমন হয়, লাভও তেমনি হয়। কিংবা হয়ত এমন হয়েছে, ঐ লোক অসংখ্য চিঠি পেয়ে পছন্দমত চিঠিগুলোর উত্তর দিয়েছে। নীলুর তিন লাইনের চিঠি তার পছন্দ হয়নি। সে হয়ত লম্বা-লম্বা চমৎকার সব চিঠি পেয়েছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কিছু লেখা সব চিঠিতে।

দশ দিনের মাথায় নীলুর কাছে চিঠি এসে পড়ল। খুবই দামি একটা খামে চমৎকার প্যাডের কাগেজে চিঠি। গোটা-গোটা হাতের লেখা। কালির রঙ ঘন কালো। মাখন-রাঙা সে কাগজে লেখাগুলো মুক্তার মতো ফুটে আছে। এত সুন্দর হাতের লেখাও মানুষের হয়! চিঠিটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

*কল্যাণীয়াসু*

*তোমার চমৎকার চিঠি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। একজন ব্যথিত মানুষের আবেদনে তুমি সাড়া দিয়েছ— তোমাকে ধন্যবাদ। খুব সামান্য একটি উপহার পাঠালাম। প্লিজ, নাও।*

*আহমেদ সাবেত*

উপহারটি সামান্য নয়। অত্যন্ত দামি একটি পিওর পারফিউমের শিশি।

নীলু ভেবে পেল না, এই লোকটি কী সবাইকে এ-রকম একটি উপহার পাঠিয়েছে? যারাই চিঠির জবাব দিয়েছে তারাই পেয়েছে? কিন্তু তাও কী সম্ভব? নাকি নীলু একাই চিঠির জবাব দিয়েছে? নীলুর বড় লজ্জা করতে লাগল। সে পারফিউমের শিশিটি লুকিয়ে রাখল এবং খুব চেষ্টা করতে লাগল সমস্ত ব্যাপার ভুলে যেতে। সে চিঠিটি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে। কেন এমন একটা বাজে ঝামেলায় জড়াল?

কিন্তু দিন সাতেক পর নীলু আবার একটি চিঠি লিখল। একটি বেশ দীর্ঘ চিঠি। সেখানে শেষের দিকে লেখা— আপনি কে, কী করেন— কিছুই তো জানাননি। আপনার বিজ্ঞাপনটিও দেখছি না। তার মানে কি এই যে আপনার নিঃসঙ্গতা এখন দূর হয়েছে?

নীলু বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করল চিঠির জবাবের জন্যে। কিন্তু কোনো জবাব এল না। কেন জানি নীলুর বেশ মন-খারাপ হল। আরেকটি চিঠি লেখার ইচ্ছা হতে লাগল। কিন্তু তাও কী হয়? একা-একা সে শুধু চিঠি লিখবে? তার এত কী গরজ পড়েছে?

৫

দুপুর-রাতে আনিসেব ঘুম ভেঙে গেল। হাত বাড়াল অভ্যেসমত। পাশে কেউ নেই। আনিস ডাকল, 'রানু, রানু।' কোনো সাড়া নেই। বাথরুম থেকে একটানা পানি পড়াব শব্দ হচ্ছে। বাথরুমে নাকি? আনিস উঁকি দিল বাথরুমে— কেউ নেই। কোথায় গেল! আনিস গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'রানু।' বসাব ঘর থেকে ক্ষীণ হাসিব শব্দ এল। বসার ঘর অন্ধকার। রানু কী সেখানে একা-একা বসে আছে নাকি?

আনিস বসার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বেলেই সঙ্গে-সঙ্গে বাতি নিভিয়ে ফেলল। রানু বসার ঘবেব ছোট টেবিলে চুপচাপ বসে আছে। তার গায়ে কোনো কাপড় নেই।

'এই রানু।'

'উঁ।'

'কী হয়েছে? তোমার কাপড় কোথায়?'

'খুলে ফেলেছি। বড্ড গরম লাগছে।'

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। হিমশীতল হাত। একটু-একটু যেন কাপছে।

'এস রানু, ঘুমুতে যাই।'

'আমাব ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও।'

'কাল আমরা একজন ডাক্তারেব কাছে যাব, কেমন?'

'কেন?'

'তোমার শরীর ভাল না রানু।'

'আমার শরীর ভালই আছে।'

'না, তুমি খুব অসুস্থ। এস আমার সঙ্গে। কাপড় পরে ঘুমুতে এস।'

রানু কোনো আপত্তি করল না। সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে এল। কাপড় পরল এবং বাধ্য মেয়ের মতো বিছানায় শুয়ে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল আনিস। রানুব শরীর দ্রুত খারাপ হচ্ছে। আগে তো এ-রকম কখনো হয়নি! মিসির আলি-টালি নয়, বড় কোনো ডাক্তারকে দেখানো দরকার।

খুটখুট করে শব্দ হচ্ছে রান্নাঘরে। ইঁদুরের উপদ্রব। তবু কেন জানি শব্দটা অন্য রকম মনে হচ্ছে। যেন কেউ হাঁটছে রান্নাঘরে। থপথপ্ শব্দও হল কয়েক বার। আনিস বলল, 'কে?' রান্নাঘরের শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। আনিস বলল, 'কে? কে?' মনের ভুল নাকি? আনিস যেন স্পষ্ট শুনল, রান্নাঘর থেকে কেউ—একজন বলল, 'আমি'। স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ আওয়াজ। মেয়েলি স্বর। নাকি রানুই বলছে ঘুমের ঘোরে? এটাই হয়েছে। রানুরই গলা।

আনিস হাত বাড়িয়ে রানুকে কাছে টানল। রানু বলল, 'হাতটা সরিয়ে নাও, গরম লাগছে।' তার মানে কী রানু জেগে ছিল এতক্ষণ?

'রানু।'

'উঁ।'

'তুমি কি জেগে ছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'আমি যখন বললাম কে কে, তখন কি তুমি বলেছ, আমি?'

রানু চুপ করে রইল। আনিস বলল, 'বল, বলেছ এ-রকম কিছু?'

'হ্যাঁ, বলেছি।'

'কিন্তু তুমি জবাব দিলে কেন? তোমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করিনি। আমি জানতে চাচ্ছিলাম রান্নাঘরে কেউ আছে কী না।'

রানু ফিসফিস করে বলল, 'আমি তো রান্নাঘরেই ছিলাম। আমি রান্নাঘর থেকেই জবাব দিয়েছি।'

আনিস চুপ করে গেল। বিছানায় উঠে বসে পরপর দুটি সিগারেট শেষ করল। বাথরুমে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে রেখে এল। রান্নাঘরের বাতিও জ্বালিয়ে দিয়ে এল। থাকুক, সারা রাত বাতি জ্বালানো থাকুক।

'রানু।'

'কী?'

'কাল তুমি আমার সঙ্গে একজন ডাক্তারের কাছে যাবে, কেমন?'

'ঠিক আছে, যাব।'

'ডাক্তার সাহেব যা-যা জানতে চান, সব বলবে।'

রানু জবাব দিল না। মনে হল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্ত নির্বিঘ্ন ঘুম। কিন্তু রান্নাঘরে আবার শব্দ হচ্ছে। আনিসের মনে হল সে স্পষ্ট চুড়ির টুনটুন শব্দ শুনছে। কাচের চুড়ির আওয়াজ। আনিস কয়েক বার ডাকল, 'কে, কে ওখানে?' কেউ কোনো জবাব দিল না। বাথরুম থেকে একটানা জল পড়ার শব্দ আসছে। বাড়িঅলাকে বলতে হবে কল ঠিক করে দিতে। একজন কাজের মানুষ রাখতে হবে। পুরুষমানুষ নয়, মেয়েমানুষ— যে রাত-দিন থাকবে। আত্মীয়স্বজন কাউকে এনে রাখলে ভাল হত। কিন্তু আনিসের তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, যারা এখানে এসে থাকবে। আনিসের ঘুম এল শেষরাতের দিকে।

মিসির সাহেবের সঙ্গে তারা প্রায় দু'ঘণ্টা সময় কাটাল।

রানু খুব সহজ-স্বাভাবিক আচরণ করল। এর প্রধান কৃতিত্ব সম্ভবত মিসির সাহেবের। তিনি খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বললেন। এক পর্যায়ে রানু বলল, 'আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন, আমি আপনার মেয়ের বয়সী।'

'মেয়ের বয়সী হলে কী, আমার তো মেয়ে নেই। বিয়েই করিনি।'

রানু কিছু— একটা বলতে গিয়েও বলল না। ভদ্রলোক সেটি লক্ষ্য করলেন।

'তুমি কিছু বলতে চাচ্ছিলে?'

'জি না।'

'কিছু বলতে চাইলে বলতে পার।'

'না, আমি কিছু বলব না।'

মিসির সাহেব চায়ের ব্যবস্থা করলেন। চা খেতে-খেতে নিতান্তই সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'আনিস সাহেব বলেছিলেন, তুমি যা স্বপ্নে দেখ তা-ই সত্যি হয়।'

'হুঁ।'

'যা স্বপ্নে দেখ তা-ই হয়?'

'শুধু স্বপ্ন না, যা আমার মনে আসে তা-ই হয়।'

'বল কী!'

'আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, না?'

'বিশ্বাস হবে না কেন? পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত।'

বলতে-বলতে মিসির আলি ড্রয়ার খুলে চৌকা ধরনের চারটি কার্ড বের করলেন। হাসিমুখে বললেন, 'রানু, এই কার্ডগুলিতে ডিজাইন আঁকা আছে। আমি একেকটি টেবিলের ওপর রাখব, ডিজাইনগুলি থাকবে নিচে। তুমি না দেখে বলতে চেষ্টা করবে।'

রানু অবাক হয়ে বলল, 'না দেখে বলব কিভাবে?'

'চেষ্টা করে দেখ। পারতেও তো পার। বল দেখি এই কার্ডটিতে কী আঁকা আছে?'

'কী আশ্চর্য, কী করে বলব?'

'আন্দাজ কর। যা মনে আসে তা-ই বল।'

'একটা ক্রস চিহ্ন আছে। ঠিক হয়েছে?'

'তা বলব না। এবার বল এটিতে কী আছে?'

'খুব ছোট-ছোট সার্কেল।'

'কটি, বলতে পারবে?'

'মনে হচ্ছে তিনটি। চারটিও হতে পারে।'

মিসির সাহেব কার্ডগুলি ড্রয়ারে রেখে সিগারেট ধরালেন। তাঁকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হতে লাগল। আনিস বলল, 'ও কী বলতে পেরেছে?' মিসির সাহেব তার জবাব না-দিয়ে বললেন, 'রানু, এবার তুমি বল, প্রথম ভয়টা তুমি কীভাবে পেলে। সব কিছু বলবে, কিছুই বাদ দেবে না। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।'

রানু চুপ করে রইল।

'তুমি নিশ্চয়ই চাও, তোমার অসুখটা সেরে যাক। চাও না?'

'চাই।'

'তাহলে বল। কোনো কিছু বাদ দেবে না।'

রানু তাকাল আনিসের দিকে। মিসির আলি বললেন, 'আনিস সাহেব, আপনি না-হয় পাশের ঘরে গিয়ে বসেন। ঐ ঘরে অনেক বইপত্র আছে, বসে-বসে পড়তে থাকুন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কারেন্ট ইস্যুটা আছে, গতকালই এসেছে।'

রানু বলতে শুরু করল। মিসির আলি শুনতে লাগলেন চোখ বন্ধ করে। একটি প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলেন না। মাঝখানে একবার শুধু বললেন, 'পানি খাবে? তৃষ্ণা পেয়েছে?' রানু মাথা নাড়ল। তিনি পানির জগ এবং গ্লাস নিয়ে এলেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'চোখে-মুখে পানি দিয়ে নাও, ভাল লাগবে।' রানু সে-সব কিছুই করল না। শান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। কথা বলতে লাগল স্পষ্ট স্বরে।

**রানুর প্রথম গল্প**

আমার বয়স তখন এগারো-বারো বৎসর। আমি মধুপুরে আমার এক চাচার বাড়িতে বেড়াতে গেছি। চাচাতো বোনের বিয়েতে। চাচাতো বোনটির নাম হচ্ছে অনুফা। খুবই ভাল মেয়ে। কিন্তু চাচা বিয়ে ঠিক করেছেন একটা বাজে ছেলের সঙ্গে। ছেলের প্রচুর জায়গাটায়গা আছে, কিন্তু কিছুই করে না। দেখতেও বাজে, দাঁত উঁচু, মুখে বসন্তের দাগ। দারুণ বেঁটে। অনুফা আপার এই নিয়ে খুব মন-খারাপ। প্রায়ই এই নিয়ে কাঁদে। আমি তাকে সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি নিজে একটি বাচ্চা মেয়ে, তাকে কী সান্ত্বনা দেব? তবে আমার সঙ্গে অনুফা আপার খুব ভাব ছিল। আমাকে অনেক গোপন কথাটথা বলত।

যাই হোক, গায়ে-হলুদের দিন খুব রঙ খেলা হল। আমাদের ওদিকে রঙ খেলা হচ্ছে উঠোনে কাদা ফেলে তাতে গড়াগড়ি খাওয়া। সারা দিন রঙ খেলে কাদা মেখে সবাই ভূত হয়ে গেছি। ঠিক করা হল সবাই মিলে নদীতে গোসল সেরে আসবে। চাচা অবশ্যি আপত্তি করলেন মেয়েছেলেরা নদীতে যাবে কী?

চাচার আপত্তি অবশ্যি টিকল না। আমরা মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে গোসল করতে গেলাম। বাড়ি থেকে অল্প কিছু দূরেই নদী। আমরা প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন মেয়ে, খুব হৈচৈ হচ্ছে। সবাই মিলে মহানন্দে পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করছি। সোখানেও খুব কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হল। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হল, মনে হল একজন কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। নির্ঘাত কেউ তামাশা করছে। আমি হাসতে-হাসতে বললাম— এ্যাই, ভাল হবে না। ছাড় বলছি, ছাড়। কিন্তু যে পা ধরেছে সে ছাড়ল না, হঠাৎ মনে হল সে টেনে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করছে। তখন আমি চিৎকার দিলাম। সবাই মনে করল কোনো-একটা তামাশা হচ্ছে। কেউ কাছে এল না। কিন্তু ততক্ষণে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলেছে আর, আর....। [এই সময় মিসির সাহেব বললেন, 'বুঝতে পারছি তারপর কী হল।']

সবার প্রথম অনুফা আপা ছুটে এসে আমাকে ধরলেন, তারপর অন্যরা ছুটে এল। যে আমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, সে আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে গভীর জলের দিকে টেনে নিতে লাগল। তারপর আমার আর কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হবার পর শুনেছি ওরা আমাকে বহু কষ্টে টেনে পাড়ে তুলেছে এবং দেখেছে একটা মরা মানুষ আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ঐ মরা মানুষটাকে গ্রামের লোকেরা নদীর পাড়ে মাটি চাপা দিয়েছিল। সেইসব কিছুই অবশ্যি আমি দেখিনি, শুনেছি। কারণ আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। চাচা আমার চিকিৎসার জন্যে আমাকে ঢাকা নিয়ে এসেছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল আমি বাঁচব

না। কিন্তু বেঁচে গেলাম। এইটুকু আমার প্রথম ভয়ের গল্প।

রানু গল্প শেষ করে পুরো এক গ্লাস পানি খেল। মিসির আলি সাহেব বললেন, 'ঐ লোককে তুমি দেখনি?'

'জি না।'

'গ্রামের অন্যরা তো দেখেছে, কি রকম ছিল দেখতে?'

'আমি জানি না, কাউকে জিজ্ঞেস করিনি। কেউ আমাকে কিছু বলেনি।'

'এর পর কী তুমি কখনো তোমার চাচাব বাড়ি গিয়েছিলে?'

'জি না, কখনো যাইনি।'

'আরেকটা কথা তুমি বলছিলে। ঐ লোকটি তোমার পায়জামা টেনে খুলে ফেলতে চেষ্টা করছিল। তোমাকে যখন টেনে তোলা হয় তখন কী পায়জামা পরনে ছিল?'

'জি না, ছিল না।'

মিসির আলি সাহেব সিগারেট ধরিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কোনো একটি জিনিস তুমি আমাকে বলনি। কিছু-একটা বাদ দিয়ে গেছ।'

রানু জবাব দিল না।

'যে-জিনিসটা বাদ দিয়েছ, সেটা আমার শোনা দবকাব। সেটা কী, বলবে?'

'অন্য আরেক দিন বলব।'

'ঠিক আছে, অন্য একদিন শুনব। তোমাকে আসতে হবে না, আমি গিয়ে শুনে আসব।'

রানু কিছু বলল না। মিসিব আলি সাহেব কিছুক্ষণ ভ্রু কুঁচকে থেকে হঠাৎ বললেন. 'যখন তুমি একা থাক, তখন কী কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলে?'

'হ্যাঁ।'

মিসিব আলি খুব উৎসাহ বোধ কবলেন।

'ব্যাপারটা গুছিযে বল।'

'মাঝে-মাঝে কে যেন আমাকে নাম ধবে ডাকে।'

'পুরুষদের গলায়?'

'জি না। মেয়েদের গলায়।'

'শুধু ডাকে, অন্য কিছু বলে না?'

'জি না।'

'এবং যে ডাকে তাকে কখনো দেখা যায় না।'

'জি না।'

'এটা প্রথম কখন হয়? অর্থাৎ প্রথম কখন শুনলে? নদীব ব্যাপারটা ঘটার আগেই?'

'হুঁ।'

'কত দিন আগে?'

'আমার ঠিক মনে নেই।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্তই।'

রানুরা উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি ভারী গলায় বললেন, 'আবার দেখা হবে।' রানু কিছু বলল না। আনিস বলল, 'আমরা তাহলে যাই?'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

মিসির আলি ওদের রিকশা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। ওরা রিকশায় উঠবার সময় তিনি হঠাৎ বললেন, 'রানু, যে তোমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, ওর নাম কী?'

'ওর নাম জালালউদ্দিন।'

'কী করে জানলে, ওর নাম জালালউদ্দিন?'

রানু তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। মিসির আলি সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, পরে কথা হবে।'

রিকশায় ওরা দুজনে কোনো কথা বলল না। আনিসের একবার মনে হল, রানু কাঁদছে। সে সিগারেট ধরিয়ে সহজ স্বরে বলল, 'ভদ্রলোককে তোমার কেমন লাগল রানু?'

'ভাল। বেশ ভাল লোক। উনি আসলে কী করেন?'

'উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পার্ট-টাইম টিচার। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রি পড়ান। খুব জ্ঞানী লোক।

'ইউনিভার্সিটির টিচাররা এমন রোগা হয়, তা তো জানতাম না! আমার ধারণা ছিল তাঁরা খুব মোটাসোটা হন।'

রানু শব্দ করে হাসল। আনিস বলল, 'আজ বাইরে খাওয়া-দাওয়া করলে কেমন হয়?'

'শুধু-শুধু টাকা খরচ।'

'তোমার গিয়ে রান্না চড়াতে হবে না। চল না, কিছু পয়সা খবচ হোক।'

'কোথায় খাবে?'

'আছে আমার একটা চেনা জায়গা। নানকটি আর কাবাব। কী বল?'

৬

মিসির আলি সাহেব দেখলেন তাঁর ঘরের সামনে চাবটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো টিউটোরিয়েল ক্লাস আছে নাকি? আজ বুধবার, টিউটোরিয়েল ক্লাস থাকার কথা নয়। তবে কে জানে হয়ত নতুন রুটিন দিয়েছে। তিনি এখনো নোটিস পাননি।

'এই, তোমাদের কী ব্যাপার?'

মেয়েগুলি জড়সড় হয়ে গেল।

'কি, তোমাদের সঙ্গে কোনো ক্লাস আছে?'

'জি না স্যার।'

'তাহলে কী? কিছু বলবে?'

'স্যার নোটিস-বোর্ডে আপনি একটা নোটিশ দিয়েছিলেন, সেই জন্য এসেছি।'

'কিসের নোটিশ?'

তিনি ভ্রূ কোঁচকালেন। মেয়েগুলো মুখ চাওয়াচাওয়ি কবতে লাগল।

'কি নোটিশ দিয়েছিলাম?'

'স্যার, আপনি লিখেছেন– কারো এক্সট্রাসেন্সবি পারসেপশনেব ক্ষমতা আছে কী না আপনি পরীক্ষা করে বলে দেবেন।'

মিসির আলি সাহেবের সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়ল। মাস দুয়েক আগে এ-বকম একটা নোটিশ দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু এই প্রথম চার'জনকে পাওয়া গেল, যারা উৎসাহী। এবং সব কটি মেয়ে। মেয়েগুলো রোগা। তার মানে কী অকল্টে ব্যাপারে রোগা মেয়েরাই বেশি উৎসাহী? তিনি মনে-মনে একটা নোট তৈবি করলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাঁব মনে হল বিষয়টি ইন্টারেস্টিং। একটা সার্ভে করা যেতে পারে।

'এস তোমরা। ঘরে এস। তোমরা তাহলে জানতে চাও তোমাদের ইএসপি আছে কী না?'

মেয়েগুলি কথা বলল না। যেন একটু ভয় পাচ্ছে। মুখ সবারই শুকনো।

'বস তোমরা। চেয়ারে আরাম করে বস।'

ওরা বসল। মিসির আলি সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। নিচু গলায় বললেন, 'সব মানুষের মধ্যেই ইএসপি কিছু পরিমাণ থাকে। টেলিপ্যাথিব কথাই ধর। তোমাদের নিজেদেরই হয়ত এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। সহজ উদাহরণ হচ্ছে, ধর, একদিন তোমাদের কারো মনে হল আজ অমুকের সাথে দেখা হবে। যাব সঙ্গে দেখা হবার কথা মনে হচ্ছে, সে কিন্তু এখানে থাকে না। থাকে চিটাগাং। কিন্তু সত্যি-সত্যি দেখা হয়ে গেল। কি, হয় না এ-রকম?

মেয়েগুলো কথা বলল না। এর মধ্যে একজন রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে লাগল। মেয়েটি ঘামছে। নার্ভাস হয়ে পড়ছে মনে হয়। নিশ্চয়ই ব্লাড-প্রেশার বেড়ে গেছে। মিসির আলি বিস্মিত হলেন। নার্ভাস মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই বিষয়ের চর্চা এখানো বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে না। বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই অনুমানের ওপর। তবে আমেরিকায় একটি ইউনিভার্সিটি আছে—ডিউক ইউনিভার্সিটি। ওরা কিছু-কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ শুরু করেছে। মুশিকল হচ্ছে, ফলাফল সবসময় রিপ্রডিউসিবল নয়।'

মিসির আলি সাহেব ড্রয়ার খুলে দশটি চৌকো কার্ড টেবিলে বিছালেন। হাসিমুখে বললেন, 'পরীক্ষাটি খুব সহজ। এই কার্ডগুলোতে বিভিন্ন রকম চিহ্ন আছে। যেমন ধর ক্রস, স্কয়ার, ত্রিভুজ,

বিন্দু। কোনটিতে কী আছে সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করবে। দু'-এক বার কাকতালীয়ভাবে মিলে যাবে। তবে ফলাফল যদি স্ট্যাটিসটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের ইএসপি আছে। এখন এস দেখি, কে প্রথম বলবে? তোমার কী নাম?'

'নীলুফার।'

'হ্যাঁ নীলুফার, তুমিই প্রথম চেষ্টা কর। যা মনে আসে তা-ই বল।'

'আমার কিছু মনে আসছে না।'

'তাহলে অনুমান করে বল।'

মেয়েটি ঠিকমত বলতে পারল না। তার সঙ্গীরাও না। মিশির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, 'নাহ্, তোমাদের কারো কোনো ইএসপি নেই।' ওরা যেন তাতে খুশিই হল। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'না থাকাই ভাল। আধুনিক মানুষদের এ-সব থাকতে নেই। এতে অনেক রকম জটিলতা হয়।'

'কী জটিলতা?'

'আছে, আছে।'

'বলুন না স্যার।'

মিসির আলি লক্ষ্য করলেন, নীলুফার নামের মেয়েটিই কথা বলছে। স্পষ্ট সতেজ গলা।

'অন্য আরেক দিন বলব। আজ তোমরা যাও।'

নীলুফার বলল, 'এমন কিছু কী স্যার আছে, যা করলে ইএসপি হয়?'

'লোকজন বলে, প্রেমে পড়লে এই ক্ষমতটা অসম্ভব বেড়ে যায়। আমি ঠিক জানি না। তোমরা যদি কেউ কখনো প্রেমে পড়, তাহলে এস, পরীক্ষা করে দেখব।'

কথাটা বলেই মিসির আলি অপ্রস্তুত বোধ করলেন। ছাত্রীদের এটা বলা ঠিক হয়নি। কথাবার্তায় তাঁর আরো সাবধান হওয়া উচিত। এ-রকম হালকা ভঙ্গিতে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।

'স্যার, আমরা যাই?'

'আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা হবে।'

মিসির আলি নিচের টিচার্স লাউঞ্জে চা খেতে এলেন। বেলা প্রায় তিনটা। লাউঞ্জে লোকজন নেই। পলিটিক্যাল সায়েন্সের রশিদ সাহেব এক কোণায় বসে ছিলেন। তিনি অস্পষ্ট স্বরে ডাকলেন, 'এই যে মিসির সাহেব, অনেক দিন পর মনে হয় এলেন এদিকে। চা খাবেন?'

'হুঁ।'

'কে যেন বলছিল, আপনি নাকি ভূতে-ধরা সারাতে পারেন। ঠিক নাকি?'

'জি না। আমি ওঝা নই।'

'রাগ করলেন নাকি? আমি কথার কথা বললাম।'

'না, রাগ করব কেন?'

'আচ্ছা মিসির আলি সাহেব, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন?'

'না।'

রশিদ সাহেব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

'আত্মা, আত্মায় বিশ্বাস করেন?'

'না ভাই, আমি একজন নাস্তিক।'

'আত্মা নেই— এই জিনিসটা কী প্রমাণ করতে পারবেন? কী কী যুক্তি আছে আপনার হাতে?'

মিসির আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। রশিদ সাহেব বললেন, 'আত্মা যে আছে, এর পক্ষে বিজ্ঞানীদের কিছু চমৎকার যুক্তি আছে।'

'থাকলে তো ভালই। বিজ্ঞানীরা জড়জগৎ বাদ দিয়ে আত্মাটাত্মা নিয়ে উৎসাহী হলেই কিন্তু ঝামেলা। রশিদ সাহেব, আমার মাথা ধরেছে। এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। কিছু মনে করবেন না।'

মিসির আলি চা না-খেয়েই উঠে পড়লেন। তাঁর সত্যি-সত্যি মাথা ধরেছে। প্রচণ্ড ব্যথা। বড় রকমের কোনো অসুখের এটা পূর্বলক্ষণ।

৭

নীলু ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে দেখে তার বিছানার উপর চমৎকার একটি প্যাকেট পড়ে আছে। ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেটে গোটা-গোটা করে তার নাম লেখা। নীলুর বুক কেঁপে উঠল, বিলুর চোখে পড়েনি তো? বিলুর খুব খারাপ অভ্যাস আছে, অন্যের চিঠি খুলে-খুলে পড়বে। হাসাহাসি করবে।

নীলু দরজা বন্ধ করেই প্যাকেটটি খুলল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু কী চমৎকার করেই-না লেখা :

*কল্যাণীয়াসু,*

*ইচ্ছা করেই তোমাকে আমি কম লিখি। তোমার চিঠি পড়ে-পড়ে খুব মায়া জন্মে যায়। এ বয়সে আমার আর মায়া বাড়াতে ইচ্ছে করে না। মায়া বাড়ালেই কষ্ট পেতে হয়। আরেকটি সামান্য উপহার পাঠালাম। গ্রহণ করলে খুব খুশি হব।*

*আহমেদ সাবেত*

উপহারটি বড় সুন্দর! নীল রঙের একটি ডায়েরি। অসম্ভব নরম প্লাস্টিকের কভার, যেখানে ছোট্ট একটি শিশুর ছবি। পাতাগুলো হালকা গোলাপি। প্রতিটি পাতায় সুন্দর-সুন্দর দু'লাইনের কবিতা। ডায়েরিটির প্রথম পাতায় ইংরেজিতে লেখা :

'I wish I could be eighteen again'
A.S

পড়তে গিয়ে কেন জানি নীলুর চোখে জল এল। একজন সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা মানুষের জন্যে মন কেমন করতে লাগল। লোকটি দেখতে কেমন কে জানে? সুন্দর নয় নিশ্চয়ই। বয়স্ক মানুষ, হয়ত চুলটুল পেকে গেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের বয়স হচ্ছে তার মনে। মন যত দিন কাঁচা থাকে, তত দিন মানুষের বয়স বাড়ে না। এই লোকটির মন অসম্ভব নরম। শিশুর মতো নরম। নীলুর মনে হল এই লোকটি স্বামী হিসেবে অসাধারণ ছিল। তার স্ত্রীকে সে নিশ্চয়ই সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছে।

নীলু রাতের বেলা দরজা বন্ধ করে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখল— আপনি এমন কেন? নিজের কথা তো কিছুই লেখেননি! অথচ আমি আমার সমস্ত কথা লিখে বসে আছি। তবু মনে হয় সব বুঝি লেখা হল না। অনেক কিছু বুঝি বাকি রয়ে গেল। আপনি আমাকে এত সুন্দর-সুন্দর উপহার দিয়েছেন, কিন্তু আমি তো আপনাকে কিছুই দিই না। আমার কিছু-একটা দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আমি তো জানি না আপনি কী পছন্দ করেন। আচ্ছা, আপনি কী টাই পরেন? তাহলে লাল টকটকে একটা টাই আপনাকে দিতে পারি। জানেন, পুরুষমানুষের এই একটি জিনিসই আমি পছন্দ করি। কিন্তু হয়ত আপিন টাই পরেন না, ঢিলেঢালা ধরনের মানুষদের মত চাদর গায়ে দেন। আপনার সম্পর্কে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। একদিন আসুন না আমাদের বাসায়, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। জানেন, আমি খুব ভালো চা বানাতে পারি। অন্য কেউ চা বানিয়ে দিলে আমার বাবা খেতে পারেন না। সব সময় আমাকে বানাতে হয়। গত রোববারে কী হল, জানেন? রাত তিনটেয় বাবা আমাকে ডেকে তুলে বললেন— মা, এক কাপ চা বানা তো, বড্ড চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে।

'আপা, দরজা বন্ধ করে কী করছ?'

নীলু অপ্রস্তত হয়ে দরজা খুলল। বিলু দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহজনকভাবে তাকাচ্ছে।

'কি করছিলে?'

'কিছু করছিলাম না।'

বিলু বিছানায় এসে বসল, 'আপা, তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।'

'কি পরিবর্তন?'

'অস্থির-অস্থির ভাব। লক্ষণ ভাল না আপা। বল তো কী হয়েছে?'

'কী আবার হবে? তোর শুধু উল্টোপাল্টা কথা।'

'কিছু-একটা হয়েছে আপা। আমি জানি।'

'কি যে বলিস!'

'আমার কাছে লুকোতে পারবে না আপা। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল।'

'যা ভাগ, পাকামো করিস না।'

বিলু গেল না। কাপড় ছাড়তে-ছাড়াতে বলল, 'রানু আপাকেও আমি বললাম তোমার পরিবর্তনের কথা। তারও ধারণা, তুমি কারো প্রেমে পড়েছ।'

'হুঁ, আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া প্রেমটা আমার সঙ্গে করবে কে? চেহারার এই তো অবস্থা।'

'খারাপ অবস্থাটা কী? রঙটা একটু ময়লা। এ ছাড়া আর কী?'

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

'নিঃশ্বাস ফেলছ কেন আপা? নিজের চেহারা সম্পর্কে তোমার এমন খারাপ ধারণা থাকা উচিত না। সবাই তো আর রানু আপার মতো হয় না, হওয়া উচিত নয়।'

'উচিত নয় কেন?'

'সুন্দরী মেয়েদের অনেক রকম প্রবলেম থাকে।'

'কী প্রবলেম?'

'রানু আপার মাথা খারাপ- সেটা তুমি জান?'

'কী বলছিস এ-সব!'

'ঠিকই বলছি। আকবরের মা একদিন দুপুরে কী জন্যে যেন গিয়েছিল. শোনে রানু আপা নিজের মনে হাসছে এবং কথা বলছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। কথাগুলো বলছে আবার দু'রকম গলায়। আকবরের মা প্রথম ভেবেছিল কেউ বোধহয় বেড়াতে এসেছে। শেষে ঘরে ঢুকে দেখে কেউ নেই।'

'সত্যি?'

'হুঁ। রহমান সাহেবের স্ত্রী বললেন, একদিন নাকি আনিস সাহেব গভীর রাতে রহমান সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেলেন তাঁর স্ত্রীর খুব অসুখ, এই কথা বলে। রহমান সাহেব গিয়ে দেখেন অসুখটসুখ কিচ্ছু নেই, দিব্যি ভাল মানুষ।'

নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'রানুর মত সুন্দরী হলে আমি পাগল হতেও রাজি।'

বিলু হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতে বলল, 'কথাটা ঠিক বলেছ আপা।'

রানু প্রসঙ্গে পাওয়া সব তথ্য লিখে রাখবার জন্যে মিসির আলি সাহেব মোটা একটা খাতা কিনে এনেছেন। খাতাটির প্রথম পাতায় লেখা—

'একজন মানসিক রুগীর পর্যায়ক্রমিক মনোবিশ্লেষণ।' দ্বিতীয় পাতায় কিছু ব্যক্তিগত তথ্য। যেমন—

নাম : রানু আহমেদ।

বয়স : সতের বৎসর (রূপবতী)

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিতা। (তের মাস আগে বিয়ে হয়)।

স্বাস্থ্য : রুগনা।

ওজন : আশি পাউন্ড।

স্বামী : আনিস আহমেদ। দি জেনিথ ইন্টারন্যাশনালের ডিউটি অফিসার। বয়স ৩৭। স্বাস্থ্য ভাল।

তৃতীয় পাতার হেডিংটি হচ্ছে— 'অডিটরি হেলুসিনেশন।' এর নিচে লাল কালি দিয়ে একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকা। এই পাতায় অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, আবার কাটাকুটি করা হয়েছে। যেন মিসির আলি সাহেব মনস্থির করতে পারছেন না কী লিখবেন। দুটি লাইন শুধু পড়া যায়। লাইন দুটির নিচে লাল কালি দিয়ে দাগ দেওয়া।

'মেয়েটি অডিটরি হেলুসিনেশন হচ্ছে : সে একা থাকাকালীন শুনতে পায় কেউ যেন তাকে ডাকছে।'

পরের কয়েকটি পাতায় রানুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের খুটিনাটি প্রতিটি বিষয় লেখা। এ পাতাগুলি পড়লেই বোঝা যায়, মিসির আলি নামের এই লোকটির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। অতি

তুচ্ছ ব্যাপারগুলিও লেখা আছে। যেমন, এক জায়গায় লেখা— মেয়েটি বেশ কয়েক বার শাড়ির আঁচল টেনেছে। দু বার শব্দ করে আঙুল ফুটিয়েছে। আমি লক্ষ্য করলাম মেয়েটি পানি খেল মাথা নিচু করে। বেশ খানিকটা নিচু করে। যেন পানি পান করার ব্যাপারটি সে আড়াল করতে চায়।

নদীতে গোসলের গল্পটি লেখা আছে। গল্পের শেষে বেশ কিছু প্রশ্ন করা আছে। যেমন—

* একজন মৃত মানুষ পানিতে ভেসে থাকবে। ডুবে থাকবে না। গল্পে মৃত মানুষটির ডুবে-ডুবে চলার কথা আছে। এ-রকম থাকার কথা নয়।

* পায়জামা খুলে ফেলার কথা আছে। কিশোরীরা সাধারণত শক্ত গিঁট দিয়ে পায়জামা পরে। গিট খুলতে হলে ফিতা টানতে হবে। ঐ মানুষটি কী ফিতা টেনেছিল, না পায়জামাটাই টেনে নামিয়েছে?

* মৃত লোকটির কী কোনো পোস্ট মর্টেম হয়েছিল?

* তার আনুমানিক বয়স কত ছিল?

* প্রথম অসুস্থতার সময় কী মেয়েটি ঘুমের মধ্যে কোনো কথাবার্তা বলত? কী বলত?

* মেয়েটি বলল লোকটির নাম জালালউদ্দিন। কীভাবে বলল? লোকটির নাম তো জানার কথা নয়। নাকি পরে শুনেছে?

* জালালউদ্দিন-জাতীয় নামের কারো সঙ্গে কী এই মেয়েটির পূর্বপরিচয় ছিল?

প্রশ্নের শেষে তিনটি মন্তব্য লেখা আছে। মন্তব্যগুলি সংক্ষিপ্ত। প্রথম মন্তব্য— মেয়েটি যে-ঘটনার কথা বলেছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দ্বিতীয় মন্তব্য— এই ঘটনা অন্য যে-সব ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেছে তাদের সঙ্গে প্রথমে আলাপ করতে হবে। দ্বিতীয় মন্তব্যটি লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করা ও পাশে লেখা— অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয় মন্তব্য— মেয়েটির অবশ্যই কিছু পরিমাণ এক্সট্রাসেন্সরি পারসেপশন আছে। সে কার্ডের সব কটি চিহ্ন সঠিকভাবে বলতে পেরেছে। আমি এ-রকম আগে কখনো দেখিনি। এই বিষয়ে আমার ধারণা হচ্ছে, মানসিকভাবে অসুস্থ রুগীদের এই দিকটি উন্নত হয়ে থাকে। আমি এর আগেও যে কটি অসুস্থ মানুষ দেখেছি, তাদের সবার মধ্যে এই ক্ষমতাটি কিছু পরিমাণে লক্ষ্য করেছি। দি জার্নাল অব প্যারাসাইকোলজির তৃতীয় ভল্যুমে (১৯৭৩) এই প্রসঙ্গে রিভিউ পেপার আছে। অথর জন নান এবং এফ টলম্যান।

## ৮

সোহাগী হাই স্কুলের হেড মাস্টার সাহেব দারুণ অবাক হলেন। রানুর ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে এক ভদ্রলোক এসেছেন— এর মানে কী? এত দিন আগে কি হয়েছিল, না-হয়েছিল, তা কি এখন আর কারো মনে আছে? আর মনে থাকলেও এইসব ব্যাপার নিয়ে এখন ঘাঁটাঘাঁটি করাটা বোধহয় ঠিক নয়। কিন্তু যে-ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে মুখের ওপর না বলতেও বাঁধছে। ভদ্রলোক হাজার হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। মানী লোক। তা ছাড়া এত দূর এসেছেন, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। মুখে বলছেন রানু অসুস্থ এবং তিনি রানুর একজন চিকিৎসক। কিন্তু এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কারণ মাসখানেক আগেই রানুকে তিনি দেখে এসেছেন। কিছুমাত্র অসুস্থ মনে হয়নি। আজ হঠাৎ এমন কী হয়েছে যে ঢাকা থেকে এই ভদ্রলোককে আসতে হল?

'রানুর কী হয়েছে বললেন?'

'মানসিকভাবে অসুস্থ।'

'আমি তো সেদিনই তাকে দেখে এলাম।'

'যখন দেখেছেন তখন হয়ত সুস্থই ছিল।'

'কী জানতে চান আপনি, বলেন।'

'নদীতে গোসলের সময় কী ঘটেছিল, সেটা বলেন।'

'সে-সব কী আর এখন মনে আছে?'

'ঘটনাটা বেশ সিরিয়াস এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে বহু বার আলোচিত হয়েছে, কাজেই মনে থাকার কথা। আপনার যা মনে আসে তাই বলেন।'

হেড মাস্টার গম্ভীর স্বরে ঘটনাটা বললেন। রানুর গল্পের সঙ্গে তাঁর গল্পের কোনো অমিল লক্ষ্য করা গেল না। শুধু ভদ্রলোক বললেন, 'মেয়েরা গোসল করতে গিয়েছিল দুপুরে, সন্ধ্যায় নয়।'

'পায়জামা খোলার ব্যাপারটি বলেন। পায়জামাটা কী পাওয়া গিয়েছিল?'

'আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।'

'রানু বলছিল, নদীতে গোসল করবার সময় সেই মরা মানুষটি তার পায়জামা খুলে ফেলে।'

'আরে না না, কী বলেন!'

'ওর পরনে পায়জামা ছিল?'

'হ্যাঁ, থাকবে না কেন?'

'আপনার ঠিক মনে আছে তো?'

'মনে থাকবে না কেন? পরিষ্কার মনে আছে। আপনি অন্য সবাইকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'ঐ মরা মানুষটি সম্পর্কে কী জানেন?'

'কিছুই জানি না রে ভাই। থানায় খবর দিয়েছিলাম। থানা হচ্ছে এখান থেকে দশ মাইল। সেই সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল ছিল না। থানাঅলারা আসে দু'দিন পরে। লাশ তখন পচে-গলে গিয়েছে। শিয়াল-কুকুর কামড়াকামড়ি করছে। থানাঅলারা এসে আমাদের লাশ পুঁতে ফেলতে বলে। আমরা নদীর ধারেই গর্ত করে পুঁতে ফেলি।'

'আচ্ছা ঐ লাশটি তো উলঙ্গ ছিল, ঠিক না?'

'জি না, ঠিক না। হলুদ রঙের একটা প্যান্ট ছিল আর গায়ে গেঞ্জি ছিল।'

মিসির সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল।

'আপনার ঠিক মনে আছে তো ভাই?'

'আরে, এটা মনে না-থাকার কোনো কারণ আছে? পরিষ্কার মনে আছে।'

'লাশটি কী বুড়ো মানুষের ছিল?'

'জি না, জোয়ান মানুষের লাশ।'

'আর কিছু মনে পড়ে?'

'আর কিছু তো নেই মনে পড়ার।

'আপনার ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাই, অনুফা যার নাম। শুনেছি ওর শ্বশুরবাড়ি কাছেই।'

'হরিণঘাটায়। আপনি যেতে চান হরিণঘাটা?'

'জি।'

'কখন যাবেন?'

'আজকেই যেতে পারি। কত দূর এখানে থেকে?'

'পনেরো মাইল। বেবিট্যাক্সি করে যেতে পারেন।'

'রাতে ফিরে আসতে পারব?'

'তা পারবেন।'

'বেশ, তাহলে আপনি আমাকে ঠিকানা দিন।'

'দেব। বাড়িতে চলেন, খাওয়াদাওয়া করেন।'

'আমি হোটেল থেকে খেয়েদেয়ে এসেছি।'

'তা কি হয়, অতিথি-মানুষ। আসুন আসুন।'

ভদ্রলোক বাড়িতে নিয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু বড়ই গম্ভীর হয়ে রইলেন। মাথার ওপর হঠাৎ এসে পড়া উপদ্রবে তাঁকে যথেষ্ট বিরক্ত মনে হল। ভাল করে কোনো কথাই বললেন না। অকারণে বাড়ির একজন কামলার ওপর প্রচণ্ড হম্বিতম্বি শুরু করলেন।

কিন্তু অনুফার বাড়িতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার ঘটল। মেয়েটি আদর-যত্নের একটি মেলা বাধিয়ে ফেলল। মিসির আলি অবাক হয়ে দেখলেন, মেয়েটির স্বামী সন্ধ্যাবেলাতেই জাল নিয়ে পুকুরে নেমে গেছে। অনুফা পরিচিত মানুষের মত আদুরে গলায় বলল, 'রাতে ফিরবেন কি— কাল সকালে যাবেন।' লোকজন মিসির আলিকে দেখতে এল। এরা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। মেয়েটিও মনে হয় বেশ ক্ষমতা নিয়ে আছে। সবাই তার কথা শুনছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁকে গোসলের জন্যে গরম পানি করে দেওয়া হল। একটা বাটিতে নতুন একটা গায়ে মাখার সাবান। মোড়কটি পর্যন্ত ছেঁড়া হয়নি। বাংলাঘরে নতুন চাদর বিছিয়ে বিছানা করা হল। মেয়েটির বৃদ্ধ শ্বশুর একটি ফর্সী হুক্কাও এনে দিলেন এবং বারবার বলতে লাগলেন, খবর না-দিয়ে আসার জন্যে ঠিকমত খাতির-যত্ন করতে না পেরে তিনি বড়ই শরমিন্দা। তবে যদি

কালকের দিনটা থাকেন, তবে তিনি হরিণঘাটার বিখ্যাত মাগুর মাছ খাওয়াবেন। খাওয়াতে না পারলে তিনি বাপের ব্যাটা না— ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি সত্যি-সত্যি একদিন থেকে গেলেন। মিসির আলি সাহেব এ-রকম কখনো করেন না।

৯

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'ভেতরে আসব?'

'এস রানু, এস।'

'গল্প করতে এলাম।'

'খুব ভাল করেছ।'

নীলু উঠে গিয়ে রানুর হাত ধরল। রানু বলল, 'তুমি কাঁদছিলে নাকি, চোখ ভেজা!' নীলু কিছু বলল না। রানু বলল, 'এত কিসের দুঃখ তোমার যে দুপুরবেলায় কাঁদতে হয়?'

'তোমার বুঝি কোনো দুঃখটুঃখ নেই?'

'উঁহু। আমি খুব সুখী।'

রানু হাসতে লাগল। নীলু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি বলেছিলে, একটা খুব অদ্ভুত কথা আমাকে বলবে।'

'বলেছিলাম নাকি?'

'হ্যাঁ। আজ সেটা বলতে হবে। তারপর আমি আমার একটা অদ্ভুত কথা বলব।'

রানু হাসতে লাগল।

'হাসছ কেন রানু?'

'তোমার অদ্ভুত কথাটা আমি জানি, এই জন্যে হাসছি।'

'কী আবোলতাবোল বলছ! তুমি জানবে কী?'

'জানি কিন্তু।'

নীলু গম্ভীর হয়ে বলল, 'জানলে বল তো!'

'তোমার একজন প্রিয় মানুষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে। ঠিক না?'

নীলু দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। রানু বলল, 'কি ভাই, বলতে পারলাম তো?'

'হ্যাঁ, পেরেছ।'

'ও কি বাসায় আসবে?'

'বলব তোমাকে। তার আগে তুমি বল, তুমি কী করে জানলে? বিলু তোমাকে বলেছে? কিন্তু বিলু তো কিছু জানে না!'

'আমাকে কেউ কিছু বলেনি।'

'তাহলে তুমি জানলে কী করে?'

'আমি স্বপ্ন দেখেছি?'

'স্বপ্ন দেখেছি মানে?'

'নীলু, মাঝে-মাঝে আমি স্বপ্ন দেখি। সেগুলি ঠিক স্বপ্নও নয়। তবে অনেকটা স্বপ্নের মতো। সেগুলি সব সত্যি। গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তুমি একটা চিঠি পেয়ে খুব খুশি। সেই চিঠিতে একটি লাইন লেখা আছে, যার মানে হচ্ছে— তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে বা এই রকম কিছু?'

'এসব কি তুমি সত্যি-সত্যি বলছ রানু?'

'হ্যাঁ। কবে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে?'

'আজ বিকেলে। আমি নিউ মার্কেটের বইয়ের দোকানের সামনে একটা সবুজ রুমাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকব। তিনি আমাকে খুঁজে বের করবেন।'

'বাহ্, খুব মজার ব্যাপার তো!'

রানু হাসতে লাগল। এক সময় হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'শুধু গল্প উপন্যাসেই এসব হয়। বাস্তবে প্রথম দেখছি। তোমার ভয় করছে না?'

'ভয় করবে কেন?'

'তোমার কিন্তু নীলু ভয় করছে। আমি বুঝতে পারছি। বেশ ভয় করছে। করছে না?'

'নাহ্।'

রানু ইতস্তত করে বলল, 'ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পার। আমি দূরে থাকব।'

'থাক, দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

মনে হল নীলু রানুর কথাবার্তা সহজভাবে নিতে পারছে না। তার চোখ-মুখ গম্ভীর। রানু বলল, 'কি নেবে?'

'না। আমার একা যাবার কথা, একাই যাব।'

'আর যদি গিয়ে দেখ, খুব বাজে ধরনের একটা লোক। তখন কী করবে?'

'বাজে ধরনের লোক মানে?'

'অর্থাৎ যদি গিয়ে দেখ দাঁত পড়া চুল পাকা এক বুড়ো?'

'তোমার কি সে-রকম মনে হচ্ছে?'

রানু মাথা দুলিয়ে হাসছে, কিছু বলল না। নীলুকে দেখে মনে হল রানুর ব্যবহারে সে বেশ বিরক্ত হচ্ছে। দুটো বাজতেই সে বলল, 'এবার তুমি যাও, আমি সাজগোজ করব।'

'এখনই? চারটা বাজতে তো দেরি আছে।'

'তোমার মতো সুন্দরী তো আমি না। আমাকে সময় নিয়ে সাজতে হবে।'

রানু উঠে পড়ল। নীলু সত্যি সাজতে বসল। কিন্তু কী যে হয়েছে তার, চোখে পানি এসে কাজল ধুয়ে যাচ্ছে। আইল্যাশ পরার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একা-একা পরা সম্ভব নয়। অনেক বেছেটেছে একটা শাড়ি পছন্দ করল। সাদার ওপর নীলের একটা প্রিন্ট। আগে সে কখনো পরেনি।

'নীলু মা, কোথাও যাচ্ছ নাকি?'

নীলু তাকিয়ে দেখল— বাবা।

'কোথায় যাচ্ছ গো মা?'

'একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তোমার কী চা লাগবে?'

'হলে ভালো হত। থাক, তুই ব্যস্ত।'

'চা বানাতে আর কয় মিনিট লাগবে! তুমি বস, আমি বানিয়ে আনছি।'

নীলু চা নিয়ে এসে দেখে বাবা ঝিমুচ্ছেন। ঝিমুনিরও বেশি, প্রায় ঘুমাচ্ছেন বলা চলে। বাবা যেন বড় বেশি দ্রুত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। বড় মায়া লাগল নীলুর।

'বাবা, তোমার চা।'

'কোন বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিস মা?'

নীলু খানিক ইতস্তত করে বলল, 'তোমাকে আমি পরে বলব বাবা।'

'সন্ধ্যার আগেই আসবি তো?'

'হ্যাঁ, বাবা।'

'গাড়ি নিয়ে যাবি?'

'না, গাড়ি নেব না।'

'নিয়ে যা না। ড্রাইভার তো দিনরাত বসে-বসেই মায়না খায়।

'বাবা, আমি গাড়ি নেব না।'

নীলুর সাজ শেষ হল ঠিক সাড়ে তিনটায়। আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে তার পছন্দ হল। যে-মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে, সে বেশ রূপসী। তার মায়া-কাড়া দু'টি চমৎকার চোখ আছে। কিশোরীদের মত ছোট একটি চিবুক। ভালই তো! এ-রকম একটি মেয়েকে পুরুষরা কি ভালবাসে না? নাকের কাছে মুক্তোর মত কিছু ঘামের বিন্দু। নীলু তার সবুজ রুমাল দিয়ে সাবধানে ঘাম মুছে ফেলল। তারপর উঠে এল তিনতলায়।

'রানু, রানু।'

রানু যেন তৈরি হয়েই ছিল। সে বেরিয়ে এল সঙ্গে-সঙ্গে।

'তুমি যাবে বলেছিলে আমার সঙ্গে। চল।'

'চল।'

রানু তালা লাগাল। নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'তুমি জানতে আমি আসব?'

'হ্যাঁ জানতাম।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করল। কারো দেখা পাওয়া গেল না। এক সময় নীলু বলল, 'এখন চলে যেতে চাও রানু?'

'আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার তো এখনো যেতে ইচ্ছা করছে না।'

'এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে চল হাঁটি।'

তারা বেশ কয়েক বার নিউ মার্কেট চক্কর দিয়ে ফেলল। কেউ এগিয়ে এসে বলল না, 'তোমাদের মধ্যে নীলু কে?'

'রানু, তোমার কি হাঁটতে টায়ার্ড লাগছে?'

'না।'

'রানু, তুমি তো অনেক কিছু বুঝতে পার, তাই না?'

'মাঝে-মাঝে পারি।'

'লোকটি এসেছে কি না বুঝতে পারছ না?'

'না নীলু, পারছি না। আমি সব সময় পারি না।'

রানু লক্ষ্য করল, নীলুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে তার সবুজ রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরল। রানু গাঢ় স্বরে বলল, 'কাঁদে না নীলু।'

'কান্না এলে কী করব?'

'মনটা শক্ত কর ভাই। পৃথিবীটা খুব ভাল জায়গা নয়।'

লোকজন তাকাচ্ছে ওদের দিকে। রানু নীলুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এল। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থা।

তার চার দিন পর নীলু একটি চিঠি পেল।

প্রিয় নীলু,

ঐদিন তোমাকে দেখলাম। তুমি তো ভারি মিথ্যুক! কেন বললে তুমি দেখতে সুন্দর নও? তোমাকে বর্ষার জলভারে নত আকাশের মত লাগছিল। আমি ছুটে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার বান্ধবীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছি। কথা ছিল একা আসবে। তাই নয় কি? শুধু আমরা দুজন থাকব। আমাকে দেখে যদি তোমার কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাহলে কোনো একটি রেস্টুরেন্টে বসে দু'জনে চা খেতে-খেতে গল্প করব। আর যদি তোমার আমাকে পছন্দ না-হয়, তাহলে তুমি তোমার সবুজ রুমালটি তোমার হ্যান্ডব্যাগে লুকিয়ে ফেলবে। তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি মন-খারাপ করব ঠিকই, কিন্তু বিদায় নেব হাসিমুখে, বরং আর কোনো দিনই তুমি আমাকে দেখবে না। তবে নীলু, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমাকে তুমি অপছন্দ করবে না। এবকম মনে করার কোনোই কারণ নেই, তবু মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব উইশফুল থিংকিং। না মেয়ে?

নীলু চিঠিটি সমস্ত দিনে প্রায় এক শ বার পড়ল এবং প্রতি বারই তার কাছে নতুন মনে হল। রাতে সে অদ্ভুত সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখল— যেন পুরনো আমলের একটি পালতোলা জাহাজে সে বসে আছে। জাহাজের পালটি গাঢ় সবুজ রঙের। প্রচণ্ড বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে জাহাজ ছুটে চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। নীলুর একটু ভয়ভয় লাগছে, কারণ জাহাজের আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু এক সময় বলল, 'আমার ভয় লাগছে এই জাহাজে। আর কেউ কি আছে?' সঙ্গে-সঙ্গে একটি ভারী পুরুষালি গলা শোনা গেল, 'ভয় নেই নীলু। আমি আছি।' স্বপ্ন এত সুন্দর হয়!

নীলুর ঘুম ভেঙে গেল। বাকি রাত সে আর ঘুমোতে পারল না। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বিলু জেগে উঠে বলল, 'কী হয়েছে রে আপা?'

নীলু ভেজা গলায় বলল, 'পেট ব্যথা করছে। এখন একটু কম। তুই ঘুমো।'

## ১০

অনুফার কাছ থেকে নতুন কিছু জানা গেল না। সেও খুব জোর দিয়ে বলল, রানুর পরনে পায়জামা ছিল এবং মৃত লোকটির পরনেও কাপড় ছিল।

'আপনি লোকটিকে দেখেছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি করে বলছেন কেন? মুরুব্বি মানুষ আপনি। আমি আপনার মেয়ের বয়েসী।'

লোকটিকে কেমন দেখলে বল তো!'

'চাচা, আমার কিছু মনে নেই। সেই সময় আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম। পরদিন আমার বিয়ে।'

হ্যাঁ, তা আমি জানি। লোকটিকে নদীর পারে পুঁতে রাখা হয়, তাই না?'

'জি। তারপর অনেক দিন কেউ ওদিক যেত না। সবাই বলাবলি করত, রাতে কী জানি দেখতে পায়।'

'কী দেখতে পায়?'

'ছায়া-ছায়া কী নাকি দেখে। তবে এইসব সত্যি না চাচা। সব মনগড়া।'

'তাই নাকি?'

'জি। ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই।'

মিসির আলি বড়ই অবাক হলেন। গ্রামের কোনো মেয়ে এইভাবে চিন্তা করে না। এতটা মুক্তচিন্তা তাদের থাকার নয়। মিসির আলী বললেন, 'তুমি পড়াশোনা কত দূর করেছ?'

'চাচা, আমি আই.এ পড়ার সময় আমার বিয়ে হয়। তারপর আর পড়াশোনা হয়নি। গ্রামে বিয়ে হয়েছে তো! পড়াশোনা করার আমার খুব সখ ছিল।'

'মানুষের সব সখ মেটা উচিত নয়। একটা কোনো ডিসস্যাটিসফেকশন থাকা দরকার।'

'কেন?'

'তাহলে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। সব সখ মিটে গেলে বেঁচে থাকার প্রেরণা নষ্ট হয়ে যায়। যে-সব মানুষের সখ মিটে গেছে, তারা খুব অসুখী মানুষ।'

অনুফা চুপ করে রইল। মিসির আলী মৃদু স্বরে বললেন, 'এবার রানুর কথা বল।'

'কী কথা জানতে চান?'

'সব কথা।'

'ও খুব অদ্ভুত মেয়ে। ও মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারে।'

'কীভাবে বলে?'

'তা জানি না, তবে বলতে পারে। একবার কী হয়েছে, শোনেন। আমি আর ও গল্প করছি, সে হঠাৎ গল্প থামিয়ে বলল— কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বাড়িতে শ্রীপুরের খালারা বেড়াতে আসবেন। আর সত্যি-সত্যি তাঁরা এলেন।'

'এটা তো এমনিতেও হতে পারে। মানুষ বেড়াতে আসে না?'

'তা আসে। কিন্তু শ্রীপুরের খালা পাঁচ বছর পর প্রথম এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কি-একটা ঝগড়া চলছিল।'

'ও, তাই নাকি?'

'জি। আরেক গল্প বলি শোনেন, তখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে রানুদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছি— না, এটা আপনাকে বলা চলে না।'

'বলা যাবে না কেন?'

'গল্পটা ভাল না।'

থাক, তাহলে অন্য গল্প বল।

অনুফার স্বামীকেও মিসির আলি সাহেবের বেশ লাগল। গোঁয়ারগোবিন্দ ধরনের লোক। স্ত্রীর খুবই অনুগত। সে মিসির আলিকে নিয়ে প্রচুর ঘুবল। লোকটির যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিও দেখা গেল। মধুপুর থানার ওসি সাহেব ওর কথাতেই পুরনো ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখালেন যে, একটি মরা লাশ পাওয়ার খবরে এফআইআর করা হয়েছিল। তখন ওসি ছিলেন বজ্রগোপাল হালদার, তাঁর নোটে লেখা—

*একটি কলেরায় মৃত মানুষের লাশ (৩০/৩৫) মধুপুরের নিমশাসা গ্রামে পাওয়া যায়। লাশটির পচন ধরিয়া গিয়াছিল। প্রাথমিক পরীক্ষার পর আমি লাশটি পুঁতিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেই। লাশটির কোনো পরিচয় জানা যায় নাই।*

মিসির আলি বললেন, 'কলেরায় মৃত, এটা বোঝা গেল কী করে?'

ওসি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'সেটা আমি কি করে বলব? রিপোর্ট তো আমার লেখা না। ব্রজগোপাল বাবুকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জানবেন।'

'তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে?'

'পুলিশ ডাইরেক্টরেটে খোঁজ করেন। তবে এই সব খোঁজখুঁজির কোনো অর্থ নেই। দশ বৎসর আগের ঘটনা মনে করে বসে আছেন নাকি? পুলিশকে আপনারা কি মনে করেন বলেন তো?'

'ঘটনাটা অস্বাভাবিক। সে-জন্যই হয়ত তাঁর মনে থাকবে।'

'একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে পানিতে, এর মধ্যে আপনি অস্বাভাবিক কি দেখলেন? বাংলাদেশে প্রতিদিন কয়টা ডেড বডি পাওয়া যায় জানেন?'

'জি না, জানি না।'

'পুলিশের লাইনে ডেড বডি পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা, বুঝলেন?'

মিসির আলি মধুপুরে আরো এক দিন থাকলেন। দেখে এলেন, যে-জায়গায় লোকটিকে পোঁতা হয়েছিল সেই জায়গা। দেখার মত কিছু নয়। ঘন কাঁটাবন হয়েছে, যার মানে হচ্ছে এই জায়গাটিকে বেশ কিছু দিন লোকজন ভয়ের চোখে দেখেছে। হাঁটাচলা বন্ধ করে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

মিসির আলি অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন— যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়। নতুন কোনো তথ্য, যা কাজে লাগবে। কিন্তু কিছুই জানা গেল না। দশ বৎসর দীর্ঘ সময়। এই সময়ে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়।

মধুপুর থেকে তিনি গেলেন রানুদের আদি বাড়িতে। সেখানে যাবার তাঁর একটি উদ্দেশ্য, খুঁজে দেখা— জালালউদ্দিন নামে কাউকে পাওয়া যায় কি না। এই লোকটিকে পাওয়া খুবই প্রয়োজন।

আনিস লক্ষ্য করল, রানু ইদানীং বেশ স্বাভাবিক। এর প্রধান কারণ বোধহয় বাড়িঅলার দুটি মেয়ে। ওদের সঙ্গে সে বেশ মিলেমিশে আছে। গল্পের বই আনছে। ভালমন্দ কিছু রান্না হলেই আগ্রহ করে নিচে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়িঅলাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা আনিসের পছন্দ নয়। বাড়িঅলাদের সে সব সময় শত্রুপক্ষ বলেই মনে করে। কয়েক বার ভেবেছিল বলবে মেলামেশাটা কমাতে। না-বলে ভালই হয়েছে, এতে যদি অসুখটা চাপা পড়ে তো ভালই।

কাজের একটি ছেলে পাওয়া গেছে— জিতু মিয়া। এই ছেলেটিও রানুকে বেশ ব্যস্ত রাখছে। ছেলেটির বয়স দশ-এগারো, তবে মহাবোকা। কোনো কাজই করতে পারে না। করার আগ্রহও নেই। রানু ক্রমাগত বকাঝকা করেও কিছু করাতে পারে না। তবে তার সময় বেশ কেটে যায়।

সন্ধ্যাবেলা সে আবার জিতু মিয়াকে নিয়ে পড়াতে বসে। জিতু ঘুমঘুম চোখে পড়ে, 'স্বরে অ স্বরে আ'! এই পড়াটি গত এক সপ্তাহ ধরে চলছে। জিতু মিয়া কিছুই মনে রাখতে পারছে না। কিন্তু তাতে রানুর উৎসাহে ভাটা পড়ছে না।

আনিস এক দিন ঠাট্টা করে বলেছে, 'তুমি দেখি একে বিদ্যাসাগর বানিয়ে ফেলছ!' রানু তাতে বেশ রাগ করেছে। গম্ভীর হয়ে বলেছে,-'ঠাট্টা করছ কেন? বিদ্যাসাগর তো একদিন হতেও পারে।'

অবশ্য অদূর-ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ভবিষ্যৎ বিদ্যাসাগর রোজ রাতেই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়ছে এবং রানু প্লেটে খাবার বেড়ে প্রতি রাতেই প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে! এতটা বাড়াবাড়ি আনিসের ভাল লাগে না। কিন্তু সে কিছু বলে না। থাকুক একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত।

এর মধ্যে একদিন আনিস গিয়েছিল মিসির আলি সাহেবের কাছে। ভদ্রলোক বেশ কিছুদিন ঢাকায় ছিলেন না। সবে ফিরেছেন। তাঁর চোখ হলুদ, গা হলুদ। আনিস অবাক হয়ে বলেছে, 'হয়েছে কী আপনার?'

'জন্ডিস। জন্ডিস বাধিয়ে বসেছি।'

'বলেন কী!'

'ইনফেকটাস হেপাটাইটিস। লিভারের অবস্থা কাহিল রে ভাই! আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?

'ভাল।'

'আর ভয়টয় পাচ্ছেন না?'

'জি না।'

'খুব ভাল খবর। আমি একটু সুস্থ হলেই যাব আপনার বাসায়।'

'জি আচ্ছা।'

'আমি কিছু খোঁজখবর পেয়েছি। মনে হয় আপনার স্ত্রীর সমস্যাটি ধরতে পেরেছি।'

'তাই নাকি?

'হ্যাঁ, একটু ভাল হলে এ নিয়ে কথা বলব।'

রানু মিসির আলি সাহেবের জন্ডিসের খবরে খুবই মন-খারাপ করল।

'আহা, বেচারা একা-একা কষ্ট করছে। চল একদিন দেখে আসি। যাবে?'

'ঠিক আছে, যাব একদিন।'

'কবে যাবে? কাল যাবে?'

'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? জন্ডিস যখন হয়েছে, তখন বেশ কিছুদিন থাকবে। একদিন দেখে এলেই হবে।'

'আমি এই অসুখের ভাল ওষুধ জানি। অড়হড়ের পাতার রস। সকালবেলা এক গ্লাস করে খেলে তিন দিনে অসুখ সেরে যাবে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার দাদা এই ওষুধটা দিতেন। তুমি কিছু অড়হড়ের পাতা ঐ লোকটিকে দিয়ে এস না।'

'ঢাকা শহরে আমি অড়হড়ের পাতা কোথায় পাব? কী যে বল!'

'খুঁজলেই পাবে। জংলা গাছ সব জায়গায় হয়।'

আনিস যথেষ্ট বিরক্ত হল। রানুর এই একটা প্রবলেম— কোনো-একটা জিনিস মাথায় ঢুকলে ওটা নিয়ে থাকবে। আনিস বলল, 'আচ্ছা, দেখি।'

'দেখাদেখি না, তুমি খুঁজবে। আর শোন, কাল তো তোমার অফিস নেই, চল ওনাকে দেখে আসি।'

'এত ব্যস্ত কেন? ভদ্রলোক তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না।'

রানু থেমে-থেমে বলল, 'আমি অন্য একটা কারণে যেতে চাই।'

'কি কারণ?'

'ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্যে মধুপুর গিয়েছিলেন, কী খোঁজ পেলেন জানতে ইচ্ছা করছে।'

'মধুপুরের খবর পেলে কীভাবে? স্বপ্নে?'

'না, স্বপ্নটপ্ন না। অনুফা চিঠি দিয়েছে।'

'কবে চিঠি পেয়েছ?'

'গতকাল।'.

আনিস চুপ করে গেল। রানু তার নিজের চিঠিপত্রের কথা আনিসকে কখনো বলেনি। বিয়ের পর রানু তার আত্মীয়স্বজনের যত চিঠিপত্র পেয়েছে তার কোনোটিই সে আনিসকে পড়তে দেয়নি। এ নিয়ে আনিসের গোপন ক্ষোভ আছে।

'কি, আমাকে নিয়ে যাবে?'

'আমি আগে গিয়ে দেখি ভদ্রলোকের অবস্থা কেমন।'

মিসির আলিকে পাওয়া গেল না। বাড়িতে তাঁর এক ছোট ভাই ছিল, সে বলল, 'ভাইয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থা বেশি ভালো না। বিলরুবিন নাইন পয়েন্ট ফাইভ। লিভার খুবই ড্যামেজড।'

## ১১

মিসির আলি হাসপাতালে এসেছেন একগাদা বই নিয়ে। তাঁর ধারণা ছিল বই পড়ে সময়টা খুব খারাপ কাটবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে-রকম হয়নি। ডাক্তাররা বই পড়তে নিষেধ করেননি, কিন্তু দেখা গেল বই পড়া হচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাথার ভেতর ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা নিয়ে বই পড়ার কোনো মানে হয় না। তবু তিনি মৃত্যু-বিষয়ক একটি বই পড়ে ফেললেন, এবং মৃত্যু ব্যাপারটিতে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন। তাঁর স্বভাবই হচ্ছে কোনো বিষয় একবার মনে ধরে গেলে সে-বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত পড়াশোনা করতে চেষ্টা করেন।

মৃত্যু সাবজেক্টটি তাঁর পছন্দ হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারছেন না। বইপত্র নেই। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে কিছু থাকার কথা, কিন্তু আনাবেন কাকে দিয়ে? তাঁকে কেউ দেখতে আসছে না। তিনি এমন কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তি নন যে তাঁর অসুস্থতার খবরে মানুষের ঢল নামবে। তা ছাড়া অসুখের খবর তিনি কাউকে জানাননি। হাসপাতালে ভর্তি হবার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু ঘরে দেখাশোনার লোক নেই। কাজের মেয়েটি তিনি মধুপুর থাকাকালীন বেশ কিছু জিনিসপত্র নিয়ে ভেগে গেছে। এমন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছাড়া উপায় কী?

বিকালবেলা তাঁর কাছে কেউ আসে না। সবারই আত্মীয়স্বজন আসে দেখতে, তাঁর কাছে কেউ আসে না। এই সময়টা তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন এবং এখনো মানুষের সঙ্গ পাবার জন্যে তাঁর মন কাঁদে দেখে নিজের কাছেই লজ্জিত বোধ করেন।

আজ সারা দিন মিসির আলির খুব খারাপ কেটেছে। তাঁর রুমমেট ছাব্বিশ বছরের ছেলেটি সকাল ন'টায় বিনা নোটিশে মারা গেছে। মৃত্যু যে এত দ্রুত মানুষকে ছুঁয়ে দিতে পারে তাঁর ধারণাতেও ছিল না। ছেলেটা ভোরবেলায় নাশতা চেয়েছে, তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তাও বলেছে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, 'আজ কেমন আছ?'

'আজ বেশ ভাল।'

'লিভার ব্যথা করছে না?'

'নাহ্, তবে তলপেটের দিকে একটা চাপা ব্যথা আছে।'

'খুব বেশি?'

'না, খুব বেশি না। আপনি এটা কী বই পড়ছেন?'

'এটা একটা সায়েন্স ফিকশন— 'ফ্রাইডে দি থার্টিন্থ'। বেশ ভাল বই। তুমি পড়বে?'

'জি না। ইংরেজি বই আমার ভাল লাগে না। বাংলা উপন্যাস পড়ি।'

'কার লেখা ভাল লাগে? এ-দেশের— মানে বাংলায়, কার লেখা তোমার পছন্দ?'

'নিমাই ভট্টাচার্য।'

'তাই নাকি?'

ছেলেটি আর জবাব না-দিয়ে কাৎরাতে থাকে। সকাল সাড়ে আটটায় বলল, 'একজন ডাক্তার পাওয়া যায় কি না দেখবেন?' তিনি অনেকক্ষণ বোতাম টিপলেন, কেউ এল না। শেষ পর্যন্ত নিজেই গেলেন ডিউটি রুমে। ফিরে এসে দেখেন ছেলেটি মরে পড়ে আছে।

মৃত্যুর সময় পাশে কেউ থাকবে না, এর চেয়ে ভয়াবহ বোধহয় আর কিছু নেই। শেষ বিদায় নেবার সময় অন্তত কোনো-একজন মানুষকে বলে যাওয়া দরকার। নিঃসঙ্গ ঘর থেকে একা-একা চলে যাওয়া যায় না। যাওয়া উচিত নয়। এটা হৃদয়হীন ব্যাপার।

এত দিন যে-ছেলেটি ছিল, এখন আর সে নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার সমস্ত চিহ্ন এ-ঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিছানায় নতুন বালিশ ও চাদর দিয়ে গেছে— হয়তো সন্ধ্যার মধ্যে কোনো নতুন পেসেন্ট এসে পড়বে।

মিসির আলি সমস্ত দিন কিছু খেতে পারলেন না। বিকেলের দিকে তাঁর গায়ে বেশ টেম্পারেচার হল। প্রথম বারের মতো মনে হল একজন-কেউ তাঁকে দেখতে এলে খারাপ লাগবে না। ভালই লাগবে। কেউ না-এলে একজন রোগী হলেও আসুক, একা-একা এই কেবিনে রাত কাটানো যাবে না। ঠিক এই সময় ইতস্তত ভঙ্গিতে রানু এসে ঢুকল।

'আপনি ভাল আছেন?'

'না, ভাল না। তুমি কোত্থেকে?'

'বাসা থেকে। ইস! আপনার এ কী অবস্থা!'

'অবস্থা খারাপ ঠিকই। আনিস সাহেব কোথায়?'

'ও আসেনি, আমি একাই এলাম। ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি।'

'বস তুমি। ঐ চেয়ারটায় বস। ফ্লাস্কে চা আছে। খেতে চাইলে খেতে পার।'

'উঁহু, চা-টা খাব না। আপনার কাছে একটা খবর জানতে এসেছি।'

'কোন খবরটি?'

'মধুপুরে গিয়ে আপনি কী জানলেন?'

'তেমন কিছু জানতে পারিনি।'

'তবু যা জেনেছেন তা-ই বলুন। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে। অনুফা লিখেছে, আপনি নাকি হাজার-হাজার মানুষকে নানা রকম প্রশ্ন করেছেন।'

মিসির আলি হাসলেন।

'হাসলে হবে না, আমাকে বলতে হবে।'

'প্রথম যে-জিনিসটি জানলাম— সেটি হচ্ছে, তুমি অনেকগুলো ভুল তথ্য দিয়েছ।'

'আমি কোনো তথ্য দিইনি।'

'তুমি নিজে হয়ত জান না সেগুলো ভুল। যেমন পায়জামা খোলার ব্যাপারটি— এ-রকম কোনো কিছু ঘটেনি।

'রানু চোখ লাল করে বলল, 'ঘটেছে।'

'না, রানু, ঘটেনি। এটা তোমার কল্পনা। তা ছাড়া তুমি উলঙ্গ একটি ডেড বডির কথা বলেছ— সেটাও ঠিক নয়।'

'কিন্তু আমি জানি, এগুলো ঠিক।'

'না রানু। এইসব তুমি নিজে ভেবেছ এবং আমার ধারণা এ-জাতীয় স্বপ্ন তুমি মাঝে-মাঝে দেখ। দেখ না?

'কী রকম স্বপ্নের কথা বলছেন?'

মিসির আলি কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করলেন। স্পষ্ট গলায় বললেন, 'তুমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখ না— এক জন নগ্ন মানুষ তোমার কাপড় খোলার চেষ্টা করছে?'

রানু উত্তর দিল না! মাথা নিচু করে থাকল।

'বল রানু। জবাব দাও।'

'হ্যাঁ, দেখি।'

'কখনো কি ভেবে দেখেছ এ-রকম স্বপ্ন কেন দেখ?'

'না, ভাবিনি।'

'আমি ভেবেছি। এবং কারণটাও খুঁজে বের করেছি। আজ সেটা বলতে চাই না, অন্য একদিন বলব।'

'না, আপনি আমাকে আজই বলেন।'

মিসির আলি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'চা খেতে-খেতে শোন। চায়ে ক্যাফিন আছে। ক্যাফিন তোমার নার্ভগুলোকে অ্যাকটিভ রাখবে।'

রানু চায়ের পেয়ালা নিল, কিন্তু চুমুক দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসির আলি ঠাণ্ডা গলায় বলতে লাগলেন, 'রানু, তোমাকে নিয়ে এই গল্পটি আমি তৈরি করেছি। তুমি মন দিয়ে শোন। তুমি যখন বেশ ছোট— নয়, দশ বা এগারো বছর বয়স, তখন একজন বয়স্ক লোক তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নির্জন কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের গ্রামে এ-রকম একটা নির্জন জায়গার খোঁজে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে জঙ্গলের কাছে একটা ভাঙা বিষ্ণুমন্দির দেখেছি। মনে হয় ঐ জায়গাটাই হবে। কারণ সাপের ভয়ে ওখানে কেউ যেত না। রানু, তুমি কি আমার কথা শুনছ?'

'শুনছি।'

'তারপর সেই বয়স্ক মানুষটি মন্দিরে তোমাকে নিয়ে গেল।'

'আমাকে কেউ নিয়ে যায়নি। আমি নিজে গিয়েছিলাম। ঐ মন্দিরে খুব সুন্দর একটি দেবীমূর্তি আছে। আমি ঐ মূর্তি দেখার জন্যে যেতাম।'

'তারপর কী হয়েছে, বল।'

রানু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তীব্র স্বরে বলল, 'আমি বলব না, আপনি বলুন।'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, 'ঐ লোকটি তখন টেনে তোমার পায়জামা খুলে ফেলল।'

রানুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

'ঐ লোকটির নাম ছিল জালালউদ্দিন।'

রানু কিছু বলল না। মিসির আলি বললেন, 'তোমার অসুখ শুরু হল সেদিন থেকে। তোমার মনের মধ্যে ব্যাপারটি গেঁথে গেল, পরবর্তী সময়ে গোসলের সময় যখন মরা মানুষটি তোমার পায়ে লেগে গেল, তখন তোমার মনে পড়ল মন্দিরের দৃশ্য। বুঝতে পারছ?'

রানু জবাব দিল না।

'অসুখের মূল কারণটি আলোয় নিয়ে এলেই অসুখটি সেরে যায়; এ-জন্যেই আমি এটা তোমাকে বললাম। তুমি নিজেও এখন গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করবে। তোমার অসুখ সেরে যাবে।'

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'আপনি ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'বলেছি।'

'ও কী বলেছে?'

'তেমন কিছু বলেনি।'

'না, বলেছে, আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন না। এতটা যখন বলেছেন, তখন বাকিটুকুও বলুন।'

রানু তীব্র চোখে তাকাল। মিসির আলি বললেন, 'দেখ রানু, আমি খুবই যুক্তিবাদী মানুষ। অলৌকিক কোনো কিছুতে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি সব কিছুরই একটি ব্যাখ্যা আছে। জালালউদ্দিন যা বলেছে, তাও নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করা যায়।'

'ব্যাখ্যা পরে করবেন। আগে বলুন, সে কী বলেছে।'

'সে বলেছে, হঠাৎ সে দেখে মূর্তিটি ছুটে এসে তোমার মধ্যে মিলিয়ে গেছে। তোমার গা থেকে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। জালালউদ্দিন তখন ছুটে পালিয়ে যায়।'

'আপনি জালালউদ্দিনের কথা বিশ্বাস করেন না?'

'না। ওর মনে পাপবোধ ছিল। মন্দিরটন্দির নিয়ে মূর্খ মানুষদের মনে অনেক রকম ভয়-ভীতি আছে। তা থেকেই সে একটা হেলুসিনেশন দেখেছে। তুমি নিজে তো কিছু দেখনি।'

'না।'

'তাহলেই হল। জালালউদ্দিন কী দেখেছে না-দেখেছে, সেটা তার প্রবলেম, তোমার নয়।'

রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কিন্তু একটা জিনিস কি জানেন? ঐ ঘটনার পর থেকে আমি অসম্ভব সুন্দর হয়ে গেলাম।'

মিসির আলি শব্দ করে হাসলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, 'সুন্দর তুমি সব সময় ছিলে। ঘটনাটি ঘটেছে তোমার বয়ঃসন্ধিতে। বয়ঃসন্ধির পর মেয়েদের রূপ খুলতে শুরু করে। এখানেও তাই হয়েছে।'

'কিন্তু ঐ দেবীমূর্তিকে এর পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'তুমি কিন্তু খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ রানু। মূর্তিটি চুরি গেছে, কেউ নিয়ে পালিয়ে গেছে, ব্যস।'

'মূর্তিটি চুরি যায়নি।'

'তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না— একটা পাথরের মূর্তি তোমার মধ্যে ঢুকে আছে? কি, কর?'

রানু তীব্র কণ্ঠে বলল, 'আমার দিকে ভাল করে তাকিয়ে বলুন, আমাকে কী অনেকটা মূর্তির মতো দেখায় না?'

'না রানু, মূর্তির মতো দেখাবে কেন? অসম্ভব রূপবতী একটি তরুণী— এর বেশি কিছু না। তোমার মতো রূপবতী মেয়ে এ দেশেই আছে এবং তারা সবাই রক্ত মাংসের মানুষ।'

রানু উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি বললেন, 'চলে যাচ্ছ রানু?'

'হ্যাঁ।'

'অসুখ সারলে তোমাদের ওখানে একবার যাব।'

'না, আপনি আসবেন না। আপনার আসার কোনো দরকার নেই।'

রানু ঘর ছেড়ে চলে গেল। মিসির আলি ক্ষীণস্বরে বললেন, 'ভেরি ইন্টারেস্টিং।' তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। তিনি ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারছেন না। যতটা সহজ মনে হয়েছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না। তিনি মৃত্যু-বিষয়ক বইটি আবার পড়তে শুরু করলেন। সাবজেক্টটি তাঁকে বেশ আকর্ষণ করেছে। ফ্যাসিনেটিং টপিক।

## ১২

গভীর রাতে আনিস জেগে উঠল। শুনশান নীরবতা চারদিকে। রানু হাত-পা ছড়িয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো ঘুমোচ্ছে। জানালার আলো এসে পড়েছে তার মুখে। অদ্ভুত সুন্দর একটি মুখ। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। আনিস ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। বাথরুমে যেতে হবে।

বাথরুমে পানি জমে আছে। পাইপ জ্যাম হয়ে গেছে। বাড়িঅলাকে বলতে হবে। আনিস নোংরা পানি বাঁচিয়ে সাবধানে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই শুনল ঝুমঝুম করে শব্দ হচ্ছে। নূপুর বাজছে যেন। এর মানে কি? মনের ভুল কী? মনের ভুল হবার কথা নয়। বেশ বোঝা যাচ্ছে নূপুর পায়ে দিয়ে ঝমঝম করতে-করতে কেউ একজন এঘর-ওঘর করছে। শব্দটা অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছে। মনের ভুল হবার কথা নয়।

বাথরুমের দরজা খুলতেই শব্দটা চট করে থেমে গেল। শুধু একটা তীব্র ফুলের গন্ধ আনিসকে অভিভূত করে ফেলল। একটু আগেও তো এ-রকম সৌরভ ছিল না। আনিসের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। বিস্ময়ের ঘোর অবশ্যি বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। আনিসের মনে পড়ল একতলার বাগানে হাস্নাহেনার প্রকাণ্ড একটা ঝাড় আছে। বাতাসের ঝাপটায় ফুলের গন্ধই উড়ে এসেছে বারান্দায়। আনিস কিছুক্ষণ একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল— নূপুরের শব্দ আবার যদি পাওয়া যায়।

দোতলার একটা বাচ্চা ছেলে শুধু কাঁদছে। তার মা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। একটা রিকশা গেল টুনটুন করে। ব্যস, আর কিছু শোনা গেল না।

শোবার ঘরে রানু ঘুমোচ্ছে। মড়ার মতো। জানালা খোলা। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে ঘরে। আনিস জানালা বন্ধ করতে গিয়ে শুনল, রান্নাঘর থেকে জিতু মিয়া সাড়াশব্দ দিচ্ছে। কান্না চাপার আওয়াজ।

'জিতু মিয়া।'

জিতু ফুঁপিয়ে উঠল। আনিস রান্নাঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাল। জিতু মশারির ভেতর জবুথবু হয়ে বসে আছে।

'জিতু, কি হয়েছে রে?'

'কিছু হয় নাই।'

'বসে আছিস কেন?'

'ঘুম আহে না।'

'স্বপ্ন দেখেছিস?'

জিতু মাথা নাড়ল।

'কী স্বপ্ন?'

'একজন মাইয়া মানুষ পাকের ঘরে হাঁটিতে আছিল।'

'এই দেখেছিস স্বপ্নে?'

'স্বপ্নে দেখি নাই। নিজের চোখে দেখলাম।'

'দূর ব্যাটা, অন্ধকারে তুই মানুষ দেখলি কীভাবে? যা, ঘুমো।'

জিতু শুয়ে পড়ল। আনিস বলল, 'ভয়ের কিছু নেই, আমি জেগে আছি, ঘুমো তুই।'

'আচ্ছা।'

'আর শোন, রান্নাঘরে বাতি জ্বালানো থাকুক।'

'আচ্ছা।'

জিতু শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। আনিস একটি সিগারেট ধরাল। ঘুম চটে গেছে। তাকে এখন দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে হবে। এক পেয়ালা চা খেতে পারলে মন্দ হত না। রাত তো বাজে প্রায় সাড়ে তিনটা। বাকি রাতটা তার জেগেই কাটবে মনে হয়। সিগারেট টানতে ভাল লাগছে না। পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠেছে।

ঘুমের মধ্যে রানু শব্দ করে হাসল। আনিস মৃদু স্বরে ডাকল, 'এই রানু।' রানু খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'কি?'

'জেগে আছ নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কি আশ্চর্য, কখন জাগলে?'

'অনেক্ষণ। তুমি বাথরুমে গেলে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলে।'

আমাকে ডাকলে না কেন?'

'শুধু-শুধু ডাকব কেন?'

আনিস সিগারেট টানতে লাগল। রানু বলল, 'বড্ড গরম লাগছে। জানালা বন্ধ করলে কেন?'

'গরম কোথায়? বেশ ঠাণ্ডা তো!'

'আমার গরম লাগছে। ফ্যানটা ছাড় না।'

'এই ঠাণ্ডার মধ্যে ফ্যান ছাড়ব কি, কী যে বল!

রানু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'তুমি যখন বাথরুমে ছিলে তখন কি নূপুরের শব্দ শুনেছ?'

আনিস ঠাণ্ডা স্বরে বলল, 'না তো, কেন?'

'না, এমনি। আমি শুয়ে-শুয়ে শুনছিলাম।'

'ঘুমাও রানু।'

'আমার ঘুম আসছে না।'

'ঘুম না এলে উঠে বস, গল্প করি। চা খাওয়া যেতে পারে, কি বল?'

রানু উঠে বসল কিন্তু জবাব দিল না। আনিস দেখল রানু কোন ফাঁকে গায়ের কাপড় খুলে ফেলেছে। ক্লান্ত স্বরে বলল, 'বড্ড গরম লাগছে। তুমি আমার দিকে তাকিও না, প্লিজ!'

'এইসব কী রানু? ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে আছে।'

'কী করব, বড্ড গরম লাগছে। তুমি বরং রান্নাঘরের বাতি নিভিয়ে সব অন্ধকার করে দাও।'

'না, বাতি জ্বালানো থাক।'

আনিস দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। রানু বলল, 'আমাদের গ্রামে একটা মন্দির আছে, তার গল্প এখন শুনবে না?'

'আহ্, মন্দির-ফন্দিরের গল্প এখন শুনব না।'

'আহ্, শোন না! আমার বলতে ইচ্ছে করছে। আমি যখন খুব ছোট, তখন একা-একা যেতাম সেখানে।'

'কি মন্দির? কালীমন্দির?'

'নাহ্, বিষ্ণুমন্দির বলত ওরা। তবে কোনো বিষ্ণুমূর্তি ছিল না। একটি দেবী ছিল। হিন্দুরা বলত রুকমিনী দেবী।'

'তুমি মন্দিরে যেতে কী জন্যে?'

'এমনি যেতাম। ছোট বাচ্চা পুতুল খেলে না?'

'কী করতে সেখানে?'

'দেবীমূর্তির সাথে গল্পগুজব করতাম। ছেলেমানুষি খেলা আর কি!'

বলতে-বলতে রানু খিলখিল করে হেসে উঠল। আনিস স্পষ্ট শুনল সঙ্গে-সঙ্গে ঝমঝম করে কোথাও নূপুর বাজছে। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'শুনতে পাচ্ছ?'

'কী শুনব?'

'নূপুরের শব্দ শুনছ না?'

আনিস দৃঢ় স্বরে বলল, 'না। তুমি ঘুমাও রানু।'

'আমার ঘুম আসছে না।

'শুয়ে থাক। তুমি অসুস্থ।'

রানু ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'হ্যাঁ আমি অসুস্থ।'

'তোমাকে খুব বড় ডাক্তার দেখাব আমি।'

'আচ্ছা।'

'এখন শুয়ে থাক।'

রানু মৃদু স্বরে বলল, 'আমি ঐ দেবীকে গান গেয়ে শোনাতাম।'

'ঐ সব অন্য দিন শুনব।'

'আজ রাতে আমার বলতে ইচ্ছে করছে।'

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। আনিস অবাক হয়ে বলল, 'তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে!'

'হুঁ, বড্ড গরম লাগছে। ফ্যানটা ছাড়বে?'

আনিস উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিল। ঘর ভর্তি হয়ে গেল ফুলের গন্ধে। আর তখনি রানু অত্যন্ত নিচু গলায় গুনগুন করে কি যেন গাইতে লাগল। অদ্ভুত অপার্থিব কোনো-একটা সুর—যা এ-জগতের কিছু নয়। অন্য কোনো ভুবনের। রান্নাঘর থেকে জিতু ডাকতে লাগল, 'ও ভাইজান, ভাইজান।'

আনিস রানুকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে গায়ের চাদর টেনে দিল। জিতুকে বলল, এ ঘরে

যেন না আসে। তারপর নেমে গেল নিচে, বাড়িঅলার মেয়েটিকে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে।

নীলু এল সঙ্গে সঙ্গে। আনিস দেখল রানু শিশুর মতো ঘুমোচ্ছে। জিতু মিয়া শুধু জেগে আছে। কাঁদছে ব্যাকুল হয়ে। নীলুর সঙ্গে তার বাবাও আসছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'হয়েছেটা কি?' আনিস ভাঙা গলায় বলল, 'বুঝতে পারছি না, কেমন যেন করছে।'

'কী করছে?'

আনিস জবাব দিল না। নীলু বলল, 'বাবা তুমি শুয়ে থাক গিয়ে, আমি এখানে থাকি। রাত তো বেশি নেই।' ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিচে নেমে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'হাসপাতালে নিতে হলে বলবেন, ড্রাইভারকে ডেকে তুলব।'

'জি আচ্ছা।'

রানু বাকি রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল। এক বারও জাগল না। নীলু সারাক্ষণ তার পাশে রইল। আনিসের সঙ্গে তার কথাবার্তা কিছু হল না। আনিস বসার ঘরের সোফায় বসে ঝিমুতে লাগল।

## ১৩

মিসির আলি লোকটির ধৈর্য প্রায় সীমাহীন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি দ্বিতীয় দফায় রানুদের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক ভদ্রলোক জয়নাল সাহেব। উদ্দেশ্য রুকমিনী দেবীর মন্দির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

জয়নাল সাহেব মন্দির দেখে বিশেষ উল্লসিত হলেন না। তিনশ বৎসরের বেশি এর বয়স হবে না। এ রকম ভগ্নস্তূপ এ-দেশে অসংখ্য আছে। মিসির আলি বললেন, 'তেমন পুরনো নয় বলছেন?'

'না রে ভাই। ইটের সাইজ দেখলেই বুঝবেন। ভেঙেটেঙে কী অবস্থা হয়েছে দেখেন!'

'যত্ন হয়নি। মন্দির যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি হয়তো মারা গেছেন কিংবা তাঁর উৎসাহ মিইয়ে গেছে।'

গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া গেল— পালবাবুদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। পালরা স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরপরই তাদের ভাগ্য-বিপর্যয় শুরু হয়। তিন-চার বছরের মধ্যে পালরা নির্বংশ হয়ে পড়ে। দেবীকে তুষ্ট করার জন্য তখন এক রাতে কুমারী বলির আয়োজন করা হয়। বারো বছরের একটা কুমারীকন্যাকে অমাবস্যার রাত্রিতে মন্দিরের সামনে বলি দেওয়া হয়। দেবীর তুষ্টি হয় না তাতেও। পাথরের মূর্তি এত সহজে বোধহয় তুষ্ট হয় না। তবে গ্রামের মানুষেরা নাকি বলি দেওয়া মেয়েটিকে এর পর থেকে গ্রামময় ছোটোছুটি করতে দেখে। ময়মনসিংহ থেকে ইংরেজ পুলিশ সুপার এসে মন্দির তালাবদ্ধ করে পালদের দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

পালরা অত্যন্ত ক্ষমতাবান ছিল। কাজেই ছাড়া পেয়ে এক সময় আবার গ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু মন্দির তালাবদ্ধই পড়ে থাকে।

ইতিহাস এইটুকুই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা গেল না। দু-এক ঘর নিম্নবর্ণের হিন্দু যারা ছিল, তারা বিশেষ কিছু বলতে পারে না। হরিশ মণ্ডল বলল, 'বাবু, আমরা কেউ ঐ দিকে যাই না। ঐ মন্দিরে গেলে নির্বংশ হতে হয়, কে যাবে বলেন?'

'আপনি তো শিক্ষিত লোক, এইসব বিশ্বাস করেন?'

'করি না, কিন্তু যাইও না।'

'মূর্তিটা আপনি দেখেছেন?'

'আমি দেখি নাই, তবে আমার জ্যাঠা দেখেছে।'

'তিনি কি নির্বংশ হয়েছেন?'

'না, তাঁর তিন ছেলে। এক ছেলে নান্দিনা হাই স্কুলের হেড মাস্টার।'

'মূর্তিটা কেমন ছিল বলতে পারেন?'

'শ্বেতপাথরের মূর্তি। কৃষ্ণনগরের কারিগরের তৈরি। একটা হাত ভাঙা ছিল।'

'মূর্তি নাকি হঠাৎ উধাও হয়েছে?'

'কেউ চুরিটুরি করে নিয়ে বিক্রি করে ফেলেছে। গ্রামে চোরের তো অভাব নাই। এ-রকম মূর্তিতে হাজারখানিক টাকা হেসেখেলে আসবে। সাহেবরা নগদ দাম দিয়ে কিনবে।'

'আচ্ছা, একটা বাচ্চা মেয়েকে যে বলি দেওয়া হয়েছিল, সে নাকি অমাবস্যার রাত্রে ঘুরে

বেড়ায়?'

'বলে তো সবাই। চিৎকার করে কাঁদে। আমি শুনি নাই। অনেকে শুনেছে।'

অমাবস্যার জন্যে মিসির আলিকে তিন দিন অপেক্ষা করতে হল। তিনি অমাবস্যার রাত্রে একটা পাঁচ-ব্যাটারির টর্চ আর একটা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে রইলেন। তিনি কিছুই শুনলেন না। শেয়ালের ডাক শোনা গেল অবশ্যি। শেষ রাত্রের দিকে প্রচণ্ড বাতাস বইতে লাগল। বাতাসে শিস দেবার মতো শব্দ হল। সে-সব নিতান্তই লৌকিক শব্দ। অন্য জগতের কিছু নয়। রাত শেষ হবার আগে-আগে বর্ষণ শুরু হল। ছাতা নিয়ে যাননি। মন্দিরের ছাদ ভাঙা। আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। মিসির আলি কাকভেজা হয়ে গেলেন।

ঢাকায় ফিরলেন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে। ডাক্তার পরীক্ষা করে শুকনো মুখে বললেন, 'মনে হচ্ছে নিউমোনিয়া। একটা লাংস এফেকটেড, ভোগাবে।'

মিসির আলিকে সত্যি-সত্যি ভোগাল। তিনি দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

## ১৪

বইপাড়াতে এ-সময় লোকজন তেমন থাকে না। আজ যেন আরো নির্জন। নীলু একা-একা কিছুক্ষণ হাঁটল। তার খুব ঘাম হচ্ছে। বারবার সবুজ রুমালটি বের করতে হচ্ছে। চারটা দশ বাজে। চিঠিতে লিখেছে সে চারটার মধ্যেই আসবে, কিন্তু আশপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু অবশ্যি কারো মুখের দিকে তাকাতেও পারছে না। কাউকে তাকাতে দেখলেই বুকের মধ্যে ধক করে উঠেছে।

নীলু একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। গল্পের বই তার তেমন ভাল লাগে না। ভাল লাগে বিলুর। বিলুর জন্যে একটা কিছু কিনলে হয়। কিন্তু কি কিনবে? সবই হয়তো ওর পড়া। ঐ দিন শীর্ষেন্দুর কী-একটা বইয়ের কথা বলছিল। নামটা মনে নেই।

'আচ্ছা, আপনাদের কাছে শীর্ষেন্দুর কোনো বই আছে?'

'জি না। আমরা বিদেশী বই রাখি না।'

নীলু অন্য একটা ঘরে ঢুকল। শুধু-শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে একটা কবিতার বই কিনে ফেলল। অপরিচিত কবি, তবে প্রচ্ছদটি সুন্দর। একটি মেয়ের ছবি। সুন্দর ছবি। নামটি সুন্দর--- 'প্রেম নেই'। কেমন অদ্ভুত নাম। 'প্রেম নেই' আবার কী? প্রেম থাকবে না কেন?

দাড়িঅলা একজন রোগা ভদ্রলোক তখন থেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে। লোকটির কাঁধে একটি ব্যাগ। এই কি সে! নীলুর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। নীলু বইয়ের দাম দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল। তার পেছনে ফেরবারও সাহস নেই। পেছনে ফিরলেই সে হয়তো দেখবে বুড়ো দাড়িঅলা গুটিগুটি আসছে।

না, লোকটি আসছে না। নীলুর মনে হল, ভয়ানক মোটা এবং বেঁটে একজন কে যে তাকে অনুসরণ করছে। তার দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু আসছে তার পিছুপিছু। নীলুর তৃষ্ণা পেয়ে গেল। বড্ড টেনশান। বাড়ি ফিরে গেলে কেমন হয়? কিন্তু বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। নীলু ঘড়ি দেখল, পাঁচটা পাঁচ। তার মানে কি যে সে আসবে না? কথা ছিল নীলু থাকবে ঠিক এক ঘণ্টা।

সে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। ভাল হয়েছে। দেখা না-হওয়াটাই বোধ হয় ভাল। দেখা হবার মধ্যে একটা আশাভঙ্গের ব্যাপার আছে। না-দেখার রহস্যময়তাটাই না হয় থাকুক। নীলু ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

'নীলু।'

নীলু দাঁড়িয়ে পড়ল।

'একটু দেরি হয়ে গেল। তুমি ভাল আছ নীলু?'

চকচকে লাল টাই-পরা যে ছেলেটি হাসছে, সে কে? লম্বা স্বাস্থ্যবান। একটি তরুণ। ঝলমল করছে। তার লাল টাই উড়ছে। বাতাসে মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে। সেন্টের গন্ধ। পুরুষ মানুষের গা থেকে আসা সেন্টের গন্ধ নীলুর পছন্দ নয়। কিন্তু আজ এত ভাল লাগছে কেন?

'চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বল।'

'আপনি বলেছিলেন আপনি বুড়ো।'

'আমরা সবাই কিছু-কিছু মিথ্যা বলি। আমাকে নীলু নামের একটি মেয়ে লিখেছিল, সে দেখতে কুৎসিত।'

লোকটি হাসছে হা হা করে। এত সুন্দর করেও মানুষ হাসতে পারে! নীলুর এক ধরনের কষ্ট

হতে লাগল। মনে হতে লাগল সমস্তটাই একটা সুন্দর স্বপ্ন, খুবই ক্ষণস্থায়ী। যেন এক্ষুণি স্বপ্ন ভেঙে যাবে। নীলু দেখবে সে জেগে উঠেছে, পাশের বিছানায় বিলু ঘুমাচ্ছে। মশারি না-ফেলে। কিন্তু সে-রকম কিছু হল না। ছেলেটি হাসিমুখে বলল, 'কোথাও বসে এক কাপ চা খেলে কেমন হয়? খাবে?'

নীলু মাথা নাড়ল— সে খাবে।

'তুমি কিন্তু সবুজ রুমালটি ব্যাগে ভরে ফেলছ। আমি যেতে ঠিক সাহস পাচ্ছি না।'

নীলু অস্বাভাবিক ব্যস্ত হয়ে রুমাল বের করতে লাগল। একটা লিপস্টিক, একটা ছোট চিরুনি, কিছু খুচরো পয়সা গড়িয়ে পড়ল নিচে। ছেলেটি হাসিমুখে সেগুলি কুড়োচ্ছে। নীলু মনে-মনে বলল— যেন এটা স্বপ্ন না হয়। আর স্বপ্ন হলেও যেন স্বপ্নটা অনেকক্ষণ থাকে। নীলুর খুব কান্না পেতে লাগল।

নিউ মার্কেটের ভেতর চা খাওয়ার তেমন ভাল জায়গা নেই। ওরা বলাকা বিলডিংয়ের দোতলায় গেল। চমৎকার জায়গা! অন্ধকার-অন্ধকার চারদিকে। পরিচ্ছন্ন টেবিল। সুন্দর একটি মিউজিক হচ্ছে।

'চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে নীলু?'

'নাহ্।'

'এরা ভালো সমুচা করে। সমুচা দিতে বলি? আমার খিদে পেয়েছে। কি, বলব?'

'বলুন।'

ছেলেটি হাসল। নীলুর খুব ইচ্ছা করছিল, জিজ্ঞেস করে— হাসছ কেন তুমি? আমি কি হাস্যকর কিছু করেছি? কিন্তু নীলু কিছু বলল না। ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, 'আসলে আমি বিজ্ঞাপনটা মজা করবার জন্যে দিয়েছিলাম, কেউ জবাব দেবে ভাবিনি।'

'আমি ছাড়া কেউ কি লিখেছিল?

'তা লিখেছে। মনে হচ্ছে এ-দেশের মেয়েদেব কাজকর্ম বিশেষ নেই। সুযোগ পেলেই ওরা চিঠি লেখে। এই কথা বললাম বলে তুমি আবার রাগ করলে না তো?'

'নাহ্।'

'গুড। আমি কিন্তু শুধু তোমার চিঠির জবাব দিয়েছি। অন্য কারো চিঠির জবাব দিইনি। আমার কথা বিশ্বাস করছ তো?'

'করছি।'

বেয়ারা চায়ের পট দিয়ে গেল। ছেলেটি বলল, 'দাও, আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি। ঘরে বানাবে মেয়েরা, কিন্তু বাইরে পুরুষেরা— এ-ই নিয়ম।'

নীলু লক্ষ্য করল, ছেলেটি তার কাপে তিন চামচ চিনি দিয়েছে। নীলু একবার লিখেছে সে চায়ে তিন চামচ চিনি খায়। ছেলেটি সেটা মনে রেখেছে। কী আশ্চর্য!

'চায়ে এতো চিনি খাওয়া কিন্তু ভাল না।'

নীলু কিছু বলল না।

'এর পর থেকে চিনি কম খাবে।'

নীলু ঘাড় নাড়ল।

তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইল। নীলু একবার বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, উঠি?'

ছেলেটি বলল, 'আরেকটু বস, আমি বাসায় পৌঁছে দেব, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে।' নীলু আর কিছু বলল না।

'একটু দেরি হলে তোমাকে আবার বাসায় বকবে না তো?'

'নাহ্, বকবে না। আমি মাঝে-মাঝে অনেক রাত করে বাসায় ফিরি।'

'সেটা ঠিক না নীলু। শহর বড় হচ্ছে, ক্রাইম বাড়ছে। ঠিক না?

'হ্যাঁ, ঠিক।'

'ঐ দিন কী হল জান— আমার পরিচিত এক মহিলার কান থেকে টেনে দুল নিয়ে গেছে, রক্তারক্তি কাণ্ড!'

'আমি বাইরে গেলে গয়নাটয়না পরি না।'

'না-পরাই উচিত। আচ্ছা নীলু, তুমি কি আজ তোমার বাবার সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবে?'

'আপনি যদি চান, দেব।'

'আমি নিশ্চয়ই চাই। তুমি কি চাও?'

'চাই' বলতে গিয়ে নীলুর চোখ ভিজে উঠল। ছেলেটিকে এখন কত-না পরিচিত মনে হচ্ছে! সে যদি এখন হাত বাড়িয়ে নীলুর হাত স্পর্শ করে, তাহলে কেমন লাগবে নীলুর? ভালই লাগবে। কিন্তু ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র। সে এমন কিছুই করবে না।

'নীলু, আমি তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছিলাম। কিন্তু তার আগে বল, তুমি কী এনেছ? তুমি বলেছিলে লাল টাই আনবে। ভুলে গেছ, না?'

'না, ভুলব কেন?'

'আমি তোমার জন্যেই লাল টাই পরে এসেছি। যদিও লাল রঙ আমার পছন্দ নয়। আমার পছন্দ হচ্ছে— নীল।'

'নীল আমারও পছন্দ।'

'তবে হালকা নীল, কড়া নীল নয়।'

নীলু এই প্রথম অল্প হাসল। হালকা নীল তার নিজেরও পছন্দ। ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, 'আমার সবচে অপছন্দ হচ্ছে সবুজ রঙ। কিন্তু, দেখ, আজ সবুজ রঙটাও খারাপ লাগছে না।'

তারা উঠে দাঁড়াল সাড়ে আটটার দিকে। হেঁটে-হেঁটে এল নিউমার্কেটের গেটে। ছোট্ট একটা হোন্ডা সিভিক সেখানে পার্ক করা। ছেলেটি ঘড়ি দেখে বলল, 'রাত কি বেশি হয়ে গেল নীলু?'

'না, বেশি হয়নি।'

'তোমার বাবা দুশ্চিন্তা না-করলে হয়। আমি চাই না আমার জন্যে কেউ বকা খাক। অবশি এক-আধ দিন বকা খেলে কিছু যায়-আসে না, কি বল?'

নীলু হাসল। ছেলেটিও হাসল। মার্জিত হাসি।

'সরাসরি বাসায় যাবে, নাকি যাবার আগে আইসক্রিম খাবে? ধানমণ্ডিতে একটা ভাল আইসক্রিমের দোকান দিয়েছে।'

'আজ আর যাবনা।'

'ঠিক আছে, চল বাসায় পৌঁছে দিই।'

ছেলেটি নীলুকে তাদের গেটের কাছে নামিয়ে দিল। নীলুর খুব ইচ্ছে করছিল তাকে বসতে বলে, কিন্তু তার বড্ড লজ্জা করল। বিলু নানান প্রশ্ন করবে।

## ১৫

'স্যার, ভেতরে আসব?'

'এস। কী ব্যাপার?'

মিসির আলি মেয়েটিকে ঠিক চিনতে পারলেন না। তিনি কখনো তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের চিনতে পারেন না।

'স্যার, আমার নাম নীলু, নীলুফার।'

'ও, আচ্ছা।'

মিসির আলি পরিচিত ভঙ্গিতে হাসলেন। কিন্তু নামটি তাঁর কাছে অপরিচিত লাগছে। এও এক সমস্যা। কারো নাম তিনি মনে রাখতে পারেন না। তাঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। নাম মনে না-করতে পারার একটিই কারণ— মানুষের প্রতি তাঁর আগ্রহ নেই। আগ্রহ থাকলে নাম মনে থাকত।

'স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি সেকেন্ড ইয়ারের। এক দিন এসেছিলাম আমরা চার বন্ধু।'

'ও হ্যাঁ। এসেছিলে তোমরা। মনে পড়ছে। আজ কী ব্যাপার?'

মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল। তার মানে কী? কমবয়েসী মেয়েদের তিনি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন। তরলমতি মেয়েরা মাঝে-মাঝে অনেক অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে বসে।

'তোমার কী ব্যাপার, বল।'

'স্যার, আমি ঐ ইএসপির টেস্টটা আবার দিতে চাই।'

'একবার তো দিয়েছ। আবার কেন?'

মিসির আলি বিস্মিত হলেন। এই মেয়েটির মতিগতি তিনি বুঝতে পারছেন না।

'স্যার, আমার মনে হয়, এবার পরীক্ষা করলে দেখা যাবে— আমার ইএসপি আছে।'

'এ-রকম মনে হবার কারণ কী?'

মেয়েটি উত্তর না-দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। লক্ষণ ভাল নয়। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, 'এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি। অন্যএক দিন এস।'

মেয়েটি তবুও কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল।

'তুমি কি অন্য কিছু বলতে চাও?'

'জি না স্যার। আমি যাই। স্লামালিকুম।'

মিসির আলি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। এ-মেয়েটিকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। এরা সহজেই একটা ঝামেলা বাধিয়ে দিতে পারে। এ-রকম সুযোগ দেওয়া ঠিক না।

বারোটায় একটা ক্লাস ছিল। মিসির আলি গিয়ে দেখলেন কোনো ছাত্র-ছাত্রী নেই। কোনো স্ট্রাইক হচ্ছে কি? এ-রকম কিছু শোনেননি। সামনে হয়ত টার্ম পরীক্ষা আছে। টার্ম পরীক্ষা থাকলে ছাত্ররা দল বেঁধে আসা বন্ধ করে দেয়। মিসির আলি ভ্রূ কুঁচকে খালি ক্লাসে মিনিট পাঁচেক বসে রইলেন। গত রাতে অসুস্থ শরীরে এই ক্লাসটির জন্যে পড়াশোনা করেছেন। এ-অবস্থা হবে জানলে সকাল-সকাল শুয়ে পড়তে পারতেন। ছাত্রশূন্য একটি ক্লাসে তিনি খাতাপত্র নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন– হাস্যকর দৃশ্য। অনেকেই করিডোর দিয়ে হাঁটবাব সময় তাঁকে কৌতূহলী হয়ে দেখল। পাগলটাগল ভাবছে বোধহয়। মিসির আলি উঠে পড়লেন।

আজকের দিনটিই শুরু হয়েছে খারাপভাবে। একটি কাজও ঠিকমত হচ্ছে না। মিসির আলি ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। তাঁর কপালের মাঝখানে ব্যথা শুরু হল। এই উপসর্গটি নতুন। ব্লাড-প্রেশারট্রেশার হয়েছে বোধ হয়। ডাক্তার দেখাতে হবে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন তিনটার দিকে। এই অসময়েও বসার ঘরে কে যেন বসে আছে। সমস্ত দিনটিই যে খারাপ যাবে, এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। গ্রামের বাড়ি থেকে টাকা-পয়সা চাইতে কেউ এসেছে নির্ঘাত।

'কে?'

'জি, আমি আনিস।'

'আনিস সাহেব, আপনি এই সময়ে? অফিস নেই?'

'ছুটি নিয়ে এলাম।'

'ব্যাপার কী?'

'রানুর শরীরটা বেশি খারাপ। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।'

'ভালই করেছেন। বসেন, চা-টা দিয়েছে?'

'জি, চা খেয়েছি। আপনার ভাই ছিলেন এতক্ষণ।'

'বসুন, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।'

লোকটি জড়সড় হয়ে বসে আছে। মিসির আলি লক্ষ্য করলেন, তার চোখের নিচে কালি পড়েছে। তার মানে রাতে ঘুমোতে পারছে না। এ রকম হওয়ার কথা নয়। মিসির আলি চিন্তিত মুখে ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর ফিরে আসতে অনেক সময় লাগল।

'এখন বলেন, ব্যাপার কি?'

আনিস ইতস্তত করে বলল, 'ভূতপ্রেত বলে সত্যি কিছু আছে?'

'এই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

আনিস মুখ কালো করে বলল, 'অনেক রকম কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। আমি কনফিউজড হয়ে গেছি।'

'অর্থাৎ এখন ভূতপেত বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন?'

আনিস চুপ করে রইল।

'এর কারণটা বলেন, শুনি।'

'নানারকম শব্দ হয় ঘরে।'

'তাই নাকি? আপনি নিজে শোনেন?'

'জি, শুনি। গন্ধও পাই, ফুলের গন্ধ।'

'আপনি পান, না আপনার স্ত্রী পান?'

'রানু প্রথম পায়, তারপর আমি পাই।'

মিসির আলি চুরুট ধরালেন। আনিস বলল, 'গত রাতে ঘরের মধ্যে কেউ যেন নূপুর পায়ে হাঁটছিল।'

'এই নূপুরের শব্দ প্রথম কে শোনে? আপনার স্ত্রী?'

'জি।'

'তারপর আপনাকে বলার পর আপনি শুনতে পান।'

'জি।'

'আনিস সাহেব, এটাকে বলা হয় ইউডিউসড অডিটরি হেলুসিনেশন। আপনার মন দুর্বল। আপনার স্ত্রী যখন বলে শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, তখন আপনিও তা শুনতে থাকেন। ব্যাপারটি আপনার মনোজগতে। আসলে কোনো শব্দ হচ্ছে না।'

আনিস দীর্ঘ সময় চুপ করে বলল, 'আপনি যদি একবার আসেন আমাদের বাসায়, আপনি নিজেও শুনবেন।'

'না ভাই, আমি শুনব না। আমি খুব শক্ত ধরনের মানুষ। খুবই যুক্তিবাদী লোক আমি।'

'আপনি আসেন-না একবার।'

'ঠিক আছে, যাব।'

'কবে আসবেন? আজ আসতে পারবেন?'

'আমি কাল-পরশুর মধ্যে একবার যাব।'

'আমাদের বাড়িঅলার খুব সুন্দর ফুলের বাগান আছে। প্রচুর গোলাপও আছে। বিকেলের দিকে গেলে সেটাও দেখতে পারবেন।'

মিসির আলি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বড় ফুলের বাগান?'

'জি।'

'আনিস সাহেব, এমন কি হতে পারে না, বাতাসে নিচের বাগান থেকে ফুলের সৌরভ ভেসে আসে? সেই সৌরভকে আপনি আধ্যাত্মিক রূপ দেন। হতে পারে?'

'পারে, কিন্তু শব্দটা?'

'কোনো একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। মস্তিষ্ক খুব অদ্ভুত জিনিস, আনিস সাহেব। সে আপনাকে এমন সব জিনিস দেখাতে বা শোনাতে পারে, যার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনি কি উঠছেন?'

'জি।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, যান। আমার নিজের মাথা ধরেছে। দুটো পেরাসিটামল খেয়েছি, লাভ হচ্ছে না। জ্বরও আসছে বলে মনে হয়। শরীরটা গেছে। বেশি দিন বাঁচব না।'

## ১৬

পত্রিকা খুলে নীলু অবাক হল। সেই বিজ্ঞাপনটি আবার ছাপা হয়েছে। কথাগুলি এক। জিপিও বক্স নাম্বারও ৭৩। শিরোনামটিও আগের মতো--- কেউ কি আসবেন?' এর মানে কী? নীলুর ধারণা ছিল, বিজ্ঞাপনটি আর কোনো দিন ছাপা হবে না। এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন তা মনে হচ্ছে না। নীলুর ইচ্ছা হল দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ কাঁদার। সে মুখ কালো করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় তার জন্যে একটা বড় ধরনের চমক অপেক্ষা করছিল। মিসির আলি সাহেব দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, 'এখানে কি আনিস সাহেব থাকেন?'

'স্যার আপনি? আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'ও ইয়ে, তুমি। আমার ছাত্রী? কোন ইয়ার?'

'থার্ড ইয়ার স্যার। নীলু আমার নাম। নীলুফার।'

'ও আচ্ছা। নীলুফার— তোমাদের তেতলায় আনিস সাহেব থাকেন নাকি?'

'জি।'

'তাঁর কাছে এসেছি। উঠবার রাস্তা কোন দিকে?'

নীলু তাঁকে সঙ্গে করে তিনতলায় নিয়ে গেল।

'ফেরবার পথে আমাদের বাসা হয়ে যাবেন স্যার। যেতেই হবে।'

'আচ্ছা, দেখি।'

'দেখাদেখি না স্যার, আপনি আসবেন।'

আনিস ঘরে ছিল না। রানু তাঁকে নিয়ে বসাল। সে খুবই অবাক হয়েছে। মিসির আলি বললেন, 'খুব অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে?'

'আপনি-আপনি করে বলছেন কেন?'

'ও আচ্ছা, তুমি-তুমি করে বলতাম, তাই না? ঠিক আছে। এখন বল, আমাকে দেখে অবাক হয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

'খুব অবাক হয়েছ?'

'জি। আপনি আসবেন ভাবতেই পারিনি।'

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বললেন, 'তুমি তো শুনেছি সব কিছু আগে বলে দিতে পার, এটি তো প্যারার কথা ছিল।'

'রানু থেমে-থেমে বলল, 'আপনি লোকটি বেশ অদ্ভুত!'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আপনার যুক্তিও খুব ভাল, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়!'

'বিশ্বাস করলেই পার। আনিস সাহেব কখন আসবেন?'

'এসে পড়বে।'

'আমাকে একটু চা খাওয়াও। আর শোন, তোমাদের একটা কাজের লোক আছে নাকি? ওকে পাঠাও তো আমার কাছে।'

'ওকে কি জন্যে?'

'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

মিসির আলি : কি নাম?'

জিতু : জিতু মিয়া।

মিসির আলি : দেশ কোথায়?'

জিতু : টাঙ্গাইল।

মিসির আলি : শুনলাম দু'এক দিন আগে তুমি নাকি রাতের বেলা কি একটা দেখে ভয় পেয়েছ?

জিতু : জি, পাইছি।

মিসির আলি : কী দেখেছ?

জিতু : পাকের ঘরে একজন মেয়েমানুস। হাঁটাচলা করতাছে।

মিসির আলি : সুন্দরী?

জিতু : জি, খুব সুন্দর!

মিসির আলি : রান্নাঘরে তো বাতি জ্বালানো ছিল?

জিতু : জি না।

মিসির আলি : অন্ধকারে তুমি মানুষ কীভাবে দেখলে?

জিতু : নিশ্চুপ।

মিসির আলি : আমার মনে হয় জিনিসটা তুমি স্বপ্নে দেখেছ।

জিতু : নিশ্চুপ।

মিসির আলি : আচ্ছা জিতু মিয়া, তুমি যাও। শোন, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এস আমার জন্যে। ক্যাপস্টান। নাও, টাকাটাও নাও।

জিতু মিয়া চলে গেল। রানু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ইউনিভার্সিটির সব মাস্টাররাই কি আপনার মতো বুদ্ধিমান?'

'না। আমার নিজের বুদ্ধি একটু বেশি। আচ্ছা, এখন যে খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে, এই শব্দটার কথাই কি আনিস সাহেব আমাকে বলেন?'

রানু জবাব দিল না। মিসির আলি কান পেতে শুনলেন।

'শব্দটা তো বেশ স্পষ্ট। রান্নাঘর থেকে আসছে না?'

'হুঁ।'

'এই শব্দটার কথাই আনিস সাহেব বলেন, তাই না?'

'বোধ হয়। আপনি রান্নাঘর দেখবেন? আপনি যাওয়ামাত্রই শব্দ থেমে যাবে।'

'শব্দটা বেশির ভাগই রান্নাঘরে হয়?'

'জি।'

'ইঁদুর-মারা কিছু বিষ ছড়িয়ে দিও, আর শব্দ হবে না। ওটা ইঁদুরের শব্দ। রান্নাঘরে খাবারের লোভে ঘোরাঘুরি করে। সেজন্যে শব্দটা বেশি হয় রান্নাঘরে। বুঝলে?'

'হুঁ।'

'যুক্তিটা পছন্দ হচ্ছে না মনে হয়।'

'যুক্তি ভালই। আরেক কাপ চা খাবেন?'

'নাহ্, এখন উঠব। আনিস সাহেব মনে হয় আজ আর আসবেন না।'

'না, আপনি আরেকটু বসুন। আপনাকে একটা গল্প বলব।'

'আজ আর না, রানু। মাথা ধরেছে।'

'মাথা ধরলেও আপনাকে শুনতে হবে। বসুন, আমি চা আনছি। প্যারাসিটামল খাবেন?'

'ঠিক আছে।'

চা আসবার আগেই আনিস এসে পড়ল। তার অফিসে নাকি কি-একটা ঝামেলা হয়েছে। দশ হাজার টাকার একটা চেকের হিসেবে গণ্ডগোল। চেকটা ইস্যু হয়েছে আনিসের অফিস থেকে। আনিসের চোখে-মুখে ক্লান্তি। মিসির আলি বললেন, 'আপনি বিশ্রামটিশ্রাম করেন। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি রানুর কাছ থেকে একটা গল্প শুনব।'

'কী গল্প?'

'জানি না কি গল্প। ভয়ের কিছু হবে।'

রানু বলল, 'না, ভয়ের না। তুমি গোসলটোসল সেরে এসে চা খাও।'

'আমি গল্পটা শুনতে পারব না?'

'নাহ্। সব গল্প সবার জন্যে না?'

আনিসের কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল। সে কিছু বলল না। বাথরুমে ঢুকে পড়ল। রানু তার গল্প শুরু করল খুব শান্ত গলায়। মিসির আলি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলেন।

রানুর দ্বিতীয় গল্প

আমার তখন মাত্র বিয়ে হয়েছে। সপ্তাহখানেকও হয়নি। সেই সময় এক কাণ্ড হল।

আমার বিয়ে হয়েছিল শ্রাবন মাসের ছ'তারিখে। ঘটনাটা ঘটল শ্রাবণ মাসের চৌদ্দ তারিখ। সকালবেলা আমার এক মামাশ্বশুর এসে ওকে নিয়ে গেলেন মাছ মারতে। নৌকায় করে মাছ মারা হবে। নৌকা বড় গাঙ দিয়ে যাবে সোনাপাতার বিলে। বঁড়শি ফেললেই সেখানে বড়-বড় বোয়াল মাছ পাওয়া যায়। বর্ষাকালের বোয়ালের কোনো স্বাদ নেই জানেন তো? কিন্তু সোনাপাতার বোয়ালের বর্ষাকালেই নাকি সবচেয়ে বেশি তেল হয়।

দুপুরের পর থেকেই হঠাৎ করে খুব দিন-খারাপ হল। বিকেল থেকে বাতাস বইতে লাগল। আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ওরা আর ফেরে না। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল।

আমাদের বাড়িটা হচ্ছে কাঠের। কাঠের দোতলা। আমি একা-একা দোতলায় উঠে গেলাম। দোতলার কোণার দিকের একটা ঘরে আজেবাজে জিনিস রাখা হয় স্টোররুমের মতো। কেউ সেখানে যায়টায় না। আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করলাম। তখন হঠাৎ একটি মেয়ের কথা শুনতে পেলাম। মেয়েটি খুব নিচু স্বরে বলল— সোনাপাতার বিলে ওদের নৌকা ডুবে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই ডুবেছে। এটা শোনার পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

মিসির আলি বললেন, 'একটুকুই গল্প?'

'হ্যাঁ।'

'গল্পের কোনো বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম না।'

'বিশেষত্ব হচ্ছে, সেদিন সন্ধ্যায় ওদের সত্যি-সত্যি নৌকাডুবি হয়েছিল। এর কোনো ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে?'

'আছে। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, কাজেই তোমার মনে ছিল অমঙ্গলের আশঙ্কা। অবচেতন মনে ছিল নৌকাডুবির কথা। অবচেতন মনই কথা বলছে তোমার সঙ্গে। মানুষের মন খুব বিচিত্র রানু। আমি উঠলাম।'

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'একতলার নীলু নামের যে মেয়েটি

আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে আপনার জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করছে। যাবার সময় ওর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।'

'মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তাতে কি?'

রানু বলল, 'নীলু এই মুহূর্তে কী ভাবছে তা আমি বলতে পারব। ওকে জিজ্ঞেস করলেই দেখবেন আমি ঠিকই বলেছি। আমি অনেক কিছুই বলতে পারি।'

'নীলু কী ভাবছে?'

'নীলু ভাবছে একজন অত্যন্ত সুপুরুষ যুবকের কথা।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক। একজন অবিবাহিত যুবতী একজন সুপুরুষ যুবকের কথাই ভাবে। এটা বলার জন্যে কোনো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দরকার হয় না, রানু।'

মিসির আলি নেমে গেলেন। নীলু সত্যি-সত্যি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে খুব অনুরোধ করল যাতে স্যার এক কাপ চা খেয়ে যান। কিন্তু মিসির আলি বসলেন না। তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। প্যারাসিটামল কাজ করছে না। সারা জীবন তিনি এত ওষুধ খেয়েছেন যে ওষুধ তাঁর ওপর এখন আর কাজ করছে না। খুব খারাপ লক্ষণ।

## ১৭

নীলুর বাবা বারান্দায় বসে ছিলেন। নীলুকে বেরুতে দেখে তিনি ডাকলেন, 'নীলু কোথায় যাচ্ছ মা?'

'একটু বাইরে যাচ্ছি।'

কিন্তু এইটুকু বলতেই নীলুর গলা কেঁপে গেল। গাল লাল হল। তিনি তা লক্ষ্য করলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, 'বাইরে কোথায়?' নীলু জবাব দিল না।

'কখন ফিরবে মা?'

'আটটা বাজার আগেই ফিরব।'

'গাড়ি নিয়ে যাও।'

'গাড়ি লাগবে না। তোমার কিছু লাগবে বাবা, চা বানিয়ে দিয়ে যাব?'

'না, চা লাগবে না। একটু সকাল-সকাল ফিরিস মা। শরীরটা ভাল না।'

'সকাল-সকালই ফিরব।'

বিকেলের আলো নরম হয়ে এসেছে। সব কিছু দেখতে অন্য রকম লাগল নীলুর চোখে। নিউ মার্কেটের পরিচিত ঘরগুলি যেন অচেনা। যেন ওদের এক ধরনের রহস্যময়তা ঘিরে আছে।

'কেমন আছ নীলু?'

নীলু তৎক্ষণাৎ তাকাতে পারল না। তার লজ্জা করতে লাগল। তার ভয় ছিল আজ হয়তো সে আসবে না। প্রিয়জনদের দেখা তো এত সহজে পাওয়া যায় না।

'আজ তুমি দেরি করে এসেছ। পাঁচ মিনিট দেরি। তোমার তার জন্যে শাস্তি হওয়া দরকার।'

'কি শাস্তি?'

সেটা আমরা চা খেতে-খেতে ঠিক করব। খুব চায়ের পিপাসা হয়েছে।'

'কোথায় চা খাবেন?'

'এইখানে কোথাও। আর শোন নীলু, চা খেতে-খেতে তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। খুব জরুরি কথা।'

'এখন বলুন। হাঁটতে-হাঁটতে বলুন।'

'নাহ্। এই কথা হাঁটতে-হাঁটতে বলা যায় না। বলতে হয় মুখোমুখি বসে। চোখের দিকে তাকিয়ে।'

নীলুর কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমল। নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। সে কোনোমতে বলল, 'ঠিক আছে, চলুন কোথাও বসি।'

'কি বলতে চাই তা কি বুঝতে পারছ?'

'নাহ্।'

'বুঝতে পারছ, নীলু। মেয়েরা এইসব জিনিস খুব ভাল বুঝতে পারে।'

নীলুর গা কাঁপতে লাগল। অন্য এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে। অন্য এক ধরনের সুখ। মনে হচ্ছে

পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই। চারিদিকে সীমাহীন শূন্যতা। শুধু তারা দু'জন হাঁটছে। হেঁটেই চলেছে। কেমন যেন এক ধরনের কষ্টও হচ্ছে বুকের মধ্যে।

ওরা একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসল।

'চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে?'

'না।'

'খাও না! কিছু খাও।'

সে বয়কে ডেকে কী যেন বলল। নীলু শুনতে পেল না। কোনো কিছুতেই তার মন বসতে চায় না। সব তার কাছে অস্পষ্ট লাগছে।

'কী নীলু, কিছু বল। চুপ করে আছ কেন?'

'কী বলব?'

'যা ইচ্ছা বল।'

নীলু ইতস্তত করে বলল, 'আপনি ঐ বিজ্ঞাপনটা আবার দিয়েছেন কেন?'

সে হাসল শব্দ করে।

'দেখেছ বিজ্ঞাপনটা?'

'হ্যাঁ।'

'মন-খারাপ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।

সে আবার শব্দ করে হাসল। তার পর ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, 'আমি পত্রিকাব অফিসে টাকা দিয়ে রেখেছিলাম। কথা ছিল প্রতি মাসে দু'বার করে ছাপবে। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর তার আর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেটা বলা হয়নি। আগামীকাল বন্ধ করে দেব। এখন খুশি তো?'

নীলু জবাব দিল না।

'বল, এখন তুমি খুশি? এইভাবে চুপ করে থাকলে হবে না, কথা বলতে হবে। বল, তুমি খুশি?'

'হুঁ।'

সে আরেক দফা চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধবাল। খানিকক্ষণ দু'জনেই কোনো কথা বলল না। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবী বড় সুন্দর গ্রহ। এতে বেঁচে থাকতে সুখ আছে।

'নীলু।'

'হুঁ।'

'তোমাকে যে-কথাটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটি বলি?'

'বলুন।'

'দেখ নীলু, সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও এক সময় একজন অন্যজনকে চিনতে পারে না। আবার এমনও হয়, এক পলকের দেখায় একে অন্যকে চিনে ফেলে। ঠিক না?'

নীলু জবাব দিল না।

'বল, ঠিক না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমাকে প্রথম দিন থেকেই...'

সে চুপ করে গেল। নীলুর চোখে জল এল।

'নীলু, আজ যদি তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, তাহলে তোমার আপত্তি আছে?'

নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। জবাব দিল না। সে মুখ ঘুরিয়ে বসে ছিল। সে তার চোখের জল তাকে দেখাতে চায় না।

'বল নীলু, আপত্তি আছে?'

'আমাকে আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।'

'আটটার আগেই আমরা বাড়ি ফিরব। এস উঠি।'

সে নীলুর হাত ধরল। ভালবাসার স্পর্শ, যার জন্যে তরুণীরা সারা জীবন প্রতীক্ষা করে থাকে।

১৮

রানু আজ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন দিন প্রায় শেষ। আকাশ লালচে হতে শুরু করেছে। সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বারান্দায় বিলু হাঁটছে একা-একা। রানুর কেমন জানি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। যেন কোথাও কিছু একটা অস্বাভাবিকতা আছে, সে ধরতে পারছে না। নিচে থেকে বিলু ডাকল, 'রানু ভাবী, চা খেলে নেমে এস, চা হচ্ছে।'

'চা খাব না।'

'আস না বাবা! ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার বলব। কুইক।'

রানু নেমে গেল। তার মাথায় সূক্ষ্ম একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিছুই ভাল লাগছে না। বমিবমি ভাব হচ্ছে।

বারান্দায় নীলুর বাবাও ছিলেন। ওপর থেকে তাঁকে দেখা যায়নি। তিনি নরম স্বরে বললেন, 'এখন তুমি কেমন আছ মা?'

'জি, ভাল।'

'আমি আনিস সাহেবকে বলেছি বড় একজন ডাক্তার দেখাতে। পিজির একজন প্রফেসর আছেন, আমার আত্মীয়, তাঁকে আমি বলে দেখতে পারি। তুমি আলাপ করো আনিসের সাথে, কেমন?'

'জি, করব।'

বিলু বলল, 'বাবা, ঘরে গিয়ে তুমি চা খাও। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। আমরা দুজন বাগানে বসি।' ভদ্রলোক চলে গেলেন সঙ্গে-সঙ্গে।

রানু বলল, 'নীলু কোথায়?'

'ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছে।'

বন্ধুর বাড়ি যাওয়া এমন কোনো ব্যাপার নয়, তবু কেন জানি রানুর বুকে ধক করে একটা ধাক্কা লাগল। ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হতে লাগল মাথায়। বিলু বলল, 'রানু ভাবী, তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি। টপ সিক্রেট, কাউকে বলবে না।'

'না, বলব না।'

'ইভেন নীলু আপাকেও নয়। কারণ কথাটা তাকে নিয়েই।'

'ঠিক আছে, কাউকে বলব না।'

'নীলু আপা ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছে। আজকে সকালে টের পেয়েছি।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। নীলু আপার ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি। জনৈক ভদ্রলোক দারুণ সব রোমান্টিক চিঠি লিখেছে নীলু আপাকে। খুব লদকালদকি।'

বিলু হাসল। রানু কিছু বলল না। তার মাথার যন্ত্রণাটা ক্রমেই বাড়ছে।

'দু'একটা চিঠি পড়ে দেখতে চাও?'

'না, অন্যের চিঠি।'

'আহ্, পড় না, কেউ তো জানতে পারছে না। আমরা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট রাখব, তাহলেই তো হল।'

'না বিলু, আমি চিঠি পড়ব না।'

'পড়ব না বললে হবে না। পড়তে হবে। দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি। যে-আলো আছে তাতে দিব্যি পড়তে পারবে।'

বিলু ঘর থেকে চিঠি নিয়ে এল। রানু চিঠিটা হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিলু অবাক হয়ে বলল, 'কী হয়েছে?'

'না, কিছু হয়নি।'

'এ-রকম করছ কেন?'

'মাথা ধরেছে। বড্ড মাথা ধরেছে।'

'প্যারাসিটামল এনে দেব? তুমি চিঠিটা পড়ে আমাকে বল ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার কী ধারণা।'

রানু চিঠি পড়ল। বিলু বলল, 'বল, তোমার কী মনে হয়?'

রানু কিছু বলল না। এক হাতে মাথার চুল টেনে ধরল।

'তোমার কী হয়েছে?'

বড্ড শরীর খারাপ লাগছে। আমি এখন যাই।'

'চা খাবে না?'

'না। বিলু, নীলু কখন ফিরবে— বলে গেছে?'

'না। সন্ধ্যার আগে-আগেই ফিরবে বোধহয়। তোমার কী শরীর বেশি খারাপ লাগছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে যাও, শুয়ে থাক গিয়ে।'

রানু উপরে উঠে এল। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালাতে ইচ্ছে হল না। শুয়ে পড়ল বিছানায়। আনিস আজ ফিরতে দেরি করবে। তার অফিসে কি-সব নাকি ঝামেলা হচ্ছে। রানু ডাকল, 'জিতু জিতু মিয়া।' কেউ সাড়া দিল না। জিতু কি বাসায় নেই? 'জিতু— জিতু।' কোনো উত্তর নেই। জিতু মিয়া ইদানীং বেশ লায়েক হয়েছে। রানু কিছু বলে না বলেই হয়ত বিকেলে খেলতে গিয়ে সন্ধ্যা পার করে বাড়ি ফেরে। বকাঝকা তার গায়ে লাগে না।

রান্নাঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। ইঁদুর। নিশ্চয় ইঁদুর। তবু রানু বলল, 'কে?' খুটখুট শব্দ থেমে গেল। ইঁদুর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই গন্ধটা আবার পাওয়া যাচ্ছে। কড়া ফুলের গন্ধ। রানুর ইচ্ছে হল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। রানু দুর্বল গলায় ডাকল, 'জিতু, জিতু মিয়া।' আব ঠিক তখন কে-একজন ডাকল, 'রানু—বানু।' এই ডাক রানুর চেনা। এই জীবনে সে অনেক বার শুনেছে। তবে এটা কিছু নয়। প্রফেসর সাহেব বলছেন 'অডিটরি হেলুসিনেশন'। আসলেই তাই। এ ছাড়া আর কিছু নয়।

'রানু— রানু।'

'কে? তুমি কে?'

রানুর মনে হল কেউ-একজন যেন এগিয়ে আসছে। তার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ছোট্ট-ছোট্ট পা নিশ্চয়ই। হালকা শব্দ। পায়ে কি নূপুর আছে? নূপুর বাজছে?

'রানু।'

রানু চোখ বন্ধ করে ফেলল। এ-সব সত্যি নয়, চোখের ভুল। বানু দুর্বল গলায় বলল, 'তুমি কে?'

'আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?'

'না।'

কিশোরীর গলায় মৃদু হাসি শোনা গেল।

'তাকাও রানু। তাকালেই চিনবে।'

'আমি চিনতে চাই না।'

'তোমার বন্ধু নীলুর খুব বিপদ, রানু। একদিন তোমার যে বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল, তার চেয়েও অনেক বড় বিপদ।'

দরজায় ধাক্কা পড়েছে। জিতু এসেছে বোধহয়। রানু তাকাল, কোথাও কেউ নেই। ফুলের গন্ধ কমে আসছে। জিতু মিয়া বাইরে থেকে ডাকল, 'আম্মা, আম্মা।' রানু উঠে দরজা খুলল।

'আপনের কী হইছে?'

'কিছু হয়নি।'

রানু এসে শুয়ে পড়ল। তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। সে বিছানায় ছটফট করতে লাগল। কখন আসবে আনিস? কখন আসবে?

'জিতু।'

'জি।'

'নিচে গিয়ে দেখে আয় তো— নীলু ফিরেছে নাকি।'

জিতু ফিরে এসে জানাল, এখনও আসেনি। রানু একটি নিঃশ্বাস ফেলে ঘড়ি দেখল, আটটা বাজতে চার মিনিট বাকি। কখন আসবে আনিস?

## ১৯

সারাটা পথ নীলু চুপ করে রইল। একবার সে বলল, 'কি ব্যাপার, এত চুপচাপ যে?' নীলু তারও জবাব দিল না। তার কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সে আছে একটা ঘোরের মধ্যে।

'গান শুনবে? গান দেব?'

নীলু মাথা নাড়ল। সেটা হাঁ কি না, তাও স্পষ্ট হল না।

'কী গান শুনবে? কান্ট্রি মিউজিক? কান্ট্রি মিউজিকে কার গান তোমার পছন্দ?'

নীলু জবাব দিল না।

'আমার ফেবারিট হচ্ছে জন ডেনভার। জন ডেনভারের রকি মাউন্টেন হাই গানটা শুনেছ?'

'না।'

'খুব সুন্দর! অপূর্ব মেলোডি!'

সে ক্যাসেট টিপে দিতেই জন ডেনবারের অপূর্ব কণ্ঠ শোনা গেল, 'ক্যালিফোর্নিয়া রকি মাউন্টেন হাই।'

'কেমন লাগছে নীলু?'

'ভাল।'

'শুধু ভাল না। বেশ ভাল।'

সেও জন ডেনভারের সঙ্গে গুনগুন করতে লাগল। নীলুর মনে হল, ওর গানের গলাও তো চমৎকার! একবার ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করে--- গান জানেন কি না। কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। গাড়ি কোন দিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছে তাও সে লক্ষ্য করছে না। একবার শুধু ট্রাফিক সিগনালে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একজন ভিখিরি এসে ভিক্ষা চাইল। সে ধমকে উঠল কড়া গলায়। তারপর আবার গাড়ি চলল। নীলু ফিসফিস করে বলল, 'কটা বাজে?'

'সাতটা পঁয়ত্রিশ। তোমাকে আটটার আগেই পৌঁছে দেব।'

'আপনার বাড়ি মনে হয় অনেক দূর?'

'শহর থেকে একটু দূরে বাড়ি করেছি। কোলাহল ভাল লাগে না। ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড কার লেখা জান?

'নাহ্।'

'টমাস হার্ডির। পড়ে দেখবে, চমৎকার! অথচ ট্র্যাজেডি হচ্ছে, টমাস হার্ডিকেই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি। তুমি তাঁর কোনো বই পড়েছ?'

'না।'

'পড়ে দেখবে। খুব রোমান্টিক ধরনের রাইটিং।'

গাড়ি ছুটে চলেছে মীরপুর রোড ধরে। হঠাৎ নীলু বলল, 'আমার ভাল লাগছে না।'

'কী বললে?'

'আমার ভাল লাগছে না, আমি বাসায় যাব।'

সে তাকাল নীলুর দিকে। একটি হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটের ভল্যুম বাড়িয়ে দিল। গাড়ির গতি কমল না।

'আমি বাসায় যাব।'

'আটটার সময় আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব।'

'না, আজ আমি কোথাও যাব না। প্লিজ গাড়িটা থামান, আমি নেমে পড়ব।'

'কেন?'

'আমার ভাল লাগছে না। প্লিজ।'

সে তাকাল নীলুর দিকে। নীলু শিউরে উঠল। এ কেমন চাউনি! যেন মানুষ নয়, অন্য কিছু।

'প্লিজ, গাড়িটা একটু থামান।'

'কোনো রকম ঝামেলা না-করে চুপচাপ বসে থাক। কোনো রকম শব্দ করবে না।'

'আপনি এ-রকম করে কথা বলছেন কেন?'

গাড়ির গতি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ঝড়ের গতিতে পাশ দিয়ে দুটো ট্রাক গেল। লোকটি তার একটি হাত রাখল নীলুর উরুতে। নীলু শিউরে উঠে দরজার দিকে সরে গেল। লোকটি হাসল। এ কেমন হাসি!

'গাড়ি থামান। আমি চিৎকার করব।'

'কেউ এখন তোমার চিৎকার শুনবে না।'

'আপনি কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?'

'আমি ভয় দেখাচ্ছি না।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করে গাড়িতে উঠেছি।'

'আরো কিছুক্ষণ থাক। বেশিক্ষণ নয়, এসে পড়েছি বলে।'

'কী করবেন আপনি?'

'তেমন কিছু না।'

নীলু এক হাতে দরজা খুলতে চেষ্টা করল। লোকটি তাকিয়ে দেখল কিন্তু বাধা দিল না। দরজা খোলা গেল না। নীলু প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করল, আমাকে বাঁচাও। কিন্তু বলতে পারল না। প্রচুর ঘামতে লাগল। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ হল।

## ২০

আনিস এল রাত সাড়ে আটটায়। ঘর অন্ধকার। কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। রানু বাতিটাতি নিভিয়ে অন্ধকারে বসে আছে। জিতু মিয়া মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়েছে।

'রানু, কী হয়েছে?'

রানু ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'তুমি এত দেরি করলে!'

'কেন, কী হয়েছে?'

'নীলুর বড় বিপদ।'

আনিস কিছু বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে তাকাল। রানু থেমে-থেমে বলল, 'নীলুর খুব বিপদ।'

'কিসের বিপদ? কী বলছ তুমি?'

রানুর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না।

'রানু, তুমি শান্ত হয়ে বস। তারপর ধীরে সুস্থে বল— কী ব্যাপার। কী হয়েছে। নীলুর?'

'ও একজন খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছে। লোকটা ওকে মেরে ফেলবে।'

রানু, ফোঁপাতে লাগল। আনিস কিছুই বুঝতে পাবল না। নীলুর বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই তার কথা হয়েছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছেন, 'কি, এত দেবি যে?' যার মেয়ের এত বড় বিপদ, সে এ-রকম স্বাভাবিক থাকবে কী করে?'

আনিস বলল, 'ওরা তো কিছু বলল না!'

'ওরা কিচ্ছু জানে না। আমি জানি, বিশ্বাস কর— আমি জানি।'

'আমাকে কী করতে বল?'

'আমি বুঝতে পারছি না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।'

'জিনিসটা কি তুমি স্বপ্নে দেখেছ?'

'না। কিন্তু আমি দেখেছি।'

'কী দেখেছ?'

'আমি সেটা তোমাকে বলতে পারব না।'

'তুমি যদি চাও আমি নিচে গিয়ে ওদের বলতে পারি। কিন্তু ওরা বিশ্বাস করবেন না।'

রানু চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইল। ওর শরীর অল্প-অল্প করে কাঁপছে। আনিস বলল, 'নাকি মিসির আলি সাহেবের কাছে যাবে? উনি কোনো-একটা বুদ্ধি দিতে পারেন। যাবে?'

রানু কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি নিজে কি আমার কথা বিশ্বাস করছ?'

'হ্যাঁ, করছি।'

একতলার বারান্দায় বিলু বসে ছিল। ওদের নামতে দেখে বিলু বলল, 'ভাবী, নীলু আপা এখনো ফিরছে না। বাবা খুব দুশ্চিন্তা করছেন।'

রানু কিছু বলল না।

'তোমরা কোথায় যাচ্ছ ভাবী?'

রানু তারও কোনো জবাব দিল না। রিকশায় উঠেই সে বলল, 'আমাকে ধরে রাখ, খুব ভাল লাগছে।'

আনিস তার কোমর জড়িয়ে বসে রইল। রানুর গা শীতল। রানু খুব ঘামছে। জ্বর নেমে গেছে।

## ২১

রানু চোখ বড়-বড় করে বলল, 'আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না, তাই না?'

মিসির আলি চুপ করে রইলেন।

'আগে আপনি বলুন- - আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন?'

'বিশ্বাসও করছি না, আবার অবিশ্বাসও করছি না। তুমি নিজে যা সত্যি বলে মনে করছ, তা-ই বলছ। তবে আমি এত সহজে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু যদি সত্যি হয়, তখন?'

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে কাশতে লাগলেন।

'বলুন, যদি আমার কথা সত্যি হয় – যদি মেয়েটা মারা যায়?'

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, ঠিক এই মুহূর্তে কী করা যায়, তা তো বুঝতে পারছি না। মেয়েটি কোথায় আছে, তা তো তুমি জানো না। নাকি জানো?'

'না, জানি না।'

'ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর। আমার এ-রকম মনে হচ্ছে।'

'এই শহরে খুব কম করে হলে দশ হাজাব সুন্দব ছেলে আছে।'

'আমরা কিছুই করব না?'

'পুলিশের কাছে গিয়ে বলতে পারি একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে এবং আশঙ্কা করা যাচ্ছে দুষ্ট লোকের খপ্পরে পড়েছে। কিন্তু তাতেও একটা মুশকিল আছে, ২৪ ঘণ্টা পার না-হলে পুলিশ কাউকে মিসিং পারসন হিসাবে গণ্য করে না।'

রানু আবার বলল, 'কিছুই কবা যাবে না?'

মিসির আলি গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন রানুর চোখ-মুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সে ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলছে।

'রানু, তুমি যদি ঐ লোকটির কোনো ঠিকানা কোনোভাবে এনে দিতে পার, তাহলে একটা চেষ্টা চালানো যেতে পারে।'

'ঠিকানা কোথায় পাব?'

'তা তো বানু আমি জানি না। যেভাবে খবরটি পেয়েছ, সেইভাবেই যদি পাও।'

রানু উঠে দাঁড়াল। মিসিব আলি সাহেব বললেন, 'যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, বসে থেকে কী কবব?'

নীলুদের সব কটি ঘরে আলো জ্বলছে। রাত প্রায় এগারটা বাজে। নীলুর বাবা পাথরের মূর্তিব মতো বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। রানুদের ঢুকতে দেখে এগিয়ে এলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। বানু মাথা নিচু করে তিনতলায় উঠে গেল। নীলুদের ঘরে ঘনঘন টেলিফোন বাজছে। দু'টি গাড়ি এসে থামল। মনে হয় ওঁবা খুঁজতে শুরু কবেছেন। পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই লোক গিয়েছে। নীলুব বাবা অস্থির ভঙ্গিতে বাগানে হাঁটছেন।

## ২২

ছোট্ট একটি ঘর। কিন্তু দু'শ পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলছে ঘরে। চারদিক ঝলমল করছে। লোকটি একটি চেয়ারে বসে আছে। নীলু লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কারণ লোকটি বসে আছে তার পেছনে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাবার কোনো উপায় নেই নীলুর। নাইলনের চিকন দড়ি তার গা কেটে বসে গেছে। চারদিকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। মাঝে-মাঝে দূরের রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নীলু থেমে-থেমে বলল, 'আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন?'

কেউ কোনো জবাব দিল না।

'আমি আপনার কোনো ক্ষতি করিনি। কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন? প্লিজ, আমাকে যেতে দিন। আমি কাউকে কিছু বলব না। কেউ আপনার কথা জানবে না।'

পেছনের চেয়ার একটু নড়ে উঠল। ভারী গলায় লোকটি কথা বলল, 'কেউ জানলেও আমার কিছু যায়-আসে না?'

'কেন আপনি এ-রকম করছেন?'

'আমি একজন অসুস্থ মানুষ। মাঝে-মাঝে আমাকে এ-রকম করতে হয়।'

'আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। চারদিকে ঘন

অন্ধকার। নীলু চাপা স্বরে ডাকল, 'মা, মাগো!'

'চুপ করে থাক, কথা বলবে না।'

'কেন এ-রকম করছেন আপনি?'

'আমি একজন অসুস্থ মানুষ। পৃথিবীতে কিছু অসুস্থ মানুষ থাকে।'

'আপনি কি আমার মত আরো অনেক মেয়েকে এইভাবে ফাঁদ পেতে এনেছেন?'

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি এগিয়ে এসে নীলুর গায়ে হাত রাখল। এ কি সেই ভালবাসার স্পর্শ? নীলু ডাকল, 'মা, মাগো!'

'চুপ করে থাক।'

'আপনি মানুষ, না অন্য কিছু?'

'বেশির ভাগ সময়ই আমি মানুষ থাকি, মাঝে-মাঝে অন্য রকম হয়ে যাই।'

লোকটি শব্দ করে হাসল। কি কুৎসিত হাসি! ঘরে একটুও বাতাস নেই। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নীলু প্রাণপণে তার একটা হাত ছুটিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। যতই চেষ্টা করছে দড়িগুলো ততই যেন কেটে-কেটে বসে যাচ্ছে।

'কেন, কেন আপনি এ-রকম করছেন?'

'বলেছি তো নীলু! অনেক বার বললাম তোমাকে। আমি অসুস্থ।'

'কী করবেন আপনি?'

'অন্যদের যা করেছি তা-ই করব।'

'কী করেছেন অন্যদের?'

লোকটি হেসে উঠল। নীলু কাতর স্বরে বলল, 'আপনি দয়া করুন, আমি আপনার পায়ে পড়ি। প্লিজ। আমি আপনার কথা কাউকে বলব না।'

'তা কি হয়?'

'বিশ্বাস করুন। আমি আমার কথা রাখি। কাউকে আপনার কথা বলব না।'

লোকটি ফিরে যাচ্ছে। নীলু কি বেঁচে যাবে? লোকটি কি তাকে ছেড়ে দেবে? নীলু গুছিয়ে চিন্তা করতে পারছে না। সব কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। লোকটি একটি ড্রয়ার খুলল। ঘর অন্ধকার, নীলু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সে নিশ্চিত জানে, তার হাতে ধারাল কিছু-একটা আছে। ক্ষুরজাতীয় কিছু। লোকটি সেটি বাঁ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। আসবে, সে এক সময় এগিয়ে আসবে তার কাছে। খুব কাছে কোথাও রিকশার টুনটুন শোনা গেল। নীলু প্রাণপণে চেঁচাল, 'বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরুল না।

## ২৩

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রানুর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। বারবার বলতে লাগল -- উফ, বড্ড গরম লাগছে। আনিস সমস্ত দরজা-জানালা খুলে দিল, ফ্যান ছেড়ে দিল, তবু তার গরম কমল না। রানু কাতর স্বরে বলল, 'তুমি আমাকে ধরে থাক, আমার বড্ড ভয় লাগছে।'

'এই তো আমি তোমার কাছে আছি। কিসের এত ভয়, রানু?'

'আমার সামনে ঐ লোকটি বসে আছে— আমি স্পষ্ট দেখছি। ওর হাতে একটা ক্ষুর।'

রানু ফোঁপাতে শুরু করল। ওকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া উচিত। যত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় ততই ভাল। আনিস ডাকল, 'জিতু— জিতু মিয়া।' কিন্তু জিতু মিয়ার ঘুম ভাঙল না। রানু বলল, 'তুমি আমাকে একা রেখে কোথাও যেতে পারবে না। আমার বড় ভয় লাগছে।'

'কোনো ভয় নেই রানু।'

'লোকটি ক্ষুর হাতে বসে আছে। তবু তুমি বলছ ভয় নেই?'

'এই সব তোমার কল্পনা। এস, তোমার মাথায় একটু পানি দিই?'

'তুমি কোথাও যেতে পারবে না। ঐ লোকটি এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে থাক। আরও শক্ত করে ধর।'

'আনিস তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। রানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'আমি তোমাকে একটি কথা কখনো বলিনি। একবার একজন লোক আমাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল।

'রানু দয়া করে এখন তোমাকে কিছু বলতে হবে না। দয়া করে চুপ করে থাক।'

'না, আমি বলতে চাই।'

'সকাল হোক। সকাল হলেই শুনব।'

'মাঝে-মাঝে আমার মনে হয় একজন-কেউ আমার সঙ্গে থাকে।'

'রানু, চুপ করে থাক।'

'না, আমি চুপ করে থাকব না। আমার বলতে ইচ্ছে করছে। যে আমার সঙ্গে থাকে, তার সঙ্গে আমি অনেক বার কথা বলেছি। কিন্তু আজ সে কিছুতেই আসছে না।'

'তার আসার কোনো দরকার নেই।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, তার আসার খুব দরকার।'

রাত দেড়টার দিকে নিচ থেকে বিলুর কান্না শোনা যেতে লাগল। অনেক লোকজনের ভিড়। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। রানু বলল, 'বিলু কাঁদছে। বড় খারাপ লাগছে আমার।'

'রানু, তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি জিতুকে ডেকে দিচ্ছি।'

'তুমি কোথায় যাবে?'

'আমি একজন ডাক্তার নিয়ে আসব। আমার মোটেই ভাল লাগছে না।'

'তুমি আমাকে ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারবে না।'

রানুর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল। এক সময় বিছানায় নেতিয়ে পড়ল। আনিস ছুটে গেল ডাক্তার আনতে। বড় রাস্তার মোড়ে একজন ডাক্তারের বাসা আছে। ডাক্তার সাহেবকে পাওয়া গেল না। আনিস ফিরে এসে ঘরে ঢোকবার মুখে তীব্র ফুলের গন্ধ পেল। ঘরের বাতি নেভানো। কে নিভিয়েছে বাতি? আনিস ঢুকতেই রানু বলল, 'ও এসেছে।'

'কে? কে এসেছে?'

'তুমি গন্ধ পাচ্ছ না?'

আনিস এগিয়ে এসে রানুর হাত ধরল। গা ভীষণ গরম। রানু বলল, 'ও নীলুর কাছে যাবে।'

রানু, শুয়ে থাক।'

'উঁহু, শোব কিভাবে? ও একা যেতে ভয় পাচ্ছে। আমিও যাব ওর সঙ্গে। ও আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।'

বলতে-বলতে রানু খিলখিল করে হাসল।

আনিস বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল, 'রহমান সাহেব, রহমান সাহেব। ভাই, একটু আসুন, আমার বড় বিপদ।'

রহমান সাহেব ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'আপনি একটু আসুন, আমার স্ত্রী কেমন যেন করছে।'

ভদ্রমহিলা সঙ্গে-সঙ্গে এলেন। এবং ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে বললেন, 'নূপুরের শব্দ না?' রানু কিশোরী মেয়ের গলায় খিলখিল করে হাসল।

'কী হয়েছে ওনার?'

আপনি একটু বসুন ওর পাশে। আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।'

আনিস ছুটে বেরিয়ে গেল। ফুলের সৌরভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। রানু হাসিমুখে বলল, 'আমার সময় বেশি নেই, ঐ লোকটি এগিয়ে আসছে।'

'কোন লোক?'

'আপনি চিনবেন না। না চেনাই ভাল।'

ভদ্রমহিলা রানুর হাত ধরলেন। উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। তিনি কি করবেন ভেবে পেলেন না।

আনিস ডাক্তার নিয়ে ফেরার আগেই রানু মারা গেল।

## ২৪

ঘর অন্ধকার। কিন্তু অন্ধকার সয়ে আসছে। আবছামত সব কিছু দেখা যায়। বাড়িটা কোথায়? শহর থেকে অনেক দূরে কি? কোনো শব্দ নেই। কত রাত এখন? বাড়িতে এখন ওরা কী করছে? বিলু কি ঘুমিয়ে মশারি ফেলে? না, না— আজ কেউ ঘুমায়নি, আজ সবাই ছোটাছুটি করছে। সবাই খুঁজছে নীলুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত পুলিশের গাড়ির শব্দ শোনা যাবে। বাবা এসে বলবেন— কোনো

ভয় নেই মা-মণি।

চেয়ার নড়ার শব্দ হল। লোকটি কি উঠে দাঁড়িয়েছে? তার হাতে ওটা কী? নীলু মনে-মনে বলল, 'বাবা, আমি একজন অসুস্থ লোকের হাতে আটকা পড়েছি, আমাকে তোমরা বাঁচাও। আমার আর মোটেও সময় নেই বাবা। তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

লোকটি এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে সে খুব ধীর গতিতে এগিয়ে এল সামনে। এখন নীলু আবছাভাবে লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে। কী সুন্দর একটি মুখ! নীলু বিড়বিড় করে বলল, 'প্লিজ, দয়া করুন।' লোকটি অদ্ভুত শব্দ করল। এটি কি হাসিব শব্দ? নীলুর পা গোলাচ্ছে। নীলু চিৎ হয়ে থাকা অবস্থাতেই মুখ ভর্তি করে বমি করল। দুঃস্বপ্ন, সমস্তটাই একটা দুঃস্বপ্ন। এক্ষুণি ঘুম ভেঙে যাবে। আর নীলু দেখবে- বিলু বাতি জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাব বুকের ওপর একটা গল্পের বই। এখানে যা ঘটছে, তা সত্যি হতে পারে না!'

লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। নীলু চাপা গলায় বলল, 'আমার গায়ে হাত দেবেন না। প্লিজ।' লোকটি হেসে উঠেছে শব্দ করে। আব ঠিক তখনই নূপুরেব শব্দ শোনা গেল। যেন কেউ-একজন এসে ঢুকেছে। এ-ঘরে।

লোকটি ভারী গলায় বলল, 'কে, কে ওখানে?' তার উত্তরে অল্পবয়সী একটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। লোকটি চেঁচাল, 'কে, কে?' কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু ঘরেব শেষ প্রান্তের একটা জানালা খুলে ভয়ানক শীতল একটা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। সে-হাওয়ায় ভেসে এল অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ।

নীলুর মনে হল একটি মেয়ে যেন নূপুর পায়ে দিয়ে তার চারপাশ দিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। ঘুবত-ঘুরতে এক বার মেয়েটি তাকে স্পর্শ করল, আর তক্ষুণি নীলুব মনে হল আব কোনো ভয় নেই।

নীলু দেখল, লোকটি ক্রমেই দেয়ালের দিকে সরে যাচ্ছে। একবাব সে চাপা স্বরে বলল, 'তুমি কে?' মিষ্টি একটি হাসি শোনা গেল তখন। ফুলের গন্ধ আরো তীব্র হল। অন্য কোনো ভুবন থেকে ভেসে এল নূপুরের ধ্বনি। লোকটি গা ঠেকিয়ে বিড়বিড় কবে বলল, 'এসব কী হচ্ছে! কে, এখানে কে?' কেউ তার কথার জবাব দিল না। একটি দুষ্ট মেয়ে শুধু হাসতে লাগল। ভীষণ দুষ্টু একটি মেয়ে। তার পায়ে নূপুর। তাব গায়ে অপার্থিব এক ফুলের গন্ধ। মেয়েটি এবাব দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটির দিকে। লোকটির কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল, 'এইসব কী? কে, কে?' তাব উত্তরে সমস্ত ঘরময় মিষ্টি খিলখিল হাসি ঝমঝম করতে লাগল। লোকটি চাপা গলায় বলে উঠল, 'আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও।' দুষ্টু মেয়েটি আবার হাসল, যেন খুব একটা মজাব কথা।

পরিশিষ্ট

থার্ড ইয়ার অনার্সের এই ক্লাসটি মিসির আলি সাহেবকে দেওয়া হয়েছে। সাইকোলজি ফিফথ পেপার। মিসির আলি হাসিমুখে ক্লাসে ঢুকলেন। তাঁব মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। বানু বসে আছে সেকেন্ড বেঞ্চে। তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। তিনি মেয়েটির দিকে তাকালেন এবং তাকিয়ে রইলেন। মনে হল, মেয়েটির ঠোঁটের কোণায় হাসি লেগে আছে।

মিসির আলি কাঁপা গলায় বললেন, 'তোমার নাম কি?'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। স্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমার নাম নীলু। নীলুফাব। রোল নাম্বার থার্টি টু।'

'আমি একটি মেয়েকে চিনতাম। তুমি দেখতে অবিকল তার মত।'

নীলুফার শান্ত স্বরে বলল, 'আমি জানি।'

মিসির আলি সাহেব কপালের ঘাম মুছলেন। সমস্ত ব্যাপারটি ভুলে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে-কবতে বললেন, 'আমি তোমাদের পড়াব ফিফথ পেপার। খুব ইন্টারেস্টিং একটি টপিক '

রানুর মত দেখতে মেয়েটি তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। মেয়েটিব মুখে মৃদু হাসি।



# আগুনের পরশমণি

সারাটা সকাল উৎকণ্ঠার ভেতর কাটল। উৎকণ্ঠা এবং চাপা উদ্বেগ। মতিন সাহেব অস্থির হয়ে পড়লেন। গেটে সামান্য শব্দ হতেই কান খাড়া করে ফেলেন, সরু গলায় বলেন,— বিন্তি দেখ তো কেউ এসেছে কী-না।

বিন্তি এ বাড়ির নতুন কাজের মেয়ে। তার কোন ব্যাপারে কোন উৎসাহ নেই, কিন্তু গেট খোলায় খুব আগ্রহ। সে বারবার যাচ্ছে এবং হাসিমুখে ফিরে আসছে। মজার সংবাদ দেয়ার ভঙ্গিতে বলছে— বাতাসে গেইট লড়ে। মানুষজন নাই। দুপুরের পর মতিন সাহেবের উদ্বেগ আরো বাড়ল। তিনি তলপেটে একটা চাপা ব্যথা অনুভব করতে লাগলেন। এই উপসর্গটি তাঁর নতুন। কোন কিছু নিয়ে চিন্তিত হলেই তলপেটে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা হতে থাকে। ডাক্তার-টাক্তার দেখানো দরকার বোধ হয়। আলসার হলে কী এরকম হয়? আলসার হয়ে গেল নাকি?

মতিন সাহেব পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন। চুল আঁচড়ালেন। সুরমা অবাক হয়ে বললেন, কোথায় যাচ্ছ তুমি?

এই একটু রাস্তায়।

রাস্তায় কী?

কিছু না। একটু হাঁটব আর কি।

তিনি হাসতে চেষ্টা করলেন।

সুরমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। গত রাতে তাঁদের বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়েছে। সাধারণত ঝগড়ার পর তিনি কিছুদিন স্বামীর সঙ্গে কোনো কথা বলেন না। আজ তার ব্যতিক্রম হল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, তুমি সকাল থেকে এ রকম করছ কেন? কারোর কী আসার কথা?

মতিন সাহেব পাংশু মুখে বললেন— আরে না, কে আসবে? এই দিনে কেউ আসে?

মতিন সাহেব স্ত্রীর দৃষ্টি এড়াবার জন্যে নিচু হয়ে চটি খুঁজতে লাগলেন। সুরমা বললেন, রাস্তায় হাঁটাহাঁটির কোনো দরকার নেই। ঘরে বসে থাক।

যাচ্ছি না কোথাও। এই গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব।

গেটের বাইরে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

তিনি জবাব দিলেন না।

স্ত্রীর কথার অবাধ্য হবার ক্ষমতা তাঁর কোনো কালেই ছিল না। কিন্তু আজ অবাধ্য হলেন। হলুদ রঙের একটা পাঞ্জাবি গায়ে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। রাস্তা ফাঁকা। তিনি পরপর দুটি সিগারেট শেষ করলেন। এর মধ্যে মাত্র একটা রিকশা গেল। সে রিকশাও ফাঁকা। অথচ কিছুদিন আগেও দুপুর বেলায় রিকশার যন্ত্রণায় হাঁটা যেত না। মতিন সাহেব রাস্তার মোড় পর্যন্ত গেলেন। ইদ্রিস মিয়ার পানের দোকানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। ইদ্রিস মিয়া শুকনো গলায় বলল, স্যার ভাল আছেন?

তিনি মাথা নাড়লেন। যার অর্থ হ্যাঁ। কিন্তু মুখের ভাবে তা মনে হল না। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি ভাল নেই।

বিক্রিবাটা কেমন ইদ্রিস?

আর বিক্রি। কিনব কে কন? কিনার মানুষ আছে?

দেখি একটা পান দাও।

মতিন সাহেবের এখনো দুপুরে খাওয়া হয়নি। এক্ষুণি গিয়ে ভাত নিয়ে বসতে হবে। পান খাওয়ার কোনো মানে হয় না। কিন্তু একটা দোকানের সামনে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। ব্যাপারটা সন্দেহজনক। এখন সময় খারাপ। আচার-আচরণে কোন রকম সন্দেহের ছাপ থাকা ঠিক না।

জর্দা দিমু?

দাও।

ইদ্রিস নিষ্প্রাণ ভঙ্গিতে পান সাজাতে লাগল। তার মাথায় ঝুঁটিবিহীন একটা লাল ফেজ টুপি। কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে। চিবুকের কাছে অল্প দাড়ি। মতিন সাহেব পান মুখে দিয়ে বললেন— দাড়ি রাখছ নাকি ইদ্রিস? ইদ্রিস জবাব দিল না।

দাড়ি রেখেই ভাল করেছ। যে দিকে বাতাস সেই দিকে পাল তুলতে হয়। পান কত?

দেন যা ইচ্ছা।

ইদ্রিসের গলার স্বরে স্পষ্ট বৈরাগ্য। যেন পানের দাম না দিলেও তার কিছু আসে যায় না। মতিন সাহেব একটা সিকি ফেলে খানিকটা এগিয়ে গেলেন। নিউ পল্টন লাইনের এই গলিটায় বেশ কয়েকটি দোকান। কিন্তু মডার্ন সেলুন এবং পাশের ঘরটি ছাড়া সবই বন্ধ। তিনি মডার্ন সেলুনে ঢুকে পড়লেন। রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করবার চেয়ে সেলুনে চুল কাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা ভাল। সেলুনটা এক সময় মস্তান ছেলেপুলেদের আড্ডাখানা ছিল। লম্বা চুলের চার-পাঁচটা ছেলে শার্টের বুকের বোতাম খুলে বেঞ্চির ওপর বসে থাকত। সেলুনের একটা এক ব্যান্ড ট্রানজিস্টার সারাক্ষণই বাজত। ট্রানজিস্টারের ব্যাটারির খরচ দিতে গিয়েই সেলুনের লাটে উঠার কথা। কিন্তু তা ওঠেনি। রমরমা ব্যবসা করছে। আজ অবশ্যি জনশূন্য। তবে ট্রানজিস্টার বাজছে। আগের মত ফুল ভল্যুমে নয়। মৃদু শব্দে। দেশাত্মবোধক গান। কথা ও সুর নজিবুল হক। মতিন সাহেব বেশ মন দিয়েই গান শুনতে লাগলেন। তবে চোখ রাখলেন রাস্তাব উপর।

চুলটা একটু ছোট কর।

নাপিত ছেলেটি বিস্মিত হল। সে ইনার চুল গত বুধবারেই কেটেছে। আজ আবেক বুধবাব। এক সপ্তাহে চুল বাড়ে দুই সুতা। তাব জন্যে কেউ চুল কাটাতে আসে না।

স্যার চুল কাটাবেন?

হুঁ। পিছনের দিকে একটু ছোট কব।

নাপিতেব কাঁচি যন্ত্রের মত খটখট করতে লাগল। মতিন সাহেব বললেন – দেশেব হালচাল কী?

ভালই।

চুল কাটতে এলে এই ছোকরার কথার যন্ত্রণায় অস্থির হতে হয়। কথা শুনতে তাঁব খাবাপ লাগে না। কিন্তু এই ছোকরা কথা বলার সময় থুথুর ছিটা এসে লাগে। আজ সে নিশ্চুপ। থুথু গায়ে লাগাব কোন আশংকা নেই।

দাম দেবার সময় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, রাতদিন ট্রানজিস্টার চালাও কিভাবে? ব্যাটাবিব তো মেলা দাম। নাপিত ছোকরা জবাব দিল না। গম্ভীর মুখে টাকা ফেবত দিয বেঞ্চিব উপর পা তুলে বসে রইল। মতিন সাহেব বললেন, আজ কার্ফু কটা থেকে জানো নাকি?

জানি, ছয়টায়।

এক ঘণ্টা পিছিয়ে দিল, ব্যাপারটা কী?

ঝামেলা নাই। গণ্ডগোল নাই। কার্ফুও নাই।

তা তো ঠিকই। এখন হয়েছে ছ'টা, তারপর হবে সাতটা, আটটা; কী বল?

তিনি কোনো উত্তর পেলেন না। ছেলেটা ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে আছে। আজকাল কেউ বাড়তি কথা বলতে চায় না। চেনা মানুষদের কাছেও না।

রোদ উঠেছে কড়া এবং ঝাঁঝাল। কিন্তু এই কড়া রোদেও তাঁর কেমন শীত শীত কবতে লাগল। তিনি ইদ্রিস মিয়ার দোকানের সামনে দ্বিতীয়বার এসে দাঁড়ালেন। মনে করতে চেষ্টা করলেন ঘরে যথেষ্ট সিগারেট আছে কিনা। পাঁচটার পর কোথাও কিছু পাওয়া যাবে না। গত সোমবারে সিগারেটের অভাবে খুব কষ্ট করেছেন। রাত ন'টার সময় বিন্তি এসে বলল, সিগারেটের প্যাকেট খুঁইজ্যা পাই না। কি সর্বনাশ! বলে কী! তাঁর মাথায় রক্ত উঠে গেল। অমানিশি কাটবে কিভাবে? এটা ফ্ল্যাট বাড়ি না। ফ্ল্যাট বাড়ি হলে অন্যদের কাছে খোঁজ করা যেত। তবু তিনি রাত দশটার সময় পাঁচিলের কাছে দাঁড়িয়ে পাশের বাড়ির উকিল সাহেবকে চিকন সুরে ডাকতে লাগলেন - ফরিদউদ্দিন সাহেব, সিগারেট আছে? সুরমা এসে তাঁকে টেনে ভেতরে নিয়ে গেলেন। রেগে আগুন হয়ে বললেন, মাথা কী খারাপ হয়ে গেছে? একটা রাত সিগারেট না ফুঁকলে কী হয়?

মতিন সাহেব মানিব্যাগ খুললেন। ইদ্রিস মিয়া তার দোকানে আগরবাতি জ্বালিয়েছে। সব

দোকানদারের মধ্যে এই একটি নতুন অভ্যাস দেখা যাচ্ছে। আগরবাতি জ্বালানো। আগে কেউ কেউ সন্ধ্যাবেলা জ্বালাত। এখন প্রায় সারাদিনই জ্বলে। আগরবাতির গন্ধ মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়। মতিনউদ্দিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

ইদ্রিস, দুই প্যাকেট ক্যাপস্টান দাও।

ইদ্রিস সিগারেট বের করল। দাম এক টাকা করে বেশি নিল। সিগারেটের দাম চড়ছে। ছেলে-ছোকরারা এখন সারাদিন ঘরে বসে থাকে এবং সিগারেট ফুঁকে। এছাড়া আর কী করবে?

দু'টা ম্যাচও দাও।

ইদ্রিস মিয়া ম্যাচ দিতে দিতে বলল, আফনে কাউরে খুঁজতেছেন?

তিনি চমকে উঠলেন। বলে কী এই ব্যাটা? টের পেল কিভাবে?

কারে খুঁজেন?

আরে না, কাকে খুঁজব? চুল কাটাতে গিয়েছিলাম। চুল একটু বড় হলেই আমার অসহ্য লাগে।

তিনি বাড়ির দিকে রওনা হলেন। গোরস্থান ঘেঁষে রাস্তা গিয়েছে। সেই জন্যেই কী গা ছম ছম করে? না অন্য কোনো কারণ আছে? একটা কটু গন্ধ আসছে। নিউ পল্টন লাইনের লোকজনদের ধারণা, বর্ষাকালে এই গন্ধ পাওয়া যায়। লাশ পচে গন্ধ ছড়ায়। এখন বর্ষাকাল। গোরস্থানের পাশে বাড়ি ভাড়া নেয়াটা ভুল হয়েছে। বিরাট ভুল।

বিন্তি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। মতিন সাহেবকে দেখে সে দাঁত বের করে হাসল। এই মেয়েটার হাসি-রোগ আছে। যখন-তখন যার-তার দিকে তাকিয়ে হাসবে। অভদ্রের চূড়ান্ত। কড়া ধমক দিতে হয়। তিনি ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না। সোজা ঘরে ঢুকে খেতে বসলেন।

সুরমাও বসেছেন। কিন্তু তিনি কিছু খাচ্ছেন না। ঝগড়া-টগড়ার পর তিনি খাওয়া-দাওয়া আলাদা করেন। মাঝে মাঝে করনেও না। মতিন সাহেব ভাত মাখতে মাখতে বললেন, আজ কার্ফু ছয়টা থেকে। সুরমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, তাতে কী?

না কিছু না। এমনি বললাম। কথার কথা।

আজ অফিসে গেলে না কেন?

শরীরটা ভাল না।

একটা সত্যি কথা বল তো, কেউ কী আসবে?

তিনি বিষম খেলেন। পানি-টানি খেয়ে ঠাণ্ডা হতে তাঁর সময় লাগল। সুরমা তাকিয়ে আছেন। তাঁর মুখ কঠিন। মতিন সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। এক সময়ে সুরমার এই মুখ খুব কোমল ছিল। কথায় কথায় রাগ করে কেঁদে ভাসাত। একবার তাঁকে এক সপ্তাহের জন্যে রাজশাহী যেতে হবে। সুরমা গম্ভীর হয়ে আছে। কথাটথা বলছে না। রওনা হবার আগে আগে এমন কান্না! মতিন সাহেব বড় লজ্জার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। বাড়ি ভর্তি লোকজন। এদের মধ্যে মেজো ভাবীও আছেন। মেজো ভাবীর মুখ খুব আলগা। তিনি নিচু গলায় বাজে ধরনের একটা রসিকতা করলেন। কী অস্বস্তি। পঁচিশ বছর খুব কী দীর্ঘ সময়? এই সময়ের মধ্যে একটি কোমল মুখ চিরদিনের জন্যে কঠিন হয়ে যায়?

কি, কথা বলছ না কেন?

কী বলব?

কারোর কী আসার কথা?

আরে না, কে আসবে?

সত্যি করে বল।

মতিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, ইয়ে আমার এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয়।

কে সে?

তুমি চিনবে না।

তোমার আত্মীয় আর আমি চিনব না— কী বলছ এ সব?

দেখা-সাক্ষাৎ নেই তো। আমি নিজেই ভাল করে চিনি না।

তুমি নিজেও চেন না?

সুরমার কপালে ভাঁজ পড়ল। মতিন সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তিনি মৃদু স্বরে বললেন,

দুই-এক দিন থাকবে। তারপর চলে যাবে। নাও আসতে পারে। ঠিক নাই কিছু। না আসারই সম্ভাবনা।

সে করে কী?

জানি না।

জানি না মানে?

বললাম তো আমি নিজেও চিনি না ভাল করে। যোগাযোগ নেই।

মতিন সাহেব উঠে পড়লেন। সাধারণত ছুটির দিনগুলিতে তিনি খাওয়া-দাওয়ার পর গল্পের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। আজ ছুটির দিন নয়। কিন্তু তিনি অফিসে যাননি। কাজেই দিনটিকে ছুটির দিন হিসাবে ধরা যেতে পারে। তাঁর উচিত একটা বই নিয়ে বিছানায় চলে যাওয়া। তিনি তা করলেন না। বই হাতে বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসলেন। চোখ রাস্তার দিকে।

দিনের আলো আসছে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। পর পর কয়েকদিন খটখটে রোদ গিয়েছে। এখন আবার কয়েকদিনের ক্রমাগত বৃষ্টি হবার কথা। বাড়ির ভেতরে সুরমা বসেছে তার সেলাই মেশিন নিয়ে। বিশ্রী ঘটাং ঘটাং শব্দ হচ্ছে। মতিন সাহেবের ঘুম পেয়ে গেল। হাতে ধরে থাকা বইটির লেখাগুলি ঝাপসা হয়ে উঠেছে। ঝাপসা এবং অস্পষ্ট। রোদ নেই একেবারেই। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টি হবে, জোর বৃষ্টি হবে। তিনি বই বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকালেন। বাদলা দিনে মনে পড়ে ছেলেবেলার গান। সুরমা ক্রমাগতই খটখট করে যাচ্ছে। কিসের তার এত সেলাই? আচ্ছা ছেলেবেলায় সুরমা কেমন ছিল? প্রতিটি মানুষ একেক বয়সে একেক রকম। যৌবনে সুরমা কত মায়াবতী ছিল। বর্ষার রাতগুলি তাঁরা গল্প করে পার করে দিতেন। একবার খুব বর্ষা হল। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট এসে বিছানা ভিজিয়ে একাকার করেছে তবু তাঁরা জানালা বন্ধ করলেন না। ভেজা বিছানায় শুয়ে রইলেন। হাওয়া এসে বারবার মশারিকে নৌকার পালের মত ফুলিয়ে দিতে লাগল। কত গভীর আনন্দেই না কেটেছে তাঁদের যৌবন। মতিন সাহেব কালো আকাশেব দিকে তাকিয়ে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

যখন ঘুম ভাঙল তখন চারদিক অন্ধকার। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। দমকা বাতাস দিচ্ছে। তিনি খোঁজ নিলেন— কেউ এসেছে কী-না। কেউ আসেনি। কার্ফু শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই। এখন আব আসার সময় নেই। কাল কি আসবে? বোধহয় না। শুধু শুধুই অপেক্ষা করা হল। তিনি শোবার ঘরে উঁকি দিলেন। সুরমা ঘুমুচ্ছে। একটা সাদা চাদরে তার শরীর ঢাকা। তাকে কেমন অসহায় দেখাচ্ছে। মতিন সাহেব কোমল গলায় ডাকলেন, সুরমা সুরমা। সুরমা পাশ ফিরলেন।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচ বাজে। কার্ফু শুরু হতে এখনো আধ ঘণ্টা বাকি। কিন্তু এর মধ্যেই চারদিক জনশূন্য। লোকজন যার যার বাড়ি ফিরে গেছে। বাকি রাতটায় আর ঘর থেকে বেরুবে না। ইদ্রিস মিয়া তার দোকান বন্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াল। রোজ শেষ মুহূর্তে কিছু বিক্রিবাটা হয়। আজ হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না কে জানে? অন্ধকার দেখে সবাই ভাবছে বোধ হয় কার্ফুর সময় হয়ে গেছে। সময় না হলেও কিছু যায় আসে না। আজকাল সবাই অন্ধকারকে ভয় পায়। ইদ্রিস মিয়া দোকানের তালা লাগাবার সময় লক্ষ্য করল গলির ভেতরে লম্বা একটি ছেলে ঢুকছে। তার হাতে কয়েকটা পত্রিকা। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বাসার নম্বর পড়তে পড়তে আসছে। ইদ্রিস মিয়ার দোকানের সামনে এসে সে থমকে দাঁড়াল। ইদ্রিস মিয়া বলল, আপনি কী মতিন সাহেবের বাড়ি খুঁজছেন?

ছেলেটি তাকাল বিস্মিত হয়ে। কিছু বলল না। ইদ্রিস বাড়ি দেখিয়ে দিল। নিচু গলায় বলল, লোহার গেইট আছে। গেটের কাছে একটা নারকেল গাছ। তাড়াতাড়ি যান। ছ'টার সময় কার্ফু।

ইদ্রিস মিয়া হনহন করে হাঁটতে লাগল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। ছেলেটি তাকিয়ে রইল ইদ্রিস মিয়ার দিকে। লোকটি ছোটখাট। প্রায় দৌড়াচ্ছে। সে নিশ্চয়ই অনেকখানি দূরে থাকে। ছ'টার আগে তাকে পৌঁছতে হবে।

ছেলেটি এগিয়ে গেল। লোহার গেটের বাড়িটির সামনে দাঁড়াল। নারকেল গাছ দু'টি ঝুঁকে আছে রাস্তার দিকে। প্রচুর নারকেল হয়েছে। ফলের ভারে যেন গাছ হেলে আছে। দেখতে বড় ভাল লাগে। ছেলেটি গেটে টোকা দিয়ে ভারী গলায় ডাকল, মতিন সাহেব, মতিনউদ্দিন সাহেব। বয়সের তুলনায় তার গলা ভারী। ছেলেটির নাম বদিউল আলম। তিন মাস পর সে এই প্রথম ঢুকেছে ঢাকা শহরে।

জুলাই মাসের ছ' তারিখ। বুধবার। উনিশ শো একাত্তুর সন। একটি ভয়াবহ বছর। পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর কঠিন মুঠির ভেতরে একটি অসহায় শহর। শহরের অসহায় মানুষ। চারদিকে সীমাহীন অন্ধকার। সীমাহীন ক্লান্তি। দীর্ঘ দিবস এবং দীর্ঘ রজনী।

বদিউল আলম গেট ধরে দাঁড়িয়েছে। সে শহরে ঢুকেছে সাতজনের একটি ছোট্ট দল নিয়ে। শহরে গেরিলা অপারেশন চালানোর দায়িত্ব তার। ছেলেটি রোগা। চশমায় ঢাকা বড় বড় চোখ। গায়ে হালকা নীল রঙের হাওয়াই শার্ট। সে একটি রুমাল বের করে কপাল মুছে দ্বিতীয়বার ডাকল, মতিন সাহেব! মতিন সাহেব!

মতিন সাহেব দরজা খুলে বের হলেন। দীর্ঘ সময় অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন ছেলেটির দিকে। এ তো নিতান্তই বাচ্চা ছেলে। এরই কী আসার কথা?

আমার নাম বদিউল আলম।

আস বাবা, ভেতরে আস।

এই সামান্য কথা বলতে গিয়ে মতিন সাহেবের গলা ধরে গেল। চোখ ভিজে উঠল। এত আনন্দ হচ্ছে! তিনি চাপা স্বরে বললেন, কেমন আছ তুমি?

ভাল আছি।

সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু নেই?

না।

বল কী!

সুরমা দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। পর্দা সরিয়ে তাকিয়ে আছেন। মতিন সাহেব বললেন, আস, ভেতরে আস। দাঁড়িয়ে আছে কেন?

গেটটা বন্ধ। গেট খুলুন।

ও আচ্ছা আচ্ছা।

মতিন সাহেব সংকুচিত হয়ে পড়লেন। সাড়ে পাঁচটার দিকে গেটে তালা দিয়ে দেয়া হয়।

চাবি থাকে সুরমার কাছে। সুরমা আঁচল থেকে চাবি বের করলেন। গেটে তালা দিয়ে রাখি। আগে দিতাম না। এখন দেই। অবশ্যি চুরি-ডাকাতির ভয়ে না। চুরি-ডাকাতি কমে গেছে। চোর-ডাকাতরা এখন কিভাবে বেঁচে আছে কে জানে। বোধ হয় কষ্টে আছে।

বদিউল আলম বসবার ঘরে ঢুকল। মতিন সাহেবের মনে হল এই ছেলেটির কোনো দিকেই কোনো উৎসাহ নেই। সোফাতে বসে আছে কিন্তু কোনো কিছু দেখছে না। বসার ভঙ্গির মধ্যেই গা-ছেড়ে-দেয়া ভাব আছে। মতিন সাহেব নিজের মনের কথা বলে যেতে লাগলেন,

কয়েকদিন ধরে আমরা স্বামী-স্ত্রী আছি এই বাড়িতে। আমাদের দুই মেয়ে আছে— রাত্রি আর অপালা। ওরা তার ফুফুর বাড়িতে। সোমবারে আসবে। ওদের ফুফু, মানে আমার বোনের কোন ছেলেপুলে নেই। মাঝে-মধ্যে রাত্রি আর অপালাকে নিয়ে যায়। ওরাও তাদের ফুফুর খুব ভক্ত। খুবই ভক্ত।

বদিউল আলম কিছু বলল না। তাকিয়ে রইল। মতিন সাহেব খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। গলা পরিষ্কার করে বললেন – অবস্থা কি বল শুনি।

কিসের অবস্থা?

তোমরা যেখানে ছিলে সেখানকার অবস্থা।

ভালই।

আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বাঘের পেটের ভেতর আছি। কাজেই বাঘটা কী করছে না করছে বোঝার উপায় নেই। বাঘ মারা না পড়া পর্যন্ত কিছুই বুঝব না। মারা পড়ার পরই পেট থেকে বের হব।

মতিন সাহেবের এটা একটি প্রিয় ডায়ালগ। সুযোগ পেলেই এটা ব্যবহার করেন। শ্রোতারা তখন বেশ উৎসাহী হয়ে তাকায়। কয়েকজন বলেই ফেলে— ভাল বলেছেন। কিন্তু এবারে সে রকম কিছু হল না। মতিন সাহেবের ভয় হল ছেলেটা হয়ত শুনছেই না।

তুমি হাত-মুখ ধুয়ে আস। চায়ের ব্যবস্থা করছি।

চা খাব না। ভাতের ব্যবস্থা করুন, যদি অসুবিধা না হয়।

না না, অসুবিধা কিসের? কোনো অসুবিধা নেই। খাবার-টাবার গরম করতে বলে দেই।

গরম করবার দরকার নেই। যেমন আছে দিন।

মতিন সাহেব অপ্রস্তুত হয়ে উঠে গেলেন। একজন ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে বকবক করছিলেন। খুব অন্যায়। খুবই অন্যায়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটির প্রসঙ্গে সুরমা কোনো কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। যেন দেখবার পর তাঁর সব কৌতূহল মিটে গেছে। ভাত খাওয়ার সময় নিজেই দু'একটা বললেন। যেমন একবার বললেন, তুমি মনে হচ্ছে ঝাল কম খাও। ছেলেটি তার জবাবে অন্য এক রকম ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। দ্বিতীয়বারে বললেন, ছোট মাছ তুমি খেতে পারছ না দেখি। আস্তে আস্তে খাও, আমি একটা ডিম ভেজে নিয়ে আসি।

ছেলেটি এই কথায় খাওয়া বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল। ভাজা ডিমের জন্য প্রতীক্ষা। ব্যাপারটা মতিন সাহেবের বেশ মজার মনে হল। সাধারণত এই পরিস্থিতিতে সবাই বলে— না না লাগবে না। লাগবে না।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হতেই বদিউল আলম বলল, আমাকে শোবার জায়গা দেখিয়ে দিন। মতিন সাহেব বললেন, এখুনি শোবে কী? বস, কথাবার্তা বলি। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবে না?

জি না। স্বাধীন বাংলা বেতার শুনবার আমার কোন আগ্রহ নেই।

বল কী তুমি! কখনো শোন না?

শুনেছি মাঝে মাঝে।

তিনি খুই ক্ষুণ্ন হলেন। ছেলেটি স্বাধীন বাংলা বেতার শোনে না সে কারণে নয়। ক্ষুণ্ন হলেন কারণ খাওয়া শেষ করেই সে একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বলতে গেলে এ তার ছেলের বয়েসী। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষের সামনে এ রকম ফট করে সিগারেট ধরানো ঠিক না। তা ছাড়া ছেলেটি দু'বার কথার মধ্যে তাঁকে বলেছে মতিন সাহেব। এ কী কাণ্ড! চাচা বলবে। যদি বলতে খারাপই লাগে কিছু বলবে না। কিন্তু মতিন সাহেব বলবে কেন? তিনি কী তার ইয়ার দোস্তদের কেউ? এ কেমন ব্যবহার?

ঘর ঠিকঠাক করলেন সুরমা। রাত্রি ও অপালার পাশের ছোট ঘরটায় ব্যবস্থা হল। বিন্তির ঘর। বিন্তি ঘুমুবে বারান্দায়। এ ঘরটা ভাঁড়ার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিষ্কার করতে সময় লাগল। তবু পুরোপুরি পরিষ্কার হল না। চৌকির নিচে রসুন ও পেঁয়াজ। বস্তায় ভর্তি চাল-ডাল। এসব থেকে কেমন একটা টকটক গন্ধ ছড়াচ্ছে। সুরমা বললেন, তুমি এ ঘরে ঘুমুতে পারবে তো? না পারলে বল আমি বসার ঘরে ব্যবস্থা করে দেই। একটা ক্যাম্প খাট আছে। পেতে দিব।

লাগবে না।

বাথরুম কোথায় দেখে যাও।

বদিউল আলম বাথরুম দেখে এল।

কোনো কিছুর দরকার হলে আমাকে ডাকবে।

আমার কোনো কিছুর দরকার হবে না।

সুরমা চৌকির এক প্রান্তে বসলেন। বসার ভঙ্গিটা কঠিন। বদিউল আলম কৌতূহলী হয়ে তাঁকে দেখল।

আপনি কী আমাকে কিছু বলতে চান?

হ্যাঁ।

বলুন।

তুমি কে আমি জানি না। কোত্থেকে এসেছ তাও জানি না। কিন্তু কি জন্যে এসেছ তা আন্দাজ করতে পারি।

আন্দাজ করবার দরকার নেই। আমি বলছি কি জন্যে এসেছি। আপনাকে বলতে আমার কোনো অসুবিধা নেই।

তোমার কিছু বলার দরকার নেই। আমি তোমাকে কি বলছি সেটা মন দিয়ে শোন।

বলুন।

তুমি সকালে উঠে এখান থেকে চলে যাবে।

ছেলেটি কিছু বলল না। তাঁর দিকে তাকালও না।

দুটি মেয়ে নিয়ে আমি এখানে থাকি। কোনো রকম ঝামেলার মধ্যে আমি জড়াতে চাই না।

রাত্রির বাবা আমাকে না জিজ্ঞেস করে এসব করেছে। তুমি কী বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাচ্ছি?

পারছি।

তুমি কাল সকালে চলে যাবে।

কাল সকালে যাওয়া সম্ভব না। সব কিছু আগে থেকে ঠিকঠাক করা। মাঝখান থেকে হুট করে কিছু বদলানো যাবে না। আমি এক সপ্তাহ এখানে থাকব। আমার সঙ্গে যারা যোগাযোগ করবে তারা এই ঠিকানাই জানে।

সুরমা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কি রকম উদ্ধত ভঙ্গিতে সে কথা বলছে। এ কি কাণ্ড!

তোমার জন্যে আমি আবার মেয়েগুলিকে নিয়ে বিপদে পড়ব? এসব তুমি কি বলছ?

বিপদে পড়বেন কেন? বিপদে পড়বেন না। এক সপ্তাহের মধ্যে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে। এর পরের বার আমি এখানে উঠব না। আর আপনার মেয়েরা তাদের ফুফুর বাড়িতে থাকুক। এক সপ্তাহ পর আসবে।

তুমি থাকবেই?

হ্যাঁ। অবশ্যি আপনি যদি ভয় দেখান আমাকে ধরিয়ে দেবেন, সেটা অন্য কথা। তা দেবেন না। সেটা বুঝতে পারছি।

সুরমা উঠে দাঁড়ালেন। যে ছেলেটিকে এতক্ষণ লাজুক এবং বিনীত মনে হচ্ছিল এখন তাকে দুর্বিনীত অভদ্র একটি ছেলের মত লাগছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে ছেলেটির এই রূপটিই তার ভাল লাগল। কেন লাগল তিনি বুঝতে পারলেন না।

আলম।

বলুন।

ঢাকা শহরে কী তোমার বাবা-মা'রা থাকেন?

হ্যাঁ থাকেন।

কোথায় থাকেন?

শহরেই থাকেন।

বলতে কী তোমার অসুবিধা আছে?

হ্যাঁ আছে।

তুমি এক সপ্তাহ থাকবে?

হ্যাঁ।

সুরমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। ঘন অন্ধকাবে নগরী ডুবে গেল। ঝুম বৃষ্টি নামল। সুরমা লক্ষ্য করলেন ছেলেটি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। লাল আগুনের ফুলকি উঠানামা করছে।

মতিন সাহেব শোবার ঘরে ট্রানজিস্টার কানে লাগিয়ে বসে আছেন। 'চরমপত্র' শোনা যাচ্ছে। এটি তাঁকে দেখে যে-কেউ বলে দিতে পারবে। তিনি তীব্র কণ্ঠে কিছুক্ষণ পরপরই বলছেন, 'মার লেংগী।' 'মার লেংগী' শব্দটি তাব নিজের তৈবি কবা। একমাত্র 'চরমপত্র' শোনার সময়ই তিনি এটা বলে থাকেন।

সুরমা মোমবাতি নিয়ে ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'কুমিল্লা সেক্টরে তো অবস্থা কেরোসিন করে দিয়েছে। লেংগী মেরে দিয়েছে বলেই খেয়াল হল। এই জাতীয় কথাবার্তা সুরমা সহ্য করতে পারে না। তিনি আশংকা করতে লাগলেন সুরমা কড়া কিছু বলবে। কিন্তু সে কিছুই বলল না।

সুরমা যথেষ্ট সংযত আচরণ করছে বলে তাঁর ধারণা। এখনো ছেলেটিকে নিয়ে কোন হৈচৈ করেনি। প্রথম ধাক্কাটা কেটে গেছে। কাজেই আশা করা যায় বাকিগুলিও কাটবে। অবশ্যি ছেলের আসল পরিচয় জানলে কি হবে বলা যাচ্ছে না। প্রয়োজন না হলে পরিচয় দেয়ারই বা দরকার কী? কোন দরকার নেই।

স্বাধীন বাংলা থেকে দেশাত্মবোধক গান হচ্ছে। তিনি গানের তালে তালে পা ঠুকতে লাগলেন-- 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা। আমাদের এই বসুন্ধরা।' তার চোখ ভিজে উঠল। এইসব গান আগে কতবার শুনেছেন কখনো এ রকম হয়নি। এখন যতবার শোনেন চোখ ভিজে উঠে। বুক হু-হু করে।

রেডিওটা কান থেকে নামাও।

মতিন সাহেব ট্রানজিস্টারটা বিছানার উপর রাখলেন। নিজে থেকে কোনো প্রশ্ন করতে সাহসে কুলাচ্ছে না। সুরমা বললেন, কাল তুমি তোমার বোনের বাসায় গিয়ে বলে আসবে রাত্রি এবং অপালা যেন এক সপ্তাহ এখানে না আসে।

কেন?

তোমাকে বলতে বলছি, তুমি বলবে। ব্যস। এই মাসটা ওরা সেখানেই থাকুক।

আচ্ছা বলব।

আরেকটা কথা।

বল।

ভবিষ্যতে কখনো আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করবে না।

আচ্ছা। এক কাপ চা খাওয়াবে?

এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সুরমাকে সামনে থেকে সরিয়ে দেয়া। সে বসে থাকা মানে স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বঞ্চিত হওয়া।

রাত দশটায় ভয়েস অব আমেরিকা থেকেও একটা ভাল খবর পাওয়া গেল। পূর্ব রণাঙ্গনে বিদ্রোহী সৈন্য এবং পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর ভেতর খণ্ড যুদ্ধ হয়েছে বলে অসমর্থিত খবরে জানা গেছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানে সমগ্র ছোট বড় শহরে পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে। আমেরিকান দু'জন সিনেটার ঐ অঞ্চলের ব্যাপক প্রাণহানিব খবরে উদ্বেগ প্রকাশ কবেছে। সংকট নিরসনের জন্যে আশু পদক্ষেপ নেয়া উচিত বলে তাঁরা মনে করেন।

ভাল খবর হচ্ছে পূর্ব রণাঙ্গনে খণ্ড যুদ্ধ। আমেরিকানদের খবর। এরা তো আর না জেনেশুনে কিছু বলছে না। জেনেশুনেই বলছে। রাত্রি নেই, সে থাকলে এসব খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারতেন। টেলিফোনটাও নষ্ট হয়ে আছে। ঠিক থাকলে ইশারা-ইঙ্গিতে জিজ্ঞেস করা যেত সে ভয়েস অব আমেরিকা শুনছে কিনা।

মতিন সাহেব রেডিও পিকিং ধরতে চেষ্টা করতে লাগলেন। পাশাপাশি অনেকগুলি জায়গায় 'চ্যাং চ্যাং চিন মিন' শব্দ হচ্ছে। এর কোনো একটি রেডিও পিকিংয়ের এক্সটারনাল সার্ভিস। কোনটা কে জানে। রাত এগারোটায় রেডিও অস্ট্রেলিয়া। মাঝে মাঝে রেডিও অস্ট্রেলিয়া খুব পরিষ্কার ধরা যায়। তারা ভাল ভাল খবর দেয়।

তিনি নব ঘুরাতে লাগলেন খুব সাবধানে। তাঁর মন বেশ খারাপ। বিবিসির খবর শুনতে পারেননি। খুব ডিসটারবেন্স ছিল। একটা ভাল ট্রানজিস্টার কেনা খুবই দবকার।

রাত সাড়ে দশটায় ইলেকট্রিসিটি এল। সুবমা লক্ষ্য করল ছেলেটি বারান্দায় রাখা চেয়ারটায় বসে আছে। সারাটা সময় কি এখানেই বসে ছিল? না ঘুমিয়ে পড়েছে বসে থাকতে থাকতে? তিনি এগিয়ে গেলেন। না ঘুমায়নি। জেগেই আছে। চোখে চশমা নেই বলে অন্য রকম লাগছে।

আলম, তোমার কি ঘুম আসছে না?

জি না।

গরম দুধ বানিয়ে দেব এক গ্লাস? গরম দুধ খেলে ঘুম আসে।

দিন।

সুরমা দুধের গ্লাস নিয়ে এসে দেখেন ছেলেটি ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ডেকে তুলতে তাঁর মায়া লাগল। তিনি বারান্দায় বাতি নিভিয়ে অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানে।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। একটি দুটি কবে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

## দুই

সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে একটি অচেনা বাড়িতে দু'দিন কেটে গেল। দু'দিন এবং তিনটি দীর্ঘ রাত। আজ হচ্ছে তৃতীয় দিনের সকাল। আলম পা ঝুলিয়ে বসে আছে। কাজের মেয়েটি এক কাপ চা দিয়ে গেছে। সে চায়ে চুমুক দেয়নি। ইচ্ছে করছে না। অস্থির লাগছে। পেঁয়াজ-রসুনের গন্ধটা সহ্য হচ্ছে না। সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। এই যন্ত্রণার উৎস নিশ্চয়ই পেঁয়াজ রসুনের গন্ধ নয়। সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার জন্যেই এ রকম হচ্ছে। দম আটকে আসছে।

কথা ছিল সাদেক তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে যেদিন সে ঢাকা এসে পৌঁছেছে তার পরদিনই।

যোগাযোগটা হবার কথা কিন্তু এখনো সাদেকের কোনো খোঁজ নেই। ধরা পড়ে গেল নাকি? দলের একজন ধরা পড়ার অর্থই হচ্ছে প্রায় সবারই ধরা পড়ে যাওয়া। এ কারণেই কেউ কারোর ঠিকানা জানে না। কাজের সময়ই সবাই একত্র হবে। তারপর আবার ছড়িয়ে পড়বে। ঝিকাতলার একটি বাসায় কন্ট্রাক্ট পয়েন্ট। সেখানেও যাবার হুকুম নেই। নিতান্ত জরুরি না হলে কেউ সেখানে যাবে না।

সবার দায়িত্ব ভাগাভাগি করা আছে। মালমশলা জায়গামত পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব রহমানের। সেগুলি নিশ্চয়ই পৌঁছে গেছে। রহমান অসাধ্য সাধন করতে পারে। রহমানকে যদি বলা হয়— রহমান, তুমি যাও তো, সিংহের লেজটা দিয়ে কান চুলকে আস। সে তা পারবে। সিংহ সেটা বুঝতেও পারবে না। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে- রহমান অসম্ভব ভীতু ধরনের ছেলে। এ জাতীয় দলে ভীতু ছেলেপুলে রাখাটা ঠিক না। কিন্তু রহমানকে রাখতে হয়েছে।

আলম খাট থেকে নামল। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে চায়ে চুমুক দিল। ঠাণ্ডা চা। সর পড়ে গিয়েছে। ঠাণ্ডার জন্যেই মিষ্টি বেশি লাগছে। বমি বমি ভাব এসে গেছে। সে আবার বিছানায় গিয়ে বসল। কিছু করবার নেই। এ বাড়ির ভদ্রমহিলা গতকাল বিশাল এক উপন্যাস দিয়ে গেছেন। অচিন্তকুমার সেনগুপ্তের 'প্রথম কদম ফুল'। প্রেমের উপন্যাস। প্রেম নিয়ে কেউ এত বড় একটা উপন্যাস ফাঁদতে পারে ভাবাই যায় না। কাকলী নামেব একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে একটি ছেলের। এই রকমই গল্প। কোনো সমস্যা নেই, কোনো ঝামেলা নেই— সুখের গল্প। পড়তে ভাল লাগছে না। তবু ছাপান্ন পৃষ্ঠা পর্যন্ত পড়া হয়েছে। আবার বইটি নিয়ে বসবে কিনা আলম মনস্থির করতে পারল না।

পাশের ঘর থেকে সেলাই মেশিনের খটাং খটাং শব্দ হচ্ছে। মেশিন চলছে তো চলছেই। রাতদিন এই মহিলা কি এত সেলাই করেন কে জানে? ক্লান্তি বলেও তো একটা জিনিস মানুষের আছে। খট খট খটাং চলছে তো চলছেই। গতকাল রাত এগারোটা পর্যন্ত এই কাণ্ড।

আলম হাত বাড়িয়ে 'প্রথম কদম ফুল' টেনে নিল। ছাপান্ন পৃষ্ঠা খুঁজে বের করতে ইচ্ছা করছে না। যে কোনো একটা জায়গা থেকে পড়তে শুরু করলেই হয়। তার আগে একবার বাথরুমে যেতে পারলে ভাল হত। এটা একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। দুটি বাথরুম এ বাড়িতে। একটি অনেকটা দূরে সার্ভেন্টস বাথরুম। অন্যটি এদের শোবার ঘরের পাশে। পুরোপুরি মেয়েলি ধরনের বাথরুম। ঝকঝক তকতক করছে। ঢুকলেই এয়ার ফ্রেশনাবেব মিষ্টি গন্ধ পাওয়া যায়। বিশাল একটি আয়না। আয়নার নিচেই মেয়েলি সাজসজ্জার জিনিস। চমৎকার করে গোছানো। আয়নার ঠিক উল্টোদিকে একটি জলরঙ ছবি ফ্রেমে বাঁধানো। গামছা পরা দুটি বালিকা নদীতে নামছে। চমৎকার ছবি। আয়নার ভেতর দিয়ে এই ছবিটি দেখতে বড় ভাল লাগে। এ জাতীয় একটি বাথরুম বাইরের অজানা-অচেনা এক মানুষের জন্যে নয়।

আলম বই নামিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আর ঠিক তখনই সেলাই মেশিনের শব্দ থেমে গেল। সে এই ব্যাপারটি আগেও লক্ষ্য করেছে। ঘর থেকে বেরুলেই ভদ্রমহিলা সেলাই থামিয়ে অপেক্ষা করেন। কিভাবে তিনি যেন টের পেয়ে যান। আলম বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই সুরমা বেরিয়ে এলেন। তাঁর চোখে বুড়োদের মত একটা চশমা। মাথায় ঘোমটা দেয়া। এটিও আলম লক্ষ্য করেছে— ভদ্রমহিলা মাথায় সব সময় কাপড় দিয়ে রাখেন। হেড মিসট্রেস হেড মিসট্রেস মনে হয় সে কারণেই।

সুরমা বললেন, তোমার কিছু লাগবে?

না, কিছু লাগবে না।

লাগলে বলবে। লজ্জা করবে না।

জি, আমি বলব।

আমাদের টেলিফোন ঠিক হয়েছে। তুমি যদি কাউকে ফোন করতে চাও বা তোমার বাসায় খবর দিতে চাও দিতে পার।

না, আমার কাউকে খবর দেবার দরকার নেই।

সারাক্ষণ ঐ ঘরটায় বসে থাক কেন? বসার ঘরে এসে বসতে পার। বারান্দায় যেতে পার।

আলম চুপ করে রইল। সুরমা বললেন, তুমি তো কোনো কাপড় জামা নিয়ে আসনি। রাত্রির বাবাকে বলেছি তোমার জন্যে শার্ট নিয়ে আসবে। ও তোমার জন্যে কিছু টাকাও রেখে গেছে। বাইরে-টাইরে যদি যেতে চাও তাহলে রিকশা ভাড়া দেবে।

আমার কাছে টাকা আছে।

তুমি কি কোথাও বেরুবে?

দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করব। দুপুরের মধ্যে যদি কেউ না আসে তাহলে বেরুব।

কারোর কি আসার কথা?

হ্যাঁ।

তুমি যখন না থাক তখন যদি সে আসে তাহলে কি কিছু বলতে হবে?

না, কিছু বলতে হবে না। সে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।

সুরমা ভেতরে চলে গেলেন। আবার সেলাই মেশিনের খট খট শব্দ হতে লাগল। ভদ্রমহিলার মাথা ঠিক নেই বোধহয়। কোন সুস্থ মানুষ দিনরাত একটা মেশিন নিয়ে খট খট করতে পারে না। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। অবশ্যি এখন সময়টাই অস্বাভাবিক। সে জন্যেই বোধ হয় চমৎকার এই সকালটাকে মানাচ্ছে না। দুর্বাঘাসের উপর সুন্দর রোদ। বাতাসে সবুজ ঘাস কাঁপছে, রোদও কাঁপছে। অস্বাভাবিক এই বন্দি শহরে এটাকে কিছুতেই মানানো যাচ্ছে না। আলম সিগারেট ধরাল। বিন্তি মেয়েটি নারকেল গাছের নিচে পা ছড়িয়ে বসে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। এই মেয়েটি কি সব সময়ই হাসে? এত সুখী কেন সে?

দুপুর তিনটায় আকাশ মেঘলা হয়ে গেল। বাতাস হল আর্দ্র। দুপুরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে বোধ হয়। আলম গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে। মেঘের গতি-প্রকৃতি বোঝার চেষ্টা হয়ত। কতক্ষণে বৃষ্টি নাবমে আঁচ করা। বিন্তি বলল, কই যান?

কাছেই।

পাঁচটার আগে আইবেন কিন্তু। 'কারপু' আছে।

আসব, পাঁচটার আগেই আসব।

পানওয়ালা ইদ্রিস মিয়াও দেখল ছেলেটি মাথা নিচু করে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে। সেও তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল কম। অল্প যে ক'জন দেখা যায় তাদেব দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, দু'একটা কথা বলবার জন্যে মন চায। ইদ্রিস মিয়া কোনো কথা বলল না। সে আজ চোখে সুরমা দিয়েছে সে জন্যে বোধ হয় চোখ কড় কড় করছে। কিংবা হয়ত চোখ উঠবে। চোখ-উঠা রোগ হয়েছে। চারদিকে সবার চোখ উঠছে।

আলম হাঁটতে হাঁটতে বলাকা সিনেমা হলের সামনে এসে দাঁড়াল। ঢাকা শহরে প্রচুব আর্মির চলাচল বলে যে কথাটা সে শুনেছিল, সেটা ঠিক নয়। আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে সে একটামাত্র ট্রাক যেতে দেখেছে। সেই ট্রাকে ছাই রঙা পোশাক পরা একদল মিলিশিয়া বসে আছে। সাধারণত ট্রাকে সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এরা বসে আছে কেন? ক্লান্ত?

চোখে পড়ার মত পরিবর্তন কি কি হয়েছে এই শহরে? আলম ঠিক বুঝতে পারল না। সে সম্ভবত আগে কখনো এ শহরকে ভালভাবে লক্ষ্য করেনি। প্রয়োজন মনে করেনি। এখন কেন জানি ইচ্ছা করছে আগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে। চারদিকে কেমন যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মনে হচ্ছে। পুরানো বইপত্রের হকাররা যে জায়গাটা দখল করে থাকত সেটা খালি। একটি অন্ধ ভিখিরী টিনের মগ নিয়ে বসে আছে। একে ছাড়া অন্য কোন ভিখিরী চোখে পড়ে না। সব ভিখিরীকে কি এরা মেরে শেষ করে দিয়েছে? দিয়েছে হয়ত।

রিকশায় কিছু বোরকা পরা মহিলা দেখা গেল। মেয়েরা কি আজকাল বোরকা ছাড়া রাস্তায় নামছে না? কিছু কিছু রিকশায় ছোট ছোট পাকিস্তানি ফ্ল্যাগ। চাঁদ তারা আঁকা এই ফ্ল্যাগের বাজার এখন নিশ্চয়ই জমজমাট। যেখানে-সেখানে এই ফ্ল্যাগ উড়ছে। এর মধ্যে একটি প্রতিযোগিতার ভাবও আছে। কার পতাকাটি কত বড়। লাল রঙের তিনকোণা এক ধরনের পতাকাও দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে কি-সব আরবি লেখা। লেখাগুলি তুলে ফেললেই এটা হয়ে যাবে মে দিবসের পতাকা।

আলম একটা রিকশা নিল। বুড়ো রিকশাওয়ালা। ভারী রিকশা টানতে কষ্ট হচ্ছে, তবু প্যাডেল করছে প্রাণপণে। সায়েন্স ল্যাবরেটরির মোড়ে একটা বরযাত্রীর দল দেখা গেল। নতুন বর বিয়ে করে ফিরছে। বিশাল একটা সাদা গাড়ি মালা দিয়া সাজানো। ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে পড়ায় গাড়ি থেমে আছে। আশপাশের সবাই কৌতূহলী হয়ে দেখতে চেষ্টা করছে বর-বউকে। আলমের মনে হল— দেশ যখন স্বাধীন হবে তখন কি এই ছেলেটি একটু লজ্জিত বোধ করবে না? যখন তার যুদ্ধে যাবার কথা তখন সে গিয়েছে বিয়ে করতে। আজ রাতে সে কি সত্যি সত্যি কোনো ভালবাসার

কথা এই মেয়েটিকে বলতে পারবে?

সিগন্যাল পেরিয়ে বরের গাড়ি চলতে শুরু করেছে। বর একটা রুমালে মুখ ঢেকে রেখেছে। বিয়ে হয়ে যাবার পর সাধারণত বররা রুমালে মুখ ঢাকে না। এই ছেলেটি ঢাকছে কেন? সে কি নিজেকে লুকাতে চেষ্টা করছে? দুঃসময়ে বিয়ে করে ফেলায় যে কি খানিকটা লজ্জিত?

জুন মাসে ইয়াদনগরে নদী পার হবার সময় এ রকম একটা বরযাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। দশ-বারো জনের একটা দল। দু'টি নৌকায় বসে আছে। সবার চেহারাই কেমন অস্বাভাবিক। জবুথবু হয়ে বসে আছে। বর ছেলেটি শুটকো মত। তাকে লাগছে উদভ্রান্তের মত। এরা লগীতে নৌকা বেঁধে বসে আছে চুপচাপ। আলমদের দলে ছিল রহমান। সে সব সময়ই বেশি কথা বলে। বরযাত্রী দেখে হাসিমুখে বলল, কি বিয়ে কবতে যান? সাবধানে যাবেন। লঞ্চে করে মিলিটারি চলাচল করছে। ঘনঘন পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলবেন। নওশাকে পাগড়ী পরিয়ে নৌকার গলুইয়ে বসিয়ে রাখলে কেউ কিছু বলবে না। বরযাত্রী দল থেকে কেউ একটি কথাও বলল না। একজন বুড়ো শুধু বিড়বিড় করতে লাগল। বর ছেলেটি কর্কশ গলায় তাকে ধমক দিল চুপ করেন। অত্যন্ত রহস্যময় ব্যাপার।

কিছুক্ষণের মধ্যে জানা গেল, এরা কনে নিয়ে ফিরছিল। বড় নদী ছেড়ে ছোট নদীতে ঢুকার সময় মিলিটারিদের একটা লঞ্চ এদের থামায়, কনে এবং কনের ছোটবোনকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়। ছোট বোনটির বয়স এগারো।

আলম বলল, আপনারা কিছুই বললেন না?

কেউ কোনো উত্তর দিল না। রহমান বলল, খামোকা এইখানে নৌকা থামিয়ে বসে আছেন কেন? বাড়ি চলে যান। তারপর আবার ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশে কি মেয়েব অভাব আছে? অভাব নাই।

লোকগুলি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। যেন কারোর কোন কথাই তাদের মাথায় ঢুকছে না।

আলম ঝিকাতলায় পৌঁছল বিকেল চারটায়। বৃষ্টি পড়ছে টিপটিপ কবে। আকাশ মেঘে মেঘে কালো। অন্ধকার হয়ে এসেছে। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে বাড়ি খুঁজতে হবে। খুঁজে পাওয়া যাবে কি-না কে জানে। সময় অল্প কার্ফুর আগেই ফিরতে হবে।

বাড়ি খুঁজে পাওয়া গেল সহজেই। ঝিকাতলা ট্যানারির ঠিক সামনে ৩৩ নম্বর বাড়ি। দোতলা-দালানের উপরের তালায় থাকেন নজিবুল ইসলাম আখন্দ। কন্‌ট্রাক্ট পয়েন্ট।

দোতলায় উঠে আলমের বিস্ময়ের সীমা বইল না। বিশাল এক তালা ঝুলছে বাড়িতে। দরজা জানালা সবই বন্ধ। তালার সাইজ দেখেই মনে হচ্ছে এ বাড়ির বাসিন্দারা দীর্ঘ দিনের জন্যে বাইরে গেছে এবং সম্ভবত আর ফিরবে না।

একতলায় অনেক ধাক্কাধাক্কি করবার পর দরজা একটুখানি খুলল। ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া একটি মেয়ে বলল, কাকে চান?

আখন্দ সাহেবকে। নজিবুল ইসলাম আখন্দ।

উনি দোতলায় থাকেন। এখন নাই।

কোথায় গেছেন?

দেশের বাড়িতে।

ছেলেমেয়ে সবাইকে নিয়ে গেছেন।

হ্যাঁ।

কবে গেছেন।

তিন দিন আগে। উনার ছোট ভাই মারা গেছে দেশের বাড়িতে।

ও আচ্ছা।

মেয়েটি দরজা বন্ধ করে দিল। এ তো একটা সমস্যায় পড়া গেল। আলম শুকনো মুখে বের হয়ে এল। বাসায় ফিরল হেঁটে হেঁটে। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। এর মধ্যে হাঁটতে ভালই লাগছে। তার সারাক্ষণই মনে হতে লাগল বাসায় পৌঁছে দেখবে সাদেক বিরক্তমুখে অপেক্ষা করছে। পরদিনই কাজে নেমে পড়া যাবে। কাজকর্ম ছাড়া চুপচাপ বসে থাকাটা আর সহ্য হচ্ছে না।

বারান্দায় উদ্বিগ্ন মুখে মতিন সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন। আলমকে দেখেই বললেন, কাউকে কিছু না বলে কোথায় গিয়েছিলেন? আমি চিন্তায় অস্থির। একটু পরেই কার্ফু শুরু হয়ে যাবে।

আলম সহজ স্বরে বলল, আমার কাছে কেউ এসেছিল?

না, কেউ আসে নাই। ভিজতে ভিজতে এলে কোত্থেকে? গিয়েছিলে কোথায়?

আলম কোনো জবাব না দিয়ে বসার ঘরে ঢুকে পড়ল। বসার ঘরের সাজসজ্জার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। সোফা একপাশে সরিয়ে একটা ক্যাম্পখাট পাতা হয়েছে। ক্যাম্পখাটে অচিন্তকুমারের 'প্রথম কদম ফুল'। তার মানে শোবার জায়গার বদল হয়েছে। মতিন সাহেব ইতস্তত করে বললেন, আমার মেয়েরা চলে এসেছে। কাজেই তোমাকে বসার ঘরে নিয়ে এলাম। তোমার অসুবিধা হবে না তো?

না, অসুবিধা কিসের?

আমার বড় মেয়ে একটু ইয়ে ধরনের মানে...মতিন সাহেব কথা শেষ করলেন না, মাঝ-পথে থেমে গেলেন। আলম বলল, আমার কোনো অসুবিধা নেই। আপনি চিন্তা করবেন না।

মতিন সাহেব নিচু গলায় বললেন, আলম আরেকটা কথা ইয়ে- মানে আমাদের আরেকটা বাথরুম যে আছে ঐটিতে তুমি যাবে। ঐটা আমি পরিষ্কার করেছি। মানে প্রবলেমটা তোমাকে বলি...প্রবলেমটা হল...

আপনাকে প্রবলেম বলতে হবে না। আমার কোনো অসুবিধা নেই।

আলম সিগারেট ধরিয়ে ক্যাম্প খাটে বসল। মতিন সাহেব হা হা করে উঠলেন, ভেজা কাপড়ে বিছানায় বসছ কেন? কাপড় জামা ছাড়। আমি তোমার জন্য শার্ট আর লুঙ্গি কিনেছি।

থ্যাংক য়্যু।

বারো-তেরো বছরের শান্ত চেহারার একটি মেয়ে উঁকি দিল। এর নামই বোধ হয় অপালা। মতিন সাহেব বললেন, তোর আপাকে ডেকে আন, পরিচয় করিয়ে দেই।

মেয়েটি ভেতরে চলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিবে এসে বলল, আপা আসবে না।

মতিন সাহেব খুব লজ্জায় পড়ে গেলেন। আলম বলল, তোমার নাম অপালা?

হ্যাঁ।

কেমন আছ অপালা?

ভাল।

বস।

না, আমি বসব না।

মেয়েটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ রকম বাচ্চা মেয়ের চোখ এত তীক্ষ্ণ কেন? এদের চোখ হবে কোমল। আলম সিগারেট ধরাল। মেয়েটি এখনো তাকে মন দিয়ে লক্ষ্য করছে। কেন করছে কে জানে।

অপালা চোখ ফিরিয়ে নিল। শীতল গলায় বলল, আপনি 'প্রথম কদম ফুল' বইটার একটা পাতা ছিঁড়ে ফেলেছেন। বই ছিঁড়লে আমি খুব রাগ করি।

আর ছিঁড়ব না।

পাতাও মুড়বেন না। এটা আমার খুব প্রিয় বই।

আলম হেসে ফেলল।

## তিন

রাত্রি সারাদিন খুব গম্ভীর ছিল। সন্ধ্যার পর আরো গম্ভীর হয়ে পড়ল। পৌনে আটটা থেকে আটটা পর্যন্ত বিবিসি বাংলা খবর দেয়। সে খবর শুনবার জন্যেও তার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। সবাইকে বলল তার মাথা ধরেছে।

সুরমা অপালাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওর কি হয়েছে? অপালা গম্ভীর হয়ে বলল – ফুফুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। সুরমা খুবই অবাক হলেন। রাত্রি কারো সঙ্গে ঝগড়া করার মেয়ে নয়। সে সব কিছুই নিজের মনে চেপে রাখে। সুরমা বললেন, কি নিয়ে ঝগড়া হল?

জানি না কি নিয়ে। ফুফু ওকে আলাদা ডেকে নিল।

এতক্ষণ এই কথা বলিসনি কেন?

মনে ছিল না।

মনে ছিল না মানে?

আপা আমাকে কিছু বলতে মানা করেছে।

অপালা গল্পের বইয়ে মাথা ডুবিয়ে ফেলল। মার কোন কথাই আসলে তার মাথায় ঢুকছে না। তার বিরক্ত লাগছে। কোন একটা গল্পের বই শুরু করলে অন্য কিছু তার আর ভাল লাগে না। যে গল্পের বইটি সে নিয়ে বসেছে তার নাম 'আলোর পিপাসা'। এই বইটি সে আগেও বেশ কয়েকবার পড়েছে। প্রতিটি লাইন তার মনে আছে, তবু পড়তে ভাল লাগছে। অপালার বয়স তেরো। রোগা বলে তাকে বয়সের তুলনায় ছোট মনে হয়। এটা তার খুব খারাপ লাগে। তেরো বছর বয়সটা তার পছন্দ নয়। যুদ্ধ শুরু হবার আগে তাদের যে প্রাইভেট মাস্টার ছিল তাকে একদিন সে বলেছে— স্যার, আমার বয়স পনেরো। বেশি বয়সে পড়ালেখা শুরু করেছি তো এই জন্যে ক্লাস এইটি পড়ি। ছোটবেলায় খুব অসুখ-বিসুখে ভুগতাম। পড়াশুনা করতে এই জনেই দেরি হয়ে গেল।

অপালার এ জাতীয় কথাবার্তা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় খুব ঝামেলা হয়েছিল। সুরমা শুধু বকাবকি করেই চুপ থাকেনি, চড় বসিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাইভেট মাস্টারটিকে বদলে দিয়ে বুড়ো ধরনের একজন টিচার রাখলেন। এ জাতীয় ঝামেলা অপালা প্রায়ই তৈরি করে। কয়েকদিন আগেই একটা হল। কি-এক উপন্যাস পড়ে তার খুব ভাল লেগেছে। উপন্যাসের নায়িকার নাম মনিকা। সে মনিকা নাম কেটে সমস্ত বইতে নিজের নাম বসিয়েছে। এ নিয়েও মা ঝামেলা করেছেন। তিনি সাধারণত বই-টই পড়েন না। অপালা কেন নায়িকার নামের জায়গায় নিজের নাম বসিয়েছে সেটা জানবার জন্যেই বইটি পড়লেন এবং রাগে তাঁর গা জ্বলে গেল। কারণ উপন্যাসের নায়িকা মনিকা তিনটি ছেলেকে ভালবাসে। ছেলেগুলি সুযোগ পেলেই তাকে জড়িয়ে ধরে। মনিকা কোন বাধা দেয় না। এর মধ্যে একটি ছেলে বেশি রকম সাহসী। সে শুধু গায়ে হাত দিতে চায়। মনিকা তার এই স্বভাব সহ্যই করতে পারে না, তবু তাকেই সে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে। ভয়াবহ ব্যাপার।

অপালাকে নিয়ে সুরমার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। তাকে তিনি চোখে চোখে রাখতে চান। নিজে স্কুলে দিয়ে আসেন এবং নিয়ে আসেন। এখন স্কুল বন্ধ বলে এই ঝামেলাটা করতে হচ্ছে না। কিন্তু ওর কোনো টেলিফোন এলে তিনি আড়াল থেকে কথাবার্তা শুনতে চেষ্টা করেন।

রাত্রিকে নিয়ে এ রকম কোনো ঝামেলা হয়নি। রাত্রি যে বড় হয়েছে এটা সে কখনো কাউকে বুঝতেই দেয়নি। একবার শুধু খানিকটা অস্বাভাবিক আচরণ করেছিল। ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে যখন পড়ে তখনকার ঘটনা। গরমের ছুটি চলছে। সে সময় সকাল দশটায় এক ছেলে এসে উপস্থিত। সে নাকি রাত্রির সঙ্গে পড়ে। সেলিম নাম। সুরমা অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন রাত্রি কেমন অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কথাবার্তা বলতে লাগল উঁচু গলায়। শব্দ করে হাসতে লাগল। এবং এক সময় মাকে এসে বলল, 'মা ওকে আজ দুপুরে খেতে বলি? হলে থাকে, হলের খাবার খুব খারাপ।' সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বললেন— 'অজানা-অচেনা ছেলে দুপুর বেলায় এখানে খাবে কেন? ওকে যেতে বল।' রাত্রি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'অচেনা ছেলে নয় তো মা। আমার সঙ্গে পড়ে।'

সুরমা শক্ত গলায় বললেন, ক্লাসের ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্যে দুপুর বেলায় বাসায় আসে— এটা আমার পছন্দ নয়। ওকে যেতে বল।

এটা আমি কি করে বলব মা?

যেভাবে বলার সেভাবে বলবি।

রাত্রি চোখ-মুখ লাল করে কথাটা বলতে গেল। এবং বলে এসে সমস্ত দিন কাঁদল। সুরমা কিছুই বললেন না। কারণ তিনি জানেন এই সাময়িক আবেগ কেটে যাবে। এখানে তাঁকে শক্ত হতেই হবে। ছেলেটিকে তিনি যদি খেতে বলতেন সে বার বার ঘুরে ঘুরে এ বাড়িতে আসত। রাত্রির মত একটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করার লোভ সামলানো কঠিন ব্যাপার। মেয়ে হয়েও সুরমা তা বুঝতে পারেন। বারবার আসা-যাওয়া থেকে একটা ঘনিষ্ঠতা হত। এই বয়সে কাঁচা আবেগের ফল কখনো শুভ হয় না।

সুরমা ভেবে পেলেন না রাত্রি তার ফুফুর সঙ্গে কি নিয়ে ঝগড়া করবে? তার ফুফুকে সে খুবই পছন্দ করে। তাদের যে সম্পর্ক সেখানে ঝগড়া হবার সুযোগ কোথায়? নাসিমাকে একটা টেলিফোন করা যেতে পারে কিন্তু তার আগে রাত্রির সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু রাত্রি কী কিছু বলবে? সুরমা অস্বস্তি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

রাত্রি চুল আঁচড়াচ্ছিল। মাকে দেখে অল্প হাসল। সুরমা মনে মনে ভাবলেন— এই মেয়েটি কি সত্যি আমার? এমন মায়াবতী একটা মেয়ের জন্ম দেবাব মত ভাগ্য আমার কী করে হয়? সুরমা

বললেন, আয় চুল বেঁধে দি।

আস্তে করে বাঁধবে মা। তুমি এত শক্ত করে বাঁধ যে মাথাব্যথা করে।

রাত্রি মাথা পেতে দিল। তিনি চিরুনী টানতে টানতে বললেন— নাসিমার সঙ্গে তোর নাকি ঝগড়া হয়েছে?

ঝগড়া হবে কেন?

অপালা বলছিল।

অপালা কত কিছুই বলে।

ঝগড়া হয়নি তাহলে?

না। কি যে তুমি বল মা। আমি কি ঝগড়া করবার মেয়ে?

সুরমা শান্ত গলায় বললেন— তার মানে কি এই যে অন্য কোনো মেয়ে হলে ঝগড়া করত?

রাত্রি হেসে ফেলল. কোনো উত্তর দিল না। সুরমা বললেন, নাসিমা তোকে কি বলছিল?

তেমন কিছু না।

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। কারণ তিনি জানেন জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। রাত্রি বসে আছে মাথা নিচু করে। মেয়েটি প্রতিদিনই কি সুন্দর হচ্ছে? সুরমার সূক্ষ্ম একটা ব্যথা বোধ হল। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, ঐ ছেলেটি কে মা?

কোন ছেলে?

আমাদের বসার ঘরে যে ছেলেটি আছে?

তোর বাবার দূর-সম্পর্কের ভাগ্নে। আমি ঠিক জানি না।

কথাটা তো মা তুমি মিথ্যা বললে। আমি শুনেছি সে বাবাকে মতিন সাহেব. মতিন সাহেব বলছিল।

সুরমা ঝাঁঝাল স্বরে বললেন, আমি জানি না সে কে।

এটাও তো মা ঠিক না। তুমি কিছু না জেনেশুনে একটা ছেলেকে থাকতে দেবে না। তোমাব স্বভাবের মধ্যে এটা নেই।

সুরমা কিছু বললেন না। রাত্রি বলল, আমি কারোর সঙ্গে মিথ্যা কথা বলি না। কেউ যখন আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলে আমার ভাল লাগে না। সুরমা থেমে বললেন, ছেলেটি ঢাকায গেবিলা অপারেশন চালানোর জন্যে এসেছে। তোর বাবা জুটিয়েছে। বুধবার পর্যন্ত থাকবে। এব বেশি কিছু আমি জানি না।

রাত্রি কিছু বলল না। এটা একটা বড় ধরনের খবর। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা ব্যাপার। কিন্তু রাত্রির কোন ভাবান্তর হল না। সে যে ভাবে বসে ছিল সে ভাবেই বসে বইল।

নাসিমাদের বাসার টেলিফোন লাইনে কোন-একটা গণ্ডগোল আছে। টেলিফোন করলেই অন্য এক বাড়িতে চলে যায়। বুড়োমত এক ভদ্রলোক বলেন, ড. খয়ের সাহেবের বাড়ি। কাকে চান? আজ ভাগ্য ভাল। টেলিফোনে নাসিমাকে পাওয়া গেল। সুরমা বললেন, রাত্রির সঙ্গে তোমাব নাকি ঝগড়া হয়েছে? অপালা বলছিল।

ঝগড়া হয়নি ভাবী। যা বলার আমিই বলেছি। ও শুধু শুনেছে।

কি নিয়ে কথা?

রাত্রির বিয়ের ব্যাপারে। ছেলের মা এসেছিলেন রাত্রির সঙ্গে কথা বলতে। বাত্রি পাথরের মত মুখ করে বসে রইল।

আমাকে তো এসব কিছু বলনি!

বলার মত কিছু হয়নি।

আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা বলছ আর আমি কিছু জানব না?

সময় হলেই জানবে। সময় হোক। ভাবী, রাত্রির জন্যে আমি যে ছেলে আনব সে ছেলে তোমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারবে না। রাত্রির ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। তোমার তো আরো একটি মেয়ে আছে। ওর বিয়ে তুমি দিও।

নাসিমা।

বল।

এ সময়ে মেয়ের বিয়ে-টিয়ে নিয়ে কথা হোক এটা আমি চাই না। মেয়ের আমি বিয়ে দেব

সুসময়ে।

সুসময়ের দেরি আছে ভাবী। ছ'সাত বৎসরের ধাক্কা। তা ছাড়া...

তা ছাড়া কি?

এ রকম সুন্দরী অবিবাহিতা একটি মেয়ে এ সময় কেউ ঘরে রাখছে না। গণ্ডায় গণ্ডায় বিয়ে হচ্ছে রোজ। এইট নাইনে পড়া মেয়েদেরও বাবা-মা পার করে দিচ্ছে। আমাদের নিচের তলার রফিক সাহেব কি করেছেন শোন...

সুরমা থমথমে গলায় বললেন, রফিক সাহেবের কথা অন্য একদিন শুনব। আজ না। আমার মাথা ধরেছে।

রাত এগারোটা প্রায় বাজে। মতিন সাহেব জেগে আছেন এখনো। রেডিও অস্ট্রেলিয়া শোনা হয়নি। রাত্রিও জেগে আছে। রেডিও অস্ট্রেলিয়া ধরে দেবার দায়িত্ব তার। ফাইন টিউনিং সে খুব ভাল পারে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর রাতে মতিন সাহেব মেয়ের সঙ্গে মৃদু স্বরে কথা বলতে পছন্দ করেন। কথা একনাগাড়ে তিনিই বলেন। অবিশ্বাস্য আজগুবি গল্প। রাত্রি কোনোটিতেই প্রতিবাদ করে না। হাসিমুখে শুনে যায়।

আজ মতিন সাহেব এক পীর সাহেবের গল্প ফাঁদলেন। পীর সাহেবের বাড়ি যশোহর। তিনি এখন কিছুদিনের জন্য আছেন ঢাকায়। টিক্কা খানের মিলিটারি এডজুটেন্ট নাকি তাকে নিয়ে গিয়েছিল ক্যান্টনমেন্টে। টিক্কা খান খুব বিনীতভাবে পীর সাহেবকে বললেন দোয়া করতে। উত্তরে পীর সাহেব বললেন - তোমাদের সামনে মহাবিপদ। তোমাদের একজনও এই দেশ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না। এক লাখ কবর উঠবে বাংলাদেশে।

রাত্রি বলল, তুমি এই গল্প শুনলে কোত্থেকে? মতিন সাহেব বললেন, আমাদের ক্যাশিয়ার সাহেবের কাছে শুনলাম। উনি ঐ পীর সাহেবের মুরিদ। নিজেও খুব সুফী মানুষ। বানানো গল্প বলার লোক না।

মিলিটারি কি আর পীর-ফকিরের কাছে যাবে বাবা?

এমনিতে কি আর যাচ্ছে? ঠেলায় পড়ে যাচ্ছে? ঠেলায় পড়লে বাঘেও ধান খায়! কি রকম লেংগী যে খাচ্ছে তুই এখানে বসে কি বুঝবি। বুঝতে হলে ফ্রন্টে যেতে হবে। তবে দু'একটা দিন অপেক্ষা কর, দেখ কি হয়।

কী হবে?

আজদহা নেমে গেছে ঢাকা শহরে। কাঁকড়া বিছার দল। মিলিটারি কাঁচা খাওয়া শুরু করবে।

গেরিলারা ঢাকায় এসেছে নাকি বাবা?

আসবে না তো কি করবে মার কোলে বসে থাকবে? ঢাকা ছেয়ে ফেলেছে। দু'একদিনের মধ্যে অপারেশন শুরু হবে। একবার অপারেশন শুরু হলে দেখবি সব কটা জেনারেলের আমাশা হয়ে গেছে। বদনা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে সবাই।

রাত্রি হেসে ফেলল। বাবা এমন ছেলেমানুষি বিশ্বাস নিয়ে কথা বলেন যে বড় মায়া লাগে। মাঝে মাঝে রাত্রি ভাবতে চেষ্টা করে এ দেশে এমন কেউ কি আছে যে এই দেশকে তার বাবার চেয়ে ভালবাসে?

বাবা।

কী?

শুয়ে পড় বাবা। ঘুমাও।

ঘুম ভাল হয় না রে মা। সব সময় একটা আতংকের মধ্যে থাকি।

একদিন এই আতংক কেটে যাবে। আমরা সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমুব।

মতিন সাহেবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি গলার স্বর অনেকখানি নিচে নামিয়ে বললেন, আমাদের বাসায় যে ছেলেটা আছে সে কে বল তো মা? দেখি তোর কেমন বুদ্ধি।

রাত্রি চুপ করে রইল। মতিন সাহেব ফিসফিস করে বললেন, বলতে পারলি না? জানি পারবি না। ও হচ্ছে সাক্ষাৎ আজদহা, আবাবিল পক্ষী। ছারখার করে দিবে। কিছু বুঝতে পারলি?

পারছি।

দেখে মনে হয়?

আমার সঙ্গে এখনো দেখা হয়নি।

কথা বলে দেখ, মনে হবে সাধারণ বাঙালি ঘরের ছেলে।

উনি তো বাঙালি ঘরের ছেলেই বাবা।

আরে না। ছেলেতে ছেলেতে ডিফারেন্স আছে না? এরা হচ্ছে সাক্ষাৎ আজদহা।

আজদহাটা কি?

মতিন সাহেব জবাব দিতে পারলেন না। আজদহা কি সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট নয়। কথাটা তিনি অফিসে শুনেছেন। গেরিলা প্রসঙ্গে কে যেন বলেছিল - তাঁর খুব মনে ধরেছে।

রাত্রি বলল, বাবা, তুমি কি ইনার কথা কাউকে বলেছ?

আরে না। কি সর্বনাশ! কাউকে বলা যায় নাকি?

তুমি তো পেটে কথা রাখতে পার না বাবা। এই তো আমাকে বলে ফেললে।

তিনি চুপ করে গেলেন। রাত্রি বলল, ভাল করে মনে করে দেখ, কাউকে বলনি?

না।

তোমাদের ক্যাশিয়ার সাহেব, তাঁকেও না?

না।

বাবা, ভাল করে ভেবে দেখ। জানাজানি হলে বিরাট বিপদ হবে।

আরে না। তুই পাগল হলি নাকি?

দুধ খাবে বাবা? শোবার আগে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে শোও। ভাল ঘুম হবে। দুধ না, চা খেতে ইচ্ছা করছে। তোর মাকে না জাগিয়ে এক কাপ চা বানিয়ে দে।

রাত্রি উঠে দাঁড়াল।

আলম হকচকিয়ে গেল।

প্রায় মাঝরাতে এমন একটি রূপবতী মেয়ে অসংকোচে তার সামনে চায়েব কাপ নামিয়ে রাখবে এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই মেয়েটি রাত্রি, এটা বোঝা যাচ্ছে কিন্তু তার কাণ্ডকারখানা বোঝা যাচ্ছে না। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, বাবার জন্যে চা বানাতে হল। আপনি জেগে আছেন, তাই আপনার জন্যেও বানালাম। ঠিক কি বললে ভাল হয় আলম বুঝতে পারল না। মেয়েটি চলেও যাচ্ছে না। তাকে কী বসতে বলা উচিত? কিন্তু এটা তারই বাড়ি। তার বাড়িতে তাকে বসতে বলার মানে হয় না।

আমি এ বাড়ির বড় মেয়ে। আমার নাম রাত্রি।

আপনি কেমন আছেন?

'আপনি কেমন আছেন' বলে আলম আরো অস্বস্তিতে পড়ল। বোকার মত একটি প্রশ্ন করা হয়েছে। এবং মেয়েটি তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে। কারণ সে এই প্রশ্নের কোন জবাব দেয়নি। আলমের মনে হল মেয়েটি যেন একটু হাসল।

রাত্রি বলল, আপনি কী আমার ওপর রাগ করেছিলেন?

রাগ করব কেন?

বিকেলে বাবা আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিল তখন আসিনি সে জন্যে।

আরে না। ঐসব নিয়ে আমি ভাবিইনি।

আমার মন খারাপ ছিল তখন, তাই আসিনি। আমার ফুফুর ওপর রাগ করেছিলাম।

ও আচ্ছা।

আপনি বোধ হয় চা-টা খাবেন না। দিন নিয়ে যাই।

না আমি খাব।

আলম চায়ে চুমুক দিল। রাত্রি বলল— কিছু বলবেন না?

কি বলব?

ভদ্রতা করে কিছু বলা। যেমন চা-টা খুব ভাল হয়েছে এ জাতীয়।

রাত্রি হাসছে। আলম ধাঁধায় পড়ে গেল। এই বয়েসী মেয়েদের সঙ্গে তার কথা বলার অভ্যেস নেই। খুবই অস্বস্তি লাগছে। সে বুঝতে পারছে তার গাল এবং কান লাল হতে শুরু করেছে। ইচ্ছে করছে এ জায়গা থেকে কোনোমতে ছুটে পালিয়ে যেতে এবং একই সঙ্গে মনে হচ্ছে এই মেয়েটি

এক্ষুণি যেন চলে না যায়। যেন সে থাকে আরো কিছুক্ষণ। আলমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল।

রাত্রি বলল, যাই। আপনি শুয়ে পড়ুন।

আলম অনেক রাত পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইল। অদ্ভুত এক ধরনের কষ্ট হতে লাগল তার। এই কষ্টের জন্ম কোথায় তার জানা নেই।

রাত বাড়ছে। চারদিক চুপচাপ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আবারো হয়ত ঝড়-বৃষ্টি হবে। হোক, খুব হোক। সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাক।

আলম বাতি নিভিয়ে দিল। আজ রাতেও ঘুম আসবে না। জেগে কাটাতে হবে। ঢাকায় আসার পর থেকে এমন হচ্ছে। কেন হচ্ছে? আগে তো কখনো হয়নি। সে কি ভয় পাচ্ছে? ভালবাসা, ভয়, ঘৃণা, এসব জিনিসের জন্ম কোথায়?

তার পানির পিপাসা হল। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছে না।

## চার

শরীফ সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। নিজেব চোখকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আলম বলল, কথা বলছ না কেন মামা? কেমন আছ?

ভাল আছি। তুই কোত্থেকে। বেঁচে আছিস এখনো?

আছি। বাসা অন্ধকার কেন? মামি কোথায়?

দেশের বাড়িতে। তুই এখন কোনো প্রশ্ন কববি না। কিছুক্ষণ সময় দে নিজেকে সামলাই।

শরীফ সাহেব সোফায় বসে সত্যি সত্যি বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন। আলম বলল, বাসার খবর বল। সবাই আছে কেমন?

তুই বাসায় যাসনি?

না।

সরাসরি আমার এখানে এসেছিস?

তাও না। ঢাকাতেই আছি কয়েকদিন ধবে।

তোর কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঢাকায় আমি একটা কাজ নিয়ে এসেছি মামা।

আই সি।

এখন বল বাসার খবর।

বাসার খবর তোকে কেন বলব? তোর কী কোন আগ্রহ আছে, না কোন দায়িত্বজ্ঞান আছে? বোন আর মাকে ফেলে চলে গেলি দেশ উদ্ধারে। ওদের কথা ভাবলি না?

তোমরা আছ, তোমরা ভাববে।

প্রথম রেসপনসিবিলিটি হচ্ছে নিজেব পরিবারের জন্যে। এই সাধারণ কথাটা তোরা কবে বুঝবি?

আলম হেসে ফেলল। শরীফ সাহেব রেগে গেলেন। মানুষটি ছোটখাটো। ফাইন্যান্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি। যতটা না বয়েস তার বেয়েও বুড়ো দেখাচ্ছে। মাথার সমস্ত চুল পেকে গেছে। মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে। আলম বলল মামা, বাসার খবর তো এখনো দিলে না। ওরা কেমন আছে?

ভালই।

মা'র শরীর কেমন?

শরীর ঠিকই আছে। শরীর একটা আশ্চর্য জিনিস, এটা ঠিকই থাকে।

তোমার তো তাও ঠিক নেই মামা, বুড়ো হয়ে গেছ।

তা হয়েছি। একা থাকি। রাতে ঘুম-টুম হয় না।

আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকলেই পার।

পাগল হয়েছিস। ঐ বাড়ির ওপর নজর রাখছে না। তুই যুদ্ধে গেছিস সবাই জানে। তোর মাকে থানায় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে।

আর কোনো ঝামেলা করেনি?

করত। তোর বাবার জন্যে বেঁচে গেলি। ভাগ্যিস সে মরবার আগে 'তমঘায়ে খিদমত'টা পেয়েছিল।

শরীফ সাহেব শার্ট গায়ে দিলেন। জুতো পরলেন।

যাচ্ছ কোথায় মামা?

অফিসে। আর কোথায় যাব? তুই কি ভেবেছিলি — যুদ্ধে যাচ্ছি?

অফিস-টফিস করছ ঠিকমতই?

করব না? তোর মত কয়েকজন চেংড়া ছোড়া দু'একটা গুলি-টুলি করবে আর এতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে? দিল্লি হনুজ দূরঅস্ত। তাছাড়া পলিটিক্যাল সল্যুশন হয়ে যাচ্ছে। খুব হাই লেভেলে কথাবার্তা হচ্ছে। আমেরিকা চাপ দিচ্ছে। আমেরিকার চাপ কি জিনিস তোরা বুঝবি না। স্যাকরার ঠুকঠাক কামারের এক ঘা।

আলম হাসতে লাগল। এই মামার সঙ্গে তার খুবই ভাব। একজন সৎ এবং সত্যিকার অর্থে ভাল মানুষ। তাঁর একটি মাত্র দোষ— উল্টো তর্ক করা। আলমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি মুক্তিযুদ্ধকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এই তিনিই আবার পাকিস্তানি ভাব আছে এমন কারোর সঙ্গে কথা বলবার সময় এমন যুক্তি দেবেন যাতে মনে হবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে দেশ স্বাধীন হচ্ছে।

আলম।

জি।

তোর মার সঙ্গে দেখা করবি না?

না।

ভাল। লায়েক ছেলে তুই। যা ভাল মনে করিস তাই করবি। আমার এখানে থাকতে চাস?

না।

তোর কি ধারণা আমার এখানে উঠলেই তোকে আমি মিলিটারির হাতে ধরিয়ে দেব?

তোমাদের কোনো ঝামেলায় ফেলতে চাই না।

এসেছিস কী জন্যে আমার কাছে?

দেখতে এলাম।

যা দেখার ভাল করে দেখে নে। দশ মিনিট সময়। দশ মিনিটের মধ্যেই বেরুব।

আলম উঠে দাঁড়াল। শরীফ সাহেব বললেন, তুই কোথায় আছিস ঠিকানাটা রেখে যা।

ঠিকানা দেয়া যাবে না মামা। মাকে বলবে আমি ভাল আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

আমি বললে বিশ্বাস করবে না। তুই মরে গেছিস এটা বললে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করবে, বেঁচে আছিস বললে করবে না। তুই একটা কাজ কর, একটা কাগজে লেখ — আমি ভাল আছি। তারপর নাম সই করে দে। আজকের তারিখ দিবি।

আলম লিখল— 'ভাল আছি মা'। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে লিখল, 'শিগগির তোমাকে দেখতে আসব।'। দ্বিতীয় লাইনটি লিখে তার একটু খারাপ লাগতে লাগল। শিগগিরই তোমাকে দেখতে আসব' এই লাইনটিতে কোথায় যেন একটু বিষাদের ভাব আছে। দেখতে আসা হবে না এই কথাটি যেন এর মধ্যে লুকানো।

শরীফ সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, একটা লাইন লিখতে গিয়ে বুড়ো হয়ে যাচ্ছিস দেখি। তাড়াতাড়ি কর।

আলম কাগজটা মামার হাতে ধরিয়ে নিউ পল্টনে চলে এল। বসবার ঘরে সাদেক তার জন্যে অপেক্ষা করছে।

সাদেককে কেমন অচেনা লাগছে।

ফর্সা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একজন মানুষ। সে গোঁফ ফেলে দিয়েছে। লম্বা চুল ছিল। সেগুলি কেটেছে। জুতো জোড়াও চক চক করছে। আলম বলল, খোলস পাল্টে ফেলেছিস মনে হচ্ছে। চেনা যাচ্ছে না।

ঢাকা শহরে ঢুকলাম এতদিন পর। সেজেগুজে ঢুকব না? তুই ছিলি কোথায়? দেড় ঘন্টা ধরে এক জায়গায় বসে আছি।

আজ আসবি বুঝব কী করে? আমি তো ভাবলাম প্রোগ্রাম ক্যানসেল। সব বাতিল।

ক্যানসেল হওয়ার মতই।

কী বললি?

রহমানের খোঁজ নেই। নো ট্রেস।

নো ট্রেস মানে?

নো ট্রেস মানে নো ট্রেস। সে আমার সঙ্গেই ঢাকায় ঢুকেছে। তারপর যেখানে যাবাব কথা সেখানে যায়নি। কোথায় আছে তাও কেউ জানে না। একগাদা এক্সপ্লোসিভ তার সাথে।

বলিস কী?

আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গিয়েছিল। ডুব মারলাম। তিনদিন ডুব দিয়ে থাকার পর গেলাম ঝিকাতলা। কনটাক্ট পয়েন্টে। সেখানেও ভোঁ ভোঁ। কেউ নেই।

এখন ব্যাপারটা কোন পর্যায়ে আছে?

বলছি। তার আগে বাথরুমে যাওয়া দরকার। কিডনি ফেটে যাওয়ার মতো অবস্থা। হেভি প্রেসার।

আলম ইতস্তত করে বলল, এখানে বাথরুমের একটু অসুবিধা আছে। বাইরে চলে যা, রাস্তার পাশে কোথাও বসে পড়। সাদেক বেরিয়ে গেল। এ বাড়িতে এসে সে খানিকটা ধাঁধায় পড়ে গেছে। দেড় ঘণ্টা একা একাই বসে ছিল। এর মধ্যে ঘোমটা দেয়া এক মহিলা এসে বললেন, আলম বাইরে গেছে। এসে পড়বে। তুমি বস। এ রকম শীতল কণ্ঠ সাদেক এর আগে শোনেনি। যেন একজন মরা মানুষ কথা বলছে।

প্রায় আধঘণ্টা পর বাইশ-তেইশ বছর বয়েসী চকলেট রঙা শাড়ি পরা একটি মেয়ে এসে ঢুকল এবং সরু চোখে তাকিয়ে রইল। এ রকম রূপবতী মেয়েদের সাধারণত সিনেমা পত্রিকার কভারে দেখা যায়। বাড়িতে তাদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়। সাদেক ঘাবড়ে গিয়ে বলল, কিছু বলবেন আমাকে? মেয়েটি তার মার মত শীতল গলায় বলল, আপনি কী দুপুরে এখানে খাবেন?

কি অদ্ভুত কথা। অচেনা, অজানা একটা মানুষকে কেউ এভাবে বলে নাকি? সাদেক অবশ্যি নিজেকে চট করে সামলে নিয়ে বলল, জি খাব। দুপুরে কী রান্না হচ্ছে?

মেয়েটি এই কথার জবাব দেয়নি। ভেতরে চলে গেছে। তারপর খটাং খটাং শব্দ। সেলাই মেশিন চলতে শুরু করেছে। মেয়েটি চায়ের কাপ নিয়ে এসেছে কিছুক্ষণ পর। কাপ নামিয়ে বলেছে চিনি লাগবে কিনা বলুন।

না লাগবে না।

চুমুক দিয়ে বলুন। চুমুক না দিয়েই কিভাবে বললেন?

সাদেক চুমুক দিয়েছে। তার বাথরুমে যাওয়া দরকার ছিল। কিন্তু এ রকম রূপবতী একটি মেয়েকে নিশ্চয়ই বলা যায় না আমি একটু ইয়েতে যাব। সাদেক বসে বসে তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'প্রথম কদম ফুল' পড়ে ফেলল। বইটা থাকায় রক্ষা। নয়ত সময় কাটানো মুশকিল হত। ফেরার সময় বইটা সঙ্গে করে নিতে হবে। কোনো কাজ আধাআধি করে রাখা ঠিক না। মরে গেলে একটা আফসোস থাকবে।

সাদেক অল্প কথায় কিছু বলতে পারে না। কিংবা বলার চেষ্টাও করে না। রহমানের খোঁজ পাওয়া গেছে। সে ভালই আছে- এই খবরটা বের করতে আলমের এক ঘণ্টা লাগল। তাও পুরোপুরি বের করা গেল না। কেন রহমান যেখানে উঠার কথা ছিল সেখানে উঠেনি সেটা জানা গেল না।

জিনিসপত্র সব এসেছে?

এসেছে কিছু কিছু।

কিছু কিছু মানে কী?

কিছু কিছু মানে হচ্ছে কিছু কিছু।

আলম বিরক্ত হয়ে বলল, যা বলার পরিষ্কার করে বল। অর্ধেক কথা পেটে রেখে দিচ্ছিস কেন? কী কী জিনিসপত্র এসেছে?

যা যা দরকার সবই এসেছে। শুধু এলএমজি আসেনি।

আসেনি কেন?

আমাকে বলছিস কেন? আর এ রকম ধমক দিয়ে কথা বলছিস কেন? জিনিসপত্র আনার

দায়িত্ব আমার ছিল না। এক্সপ্লোসিভ আনার কথা ছিল, নিয়ে এসেছি।

কোথায় সেগুলি?

জায়গামতই আছে।

প্রোগ্রামটা কী?

সাদেক সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, সেটা তুই ঠিক কর। তুই হচ্ছিস লিডার। তুই যা বলবি, তাই।

সবার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

কারো সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই। ফাইন্যাল প্রোগ্রামটা শুধু ওদের জানাব। সেই ভাবে কাজ হবে। প্রথম দানেই ছক্কা ফেলতে হবে।

ছক্কা ফেলতে হবে মানে?

সাদেক বিরক্ত হয়ে বলল, তুই কী বাংলাও ভুলে গেছিস? ছক্কা পাঞ্জাও তোর কাছে এক্সপ্লেইন করতে হবে? প্রথম দানে ছক্কা মানে প্রথম অপারেশন হবে ক্লাস ওয়ান। ওয়ান হানড্রেড পারসেন্ট সাকসেস। বুঝতে পারছিস?

আলম চুপ করে রইল। সাদেক সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, তুই কেমন অন্য রকম হয়ে গেছিস!

কী রকম?

কেমন যেন সুখী সুখী চেহারা হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তুই এ বাড়ির জমাই। সাদেক গলা ফাটিয়া হাসতে লাগল। অস্বস্তিকর অবস্থা। আলম বিরক্তমুখে বলল, এত হাসছিস কেন? হাসির কী হয়েছে?

তুই কেমন পুতুপুতু হয়ে গেছিস তাই দেখে হাসি আসছে। মোনালিসার প্রেমে পড়ে গেছিস নাকি?

চুপ কর।

ভাবভঙ্গি তো সে রকমই। মজনু মজনু ভাব। অবশ্যি যে জিনিস দেখলাম প্রেমে পড়াই উচিত।

সাদেককে আটকানো মুশকিল। যা মনে আসবে বলবে। আলম চিন্তায় পড়ে গেল। সে গম্ভীর গলায় বলল, আজেবাজে কথা বন্ধ কর। কাজের কথা বল। মোটামুটি একটা প্ল্যান দাঁড় করানো যাক। আমরা বেরুব কখন?

কার্ফুর আগে আগে বের হওয়াই ভাল। রাস্তাঘাটে লোক চলাচল সে সময়টায় বেশি থাকে। গাড়ি-টাড়ি চলে। সময়টা ধর সাড়ে তিন থেকে চার।

কথাবার্তার এই পর্যায়ে বিন্তি এসে বলল, আপনেরে খাইতে ডাকে। আহেন।

খাবার টেবিল বারান্দায়। খাবার দেয়া হয়েছে দুজনকেই। এ বাড়ির কেউ বসেনি। সুরমা দাঁড়িয়ে রইলেন। ঠাণ্ডা গলায় বললেন, নিজেরা নিয়ে খাও। সাদেক সঙ্গে সঙ্গে বলল, কোনো অসুবিধা নেই খালাম্মা। আপনার থাকতে হবে না। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আমার কোনো লজ্জা নেই।

লজ্জা না থাকাই ভাল।

আমার কোনো কিছুতেই লজ্জা নেই। আলমের সঙ্গে আমার বনে না এই জন্যেই। কয়েকটা শুকনো মরিচ ভেজে আনতে বলুন তো খালাম্মা। ঝাল কম হয়েছে।

সুরমা নিজেই গেলেন। সাদেক মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। মৃদু স্বরে বলল, বেশি পরিষ্কার। ভাগ্যিস এ বাড়িতে আমি উঠিনি। আমার এখানে উঠার কথা ছিল। বাড়ির মালিক কী করেন?

জানি না কী করেন?

বলিস কী, ভদ্রলোক কি করেন জানিস না?

না।

মেয়েটার নাম কী? না তাও জানিস না?

ওর নাম রাত্রি।

রাত্রি? বাহ্, চমৎকার তো! জোছনা রাত্রি নিশ্চয়ই। হা হা হা।

আস্তে হাস।

সুরমা কাচের প্লেটে ভাজা শুকনা মরিচ নিয়ে ঢুকতেই সাদেক বলল, রাত্রি খাবে না? হোস্টদের তরফ থেকে কারোর বসা উচিত। সুরমা শান্ত স্বরে বললেন, তোমরা খাও, ওরা পরে খাবে।

পরে খাবে কেন? ডাকুন, গল্প করতে করতে খাই।

সুরমা অনেকক্ষণ সাদেকের দিকে তাকিয়ে থেকে সত্যি সত্যি রাত্রিকে ডাকলেন। এবং আশ্চর্য! রাত্রি একটি কথা না বলে খেতে বসল। সাদেক হাত-টাত নেড়ে একটা হাসির গল্প শুরু করল। ছেলেবেলায় দৈ মনে করে এক খাবলা চুন খেয়ে তার কী দশা হয়েছিল। দশ দিন মুখ বন্ধ করতে পারেনি। হা করে থাকতে হত। সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল ভেটকি মাছ। ভেটকি মাছ মুখ বন্ধ করে না, হা করে থাকে। গল্প শুনে কেউ হাসল না। সাদেক একাই বারান্দা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল।

ফার্স্ট ক্লাস রান্না হয়েছে খালাম্মা। খাওয়ার পর আমি পান খাব। পান আছে ঘরে? না থাকলে বিন্তিকে পাঠিয়ে দিন, নিয়ে আসবে।

সুরমা বিন্তিকে পান আনতে পাঠালেন। সাদেক রাত্রির দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল, আপনি এত গম্ভীর হয়ে আছেন কেন? রাত্রি কিছু বলল না।

আপনি ইউনিভার্সিটিতে পড়েন নিশ্চয়ই। চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েগুলি গম্ভীর হয় খুব।

আমি ইউনিভার্সিটিতেই পড়ি।

কোন সাবজেক্ট?

কেমিস্ট্রি।

সর্বনাশ! মেয়েরা এত কঠিন কঠিন সাবজেক্ট কেন পড়ে বুঝতে পারি না। মেয়েরা পড়বে বাংলা।

রাত্রি উঠে পড়ল। আলম একটা মজার ব্যাপার লক্ষ্য করল। রাত্রি মেয়েটি বিরক্ত হয়নি। সাদেকের কথাবার্তার ধরনে যে-কেউ বিরক্ত হত। হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই মেয়েটি হয়নি। হাত ধুয়ে এসে সে আবার চেয়ারে বসল এবং চামচে করে ভাত তুলে দিল সাদেকের প্লেটে। তুলে দেয়ার ভঙ্গিটা সহজ ও স্বাভাবিক।

সাদেক দুপুর তিনটা পর্যন্ত থাকল। মৃদু গলায় প্ল্যান নিয়ে কথা বলল। প্রথম দিনের অপারেশনের জায়গাগুলি ঠিক করল। 'রেকি' করবার কি ব্যবস্থা করা যায় সে নিয়ে কথা বলল। অপারেশন চালাতে হবে অচেনা গাড়ি দিয়ে। সেই গাড়ির জোগাড় কিভাবে করা যায় সেই নিয়েও কথা হল। আগামীকাল ভোরে আবার বসতে হবে। এ বাড়িতে নয়। পাক মটরস-এর কাছের একটি বাড়িতে। সেখানে রহমানও থাকবে। প্রোগ্রাম ফাইন্যাল করা হবে সেখানেই।

সাদেক যাবার আগে সুরমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করল। সুরমা হকচকিয়ে গেলেন।

দোয়া করবেন খালাম্মা।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই দোয়া করব।

রাত্রিকে ডাকুন। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাই।

রাত্রি এল। খুব সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সাদেক বলল, রাত্রি চলি। আবার দেখা হবে। যেন এ বাড়ির সঙ্গে তার দীর্ঘ দিনের চেনাজানা। রোজই আসছে, যাচ্ছে। রাত্রি হেসে ফেলে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই দেখা হবে। ভাল থাকবেন।

সাদেক ঘর থেকে বেরুবামাত্র রাত্রি বলল, আপনার বন্ধুর সঙ্গে আপনার কোন মিল নেই। দুজন সম্পূর্ণ দু'রকম। ও কী আপনার খুব ভাল বন্ধু?

হ্যাঁ ভাল বন্ধু। ও কিন্তু একটি অসম্ভব ভাল ছেলে।

তা জানি।

কিভাবে জানেন?

কিছু কিছু জিনিস টের পাওয়া যায়। আপনার হয়ত ধারণা হয়েছে আমি উনার ওপর বিরক্ত হয়েছি। এটা ঠিক না। আমি বিরক্ত হইনি।

অনেক দিন পর আলম দুপুর বেলা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা মিলাবার পর। বিন্তি চায়ের পেয়ালা হাতে তাকে ডাকছে। বাইরে প্রবল বর্ষণ। ঘোর বর্ষা যাকে বল। মতিন সাহেব বসে

আছেন সোফায়। তাঁকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হচ্ছে। আলম উঠে বসতেই তিনি বললেন, শরীর খারাপ করেছে নাকি?

জি না।

হাত-মুখ ধুয়ে আস। একটা খারাপ খবর আছে।

কী সেটা?

আমেরিকানরা সেভেনথ ফ্লিট নিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে রওনা হয়েছে।

আলম এই খবরে তেমন কোনো উৎসাহ দেখাল না। তার কাজকর্মের সঙ্গে আমেবিকান সেভেনথ ফ্লিটের কোন সম্পর্ক নেই। মতিন সাহেব নিচু গলায় বললেন, এর চেয়েও একটা খারাপ সংবাদ আছে।

বলুন শুনি।

ঢাকা শহরে চাইনিজ সোলজার দেখা গেছে।

আপনি নিজে দেখেছেন?

না, আমি নিজে দেখিনি। কিন্তু দেখেছেন অনেকেই। নাক চেঁপা বাঁটু সোলজার। দেখলেই চেনা যায়।

আলম বাসিমুখে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। গুজবে ভর্তি হয়ে গেছে ঢাকা শহর। মানুষের মরাল ভেঙে পড়ছে। ঢাকা শহরের গেরিলাদের প্রথম কাজই হবে এই মরাল ঠিক করা। নতুন ধরনের গুজবের জন্ম দেয়া। যা শুনে একেকজনেব বুকেব ছাতি ফুলে উঠবে। এবা রাতে আশা নিযে ঘুমুতে যাবে। মতিন সাহেবের মত প্রাণহীন মুখ করে সোফায় বসে থাকবে না।

আলম।

বলুন।

শুনলাম তোমার এক বন্ধু নাকি এসেছিল?

জি।

কাজ তাহলে শুরু হচ্ছে?

হচ্ছে।

অবস্থা কাহিল হয়ে যাবে ওদের, কী বল?

তা হবে।

এক লাখ নতুন কবর হবে, কী বল?

হওয়ার তো কথা।

যশোহরের এক পীর সাহেব কী বলেছেন শুনবে কী?

বলুন।

খুবই কামেল আদমি। সুফী মানুষ।

মতিন সাহেব অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যশোবের পীর সাহেবের কথা বলতে লাগলেন। আলম কোনো কথা না বলে গল্প শুনে গেল। ডুবন্ত মানুষরাই খড়কুটো আঁকড়ে ধরে। ঢাকার মানুষ কী ডুবন্ত মানুষ? তারা কেন এ রকম করবে? আলম একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস চাপতে চেষ্টা করল।

রাত্রির ঘর অন্ধকার। সে বাতি নিভিয়ে চুপচাপ শুয়ে ছিল। অপালা এসে বলল, ফুফু টেলিফোন করেছে। তোমাকে ডাকে। রাত্রি একবার ভাবল টেলিফোন ধরবে না। বলে পাঠাবে শবীর ভাল না, জ্বরজ্বর লাগছে। কিন্তু তাতে লাভ হবে না। ফুফু বলবেন রিসিভার এ ঘরে নিয়ে আসতে। তাব চেয়ে টেলিফোন ধরাই ভাল।

কেমন আছিস রাত্রি?

ভাল।

তোদের ইউনিভার্সিটি নাকি খুলেছে? ক্লাস-ট্রাস হচ্ছে?

হ্যাঁ হচ্ছে।

তুই যাচ্ছিস না?

না। পরীক্ষা নাকি ঠিকমত হবে শুনলাম?

হলে হবে।

তোর গলাটা এত ভারী ভারী লাগছে কেন? জ্বর নাকি?

না, জ্বর না।

কাল গাড়ি পাঠাব। চলে আসবি আমার এখানে।

আচ্ছা।

আরেকটা কথা শোন, ঐ ভদ্রমহিলা আসবেন তোকে দেখতে। দেখলেই যে বিয়ে হবে এমন তো কোনো কথা না। তোর মত মেয়েকে কি কেউ জোর করে বিয়ে দিতে পারে? তোর অনিচ্ছায় কিছু হবে না। বুঝতে পারছিস?

পারছি।

কাজেই ভদ্রমহিলা এলে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলবি।

ঠিক আছে বলব।

রাত্রি আরেকটা কথা শোন— আমাদের ড্রাইভার বলল সে দেখেছে কে একজন লোক তোদের বসার ঘরের ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছে। কে সে?

আব্বার এক বন্ধুর ছেলে।

এখানে সে কী করছে?

কি একটা কাজে ঢাকায় এসেছে। থাকার জায়গা নেই বুধবারে চলে যাবে।

নাসিমা বিরক্ত স্বরে বললেন— থাকার জায়গা নেই মানে? হোটেল আছে কী জন্যে? বাড়িতে সেয়ানা মেয়ে। এর মধ্যে ছেলে-ছোকরা এনে ঢুকানোর মানেটা কী? দেখি তোর বাবাকে টেলিফোনটা দে তো।

মতিন সাহেব টেলিফোনটা ধরতে রাজি হলেন না। কারণ তিনি বিবিসি শুনছেন। এই অবস্থায় তাঁকে হাতী দিয়ে টেনেও কোথাও নেয়া যাবে না। বিবিসি একটা বেশ মজার খবর দিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আমেরিকান টিভি এনবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন— আলোচনার দ্বার রুদ্ধ নয়। এর মানে কী? কী আলোচনা? কার সঙ্গে আলোচনা? হাতী কী কাদায় পড়ে গেছে নাকি? এঁটেল মাটির কাদা। মতিন সাহেব অনেক দিন পর ঢাকা রেডিও খুললেন। মাঝে-মধ্যে এদের কথাও শোনা দরকার। তেমন কোনো খবর নেই। দেশে সার্বিক পরিস্থিতির উন্নয়নের কারণে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন শান্তি ও কল্যাণ কমিটির সভাপতি ফরিদ আহমেদ। মুসলিম লীগের সভাপতি হাশিমউদ্দীনের বিবৃতিও খুব ফলাও করে প্রচার করা হল— ছাত্র-ছাত্রীরা যেন দেশদ্রোহীদের দুরভিসন্ধিমূলক ও মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয়। তারা যেন একটি মূল্যবান শিক্ষাবছর নষ্ট না করে। শান্তিপূর্ণভাবে মেট্রিক পরীক্ষা পরিচালনার জন্যে সরকার যা করণীয় সবই করবেন।

পনেরই জুলাই থেকে মেট্রিক পরীক্ষা। ঐ দিন একটা শো-ডাউন হবে বলে মতিন সাহেবের ধাবণা। মুক্তিবাহিনীর আজদহারা নিশ্চয়ই পরীক্ষা বানচাল করবার কাজে নামবে। ঐ দিন একটা উলট পালট হয়ে যাবে। এটা চোখ বন্ধ করে বলে দেয়া যায়। মতিন সাহেব তাঁর রক্তের ভেতরে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করলেন।

সুরমা রাতের খাবারের আয়োজন করছিলেন। তাঁর মুখ বিষণ্ণ। কোনো কারণে তিনি খুবই বিচলিত। কারণটি কি নিজেও স্পষ্ট জানেন না। মাঝে মাঝে তাঁর এ রকম হয়। বাত্রি এসে মার পাশে দাঁড়াল। সুরমা বললেন, কিছু বলবি?

হ্যাঁ মা, উনাকে ভেতরের ঘরে থাকতে দেয়া উচিত।

আলমের কথা বলছিস?

হ্যাঁ। বসার ঘরে থাকলেই সবার চোখে পড়বে। ফুফু টেলিফোনে জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁদের ড্রাইভার দেখে গেছে।

এখন আবার ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলে সেটা কী আরা বেশি করে চোখে পড়বে না?

রাত্রি কিছু বলতে পারল না। বেশির ভাগ সময়ই সুরমা চমৎকার মুক্তি দিয়ে কথা বলেন।

রাত্রি।

বল মা।

ভেতরে নেয়ার আরেকটি সমস্যা কী জানিস? ছেলেটি অস্বস্তি বোধ করবে। একবার ভেতরে নেয়া হচ্ছে একবার বাইরে। আবার ভেতরে। আমি কী ঠিক বলছি রাত্রি?

ঠিকই বলছ।

সুরমা অস্পষ্টভাবে হাসলেন। মৃদু স্বরে বললেন, তোর যখন ইচ্ছা তাকে ভেতরেই নিয়ে

আয়। বিন্তিকে বল ঘর পরিষ্কার করতে। অপালা কী করছে? তাকে তো কোনো কাজেই পাওয়া যায় না। মুখের সামনে গল্পের বই ধরে বসে আছে। ওকেও লাগিয়ে দে।

রাত্রি কাউকে লাগাল না, নিজেই পরিষ্কার করতে লাগল। সুরমা এক সময় উঁকি দিলেন। চমৎকার সাজানো হয়েছে। জানালায় পর্দা দেয়া হয়েছে। একটা ছোট্ট বুক সেলফ আনা হয়েছে। বুক সেলফ ভর্তি বই। অপালার পড়ার টেবিলটিও আনা হয়েছে ঘরে। টেবিলে চমৎকার টেবিল ক্লথ। পিরিচ দিয়ে ঢাকা পানির জগ এবং গ্লাস। সুরমা বিস্মিত হয়ে বললেন, ব্যাপার কী রাত্রি? রাত্রি লজ্জা পেয়ে গেল। তার গাল ঈষৎ লাল হয়ে গেল। এই ক্ষুদ্র পরিবর্তনও সুরমাব চোখ এড়িয়ে গেল না। তিনি হালকা স্বরে বললেন, ছেলেটা হঠাৎ এই পরিবর্তন দেখে কী ভাববে বলত?

কিছুই ভাববেন না। উনি অন্য ব্যাপারে ডুবে আছেন। কিছুই তাঁর চোখে পড়বে না। উনি আছেন একটা ঘোরের মধ্যে।

তুই যা করেছিস চোখে না পড়ে উপায় আছে?

আলমের কিছু চোখে পড়ল বলে মনে হল না। সে সহজভাবেই ভেতরের ঘরে চলে এল। 'প্রথম কদম ফুল'-এর পাতা উল্টাতে লাগল। রাত্রি দবজাব পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হাসিমুখে বলল – বইটা কেমন লাগছে?

ভাল।

ছেলেটার ওপর আপনার রাগ লাগছে না?

কোন ছেলেটার ওপর?

কাকলীর হাজবেন্ড।

না, রাগ লাগবে কেন?

আপনার কী আর কিছু লাগবে?

না, কিছু লাগবে না।

ড্রয়ারে মোমবাতি আছে। যদি বাতি নিভে যায় মোমবাতি জ্বালাবেন।

ঠিক আছে, জ্বালাব।

রাত দশটায় মতিন সাহেব আলমকে ডাকতে এলেন ভয়েস অব আমেবিকা শুনবাব জন্যে। আলম বলল তার মাথা ধরেছে, সে শুয়ে থাকবে। মতিন সাহেব তবু খানিকক্ষণ ঝুলাঝুলি কবলেন। একা একা তার কিছু শুনতে ইচ্ছা করে না। আজ রাত্রিও নেই। দবজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে।

মতিন সাহেব শোবার ঘরে ঢুকলেন। সুষমা জেগে আছে এখনো। আলনায় কাপড় রাখছে। মতিন সাহেব ভয়ে ভয়ে বললেন, সুরমা ভয়েস অব আমেরিকা শুনবে? সুরমা শীতল গলায় বললেন, না।

আজ কিছু ইন্টারেস্টিং ডেভেলপয়েন্ট শোনা যাবে বলে আমাব ধাবণা।

সুরমা জবাব দিলেন না।

## পাঁচ

আলমের ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। আঁধার তখনো কাটেনি। চারদিকে ভোর হবার আগের অদ্ভুত নীরবতা। কিছুক্ষণের ভেতরই সূর্য উঠার মত বিরাট একটা ঘটনা ঘটবে। প্রকৃতি যেন তার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আলম নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিক থেকে আজানের শব্দ হতে লাগল। ঢাকা শহরে এত মসজিদ আছে? আলম হকচকিয়ে গেল। ভোরবেলায় অদ্ভুত অন্ধকারে চারদিক থেকে ভেসে আসা আজনের শব্দে অন্য রকম কিছু আছে। কেমন যেন ভয়ভয় লাগে। আলমের প্রায় সারাজীবন এই শহরেই কেটেছে কিন্তু সকালবেলার এই ছবিব সঙ্গে তার দেখা হয়নি। সব মানুষই বোধ হয় অনেক কিছু না জেনে বড় হয়।

সুরমা বারান্দায় বসে অজু করছিলেন। আলমকে বেরুতে দেখে বেশ অবাক হলেন। মাথায় ঘোমটা তুলে দিয়ে পরিষ্কার গলায় বললেন, রাতে ঘুম হয়নি? তাঁর গলায় খানিকটা উদ্বেগ ছিল। আলমকে তা স্পর্শ করল। সে হাসিমুখে বলল, ভাল ঘুম হয়েছে। খুব ভাল। আপনি কী রোজ এ সময়ে জাগেন?

হ্যাঁ। নামাজ পড়ি। নামাজ শেষ করে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। তারপর সাতটা সাড়ে সাতটার দিকে রাত্রি ডেকে তোলে।

সুরমা হাসতে লাগলেন। যেন খুব একটা হাসির কথা বলেছেন। ভোরবেলার বাতাসে কিছু

একটা বোধ হয় থাকে। মানুষকে তরল করে ফেলে। আলম বলল, আজ আমাদের একটা বিশেষ দিন।

বুঝতে পারছি। তোমার কী ভয় লাগছে?

ভয় না। অন্য রকম লাগছে। আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম ঘণ্টা পড়বার সময় যে রকম লাগে সে রকম।

কিন্তু এ ধরনের কাজ তো তুমি এর আগেও করেছ।

তা করেছি। অবশ্যি এখানকার অবস্থাটা অন্য রকম।

তুমি কী আল্লাহ্ বিশ্বাস কর? তোমার বয়েসী যুবকরা খানিকটা নাস্তিক ধরনের হয় সেই জন্যে বলছি।

আলম কিছু বলল না। সুরমা তার প্রশ্নের জবাবের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। জবাব পেলেন না। তিনি হালকা গলায় বললেন, নামাজ শেষ করে এসে আমি একটা দোয়া পড়ে তোমার মাথায় ফুঁ দিতে চাই। তোমার কোনো আপত্তি আছে?

না, আপত্তি থাকবে কেন?

ঠিক আছে, আমি নামাজ শেষ করে আসছি। রাত্রিকে ডেকে দিচ্ছি সে তোমাকে চা বানিয়ে দেবে।

ডাকতে হবে না। আমার এত ঘন ঘন চা খাবার অভ্যেস নেই।

সুরমা রাত্রিকে ডেকে তুললেন। সাধারণত ফজরের নামাজ তিনি চট করে সেরে ফেলেন কিন্তু আজ অনেক সময় নিলেন। কোথায় যেন পড়েছিলেন নামাজের শেষে পার্থিব কিছু চাইতে নেই। তাতে নামাজ নষ্ট হয়। কিন্তু আজ তিনি পার্থিব জিনিসই চাইলেন। অসংখ্যবার বললেন, এই ছেলেটিকে নিরাপদে রাখ। ভাল রাখ। সে যেন সন্ধ্যাবেলা আবার ঘরে ফিরে আসে। হারিয়ে না যায়।

বলতে বলতে এক সময় তাঁর চোখে পানি এসে গেল। একবার পানি এসে গেলে খুব মুশকিল। তখন যাবতীয় দুঃখের কথা মনে পড়ে যায়। কিছুতেই আর কান্না থামানো যায় না। সুরমার তাঁর বাবার কথা মনে পড়ল। ক্যানসার হয়ে যিনি অমানুষিক যন্ত্রণা ভোগ করে মারা গেছেন। মৃত্যুর ঠিক আগে আগে পানি খেতে চেয়েছিলেন। চামচে করে পানি খাওয়াতে হয়। কী আশ্চর্য! একটা চামচ সেই সময় খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষপর্যন্ত হাতে আঁজলা করে পানি নিয়ে গেলেন সুরমা। সেই পানি মুখ পর্যন্ত নিতে নিতে আঙুল গলে নিচে পড়ে গেল। অতি কষ্টের মধ্যেও এই দৃশ্য দেখে তাঁর বাবা হেসে ফেললেন। তাঁর পানি খাওয়া হল না। কত অদ্ভুত মানুষের জীবন!

রাত্রি ঘরে ঢুকে দেখল, তার মা জায়নামাজে এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছেন। কান্নার জন্যেই শরীর বারবার কেঁপে উঠছে। সে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। আলমকে চা দিয়ে আসা হয়েছে। আবার সেখানে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। কিন্তু যেতে ইচ্ছা করছে। মাঝে মাঝে অর্থহীন গল্পগুজব করতে ইচ্ছা করে। রাত্রি আলমের ঘরে উঁকি দিল।

আবার এলাম আপনার ঘরে।

আসুন।

চিনি হয়েছে কিনা জানতে এসেছি।

হয়েছে। থ্যাংকস।

রাত্রি খাটে গিয়ে বসল। আলমের কেমন লজ্জা করতে লাগল। রাত্রির গায়ে আলখাল্লা জাতীয় লম্বা পোশাক, সাধারণ নাইটির মত বাহারী কোন জিনিস নয়। এই পোশাকে তাকে অন্য রকম লাগছে। সে পা দুলাতে দুলাতে বলল, আপনি আজ এত ভোরে উঠেছেন কেন?

জানি না কেন। ঘুম ভেঙে গেল।

টেনশান থাকলে ভেঙে যায়।

তা যায়।

আমার উল্টোটা হয়। টেনশনের সময়ে শুধু ঘুম পায়।

একেকজন মানুষ একেক রকম।

তা ঠিক। আমরা সবাই আলাদা।

আলম সিগারেট ধরাল। তার সিগারেটের কোন তৃষ্ণা হয়নি। অস্বস্তি কাটানোর জন্যে ধারানো।

তার অস্বস্তির ব্যাপারটা কী মেয়েটি টের পাচ্ছে? পাচ্ছে নিশ্চয়ই। এসব সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলি মেয়েরা সহজেই টের পায়। আলম বলল, আপনি খুব ভোরে উঠেন?

হ্যাঁ উঠি। অন্ধকার থাকতে আমার ঘুম ভাঙে। খুব খারাপ লাগে তখন।

খারাপ লাগে কেন?

সবাই ঘুমুচ্ছে আমি জেগে আছি এই জন্যে। যখন ছোট ছিলাম তখন গেট খুলে বাইরে যেতাম। একা একা হাঁটতাম। ছোটবেলায় আমি খুব সাহসী ছিলাম।

এখন সাহসী না?

না। ছোটবেলায় আমি একটি কুৎসিত ঘটনা দেখি। তারপর আমার সব সাহস চলে যায়। আমি এখন একটি ভীরু ধরনের মেয়ে।

রাত্রি তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। পা দুলাচ্ছে না, কাঠিন্য চলে এসেছে তার চোখে-মুখে। আলম অবাক হয়ে এই সূক্ষ্ম কিন্তু তীক্ষ্ণ পরিবর্তনটি লক্ষ্য করল। রাত্রি বলল, আমি কী দেখেছিলাম তা তো জিজ্ঞেস করলেন না?

জিজ্ঞেস করলে আপনি বলবেন না, তাই জিজ্ঞেস করিনি।

ঠিক করেছেন। আমি বলতাম না, কাউকেই বলিনি। মাকেও বলিনি। যাই কেমন?

রাত্রি উঠে দাঁড়াল। এবং দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

রাত্রির ফুফু নাসিমার বয়স চল্লিশের উপরে। কিন্তু তাঁকে দেখে সেটা বোঝাব কোন উপায় নেই। এখনো তাকে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের তরুণীর মত লাগে। ভিড়ের মধ্যে লোকজন তাঁর গায়ে হাত দিতে চেষ্টা করে। একবার এরকম একটা ছোকরাকে তিনি হাতেনাতে ধরে ফেললেন এবং হাসিমুখে বললেন, তোমার বয়স কত খোকা? ছেলেটি এ জাতীয় দৃশ্যের জন্যে প্রস্তুত ছিল না। সে ঘেমে নেয়ে উঠল। নাসিমা ধারাল গলায় বললেন, আমার বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। বুঝতে পারছ?

তাঁর বড় মেয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে এটা ঠিক না। নাসিমার কোনো ছেলেপুলে নেই। বড় মেয়ে বলতে তিনি বুঝিয়েছেন রাত্রিকে। বাইরের কেউ যদি জিজ্ঞেস করে আপনার ছেলেমেয়ে ক'টি? তিনি সহজভাবেই বলেন, আমার কোনো ছেলে নেই। দু'টি মেয়ে রাত্রি এবং অপালা। এটা তিনি যে শুধু বলেন তাই না, মনেপ্রাণে বিশ্বাসও করেন। তাঁর বাড়িতে এদের দুজনের জন্যে দু'টি ঘর আছে। সেই ঘর দু'টি ওদের ইচ্ছামত সাজানো। সপ্তাহে খুব কম হলেও তিনদিন এই ঘর দু'টিতে দু'বোনকে থাকতে হয়। নয়ত নাসিমা অস্থির হয়ে যান। তাঁর কিছু বিচিত্র অসুখ দেখা দেয়। হিস্টিরিয়ার সঙ্গে যার কিছু মিল আছে।

নাসিমার স্বামী ইয়াদ সাহেব লোকটি রসকষহীন। চেহারা চালচলন সবই নির্বোধের মত কিন্তু তিনি নির্বোধ নন। কোন নির্বোধ লোক একা একা একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম শুরু করে বারো বছরের মাথায় কোটিপতি হতে পারে না। ইয়াদ সাহেব হয়েছেন। যদিও এই বিত্ত তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতির ওপর কোন রকম ছাপ ফেলেনি। তিনি এখনো গায়ে তেল মেখে গোসল করেন। এবং স্ত্রীকে ভয় করেন। অসম্ভব রকম বিত্তবান লোকজনক স্ত্রীদের ঠিক পরোয়া করে না।

ভোর আটটায় নাসিমা ইয়াদ সাহেবকে ডেকে তুললেন। তাঁর ডাকার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যে ইয়াদ সাহেবের বুক ধড়ফড় করতে লাগল। তিনি ভয়-পাওয়া গলায় বললেন, কী হয়েছে?

তোমার গাড়ি পাঠালাম রাত্রিদের আনবার জন্যে।

ও আচ্ছ।

ইয়াদ সাহেব আবার ঘুমুবার আয়োজন করলেন।

তুমি কিন্তু আজ অফিসে-টফিসে যাবে না।

কেন?

আজ রাত্রিকে দেখতে আসবে। তোমার থাকা দরকার।

আমি থেকে কী করব?

কিছু করবে না। থাকবে আর কী। এসব কাজে ব্যাকগ্রাউন্ডে একজন পুরুষ মানুষ থাকা দরকার।

দরকার হলে থাকব। এখন একটু ঘুমাই, কী বল?

আচ্ছা ঘুমাও।

ইয়াদ সাহেব চোখ বন্ধ করে পাশ ফিবলেন। ছুটে যাওয়া ঘুম ফিরে এল না। কিছুদিন থেকেই তাঁর দিন কাটছে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তায়। মোহাম্মদপুরে তাঁদের মূল বাড়িটি বিহারীদের দখলে। দেশ স্বাধীন না হলে এ বাড়ি ফিরে পাওয়া যাবে না। অসম্ভব। দেশ চট করে স্বাধীন হয়ে যাবে এ রকম কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। চট করে পৃথিবীর কোনো দেশই স্বাধীন হয়নি। ইংরেজ তাড়াতে কত দিন লেগেছে? এখানেও তাই হবে। বছবের পর বছর লাগবে। তারপর এক সময় বাঙালিরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। এই একটা অদ্ভুত জাতি। নিমিষেব মধ্যে উৎসাহে পাগল হয়ে ওঠে, আবার সে উৎসাহ নিভেও যায়।

ইয়াদ সাহেব উঠে বসলেন। কাজের ছেলেটিকে বেড টি-র কথা বলে চুরুট ধরালেন। তাঁর বমি বমি ভাব হল। তিনি বিছানা থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে বারান্দায় গেলেন। বারান্দার সামনে ঘুপসিমত গলি। মোহাম্মদপুরের বিশাল বাড়ি ছেড়ে তাকে থাকতে হচ্ছে ভাড়া বাড়িতে যার সামনে ঘুপসি গলি। তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে কী দেশ স্বাধীন হবে? ফিরে পাওয়া যাবে নিজের বাড়ি? ইয়াদ সাহেব খানিকটা লজ্জিত বোধ করলেন। তিনি দেশের স্বাধীনতা চাইছেন ব্যক্তিগত স্বার্থে - এটা ঠিক হচ্ছে না।

চায়ের পেয়ালা নিয়ে তিনি বাসিমুখে নিজের স্টাডি রুমে ঢুকলেন। তাঁর অফিসের যাবতীয় কাগজপত্র এই ছোট্ট ঘরটিতে আছে। এখানে তিনি দীর্ঘ সময় কাটান। নিজের তৈরি ব্লু প্রিন্টগুলির দিকে তাকিয়ে থাকতে তাঁর ভাল লাগে। কিন্তু আজ কিছুই ভাল লাগছে না। আলস্য অনুভব করছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য এখন কিছুই নেই। সব রকম কনসট্রাকশনের কাজ বন্ধ হয়ে আছে। সরকারের কাছে মোটা অংকের টাকা পাওনা। সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। যাবেও না সম্ভবত। সব জলে যাবে। তাঁর মতে বাঙালিদের এই যুদ্ধে সবচে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কনসট্রাকশন ফার্মগুলি। এদেব কোমর ভেঙে গেছে। এই কোমর আর ঠিক হবে না। দেশ স্বাধীন হলেও না। তিনি একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। কলিং বেল বাজছে। মেয়ে দুটি এসেছে নিশ্চয়ই। এদের তাঁব ভাল লাগে না। কিন্তু তবু তিনি হাসি মুখে দরজা খুলে বের হলেন। এবং অমায়িক ভঙ্গিতে বললেন রাত্রি মা, কেমন আছ?

ভাল আছি ফুফা।

অপালা মা, মুখটা এমন কালো কেন?

অপালা জবাব দিল না। সে তার ফুফাকে পছন্দ কবে না। একেবাবে না। ইয়াদ সাহেব বললেন, কী গো মা, কথা বলছ না কেন?

কথা বলতে ভাল লাগছে না, তাই বলছি না।

ইয়াদ সাহেব চুপ করে গেলেন।

আলম দোকানটির সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত কবতে লাগল। এটিই কী সেই দোকান? নাম অবশ্যি সে রকমই মডার্ন নিওন সাইনস। এখানেই সবাব জড় হবার কথা। কিন্তু দোকানটি সদর রাস্তার উপরে। তাছাড়া ভেতবে যে লোকটি বসে আছে তার চেহারা কেমন বিহারি বিহারি। কার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। কোন বাঙালি ছেলে এই সময়ে এমনভাবে হাসবে না। এটা হাসির সময় না। আলম দোকানে ঢুকে পড়ল।

চেক হাওয়াই শার্ট পবা ছেলেটির ঠোঁটের উপর সুঁচালো গোঁফ। গলায় সোনার চেইন বের হয়ে আছে। রোগা টিঙটিঙে কিন্তু কথা বলার ভঙ্গি কেমন উদ্ধত। ছেলেটি টেলিফোন নামিয়ে রাগী গলায় বলল, কাকে চান?

এটা কী মডার্ন নিওন সাইন?

হ্যাঁ।

আমি আশফাক সাহেবকে খুঁজছি।

আমিই আশফাক। আপনার কী দরকার?

আমার নাম আলম।

ছেলেটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ হল কিন্তু কথা বলল নরম গলায়— আপনি ভেতরে ঢুকে যান। সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় চলে যান।

আর কেউ এসেছে?

রহমান ভাই এসেছে। যান, আপনি ভেতরে চলে যান।

ভেতরটা অন্ধকার। অসংখ্য নিওন টিউব চারদিকে ছড়ানো। একজন বুড়ো মত লোক এই অন্ধকারেই বসে কী সব নকশা করছে। সে একবার চোখ তুলে আলমকে দেখল। তার কোনো রকম ভাবান্তর হল না। চোখ নামিয়ে নিজের মত কাজ করতে লাগল।

দোতলায় দু'টি ঘর। একটিতে প্রকাণ্ড একটি তালা ঝুলছে। অন্যটি খোলা। রঙিন পর্দা ঝুলছে। রেলিং-এ মেয়েদের কিছু কাপড়। ঘরের ভেতর থেকে ক্যাসেটে গানেব শব্দ আসছে হাওয়ামে উড়তা যায়ে মেরা লাল দুপাট্টা মলমল। আলম ধাঁধায় পড়ে গেল। সে মৃদু স্বরে ডাকল, রহমান রহমান।

রহমান বেরিয়ে এল। তার গায়ে একটা ভারী জ্যাকেট। মুখ শুকনো। এমনিতেই সে ছোটখাটো মানুষ। এখন তাকে আরো ছোট দেখাচ্ছে। রহমান হাসতে চেষ্টা কবল।

আসুন আলম ভাই।

তোমার এই অবস্থা কেন? কি হয়েছে?

শবীব খাবাপ করে ফেলেছে। জ্বর, সর্দি. কাশি বুড়োদেব অসুখ-বিসুখ। একশ দুই। অসুবিধা হবে না। চারটা এ্যাসপিরিন খেযেছি। জ্বর নেমে যাবে। সকালে একশ তিন ছিল। ভেতবে আসুন আলম ভাই।

ভেতরে কে কে আছে?

কেউ এখনো এসে পৌঁছেনি। আমি ফার্স্ট, আপনি সেকেন্ড। এসে পড়বে।

আলম ঘরে ঢুকল। ছোট্ট ঘর। আসবাবপত্রে ঠাসা। বেমানান একটা কারুকার্য করা বিশাল খাট। খাটের সঙ্গে লাগোয়া একটা স্টিলের আলমারি। তাব একটু দূবে ড্রেসার। জানালাব কাছে খাটের মতই বিশাল টেবিল। এত ছোট্ট একটা ঘবে এতগুলি আসবাবেব জায়গা হল কী ভাবে কে জানে।

আলম নিচু গলায় বলল, জিনিসপত্র সব কী এখানেই?

সব না। কিছু আছে। বাকিগুলি সাদেকের কাছে। যাত্রাবাড়িতে।

আশফাক ছেলেটি কেমন?

ওয়ান হানড্রেড পাবসেন্ট গোল্ড। আপনাব কাছে বিহারী বিহারী লাগছিল, তাই না? চুল ছোট করে কাটায় এ রকম লাগছে। গলায় আবার চেইন-টেইন আছে। উর্দু বলে ফ্লুয়েন্ট।

বাড়ি কোথায়?

খুলনার সাতক্ষীরায়।

ফ্লুয়েন্ট উর্দু শিখল কাব কাছে?

সিনেমা দেখে নাকি শিখেছে। 'নাচে নাগিন বাজে বীণ' নামের একটা ছবি নাকি সে ন'বাব দেখেছে। আলম ভাই, পা তুলে বসেন।

আলম ঠিক স্বস্তি বোধ করছিল না। সে থেমে থেমে বলল, জায়গাটা কেমন যেন সেফ মনে হচ্ছে না।

প্রথম কিছুক্ষণ এ রকম মনে হয়। আমারো মনে হচ্ছিল। আশফাকেব সঙ্গে কথার্বাতা বললে বুঝবেন এটা অত্যন্ত সেফ জায়গা।

ছেলেটা একটু বেশি স্মার্ট। বেশি স্মার্ট ছেলেপুলে কেয়ারলেস হয়। আর জায়গাটা খুব এক্সপোজড। মেইন রোডের পাশে।

রহমান শান্ত স্বরে বলল, মেইন রোডের পাশে বলেই সন্দেহটা কম। আইসোলেটেড জায়গাগুলি বেশি সন্দেহজনক।

আমার কেন জানি ভাল লাগছে না।

আপনার আসলে আশফাকের ওপর কনফিডেন্স আসছে না। ও যাচ্ছে আমাদের সাথে।

ও যাচ্ছে মানে?

গাড়ি চালাবে। ওর একটা পিকআপ আছে। সাদেককে তো আপনিই বলেছেন দুটি গাড়ি থাকবে। পেছনেরটা কভার দেবে। অবশ্যি আপনি নিতে না চাইলে ওকে বাদ দেবেন।

নিচে বসে থাকা বুড়ো লোকটি চা আর ডালপুরি নিয়ে এল। রহমান শুয়ে পড়ল চোখ বন্ধ করে। তার বেশ ঘাম হচ্ছে। জ্বব ছেড়ে দিচ্ছে বোধ হয়। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, চা খান আলম ভাই।

আলম চা বা ডালপুরিতে কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে দেখতে লাগল। নায়িকাদের ছবি কেটে কেটে দেয়ালে লাগানো। এর মধ্যে বেশির ভাগ ছবিই অত্যন্ত আপত্তিকর। আলম বলল, মেয়েমানুষ কেউ কী থাকে এখানে?

জি না।

রেলিং-এ মেয়েদের কিছু জামা-কাপড় দেখলাম।

আমি লক্ষ্য করিনি। আপনার মনের মধ্যে কিছু-একটা ঢুকে গেছে আলম ভাই।

আলম জবাব দিল না। গুনগুন করতে করতে আশফাক এসে ঢুকল। ফুর্তিবাজের গলায় বলল— চা-ডালপুরি কেউ খাচ্ছে না, ব্যাপারটা কী? ডালপুরি ফ্রেশ। আলম ভাই, খেয়ে দেখেন একটা। আপনার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে এলাম।

বসুন।

ড্রাইভার হিসেবে আমাকে দলে নেন। দেখেন কী খেল দেখাই। আমার একটা পংখীরাজ আছে। দেখলে মনে হবে ঘণ্টায় দশ মাইলও যাবে না, কিন্তু আমি আশি মাইল তুলে আপনাকে দেখাব।

আলম শীতল গলায় বলল, আশফাক সাহেব, কিছু মনে করবেন না। এ জায়গাটা আমার সেফ মনে হচ্ছে না।

আশফাক হকচকিয়ে গেল। বিস্মিত গলায় বলল, সেফ মনে হচ্ছে না কেন?

জানি না কেন। ইনট্যুশন বলতে পারেন।

ঢাকা শহরে যে কয়টা সেফ বাড়ি আছে তার মধ্যে এটা একটা। আশপাশের সবাই আমাকে কড়া পাকিস্তানি বলে জানে। মাবুদ খাঁ বলে এক ইনফেনট্রির মেজরের সঙ্গে আমার খুব খাতির। সে সপ্তাহে অন্তত একদিন আমার ঘরে আসে আড্ডা দেবার জন্যে।

আলম কিছু না বলে সিগারেট ধরাল। আশফাক বলল, এখনো কী আপনার এ বাড়ি আনসেফ মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ হচ্ছে।

তাহলে সবাই আসুক, তারপর আমরা অন্য কোথাও চলে যাব। সবাই চুপ করে গেল। আশফাককে দেখে মনে হচ্ছে সে আহত হয়েছে। হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। নিষ্প্রাণ গলায় বলল, রহমান ভাই, আপনার জ্বর কী কমেছে?

বুঝতে পারছি না। ঘরে থার্মোমিটার আছে?

আছে।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখা গেল জ্বর একশ-র অল্প কিছু উপরে কিন্তু রহমানের বেশ খারাপ লাগছে। বমির বেগ হচ্ছে। বমি করতে পারলে হয়ত একটু আরাম হবে। সে বিছানা থেকে নেমে বাথরুমের দিকে এগুল। বাথরুমের দরজা খুলেই হড়হড় করে বমি করল। নাড়ীভুঁড়ি উল্টে আসছে বলে মনে হচ্ছে। পৃথিবী দুলছে। রহমান ক্লান্ত স্বরে বলল, মাথাটা ধুইয়ে দিন তো আশফাক সাহেব। অবস্থা কাহিল।

আলম চিন্তিত মুখে বলল, তোমার শরীর তো বেশ খারাপ। কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমার চলবেও না। ডেটটা কী পিছিয়ে দেব?

আরে না। আজই সেই দিন। আমাকে নিয়ে চিন্তা করবেন না। বমি করার পর ভালই লাগছে। ঘণ্টা খানিক থাকলেই ঠিক হয়ে যাবে।

রহমান চাদর গায়ে বিছানায় এসে শোয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। নিচে কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। সাদেকের উঁচু গলায় ফুর্তির ছোঁয়া। যেন তারা সবাই মিলে পিকনিকে যাবার মত কোন ব্যাপার নিয়ে আলাপ করবে। রঙ্গ-তামাশা করবে।

মতিন সাহেব আজ অফিসে যায়নি। যাবার জন্যে তৈরি হয়েছিলেন। জামা জুতো পরেছিলেন। দশবার 'ইয়া মুকাদ্দেমু' বলে ঘর থেকেও বেরিয়েছিলেন। পিলখানার তিন নম্বর গেটের কাছে এসে একটি অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে পাথর হয়ে গেলেন। খোলা ট্রাকে করে দুটি অল্পবয়েসী ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলে দুটির হাত পেছন দিকে বাঁধা। ভাবশূন্য মুখ। একজনের চোখে আঘাত লেগেছে। চোখ এবং মুখের এক অংশ বীভৎসভাবে ফুলে উঠেছে। কালো পোশাকপরা এক দল মিলিশিয়া ওদের ঘিরে আছে। তাদের একজনের হাতে একটি রুমাল। সে রুমাল দিয়ে

খেলার ছলে ছেলে দুটির মাথায় ঝাপটা দিচ্ছে, বাকিরা সবাই হেসে উঠছে। ট্রাক চলছিল। কাজেই দৃশ্যটির স্থায়িত্ব খুব বেশি হলে দেড় মিনিট। এই দেড় মিনিট মতিন সাহেবের কাছে অনন্তকাল বলে মনে হল। সমস্ত ব্যাপারটাতে প্রচণ্ড হৃদয়হীন কিছু আছে। মতিন সাহেবের পা কাঁপতে লাগল। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। ব্যাপারটা যে শুধু তাঁর ক্ষেত্রেই ঘটল তা না। তাঁর আশপাশে যারা ছিল সবাই যেন কেমন হয়ে গেল। মতিন সাহেবের মনে হল ছেলে দুটিকে ওরা যদি মারতে মারতে নিয়ে যেত তাহলে তাঁর এমন লাগত না। রুমাল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তামাশা করছে বলেই এমন লাগছে। তিনি বাসায় ফিরে চললেন।

পানওয়ালা ইদ্রিস বলল, অফিসে যান না?

না। শরীরটা ভাল না। দেখি একটা পান দাও।

পান খাওয়ার তাঁর দরকার ছিল না। এ সময়ে সবাই অদরকারি কাজগুলি করে, অপ্রয়োজনীয় কথা বলে। ভয় কাটানোর জন্যেই করে। ভয় তবু কাটে না। যত দিন যায় ততই তা বাড়তে থাকে।

দুটা ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল। দেখলে ইদ্রিস মিয়া?

জি দেখলাম। নেন পান নেন।

মতিন সাহেব পান মুখে দিয়ে নিচু গলায় বললেন, এই অবস্থা বেশি দিন থাকবে না। আজদহা নেমে গেছে।

বলেই তিনি হকচকিয়ে গেলেন। একজন পানওয়ালার সঙ্গে এসব কি বলছেন? ইদ্রিস মিয়া হয়ত তাঁর কথা পরিষ্কার শোনেনি। কিংবা শুনলেও অর্থ বুঝতে পারেনি। সে একটি আগরবাতি জ্বালাল। আগেরটি শেষ হয়ে গেছে।

সুরমা একবার জিজ্ঞেসও করলেন না— অফিসে যাওনি কেন? তিনি নিজের মনে কাজ করে যেতে লাগলেন। সাবান পানি দিয়ে ঘরের মেঝে নিজের হাতে মুছলেন। কার্পেট শুকাতে দিলেন। বাথরুমে ঢুকলেন প্রচুর কাপড় নিয়ে। আজ অনেকদিন পর কড়া রোদ উঠেছে। রোদটা ব্যবহার করা উচিত।

মতিন সাহেব কি করবেন ভেবে পেলেন না। কিছুক্ষণ বারান্দায় বসে রইলেন। তারপরই তাঁর মনে হল অফিসে না গিয়ে তিনি বারান্দায় বসে আছেন এটা লোকজনের চোখে পড়বে। তিনি ভেতরের ঘরে গেলেন। ঝকঝকে মেঝে মাড়িয়ে যেতে খারাপ লাগে। সুরমা কিছু বলছেন না কিন্তু তাকিয়ে আছেন কড়া চোখে। মতিন সাহেব বাগানে গেলেন। বাগান মানে বারান্দার কাছ ঘেঁষে এক চিলতে উঠোন। দীর্ঘ দিন ধরে তিনি এখানে শাকসব্জি ফলাবার চেষ্টা করছেন। ফলাতে পারেননি। মরা মরা ধরনের কিছু গাছপালা হয়ে কিছুদিন পর আপনা-আপনি শুকিয়ে যায়। সার-টার সব দিয়েও একই অবস্থা। নিজেই একবার মাটি নিয়ে জয়দেবপুর গিয়েছিলেন সয়েল টেস্টিং-এর জন্যে। তারা এক সপ্তাহ পর যেতে বলল। তিনি গেলেন এক সপ্তাহ পর। তিন ঘণ্টা বসে থাকার পর কামিজ পরা অত্যন্ত স্মার্ট একটি মেয়ে এসে বলল, আপনার স্যাম্পল তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কী কষ্ট করে আরেকবার খানিকটা স্যাম্পল দিয়ে যেতে পারবেন? দু'একদিনের মধ্যে নিয়ে আসুন। তিনি নিয়ে যাননি।

কয়েকদিন ক্রমাগত বৃষ্টির জন্যে বাগানে কাদা হয়েছে। জুতো সুদ্ধ পা অনেকখানি কাদায় ডেবে গেল। তিনি অবশ্যি তা লক্ষ্য করলেন না। কারণ তাঁর চোখ গিয়েছে কাঁকরুল গাছের দিকে। কাঁকরুল গাছ যে বাগানে হয়েছে তা তাঁর মনে ছিল না। আজ হঠাৎ দেখলেন একটা সতেজ গাছ। চড়া সবুজ রঙের পাকা চকচক করছে। তার চেয়েও বড় কথা— পাতার ফাঁকে বড় বড় কাঁকরুল ঝুলছে। কেউ লক্ষ্য করেনি। একটি আবার পেকে হলুদ বর্ণ হয়েছে। মতিন সাহেব চেঁচিয়ে উঠলেন— রাত্রি, রাত্রি। রাত্রি বাসায় নেই। ভোরবেলা তাঁর চোখের সামনে গাড়ি এসে নিয়ে গিয়েছে তা তাঁর মনে রইল না। উত্তেজিত স্বরে তিনি দ্বিতীয়বার ডাকলেন— রাত্রি, রাত্রি।

সুরমা ঘর মোছা বন্ধ করে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ বিষণ্ন। খানিকটা উদ্বেগ মিশে আছে সেখানে। তিনি বললেন, কি হয়েছে?

সুরমা, কাঁকরুল দেখে যাও। গাছ ভর্তি হয়ে আছে। কেউ এটা লক্ষ্যই করে নাই। কি কাণ্ড!

সুরমা সত্যি সত্যি নেমে এলেন। তাঁর যা স্বভাব তাতে নেমে আসার কথা নয়। নোংরা কাদা থিকথিক বাগানে পা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

সুরমা, দেখ দেখ, পুঁই গাছটার দিকে দেখ। কেন এসব এতদিন কেউ দেখল না?

মতিন সাহেব গভীর মমতায় গাছের পাতায় হাত বুলাতে লাগলেন।

শুধু পুঁই গাছ নয়। রান্নাঘরের পাশের খানিকটা জায়গায় ডাঁটা দিয়েছিলেন। লাল লাল পুরুষ্টু ডাঁটা সেখানে। নিষ্ফলা মাটিতে হঠাৎ করে প্রাণ সঞ্চার হল নাকি? আনন্দে মতিন সাহেবের দম বন্ধ হয়ে যাবার মত হল। রাত্রিকে খবর দিতে হবে। ওরা এলে একসঙ্গে সবজি তোলা হবে। তাছাড়া বাগান পরিষ্কার করতে হবে। বড় বড় ঘাস জন্মেছে। এদের টেনে তুলতে হবে। মাটি কুপাতে হবে। ডাঁটা ক্ষেতে পানি জমেছে, নালা কেটে পানি সরাতে হবে। অনেক কাজ। অফিসে না গিয়ে ভাল হয়েছে। রাত্রিকে খবর দেয়া দরকার। মতিন সাহেব কাদামাখা জুতো নিয়েই শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। রাত্রিকে টেলিফোন করলেন। সুরমা দেখলেন তাঁর ধোয়া-মোছা মেঝের কি হাল হল। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না।

রাত্রিকে টেলিফোনে পাওয়া গেল না। নাসিমা বলল, ওর সঙ্গে এখন কথা বলা যাবে না। তুমি ঘণ্টাখানিক পরে রিং করবে।

মতিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, এখন সে কি করছে?

একজন ভদ্রমহিলা তাকে দেখতে এসেছেন। সে কথা বলছে তাঁর সঙ্গে।

কেন দেখতে এসেছে রাত্রিকে?

কেন তুমি জান না? তোমাকে তো বলা হয়েছে।

নাসিমা ব্যাপারটা কি খুলে বল তো!

এখন বকবক করতে পারব না। রান্নাবান্না করছি। উনি খাবেন এখানে।

কে এখানে খাবেন?

দাদা, পরে তোমাকে সব গুছিয়ে বলব। এখন রেখে দেই। তুমি বরং অপালার সঙ্গে কথা বল। ওকে ডেকে দিচ্ছি।

মতিন সাহেব রিসিভার কানে নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপালা আসছেই না। কোন একটা গল্পের বই পড়ছে নিশ্চয়ই। গল্পের বই থেকে তাকে উঠিয়ে আনা যাবে না। তিনি যখন টেলিফোন রেখে দেবেন বলে মন ঠিক করে ফেলেছেন তখন অপালার চিকন গলা শোনা গেল।

হ্যালো বাবা।

হুঁ।

কি বলবে তাড়াতাড়ি বল।

মতিন সাহেব উৎকণ্ঠিত স্বরে বললেন, তোদের ওখানে কি হচ্ছে?

আপার বিয়ে হচ্ছে।

কি বললি?

আপার বিয়ে হচ্ছে। বিবাহ। শুভ বিবাহ।

কী বলছিস এসব কিছু বুঝতে পারছি না।

অপালা বিরক্ত স্বরে বলল, বাবা, আমি এখন রেখে দিচ্ছি। সে সত্যি সত্যি টেলিফোন রেখে দিল।

রাত্রি পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার সামনে বসে আছেন মিসেস রাবেয়া করিম। রাত্রির ধারণা ছিল একজন বুড়োমত মহিলা আসবেন। তাঁর পরনে থাকবে সাদা শাড়ি। তিনি আড়চোখে রাত্রিকে কয়েকবার দেখে ভাসা ভাসা ধরনের কিছু প্রশ্ন করবেন - বাড়ি কোথায়? ক' ভাইবোন? কী পড়? কিন্তু তার সামনে যিনি বসে আছেন তিনি সম্পূর্ণ অন্য রকম মহিলা। রেডক্রস লাগানো কালো একটি মরিস মাইনর গাড়ি নিজে চালিয়ে নিয়ে এসেছেন। মহিলাদের গাড়ি চালানো এমন কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়। অনেকেই চালাচ্ছে। নাসিমাও চালায় কিন্তু এই সময়ে একজন একা একা গাড়ি করে যাওয়া-আসা করে না।

ভদ্রমহিলা বেশ লম্বা। মাথার চুল কাঁচাপাকা। মুখটি কঠিন হলেও চোখ দু'টি হাসি হাসি। অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী একজন মহিলা। রাত্রিকে দেখে প্রথম যে কথাটি বললেন তা হচ্ছে— তোমার ইন্টারভ্যু নিতে এলাম মা। রাত্রি হকচকিয়ে গেল।

প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে নেই। আমি একজন ডাক্তার। মেডিকেল কলেজে গাইনির এসোসিয়েট প্রফেসর। আমার নাম রাবেয়া। তোমার ভাল নামটি কী?

ফারজানা।

তুমি বস এবং বল এত সুন্দর তুমি কি ভাবে হলে? এটা আমার প্রথম প্রশ্ন। খুব কঠিন প্রশ্ন।

ভদ্রমহিলা হাসতে লাগলেন। রাত্রি কী বলবে ভেবে পেল না।

হঠাৎ করে কেউ সুন্দর হয় না। এর পেছনে জেনেটিক কারণ থাকে। মনের সৌন্দর্য একজন নিজে নিজে ডেভেলপ করাতে পারে কিন্তু দেহের সৌন্দর্য উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে হয়। বল, তোমার মা এবং বাবা এদের দুজনের মধ্যে কে সুন্দর?

মা।

শোন রাত্রি, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তা কিছুই মিন করে না। তোমার পছন্দ-অপছন্দ আছে। এবং আমার মনে হচ্ছে তুমি খুব খুঁতখুঁতে ধরনের মেয়ে। আমি কী ঠিক বলেছি?

ঠিকই বলেছেন।

ভদ্রমহিলা চা খেলেন। অপালার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করলেন এবং এক পর্যায়ে একটি হাসির গল্প বললেন। হাসির গল্পটি একটি ব্যাঙ নিয়ে। পরপর কয়েকদিন বৃষ্টি হওয়ায় ব্যাঙটির সর্দি হয়ে গেছে। ব্যাঙ সমাজে ছিঃ ছিঃ পড়ে গেছে। বেশ লম্বা গল্প। অপালা মুগ্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর পর হাসিতে ভেঙে পড়তে লাগল।

ভদ্রমহিলা এসেই বলেছিলেন আধঘণ্টা থাকবেন। কিন্তু তিনি পুরোপুরি তিন ঘণ্টা থাকলেন। দুপুরের খাবার খেলেন। খাবার শেষ করে রাত্রিকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেলেন। অস্বাভাবিক নরম গলায় বললেন, মা, তোমাকে কী আমি আমার ছেলের সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে পারি?

রাত্রি লজ্জিত স্বরে বলল, বলুন।

তার সবচে দুর্বল দিকটির কথা আগে বলি। ওর থিংকিং প্রসেসটা একটু স্লো বলে আমার মনে হয়। যখন কেউ কোনো হাসির কথা বলে তখন সে প্রায়ই বুঝতে পারে না। বোকা মানুষদের মত বলে--- ঠিক বুঝতে পারলাম না।

রাত্রি অবাক হয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকিয়ে রইল। তিনি এই কথাটি বলবেন তা বোধ হয় সে ভাবেনি।

এখন বলি ওর সবচে সবল দিকটির কথা। পুরনো দিনের গল্প-উপন্যাসে এক ধরনের নায়ক আছে যারা জীবনে কোন পরীক্ষাতে সেকেন্ড হয় না। ও সে রকম একটি ছেলে। মা, আমি খুব খুশি হব তুমি যদি খানিকক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বল। আমার ধারণা, কিছুক্ষণ কথা বললেই তোমার ওকে পছন্দ হবে। অবশ্যি ও কথা বলবে কিনা জানি না। যা লাজুক ছেলে!

ছেলেটিকে না দেখেই রাত্রির কেমন যেন পছন্দ হল। কথা বলতে ইচ্ছা হল। তার একটু লজ্জা লজ্জাও লাগল। ভদ্রমহিলা বললেন, মা, তুমি কী ওর সঙ্গে কথা বলবে?

হ্যাঁ বলব।

থ্যাংক য়্যু। যাই কেমন?

যাই বলার পরও তিনি আরো কিছুক্ষণ থাকলেন। নাসিমার সঙ্গে গল্প করলেন। অপালাকে আরো একটি হাসির গল্প বললেন। সেই গল্পটি তেমন জমল না। অপালা গম্ভীর হয়ে রইল।

ওরা মডার্ন নিওন সাইন থেকে বেরুল দুপুর দুটায়। রহমানকে রেখে যেতে হল। কারণ তার উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই। আলম চেয়েছিল রহমানকে তার জায়গায় রেখে আসতে। দলের সবাই আপত্তি করল। নাড়াচাড়া করার কোনো দরকার নেই। এখানে বিশ্রাম করুক। আশফাক বলল, জহুর মিয়া আছে সে দেখাশোনা করবে। দরকার হলে চেনা একজন ডাক্তার আছে তাকে নিয়ে আসবে। কোনই অসুবিধা নেই।

আলম গম্ভীর হয়ে রইল। রহমানকে বাদ দিয়ে আজকের অপারেশন শুরু করতে তার মন চাইছে না। এবং কেন যেন জায়গাটাকে তার নিরাপদ মনে হচ্ছে না। সারাক্ষণই মনে হচ্ছে কিছু-একটা হবে।

এরকম মনে হবার তেমন কোন কারণ নেই। এই শহরে মিলিটারিরা নিশ্চিন্ত জীবনযাপন করছে। এরা এখানে শংকিত নয়। আলাদাভাবে কোনো বাড়িঘরের দিকে নজর দেবে না। নজর দেবার কথাও নয়। সাদেক বলল, আলম, তুই এত গম্ভীর কেন? ভয় পাচ্ছিস নাকি? আলম বলল, বেরিয়ে পড়া যাক।

তারা উঠে দাঁড়াল। আশফাককে নিয়ে ছ'জনের একটি দল। আলম বলল, রহমান চললাম।

রহমান উত্তর দিল না। তাকিয়ে রইল। তার জ্বর নিশ্চয়ই বেড়েছে। চোখ ঘোলাটে। জ্বরের জন্য মুখ লাল হয়ে আছে।

তারা রাস্তায় বেরুতেই একটি মিলিশিয়াদের ট্রাক চলে গেল। মিলিশিয়ারা ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে আছে। মনে হয়, অল্প কিছুদিন হল এ দেশে এসেছে। নতুন পরিবেশে নতুন ধরনের জীবনযাত্রায় এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি।

সাদেক বলল, রওনা হবার আগে পান খেলে কেমন হয়? কেউ পান খাবে?

জবাব পাওয়া গেল না। সাদেক লম্বা লম্বা পা পেলে পান কিনতে গেল। নূরু বলল, সাদেক ভাইয়ের খুব ফুর্তি লাগছে মনে হয়। হাসতে হাসতে কেমন গল্প জমিয়েছে দেখেন।

সাদেক সত্যি সত্যি হাত-পা নেড়ে কী সব বলছে। সিগারেট কিনে শীস দিতে দিতে আসছে। এই ফুর্তির ভাবটা কতটুকু আন্তরিক বোঝার উপায় নেই। ফুর্তির ব্যাপারটা কারো কারো চরিত্রের মধ্যেই থাকে। হয়ত সাদেকেরও আছে।

আলম আকাশের দিকে তাকাল। নির্মেঘ আকাশ। ঘন নীলবর্ণ। বর্ষাকালে আকাশ এত নীল হয় না। আজ এত নীল কেন?

## ছয়

ভদ্রলোকের পরনে হাফ হাওয়াই শার্ট। বয়স খুব বেশি হলে পঁয়ত্রিশ হবে। কালো ফ্রেমের ভারী চশমার জন্যে বয়স কিছু বেশি মনে হচ্ছে। বেশ লম্বা, হাঁটছেন মাথা নিচু করে। তাঁর ডান হাতে একটি প্যাকেট। বাঁ হাত ধরে একটি মেয়ে হাঁটছে—তার বয়স পাঁচ-ছ'বছর। ভারি মিষ্টি চেহারা। তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে। ছোট মেয়েটি ক্রমাগত কথা বলছে। ভদ্রলোক তার কোনো কথার জবাব দিচ্ছেন না। ভদ্রলোকের কম কথা বলার স্বভাবের সঙ্গে মেয়েটি পরিচিত। তাদের গাড়িটি বেশ খানিকটা দূরে পার্ক করা। তারা ছোট ছোট পা ফেলে গাড়ির দিকে যাচ্ছে। জায়গাটা বায়তুল মোকাররম। সময় তিনটা পাঁচ।

ভদ্রলোকের গাড়িটি নতুন। সাদা রঙের টয়োটা করোলা। ফোর ডোর। রাস্তার বাঁয়ে দৈনিক বাংলার দিকে মুখ ফিরিয়ে প্যারালাল পার্ক করা। গাড়িটির কাছে পৌঁছতে হলে রাস্তা পার হতে হয়।

তিনি সাবধানে রাস্তা পার হলেন। লক্ষ্য করলেন তাঁর সঙ্গে দুটি ছেলেও রাস্তা পার হল। এরা বারবার তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। ভদ্রলোক একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এই ছেলে দু'টি অনেকক্ষণ ধরেই আছে তাঁর সঙ্গে। ব্যাপার কী? তিনি গাড়ির হাতলে হাত রাখামাত্র চশমা পরা লম্বা ছেলেটি এগিয়ে এল।

আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আমার সঙ্গে কী কথা? আমি আপনাকে চিনি না।

ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুললেন। ছেলেটি শীতল কণ্ঠে বলল, গাড়িতে উঠবেন না। আপনার গাড়িটি দরকার। চিৎকার-চেঁচামেচি কিছু করবেন না। যেভাবে দাঁড়িয়ে আছেন সেভাবে দাঁড়িয়ে থাকুন।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। ছোট মেয়েটি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। লম্বা ছেলেটি বলল, আমরা মুক্তিযোদ্ধার একটি গেরিলা ইউনিট, কিছুক্ষণের ভেতর ঢাকা শহরে অপারেশন চালাব। আপনার গাড়িটা দরকার। চাবি দিয়ে দিন।

ভদ্রলোক চাবি তুলে দিলেন।

গাড়িতে কোন সমস্য নেই তো? ভাল চলে?

নতুন গাড়ি, খুবই ভাল চলে। তেল নেই। আপনাদের তেল নিতে হবে।

নিয়ে নেব।

তেল কিনার টাকা আছে তো? টাকা না থাকলে আমার কাছ থেকে নিতে পারেন।

টাকা আছে।

ভদ্রলোক হাসছেন। তিনি তাঁর মেয়ের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে মেয়েকে আশ্বস্ত করলেন। নরম স্বরে বললেন, মা, এঁদের স্লামালিকুম দাও।

মেয়েটি চুপ করে রইল। তার চোখে স্পষ্ট ভয়। সে অল্প অল্প কাঁপছে।

আপনি এখন থেকে ঠিক দু'ঘণ্টা পর থানায় ডায়েরি করবেন যে আপনার গাড়িটি চুরি হয়েছে।

এর আগে কিছুই করবেন না।

ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকালেন এবং হাত বাড়িয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের হাত মেয়েদের হাতের মত কোমল।

আমার নাম ফারুক চৌধুরী। আমি একজন ডাক্তার। এ তৃণা, আমার বড় মেয়ে। আজ ওর জন্মদিন। আমরা কেক কিনতে এসেছিলাম।

লম্বা ছেলেটি বলল আমার নাম আলম। বদিউল আলম, শুভ জন্মদিন তৃণা।

আলম গাড়িতে উঠে দরজা লাগিয়ে দিল। গাড়ি চালাবে গৌরাঙ্গ। আলম বসেছে গৌরাঙ্গের পাশে। পেছনের সিটে সাদেক এবং নূরু।

আশফাকের গাড়িতে থাকবে শুধু নাজমুল। বেশি মানুষের সেখানে থাকার দরকার নেই। এটি হচ্ছে কভার দেয়ার গাড়ি। একটি সেলফ লোডিং রাইফেল হাতে নাজমুল একাই যথেষ্ট। সে মহা ওস্তাদ ছেলে। উৎসাহ একটু বেশি। তবে সেই বাড়তি উৎসাহের জন্যে এখন পর্যন্ত কাউকে বিপদে পড়তে হয়নি। আজও বিপদে পড়তে হবে না।

দু'টি গাড়ি মগবাজার এলাকার দিকে চলল। আশফাকের গাড়িটিতে অস্ত্রশস্ত্র আছে। তার কিছু কিছু সামনের টয়োটায় তুলতে হবে।

আলম ও সাদেকের হাতে থাকবে স্টেইনগান। ক্লোজ রেঞ্জ উইপন। ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে এটি একটি চমৎকার অস্ত্র। গেরিলাদের জন্যে আদর্শ। ছোট এবং হালকা। নূরুর দায়িত্বে এক বাক্স গ্রেনেড। নূরু হচ্ছে গ্রেনেড জাদুকর। নিশানা, ছুড়বার কায়দা, টাইমিং কোথাও কোনো খুঁত নেই। অথচ এই ছেলে মহা বিপদ ঘটাতে যাচ্ছিল।

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সার্জেন্ট মেজর ময়না মিয়া গ্রেনেড ছুড়বার ট্রেনিং দিচ্ছেন। পরিষ্কার করে সব বুঝিয়ে দিলেন—

"পিনটা খুলবার পর হাতে সময় হচ্ছে সাত সেকেন্ড। খেয়াল রাখবেন সাত সেকেন্ড। মনে হচ্ছে খুব কম সময়। আসলে অনেক বেশি সময়। সাত সেকেন্ডে অনেক কিছু করা যায়। ব্রাদারস, খেয়াল রাখবেন সাত সেকেন্ড অনেক সময়। পিন খুলে নেবার পর যদি শুধু চিন্তা করতে থাকেন 'এই বুঝি ফাটল', 'এই বুঝি ফাটল' তাহলে মুশকিল। মনের ভয়ে তাড়াহুড়া করবেন, নিশানা ঠিক হবে না। খেয়াল রাখবেন, সাত সেকেন্ড অনেক সময়। অনেক সময়।"

নূরুকে গ্রেনেড দিয়ে পাঠানো হল। ছুড়বার ট্রেনিং হবে। নূরু ঠিকমতই গ্রেনেডের পিন দাঁত দিয়ে খুলল। তারপর সে আর ছুড়ে মারছে না। হাতে নিয়ে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। ময়না মিয়া চেঁচাল, ছুড়ে মারেন, ছুড়ে মারেন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন? নূরু কাঁপা গলায় বলল, আমার হাত শক্ত হয়ে গেছে, ছুড়তে পারছি না। নূরুর মুখ রক্তশূন্য।

বিদ্যুতের গতিতে ছুটে গেলেন ময়না মিয়া। গ্রেনেড কেড়ে নিয়ে ছুড়ে মারবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হল। ময়না মিয়া নূরুকে নিয়ে মাটিতে শোবারও সময় পেলেন না। সৌভাগ্যক্রমে কারো কিছু হল না। ময়না মিয়া ঠাণ্ডা গলায় বললেন, নুরু ভাই, আরেকটা গ্রেনেড ছুড়েন। এখন আমি আছি আপনার কাছে। নূরু বলল, আমি পারব না। ময়না মিয়া প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন। তারপর বললেন, যা বলছি করেন।

নূরু গ্রেনেড ছুড়ল। সার্জেন্ট মেজর ময়না মিয়া বললেন, নূরু ভাই হবেন গ্রেনেড মারায় এক নম্বর।

ময়না মিয়ার কথা সত্যি হয়েছে। ময়না মিয়া তা দেখে যেতে পারেননি। মান্দার অপারেশনে মারা গেছেন।

আলম ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। ময়না মিয়া কথা মনে হলেই মন দ্রবীভূত হয়ে যায়, বুক হু-হু করে। দেশ স্বাধীন হবার আগে কী দেশের বীরপুত্রদের সবাই শেষ হয়ে যাবে?

আলম।

বল।

গাড়ি কোথাও রাখতে হবে, আমার পেচ্ছাব করতে হবে। কিডনি প্রেসার দিচ্ছে। একটা নর্দমার কাছে গাড়িটা থামা তো গৌরাঙ্গ।

গৌরাঙ্গ গাড়ি থামাল।

গাড়ি এগুচ্ছে খুব ধীরে। যেন কোন রকম তাড়া নেই। গৌরাঙ্গ পেছনের পিকআপটির দিকে লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করছে। ব্যাক মিররটা ভাল না। বাঁকা হয়ে আছে। পেছনে কে আসছে দেখার জন্যে ঘাড় বাঁকা করতে হয়। আলমের মনে হল গৌরাঙ্গ বেশ নার্ভাস।

গৌরাঙ্গ।

বলেন।

পেছনের দিকে লক্ষ্য রাখার তোমার কোনো দরকার নেই। তুমি চালিয়ে যাও।

জি আচ্ছা।

এত আস্তে না। আরেকটু স্পিডে চালাও। রিকশা তোমাকে ওভারটেক করছে।

গৌরাঙ্গ মুহূর্তে স্পিড বাড়িয়ে দিল। তার এতটা নার্ভাস হবার কারণ কী? আলম পরিবেশ হালকা করার জন্যে বলল, সেন্ট মেখেছ নাকি গৌরাঙ্গ? গন্ধ আসছে। কড়া গন্ধ।

গৌরাঙ্গ লজ্জিত স্বরে বলল, সেন্ট না। আফটার শেভ দিয়েছি।

দাড়ি-গোঁফ গজাচ্ছে না। আফটার শেভ কেন?

সবাই হেসে উঠল। গৌরাঙ্গও হাসল। পরিবেশ হালকা করার একটা সচেতন প্রচেষ্টা। সবার ভাবভঙ্গি এ রকম যেন বেড়াতে যাচ্ছে। আলগা একটা ফুর্তির ভাব। কিন্তু বাতাসে উত্তেজনা। রক্তে কিছু একটা নাচছে। প্রচুর পরিমাণে এড্রোলিন চলে এসেছে পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে। সবার নিঃশ্বাস ভারী। চোখের মণি তীক্ষ্ণ। গৌরাঙ্গের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে সিগারেট ধরাল। স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে সিগারেট ধরানোর কৌশলটা চমৎকার। আলম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। তামাকের গন্ধ ভাল লাগছে না। গা গুলাচ্ছে। আলম একবার ভাবল, বলে— সিগারেট ফেলে দাও গৌরাঙ্গ। বলা হল না।

সাদেক পেছনের সিটে গা এলিয়ে দিয়েছে। তার চোখ বন্ধ। সে বলল, আমি একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। সময় হলে জাগিয়ে দিও। রসিকতার একটা চেষ্টা। স্থূল ধরনের চেষ্টা। কিন্তু কাজ দিয়েছে। নূরু এবং গৌরাঙ্গ দাঁত বের করে হাসছে। সাদেক এই হাসিতে আরো উৎসাহিত হল। নাক ডাকার মত শব্দ করতে লাগল।

গাড়ি নিউ মার্কেটের সামনে দিয়ে সোজা ঢুকল মীরপুর রোডে। লালমাটিয়ার কাছাকাছি এসে ডানদিকে টার্ন নিয়ে চলে যাবে ফার্মগেট। সেখান থেকে হোটেল ইন্টারকন। কাগজে-কলমে কত সহজ। বাস্তব অন্য জিনিস। বাস্তবে অদ্ভুত অদ্ভুত সব সমস্য হয়। মিশাখালিতে যে রকম হল। খবর পাওয়া গেল দশজন রাজাকার নিয়ে তিনজন মিলিটারির একটা দল সুলেমান মিয়ার ঘরে এসে বসে আছে, ডাব খাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে সাদেক দলবল নিয়ে রওনা হয়ে গেল। দু'তিনটা গুলি ছুড়লেই রাজাকাররা তাদের পাকিস্তানি বন্ধুদের ফেলে পালিয়ে যাবে। অতীতে সব সময়ই এ রকম হয়েছে কিন্তু সেবার হয়নি। সুলেমান মিয়ার ঘরে যারা বসে ছিল তারা সবাই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কমান্ডো ইউনিট। গ্রামে ঢুকেছে গানবোট নিয়ে। সাদেক মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছে। যাদের নিয়ে গিয়েছিল তাদের সবাইকে প্রায় রেখে আসতে হয়েছিল। ভয়াবহ অবস্থা।

নাজমুল বলল, আপনার ভয় লাগছে নাকি আশফাক সাহেব?

আশফাক ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার এত ভয় নাই।

অ্যাকশন কখনো দেখেননি এই জন্যে ভয় নেই। একবার দেখলে বুকের রক্ত পানি হয়ে যায়। খুব খারাপ জিনিস।

আশফাক ব্রেকে পা দিল। সামনে একটা ঝামেলা হয়েছে। অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে বোধ হয়। একটা ঠেলাগাড়ি উল্টে পড়ে আছে। তার পাশে হেডলাইট ভাঙা একটা সবুজ রঙের জিপ। প্রচুর লোকজন এদের ঘিরে আছে। আশফাক ভিড় কমাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ভিড় কমছে না। একজন ট্রাফিক পুলিশ মেয়েদের মত মিনমিনে গলায় কী সব বলছে, কেউ তার কথা শুনছে না। নাজমুল বিরক্ত স্বরে বলল, ঝামেলা হয়ে গেল দেখি।

আশফাক নির্বিকার। যেন কিছুই হয়নি। সে জানালা দিয়ে মাথা বের করে ব্যাপারটা দেখবার চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে সে এই ঝামেলাটায় বেশ মজা পাচ্ছে। কত অদ্ভুত মানুষ থাকে।

ভিড় চট করে কেটে যেতে শুরু করেছে। কারণ হচ্ছে ইপিআর এক নম্বর গেট থেকে একটি সাদা রঙের জিপ বাঁশি বাজাতে বাজাতে আসছে।

গৌরাঙ্গ একস্লিলেটরে পা দিল। নূরু বলল, যাত্রা শুভ না আলম ভাই। যাত্রা খারাপ।

এ ধরনের কথাবার্তা খুবই আপত্তিজনক। মনের ওপর বাড়তি চাপ পড়ে। এই মুহূর্তে আর কোনো বাড়তি চাপের প্রয়োজন নেই। আলম ঠাণ্ডা গলায় বলল, শুভ কাজের জন্যে যে যাত্রা তা সব সময়ই শুভ। গৌরাঙ্গ স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে। হু-হু করে হাওয়া আসছে জানালা দিয়ে। লালমাটিয়ার কাছাকাছি আসতেই আবার ব্রেকে পা দিতে হল। গৌরাঙ্গ শুকনো গলায় বলল, আলম ভাই কী করব বলেন? ছুটে বেড়িয়ে যাব?

না, গাড়ি থামাও।

ভাল করে ভেবে বলেন।

গাড়ি থামাও। সবাই তৈরি থাক।

গাড়ি রাস্তার পাশে এসে থামল। আশফাকও তার পিকআপ থামিয়েছে।

তাদের সামনে দুটি গাড়ি থেমে আছে। একটি ত্রিপল ঢাকা ট্রাক, অন্যটি ভোক্সওয়াগন। মুখ কালো করে কয়েকজন লোক গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরা ভয়ে অস্থির।

যারা গাড়ি থামাচ্ছে তারা মিলিটারি পুলিশ। একেকটা গাড়ি আসছে—হুইসেল দিয়ে হাত ইশারা করছে। গাড়ি থামামাত্র এগিয়ে যাচ্ছে—কাগজপত্র নিয়ে আসছে।

সংখ্যায় তারা চারজন। ভাল ব্যাপার হচ্ছে এই চারজনই দাঁড়িয়ে আছে কাছাকাছি। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নেই। এদের একজনের সঙ্গে রিভলবার ছাড়া অন্য কিছু নেই। বাকি তিনজনের সঙ্গে আছে চাইনিজ রাইফেল।

আলম বলল, সাদেক তুই একা আমার সঙ্গে নামবি। অন্য কেউ না।

গৌরাঙ্গ।

বলুন।

সিগারেট এখন ফেলে দাও।

গৌরাঙ্গ সিগারেট ফেলে দিল। আলম জানালা দিয়ে মুখ বের করে হাত ইশারা করে ওদের ডাকল। মিলিটারি পুলিশের দলটি ক্রুদ্ধ ও অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখল। হাত ইশারা করে ওদের ডাকার স্পর্ধা এখনো কারোর আছে তা তাদের কল্পনাতেও নেই। একজন এগিয়ে আসছে, অন্য তিনজন দাঁড়িয়ে আছে।

আলম নামল খুব সহজ ও স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। তার পেছনে নামল সাদেক। সাদেকের মুখ ভর্তি হাসি।

এরা বুঝতে পারল না এই ছেলে দুটি ভয়াবহ অস্ত্র নিয়ে নেমেছে। এদের স্নায়ু ইস্পাতের মত।

প্রচণ্ড শব্দ হল গুলির। একটি গুলি নয়। এক ঝাঁক গুলি। ফাঁকা জায়গায় এত শব্দ হবার কথা নয়। কিন্তু হল। চারজনেই গড়িয়ে পড়ছে। এখনো রক্ত বেরুতে শুরু করেনি। ওদের মুখে আতংক ও বিস্ময়।

নাজমুল নেমে পড়েছে তার হাতে এসএলআর। আলম বলল, গাড়িতে উঠ নাজমুল। নেমেছ কেন?

দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলি একটা ঘোরের মধ্যে আছে কী হয়ে গেল তারা এখনো বুঝতে পারছে না। সাদেক বলল, আপনারা দাঁড়িয়ে থাকবেন না। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যান। লোকগুলির একজন শব্দ করে কাঁদছে। কী জন্যে কাঁদছে কে জানে। এখানে তার কাঁদবার কী হল?

এখানকার ঘটনা প্রচার হতে সময় লাগবে। তারা ফার্মগেটে পৌঁছে যাবে কিছু ক্ষণের মধ্যেই। অবশ্যি গুলির শব্দ ওরা হয়ত পেয়েছে। এতে তেমন কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। এই শহরে গেরিলারা এসেছে এটা ওদের কল্পনাতেও নেই।

গাড়ি চলা শুরু করতেই সাদেক বলল, আমার বাথরুম পেয়ে গেছে। কেউ কোনো উত্তর দিল না। সাদেক আবার বলল, ডায়াবেটিস হয়ে গেল নাকি? এই কথারও কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

গৌরাঙ্গ আবার একটি সিগারেট ধরিয়েছে। তার ফর্সা আঙুল অল্প অল্প কাঁপছে। আলম বলল, ভয় লাগছে গৌরাঙ্গ?

গৌরাঙ্গ সত্যি কথা বলল।

হ্যাঁ, লাগছে। বেশ ভয় লাগছে।

আলম তাকাল পেছনে। সাদেক চোখ বন্ধ করে পড়ে আছে। স্টেইনগানটি তার কোলে। কেমন খেলনার মত লাগছে। নূরু বসে আছে শক্ত মুখে। আলমের দিকে চোখ পড়তেই সে বলল, কিছু বলবেন আলম ভাই?

না কিছু বলব না।

সিগারেট ধরাবেন একটা?

না।

ঠিক এই মুহূর্তে কিছুই বলার নেই। কিছুই করার নেই। এটা হচ্ছে প্রতীক্ষার সময়। আলম লক্ষ্য করল বারবার তার মুখে থুথু জমা হচ্ছে। কেন এরকম হচ্ছে? তার কী ভয় লাগছে? তার সঙ্গে আছে চমৎকার একটি দল। এরা প্রথম শ্রেণীর কমান্ডো ট্রেনিং পাওয়া দল। এদের সঙ্গে নিয়ে যে কোনো পরিস্থিত সামাল দেয়া যায়। কোনো রকম ভয় তার থাকা উচিত নয়। কিন্তু আছে। ভালই আছে। নয়ত বারবার মুখে থুথু জমত না। সেই আদিম ভয় যা যুক্তি মানে না। মনের কোন এক গহীন অন্ধকার থেকে বিড়ালের মত নিঃশব্দে বের হয়ে আসে এবং দেখতে দেখতে ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে ওঠে। গাড়ির বেগ কমে আসছে। গৌরাঙ্গের চোখ-মুখ শক্ত। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আলম ডাকল, সাদেক সাদেক। সাদেক ভারী গলায় বলল, আমি আছি। গৌরাঙ্গ বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। আলমের কেমন বমি-বমি ভাব হচ্ছে। তার জানতে ইচ্ছা করছে অন্যদেরও তার মত হচ্ছে কি-না। কিন্তু জানার সময় নেই। গাড়ি থেমে আছে। মিলিটারিদের তাঁবু দশ-পনেরো গজ দূরে।

দরজা খুলে তিনজনই লাফিয়ে নামল। নামজুল তখনো নামেনি।

পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কুড়িজনের একটি ইউনিট ছিল ফার্মগেটে। তাদের দলপতি সুবেদার মেজর মাবুদ খাঁ। এই দলটিকে এখানে রাখার উদ্দেশ্য মাবুদ খাঁর কাছে পরিষ্কার নয়। এদের ওপর তেমন কোন ডিউটি নেই। মাঝে মাঝে রোড ব্লক করে যে চেকিং হয় তা করে এমপি-রা। ওদের সঙ্গে ইদানীং যোগ দিয়েছে মিলিশিয়া।

তাঁবুর ভেতরটা বেশ গরম কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশির ভাগ সৈন্যই ঘুমুচ্ছিল। বা ঘুমের ভঙ্গিতে শুয়ে ছিল। যদিও এটা ঘুমুবার সময় নয়। কিছুক্ষণের ভেতরই বৈকালিন চা আসবে। চা আসতে আজ দেরি হচ্ছে। কেন দেরি হচ্ছে কে জানে।

মাবুদ খাঁ তাঁবুর বাইরে চেয়ারে বসে ছিল। শুধু শুধু বসে থাকা যায় না। কিন্তু তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার কোনো কাজ নেই। তাঁবুর ভেতর হৈচৈ হচ্ছে। তাস খেলা হচ্ছে সম্ভবত। এই খেলাটি তার অপছন্দ। সে মুখ বিকৃত করল এবং ঠিক তখনই সে লক্ষ্য করল তিনটি ছেলে দৌড়ে আসছে। দীর্ঘদিনের সামরিক ট্রেনিং তার পেছনে। তার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না যে ছেলে তিনটি কেন ছুটে আসছে। সে মুগ্ধ হল এদের অর্বাচিন সাহসে। কিছু একটা বলল চিৎকার করে। সেটা শোনা গেল না। কারণ আকাশ কাঁপিয়ে একটা বিস্ফোরণ হয়েছে।

চিৎকার, হৈচৈ, আতংকগ্রস্ত মানুষদের ছোটাছুটি। সব কিছু ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে গুলির শব্দ। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ছে।

নূর শান্ত। সে দুটি গ্রেনেড পরপর ছুড়েছে। এখন তার করবার কিছু নেই। সে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তির মত। চোখের সামনে যা ঘটছে তা ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। আলম ভাই দ্বিতীয় ম্যাগজিনটি ফিট করছেন। কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। এখন উচিত দ্রুত পালিয়ে যাওয়া। যে বিকট বিস্ফোরণ হয়েছে অর্ধেক শহর নিশ্চয়ই কেঁপে উঠেছে। এয়ারপোর্ট থেকে টহলদারি জিপ নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে।

গৌরাঙ্গ ক্রমাগত হর্ন দিচ্ছে। তার মুখ রক্তশূন্য।

নূরু চেঁচিয়ে বলল, আলম ভাই গাড়িতে উঠেন।

একটি সরকারি বাস যাত্রী নিয়ে হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। ড্রাইভার বাস থামিয়ে হতভম্ব হয়ে তার সিটে বসে আছে। বাসটি এমনভাবে সে রেখেছে যে গৌরাঙ্গ তার গাড়ি বের করতে পারছে না। সাদেক এগিয়ে গেল। তার হাতে স্টেইনগান। বাস ড্রাইভারকে আশ্চর্যরকম নরম গলায় বলল, ড্রাইভার সাহেব, গাড়িটা সরিয়ে নিন। আমাদের আরো কাজ আছে।

হতভম্ব ড্রাইভার মুহূর্তে তার গাড়ি নিয়ে গেল থার্ড গিয়ারে।

ঘণ্টার শব্দ আসছে। দমকল নাকি?

ওরা গাড়িতে উঠে বসল। গৌরাঙ্গ গাড়িটিকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আলম বলল, আস্তে যাও। আস্তে কোনো ভয় নেই।

গাড়ি যাচ্ছে ইন্টারকনের দিকে। এই প্রোগ্রামটিতে কোনো ঝামেলা নেই। কেউ গাড়ি থেকে নামবে না। ছুটে যেতে যেতে কয়েকটি গ্রেনেড ছোঁড়া হবে। হোটেলের বিদেশী সাংবাদিকরা জানবে ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক নয়। আলমের মনে হল বড় রকমের ঝামেলা হয়ত ইন্টারকনের সামনেই অপেক্ষা করছে। যেখানে কোনো ঝামেলা হবে না মনে করা হয় সেখানেই ঝামেলা দেখা দেয়। আলম বলল, স্পিড কমাও গৌরাঙ্গ। করছ কি তুমি? মারবে নাকি?

গৌরাঙ্গ স্পিড কমাল। সাদেক বলল, প্রচণ্ড বাথরুম পেয়ে গেছে, কি করা যায় বল তো আলম?

আলম জবাব দিল না। ইন্টারকন এসে পড়েছে। আলমের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। আবার মুখে থুথু জমছে। গা গুলাচ্ছে।

ছটায় কার্ফু শুরু হবে।

রাত্রি সাড়ে পাঁচটায় উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করল। ফোন ধরলেন সুরমা। তিনি বুঝতে পারছেন রাত্রির গলা কাঁপছে। অনেক চেষ্টা করেও সে তার উদ্বেগ চেপে রাখতে পারছে না।

তিনি নরম গলায় বললেন, কি হয়েছে রাত্রি?

কিছু হয়নি মা। তুমি কি খবর শুনেছ?

না। কী খবর?

টেলিফোনে বলা যাবে না। দারুণ সব কাণ্ড হয়েছে মীরপুর রোডে। ফার্মগেটে। কিচ্ছু জান না?

না। জানি না।

আমরা বাড়ি আসবার জন্যে গাড়ি বের করেছিলাম। ওরা আসতে দেয়নি। রোড ব্লক করেছে। মা শোন—

শুনছি।

উনি কি এসেছেন?

না।

বল কি মা?

সুরমা চুপ করে রইলেন। রাত্রি টেলিফোন ধরে রেখেছে। যেন সে আরো কিছু শুনতে চায়। সুরমা বললেন, তোর বাবার সঙ্গে কথা বলবি?

না। মা শোন, উনি এলেই তুমি টেলিফোন করবে।

সুরমা জবাব দিলেন না।

মা।

বল শুনছি।

উনি এলেই টেলিফোন করবে। আমার খুব খারাপ লাগছে মা। আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে।

সুরমার মনে হল উনি কান্নার শব্দ শুনলেন। তাঁর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। কেন রাত্রি কাঁদছে? এই বয়েসী মেয়ে যদি কোনো পুরুষের কথা ভেবে কাঁদে তার ফল শুভ হয় না। বিয়ের আগে তিনি নিজেও একটি ছেলের জন্যে কাঁদতেন। তার ফল শুভ হয়নি। যদিও সেই ছেলেটির কথা তিনি একবারও ভাবেন না। তবু কোথাও যেন একটা শূন্যতা অনুভব করে। ছেলেটি তাঁর হৃদয়ের একটি অংশ খালি করে গেছে। সেখানে কোনো স্মৃতি নেই, স্বপ্ন নেই, প্রগাঢ় শূন্যতা।

সুরমা টেলিফোন নামিয়ে বসার ঘরে ঢুকবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আলম এল। তার চোখ লাল। দৃষ্টি এলোমেলো। সে সুরমার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল। সুরমা বললেন, তুমি ভাল আছ তো?

জি।

সবাই ভাল আছে?

হ্যাঁ, আপনি কী আমাকে একটু গরম পানি করে দিতে পারবেন? গরম পানি দিয়ে গোসল করব।

আলম ক্লান্ত পায়ে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। থমকে দাঁড়াল বারান্দায়। মতিন সাহেব বাগানে কাজ করছেন। আগাছা পরিষ্কার করে বাগানটিকে এত সুন্দর করে ফেলেছেন— শুধু তাকিয়ে

থাকতে ইচ্ছা করে।

সুরমা গরম পানি বাথরুমে দিয়ে আলমকে খবর দিতে গেলেন। আলম হাত-পা ছড়িয়ে গভীর ঘুমে অচেতন। কাপড় ছাড়েনি। পা থেকে জুতো পর্যন্ত খুলেনি।

ঘুমের মধ্যেই আলম একটি অস্ফুট শব্দ করছে। প্রচণ্ড জ্বর হলে মানুষ এমন করে। ওর কি জ্বর? ঘরে ঢুকবার সময় দেখেছেন চোখ টকটকে লাল। সুরমা আলমের কপালে হাত রাখতেই আলম উঠে বসল।

তোমার পানি গরম হয়েছে।

থ্যাংক য়্যু।

কিন্তু তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে।

আমার এ রকম হয়। হট শাওয়ার নিয়ে শুয়ে থাকলে জ্বর নেমে যাবে।

আলম তোয়ালে টেনে নিয়ে মাতালের ভঙ্গিতে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

রাত্রি সন্ধ্যা সাতটায় আবার টেলিফোন করল। কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, মা উনি আসেননি। তাই না?

এসেছে।

এসেছেন। তাহলে আমাকে টেলিফোন করনি কেন? আমি তখন থেকে টেলিফোনের সামনে বসে আছি।

রাত্রি ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগল। সুরমা টেলিফোনে সেই কান্না শুনলেন। তাঁর নিজেরো চোখ ভিজে উঠতে শুরু করল। তিনি নিজেও কিশোরী বয়সে এভাবে কেঁদেছেন। কেউ তার কান্না শোনেনি। তিনি টেলিফোন নামিয়ে রেখে আলমের ঘরে এলেন। আলম খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। তার মুখে সিগারেট। সে সুরমাকে দেখে সিগারেট নামাল না। সুরমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার দিকে।

আলম বলল, আপনি কী কিছু বলবেন?

সুরমা থেমে থেমে বললেন, তুমি বলেছিলে এ বাড়িতে সাত দিন থাকবে। আজ সাতদিন শেষ হয়েছে।

আমি আগামীকাল চলে যাব। আগামীকাল সন্ধ্যায়।

তোমাকে কী এক কাপ চা বানিয়ে দেব?

দিন। আপনার কাছে এ্যাসপিরিন আছে?

আছে। দিচ্ছি।

বলেও সুরমা গেলেন না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আলম বলল, আপনি কী আরো কিছু বলবেন?

না।

মতিন সাহেবের নাক ফুলে উঠছে বারবার। হাত মুঠিবদ্ধ হচ্ছে। কারণ বিবিসি ঢাকার গেরিলা অপারেশনের খবর ফলাও করে বলেছে। এত তাড়াতাড়ি খবর পৌছল কিভাবে? সাহেবদের কর্মদক্ষতার ওপর তাঁর আস্থা সব সময়ই ছিল। এখন সেটা বহুগুণে বেড়ে গেছে।

সুরমাকে ঢুকতে দেখেই তিনি বললেন, ব্রিটিশদের মত একটা জাত আর হবে না।

সুরমা তাঁর কথা বুঝতে পারলেন না। হঠাৎ বৃটিশ প্রসঙ্গ এল কেন কে জানে।

সুরমা, আজদহারা ছারখার করে দিয়েছে। অর্ধেক ঢাকা শহর বার্ন করে দিয়েছে। একেবারে ছাতু। হ্যাভক।

সুরমা কিছুই বললেন না। মতিন সাহেব ট্রানজিস্টার নিয়ে শোবার ঘরে চলে গেলেন। রাত্রিকে টেলিফোন করে জানতে হবে বিবিসি শুনছে কিনা।

টেলিফোন ধরল অপালা। সে হাই তুলে বলল, বাবা আপাকে টেলিফোন দেয়া যাবে না। তার কি জানি হয়েছে, দরজা বন্ধ করে কাঁদছে।

মতিন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, এ রকম খুশির দিনে কাঁদছে কেন?

## সাত

রাত্রি ভোরবেলাতেই চলে এসেছে।

সুরমা রান্নাঘরে ছিলেন। সে চলে গেল রান্নাঘরে। সুরমা মেয়েকে দেখে বিস্মিত হলেন। এ কি চেহারা হয়েছে মেয়ের! মুখ শুকিয়ে কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে। চোখ লাল।

তোর কী হয়েছে?

কিছু হয়নি।

ঠিক করে বল কি হয়েছে?

রাতে ঘুম হয়নি মা। সারারাত জেগে ছিলাম।

সুরমা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। রুটি বেলতে লাগলেন। বিন্তি রুটি সেঁকছে এবং নিজের মনেই হাসছে। রাত্রি হালকা গলায় বলল, আজ কি নাশতা মা?

সুরমা কঠিন গলায় বললেন— দেখতেই পাচ্ছিস কি! জিজ্ঞেস করছিস কেন?

রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, আমার ওপর কেন তুমি রেগে যাচ্ছ মা? আমি কী কখনো তোমাকে রাগানোর জন্যে কিছু করেছি?

সুরমা উত্তর দিলেন না। রাত্রি আবার বলল, চুপ করে থাকবে না। বল তুমি, কখনো কী তোমাকে রাগানোর মত কোনো কারণ ঘটিয়েছি?

সুরমা দেখলেন রাত্রির চোখে জল টলমল করছে। যেন এক্ষুণি সে কেঁদে ফেলবে। তাঁর নিজেরো কান্না পেয়ে গেল। তিনি মনে মনে বললেন, কেউ যেন আমার এই মেয়েটির মনে কষ্ট না দেয়। বড় ভাল মেয়ে। বড় ভাল।

রাত্রি।

কি মা। আলমের ঘুম ভেঙেছে কিনা দেখে আয়।

বলেই সুরমা পাংশুবর্ণ হয়ে গেলেন। কেন রাত্রিকে এই কথা বললেন? তিনি ভালই জানেন আলম জেগে আছে। কিছুক্ষণ আগেই তিনি তাকে চা দিয়ে এসেছেন। রাত্রিকে এ কথা বলার উদ্দেশ্য কি এই যে তিনি তাকে খুশি করতে চেয়েছেন? কী ভয়ানক কথা! রাত্রি কি তার এই উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছে? নিশ্চয়ই পেরেছে। সে বোকা মেয়ে নয়। নিজেকে সামলানোর জন্য তিনি থেমে থেমে বললেন—

আজ চলে যাবে। একটু যত্ন-টত্ন করা দরকার।

আজ চলে যাবেন নাকি?

হ্যাঁ। এক সপ্তাহ থাকার জন্যে এসেছিল। এক সপ্তাহ তো হয়ে গেল।

তিনি কি বলছেন আজ চলে যাবেন?

হ্যাঁ বলেছেন।

রাত্রি হালকা পায়ে ঘর ছেড়ে গেল। তার গায়ে একটা ধবধবে সাদা সিল্কের শাড়ি। শাড়িতে বেগুনি ফুল। কি চমৎকার লাগছে রাত্রিকে। তাঁর মনে হল শুধুমাত্র মেয়েরাই সৌন্দর্য বুঝতে পারে। পুরুষরা পারে না। ওদের নজর থাকে শরীরের দিকে। সৌন্দর্য দেখবার সময় কোথায় ওদের।

আলম পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার কোলের উপর একটি বই। সে পা দুলাচ্ছে। রাত্রিকে ঢুকতে দেখে সে অল্প হাসল।

কখন এসেছেন?

এই তো কিছুক্ষণ আগে। কী বই পড়ছেন এত মন দিয়ে?

আলম একটু উঁচু করে দেখাল 'দত্তা'। রাত্রি হাসিমুখে বলল, অপালা এই বইটা মুখস্থ বলতে পারে। পাঁচ ছ'দিন পর পর এই বইটা সে একবার পড়ে ফেলে।

আলম বলল, আপনি কি অসুস্থ? কেমন যেন অন্য রকম লাগছে।

না, অসুস্থ না। আমি বেশ ভাল। দেখতে এসেছি আপনি কেমন আছেন। কাল সন্ধ্যাবেলা যা ভয় পেয়েছিলাম। কেন জানি মনে হচ্ছিল কিছু একটা হয়েছে আপনার। কি যে কষ্ট হচ্ছিল আপনি কোনোদিন কল্পনাও করতে পারবেন না।

আলমের অস্বস্তি লাগছে। এসব কি বলছে এই মেয়ে? কিন্তু এ তো সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলছে। আলম কথা ঘুরাবার জন্য বলল, কাল কি হয়েছে শুনতে চান?

না শুনতে চাই না। যুদ্ধ-টুদ্ধ আমার ভাল লাগে না।

কারোরই ভাল লাগে না।

রাত্রি খাটে আলমের মত পা ঝুলিয়ে বসল। মিষ্টি একটা গন্ধ বাতাসে ভাসছে। সৌরভ কি মানুষের মনে বিষাদ জাগিয়ে তুলে? তুলে বোধ হয়। আলমের কেমন জানি মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

রাত্রি বলল, আপনি নাকি আজ চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ।

কখন যাবেন?

বিকালে।

আপনি কি ঢাকাতেই থাকবেন, না চলে যাবেন অন্য কোথাও?

ঢাকাতেই থাকব।

আর আসবেন না আমাদের এখানে?

আসব না কেন, আসব।

আমার মনে হচ্ছে আপনি আর আসবেন না।

এ রকম মনে হচ্ছে কেন?

কেউ কথা রাখে না।

রাত্রি হঠাৎ উঠে চলে গেল। কারণ তার চোখ চলে ভরে আসছে। এই জল একান্তই নিজের, লুকিয়ে রাখার জিনিস। সে চলে গেল তার নিজের ঘরে।

অপালা সেখানে বসে আছে। তার হাতে একটা গল্পের বই। সে বই নামিয়ে বলল, কাঁদছ কেন আপা?

মাথা ধরেছে।

অপালা চোখ নামিয়ে নিল বইয়ে। সে নিজেও কাঁদছে কারণ এই মুহূর্তে সে খুবই দুঃখের একটা ব্যাপার পড়ছে। নায়িকা সিঁড়ি থেকে পিছলে পড়েছে এবং চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সে আর্তস্বরে চিৎকার করছে— অরুণ! অরুণ! সে ডাক শুনেও নির্বিকার ভঙ্গিতে নেমে যাচ্ছে।

সুরমা নাস্তা টেবিলে দিয়ে আলমকে ডাকতে এলেন। আলম জুতো পরছে।

কোথাও বেরুচ্ছ?

জি।

কখন ফিরবে?

বিকেলে এসে বিদায় নিয়ে যাব।

সুরমা একবার ভাবলেন বলেন, মাঝে মাঝে এসো। কিন্তু বলতে পারলেন না। যেসব কথা আমরা বলতে চাই তার বেশির ভাগই আমরা বলতে পারি না।

নাশতা খেতে আস বাবা।

আসছি।

মতিন সাহেব ঢাকা রেডিও খুলে বসেছিলেন। বাচ্চাদের একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে। কিচিরমিচির করছে একদল বাচ্চা।

আপা, আমি একটা ছড়া বলব। আমার নাম রুমানা ময়না ময়না কোন কথা কয় না...

বাহ্ বাহ্ বেশ হয়েছে। এবার তুমি আস। পরিষ্কার করে নাম বল।

আপা, আমার নাম সুমন, আমি একটা গান গাইব। রচনা বিদ্রোহী কবি নজরুল— কাবেরী নদীজলে কে গো বালিকা...

চমৎকার হয়েছে। এবার তুমি আস।

মতিন সাহেব বিড়বিড় করে বললেন— এদের ধরে চাবকান উচিত। এ সময় গান গাচ্ছে, ছড়া বলছে, কতবড় স্পর্ধা!

সুরমা এসে বললেন, নাশতা দেয়া হয়েছে। খেতে আস।

মতিন সাহেব শিশুর মত রেগে গেলেন।

যাও, আমি খাব না কিছু। যত ইডিয়টের দল। গান গাইছে, ছড়া বলছে। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিতে হয়।

শরীফ সাহেব আলমকে দেখে মোটেই অবাক হলেন না। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হল তিনি যেন মনে মনে তার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

মামা কি খবর তোমার?

ভাল। তুই এখনো বেঁচে আছিস?

আছি।

কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম গুলি খেয়েছিস। তখনি বুঝলাম তুই ভাল আছিস। আমার স্বপ্ন সব সময় উল্টো হয়।

শরীফ সাহেব কোমরের লুঙ্গী আঁট করতে করতে উঠে দাঁড়ালেন। ন'টা বাজে। অফিসে যাবার জন্য তৈরি হতে হয়। কিন্তু কেন যেন অফিসে যেতে ইচ্ছা করছে না। লুঙ্গী বদলে প্যান্ট পরতে হবে ভাবতেই খারাপ লাগছে।

চা খাবি?

না।

কফি। কফি খাবি? একটা ইনসটেন্ট কফি কিনেছি। চা বানানোর মহা হাঙ্গামা। কাজের ছেলেটা আমার একটা স্যুটকেস নিয়ে পালিয়ে গেছে।

বলতে বলতে তাঁর হাসি পেয়ে গেল। কারণ স্যুটকেসটিতে কিছু পুরনো ম্যাগাজিন ছাড়া কিছু ছিল না। ছাত্র জীবনে কিছু গল্প কবিতা লিখতেন। তার কয়েকটি ছাপাও হয়েছিল। স্যুটকেস বোঝাই সেই সব ম্যাগাজিনে।

হাসছ কেন?

ব্যাটা খুব ঠক খেয়েছে। স্যুটকেস খুলে হাউমাই করে কাঁদবে।

আলমের মনে হল, তার মামার হাসির ভঙ্গিটি কেমন যেন অস্বভাবিক। সুস্থ মানুষের হাসি নয়। অসুস্থ মানুষের হাসি।

আলম।

বল।

তোর চিঠি তোর মাকে পৌঁছে দিয়েছি।

মা ভাল আছেন?

জানি না।

জানি না মানে?

দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ভাল করেছ। ভাবছি নিজেও চলে যাব। রাতে ঘুম হয় না।

যাও, চলে যাও।

কিন্তু ওরা খুঁজে বের করে ফেলবে। ফখরুদ্দীন সাহেব পালিয়ে গিয়েছিলেন। মানিকগঞ্জ তাঁর শ্বশুরবাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসেছে। এখন বোধ হয় মেরেই ফেলেছে। খাবি তুই কফি?

দাও।

ফার্মগেটের অপারেশনে তুই ছিলি?

হুঁ।

ভালই দেখিয়েছিস।

আলম হাসল। হাসিমুখে বলল, তোমার সামনে সিগারেট খেলে তুমি রাগ করবে?

খেতে ইচ্ছা হলে খা। লায়েক হয়ে গেছিস, এখন তো খাবিই।

কফি ভাল হল না। অতিরিক্ত কড়া হয়ে গেল। হালকা করার জন্য দুধ ও গরম পানি মেশানোর পর তার স্বাদ হল আরো কুৎসিত। শরীফ সাহেব খুব বিকৃত করে বললেন, পেচ্ছাবের মত লাগছে। ফেলে দে। আবার বানাব।

আর বানাতে হবে না। মামা একটা কথা শোন।

বল, শুনছি।

আমি যদি তোমার এখানে থাকি কয়েকদিন তোমার অসুবিধা হবে?

না। আগে যেখানে ছিলি সেখানে কি অবস্থা? জানাজানি হয়ে গেছে?

তা না। ভদ্রমহিলা একটু ভয় পাচ্ছেন। তাছাড়া আমি বলেছিলাম এক সপ্তাহ থাকব। এক

সপ্তাহ হয়ে গেছে।

কখন আসবি?

বিকেলে। আমাকে একটা চাবি দাও।

শরীফ সাহেব চাবি বের করে দিলেন। এবং দ্রুত কাপড় পরতে শুরু করলেন। আলম এখানে থাকলে অফিস মিস করা উচিত হবে না।

আলম।

বল মামা।

একটা সাকসেসফুল অপারেশনের পর ওভার কনফিডেন্ট হবার একটা সম্ভাবনা থাকে। খুব সাবধান। এরা এখন পাগলা কুত্তার মত। দারুণ সতর্ক। পাগলা কুত্তারা খুব সতর্ক হয় জানিস তো?

আমরাও সতর্ক।

স্বপ্ন দেখে মনটা একটু ইয়ে হয়ে গেল। যদিও জানি আমার স্বপ্ন সব সময় উল্টো হয়। প্রমোশন পাওয়ার একটা স্বপ্ন দেখলাম একবার, হয়ে গেল ডিমোশন। অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি বানিয়ে বেইজ্জত করল।

শরীফ সাহেব আবার হাসতে শুরু করলেন। অন্য রকম হাসি। অসুস্থ মানুষের হাসি।

বুঝলি আলম, এই যুদ্ধ দীর্ঘদিন চলবে। মে বি ফর ইয়ারস। চায়না কেমন চুপ মেরে আছে দেখছিস না? অন্য দেশগুলি চুপ করে আছে আমি মাইন্ড করছি না, কিন্তু চায়না পাকিস্তান সমর্থন করবে কেন? হোয়াই? মানুষের জন্য মমতা নেই চায়নার এটা ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। হোয়াই চায়না? হোয়াই?

অফিসে যাবে না মামা?

না ইচ্ছা করছে না। শুয়ে থাকব। সিক রিপোর্ট করব। আসলেই সিক সিক লাগছে। দেখ তো কপালে জ্বর আছে কিনা।

জ্বর নেই।

না থাকলেও হবে। জ্বর হবে, সর্দি হবে, কাশি হবে। ডায়েরিয়া হবে।

শরীফ সাহেব শব্দ করে হাসতে লাগলেন। গা দুলিয়ে হাসি।

ঝিকাতলার একটি বাসায় সবাই একত্র হয়েছে। রহমানও আছে। সে এখন মোটামুটি সুস্থ। জ্বর নেমে গেছে। দাড়ি-গোঁফ কামানোয় তাকে বালক-বালক লাগছে। পরবর্তী অপারেশন নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। নতুন মানুষের ভেতর মিনহাজ উদ্দিনকে দেখা যাচ্ছে। তার কাছ থেকেই জানা গেল আরো কিছু ছোট ছোট গ্রুপ শহরে ঢুকেছে। এরা পাওয়ার স্টেশন নষ্ট করতে চেষ্টা করবে। ট্রান্সফরমার উড়িয়ে দেয়ার কাজটা বাইরে থেকে বোমা মেরে করা যাবে না। সাহায্য আসতে হবে ভেতর থেকে। প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে বিস্ফোরণ ঘটাতে হবে।

সাহায্য করতে সবাই আগ্রহী কিন্তু সবাইকে দিয়ে এ কাজ হবে বা। ঠিক লোকটিকে বেছে নিতে হবে। সাহসী এবং বুদ্ধিমান একজন মানুষ। মুশকিল হচ্ছে— এই দুটি জিনিস খুব কম সময়ই একত্রে পাওয়া যায়। সাধারণত সাহসী লোকদের বুদ্ধি কম থাকে। মিনহাজ সাহেব বললেন, আলম সাহেব, আপনারা যা করছেন এটা হচ্ছে হিরোইজম। ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের বীরত্বের দরকার নেই। আমরা এখন চাই ওদের বিরক্ত করতে। বোমা ফাটিয়ে, গ্রেনেড ফাটিয়ে নার্ভাস করে ফেলতে। বুঝতে পারছেন?

পারছি।

কথাগুলি কিন্তু আমার না। কমান্ড কাউন্সিলের।

তাও জানি।

এমন সব জায়গায় যান যেখানে মিলিটারি নেই। সরাসরি সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই। যেমন ধরুন, পেট্রল পাম্প। পেট্রল পাম্প উড়িয়ে দিন। দর্শনীয় ব্যাপার হবে।

আলম হাই তুলল। মিনহাজ সাহেব একজন বিরক্তিকর মানুষ। কথা বলে মাথার পোকা নড়িয়ে দেয়। একই কথা একশ বার বলে।

আলম সাহেব।

বলুন শুনছি।

আজ আপনাদের কি প্রোগ্রাম?

আছে কিছু।

বলুন শুনি।

বলার মত কিছু না।

মিনহাজ সাহেব মুখ কালো কবে ফেললেন। এত অল্পতে মানুষ এমন আহত হয় কেন আলম ভেবে পেল না। মিনহাজ সাহেবেব অন্য দল। তাদের সঙ্গে এ দলের কাজকর্মের আলোচনার কি তেমন কোনো দরকার আছে? কোন দরকার নেই।

আশফাক তার পিকআপ নিয়ে উপস্থিত হল দু'টার সময়। তার সঙ্গে সাদেক।

আশফাক দাঁত বের করে বলল, নিজের গাড়িই আনলাম। নিজের জিনিস ছাড়া কনফিডেন্স পাওয়া যায় না।

আলম বিরক্ত হয়ে বলল, একই গাড়ি নিয়ে দ্বিতীয়বার বের হতে চাই না।

সাদেক নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, ঢাকা শহরে এ রকম পিকআপ পাঁচ হাজার আছে। তুই ভ্যাজর ভ্যাজর করিস না, উঠে আয়। বোজ একটা করে নতুন গাড়ি পাব কোথায়? ছোট কাজ চট করে সেরে চলে আসব। সবার যাওয়ার দরকার নেই।

গাড়িতে উঠল তিনজন। ড্রাইভারের পাশে আলম। পেছনের সিটে নুরু এবং সাদেক। তাবা চলে গেল মগবাজারের একটা পেট্রল পাম্পে। জায়গাটা খারাপ না। ওয়ারলেস স্টেশনের কাছে। ঠিকমত বিস্ফোরণ ঘটাতে পারলে পাকিস্তানিদের বড় ধরনের একটা চমক দেওয়া যাবে।

সবাই বসে রইল পিকআপে। লম্বা লম্বা পা ফেলে নেমে গেল সাদেক। যেতে যেতে শীস দিচ্ছে।

কাচের ঘরের ভেতর যে গোলগাল লোকটি বসে ছিল, তাকে হাসিমুখে বলল, মন দিয়ে শুনেন কি বলছি। আমরা আপনার এই পেট্রল পাম্পটা উড়িয়ে দেব। আপনি লোকজন নিয়ে সরে পড়ুন। কুইক।

লোকটি চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলতে ভুলে গেল। তাকিয়ে রইল মাছেব মত। সাদেক বলল, আমার কথা বুঝতে পারছেন তো?

জি পারছি।

তাহলে দেরি করছেন কেন?

আপনারা মুক্তিবাহিনী?

হ্যাঁ।

লোকটি হাসের মত ফ্যাসফ্যাস গলায় ডাকতে লাগল হিসামুদ্দিন, হিসামুদ্দিন ও হিসামুদ্দিন!

বিস্ফোরণ হল ভয়াবহ। বিশাল আগুন দাউদাউ করে আকাশ স্পর্শ করল। বিকট শব্দ হতে থাকল। কুণ্ডুলী পাকিয়ে উঠছে কালো ধোঁয়া। অসংখ্য লোকজন ছোটাছুটি করছে। চিৎকার। হৈচৈ। হিসহিস শব্দ হচ্ছে। ভয়াবহ ব্যাপার!

আশফাকের পিকআপ ছুটে চলছে। নূরু ফিসফিস করে বলল, পেট্রল পাম্পে গ্রেনেড না ছোড়াই ভাল। এই অবস্থা হবে কে জানত।

ঘণ্টা বাজিয়ে চারদিক থেকে ফায়ার ব্রিগেড আসছে। বিস্ফোরণে যারা ভয় পায়নি তারা এবার ভয় পাবে। ফায়ার ব্রিগেডের ঘণ্টা অতি সাহসী মানুষের মনেও আতংক ধরিয়ে দেয়।

আলম হঠাৎ করে লক্ষ্য করল পেছন থেকে দৈত্যাকৃতি একটি ট্রাক ছুটে আসছে। অনুসন্ধানী ট্রাক। বিস্ফোরণের রহস্যের সন্ধান করছে নিশ্চয়ই। ট্রাকের মাথায় দুটি মেশিনগান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজন গানার। এরা কি তাদের পিকআপ থামাবে এবং বলবে- তোমরা কারা? কোথায় যাচ্ছ? বের হয়ে আস। হাত মাথার উপর তোল।

আলমের মাথা ঝিমঝিম করছে। পেটের ভেতর কি জানি পাক খাচ্ছে। এই ট্রাক ওদের থামাবে। নিশ্চয়ই থামাবে। বোঝা যায়। কিছু কিছু জিনিস টের পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ সময়ে সিক্সথ সেন্স কাজ করে। আলম ফিসফিস করে বলল আশফাক সাইড দাও। মাথা ঠাণ্ডা রাখ সবাই।

আশফাক গাড়ি প্রায় ফুটপাতের উপর তুলে ফেলল। ট্রাক থামল না। গানার দুজন পলকের জন্যে তাকাল তাদের দিকে। ওদের চোখ কাচের মত ঠাণ্ডা।

সাদেক কপালের ঘাম মুছে বলল, একটা বড় ফাঁড়া কাটা গেছে। আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল এরা আমাদের জন্যেই এসেছে। আলম, তোর কি এরকম মনে হয়েছে?

আলম জবাব দিল না। সাদেক বলল, কেন জানি দারুণ একটা ভয় লেগে গেল। আমার কখনো এ রকম হয় না। মরার ভয় আমার নেই।

আশফাক সিগারেট ধরিয়েছে। সে বেশ সহজ স্বাভাবিক। সিগারেটে টান দিয়ে একসিলেটরে চাপ দিয়ে হালকা গলায় বলল, চলেন ঘরে ফিরে যাই।

নিউ ইস্কাটনের কাছে এসে তাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সেই ট্রাকটি দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে তাদের দিকে মুখ করে। গানার দুজন মেশিনগান তাক করে আছে। কিছু সৈন্য নেমে এসেছে রাস্তায়। তাদের একজন মাঝ রাস্তায় চলে এসেছে। বাঁশি বাজাচ্ছে এবং গাড়ি থামাতে বলছে। এর মানে কি?

আলম ফিসফিস করে বলল, আশফাক, কেটে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা কর। নূরু, দেখ কিছু করতে পার কিনা।

ওরা বন্দুক তাক করছে। বুঝে ফেলেছে এ গাড়ি থামবে না। সাদেক স্টেনগানের মুখ গাড়ির জানালায় রাখল। নূরু দুটি গ্রেনেডের পিন খুলে হাত নিয়ে বসে আছে। সাত সেকেন্ড সময় আছে। সাত সেকেন্ড অনেক সময়। কিছুক্ষণ হাতে নিয়ে বসে থাকা যায়।

আশফাকের গাড়ি লাফিয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে উড়ে চলে যাবে। নূরু দুটি গ্রেনেডই ছুড়েছে। বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়ার আগেই ওদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে পড়ল। আলম নিজের স্টেনগানের উপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল— মাথা ঠাণ্ডা রাখ, মাথা ঠাণ্ডা।

শরীফ সাহেব বাড়ি ফিরবার জন্যে তৈরি হচ্ছিলেন। তখন খবরটা পেলেন। মিলিটারিদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে গেরিলাদের। গেরিলাদের কিছুই হয়নি কিন্তু মিলিটারিদের একটা ট্রাক উড়ে গেছে। এ জাতীয় খবর কখনো পুরোপুরি সত্যি হয় না। উইসফুল থিংকিংয়ের একটা ব্যাপার আছে। বাস্তবে নিশ্চয়ই অন্যরকম কিছু হয়েছে। গেরিলাদের গায়ে আঁচড়ও পড়বে না তা কি হয়!

শরীফ সাহেব খুব আশা করতে লাগলেন যেন সংঘর্ষের খবরটা সত্যি না হয়। সত্যি না হবার কথা। দিনে দুপুরে ওরা কি মিলিটারিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে? অবশ্যি পড়তেও পারে। রোমান্টিসিজম! ওদের যা বয়স তাতে রোমান্টিসিজমই প্রাধান্য পাবে। এ জাতীয় অপারেশনে আসা উচিত মধ্য বয়স্কদের। যারা সাবধানী।

তিনি বাড়ি ফিরে কাপড় না ছেড়েই বারান্দার ইজি চেয়ারে বসে রইলেন। আলমের জন্যে অপেক্ষা। সে আসছে না। দেরি করছে কেন? খোঁজখবর নেবারও কোনো উপায় নেই। কে কোথায় থাকে তাঁর জানা নেই। সাবধানতা! যেখানে ওদের সাবধানী হওয়া উচিত সেখানে না হয়ে অন্য জায়গায়। কোন মানে হয়?

দুপুর তিনটায় নিয়ামত সাহেব টেলিফোন করলেন।

খবর শুনছেন? ভেরি অথেনটিক।

কি খবর?

গেরিলাদের একটা পিকআপ ধরা পড়েছে। দুজনের ডেড বডি পাওয়া গেছে।

কে বলেছে আপনাকে? যত উড়ো খবর। এইসব খবরে কান দেবেন না। এবং টেলিফোনে এসব ডিসকাসও করবেন না।

শরীফ সাহেব টেলিফোন নামিয়ে আবার বারান্দায় এসে বসলেন।

মতিন সাহেব অবাক হয়ে দেখলেন একটা বেবি টেক্সি এসে তাঁর বাড়ির সামনে থেমেছে। বেবি টেক্সি ড্রাইভার এবং একটি অচেনা লোক আলমকে ধরাধরি করে নামাচ্ছে। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, কি হয়েছে? অপরিচিত লম্বা ছেলেটি বলল, গুলি লেগেছে। আপনারা রক্ত বন্ধ করার চেষ্টা করুন। আমি ডাক্তার নিয়ে আসব। আমার নাম আশফাক। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। এসে ধরুন।

তারা বসার ঘরে ঢুকল। আলমের জ্ঞান আছে। সে হাত দিয়ে বাঁ কাঁধ চেপে ধরে আছে।

ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে সেখান থেকে।

রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে। তার মুখ রক্তশূন্য। সে একটি কথাও বলছে না। মতিন সাহেব ভাঙা গলায় বললেন, মা একে ধর। রাত্রি নড়ল না। যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

ভেতর থেকে সেলাই মেশিনের শব্দ হচ্ছে। আশফাক শান্ত স্বরে বলল, আলম ভাই, আপনি কোনো রকম চিন্তা করবেন না। কারফিউয়ের আগেই আমি ডাক্তারের ব্যবস্থা করব। যেভাবেই হোক।

বেবিটেক্সির বুড়ো ড্রাইভারটির মুখ ভাবলেশহীন। যেন এ জাতীয় ঘটনা সে জীবনে বহু দেখেছে।

আশফাক তার ঘরে পৌঁছল পাঁচটায়। এখান থেকে সে যাবে ঝিকাতলা। ওদের খবর দিয়ে ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। কার্ফু শুরু হয়ে যাবে সাড়ে ছ'টায়। হাতে অনেকখানি সময়।

সে গেঞ্জি বদলে একটা শার্ট পরল। অভ্যাস বসে চুল আঁচড়াল, নিচে নামল। গালে ক্রিম দিল। মুখের চামড়া টানছে। এসব শীতকালে হয়। চামড়া শুকিয়ে যায়। কিন্তু তার এখন হচ্ছে কেন? বড্ড ক্লান্ত লাগছে। নিচে নামতে গিয়ে পা কাঁপছে। কেন এ রকম হচ্ছে? সে এখনো বেঁচে আছে। বিরাট ঘটনা। আনন্দে চিৎকার করা উচিত। কিন্তু আনন্দ হচ্ছে না। কেমন যেন ঘুম পাচ্ছে।

তার জন্যে কালো রঙের জিপ নিয়ে আর্মি ইন্টেলিজেন্সের লোকজন অপেক্ষা করছে।

আশফাক তোমার নাম?

হ্যাঁ।

চল আমাদের সঙ্গে। তোমার জন্য গত এক ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।

## আট

রাত্রি পাথরের মূর্তির মত একা একা বসার ঘরে বসে আছে। দুপুর থেকেই আকাশ মেঘে মেঘে কালো হয়েছিল। এখন বৃষ্টি নামল। প্রবল বর্ষণ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঘনঘন বাজ পড়ছে।

রাস্তায় লোক চলাচল একেবারেই নেই। দু'একটা রিকশা বা বেবিটেক্সির শব্দ শোনামাত্র রাত্রি বের হয়ে আসছে। বোধ হয় ডাক্তার নিয়ে কেউ এসেছে। না কেউ না। কার্ফুর সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ পর হয়ত একটি রিকশা বা বেবিটেক্সির শব্দ কানে আসবে না। দ্রুতগামী জিপ কিংবা ভারী ট্রাকের শব্দ কানে আসবে। রাত্রি ঘড়ি দেখে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সামনের পুকুরে এই অবেলায় একজন লোক গোসল করছে। কোথাও কেউ নেই। এমন ঘোর বর্ষণ-এর ভেতর নিজের মনে লোকটা সাঁতার কাটছে। দেখে মনে হচ্ছে এই লোকটির মনে কত আনন্দ।

জামগাছওয়ালা বাড়ির উকিল সাহেব বাজার নিয়ে ফিরছিলেন। তাঁর এক হাতে ছাতি, তবু তিনি পুরোপুরি ভিজে গেছেন। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে রাত্রিকে দেখলেন। অবাক হয়ে বললেন, একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছ কেন মা? ভেতরে যাও। কখনো বারান্দায় থাকবে না। যাও যাও, ভেতরে যাও। দরজা বন্ধ করে দাও।

রাত্রি বলল, কার্ফু কি শুরু হয়েছে চাচা?

না, এখনো ঘণ্টা খানিক আছে। যাও মা, ভেতরে যাও।

উকিল সাহেব লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুলেন। তাঁর এক মেয়ে যুথী রাত্রির সঙ্গে পড়ত। মেট্রিক পাস করবার পরই তার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের এক বছরের মাথায় বাচ্চা হতে গিয়ে যুথী মারা গেল। বিয়ে না হলে মেয়েটা বেঁচে থাকত। মেয়েদের জীবন বড় কষ্টের।

লোকটা পুকুরে এখনো সাঁতার কাটছে। চিৎ হয়ে, কাত হয়ে নানান রকম ভঙ্গি করছে। পাগল নাকি?

ভেতর থেকে সুরমা ডাকলেন--- রাত্রি!

রাত্রি জবাব দিল না। সুরমা বারান্দায় এসে তাঁর মেয়ের মতই অবাক হয়ে সাঁতার কাটা লোকটিকে দেখতে লাগলেন। রাত্রি মৃদু স্বরে বলল, কেউ তো এখনো এল না মা। সুরমা শান্ত গলায় বললেন, এসে পড়বে। এখনি এসে পড়বে। তুই ভেতরে আয়। আলমের কাছে গিয়ে বস।

রাত্রি বসার ঘরে এসে সোফায় বসল। ভেতরে গেল না। ভেতরে যেতে তার ইচ্ছা করছে না।

মতিন সাহেব একটা পরিষ্কার পুরনো শাড়ি ভাঁজ করে আলমের কাঁধে দিয়েছেন। তিনি দু'হাতে সেই শাড়ি চেপে ধরে আছেন। একটু পরপর ফিসফিস করে বলছেন, তোমার কোনো ভয় নাই। এক্ষুণি ডাক্তার চলে আসবে। তাছাড়া রক্ত বন্ধ হওয়াটাই বড় কথা। রক্ত বন্ধ হয়েছে।

মতিন সাহেবের কথা সত্যি নয়। কাঁধের শাড়ি ভিজে উঠেছে। রক্ত জমাট বাঁধছে না। আলম নিঃশ্বাস নিচ্ছে হা করে। মাঝে মাঝে খুব অস্পষ্টভাবে আহ্-উহ্ করছে। কিন্তু জ্ঞান আছে পরিষ্কার। কেউ কিছু বললে জবাব দিচ্ছে। সে একটু পরপর পানি খেতে চাইছে। চামচে করে মুখে পানি দিচ্ছে বিন্তি। এই প্রথম বিন্তির মুখে কোনো হাসি দেখা যাচ্ছে না। সে পানির গ্লাস এবং চামচ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। তার সঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অপালা। সে দারুণ ভয় পেয়েছে। একটু পরপর কেঁপে উঠছে। এক সময় আলম গোঙাতে শুরু করল। অপালা চমকে উঠল। তারপরই কেঁদে উঠে ছুটে বের হয়ে গেল।

রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার ওপাশে। তার মুখ ভাবলেশহীন। সে তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে।

আলম কাৎরাতে কাৎরাতে বলল, ব্যথাটা সহ্য করতে পারছি না। একেবারেই সহ্য করতে পারছি না।

মতিন সাহেব তাকিয়ে আছেন। তিনি বিড়বিড় করে বললেন, ডাক্তার এসে পড়বে। একটু ধৈর্য ধর। একটু। রাত্রি, তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কিছু একটা কর।

কি করব বল?

মতিন সাহেব কিছু বলতে পারলেন না।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে প্রচুর হাওয়া আসছে। বৃষ্টি ভেজা হাওয়া।

জানালা বন্ধ করে দে।

রাত্রি জানালা বন্ধ করবার জন্য এগিয়ে যেতেই আলম বলল, বন্ধ করবেন না। প্লিজ, বন্ধ করবেন না। সে পাশ ফিরতে চেষ্টা করতেই তীব্র ব্যথায় সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে গেল। মাকে ডাকতে ইচ্ছা করছে। ব্যথার সময় মা মা বলে চিৎকার করলেই ব্যথা কমে যায়। এটা কি সত্যি, না একটা সুন্দর একটা কল্পনা?

খোলা জানালার পাশে রাত্রি দাঁড়িয়ে আছে। হাওয়ায় তার চুল উড়ছে। আহ্ কি সুন্দর দেখাচ্ছে মেয়েটাকে! বেঁচে থাকার মত আনন্দ আর কিছুই নেই। কত অপূর্ব সব দৃশ্য চারদিকে। মন দিয়ে আমরা কখনো তা দেখি না। যখন সময় শেষ হয়ে যায় তখনি শুধু হাহাকারে হৃদয় পূর্ণ হয়। রাত্রি কি যেন বলছে। কি বলছে সে? আলম তার ইন্দ্রিয়গুলি সজাগ করতে চেষ্টা করল।

আপনি বৃষ্টিতে ভিজে যাচ্ছেন। জানালা বন্ধ করে দি?

না না। খোলা থাকুক প্লিজ।

এই জানালা বন্ধ করা নিয়ে কত কাণ্ড হত বাড়িতে। শীতের সময়ও জানালা খোলা না রেখে সে ঘুমুতে পারত না। মা গভীর রাতে চুপিচুপি এসে জানালা বন্ধ করে দিতেন। এ নিয়ে তার কত ঝগড়া।

নিউমোনিয়া হয়ে মরে থাকবি একদিন।

জানালা বন্ধ থাকলে নিউমোনিয়া ছাড়াই মরে যাব মা। অক্সিজেনের অভাবে মরে যাব।

অন্য কারো তো অক্সিজেনের অভাব হচ্ছে না।

আমার হয়। আমি খুব স্পেশাল মানুষ তো তাই।

সেই খোলা জানালা দিয়ে চোর এল এক রাতে। আলমের টেবিলের উপর থেকে মানিব্যাগ, ঘড়ি এবং একটা ক্যামেরা নিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে গেল। সকালবেলা দেখা গেল— চোর তার স্পঞ্জের স্যান্ডেল বাগানে ফেলে গেছে। আলম সেই স্যান্ডেল জোড়া নিয়ে এল। হাসিমুখে মাকে বলল, শোধ-বোধ হয়ে গেল মা। চোর নিয়েছে আমার জিনিস, আমি নিলাম চোরের। এখন থেকে এই স্যান্ডেল আমি ব্যবহার করব।

এই নিয়ে মা বড় ঝামেলা করতে লাগলেন। চিৎকার চেঁচামেচি। চোরের স্যান্ডেল ঘরে থাকবে কেন? এসব কি কাণ্ড? আলম হেসে হেসে বলত, বড় সফট স্যান্ডেল মা। পরতে খুব আরাম।

স্যাণ্ডেল জোড়া কি আছে এখনো? মানুষের মন এত অদ্ভুত কেন? এত জিনিস থাকতে আজ মনে পড়ছে চোরের স্যাণ্ডেল জোড়ার কথা?

মতিন সাহেব ঘড়ি দেখলেন। কারফিউয়ের সময় দ্রুত এগিয়ে আসছে। ছেলেটি কি ডাক্তার নিয়ে আসবে না? তাঁর নিজেরই কি যাওয়া উচিত? আশপাশে ডাক্তার কে আছেন? একজন লেডি ডাক্তার এই পাড়াতে থাকেন। তার বাড়ি তিনি চেনেন না। কিন্তু খুঁজে বের করা যাবে। সেটা কি ঠিক হবে? গুলি খেয়ে একটি ছেলে পড়ে আছে। এটা জানাজানি করার বিষয় নয়। কিন্তু ছেলেটার যদি কিছু হয়? বৃষ্টি-বাদলার জন্যেই অসময়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। ইলেকট্রিসিটি নেই। এ অঞ্চলে অল্প হাওয়া দিলেই ইলেকট্রিসিটি চলে যায়। মতিন সাহেব বললেন, একটা হারিকেন নিয়ে আয় তো মা।

রাত্রি ঘর থেকে বেরুবামাত্র আলম দুইবার ফিসফিস করে তার মাকে ডাকল – আম্মি আম্মি। শিশুদের ডাক। যেন একটি নয়-দশ বছরের শিশু অন্ধকারে ভয় পেয়ে তার মাকে ডাকছে। রাত্রি নিঃশব্দে এগুচ্ছে রান্নাঘরের দিকে। শোবার ঘর থেকে অপালা ডাকল, আপা, একটু শুনে যাও।

অপালা বিছানার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। অসম্ভব ভয় লাগছে তার। সে চাদরের নিচে বারবার কেঁপে কেঁপে উঠছে। রাত্রি ঘরে ঢোকামাত্রই সে উঠে বসল।

কি হয়েছে অপালা?

খুব ভয় লাগছে।

মার কাছে গিয়ে বসে থাক।

না।

অপালা আবার চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। রাত্রি এসে হাত রাখল তার মাথায়। গা গরম। জ্বর এসেছে।

অপালা ফিসফিস করে বলল, আপা উনি কি মারা গেছেন?

না, মারা যাবেন কেন? ভাল আছেন।

তাহলে কোনো কথাবার্তা শুনছি না কেন?

রাত্রি কোনো জবাব দিল না। অপালা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, তুমি একটু আমার পাশে বসে থাক আপা। রাত্রি বসল। ঠিক তখনি শুনতে পেল আলম আবার তার মাকে ডাকছে আম্মি আম্মি।

রাত্রি উঠে দাঁড়াল।

সুরমা হারিকেন জ্বালিয়ে রান্নাঘরেই বসে আছেন। রাত্রি ছায়ার মত রান্নাঘরে এসে ঢুকল। কাঁপা গলায় বলল, মা, তুমি উনার হাত ধরে একটু বসে থাক। উনি বারবার তাঁর মাকে ডাকছেন।

সুরমা নড়লেন না। হারিকেনের দিকে তাকিয়ে বসেই রইলেন। রাত্রি বলল, মা এখন আমরা কি করব?

সুরমা ফিসফিস করে বললেন, কিছু বুঝতে পারছি না।

হাওয়ার ঝাপটায় হারিকেনের আলো কাপছে। বিচিত্র সব নকশা তৈরি হচ্ছে দেয়ালে। প্রচণ্ড শব্দে কাছেই কোথাও যেন বাজ পড়ল। মতিন সাহেব ও-ঘর থেকে চেঁচাচ্ছেন - আলো দিয়ে যাচ্ছ না কেন? হয়েছে কি সবার? ভয় পেয়ে অপালা তার ঘরে কাঁদতে শুরু করেছে। কি ভয়ংকর একটি রাত। কি ভয়ংকর!

গত দেড় ঘণ্টা যাবত আশফাক একটা চেয়ারে জড়সড় হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তার কোনো বোধশক্তি নেই। চারপাশে কোথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কেও কোনো আগ্রহ নেই। তার সামনে একজন মিলিটারি অফিসার বসে আছেন। অফিসারটির গায়ে কোন ইউনিফর্ম নেই। লম্বা কোর্তার মত একটা পোশাক। ইউনিফর্ম না থাকায় তার র‍্যাংক বোঝা যাচ্ছে না। বয়স দেখে মনে হয় মেজর কিংবা ল্যাফটেনেন্ট কর্নেল। জুলপির কাছে কিছু চুল পাকা।

চেহারা রাজপুত্রের মত। কথা বলে নিচু গলায়। খুব কফি খাওয়ার অভ্যেস। আশফাক লক্ষ্য করছে এই এক ঘণ্টায় সে ছয় কাপের মত কফি খেয়েছে। কফি খাওয়ার ধরনটিও বিচিত্র। কয়েক চুমুক দিয়ে রেখে দিচ্ছে। এবং নতুন আরেক কাপ দিতে বলছে। এখন পর্যন্ত আশফাকের সাথে তার কোনো কথা হয়নি। আশফাক বসে আছে। অফিসারটি কফিতে চুমুক দিচ্ছে এবং নিজের মনে কি সব লেখালেখি করছে। মনে হচ্ছে আশফাক সম্পর্কে তার কোনো উৎসাহ নেই।

ঘরটি খুবই ছোট। তবে মেঝেতে কার্পেট আছে। দরজায় ফুল তোলা পর্দা। অফিস ঘরের জন্যে পর্দাগুলি মানাচ্ছে না। কার্পেটের রঙের সঙ্গেও মিশ খাচ্ছে না। কার্পেট লাল রঙের, পর্দা

দুটি নীল। আশফাক বসে বসে পর্দায় কতগুলি ফুল আছে তা গোণার চেষ্টা করছে। তার প্রচণ্ড সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে। সিগারেট আছে সঙ্গে, তবে ধরাবার সাহস হচ্ছে না।

মিলিটারি অফিসারটির কাজ মনে হয় শেষ হয়েছে। সে ফাইল পত্র একপাশে সরিয়ে রেখে আশফাকের দিকে তাকিয়ে চমৎকার ইংরেজিতে বলল, কফি খাবে? ঝড়বৃষ্টিতে কফি ভালই লাগবে।

আশফাক কোনো উত্তর দিল না।

আশফাক তোমার নাম?

হ্যাঁ।

তোমার গাড়িতে যে দুটি ডেড বডি পাওয়া গেছে ওদের নাম কি?

আশফাক নাম বলল। অফিসারটির মনে হল নামের প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই। সে হাই তুলে উঁচু গলায় দু'কাপ কফি দিতে বলল। কফি চলে এল সঙ্গে সঙ্গেই।

খাও, কফি খাও। আমার নাম রাকিব। মেজর রাকিব। আমি কফিতে দুধ চিনি খাই না। তোমারটাতেও দুধ চিনি নেই। লাগলে বলবে। তুমি সিগারেট খাও?

হ্যাঁ।

তাহলে সিগারেট ধরাও। স্মোকাররা সিগারেট ছাড়া কফি খেতে পারে না।

আশফাক কফিতে চুমুক দিল। চমৎকার কফি। সিগারেট ধরাল। ভাল লাগছে সিগারেট টানতে। মেজর রাকিব তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। তার চোখ দুটি হাসি হাসি।

আশফাক।

বলুন।

আমরা দুজন পনেরো মিনিটের মধ্যে এখান থেকে বেরুব। ঝড়টা কমার জন্যে অপেক্ষা করছি। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে এবং তোমার সহকর্মীরা যেসব জায়গায় থাকে সেসব আমাদের দেখিয়ে দেবে। আমরা আজ রাতের মধ্যেই সবাইকে ধরে ফেলব।

আশফাক তাকিয়ে রইল।

তোমার সাহায্য আমি মনে রাখব এইটুকু শুধু তোমাকে বলছি।

আশফাক নিচু গলায় বলল, ওরা কোথায় থাকে আমি জানি না। মেজর রাকিব এমন ভাব করল যে সে এই কথাটি শুনতে পায়নি। হাসি হাসি মুখে বলল, কেউ কথা না বলতে চাইলে আমাদের বেশ কিছু পদ্ধতি আছে। কিছু কিছু পদ্ধতি বেশ মজার। একটা তোমাকে বলি। এক বুড়োকে আমরা ধরলাম গত সপ্তাহে। আমার ধারণা হল সে কিছু খবরাখবর জানে। ভাব দেখে মনে হল কিছু বলবে না। আমি তখন ওর মেয়েটিকে ধরে আনলাম এবং বললাম, মুখ না খুললে আমার একজন জোয়ান তোমার সামনে মেয়েটিকে রেপ করবে। পাঁচ মিনিট সময়। এর মধ্যে ঠিক কর বলবে কি বলবে না। বুড়ো এক মিনিটের মাথায় কথা বলতে শুরু করল।

আশফাক বলল, স্যার আমি কারোরই ঠিকানা জানি না।

এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

এরা আমার কাছে এসেছে, আমি ওদের গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছি। আমি নিজেও মুক্তিযোদ্ধা না।

ওরা তোমাকে জোর করে নিয়ে গেছে, তাই না? গান পয়েন্টে না গেলে তোমাকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলত?

জি।

নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তুমি এই কাজটি করেছ।

জি স্যার।

তা তো করবেই। গান পয়েন্টে কেউ কিছু বললে না শুনে উপায় নেই। শুনতেই হয়।

মেজর রাকিব আরেক কাপ কফির কথা বলল। কফি নিয়ে যে লোকটি ঢুকল তাকে বলল, তুমি একে নিয়ে যাও। ওর দুটি আঙুল ভেঙে আমার কাছে নিয়ে আস। বেশি ব্যথা দিও না।

রাকিব হাসিমুখে তাকাল আশফাকের দিকে এবং নরম গলায় বলল, তুমি ওর সঙ্গে যাও। এবং শুনে রাখ এখন বাজে ন'টা কুড়ি, তুমি ন'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে প্রচুর কথা বলবে। সবার বাড়ি দেখিয়ে দেবে। ধরিয়ে দেবে। আমি এই নিয়ে তোমার সঙ্গে দশ হাজার টাকা বাজি রাখতে পারি।

যে লোকটি আশফাকের ডান হাত নিজের মুঠোয় ধরে রেখেছে তার মুখ গোলাকার। এ রকম গোল মানুষের মুখ হয়? যেন কম্পাস দিয়ে মুখটি আঁকা। তার হাতটিও মেয়েদের হাতের মত

তুলতুলে নরম। লোকটি পেনসিলের মত সাইজের একটি কাঠি আশফাকের দু'আঙুলের ফাঁকে রাখল। আশফাকের মনে হচ্ছে এটা একটা স্বপ্নদৃশ্য। বাস্তবে এ রকম কিছু ঘটছে না। গোলাকার মুখের এ লোকটি তার হাত নিয়ে খেলা করছে। আশফাক নিজেই বুঝতে পারল না যে সে পশুর মত আঁ আঁ করে চিৎকার করে উঠেছে। কেউ কী টেনে তার হাতটি ছিঁড়ে ফেলেছে? কী করছে এরা? কী করছে? তীব্র তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা। দ্বিতীয়বারের মত চিৎকার করেই সে জ্ঞান হারাল।

মেজর রাকিব তাকিয়ে আছে তার দিকে। কি সুন্দর চেহারা এই লোকটির! নাদিমের সঙ্গে মিল আছে। নাকটা লম্বা।

আশফাক, তোমার জ্ঞান ফিরেছে মনে হচ্ছে। ভালই হয়েছে। গাড়ি এসে গেছে। চল, যাওয়া যাক। নাকি যাবার আগে আরেক কাপ কফি খাবে?

আশফাক তাকিয়ে আছে। লোকটি নাদিমের মত লম্বা নয়। একটু খাট। বড়জোর পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি।

আশফাক, তুমি ওদের ঠিকানা জান নিশ্চয়ই। জান না?

কয়েকজনের জানি। সবার জানি না।

ওতেই হবে। ব্যাপারটা হচ্ছে মাকড়সার জালের মত। একটা সুতার সন্ধান পাওয়া গেলে জালটা খুঁজে পাওয়া যায়। আশফাক।

বলুন।

চল, রওনা হওয়া যাক।

আমি আপনাকে কিছুই বলব না।

কিছুই বলবে না?

না।

মাত্র দুটি আঙুল তোমার ভাঙা হয়েছে। তোমার হাতে আরো আটটি আঙুল আছে।

আমি কিছুই বলব না।

তোমার মাথা গরম হয়ে গেছে। অনেক সময় ব্যথার পরিমাণ বেশি হলে মাথা গরম হয়ে যায়। তুমি মাথা ঠাণ্ডা কর। কফি খাও, সিগারেট খাও। তারপর আমরা কথা বলব। নাকি সলিড কিছু খাবে? গোশত পরোটা?

আশফাক কিছু বলল না। সে তাকিয়ে আছে তার বাঁ হাতের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে কেমন ফুলে উঠেছে। একি সত্যি তার হাত?

আশফাক গোশত পরটা খুব আগ্রহ করে খেল। তার এতটা ক্ষিধে পেয়েছিল সে নিজেও বুঝতে পারেনি। ঝাল দিয়ে রান্না করা গোশত। চমৎকার লাগছে। পশ্চিমারা এতটা ঝাল খায় তার জানা ছিল না।

আশফাক!

জি।

আরো লাগবে?

জি না।

কফি চলবে?

একটা পান খাব।

পান খাওয়া যাবে না। দোকানপাট বন্ধ। এখন কার্ফু চলছে। সিগারেট আছে তো? না থাকলে বল।

জি আছে।

চল, তাহলে রওনা দেওয়া যাক।

কোথায়?

তুমি তোমার বন্ধুদের দেখিয়ে দেবে। বাড়ি চিনিয়ে দেবে।

আশফাক অনেক কষ্টে এক হাতে দেয়াশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরাল। অনেকখানি সময় নিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল। বেশ লাগছে সিগারেট।

মেজর সাহেব।

বল।

আমি কিছুই বলব না।

কিছুই বলবে না?

জি না। আপনি তো আমাকে মেরেই ফেলবেন। মারেন। কষ্ট দেবেন না। কষ্ট দেয়া ঠিক না।

মরতে ভয় পাও না?

জি পাই। কিন্তু কি করব বলেন। উপায় কি?

উপায় আছে। ধরিয়ে দাও ওদের। আমি তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গ্যারান্টি তোমাকে দিচ্ছি।

মেজর সাহেব, এটা সম্ভব না।

সম্ভব না?

জি না। আমি তো মানুষের বাচ্চা। কুকুর বিড়ালের বাচ্চা তো না।

তুমি মানুষের বাচ্চা?

জি, আমাকে কষ্ট দেবেন না মেজর সাহেব। মেরে ফেলতে বলেন। কষ্ট সহ্য করতে পারি না।

মেজর রাকিব দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল। এই ছেলেটির যাবতীয় যন্ত্রণার অবসান করবার জন্যে তার ইচ্ছা করছে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। খবর বের করতেই হবে। এটা একটা মাকড়সার জাল। একটা সুতা পাওয়া গেছে। জালটিও পাওয়া যাবে। যেতেই হবে। মানুষ আসলে একটি দুর্বল প্রাণী। মেজর রাকিব আশফাকের আরো দু'টি আঙুল ভেঙে ফেলার হুকুম দিয়ে নিজের ঘরে এসে বসল।

বাইরে আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে।

রাত এগারোটায় টেলিফোন। নাসিমা ভয়ে ভয়ে টেলিফোন ধরলেন।

কে?

ফুফু আমি।

কী ব্যাপার রাত্রি? গলা এরকম শুনাচ্ছে কেন? কী হয়েছে?

কিছু হয়নি। ফুফু তোমার কাছে যে একজন ভদ্রমহিলা এসেছিলেন। মেডিকেল কলেজের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর মিসেস রাবেয়া করিম. উনার টেলিফোন নম্বর দাও।

কেন?

খুব দরকার ফুফু। তুমি দাও।

কী হয়েছে বল?

বলছি। নম্বরটা দাও আগে। তোমার পায়ে পড়ি ফুফু।

নাসিমা অবাক হয়ে শুনলেন রাত্রি ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তিনি নম্বর এনে দিলেন।

সেই নম্বরে বারবার টেলিফোন করেও কাউকে পাওয়া গেল না। রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না।

মতিন সাহেব ঠিক একই ভঙ্গিতে কাঁধ চেপে ধরে আছেন। তাঁর ধারণা রক্ত বন্ধ হয়েছে। তিনি মনে মনে সারাক্ষণ সুরা এখলাস পড়ছেন।

আলম এখন আর পানি খেতে চাচ্ছে না। খানিকটা আচ্ছন্নের মত হয়ে পড়েছে। সুরমা এক কাপ গরম দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করলেন। এটা সে খেতে পারল বলে মনে হল।

তার জ্ঞান আছে। ডাকলে সাড়া দেয়। চোখ মেলে তাকায়। সেই চোখ টকটকে লাল।

মতিন সাহেব বললেন, মাথায় জলপট্টি দেয়া দরকার। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। সুরমা ভেজা তোয়ালে নিয়ে এস।

ভেজা তোয়ালে দিয়ে কপাল স্পর্শ করতেই আলম কেঁপে উঠল। সুরমা মৃদু স্বরে বললেন, বাবা, এখন রাত দুটো বাজে। ভোর হতে বেশি বাকি নেই। ভোর হলেই যে ভাবেই হোক তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করব। তুমি শক্ত থাক।

আশফাক তাকিয়ে আছে শূন্য দৃষ্টিতে। মেজর রাকিবের মুখ এমন গোলাকার লাগছে কেন? তার মুখ তো এমন ছিল না। গোল মুখ ছিল ঐ লোকটির যে আঙুল ভাঙে। ভাঙার সময় কেমন টুক করে শব্দ হয়।

আশফাক।

জি।

চিনতে পারছ আমাকে?

জি। আপনি মেজর রাকিব।

তুমি কী এখন  বলবে?

জি না। মেজর সাহেব, আপনি আমাকে মেরে ফেলেন, কষ্ট দেবেন না।

মেজর রাকিব তাকিয়ে রইল। এই ছেলেটি কোনো কথা বলবে  না এ বিষয়ে সে এখন নিঃসন্দেহ। তার প্রচণ্ড রাগ হওয়া উচিত। কিন্তু কেন জানি হতে পারছে না। সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুমি কী কিছু খেতে চাও? কফি কিংবা সিগারেট? খেতে চাইলে খেতে পার। চাও কিছু?

জি না। ধন্যবাদ মেজর সাহেব। বহুত শুকরিয়া।

আশফাক।

জি।

তুমি কী বিবাহিত?

জি স্যার।

ছেলে মেয়ে আছে?

জি না।

নতুন বিয়ে?

জি।

স্ত্রীকে ভালবাস?

আশফাক জবাব দিল না। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মেজর রাকিব সহজ ভঙ্গিতে বলল, জবাব দাও। ভালবাস?

জি স্যার।

তাহলে তো ওর জন্যেই বেঁচে থাকা উচিত। উচিত নয় কী?

জি, উচিত।

তাহলে বোকামি করছ কেন? তোমার কী ধারণা কয়েকটি ছেলে ধরা পড়লে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে? তা তো  না। নতুন নতুন ছেলে আসবে। এবং কে জানে এক সময় যুদ্ধে তোমরা জিতেও যেতে পার। পার না?

জি স্যার, পারি।

নিজের জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছুই নেই। এটা একটা সহজ সত্য। তুমি নেই তাব মানে তোমার কাছে পৃথিবীর কোনো অস্তিত্ব নেই    দেশ তো অনেক দুরের কথা। আমি কী ঠিক বলছি?

জি স্যার, ঠিক।

বেশ এখন তুমি কথা বল। চল আমার সঙ্গে। শুধুমাত্র একজনকে ধরিয়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, ভোরবেলায় তোমাকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করব।

আশফাক অনেকক্ষণ মেজর রাকিবের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তাকাল তার ফুলে উঠা হাতের দিকে। আহ কী অসম্ভব যন্ত্রণা। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ইচ্ছা করে। খুবই ইচ্ছা করে।

চল, আশফাক। চল। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

স্যার, আমি কিছু বলব না।

বলবে না?

জি না।

দুজন দীর্ঘ সময় দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। মেজর রাকিব বেল টিপে কাকে যেন ডাকল। শীতল গলায় আশফাককে মেরে ফেলবার নির্দেশ দিল। আশফাক বিড়বিড় করে বলল, স্যার যাই। স্লামালিকুম।

আলম কোন সাড়া শব্দ করছে না। তার পা আগুনের মত গরম। কিছুক্ষণ আগেও ছটফট করছিল। এখন সে ছটফটানি নেই। একবার শুধু বলল, পানি খাব। পানি দিন।

মতিন সাহেব চামচে করে পানি দিলেন। সে পানি খেল না। মুখ ফিরিয়ে নিল।
পানি চেয়েছিলে তুমি। একটু হা কর।
না।
ব্যথা কী খুব বেশি?
না বেশি না।
মতিন সাহেব চিন্তিত বোধ করলেন। হঠাৎ করে ব্যথা কমে যাবে কেন? এর মানে কী?
আলম! আলম!
জি।
ভোর হতে খুব দেরি নাই। তোমার আত্মীয়-স্বজন কাকে খবর দেব বল তো।
আলম জবাব দিল না। মতিন সাহেব এই প্রশ্নটি দ্বিতীয়বার করলেন। আলম বলল, কাউকে বলতে হবে না।
কেন বলতে হবে না। নিশ্চয়ই বলতে হবে।
কেন বিরক্ত করছেন?
মতিন সাহেব চুপ করে গেলেন।
আলম বিড়বিড় করে বলল, আমার মাথার নিচে আরেকটা বালিশ দিন।
তার কাছে মনে হচ্ছে তার মাথা ক্রমেই নিচে নেমে যাচ্ছে। টেনে কেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে অতলান্তিক জলে। কিছুতেই ভাসিয়ে রাখা যাচ্ছে না। ঘরবাড়ি অচেনা হয়ে যাচ্ছে। সে কী মারা যাচ্ছে! মরবার আগে সমস্ত অতীত স্মৃতি নাকি ঝলসে ওঠে। কই সে রকম তো কিছু হচ্ছে না। চোখের সামনে কিছুই ভাসছে না। কোন স্মৃতি নেই। চেষ্টা করেও কোনো কিছু মনে করা যাচ্ছ না। যতবার সে কিছু মনে করবার চেষ্টা করছে ততবারই সাদেকের মুখ ভেসে উঠছে। নূরুর মুখের ছবি আসছে না। অথচ গাড়ি থেকে বের হবার সময় সে এই দুজনের দিকেই তাকিয়ে ছিল। তার চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে নূরুকে সে অনেক বেশি পছন্দ করে। অনেক বেশি। কী ঠাণ্ডা একটা ছেলে। বয়স কত হবে? কুড়ি একুশ? তার চেয়েও কম হতে পারে। কোনোদিন জিজ্ঞেস করা হয়নি। জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল।
মতিন সাহেব।
কী বাবা?
আমাদের সঙ্গে দুটি ছেলে ছিল। ওরা মারা গেছে।
বাবা, তুমি চুপ করে থাক। কথা বলবে না। কোনো কথা বলবে না।
পানি খাব।
বিন্তি এক চামচ পানি দিল মুখে। রাত্রি এসে দাঁড়িয়েছে দরজার পাশে। সেখানে থেকেই সে বলল, আপনার কী এখন একটু ভাল লাগছে? রাত সাড়ে তিনটা, সকাল হতে বেশি বাকি নেই।
আলমের মাথা আবার কেমন ভারী হয়ে যাচ্ছে। সে কী আবার তলিয়ে যেতে শুরু করেছে? কিন্তু সে তলিয়ে যেতে চায় না। জেগে থাকতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।
পাশা ভাইও এ রকম গুলি খেয়েছিল। গুলি লেগেছিল পেটে। ভয়াবহ অবস্থা। কিন্তু পাশা ভাই ছিলেন ইস্পাতের মত। মৃত্যুর আগ মুহূর্তেও বললেন-- আমাকে মেরে ফেলা এত সহজ না। সামান্য একটা সিসার গুলি আমাকে মেরে ফেলবে। পাগল হয়েছিস তোরা? 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদিনী'। কথায় কথায় কবিতা বলতেন। ছড়া বলতেন। দেশের সেরা সন্তানদের আমরা হারাচ্ছি। এরা দেশের শ্রেষ্ঠতম ফসল। এই দেশ বীর প্রসবিনী।
রাত্রির পাশে তার মা এসে দাঁড়িয়েছেন। কী করুণ লাগছে ভদ্রমহিলার মুখ। আলম একবার ভাবল বলবে, আপনাদের অনেক ঝামেলায় ফেললাম। কিন্তু বলা গেল না। বললে নাটকীয় শোনাবে। বাড়তি নাটকের এখন কোনো দরকার নেই। আলম বলল, ক'টা বাজে?
তিনটা পঁয়ত্রিশ।
মাত্র পাঁচ মিনিট গিয়াছে? সময় কী থেমে গেছে? কে একজন ছিল না যে সময়কে থামিয়ে দিয়েছিল? কী নাম যেন? মহাবীর থর? না অন্য কেউ? সব এলোমোলো হয়ে যাচ্ছে। আবার সাদেকের মুখটা ভাসছে। মৃত মানুষদের কথা এখন আমি ভাবতেই চাই না। কিছুতেই না। আমি ভাবতে চাই জীবিত মানুষদের কথা। মার কথা ভাবতে চাই। বোনের কথা ভাবতে চাই। এবং এই

মেয়েটির কথাও ভাবতে চাই। রাত্রি! কী অদ্ভুত না।

আলম পাশ ফিরতে চেষ্টা করল। সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যথা। আবার সে ডুবে যেতে শুরু করেছে। সে বিড়বিড় করে বলল, মতিন সাহেব মাথাটা একটু উঁচু করে দিন।

রাত্রি একা একা বারান্দায় বসে আছে। সে তাকিয়ে আছে নারকেল গাছের দিকে। সেখানে বেশ কিছু জোনাকি ঝিকমিক করছে। শহরেও জোনাকি আছে তার জানা ছিল না।

ভাল লাগছে ওদরে দিকে তাকিয়ে থাকতে।

পাশের বাড়িতে দোতলা ফ্ল্যাটে একটি ছোট বাচ্চা কাঁদছে। তার মা তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। একটি দু'টি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। রাত্রি লক্ষ্য করল আকাশের তারার সঙ্গে জোনাকিদের চমৎকার মিল আছে।

বাচ্চাটা কান্না থামিয়েছে। হয়ত দুধ বানিয়ে দিয়েছে তার মা। নিশ্চিত হয়ে ঘুমুচ্ছে। আহ শিশুরা কত সুখী।

সুরমা বারান্দায় এসে তাকালেন মেয়ের দিকে। তাঁর বুক ধক করে একটা একটা ধাক্কা লাগল।

রাত্রি!

কী মা?

একা একা বসে আছিস কেন?

রাত্রি জবাব দিল না। তাকিয়ে রইল জোনাকিব দিকে। সুরমা ক্লান্ত স্বরে বললেন, ভোব হতে দেরি নেই।

রাত্রি ঠিক আগের মতই বসে রইল। সুরমা বললেন, তুই চিন্তা করিস না। আমার মনে হয় ও সুস্থ হয়ে উঠবে। তোর মনে হয় না?

আমার কিছু মনে-টনে হয় না।

বলতে গিয়ে রাত্রির গলা ধরে গেল। ইচ্ছা করল চেঁচিয়ে কেঁদে উঠতে।

সুরমা বসলেন মেয়ের পাশে। একটি হাত রাখলেন তার পিঠে। অস্বাভাবিক কোমল স্বরে বললেন, দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর আমি আলমের মা'র কাছে গিয়ে বলব চবম দুঃসময়ে আমরা আপনার ছেলের কাছে ছিলাম। তার ওপর আমাদের দাবি আছে। এই ছেলেটিকে আপনি আমায় দিয়ে দিন।

দুজনে অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। রাত্রির চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়তে লাগল। সুরমা মেয়েকে কাছে টানলেন। চুমু খেলেন তার ভেজা গালে।

রাত্রি ফিসফিস করে বলল, জোনাকিগুলিকে আর দেখা যাচ্ছে না কেন মা?

জোনাকি দেখা যাচ্ছে না কারণ ভোর হচ্ছে। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করছে। গাছে গাছে পাখ-পাখালি ডানা ঝাপ্টাচ্ছে। জোনাকিদের এখন আর প্রয়োজন নেই।



# দূরে কোথাও

আকাশে মেঘ করেছে।

ঘন কালো মেঘ। ক্রমেই ফুলে ফেঁপে উঠছে।

ওসমান সাহেব আকাশের দিকে তাকালেন। তাঁর কেন জানি মনে হল এই মেঘে বৃষ্টি হবে না। প্রিকগনিশন নাকি? ভবিষ্যতের কথা আগে ভাগে বলে ফেলা। তিনি হাঁটছেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। উদ্দেশ্যহীন মানুষের হাঁটা। গন্তব্যহীন যাত্রা। অথচ তাঁর একটি গন্তব্য আছে। বি.ডি.আর-এর তিন নম্বর গেট পার হয়ে তিনি ঢুকে যাবেন নিউ পল্টন লাইনের গলিতে। গোরস্থানের দেয়াল ঘেঁষে এগুতে থাকবেন।

স্লামালিকুম।

ওসমান সাহেব চমকে তাকালেন। সালামটা কী তাঁকেই দেয়া হয়েছে? দু-একজন কী চিনতে শুরু করেছে? চেনার কথা নয়। তিনি মাসের দু'বারের বেশি আসেন না এদিকে। সালাম দেয়া ছেলেটির বয়স অল্প। চোখে চশমা। সে তাকাচ্ছে কৌতূহলী হয়ে। ওসমান সাহেব প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন। এবং মৃদু স্বরে বললেন— ভাল তো?

আপনি কী এই পাড়াতে থাকেন?

না। তবে মাঝে মাঝে আসি।

আমি আগেও একবার দেখেছি। তখন চিনতে পারিনি।

তিনি মৃদু হেসে হাঁটতে শুরু করলেন। পেছন না ফিরেও বুঝতে পারছেন ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে। তার হয়ত আরও কিছু কথা বলবার ছিল।

ওসমান সাহেব ঘড়ি দেখলেন - পাঁচটা দশ। তিনি সব সময় চারটার মধ্যে এসে পড়েন। আজ অনেকখানি দেরি করলেন। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে এটা খাপ খায় না। রানুকে পাওয়া যাবে কী? দেরি দেখে কোথাও চলে যায়নি তো?

রানুরা থাকে তিন তলার শেষ মাথায়। ছোট্ট এক চিলতে বারান্দা আছে তাদের। সে সেখানে দু'টি টবে মরিচ গাছ লাগিয়েছে। গোলাপ-টোলাপ না লাগিয়ে মরিচ গাছ লাগানোটা উদ্দেশ্যমূলক। উদ্দেশ্যটা কী?

তিনি বারান্দায় কাউকে দেখলেন না। সাধারণত টগর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা কী নেই আজ? টগরের জন্যে এক প্যাকেট মিমি·এনেছেন। তিনি মিমির প্যাকেট হাতে নিয়ে নিলেন। আজ যেন গতবারের মত না হয়। গতবার পেয়ারা নিয়ে গিয়েছিলেন মনের ভুলে দেয়া হয়নি।

ওরা কী সত্যি সত্যি নেই? সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তাঁর মনে আশাভঙ্গের বেদনা জাগতে লাগল। সিঁড়ি অন্ধকার। কে যেন জায়গায় জায়গায় পানি ফেলে রেখেছে। রানুকে বলতে হবে এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ভাল একটা জায়গায় বাড়ি নিতে।

কলিং বেলে হাত রাখতেই দরজা খুলে গেল। যেন দরজার পাশেই রানু অপেক্ষা করছিল। ওসমান সাহেব মৃদু গলায় বললেন - "একটু দেরি করে ফেললাম।" রানু কিছু বলল না।

টগর কী বাসায় নেই?

না।

কোথায় গিয়েছে?

খালার বাসায় গেছে। এসে পড়বে।

তিনি ইতস্তত করে বললেন — আমি কী ওর জন্যে অপেক্ষা করব?

ইচ্ছা করলে কর।

তিনি বসতে বসতে বললেন— তুমি ভাল আছ তো? রানু জবাব দিল না। ওসমান সাহেব বললেন— ঘরে কী মাথা ধরার টেবলেট আছে? রানু হ্যাঁ না কিছুই বলল না। পাশের ঘরে চলে গেল। তাঁর মনে হল রানু অনেক রোগা হয়ে গেছে। অসুখ-বিসুখ হয়েছে কী? রোগা হবার জন্যেই

বোধ হয় তাকে উনিশ-কুড়ি বছরের তরুণীর মত লাগছে। তিনি মনে মনে রানুর বয়স হিসেব করতে চেষ্টা করলেন। বিয়ে হয়েছিল ষোল বছর বয়সে। সেও তো পাঁচ বছর হল। তার মানে রানুর বয়স এখন একুশ। এত অল্প!

পাশের ঘরে খুট খুট শব্দ হচ্ছে। ওটা কী রান্না ঘর? এখানে সব মিলিয়ে ক'টি রুম কে জানে! কিছুই তিনি জানেন না। রানুর শোবার ঘরটি কেমন? খুব গোছানো নিশ্চয়ই। এমনিতেই রানুর খুব গুছিয়ে রাখার স্বভাব। টুথপেস্টের মুখ খুলে রাখলে সে রাগ করত। মাথা আঁচড়ে চিরুনি ড্রেসিং টেবিলের উপর না রেখে অন্য কোথাও রাখলে গম্ভীর হয়ে যেত।

দুলাভাই, আপনার ওষুধ নিন।

কামিজ পরা লম্বা বেণীর মেয়েটি প্রায় নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনি মেয়েটিকে চিনতে পারলেন না। দুলাভাই সম্বোধনে বিব্রতবোধ করতে লাগলেন।

আমাকে বোধ হয় চিনতে পারেননি, তাই না?

চেনা চেনা লাগছে অবশ্যি।

মোটেই চেনা চেনা লাগছে না। আপনি আমাকে দেখেছেন মাত্র একবার। আপনার বিয়ের সময়। তখন আমার চেহারা অন্য রকম ছিল।

এখন চেহারা বদলে গেছে?

হ্যাঁ।

তুমি কে?

আমার নাম অপলা। আমি রানু আপার দূর সম্পর্কের বোন হই।

তিনি দু'টি ট্যাবলেটের একটি গিলে ফেলে অন্যটি পকেটে রাখলেন, শান্ত স্বরে বললেন আমি একসঙ্গে দু'টি ট্যাবলেট গিলতে পারি না, বমি হয়ে যায়, কাজেই বাকিটা খাব দু'ঘণ্টা পর।

এর মধ্যেই হয়ত আপনার মাথাব্যথা সেরে যাবে।

না, সারবে না। আমার এত সহজে কিছু সারবে না।

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন অপলা মেয়েটি বেশ সহজভাবেই আলাপ করছে, মেয়েটা রানুর অন্য আত্মীয়দের মত নয়।

দুলাভাই আপনি কী বারান্দায় বসবেন? এখানে ফ্যান নেই। আপনার গরম লাগছে নিশ্চয়ই।

না, থাক।

চলুন আমি চেয়ার নিয়ে দিচ্ছি।

আমি বারান্দায় বসলে তোমার আপা সেটা পছন্দ করবে না। সে চায় না লোকজন দেখুক আমি তার এখানে আসি।

অপলা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চুপ করে রইল। ওসমান সাহেবের মনে হল, এটা না বললেই পারতেন। কেন এটা বললেন? তিনি কী অবচেতন মনে মেয়েটির সহানুভূতি চাচ্ছিলেন?

অপলা বলল বসুন চা নিয়ে আসি। তিনি দীর্ঘ সময় বসে রইলেন একা একা। বসে থাকতে তার কখনো খারাপ লাগে না, আজ লাগছে। চলে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে। এতক্ষণ তাঁর গরম লাগেনি। এখন লাগছে। রানুর শোবার ঘরে ফ্যান আছে কী? তিনি ঠিক করে রাখলেন রানু এলেই জিজ্ঞেস করবেন। শুধু এটিই নয় তাঁর আরো কিছু জানবার আছে। যেমন পুরুষ মানুষ কেউ কী থাকে রানুদের সঙ্গে? তিনি যতবার এসেছেন কোন বারই পুরুষ কাউকে দেখেননি। একবার এসে এশট্রেতে ছ'টা সিগারেটের টুকরো দেখেছেন। যে এসেছিল সে নিশ্চয়ই নার্ভাস প্রকৃতির লোক; কারণ কোন সিগারেটই পুরোপুরি শেষ করেনি। একটি তো প্রায় আস্তই ছিল।

দুলাভাই, চা দেয়া যাবে না, চিনি নেই।

চা লাগবে না।

আপনি খবরের কাগজটা পড়ুন। টগর এসে পড়বে।

অপলা কাগজটা টেবিলে রেখে ভেতরে চলে গেল। রানু চায় না কেউ তার সামনে থাকুক। মানুষকে অপদস্ত করার ও কষ্ট দেবার সব ক'টি মেয়েলি অস্ত্রই সে প্রয়োগ করতে চায়।

খবরের কাগজে কোনো খবর নেই। তেরো বছরের একটি কিশোরীকে ঝিকাতলা থেকে দিনে দুপুরে অপহরণ করা হয়েছে। দু'টি ছেলে বেবি টেক্সিতে করে মেয়েটিকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। এটা কী বিশ্বাসযোগ্য? হাজার হাজার মানুষ গিজিগিজ করছে চারদিকে। একটি মেয়ের চিৎকারে

লোক জমে যাবার কথা। নিশ্চয়ই কোনো প্রেমের ব্যাপার। মেয়েটি পালিয়েছে। বাবা অপহরণের মামলা করছেন।

পাশের ঘর থেকে রানুর হাসির শব্দ পাওয়া গেল। অপলাও হাসছে। ওসমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। ঘড়ি দেখলেন। খবরের কাগজে বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপনগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন। অবসর সময়ে বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন পড়তে তাঁর বেশ ভাল লাগে। এর পেছনের মনস্তাত্ত্বিক কারণটি কী? কারণ কিছু নিশ্চয়ই আছে। এই যে রানু খিলখিল করে হাসছে তার পেছনে যেমন কারণ আছে, বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞাপন পড়ার পেছনেও কারণ আছে। চার রুম। গ্রিল দেয়া বারান্দা। সার্ভেন্টস রুম ও গ্যারাজ। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। ড্রয়িং কাম ডাইনিং. দুই বেডরুম, দুই বাথরুম। ভাড়া বাইশশ টাকা অগ্রিম আবশ্যক।

দুলাভাই আপনার চা।

ওসমান সাহেব চায়ের পেয়ালার দিকে তাকালেন! দুধ চা। তিনি দুধ চা খান না। দুধ ছাড়া হালকা চা খান। রানু তা জানে। ওসমান সাহেব হাসি মুখে বললেন চিনি ছিল না বলেছিলে।

টগরের চিনি থেকে বানানো হয়েছে।

টগরের জন্য আলাদা চিনি কেনা হয়?

হ্যাঁ।

অবাক হতে গিয়েও তিনি অবাক হলেন না। সব কিছু আলাদা আলাদা করার একটা প্রবণতা রানুর আছে। বিয়ের কিছু দিন পরই রানু বলেছিল তুমি আমার সাবান ব্যবহার করছ কেন? ওসমান সাহেব অবাক হয়ে বলেছিলেন তোমার আলাদা সাবান নাকি?

হ্যাঁ। নীল সাবানদানীতে যে সাবান সেটা আমার।

ও আচ্ছা।

তবু তার মনে থাকত না। রানুর সাবান মেখে ফেলতেন। ভুল ধরা পড়া মাত্র লজ্জাবোধ করতেন।

চা খাচ্ছেন না কেন? চা খান।

তিনি চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন অপলা চাটা ভালই বানিয়েছ।

আমি বানিয়েছি বুঝলেন কী করে?

আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি।

আবার অনেক কিছু বুঝতেও পারেন না।

তা ঠিক আমি অনেক কিছুই বুঝতে পারি না।

অপলা একটু অবাক হল। সে ধারণা করেছিল ওসমান সাহেব তার কথায় আপত্তি করবেন। কিছু কিছু মানুষকে দেখলেই মনে হয় এরা কারো কথাই মেনে নেয় না। সব সময় কঠিন কিছু যুক্তি-তর্ক বের করে বিপক্ষের মানুষটিকে ধরাশায়ী করে দেয়। যুক্তিগুলি দেয়া হয় খুব ঠাণ্ডা মাথায় গলার স্বর থাকে খাদে। মুখ থাকে হাসি হাসি কিন্তু প্রতিটি বাক্যই কেটে কেটে বসে যায়। ওসমান সাহেব কী এ রকম একজন মানুষ?

অপলা, এমন মন দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছ কেন? কী দেখছ?

অপলা লজ্জা পেয়ে উঠে দাঁড়াল। বিব্রতস্বরে বলল - আপনি বসুন আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসব। কাপড় বদলাব।

আমাকে সঙ্গ দেবার জন্য তোমাকে তাড়াতাড়ি আসার দরকার নেই। আমার একা বসে থাকার অভ্যাস আছে। ইউ টেক ইওর টাইম।

মাথা ধরাটা এখনো যায়নি। ওসমান সাহেব দ্বিতীয় ট্যাবলেটটি গিলে ফেললেন। একা সময় কাটানো তার নিজস্ব কিছু পদ্ধতি আছে। সেগুলো কাজে লাগাতে শুরু করলেন। ঘরের প্রতিটি জিনিসের দিকে তিনি তাকাবেন। এবং বেশ কিছু সময় এগুলি নিয়ে ভাববেন। এই ছোট্ট ঘরে তিনি তাঁর পদ্ধতি আগেও অনেকবার খাটিয়েছেন। প্রতিটি জিনিসই তাঁর চেনা, তবু প্রতিবারই নতুন নতুন ডিটেইল চোখে পড়ে। যেমন আজ চোখে পড়ল শোকেসে কিছু নতুন বই এনে রাখা হয়েছে। সবই কবিতার বই। রানু কবিতা পড়ে না। এখন কী পড়তে শুরু করেছে, না উপহার পাওয়া? শোকেসে একটা তালাও লাগানো হয়েছে। খুব সম্ভব টগরের জন্যে। শোকেস ঘাঁটাঘাঁটির বয়স এখন। দেয়ালে যে ক্যালেন্ডার ঝুলছে তার পাতা উল্টানো হয়নি। এখনো দেখা যাচ্ছে জুলাই মাস।

এই ভুল রানু করবে না। সে এসব ব্যাপারে খুব সাবধান। কিন্তু ভুলটা করেছে। এটাকে কী সূক্ষ্ম কোনো মানসিক পরিবর্তনের লক্ষণ বলা যাবে? ওসমান সাহেব ক্যালেন্ডারের ছবিটির দিকে মন দিলেন, রানু এসে ঢুকল তখন।

সে নিশ্চয়ই কোথাও বেরুবে। যত্ন করে সেজেছে। কালো জমিনের উপর লাল পাতা আঁকা জামদানী শাড়ি। শাড়িটার জন্যেই কী তার চেহারা বদলে গেছে, না রোগা হবার জন্যে এমন লাগছে? ওসমান সাহেব মুগ্ধ হয়ে তাকালেন। এবং মনে মনে বললেন – কিছু মেয়ে আছে যাদের রূপ সব সময় টের পাওয়া যায়।

তোমরা কোথাও যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ বিয়েতে যাচ্ছি।

আমি তাহলে যাই?

না বস। টগর আসবে। টগরকে তুমি আজ রাতে তোমার সঙ্গে রাখবে। সকাল বেলা আমি ওকে নিয়ে আসব। অসুবিধা হবে?

না। কার বিয়ে?

আমাদের এক আত্মীয়।

রানু বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই সামনে বসল। শীতল স্বরে বললো সামনে তো এ্যাশট্রে আছে, চায়ের কাপে ছাই ফেলছ কেন?

এ্যাশট্রেটা এত সুন্দর যে ছাই ফেলতে ইচ্ছা করে না। সুন্দরের মধ্যে অসুন্দর ঠিক মানায় না।

আমার সঙ্গে বড় বড় কথা বলে লাভ নেই। তোমার বড় বড় কথা অনেক শুনেছি। আর শুনতে ইচ্ছা করছে না।

তিনি দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরালেন এবং খুব সাবধানে ছাই ফেললেন এ্যাশট্রেতে। রানু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। ওসমান সাহেবও এগিয়ে গেলেন– হাল্কা গলায় বললেন, এ বাড়িতে তোমার সঙ্গে পুরুষ মানুষ কেউ থাকে না?

না।

একা একা থাক ভয় লাগে না।

ভয় লাগবে কেন? এটা আমার বড় খালার বাড়ি। রাতে আমি বড় খালার সঙ্গে ঘুমাই।

এটা তোমার খালার বাড়ি জানতাম না তো। আপন খালা?

রানু জবাব দিল না। আগ্রহ নিয়ে রাস্তার দিকে তাকাল। ওসমান সাহেব দেখল ক্রিম কালারের একটা গাড়ি এসে থেমেছে। প্রায় ছ'ফুটের মত স্বাস্থ্যবান একটি তরুণ হাসি মুখে নামছে গাড়ি থেকে। খুব সম্ভব এই ছেলেটির সঙ্গে রানু বিয়েতে যাবে। রানুর দিকে তাকালেন। ছেলেটিকে ওসমান সাহেব আগে দেখেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না। দেখেছেন হয়ত, মানুষের চেহারা তাঁর মনে থাকে না।

রানু ঐ ছেলেটা কে?

আমাদের দূর সম্পর্কে আত্মীয় – আলম। কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার।

ওর সঙ্গে কী যাচ্ছ?

হ্যাঁ। এত প্রশ্ন করছ কেন?

তিনি অপ্রস্তুত হয়ে নিজ জায়গায় ফিরে গেলেন। আলমকে দেখে মনে হল সে ওসমান সাহেবকে দেখে খুব অবাক হয়েছে। সে তার বিস্ময় গোপন করল না। হাসি মুখে বলল- কেমন আছেন আপনি?

ভাল। ভাল আছি।

আপনি কী আমাকে চিনেছেন? আমি রানুর মামাতো ভাই। আমার নাম আলম। রানু কী আপনাকে আমার কথা বলেছে?

তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। অস্পষ্টভাবে হাসলেন। যার মানে হ্যাঁও হতে পারে আবার নাও হতে পারে। আলম বলল— আমি আপনার একটা মাত্র বই পড়েছি– নাম হল গিয়ে 'চৈত্রের রাতে'। বইটা আমার একটুও ভাল লাগেনি। আপনি রাগ করলেন না তো?

না, রাগ করিনি।

রানুকে বলেছিলাম– আমি তো বই পড়ি না। পড়তে ভালও লাগে না। উনার সবচে' ভাল

বইটা দাও, পড়ি। রানু ঐটা দিল।

আলম সিগারেট ধরাল। নড়েচড়ে বসল। তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে একটা আলোচনায় নামতে চায়। ওসমান সাহেব শঙ্কিত বোধ করলেন। যে তার বই পছন্দ করে না তার সঙ্গে আলোচনা জমে না। কথা বলতে গেলেই মনের ওপর চাপ পড়ে।

আচ্ছা ওসমান ভাই, চৈত্রের রাতে বইটিতে নীলু মেয়েটি শেষ মুহূর্তে এই কাণ্ডটি কেন করল?

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। আলম উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে লাগল "নীলু যা করেছে তাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। আমি তো তাকে ক্ষমা করবো না। ইন ফেক্ট...." তিনি হেসে ফেললেন। আলম কথা বন্ধ করে অবাক হয়ে বলল হাসছেন কেন? ওসমান সাহেব বললেন, উপন্যাসটি আপনার পছন্দ হয়নি তবুও নীলুর ব্যাপারে যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছেন। তাই হাসছি।

আলম আধ-খাওয়া সিগারেট এ্যাস্ট্রেতে গুঁজে নতুন সিগারেট ধরাল। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল- অনেক লেট করে ফেললাম আমরা। রানু বলল— টগরকে নিয়ে আসতে এত দেরি করছে কেন, বুঝছি না। সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তার চোখে চিন্তার ছাপ। কপালে দু'টি সূক্ষ্ম ভাঁজ।

টগরকে তার কিছুক্ষণ পরই আসতে দেখা গেল। সে তার খালার কোলে ঘুমুচ্ছে। রানু বলল যাক, টগরকে সঙ্গেই নিয়ে যাব। ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আলম বলল— চলুন আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

দরকার নেই কোনো।

চলুন না। এমনিতেও আমাকে সিগারেট কিনতে হবে।

আলম বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত এল এবং এক সময় বলল— আপনি আপনার নাম লিখে একটা বই আমাকে দেবেন। আমি আমার বন্ধুদের দেখাব।

ঠিক আছে দেব। রানুর কাছে রেখে যাব।

আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে।

না। আমি বিয়ে-টিয়েতে বিশেষ যাই না। আপনারা যান।

আপনার বাসায় আপনাকে নামিয়ে দেব।

দরকার নেই কোনো।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন। অল্প কয়েক পা হাঁটার পরই মনে হল মিমির প্যাকেটটা টগরকে দেয়া হয়নি। আলম এখনো দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছা করলেই ফিরে গিয়ে তার হাতে দেয়া যায়। কিন্তু ফিরলেন না। লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগলেন।

আকাশে মেঘ। ঘন কালো মেঘ।

বৃষ্টি কী হবে? ভাদ্র মাসে এত মেঘ হয় আকাশে?

## ২

ওসমান সাহেব বাড়ি ফিরলেন রাত আটটায়। রিকশা থেকে নেমে ভাড়া মেটাবার সময় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। তাঁর ধারণা বৃষ্টির ফোঁটা যদি ছোট হয় এবং যদি খুব কাছাকাছি হয় তাহলে বৃষ্টি থামতে দীর্ঘ সময় লাগে। ফোঁটার ধরন দেখে তাঁর মনে হল সারা রাত বৃষ্টি হবে। এবারে খুব শুকনো ধরনের বর্ষা গেছে। গভীর রাতে ঘুম ভেঙে বৃষ্টির শব্দ শোনা হয়নি। আজ হয়ত শোনা যাবে।

চার টাকা ভাড়া ঠিক করা ছিল। ওসমান সাহেব চকচকে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে মনে মনে বললেন, বৃষ্টি আসার আনন্দে তোমাকে এক টাকা বকশিস দেয়া গেল।

বসার ঘরে টিভি চলছে। আকবরের মা এবং তার ছেলে জিতু মিয়া পা ছড়িয়ে টিভি দেখছে। তারা দেখল ওসমান সাহেব ঢুকছেন কিন্তু কেউ গা করল না। দুজনেই ভান করল— দেখতে পায়নি। ওসমান সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন— সদর দরজা খোলা কেন আকবরের মা? আকবরের মা জবাবই দিল না। তাকিয়ে রইল।

অন্য কোনো ঘরে বাতি জ্বালাওনি কেন? যাও শোবার ঘরের বাতি জ্বালাও। টিভির সাউন্ড কমিয়ে দাও।

আকবরের মা বিরক্ত মুখে উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাল। ওসমান সাহেব ঘরে ঢুকে দেখলেন বেশ পরিষ্কার করে বিছানা করা। লেখার টেবিলে নতুন টেবিল ক্লথ। কাচের জগে পানি। পিরিচ দিয়ে

ঢাকা একটা গ্লাস।

লেখার কাগজ। একটা লাল এবং একটা কাল বল পয়েন্ট পেন। হাতের বাঁ পাশের বুকশেলফের বইগুলি চমৎকার করে গোছানো। শুধু তাই নয়, খাটের পাশে ছোট্ট টেবিলটায় একটা স্টেনলেস স্টিলের বাটিতে কিছু টাটকা বেলি ফুল। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন-- কেউ এসেছিল আকবরের মা।

মিলা আফা আসছিল।

কিছু বলে গেছে?

বলছে কাইল আবার আসব।

এসেছিল কখন?

দুপুরের পরে, সইন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল। কাইল সইন্ধ্যার সময় আপনারে থাকতে কইছে।

মিলি ওসমান সাহেবের ছোট বোন। তার স্বামী সিভিল সাপ্লাইয়ে কাজ করে এবং বেশ ভালই মাইনে পায়। ঢাকা শহরে তাদের একটি বাড়ি আছে যার দোতলাটা ভাড়া দেয়া হয়। কিন্তু মিলির মাঝে মাঝে টাকার দরকার পড়ে। ওসমান সাহেব সেই দরকারটা মেটান। আবার হয়ত এরকম কোনো প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

আকবরের মা।

জি।

চা দাও তো। লেবু চা।

আকবরের মা অপ্রসন্ন মুখে চা বানাতে গেল। ওসমান সাহেব বাথরুমে ঢুকলেন। রানুর অভাবটা বোঝা যাচ্ছে মেঝেতে সাবান গলে পড়ে আছে। বেসিনটা নোংরা। আয়নায় সাবানের ফেনা পড়ে জালের মত নকশা তৈরি হয়েছে। আকবরের মা এবং তার ছেলের কোনো দিকেই কোনো নজর নেই। অবিশ্যি বাজার করা হচ্ছে। রোজ দু'বেলা রান্না হচ্ছে। এই বা কম কী!

গোসল সেরে বেরুতে তাঁর অনেক সময় লাগল। টেবিলে ঢেকে রাখা চা ততক্ষণে জুড়িয়ে পানি হয়ে গেছে। ওসমান সাহেব মুখ বিকৃত না করে সেই ঠাণ্ডা চা খেলেন। ঠিক এই মুহূর্তে কোন লেখালেখি করতে ইচ্ছা হচ্ছে না তবু বসলেন লিখতে। অনেক দিন ধরে একটা লেখা ঘুরছে মাথায়। সারাক্ষণেই ভোতা একটা যন্ত্রণা দিচ্ছে লেখাটা। দশ/বার পৃষ্ঠা লিখে ফেলতে পারলে যন্ত্রণা একটু কমবে। এক বছর হয়ে গেল যন্ত্রণাটা পুষছেন।

কিছু কিছু লেখা বড় কষ্ট দেয়। এই কষ্ট দেয়া গল্পটির জন্ম গত বর্ষায়। ময়মনসিংহ থেকে বাসে করে ঢাকায় আসছেন। ঝাঁকুনিতে চমৎকার ঘুম এসে গেল। ঘুম ভাঙল ভাওয়ালের জঙ্গলে। সন্ধ্যা হব হব করছে। বনের মাথায় চাঁদ উঠেছে। বাস চলার শব্দ ছাড়া কোথাও কোনো শব্দ নেই। সেই শব্দও এক সময় থেমে গেল। কারবুরেটরে গোলমাল। ড্রাইভার রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে খুটখাট শুরু করেছে। যাত্রীরা সব নেমে গেছে বাস ছেড়ে। ওসমান সাহেব জানালা দিয়ে মুখ বের করে বসে আছেন। বিশাল অরণ্যে বৃষ্টির মত চাঁদের আলো ঝড়ছে। শুনশান নীরবতা। মাথায় ঠিক তখন গল্পটা এল। তিনি কল্পনা করলেন এই আরণ্য ক্রমেই বড় হচ্ছে। একটির পর একটি শহর এবং নগর গ্রাস করতে শুরু করেছে। ছোট্ট একটি শহর শুধু বাকি। অল্প কিছু লোক থাকে সেই শহরে। প্রতি রাতেই তারা শুনতে পায় অরণ্য এগিয়ে আসছে।

গল্পটি অনেকবার লিখতে চেষ্টা করেছেন। লিখতে পারেননি। সমস্ত ব্যাপারটা মাথায় সাজানো আছে কিন্তু কলমে আসছে না। একটি লাইনও নয়। তিনি রাতের পর রাত কাগজ কলম নিয়ে বসে কাটিয়েছেন। দু'বার এ নিয়ে রানুর সঙ্গে ঝগড়া হল। রানু বলল--- এই গল্পটিই যে লিখতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। অন্য গল্প লেখ। তিনি গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন-- একটা শেষ না করে অন্য কোনো লেখায় আমি হাত দেব না।

যদি এটা লিখতে না পার তাহলে আর অন্য কিছু লিখবে না?

না।

তুমি বড় অহঙ্কারী।

এখানে অহঙ্কারের কী দেখলে?

অনেক কিছুই দেখলাম। অক্ষমতা স্বীকার না করাটাও অহঙ্কার।

ওসমান সাহেব চুপ করে রইলেন। রানু মশারি ফেলতে ফেলতে বলল, কোনো মানুষই তার প্রতিভার বাইরে যেতে পারে না।

প্রকারন্তরে বলা, তাঁর তেমন কোনো প্রতিভা নেই। থাকলে অরণ্যের সেই গল্প লিখে ফেলতে পারতেন। পুরুষদের আহত করার কৌশল মেয়েরা খুব তাড়াতাড়ি শিখে ফেলে এবং তা ব্যবহারও করে চমৎকারভাবে। কেউ তার প্রতিভার বাইরে যেতে পারে না। বইয়ের ভাষায় কয়েকটা কথা বলে রানু ঘুমুতে গেল। ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। ওসমান সাহেব রাত তিনটা পর্যন্ত জেগে রইলেন। খাতার পাতায় শুধু কয়েক বার লেখা হল– অরণ্য এ পর্যন্তই। টগর যখন জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করেছে তখনো তিনি ঘুমুতে যাননি। রানু টগরকে নিয়ে বাথরুম করাল। মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াল এবং খুব সহজভাবে বলল– শোবার সময় ফ্যানটা এক ঘর কমিয়ে দিও তো। যেন কিছুই হয়নি।

ওসমান সাহেব ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। বাইরে ভালই বৃষ্টি হচ্ছে। তার থিওরি সত্যি করবার জন্যেই বোধ হয় আজ সারা রাত বৃষ্টি পড়বে।

আপনার টেলিফোন।

তিনি চমকে তাকালেন। আকবরের মা নিঃশব্দে চলাফেরা করে। মাঝে মধ্যেই তাকে চমকে দেয়। তিনি বিরক্ত স্বরে বললেন

কার টেলিফোন?

মিলা আফার।

তার চেয়ার ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করছিল না। আকবরের মাকে বললেই সে হাতের কাছে রিসিভার এনে দেবে। কিন্তু শোবার ঘরে টেলিফোন রাখা তাঁর পছন্দ নয়। টেলিফোন আসা মানেই হচ্ছে অপরিচিত একজন লোকের ঘরে ঢুকে পড়া। একজন অপরিচিত মানুষ রাত দুপুরে শোবার ঘরে ঢুকুক এটা তার পছন্দ নয়। কিন্তু মিলি অপরিচিত কেউ নয়।

টেলিফোন এই ঘরে আনুম?

না আমি যাচ্ছি।

ওসমান সাহেব টেলিফোনে দীর্ঘ সময় কথা বলতে পারেন না। মিলি ঠিক তার উল্টো, ঘণ্টা খানিকের আগে টেলিফোন ছাড়তে চায় না।

হ্যালো ভাইয়া, কী করছ? লিখছিলে নাকি?

না।

তোমার অপেক্ষায় থেকে সারাটা দুপুর, সারাটা বিকাল এবং সারাটা সন্ধ্যা নষ্ট হল। আমি যে গিয়েছিলাম তোমাকে বলেনি?

বলেছে।

গিয়ে কী দেখি জানো? তোমাদের জিতু মিয়া সোফায় পা তুলে লাট সাহেবের মত বসে আছে। এমন এক চড় দিয়েছি। চড়ের কথা তোমাকে বলেছে?

না।

আচ্ছা ভাইয়া, শোন, যে জন্যে তোমাকে টেলিফোন করলাম ভাবীকে গতকাল দেখলাম একটা ছেলের সঙ্গে রিকশায় করে যাচ্ছে। সুন্দর মত ছেলে। চেক চেক শার্ট গায়ে। দুজনে খুব হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করছিল। ভাইয়া, তুমি শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

কিছু বলছ না কেন?

দেখ মিলি রানুর সঙ্গে আমার বনিবনা হয়নি। আমরা আলাদা থাকছি। এখন সে যদি কোনো ছেলের সঙ্গে পরিচিত হয় তাহলে হবে। আমি এখানে কী বলব?

কিছুই বলবে না? ভাবীর সঙ্গে তোমার সেপারেশন তো এখনও হয়নি।

এখনও হয়নি কিন্তু হবে। রানু কাগজপত্র জমা দিয়েছে। আচ্ছা মিলি আমি রাখলাম, ঘর গুছিয়ে দিয়ে যাবার জন্যে ধন্যবাদ।

শোন, ভাইয়া, আমার কথা এখনো শেষ হয়নি।

বল কী বলবি।

তুমি নাকি বাড়ি বিক্রি করে দিচ্ছ?

বাড়ি বিক্রি করবে কেন?

কেন করবে তা আমি কী করে জানব। আমি যা শুনলাম তোমাকে বললাম।

ভুল শুনেছিস।

কার কাছে শুনলাম সেটা জিজ্ঞেস করলে না?

না গুজব শোনায় আমার আগ্রহ নেই। মিলি আমি রাখলাম।

এত রাখি রাখি করছ কেন?

ক্ষিধে লেগেছে। ভাত খাব।

ঠিক আছে তাহলে ভাত খাবার পর আমাকে টেলিফোন করবে।

কেন কথা এখনও শেষ হয় নি?

খুব একটা ইন্টারেস্টিং গল্প তোমাকে বলব ভাইয়া। আমার এক বান্ধবীর জীবনের সত্যি ঘটনা। তুমি এটা নিয়ে একটা গল্প লিখতে পার। তবে বান্ধবীর নাম ব্যবহার করতে পারবে না। হ্যালো, ভাইয়া, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি।

একটু ধরে রাখ। বাবু কী জন্যে ডাকছে শুনে আসি। আচ্ছা ভাইয়া শোন, হ্যালো? বাবুর ভাল নাম রেখে দিলে না তো। খুব সুন্দর দেখে তিন অক্ষরে একটা নাম দাও তো। শুরু হবে ম দিয়ে। আমার সঙ্গে মিলিয়ে রাখতে চাই।

মৌসুমী রাখ।

না মৌসুমী না। মৌসুমী সিনেমার নায়িকার নাম।

মিতুল।

ওটা তো ছেলেদের নাম।

আজকাল ছেলেদের এবং মেয়েদের একই নাম হয়।

মিতুল শব্দের মানে কী?

আমি জানি না।

বল কী, তুমি এত বড় লেখক হয়ে মিতুল শব্দের মানে জানো না?

আমি বড় লেখক তোকে বলল কে? আচ্ছা এখন রাখলাম।

তিনি টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। আকবরের মা এবং জিতু মিয়া গভীর আগ্রহে টিভি দেখছে। জীবনের সমস্ত সুখ ও আনন্দ যেন এই যন্ত্রটিতে। রানু চলে যাওয়ায় এরাই বোধ হয় সবচেয়ে খুশি।

তিনি নিজেও কি খুশি হননি? সম্পূর্ণ নিজের মত করে থাকার একটা আলাদা আনন্দ আছে। স্বাধীনতার আনন্দ। রানুর অভাব তিনি যতটা বোধ করবেন ভেবেছিলেন ততটা করছেন না, তেমন কোন শূন্যতা তার মধ্যে তৈরি হয়নি। কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। শুধু রানু কেন টগরের জন্যও কী তিনি তেমন কোন আকর্ষণ অনুভব করেন? মনে হয় না। কাউকে ভালবাসার ক্ষমতাই বোধ হয় তার নেই।

আকবরের মা বলল— ভাইজান ভাত দিব?

দাও। কী রান্না আজকে?

কই মাছ।

ওসমান সাহেব তৃপ্তি করে ভাত খেলেন। খাওয়ার শেষে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে দু'টি সিগারেট শেষ করলেন। তাঁর পান খেতে ইচ্ছা হল। ঘরে পান ছিল না। জীতু মিয়া ছাতা মাথায় দিয়ে পান কিনতে গেল। ওসমান সাহেবের মনে হল এই জীবনটাই বা নেহায়েত খারাপ কী। নিঃসঙ্গতারও তো এক ধরনের আনন্দ আছে। শূন্যতার মধ্যেও আছে পরিপূর্ণতা। নৈঃশব্দ্যের গান।

ভাইজান আপনার টেলিফোন।

তিনি রিং শুনতে পেলেন। বেশ জোরেই শব্দ হচ্ছে। কিন্তু তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন না কেন? যা আমরা শুনতে চাই না আমাদের মস্তিষ্ক সব সময় চেষ্টা করে তা যেন শুনতে না হয়।

ওসমান সাহেব বললেন- আকবরের মা, তুমি বারান্দায় একটা মোড়া এনে দাও আর যে টেলিফোন করেছে তাকে বলে দাও আমি এখন ব্যস্ত, সকাল বেলা টেলিফোন করতে।

মিলা আফা ফোন করছে।

যা বলতে বললাম বল।

আমি কইছি, আপনে বারান্দায়।

অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি টেলিফোন ধরলেন - কী ব্যাপার মিলি?

ভাইয়া আমার কথা শেষ হবার আগেই তুমি খট করে টেলিফোন রেখে দিলে কেন?'

কী বলতে চাস বল।

তুমি আমার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার কর কেন?

ওসমান সাহেব একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। মিলি বলল - বাবার শরীর এত খারাপ তুমি একবারও তাঁকে দেখতে যাওনি। পরশু দিন তিনি দুঃখ করছিলেন। আগামীকাল আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

ঠিক আছে।

শোন ভাইয়া, তুমি বাবার সঙ্গে কয়েকদিন থাকবে। একা একা এই বাড়িতে পড়ে থাকার কোনো মানে আছে?

আচ্ছা সেটা দেখা যাবে।

মিলি আরো মিনিট দশেক কথা বলে টেলিফোন রাখল। ওসমান সাহেব নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঘুম ঘুম লাগছে, আবার শুয়ে পড়তেও ইচ্ছা হচ্ছে না। রানু যখন ছিল দুটো পর্যন্ত জেগে থাকতেন। এখন এগারোটা বাজতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। এর অন্তর্নিহিত রহস্যটি কী?

বৃষ্টির জন্য শীত করছে। পাতলা কোনো একটা জামা গায়ে দিয়ে ঘুমুতে হবে। আলনায় তেমন কিছু নেই। কোথায় থাকতে পারে? কাবার্ডে নিশ্চয়ই নেই। কাবার্ডে থাকত রানুর কাপড় এবং কোনো কারণে তিনি কাবার্ড খুললে রানু বিরক্ত হত। কঠিন স্বরে বলত — আমার জিনিসে হাত দিচ্ছ কেন?

মজার ব্যাপার হচ্ছে রানু তার জিনিসের কিছুই সঙ্গে নিয়ে যায়নি। আসার সময় যেমন চটের একটা হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে এসেছিল, যাওয়ার সময়ও ঠিক সেভাবেই গিয়েছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন, আমাদের সবার মধ্যেই নাটক করবার প্রবণতা আছে। রানুর মধ্যে সেটা হয়ত ছিল বেশি মাত্রায় নয়ত বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় নীল রঙের শাড়ি পরার দরকার ছিল না। ওসমান সাহেবের ধারণা সে এই শাড়ি পরেছে কারণ প্রথম যখন সে এ বাড়িতে আসে তার পরনে ছিল নীল শাড়ি। কিংবা সমস্ত ব্যাপারটা কাকতালীয়ও হতে পারে। রানু হয়ত সচেতনভাবে কিছু করেনি। তিনি অন্য রকম ব্যাখ্যা করছেন। যাবার সময় গায়ে নীল শাড়ি ছিল বলেই সেই শাড়ি পরেই গিয়েছে।

জিতু মিয়া পান নিয়ে এসে দরজায় ধাক্কা দিল। ওসমান সাহেব বললেন, এখন আর লাগবে না সকালে খাব। জিতু বেচারী বৃষ্টি মাথায় হেঁটে হেঁটে পান আনতে গেছে - একটা নিয়ে খেলেই হত। কিন্তু তার উঠতে ইচ্ছা করছে না। শরীর জুড়ে আরামদায়ক একটা আসল্য।

বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। কী মাস এটা? ভাদ্র মাস না? বাংলা মাসের নামের মধ্যে ভাদ্র মাস নামটাই সবচেয়ে খারাপ। সবচে সুন্দর হল শ্রাবণ। চৈত্র নামটাও ভাল। ওসমান সাহেব হাত বাড়িয়ে শেলফ থেকে একটা বই নামালেন। পড়তে ইচ্ছে করছে না। চোখ বুলানোর জন্য নেয়া। এক সময় প্রচুর পড়তেন। রাতের পর রাত বই পড়ে কাটিয়েছেন। একবার 'জাম্প ইন্টু নাথিংনেস' নামে একটা বই রাত তিনটায় পড়ে শেষ করলেন। তারপর নিজে চা বানিয়ে খেলেন এবং সেই বই-ই আবার গোড়া থেকে পড়তে শুরু করলেন। চমৎকার সময় ছিল সেটা। আনন্দও উল্লাসের সময়। মনে আছে একটি জাপানি ছোটগল্প একরাতে চারবার পরার পর অনুবাদ করতে বসলেন। তার সমগ্র জীবনে এই একটিই অনুবাদ কর্ম। সেই অনুবাদটি তিনি কখনো প্রকাশ করেননি। প্রকাশ না করার পেছনের যুক্তিটি ছিল ছেলেমানুষি যুক্তি আমি ঐ জাপানি লেখকের চেয়েও অনেক বড় লেখক হব। ওর গল্পের অনুবাদ আমি কেন করব?

তিনি বড় লেখক হতে পেরেছেন? অনেক গল্প-উপন্যাস লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু বড় লেখক হতে পেরেছেন কী? কেউ তার নিজের প্রতিভার বাইরে যেতে পারে না।' খুব সত্যি কথা। বাতি নিভিয়ে ওসমান সাহেব জাপানি গল্পের কথা ভাবতে শুরু করলেন —

'একটা ছোট্ট শহর। সেই শহরের নিয়ম হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের শহরের রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা। কোমর পর্যন্ত ঢুকানো থাকে গর্তে। শরীরটা বেরিয়ে থাকে। দিন যায়। ধীরে ধীরে এরা বদলে যেতে থাকে। এবং এক সময় এরা গাছ হয়ে যায়। এই রকম একজন অপরাধী পুরুষ

ধীরে ধীরে গাছ হচ্ছে আর রোজ রাতে তার স্ত্রী আসে তার কাছে। জানতে চায় "তোমার কেমন লাগছে?" পুরুষটি ক্লান্ত স্বরে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে। মেয়েটি জানতে চায় — তুমি কী এখনো আমাকে ভালবাস। পুরুষটি থেমে থেমে বলে আমি জানি না। আমি গাছ হয়ে যাচ্ছি, আমি বুঝতে পারছি না।

যখন মানুষ ছিলে তখন কী আমাকে ভালবাসতে?

একটি অসাধারণ গল্প। কিন্তু আজ এই বর্ষার রাতে তিনি এই গল্পটির কথা ভাবছেন কেন? নিজেকে কী তিনি 'গাছ' হিসাবে ভাবছেন। রানু হচ্ছে সেই গাছের পাশে আসা মেয়েটি?

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। গল্পটির প্রভাব। অন্য কিছু নয়। প্রতিভাবান জাপানি গল্পকার তার মধ্যে একটি বিশুদ্ধ আবেগ সৃষ্টি করেছেন। চোখ ভিজে ওঠার পেছনে রানুর কোন ভূমিকা নেই।

৩

মিলির বয়স তেইশ।

রূপসী মেয়েদের যা যা থাকতে হয়, সবই মিলির আছে। গায়ের রঙ ফর্সা। গড়পড়তা মেয়েদের তুলনায় অনেকখানি লম্বা। কাটা কাটা চোখ মুখ। বাঁ চোখের নিচে চোখে পড়ার মত কালো তিল। তবু মিলির ধারণা তাঁর চেহারাটা খুবই সাধারণ। সাধারণ এবং বাজে। তা না হলে বিয়ে নিয়ে কোনো মেয়ের এত ঝামেলা হয়? কথাবার্তা অনেক দূর এগুবার পর পাত্রপক্ষ হঠাৎ সময় চায়। "খালার অসুখ, ছেলের এক ভাই বিদেশে থাকেন— তিনি বিয়েতে আসার ছুটি পাচ্ছেন না" ইত্যাদি। বিয়ে ঠিকঠাক হবার পর সময় চাওয়ার একটাই মানে। বিয়ে হবে না।

যার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল তার নাম মতিয়ুর রহমান। মোটাসোটা বেঁটে-খাটো মানুষ। নাকের নিচে হিটলারী গোঁফ। সিভিল সাপ্লাইয়ে কাজ করে। মিলির জন্যে খুব যে আকর্ষণীয় পাত্র তা নয়। তবু এই বিয়ে নিয়েও কত ঝামেলা। কথাবার্তা পাকা হয়ে যাবার পর দিনই ছেলের বড় ফুপা টেলিফোন করে জানালেন, ছেলে ঠিক করেছে তার ছোট বোনের বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত সে বিয়ে করবে না।

সে সময়টা মিলির খুব খারাপ কেটেছে। এমনিতেই সে রোগা। এই সব ঝামেলায় আরো রোগা হয়ে গেল। গালের হাড় বের হয়ে এল। তার চেয়েও বড় কথা মাথার চুল পড়ে যেতে শুরু করল। চিরুনী দিয়ে একটা টান দিলেই একগাদা চুল উঠে আসে। মাথা ভর্তি চুল মিলির। কিন্তু এভাবে উঠতে থাকলে মাথা ফাঁকা হয়ে যেতে বেশি দিন লাগার কথা নয়। তার দুশ্চিন্তায় রাতে ঘুম হত না। এ অবস্থায় এক সপ্তাহের মধ্যে হুট করে মিলির বিয়ে হয়ে গেল, মতিয়ুর রহমানের সঙ্গেই। এবং তখনো তার ছোট বোনের বিয়ে হয়নি। মিলির ধারণা শ্বশুর বাড়ির কেউ তাকে পছন্দ করেনি, নেহায়েত ছেলের জন্যে কোথাও কিছু পায়নি তাই আবার তার কাছে এসেছে। কথাটা আংশিক সত্য। শ্বশুরবাড়ির অন্য কেউ তাকে পছন্দ করেনি কিন্তু মতিয়ুর রহমান করেছিল। এবং বিয়েটা হয়েছে তার আগ্রহেই। এরকম আজগুবী কথা মিলি বিশ্বাস করে না। সে নিজেকে সুন্দর দেখানোর যত রকম প্রক্রিয়া আছে সব চালিয়ে যায়। তার ধারণা কোনোটিই তার বেলায় কোনো কাজ করে না। কাজ করলে তার বরের চোখেই পড়ত। কিন্তু পড়ে না।

সে গত পরশু সামনের দিকের এক গাদা চুল কেটে ফেলেছে। এত বড় একটা ব্যাপারও মতিয়ুরের চোখে পড়েনি। মিলি যখন বলেছে, কোন চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছ? সে নির্লিপ্ত গলায় বলেছে— কী চেঞ্জ?

কিছুই চোখে পড়ছে না?

না তো। কোনো কিছু চোখে পড়ার ব্যাপার আছে না কী?

মিলি বহু কষ্টে নিজেকে সামলেছে। তার ধারণা তার বরের তার প্রতি কোনো উৎসাহ নেই। এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। বিয়ের দু'বছরের মধ্যে কোন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম হয় না কী? ব্যাপারটা নিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করে কিন্তু তার তেমন কোনো ভাল বন্ধু নেই।

বিকেলে মিলি তার শাড়ির ট্রাংক খুলল। কোনোটাই তার পছন্দ হল না। আচ্ছা সে কেন বেছে বেছে সব জংলি কালারগুলি পছন্দ করে? কেনার সময় মনে হয় কী অপূর্ব রঙ, কী অদ্ভুত ডিজাইন। কিন্তু কেনার পর আর তাকাতে ইচ্ছে করে না।

কোথাও যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ।

কোথায়?

ভাইয়ের কাছে যাব।

মতিয়ুর হালকা সুরে বলল, -- আমি একটা লিফট দিতে পারি। এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। মিলি গম্ভীর গলায় বলল, আমার লিফট-টিফট লাগবে না। বলেই মনে হল -- এটা সে বলল কেন? তাদের তো কোন ঝগড়া হয়নি। মিলি গলার স্বর বদলে বলল, দেখ তো কোন শাড়িটা পরব।

একটা পরলেই হয়। ভাইয়ের কাছে যেতে আবার এত সাজগোজ লাগে নাকি?

তাই বলে ফকিরনীর মতো যাব?

পর এই সবুজটা পর।

এমন কড়া রোদে ডার্ক কালার পরব?

বিকেলে রোদ থাকবে না।

না থাকুক। ডার্ক কালার আমাকে মানায় না। বিহারি মেয়েদের মত লাগে।

মতিয়ুর কিছু বলল না। তার মানে সে স্বীকার করে নিল যে ডার্ক কালার তাকে মানায় না। যেটা তাকে মানায় না সেটা পরতে বলার অর্থ কী? মিলির গলা ভার ভার হয়ে গেল। সে ঠিক করল কোথাও যাবে না। ঘরেই থাকবে। মিলির কোনো সিদ্ধান্তই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এটাও হল না। সে সবুজ রঙের শাড়িটা পরল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বদলে হলুদ ফুটি দেয়া একটা সাদা শাড়ি পরল।

ওসমান সাহেব ঘরে ছিলেন না। কোথায় গিয়েছেন কখন ফিরবেন আকবরের মা বলতে পারল না। মিলি বিরক্ত স্বরে বলল, কাল টেলিফোন করে বলে রেখেছি আমি আসব। আকবরের মা ভীত স্বরে বলল - আফা চা দিমু?

আমি চা খাই নাকি? কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে?

জি না।

কিছুই বলেনি?

বলছে টেলিফোন বাজলে আমরা কেউ যেন না ধরি।

কেন?

আমি কই ক্যামনে?

মিলি আধঘণ্টার মত বসল। এই সময়ের মধ্যেই শোবার ঘর এবং বসার ঘর পরিষ্কার করল। আকবরের মাকে দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করাল। শোবার ঘরের বুক শেলফের সমস্ত বই নামিয়ে আবার নতুন করে রাখল।

লেখার টেবিল কাল যেমন গোছানো ছিল আজও তেমনই আছে। তার মানে ভাইয়া লিখতে বসেনি। সাদা কাগজে অবশ্যি কিছু কাটাকুটি আছে। মিলি পড়তে চেষ্টা করল হলুদ পাখি সবুজ বন। এইটিই আট দশ বার লেখা। কোনো নতুন গল্প বা উপন্যাসের নাম। মিলি তার ভাইয়ের কোনো লেখা ছাপা হয়ে যাবার পর আর পড়ে না। গল্পের বই তার ভাল লাগে না। কয়েক পাতা পড়বার পরই তার মাথা ধরে। শুধু চৈত্রের রাতে বইটা ছয়ত্রিশ পাতা পর্যন্ত পড়েছে। কারণ সেখানে একটা চরিত্র আছে নাম মিলি। সবাই বলে এটা নাকি তাকে নিয়েই লেখা। কিন্তু মিলির তা মনে হয় না। কারণ বইয়ের মিলি খুব সুন্দর। একটু বোকা। সেই মিলি অল্পতেই রাগ করে।

আকবরের মা, আমি যাচ্ছি।

বইতেন না?

খালি বাড়িতে বসে থেকে করব কী?

যাইবেন কই?

সেটা দিয়ে তুমি কী করবে? যত বাড়তি কথা। তুমি কথা কম বলবে। এত বেশি কথা বল কেন?

গাড়ির ড্রাইভারও জিজ্ঞেস করল-- কোথায় যাবেন? রেগে যেতে গিয়েও মিলি রাগ সামলাল। কারণ এটা নিজেদের গাড়ি নয়। মতিয়ুরের মামাতো বোনের গাড়ি। মাঝে মাঝে নিয়ে আসা হয়। আজ রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত মিলি গাড়িটা নিজের কাছে রাখতে পারবে। কিন্তু তার যাবার কোনো জায়গা নেই।

বেগম সাহেব কোন দিকে যাবেন?

নিউমার্কেটে চল।

আজ সোমবার নিউমার্কেট বন্ধ।

তোমাকে যেতে বলছি তুমি যাও। সোমবার নিউমার্কেট বন্ধ এটা তুমি জানো, আমি জানি না?

মিলি গেটের সামনে গাড়ি রেখে বন্ধ নিউমার্কেটে ঢুকল। কিন্তু মাস্তান ধরনের ছেলে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এদের দিকে তাকালেই বুকের মধ্যে ধুক করে শব্দ হয়। মিলি তবু তাকাল, সব ক'টি ছেলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। এর মধ্যে একটি প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা। নিউমার্কেট বন্ধ হলেও দু'টি ওষুধের দোকান খোলা। সে গট গট করে ঢুকল ওষুধের দোকানে চারটি প্যারাসিটামল ও দু'টি ঘুমের ট্যাবলেট 'ফোনোবরবিটন' কিনল। দু'টি কিনল যাতে দোকানীর মনে কোন সন্দেহ না হয়। দু'টি করে কিনে কিনে সে একটা ক্রিমের কৌটা ভর্তি করে ফেলেছে। কৌটাটির দিকে তাকালে তার ভয় লাগে। আবার ভালও লাগে।

বেগম সাহেব এখন কোনদিকে যাবেন?

নিউ পল্টন লাইন। গোরস্থানের পাশ দিয়ে যাও। ইরাকি গোরস্থান চেন? ঐ দিকে।

মিলির সমস্ত সিদ্ধান্তের মত এই সিদ্ধান্তও আকস্মিক। এখন সে যাচ্ছে রানুদের বাসায়। সে নিশ্চিত জানে রানুকে বাসায় পাওয়া যাবে না। আজ একটা খারাপ দিন। কাউকে আজ পাওয়া যাবে না। টেলিফোন করলে সেটা হবে রং নাম্বার। টিভির সামনে বসলে কারেন্ট চলে যাবে।

রানু ঘরেই ছিল। মিলিকে দেখে তার যতটা অবাক হবার কথা ততটা হল না। যেন মিলির এখানে আসাটা খুব স্বাভাবিক। সে রোজই আসে। কিন্তু তা তো নয়। মিলি বলল, ভাবী আমি আরো একদিন এসেছিলাম। তুমি ছিলে না।

জানি তোমার নোট পেয়েছিলাম।

আজ কিন্তু ভাবী বেশিক্ষণ থাকব না। পাঁচ মিনিট বসব।

এত তাড়া কিসের?

ওর এক মামাতো বোনের গাড়ি নিয়ে এসেছি, সাড়ে আটটার মধ্যে ফেরত দিতে হবে।

সাড়ে আটটা বাজতে দেরি আছে। তুমি আরাম করে বস। নতুন হেয়ার স্টাইল দেখছি।

কেমন লাগছে ভাবী?

রানু হাসি মুখে বলল— একটু ছেলে ছেলে লাগছে। মিলির মুখ কালো হয়ে গেল। তাকে ছেলে ছেলে লাগছে। এটা সে নিজেও লক্ষ্য করেছে। রানু বলল— মেয়েদের চেহারা একটু ছেলে ছেলে দেখালে খারাপ লাগে না। ছেলেদের যেমন মেয়ে মেয়ে চেহারাতে ভালই লাগে অনেকটা এ রকম। মিলির মুখের অন্ধকার কাটল না। সে করুণ মুখ করে বসে রইল। রানু বলল, শোবার ঘরে চল। আমার সংসার দেখ।

তার শোবার ঘরটি চমৎকার করে সাজানো! দু'টি খাট পাশাপাশি। একটিতে টগর ঘুমিয়ে আছে। ওর গায়ে পাতলা একটা চাদর।

ও এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছে কেন ভাবী?

টগরের শরীরটা ভাল না জ্বর।

মিলি উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে টগরের কপালে হাত রাখল, বেশ জ্বর তো ভাবী! হাত পুড়ে যাচ্ছে।

খুব বেশি না। একশ এক।

একশ এক, কম দেখলে? ভাইয়াকে খবর দিয়েছ?

না, ওকে খবর দেইনি। সামান্য ব্যাপার নিয়ে আমি হৈচৈ করি না। ঠাণ্ডা লেগেছে, গা গরম হয়েছে। সেরে যাবে। তুমি কিছু খাবে মিলি?

না।

এক কাপ চা খাবে?

আমি চা খাই না ভাবী। চা খেলে রাতে আমার ঘুম হয় না।

রানু সহজ স্বরে বলল— চায়ের সঙ্গে ঘুমের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার সাথে এক কাপ খাও কিছু হবে না। এসো রান্নাঘরে, মোড়া পেতে দিচ্ছি। রানু চায়ের কেতলি বসাল। মিলি তার পাশেই চুপচাপ বসে রইল। রানু বলল, গল্পটল্প কর। চুপচাপ বসে আছ কেন?

কী গল্প করব?

তোমরা যে গাড়ি কিনবে শুনেছিলাম তার কী হল?

জানি না কিছু। ও রিকন্ডিশন্ড গাড়ি কিনতে চায় ন। নতুন গাড়ি কেনার মত টাকাও বোধ হয় নেই।

বোধ হয় বলছ কেন? তুমি জানো না?

না। টাকাপয়সার ব্যাপারে আমি ওর সঙ্গে কথা বলি না। ও নিজেও বলে না।

নাও, দেখ চায়ে চিনি হয়েছি কী না।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে মিলি রানুকে দেখতে লাগল। স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে কিন্তু তাতে যেন তাকে আরো সুন্দর লাগছে। কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়া একটি বাচ্চা মেয়ের মত লাগছে। রানু বলল— তুমি কী কিছু বলতে চাও নাকি?

না, কী বলব?

মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে কী একটা বলতে গিয়েও বলছ না?

মিলি ইতস্তত করে বলল ভাইয়ার মত এমন একজন ভাল মানুষকে তোমার পছন্দ হল না কেন? এটা আমার খুব জানার ইচ্ছা। নাকি সে ভাল মানুষ না? রানু সহজভাবেই বলল, তোমার ভাই দূর থেকে খুব ভাল মানুষ। শুধু ভাল মানুষ না, খুবই ভাল মানুষ। কিন্তু কাছ থেকে না। তোমরা কেউ ওকে কাছ থেকে দেখনি।

আমার ভাই আর আমি কাছ থেকে দেখিনি?

রানু হালকা গলায় বলল— পাশাপাশি থাকলেই কাছ থেকে দেখা হয় না মিলি।

দুজনই বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। এক সময় রানু বলল— আটটা বেজে গেছে, তোমার না সাড়ে আটটায় গাড়ি ফেরত দিতে হবে?

মিলি উঠে দাঁড়াল। শোবার ঘরে গিয়ে টগরের মাথায় হাত রাখল। ঘাম দিচ্ছে। জ্বর কমে যাচ্ছে বোধ হয়। রানু তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেখতে এল। মিলির মনে হল আবহাওয়াটা কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। কেউ সহজ হতে পারছে না। মিলি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করবার জন্য জিজ্ঞেস করল - শাড়িটাতে আমাকে কেমন লাগছে ভাবী?

খুব একটা ভাল লাগছে না। সাদার ব্যাক গ্রাউন্ড হলুদ ফোঁটা গুটি বসন্তের মত দেখাচ্ছে। রাগ করলে না তো?

না রাগ করব কেন? তোমার কাছে যা সত্যি মনে হয়েছে তাই বলেছ। মিলি সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল। রানু বলল - খুব সাবধানে নামবে, সিঁড়িটা ভাল না। মিলি কোনো জবাব দিল না। তার চোখ ঝাপসা। অল্পতেই তার চোখে পানি আসে।

মিলিরা থাকে কলাবাগান, লেক সার্কাসে। নিজেদের বাড়ি নয়। ভাড়া বাড়ি। বাড়িটি কেনার কথা হচ্ছে। কথাবার্তা কোন পর্যায়ে আছে মিলি জানে না। মতিয়ুর এ সব ব্যাপারে তার সঙ্গে কখনো কোনো কথা বলে না। মিলির শ্বশুর একবার তাকে জিজ্ঞেস করলেন— বাড়ি কেনার কী হয়েছে। তখনি শুধু মিলি জানল বাড়ি কেনার একটা কথাবার্তা চলছে। একদিন সত্যি সত্যি কেনা হয়ে যাবে এবং তারও অনেক দিন পর হয়ত মিলি জানবে। কিংবা হয়ত জানবেই না।

মতিয়ুর বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর সঙ্গে খুব রোগা, চশমা পরা একজন লোক। সে ছেলেটির সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। মিলিকে গাড়ি থেকে নামতে দেখেও সে না দেখার ভান করল। এবং আগের মতই হেসে হেসে কথা বলতে লাগল। কিন্তু লোকটি তাকিয়ে আছে মিলির দিকে। বেশ ভদ্রভাবেই তাকিয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। মিলির কী উচিত কাছে এগিয়ে যাওয়া? না। মতিয়ুর পছন্দ করবে না, সে তার কোনো বন্ধুর সঙ্গে মিলিকে আলাপ করিয়ে দেয় না।

ওদের বাড়িতে বাইরের পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের কথা বলার রেওয়াজ নেই। মতিয়ুরের একটি বোন ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ফিজিক্সে অনার্স। সেও বোরকা পড়ে ক্লাসে যায়।

মিলি তার নিজের ঘরে ঢুকে গেল। ভাইয়াকে টেলিফোন করল কয়েকবার। রিং হচ্ছে, কিন্তু ধরছে না। তার মানে ভাইয়া ফেরেনি। এবং আকবরের মা টেলিফোন ধরছে না। মিলির রোখ চেপে গেল। কতক্ষণ সে না ধরে থাকবে?. রিং হতে থাকুক। পাঁচবার ছ'বার, সাতবার, আটবার ন'বার।

হ্যালো।

কে ভাইয়া?

টেলিফোন ধরছিলে না কেন?

এইমাত্র আসলাম।

ওদের টেলিফোন ধরতে নিষেধ করে গেছ কেন?

কী বলতে চাস সেটা বল। আমি গোসল করব।

ভাইয়া শোন, আমি ভাবীর বাসায় গিয়েছিলাম।

ভাল।

সুন্দর বাসা।

সুন্দর হলে তা ভালই।

টগরের জ্বর। খুব জ্বর।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। মিলি বলল - হ্যালো, ভাইয়া আমার কথা শুনছ?

শুনছি।

কিছু তো বলছ না।

কী বলব?

মিলি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল— তোমাকে একটা ছেলের কথা বলেছিলাম না, কালো মতো, ভাবীর সঙ্গে এক রিকশায় যাচ্ছিল?

হ্যাঁ বলেছিলি।

ঐ ছেলেটা ভাবীর বসার ঘরে বসেছিল।

তিনি একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন— ঐ ছেলেটার নাম আলম। ও এসেছিল আমার এখানে একটা বই নিতে। আমার সঙ্গেই ছিল এতক্ষণ। তুই ওকে দেখিসনি। শুধু শুধু কেন এত মিথ্যা বলিস?

মিলি কোনো কথা বলল না। ওসমান সাহেব শান্ত স্বরে বললেন রেখে দেই কেমন?

আচ্ছা।

আর কিছু বলবি?

না।

ওসমান সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

## ৪

ওসমান সাহেবের বাবা ফয়সল সাহেবের বয়স তিয়াত্তুর। এই বয়সেও তিনি বেশ শক্ত। রোজ ভোরে দু'মাইল হাঁটেন। বিকেলে ঘড়ি ধরে পনেরো মিনিট ফ্রি হ্যান্ড একসারসাইজ করেন। চোখের দৃষ্টি ঠিক আছে। কিছু দিন আগেও চশমা ছাড়া পড়তে পারতেন। এখন অবশ্যি প্লাস ওয়ান পাওয়ারের চশমা লাগে। লোকটি ছোটখাটো এবং রোগা-পাতলা। রোগা লোকেরা যেমন হয় দারুণ রগচটা। দু'মাস আগে তাঁর ছোটখাটো একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তার রাগারাগি না করার জন্যে কঠিন নিষেধ জারি করেছেন। বাড়ির লোকজনদেরও বলা হয়েছে যেন কিছুতেই তাঁকে রাগানো না হয়। যা বলেন তাই যেন সবাই মেনে চলে। সবাই করেছেও তাই। এতে ফয়সল সাহেব আরো রেগে যাচ্ছেন। আজও মিলিকে ঢুকতে দেখে তিনি রেগে গেলেন। রাগের যদিও কোনো কারণ ছিল না।

তিনি বসেছিলেন বারান্দায় ইজিচেয়ারে। নিচু একটা কফি টেবিলে পা তুলে দিয়েছেন। কোলের উপর খবরের কগজ। তিনি কাগজ পড়ছিলেন না। মিলিকে ঢুকতে দেখে কাগজের উপর চোখ রাখলেন। মিলি ক্ষীণস্বরে বলল, কেমন আছ বাবা?

ভালই আছি, খারাপ থাকব কেন?

না মানে শরীর ঠিক আছে তো?

ঠিক না থাকলে তুই কী করবি, ঠিক করে দিবি?

মিলি কী বলবে বুঝতে পারল না। বাবার সামনে একটি চেয়ার আছে। সেখানে কী বসবে খানিকক্ষণ? কিন্তু বাবা নিশ্চয়ই তা পছন্দ করবেন না। মিলি সংকুচিত হয়ে বসেই পড়ল। ভয়ে ভয়ে বলল, নানান ঝামেলায় থাকি আসাই হয় না।

আসতে বলি নাকি?

না বলবেন কেন? নিজে থেকেই তো আসা উচিত।

আমি সুখেই আছি। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। নিজেদের কথা ভাব। নিজেদের চরকায় তেল দে। আই থিং ইওর চরকা নিডস ওয়েলিং।

ফয়সল সাহেব ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন এবং অতিদ্রুত পা নাচাতে শুরু করলেন। এটা তাঁর একটা সিগন্যাল। যার মানে হচ্ছে আমি আর একটি কথারও জবাব দেব না, এখন বিদেয় হও। মিলি তুব আরেকবার চেষ্টা করল। বেশ উৎসাহের ভঙ্গি করে বলল, রানু ভাবীর বাসায় গিয়েছিলাম। ওরা ভালই আছে। তবে টগরের গা গরম।

ফয়সল সাহেব পত্রিকাটি চোখের আরও কাছে নিয়ে এলেন। যেন হঠাৎ দারুণ একটা খবর চোখে পড়েছে।

আপনি যদি রানু ভাবীকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলেন তাহলে মনে হয় সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি বুঝিয়ে বলব কেন? হু এম আই? এখানে আমার কথা আসছে কেন? যাদের ঝামেলা তারা মিটাবে।

ভাবী আপনাকে খুব রেসপেক্ট করে।

সে রেসপেক্ট করতে চাইলে করবে। তার মানে এই না...

ফয়সল সাহেব কথা শেষ করলেন না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। আগে দিনে এক প্যাকেট করে খেতেন। স্ট্রোক হবার পর পর ডাক্তার সিগারেট নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। ফয়সল সাহেব কারো কোনো কথা কানে নেন না কিন্তু এই কথাটি মেনে চলেন। সিগারেট খান না কিন্তু মুখে দিয়ে বসে থাকেন।

মিলি দেখল তার বাবা আগুন না ধরিয়ে সিগারেট টানছেন এবং নাকে ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গি করছেন। মিলি কিছু বলতে গিয়েও বলল না। তার খানিকটা ভয় ভয় করতে লাগল। ফয়সল সাহেব বললেন দেখা তো হয়েছে এখন চলে যা। নাকি আরো কিছু বলবি? মিলি ইতস্তত করে বলল মেয়ের একটা নাম দেন না বাবা। তিন অক্ষরেব। ম দিয়ে শুরু হবে।

তোর মেয়ের কী স্বাস্থ্য ভাল?

জি।

তাহলে নাম রাখ মুটকি। তিন অক্ষর ম দিয়ে শুরু। যা যা চেয়েছিলি সবই আছে।

ফয়সল সাহেব দুলে দুলে হাসতে লাগলেন। চোখে পানি এসে গেল মিলির। সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। এ বাড়িতে এসে তার নিজের ঘর না দেখে সে যেতে পারে না। দোতলায় তার ঘরটি তালা দেয়া। তালাচাবি তার কাছেই আছে। সে যখনি আসে তার ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ বসে থাকে। তার খুব কান্না পায়। আজও সে তার ঘরে ঢুকল। সব কিছু আগের মত আছে। একটি জিনিসও উলট পালট হয়নি। মিলি ছোট্ট খাটটাতে শুয়ে পড়ল। সে যেদিন তার ঘুমের ওষুধ খাবে - এই খাটে শুয়েই খাবে। মিলি বালিশ জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদল। তারপর হাত-মুখ ধুয়ে নিচে নেমে এল।

বাবা এখনো বারান্দায় বসে আছেন। তাঁর সামনে বসে আছে বীথি নামের ঐ কম বয়েসী মেয়েটি। বাবার সেক্রেটারি। তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনায়। ডিকটেশন নেয়। মিলি লক্ষ্য করল মেয়েটি বসে আছে খালি পায়ে। তার মানে কি এই যে সে এখন এ বাড়িতে থাকে? কেন থাকে?

বাবা যাই?

ফয়সল সাহেব জবাব দিলেন না। মাথা নাড়লেন। বীথি বলল তুমি কখন এসেছ। আমি জানি না তো? চা-টা খেয়েছ?

মেয়েটি এভাবে কথা বলছে যেন এ বাড়ির একজন অতিথি আপ্যায়ন করছে। সবচে মজার ব্যাপার হচ্ছে তাকে তুমি তুমি করে বলছে। তাকে সে তুমি করে কেন বলবে? মিলি ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনি ভাল আছেন?

হ্যাঁ আমি ভাল। সারের শরীর ভাল না। দেখা-শোনারও লোকজন নেই। আমি তাই কিছুদিন ধরে এ বাড়িতেই থাকি। তুমি জানো বোধ হয়।

না আমি জানতাম না। এখন জানলাম। আচ্ছা যাই।

ফয়সল সাহেব মাথা এলিয়ে চোখ বন্ধ করছেন। ঘুমিয়ে পড়েছেন বোধ হয়। এই বয়সে লোকজন আচমকা ঘুমিয়ে পড়ে। বীথি বলল, তুমি আসবে ঘন ঘন। খোঁজ-খবর নেবে।

মিলি বলল, আপনি আমাকে তুমি তুমি করে বলছেন কেন?

ফয়সল সাহেব চোখ মেললেন। মিলি ভাবল বাবার কাছ থেকে সে প্রচণ্ড একটা ধমক খাবে। কিন্তু ফয়সল সাহেব কিছু বললেন না। আবার চোখ বন্ধ করে ফেললেন। খুব দ্রুত তাঁর পা দুলতে লাগল।

## ৫

শেষ রাতের দিকে ওসমান সাহেব একটা দুঃস্বপ্ন দেখলেন, যেন ক্লাস নিতে গিয়েছেন। তিনি পড়াবেন আর্যদের আগমনের ইতিহাস। কিন্তু ক্লাসে ঢুকেই টের পেলেন তাঁকে পড়াতে হবে জ্যামিতি। দুটি ত্রিভুজকে সর্বসম প্রমাণ করতে হবে। ত্রিভুজ দুটির দুই বাহু ও অন্তঃস্থ কোণ সমান ম্যাট্রিকে পড়ে এসেছেন তবু বোর্ডের সামনে দাঁড়ানোমাত্র সব গুলিয়ে গেল। তিনি হকচকিয়ে তাকালেন ছাত্রদের দিকে। সবাই হাসছে। মেয়েগুলি হেসে একজন অন্যজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। এতো হাসির কী আছে? তিনি বিড়বিড় করে বললেন, এই হাসছ কেন? তারা আরো জোরে হেসে উঠল। তিনি কপালের ঘাম মুছবার জন্যে পকেটে হাত দিতে গিয়ে টের পেলেন তার গায়ে কোন কাপড় নেই। কী ভয়াবহ ব্যাপার। ওসমান সাহেব গোঙানির মত শব্দ করতে কবতে জেগে উঠলেন। তাঁর সারা গা ঘামে জড়িয়ে গেছে। তিনি ক্ষীণ স্বরে ডাকলেন রানু রানু। তিনি জানেন রানু এখানে নেই। তবুও প্রতিদিনই আধো-ঘুম আধো-জাগরণে মনে হয় সে পাশেই আছে, ডাকলেই সাড়া দেবে।

তিনি ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে। হাতের কাছে কাচেব জগ কিন্তু পানি নেই। তিনি উঠে গিয়ে বাতি জ্বালালেন। গায়ে মুখে পানি ঢাললেন। রাত শেষ হয়ে এসেছে চারটা দশ বাজে। আবার ঘুমুতে যাবার কোন মানে হয না। চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। বানাবে কে? বিয়ের পর পর ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা বানিয়ে রাখত রানু। কোন ভাবে যদি লেখক স্বামীকে সাহায্য করা যায়। ডিকশনারি দেখে বানান ঠিক করা। লেখা কফি করে দেয়া। কত উৎসাহ। জীবনটাই অন্য রকম ছিল।

বিয়েব পরপর একবার এ রকম ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। ভয়ে অস্থিব হয়ে ডাকলেন – রানু রানু। রানু হকচকিয়ে গেল। ভয় পাওয়া গলায বলল, কী হয়েছে?

ভয় পেয়েছি। দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম একটা পাগল আমাকে তাড়া কবেছে।

বলতে বলতে তিনি শিউরে উঠলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। রানু অবাক হয়ে বলল এত ভয় পাওয়ার মত কি দেখলে, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর স্বপ্ন তো আমি রোজই দেখি। ওসমান সাহেব নিচু গলায় বললেন না এ রকম তুমি দেখ না। এটা একটা ভয়ানক স্বপ্ন' তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। সম্পূর্ণ অন্য রকম ব্যাপার।

রানু তার হাত ধরে অনেক্ষণ পাশে বসে রইল। তারপর চা বানিযে আনল।

ওসমান সাহেব শিশুর মত তাকে জড়িয়ে ধরে বাকি রাতটা জেগে কাটালেন। বানু নিজেও ঘুমাল না। একজন বয়স্ক মানুষ সামান্য একটা স্বপ্ন দেখে এতটা ভয় পেতে পাবে তা তার ধারণার বাইরে ছিল। সে নিচু স্বরে বলল তুমি কী প্রায়ই এ রকম দুঃস্বপ্ন দেখ?

প্রায়ই না মাঝে মাঝে দেখি।

সব সময় এ রকম ভয় পাও?

হ্যাঁ।

বেশ কিছু সময় চুপচাপ থেকে রানু বলল, তোমার এক গল্পের নায়ক এ রকম দুঃস্বপ্ন দেখত। ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। রানু বলল বেচারা অবশ্যি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়।

তিনি রাগি গলায় বললেন ওর পাগল হওয়ার অন্য কারণ ছিল।

রাগ করছ কেন?

রাগ করছি না। লেখার সঙ্গে সবাই লেখককে মিশিয়ে ফেলে। এটা ঠিক না। লেখা এবং লেখক এক নয়।

আহ্ আমি ঠাট্টা করছিলাম।

ওসমান সাহেব থমথমে গলায় বললেন এই ব্যাপারটা নিয়ে ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

তুমি এত রেগে যাচ্ছ কেন? রাগ করার মত কিছু তো আমি বলিনি। দাও মাথায় হাত বুলিয়ে

দিচ্ছি—নাকি অন্য কিছু চাই?

ওসমান সাহেব জবাব দেননি। পাশ ফেরে ঘুমুতে চেষ্টা করেছেন। ঘুম আসেনি। দুঃস্বপ্ন দেখার পর সাধারণত তাঁর ঘুম হয় না। আজও হবে না। অবশ্যি আর রাতও খুব বাকি নেই। আকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। কাক ডাকতে শুরু করবে। লেখক হয়েও অলেখক সুলভ চিন্তা করলেন। কাক ডাকতে শুরু করবে না বলে উচিত ছিল পাখি ডাকতে শুরু করবে।

তিনি চটি পায়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর গল্পের নায়কের সঙ্গে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সেও দুঃস্বপ্ন দেখার পর বাকি রাতটা ঘুমুতে পারত না। বারান্দায় এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত হাঁটাহাঁটি করত। সূর্য ওঠার পর ঘুমুতে যেত। একজন নিঃসঙ্গ মানুষের গল্প। শেষ পর্যায়ে সে স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবকে গুলিয়ে ফেলে। চমৎকার একটি গল্প। শুধু চমৎকার নয় একটি অসাধারণ গল্প। আশ্চর্যের ব্যাপার, সমালোচকরা এই গল্পটিকে গুরুত্ব দেননি। কেন দেননি? ওসমান সাহেব ঠিক করে ফেললেন আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো এই গল্পটি পড়বেন। স্বপ্ন দৃশ্যে বর্ণনাগুলি ভাল করে দেখা দরকার। এই গল্পে অতিপ্রকৃত আবহ তৈরির জন্যে প্রচুর তৎসম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে কী গল্পের গাঁথুনি আলগা হয়ে গেছে?

সাদামাটা একটা সূর্য উঠল। ভোর হওয়া নিয়ে কবি সাহিত্যিকরা এত হৈচৈ করে কী জন্যে কে জানে? সূর্য ওঠার মধ্যে রহস্যময় কিছু নেই। জ্যোৎস্নায় কিছু রহস্য আছে। কাজেই চাঁদ নিয়ে কিছুটা মাতামাতি করা যেতে পারে। সূর্য নিয়ে নয়।

আকবরের মা উঠে পড়েছে। গ্যাসের চুলায় আগুন জ্বলছে চায়ের কেতলি বসানো হয়েছে। ভোর বেলার এই আয়োজনটি চমৎকার। দেখলেই মন ভাল হয়ে উঠতে শুরু করে।

আজ আমি লেখা নিয়ে বসব।

জি আইচ্ছা।

যেই আসুক বলবে আমি বাসায় নেই। কখন ফিরব তার ঠিক নেই। টেলিফোনেও একই কথা বলবে।

জি আইচ্ছা। ফেলাস্কে চা বানাইয়া দিমু?

না, চা-টা লাগবে না।

অনেক দিন পর লেখার টেবিলের কাছে এসেছেন। সাদা খাতা খোলা দেখলেই কিছু একটা লিখতে ইচ্ছা করে। 'অরণ্য এগিয়ে আসছে' এই গল্পটি লিখে ফেললে কেমন হয়?

'অরণ্য এগিয়ে আসছে। ছোট শহরের সবাই বুঝতে পারছে পালানোর পথ নেই।' প্রথম কযেক পৃষ্ঠায় এই বর্ণনাটিই থাকবে। কিন্তু লেখাটা আসছে না।

টেবিলে এক পাশে মিমির প্যাকেট। লাল লাল পিঁপড়া প্যাকেটটি ছেঁকে ধরেছে। টগরকে দেয়া হয়নি। কেন দেয়া হয়নি? হাতেই তো ছিল। তবু শেষ মুহূর্তে দেয়া হল না কেন? তিনি কী টগরকে ভালবাসেন না? কিন্তু তা কি করে হয়!

ওসমান সাহেব মিমির প্যাকেটটি তাঁর লেখার কাগজের উপর এনে রাখলেন। পিঁপড়াদের মধ্যে একটি সাড়া পড়ে গেল। হঠাৎ বস্তুর অবস্থানগত পরিবর্তন কেন হল তারা বুঝতে পারছে না। ছোটাছুটি করছে পাগলের মত। ওসমান সাহেব মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন।

রানুর ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

অভ্যাস মত টগরের গায়ে হাত রাখল। গা গরম। টেম্পারেচার কত হবে? রাত দুটোর দিকে একবার টেম্পারেচার নেয়া হয়েছিল, নিরানব্বই। এখন বোধ হয় তার চেয়েও বেশি। রানু টগরকে নিজের কাছে নিয়ে এল। গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে উত্তাপ যদি কিছু কমিয়ে দেয়া যায়। এত ভুগে কেন সে? দু'দিন পর পর অসুখ। হাম থেকে উঠবার পরই এক নাগাড়ে সাতদিন সর্দিজ্বর। সেই জ্বর সারল, সঙ্গে সঙ্গে হল আমাশা। একটা কিছু লেগেই আছে। শরীর শুকিয়ে কাঠির মত হয়েছে- শুধু মুখটা শুকায়নি। বড়সড় একটি মুখে দুটি বিশাল চোখ। ওর বাবার চোখ পেয়েছে। শুধু চোখ নয় বাবার স্বভাব-চরিত্রও বোধ হয় কিছু পেয়েছে। কোনো ব্যাপারেই কোনো অভিযোগ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক জায়গায় বসে থাকতে পারে।

টগর ঘুমের মধ্যেই নড়ে উঠল। রানু ডাকল এই টগর!

সে তার ছোট হাত দুটি দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। কেমন তাকাচ্ছে পিট পিট করে।

টগর, এই পাজী।

কী।

টগর মাথা নাড়ল। তার খারাপ লাগছে। কিন্তু মুখ হাসি হাসি। বলল দুধ খাবি?

বোতলে করে খাব।

এত বড় ছেলে বোতলে করে খাবি কি? মালটোভা দিয়ে বানিয়ে দেব। এক চুমুকে খেয়ে ফেলবি, ঠিক আছে?

টগর ঘাড় কাত করল, সে গ্লাসে করে দুধ খেতে রাজি আছে।

বেশি করে চিনি দিও।

দেব।

দুধ বানিযে এনে রানু দেখল টগর বালিশটা দু'পায়ের ফাঁকে নিয়ে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, জ্বর কি কমে আসছে? রানু অনেক্ষণ ছেলের পাশে বসে রইল।

রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। অপলা জেগেছে নিশ্চয়ই। সেও খুব ভোরে ওঠে। হাত-মুখ ধুয়ে পড়তে বসে। মেডিকেলে টেস্ট দেবে। এ্যালাউ হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। রোজ ঘুমুতে যায় দেড়টা-দুটোর দিকে। রানু রান্নাঘরে এসে দেখল অপলা চায়ের কেতলি বসিয়েছে। সে হাসি মুখে বলল - তুমি আজ এত ভোরে উঠলে যে? ব্যাপাব কী?

ব্যাপার কিছু না।

টগরের জ্বর আছে এখনো?

কম, গা ঘামছে।

রাতে বেশ কয়েকবার কাঁদল। তখনি বুঝেছি শরীর খারাপ। ওকে আজ একবাব ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।

রাতে কেঁদেছে নাকি?

হ্যাঁ, তুমি টের পাওনি?

না।

রানুর কিছুটা মন খারাপ হল। টগর, কেঁদেছে সে টেবও পায়নি। ও অবশ্যি কেঁদে-কেটে পাড়া মাথায় করবে না। নিজে নিজেই শান্ত হয়ে ঘুমুতে চেষ্টা করবে।

আপা চা খাবে?

খালি পেটে চা খাই না।

খালিপেটে হবে কেন। নোনতা বিস্কুট আছে, দেব?

দে।

অপলা চা ঢালতে ঢালতে বলল, তুমি চিন্তিত কেন? রাতে ভাল ঘুম হয়নি?

হয়েছে।

তাহলে? মুখ এমন শুকনো কেন?

টগরের আবার জ্বর আসল— এই জন্যই খারাপ লাগছে।

আপা তুমি একটা কাজ কর দুলাভাইকে খবর দাও। সে কয়েকদিন ঘন ঘন আসুক। ছেলেকে নিয়ে ছোটছুটি করুক, দেখবে জ্বর কমে যাবে।

রানু গম্ভীর হয়ে গেল। অপলা বলল কথা বলছ না কেন আপা? চুপ করে আছ কেন?

তুই সব সময় দুলাভাই দুলাভাই বলিস। সব জেনে-শুনেও কেন বলিস?

তাহলে কী বলব? টগরের বাবা? না ওসমান সাহেব?

রানু কিছু বলল না। নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। অপলা বলল ঠিক আছে আর বলব না। কিন্তু তুমি তাকে আসতে বল। এক মাস ধরে আসছেন না।

আসতে না চাইলে আসবে না। ধরে নিয়ে আসতে হবে?

ঠিক তা-ও না আপা। তুমিই আসতে নিষেধ করেছ।

নিষেধ করিনি। বলেছি, এত ঘন ঘন যেন না আসে। আমি জীবনটাকে বদলাতে চেষ্টা করছি। তুই কেন বুঝতে চেষ্টা করছিস না?

তোমার ধারণা উনি ঘন ঘন এলে জীবন বদলানো যাবে না?

এ নিয়ে তোর সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

রানু উঠে পড়ল। টগরের ঘুম ভেঙেছে। সে গম্ভীর মুখে রওনা হয়েছে বাথরুমের দিকে।

বয়সের তুলনায় সে কি একটু বেশি গম্ভীর? রানু ডাকল দেখি টগর এদিকে আয় তো, জ্বর আছে কি না দেখি। টগর গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এল।

এই তো জ্বর নেই। গুড বয়। যাও দাঁত মেজে আস। নিজে নিজে মাজতে পারবে না?

পারব।

ভেরি গুড।

রানু শুনল— টগর, অপলার সঙ্গে কথা বলছে। ওর সঙ্গে তার বেশ ভাব। কথাবার্তা হচ্ছে বন্ধুর মত।

কেমন আছিস রে টগর?

ভাল।

তোর মার মত মুখটা এমন অন্ধকার করে আছিস কেন? কেমন করে হাসতে হয় মনে আছে?

আছে।

তাহলে বিরাট বড় একটা হাসি দে তো দেখি। বাহ্ বাহ চমৎকার। দেখি তোর নড়বগে দাঁতটার কী অবস্থা। কাছে আয়।

না।

না কেন?

তুমি ফেলে দেবে।

ফেলব না, হাত দিয়ে দেখব নড়ছে কি না। আয় কাছে আয়।

রানু টগরের ছোট্ট একটি চীৎকার শুনল। তারপর আবার চুপ। অপলা বলছে— এইত ফেলে দিলাম, ব্যথা পেয়েছিস?

না।

তাহলে কাঁদছিস কেন? ব্যাটাছেলেদের এত কাঁদতে নেই, কাঁদবে মেয়েরা। তুই কী মেয়ে?

না।

যা, হাত-মুখ ধুয়ে আয়।

বাথরুমের কল দিয়ে পানি পড়ছে। টগর হাত-মুখ ধুচ্ছে নিশ্চয়ই। রানু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল দাঁত পড়ার মত একটা বড় ঘটনা সে তার মাকে বলতে এল না। যেন এটা বলার মত কিছু নয়। নাশতার টেবিলে খুব সহজভাবেই রানু জিজ্ঞেস করে— তোমার দাঁত পড়ে গেছে নাকি?

হ্যাঁ।

কই আমাকে তো কিছু বলনি। দেখি এখন তোমাকে কেমন দেখাচ্ছে। বাহ্ সুন্দর লাগছে তো।

টগর ছোট্ট করে হাসল। রানু বলল আজ আমি বাইরে যাব। তুমি অপলার সঙ্গে থাকতে পারবে না?

পারব।

বিকেলে তোমার বাবা আসবেন তোমাকে দেখতে।

আজ কী বুধবার?

রানুর বুকে ছোট একটা ধাক্কা লাগল। টগর কী মনে মনে তার বাবার জন্যে অপেক্ষা করে? নয় তো বুধবার তার মনে থাকার কথা নয়।

হ্যাঁ, আজ বুধবার। নাও এই রুটিটা খাও।

আদ্দেকটা খাই?

ঠিক আছে খাও।

বাবা যখন আসবে তুমি তখন থাকবে না?

থাকব। আমি পাঁচটার মধ্যে আসব।

রানু খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বলল— তুমি কী তোমার বাবার সঙ্গে ঐ বাড়িতে দু'একদিন থাকতে চাও?

টগর ঘাড় কাত করল। সে থাকতে চায়।

আমার জন্যে তোমার খারাপ লাগবে না?

টগর কিছু বলল না।

রাতে ঘুম ভাঙলেই কাঁদবে আম্মা কোথায়? আম্মা কোথায়? কাঁদবে না?

হ্যাঁ কাঁদব।

তাহলে যাবে কেন?

টগর জবাব দিল না! মায়ের দিকে সরাসরি তাকালও না।

রানু অনেকক্ষণ বসে থাকার পর তার ডাক পড়ল। সিদ্দিক সাহেব নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেলেন। সহজ স্বরে বললেন -একটা বোর্ড মিটিং ছিল। তাই দেরি হল কিছু মনে করবেন না। আপনাকে চা-টা দিয়েছে তো?

হ্যাঁ দিয়েছে।

বসুন এখানে। আরাম করে বসুন।

এই ঘরটি এয়ারকন্ডিশন্ড। হুম হুম একটা শব্দ হচ্ছে যন্ত্রটা হয়ত ভাল না। কিন্তু ঘর খুব সুন্দর করে সাজানো। অফিস মনে হয় না। মনে হয় অফিস নয় কারো ড্রয়িং রুম।

বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবিল। কিন্তু কোনো কাগজ বা ফাইলপত্র নেই। টেবিলের মাঝখানে ধবধবে সাদা একটা ফুলদানি ভর্তি ফুল। ঘরের এক কোণায় ছোট্ট একটা আলনা, সেখানে টাওয়েল ঝুলছে। অফিস ঘরে আলনা কেন কে জানে।

আপনি কেমন আছেন বলুন।

আমি ভালই আছি।

চা কফি কোনটাই খাব না।

সিদ্দিক সাহেব সিগারেট ধরিয়ে চিন্তিত মুখে টানতে লাগলেন। এখানে সম্ভবত কিছু হবে না। রানুর ধারণা ছিল হবে। গত সপ্তাহের কথাবার্তা এরকমই ছিল। সিদ্দিক সাহেব হাসিমুখে বলেছিলেন— পোস্ট না থাকলেও অনেক সময় পোস্ট তৈরি করা হয়। আপনি আগে মন ঠিক করুন। রানু বলেছিল  আমার মন ঠিক করাই আছে।

বেশ তাহলে আগামী সপ্তাহে আসুন। দশটার আগে আসতে পারবেন?

পারব।

সেদিন সিদ্দিক সাহেবের যে হাসি-খুশি ভাব ছিল আজ তা নেই। গম্ভীর মুখে সিগারেট টানছেন। যেন কোনো একটি অস্বস্তিকর কথা বলতে দ্বিধা করছেন।

সিদ্দিক সাহেব একটি মুখবন্ধ খাম এগিয়ে দিলেন। গম্ভীর গলায় বললেন  এখানে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আছে। শর্তগুলি আপনার যদি পছন্দ হয়, তাহলে আপনি আগামী মাসের এক তারিখ থেকে জয়েন করতে পারেন।

কী পোস্ট, কী কাজ কিছুই তো বললেন না।

এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারে সব বলা আছে। তিন মাস আপনি থাকবেন ট্রেইনি হিসাবে। বিভিন্ন সেকশনে যাবেন এবং কাজ শিখবেন। তিন মাস পর আমরা যদি মনে করি আপনার ট্রেনিং ভাল হয়নি তাহলে  সেটি এক্সটেন্ড করে ছ'মাস করা হবে। ট্রেনিং পিরিয়ড আপনার ভাতা হবে মূল বেতনের অর্ধেক। অন্য কোন ফেসিলিটিও থাকবে না।

খামটা এখানে খোলা উচিত হবে কি না রানু বুঝতে পারছে না। সিদ্দিক সাহেব বললেন আপনি কী কিছু বলবেন?

জি না। থ্যাংক ইউ।

এখন নিশ্চিয়ই বাড়ি যাবেন?

জি।

একটু বসুন।

রানু বসে রইল। সিদ্দিক সাহেব বেল টিপে বেয়ারাকে ডেকে বললেন  ড্রাইভার সাহেবকে বল ইনাকে বাসায় পৌঁছে দিতে।

জুনিয়র অফিসার্স গ্রেড। বেতন সব মিলিয়ে দু'হাজার টাকার মত। এই চাকরি নেয়াটা কী ঠিক হবে? ড্রাইভার বলল,

আপা কোন দিকে যাব?

আমি যাব নিউ পল্টন। নিউমার্কেটে নামিয়ে দিলেই হবে। কিছু কেনাকাটা করব।

রানু কথাটা বলেই একটু অস্বস্তি বোধ করল। নিউমার্কেটে কেনাকাটা করব এটা বলার দরকার ছিল না। সাফাই গাইবার কোনো ব্যাপার নয়।

ওসমান সাহেব রানুর বসার ঘরে একা একা বসেছিলেন। রানুকে ঢুকতে দেখে তিনি তাকালেন। রানুর হাতে এক গাদা জিনিসপত্র। দু'হাতে সেগুলি ঠিক সামলানোও যাচ্ছিল না। ওসমান সাহেব সহজ স্বরে বললেন, অনেক কিছু কিনলে দেখি। রানু কিছু বলল না। জিনিসপত্র নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল।

অপলা টগরের পাশে শুকনো মুখে বসে আছে। সে রানুকে দেখেই বলল—ওর তো বেশ জ্বর আপা। একশ দুইয়ের উপরে। তিন-চারবার বমি করেছে। রানু বলল— ও কখন এসেছে?

বেশিক্ষণ হয়নি। দশ-পনেরো মিনিট। আমি বলেছিলাম ভেতরে এসে বসতে। উনি আসেননি।

রানু টগরের কপালে হাত দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে জ্বর দেখল। শুকনো মুখে বলল— থার্মোমিটারটা আবার দে তো দেখি।

অপলা বলল, চল ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই। দুলাভাই আছেন তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

তাকে সঙ্গে করে নিতে হবে কেন?

অপলা চুপ করে গেল। থার্মোমিটার দেখল রানু বলল -কত?

একশ এক। একটু কমেছে। জ্বর ছেড়ে যাবে বোধ হয়। ঘাম হচ্ছে।

রানু কিছু বলল না। অপলা বলল— তুমি বাইরের ঘরে গিয়ে বস। অনেকক্ষণ উনি একা বসে আছেন।

রানু মনে হল শুনতেই পেল না।

অপলা বলল— তুমি চা খাবে, চা দেব? পানি গরম আছে।

না, চা-টা কিছু খাব না।

রানু বসার ঘরে ঢুকল। ওসমান সাহেব বললেন, জ্বর কী খুব বেশি? বেশি হলে একজন ডাক্তার নিয়ে আসি। কাছেই আমার একজন চেনা ডাক্তার আছেন।

ডাক্তার আনতে হবে না। আমি নিয়ে যাব।

জ্বর কবে থেকে?

দু-তিন দিন থেকে।

আমাকে তো খবর দাওনি।

খবর দেওয়ার মত কিছু হয়নি। তাছাড়া আমার খবর দেবার লোক নেই তুমি ভাল করেই জান।

তোমার খালার বাসায় টেলিফোন নাই?

আছে। তাঁদের টেলিফোন আমি আমার নিজের কাজের জন্য ব্যবহার করব কেন?

ওসমান সাহেব বিস্মিত হয়ে বলল -- তোমার খালার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভাল না নাকি?

সম্পর্ক খারাপ হবে কেন?

অপলা চা নিয়ে ঢুকল, লজ্জিত মুখে বলল, চা ছাড়া আর কিছুই নেই। শুধু চা দিলাম।

আর কিছু লাগবে না।

রানু বলল -- অপলা তুই ঘরে যা আমি একটু কথা বলছি। অপলা বিব্রত ভঙ্গিতে ঘরে গেল। ওসমান সাহেব তাকালেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রানু বলল আমি একটি চাকরি পেয়েছি। কাজেই তুমি মাসে যে টাকাটা দিতে সেটা আর দিতে হবে না।

চাকরিটা কী?

সেটা দিয়ে তোমার তো কোন দরকার নেই। তোমার স্ত্রী হিসাবে আমি যদি নিচু ধরনের কাজ করতাম তাহলে হয়ত তোমার অহংকারে লাগত। এখন তো অহংকারে লাগার কোনো প্রশ্ন নেই।

তুমি ভুল করছ রানু আমি অহংকারী না।

বাজে কথা বলবে না।

তিনি চুপ করে গেলেন। রানু থমথমে গলায় বলল, কেন তুমি আমাকে তোমার বাবার কাছে এ রকম একটা কায়দা করে পাঠালে?

কী কায়দা?

মিলি এসে বলল উনি খুব অসুস্থ। মৃত্যুশয্যায়। আমাকে এবং টগরকে দেখতে চান। আমি ঠিক সেই দিনই গেলাম দেখা করতে। গিয়ে দেখি দিব্যি সুস্থ মানুষ। বাগানে ফুলগাছ লাগাচ্ছেন।

আমার সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলতে লাগলেন যেন আমাকে চেনেন না এই প্রথম দেখলেন। টগর ফুল গাছে হাত দিয়েছিল বলে ধমক দিলেন। বিশ্রী গলায় ধমক।

উনি বুড়ো মানুষ। তুমি নিজেও জানো তার মাথা পুরোপুরি ঠিক না। তা ছাড়া যা ঘটেছে আমাকে বাদ দিয়েই ঘটেছে। মিলি প্রচুর মিথ্যা কথা বলে । তুমি তো মিলির স্বভাবও জানো। জানো না?

না আমি তোমাদের কারোরই স্বভাব জানি না। তোমার নিজের স্বভাব বুঝতে আমার ছ'বছর লেগেছে।

বুঝতে পারলে কিছু?

হ্যাঁ, তোমারটা বুঝেছি।

ভাল। বুঝতে পারাই উচিত। তুমি বুদ্ধিমতি মেয়ে।

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন আজ যাই। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল খুব তাড়া মনে হয়, কোথায় যাচ্ছ, মনিকার কাছে?

হ্যাঁ, ওর কাছে যাব একবার।

সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হবে? আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু কী? সতীনাথ ভাদুড়ি না মানিক বাবু?

তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আজ তুমি নানা কারণে উত্তেজিত। কাজেই বেশিক্ষণ থাকতে চাই না।

মনিকা কখনো উত্তেজিত হয় না, তাই না?

হবে না কেন, সেও হয়। আমরা সবাই নানা কারণে উত্তেজিত হই।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন রানু তার সঙ্গে সিঁড়ি পর্যন্ত এসেছে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, টগরকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও। রানু তার জবাব দিল না।

টগরের ঘুম ভাঙল ছ'টার দিকে। ভাল মানুষের মত কাপে করে মালটোভা খেল। তার কিছুক্ষণ পরই ঘর ভাসিয়ে বমি করল। অপলা বলল খারাপ লাগছে নাকি টগর?

না।

চল আমরা ডাক্তারের কাছে যাব। আয় শার্টটা বদলে দেই। তার আগে চল মুখ ধুইয়ে দি।

টগর বাধ্য ছেলের মত অপলার সঙ্গে সঙ্গে গেল। বাথরুমে ঢুকেই গলার স্বর নিচু করে বলল, আজ কী বুধবার খালামণি?

হ্যাঁ। কেন?

টগর আর কোন কথা না বলে হঠাৎ ব্যস্ত হযে আয়নায় তার দাঁত দেখতে লাগল। উপরের পাটির একটি দাঁত নেই। কেমন অচেনা দেখাচ্ছে তাকে। অপলা বলল, দাঁত তোলার সময় ব্যথা লেগেছিল? টগর তার জবাব না দিয়ে দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল আজ কি বার খালামণি? বুধবার?

মনিকার ওখানে যাবার কোন ইচ্ছা ওসমান সাহেবের ছিল না। তবু ওদিকেই রওনা হলেন। ঘরে ফিরে কিছু করবার নেই। ফিরতেও ইচ্ছা করছে না।

মনিকাদের বাড়ির সামনে নবীর লাল গাড়িটি দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় যেন পড়েছিলেন অন্ধকার বস্তুর কোন রঙ থাকে না। সব হয়ে যায় ধূসর বর্ণ। কিন্তু তিনি অন্ধকারেও গাড়ির লাল রঙ দেখতে পেলেন। কিংবা হয়ত এই গাঢ় লাল রঙ তাঁর স্মৃতিতে ছিল। এখন যা দেখছেন তার কিছুটা আসছে স্মৃতি থেকে, কিছুটা সত্যি সত্যি দেখছেন।

গাড়ি গেটের বাইরে কেন? ওসমান সাহেব একধরনের অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। চিত্রটি ঠিক মিলছে না। নবী তার গাড়ি গেটের বাইরে রেখে মনিকার সঙ্গে দেখা করতে আসবে না। এই জিনিস ওর চরিত্রে নেই। বুড়ো দারোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে বিনীত ভঙ্গিতে সালাম করল। ওসমান সাহেব বললেন, রহমত ভাল আছ? রহমতের মাথা অনেকখানি নিচু হয়ে গেল।

মেম সাহেব আছেন?

জি আছেন।

তোমার শরীর এখন সেরেছে তো?

জি স্যার।

ব্যথা হয় না আর?

আগের মত হয় না।

রহমত তাঁর সঙ্গে হেঁটে বাড়ির সিঁড়ি পর্যন্ত এল। এই লোকটিও তাঁকে খুবই পছন্দ করে। কেন করে কে জানে। ওসমান সাহেব এসব ছোটখাটো ব্যাপার লক্ষ্য করেন। আজও লক্ষ্য করলেন রহমত এগিয়ে গিয়ে অসহিষ্ণুভাবে পর পর তিন বার কলিং বেল টিপল। তিনি ভাল জানেন ফেরার সময়ও সে হেঁটে হেঁটে তাঁর সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত যাবে। কথাবার্তা বিশেষ কিছু বলবে না।

মানুষের ভালবাসা কখনো নিঃস্বার্থ নয়। রহমতের ভালবাসা কী নিঃস্বার্থ? তিনি কখনো এ ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে ভাবেননি। ভাবতে হবে।

মনিকা দরজা খুলে ছোট করে হাসল। যেন সে তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। মনিকার গায়ে হালকা নীল রঙের সুতির শাড়ি। গলায় লাল একটা মাফলার। আবার ঠাণ্ডা লেগেছে বোধ হয়। মনিকার ঘন ঘন ঠাণ্ডা লাগে।

ভাল আছ মনিকা?

ভালই ছিলাম। ঘণ্টাখানেক আগে থেকে আর ভাল নেই। নবী এসেছে বড্ড পাগলামী করছে।

তিনি কিছুই বললেন না। মনিকা বলল আজ আমি ওকে স্ট্রেইট বলেছি আমার বাড়িতে আর আসবে না।

সে তো আগেও বলেছ।

আজ যেভাবে বলেছি সেভাবে আগে কখনো বলিনি। আজ সত্যি সত্যি বিরক্ত হয়েছি।

ওসমান সাহেব বসার ঘরে কাউকে দেখলেন না। একবার ভাবলেন জিজ্ঞেস করবেন নবী কোথায়? তাও করলেন না। মনিকা গম্ভীর গলায় বলল তুমি খানিকক্ষণ একা একা বস। আমি চুল বেঁধে আসি।

তিনি প্রায় দু'মাস পর এলেন। মনিকা একবারও জিজ্ঞেস করল না, এতদিন আসা হয়নি কেন? মনিকার কিছু বিচিত্র ব্যাপার আছে।

এই বসার ঘরটিতে ওসমান সাহেব ঠিক সহজ বোধ করেন না। সব কিছু বড় বেশি গোছানো। কার্পেটের রঙ টকটকে লাল। এই রঙ রক্তের কথা মনে করিয়ে দেয়। রক্তের ওপর পা রাখতে তাঁর ভাল লাগে না।

ওসমান সাহেব সিগারেট ধরাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই কাজের মেয়েটি ট্রেতে করে এক গ্লাস পানি রেখে গেল। রুপোর গ্লাস। খুবই ঠাণ্ডা পানি। গ্লাসের চারদিকে বিন্দু বিন্দু পানি জমেছে যা দেখা মাত্র তৃষ্ণা পায়। ওসমান সাহেব তৃষ্ণার্তের মত পানি খেলেন। কাজের মেয়েটি বলল, আর এক গ্লাস পানি আনি?

না, আর লাগবে না।

চা আনব?

না, চা আনতে হবে না।

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন মেয়েটি হাসি চাপতে চেষ্টা করছে। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মেয়েটির মুখে হাসি দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল। শঙ্কার ছাপ পড়ল। সে গ্লাস নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল।

প্রথম যেদিন এ বাড়িতে এসেছিলেন সেদিন ওসমান সাহেব সোফায় বসে পানি খেতে চেয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বারেও তাই। এরপর থেকে আর চাইতে হয় না। পানি আসে। তিনি ঘড়ি দেখলেন সাড়ে ন'টা। আর মনে হচ্ছিল রাত অনেক। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। কোন কোন বাড়িতে পা দেয়া মাত্র মনে হয় ঘড়ির কাঁটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

মনিকা আসতে খুব দেরি করছে। তিনি বসে আছেন একা একা। এটি নতুন কোনো অভিজ্ঞতা নয়। মনিকার ব্যবহারে কোথায় যেন একটি অবহেলার ভাব আছে। প্রথম যখন এ বাড়িতে এলেন সেদিনই ব্যাপারটা চোখে পড়েছিল। যদিও সেদিন মনিকা এগিয়ে এসে সবাইকে হতচকিত করে পা ছুঁয়ে সালাম করল। নবী ছিল সঙ্গে। সে অবাক হয়ে বলল, একি কাণ্ড, সে কী রবি ঠাকুর নাকি? আমি তো জানি একমাত্র রবি ঠাকুরকেই লোকজন পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে। মনিকা বলেছিল, আমি স্কুলে পড়ার সময় ভেবে রেখেছিলাম যদি কোনোদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় আমি সালাম করব। ওসমান সাহেব অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। মনিকা সহজ স্বরে বলল, ক্লাস টেনে যখন

পড়ি ঠিক করলাম যদি উনি অবিবাহিত হন তাহলে তাঁকে গিয়ে বলব— আমাকে বিয়ে করুন। নবী ঘর ফাটিয়ে হাসতে লাগল। ওসমান সাহেবের মনে হল হাসি স্বতঃস্ফূর্ত নয়। কষ্ট করে হাসা। নবীকে তিনি কখনো এভাবে হাসতে দেখেননি।

সে রাতে মনিকার সঙ্গে গল্প উপন্যাস নিয়ে কোনোই আলাপ হয়নি। মনিকার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছিল তার সমস্ত উৎসাহ মিইয়ে গেছে। সে পাকা আমের আচার বানানোর কী একটি পদ্ধতি নিয়ে গল্প করতে শুরু করল। এবং এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমার প্রচণ্ড মাথাব্যথা হচ্ছে কিছু মনে করবেন না, আমি কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। ওসমান সাহেব অপমানিত বোধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও আবার একদিন এলেন নবীর সঙ্গে। সেদিনই মনিকার এ রকম আলগা আলগা ভাব। তার পরেও তিনি এলেন। কেন এলেন? কেন বারবার আসেন?

ওসমান সাহেব দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরাবারও অনেক্ষণ পর মনিকা এল অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম? কাজের মেয়েটি চুল টেনে দিচ্ছিল, আরাম লাগছিল খুব। তোমায় পানি দিয়ে গেছে?

হ্যাঁ।

আরও লাগবে?

না, লাগবে না। নবী কোথায়?

গেস্ট রুমে ঘুমুচ্ছে। বমি-টমি করে বিশ্রী কাণ্ড। যে জিনিস সহ্য হয় না সে জিনিস কেন খায়?

মনিকা বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকাল। ওসমান সাহেব বললেন, তোমার হ্যাসবেন্ডের কোন খবর পেয়েছ?

না।

তিনি আছেন কেমন?

আগের মতই আছে। লাংসটলারেন্স, ই সি জি সব কিছুই হয়েছে। শরীরে কোনো অসুখ নেই। ডাক্তাররা বলছেন সাইকে সিমেটিক। মনের রোগ। কিন্তু সে সেটা বিশ্বাস করছে না। আরও বড় ডাক্তার দেখাতে চায়।

তাই নাকি?

হ্যাঁ মানসিক রোগীদের এই প্রবলেম। তারা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না রোগটা মনে, শরীরে নয়। তুমি চা খাবে?

না।

খাও এক কাপ। সিলোনিজ টি। খুব চমৎকার ফ্লেভার।

তিনি হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। মনিকা কাজের মেয়েটিকে চায়ের কথা বলে তাঁর সামনে এসে বসল। তার বসে থাকার ভঙ্গিতে কোন আড়ষ্টতা নেই। সে কোনো কথা বলছে না। কথা না বলে কোনো মেয়ে চুপচাপ বসে থাকলেও সমস্ত পরিবেশ আড়ষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু মনিকার বেলায় হয় না। কাজের মেয়েটি বলল—

উনার ঘুম ভাঙছে। আপনারে ডাকে। মনিকা কঠিন স্বরে বলল, তাকে এ ঘরে আসতে বল। বল তার বন্ধু এসেছে— ওসমান সাহেব।

নবী লম্বায় প্রায় ছ'ফুট। গায়ের রঙ শ্যামলা। মেয়েলী ধরনের মুখ। চেহারায় কাঠিন্য আনবার জন্যে সে নানান সময় নানান কায়দা-কানুন করেছে। একবার জুলফি রেখেছে, একবার গোঁফ রেখেছে। কিছুদিন ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়িও ছিল। লাভ হয়নি। কোনো এক বিচিত্র কারণে তার চেহারা থেকে ছেলেমানুষি দূর হয়নি।

যৌবনে দুর্দান্ত কিছু কবিতা লিখেছিলেন। হঠাৎ এক রাতে ঠিক করল কবিতা মেয়েদের ভাষা, কবিতায় কাঠিন্য নেই। প্রতীক, উপমা এইসব ছেলেমানুষি ব্যাপার। কাজেই সে চলে এল গদ্যে। লিখল 'দুপুর' নামের উপমা ও প্রতীক বিবর্জিত উপন্যাস। প্রচুর লেখালেখি হল দুপুর নিয়ে। সমালোচকদের কেউ কেউ উল্লসিত হলেন। কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কোন বিদেশী ঔপন্যাসিকের ছাপ পড়েছে সেটা বের করবার জন্যে। কবিখ্যাতি তেমন না জুটলেও কথা-শিল্পীর স্বীকৃতি পাওয়া গেল। পুরোপুরি সাহিত্যে নিবেদিত না হলে কিছু লেখা যাবে না এই ভেবে নবী চাকরি ছেড়ে দিল। পরবর্তী তিন বছর একটি লাইনও লিখল না। ইদানীং সে বলছে নাটক হচ্ছে সাহিত্যের সবচেয়ে পরিশীলিত রূপ। যে কোন এক শুভদিনে নাটক লেখা শুরু হবে এই ধরনের কথা শোনা যাচ্ছে গত ছ'মাস ধরে। এখনও কিছু লেখা হয়নি। শুভ দিন এখনো আসেনি। নবী ঘরে

ঢুকল অপ্রসন্ন মুখে, মনিকার আজকের ব্যবহারে সে খুবই বিরক্ত হয়েছে। মনিকা বলেছিল - তুমি হুট করে ভিতরের ঘরে ঢুকবে না। এটা ভাল দেখায় না। এ কেমন কথা মনিকা তার ফুফাতো বোন এ-বাড়িতে সে আসছে ছেলেবেলা থেকে। মনিকার স্বামী তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন। নবী অবাক হয়ে বলল, তুমি চাও না আমি এ বাড়িতে আসি?

আসতে ইচ্ছা হলে আসবে। তবে হুট করে শোবার ঘরে ঢুকবে না। এবং মাতাল অবস্থায় আসবে না।

নবী অবাক হয়ে বলল মাতাল বলছ কাকে? মাতাল কাকে বলে জানো?

মনিকা ঠাণ্ডা গলায় বলল, মাতালের ডেফিনেশন নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। তবে মাতাল আমার চেয়ে ভাল কেউ চেনে না। তোমার চাউনি দেখেই বুঝতে পারছি তুমি এক্ষুণি বমি করবে।

বমি করব?

হ্যাঁ।

তোমার ধারণা বমি করব?

একমাত্র মাতালরাই প্রতিটি কথা দু'বার করে বলে। তুমি দয়া করে বাথরুমে যাও।

আমি আরো দশ পেগ খেতে পারি, তা জানো?

খেতে পাবলে তো ভালই।

মনিকা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হেসে উঠল। এবং আশ্চর্য, নবীকে কিছুক্ষণেব মধ্যে সত্যি সত্যি বাথরুমে ছুটে যেতে হল। মনিকা মাতাল চেনে।

ওসমান সাহেব নবীর দিকে তাকালেন। নবী সে চাউনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মনিকাকে বলল, ক্ষিধে লেগেছে। কিছু খাব?

কিছুক্ষণের মধ্যেই টেবিলে ডিনার দেযা হবে। এখন একটু ভাল লাগছে?

নবী তার জবাব না দিয়ে ওসমান সাহেবেব পাশে গম্ভীর মুখে বসল। ওসমান সাহেব বললেন কেমন আছেন?

ভাল।

নাটকের কাজ কেমন এগুচ্ছে?

ধরিনি এখনো। আমি তো আপনার মত না যে এক সপ্তাহে দু'টা উপন্যাস নামিয়ে দেব। আমি কম লিখব; কিন্তু যা লিখব ভাল লিখব।

মনিকা হালকা গলায় বলল তোমার ধারণা উনি ভাল লিখছেন না?

পাঠযোগ্য লেখা মানেই ভাল লেখা না। ডিটেকটিভ উপন্যাসও তরতর করে পড়া যায়।

তুমি এটা বলছ ঈর্ষা থেকে।

-ঈর্ষা? কিসের ঈর্ষা? আমি ঈর্ষা করি মানিক বাবুকে, ওসমান সাহেবকে ঈর্ষা করব কেন? তা ছাড়া ঈর্ষা একটি মেয়েলি ব্যাপার। পুরুষ মানুষদের ঈর্ষা থাকে না।

ওসমান সাহেব ঘড়ি দেখে বললেন আমি আজ উঠি। নবীর মুখ গম্ভীর। মনিকা খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করছে। সে কিছু বলল না। নবী বলল, আমিও উঠব। মনিকা বলল, ক্ষিধে লেগেছে বলেছিলে।

এখন ক্ষিধে নাই।

ভাত খেয়ে বিশ্রাম নাও। ড্রাইভাব তোমাকে পৌঁছে দেবে। তুমি নিজে নিজে ড্রাইভ করে যেতে পারবে না।

আমি ঠিকই পারব। তুমি সব ব্যাপারে আমাকে আন্ডারএস্টিমেট কর।

সব ব্যাপারে করি না। কিছু কিছু ব্যাপারে করি।

নবীর মুখ আরও গম্ভীর হল। সে ওসমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল - আমার ওপর যদি ভরসা থাকে তাহলে আমি আপনাকে একটা লিফট দিতে পারি। মাতালের গাড়িতে চড়বেন?

ওসমান সাহেব হাসলেন। তিনি রাজি আছেন।

নেশাগ্রস্ত ড্রাইভারদের প্রবণতা হচ্ছে স্পিড বাড়ানো। সবাইকে দেখানো যে ঠিক আছে। গাড়ি চালানোর কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু নবীর গাড়ি চলছে খুব ধীরে। সে বড় রাস্তায় না উঠা

পর্যন্ত কোনো কথা বলল না। তাকে দেখে মনে হল সে খুবই চিন্তিত। ওসমান সাহেব বসে আছেন চুপচাপ। একবার শুধু বললেন, আমাকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার দরকার নেই। রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিলেই চলবে। নবী তার জবাব না দিয়ে হঠাৎ গাড়ির গতি অনেকখানি বাড়িয়ে দিল।

নবীকে তিনি পছন্দ করেন? এই প্রশ্নটি অনেকবার নিজেকে করেছেন। কখনো ঠিক জবাব পাননি। আজও পেলেন না। ওসমান সাহেব 'দুপুর' উপন্যাসটি পড়েছেন। এটি একটি প্রথম শ্রেণীর রচনা। এক মসজিদের পেশ ইমাম— জোনাব আলী, এক দুপুরে ঠিক করল একটি খুন করবে। সে সিন্দুকের ভেতর থেকে গরু কোরবানীর প্রকাণ্ড ছুরিটি বের করে ধার দিতে বসল। কাকে সে খুন করবে উপন্যাসের কোথাও তা বলা হল না।

নানান চরিত্রকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হল একে একে এবং মনে হল এদের সবাইকে খুন করা যেতে পারে। যে লোক এমন একটি জটিল বিষয়কে এত চমৎকার ভঙ্গিতে উপস্থিত করতে পারে তাকে পছন্দ করতেই হয়। ওসমান সাহেব হঠাৎ করে বললেন — নবী সাহেব, আপনি কী আমার কোনো লেখা পড়েছেন?

সেন্টিমেন্টাল লেখা আমি পড়ি না। আপনার একটা লেখা পড়তে চেষ্টা করেছিলাম, মেয়েলি জিনিসে এমন ঠাসা যে গা ঘিন ঘিন করে। মেয়েদের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়।

মেয়েদের গায়ের গন্ধ খুব কী খারাপ?

না খারাপ না ভাল। কিন্তু উপন্যাসে উঠে এলেই খারাপ। আধুনিক কালের সাহিত্যে সেন্টিমেন্টের কোনো ব্যবহার থাকা উচিত নয়। একালের লেখা হবে জার্নালিস্টিক।

ওসমান সাহেব তর্কে গেলেন না। নবী বলল, আপনি রাগ করলেন নাকি?

না।

আমি যা বললাম তা কি স্বীকার করেন?

পুরোপুরি না করলেও কিছু করি।

আপনার জীবদ্দশাতেই যখন আপনার লেখা কেউ পড়তে চাইবে না, তখন পুরোপুরি স্বীকার করবেন।

নবী গাড়ি বাড়ির সামনে এনে রাখল। ওসমান সাহেব বললেন— নামবেন? ক্ষিধের কথা বলেছিলেন। আমার সঙ্গে খেতে পারেন। নবী থেমে থেমে বলল— আমি আপনার এখানে খাব না। আমি এখন আবার মনিকার ওখানে যাব।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। আমি বের হয়ে এসেছি আপনাকে বের করে আনার জন্যে।

ওসমান সাহেব তাকিয়ে রইলেন। নবী বলল— ওকে আজ আমি একটা কথা বলব। সুস্থ অবস্থায় কথাটা বলার চেষ্টা করেছি। বলতে পারিনি। সে জন্যেই পাঁচ পেগ হুইস্কি খেয়ে গিয়েছিলাম। বুঝতে পারছেন?

পারছি।

জানতে চান?

না, আমি জানতে চাই না।

জানতে না চাইলেও আমি আপনাকে শুনাতে চাই। লিসন কেয়ারফুলি। আমি মনিকাকে বিয়ে করতে চাই। এই কথাটি আজ তাকে বলব। তার হ্যাসবেন্ড থাকুক না থাকুক তাতে কিছু আসে যায় না। বুঝতে পারছেন?

বুঝতে চেষ্টা করছি।

আপনার ধারণা মদের ঝোঁকে এসব বলছি?

বলতেও পারেন। অনেকে বলে। এ নিয়ে আমি ভাবছি না।

নবী হিস হিস করে বলল—

আমি ষাট মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে যাব এবং মরব না। এতেই প্রমাণ হবে আমি মাতাল নই। কি বলেন?

সে একসিলেটারে চাপ দিল। গাড়ি লাফিয়ে উঠল।

৬

মিলি চুপি চুপি তার স্টিলের আলমারি খুলল। তার ভাবভঙ্গি অনেকটা চোরের মত। দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে। সব কটা পর্দা টেনেছে এবং এমনভাবে আলমারির সামনে আছে যাতে চট করে আড়াল করা যায়। তবু তার হাত কাঁপছে। সে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ভেজানো দরজার দিকে।

মিলি ভয়ে ভয়ে তার টিনের কৌটা খুলল। ঘুমের ওষুধগুলি সে গুণবে। মাঝে মাঝেই সে গুণে দেখে কটা হল। এর আগের বার ছিল তেত্রিশটি এরপরও সে ছ'টি কিনেছে। তার মানে উনচল্লিশটি হওয়া উচিত কিন্তু একচল্লিশটি হচ্ছে। সে আবার গুনতে শুরু করল, ঠিক তখন ঢুকল মতিয়ুর রহমান।

বিদ্যুৎ গতিতে আলমিরা বন্ধ করে মিলি হাসল। ফ্যাকাসে হাসি। তার মুখও শূন্য। মতিয়ুর রহমান কিছু লক্ষ্য করল না। ঘরে একটি ইজিচেয়ার আছে। সে সেখানে বসে সিগারেট ধরাল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, ফ্যানটা বাড়িয়ে দাও তো মিলি।

মিলি ফ্যান বাড়িয়ে দিল।

খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

মিলি মাথা নাড়ল। সে খেয়েছে। এ বাড়িতে অনেক মানুষ-জন। দু-তিন বারে খাওয়া হয়। সে বাচ্চাদের সঙ্গে প্রথম বারে খেয়ে নেয়। তার শাশুড়ি পছন্দ করেন না। ননদরা হাসাহাসি করে। কিন্তু সে না খেয়ে পারে না। সন্ধ্যা মিলাতেই তার ভাতের ক্ষিধে পেয়ে যায়।

শুয়ে পড়া যাক তা হলে, কি বল?

মিলি কিছু বলল না। তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইল। মতিয়ুর অন্য রকম ভাবে তার দিকে তাকাচ্ছেন। যার অর্থ পরিষ্কার। সে ঘুমুতেও এসেছে সকাল সকাল। সে এখন বেশ কিছুক্ষণ হালকা গলায় কথাবার্তা বলবে। মিলি কিছু বলার থাকলে শুনবে। মিলি বলল, ভাইয়ার ছেলেটার জ্বর।

তাই নাকি?

হুঁ। বেশ জ্বর।

জ্বর-টর হচ্ছে চারদিকে। বর্ষার শুরুতে হয় এসব। ডাক্তার দেখাচ্ছে?

দেখাচ্ছে। হয়ত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। তা হলে অবশ্যি ভালই হয়।

ভাল হয় কেন?

ছেলের অসুখের কারণে বাবা-মা কাছে আসবে। সমস্যা মিটে যাবে।

মতিয়ুর কিছু না বলে আরেকটি সিগারেট ধরাল। মিলি টেনে টেনে বলল, বাচ্চাদের অসুখ-বিসুখে বাবা-মা মাথা ঠিক রাখতে পারে না। তাই না?

জানি না। ওদের তো লিগাল সেপারেশন হয়ে গেছে। হয়নি?

হুঁ। তাতে কি?

মতিয়ুর বলল, বাতিটা নিভিয়ে ব্লু বাতিটা জ্বেলে দাও।

মিলি অস্পষ্টভাবে একটি নিঃশ্বাস ফেলল। কড়া আলো নিভিয়ে নীল আলো জ্বালাল। দরজা বন্ধ করল এবং মৃদু স্বরে বলল— কাপড় খুলে ফেলব?

মতিউর জবাব দিল না। রাগী চোখে তাকাল। মিলির প্রায় কান্না এসে যাচ্ছিল। সে কান্না থামিয়ে শাড়ি খুলতে শুরু করল। ঘর ভর্তি আলো। সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কি লজ্জার ব্যাপার। মিলি ক্ষীণ স্বরে বলল, এই বাতিটাও নিভিয়ে দেই?

দরকারটা কি, থাক না।

মিলি বড় একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। সব বিবাহিত মেয়েদের জীবনই কি এ রকম? বিশেষ বিশেষ দিনে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তারাও কি বসে থাকে স্বামীর সঙ্গে? তাদের স্বামীরাও কি সিগারেট টানতে টানতে লজ্জায় জড়সড় হয়ে যাওয়া স্ত্রীর দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে? এসব প্রশ্নের উত্তর কোনোদিন জানা যাবে না। কাকে জিজ্ঞেস করবে মিলি? এসব কি কাউকে জিজ্ঞেস করা যায়? ছিঃ। তার নিজের মেয়েটির কথা ভেবে সে এই কারণেই কষ্ট পায়। তার জীবনও কি এরকম হবে? যদি হয় সেটা খুব দুঃখের ব্যাপার হবে। মিলি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। মতিয়ুর আরেকটি সিগারেট ধরিয়েছে। এটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার করণীয় কিছু নেই।

বাবু কি কেঁদে উঠল নাকি? মিলি কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হয়ে রইল। না বাবুর কান্না নয়। অবশ্যি সে কাঁদলেও মিলির কিছু করার নেই। তার শাশুড়ী বাবুর দেখা শোনার দায়িত্ব নিয়েছেন। মিলির

নাকি শিশু পালনের ক্ষমতা নেই। কবে নাকি বাবু কেঁদে কেঁদে সারা হয়েছে, তার ঘুম ভাঙেনি। হবে হয়ত। মাঝে মাঝে তার খুব ঘুম পায়। এখন অবশ্যি রাতগুলি জেগেই কাটে সারাক্ষণ, মনে হয় এই বুঝি বাবু কাঁদছে। এই বুঝি বিছানা থেকে গড়িয়ে পড়ল।

মিলি।

উঁ।

পানি দাও তো এক গ্লাস।

পানির জগ ও গ্লাস আরেক মাথায়। মিলির কি এই অবস্থায় হেঁটে হেঁটে পানির গ্লাস আনতে যেতে হবে। গায়ে কোনো কাপড় জড়াতে পারবে না। কারণ তাতে মতিয়ুর রাগ করবে। মিলি উঠে দাঁড়াল। আয়নায় তার শরীরের ছায়া পড়ছে। সেই ছায়াটি কি সুন্দর? ওর কাছে কি সুন্দর লাগছে? মিলি জানে না। তার জানতেও ইচ্ছা করে না। সে এগিয়ে যায় পানির গ্লাস আনতে। মতিয়ুর রহমান সিগারেট ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

## ৭

ফয়সল সাহেব ডেনটিস্টের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছে উপরের পাটির একটি দাঁত তুলে ফেলতে হবে। মাঝে মাঝেই ব্যথা হচ্ছে। অসহ্য ব্যথা নয়— চিনচিনে ব্যথা। ঠাণ্ডা পানি খেতে পারেন না। দাঁত শির শির করে।

অল্প বয়স্ক ডেনটিস্ট তাঁকে অবাক করল। সে গম্ভীর হয়ে বলল, আপনার দাঁত তো ঠিক আছে? শুধু শুধু তুলতে চান কেন? চমৎকার দাঁত, হেসে খেলে আরো দশ বছর যাবে। এনামেল নষ্ট হয়েছে সে জন্যই ঠাণ্ডা পানি খেতে পারেন না, এটা কিছুই না।

ফয়সল সাহেব হৃষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরলেন। রিকশা নিলেন না। দের মাইল রাস্তা হাঁটলেন। এই বয়সে হাঁটা ভাল। ব্লাড সার্কুলেশন ভাল হয়। হার্ট ঠিক থাকে। ভাদ্র মাসের কড়া রোদে তাঁর খানিক কষ্ট হল। কিন্তু মনে আনন্দ। আনন্দ থাকলে কোনো কষ্ট মনে হয় না। তাঁর ধারণা হল তিনি দীর্ঘদিন বাঁচবেন। আরো দশ বছর তো বটেই। দশ বছর খুব কম সময় নয়। দীর্ঘ সময়। তাঁর খুব বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করে। মৃত্যুর মত একটা ভয়াবহ ব্যাপারকে যত ঠেকিয়ে রাখা যায় ততই ভাল।

কাবুল মিয়া ফয়সল সাহেবকে দেখেই ছুটে গিয়ে গেট খুলে দিল। কাবুল মিয়া ফয়সল সাহেবের বুইক গাড়ির ড্রাইভার। এই গাড়ি গত দু'বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে। ফয়সল সাহেব সরাচ্ছেন না। অবশ্যি কাবুল মিয়ার চাকরি ঠিকই আছে। খাওয়া-দাওয়া এবং বেতন ঠিক মতই পাচ্ছে। তার বর্তমান চাকরি হচ্ছে বারান্দায় পা ছড়িয়ে ঘুমানো এবং হঠাৎ কোনো কোনো দিন ছুটে গিয়ে গেট খুলে দেয়া। অবশ্যি এই বিশেষ কাজটি সে শুধু ফয়সল সাহেবের জন্যেই করে। তার নিজের পদমর্যাদা সম্পর্কে সে অত্যন্ত সচেতন।

ফয়সল সাহেব হাসি মুখে বললেন— কী খবর কাবুল মিয়া? কাবুল মিয়ার বিস্ময়ের সীমা রইল না। বড় সাহেব এই সুরে কখনো কথা বলেন না।

ভাল তো কাবুল মিয়া?

জি স্যার।

তোমার গাড়িটা তো ঠিকঠাক করতে হয়।

কাবুল মিয়া হাত কচলাতে লাগল।

বাগানের এই অবস্থা কেন?

কাবুল মিয়া কী বলবে ভেবে পেল না। মালীকে ফয়সল সাহেব নিজেই গত মাসে বিদায় করেছেন। এমনিতেই বাগানের অবস্থা কাহিল ছিল। মালী চলে যাবার পর মরুভূমি হয়ে গেছে।

বাগান সাজাতে হবে বুঝলে কাবুল মিয়া। শীত এসে যাচ্ছে। ফ্লাওয়ার বেড তৈরি করতে হবে। ঝামেলা আছে। আছে না?

জি স্যার আছে।

তিনি উৎফুল্ল মনে দোতলায় উঠে শিশুদের গলায় ডাকলেন, বীথি বীথি।

বাড়ির সবাই ফয়সল সাহেবের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করল। এ বাড়িতে অনেক লোকজন। বাড়ির সবাই আশ্রিত। আশ্রিত লোকজন গৃহকর্তার মেজাজের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। তাদের মেজাজও গৃহকর্তার মেজাজের সঙ্গে ওঠানামা করে। কাজেই এ বাড়ির সবার মনেই সুবাতাস

রইল। যদিও সবাই জানে এ সুবাতাস ক্ষণস্থায়ী। ফয়সল সাহেবের মেজাজ খুব বেশি সময় ঠিক থাকে না। কে জানে হয়ত আজ সন্ধ্যার মধ্যেই তিনি উলটে যাবেন।

কিন্তু তিনি উল্টালেন না। সন্ধ্যাবেলায় তাঁকে দেখা গেল বীথির সঙ্গে। ইজিচেয়ারে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। বীথি কিছু বলছে না। তিনি একাই কথা বলছেন—

বুঝলে বীথি, ব্রিটিশ আমলে নাইনটিন ফর্টিসিক্স কিংবা ফর্টি ফাইভে একটা স্ট্রেঞ্জ মামলা হয়। দুই ভদ্রলোক একই সময়ে একটা ছেলের পিতৃত্ব দাবী করে মামলা করেন। এদের একজনের নাম রমেশ হালদার। আমি ছিলাম এই রমেশ হালদারের ল'ইয়ার। মামলায় আমরা জিতে যাই। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে রমেশ হালদার ঐ ছেলের বাবা ছিল না বলে আমার ধারণা।

বলেন কী?

এই যুগে অবশ্যি পিতৃত্ব এস্টাবলিশ করা খুব সোজা। ডি এন এ টেস্ট করলেই হয়। তখন তো এসব ছিল না। বুঝলে বীথি মামলাটা ছিল দারুণ ইন্টারেস্টিং।

এইসব লিখে ফেলেন না কেন?

কথাটা খারাপ বলনি তো, লেখা যায়।

ফয়সল সাহেব, সোজা হয়ে বসলেন। হাসিমুখে বললেন— এইটা আর কী মামলা, একটা মামলা ছিল মেয়ে-ঘটিত। ফিকসান তার কাছে কিছু না।

আপনি স্যার লিখে ফেলেন।

এই বয়সে কী আর লেখা সম্ভব হবে। কিছু পড়তে গেলেই চোখে স্ট্রেইন পড়ে।

আপনি বলবেন, আমি লিখব।

ফয়সল সাহেবের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি নিজেই বের হলেন খাতা কিনতে।

রাতে টেলিফোন করলেন ছেলেকে। একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। ওসমানের সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ নেই। পুত্র-কন্যাদের খোঁজ-খবর রাখাকে তিনি চারিত্রিক দুর্বলতা মনে করেন।

ওসমান নাকি?

জি কী ব্যাপার।

ব্যাপার কিছু না। তুই আছিস কেমন?

ভাল আপনার শরীর কেমন?

শরীর ভালই।

কোন দরকারে টেলিফোন করছেন, না এমনি?

তোর কাছে আবার আমার কী দরকার? এমনি করলাম। আচ্ছা শোন বীথি মেয়েটাকে তোর কেমন লাগে? আমার সেক্রেটারি। দেখেছিস তাকে?

না, দেখিনি। শুনেছি মিলির কাছে।

এই বাড়িতেই সে এখন থাকে। নিডি মেয়ে, বিয়ে হয়েছিল। হ্যাসবেন্ডের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

ও তাই নাকি।

আমার এখানে থাকে বলে তোরা আবার কিছু মনে করিস না তো?

না, কী মনে করব?

আচ্ছা রাখলাম।

ফয়সল সাহেব, হৃষ্টচিত্তে ঘুমুতে গেলেন। এবং তার কিছু ক্ষণ পরই খবর পেলেন টগরের ডিপথেরিয়া হয়েছে বলে ডাক্তাররা সন্দেহ করছেন। তাকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করার জন্যে নেয়া হচ্ছে।

ফয়সল সাহেবকে দেখে মনে হল না এই খবরটি তাঁকে বিচলিত করেছে। তিনি ক্লিনিকে যাবার জন্যে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাপড় বদলাতে লাগলেন। বীথিকে বললেন, গাড়িটা ঠিক করা দরকার। কখন কী দরকার হয়। কালকে আমাকে মনে করিয়ে দিও তো?

## ৮

টগরকে ভর্তি করা হয়েছে একটা ক্লিনিকে।

ঝকঝকে তকতকে একটা বাড়ি। হাসপাতাল মনেই হয় না। রুগীটুগীও নেই। তিন নম্বর রুমে একটি মাত্র পেসেন্ট। সেও খুব হাসি খুশি। অল্প বয়সী একজন তরুণী। প্রথম মা হবে। সকালবেলা

ব্যথা উঠেছিল, সবাই ব্যস্ত হয়ে নিয়ে এসেছে। ডাক্তার বললেন ফলস পেইন। স্বামী ভদ্রলোক নার্ভাস প্রকৃতির। সে স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে রাজি নয়। রাতটা এখানেই রাখতে চায়। সে পরিচিত অপরিচিত সবাইকে সিগারেট দিচ্ছে এবং স্ত্রীর ব্যথা উঠার ব্যাপারটি বলছে। তার মূল বক্তব্য হচ্ছে, দরকারের সময় কাউকে পাওয়া যায় না। তাঁর নিজের গাড়ি আছে। আত্মীয়-স্বজনদেরও গাড়ি আছে কিন্তু তার স্ত্রীকে আনতে হল রিকশায়। এর নাম ভাগ্য।

ওসমান সাহেব পৌঁছলেন রাত এগারোটায়। ওয়েটিং রুমে অপলা বসে আছে। আর কাউকে দেখা গেল না। বারান্দার সোফায় এক বুড়ো ভদ্রলোক গা এলিয়ে পড়ে আছেন। অপলা বলল, দুলাভাই, আপনার এত দেরি হল কেন? ওসমান সাহেব সহজ স্বরে বললেন পিজিতে গিয়েছিলাম। তোমরা কোথায় আছ কেউ বলতে পারল না।

বুঝলেন কী করে আমরা এখানে?

তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম। রানুর খালার কাছ থেকে ঠিকানা আনলাম। টগর কেমন আছে?

ভাল আছে। ভয়ের কিছু নেই। ঘুমুচ্ছে। আপনি ভেতরে চলে যান। আপা সেখানে আছে। দু'নম্বর রুম।

তার সঙ্গে আর কে আছে?

আর কেউ নেই। যান আপনি ছেলেকে দেখে আসুন।

তিনি সিগারেট ধরালেন এবং বেশ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন অসুস্থ ছেলের জন্যে যে রকম আবেগ অনুভব করার কথা সে রকম তিনি করছেন না। কিংবা হয়ত এই ক্লিনিকটি মনের উপর চাপ ফেলতে পারছে না। হাসপাতাল যে রকম ফেলে।

ওসমান সাহেবের পানির তৃষ্ণা হচ্ছিল। এখানে পানি কোথায় পাওয়া যাবে কে জানে। অপলা বিরক্ত স্বরে বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান, আপা একা আছে।

তুমি এখানে বসে আছ কেন?

এমনি আমার ভাল লাগছে না।

অপলা অন্য দিকে মুখ ফেরাল। ঝগড়া-টগড়া কিছু হয়েছে। মেয়েরা অদ্ভুত অদ্ভুত সময়ে ঝগড়া করতে পারে।

এই ক্লিনিক বিত্তবানদের জন্যে। বেশ বড় বড় রুম। জানালায় সুন্দর পর্দা। প্রশস্ত বেডে ফোমের তোষক। ওসমান সাহেব দেখলেন টগর কাত হয়ে ঘুমুচ্ছে। তার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। গায়ে ধবধবে সাদা একটা চাদর। সাদা চাদর সব সময় মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয। ওসমান সাহেব মনে মনে ঠিক করলেন রানুকে বলবেন চাদরটা বদলে দিতে।

রানু খুব ভয় পেয়েছে। সে বসে আছে টগরের মাথার পাশে। কিছুক্ষণ পর পরই টগরকে ছুঁয়ে দেখছে।

টগর বেঁচে আছে এ ব্যাপারে সে যেন নিশ্চিত হতে চান। রানুর চোখের নিচে কালি পড়েছে। সে কাঁপছে অল্প অল্প। এতটা ভয় পাওয়ার মত সত্যি কী কিছু হয়েছে? টগর তো ঘুমুচ্ছে বেশ স্বাভাবিকভাবে। ওর ঘুমন্ত মুখে তেমন কোন যন্ত্রণা ছাপ নেই। কোথায় যেন পড়েছিলেন, শিশুদের মুখে শারীরিক কোন কষ্টের ছাপ পড়ে না। ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, ও কেমন আছে?

ভাল। ঘণ্টাখানেক আগে ঘুমিয়েছে।

গায়ে জ্বর আছে?

আছে।

তিনি টগরের কপালে হাত রাখতেই সে কেঁপে উঠল। যেন সে বুঝতে পারছে অপরিচিত কারোর স্পর্শ। এ হাত মায়ের হাত নয়।

বেশ জ্বর তো গায়ে।

হ্যাঁ। বারটার সময় আরেক ডোজ ওষুধ পড়বে।

ওসমান সাহেব ইতস্তত করে বললেন- ক্লিনিকের কাউকে বল সাদা চাদর বদলে একটা রঙিন চাদর দিতে।

কেন?

এমনি বলছি। কারণ নেই।

রানু কাঁপা গলায় বলল— কারণ নিশ্চয়ই কিছু আছে। তুমি বল।

সাদা চাদর মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়।

রানু কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে টগরের গায়ের চাদর তুলে ফেলল। ওসমান সাহেব শান্ত স্বরে বললেন-- এত ভয় পাচ্ছ কেন রানু? ভয়ের কিছু নেই।

তুমি বুঝলে কী করে ভয়ের কিছু নেই?

তিনি এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কিন্তু রানু তাকিয়ে আছে আগ্রহ নিয়ে। সে একটা জবাব চায়।

বল কী করে বুঝলে ভয়ের কিছু নেই?

আমার মন বলছে। দেখবে ও সকালের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

রানু বলল, বারটা বাজতে কত দেরি বল তো?

পনেরো মিনিট।

হল ঘরে একজন নার্স আছে তাকে খবর দাও। বারটার সময় ওষুধ দিতে হবে। আর শোন, তুমি কী আত্মীয়-স্বজন সবাইকে খবর দিয়েছ?

না। কাউকে কিছু বলিনি।

সবাইকে বল।

দরকার আছে কোনো?

আছে। নয়ত পরে সবাই রাগ করবে।

কথাটা মিথ্যা নয়। এদেশে অসুখ-বিসুখ সামাজিক ব্যাপার। যথা সময়ে সবাইকে জানাতে হবে। কেউ যেন বাদ না পড়ে। কাউকে খবর না দেযাব মানে হচ্ছে তাকে দাম দেযা হয়নি। তুচ্ছ করা হয়েছে।

ওসমান সাহেব ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। নার্সকে দেখা গেল ট্রেতে করে ওষুধপত্র সাজিয়ে আনছে। ক্লিনিকটি মনে হচ্ছে ভালই। ঘড়ি ধরে সব হচ্ছে। বারটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি আছে এখনো।

নার্স মেয়েটি মধ্য বয়সী। গায়ের রঙ শ্যামলা। কিন্তু ধবধবে সাদা শাড়ির জন্যে তাকে কালো দেখাচ্ছে। ভালই লাগছে। মেয়েটির মধ্যে মা মা ভাব আছে।

ওসমান সাহেব হাসিমুখে তাকালেন। মেয়েটি বিরক্ত গলায় বলল - এত মানুষ কেন এখানে? শুধু একজন থাকবেন। ওয়েটিং রুমে অপেক্ষা করেন। ক্লিনিকের নিয়ম-কানুন মানতে হবে তো।

মেয়েটির গলার স্বর পুরুষালি। কথা বলার ভঙ্গিটিও বাজে। ওসমান সাহেব ওয়েটিং রুমে চলে এলেন।

অপলা বেঁটে মত একটি লোকের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছে। লোকটির হাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট। সে হাত মুঠো করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে সিগারেট টানছে। ওসমান সাহেব এগিয়ে আসতেই সে হাসি মুখে বলল স্লামালিকুম স্যার, আবদুল মজিদ আমার নাম। পিডিপিতে কাজ করি।

ভদ্রলোকের গলার স্বর এমন যেন দীর্ঘদিনের পরিচয় তাদের। ওসমান সাহেব অস্পষ্ট ভাবে হাসলেন।

আপনার কথা শুনলাম স্যার উনার কাছে। বিখ্যাত সাহিত্যিক। আপনাদের সাথে দেখা হওয়া ভাগ্যের কথা। সিগারেট নেন স্যার।

ওসমান সাহেব সিগারেট নিলেন। মজিদ দামী একটা লাইটার বিদ্যুৎগতিতে বের করল। হাসি মুখে বলল - আপনার নাম শুনেছি।

লেখা পড়ি নাই। আউট বই পড়ার আমার অভ্যাস নাই। আমি খুবই লজ্জিত।

লজ্জিত হবার কিছু নাই। পড়ার অভ্যাস অনেকের নাই। অনেকে সময়ও পায় না।

আমার স্ত্রী অবশ্যি খুব পড়ে। রাত-দিন গল্পের বই নিয়ে আছে। আমাকে রাতে পড়ে শুনাতে চায়। যা মুসিবত। সারাদিন পরিশ্রম করে রাতে একটু ঘুমাব। তা না গল্প শোন। অন্য মানুষের জীবনের বানানো গল্প শুনে কোন লাভ আছে স্যার বলেন?

না। লাভ আর কী।

এই তো আপনি স্বীকার করলেন। অনেস্টলি এডমিট করলেন। নিজে সাহিত্যিক হয়েও করলেন। আপনি স্যার গ্রেটম্যান।

অপলা হাসছে মুখ টিপে। ওসমান সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। মজিদ ক্রমাগত কথা বলে যেতে লাগল— তার স্ত্রীর ব্যথা কীভাবে উঠল, কত ঝামেলা করে আসতে হল এখানে। এসে দেখা গেল ফলস পেইন। আসার সময় আত্মীয়-স্বজন কাউকেই খবর দেয়া হয়নি। এখান থেকে টেলিফোন করারও উপায় নেই। কারণ তার সব কিছু মনে থাকে কিন্তু টেলিফোন নাম্বার মনে থাকে না। একটা কালো ডাইরিতে সব নাম্বার লেখা আছে কিন্তু তাড়াহুড়ার জন্যে সে ডাইরিটাই আনা হয়নি। অপলা বললো— আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন। তাঁর নিশ্চয়ই মনে আছে। মেয়েদের এসব জিনিস খুব মনে থাকে।

মজিদ প্রায় লাফিয়ে উঠল-- দ্যাটস রাইট। এক্ষুণি যাচ্ছি।

অপলা বলল, ভদ্রলোক মাথা ধরিয়ে দিয়েছেন। অবশ্যি খুবই সরল টাইপের মানুষ। তার জীবনের পুরা হিস্ট্রি আমাকে বলেছেন। আপনার উপন্যাসের জন্যে একটা চমৎকার ক্যারেকটার। ঠিক না দুলাভাই?

ওসমান সাহেব সহজ স্বরে বললেন, খুব কমন ক্যারেকটার। এ জাতীয় মানুষ প্রচুর আছে আমাদের চারপাশে। তাছাড়া এদের তুমি যতটা সরল মনে করছ ততটা না। এদের অনেকেই বোকার একটা মুখোশ পড়ে থাকে। এই মুখোশ দিয়ে প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। সেগুলিকে তখন আর মিথ্যা বলে মনে হয় না।

অপলা তাকিয়ে রইল। ওসমান সাহেব বললেন, তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না?

বিশ্বাস করব না কেন? করছি।

না, করছ না। এই লোকটির কথাই ধর, সে যে মিথ্যা বলছে তা কী টের পেয়েছ?

সে আবার কী মিথ্যা বলল?

ঐ যে বলল আত্মীয়-স্বজনদের খবর দিতে পারিনি। এটা মিথ্যা। আমি এসে দেখি, এখানে একগাদা লোকজন। সে সবাইকে সিগারেট দিচ্ছে।

ঔপন্যাসিকরা খুব ভাল ডিটেকটিভ হতে পারে বোধ হয়। এরা সব কিছু খুব তলিয়ে দেখে। ঠিক না দুলাভাই?

ওসমান সাহেব একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। তাঁর নিজের কাছেই মনে হল অপলাকে এত কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে ইমপ্রেস করা। এই বালিকাটিকে মুগ্ধ করবার একটি গোপন ইচ্ছা কী তার অবচেতন মনে বাসা বেঁধে আছে? কেন আছে?

অপলা!

জি।

এখানে টেলিফোন আছে?

অফিসে আছে। দু'টাকা করে দিতে হয়। এরা ভাল বিজনেস শুরু করেছে। আমি কী আসব আপনার সঙ্গে?

এসো।

আপার সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলাম। নার্সটা একগাদা কথা শুনিয়ে দিল। ইচ্ছা হচ্ছিল একটা চড় দেই।

দিলে না কেন?

অপলা অবাক হয়ে তাকাল। ওসমান সাহেবের গলার স্বরে কোন রসিকতা নেই। তিনি সত্যি সত্যি জানতে চান। অপলা মৃদু স্বরে বলল, আপনি লোকটি খুব অদ্ভুত।

তাই কী?

হ্যাঁ।

রাতে দেড়টায় টেলিফোন করা বিরক্তিকর ব্যাপার। বার বার রিং হবে কেউ ধরবে না। তারপর যখন ধরবে তখন ভয়ার্ত স্বর বের করবে— কী হয়েছে কী হয়েছে? কী হয়েছে ব্যাখ্যা করার পরও বুঝতে চাইবে না। আবার বলতে হবে। মধ্যরাতে সুসংবাদ দিয়ে কেউ ফোন করে না।

কিন্তু আশ্চর্য, রিং করা মাত্রই মিলি ধরল এবং সহজ স্বরে বলল -- কাকে চাই?

মিলি নাকি?

হুঁ। কী ব্যাপার, ভাইয়া?

তুই এখনো ঘুমুসনি।

না, রাতে তো আমার ঘুম হয় না।

ঘুম হয় না মানে?

হয় না মানে হয় না। মাঝে মাঝে ঘুমের ওষুধ খাই। তুমি এত রাতে কী জন্যে ফোন করেছ?

টগরের শরীরটা খারাপ। ডিপটেরিয়া। ওকে একটা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে।

মিলি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, এই কথাটা তুমি এত পরে বলছ কেন? ঠিকানা কী বল, আমি এক্ষুণি আসছি।

আসার দরকার নেই, ও ভালই আছে।

তোমাকে ঠিকানা দিতে বলছি তুমি ঠিকানা দাও।

ওসমান সাহেব ঠিকানা দিলেন। তিনি নিশ্চিত জানেন মিলি আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবে। এবং আসার আগে ঢাকা শহরে যত পরিচিত লোকজন আছে সবাইকে টেলিফোন করবে। টেলিফোনের ভাষাটা হবে এরকম- সর্বনাশ হয়ে গেছে -টগরের শরীর খুব খারাপ। এখন তখন অবস্থা। হাসপাতালে নিয়ে গেছে। এক্ষুণি আসুন।

অপলা বলল,মিলি আপা আসছে নাকি?

হ্যাঁ আসছে। মনে হচ্ছে বিরাট একটা দল নিয়ে আসবে। ও ঝামেলা ছাড়া কিছু করতে পারে না।

অপলা অল্প হাসল। ওসমান সাহেব বললেন, ক্ষিধে পেয়েছে, রাতের খাওয়া হয়নি। তোমরা কিছু খেয়েছ?

না।

মিলিকে বলে দেই কিছু খাবার-দাবার নিয়ে আসতে।

বলুন।

যা ভাবা গেছে, টেলিফোন এনগেজড। মিলি নিশ্চিয়ই পাগলের মত চারিদিকে টেলিফোন করছে। ওসমান সাহেব বেশ শব্দ করেই হাসলেন। অপলা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আপনাকে একটা কথা বলব দুলাভাই?

বল।

আগে কথা দিন রাগ করতে পারবেন না।

না রাগ করব না।

এই যে টগর এরকম অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে এটা আপনাকে এফেক্ট করেনি। ঠিক না?

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। অপলা বলল আপনি কী আমার ওপর রাগ করেছেন?

না, রাগ করিনি।

আমার ধারণা ছিল কবি-সাহিত্যিকদের অনুভূতি অনেক তীক্ষ্ণ। ধারণাটা বোধ হয় সত্যি না।

একজনকে দিয়েই সবার বিচার করা ঠিক?

অপলা চুপ করে রইল। সে একটু লজ্জিত বোধ করেছে। মজিদ সাহেবকে সিগারেট হাতে হাসতে হাসতে আসতে দেখা গেল।

স্যার, আমার স্ত্রী আপনাকে চিনেছে। আপনার তিনটা বই সে পড়ছে। এর মধ্যে দু'টা খুব ভাল লেগেছে। নাম বলেছিল। এখন মনে নাই।

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না। পানির তৃষ্ণা অনেক বেড়েছে। কোথায় পানি পাওয়া যাবে কে জানে।

রাত দু'টার দিকে রানু এসে বলল, টগরের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ডাক্তার বলেছে অক্সিজেন দিতে হবে। রানু কাঁপছে থরথর করে। ওসমান এগিয়ে এসে তার হাত ধরলেন।

রানু কাঁদতে শুরু করল। এত ভয় পেয়েছে সে? ওসমান সাহেব বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। আশপাশে কেউ নেই। বারান্দার শেষ প্রান্তে মজিদ সাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি আড়ালে সরে গেলেন। এই ছোট্ট ভদ্রতাটি ওসমান সাহেবের বড় ভাল লাগল।

রানুর হাত থরথর করে কাঁপছে। ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, কোন ভয় নেই রানু। এরকম অভয়বাণী দেয়ার যোগ্যতা কী তার আছে? তিনি ডাক্তার নন। মহাপুরুষও নন। রানু যেমন ভয় পেয়েছে, তিনিও পেয়েছেন। তবু অভয় দেয়ার দায়িত্বটি তিনি নিলেন কেন? পুরুষ হিসেবে এই দায়িত্ব কী আপনাতেই এসেছে তাঁর কাছে?

রানু চল টগরের কাছে যাই। মিলিরা এসে পড়বে।

টগর জেগে আছে কী ঘুমিয়ে আছে তা টের পাওয়া যাচ্ছে না। অক্সিজেনের নল তার নাকে স্কচ টেপ দিয়ে আটকানো। অল্প বয়সী ডাক্তারটি তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। টগরের যে খুব কষ্ট হচ্ছে তা মনে হল না। সে বেশ স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

ওসমান সাহেব বললেন. কেমন দেখছেন? ডাক্তার ছেলেটি হাসিমুখে বলল,— ভাল, ভয়ের কিছু নেই। ব্রিদিংয়ের কষ্ট হচ্ছিল মনে করে অক্সিজেন দিয়েছি। আসলে অক্সিজেনের নল দেখলেই লোকজন ভয় পায়।

রানু শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। ডাক্তার ছেলেটি তার দিকে তাকিয়ে সহজ স্বরে বলল, তেমনি কিছু অসুবিধা হলে তো আমি স্যারকে ডেকে আনতাম। আনতাম না?

রানু কাঁপা গলায় বলল, আপনি আপনার স্যারকে ডেকে আনুন।

কোনোই প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন আছে, ডেকে আনুন।

বিশ্বাস করুন দরকার হলেই আমি তাঁকে ডাকব।

রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, আপনি বুঝতে পারছেন না, এই ছেলেটি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। ওসমান সাহেব তাকালেন রানুর দিকে। তার চোখ ভেজা। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটি কঠিন। শিশুটিকে রক্ষার জন্যে সে যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। চমৎকার একটি ছবি তো। তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর কোনো উপন্যাসে এরকম কোনো ছবি আছে কী? তিনি মনে করতে পারলেন না। বাইরে গাড়ির হর্ণ দিচ্ছে। মিলিরা কী এসে পড়েছে? তিনি ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন।

দু'টি গাড়ি ভর্তি করে একগাদা মানুষ এসেছে। মিলি যাকে যেখানে পেয়েছে ধরে বেঁধে নিয়ে এসেছে। বাবা এসেছেন। বাবার সেক্রেটারি সুন্দরী মেয়েটি পর্যন্ত এসেছে। ওসমান সাহেব বিরক্ত হবার বদলে খুশি হলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, এতগুলি মানুষ হঠাৎ চলে আসায় একটা উৎসবের ভাব চলে এসেছে।

তাঁর মায়ের মৃত্যুর সময়ও এরকম হল। নানান জায়গা থেকে এত মানুষজন এল যে বাড়িটি হয়ে গেল বিয়ে বাড়ির মত। সবাই মায়ের ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ চোখ মুছে তারপর ছড়িয়ে পড়ে সারা বাড়িতে। সবাই চেষ্টা করে মুখের ভাব যথাসম্ভব করুণ রাখতে। সেটা বেশীক্ষণ সম্ভব হয় না। পুরনো দিনের মজার মজার সব ঘটনা মনে পড়ে যায় একেক জনের। খানিকক্ষণ হাসির পর আবার দারুণ গম্ভীর হয়ে যায় সবাই।

পরিষ্কার মনে আছে, পানি আনবার জন্যে রান্নাঘরে ঢুকে ওসমান সাহেব অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলেন তিন-চারজন মাঝ-বয়সী মহিলা·সুখী সুখী মুখে জমিয়ে গল্প করেছেন। চুলায় এক বিশাল কেতলিতে চায়ের পানি ফুটছে। টেবিলে সারি সারি চায়ের কাপ। ওসমান সাহেবকে দেখেই একজন মহিলা বললেন— চায়ের দেরি হবে। দুধ আনতে গেছে। দুধ নাই।

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন, মিলির মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। সে বোধ হয় রাস্তায় আসতে আসতে কেঁদেছে। তার চোখ লাল। নাক ফুলে আছে। মিলি তাঁকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, টগরের খবর কী?

ভালই।

কে যেন বলল অক্সিজেন দিচ্ছে।

তা দিচ্ছে।

তাহলে ভাল হয় কী ভাবে? এসব কী বলছ তুমি?

ওসমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। মিলি বলল, আরে, তুমি কেমন মানুষ? এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

কোথায় যাব?

টগরের কাছে গিয়ে বস?

বসলে কী হবে?

বসলে কী হবে মানে? নিজের ছেলের এত বড় অসুখ আর তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে আরাম করে বিড়ি সিগারেট খাবে?

বলতে বলতে মিলি কেঁদে ফেলল। মেয়েরা এত সহজে কাঁদতে পারে? মনিশ রায় বলে তার এক বন্ধু একবার বলেছিল মেয়েদের সব কিছুর মধ্যে একটা লোক দেখানোর ব্যাপার আছে।

কোনো মেয়ের যদি স্বামী মরে যায় সে কাঁদবে কিন্তু এমনভাবে কাঁদবে যেন তাঁকে খারাপ না দেখা যায়। কাঁদার মধ্যেও সে একটু আর্ট খুঁজবে।

মিলি অবশ্যি আর্ট-ফার্ট খুঁজছে না। সে বিশ্রী একটা ভঙ্গি করেই কাঁদছে। ওসমান সাহেব বললেন, এত কাঁদছিস কেন?

কাঁদব না?

কাঁদার মত তো কিছু হয়নি?

মিলি ফোঁফাতে ফোঁফাতে বলল, সব কিছুর মূলে হচ্ছ তুমি। তোমার মধ্যে মায়া বলে কিছু নেই।

মায়ার সঙ্গে ডিপথেরিয়ার কী সম্পর্ক? ডিপথেরিয়া একটা জীবাণুঘটিত অসুখ। খুব মায়া আছে এমন একজন বাবার ছেলেরও ডিপথেরিয়া হতে পারে। তুই যা— তোর ভাবীর কাছে যা। তবে এমন হাউমাউ করে কাঁদিস না।

মিলি তীব্র কণ্ঠে বলল, কেমন করে কাঁদতে হবে? তোমার উপন্যাসের নায়িকাদের মত? ফিচ ফিচ করে?

তিনি হেসে ফেললেন। স্বল্পবুদ্ধি মানুষেরা মাঝে মাঝে বেশ মজার কথা বলে।

মিলি ঘরের দিকে চলে গেল। তার মুখ থমথম করছে। রানুর কাছে গিয়ে সে দ্বিতীয় দফায় কেঁদেকেঁটে একটা ঝামেলা করবে। ওসমান সাহেব হাঁটতে হাঁটতে বারান্দার শেষ মাথায় চলে গেলেন। সিগারেটটা ড্যাম্প। টানতে কষ্ট হচ্ছে।

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন, তাঁর বাবা খুবই উৎসাহী ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছেন। কোনো রকম ঝামেলা উপস্থিত হলে বুড়োরাই বোধ হয় সবচেয়ে উৎসাহী হয়। তাঁদের উত্তেজনাহীন জীবনে সাময়িক উত্তেজনার বিষয়গুলি তাঁরা উপভোগ করেন।

বাবাকে দেখা গেল গম্ভীর হয়ে কাকে হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন বলছেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন ধরাধরি করে ওয়েটিং রুম থেকে একটা সোফা বাইরে নিয়ে এল। তিনি রাজা-বাদশাদের মত মুখ করে বসলেন। এই লোকটি যে বাড়িতেই যান সে বাড়িকেই মনে করেন নিজের বাড়ি। ওয়েটিং রুম থেকে সোফা টেনে বারান্দায় আনার কোনো দরকার ছিল না। ওয়েটিং রুমে দিব্যি বসা যেত আর এমন যদি হয় যে তাঁকে বারান্দাতেই বসতে হবে তিনি বেতের চেয়ারে বসতে পারতেন। বেশ কয়েকটি বেতের চেয়ার আছে বারান্দায়। ওসমান সাহেব সিগারেট ফেলে দিয়ে বাবার কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি ধমকের স্বরে বললেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলি?

এখানেই ছিলাম।

ক্লিনিকে আনার বুদ্ধি দিল কে? ক্লিনিকে কোন চিকিৎসা হয়? টাকার শ্রাদ্ধ ছাড়া কিছুই হয় না। যত বেকুবী কাণ্ডকারখানা। আসল যে ডাক্তার সে ঘুমাচ্ছে। এক চেংড়া ছেলেকে দিয়ে রেখেছে। সে এ বি সি জানে না, ডাক্তারি জানবে কী?

ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, ডাক্তারি জানবে না কেন? মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করে এসেছে।

পাস করলেই ডাক্তার হয়? হাজার হাজার ছেলে পুলে তো ল' পাস করছে। ওরা পারে ওকালতী করতে? কোর্টে দাঁড়িয়ে একটা আর্গুমেন্ট করতে গেলেই তো প্যান্ট নষ্ট করে ফেলবে।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। বাবার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। হৈচৈ শুরু করলেন।

অপলা এসে বলল, চাচাজান আপনাকে ভেতরে ডাকে।

কে ডাকে?

রানু আপা। বড় ডাক্তার এসেছে।

ঘুম ভেঙেছে তাহলে। আমি ভেবেছিলাম ভোর দশটার আগে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হবে না। ওসমান তুইও আয়।

না ঠিক আছে। আপনি একাই যান। একসঙ্গে এতগুলি মানুষের ভিড় করা ঠিক হবে না।

ওসমান সাহেব বাবার খালি করা সোফায় বসলেন। পানির তৃষ্ণা হচ্ছে এখানে পানি কোথায় পাওয়া যায় কে জানে। মোটা নার্সটাকে একটি ট্রে নিয়ে যেতে দেখা গেল। ওসমান সাহেব একবার ভাবলেন তাকে জিজ্ঞেস করবেন। শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতে পারলেন না। বাবা হলে কড়া গলায় বলতেন,'এই যে মেয়ে, ঠাণ্ডা দেখে এক গ্লাস পানি আন। গ্লাস ধুয়ে আনবে।' এই বলায় কোনো

রকম জড়তা থাকত না। যেন নিজের বাড়িতেই কাউকে কিছু বলছেন। একটি মানুষেব সঙ্গে অন্য একটি মানুষেব এত তফাৎ।

ওসমান সাহেব দেখলেন বাবার সেক্রেটারি মেযেটি ছোট ছোট পাযে এগিযে আসছে। মিলির কাছে এর কথা শুনেছেন। কিন্তু দেখা হল এই প্রথম। কী যেন নাম মেয়েটির? অত্যন্ত পরিচিত চেহারা। আগে কি দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন? টিভি বা সিনেমায অভিনয-টবিনয করে নাকি? কবলেও তাঁর দেখাব কথা নয। টিভি-সিনেমা তিনি দেখেন না। মেযেটির নাম কী বেবা? না রেখা? প্রথম অক্ষরটি কী 'ব' না অন্য কিছু?

স্লামালিকুম।

ওযালাইকুম সালাম।

ডাক্তার সাহেব এসে দেখেছেন। টগব ভাল আছে। অক্সিজেনেব নল সব খুলে ফেলা হযেছে।

তাই নাকি?

জি।

ক্রেস্টাপেন পেনেসিলিন দেয়া হচ্ছে, দশ লাখ ইউনিট কবে। এটিএসও দেযা হযেছে। ভযেব কিছুই নেই। সকালের মধ্যে সে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠবে।

আপনি এতসব জানলেন কোত্থেকে?

মেযেটি লজ্জিত স্বরে বলল, জিজ্ঞেস করে জেনেছি। আচ্ছা আপনি কী আমাকে চিনতে পাবছেন?

পারব না কেন? আপনি আমার বাবার সেক্রেটারি। মিলি আমাকে বলেছে।

মিলি আমাকে ঠিক পছন্দ করে না।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। মিলিকে ব্যস্তভাবে আসতে দেখা গেল। বীথি সবে গেল। মিলি বিরক্তস্বরে বলল, এ মেয়েটে এতক্ষণ ধবে কী গুজ গুজ করছিল?

তেমন কিছু না। কথা বলছিল।

অসুখ-বিসুখের মধ্যে তাব এত কী কথা?

প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে ওসমান সাহেব বললেন, টগব কেমন আছে?

ভাল ঘুমাচ্ছে। তোমাদের জন্যে খাবাব নিযে এসেছি। এসো।

কী এনেছিস?

স্যান্ডউইচ বানিয়ে এনেছি। চট করে আর কী পাব?

তোর বর তোর সঙ্গে আসেনি?

ও ঘুমাচ্ছিল। জাগাইনি। টগরেব সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক বল? টগবের অসুখ হলেই কী আব না হলেই বা কী?

তাই বলে কাউকে কিছু না বলে চলে আসবি?

হুঁ আসব। এসো, খেতে এসো।

রানু সহজভাবেই স্যান্ডউইচ মুখে দিচ্ছে। মিলি ফ্লাস্ক ভর্তি কবে চা নিযে এসেছে। সেই চা ঢালা হচ্ছে। উৎসবের আমেজ চারদিকে। ওসমান সাহেব চাযের পেয়ালা হাতে নিযে অপলাকে বললেন, মজিদ সাহেবকে ডেকে নিয়ে আস। বেচারা একা ঘুর ঘুর কবছে।

রানুর চেহারা থেকে ভয়ের ভাবটা কেটে গেছে। সে হাসতে হাসতে পাশে বসে থাকা মোটা ভদ্রমহিলাকে কী যেন বলল। তিনিও হাসতে শুরু করলেন। এখানে যারা এসেছে এদের অনেককেই ওসমান সাহেব চেনেন না। যেমন মোটা ভদ্রমহিলা। মুখ চেনা চেনা। পারিবাবিক উৎসবে ইনি নিশ্চয়ই আসেন। চৌদ্দ পনেরো বছরের চশমাপরা একটু ভাবুক ভাবুক ধবনেব ছেলেকে ও দেখা যাচ্ছে একে এর আগে কোনোদিন দেখেননি, আত্মীয-স্বজনদের মধ্যে কেউ না নিশ্চয়ই।

অপলা এসে বলল, দুলাভাই, মজিদ সাহেব আপনাকে একটু বাইরে ডাকেন।

কেন?

জানি না কেন। আপনি একটু আসেন। ভদ্রলোক খুব আপসেট।

মজিদ সাহেব শুকনো মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। ওসমান সাহেবকে দেখেই বললেন, কাণ্ড দেখেছেন? এখন বলছে সিজারিয়ান করতে হবে। এতক্ষণ কিছু বলে নাই। হঠাৎ সিজারিযান।

তাই নাকি?

স্যার ওদের ওপর আমার ফেইথ চলে গেছে। ওর যদি সিজারিয়ান লাগেও আমি এখানে করাব না। মরে গেলেও না। আমি পিজিতে নিয়ে যাব। আপনি স্যার আমাকে একটু সাহায্য করেন।

ওসমান সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কী সাহায্য?

আপনাকে স্যার একটু আসতে হবে আমার সাথে। আপনি সঙ্গে থাকলে বুকে হাতীর বল হয় স্যার।

তাঁকে অবাক করে দিয়ে মজিদ চোখ মুছতে লাগলেন। ওসমান সাহেব বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন।

নার্ভাস হচ্ছি কারণ ও বাঁচবে না।

কেমন করে বুঝলেন?

আমি বুঝতে পারছি।

মজিদ সাহেব শিশুদের মত ফুঁফিয়ে উঠলেন।

আমি যাব আপনার সঙ্গে। ভয়ের কিছু নেই। আমি আমার স্ত্রীকে বলে এক্ষুণি আসছি।

টগরের পাশে রানু বসে আছে। বুড়ো মত একজন ডাক্তার টগরের কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করছেন। ওসমান সাহেব ভেতরে ঢুকতেই রানু বলল, ইনি ছেলের বাবা। খুব সম্ভব ছেলের বাবা প্রসঙ্গেই কথা হচ্ছিল। ডাক্তার সাহেব বললেন--- আপনারা শুধু শুধুই ব্যস্ত হয়েছেন। ছেলে ভাল আছে। তাছাড়া আপনারা বার বার ডিপথেরিয়া ডিপথেরিয়াই বা করছেন কেন? ডিপথেরিয়া রুগী আমি আমার ক্লিনিকে কেন রাখব?

ওর কী হয়েছে?

ডিপথেরিয়ার মতই একটা মেমব্রেন। ফলস মেমব্রেন। কোন রকম টক্সিসিটি এখানে হয় না। আর আপনারা রাত তিনটায় ঢাকা শহরে সমস্ত লোক নিয়ে এসেছেন।

বুড়ো ডাক্তার অসম্ভব বিরক্ত হলেন। ওসমান সাহেব বললেন, পাশের রুমের মহিলার নাকি সিজারিয়ানের প্রয়োজন হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে। বাচ্চার হার্ট বিট বেড়ে একশ পঞ্চাশ হয়েছে। বাচ্চা বের না করলে দারুণ মুশকিল। এখন আপনি দয়া কের লোকজন নিয়ে বাড়ি যান শান্তিতে ঘুমুতে চেষ্টা করুন। আমাদের খানিকটা রিলিজ দিন, কবি-সাহিত্যিক মানুষ আপনারা, বেশি কিছু বলাও মুশকিল।

ডাক্তার সাহেব বিরক্ত মুখেই ঘর ছেড়ে গেলেন। ওসমান সাহেবের মনে হল রানু নিশ্চয়ই বেশ ফলাও করে টগরের বাবার পরিচয় ডাক্তার সাহেবকে দিয়েছে। নয়ত ডাক্তার সাহেব 'কবি সাহিত্যিক' এই শব্দ ব্যবহার করতেন না। চেহারায় তাঁকে চেনে এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি না।

ওসমান সাহেব রানুর দিকে তাকালেন। সে এখন বেশ স্বাভাবিক। পান চিবোচ্ছে। মিলি কী পানও নিয়ে এসেছিল নাকি? ওসমান সাহেব বললেন, রানু পাশের ঘরে যে মহিলা আছে তার সঙ্গে আমি হাসপাতালে যাচ্ছি। পৌছে দিয়েই ফিরে আসব।

তুমি যাচ্ছ কেন?

তার হ্যাসবেন্ড খুব নার্ভাস ফিল করছে। তার ধারণা আমি থাকলে ভর্তির ব্যাপার খুব সহজ হবে।

নিজের ছেলের এত বড় অসুখে তুমি ওর কপালে হাত দিয়ে একবার টেম্পারেচার পর্যন্ত দেখনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকেছ। আর অজানা অচেনা এক রুগীর জন্যে দরদ উথলে উঠছে?

দরদ-টরদের কোনো ব্যাপার না। একজন লোক একা একা হাসপাতালে যেতে ভয় পাচ্ছে।

সে ভয় পাচ্ছে তাতে তোমার কী?

আমার কিছুই না?

না, তোমার কিছুই না। মহাপুরুষ সাজতে যেও না। তুমি মহাপুরুষ না। সাধারণ মানুষ। লেখকরা মহাপুরুষ না।

রানুর চেঁচামেচিতে দরজার কাছে একটা ভিড় জমে গেল। তিনি ভেবে পেলেন না হঠাৎ রানুর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল কেন? টগর পর্যন্ত জেগে উঠেছে। ওসমান সাহেব ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। মজিদ সাহেব বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বরে বললেন চলুন যাই।

৯

হাতে একটা কমলালেবু নিয়ে টগর বসে আছে। টগরের গায়ে লাল একটা সোয়েটার। কত দ্রুতই না বড় হয়ে যাচ্ছে ছেলেটি। শিশুরা বোধ হয় সময়কে পেছনে ফেলে এগুতে থাকে।

রোদ এসে পড়েছে তার চোখে-মুখে। সে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। গভীর মনোযোগে কী যেন দেখছে সে।

দরজার আড়াল থেকে রানু দৃশ্যটি দেখল। এত মন দিয়ে সে কী দেখছে। রাস্তার ওপাশে পা ছড়িয়ে একটা কুকুর রোদ পোহাচ্ছে। এছাড়া দেখার মত কোথাও কিছু নেই।

এমন অদ্ভুত হচ্ছে কেন ছেলেটা? ঘুম থেকে উঠেছে ছ'টায়, এখন বাজে দশটা। কমলা হাতে বসে আছে, একবারও বলেনি খুলে দাও। যেন হাতে নিয়ে বসে থাকতেই আনন্দ। রানু ডাকল, টগর। সে ফিরে তাকাল এবং ফিক করে হেসে ফেলল।

কমলা খুলে দেব?

দাও।

রোদে বসে আছে কেন? একটু সরে ছায়াতে বস।

টগর বাধ্য ছেলের মত সরে বসল। রানু কমলার খোস ছড়াতে ছড়াতে বলল, এখন তোমার শরীর ভাল তাই না টগর?

হ্যাঁ।

নাও কমলা নাও। দেখি কাছে আসত, গা গরম কী না দেখি। না জ্বর নেই। টগর খোসা ছাড়ানো কমলা হাতে ঠিক আগের জায়গায় গিয়ে বসল। ঠিক আগের মতই তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। রানু বলল, হাতে নিয়ে বসে আছ কেন খাও। খেয়ে আমাকে বল মিষ্টি না টক।

মিষ্টি।

রাস্তায় কী দেখছ তুমি?

টগর লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। সব শিশুরাই কী এমন চমৎকার করে হাসে?

না টগর একাই এমন হাসতে পারে? কী সুন্দর টোল পড়ছে চিবুকে।

রানু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। টগর বলল, পানি খাব।

শোবার ঘরে অপলা চেঁচিয়ে পড়ছে। তার পড়ার ভঙ্গিও অদ্ভুত। চেঁচিযে চেঁচিয়ে এবং হেঁটে হেঁটে না পড়লে তার নাকি পড়া মুখস্থ হয় না। কেউ যে পড়াশোনা এত সিরিয়াসলি নেয় তা রানুর জানা ছিল না। অপলার মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট এমন কিছু আহামরি নয়। কিন্তু মেডিকেলের ভর্তি পরীক্ষায় সে প্রথম হয়েছে। ক্লাসের পড়াশোনা এখনও শুরু হয়নি। কিন্তু অপলার ভাবে মনে হচ্ছে সামনেই ফাইনাল। রানু বলল, টগরকে এক গ্লাস পানি এনে দে তো অপলা। দরজার পাশ থেকে রানুর নড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না। টগর রাস্তা থেকে কখন চোখ ফিরিয়ে নেয় তাই তার দেখার ইচ্ছা।

টগর এক চুমুক পানি খেয়েই গ্লাস সরিয়ে দিল। অপলা বলল, টগর আমাকে একটা কোয়া দে তো দেখি। মিষ্টি আছে?

হ্যাঁ।

খুব মিষ্টি?

হুঁ খুব মিষ্টি।

ওয়াক থু। তেঁতুলের মত টক। তুই এটাকে বলছিস মিষ্টি। একটা চড় খাবি।

টগর খিল খিল করে হেসে উঠল। যেন এ রকম মজার কথা সে আর শোনেনি। হাসি থামিয়ে সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, খালামণি, আমাকে কোলে নাও।

পড়া বন্ধ করে আমি এখন বাবু সাহেবকে কোলে নেই। সখ কত।

একটু নাও।

এখন না, পড়া শেষ হোক।

অপলা ভেতরে ঢুকে গেল। রানু তাকিয়ে আছে টগরের দিকে। টগরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে। অপলার সঙ্গে তার সম্পর্ক বেশ আন্তরিক। কিন্তু রানুর সঙ্গে নয়। রানুকে সে কী একটু ভয় করে? মার সঙ্গে তার কী কোন দূরত্ব তৈরি হয়েছে? রানু বলল, আমার কোলে উঠতে চাও? টগর লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। সে কী চায় নাকি? মা'র চেয়ে সে-কি বাবাকেই বেশি পছন্দ করে?

টগর!

উঁ।

বেড়াতে যাবে আমার সাথে?

হুঁ।

কোথায় যেতে চাও বল। তুমি যেখানে যেতে চায় সেখানেই নিয়ে যাব। বল কোথায় যাবে?

এই প্রশ্নটি উদ্দেশ্যমূলক। রানু দেখতে চায় টগর তার বাবার কাছে যাবার কথাটি কী ভাবে বলে। কিন্তু শিশুরা খুব সাবধানী। জীবনের কিছু কিছু জটিলতা তারা ভালই বুঝতে পারে। টগর তার বাবার কাছে যাবার কথা কিছুই বলল না। চোখ মিটমিট করতে লাগল।

বলো কোথায় যাবে?

তোমার ইচ্ছা।

আমার ইচ্ছা মানে? তোমার নিজের কোনো ইচ্ছা নেই?

টগর কোনো কথা বলল না। রানু বলল, বাবার কাছে যাবে? টগর তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। ঠাট্টা ভাবছে হয়ত।

যাবে?

সে মাথা নাড়াল। রানু বলল, মাথা নাড়ানাড়ি নয়। পরিষ্কার করে বল। যাবে?

হুঁ।

ঠিক আছে নিয়ে যাব। তোমাকে ও বাড়িতে রেখে চলে আসব। যতক্ষণ ইচ্ছা তুমি থাকবে। তারপর তোমার বাবা তোমাকে দিয়ে যাব।

টগর তাকিয়ে আছে উজ্জ্বল চোখে। শিশুরা মনের মধ্যে অনেক কিছু পুষে রাখে। বাবার কাছে যাওয়াটা যে টগরের কাছে এত বড় একটা ব্যাপার তা সে কখনো বুঝতে দেয়নি।

রানু এ বাড়িতে প্রায় ছ'মাস পড়ে এসেছে। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে তার মন খারাপ হল। সব কিছু অবিকল আগের মত আছে। কিছুই বদলায় নি। সে-কী আশা করছিল এই ছ'মাসে সব বদলে যাবে?

আকবরের মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদের রিকশা থেকে নামতে দেখছে। রানুকে দেখে সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারেনি। কিংবা বিশ্বাস করলেও এতই হকচকিয়ে গিয়েছে কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। এমন সময় সে সম্বিৎ ফিরে পেল। প্রায় পাগলের মত সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগল। রানুর প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল সে সিঁড়িতে একটি পতনের শব্দ শুনবে এবং আকবরের মা বালির বস্তার মত গড়িয়ে পড়বে। রানু টগরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। টগর হাত ছাড়িয়ে ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। যেন এই মুহূর্তে তাব মাকে প্রযোজন নেই।

ওসমান সাহেব বাসায় নেই। রানু খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। কী অবস্থা হয়ে আছে বাড়ির। মশারি তোলা হয়নি, ঘরময় সিগারেটের ছাই। এক গাদা বই বিছানায় ছড়ানো। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। এখনো নেভানো হয়নি।

ঘরের এ অবস্থা কেন আকবরের মা?

আকবরের মা প্রশ্নটা না শোনার ভান করল।

এ ঘর কতদিন ধরে এরকম?

কালকেই পরিষ্কার করছি। একদিনে এই অবস্থা।

ও গিয়েছে কখন।

খুব ভোরে। নাস্তাও খায় নাই।

এতক্ষণ তুমি কী করছিলে? কোনো ভদ্রলোকের বাড়ি সকাল বেলা এ রকম থাকে? কী আশ্চর্য।

রানুর বিরক্তির সীমা রইল না। যদিও এ বাড়ি অপরিষ্কার থাকলে তার কিছুই যায় আসে না। তবু এ রকম একটা অবস্থা সহ্য করা মুশকিল। বাথরুমে ভেজা কাপড় ছাড়ানো। বেসিন নোংরা হয়ে আছে। রানু বলল, ও আসবে কখন?

আফা, কিছুই কইয়া যায় নাই।

ঘর-দোয়ার যে এরকম করে রাখ সে কিছু বলে না?

আকবরের মা চুপ করে রইল।

জীতু মিয়া কোথায়?

বাজারে গেছে।

সমস্ত ঘর আজ পরিষ্কার করবে। পানি দিয়ে মুছবে। কার্পেট রোদে দিবে। বাথরুম পরিষ্কার করবে।

জি আইচ্ছা।

আকবরের মা হেসে ফেলল এবং সঙ্গে সঙ্গেই হাসি গোপন করার জন্যে অন্যদিকে মুখ ফেরাল। সেকি ভাবছে রানু ফিরে এসেছে? বসার ঘরে টেলিফোন বাজছে। আকবরের মা টগরকে কোলে নিয়ে ঘুরছে। রানু বিরক্ত মুখে বলল, টেলিফোন ধরছ না কেন?

টেলিফোন ধরতে আমাকে নিষেধ করছে।

কেন? নিষেধ করছে কেন?

মিলা আফা রোজ টেলিফোন করে। ভাইজান রাগ হইছে।

ছোট বোন টেলিফোন করলে রাগ করবে কেন? এসব কী ধরনের কথা?

রানু এগিয়ে গিয়ে ফোন ধরল। মিলিই করেছে। মিলি অবাক হয়ে বলল, কে ভাবী?

হ্যাঁ।

তুমি এখানে কেন?

টগরকে নিয়ে এসেছি। কাঁদছিল।

তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে ভাবী, তুমি থাক কিছুক্ষণ। আমি আসছি।

আমি বেশিক্ষণ থাকব না মিলি। আমি এক্ষুণি রওনা হচ্ছি।

ঠিক আছে ভাইয়াকে দাও। তার সঙ্গে আমার খুব দরকারি কথা।

ও তো বাসায় নেই।

ভাবী শোন, ভাইয়া আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করে কেন?

টেলিফোন করলেই সে রিসিভার নামিয়ে রাখে। বাসায় বলে দিয়েছে আমি টেলিফোন করলে বলতে সে বাসায় নেই। সে এরকম করছে কেন?

তোমার ভাই তুমি ভাল বলতে পারবে।

বাবুর জন্যে একটা নাম চাচ্ছি দু'মাস ধরে। প্রথম অক্ষর হবে ম, এটা দিচ্ছে না। শুধু ঘুরাচ্ছে।

তার কাছ থেকে নাম দিতে হবে এমন তো কোন কথা নেই। তোমরা একটা নাম দিয়ে দাও।

তুমি বুঝতে পারছ না ভাবী,-আমি সবাইকে বলেছি আমার ভাই নাম রাখছে। এখন তার আকিকা হচ্ছে সামনের মাসে তিন তারিখে, এগারো দিন মোটে আছে।

মিলি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর পরই রানু শুনল মিলি কাঁদছে। রানু বিরক্ত স্বরে বলল, কাঁদছ কেন তুমি? এখানে কাঁদার মত কী হল? মিলি ধরা গলায় বলল, গতকাল সকাল বেলায় টেলিফোন করেছিলাম, ভাইয়া বলল, নাম রাখ মাকাল। ম দিয়ে শুরু। রানু বেশ অবাক হল। এরকম নীচ ধরনের রসিকতা করবার লোক সে নয়। এবং মিলিকে সে যথেষ্টই পছন্দ করে। তাহলে এরকম কথা বলার মানে!

রানু বলল,— মিলি, তুমি নিজে একটা সুন্দর নাম রাখ, তারপর সবাইকে বল তোমার ভাই এই নাম রেখেছে। ঠিক আছে?

আচ্ছা

এখন তাহলে রাখি?

তুমি নিজেও আমাকে দশ বারটা নাম দিবে ভাবী। ম দিয়ে শুরু হবে। এবং তিন অক্ষরে হবে।

এত বাধ্যবাধকতা কেন? নামের মত সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত রকম কন্ডিশন দেয়া ঠিক না।

নামে কিছু না আসলে গেলে তুমি তোমার ছেলের জন্য এত সুন্দর নাম রাখলে কেন?

আমি রাখিনি তোমার ভাইয়ের নাম।

সে তার নিজের ছেলের জন্যে রাখবে আর আমার বাবুর জন্যে রাখবে না কেন?

রানু একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মিলি বড় ঝামেলা করে। তার সঙ্গে টেলিফোন কথা বলা মানেই হচ্ছে সমস্তটা দিন মাটি। তাও একবারে তার কথা শেষ হবে না। টেলিফোন নামিয়ে রাখার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার রিং করবে।

আফা আপনার চা।

শুধু চা নয় সঙ্গে বিসকিট চানাচুর। একটা ট্রেতে করে বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে এনেছে। রুপোর ট্রে। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কতবার বলেছি এই ট্রেটা কখনো বের করবে না। বলিনি?

আকবরের মা জবাব দিল না।

টগর কোথায়?

ঘুমাইতাছে।

এখন ঘুমাচ্ছে কী? এখন ঘুমাবার সময়?

নিজে নিজে গিয়া বিছানায় শুইছে। এখন গিয়া দেখি ঘুমাইতাছে। আবার ঘুমের মইধ্যে হাসে।

টগর শুয়েছে তার ছোট খাটে। আরাম করে ঘুমুচ্ছে। নিজের বাড়িতে ফিরে আসার আনন্দেই ঘুম এসে গেছে বোধ হয়। রানু টগরের কপালে হাত রেখে উত্তাপ দেখল  গা ঠাণ্ডা। সে মৃদু স্বরে ডাকল  টগর, বাড়ি যাবে না? টগর জবাব দিল না। সত্যি সত্যি ঘুমুচ্ছে, ভান নয়।

আফা বাজার আসছে।

বাজার আসছে ভাল কথা, আমাকে ডাকছ কেন?

কী রানমু কন।

রোজ দিন যা রাঁধ তাই রাঁধবে। আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন? ঘর পরিষ্কার করেছ?

জি না।

আগে ঘর ঠিকঠাক কর। এ রকম নোংরা বাড়িতে আমি দাঁড়িয়েই থাকতে পারছি না। গা ঘিন ঘিন করছে।

আকবরের মা ভয়ে ভয়ে বলল  আফা আপনে দুপুরে খাইতেন না?

না আমি দুপুরে খাব না। টগরের ঘুম ভাঙলেই চলে যাব।

বাজার দেখতেন না?

জীতু মিয়া পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল। রানু বলল, কেমন আছিস তুই? দেখি এদিকে আয় তো। জীতু মিয়া এগিয়ে এসে টপ করে পা ছুঁয়ে সালাম করল।

টগর নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। নিশ্চিন্ত আরামের ঘুম। রানু তার পাশে কিছুক্ষণ বসল। তারপর বারান্দায় গিয়ে বসল খানিক্ষণ। এখানে কিছু ফুলের টব ছিল। দুটি রজনীগন্ধার ঝাড় শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। পানি-টানি দেয়া হয় না।

ওসমান সাহেব বারটার দিকে এলেন। কিছু কিছু মানুষ কখনও অবাক হয় না। তিনিও কী সে রকম? রানুকে চেয়ার পেতে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে একটুও অবাক না হয়ে বললেন, কেমন আছ?

ভাল।

টগরকে নিয়ে এসেছ?

হ্যাঁ। ঘুমুচ্ছে।

শরীর ঠিক আছে তো?

ঠিকই আছে।

তিনি লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, তুমি আসবে জানলে ঘর-দোয়ার ঠিকঠাক করে রাখতে বলতাম। আঁস্তাকুড় বানিয়ে রেখেছে।

এদের কিছু বল না কেন?

প্রথম প্রথম বলতাম। এখন বলি না। মানুষের এক সময় সব কিছুই অভ্যাস হয়ে যায়।

কিছু  কিছু জিনিস অভ্যাস হওয়া ঠিক না। নোংরামি হচ্ছে তার মধ্যে একটা।

তিনি অল্প হাসলেন। হাসি মুখেই বললেন, তুমি না এলে আজ তোমার ওখানে যেতাম। যদিও আজ বুধবার না। তবে আজকের দিনটা ইম্পর্টেন্ট। আমার একটা বই রাশিয়ান ভাষায় অনুবাদ হবে বলে খবর পাওয়া গেছে। ফাইন্যাল কিছু না অবশ্যি।

কোন বইটা?

আন্দাজ কর তো কোনটা?

রানু কিছু বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, চা-টা কিছু খেয়েছ?

হ্যাঁ।

আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলে কেমন হয় রানু? রাতে কোন একটি ভাল রেস্টুরেন্ট...

রানু সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিরক্ত স্বরে বলল, মিলি টেলিফোন করেছিল। সে তার বাবুর জন্যে একটা নাম চেয়েছে আর তুমি বলেছ মাকাল নাম রাখার জন্যে, এর মানে কী?

ওসমান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, এ রকম ক্রুয়েল রসিকতা কারো সঙ্গেই করি না। মিলি বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বলে। ওর কথা বাদ দাও। আমার প্রশ্নের জবাব দাও। থাকবে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত?

মিলি চুপ করে রইল। ওসমান সাহেব বললেন, আমি কখনো তোমার কাছে বেশি কিছু চাইনি, চেয়েছি?

এত প্যাঁচাল প্রশ্নের দরকার নেই। যা বলতে চাও সরাসরি বল?

তিনি নরম করে বললেন, তুমি থাকবে আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত?

না। এখানে এসেছি বলেই তুমি অন্য রকম ভাবতে শুরু করেছ। অন্য রকম ভাবার কোনো কারণ নেই। আমি যা করেছি খুব ভেবে-চিন্তে করেছি। আমি কোনো খুকি না। হুট করে কিছু করার বয়স আমার না।

ওসমান সাহেব অল্প হাসলেন। রানু ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, হাসছ কেন?

তোমার রাগ দেখে হাসছি। অনেকদিন রাগতে দেখি না তোমাকে।

রানু বলল, আমি এখন উঠব। তুমি যদি তোমার ছেলেকে রাখতে চাও রাখতে পার।

না, রাখতে চাই না। মাঝরাতে তোমার জন্যে কাঁদতে শুরু করবে।

ভুলেই গিয়েছিলাম বাচ্চাদের কান্না তো তুমি আবার সহ্য করতে পার না। তোমার সূক্ষ্ম অনুভূতি আহত হয়। লেখা আটকে যায়।

লেখা আমার এমনিতেই আটকে গেছে। একটি লাইনও লিখতে পারছি না।

সাহিত্যের তো তাহলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

ওসমান সাহেব ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এখন তো আমরা দুজন দু'প্রান্তের মানুষ। তুমি এসেছ বেড়াতে। কাজেই আমরা কী এখন সহজ ভাবে গল্প-টল্প করতে পারি না?

রানু চুপ করে রইল।

তোমার অফিস কেমন চলছে রানু?

ভালই।

চাকরি মনে ধরেছে?

মনে ধরাধরির কী আছে? চাকরি কী স্বামী নাকি যে মনে ধরতে হবে?

ওসমান সাহেব প্রায় নিশ্চিত মনে ছিলেন রাতের খাবার পর্যন্ত রানু থাকবে। কিন্তু সে থাকল না।

## ১০

মিলি সেজেগুজে বেরুচ্ছিল। তার শাশুড়ি, সুরমা তাকে ডাকলেন। সুরমার বয়স প্রায় পঞ্চাশ, কিন্তু এখনো তাঁর মাথার চুল পাকেনি। চামড়ায় ভাঁজ পড়েনি। ভদ্রমহিলা ছোটখাটো। কথা বলেন নিচু গলায় কিন্তু যা বলেন খুব স্পষ্ট করে বলেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বললেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে তিনি এ সংসারের সর্বময় কর্ত্রী। এবং আরো দীর্ঘদিন তাঁর কর্তৃত্ব থাকবে।

মিলি শাশুড়িকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। সে সুরমাকে বেশ ভয় করে। সুরমা ঠাণ্ডা গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ মা?

এই একটু বাইরে যাচ্ছি, এসে পড়ব।

যখন তখন হুটহাট করে বাইরে যাওয়া ঠিক না।

মিলি কি বলবে বুঝে উঠতে পারল না। সুরমার মনের ভাব ঠিক ধরা যাচ্ছে না। তিনি কথা বলছেন মিষ্টি গলায়। আদর করার ভঙ্গিতে।

তুমি মা একা একা বেড়াও। এই শহর কী একা একা ঘুরে বেড়ানোর শহর? এখন যাচ্ছ কোথায়?

বাবার কাছে যাব। তার শরীরটা ভাল না। খুব জ্বর।

সুরমা তাকিয়ে রইলেন, কিছু বললেন না। মিলি হড়বড় করে বলল,

একশ চার পর্যন্ত উঠেছিল। মাথায় পানি-টানি ঢেলে রক্ষা। এই বয়সে এ জ্বর ওঠা খুব খারাপ।

কিন্তু কাল তো কিছু বলনি। কাল গিয়েছিলে না তার ওখানে?

মিলি আমতা আমতা করে বলল, কাল বলতে মনে ছিল না।

সুরমা শীতল কণ্ঠ বের করলেন। কিন্তু শীতল হলেও গলার স্বরের অদুরে ভঙ্গিটি নষ্ট হল না।

ঠিক আছে মা, যাও বাবাকে দেখে আস। ছেলেমেয়ে বাবাকে না দেখলে কে দেখবে?

তা তো ঠিকই। তাছাড়া বাবা একা মানুষ। সব সময় চিন্ত-ভাবনা করেন। আমাদের নিয়ে তাঁর খুব চিন্তা।

সুরমা গভীর হয়ে বললেন, এটা তো মা ঠিক বললে না। বেয়াই সাহেব চিন্তা-ভাবনা নিশ্চয়ই করে কিন্তু তোমাকে নিয়ে না। যতদিন বিয়ে হয়েছে একদিন এসেছেন তোমাকে দেখতে? নাতনী হবার খবর পেয়েও তো আসেননি।

বাবার গাড়িটা মা নষ্ট। তিনি একে বারে অচল।

যাদের গাড়ি নেই তারা বুঝি চলাফেরা করে না?

মিলি এর কী উত্তর দেবে বুঝতে পারল না। সুরমা হাসি মুখে বললেন, তোমার বাবা যেমন তোমার লেখক ভাইও সে রকম। সেও তো আসে না। তারও বুঝি গাড়ি নষ্ট?

ভাইয়ার তো গাড়ি নেই মা। ও রিকশাতেই ঘোরাফেরা করে। খুব অসামাজিক তো, তাই কোথাও যায় না। লেখক মানুষ, নিজের চিন্তা-ভাবনা নিয়ে থাকে। ভাইযার কোনো দোষ ধরা ঠিক না মা। সে তো আর আমাদের মত সাধারণ মানুষ না।

তা তো ঠিকই। সাধারণ কেন হবে। ঠিক আছে মা যাও ঘুরে আস। তোমার দেরি করিয়ে দিলাম।

মিলির মনটাই খারাপ হয়ে গেল। একবার ভাবল যাবে না কোথাও। ঘরে শুয়ে থাকবে। কিন্তু দুপুরে সে ঘুমুতে পারে না। বিছানায় গড়াগড়ি করতে খুব খারাপ লাগে। কারো সঙ্গে গল্প করে সময় কাটানোরও উপায় নেই। ননদ গিয়েছে ইউনিভার্সিটিতে। আগে সে দুপুর নাগাদ ফিরে আসত। এখন ফিরছে না। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় আসছে। তার হাবভাবে কিছু একটা গোপন করার চেষ্টা। মিলির ধারণা তার এই বোরকাওয়ালির কোনো একটা ছেলের সঙ্গে ভাব-টাব হয়েছে। হয়ত লাইব্রেরির বারান্দায় বসে আড্ডা দেয়। তখনো বোরকা থাকে কী না এটা মিলির দেখার সখ। কিন্তু ভর দুপুরে ইউনিভার্সিটি এলাকায় যেতে ভয় ভয় লাগে বলে যাওয়া হয় না।

আজ সে রিকশা নিয়ে শাহবাগ চলে গেল। একটা স্ন্যাকবারে ঢুকে ঠাণ্ডা পেপসি খেল, যদিও তার মোটেও তৃষ্ণা হয়নি। সেখান থেকেই দেখল ছেলেমেয়ে নিয়ে দুটা ফ্যামিলি ঢুকছে মিউজিয়ামে। মিলি এখনো এই মিউজিয়াম দেখেনি, কাজেই সে মিউজিয়াম দেখতে গেল। দোতালায় রাজা-মহারাজাদের পালঙ্ক দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। দীর্ঘ সময় সে ঘুর ঘুর করল পালঙ্কের আশপাশে। এক বিদেশিনী পালঙ্কের ছবি তুলছিল। মিলির ইচ্ছা হল বলে "দয়া করে আমারও একটা ছবি তুলে দেন না।" ইংরেজিতে এটা কিভাবে বলতে হবে বুঝতে না পারার জন্যে শেষ পর্যন্ত বলতে পারল না। তবে সে ঘুরতে লাগল বিদেশিনীর সঙ্গে সঙ্গে।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে আসবার মুখে রিসিপশনের মেয়েটিকে বলল, আমার একটা টেলিফোন করা খুব জরুরি কোত্থেকে করতে পারি বলতে পারেন? এখন একটা টেলিফোন করতে না পারলে বিরাট বিপদ হয়ে যাবে।

মিলি তার মুখ এতই করুণ করে ফেলল যে তার নিজেরই কান্না পেয়ে যেতে লাগল। এবং এক সময় সত্যি সত্যি চোখে পানি এসে গেল। রিসিপশনিস্ট মেয়েটি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে তাকে টেলিফোন জোগাড় করে দিল। সে ডায়াল ঘুরিয়ে হাসি মুখে বলল, কেমন আছ ভাইয়া? ঘুমুচ্ছিলে নাকি? না? তাহলে কী লিখছিলে? বলত কোত্থেকে ফোন করছি? একশ টাকা বাজি, বলতে পারবে না। যে জায়গা থেকে করছি তার প্রথম অক্ষর হচ্ছে 'ম'। কী আন্দাজ করতে পারছ?

রিসিপশনিস্ট মেয়েটি অবাক হয়ে মিলির কথাবার্তা শুনতে লাগল।

## ১১

রাত এগারোটার সময় নবী এসে উপস্থিত। তার চোখ রক্তবর্ণ। কথাবার্তা অসংলগ্ন। ঠিকমত দাঁড়াতেও পারছে না। জীতু মিয়া বলল, সায়েব ঘুমাইতেছে। নবী ধমকে উঠল।

ডেকে তোল। বল গিয়ে নবী এসেছে।

জীতু মিয়া ডেকে বলবে সে রকম ভরসা বোধ হয় তার হল না। নবী গলা উঁচিয়ে ডাকল,—

ওসমান।

ওসমান সাহেব বাতিটাতি নিভিয়ে সত্যি সত্যি শুয়ে পড়েছিলেন। হাঁকডাকে বেরিয়ে এলেন।

ওসমান, হাউ আর ইউ?

ভাল। আপনার অবস্থা?

অবস্থা তো দেখতেই পারছেন। খুব ভাল না। বসতে পারি?

হ্যাঁ পারেন।

বেশিক্ষণ বিরক্ত করব না। ঘুমুচ্ছিলেন শুনলাম। কোনো লেখক রাত এগারোটায় ঘুমোয় বলে জানতাম না। রাত হচ্ছে ক্রিয়েটিভিটির সময়। রাতে ঘুমুবে ননক্রিয়েটিভ লোক।

নবী সোফায় বসল। পরক্ষণেই সোফা বদলে বেতের চেয়ারে বসল। সেটিও পছন্দ হচ্ছিল না বোধ হয়। বিরক্ত ভঙ্গিতে শরীর নাড়াচ্ছে। ওসমান সাহেব বললেন, চায়ের কথা বলব? কিংবা কোন খাবার-দাবার?

না। কফি থাকলে দিতে পারেন। নেশাটা কমানো দরকার। সুস্থ মাথায় আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই। আপনি বসুন।

ওসমান সাহেব বসলেন। ঘরে কফি নেই। কফির কথা বলা হল না। নবী ঠিক কী বলতে এসেছে বুঝতে পারছেন না। অনুমান করতেও চেষ্টা করলেন না। নবীর ব্যাপারে আগেভাগে কিছু অনুমান করা মুশকিল।

নবী সিগারেট ধরাল। গম্ভীর হয়ে বলল, একটা সায়েন্স ফিকশন লেখার কথা ভাবছি। আইডিয়াটা নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি।

সায়েন্স ফিকশনের আইডিয়া নিয়ে আলাপ করবার জন্যে কেউ দুপুর রাতে অন্যের বাড়ি যায় না। ওসমান সাহেবের মনে হল এটা হচ্ছে প্রস্তাবনা। এরপরে আসল কথা আসবে।

আইডিয়াটা এ রকম-একটি গ্রহের কথা আমি বলব। সেই গ্রহে প্রাণের বিকাশ হয়েছে অদ্ভুতভাবে। সেখানে পুরুষ এবং নারী বলে কিছুই নেই। যৌনতার ব্যাপারটি নেই। সবাই জীবনের এক পর্যায়ে গর্ভধারণ করে। ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র এদের মৃত্যু হয়। কাজেই সে গ্রহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোনো ব্যাপার নেই।

গর্ভধারণের ব্যাপারটিই হয় কিভাবে?

সেটা নিয়ে এখনও ভাবিনি। তবে যৌন মিলনের কোনো ব্যাপার নেই। আইডিয়া হিসেবে আপনার কাছে কেমন লাগছে?

ভালই।

শুধু ভালই বলাটা ঠিক হল না। এই গল্পে নতুন ধরনের জীবনযাত্রা, নতুন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা আমি আনব। এ ধরনের একটি আইডিয়াকে শুধু ভালই বলে চালানো ঠিক নয়। আপনি বলুন— খুব চমৎকার আইডিয়া।

খুব চমৎকার আইডিয়া।

নবী উঠে দাঁড়াল- আপনার বাথরুমটা ব্যবহার করতে চাই।

আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।

হুইস্কি আমার সহ্য হয় না। বমি করতে হবে। দামী একটা নেশা বমি করে নষ্ট করাটা ক্রাইম। কিন্তু উপায় নেই।

নবী বাথরুম থেকে বের হতে অনেক দেরি করল। ওসমান সাহেব আকবরের মাকে দিয়ে লেবু চা বানালেন। নেশা উগরে দেওয়ার পর চা খেতে হয় তো ভাল লাগবে। নবী চা খেল না। কোট কাঁধে ফেলে বলল, আমি এখন যাব।

চা খাবেন না?

না, আগেই তো বলেছি খাব না।

ওসমান সাহেব নবীকে এগিয়ে দেবার জন্যে রাস্তা পর্যন্ত এলেন। নবীর লাল রঙের ওপেল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। যে ঠিকমত পা ফেলতে পারছে না সে গাড়ি চালিয়ে যাবে- ভাবতেই অস্বস্তি বোধ হয়।

নবী ড্রাইভিং সিটে বসে সে হঠাৎ বলল,- মনিকার সঙ্গে কী আজ সারাদিনে আপনার কোনো যোগাযোগ হয়েছে?

না। টেলিফোনেও কোন কথা হয়নি?

না। কেন?

নবী গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। নিচু গলায় বলল, মনিকার স্বামী মারা গেছে। আমার ধারণা ছিল সে আপনাকে জানিয়েছে।

কবে মারা গেছে?

কবে মারা গেছে জানি না। মনিকা খবর পেয়েছে আজ ভোরে। আমি দেখতে গিয়েছিলাম। খুব কান্নাকাটি করছিল।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। মনিকা খুব কান্নাকাটি করছে এই দৃশ্যটি তিনি কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন। সে চেঁচিয়ে নিশ্চয়ই কাঁদবে না, কিংবা কে জানে হয়ত চেঁচিয়েই কাঁদবে। একটি অত্যন্ত রূপসী মেয়ে কাঁদছে দৃশ্যটি কল্পনায় চমৎকার কিন্তু বাস্তবে কুৎসিত। বেশ কিছু সুন্দরী মেয়েকে তিনি কাঁদতে দেখেছেন। তার কাছে কখনও ভাল লাগেনি।

নবী বলল, আমি ঠিক স্টেডি ফিল করছি না। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। আজ রাতটা আপনার ঘরে কাটিয়ে দেয়া যাবে?

যাবে। আসুন।

নবী গাড়ি লক করে দোতালায় উঠে এল খুব সহজভাবেই বলল, কাউকে বলুন গরম পানি করে দিতে, আমি একটা হট সাওয়ার নেব। একটা স্যান্ডউইচ বা এই জাতীয় কিছু দিতে বলুন। ভাল কথা, আমার শোবার ঘরে কিছু কাগজ রাখবেন। মাঝেমধ্যে শেষ রাতের দিকে আমার লিখতে ইচ্ছা করে।

ওসমান সাহেব মৃদু হাসলেন। উপহাসের হাসি কিনা ঠিক ধরা গেল না।

ওসমান সাহেব।

বলুন।

আসুন একটা কাজ করা যাক সায়েন্স ফিকশনের যে আইডিয়াটা আপনাকে বললাম তার ওপর আপনি একটি লেখা তৈরি করুন আমিও একটি করি।

কেন?

কে আইডিয়া কেমন খেলাতে পারে তাই দেখা, এর বেশি কিছু নয়। আপনি যা ভাবছেন তা না।

আমি কী ভাবছি?

আপনি ভাবছেন এটা একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার। তা নয়। এ দেশে আমি কাউকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না।

ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, আপনার বিছানা তৈরি আছে, আসুন ঘর দেখিয়ে দিই। নবী রুক্ষ স্বরে বলল আপনি কী আমার ওপর বিরক্ত?

না, আমি সহজে বিরক্ত হই না।

তাহলে আমার আইডিয়া নিয়ে আপনি লিখতে চান না?

না।

ওসমান সাহেব ঘুমুতে গেলেন অনেক রাতে। নবী প্রচুর ঝামেলা করল। গরম পানি দিয়ে গোসল করল। চা খেল। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে হো হো করে হাসল নিজউ কিভাবে দেয় দেখেছেন? চাচার হাতে ভাতিজা খুন। চাচার হাতে খুন লিখলেই তো বুঝা যায় ভাতিজা খুন হয়েছে। কী দরকার ভাতিজা খুন লেখা।

খবরের কাগজ পড়া শেষ হবার পর সে টেলিফোন নিয়ে বসল। রাত তখন দেড়টা। এই গভীর রাতে কাকে যেন ঘুম থেকে তুলে ধমকাতে শুরু করল। পরক্ষণেই অন্য কাউকে টেলিফোন করে মজার মজার সব কথা বলে খুব হাসতে লাগল।

ওসমান সাহেব জেগে রইলেন অনেক রাত পর্যন্ত। ঘুমের অনিয়ম হয়েছে। সারারাত হয়ত জেগে থাকতে হবে। একা একা জেগে থাকা একটা যন্ত্রণার ব্যাপার। পাশের কামরায় নবী অবশ্যি এখনও জেগে। কী সব খুটখাট করছে তবু একা একাই লাগছে নিজেকে।

তিনি মশারির ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নিলেন। মশারির ভেতর সিগারেট খাওয়া রানু খুব অপছন্দ করত। কিন্তু এর মধ্যে একটি মজার ব্যাপার আছে ধোঁয়া আটকে থাকে মশারির ভেতর। যেন সাদা মেঘ চারপাশে জমতে শুরু করেছে। বিশাল মেঘের টুকরো নয় ছোট্ট

একটি নিজস্ব মেঘ। এবং এটিকে তৈরি করেছেন নিজেই।

ওসমান সাহেব সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলেন ঠিক এই মুহূর্তে এ শহরে কতজন মানুষ জেগে আছে। জেগে আছে না বলে বলা যাক ঘুমুতে পারছে না। চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। একদল জেগে আছে ক্ষুধার যন্ত্রণায়। অন্য আরেক দল রোগ যন্ত্রণায়। বাকিরা সবাই সৌখিন নিশি যাপনকারী। তিনি, নবী সাহেব এবং মনিকা।

মনিকা নিশ্চয়ই জেগে আছে। এবং নবীর কথা অনুযায়ী ধরে নিতে হয় খুব কান্নাকাটি করছে। এখনও কী কাঁদছে? মেয়েদের কান্নার ব্যাপারে তাঁর একটা মজার অবজারভেশন আছে। কিশোরীরা কাঁদে লুকিয়ে। যুবতীরা কাঁদে প্রকাশ্যে। প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধরা আশপাশে বেশ কিছু মানুষজন না থাকলে কাঁদতেই পারে না।

রানু তাঁর এ কথায় খুব রেগে গিয়েছিল। থমথমে মুখে বলেছিল, কী ভাব তুমি মেয়েদের মেয়েদের ছোট করে দেখবার একটা প্রবণতা আছে তোমার মধ্যে। এর মধ্যে ছোট করে দেখবার কী আছে তিনি বুঝতে পারেননি। রানুর হঠাৎ রেগে যাওয়া দেখে দুঃখিত ও লজ্জিত হয়েছেন।

রানু কখন থেকে তাঁকে অপছন্দ করতে শুরু করেছে? বিয়ের পর পরই কী? দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকলে দুজনের ভেতরে ক্রমে ক্রমে ভালবাসা জন্মাতে থাকে। তাদের মধ্যে সে রকম হয়নি। রানু তাঁর প্রতিটি ব্যাপারে বিরক্ত হতে শুরু করল গোড়া থেকেই।

মশারির ভেতরে মেঘ তৈরি করছ? এই সব হালকা ধরনের কথা বলে আমাকে ভুলাতে চাও কেন? বল, তোমার আলসী লাগছে।

ওসমান সাহেব বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। রাত প্রায় শেষ হয়ে আসছে, চারটা দশ বাজে। কিছুক্ষণের ভেতর আকাশ ফর্সা হতে শুরু করবে। তিনি বসার ঘরে এলেন। নবীর দরজা হাট খরে খোলা। সে এই শীতেও খালি গায়ে চেয়ারে বসে দ্রুত লিখছে। চমৎকার একটি দৃশ্য। তিনি দীর্ঘদিন কিছু লিখতে পারছেন না।

নবী চোখ তুলে একবার দেখল। অত্যন্ত সহজ গলায় বলল, সায়েন্স ফিকশনটা নামিয়ে দিচ্ছি।

ভাল।

আজ সারাদিন চালাব। ননস্টপ, ফ্লো এসে গেছে। কাইন্ডলি কফির ব্যবস্থা করুন।

কফি নেই চা খেতে পারেন।

হোক। চা-ই হোক।

তিনি নিজেই চা বানাতে গেলেন। হাতের কাছে কিছুই পাওয়া গেল না, চিনির পট, দুধের কৌটা কিছুই নেই। সংসার অগোছালো হয়ে গেছে। অগোছালো এবং অপরিচ্ছন্ন। রান্না ঘরের বেসিনের উপর রাতের থালাবাটি পড়ে আছে। টক টক একটা গন্ধ ছাড়ছে। আকবরের মাকে আজ কিছু কড়া কড়া কথা বলতে হবে।

কী ওসমান সাহেব। আপনার চা কোথায়?

একটু দেরি হবে। আকবরের মা উঠুক ঘুম থেকে।

ডেকে তুলুন না। ডেকে তুললেই হয়।

নবী উঠে এসে উঁচু গলায় ডাকতে লাগল, এ্যাই এ্যাই।

আকবরের মা ঘুম থেকে উঠে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

জলদি চা বানাও। তুরন্ত। চা বানানো হয়ে গেলে গরম পানি করবে। আই উইল টেক এনাদার হট বাথ।

ওসমান সাহেব দেখলেন নবীর চোখ মুখ উজ্জ্বল। লেখার কাজ নিশ্চয়ই ভাল হচ্ছে। নবী বলল,

প্রথম কয়েক পাতা শুনবেন নাকি? পড়ে শুনাতে পারি।

আপনি শেষ করুন। তারপর শুনব।

সন্ধ্যা নাগাদ শেষ হবে। আমি কী সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে পারি? এখন জায়গা বদল করতে চাই না।

নিশ্চয়ই থাকতে পারেন।

আপনি কফির ব্যবস্থা করবেন?

হ্যাঁ করব।

সকাল আটটার দিকে ওসমান সাহেব বের হলেন। নবীকে কিছু বলে গেলেন না। কোথায়

যাবেন কিছু ঠিক নেই। একবার কলেজে যাওয়ার দরকার। শারীরিক কারণে তিন মাসের ছুটি নেয়া আছে। সেই ছুটি বাড়িয়ে ছ'মাস করতে চান।

রাস্তায় নেমেই ভাবলেন চাকরিটা ছেড়ে দিলে কেমন হয়? মন বসছে না। একদল ছাত্র তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তিনি কথা বলবেন। তাঁরা নোট নেবে। হাই তুলবে। তাদের চোখে-মুখে থাকবে অপরিসীম ক্লান্তি। ভাল লাগে না। এতটুকুও ভাল লাগে না।

রাস্তায় একটা মিছিল বের হয়েছে। নির্জিব মিছিল। একদল রোগা ও ক্লান্ত মানুষ চিকন গলায় চেঁচাচ্ছে, দিতে হবে দিতে হবে। ঢাকা শহরের মিছিলগুলি সহজেই জমে যায়। ছোট একটি মিছিল দেখতে দেখতে ফুলেফেঁপে ওঠে। সমুদ্র গর্জনের মত শব্দ উঠতে থাকে। কিন্তু এই মিছিলটি ক্রমেই যেন প্রাণ হারিয়ে ফেলছে। প্রথম দিকের একজন নেতা গোছের কেউ মিছিল ভেঙে পানি কিনতে এল।

ওসমান সাহেব মিছিলের পেছনে হাঁটতে লাগলেন। রোদ ভালই লাগছে। শীতের সকালের রোদের মতো ভাল জিনিস আর কী হতে পারে? তাঁর প্রথমদিকের একটি উপন্যাসে শীতের রোদকে তুলনা করেছিলেন শিশুর আলিঙ্গনের সঙ্গে। শিশুর দেহের ওম ওম ভাবটি আসে শীতের রোদ থেকে। অতি বাজে ধরনের তুলনা।

আরে আপনি এখানে?

তিনি তাকিয়ে দেখলেন চশমা পরা একটি রোগা ছেলে। মাথা ভর্তি লম্বা চুল। কোন তরুণ কবি বা গল্পকার হবে।

আমাকে চিনতে পারছেন তো?

তিনি একটি পরিচিতের হাসি দিলেন।

আপনি এখানে কী করছেন?

এই হাঁটছি আর কী?

কিসের মিছিল এটা জানেন?

না। কিসের?

ট্রাক ড্রাইভার এসোসিয়েশনের। এক ট্রাক ড্রাইভার একটি ছেলেকে চাপ দিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। পুলিশ হেভি পিটন দিয়েছে। পাবলিকও দিয়েছে। তার প্রতিবাদে মিছিল। চলে আসেন।

ওসমান সাহেব চলে এলেন না। হাঁটতে লাগলেন নিজের মনে। ছেলেটি বলল, লেখালেখি কেমন হচ্ছে স্যার?

হচ্ছে না।

কিছু মনে করবেন না স্যার। আপনার ইদানীংকালের লেখাগুলি আগেরগুলির মত হচ্ছে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ইদানীংকালের লেখাগুলি মনে হয় পপুলার ডিমান্ডে লেখা। তেমন ডেপথ নেই।

তুমি কী আমার ইদানীংকালের লেখাগুলি পড়েছ?

কিছু কিছু পড়েছি।

দু'একটার নাম বলতে পারবে?

ছেলেটি চুপ করে গেল। ছেলেটি তাঁর নতুন লেখাগুলি পড়েনি। আগের গুলিও হয়ত পড়েনি। ওসমান সাহেব মৃদু হেসে বললেন, না পড়ে কোনো মন্তব্য করা ঠিক না। তুমি কী সিগারেট খাবে? ভাল সিগারেট আছে খাওয়াতে পারি।

জি না। আমার একটা কাজ আছে? আমি মতিঝিল যাব।

ঠিক আছে দেখা হবে পরে।

তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগলেন। মিছিল গুলিস্তানের কাছে এসে ভেঙে গেল। ক্লান্তি লাগছিল। তিনি একটা রিকশা নিলেন। কোথায় যাওয়া যায়? মনিকার কাছে যাবেন কী? তার মনে হল মনিকার কাছে যাবার ইচ্ছাই এতক্ষণ পুষে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি ওর কাছে যাবেন না। শোকের ব্যাপারগুলি থেকে তিনি দূরে থাকতে চান। এখন মনিকাকে ঘিরে অনেকেই বসে আছে। এ সময় উপস্থিত হবার কোনো মানে হয় না। কিন্তু তবু মনিকার বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামলেন।

অনেকগুলি গাড়ি পার্ক করা। তাঁর চোখের সামনেই বিরাট একটা নীল রঙের গাড়ি থামল। কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল হয়ে গেছে এমন একজন মহিলা নামলেন। মহিলাটির পরনে ধবধবে সাদা সিল্কের শাড়ি। কাশ্মিরী একটি শাল কাঁধে। শালটির রঙ টকটকে লাল। সাদার সঙ্গে লালের কম্বিনেশন কী চমৎকার লাগছে।

ওসমান সাহেব বাড়িতে ঢুকলেন না। কিন্তু এখন কোথায় যাওয়া যায়? তাঁর যাবার জায়গা দ্রুত কমে আসছে। হয়ত এমন একটি সময় আসবে যখন কোথাও যাবার জায়গা থাকবে না। নিজের ঘরেই থাকবে দিন-রাত। কিছুক্ষণের জন্য রাস্তায় হাঁটবেন তারপর আবার ফিরে যাবেন নিজের জায়গায়।

রানুদের বাসায় গেলে কেমন হয়? আজ বুধবার না। তাতে কী? দেখা যাক না হঠাৎ উপস্থিত হলে কী হয়। টগর নিশ্চয়ই খুব অবাক হবে।

রানুরা বাসায় ছিল না। দরজা তালা বন্ধ। কয়েকটা দিন খুব খারাপভাবে শুরু হয়। আজও কী সে রকম একটি দিন? মিলিদের বাসায় গেলে কেমন হয়? মিলি কী আছে? না সেও ঘরে তালা দিয়ে উধাও হয়ে গেছে কোথাও।

অবশ্যি মিলিদের বাসা কোথায় তাঁর পরিষ্কার ধারণা নেই। ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া যাবে না। তিনি বাড়ি ফিরে এসে শুনলেন তাঁর বাবার আরেকটি স্ট্রোক হয়েছে। ওসমান সাহেবের ক্লান্তি লাগছিল। বাবার কাছে যেতে ইচ্ছা করছিল না।

## ১২

ফয়সল সাহেব পিঠের নিচে দুটি বালিশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন। তাঁর মুখ দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে ভোর বেলাতে তাঁর উপর দিয়ে বড় রকমের একটা ঝড় গিয়েছে। লোকজন তাঁকে দেখতে আসতে শুরু করেছে। সবাই একই কথা বিভিন্নভাবে বলছে।

কী করে ব্যাপারটা হল?

ব্যথাটা প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল?

ডাক্তারের কাছে কখন গেলেন?

ডাক্তার কী বলল?

এখন অবস্থা কী?

খাওয়া-দাওয়া কী করছেন?

ফয়সল সাহেব দুপুরের মধ্যেই মহাবিরক্ত হয়ে গেলেন। বীথিকে ডেকে বললেন, যেসব প্রশ্ন সবাই আমাকে জিজ্ঞেস করছে সেগুলির উত্তর লিখে তুমি দেয়ালে টানিয়ে দাও। এক দুই করে নম্বর দিয়ে দেবে।

বীথি হ্যাঁ সূচক ঘাড় নেড়েছে। অন্য কিছু বললেই তিনি রেগে যাবেন নানান তর্ক-বিতর্ক শুরু করবেন। এই ঝামেলায় না যাওয়াই ভাল।

দাঁড়িয়ে থাকবে না, এক্ষুণি লিখে ফেল। সবশেষে লিখবে এখন দয়া করে বিদেয় হন। যা জানবার সবই জেনেছেন। মিলি কী করছে?

রান্না ঘরে বাচ্চার দুধ গরম করছে।

একেবারে আণ্ডাবাচা নিয়ে চলে এসেছে? সে জানে না বাচ্চাকাচ্চা আমি পছন্দ করি না? ওকে বল বাসায় চলে যেতে। আমার মরার সময় এখনো হয়নি। সময় হলে তাকে খবর দেবে।

বীথি বলল, এটা বলা কী ঠিক হবে?

খুবই ঠিক হবে। তুমি বলতে না পারলে আমি বলব। ডেকে আন তাকে।

ডেকে আনতে হল না। মিলি তার ছেলে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকল। আদুরে গলায় বলল, তোমার পাশে ওকে শুইয়ে দেই।

কেন?

দুধ খাবে। ও দুধ খাওয়ার সময় কাউকে কাছে থাকতে হয়।

ফয়সল সাহেব রুক্ষ গলায় বললেন, ঝামেলা করিস না, ওকে নিয়ে বাসায় চলে যা।

মিলি তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে। সে বাবার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। মিলি তাকাল বীথির দিকে। বীথি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

বাসায় চলে যাব?

হ্যাঁ।

কেন?

কেন কী? এখানে থেকে লাভটা কী হচ্ছে? বাচ্চার ঘ্যান ঘ্যান পেশাব পায়খানা। একশ ঝামেলা।

কখন সে ঘ্যান ঘ্যান করল?

ফয়সল সাহেব প্রচণ্ড এক ধমক দিলেন। মা'র কোলের বাচ্চাটি এতক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল। এই বার সে কাঁদতে শুরু করল। মিলির নিজের চোখেও পানি এসে গেল। সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চোখ মুছল। মিলি ভেবে রেখেছে বেশ কয়েক দিন এ বাড়িতে থাকবে। স্যুটকেস গুছিয়ে এনেছে। কাজের একটি মেয়েকেও এনেছে সঙ্গে এখন কী হুট করে চলে যাবে? বাসায় গিয়ে বলব কী? বাবা তাড়িয়ে দিয়েছেন?

বাবু ক্রমাগত কাঁদছে। ক্ষিধের কান্না। বাবার কানে যাচ্ছে এবং তিনি নিশ্চয়ই আরো রাগছেন। মিলি সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে এল। আগে যে ঘরটিতে সে থাকত সেই ঘর সকালবেলা সে নিজের জন্যে গুছিয়ে নিয়েছে। এখন কেন যেন মনে হচ্ছে এটা অন্যের বাড়ি। এ ঘরে সে আগে কোনোদিন থাকেনি।

অসুখ সংক্রান্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দেয়ালে টানানোর পর ফয়সল সাহেব ঘোষণা করলেন, কাউকে যেন এ ঘরে ঢুকতে না দেয়া হয়। বীথিকে বললেন,

কাউকেই আসতে দেবে না। ওসমানকেও নয়। বুঝতে পারছ?

পারছি।

ওসমান কী এসেছিল?

জি না। এখনো আসেনি। খবর পাননি বোধ হয়।

খবর পেলেও আসবে না। মহালায়েক ছেলে। সাহিত্য সভাতে চলে গেছে। কিংবা কোনো মহাকাব্য লিখছে। মহাসাহিত্যিক তো। ও এলেই হাঁকিয়ে দেবে।

ফয়সল সাহেব সিগারেট ধরালেন। বীথি মৃদু স্বরে বলল, ডাক্তার খুব করে বলে গেছেন আপনি যেন সিগারেট না খান। তিনি বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকালেন।

মরবার সময় হয়ে গেছে, সিগারেট খেলেও মরব, না খেলেও মরব, কাজেই এসব নিয়ে বাজে তর্ক করবে না।

তিনি সিগারেট শেষ করে ঘুমুতে গেলেন। ঘুমুলেন সন্ধ্যা পর্যন্ত।

ওসমান সাহেব এলেন বিকেলে। বাড়ি ভর্তি মানুষ। সকালে যারা এসেছিল তাদের অনেকেই আবার এসেছে। ওসমান সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। এরা সবাই তাঁর আত্মীয়-স্বজন অথচ কাউকেই ভাল করে চেনেন না। মৃত্যু, অসুখ এইসব বড় বড় ঘটনার সময় তাদের দেখা পাওয়া যায়। তাঁরা আসেন। আন্তরিকভাবেই খোঁজ-খবর করেন।

ওসমান সাহেবকে দেখে কালো লম্বামত একজন বুড়ো মানুষ বললেন, ভাল আছ বাবা? ওসমান সাহেব হাসলেন। বুড়ো লোকটি বললেন, যাবার সময় হয়ে এসেছে আমাদের। সবাই চলে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের বলার ভঙ্গিতে কোন হতাশার ছোঁয়া নেই। যেন বেড়াতে যাবার মত কোনো ব্যাপার নিয়ে কথা বলছেন।

ওসমান সাহেব মনে মনে বললেন, যাবার সময় হল বিহঙ্গের। নিতান্তই অর্থহীন কথা। এ সময় এটা মনে হবার কোনই কারণ নেই। কিন্তু একেক সময় একেকটা কথা মনে আসে এবং ক্রমাগত ঘুরপাক খেতে থাকে। যাবার সময় হল বিহঙ্গের এই লাইনটি এখন মাথায় ঘুরতেই থাকবে। আটকে যাওয়া রেকর্ডের মত। কিছুতেই তাড়ানো যাবে না।

বুড়ো লোকটি বললেন, যাও বাবা তুমি ভেতরে যাও। আমরা আছি কিছুক্ষণ।

ওসমান সাহেবের কাছে এ বাড়ি এখন অপরিচিত বাড়ি। সহজভাবে ভেতরে যেতেও কেন জানি সংকোচ লাগছে। মনে হচ্ছে এক্ষুণি কেউ একজন এসে বলবে, আপনি কাকে চাচ্ছেন?

তিনি সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় উঠে গেলেন। এক সময় দোতলায় তাঁর এবং মিলির ঘর পাশাপাশি ছিল। মিলি একটু খুটখাট শব্দ হলেই ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলত, ভাইয়া একটু দেখত। চোর এসেছে। মিলির ভয় কী এখনো আগের মতই আছে? বিয়ের পর মেয়েদের অনেক কিছু বদলে যায়। ভীরু মেয়েরা হঠাৎ সাহসী হয়ে ওঠে। লাজুক মেয়েগুলি হাত নেড়ে নেড়ে হড়হড় করে

কথা বলে।

স্লামালিকুম। কখন এসেছেন?

বীথি, তাঁকে দেখে উঠে আসতে শুরু করেছে। উঠে আসার ভঙ্গিটি অত্যন্ত সাবলীল। এটা যেন তার নিজের বাড়ি-ঘর। সে অতিথির খোঁজ নিতে আসছে।

স্যারের ঘুম ভেঙেছে। আপনি কী দেখা করবেন?

আছেন কেমন?

ভালই। তবে খুব দুর্বল। সারা বিকাল ঘুমিয়েছেন। সাধারণত উনি বিকেলে ঘুমান না।

মিলি আসেনি?

এসেছে। সে ঘুমুচ্ছে।

সবাই ঘুমুচ্ছে। ব্যাপার কী?

বীথি হাসল। ওসমান সাহেব ভাবলেন, সুন্দর মেয়েদের সব কিছুই কী সুন্দর? তিনি এখন পর্যন্ত কোন সুন্দরী মেয়ে দেখেননি যাদের হাসি অসুন্দর।

স্যারের ঘরে যাবেন এখন?

ধীরে-সুস্থে যাই। তাঁর মেজাজ কেমন?

খুব খারাপ। সবার ওপর রেগে আছে। আপনি কী বসবেন বারান্দায়? চেয়ার এনে দেব?

না বসব না। দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে।

চা খাবেন? চা এনে দেব?

দিতে পারেন।

বীথি নেমে গেল। তাঁর আবার মনে হল এই মেয়েটি এ বাড়িতে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে চলাফেরা করছে। আশ্রিত মানুষ কখনো এত সহজ হয় না। তাদের চোখে-মুখে সবসময় একটা বিনীত ভাব ফুটে থাকে।

ভাইয়া তুমি কখন এসেছ?

মিলি বের হয়েছে তার ঘর থেকে। দীর্ঘ ঘুমের জন্য তার চোখ-মুখ ফোলা ফোলা।

তুই অসময়ে ঘুমুচ্ছিলি ব্যাপার কী?

রাতে তো আমার ঘুম হয় না, এই জন্যে দিনে ঘুমাই।

রাতে ঘুম হয় না নাকি?

না।

কেন?

এমনি হয় না। ভাইয়া, বাবা আজ আমার সঙ্গে খুব রাগারাগি করেছে।

তাই নাকি?

একটা বাইরের মেয়ের সামনে আমাকে অপমান করেছে।

বাইরের মেয়েটা কে? বীথি?

হ্যাঁ। ওর কাণ্ডকারখানা দেখেও অবাক হয়েছি। এমন ভাব করছে যেন সব কিছু তার। এ বাড়ির সব আলমারীর চাবি তার কাছে থাকে।

থাকুক না। তাতে অসুবিধা কী?

বাইরের একটা মেয়ের কাছে আলমারীর চাবি থাকবে? বলছ কী তুমি?

নিজের ছেলেমেয়েরা যখন কাছে নেই তখন এছাড়া আর কী করবেন। ও নিয়ে তুই কিছু বলতে যাবি না।

বলব না কেন? একশ বার বলব। তুমি যে ঘরটিতে থাকতে সে ঘরটিতে এখন সে থাকে। অথচ নিচে এতগুলি ঘর খালি পড়ে আছে।

আমি তো আর এখানে থাকি না। কাজেই কোনো অসুবিধা নেই।

যথেষ্ট অসুবিধা আছে। এ বাড়িতে আমাদের ঘরগুলি ঠিক আগের মত থাকবে। যখন ইচ্ছা আমরা আসব। যতদিন ইচ্ছা থাকব। নিজেদের ঘরগুলিতেই থাকব।

তুই থাকিস। তোর ঘর তোর খালিই আছে।

মিলি মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে রইল। বীথিকে ট্রেতে করে চা নিয়ে আসতে দেখে তাঁর মুখ আরো অন্ধকার হয়ে গেল। সে চাপা স্বরে বলল, আপনি ভাইয়ার ঘর দখল করে আছেন কেন?

ভাইয়া খুব বিরক্ত হয়েছে। সে প্রায়ই নিজের ঘরে এসে থাকে। আপনি আসার পর সে একবারও আসেনি।

বীথি অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওসমান সাহেব কী বলবেন ভেবে পেলেন না এমন অপ্রস্তুত করতে পারে মিলি।

কিন্তু বীথি মেয়েটি বেশ শক্ত, সে সহজেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। অন্য কোনো মেয়ে হলে সামলাতে পারত না। কেঁদে-টেঁদে ফেল।

বীথি বলল, স্যার আপনাকে ডাকছেন। চা খেযেই যান। চিনি হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

বাবা আপনার শরীর কেমন? ফয়সল সাহেব ছেলের প্রশ্নের জবাব দিলেন না। হাত উঁচিয়ে দেয়ালে টানানো প্রশ্নোত্তরগুলি দেখিয়ে দিলেন। ওসমান সাহেব মৃদু হাসলেন। বৃদ্ধ মানুষের মধ্যে শিশুর ব্যাপারগুলি দেখা দিতে থাকে কথাটা মিথ্যা নয়।

হাসছিস কেন? কাজটা হাস্যকর?

হ্যাঁ। এর উদ্দেশ্য যদি কথা কম বলা হত তাহলে হাস্যকর হত না। কিন্তু আপনি কথা কম বলছেন না। বরং আগের চেয়ে বেশি বলছেন।

ঘরে ঢুকেই সেটা বঝে গেলি? বড় সাহিত্যিক হযে গেছিস মনে হয়। শুদ্ধ করে তো তিনপাতা বাংলা লিখতে পারিস না।

ওসমান সাহেব একটা চেয়ার টেনে বাবার পাশে বসলেন। মৃদু স্বরে বললেন, রাগ করার মত কিছু তো বলিনি, রাগ করছেন কেন? এই শরীরে রাগ করাটা ঠিক হবে না।

বাগ করতে হলে দুধ-দৈ খেয়ে শবীর ঠিক করতে হবে? কী, চুপ করে আছিস কেন? বল শুনে ফেলি।

ওসমান সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, আমাকে দেখে আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন, আমি বরং যাই। পবে আসব। তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

বোস তুই, কথা আছে।

তিনি বসলেন। ফয়সল সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেশ কিছু সময় তাকিযে থাকলেন ছেলের দিকে।

কী বলবেন বলুন।

কেন তোর রাজকার্য পড়ে আছে নাকি? না কোনো মহাকাব্য লেখার কথা?

আমার লেখালেখি আপনার পছন্দ নয়?

এই সব নাকি কান্না আমার পছন্দ হবার কথা না। আমার বয়স হয়েছে। আমি বার বছরের খুকি না।

ফয়সল সাহেব বালিশের নিচ থেকে সিগারেট বের করলেন। তাঁর হয়ত ধারণা ছিল ওসমান নিষেধ করবে। কিন্তু ওসমান সাহেব কিছুই বললেন না।

তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে।

বলুন, আমি শুনছি।

ঠিক ঠিক জবাব দিবি।

তিনি বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বাবা কী বলবেন আঁচ করতে চেষ্টা করছেন।

শুনলাম বৌমা নাকি আলম নামের কোন এক ছেলেকে বিয়ে করেছে? কথাটা সত্যি?

কার কাছ থেকে শুনেছেন?

কার কাছ থেকে শুনেছি সেটা জরুরি নয়। ঘটনাটা সত্যি কী না বল।

আমি ঠিক জানি না।

কিছুই জানিস না। কিছুই শুনিসনি?

ওসমান সাহেব চুপ করে রইলেন।

বেকুবের মতো চুপ করে থাকিস না, কথার জবাব দে।

আমিও শুনেছি।

ঘটনা সত্যি?

সত্যি হতেও পারে। ও আমাকে একটা শিক্ষা দেবার জন্যে এটা করবে। ঐ ছেলেটির প্রতি তার আলাদা কোনো মমতা আছে বলে মনে হয় না।

তুই একটা মহাবেকুব। তুই বেকুব, তোর বোন বেকুব। দুইজনই বেকুব।

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। মৃদু স্বরে বললেন, এটাই কী আপনার জরুরি কথা?

না, এটা জরুরি কথা হবে কেন? তোদের কী হচ্ছে না হচ্ছে সেটা তোদের ব্যাপার? আই ডোন্ট থিংক আই কেয়ার।

জরুরি কথা কী বলুন শুনে যাই।

এখন বলতে ইচ্ছে করছে না।

ঠিক আছে আমি পরে আসব।

আসার কোনো দরকার নেই। যে সব বেকুবদের বৌ অন্য লোকের সঙ্গে ভেগে যায় তাদের সাথে দেখা – সাক্ষাৎ হওয়ার আমার কোনো প্রয়োজন নেই।

আপনি ব্যাপারটা যেভাবে দেখছেন আসলে এটা সেরকম নয়। আমরা আলাদা হয়েছিলাম। এই অবস্থায় তার যদি কোনো একটি ছেলেকে পছন্দ হয় এবং সে তাকে বিয়ে করে তাতে দোষের তো কিছু নেই।

ফয়সল সাহেব বাড়ি কাঁপিয়ে ধমকে উঠলেন— 'শাট আপ।' মিলি এবং বীথি দুজনেই ছুটে এল। মিলির কোলে তার বাচ্চাটি কাঁদছে। ওসমান সাহেব নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। বসার ঘরে অনেকেই তখনো বসে আছে। একজন বলল, চললেন? তিনি জবাব দিলেন না।

গেট খুলে বাইরে পা ফেলামাত্র মিলি বলল, ভাইয়া বাবা ডাকছে। তিনি ফিরে এলেন। ফয়সল সাহেব বেশ সহজ এবং স্বাভাবিক। বিছানায় বসে আছেন পা ঝুলিয়ে। ছেলেকে ঢুকতে দেখে পা দোলানো বাড়িয়ে দিলেন।

ডেকেছেন নাকি বাবা?

হুঁ বোস। জরুরি কথাটা বলেই ফেলি।

তিনি কিছু বললেন না। বাবার মুখোমুখি বসলেন। ফয়সল সাহেব গলার স্বর খানিকটা নামিয়ে বললেন, একটা বিয়ে করব বলে ঠিক করেছি। অল্প বয়সী একটা মেয়ে।

অল্প বয়সী একটা মেয়ে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি হবে কেন?

রাজি হয় টাকার লোভে। পৃথিবীতে পুরুষ মানুষ হয় তো দু'একটা পাওয়া যাবে যাদের টাকার লোভ নেই। কিন্তু মেয়ে মানুষ পাওয়া যাবে না। এ বাড়িটা মেয়েটির নামে লিখে দিলেই সুড়সুড় করে রাজি হবে।

মেয়েদের সম্পর্কে আপনার বড় খারাপ ধারণা।

তোর তো খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তার ফল তো হাতে হাতে দেখলি। তোকে লাথি মেরে চলে গেল।

তিনি কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। বাবার দিকে তাকিয়ে রইলেন এক দৃষ্টিতে। যেন বাবাকে বুঝতে চেষ্টা করছেন।

বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে অল্প বয়সী মেয়ে বিয়ে করাই ভাল। এতে বেঁচে থাকার আগ্রহ জন্মে। কী বলিস তুই? সাহিত্যিক মানুষ তোর ধারণাটা শুনি।

তিনি জবাব দিলেন না। একবার ভাবলেন, জিজ্ঞেস করেন মেয়েটি কে? জিজ্ঞেস করা হল না। সব প্রশ্ন সবসময় করা যায় না।

বাবা আজ যাই।

ঠিক আছে যা।

ফয়সল সাহেব পা দোলাতে লাগলেন। তিনি খুব মজা পাচ্ছেন।

ওসমান সাহেব উদ্দেশ্যহীনভাবে অনেকক্ষণ রাস্তায় হাঁটলেন। বেশ শীত পড়েছে। শীতের রাতে হাঁটতে ভালই লাগে। তাঁর মাথায় ক্রমাগত বাজছে যাবার সময় হল বিহঙ্গের। তাড়ানো যাচ্ছে না এটাকে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন রাত দশটায়। নবী তখনও আছে। বসার ঘরে আরামের ভঙ্গি করে সিগারেট টানছে। চা কফি-- টেবিলের উপর রাখা।

কোথায় ছিলেন সারাদিন? আমি সেই সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষা করছি। আপনার কোনো ট্রেস নেই। কলেজেও ফোন করেছিলাম। তারাও কিছু জানে না।

ওসমান সাহেব জবাব দিলেন না।

সায়েন্স ফিকশনটা নামিয়ে দিয়েছি। বসে আছি আপনাকে পড়াবার জন্যে।

তিনি ক্লান্ত স্বরে বললেন, আজ থাক, অন্য একদিন পড়ব। আজ আমার শরীরটা ভাল না।

না না আজই পড়বেন। গরম গরম। যান, হাত-মুখ ধুয়ে আসুন। আকবরের মা, চা কর আমাদের জন্যে। তুরন্ত।

নবী শীস দিতে লাগল। একজন সুখী ও পরিতৃপ্ত মানুষ। হাসিমুখে বলল।

আইডিয়াটা জমিয়ে ফেলেছি। অতটা ভাল হবে বুঝতে পারিনি। আপনি গিয়েছিলেন কোথায়? মনিকার ওখানে নাকি?

ওসমান সাহেব হ্যাঁ না কিছুই বলেন না। তাঁর খুব ইচ্ছা হতে লাগল বাবার মত চেঁচিয়ে উঠতে— শাট আপ। কিন্তু তিনি তা করলেন না। চাদর গায়ে দিয়ে বসলেন সোফায়। মৃদু স্বরে বললেন, পড়ুন।

নবী পড়তে শুরু করল। গল্প জমে গেল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওসমান সাহেব এক সময় মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলেন। চমৎকার লেখা।

## ১৩

রানুর বড় খালা সুরমা কয়েকদিন ধরে একটি ব্যাপার নিয়ে ভাবছেন। যতই ভাবছেন ততই তাঁর মেজাজ খারাপ হচ্ছে। মেজাজ খারাপ হলে তাঁর কিছু শারীরিক অসুবিধা হয়— ক্ষুধা হয় না, বুকে ধরফর করে। ক'দিন ধরে তাই হচ্ছে। এসব ঝামেলা থেকে মুক্তির কোনো উপায় খুঁজে পাচ্ছেন না।

রানুকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে বললে সব সমস্যার সমাধান হয়। কিন্তু তা বলার জন্যে যে সাহস দরকার তা তাঁর নেই। রানুকে বিচিত্র কারণে তিনি ভয় করেন। সে যেদিন প্রথম এসে বলল, খালা আমি কয়েকদিন তোমার এখানে থাকব। তোমার আপত্তি আছে?

তাঁর যথেষ্ট আপত্তি ছিল তবু তিনি বললেন, আপত্তি কিসের? ঘর তো খালিই পড়ে আছে। থাক যতদিন ইচ্ছা। তিনি কল্পনাও করেননি এই কথার ওপর ভর করে রানু তার ছেলেকে নিয়ে এ বাড়িতে এসে উঠে পড়বে। এবং কিছু দিন যেতে না যেতে অপলা এসে জুটবে তার সঙ্গে।

অপলা মেয়েটিকে তিনি সহ্যই করতে পারেন না। প্রথম দিন এসেই সে বলল খালা, ছাদের চাবিটি আমাদের কাছে দিন। আমি ছাদে খুব হাঁটাহাঁটি করি। আপনি ছাদ বন্ধ করে রাখেন কেন?

তিনি ছাদ বন্ধ করে রাখেন কারণ ভাড়াটের ছেলে-মেয়েরা ছাদে উঠে বড় বিরক্ত করে। ছাদ হচ্ছে প্রেমের বৃন্দাবন। সামনের বাড়ির ছাদে তো বিরাট একটা কেলেঙ্কারিই হল। এমন কেলেঙ্কারি যে কাউকে বলার উপায় নেই। অপলাকেও বললেন না। শুধু শুকনো মুখে জানালেন চাবিটি পাচ্ছেন না। তার কিছুক্ষণ পরই নূরীর মা এসে বলল, অপলা ছাদে। সে নাকি তার ঢুকিয়ে কিভাবে তালা খুলে ফেলেছে। তালা খুলে চোর ছ্যাঁচর, অপলা ভদ্রলোকের মেয়ে। তার এ কি কাণ্ড!

রানুকে থাকতে দিয়ে তিনি যে কি ভুল করেছেন তা মর্মে মর্মে এখন বুঝছেন। কিন্তু উপায় কি? তিনি যে সমস্ত ব্যাপারটাই এখন অপছন্দ করছেন তা আকারে-ইঙ্গিতে এখন বুঝাতে চেষ্টা করছেন। কিন্তু রানু বোধ হয় বুঝেও বুঝতে চাইছে না।

সেদিন হঠাৎ কথায় কথায় বললেন, আমার টেলিফোন নাম্বার তুমি কাউকে দিও না। অচেনা মানুষদের ফোন কল আমার ধরতে ভাল লাগে না। আমি আমার ভাড়াটেদেরও নাম্বার দেই না।

রানু সহজ ভাবে বলেছে— এ নিয়ে চিন্তা করবেন না খালা, টেলিফোনে কথা বলার লোক নেই আমার। এ কথাটা ঠিক। এখন পর্যন্তও কেউ রানুকে টেলিফোন করেনি। রানু গত তিন মাসে চার বার টেলিফোন করেছে। এটাও খারাপ না। তার প্রশংসাই করতে হয়।

সুরমা স্বীকার করেন প্রশংসা করবার মত এই মেয়ের অনেক কিছুই আছে, কিন্তু তাই বলে তিনি তাকে খামোকা পুষবেন কেন?

রানু চাকরি পাবার পর বাড়ি ভাড়া হিসেবে এক হাজার টাকা করে দিতে চাইল, তিনি নেননি। একবার নিতে শুরু করলে ওদের এখান থেকে সরানো মুশকিল হবে। তাছাড়া নিজের বোনের মেয়ের কাছ থেকে বাড়ি ভাড়া নেয়াটাও খারাপ দেখায়। বিশেষ করে সবাই যখন জানে রানু বিপদে পড়েছে।

সুরমা নানাভাবে নিজেকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করেন। ভাবতে চান মা-বাপ মরা একটি মেয়েকে সাহায্য করছেন এবং তা বেশি দিন করতেও হবে না। সে ফিরে যাবে তার স্বামীর কাছে। একা

একা কোনো মেয়ে থাকতে পারে? বিশেষ করে সেই মেয়ের যখন একটি ছেলে আছে। ছেলের কারণেই তাকে যেতে হবে। আজ হোক আর কাল হোক। জামাইকে তাঁর কাছে খানিকটা 'ভোন্দা' ধরনের বলে মনে হয়। মিন মিন স্বভাব। চুলের মুঠি ধরে একটা চড় দিলে এই সব মেয়ে জন্মের মত ঠিক হয়ে যায়— তা করবে না, সব সময় পুতু পুতু করবে। পুরুষ মানুষকে হতে হয় পুরুষ মানুষের মত। মাদী মার্কা পুরুষগুলির জন্যেই এত ঝামেলা।

সুরমা রোদে এসে বসলেন। মাঘ মাস শেষ হয়নি। এখনো কয়েকটা দিন আছে কিন্তু চিড়চিড়ে গরম পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ রোদে বসেই তিনি বিরক্ত হয়ে পড়লেন। উঠে গেলেন না। রোদের মধ্যে নাকি সব ভাইটামিন আছে। শরীরে যত বেশি লাগানো যায় ততই ভাল। কষ্ট হলেও লাগাতে হবে।

খালা কড়া রোদে বসে আছেন যে?

সুরমা ঘাড় ঘুরিয়ে রানুকে দেখলেন। কোন জবাব দিলেন না।

আজ একটু টগরকে রাখবেন খালা? অল্প কিছুক্ষণের জন্যে।

অফিসে যাবে?

না আজ অফিস নেই। একটু কেনাকাটা করব।

অপলা কোথায়? অপলার কাছে রেখে যাও। এইসব পুলাপান বড় বিরক্ত করে। এটা ধরে, ওটা ধরে।

টগর বিরক্ত করবে না।

না গো মা— হাগামুতা আছে। তুমি সাথে করে নিয়ে যাও।

রানু শান্ত গলায় বলল আপনাকে বেশি বিরক্ত করব না খালা— বাড়ি ভাড়া করব। অফিসের কাছে একটা বাড়ি নেব।

ভালই তো। স্বাধীন মহিলা হওয়াটাই তো ভাল। আমরা পরাধীন ছিলাম— স্বাধীনতার মর্ম বুঝি না। তোমরা বোঝ।

এসব কেন বলছেন খালা? ঝগড়া করতে চান নাকি?

নিজের বোনঝির সঙ্গে কি ঝগড়া করব?

ঝগড়া করতে না চাইলে টগরকে কিছুক্ষণ দেখেন। বাইরে ঘোরাঘুরি করলেই ওর শরীর খারাপ করে। টগর নানুকে বিরক্ত করবে না।

সুরমা কিছু না বলে রোদ থেকে উঠে এলেন। মনে মনে রানুর প্রশংসা করলেন। অন্য কোনো মেয়ে হলে এই অবস্থায় ছেলেকে ফেলে বাজারে যেত না। সে গেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে টগরকে রেখে যাওয়ায় তিনি খুশিই হলেন। এই বিশাল এক তলাটায় তাঁর খুব একা একা লাগে। নিজের মেয়েরা বিয়ের পর কোথায় কোথায় চলে গেছে। কেউ ভুলেও খোঁজ করে না। তিনি এই শূন্যপুরী পাহারা দেন। ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়া করেন। প্রতি মাসের তিন তারিখে নিজে ব্যাংকে গিয়ে পাঁচ হাজার টাকা জমা দেন। তাঁর কাজ বলতে এইটুকুই। টগর মাঝে মধ্যে এলে তাঁর ভালোই লাগে। যদিও এটা কাউকে বুঝতে দেন না।

টগর সরু চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি হাত ইশারা করে টগরকে ডাকলেন।

পিয়াস লাগছে নাকি রে?

টগর ভেবে পেল না হঠাৎ করে তার পিয়াস লাগবে কেন? সে মাথা নাড়ল।

পিয়াস লাগলে বল ফান্টা এনে দেব।

লাগে নাই।

লেগেছে। মুখ শুকনা।

সুরমা দু'টি ফান্টার বোতল আনালেন। তাঁদের দুজনের জন্যে দুটি। তারপর শুরু করলেন ডাকাতের গল্প। খুব ছোট বেলায় নৌকা করে যাচ্ছিলেন হঠাৎ একটা ডিঙি নৌকা তাদের নৌকার কাছাকাছি এসে বলল— আগুন আছে? বিড়ি ধরানির আগুন?

গল্প শুনে টগর মুগ্ধ হয়ে গেল। সে মৃদু স্বরে বলল— আরেকটা বলেন। সুরমা তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় গল্প শুরু করলেন। এই গল্পটি প্রথমটির চেয়েও ভাল - সাপের গল্প।

মিলি নিউমার্কেটে একটি বইয়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। রানু অবাক হয়ে বলল তুমি এখানে কি করছ?

মিলি হাসি মুখে বলল, বেড়াচ্ছি।

বেড়াচ্ছি মানে— এটা বেড়াবার জায়গা নাকি? কখন এসেছ?

অনেক্ষণ আগে।

মিলি রানুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে লাগল। তার উৎসাহের সীমা নেই। এক সময় রানু বলল, এসো তোমাকে একটা শাড়ি কিনে দেই।

মিলি বিস্মিত হয়ে বলল, কেন আমাকে শাড়ি কিনে দেবে কেন?

বেতন পেয়েছি আজ। এসো তুমি পছন্দ কর। পাঁচশ টাকার মধ্যে। মিলি কোনো রকম আপত্তি না করে শাড়ির দোকানে ঢুকে পড়ল। প্রায় ঘণ্টাখানিক লাগিয়ে শাড়ি কিনল।

ভাবী, এখন একটা আইসক্রিম খাব।

এখন আইসক্রিম খাবে কেন? চল বাসায় চল, ভাত খাবে। ক্ষিধে লাগেনি?

লেগেছে। কিন্তু আইসক্রিম খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

তারা আইসক্রিমের দোকানে ঢুকল। রানুর মনে হল মিলি ঠিক সুস্থ নয়। তার কথাবার্তা, আচার-আচরণে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। তবু কোথায় যেন কিছু একটা গোলমাল হয়ে গেছে। রানু বলল, তোমার শরীর এখন কেমন মিলি?

ভাল।

তোমার বাচ্চা কেমন আছে?

জানি না।

জানি না মানে?

আমার শাশুড়ি তাঁকে নিয়ে গেছেন।

কোথায় নিয়ে গেছেন?

ময়মনসিংহে। ওদের বাড়িতে।

তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না মিলি। মিথ্যা কথা বলছ। ঠিক না? মিলি হেসে ফেলল।

কেন এত মিথ্যা বল?

জানি না কেন বলি। চল ভাবী উঠি। বাসায় চলে যাব। ঘুম পাচ্ছে।

আমার সঙ্গে যাবে না?

উঁ হুঁ। ভাবী, বাবা যে বিয়ে করছে তুমি শুনেছ?

রানু কিছুই বলল না। মিলির কোনো কথার গুরুত্ব দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। ওর যা মনে আসে তাই বলে।

আমার কথা বিশ্বাস করছ না, তাই না ভাবী?

ঠিকই ধরেছ। করছি না।

এবার কিন্তু সত্যি কথাই বলছি। বাবা তার সেক্রেটারিকে বিয়ে করেছেন। আমার কথা বিশ্বাস না হলে একশ টাকা বাজি রাখতে পার।

রানু চুপ করে রইল। দেড়টা বাজে। মাথা ধরে গেছে। এত সময় হাঁটাহাঁটি করা ঠিক হয়নি। মিলি গেটের কাছে এসেই বলল-- ভাবী, শাড়ির রঙটা এখন আর আমার পছন্দ হচ্ছে না। পাঁচ মিনিটের জন্যে আসবে শাড়িটা বদলে নেব। প্লিজ ভাবী তোমার পায়ে পড়ি।

## ১৪

ওসমান সাহেব দূর থেকে একটি চমৎকার দৃশ্য দেখলেন। গেটের বাইরে অপলা ও টগর।

অপলা হাসছে। অপলার কোলে হাসছে টগর।

তিনি মুগ্ধ চোখে তাকালেন। কিছু কিছু দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যে মানুষকে অন্য রকম করে ফেলে। অন্ধকার দূর করে দেয়। মনের কোনো একটা স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় হঠাৎ খানিকটা আলো এসে পড়ে।

তাঁর মন হাল্কা হয়ে গেল। দীর্ঘদিন তিনি কিছু লিখতে পারছেন না। একটি লাইনও নয়। না লেখার মত কষ্টও যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। তিনি হাসলেন। একজনের কান্না অন্য জনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু হাসি করে।

অপলা চেঁচাল- দুলাভাই। দুলাভাই। সে আজ এত উল্লসিত কেন? ওসমান সাহেব হাসতে

হাসতে বললেন, কি খবর অপলা?

আমাদের ভাল খবর। আপনার খবর কি?

আমার কোনো খবর নেই। এত খুশি কেন?

অপলা ঘাড় কাত করে বলল - খুব ভাল সময়ে এসেছেন।

ভাল সময় কেন?

তা বলব না।

অপলা হাসছে। টগর হাসছে। হাসছেন ওসমান সাহেব। রানু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখল। এমন আনন্দিত হবার মত কি ঘটেছে? টগর বাবার কোলে যাবা জন্যে হাত বাড়িয়েছে। এটাও একটা নতুন দৃশ্য। টগর তার বাবা-মার প্রতি আলাদা কোনো আবেগ দেখায় না।

ওসমান সাহেব ছেলেকে হাত বাড়িয়ে কোলে নিলেন। টগর বলল, আজ কি বুধবার?

না আজ বুধবার না। অন্য একবারে এসে দেখলাম কেমন লাগে। তুমি খুশি হয়েছ টগর?

হ্যাঁ।

বেশি খুশি? না অল্প খুশি?

টগর দাঁত বের করে হাসল। অপলা বলল চলুন উপরে যাই। ওসমান সাহেবের কেন জানি দোতলায় উঠতে ইচ্ছা হল না। তাঁর মনে হল দোতলায় উঠলেই চমৎকার বিকালটা অন্য রকম হয়ে যাবে। রানু এসে কঠিন মুখে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবে। আজ কারোর কঠিন মুখ দেখতে ইচ্ছা করছে না।

তিনি বললেন— অপলা চল রাস্তার মোড়ে যাই। টগরকে চকলেট কিনে দেই। আজ ওর জন্যে কিছু আনা হয়নি।

বৃষ্টি আসবে তো দুলাভাই।

না আসবে না।

কি করে বুঝলেন?

দেখছ না একটা বেড়াল হাঁটছে?

বৃষ্টি আসার আগে বেড়ালরা কখনো ঘর থেকে বের হয় না। পশুপাখিরা প্রকৃতির ব্যাপারগুলি আগে আগে টের পায়।

সত্যি?

হ্যাঁ, সত্যি।

অপলা কি বলতে গিয়েও বল না। অপলা না হয়ে রানু হলে তীক্ষ্ণ স্বরে বলত, তুমি পৃথিবীর সব রহস্য জেনে বসে আছ? অপলা, রানু নয়। অপলা না হয়ে অন্য কোনো মেয়ে হলে বলত, ওমা আপনি এত কিছু কি ভাবে জানেন?

প্রতিটি মানুষ আলাদা, একজনের সঙ্গে অন্যজনের কোনো মিল নেই।

দুলাভাই!

বল।

টগরকে আমার কাছে দিন। আপনার কষ্ট হচ্ছে।

তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

না, আমার অভ্যাস আছে।

মোড়ের দোকানটির কাছাকাছি আসতেই বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। অপলা অবাক হয়ে বলল— কি আশ্চর্য বৃষ্টি পড়ছে কেন? যেন বৃষ্টি পড়াটা উচিত নয়। তিনি হেসে ফেললেন।

আপনি হাসছেন কেন?

তুমি আমার কথাটা এমনভাবে বিশ্বাস করেছ দেখে হাসছি। লেখকদের কথা চট করে বিশ্বাস করতে নেই।

আপনি এত আস্তে আস্তে হাঁটছেন কেন? দৌড়ে গিয়ে ঐ বারান্দায় ওঠেন। টগর ভিজে যাচ্ছে যে।

তিনি সত্যি সত্যি দৌড়ালেন। তার গলা জড়িয়ে টগর খিলখিল করে হেসে উঠল। সে খুব মজা পেয়েছে। ওসমান সাহেব হালকা গলায় বললেন, এই বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকবে না। এক্ষুণি থেমে যাবে।

আপনার কোনো কথা আমি এখন আর বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস কর আর না কর বৃষ্টি থামবেই। যে বৃষ্টির ফোঁটা বড় হয় সে বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না।

আপনি এমনভাবে কথা বলেন যে মনে হয় সত্যি কথা বলছেন।

একজন লেখকের গুণ হচ্ছে বিশ্বাসযোগ্যভাবে কথা বলা।

ওসমান সাহেবের বৃষ্টির কথাগুলি মিলে গেল। চট করে বৃষ্টি থেমে গেল। দোকানের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলি মুহূর্তের মধ্যে নেমে গেল রাস্তায়। দারুণ ব্যস্ত সবাই। এ রকম একটা মেঘলা সন্ধ্যায় কারোরই তেমন কোন কাজ থাকার কথা নয়। অথচ সবাই এমন ব্যস্ত যেন এই মুহূর্তে ছুটে না গেলে বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে।

অপলা বলল, ইস, টগর ভিজে একেবারে কাই হয়ে গেছে। চকলেট নিয়ে চলুন তাড়াতাড়ি বাসায় যাই।

'ভিজে কাই হয়ে গেছে' একটা নতুন ধরনের এক্সপ্রেশন। আগে কখনো শোনা যায়নি। তিনি মনে মনে নোট করে ফেললেন। কখনো না কখনো ব্যবহার করা যাবে।

কিন্তু সত্যি কি ব্যবহার করা যাবে? কোন দিন তিনি লিখতে পারবেন কিছু? আজকাল তাঁর মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কাল রাতে দীর্ঘ সময় লেখার টেবিলে বসেছিলেন। বসে থাকাই হয়েছে। অন্য সময় কাগজে আঁকা বুকি করেন। একটি দুটি লাইনও লেখা হয়, কাল তাও হয়নি। ঘুমুতে যাবার সময় মনে হয়েছে, এভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না।

দুলাভাই কি ভাবছেন?

কিছু ভাবছি না।

চলুন ফিরে যাই। কি কিনবেন কিনে নেন। টগরের ঠাণ্ডা লাগবে। দেখুন কাঁপছে।

টগর বলল, আমি যাব না। তিনি তাকালেন ছেলের দিকে। টগরের চোখ-মুখ উজ্জ্বল। তিনি বললেন, বাসায় যাবে না?

না।

না কেন? কোথায় যেতে চাও।

তোমার সঙ্গে যাব।

তিনি তাকালেন অপলার দিকে। সে আবার বলল, বাসায় চলুন তো। আপা খুব রাগ করবে। নির্ঘাৎ টগরের ঠাণ্ডা লাগবে দেখুন ওর দাঁত কির কির করছে।

রাস্তায় নেমেই ওসমান সাহেবের মনে হল রানুর কাছে ফিরে যাবার কোনো অর্থ হয় না। রানুর কাছে না গিয়ে তিনি বরং রাস্তায় রাস্তায় হাঁটবেন। এককালে এ রকম করতেন। বিয়ের পর রানুকে নিয়ে কিছুদিন হেঁটেছেন। রানু বিরক্ত হয়েছে। চোখ-মুখ কুঁচকে বলেছে এ কি বিশ্রী অভ্যাস। বিনা কারণে হাঁটছ কেন?

তোমার ভাল লাগছে না।

এর মধ্যে ভাল লাগার কি আছে?

রানুর স্বভাবই হচ্ছে প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্নের জবাব দেয়া। শিশুদের স্বভাব। শিশুরাই প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করে। তার পেছনে থাকে শিশুর সরলতা। কাজেই তাঁদের প্রশ্ন শুনতে ভাল লাগে। বয়স্কদের বেলায় সেটা হয় না।

অপলা বলল এ রকম গম্ভীর হয়ে কি ভাবছেন?

কিছু ভাবছি না।

আচ্ছা দুলাভাই, আপনি কী রানু আপা সম্পর্কে কিছু শুনেছেন? তার বিয়ের প্রসঙ্গে কিছু?

তিনি কিছু বললেন না। অপলা অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, নিশ্চয়ই আপনার কানেও গিয়েছে

ওর বিয়ের কথা বলছ?

হ্যাঁ, আলম ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ের গুজব।

শুনেছি।

এটা ঠিক না। আমি আপাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ওসমান সাহেবের কোনো ভাবান্তর হল না। যেন তাঁর কিছুই যায়-আসে না। অথচ তার খুশি হওয়া উচিত। উচিত নয় কি?

অপলা মৃদু স্বরে বলল আমার মনে হয় আপা একদিন না একদিন আপনার কাছে ফিরে

যাবে।

তাহলে তুমি খুব খুশি হবে?

হ্যাঁ।

কেন বল তো?

অপলা এক মুহূর্তও না ভেবে বলল, আপনাকে আমার খুব ভাল লাগে দুলাভাই।

তিনি চমকে তাকালেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। অপলার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তাঁর খুব ইচ্ছে হল অপলার মুখের রেখাগুলি দেখতে। তিনি তার কোনো এক উপন্যাসে লিখেছিলেন একমাত্র কিশোরীরাই ভালবাসার কথা সরাসরি বলতে পারে। কোন বইতে বলেছিলেন? এমন নয় যে তিনি অসংখ্য উপন্যাস লিখেছেন। কিন্তু তবু কেমন যেন ঝামেলা হচ্ছে। কিছুই আজকাল আর মনে করতে পারেন না। সব জট পাকিয়ে যায়। সব কিছুই কী এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে?

রানু বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। সে তার শাড়ি বদলেছে। সামান্য কিছু সাজগোজও করেছে। কেন করেছে সে নিজেও জানে না। ওদের আসতে দেখে সে ভেতরে চলে গেল।

ওসমান সাহেব গেটের সামনে এসে বললেন, অপলা, আজ আর ভেতরে যাব না।

কেন?

যেতে ইচ্ছে করছে না। অন্য একদিন আসব।

না না, এসব কি, চলুন। আপা অপেক্ষা করছে আপনার জন্যে।

আমার জন্যে অপেক্ষা করছে না। নাও, টগরকে কোলে নাও। ও ঘুমিয়ে পড়ছে।

অপলা টগরকে কোলে নিল।

ওর শরীর মনে হয় পুরোপুরি সারেনি। কেমন চটকরে ঘুমিয়ে পড়ল।

ও কোলে উঠলেই ঘুমিয়ে পড়ে।

তিনি বললেন, অপলা আমি যাচ্ছি। অপলা বিস্মিত হয়ে বলল, আপনার কী হয়েছে দুলাভাই?

কিছু হয়নি। আমি লিখতে পারছি না।

লিখতে না পারা কি খুব কষ্টের?

হ্যাঁ, খুব কষ্টের। আচ্ছা যাই।

দুলাভাই, প্লিজ আপনি রানু আপার সঙ্গে দেখা করে যান। আপনার পায়ে পড়ি। আমার একটা কথা রাখুন।

তিনি বড়ই অবাক হলেন। মেয়েটির গলায় এত কাতরতা কেন?

আসুন দুলাভাই।

তিনি সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করলেন। হঠাৎ তার বড় ক্লান্তি লাগল। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কখনোই কিছু করতে পারেন না। মনের ওপর অসম্ভব চাপ পড়ে।

রানু বেশ সহজ স্বাভাবিকভাবেই কথা-টথা বলল। ওসমান সাহেব জানতে পারলেন সে শিগগিরই এ বাড়ি ছেড়ে দেবে। অফিসের কাছাকাছি একটি ফ্ল্যাট নেবে।

তুমি দেখো তো, তোমার চোখে কোন খালি বাড়ি পড়ে কি না। তুমি তো হেঁটেই বেড়াও। নাকি এখন আর হাঁট না?

হাঁটি। এখনো হাঁটি। বাড়ি চোখে পড়লে তোমাকে বলব।

তিনি উঠে পড়লেন। রানু সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে হঠাৎ করে বলল, মিলিকে একজন ভাল ডাক্তার-টাক্তার দেখানো উচিত। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন?

আমার মনে হয় ও অসুস্থ।

কি রকম অসুস্থ?

বুঝতে পারছি না। ওকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখাও। ওর স্বামীর সঙ্গে কথা বল।

বলব।

তুমি তো যাও না। ওদের বাসায়। যাও একদিন। ওর স্বামীকে বুঝিয়ে বল।

ওসমান সাহেবের বেশ মন খারাপ হল। রিকশায় উঠে তিনি মিলির মেয়েটির জন্যে তিন অক্ষরের একটি নাম ভাবতে লাগলেন। যার শুরু হবে ম দিয়ে। এবং এমন একটি নাম যা আগে কেউ রাখেনি।

প্রথমেই যে নামটি মনে হল সেটা হচ্ছে ময়ূর। ময়ূর নাম কেউ কি আগে রেখেছে? পাখিদের

নামে প্রচুর নাম আছে দোয়েল, ময়না কিন্তু ময়ূরের নাম কেউ রাখেনি। অথচ কি চমৎকার একটি পাখি। নাম রাখার ব্যাপারে খুব সূক্ষ্মভাবে হলেও কোন এক ধরনের সাইকোলজি কাজ করে। ফলের নামে আমরা রাখি আপেল, বেদানা, কমলা কিন্তু আম দিয়ে কারুর নাম নেই। এর কারণ কি? ওসমান সাহেব শব্দ করে হেসে উঠলেন। রিকশা-ওয়ালা চমকে পেছন ফিরে তাকাল। বোধ হয় তাঁকে পাগল ভাবছে। মিলির কাছে এখন আর যেতে ইচ্ছে করছে না। কাল যাওয়া যাবে।

## ১৫

সকাল ন'টা।

এ সময় সাধারণত সবাইকে ঘরে পাওয়া যায়।

মিলি বাসায় ছিল না। মিলির বর মতিয়ুর রহমান ছিল। এই ছেলেটিকে ওসমান সাহেব পছন্দ করেন। অথচ সে ঠিক পছন্দ করার মত মানুষ নয়। উদ্ধত প্রকৃতির মানুষ। হিসেবী ও বৈষয়িক। তবু তাকে ভাল লাগে। কেন? চেহারার জন্যে নিশ্চয়ই নয়। মতিয়ুর রহমানের চেহারা ভাল নয়। গ্রাম্যভাব আছে। ওসমান সাহেবকে দেখে মতিয়ুর রহমান খুবই অবাক হল। অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ভাই সাহেব কেমন আছেন?

ভাল।

হঠাৎ এদিকে?

এমনি এলাম। তেমন কারণ নেই। মিলি কোথায়?

মিলি ডাক্তারের কাছে গেছে। এখনি চলে আসবে।

ঠিক আছে, আমি বসছি। মিলির সঙ্গে দেখা হয় না অনেক দিন। ও আছে কেমন?

ভালই আছে। অবশ্যি সব সময় কমপ্লেইন করে ঘুম হয় না। আমি কিন্তু দেখি ঠিকই ঘুমুচ্ছে।

ওষুধ খেয়ে ঘুমায়?

না এমনিতেই ঘুমায়।

একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখালে কেমন হয়?

সাইকিয়াট্রিস্ট?

হ্যাঁ। ও বোধ হয় ঠিক সুস্থ না।

মতিয়ুর অনেক্ষণ চুপ করে থেকে অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলল,

ভাই সাহেব, আপনি কী আজ দুপুরে আমাদের সঙ্গে চারটা ডাল-ভাত খাবেন।

খাব। আমি বিকেল পর্যন্ত থাকব এখানে। মিলি আসবে কখন?

আমি ওকে আনার জন্যে লোক পাঠাচ্ছি।

লোক পাঠানোর দরকার নেই। ও আসুক ধীরে-সুস্থে।

ডাক্তারের কাছে অন্য সময়ও যেতে পারবে। এখন এসে আপনার জন্য নিজের হাতে রান্না-বান্না করুক। খুব খুশি হবে। আপনি কি হাত-মুখ ধোবেন?

না। তুমি তোমার কাজ কর। আমার জন্যে ব্যস্ত হতে হবে না। একা বসে থাকতে আমার খারাপ লাগে না। ভালই লাগে।

আপনি চা খান, আমি আধ-ঘণ্টার মধ্যে আসছি।

বাজারে যাচ্ছ নাকি?

না মিলিকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি।

তিনি এদের এই বাড়িতে অনেক দিন পর এসেছেন। বাড়ির অনেক রকম পরিবর্তন হয়েছে। নতুন ঘর উঠেছে কয়েকটি। মিলিদের এই বাড়ি কিনে নেবার কথা ছিল, কিনে নিয়েছে কিনা কে জানে। সওদাগরদের বাড়ির মত বিশাল এক বাড়ি। আসবাবপত্র ঠাসা। এদের প্রচুর পয়সা হয়েছে মনে হয়। আগে এত সচ্ছলতা ছিল না।

মিলি বাড়িতে ঢুকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কল কল করে বলল,

তুমি আমার এখানে আসবে এটা আগে বললে না কেন?

আগে বললে কি হত?

কত কিছু করতাম।

তোর মেয়ের নাম ঠিক করেছিস?

হ্যাঁ মিনতি। নামটা কেমন ভাইয়া?

সুন্দর নাম। আমি আসতে আসতে তোর মেয়ের জন্যে নাম ভাবছিলাম। তিন অক্ষরের 'ম' দিয়ে শুরু।

কি নাম?

ময়ূর।

মিলি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।

ময়ূর?

হ্যাঁ।

ময়ূর কখনো নাম হয়? তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে না কি ভাইয়া?

বোধ হয় হচ্ছে।

মিলি খুব হাসতে লাগল। যেন অনেক দিন পর সে মজার একটা কথা শুনল। হাসির ভঙ্গিও অস্বাভাবিক। ওসমান সাহেব মনে মনে ভাবলেন - মিলি কি সত্যি অসুস্থ? মতিয়ুর রাগী চোখে তাকিয়ে আছে। হাসি থামলেই সে হয়ত কিছু বলবে। মিলি হাসি থামাল। তার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। মতিয়ুর বলল, তুমি যাও রান্না-বান্না শুরু কর। বারটা বাজে।

আমার রাঁধতে ইচ্ছা হচ্ছে না। অন্য কেউ রাঁধুক।

তুমি কি করবে?

আমি ভাইয়ার সঙ্গে গল্প করব। তুমি কাউকে বল। কিংবা হোটেল থেকে কিছু আনিয়ে নাও।

মতিয়ুর চলে গেল। তার মুখ থম থম করছে। ঘরে রান্না-বান্না করার কেউ হয়ত নেই। খুব সহজেই মিলি হোটেলের প্রসঙ্গ এনেছে - তার মানে এরা প্রায়ই হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে নেয়। কিন্তু ওর শাশুড়ি তো এখানে থাকেন। তিনি থাকতে হোটেলের খাবার আসবে এ বাড়িতে?

ভাইয়া তুমি কি মাকে কখনো স্বপ্নে দেখ।

ওসমান সাহেব ভেবে পেলেন না হঠাৎ মা-র প্রসঙ্গ কেন এল। মিলি কি এলোমেলোভাবে চিন্তা করতে শুরু করছে। তিনি মিলির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। মিলি হালকাভাবে বলল,

আমি প্রায়ই দেখি। রোজ রাতে দেখি। কালও দেখেছি।

কি দেখি।

দেখি মা খুব লজ্জিত ভঙ্গিতে আমার কাছে এসে দাঁড়ান। অস্পষ্ট স্বরে বলেন, ভুল হয়ে গেছে মিলি, কিছু মনে করিস না। তখন আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করি।

কি নিয়ে ঝগড়া?

জানি না কি নিয়ে। মা এত ভাল মানুষ ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমি ঝগড়ার স্বপ্ন কেন দেখব?

স্বপ্ন স্বপ্নই।

না, স্বপ্ন স্বপ্ন না। স্বপ্নের অনেক মানে আছে।

মিলি কাঁদতে শুরু করল। তিনি কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

কান্না থামা মিলি।

মিলি সঙ্গে সঙ্গে কান্না থামাল। ওসমান সাহেব বললেন, আমি কিছু দিন আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকব।

কেন?

এমনি। কোনো বিশেষ কারণ নেই।

আমিও তোমার সঙ্গে যাব ভাইয়া।

একা থাকার জন্যে যাচ্ছি। দলবল এসে গেলে তো আর থাকা যাবে না।

এখানে তো একাই থাকতে।

তা ঠিক।

গ্রাম এবং শহর বেশ - কমটা কি হচ্ছে?

ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, অনেক দিন থেকে কিছু লিখতে পারছি না। পরিবেশ বদলে দেখতে চাই লাভ হয় কি না।

তোমার রান্না-বান্না করে দেবে কে?

লোকজন পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই।

যাবে কবে?

কাল।

রানু ভাবী জানে?

না।

মিলি খানিক্ষণ ইতস্তত করে বলল, গতকাল রানু ভাবী আর আলম ছেলেটিকে দেখলাম রিকশা করে যাচ্ছে। হাত ধরাধরি করে দুজন বসে আছে। ওসমান সাহেব হেসে ফেললেন। মিলি বিরক্তি স্বরে বলল, হাসছ কেন?

এমনি হাসছি।

মিলির কোনো ভাবান্তর হল না। ওসমান সাহেব বললেন, কাউকে দিয়ে সিগারেট আনিয়ে দে। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। মিলি উঠল না। যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল। যেন তাঁর কথা শুনতে পায়নি।

মিলি।

বল।

মতিয়ুরের সঙ্গে কথা বলছিলাম সে তোকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চায়।

জানি, পাগলের ডাক্তার। তোমার কী মনে হয় আমি পাগল?

না, পাগল হবি কেন?

আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলছ আসলে তোমার নিজেরও ধারণা আমি পাগল। তা না হলে ডাক্তারের কথা তুলতে না।

তুই এত সুন্দর লজিক বের করেছিস। এরপর তোকে পাগল বলবে কে?

বলে, সবাই বলে। আমার শাশুড়ি এখন আমাকে দেখে এমন ভয় পান, আমি ঘরে ঢুকলেই চমকে ওঠেন। পাগলকে মানুষ যেমন ভয় পায় সে রকম আর কি।

বলতে বলতে মিলি খিলখিল করে হাসতে শুরু করল। সে হাসি আর কিছুতেই থামে না। ওসমান সাহেব অবাক হয়ে মিলির দিকে তাকিয়ে রইলেন। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতস্থ একজন মানুষের হাসি। মতিয়ুর ঘরে ঢুকে ধমক দিল, আবার কি শুরু করেছ? মিলির হাসি থেমে গেল। সে থমথমে গলায় বলল, আমি হাসতেও পারব না?

তুমি রান্না ঘরে যাও তো মিলি।

না, আমি রান্না ঘরে যাব না। এখানেই থাকব। এবং ভাইয়াকে সব কথা বলে দেব আমি। ভাইয়া শোন ও এখন আমাকে ঘর থেকে বেরুতে দেয় না। গেটে তালা দিয়ে রাখে। কাউকে টেলিফোনও করতে দেয় না। টেলিফোনের মাউথ পিস খুলে রেখেছে। সে যখন কাউকে টেলিফোন করতে চায় তখন মাউথ পিস লাগায়।

মিলি তুমি রান্না ঘরে যাও তো।

না, আমি যাব না। কি করবে তুমি? মারবে আমাকে? বেশ তো মার।

ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, ক্ষিধে লেগেছে মিলি, খাওয়ার ব্যবস্থা কর। মিলি শান্ত মেয়ের মত সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হাসি মুখে বলল, দশ মিনিটের মধ্যে খাবার দেব। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। ওসমান সাহেব মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইলেন, আর সামনে মতিয়ুর রহমান বসে আছেন। দুজনের কারুর মুখেই কোন কথা নেই।

মিলিদের বাড়ি থেকে তিনি বের হলেন সন্ধ্যার পর। রিকশাওয়ালাকে বললেন, আমি কোথাও যাব না। শহরেই খানিকটা ঘুরব। তোমার যে দিকে যেতে ইচ্ছা করে সেদিকে যাও।

রিকশাওয়ালা ইতস্তত করছে। মন ঠিক নেই এমন কাউকে রিকশায় তুলতে তার হয়ত দ্বিধা আছে।

## ১৬

**আজকাল ফয়সল সাহেবের ঘুমের রুটিনে অদল-বদল হয়ে গেছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েন। বেশ গাঢ় ঘুম। সেই ঘুমের স্থায়িত্ব কম। জেগে উঠেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যে এবং জেগেই নিজের ওপর রেগে যান। ভয়ঙ্কর রাগ। কেন দীর্ঘদিনের এই ক্রীতদাস শরীর তার**

কথা শুনবে না মৃত্যু কি এসে যাচ্ছে? সে কি অপেক্ষা করছে বাইরে। দেখতে সে কেমন? ফয়সল সাহেবের মনে হল সে দেখতে অন্ধ ভিখারীদের মত। নোংরা পূতিগন্ধময় তার পোশাক। হাতে লম্বা লম্বা কালো নখ। সমস্ত গায়ে কুষ্ঠ-- রোগীর ঘা। সেই ঘা থেকে লালাভ রস ঝরছে।

আজও ফয়সল সাহেব নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ নিয়ে জেগে উঠলেন। ঘড়ি দেখলেন সন্ধ্যা ছ'টা। হঠাৎ তাঁর খটকা লাগল সন্ধ্যা না সকাল? তাঁর মাথা দুলতে লাগল। সময়ের জ্ঞান কি চলে যাচ্ছে? এ কেমন কথা? তিনি ভয় পাওয়া গলায় ডাকলেন, বীথি বীথি!

বীথি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুকল। সাদা একটা শাড়ি গায়ে। লাল একটা শাল ছড়িয়ে দিয়েছে শাড়ির উপর। শালের উপর মাথার ঘন কালো চুল এলিয়ে দিয়েছে। অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য এই সব দৃশ্য তিনি আর বেশি দিন দেখবেন না। একজন অচেনা-অজানা যুবক এই মেয়েটির হাত ধরে ছাদে হাঁটাহাঁটি করবে। অসহ্য। ফয়সল সাহেবের মুখে যন্ত্রণার ছাপ পড়ল।

তিনি মুখ কুঁচকে ফেললেন। বীথি ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার আমাকে ডেকেছিলেন?

হুঁ।

কী জন্যে?

এখন সকাল না সন্ধ্যা?

বীথি বিস্মিত হয়ে বলল, সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা হলে আলো নেই কেন?

বারান্দার বাতিটা জ্বালিয়ে দেব?

দরকার নেই, তুমি বস আমার পাশে।

বীথি বসল।

এত দূরে বসছ কেন? নাকি বুড়ো মানুষদের কাছে বসতে ভাল লাগে না? চেয়ারটা টেনে আরো কাছে নিয়ে এসো।

বীথি চেয়ার টানল। ফয়সল সাহেব বীথির ডান হাতের উপর নিজের হাত রাখলেন। বীথির কোনো রকম ভাবান্তর হল না। যে ভাবে বসেছিল ঠিক সে ভাবেই বসে রইল।

বীথি!

জি।

আমি এই বাড়িটা তোমার নামে লিখে দিয়ে যাব।

বীথি কিছু বলল না। ফয়সল সাহেব বললেন,

বার কাঠা জমির উপর বাড়ি। জমির ভ্যালুয়েশনই হবে তোমার বিশ লাখ টাকা। বাড়ির দাম আর ধরলাম না। কি কথা বলছ না কেন?

বীথি শান্ত স্বরে বলল, চা খাবেন স্যার? চা নিয়ে আসি?

না চা আনতে হবে না। বসে থাক চুপচাপ। হাত ধরে আছি বলে কী তোমার খারাপ লাগছে?

জি না স্যার।

ফয়সল সাহেব বীথির ফর্সা হাতের দিকে তাকালেন। কি ফর্সা হাত! কি নরম! এই কোমল পেলব হাতের উপর তাঁর হাতটাকে কি কুৎসিত দেখাচ্ছে। তাঁর বুকের ভেতর একটি নিঃশ্বাস পাক খেতে লাগল। ভোগ করবার কত কি আছে পৃথিবীতে কিন্তু সময় এত অল্প। কিছুই ভোগ করা যায় না। সময় এত কম।

বীথি!

জি স্যার।

বাড়ি টা তোমাকে দান করে যাব। বুঝতে পারছ?

অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, বাতি জ্বেলে দেই?

দাও।

বীথি উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাল। এই মেয়েটি আরো সুন্দর হয়েছে। ঘন কালো চোখ। এত কালো চোখ হয় মেয়েদের?

বীথি!

জি!

চোখে কাজল দিয়েছ নাকি?

জি না।

তুমি যাচ্ছ কোথায়?

আপনার জন্যে কিছু খাবার নিয়ে আসি।

কিছু আনতে হবে না। যেখানে বসেছিলে সেখানে বসে থাক।

বীথি এসে বসল। ফয়সল সাহেব আবার তাঁর হাত তুলে নিলেন। সময় ফুরিয়ে আসছে। নখদন্ত নিয়ে অপেক্ষা করছে কুৎসিত মৃত্যু! সে তার অন্ধ চোখে তাকিয়ে আছে বারান্দার দিকে।

ফয়সল সাহেবের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। 'বৃক্ষ বার বার তার যৌবন ফিরে পায়। প্রতি বসন্তে নতুন পাতা আসে তার গায়ে কিন্তু মানুষের যৌবন আসে একবার।' কোথায় পড়েছেন এটা? কার লেখা? ওসমানের কোন বইতেই কি পড়েছেন? এমন একটি চমৎকার কথা তার অপদার্থ ছেলে কি করে লিখবে? নিশ্চয় অন্য কেউ লিখেছে। আজকাল কিছু মনে থাকে না।

বীথি।

জি।

ওসমানকে একটা টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করত 'বৃক্ষ বার বার তার যৌবন ফিরে পায়' এই কথাটা সে তার কোন বইয়ে লিখেছে কিনা।

লিখেছেন। বইটির নাম হচ্ছে...

থাক নামের দরকার নেই। তুমি যাও বাতিটা নিভিয়ে দাও। আলো চোখে লাগছে।

বীথি আলো নিভিয়ে দিল।

## ১৭

রানু আজ একটু সকাল সকাল অফিস থেকে এসেছে। টগরকে নিয়ে একবার ডাক্তারের কাছে যাবে। দিন দিন এমন রোগা হয়ে যাচ্ছে কেন সে? ভিটামিন টিটামিন কিছু খাওয়ানো দরকার।

বাসায় ঢুকতে গিয়ে সে চমকে গেল। বসার ঘরের দরজা হাট করে খোলা। সিগারেটের গন্ধ আসছে। অথচ তালাবদ্ধ থাকার কথা। অপলা কলেজ থেকে ফিরবে পাঁচটায়। টগর খালার কাছে। অসময়ে তালা খুলে ঘরে বসে থাকবে কে?

আলম বসেছিল। রানুকে দেখে সে ফ্যাকাশেভাবে হাসল। রানু বলল, ঘরে ঢুকলে কি ভাবে?

নিচ থেকে চাবি এনে খুলেছি।

ভাল করেছ। কেমন আছ তুমি?

আলম জবাব দিল না। তার ফর্সা গাল ঈষৎ লাল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তাকে নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ বলা যাবে না। কিন্তু আজ তাকে নার্ভাস লাগছে। রানু অস্বস্তিবোধ করতে লাগল। একজন নার্ভাস মানুষ হঠাৎ অস্বাভাবিক কিছু করে বসতে পারে। রানু বেশ সহজভাবেই বলল, তুমি বস, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।

আলম কিছু বলল না। আরেকটি সিগারেট ধরাল। রানু বলল, চা-টা কিছু খাবে?

না। পানি খাব। এক গ্লাস পানি দাও।

রানু পানি দিয়ে গেল। আলম একটি চুমুক দিয়েই গ্লাস নামিয়ে রাখল। বিস্বাদ কিছু মুখে দিলে মানুষের চোখ-মুখ যেভাবে বিকৃত হয় তার চোখ মুখও সে রকম হয়েছে। আলম বলল, একটু তাড়াতাড়ি আসবে রানু।

তোমার কী কোন তাড়া আছে?

না।

তাহলে বস। আমার দেরি হবে না।

রানু দেরি করতে লাগল। ঠিক এই মুহূর্তে আলমের সামনে বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে না। সব সময় সব কিছু ভাল লাগে না। আলম একটি চমৎকার ছেলে। তার সঙ্গে গল্প করতে রানুর ভাল লাগে। কিন্তু আজ কেন জানি ইচ্ছা করছে না।

রানু অনেকখানি সময় নিয়ে গোসল করল। বালতিতে ভেজা কাপড় ছিল সেগুলি ধুয়ে ফেলল। কাজটা উল্টা করা হল। কাপড়গুলি আগে ধোয়া উচিত ছিল। সে দ্বিতীয়বার গায়ে পানি ঢালতে লাগল। তার মধ্যে কি শুচি বায়ুর কোন লক্ষণ দেখা দিচ্ছে? সম্ভবত দিচ্ছে। বাইরে কোথাও গেলেই সমস্ত শরীর নোংরা মনে হয়। এসব আগে ছিল না। নতুন দেখা দিয়েছে।

আলম গম্ভীর মুখে বসে আছে চেয়ারে। বসার ভঙ্গি রাগী রাগী! রানু ঘরে ঢুকেই বলল, দেরি করে ফেললাম তাই না?

হ্যাঁ তা করেছ। ঠিক এক ঘণ্টা ছ'মিনিট দেরি করেছ।

আই এ্যাম সরি।

আলম শীতল স্বরে বলল, তুমি ইচ্ছা করে এতটা দেরি করলে। আমার মনে হয় তুমি আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ।

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কর কেন?

আমি জানি না কেন? কিন্তু তুমি করছ। এটা অবশ্যি নতুন না, প্রায়ই তুমি এরকম কর। কর না? বল কর, কি কর না?

আমরা সবাই কখনো কখনো প্রিয়জনদের এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। আমি যেমন করি তুমিও তেমন কর। ঠিক না?

আলম জবাব দিল না। রুমাল বের করে মুখ মুছল। এটা তার বিদায় নেবার লক্ষণ। উঠবার সময় হলেই সে রুমাল বের করে মুখ মোছে। চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে নেয়। অভ্যাসটা মেয়েলি। পুরুষ মানুষের চেহারা সম্পর্কে এতটা সচেতন হওয়া ঠিক না।

আলম বলল, আমি উঠছি।

এখনই উঠবে কি? বস চা খাও।

সে হ্যাঁ না কিছুই বলল না। যেভাবে বসেছিল সেভাবেই বসে রইল।

রানু চা বানাতে চলে গেল। অপলা এসে ঢুকল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। পাঁচটা বেজে গেছে নাকি? অপলা আসে পাঁচটার দিকে।

আলম ভাই কেমন আছেন?

ভাল।

এমন মুখ কালো করে রেখেছেন কেন? আপার সঙ্গে ঝগড়া-টগড়া হয়েছে নাকি?

না।

দারুণ একটা খবর আছে দাঁড়ান বলছি। ভেরি এ্যাকসাইটিং। অপলা রান্না ঘরে চলে গেল।

তোমার অফিস কেমন হল আপা?

ভাল।

টগর ফেরেনি এখনো?

না।

দারুণ একটা ব্যাপার হয়েছে আপা।

রানু কোনো রকম উৎসাহ দেখাল না। অপলা প্রায়ই দারুণ খবর বলে। যে সব খবর বলে সেগুলি খুবই হালকা ব্যাপার।

আজ আমাদের কলেজে নবীন বরণ উৎসব হল। দুজন বিখ্যাত লেখককে আনা হয়েছিল। একজন হচ্ছেন...আন্দাজ করত কে?

রানু জবাব দিল না।

দুলাভাই। চমৎকার একটা বক্তৃতা দিলেন। এমন সব হাসির কথা বলতে লাগলেন আমরা হাসতে হাসতে বাঁচি না। দুলাভাই যে এমন হাসাতে পারেন জানতাম না। সাধারণ সব গল্প এমন অন্য রকম করে বলতে লাগলেন একটা গল্প হচ্ছে একজন ভূতের গল্পের লেখককে নিয়ে। ভদ্রলোক একদিন দুপুরবেলা গল্প লিখতে বসেছে...

বলতে হবে না। গল্পটা আমি জানি। তুই বসার ঘরে চা-টা দিয়ে আয়।

গল্পটা শেষ করে যাই এক মিনিট লাগবে।

শেষ করার দরকার নেই।

অপলা থেমে থেমে বলল, দুলাভাই লোকটিকে তুমি পছন্দ না করতে পার কিন্তু তার গল্পগুলি তো ভাল। গল্প তো কোনো দোষ করেনি?

রানু উত্তর না দিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। অপলা চা দিতে গিয়ে গল্প শুরু করেছে। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছে

বুঝলেন আলম ভাই, আমি তো ভাবিনি দুলাভাইকে দেখব। আমি প্রায় চিৎকার করে

উঠেছিলাম। বহু কষ্টে সামলেছি। অনুষ্ঠান শেষে অটোগ্রাফ নেবার জন্য ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। আমিও অচেনা মেয়ের মত খাতাটা বাড়িয়ে দিয়েছি। তারপর কী হয়েছে শোনেন...

আলমের কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। সে নিশ্চয়ই থমথমে মুখে বসে আছে।

বাড়ির সামনে রিকশা এসে থেমেছে। একজন অপরিচিত লোক টগরকে কোলে করে নামছে রিকশা থেকে। কার না কার হাতে ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন খালা। রানু টগরের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। টগর তাকাল। হাসল না, হাত নাড়ল না, কিছুই করল না। কী যে অদ্ভুত হচ্ছে ছেলেটা। সমস্ত দিন মা'কে দেখেনি কিন্তু সে নির্বিকার। যেন মাকে সারাদিন দেখতে না পাওয়া একটা স্বাভাবিক ঘটনা।

বসার ঘরে অপলা একাই কথা বলে যাচ্ছে। আর তার উচ্ছ্বাস এবং আবেগ দুইই খুব উঁচু তারে বাঁধা। দুলাভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে এটাই কী উচ্ছ্বাসের মূল কারণ?

আলম ভাই এই গল্পটা শোনেন। একজন লেখক শুধু ভূতের গল্প লেখেন। একদিন দুপুর বেলায়...

অপলা তোমার গল্পটা অন্যদিন শুনব। আজ আমার একটা কাজ আছে আমি উঠব।

এক মিনিট লাগবে। বসুন না।

প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। অন্য একদিন শুনব।

বসুন আপাকে ডাকি।

না থাক, ওকে ডাকতে হবে না।

আলম ভাই আপনাদের কী রাগারাগি হয়েছে?

না না কিছুই হয়নি।

আলম ঘর থেকে বের হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টগর ঢুকল। অপলা ব্যস্ত হয়ে পড়ল টগরকে নিয়ে।

এই টগর আজ কী হয়েছে বলত?

কী হয়েছে।

আমাদেব ফাংশনে একজন বিখ্যাত লোক এসেছিলেন। সেই লোকটি লম্বা। চোখে কাল চশমা। বল তো লোকটি কে?

বাবা?

হুঁ। যা কাণ্ড হয়েছে না।

কী হয়েছে?

রানু বসার ঘরে ঢুকে দেখল টগর অপলার কোলে বসে আছে। মাকে ঢুকতে দেখে লাজুক ভঙ্গিতে হাসল।

কেমন ছিলে সাবাদিন, টগর?

ভাল।

সারাদিন বাসাতেই ছিলে না অন্য কোথাও গিয়েছিলে?

টগর সে কথার জবাব দিল না। মুখটিপে হাসল। যেন এটি একটি অপ্রয়োজনীয় কথা, এর জবাব দেবার দরকার নেই। বাবার কিছু কিছু স্বভাব সে পেয়ে যাচ্ছে। যে সব প্রশ্নের জবাব দেবার সে কোনো প্রয়োজন মনে করবে না সে সব প্রশ্নের সে জবাব দেবে না। রানু সব সময় ভাবত টগরের বাবা এটা অন্যদের ভাগিয়ে দেবার জন্যে করে থাকে। এখন মনে হয় না। এখন মনে হয়, এটা তার স্বভাব। রানু বলল,

টগর, দুপুরে কী দিয়ে ভাত খেয়েছ?

টগর এই প্রশ্নটিরও জবাব দিল না। সম্ভবত এটাও তার কাছে একটি অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন। সে অপলার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী যেন বলল। রানু শীতল স্বরে জিজ্ঞেস করল, কী বলছ টগর? টগর চুপ করে রইল। অপলা হাসি মুখে বলল, দুলাভাই আমাদের ফাংশনে কী বললেন তাই জানতে চাচ্ছে।

এটা ফিসফিস করে বলার দরকার কী?

হয়ত ভাবছে তুমি রেগে যাবে।

আমি রেগে যাব কেন?

না রাগলেও বিরক্ত হবে। তার কথা উঠলেই তুমি নীরব হও। হও না?

রানু লক্ষ্য করল অপলা কাটা কাটা জবাব দিচ্ছে। তার গলার স্বর তীক্ষ্ণ। যেন সে একটা ঝগড়া বাঁধাতে চায়। রাগিয়ে দিতে চায় রানুকে। টগর অপলার গলা জড়িয়ে ধরে কৌতূহলী চোখে তাকাচ্ছে। রানু সহজ স্বরে বলল, যাও টগর, হাত-মুখ ধুয়ে আস। আমি তোমাকে নিয়ে হাঁটতে যাব।

কোথায়?

রাস্তায় হাঁটব। শিশু পার্কের দিকেও যেতে পারি। যাবে?

টগর মাথা নাড়ল। সে যাবে কিন্তু তার মধ্যে তেমন কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। যেন নেহায়েত মাকে খুশি করবার জন্যে রাজি হওয়া।

রাতে ঘুমুতে যাবার আগে রানু উঁকি দিল অপলার ঘরে। সে গভীর মনযোগে খাতা খুলে দেখছে। রানুকে ঢুকতে দেখেই সে খাতা বন্ধ করে ফ্যাকাসে ভাবে হাসল। রানু লক্ষ্য করল অপলার মুখ লালচে হয়ে আছে।

তোর এখানে একটু বসি অপলা?

বস। আমার এখানে বসতে হলে আবার অনুমতি লাগবে নাকি?

অপলা নার্ভাস ভঙ্গিতে হাসল। রানু বলল, তোর ঐ খাতায় তোর দুলাভাই কী অটোগ্রাফ দিয়েছে?

হুঁ।

দেখতে পারি?

অপলা খাতা বের করল। দু'লাইনের একটি লেখা 'হায় সখী, এত স্বর্গপুরী নয়। পুষ্পে কীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়'। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা দেখতে ভাল লাগে।

অপলা ভয়ে ভয়ে বলল, যারা অটোগ্রাফের জন্যে গিয়েছে দুলাভাই তাদের সবার খাতাতেই এ রকম সুন্দর সুন্দর লাইন লিখে দিয়েছেন।

জানি। এ রকম অসংখ্য লাইন তার মুখস্থ।

তুমি রাগ করনি তো আপা?

রাগ করব কেন?

অপলা মাথা নিচু করে বসে রইল। রানু বলল, কিন্তু তুই এমন ভাব করছিস যেন তোকে একটা প্রেমপত্র লিখে দিয়েছে। তুই এই লেখাটা কম করেও এক লক্ষ্য বার পড়েছিস। পড়িসনি।

তুমি শুধু শুধু রাগ করছ আপা।

না রাগ করছি না। একজন লেখক তার ভক্ত পাঠিকাকে সুন্দর একটা কবিতার লাইন লিখে দিয়েছে এতে রাগ করার কিছু নেই। কিন্তু সেই পাঠিকা যদি মনে করে এই লাইনটি তার জন্যেই লেখা তাহলেই মুশকিল।

কী মুশকিল?

রানু বলল, তোকে একটা গল্প বলি শোন— আমার বিয়ের পর পর একবার একটি মেয়ে তাকে চিঠি লিখল। বিবাহিতা মেয়ে। বিয়েতে ওর কিছু বই পেয়েছিল। সেই বই পড়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে লেখা চিঠি। ও চিঠির জবাব দিল। মেয়েটি আবার লিখল -- চমৎকার চিঠি। তারপর একদিন এল দেখা করতে। মেয়েটি দেখতে ভাল নয়। কালো বেঁটে অসম্ভব রোগা। তোর দুলাভাই মেয়েটিকে দেখেই রেগে গেল। মুখ কালো করে বলল, -- আমি এখন লিখছি, এখন কথা বলতে পারব না। অথচ এই মেয়েটিকে সে সুন্দর চিঠি লিখেছে, বই পাঠিয়েছে।

তারপর?

তারপর আবার কী। তোর দুলাভাই চলে গেল অন্য ঘরে। মেয়েটি ঘণ্টাখানিক বসে রইল। আমি দু'একটা কথা-টথা বলতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে কথা বলতে আসেনি।

দুলাভাই আর কথা বললেন না?

না। তবে মেয়েটি যদি সুন্দরী হত সে তার সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাহিত্য নিয়ে আলাপ করত। আগ্রহ নিয়ে বলত জীবন কী, জীবনের মানে কী? মেয়েটি আবার ঘুরে ঘুরে আসত।

অপলা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। রানু বলল, লোকটির মধ্যে কোনো কিছুর প্রতি কোনো মমতা নেই। মানুষের প্রতি যার মমতা নেই সে লেখক হতে পারে না। লেখকরা মানুষের কথা

লেখেন। মমতা ছাড়া তাদের কথা লেখা যায় না।

কিন্তু তিনি তো লিখছেন।

ঐ সব ট্র্যাস। ডাস্টবিনে ফেলে দেবার জিনিস। যে কবিতার লাইন তোর খাতায় লিখেছে তার পেছনেও কোনো সত্য নেই। অন্যের ধার করা লাইন। তার গল্প উপন্যাসও সে রকম। তুই ঐ পাতাটি ছিড়ে ফেলে দে।

অপলা অবাক হয়ে বলল, কী বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি, ছিঁড়ে ফেল।

না, ওটা আমি ছিঁড়ব না।

দে পাতাটা আমার কাছে।

অপলা খাতা দিল না। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। রানু খাতাটা হাতে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ছিঁড়ে কুচি কুচি করে ফেলল।

আপা তুমি এ রকম করলে কেন?

ঠিকই করেছি।

না, তুমি ঠিক করনি। এটা আমার জিনিস। আমার জন্যে লেখা। এটা তুমি ছিঁড়তে পার না। তোমার নিজের যা আছে সে সব ছিঁড়ে ফেল। আমার গুলি কেন?

অপলা কেঁদে ফেলল। রানু বিস্মিত চোখে তাকিয়ে বইল অপলার দিকে। সে নিজেও নিজের আচরণে খুব অবাক হয়েছে। সে কেন এরকম করল? সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটেছে আলমের জন্যে। আলম আজ না এলে এটা হত না। তার আসার কারণেই রানু অস্থিরতায় ভুগছিল। খাতা ছিঁড়ে ফেলার পেছনে অন্য কোনো যুক্তি নেই। এমন ছেলেমানুষি একটি কাণ্ড রানু করতে পারে না।

অপলা, আই এ্যাম সরি। কিছু মনে করিস না।

অপলা টেবিলে মাথা রেখে কাঁদছে। রানু তার পিঠে হাত রাখল। হঠাৎ তার মনে হল অপলার মতো একটি মেয়ের সঙ্গে ওসমানের বিয়ে হলে বেশ হত। এই কথাটি তার কেন মনে হল কে জানে।

ওসমান সাহেব বাথরুমে হাত-মুখ ধুচ্ছিলেন। কাল রাতে তাঁর ভাল ঘুম হয়নি। চোখ লাল হয়ে আছে। মাথা ভার ভার। এই অবস্থাতেই তাঁকে বেরুতে হবে। আজ অনেকগুলি কথা বলবেন। কলেজে যাবেন। প্রিন্সিপ্যালকে বলবেন মাস্টারি আর করব না। আমি অসুস্থ। মাস্টারিতে মন বসছে না। রানুর কাছে যাবেন। রানুকে বলবেন বেশ কিছু দিনের জন্য তিনি গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন। নবীর কাছে যেতে হবে। নবী খবর পাঠিয়েছে খুব দরকার।

ওসমান সাহেব বাথরুম থেকে বেরিয়েই দেখলেন রানু এসেছে। সকাল সাতটায় হঠাৎ তার আসার কোনো কারণ নেই।

কী ব্যাপার রানু?

রানু সহজ স্বরে বলল, তুমি একটা কাগজে লিখে দাও 'হায় সখা এত স্বর্গপুরি নয়। পুষ্পে কীট সম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়।' তারপর নাম সই কর।

কেন?

দরকার আছে। এই নাও কাগজ।

ওসমান সাহেব লিখতে বসলেন।

লিখতে লিখতে বললেন, তুমি কেমন আছ রানু? রানু কিছু বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, বাবার শরীর খারাপ হয়েছে। বেশ খারাপ।

তাতে তো তোমার কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। অন্যের অসুখ-বিসুখে তোমার কিছু যায় আসে না। তোমার উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা সুখে থাকলেই হল। ওরা সুখে আছে তো?

তিনি হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতেই বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন বস। কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে আমার ভাল লাগে না। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটা ঝগড়ার আর বসার ভঙ্গিটা হচ্ছে সন্ধির।

বসলেই সন্ধি হয়ে যাবে তোমার সঙ্গে? কেন অদ্ভুত কথাবার্তা বলে আমাকে ভুলাতে চাইছ? আমি অপলা নই।

ওসমান সাহেব কাগজ এগিয়ে দিলেন। রানু দেখল শুধু দুটি লাইনই নয় বেশ ক'টি লাইন

সেখানে লেখা। 'বিদায় অভিশাপ' পুরো কবিতাটি তার মুখস্থ। বিয়ের রাতে কী মনে করে যেন সে কবিতাটি শুনিয়েছিল। হয় তো রানুকে অভিভূত করতে চেয়েছিল। রানু কী অভিভূত হয়েছিল। রানুর মনে পড়ল না।

## ১৮

মিলি বসে আছে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে।

মিলির বর এতটা আশা করেনি। তার ধারণা ছিল ডাক্তারের কাছে যাবার কথা শুনে সে রেগে উঠবে। হৈচৈ করবে। ইদানীং সে খুব হৈচৈ করছে। কিন্তু আজ সে বেশ শান্ত। সহজ সুরে পাশে বসা মহিলার সঙ্গে কথা বলছে। মহিলা পান খাচ্ছেন। তিনি নিশ্চয়ই পেসেন্ট নন। কোন রোগী ডাক্তারের কাছে এসে এমন আরাম করে পান চিবোয় না। মিলি তার বরকে হাত ইশারা করে ডাকল। মতিয়ুর নড়ল না। কাছে গেলেই মিলি হয়ত চট করে রেগে যাবে। সহজ স্বাভাবিক ভাব মুহূর্তের মধ্যে মাটি হবে। মিলি নিজেই এগিয়ে এল। হাসি মুখে বলল, আমাকে একটা পান এনে দেবে? পান খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

ডাক্তারের কাছেও সে বেশ স্বাভাবিক রইল। মাথা নিচু করে শান্ত গলায় বলল, পান খাচ্ছি বলে রাগ করছেন না তো? ডাক্তার সাহেব হাসলেন।

না, রাগ করব কেন?

আমার বড় ভাই খুব রাগ করেন।

তাই বুঝি?

জি। কাউকে পান খেতে দেখলেই তার নাকি গরুর জাবর কাটার কথা মনে হয়। ভাইয়া এমনিতে খুব গম্ভীর। কিন্তু মাঝে মাঝে এমন সব মজার কথা বলে? আপনি আমার ভাইকে চেনন তো?

হ্যাঁ নামে চিনি। টিভিতে একবার দেখেছিলাম কী একটা প্রোগ্রামে যেন এসেছিলেন। টিভিতে খুব লাজুক মনে হচ্ছিল।

উনার কোনো বই পড়েছেন?

গল্পের বই পড়ার অভ্যাস আমার খুব কম।

আমারো কম। ভাইয়া আমাকে নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছে, সেটি শেষ করতেও আমার এক মাস লেগেছে। আপনি বোধ হয় আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।

বিশ্বাস করব না কেন?

কেউ বিশ্বাস করে না।

মিলি হাই তুলল। সন্ধ্যাবেলার দিকে তার একবার প্রচণ্ড ঘুম পায়। তারপর বাকি রাতটা কাটে জেগে। কি কষ্ট! কি কষ্ট!

আপনার ভাইকে আপনি খুব পছন্দ করেন?

হুঁ।

আর কাকে পছন্দ করেন?

আর কাউকে না।

কাউকে না?

না।

না। আমার এই কথাটিও আপনি বিশ্বাস করছেন না, তাই না?

বিশ্বাস করব না কেন?

আমার কেন জানি শুধু মনে হয় কেউ আমার কথা বিশ্বাস করে না। আমি অবশ্যি খুব মিথ্যা কথা বলি।

সে তো আমরা সবাই বলি। আমিও বলি।

মিলি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। ডাক্তার সাহেব অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিলি বলল,

আপনি আমার সব কথাতেই সায় দিচ্ছেন কারণ আপনার ধারণা আমি পাগল তাই আমাকে না রাগাবার চেষ্টা করছেন।

আপনার ধারণা ঠিক নয়। আপনি একজন সুস্থ মানুষ। আপনার কথায় সুন্দর লজিক আছে। একজন মানষিক রোগীর কথাবার্তায় কোনো লজিক থাকে না। প্রায়ই ওরা বুদ্ধিমানের মত

কনভারসেশন চালিয়ে যেতে পারে কিন্তু লজিকে এসে আটকে যায়।

আমি কিন্তু সত্যি সত্যিই পাগল।

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেললেন। মিলিও হাসল। এই ডাক্তারটিকে তার পছন্দ হয়েছে।

ক্লিনিক থেকে বেরিয়েই মিলি বলল, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। তাকিয়ে থাকতে পারছি না। মতিয়ুর বলল, বাসায় যাচ্ছি। বাসায় গিয়েই ঘুমিয়ে পড়বে। সে তার স্ত্রীর হাত ধরল। অনেক দিন পর সে স্ত্রীর প্রতি অন্য এক ধরনের মমতা অনুভব করছে। অসহায় শিশুর জন্য যে ধরনের মমতা অনুভব করা হয় সে ধরনের মমতা।

মিলি বলল, আমার বাসায় যেতে ইচ্ছা করছে না।

বাসায় না গেলে কোথায় যাবে? রাস্তায় ঘুরবে খানিকক্ষণ?

না। আমাকে ভাবীর বাসায় নিয়ে চল। অনেকদিন ভাবীকে দেখি না। তাঁকে দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে।

কাল সকালে গেলে হয় না?

সকালে উনাকে পাওয়া যাবে না। অফিসে চলে যান। তা ছাড়া এখন আমার যেতে ইচ্ছা করছে, সকালে হয়ত যেতে ইচ্ছা করবে না। ভাবীর সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে।

কী কথা?

মিলি জবাব দিল না। তার ঘুম পাচ্ছে। গাড়িতে উঠেই সে চোখ বন্ধ করে এলিয়ে পড়ল। কে জানে আজ রাতে হয়ত তার গাঢ় ঘুম হবে। জেগে জেগে রাত কাটাতে আর ভাল লাগছে না।

মতিয়ুর নরম গলায় বলল, ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে তোমার কী কথা হল?

তেমন কোনো কথা হয়নি। আমি পান খাচ্ছিলাম তো তাই দেখে উনি খুব রেগে গেলেন।

রাগলেন কেন?

ভাইয়ার মত স্বভাব। ভাইয়াও তো রাগত।

বলেই মিলি হাসল। মতিয়ুর আর কিছু বলল না।

মিলিকে দেখে রানু খুবই অবাক হল।

একি অবস্থা তোমার মিলি। শরীরের এ রকম হাল কেন?

আমি পাগল হয়ে গেছি ভাবী।

কী বলছ আবোল-তাবোল। আস, তুমি বিছানায় শুয়ে থাক। তোমার এতটা শরীর খারাপ হয়েছে আমি জানতামই না।

টগর চোখ বড় বড় করে দেখছে মিলিকে। অপলক তাকিয়ে আছে। মিলি বলল, ভাবী ওকে বল চলে যেতে, আজ রাতে আমি তোমার সঙ্গে ঘুমোব। বলেই সে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। এই কথাটি সে দীর্ঘদিন পরে বলল। তার বিয়ের পরও সে বেশ অনেকবার অসময়ে চলে এসেছে রানুর কাছে। লজ্জিত ভঙ্গিতে বলেছে, ভাবী আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমোব। রানু হেসে বলল, ঝগড়া কিছু করেছ?

না, ঝগড়া না। এমনি। ভাইয়াকে বল অন্য ঘরে ঘুমুতে। আজ সারা রাত গল্প করব আমরা দুজন। কেমন ভাবী?

হ্যাঁ করব।

গল্প অবশ্যি করা হত না। শোয়া মাত্রই মিলি ঘুমিয়ে পড়ত। নিশ্চিন্ত ঘুম। আজ অনেক দিন পর মিলির আবার হয়ত পুরানো সখ জেগে উঠেছে। সারারাত গল্প করার কথা বলবে কিন্তু বিছানায় যাওয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়বে।

মতিয়ুর মিলিকে রেখে যেতে রাজি হল না। নিচু গলায় বলল, ওর শরীর খুবই খারাপ। ও যে কি পরিমাণ বিরক্ত করে ধারণাও করতে পারবেন না। রাতে একজন ডাক্তার এসে থাকেন। আজ সে অনেক ভাল। কতক্ষণ এরকম ভাল থাকবে বলা মুশকিল।

হঠাৎ করে এ রকম হল কেন?

হঠাৎ করে হয়নি। ধীরে ধীরে হয়েছে। আপনি অনেক দিন পর দেখছেন বলে আপনার কাছে এ রকম লাগছে।

ডাক্তার কী বলছেন?

তেমন কিছু বলছেন না। বলার মত হয়ত কিছু নেই। আমি গাড়ি রেখে যাচ্ছি, ঘণ্টাখানিক বা

ঘণ্টা দু'এক পর পাঠিয়ে দেবেন।

মিলি বিছানায় শুয়ে ছিল। অপলা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। টগর অনেক দূরে বসে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। মিলি টগরের প্রতি কোনো রকম উৎসাহ দেখাল না। যেন সে টগরকে চিনতে পারছে না।

রানু বলল, তুমি কিছু খাবে মিলি?

আমি কিছুই খাব না। তুমি আমার পাশে বস।

তোমার শরীর এত খারাপ হয়েছে আমাকে কিছু বলনি কেন।

বললে তুমি কী কবতে?

মিলি ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। থেমে থেমে বলল, আমার জন্যে কেউ কখনো কিছু করে না। আমার মা করেনি, আমার বাবা করেনি, তুমি কেন করবে? তুমি তো বাইরের মেয়ে। রানু কিছু বলল না। চেযার টেনে মিলির পাশে এসে বসল।

আমি যখন ক্লাস এইটে পড়ি। তখন একদিন বাবা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন। কারণ খুব সামান্য। মা'র একটা শাড়ি পরে ছাদে হাঁটছিলাম। বাবার ধারণা হল পাশের বাসার একটা ছেলের সঙ্গে খাতির জমানোর চেষ্টা করছি। তুমি আমার কথা বিশ্বাস কবছ তো ভাবী?

করছি।

আমি অবশ্যি প্রচুর মিথ্যা কথা বলি, তবে মাঝে মাঝে সত্যি কথাও বলি। আমাবই হযত লেখক হওয়া উচিত ছিল কিন্তু লেখক হয়ে গেল ভাইয়া। যে তার সাবা জীবনে কোন মিথ্যা কথা বলেনি। মজার ব্যাপার, তাই না ভাবী?

মিলি তাকাল রানুর দিকে। সে হয়ত মনে মনে ভেবেছে এই জাগযাতে বানু আপত্তি করবে। কিন্তু রানু কিছু বলল না। মিলি বলল, ভাইযা প্রসঙ্গে এই কথাটা কী আমি ঠিক বললাম ভাবী?

বোধ হয় ঠিক।

তবে আমার কী মনে হয় জান ভাবী, আমাব মনে হয় সব মানুষের মিথ্যা বলাব অভ্যেস থাকা উচিত। এতে অনেক ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওযা যায়। ভাইযাব যদি মিথ্যা বলাব অভ্যাস থাকত তাহলে আর তোমাদের এই ঝামেলা হত না।

রানু ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমার তো মিথ্যা বলার অভ্যাস আছে। তোমাদের খুব ঝামেলা হয় না?

হয়।

মিথ্যা কথা বলা না বলার ওপর কোনো সম্পর্ক নির্ভব করে না।

মিলি একটি নিঃশ্বাস ফেলল। অপলা বলল, আপনার বাবা আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলেন তারপর কী হল সেটা বলুন, আমার খুব শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে। রানু বিবক্ত স্বরে বলল, ঐ সব শুনে কী হবে?

আমার শুনতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আপা।

মিলি হাসি মুখে বলল, ব্যাপারটা খুব কষ্টের কিন্তু এখন কেন জানি আমার হাসি লাগছে। বাবা আমাকে ছাদ থেকে ডেকে আনলেন, তারপর খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, যে ছেলেটিকে ভুলাবার জন্যে তুমি এত সাজসজ্জা করে ছাদে হাঁটাহাঁটি করছ তাব সঙ্গে চলে যাও। এই বলেই দারোযানকে গেট বন্ধ করে দিতে বললেন। আমি গেটের বাইরে হতভম্ব হযে দাঁড়িযে রইলাম। আমার গায়ে ঝলমলে একটা শাড়ি। কিন্তু পায়ে কিছু নেই। খালি পাযে ছাদে হাঁটছিলাম তো।

তার পর?

তার পরটা শুনে কী হবে? বাদ দাও। বাবার স্বভাবই ছিল এ রকম। আমাদের দুই ভাই-বোনকে কি পরিমাণ কষ্ট যে দিয়েছেন। ভাইয়ার প্রথম বই যখন বের হল খুব হৈচৈ হল। অল্প দিনের মধ্যেই ভাইয়া বিখ্যাত হয়ে গেল। তখন বাবা ইংরেজিতে একটা বিশাল প্রবন্ধ লিখলেন এবং সেই প্রবন্ধে প্রমাণ করলেন যে বইটা কোনো এক ফরাসি বিখ্যাত উপন্যাসের দুর্বল অনুকরণ। মিলি শব্দ করে হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতে তার চোখে পানি এসে গেল। রানুর এই প্রথমবারের মত মনে হল মিলি বেশ অসুস্থ।

বুঝলে ভাবী, আমরা দুজন খুব কষ্ট করেছি।

রানু কথা ঘুরাবার জন্যে বলল, তোমার মেয়ে কেমন আছে?

জানি না কেমন আছে। বোধ হয় ভালই আছে।

জান না মানে?

ও তো আমার সঙ্গে থাকে না। একেক সময় একেক জনের সঙ্গে থাকে। এখন আছে তার এক ফুপুর সঙ্গে। আমার তো মাথার ঠিক নেই আমার সঙ্গে রাখতে ভরসা পায় না। কখন কি করে বসি। কয়েকদিন আগে আমার কাছে এনেছিল, আমি এমন ভান করলাম যেন চিনতে পারছি না। আমি মাঝে মাঝে পাগলের ভান করি এবং বেশ ভালই করি।

মিলি আবার উঁচু স্বরে হাসতে শুরু করল। হাসতে হাসতেই বলল, ভাবী আমি উঠব।

এখনই উঠবে?

হ্যাঁ, এসো তুমি আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দাও।

রানু বলল, টগরকে আদর করলে না? সব সময় তো আদর করতে।

এখন আমার আর ছোট বাচ্চাকাচ্চা ভাল লাগে না ভাবী। টগর যাই? অপলা যাচ্ছি কেমন?

আবার এসো।

না, আমি আর আসব না।

কেন?

মিলি হাসতে হাসতে বলল, আর আসতে ইচ্ছা করবে না। অপলা হেসে ফেলল। মিলি বলল আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ না, তাই না? মাঝে মাঝে আমি কিন্তু সত্যি কথা বলি।

রানু মিলিকে ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামল। মিলি বলল, আমি নিজে নিজেই নামতে পারব। আমাকে যতটা দুর্বল দেখাচ্ছে তত দুর্বল আমি না। আমি বেশ শক্ত। মাঝে মাঝে দুর্বল হবার ভান করি।

কেন কর?

যাতে ও আমাকে ভালবাসে।

মিলি আবার হেসে ফেলল। আদুরে গলায় বলল, আমার শুধু ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করে।

রানু বলল, সে তো সবারই করে। মিলি শান্ত স্বরে বলল, না সবার করে না। যেমন তুমি, তোমার কী করে?

রানু জবাব দিল না।

ভাবী, এখন বিদেয় হচ্ছি। বক বক করে সবার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি। পাগল মানুষ, কী করব বল?

## ১৯

রাত তিনটায় ফয়সল সাহেব একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন। তার ইদানীং কালের স্বপ্নগুলি অস্পষ্ট কিন্তু আজ রাতের স্বপ্ন অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি দেখলেন একটা প্রকাণ্ড নেকড়ের মতো জন্তু তাকে কামড়াচ্ছে। বাঁ পায়ে কামড় দিয়ে একটুকরা মাংস সে ছিঁড়ে নিল। তিনি জেগে উঠলেন বাঁ পায়ে তীব্র ব্যথা নিয়ে। জেগে উঠে ও তাঁর মনে হল সত্যি সত্যি তাঁর পা থেকে নেকড়েটা বোধ হয় মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন ও সত্যের সীমারেখা অস্পষ্ট হয়ে যায়। তিনি ভয় পাওয়া গলায় বীথিকে ডাকতে লাগলেন।

বীথি এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। নরম স্বরে বলল, কী হয়েছে স্যার?

স্বপ্ন দেখেছি।

কী স্বপ্ন?

কী স্বপ্ন মনে নেই। তুমি ওসমানকে টেলিফোনে ধর দেখি।

এখন অনেক রাত স্যার।

সেটা কী আমি জানি না? তোমাকে যা করতে বলেছি কর।

বীথি টেলিফোন সেট শোবার ঘরে নিয়ে এল। ওসমান সাহেবকে পেতে দেরি হল না। বীথি অস্পষ্ট স্বরে বলল, আপনি স্যারের সঙ্গে কথা বলুন।

হ্যালো ওসমান?

জি। কী ব্যাপার বাবা?

ব্যাপার কিছু না। তুই কী করছিলি?

ঘুমাচ্ছিলাম। রাত তিনটা বাজে।

রাত তিনটা বাজলেই ঘুমাতে হবে এমন কোনো কথা নেই। রাত তিনটার সময়ও অনেকে জেগে থাকে।

তা থাকে। আপনি কিছু বলবেন?

হ্যাঁ বলব। আমি এই বাড়িটা বীথির নামে দানপত্র করতে চাই।

করতে চান করুন।

তা তো করবই। তোর অনুমতি লাগবে নাকি? আমি করেই রেখেছি। আলমারীতে দলিল আছে। তোকে টেলিফোন করলাম এই জন্য যাতে পরে কোনো ঝামেলা না হয়।

কী ঝামেলা হবে?

তোর যদি মনে করে বসিস যে আমার মাথার ঠিক ছিল না। কোর্ট-কাছারি করা শুরু করিস।

এ সব কিছুই করব না। আপনার শরীর কী ঠিক আছে?

ফয়সল সাহেব কিছু না বলে টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। বীথিকে বললেন, আমার মধ্যে যে সব খারাপ জিনিস আছে তার কোনোটাই আমার ছেলের মধ্যে নেই। ও ছোট বেলা থেকে আমাকে দেখে দেখে নিজেকে ঠিক করেছে। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। মানুষ উল্টোটা করে। খারাপটাই শেখে।

বীথি বলল, আপনার কী শরীর খারাপ লাগছে?

হুঁ লাগছে। তুমি একটা টেলিফোন কর এম্বুলেন্সের জন্যে। হাসপাতালে নিয়ে যাও। চেষ্টা করে দেখ আরো কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পার কী না।

ফয়সল সাহেব চোখ বন্ধ করে আধশোয়া হয়ে বসলেন। গেটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্ধ ভিখারীর ছবিটি তাঁর সামনে ভেসে উঠল। ভিখিরীটির সঙ্গে এবার একটি নেকড়ে আছে। নেকড়েটির মুখ হাসি হাসি। পশুরা হাসতে পারে না কথাটা ঠিক না। ছোলেবেলায় ভালুকের খেলা দেখাতে একটি লোক এসেছিল। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে ভালুকটা তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্য। তিনি প্রায় রাতেই এই ভালুকটাকে স্বপ্নে দেখতেন।

ফয়সল সাহেব চোখ মেললেন। বীথি টেলিফোন করছে। কী সুন্দর লাগছে। কী চমৎকার একটি দৃশ্য।

বীথি।

জি স্যার।

পাওয়া গেছে কাউকে?

এম্বুলেন্স আসছে স্যার।

কাউকে খবর দেয়ার দরকার নেই। তুমি একাই আমাকে নিয়ে যাও।

বীথি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

ফয়সল সাহেব মারা গেলেন এম্বুলেন্সে। নিঃশব্দ মৃত্যু। বীথি তাঁর হাত ধরে বসেছিল। সে পর্যন্ত বুঝতে পারল না। যেমন হাত ধরে ছিল তেমনি ধরে থাকল।

## ২০

মিলি একাই কাঁদছে।

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন বাবার মৃত্যু তাকে তেমন অভিভূত করতে পারছে না। অস্বস্তি লাগছে এই পর্যন্তই। তার মনে হল, এখন যদি কেউ বলে আপনার এখানে থাকার দরকার নেই আপনি চলে যান, তাহলে তিনি খুশিই হবেন। তাঁর প্রচণ্ড চায়ের পিপাসা হচ্ছে।

ফয়সল সাহেবের শরীর সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। সাদা চাদর এখানে একটা রহস্যের সৃষ্টি করেছে। আড়াল মানেই রহস্যময়তা। গোল্ড রিমের চশমা পরা একজন ডাক্তার এসে বলল, আপনারা সবাই এখানে ভিড় করছেন কেন? বাইরে অপেক্ষা করেন। ডেডবডি নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেন।

মিলি চেঁচিয়ে কাঁদছে। গ্রাম্য ধরনের কান্না। বিরক্তিকর। ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, চুপ কর মিলি। মিলি চোখ বড় বড় করে বলল, কেন চুপ করব, কেন?

সবাইকে বিরক্ত করছিস।

বেশ করছি।

ওসমান সাহেব ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গেলেন। যেন ক্ষমা প্রার্থনা করছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন, আমরা এক্ষুণি ডেডবডি নেবার ব্যবস্থা করব। আপনি কিছু মনে করবেন না। ডাক্তার

তাকাল অবাক হয়ে।

আপনি কে?

যে মানুষটি মারা গেছেন আমি তাঁর বড় ছেলে।

ডাক্তার তাকিয়ে আছে। তার চোখে বিস্ময়। ওসমান সাহেবের মনে হল শুধু বিস্ময় নয় অভিযোগও আছে। যেন সে বলছে তুমি মৃত ব্যক্তিটির ছেলে অথচ তোমার চোখ শুকনো, তুমি দিব্যি নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে হাঁটাহাঁটি করছ। তোমার বোনকে বলছ -- কান্না বন্ধ করতে। এটা ঠিক না।

তিনি বারান্দায় চলে গেলেন। লম্বা বারান্দায় বহু লোকজন অপেক্ষা করছে। প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষার মত খারাপ আর কিছুই নেই। এরা সবাই প্রতীক্ষা করছে। তিনি সিগারেট ধরালেন। ডেডবডি নেবার ব্যবস্থা তিনি না থাকলেও হবে। এবং ভালভাবেই হবে। এর মধ্যে তার আর থাকতে ইচ্ছা করছে না। থাকার প্রয়োজনও নেই। এ সমস্ত কাজের জন্যে প্রচুর উৎসাহী লোকজন আছে। এরা খুব আগ্রহ নিয়ে ছোটাছুটি করবে।

আচ্ছা তিনি কী তাঁর কোনো উপন্যাসে মৃত্যু বর্ণনা করেছেন? তিনি মনে করতে পারলেন না। তবে দীর্ঘ বর্ণনা কোথাও নেই এটা প্রায় একশ ভাগ গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়। মৃত্যু ব্যাপারটি তিনি সব সময় এক দুই লাইনে সারতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর ধারণা তিনি একা নন মৃত্যুর বর্ণনা খুব কম লেখকই দিয়েছে। সবার মধ্যে একটা পাশ কাটানোর ভাব। প্রায় সবাই ফিলসফি করার চেষ্টা করছেন। মূল বর্ণনা তেমন নেই।

শরৎচন্দ্রের দেবদাসেরও একই ব্যাপার। শরৎচন্দ্র পাঠককে বললেন- 'মরণে ক্ষতি নাই। কিন্তু সেই সময় একটি সুখকর স্পর্শ কপালে আসিয়া পৌঁছে যেন একটি দয়ার্দ্র স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে জীবনের ইতি হয়।'

ওসমান সাহেব।

তিনি চমকে তাকালেন। বেঁটে মত লোকটিকে চিনতে পারলেন না। কিছু কিছু মুখ সব সময় অচেনা থাকে। দীর্ঘ পরিচয়েও তাদের কখনো চেনা মনে হয় না।

আপনি এখানে কী করছেন?

কিছু করছি না।

সবাই আপনাকে খুঁজছে।

কেন?

ডেডবডি বের করতে হবে না?

বের করুন। আমাকে দরকার কেন?

বেঁটে লোকটি অবাক হয়ে বলল, সেকি আপনি ধরবেন না?

কী ধরব?

লাশ বের করার সময় ধরতে হবে না?

না।

আরে আপনি বলেন কী?

বেঁটে লোকটির বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁর বিস্ময় দেখে ওসমান সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। লাশ বের করবার সময় তাঁর বোধহয় ধরা উচিত। এটা নিশ্চয় কোনো একটা সামাজিক নিয়ম। কুৎসিত সব নিয়মকানুন চালু আছে এ সমাজে।

ওসমান সাহেব শীতল স্বরে বললেন, যা করতে হয় আপনারা করুন। আমাকে টানবেন না। প্লিজ।

লোকটি চলে গেল। শেষ মাথা পর্যন্ত গিয়ে পেছন ফিরে তাকাল, তার মানে সে বড়ই অবাক হয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না বলেই দ্বিতীয়বার তাকিয়েছে।

তিনি ঘড়ি দেখলেন। ঘড়ি কী বন্ধ হয়ে আছে? মাত্র আটটা বাজে। হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেলে কেমন হয়? একটা রিকশায় উঠে চলে যাওয়া যায়। বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করলেই হবে।

ওসমান সাহেব, স্লামালিকুম।

ওয়াল্যাইকুম সালাম।

দ্বিতীয় এই লোকটিকেও তিনি চিনতে পারলেন না। এও কী এসেছে তাঁকে নিয়ে যেতে?

আমি এখানকার একজন ডাক্তার। আমার নাম নাজমুল।

কেমন আছেন?

স্যার ভাল আছি। আপনাকে প্রথম দেখে আমি চিনতে পারিনি। চেনা চেনা লাগছিল। এখানে কী করছেন? কোনো পেসেন্ট আছে নাকি?

হ্যাঁ একজন ছিলেন। আমার বাবা। মারা গেছেন।

ডাক্তার সাহেব একটু হকচকিয়ে গেলেন। সান্ত্বনা দেয়ার ব্যাপারটা ডাক্তারেরা একেবারেই পারে না। রোগীর মৃত্যু মানেই ডাক্তারদের পরাজয়। পরাজিত মানুষেরা কখনো গুছিয়ে কিছু বলতে পারে না। ওসমান সাহেব। বললেন, আপনি কী আমাকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারেন?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আসুন স্যার আমার সঙ্গে?

আমাকে স্যার বলছেন কেন?

ডাক্তার সাহেব হেসে ফেললেন। হাসি মুখেই বললেন, আপনি আমার কাছে অনেক বড় ব্যক্তি। আপনার প্রায় লেখাই আমি দু'তিনবার পড়েছি।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। ডাক্তার সাহেব বললেন, আমার সৌভাগ্য আপনার সঙ্গে দেখা হল। আমার অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে আপনাকে।

জিজ্ঞেস করুন।

আজ না অন্য একদিন।

ডাক্তারের ঘরটি ছোটখাটো কিন্তু বেশ সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে সূর্যাস্তের একটা জল রঙ ছবি পর্যন্ত আছে। ফুলদানীতে কিছু প্লাস্টিকের ফুল। এটা চোখে লাগে। প্লাস্টিক দিয়ে ফুল বানানোর বুদ্ধি মানুষকে কে দিল কে জানে।

চায়ের কথা বলে এসেছি আপনি স্যার আরাম করে বসুন।

আরাম করেই বসেছি।

তিনি ঘড়ি দেখলেন। ঘড়ি বোধ হয় বন্ধই হয়ে আছে, এখনো আটটা বাজে।

ক'টা বাজে বলতে পারবেন ডাক্তার সাহেব?

আটটা।

তাই নাকি?

জি। আটটা বাজে দু'মিনিট হবে। আমার ঘড়ি একটু স্লো।

ওসমান সাহেব হঠাৎ অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী একটা জিনিস লক্ষ্য করছেন, মৃত্যু প্রসঙ্গ আমি মোটামুটি এড়িয়ে গেছি। আমার উপন্যাসগুলির কোনোটিতে মৃত্যু বিষয়ক কোন বর্ণনা নেই।

এটা তো স্যার ঠিক বললেন না। আপনার 'অন্য দিন' উপন্যাসের মৃত্যুর দীর্ঘ বর্ণনা আছে। চমৎকার বর্ণনা। মা মারা যাচ্ছে। তার ছোট ছেলে ও বড় মেয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ছোট ছেলেটির বয়স পাঁচ বছর, বড় মেয়েটির বয়স দশ বছর। শীতের রাত।

তিনি চমকে উঠলেন। তাঁর মনে ছিল না এই দৃশ্যটি তিনি ব্যবহার করেছেন। ডাক্তার সাহেব বললেন, স্যার বর্ণনা এত আন্তরিক যেন মনে হয় লেখকের চোখের সামনে এই ঘটনা ঘটেছে।

ওসমান সাহেব ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, চোখের সামনেই ঘটেছে। ছোট ছেলেটি হচ্ছি আমি আর বড় মেয়েটি আমার বোন। ওর নাম ছিল নীলাঞ্জনা। খুব কাব্যিক নাম। আমার মায়ের রাখা। ও মারা যায় এগারো বছর বয়সে।

বলতে বলতে তাঁর গলা ধরে এল। দীর্ঘদিন পর তাঁর চোখ ভিজে উঠল। মানুষের দুঃখগুলি কোথায় লুকানো থাকে?

চা নিন স্যার। চিনি হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে?

আপনার বোধ হয় সিগারেট শেষ হয়ে গেছে। সিগারেট আনিয়ে দেই?

দিন। আপনার নামটা ভুলে গেছি। কী নাম বলেছিলেন যেন?

নাজমুল। নাজমুল হক।

নাজমুল সাহেব, চায়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনি কী এখন কাইন্ডলি দেখবেন আমার বাবার ডেডবডি নেবার ব্যাপারে ওরা কত দূর কী করেছে। উনি একুশ নম্বর বেডে ছিলেন।

ডাক্তার সাহেব বের হয়ে গেলেন। ওসমান সাহেব ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে আট। সময় সত্যি

সত্যি থেমে গেছে। আইনস্টাইন সাহেবের থিওরি অব রিলেটিভিটি। কোথায় যেন পড়েছিলেন ফাঁসির আসামির কাছে সময় শ্লথ হয়ে যায়। এক এক মিনিটও তাঁদের কাছে মনে হয় অনন্তকাল। সেই হিসেবে এরাই সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষ।

ডাক্তার সাহেব সিগারেটের একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে ঢুকলেন। মৃদু স্বরে বললেন, ওরা এখন বেরুচ্ছেন একটা এম্বুলেন্সে ডেডবডি নেয়া হচ্ছে। আসুন স্যার। ওরা অপেক্ষা করছেন আপনার জন্যে।

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

সিগারেট নিন স্যার।

তিনি সিগারেট নিলেন। ধন্যবাদ জাতীয় কিছু বলা উচিত, বলতে পারলেন না। বলার বোধ হয় প্রয়োজনও নেই।

নাজমুল সাহেব, যাই।

স্যার আবার দেখা হবে।

অন্য দিনের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছিন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ডাক্তার সাহেব কিছুই বুঝতে পারলেন না। ওসমান সাহেব থেমে থেমে বললেন, অনেক দিন পর আপনি আমার বড় বোনের কথা মনে করিয়ে দিলেন। থ্যাংকস।

ন'টার মধ্যে ফয়সল্ সাহেবের বাড়ি মানুষজনে ভরে গেল। ঢাকা শহরের পরিচিত অর্ধ পরিচিত সব আত্মীয় স্বজন চলে এসেছে। গেট দিয়ে ঢুকেছে অত্যন্ত চিন্তিত ও বিষণ্ন মুখে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। একদল ঘুরে বেড়াচ্ছে অলস ভঙ্গিতে, অন্য একদল দারুণ ব্যস্ত। যদিও এতটা ব্যস্ততার কোনোই কারণ নেই। সবাইকে খরব দেয়া। পত্রিকার অফিসে নিউজ পাঠানো। ফটোগ্রাফার এনে ছবি তোলানো। অসংখ্য কাজ।

ওসমান সাহেব দোতালার বারান্দায় চাদব গায়ে দিয়ে বসেছিলেন। তাঁর একটু শীত শীত করছে। বীথি এসে বলল, আপনি ভেতবে গিয়ে বসুন না। শীত লাগছে তো।

না ঠিক আছে। মিলি কী করছে?

ও শুয়ে আছে।

জ্ঞান ফিরেছে?

হ্যাঁ ডাক্তার সিডেটিভ দিয়েছে। ঘুমিযে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই। আপনি কিছু খাবেন? দু'পিস কেক এনে দেই?

দিন।

বলেই তাঁর লজ্জা লাগল। দু'ভাই বোনের একজন ঘন ঘন ফিট হচ্ছে। অন্যজন দিব্যি বসে আছে। কেক বিসকিট খাচ্ছে।

আপনি একটু মিলিকে ডেকে দিন।

ওকে এখন আর ডাকাডাকি করবেন না। ঘুমুতে দিন।

মিলির হ্যাসবেন্ড কোথায়?

উনি মিলির সঙ্গে আছেন। উনাকে ডেকে দেব?

না থাক।

বীথি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, ডেডবডি তো গ্রামের বাড়িতে যাবে। আপনি যাচ্ছেন তো সঙ্গে?

গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ। স্যার সেরকম বলে গেছেন। আপনি কী যাচ্ছেন সঙ্গে।

কখন যাবে?

কাল ভোরে। ট্রাক ভাড়া করতে গেছে। আপনি একটু কিছু মুখে দিয়ে নিচে গিয়ে বসুন। এভাবে বসে থাকা ভাল দেখায় না।

নিচে গিয়ে আমি করবটা কী?

কিছু করতে হবে না। বসে থাকবেন।

ওসমান সাহেব নিচে নেমে আসতেই নতুন একটা উদ্দীপনা দেখা দিল। খাটের চারপাশে কয়েকজন দোয়া-দরুদ পড়ছিলেন, তাঁদের গলার স্বর হঠাৎ অনেকখানি উঁচুতে উঠে গেল। ওসমান

সাহেব লক্ষ্য করলেন অনেকেই রুমাল দিয়ে চোখ মুছলেন। সম্পূর্ণই লোক দেখানো ব্যাপার। তাঁর বাবা এমন কোনো মানুষ ছিলেন না যাঁর মৃত্যুতে পরিচিত মানুষজন চোখের জল ফেলবে।

তিনি কঠিন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কাউকে কখনো নরম স্বরে কিছু বলেননি। আশপাশের প্রতিটি মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এত লোকজন রুমালে চোখ মুছছে ব্যাপারটা হাস্যকর।

ধূপকাঠি এবং আতরের গন্ধে ওসমান সাহেবের মাথা ধরে গেল। তবু তিনি বসেই রইলেন। লম্বা এবং রোগা ধরনের একজন মওলানা সাহেব কোবান শরীফ পড়ছেন। তাঁর কল্পনাতেও ছিল না। পড়ার ভঙ্গিতে, গলার স্বরে কোথাও যেন একটা অপার্থিব কিছু আছে যা মন ছুঁয়ে যায়। তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন।

ওসমান একটু শুনে যাও তো।

তিনি চোখ মেললেন। মগবাজারের সিদ্দিক সাহেব। তাঁব দূব সম্পর্কের চাচা।

একটু বাইরে আস আমার সাথে।

তিনি বারান্দায় এলেন। সিদ্দিক সাহেব নিচু স্বরে বললেন, ঘবেব আলমাবির সব চাবি নিজেব কাছে নিয়ে যাও, নয়ত হরির লুট হয়ে যাবে।

হরির লুট হওয়ার মত কিছু নেই।

তুমি বললেই হল, নাই। কিছুই জানো না তুমি। ক্যাশ টাকাই আছে দশ-বাব হাজার।

দেখি।

না, দেখাদেখির কিছু নাই। আব শোন, এই বাড়ি ভর্তি ফালতু লোকজন। এদেব সবাবার ব্যবস্থা কর।

কেন?

পরে আর সরাতে পারবে না। গ্যাট হযে বসবে। দান করে গেছেন। হেন তেন সতেরো কথা বলবে।

ওসমান সাহেব কিছু বললেন না।

তোমার বলতে লজ্জা লাগে তো আমি বলে দেব।

আপনার বলার দারকার নেই।

খুব দরকার আছে। তুমি ব্যাপারটার গুরুত্বই বুঝতে পারছ না। তা ছাড়া শুনলাম বাড়ি ঘর সব নাকি ঐ মেয়েকে দিয়ে গেছেন?

হ্যাঁ, দিয়ে গেছেন।

একদম চেপে যাও। আমি দেখব ব্যাপারটা। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।

ওসমান সাহেব আবার দোতলায় চলে এলেন। মিলি ঘুমায়নি, খুন খুন করে কাঁদছে। সে কী বাবার মৃত্যুর জন্যেই এমন কাঁদছে না পুরনো কোনো দুঃখের কথা ভেবে ভেবে কাঁদছে? জানার কোনো উপায় নেই। নিজের মনকেই কখনো জানা যায় না অন্যের মন জানার তো প্রশ্নই ওঠে না।

ওসমান সাহেব সিগারেট ধরিয়ে হাঁটতে লাগলেন। ক্ষিধে লেগেছে। কটা বেজেছে কে জানে? বীথি এগিয়ে আসছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কেন জানি ওসমান সাহেবের ইচ্ছা হল বীথির মুখ ভাল করে লক্ষ্য করতে। গালে চোখের জলের কোনো চিহ্ন আছে কী না। চোখ লাল হয়ে আছে কিনা। তিনি হাত ইশারা করে বীথিকে ডাকলেন।

বীথি এগিয়ে এল।

কিছু বলবেন?

ওসমান সাহেব নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, অনেকদিন ধরে আমি কিছু লিখতে পারছি না। বীথি তাকিয়ে রইল। বেশ কিছুক্ষণ কোনো কথা বলল না। ওসমান সাহেব বললেন, মৃত্যু আমার কাছে খুব ছোট ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। আমার কষ্ট অনেক বেশি।

বীথি কোমল স্বরে বলল, আপনি রানু ভাবীকে নিয়ে আসুন। একটা গাড়ি নিয়ে চলে যান।

ওকে এনে কী হবে?

বাবার মৃত্যু সংবাদ তো অন্তত তাঁকে দিন। দেয়া উচিত। টগরকেও আনুন। ওসমান সাহেব রানুকে খবর দিতে গেলেন অনেক রাতে।

রানু ঘুমিয়ে পড়েছিল। এত রাতে তাঁকে আসতে দেখে সে খুব অবাক হল। চিন্তিত মুখে

বলল, কী হয়েছে? বাবার মৃত্যু সংবাদ দেবার বদলে ওসমান সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, রানু আমি কিছু লিখতে পারছি না।

## ২১

রানু অবাক হয়ে বলল, রাত এগারটার সময় তুমি আমাকে এই খবরটা দিতে এলে?

ওসমান সাহেব চুপ করে রইলেন। রানুর পেছনে পেছনে অপলাও এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে মুখে কৌতূহল। সে বলল, কী ব্যাপার দুলাভাই? রানু কাটাকাটা গলায় বলল, তোর দুলাভাই ইদানীং লিখতে পারছে না এই খবরটা দিতে এসেছে।

দুলাভাই ভেতরে এসে বসেন।

ওসমান সাহেব বসবার ঘরে এসে ঢুকলেন। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বসলেন সোফায়। চাপা গলায় বললেন, টগর কী ঘুমুচ্ছে? রানু বলল, হ্যাঁ।

ওর শরীর ভাল আছে?

ভালই আছে।

এক কাপ চা খাওয়াতে পার রানু? প্রচণ্ড শীত বাইরে।

রানু কিছুই বলল না। অপলা বলল, আপনি আরাম করে বসুন। আমি চা নিয়ে আসছি। আপা তুমি খাবে?

না।

খাও না একটু। তিন কাপ নিয়ে আসি। গল্প করতে করতে খাব।

রানু কড়া চোখে তাকাল অপলার দিকে। অপলা সেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করল। দুলাভাইয়ের হঠাৎ করে এই রাতের বেলা উপস্থিত হওয়াটা তার খুব ভাল লাগছে। কেমন যেন উৎসব মনে হচ্ছে তার কাছে। সে হালকা পায়ে চা আনতে গেল।

ওসমান সাহেব বললেন, রানু এক গ্লাস পানি খাব। রানু বলল, তোমার কী হয়েছে?

আমার কিছু হয়নি।

তোমাকে আমি খুব ভালভাবে চিনি। অকারণে তুমি এত রাতে এখানে আসবে না। তোমার অহঙ্কারে লাগবে। কী হয়েছে, বল।

বাবা মারা গেছেন।

কখন?

রাতে। ঠিক টাইমটা বলতে পারব না। খেয়াল করিনি।

রানু দীর্ঘ সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। ওসমান সাহেব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সিগারেট টানতে লাগলেন। এক সময় বললেন,

হঠাৎ করে বেশ শীত পড়ে গেল, তাই না রানু? নাকি শুধু আমার একারই শীত লাগছে?

শীত পড়েছে।

রানু উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। খোলা দরজায় ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। ওসমান সাহেব বললেন, তুমি কী যাবে আমার সঙ্গে? বাবা, তোমাকে খুব পছন্দ করতেন। রানু ঠাণ্ডা গলায় বলল, একটা মৃত্যু সংবাদ দিতে এসে তুমি নিজের লিখতে না পারার খবরটা আগে দিলে। লেখাটা কী এতই জরুরি?

তিনি কিছু বললেন না। রানু তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, লেখকরা অন্য মানুষদের চেয়ে আলাদা এটা আর যেই বিশ্বাস করুক আমি করি না।

আমি আলাদা এটা কখনো দাবি করিনি।

দাবি করতে হবে কেন? আচার-আচারণ দিয়ে তুমি বুঝিয়ে দিতে চাও তুমি আলাদা।

তাই কী?

হ্যাঁ তাই। তোমার বাবা মারা গেলেন। এটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। অথচ তুমি নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে এসে বললে, রানু, আমি লিখতে পারছি না। এর মানে কী?

মৃত্যু খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

একজন লেখক লিখতে না পারলে বাংলা সাহিত্যের এমন কোনো ক্ষতি হবে না।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষতি নিয়ে আমি ভাবি না। আমি আমার নিজের কথাই ভাবি।

এটা ঠিকই বলেছ। নিজেকে ছাড়া তুমি আর কিছুই ভাবতে পার না।

রানু উঠে দাঁড়াল। ওসমান সাহেব বললেন, চলে যাচ্ছ নাকি?

কাপড় বদলে আসি। যেতে হবে না? তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে?

আছে। মিলির গাড়ি নিয়ে এসেছি।

ওরা গাড়ি কিনেছে নাকি?

জানি না কিনেছে কী না।

তা জানবে কেন?

অপলা চায়ের কাপ নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, দুলাভাই আমার খারাপ লাগছে। আমি বুঝতেই পারিনি আপনি একটা মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছেন।

তিনি দ্বিতীয় সিগারেট ধরিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, তোমাকে অন্য রকম লাগছে কেন অপলা?

কী রকম?

একটু যেন অচেনা লাগছে!

শাল গায়ে দিয়েছি তো সেই জন্যে। আপনি আমাকে শাল গায়ে দেয়া অবস্থায় কখনো দেখেননি।

তোমরা কখন কোন পোশাক পরে কার সামনে গিয়েছ এটা কী মনে রাখ নাকি?

অপলা লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল, হাসতে হাসতেই বলল, চা-টা ভাল হয়েছে দুলাভাই?

খুব ভাল হয়েছে। চমৎকার। বস অপলা।

অপলা বসল তাঁর সামনে। তার মুখ হাসি হাসি। চোখ চিকমিক করছে। এর মানে হচ্ছে ওসমান সাহেবের চেহারায় কোনো দুঃখের ছাপ নেই। ছাপ থাকলে অপলা এমন খুশি খুশিভাবে তাঁর সামনে এসে বসত না। একজনের দুঃখ অন্য জনের ওপর ছায়া ফেলে। ওসমান সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেল।

অপলা তুমিও চল আমাদের সঙ্গে?

কোথায়?

আমাদের বাড়িতে। টগরকেও নিয়ে চল।

আপনি রানু আপাকে বলুন। আপা রাজি না হলে তো যাওয়া হবে না।

রানুকে কিছু বলতে হল না। সে এসে অপলাকে তৈরি হতে বলল। টগরের ঘুম ভাঙিয়ে কাপড়-জামা পরাতে বসল। টগর কিছুই বলল না। যেন রাত দুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে কাপড়-জামা পরানোটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। শিশু সুলভ কোন কিছুই তার মধ্যে নেই। এ রকম হচ্ছে কেন ছেলেটা?

রানু বলল, টগর আমরা তোমার দাদার বাড়িতে যাচ্ছি।

আচ্ছা।

তোমার দাদা মারা গেছেন।

টগরকে এবার কৌতূহলী হতে দেখা গেল। সে চোখ বড় বড় করে তাকাল। রানু বলল, মানুষ যখন খুব বুড়ো হয় তখন তারা মারা যায়।

বাচ্চারা মারা যায় না?

না।

টগর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বাচ্চারাও মারা যায়। আমি দেখেছি।

কোথায় দেখলে তুমি?

টগর কোন উত্তর দিল না। রানু তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, কোথায় দেখলে তুমি বল শুনি।

বলব না।

বলবে না কেন?

বলতে ইচ্ছা করছে না।

তারা বাড়িতে পৌঁছল একটার দিকে। টগরের চোখে ঘুমের লেশমাত্র নেই। সে অপলার গলা জড়িয়ে ধরে আছে। অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে দেখছে চারদিকে। মাঝে মাঝে ফিসফিস করে অপলার কানে কানে কি যেন বলছে এবং অপলা বিরক্ত হচ্ছে।

লোকজন বাড়িতে অনেক কম। বেশির ভাগ আত্মীয়-স্বজনই চলে গেছেন। যারা আছেন তাঁদের একটা বড় অংশ বসার ঘরে ঝিমুচ্ছে। কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। আগের জমজমাট ভাব এখন

আর নেই। চারদিকে মোটামুটিভাবে নিঃশব্দ। শুধু মওলানা সাহেব এখনো ক্লান্তিহীন। তিনি আগের মতই সুরেলা গলায় কোরান শরীফ পড়ছেন। সারা রাতই হয় তো পড়বেন।

ওসমান সাহেবের মনে হল এই মওলানা সাহেব এর আগেও নিশ্চয়ই অনেক মৃত মানুষের পাশে বসে কোরান শরীফ পড়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটিতেই এখন তিনি অভ্যস্ত। এটা তার একটা রুটিন কাজ। অথচ মনে হচ্ছে কী গভীর আবেগ নিয়েই না তিনি কোরান শরীফের আয়াত পড়ে যাচ্ছেন, একটির পর একটি। লেখকরাও তো অনেকটা সে রকম। রুটিন মত লিখতে বসেন। পাঠকরা সে লেখা পড়ে মনে করে কী গভীর আবেগ ও মমতা নিয়েই না লেখাগুলি লেখা হয়েছে। পাঠকরা হাসে ও কাঁদে।

ওদের ঢুকতে দেখে বীথি এগিয়ে এল। টগরকে বলল, বাবু তুমি আমার কোলে আসবে? টগর দু'হাত বাড়িয়ে দিল। যেন এর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। অথচ বীথির সঙ্গে তার পরিচয় নেই। বীথি রানুকে বলল, আপনি আসুন আমার সঙ্গে, বাবুকে শোয়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। রাতটা নিশ্চয়ই থাকবেন?

হ্যাঁ থাকব।

আপনার জন্য একটা ঘর গুছিয়ে রেখেছি।

রানু বীথির সঙ্গে দোতলায় উঠে গেল। অপলা বলল, এই মেয়েটি কে দুলাভাই?

আমার বাবার সেক্রেটারি। বীথি।

আশ্চর্য এমন সুন্দর মানুষ হয়?

খুব সুন্দর নাকি?

হ্যাঁ।

অপলা খুব অবাক হয়েছে। ওসমান সাহেবের মনে হল সৌন্দর্য ব্যাপারটা পরিবেশ নির্ভর। গভীর রাতে অপলা একটি অপরিচিত বাড়িতে এসেছে। সে বাড়িতে একটি মৃতদেহ আছে। স্বভাবতই অপলার মনে ভয় এবং সংশয় ছিল। সে নিশ্চয়ই ভেবে রেখেছিল এ বাড়িতে এসে সে দেখবে চারদিকে সবাই কাঁদছে। এ রকম কিছু সে দেখেনি। সে দেখেছে বীথিকে। যার মুখে অন্য ধরনের একটি স্নিগ্ধতা আছে। যার কাঁধে হালকা নীল রঙের চাদর। পরনের শাড়ি সাদা রঙের। ছবিটি সুন্দর। কাজেই অপলার মনে হয়েছে সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর রমণীটিকে দেখেছে। দিনের আলোয় এ রকম মনে হবে না। কিংবা হয়ত হবে। মনের ওপর প্রথম যে ছাপটি পড়ে তা দীর্ঘদিন থেকে যায়।

অপলা হাঁটতে লাগল ওসমান সাহেবের পিছু পিছু। একবার ক্ষীণ স্বরে বলল, বিরাট বাড়ি আপনাদেরই দুলাভাই। রাজপ্রাসাদের মত। এটাও একটা আপেক্ষিক কথা। রাতের জন্যে বাড়িটি প্রকাণ্ড মনে হচ্ছে। দিনের আলোয় আর সে রকম মনে হবে না।

অপলা।

বলুন।

কাল আমি ডেডবডি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যাব। ঐ বাড়িটিও খুব সুন্দর। তুমি যাবে আমার সঙ্গে?

অপলা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ দুলাভাই আমি যাব। তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। মওলানা সাহেব এক মনে কোরান পাঠ করছেন। সবাইকে মনে করিয়ে দিচ্ছেন এ বাড়িতে একটি মৃত্যু ঘটেছে।

টগরকে ঘুম পাড়িয়ে রানু নিচে আসছিল। সিঁড়ির গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়াল। বারান্দার রেলিং ধরে অপলা দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর পাশেই ওসমান। দুজনের দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে অন্যরকম কিছু একটা আছে। রানুর বুকে ছোট্ট একটা ধাক্কা লাগল।

## ২২

**দিন কী খুব দ্রুত কাটে?**

কারোর কারো হয়ত কাটে। কিন্তু ওসমান সাহেবের ধারণা তাঁর দিন চলছে শামুকের মত। এবং কখনো একেবারে চলছেই না, থেমে আছে।

কিন্তু আজ বীথির কথা শুনে তিনি চমকে উঠলেন। দ্বিতীয় বারের মত বললেন, বাবা মারা

গেছেন এক বছর হয়েছে? বলেন কী?

বীথি হালকা স্বরে বলল, সময় খুব দ্রুত যায়। বলেই সে হাসল। সেই হাসি সে ধরে রাখল অনেকক্ষণ। কেউ কেউ দীর্ঘ সময় হাসি ধরে রাখে। কেউ কেউ ধরে রাখে বিষাদ। দুটিই কঠিন কাজ। বীথি বলল, আপনি আসবেন আজ সন্ধ্যায়?

কী হবে সন্ধ্যায়?

তেমন কিছু না। একটা মিলাদ পড়াবার ব্যবস্থা করেছি। অল্প কিছু লোকজনকে আসতে বলেছি।

আমি যাব। আপনার সমিতি কেমন চলছে?

ভালই, আপনি তো কোনোদিন দেখতে এলেন না।

আজই তো যাচ্ছি। আজ দেখব। সমিতির মেয়েরা সব ওখানেই থাকে তো?

সবাই থাকে না। কেউ কেউ থাকে। আমার মত যাদের কোথাও যাবার জায়গা নেই তারা থাকে।

বীথি আবার হাসল। ওসমান সাহেবের মনে হল এই মেয়েটিকে তিনি মোটেই জানেন না। কখনো ভাল ভাবে লক্ষ্য করেননি, কখনো ভাবেননি। এক ধরনের মানুষ থাকে যাদের দেখে মনে হয় এদের ভেতর তেমন কোনো রহস্য নেই। এদের লক্ষ্য করার কিছু নেই। বীথিকে কখনো সে দলে ফেলা যাবে না। একজন রূপবতী তরুণীকে কখনো সে দলে ফেলা যায় না। তবু তিনি বীথির প্রতি অনাগ্রহ বোধ করেছেন কেন? বাবার কারণে কী? বাবা যে জিনিসটা পছন্দ করবেন তাঁকে সেটি অপছন্দ করতে হবে এমন কিছু কী তাঁর মানসিকতায় ঢুকে গেছে?

বীথি বলল, কী ভাবছেন?

কিছু ভাবছি না।

বীথি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আপনার কাছে আমার একটি ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপার আছে। অনেকবার ভেবেছি ক্ষমা চাইতে আসব। কখনো ঠিক সাহস হয়নি।

ওসমান সাহেব বিস্মিত চোখে তাকালেন। বীথি বলল, স্যার আমাকে বাড়িটা লিখে দিয়েছিলেন কিন্তু আমার ধারণা ছিল এটা আমি কখনো পাব না। আপনারা আপত্তি তুলবেন। কোর্টে গেলে আপনাদের আপত্তি টিকে যাবে। কিন্তু আপনি উল্টোটা করলেন। বাড়িটি পেতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেটা দেখলেন।

উল্টোটা করলাম বলেই কী আপনি ক্ষমা চাইতে এসেছেন?

না, সে জন্যে না। স্যার আমাকে বেশ কিছু নগদ টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন। এটা আপনাদের কাছে গোপন করেছিলাম। ক্ষমা চাচ্ছি সে কারণেই।

বীথি সত্যি সত্যি নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করল। ওসমান সাহেব সিগারেট ধরালেন। সমস্ত ব্যাপারটার ভেতর একটা নাটকীয়তা আছে। নাটকীয়তা তাঁর পছন্দ নয়। বীথি বলল, কত টাকা তা তো জিজ্ঞেস করলেন না? আমার ধারণা ছিল লেখকদের কৌতূহল অনেক বেশি হয়।

আমি মিথ্যামিথ্যি লেখক। আমার কৌতূহল কম।

টাকাটা আমার খুব কাজে লেগেছে। সমিতিটা দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। টাকা ছাড়া কিছুই করা যায় না। যেই টাকা হয়েছে অমনি আমার স্বপ্নটা সত্যি করে ফেলেছি।

বীথি উঠে দাঁড়াল। আত্মবিশ্বাস ভরপুর একজন তরুণী। চেহারায় অবশ্যি আগের কোমলতা নেই। একটা কাঠিন্য এসে গেছে কিন্তু তার জন্যে খারাপ লাগছে না। চেহারার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। ওসমান সাহেবের মনে হল সব কিছুই মানুষের চেহারার সঙ্গে মানিয়ে যায়। যখন কেউ নতুন চশমা নেয় সেই চশমা মানিয়ে যায়। যখন চুলে পাক ধরে সেই পাকা চুলও মানিয়ে যায়।

বীথি বিদায় নেবার সময় আরেকবার বলল, আপনি কিন্তু আসবেন।

ন'টার সময় যাবার কথা। ওসমান সাহেব তাঁর আগেই উপস্থিত হলেন। তাঁর জন্যে বড় ধরনের বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তিনি নিজেদের পুরনো বাড়িটি চিনতে পারলেন না। সামনের বাগানে লম্বা গুদাম ঘরের মত একটা ঘর উঠেছে। দু'পাশে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা ছিল, সেখানেও টিনের শেড দেয়া একতলা দালান। তিনি হকচকিয়ে গেলেন। বীথি বলল, চিনতে পারছেন না, তাই না?

না, পারছি না।

গুদাম ঘরের মত যে লম্বা ঘরটি দেখছেন এটা আমাদের সিউইং সেকশন। তেত্রিশটা

ইলেকট্রিক সেলাই মেশিন আছে।

বলেন কী?

দোতলার পুরো বাড়িটা হ্যান্ডিক্রাফট সেকশন, মেয়েরা এখানে হাতের কাজ শেখে। আমাদের কিছু অবৈতনিক ইনস্ট্রাকটর আছেন। এখন একজন জাপানি ইনস্ট্রাকটর পেয়েছি, হিরোকো কাগুইয়া। সুন্দর বাংলা বলেন।

এতসব করলেন কিভাবে?

অনেকে সাহায্য করেছে। বিদেশী অর্গানাইজেশনগুলি সাহায্য করেছে। একটা বড় এমাউন্টের সরকারি সাহায্য পাওয়ার কথা। ওটা পেলে আমরা মীরপুরের মেয়েদের একটা হোস্টেল করব।

ওসমান সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বীথি গভীর আগ্রহে তাঁকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখাতে লাগল। সঙ্গে সমিতির কিছু মেয়েও আছে তাদের সবার বয়সই ত্রিশের নিচে। তারা ওসমান সাহেবকে দেখছে কৌতূহলের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে নিচু গলায়। সবাই বেশ হাসিখুশি।

মিলাদে যাদের আসবার কথা ছিল, তারা কেউ এল না। সাতটার দিকে মিলিকে নিয়ে এল মতিয়ুর। তারও কিছু পর এলেন মগবাজারের সিদ্দিক সাহেব।

যে মৌলানা মিলাদ পড়াবেন তিনি ধাঁধায় পড়ে গেলেন। তিন জন পুরুষ মানুষকে নিয়ে তিনি সম্ভবত এর আগে মৃত্যুবার্ষিকীর মিলাদ পড়াননি। তিনি বিরক্ত গলায় সূরা বলতে লাগলেন এবং ঘড়ি দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর পর বলতে লাগলেন, আর কতক্ষণ অপেক্ষা করব? বীথি প্রতিবারই বলতে লাগল আর কিছুক্ষণ দেখি। অনেকেই আসার কথা।

মিলিকে দেখে ওসমান সাহেব অবাক হলেন। ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে গেছে। মাথাটা অস্বাভাবিক বড় লাগছে সেই কারণেই। মাথায় বাহারি একটি রুমাল। ওসমান সাহেব বললেন, মাথায় রুমাল কেন রে?

মিলি হাসিমুখে বলল, মাথা কামিয়ে ফেলেছি তো, সেই জন্যে রুমাল।

মাথা কামিয়ে ফেলেছি মানে?

কী সব কবিরাজী ওষুধ দেবে। মাথা না কামিয়ে দেয়া যায় না। প্রথমে আমি রাজি হই না। পরে ভাবলাম আমি পাগল মানুষ, মাথায় চুল থাকলেই কী না থাকলেই বা কী?

মিলি মাথার রুমাল খুলে ফেলে বলল, কেমন লাগছে আমাকে বলত?

ভালই লাগছে। কোজাকের মতো।

তোমার যদি মাথায় হাত বুলাতে ইচ্ছা করে হাত বুলাও।

হাত বুলাতে ইচ্ছা করবে কেন?

ন্যাড়া মাথা দেখলে হাত বুলাতে ইচ্ছা করে না? মনে নাই পাশের বাসার খোকন যখন মাথা কামাল, তখন আমরা শুধু ওর মাথায় হাত বুলাতাম।

মিলি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। ওসমান সাহেব মন খারাপ করে তাকিয়ে রইলেন। নরম স্বরে বললেন, মিলি, আমি গ্রামের বাড়িতে গিয়ে কিছু দিন থাকব। তুই যাবি আমার সাথে?

যাব ভাইয়া।

তোর মেয়েকেও সঙ্গে নিবি।

ও খুব কাঁদবে তো। আমাকে চেনে না। ন্যাড়া মাথা দেখে ভয় পায়।

ভয় কেটে যাবে। ও তোর সঙ্গে যাবে, তুই ভাল হয়ে যাবি।

আমারও ভাল হতে ইচ্ছা করে। পাগল হয়ে থাকতে ভাল লাগে না।

ওসমান সাহেবের মনে হল এইসব কথাবার্তা তো পাগলের কথাবার্তা নয়। সুস্থ মানুষের কথাবার্তা। কিন্তু তবু সে সুস্থ নয়। এটা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।

মিলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এই পাজী মেয়েটা ঘরবাড়ি কেমন বদলে ফেলেছে দেখেছ? গুদাম বানিয়ে ফেলেছে। বাড়ি দেখে আমি এমন অবাক হয়েছি, ইচ্ছা করছে মেয়েটিকে একটা চড় দিতে।

মিলি সারাক্ষণ বক বক করতে লাগল। একসময় মতিয়ুর এসে বলল, আর কত, চুপ কর তো। কনটিনিউয়াস কথা বলে যাচ্ছ।

মিলি করুণ মুখে বলল, পাগল মানুষ কী করব বল।

মতিয়ুর রাগী চোখে তাকিয়ে রইল।

ওসমান সাহেব খুবই মন খারাপ করে বাড়ি ফিরলেন। প্রায় সারা রাত তাঁর ঘুম হল না। শেষ রাতের দিকে ভয়াবহ একটা দুঃস্বপ্ন দেখলেন। তাঁর কেন জানি মনে হল তিনি নিজেও পাগল হয়ে যাবেন। জীবন এত জটিল কেন? অসংখ্যবার নিজেকে এই প্রশ্ন করলেন। তাঁর নিজের একটি উপন্যাসের এক ছেলেও এই একই প্রশ্ন করেছিল। সে তার উত্তরও পেয়েছে। কিন্তু তার মনে হচ্ছে উত্তরটা ঠিক না। বিরাট একটা ফাঁকি আছে উত্তরে।

## ২৩

রানুরা নতুন বাসায় উঠে এসেছে। অফিসের ফ্ল্যাট। দু'টি বেড রুম দু'টি বারান্দা, ড্রইং কাম ডাইনিং। একটি ছোট্ট স্টোর রুমের মত আছে। বাসায় ঢোকার সময় আনন্দে রানুর চোখে পানি এসে গেল। এটি তার নিজের বাসা, সম্পূর্ণ নিজের মত করে সাজানো যাবে। স্বাধীনভাবে থাকা যাবে। খালা খবরদারি করতে আসবে না। টগরের জন্যে সুন্দর করে একটা রুম সাজিয়ে দেয়া যাবে। তার নিজের থাকার একটি ঘর। অপলা নেই, এটি একদিকে দিয়ে ভালই হয়েছে। অপলা থাকলে ঘর ভাগ করা একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াত। কিছুদিন থেকে অপলার সঙ্গে সম্পর্কও খুব খারাপ হয়ে পড়েছিল। কেন জানি তাকে আর সহ্য হত না।

সে এখন মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে সিট পেয়েছে। তার পড়ার খরচ যে মামা দিতেন। তিনি এই বাড়তি খরচ কিভাবে দেবেন তা রানু জানে না। ওটা তাদের ব্যাপার। অপলাকে সে একবার জিজ্ঞেস করেছিল, খরচ কি ভাবে চালাবি?

সে শান্ত গলায় বলেছে, ওটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। দরকার হলে প্রাইভেট ট্যুশনি করব। বেশ কিছুদিন তুমি আমাকে থাকতে দিয়েছ তার জন্যে মেনি থ্যাংকস।

তুই এমন করে কথা বলছিস কেন?

আমি একটা খারাপ মেয়ে আপা। কী করব বল। যা মনে আসে বলে ফেলি। ক্ষমা করে দাও।

রানু ভাবেনি সত্যি সত্যি। অপলা শেষ পর্যন্ত হোস্টেলে যাবে। তার ধারণা ছিল শেষ পর্যন্ত টগরের জন্যেই যাওয়া হবে না। টগর যখন বলবে, তুমি যেতে পারবে না খালামণি। তখন তার পক্ষে যাওয়া অসম্ভব হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার টগর কিছুই বলল না। অপলা চোখ মুছতে মুছতে যখন বলল, টগর যাচ্ছি রে। সে কিছুই বলল না। যেন চলে যাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। অপলা বলল, কাঁদিস না। ব্যাটা ছেলের কান্না খুব খারাপ।

টগর অবাক হয়ে বলল, কই কাঁদছি না তো। অপলা একাই কেঁদে বুক ভাসিয়ে রিকশায় গিয়ে উঠল। রানু একবার ভাবল বলবে, থাক যেতে হবে না। কিন্তু তা বলা হল না।

অপলার এভাবে থাকতে অসুবিধা হবে। সমস্যা হবে। সব সমস্যারই সমাধান আছে। এই সমস্যারও নিশ্চয়ই কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

একটি কাজের মেয়ে পাওয়া গেছে। সে টগরের দেখাশুনা করতে পারবে। তা ছাড়া খুব বেশি সময় দেখাশোনা করতেও হবে না। টগরের স্কুল ছুটি হবে বারটায়। দু'টোর সময় রানুর অফিস ছুটি হয়। দু-তিন ঘণ্টার ব্যাপার। টগর কোন অবুঝ ছেলে নয়। কেউ না থাকলেও সে দু-তিন ঘণ্টা সময় অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারবে। ঘর-দুয়ার গুছিয়ে বসতে তার পাঁচ-ছ'দিন লাগল। নিজেই ঘুরে ঘুরে কিছু ফার্নিচার কিনল। একটা কার্পেট কেনার খুব সখ ছিল। কিন্তু কেনা গেল না। অনেকগুলি টাকা একসঙ্গে বেরিয়ে যায়।

রানুর নতুন বাড়িতে ঘন ঘন আসল শুধু আলম। যতবারই সে এল এতবারই রানু বিরক্ত হল। ততবারই মনে হল তার নিজের একটি সংসারে সে জোর করে ঢুকে পড়তে চাইছে। একেকবার তার বলতে ইচ্ছা হল প্লিজ বার বার এসে আমাকে বিরক্ত করবে না, আমার ভাল লাগে না। একজন ডিভোর্স মহিলার কাছে একজন পুরুষ মানুষের বারবার আসা ভাল দেখায় না। লোকজন খারাপ চোখে দেখে।

মনের কথা প্রায় কোনো সময়ই বলা যায় না। বলা গেলে সংসারের জটিলতা কমত। কিন্তু সংসার জটিলতা পছন্দ করে। নয়ত অপলার সঙ্গে এই ঝামেলাটা হত না।

বুধবার, টগর খুব উৎকণ্ঠায় কাটাল। বাবা কী আসবে? তাদের নতুন বাসা সেকি চেনে? তার

উৎকণ্ঠার কথা সে অবশ্যি মাকে বলল না। বেশির ভাগ সময়ই বারান্দায় কাটাতে লাগল। সন্ধ্যাবেলা একবার এসে মাকে জিজ্ঞেস করল, বাবা এই বাসা চেনে?

রানু হালকা গলায় বলল, চেনে না। তবে ঠিকানা দিয়ে এসেছি, খুঁজে বের করতে অসুবিধা হবে না।

টগর ইতস্তত করে বলল, বাবা আর খালামণি কী একসঙ্গে আসবে?

রানু চমকে উঠল। টগরের এ ধরনের কথা বলার মানে কী? ওদের দুজনকে নিয়ে সে কী কোন কিছু কল্পনা করে?

টগর।

কী?

ওরা দুজন একসঙ্গে আসবে, এটা তুমি কেন বলছ?

টগর কিছু বলল না।

তোমার খালামণি কী তোমাকে কিছু বলেছে?

টগর মাথা নাড়াল। কিছু বলেনি। প্রশ্নটি করে রানু নিজেও লজ্জিত হয়ে পড়ল। এ জাতীয় প্রশ্ন টগরকে করার কোনোই মানে হয় না। কেন সে করল?

ওসমান সাহেব বুধবার এলেন না। তবে তাঁর একটি চিঠি এল। নতুন বাসায় কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা। প্রয়োজন মনে করলে আকবরের মাকে নিয়ে যেতে। বিশ্বাসী পুরনো মানুষ। ও কাছে থাকলে সুবিধা হবে। তিনি আসতে পারছেন না কারণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। পুরনো অসুখ- অনিদ্রা।

ওসমান সাহেবের চিঠির সঙ্গে অপলারও একটি চিঠি এল। দীর্ঘ চিঠি। সব মিলিয়ে এগারো পৃষ্ঠা। শুরু হয়েছে এ ভাবে –

আপা,

হোস্টেলে থাকতে আমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু নিজে থেকে ফিরে আসতেও লজ্জা লাগছে। তুমি এসে আমাকে নিয়ে যাও। আর শোন আপা, আমাকে নিয়ে তুমি যে সন্দেহ করছ এটা ঠিক না। দুলাভাইকে আমি খুবই পছন্দ করি। কিন্তু তার মানে এই না যে আমি তাঁকে বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে আছি। অবশ্যি এটা ঠিক যে তাঁর মত কোনো ছেলের সঙ্গে যদি আমার দেখা হয় তাহলে...। আজ আমার লিখতে লজ্জা লাগছে। তা ছাড়া একটা কথা আপা, যদি দুলাভাইকে আমার খুব বেশি ভাল লাগে সেটা কী আমার অপরাধ? কেন তুমি আমার ওপর ঐ দিন এত রাগ করলে? ঐদিন সকাল সকাল আমার কলেজ ছুটি হল। আমি ভাবলাম হঠাৎ করে দুলাভাইকে গিয়ে চমকে দেব। গিয়ে দেখি দুলাভাই নেই। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। এমন সময় তুমি উপস্থিত হলে, আমাকে দেখে ভাবলে, আমি রোজ এখানে এসে বসে থাকি। আমি কী ঠিক করেছিলাম জানো? তোমার সঙ্গে বাসায় যাব। তারপর একা একা ছাদে উঠে ছাদ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ব।

আপা, তুমি দুলাভাইকে জিজ্ঞেস করে দেখ আমি আর কোনোদিন যাইনি। উনি তো মিথ্যা কথা বলেন না। তার এই গুণটি তো তুমি নিজেও স্বীকার কর। কর না?

গুটি গুটি করে লেখা চিঠি শেষ করতে রানুর আধঘণ্টা লাগল। সেই দিনই বিকেলে গিয়ে অপলাকে নিয়ে এল। এই ক'দিনই অপলা রোগা হয়ে গেছে। তাকে কেমন লম্বা লম্বা লাগছে।

## ২৪

মতিয়ুর অবাক হয়ে ওসমানের দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ওসমান সাহেবের কথার কোনো অর্থ সে বুঝতে পারছে না। সে বিস্মিত গলায় বলল, মিলিকে আপনি গ্রামের বাড়িতে নিয়ে কিছু দিন রাখতে চান?

ওসমান সাহেব নিচু স্বরে বললেন, হ্যাঁ, যদি তোমার আপত্তি না থাকে। মতিয়ুর থমথমে গলায় বলল,

আপত্তি অবশ্যই আছে। সে দারুণ অসুস্থ মেয়ে। আপনি কাছাকাছি থাকলে সে কিছুটা সংযত আচরণ করে। এমনিতে তার আচারণ আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তা ছাড়া...

তা ছাড়া কী?

বোনের বিয়ে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন পাগল পুষতে হবে না।

তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ কেন?

মতিয়ুর চুপ করে গেল। ওসমান সাহেব বললেন,

তুমি ওকে আমার সঙ্গে দিতে রাজি না?

জি না। আমি ওকে ইন্ডিয়া পাঠাব। রাচি মেন্টাল হসপিটেলে আমার বন্ধুর একজন পরিচিত ডাক্তার আছেন। প্রফেসর দেবশর্মা। উনার সঙ্গে যোগাযোগ করছি।

কবে নাগাদ পাঠাবে?

এখনও কিছু জানি না। পাসপোর্ট ভিসা এইসব হাঙ্গামা আছে। আপনি দেশে কবে যাবেন?

শিগগিরই যাব।

এমনি যাচ্ছেন, না কোনো কারণ আছে?

এমনি যাচ্ছি।

মিলি ঘুমুচ্ছিল। ওসমান সাহেব অপেক্ষা করলেন না। দেখা না করেই চলে এলেন। মাঝে মাঝে কারো জন্যেই অপেক্ষা করতে ইচ্ছা করে না।

কোথাও যাবার আগে তিনি এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করেন।

ঢাকা শহরে তার শিকড় গজিয়ে গেছে। কোথাও যাওয়া মানেই শিকড় ছিঁড়ে যাওয়া। মানুষ কী আসলে এক ধরনের বৃক্ষ? এই কথা ভাবতে ভাবতে তিনি বারান্দায় হাঁটতে লাগলেন। রাত প্রায় এগারোটা। আকবরের মা তার ছেলের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে। ওসমান সাহেবের মনে হল তাঁর মনের উত্তেজনা ওদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। অন্য সময় এগারোটার অনেক আগেই রফিক ঘুমিয়ে পড়ত। আকবরের মা ঘুম ঘুম চোখে তাকিয়ে থাকত টিভির দিকে। টিভির শেষ অনুষ্ঠানটি না হওয়া পর্যন্ত সে উঠত না। আজ টিভি চলছে না।

আকবরের মা বারান্দায় এসে বলল, চা দিমু?

না, চা লাগবে না।

গরম দুধ দিমু এক কাপ?

তিনি চমকালেন। দুধ দেবার কথা বলে সে কী একটু বাড়তি যত্নের চেষ্টা করছে? রানু এখানে থাকার সময় শোবার আগে তাকে এক কাপ বিস্বাদ গরম দুধ খেতে হত। আজ হঠাৎ আকবরের মার হয়ত পুরানো কথা মনে পড়েছে। তিনি বললেন, দাও এক কাপ।

আকবরের মা আগুন-গরম দুধ নিয়ে এল। এতটা গরম তিনি আন্দাজ করেননি। মুখে নিতেই মুখ পুড়ে গেল।

চিনি দিমু?

চিনি লাগবে না। তুমি ঘুমোতে চাও।

আপনি কবে আইবেন?

ঠিক নেই। তুমি ঘুমোতে যাও, আকবরের মা।

সে গেল না। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। রফিক এসে ভয়ে ভয়ে দাঁড়াল তার মা'র পাশে। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, কিছু বলবে আমাকে?

জি না।

তোমাদের আমি রানুর বাসায় রেখে আসব। ও নতুন বাসা করেছে। বড় বাসা। অসুবিধা হবে না। এখানে যে বেতন পেতে ওখানেও তাই পাবে।

বলেই ওসমান সাহেবের মনে হল আকবরের মা কোনো বেতন নেয় না। তার বেতন সব জমা থাকে। একদিন সবটা একসঙ্গে নেবে। প্রায় আট বছর সে আছে খানে এই দীর্ঘ আট বছরে সে কোনো টাকা পয়সা নেয়নি। রানুকে বলেছে--- নিলেই তো খরচ কইরা ফেলামু আফা। আফনের কাছে থাউক।' বেতন কত কী তা নিয়েও তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। একশ টাকা করে হলেও প্রায় দশ হাজার টাকা। অনেকগুলি টাকা। এত টাকা নিয়ে সে কী করবে?

ওসমান সাহেব বললেন, আকবরের মা, তুমি কী বেতনের টকাটা চাও? অনেক টাকা জমেছে তোমার।

টাকা নিয়ে আমি করমুটা কী? কারে দিমু?

নিজের টাকা অন্যকে দিবে, নাহয় নিজে খরচ করবে।

আকবরের মা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমরা আপনাদের সাথে যাইতে চাই ভাইজান।

আমার সাথে কোথায় যাবে?

দেশের বাড়িত। পাক-সাক করনের দরকার না? পাক-সাক কে করবে?

না, তার দরকার নেই।

আকবরের মা ক্ষীণ স্বরে বলল, আমরা কাপড়-চোপড় ঠিক কইরা রাখছি। তিনি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। মানুষ মায়াবদ্ধ জীব। তারা মায়ায় পড়ে গেছে। শুধু মানুষই মায়াবদ্ধ? সমস্ত জীব জগৎই কী মায়াবদ্ধ নয়? খুব ছোট বেলায় তিনি একটি কুকুর পুষেছিলেন। অত্যন্ত গোপনে বাড়ির গ্যারেজের পেছনে তার আহার এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল। কালে এটা কিং কংয়ের মত মহাবলশালী একটা কিছু হবে এই আশাতেই সম্ভবত তার নাম দেয়া হয়েছিল 'কিং কং'। এক মাসের মাথায় কুকুর সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফয়সল সাহেবের নির্দেশে একটা চটের বস্তায় তাকে মুড়ে পাঠিয়ে দেয়া হল সাত মাইল দূরে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে 'কিং কং' তৃতীয় দিনের মাথায় বাড়ি এসে উপস্থিত। গেটের ভেতর ঢুকেই সে খুব হৈচৈ করে সে তার আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। তাকে আবার বস্তাবন্দি করে ফেলে দিয়ে আসা হল আরো দূরে। বস্তায় ভরে দেয়া হল কর্পুর! যাতে কর্পুরের গন্ধে অন্য সব গন্ধ এলোমেলো হয়ে যায়। ঘ্রাণ নিয়ে নিয়ে সে আর ফিরে আসতে না পারে। কিন্তু সে ফিরে এল। দশ দিনের মাথায় কাহিল অবস্থায় সে উপস্থিত। এবার আর আগের মতো হৈচৈ নেই, আনন্দ উল্লাস নেই। তার চোখে ভয়।

ফয়সল সাহেব রেগে আগুন হয়ে গেলেন। বাগানের মালি কাশেম মিয়াকে বললেন, এবার এমন একটা কিছু কর যাতে সে ফিরে আসতে না পারে। যদি সে ফিরে আসে, তোমার চাকরি থাকবে না। কাশেম মিয়া ভয়ে ভয়ে বলল, বস্তাতে ভইরা পানিতে ডুবাইয়া দিমু?

যা ইচ্ছা কর, শুধু মনে রাখবে সে এলে তোমার চাকরি নট।

কিং কং আর ফিরে আসেনি। তিনি দিনের পর দিন প্রতীক্ষা করছেন কিং কং আবার আসবে। কত বার কাশেম মিয়াকে গোপনে জিজ্ঞেস করেছেন, সত্যি সত্যি পানিতে ফেলে দিয়েছেন কাশেম ভাই? কাশেম মিয়া চোখ কপালে তুলে বলেছে, তা কেমনে করি ছোড মিয়া? আমি মানুষ না? আমার নিজের পুলাপান আছে না?

তা হলে আসে না কেন?

আইব আইব। একটু দেরি হইতেছে আর কি?

বার বছর বয়সে তাঁর প্রথম রচনাটি কিং কং-কে নিয়ে লেখা। 'আমার পোষা প্রাণী' এই পর্যায়ে ক্লাস সেভেনে তিনি রচনা লিখলেন, বাংলা স্যার মনমোহন বাবু সেই লেখাটি স্কুলের প্রায় সব ক'টি ক্লাসে পড়ে শোনালেন। তিনিই ওসমান সাহেবের লেখার প্রথম মুগ্ধ পাঠক। মনমোহন বাবু তাঁর বরিশালের উচ্চারণে লেখাটা পড়তে পড়তে হঠাৎ থেমে গিয়ে চোখ মুছতেন এবং ধরা গলায় বলতেন, 'পশু হয়ে জন্মানো বড় কষ্ট। অবলা প্রাণী, মুখে ভাষা নাই। মনের কথা কাউকে বলতে পারে না।'

ওসমান সাহেব বারান্দায় হাঁটতে লাগলেন। আকবরের মা তার ছেলেকে নিয়ে এখনো ফিসফিস করছে। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছে বোধ হয়। আকাশে বিশাল একটা চাঁদ উঠেছে। শহরে জ্যোৎস্না হয় না কথাটা ঠিক নয়। শহরের জ্যোৎস্নায় অন্য এক ধরনের বিষণ্নতা আছে। শহরের জ্যোৎস্না পুরনো দুঃখের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

তিনি হাঁটতে হাঁটতে কিং কংয়ের কথা ভাবতে লাগলেন। সমগ্র সৃষ্টির মূল কথা কী? বিষাদ? হয়তবা। কিন্তু গাঢ় বিষাদ! তীব্র বেদনা তিনি কী কখনো বোধ করছেন? মোটা দাগের দুঃখ তাকে কখনো স্পর্শ করেনি। মার মৃত্যু, বাবার মৃত্যু। অথচ কিং কংয়ের কথা মনে হলে এখনো তীব্র বেদনা বোধ হয়। কেন হয়?

ভাইজান আপনেরে ডাকে?

কে ডাকে?

তিনি বিস্মিত হয়ে তাকালেন। এই দুপুর রাতে তাকে কে ডাকবে?

টেলিফোন।

তিনি বিরক্ত মুখে বসার ঘরের দিকে এগিয় গেলেন। বারান্দায় হাঁটতে তাঁর ভালই লাগছিল।

সুর কেটে গেছে। আবার ফিরে আসা যাবে না।

টেলিফোন করেছে নবী। দুপুর রাতে অকারণে মানুষকে বিরক্ত করা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব।

হ্যালো ওসমান সাহেব, কেমন আছেন?

ভাল।

গর্জিয়াস একটা চাঁদ উঠেছে বাইরে। আপনার লক্ষ্য করার কথা নয়। আপনার কাজ হচ্ছে মানুষ নিয়ে। প্রকৃতি নিয়ে নয়। হ্যালো, শুনতে পারছেন। আমার কথা?

পারছি।

কিছুক্ষণ আগে একটা প্ল্যান করা হল, আমরা কয়েকজন মিলে লঞ্চে করে বুড়িগঙ্গায় ঘুরব। সঙ্গে থাকবে হাজির মোরগ পোলাও এবং বুঝতেই পারছেন কী? জলযাত্রার ব্যবস্থা। ওসমান সাহেব।

বলুন।

আপনি তৈরি হয়ে থাকুন। আমি আপনাকে নিতে আসছি। আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন নিতীশ বাবু। চিনতে পারছেন তো?

না।

আপনি তো ভাই অবাক করলেন। নিতীশ শর্মা, কবি ও নাট্যকার। কলকাতা থেকে এসেছেন। নিতীশ বাবু আমার পাশেই আছেন। কথা বলবেন তাঁর সাথে?

জি না। অপরিচিত কারোর সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না।

অপরিচিত হবে কেন। নিতীশ বাবুর লেখা তো পড়েছেন? স্বরবৃত্তে আসিনি কখনো, পড়েননি?

কবিতা পড়ি না। নবী সাহেব শুনুন, আমি যাচ্ছি না আপনাদের সঙ্গে।

কেন?

আমি এ জাতীয় ব্যাপারগুলি ঠিক এনজয় করি না।

মনিকাও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে। ওর ইচ্ছা আপনাকে সঙ্গে নেবার। আমি নিজে আপনার কোম্পানির জন্যে তেমন উতলা নই। কী যাবেন?

আমার শরীরটা ভাল নেই।

আপনি তো এখানে ব্যায়াম করবার জন্যে আসছেন না। লঞ্চের রেলিং ধরে জ্যোৎস্না দেখবেন। আমরা চাঁদপুর যাব। তারপর ফিরে আসব। নদী বক্ষে রাত কাটাব। নিতীশ বাবুর স্ত্রীও যাচ্ছেন। কীর্তনের একজন নামী শিল্পী। তিনি সারা রাতই গানটান গাইবেন।

কিছু মনে করবেন না নবী সাহেব, আমি যাব না।

নবী সাহেব খানিকক্ষণ কোনো কথা বললেন না। ওসমান সাহেব ভেবে পেলেন না, হঠাৎ তাকে নেবার জন্যে নবী এত ব্যস্ত কেন? তারা তাঁর স্বভাব জানে। দল বেঁধে প্রকৃতি দেখা, সাহিত্য সভা করা, গানের আসর করা এসবে তাঁর কোনোকালেই কোন আগ্রহ ছিল না। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, নবী সাহেব, রেখে দেই।

এখনি রাখবেন না। মনিকার সঙ্গে কথা বলুন।

ওসমান সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না। মনিকা কী তাঁকে সঙ্গে যাবার জন্যে বলবে? সেই অনুরোধ না রাখার মত মনের জোর কী তাঁর আছে। বহুদিন পর মনিকার সঙ্গে তাঁর কথা হচ্ছে। তাঁর ধারণা ছিল মনিকার প্রতি তিনি এখন আর তেমন কোনো আকর্ষণ অনুভব করছেন না। কিন্তু ধারণা ঠিক নয়। ওসমান সাহেব টেলিফোন হাতে নিয়ে এক ধরনের উত্তেজনা অনুভব করলেন। তাঁর নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। কেউ কখনো হারায় না। মানুষের মনের মত বিচিত্র আর কী আছে। কাউকে সে হারাতে দেয় না। বিশাল এক অন্ধকার ঘরে সমস্তই সাজানো। যে কোন মুহূর্তে আলো ফেলে সে তুচ্ছতম বস্তুকেও আলোকিত করে।

মনিকা শান্ত স্বরে বলল, শরীর কী বেশি খারাপ?

না খুব বেশি না।

অনেক দিন দেখা হয় না তোমার সাথে। লেখাটেখাও কিছু চোখে পড়ে না।

লিখতে পারছি না।

কেন?

জানি না। ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে বোধ হয়। কিংবা ক্ষমতা হয়ত কোনকালে ছিলই না।

দুঃখবাদী কথাবার্তা বলছ কেন?

ওসমান সাহেব হাসলেন। নিঃশব্দ হাসি। মনিকা টের পেল না।

এই গভীর রাতে তোমাকে টেলিফোন করার কারণটি জান?

জানি। জ্যোৎস্না দেখা।

না সেটা তেমন কোনো কারণ নয়। জ্যোৎস্না দেখার জন্যে লঞ্চ ভাড়া করার দরকার নেই। ব্যবস্থা করা হল নবীর জন্যে। নবীর খবর জান নিশ্চয়ই।

কী খবর?

আজ রাত আটটায় খবরে তো বলেছে।

খবর আমি শুনিনি।

নবী স্বাধীনতা পদক পেয়েছে। সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্যে।

খুব ভাল খবর। নবী নিশ্চয়ই উল্লসিত।

না। সে গম্ভীর। বলছে, পদক-ফদকের জন্যে আমি লিখি না। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। খবর শুনেই সে ছুটে এসেছে আমার কাছে। সেলিব্রেট করার জন্যে কী করা যায় সেই নিয়ে চিন্তাভাবনা। শেষে নদী বক্ষে ভ্রমণ ঠিক করা হয়।

মনিকা হাসল। কী সুন্দর হাসি।

তুমি আসতে পারছ না?

শরীরটা ভাল নেই। তাছাড়া----

তাছাড়া কী?

কাল ভোরে আমি গ্রামের বাড়ি যাচ্ছি, কিছু দিন থাকব সেখানে।

হঠাৎ গ্রামের বাড়িতে কেন?

কোনো কারণ নেই। এমনি।

আচ্ছা ঠিক আছে। পরে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

মনিকা ফোন রেখে দিল। ওসমান সাহেব ঘুমুতে গেলেন। ঘুম আসবে না। শুয়ে শুয়ে বইটই পড়লে কেমন হয়। কিন্ত বাতি জ্বালাতেও ইচ্ছা করছে না। তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন নবীর প্রতি তিনি কোনো ঈর্ষাবোধ করছেন না। কেন করছেন না? সাহিত্যের আসর থেকে তিনি কী নিজেকে নির্বাসিত করেছেন? এ রকম হল কেন?

তার পুরনো বইগুলির এডিসন হচ্ছে না। প্রকাশকরা উৎসাহিত বোধ করছে না। কেউ বোধ হয় এসব বই আর চায় না। তারা এখন চাইবে নবীর মত লেখকদের লেখা। যেখানে ঝলমল করবে প্রাণ। নবীর শেষ বইটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোড়ন হয়েছে। একজন লেখকের জন্যে এরচে বড় পুরস্কার আর কী?

আচ্ছা তিনি কী আবার কোনো দিন লিখতে পারবেন? পাঠককে আলোড়িত করবার মত না হোক সাধারণ একটি লেখা? মনে হয় না। লেখা হবে না আর কোনো দিন। এখন তাঁর নির্বাসনের কাল। তিনি ছটফট করতে লাগলেন। শেষ রাতে তন্দ্রার মত হল। সেই তন্দ্রার মধ্যেই স্বপ্নে দেখলেন, কিং কং ফিরে এসেছে। কিন্তু তার চোখ দু'টি নষ্ট। সে গন্ধ শুঁকেশুঁকে পুরানো বন্ধুকে খুঁজে বের করতে চাচ্ছে কিন্তু পারছে না।

## ২৫

ওসমান সাহেব অপলাকে রানুর বাসায় দেখে অবাক হলেন। তাঁর ধারণা ছিল সে হোস্টেলে। শেষ পর্যন্ত বোধ হয় হোস্টেলে যায়নি। তিনি ঐ প্রসঙ্গ তুললেন না। গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছেন, এই খবরটি দিলেন। অপলা বলল সত্যি যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, কেন?

এমনি। কিছুদিন থাকব। শরীর ভাল লাগছে না।

কতদিন থাকবেন?

সেটা ঠিক করিনি।

যাচ্ছেন কখন?

এইত ঘণ্টাখানেকের মধ্যে।

রানু এই খবরে বিশেষ বিচলিত হল না। তার অফিসে যাবার তাড়া। বেশি সময় দিতে পারছে না। সে বলল, টগর বড় খালার বাসায় আছে। তুমি কী তার সঙ্গে দেখা করতে চাও?

না। ওখানে গিয়েছে কেন?

ওর সমবয়সী কিছু বন্ধু-বান্ধব আছে। কাল নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আর আসতে চায় না।

রানু মৃদু স্বরে বলল, আমাকে মনে হয় সে পছন্দ করে না। ওসমান সাহেব কিছু বললেন না। রানু বলল, তুমি যদি চাও তোমার সঙ্গে ওকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবে, তাহলে নিতে পার। টগর খুশিই হবে।

তার কোনো দরকার নেই

রানু বেশখানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, নির্বাসনে যাচ্ছ?

নির্বাসনে যাব কেন?

লেখক সুলভ একটা চাল দেবার জন্যে যাওয়া আর কী?

উঠি রানু।

রানু বলল, আকবরের মা আর তার ছেলে, ওরা কোথায় থাকবে?

ওদের বীথির সমিতিতে রেখে এসেছি।

অপলা তাঁকে এগিয়ে দিতে নেমে এল নীচ পর্যন্ত। মৃদু স্বরে প্রায় ফিসফিস করে সে বলল, দুলাভাই আপনি কী আমাকে চিঠি লিখবেন?

হ্যাঁ লিখব। অপলা বলল, চোখ মুছতে মুছতে, লিখব আমিও।

অবাক হয়ে দৃশ্যটি ওসমান সাহেব দেখলেন।

## ২৬

রানু, কেমন আছ তোমরা?

কুশল জানতে চেয়ে চিঠি শুরু করা গেল। বিয়ের আগে যেসব চিঠি লিখেছি তার শুরু কেমন ছিল মনে করতে পারছি না। অনেক কিছুর সঙ্গে স্মৃতি শক্তিও আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। পুরনো কথা সহজে মনে পড়তে চায় না। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি বোধ হয়।

চিঠির শুরুটা ভাল হয় না। তোমার নিশ্চয়ই ভ্রূ কুঁচকে উঠেছে। তবে একটা মজার কথা কী জানো? চিঠিতে এলেবেলে যাই লিখি না কেন তুমি মন দিয়ে পড়বে। রাগ দেখানোর জন্যে দু'তিন লাইন পড়েই চিঠি ছুড়ে ফেলবে না। কেন পড়বে না সেই কারণটিও বলি। কারণ, তুমি যে রাগ করে চিঠি ফেলে দিয়েছ এই দৃশ্যটি আমি দেখব না। যার ওপর রাগ করলে সে যদি নাই জানল, তাহলে রাগ করার যৌক্তিকতাটা কোথায়? কাজেই আমার ধারণা তুমি খুব মন দিয়েই চিঠি পড়বে। ঠিক বলিনি?

এখানে এসে পৌঁছেছি গত পরশু। বিকেল চারটায় যে ট্রেন পৌঁছানোর কথা সেটা পৌঁছাল সন্ধ্যা ছ'টায়। আমার ধারণা ছিল দেখব সব বদলে গেছে সব অচেনা, শহরতলি শহরতলি ভাব চলে এসেছে গ্রামে। সে রকম কিছুই দেখলাম না। সব কিছু আগের মতই আছে। আগের মতই অনেক অপরিচিত মানুষ আমাকে জিজ্ঞেস করল,

আপনার নাম?

যাইবেন কই?

কোন গেরাম?

কার বাড়ি?

এসব প্রশ্নের উত্তর জানার তাদের দরকার নেই। তবু এমন ভাবে জিজ্ঞেস করছে যেন উত্তরগুলি জানা না থাকলে এদের খুব মুশকিল হয়ে যাবে। এবং মজার ব্যাপার হাচ্ছে এরা সবাই আগ্রহ করে বলল, আমাকে কী ভাবে যেতে হবে। জুম্মা-ঘরের ডান দিকের রাস্তা নিতে হবে না বাঁ দিকের রাস্তা নিতে হবে। যদিও তাদের কাছে আমি কিছুই জানতে চাইনি।

রানু, নিশ্চয়ই তুমি অবাক হয়ে ভাবছ এসব আমি লিখছি কেন? কারণ একটা আছে। আমি মূল কথা বলবার জন্যে আবহ তৈরি করছি। ভূতের গল্প বলার আগে যেমন বাতি নিভিয়ে দেয়া হয়। কথক গলার স্বর অনেক খানি নামিয়ে আনেন, যাতে গা ছমছমানো একটা ভাব তৈরি হয়। এ

রকম আর কী?

এই পর্যন্ত লিখেই ওসমান সাহেব চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। যা লিখতে চাচ্ছেন তা খিলতে পারছেন না। অবান্তর কথাবার্তা লেখা হচ্ছে। অবান্তর এবং অসত্য।

স্টেশন থেকে বাড়ি আসবার পথে কেউ তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। গ্রাম আগের মত আছে বলে যা লিখছেন তাও সত্যি নয়। অনেকখানি বদলেছে। ইলেকট্রিসিটি এসেছে। কিছু কিছু বাড়িতে লম্বা বাঁশের মাথায় টিভি এন্টেনা। এ গ্রাম ভিন্ন ধরনের গ্রাম। আগের চেনা গ্রাম নয়। তিনি কী জেনে শুনেই সমস্ত অস্বীকার করতে চাইছেন? ভান করছেন সব আগের মতই আছে?

তাছাড়া 'মূল কথা বলবার জন্যে আবহ তৈরি করছি' এর মানেই কী? তাঁর কী মূল কথা সত্যি সত্যি কিছু আছে?

ওসমান সাহেব বিরক্ত গলায় ডাকলেন, আইনুদ্দিন, আইনুদ্দিন! আইনুদ্দিন প্রায় ছুটে এল।

কিছু কইছেন ভাইজান?

ক'টা বাজে দেখত।

আইনুদ্দিন বোকার মত তাকিয়ে রইল। বাড়িতে নিশ্চয়ই কোনো ঘড়ি নেই। তিনি তাঁর রিস্টওয়াচ ফেলে এসেছেন। লেখক সুলভ অন্যমনস্কতার কোনো ব্যাপার নয়। ঘড়ি রেখে এসেছেন ইচ্ছা করেই। রওনা হবার শেষ মুহূর্তে তার মনে হল ঘড়ি কলম কাগজ এসব না নিয়ে গেলে কেমন হয়? একজন নাগরিক মানুষের পুরোপুরি মুক্তির জন্যে এসব সরঞ্জাম না থাকা একটি পূর্ব শর্ত।

জর্জ ম্যারন নামের এক আমেরিকান কবি বৎসরের একটি মাস নগর ছেড়ে অরণ্যে ঢুকে পড়তেন। কিছুই থাকত না তাঁর সঙ্গে। কাপড় পর্যন্ত নয়। খাদ্য সংগ্রহ করতেন বন থেকে।

তাতে অবশ্যি সাহিত্যে তেমন কোনো লাভ হয়নি। জর্জ ম্যারন নিম্নমানের কবিতাই লিখেছেন। বনবাসের ফল হিসেবে কোন মুক্ত মানুষের কবিতা লেখা হয়নি।

আইনুদ্দিন!

জি।

ঠিক আছে তুমি যাও।

কয়টা বাজে জাইন্যা আইতাম?

না, দরকার নেই কোনো। তুমি যাও।

আইনুদ্দিন চিন্তিত মুখে বের হয়ে গেল। ওসমান সাহেব নিশ্চিত হলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটি ঘড়ি জোগাড় করবে। এখানে পৌঁছানোর একদিন পরই তিনি আইনুদ্দিনের কাছে কাগজ এবং কলম চেয়েছিলেন। আইনুদ্দিন বিব্রত ভঙ্গিতে বলেছিল কাগজ কলম তো ভাইজান নাই। আইন্যা দিমু?

থাক দরকার নেই।

ইস্টিশনের কাছে এক দোকানে পাওয়া যায়।

লাগবে না।

আইনুদ্দিন চলে গেল। সন্ধ্যা বেলা তিনি দেখলেন তাঁর বিছানার পাশের টেবিলে কাগজ এবং দুটি বল পয়েন্ট কলম। একটি লাল এবং একটি কাল। দু'টি দু'কালির কলম কেন কিনল সে? ওসমান এই বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ সময় ভাবলেন। মাঝে মাঝে তুচ্ছ জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে তার ভাল লাগে। বিনা কারণে কেউ কিছু করে না। আইনুদ্দিনের দুটি কলম কেনার পেছনেও নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে যা শুধু আইনুদ্দিনই জানে।

ওসমান সাহেব বারান্দায় চলে গেলেন। সূর্যের দিকে তাকিয়ে যদি সময় টের পাওয়া যায়। তাঁর কাছে মনে হল এগারোটার মত বাজে। উঠোনময় ধান শুকুতে দেয়া হচ্ছে। আইনুদ্দিনের মেয়ে কঞ্চি হাতে উঠোনে বসে আছে। মেয়েটির বয়স ছ-সাত। রোদের আঁচে তার ফর্সা গাল লাল হয়ে আছে। কাক এসে ধানে বসা মাত্রই সে তার কঞ্চি নাড়াছে এবং মুখে বলছে হুস। কাজটি সে করছে খুব আগ্রহ নিয়ে। ওসমান সাহেব অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখলেন। হঠাৎ করে তাঁর মনে হল শুধু কাক কেন ধান খেতে আসে? অন্য পাখিরা কেন আসে না? উঠোনে ধান পড়ে থাকবে, রঙ-বেরঙের পাখিরা আসবে ধান খাবার জন্যে। দৃশ্যটি কল্পনা করতেই ভাল লাগে।

এই মেয়ে তোমার নাম কী?

মেয়েটি গম্ভীর মুখে বলল, বাতাসী। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা বাতাসী শুধু কাক

ধান খেতে আসে। অন্য পাখিরা কেন আসে না। এর কারণ তুমি জানো?

জানি।

কেন আসে না।

কাউয়া মাইনষেরে ডরায় না। পক্ষী ডরায়।

চমৎকার জবাব! তার চেয়েও চমৎকার হচ্ছে মেয়েটির তৎক্ষণাৎ জবাব দেবার ভঙ্গি। মেয়েটি জবাব দেবার পরও চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। ওসমান সাহেব বললেন, তুমি স্কুলে পড়?

মেয়েটি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, চড়ুই পাখি আয়। চড়ুই পাখি ধান খায়।

তিনি সত্যি সত্যি বিস্মিত হলেন। পাখি ধান খায় না কেন এই প্রশ্ন বাতাসীকে বিচলিত করেছে। সে ভাবতে শুরু করেছে।

তুমি স্কুলে পড় না বাতাসী?

না।

কেন? স্কুল নেই এ দিকে?

আছে।

পড়তে ইচ্ছে করে না?

না।

ধান পাহারা দিতে ভাল লাগে?

মেয়েটি এই প্রশ্নের জবাব দিল না। ওসমান সাহেবের মনে হল জবাব না দেবার কারণ হচ্ছে সে ভাবতে শুরু করেছে। চট করে কিছু বলবে না। ভেবে চিন্তে বলবে। তিনি উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। অপেক্ষা করতে করতে তাঁর মনে হল সম্পূর্ণ কর্ম-শূন্য তৃতীয় দিনটি তার শুরু হয়েছে। খুব একটা খারাপ তো লাগছে না।

এই ক'দিনে একবারও লেখালেখির কথা মনে হয়নি। কোন গল্পের প্লট নিয়ে মাথা ঘামাননি। বেশির ভাগ সময়ই কাটিয়েছেন বারান্দায় বসে। আইনুদ্দিনের ঘরসংসার লক্ষ্য করেছেন। লক্ষ্য করেছেন বলাটা ঠিক নয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছেন আইনুদ্দিনের স্ত্রী ধান মেলে দিচ্ছে। ধান সিদ্ধ করবার জন্যে আগুন জ্বালাচ্ছে। আইনুদ্দিন গরুর জন্যে ভাতের ফ্যান নিয়ে যাচ্ছে। ঘটনাগুলি ঘটছে চোখের সামনে। এ পর্যন্তই। একে লক্ষ্য করা বলা চলে না।

এই পরিবারটির দিকে তাকিয়ে থাকতে ওসমান সাহেবের ভাল লাগছে। কর্মব্যস্ত মানুষ দেখতে ভাল লাগে। একবার তিনি কল্যাণপুরের দিকে গিয়েছিলেন। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা গোটা পরিবার ইট ভাঙতে বসেছে। মা, বাবা দুটি ছোট ছোট ছেলে, একজন অতি বৃদ্ধা মহিলা। সবাই ইট ভাঙছে মহা উৎসাহে। কঠিন পরিশ্রমের এই কাজে তারা একটা উৎসবের ভাব নিয়ে এসেছে। বৃদ্ধ মহিলাটি মাঝে মাঝে কী যেন বলছে-- গোটা পরিবার হেসে উঠছে। মুগ্ধ করে দেবার মত একটি ছবি। ওসমান সাহেব আটকা পড়ে গেলেন। বেড়াচ্ছেন এ রকমের ভান করে এদের পাশ দিয়ে কয়েকবার হেঁটে গেলেন।

বাসায় ফিরে রানুকে খুব উৎসাহ নিয়ে ঘটনাটা বলতেই রানু বলল, ইট ভাঙছিল বউটির বয়স কত?

কেন?

ঐ বউটির বয়স নিশ্চয় কম। দেখতেও সে রূপসী। ইট ভাঙবার সময় তাঁর কাপড় নিশ্চয় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। এর জন্যেই দৃশ্যটি তোমার কাছে স্বর্গীয় মনে হচ্ছিল। ইট ভাঙা কোন স্বর্গীয় ব্যাপার নয়। কষ্টের ব্যাপার।

ওসমান সাহেব থমকে গিয়েছিলেন। কারণ ঐ বউটির সত্যি সিত্য মায়া কাড়া চেহারা ছিল। রানুর কথা উড়িয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি। আজ যে আইনুদ্দিনের ঘর সংসার তাঁর ভাল লাগছে এর পেছনেও কী ফ্রয়েডিয় কিছু কাজ করছে? সম্ভবত নয়। আইনুদ্দিনের স্ত্রীকে তিনি দেখেননি। সে কাজ করছে নতুন বৌয়ের মত লম্বা একা ঘোমটা টেনে। তবে অনুমান করা যাচ্ছে বৌটি দেখতে ভাল, কারণ বাতাসী মেয়েটি সুন্দর দেখতে। মা'র মত হয়েছে নিশ্চয়ই।

তিনি সিগারেট ধরিয়ে বাতাসীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। মেয়েটি এখন নিজের মনে কথা বলছে। ছড়া টড়া কিংবা গ্রাম্য কোনো বিয়ের গান। কারণ তার মাথা দুলছে। ছন্দের কোনো

ব্যাপার ছাড়া মাথা দুলবে না। কাছে দাঁড়িয়ে শুনতে পারলে হত। কিন্তু কাছে যাওয়া মাত্র এই মেয়ে চুপ করে যাবে। তাছাড়া মেয়েটির ব্যক্তিগত সংলাপে হঠাৎ উপস্থিত হওয়া কী ঠিক?

ওসমান সাহেব অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলেন। মেয়েটি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে গানের মত গাইছে।

'ভাত খাইছে ধান খাইছে
কলাই খাইছে কে?'

গানের কলি এই একটিই। ঘুরে ফিরে তাই সে গাইছে। সুরও সম্ভবত তার নিজের। ওসমান সাহেব এক ধরনের বিষণ্ণতা অনুভব করলেন। যে গান একা একা গাওয়া হয়, সেই গান নৈসঙ্গের গান। তার সুর নিসঙ্গতা এনে দেবেই।

মেয়েটি তাঁর দিকে তাকিয়ে হাসল কিন্তু গান বন্ধ করল না। সম্ভবত সে বুঝতে পারছে শহর থেকে আসা এই মানুষটি তার গান পছন্দ করছে। শিশুরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

## ২৭

মিলির চিঠি এসছে।

দু'টি চিঠি। দু'টি চিঠিতে একই কথা লেখা। একই বক্তব্য। একটি শব্দও এদিক ওদিক নয়। দু'টি চিঠি পাঠানোর কারণ ওসমান সাহেব ধরতে পারলেন। একটি হারিয়ে গেলেও অন্যটি যাতে পৌঁছে সেই ব্যবস্থা। অদ্ভুত সব চিন্তা মিলির মাথাতেই খেলে।

চিঠির ভাষা গুরু গম্ভীর। এবং আপনি আপনি করে লেখা। যেন পরীক্ষার খাতায় চিঠি লেখা হচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হলে নম্বর কাটা যাবে।

শ্রদ্ধেয় ভাইয়া,

আমার সালাম জানবেন। আপনি বিগত এক সপ্তাহ যাবত বাইরে আছেন। আমরা সবাই অত্যন্ত চিন্তাগ্রস্ত। এদিকে কয়েকদিন আগে আমি একটি পত্রিকায় পড়লাম এই মাস বৃশ্চিক রাশির জাতকের জন্যে খুব খারাপ মাস। আমি পত্রিকার লেখাটি আপনার জন্যে লিখে দিচ্ছি।

'বৃশ্চিক রাশির জাতকের ওপর শনি এ মাসে পূর্ণ প্রভাব ফেলবে। দুর্ঘটনা, স্বাস্থ্যহানী, আত্মীয় বিয়োগ প্রভৃতি ঘটার সম্ভাবনা। নতুন বন্ধু তৈরিতে বিরত থাকুন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে ভ্রমণে না যাওয়াই ভাল।'

ভাইয়া আপনি তো এসব বিশ্বাস করেন না। কিন্তু এগুলি সত্যি। প্রথম প্রথম আমিও বিশ্বাস করতাম না। একদিন পত্রিকায় দেখলাম ধনু রাশির জন্যে আজকের দিনটি অশুভ। দুর্ঘটনা যোগ আছে।

তবু আমি গেলাম। পরে কী হল তা তো আপনি জানেন। রিকশা একসিডেন্ট করে পা ভেঙে এক মাস হাসপাতালে।

যাই হোক চিঠি পাওয়া মাত্র আপনি চলে আসবেন। টগর, আপনার জন্যে খুব কান্নাকাটি করছে। সেদিন গিয়েছিলাম ভাবীর কাছে নিউ পল্টন লাইনে। আপনার কথা উঠতেই টগর এমন কাঁদতে লাগল যে আমি নিজেও কাঁদলাম। তাছাড়া টগরের শরীরও খুব খারাপ। কয়েকদিন ধরে একশ তিন জ্বর চলছে। ডাক্তাররা আশংকা করছে হয়তবা টাইফয়েড।

পুনশ্চ দিয়ে লেখা, ভাইয়া, ও আমাকে একটুও ঘর থেকে বের হতে দেয় না। গেটে তালা বন্ধ করে রাখে।

ও ভাল কথা, আমি ইন্ডিয়া যাচ্ছি চিকিৎসার জন্যে। আপনার জন্যে কিছু আনতে হলে জানাবেন।

ওসমান সাহেব চিঠিটি বেশ কয়েকবার পড়লেন। মিলি, তার স্বভাবমত মিথ্যায় চিঠি ভরিয়ে দিয়েছে। পা ভাঙার কোনো ব্যাপার তার জীবনে ঘটেনি।

টগর, তার জন্যে কাঁদছিল এটা একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। টগরের মধ্যে এ জাতীয় আবেগ নেই। থাকলেও তা গোপনে, অন্য কেউ তাঁর খোঁজ জানবে না। আর জ্বরের ব্যাপারটি তো শেষ মুহূর্তে বানানো হয়েছে। গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য লেখা হয়েছে -- 'ডাক্তাররা আশঙ্কা করছে হয়তবা টাইফয়েড।' ডাক্তাররা অর্থাৎ একজন ডাক্তার নয়। কয়েকজন ডাক্তার। খবরগুলি যে মিথ্যা তার সবচে বড় প্রমাণ হচ্ছে রানুরা এখন নিউ পল্টন লাইনে থাকে না।

তিনি নিজের মনেই খুব হাসলেন। মন ভাল করে দেবার মত চমৎকার একটি চিঠি। একজন কেউ বলছে - 'ফিরে এসো।' সেই বলার আন্তরিকতা ফুটে উঠেছে প্রতিটি অক্ষরে। মানুষ বাঁধা পড়বার জীবন নয়। কিন্তু তাকে বাঁধবার আয়োজনই বোধ হয় সবচে প্রবল।

তিনি গভীর রাত পর্যন্ত জেগে রইলেন। চমৎকার একটি চিঠি লিখলেন, মিলিকে। সেখানে কিং-কংয়ের কথা লেখা হল। ওসমান সাহেব লিখলেন, 'আমার কেন জানি মনে হয় আমি সারা জীবন একেই খুঁজে বেড়াচ্ছি। তার ছায়া দেখতে চেয়েছি প্রিয়জনদের মধ্যে। একটা অলৌকিক বিশ্বাস লালন করেছি নিজের মধ্যে যে একদিন না একদিন কিং-কং ফিরে আসবে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া কেউ বোধ হয় কখনো ফেরে না।'

চিঠিটি পাঠানো হল না। তাঁর মনে হল মিলি এই চিঠির অর্থ বুঝতে পারবে না মনগড়া মানে দাঁড়া করিয়ে নিজের মনে কাঁদবে। মিলি বড় ভাল মেয়ে। তাকে কাঁদাতে ইচ্ছা করে না।

দোতালার ঘর, বারান্দা, বাড়ির পেছনের পুকুরঘাট এর মধ্যেই ওসমান সাহেবের জীবনযাত্রা চলতে লাগল। খারাপ লাগল না মোটেই। বরং ভালই লাগতে লাগল। কাক তাড়ানোর ব্যাপারে বাতাসীকে সাহায্য করবার জন্যেও তিনি বসতে শুরু করলেন। আইনুদ্দিন এবং তার স্ত্রী কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এই মানুষটিকে তারা ঠিক বুঝতে পারছে না। গ্রামের মানুষেরা রহস্যময়তা পছন্দ করে না।

আইনুদ্দিনের ধারণা ছোট সাহেবের মাথায় ছিট আছে। তার স্ত্রী তাঁকে ঠিক সমর্থন করেনি। কিন্তু গত রাতে তার মনেও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ আইনুদ্দিনকে ডেকে ওসমান সাহেব বলেছেন, একটা কাল রঙের কুকুরের বাচ্চা জোগাড় করে দিতে পারো? আইনুদ্দিন অবাক হয়ে তাকিয়েছে। তিনি বলেছেন, আমি একটি কুকুর পুষতে চাই। তবে কাল রঙে হতে হবে।

ক্যান?

কিং-কংয়ের রঙ ছিল কাল।

আইনুদ্দিন এবার বলতে চাইল— কিং-কং কে? সে বলল না। কুকুর-ছানা খুঁজে আনল একটি। তাকে দেখা মাত্র ওসমান সাহেব রেগে গেলেন।

এক্ষুণি একে ফেলে দিয়ে এসো।

আইনুদ্দিন ফেলে দিয়ে এল। সে রাতে ওসমান সাহেব কিছু খেলেন না। অনবরত বারান্দায় পায়চারি করলেন। আইনুদ্দিন ও তার স্ত্রী দূর থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

তিনি অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। খিলখিল হাসির শব্দে ঘুম ভাঙল। বাতাসী হাসছে। তার মানে রাত হয়নি। রাত বেশি হলে বাতাসী জেগে থাকত না। কিন্তু তাঁর কাছে মনে হচ্ছে অনেক রাত। আইনুদ্দিন ঘরে কোনো আলো দিয়ে যায়নি। অবশ্যি তার দরকারও নেই। ঘরে প্রচুর আলো। আকাশ ভেঙে জোছনা নেমেছে। কিংবা কে জানে আজ হয়ত হঠাৎ কোনো কারণে দুটি চাঁদ উঠেছে।

ওসমান সাহেব উঠে বসলেন। বিছানার এক অংশ, পড়ার টেবিল এবং আলনায় চাঁদের আলো এসে পড়েছে। সে আলো নদীর জলের মত কাঁপছে। এ রকম মনে হচ্ছে কেন? চোখের ভুল নাকি? তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। বিস্তীর্ণ মাঠে সত্যি সত্যি জোছনার ঢেউ। মাঝে মাঝেই ফুলে-ফেঁপে উঠছে। তার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। তিনি কাঁপা গলায় ডাকলেন, আইনুদ্দিন, আইনুদ্দিন।

আইনুদ্দিন তাঁর ডাক শুনতে পেল না। সে উঠোনে বসে চাঁদের আলোয় দড়ি পাকাচ্ছে। লম্বা ঘোমটা দিয়ে তার বৌ বসে আছে তার পাশে। বাতাসী একটি কঞ্চি হাতে নিয়ে উঠোনের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় ছুটে ছুটে যাচ্ছে এবং অনবরত হাসছে। চমৎকার একটি ছবি। এত চমৎকার যে মনে হয়এ রকম কিছু সত্যি সত্যি ঘটছে না। এ ছবিটি বিশুদ্ধ কল্পনা। ওসমান সাহেব দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন মাঠে আবার তাঁর ভয় ভয় করতে লাগল। তিনি আবার ডাকলেন, আইনুদ্দিন, আইনুদ্দিন।

আইনুদ্দিন দড়ি ফেলে উঠে এল। তার বৌ মাথার ঘোমটা অনেকখানি টেনে দিল। বাতাসী হাতের কঞ্চি ফেলে তার দিকে হাত নাড়তে নাড়তে বিজ বিজ করে কী সব বলতে লাগল। কোনো গ্রাম্য ছড়া বোধ হয়। এই মেয়েটি প্রচুর ছড়া জানে। এক মুহূর্তের জন্যে না থেমেও সে অনবরত নতুন ছড়া বলতে পারে। তার মার কাছে থেকেই শিখেছে নিশ্চয়ই কারণ বাতাসীকে তিনি কখনো বাড়ির বাইরে যেতে দেখেননি। আইনুদ্দিন হাতে একটি হারিকেন নিয়ে বারান্দায় উঁকি দিল। নিচু

গলায় বলল, ভাই জানের শইলটা এখন কেমুন?

শরীর ভালই। ক'টা বাজে আইনুদ্দিন?

আইনুদ্দিন বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। এ বাড়িতে কোনো ঘড়ি নেই। আইনুদ্দিন কার কাছ থেকে ঘড়ি একটা নিয়ে এসেছিল। তিনি ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল, বন্ধনহীন অবস্থায় সময়কে দেখতে ভালই লাগবে। গভীর রাতে ঘুম ভাঙলে জানা যাবে না কটা বাজে, রাত কাটতে কত দেরি। সময়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ। কিন্তু আজ হঠাৎ করেই সময় জানতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আইনুদ্দিন।

জি।

কটা বাজে জেনে আসতে পারবে?

পারমু।

যাও জেনে আস।

চা খাইবেন ভাইজান?

না চা-টা কিছু খাব না। আইনুদ্দিন আজ কী পূর্ণিমা?

জে না। কাইল। কাইল লক্ষ্মীপূজা।

ওসমান সাহেব খানিক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, মাঠের উপর চাঁদের আলো এমন উঠা-নামা করছে কেন? দেখতে পাচ্ছ আইনুদ্দিন? আইনুদ্দিন অবাক হয়ে তাকাল মাঠের দিকে। সে তেমন কিছু দেখতে পেল না।

দেখতে পাচ্ছ না?

বাতাসে ঘাস কাঁপতাছে হেই জন্যে এমুন মনে হয়। ভাইজান, আপনে ভিতরে গিয়া বসেন।

কেন?

আপনের শইলডা ভাল না।

আজ কী বার?

বুধবার।

তিনি ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। বুধবার টগরকে দেখতে যাবার দিন। অনেক দিন তাকে দেখতে যাওয়া হয় না। টগর প্রতি বুধবার তার জন্য অপেক্ষা করে? কিছু দিন করবে তারপর আর করবে না। কোনো একটি বিশেষ কিছুর জন্যে মানুষ দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে পারে না। মানুষ প্রতিবারই নতুন কিছুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে ভালবাসে।

ভাইজান।

বল।

ডাক্তার সাবরে খবর দেই?

কেন?

আপনার শইলডা ভাল না।

আমার শরীর ভালই আছে। আর শোন, ঘড়ি আনার দরকার নেই।

রাইতে কী খাইবেন?

কিছুই খাব না। হারিকেন রেখে তুমি নিচে চলে যাও।

আইনুদ্দিন চিন্তিত মুখে নেমে গেল। ওসমান সাহেব নিশ্চিত সে উঠোনে বসা তার স্ত্রীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গুজ গুজ করে কথা বলবে, তারপর রওনা হবে ডাক্তারের কাছে। সময় জেনে আসবে, এবং খুব সম্ভবত ডাক্তারকেও সঙ্গে নিয়ে আসবে। ডাক্তার ভদ্রলোক এসে আর উঠতে চাইবেন না। অনবরত কথা বলবেন। এখানে তাঁর কথা বলার মত লোক নেই হয়ত।

গতকাল ভদ্রলোক প্রথম এসেছিলেন। বুড়ো ধরনের একজন মানুষ। এই গরমেও স্যুট পরা। স্যুটটি পুরনো এবং ময়লা কিন্তু গলায় টাইটি ঝক ঝক করছে। সম্ভবত আজই ট্রাংক খুলে বের করা হয়েছে।

আপনি যে এখানে আছেন জানতামই না। আইনুদ্দিনের কাছে শুনে অবাকই হলাম। আমার স্ত্রীকে বললাম সেও আসতে চাচ্ছিল। আমার ছেলে মেয়েরা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসত। ওরা আবার খুব সাহিত্য পাগল; একজন কবিতা লিখে ছদ্মনামে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখা বের হয়।

আপনার চোখে পড়েছে বোধ হয়, সানজা করিম। একটা কবিতার বই বের করতে চায়। বহু খরচান্ত ব্যাপার। কী বলেন? এদিকে আবার বই না হলে কবি বলে কেউ স্বীকার করতে চায় না। ভাল লিখছে না খারাপ লিখছে এটা কেউ দেখতে চায় না। দেখতে চায় বই কটা আছে। কোয়ালিটি নিয়ে কারোর মাথাব্যথা নেই, সবাই চায় কোয়ান্টিটি। ঠিক বলছি কি না বলেন?

ভদ্রলোক অনবরত কথা বলতে লাগলেন। নিজেই প্রশ্ন করছেন নিজেই জবাব দিচ্ছেন। আবার প্রশ্ন করছেন আবার জবাব দিচ্ছেন। অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থা। আইনুদ্দিন কী মনে করে তাঁকে নিয়ে এসেছে কে জানে। ভদ্রলোকের সঙ্গে ডাক্তারি ব্যাগ। প্রেসার মাপার যন্ত্র। কাজেই দেখা সাক্ষাতের জন্য আসেননি চিকিৎসার জন্যই এসেছেন।

ভাই এখন বলেন, আপনার কী অসুবিধা?

আমার কোনো অসুবিধা নেই।

সে কী আইনুদ্দিন যে বলল...

ও ঠিক বলেনি।

ঘুম হচ্ছে না নাকি। সারারাত হাঁটাহাটি, করেন?

আমি এমনিতেই রাত জাগি।

তা তো জাগতেই হয়। লেখক মানুষ। আপনারা নাক ডাকিয়ে ঘুমুলে চলে না কী?

ওসমান সাহেব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আপনি অন্য একদিন আসুন। আজ আমি একটু ব্যস্ত।

ডাক্তার অবাক হয়ে বললেন, প্রেসার মাপবেন না?

জি না।

টেবিলের উপর হারিকেন জ্বলছে। সুন্দর করে সাজানো টেবিল। কাগজ, কলম, পিরিচে ঢাকা পানির গ্লাস। ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন দুটি পেনসিলও রাখা আছে। পেনসিল দু'টি কাল ছিল না। আজই আনা হয়েছে এবং আইনুদ্দিনের স্ত্রী এক ফাঁকে রেখে গেছে। তাঁর মনে হল এই টেবিলে কোথাও যেন মিলির ছোঁয়া আছে। ওসমান সাহেব বুঝতে পারলেন না হঠাৎ করে মিলির কথা কেন মনে হল। এ রকম মনে হবার কারণ কী পেনসিল দু'টি? মিলিও লেখার টেবিল গোছাবার সময় কলমের পাশাপাশি দু'টি পেনসিল রাখত। পেনসিল তিনি ব্যবহার করেন না। মিলিকে বলেছেন অনেকবার। লিখতে বসে প্রতিবারই তিনি পেনসিল দু'টি ড্রয়ারে রাখতেন। এবং প্রতিবারই মিলি তা বের করে টেবিলে সাজিয়ে রাখত। মজার ব্যাপার হচ্ছে মিলির আগ্রহ এই টেবিলেই সীমাবদ্ধ ছিল। কী লেখা হল না হল তা নিয়ে তার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বিয়ের পরও রোজ রানুকে টেলিফোন।

হ্যালো ভাবী, ভাইয়ার টেবিল গোছানো হয়েছে?

হ্যাঁ হয়েছে।

টেবিল ক্লথ বদলে দিয়েছ তো? রোজ নতুন টেবিল ক্লথ না দিলে সে লিখতে পারে না। সাতটা টেবিল ক্লথ আছে তার জন্যে। কোণায় শনি, রবি লিখে দিয়েছি।

আমি জানি তুমি আমাকে বলেছ অনেকবার।

ভাবী দেখ তো আজ কী সোমবার লেখা টেবিল ক্লথ আছে কিনা। না থাকলে ভাইয়া কিন্তু লিখতে পারবে না।

শোন মিলি, লেখাটা তৈরি হয় মাথায়। টেবিল ক্লথের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।

তুমি কাইন্ডলি একটু দেখে আস না ভাবী এক মিনিটের ব্যাপার।

ঠিক আছে যাচ্ছি।

আরেকটা কথা ভাবী, উপন্যাসটা শুরু করেছিল সেটা ক' পৃষ্ঠা লিখেছে সেটাও আমাকে বলবে।

ঠিক আছে বলব। এখন টেলিফোন নামিয়ে রাখি?

না ভাবী এখনই রাখবে না আরেকটু কথা বলি।

ওসমান সাহেব টেবিলের সামনে বসলেন। হারিকেনের আলো কমিয়ে দিলেন। এক চুমুক পানি খেলেন।

গ্লাসের নিচে রাখা রানুর চিঠিটি আবার পড়লেন। পাঁচ-ছ'লাইনে লিখেছে মিলিকে রাঁচিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাজটা ভাল হয়নি। সম্ভব হলে তুমি ওকে দেশে নিয়ে আসার চেষ্টা কর।

কী চেষ্টা তিনি করবেন? কার কাছে যাবেন। এবং ওরাই বা তার কথা কেন শুনবে।

বাতাসী এসে দাঁড়িয়েছে পর্দা ধরে। সে ভেতরে ঢোকে না। এ ঘরে ঢোকা বোধ হয় নিষেধ আছে। ওসমান সাহেব বললেন,

কী খবর বাতাসী?

বাতাসী হাসি মুখে বলল,

"ইরল বিরল চিরল পাতা

হাত্তীর মাথাত কলাপাতা।"

বলেই সে ছুটে নেমে গেল নিচে। মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গি-ছুটে পালাবার ভঙ্গির মাঝে কী মিলির কোন ছাপ আছে? সে কী ছেলেবেলায় এ রকম ছড়া বলত? কিছুই মনে পড়ছে না। কোন প্রিয়জন হঠাৎ করে অনেক দূরে চলে গেলে তার কথা বারবার মনে পড়ে। পুরনো সব স্মৃতি ভেসে ওঠে কথাটা কী ঠিক? বোধ হয় না। অনেক চেষ্টা করেও তিনি মিলি প্রসঙ্গে পুরোনো কিছু মনে করতে পারলেন না।

ওসমান সাহেব কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়লেন এবং অত্যন্ত দ্রুত লিখতে শুরু করলেন,

কল্যাণীয়াষু,

মিলি, আজ আমাদের গ্রামের বাড়িতে অদ্ভুত একটা কাণ্ড হয়েছে। প্রচণ্ড জোছনা হয়েছে। অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, হঠাৎ জেগে দেখি ঘরে আলোর বন্যা। বন্যার জলের মতই থৈ থৈ করছে জোছনা। একবার ভাবলাম দু'টো চাঁদ উঠল নাকি আকাশে। বারান্দায় গিয়ে দেখি আইনুদ্দিন তার স্ত্রীকে নিয়ে দড়ি পাকাচ্ছে। তাদের ছোট্ট মেয়েটি কঞ্চি হাতে ছোটাছুটি করছে। কী অপূর্ব একটি ছবি, এ ছবি এ ভুবনের নয় অন্য কোনো ভুবনের। আনন্দে আমার চোখ ভিজে উঠল।

মিলি, সমগ্র জীবনে আমি এমন একজন মানুষ হতে চেয়েছিলাম, যার ভেতর কোন রকম ক্ষুদ্রতা থাকবে না। যে এ পৃথিবীর সুন্দর যা কিছু আছে তাকে স্পর্শ করবে...

বাতাসী আবার এসে দাঁড়িয়েছে। আবার কী একটা ছড়া বলল। ওসমান সাহেব তার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। আবার লিখতে শুরু করলেন। বাতাসী তাকিয়ে আছে। সে ভেতরে এসে ঢুকল। এই অদ্ভুত মানুষটিকে তার বড় ভাল লাগে। আজ কেন জানি অন্য দিনের চেয়েও ভাল লাগছে।

## ২৮

ইদানীং রানুর ইনসমনিয়ার মত হচ্ছে।

গত রাত্রে তিনটা পর্যন্ত জেগে ছিল। আজও ঘুম আসছে না। মাথার দু' পাশে দপ দপ করছে। একটু আগেই এক গ্লাস পানি খেয়েছে কিন্তু এখন আবার তৃষ্ণা হচ্ছে। রানু মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল।

অপলা পড়ছে। এত পড়ার কোনো মানে হয়? তার পড়ার ধরনও অদ্ভুত। কোলের কাছে বই নিয়ে হেঁটে হেঁটে পড়া। এরকম না করলে তার নাকি কিছু মনে থাকে না। রানু বারান্দায় যাবার জন্যে দরজা খুলতেই অপলা চেঁচিয়ে উঠল, কে কে? রানু জবাব দিল না। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। চারদিক অন্ধকার। কোনো সারাশব্দ নেই। যাদের ঘুমিয়ে পড়ার তারা ঘুমিয়ে পড়েছে।

রানু আপা?

হুঁ।

আজ ঘুম আসছে না?

না।

ঠাণ্ডা পানিতে মাথা ধুয়ে এক গ্লাস গরম দুধ খেয়ে শুয়ে থাক। চিৎ হয়ে শুবে এবং বড় বড় নিঃশ্বাস নেবে, যাতে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণটা বেশি থাকে।

রানু জবাব দিল না। অপলা কী আজকাল বেশি কথা বলছে? বোধ হয় বলছে। এত কথা আগে বলত না।

আপা।

বল।

আনব দুধ গরম করে? তুমি খেলে আমিও খাব। আমারও ঘুমের ট্রাবল হচ্ছে। অবশ্যি

আমার ঘুম হচ্ছে না পরীক্ষার টেনশনে।

অপলা বারান্দায় চলে এল। তার হাতে ডিকশনারি সাইজের একটা বই। অপলা হাসতে হাসতে বলল, আজকাল যেসব স্বপ্ন দেখছি সেগুলিও পরীক্ষা সংক্রান্ত। যেমন গতকাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম আমাদের এনাটমির কোশ্চেন আউট হয়ে গেছে। সবাই সে কোশ্চেন পেয়েছে। বহু ছোটাছুটি করে আমিও কোশ্চেন জোগাড় করলাম। পরীক্ষা দিতে গিয়ে দেখি এনাটমির বদলে সেদিন হচ্ছে বাংলা পরীক্ষা। কঠিন সব ব্যাকরণের প্রশ্ন হল, 'উপপদ তৎপুরুষ সমাস কাহাকে বলে?' বলতে বলতে অপলা হাসতে শুরু করল। রানু লক্ষ্য করল, হাসির দমকে ডিকশনারির মত মোটা বইটি মেঝেতে ছিটকে পড়েছে। অপলার সেদিকে লক্ষ্যও নেই।

অপলা!

বল।

রাত দুপুরে এরকম চেঁচিয়ে হাসা ঠিক না।

সরি আপা। দুধ আনব তোমার জন্যে?

তুই বোস। তোর সঙ্গে কথা আছে।

অপলা বারান্দার মেঝেতেই শিশুদের মত পা ছড়িয়ে বসল অথচ রানুর পাশেই একটা খালি চেয়ার আছে। রানু দেখল অপলা শাড়ির আঁচল মুখে গুঁজে হাসির বেগ সামলাবার চেষ্টা করছে।

অপলা, গত কয়েক দিন ধরে একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করছি। অকারণেই তুই খুব হাসছিস। বেশ কথা বলছিস।

পরীক্ষার টেনশনে এরকম হচ্ছে আপা। মেডিক্যাল টার্মে একে বলে...

মেডিক্যাল টার্মে যাই বলুক, আমার মনে হয় আমি কারণটা জানি। ভালই জানি।

জানলে বল। অবশ্যি যদি বলতে চাও।

তোর মত বয়েসী মেয়েরা যখন নিষিদ্ধ কিছু করে, তখন এরকম আচরণ করে। হঠাৎ খুব প্রগলভ হয়ে যায়। নিজেকে আড়াল করে রাখবার জন্যে কৃত্রিম কিছু আচরণ করে। যেমন তুই করছিস।

অপলা গম্ভীর হয়ে বলল, নিষিদ্ধ কাজটা কী করলাম সেটাও বল শুনি। পরীক্ষা হয়ে যাক তুমি কত বড় ডিটেকটিভ।

সেটা আমি জানি না তবে অনুমান করতে পারি। আমার ধারণা তুই তোর দুলাভাইকে খুব একটা আবেগের চিঠি লিখেছিস। চিঠিটা পোস্ট করবার পর তোর মনে হয়েছে কাজটা ঠিক হয় নি, খুব অন্যায় হয়েছে। অপলা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, তুমি কী আমার চিঠি পড়েছে?

না পড়িনি। লুকিয়ে অন্যের চিঠি পড়বার অভ্যেস আমার নেই।

না পড়লে চিঠির কথা তুমি জানতে পারতে না। এত বড় ডিটেকটিভ তুমি এখনো হওনি।

অনুমান করে বলেছি। অনুমানটা ঠিক হয়েছে। সব অনুমান তো সব সময় ঠিক হয় না। অনেকবার ভুলও করেছি।

সারা জীবনই তুমি ভুল করেছ। কেউ কেউ ভুল করবার জন্যে জন্মায়।

অপলা হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। রানু কিছু বলবার আগেই ছুটে চলে গেলে ভেতরে। রানু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল, কী লেখা ছিল সেই চিঠিতে? প্রেমের চিঠি না তো?

অনেক দূরে কোথাও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বর্ষা এসে গেল বোধ হয়। রানু, ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। শীত শীত করছে। বেশ বাতাস বারান্দায়। ভেতর থেকে একটা চাদর নিয়ে আসবে নাকি? আলসী লাগছে। একবার ভেতরে গেলে আর বারান্দায় আসা হবে না।

অপলা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কেঁদে-টেঁদে এসেছে বোধ হয়। কিংবা এক্ষুণি হয়ত কাঁদবে। রানু তাকিয়ে রইল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। রাত কত হয়েছে কে জানে। নিশ্চয়ই অনেক রাত।

রানু আপা।

বল।

অপলা থেমে থেমে বলল, আমি তাঁকে আবেগের চিঠি লিখলেও তো তোমার কিছু যায় আসে না।

তা ঠিক কিছুই যায় আসে না।

কোনো মেয়ে তাকে কী লিখছে, না লিখছে তাতে তোমার কী?

বললাম তো একবার আমার কিছুই না।

এটা তুমি মুখে বলছ, কিন্তু মনে তো স্বীকার কর না। যদি স্বীকার করতে তা হলে আমার সামান্য চিঠি লেখা নিয়ে এতগুলি কথা বলতে না।

রানু হেসে ফেলল। কেমন পাগলের মত কথা বলছে অপলা। হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলা। যেন ক্লাসে বক্তৃতা দিচ্ছে। রানু শান্ত স্বরে বলল, আমি তোকে তেমন কিছুই বলিনি। তোর যদি ইচ্ছে হয় রোজ তাকে দুটো করে চিঠি লিখিস।

হ্যাঁ আমি লিখব।

বেশ তা লিখবি। ঢাকায় এলে হাত ধরাধরি করে বলধা গার্ডেনে যাবি। আমি কিছুই বলব না।

অপলা কাঁদতে শুরু করল। ব্যাপারটা ঘটল হঠাৎ। অপলা যে কেঁদে ফেলতে পারে এটা সে ভাবেনি। রানু এগিয়ে এসে তাঁর হাত রাখল অপলার পিঠে। শান্ত গলায় বলল, আবেগ খুব মূল্যবান জিনিস এই কথাটা খেয়াল রাখবি। তোর দুলাভাইয়ের মধ্যে অন্য কিছু আছে কিনা আমি জানি না। কিন্তু আবেগ যে নেই এটা আমি বলতে পারি। দীর্ঘদিন তার পাশে থেকে আমাকে শিখতে হয়েছে। চল ভেতরে চল। ঠাণ্ডা লাগছে।

তুমি যাও।

দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ব। আয়। আর শোন, কাঁদছিস কেন?

আমি কাঁদলে তোমার কী অসুবিধা?

আমার কোনোই অসুবিধা নেই। যত ইচ্ছা কাঁদ। তবে কথায় কথায় কান্না একমাত্র শরৎচন্দ্রের নায়িকাদেরই মানায়, তোকে মানায় না।

তারা ঘুমুতে গেল রাত দু'টোর দিকে। রানু দেখল, টগর তার খাটে নেই। এক ফাঁকে উঠে চলে গেছে অপলার ঘরে। টগর কী তাকে পছন্দ করে না? কেন করে না? টগরের পরিস্থিতি অন্য কোনো ছেলের হলে সে তার মাকেই আঁকড়ে ধরত। সেটাই স্বাভাবিক। রানু অপলার ঘরে উঁকি দিল। টগর অপলার গলা দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। দৃশ্যটি সুন্দর। কিন্তু মন খারাপ করে দেবার মত।

অপলা, টগর কী জেগে আছে?

হুঁ আছে।

টগর! টগর!

কী?

আমার সঙ্গে ঘুমাবে না?

ঘুমাব।

তাহলে এসো।

আসছি।

কিন্তু টগর উঠে এল না। যেন মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলা। রানু ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলে মৃদুস্বরে বলল, অপলা, তুই চিঠিতে কী লিখেছিস?

তেমন কিছু না আপা। আসতে লিখেছি। এর বেশি কিছু না।

খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা তাই না?

হ্যাঁ।

আচ্ছা ঘুমো।

টগরকে নেবে না?

না। ও তোর সঙ্গেই থাক।

রানুর একফোঁটাও ঘুম এল না। হাতের কাছে টগর নেই। বিছানাটা সেই কারণেই কী বিশাল লাগছে? এক সময় তার মনে হল একটা বিশাল মাঠের মাঝখানে সে শুয়ে আছে। তার ভয় ভয় করতে লাগল। ওসমান সব সময় বলত, জীবজগতে মানুষ হচ্ছে একমাত্র প্রাণী, যে একা একা থাকতে পারে। অন্য কোনো প্রাণী পারে না। তাদের সঙ্গি বা সঙ্গিনী প্রয়োজনে, তবে মানুষ অসাধারণ কল্পনা শক্তির অধিকারী বলেই সে নিঃসঙ্গ সময়টায় সঙ্গি কল্পনা করে নেয় এবং এক সময় একা থাকাটা তার অভ্যাস হয়ে যায়।

টগরের বাবার নিশ্চয়ই একা থাকটা এতদিনের অভ্যাস হয়ে গেছে? রানু এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। পাশের ঘরে বাতি জ্বলছে। অপলা বাথারুম করাচ্ছে বাবুকে। খুব সহজ ও স্বাভাবিক

ভঙ্গিতে কথা বলছে দুজনে।'কী এত কথা ওদের? গুজগুজ ফুসফুস। কান পাতলে হয়ত শোনা যাবে, কিন্তু কান পাততে ইচ্ছে করছে না। টগর হাসছে। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হাসছে অপলা। ওদের দু'জনের একটি গোপন জগৎ আছে। রানুর সে জগতে প্রবেশের অধিকার নেই। জোর করে সে অধিকার আদায় করা কী সম্ভব? রানু কী এখন ডাকতে পারে টগরকে? শান্ত শীতল গলায় বলতে পারে,

তোরা কী নিয়ে হাসছিস টগর? আমাকেও দলে নিয়ে নে। আমারও হাসতে ইচ্ছে করছে। আমিও হাসব।

কিন্তু কেউ তাকে দলে নিবে না। আমি ছিলাম সারাজীবন দল ছুট। ক্লাস নাইনে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে চারজন করে গ্রুপিং হবে। একচল্লিশজন ছাত্রী ক্লাসে। দশটি গ্রুপ। সে বাদ পড়ল। তাকে নিয়ে ছাত্রীরা কেউ গ্রুপ করেনি। বদিউজ্জামান স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, কোন এক গ্রুপের সঙ্গে ঢুকে যা। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কিন্তু ঢুকবে কার সঙ্গে? যাদের কাছেই গেছে তারাই বলেছে, তুমি ভাই অন্য গ্রুপে যাও। সে সময় তার বয়স কম ছিল। আবেগ ছিল প্রচুর। সেও শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মতই কাঁদতে শুরু করল। চোখ মুছতে মুছতে বদিউজ্জামান স্যারকে বলল, স্যার আমি সায়েন্স পড়ব না। স্যার অবাক হয়ে বললেন, কেউ তোকে গ্রুপে নিচ্ছে না এই জন্যে সায়েন্স পড়া ছেড়ে দিবি? রানু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, সে জন্যে না স্যার। সায়েন্স পড়তে আমার ভাল লাগে না।

সায়েন্স কী পড়েছিস যে বুঝে ফেললি সায়েন্স পড়তে ভাল লাগে না? আর ফিচ ফিচ করে কাঁদছিস কেন?

মাথাব্যথা করছে স্যার। এ জন্যে কাঁদছি।

আবার মিথ্যা কথা? মাথা মুড়িয়ে দেব. বুঝলি?

বদিউজ্জামান স্যার কথায় কথায় বলতেন মাথা মুড়িয়ে দেব। কেউ অঙ্ক পারল না স্যার হুংকার দিয়ে বললেন, কাল একটা ক্ষুর নিয়ে আসবি তোর মাথা মুড়িয়ে দেব। কেউ ক্লাসে লুকিয়ে লুকিয়ে গল্পের বই পড়েছে— স্যারের চোখে পড়ল, স্যার বললেন, দপ্তরী কালিপদকে ডেকে নিয়ে আয়, ওকে দিয়ে একটা সেভেন ও ক্লক ব্লেড আনিয়ে তোর মাথা মুড়িয়ে দেব।

একজন মানুষ সমগ্র জীবন অল্প কয়েকজন ভাল মানুষের সাক্ষাৎ পায় যারা তার ওপর অসাধারণ প্রভাব ফেলে। বদিউজ্জামান স্যার সে রকম একজন মানুষ। ক্লাস নাইনের সেই প্রাকটিক্যাল ক্লাসে রানু লজ্জা ও অপমানে মরে যেতে বসেছিল। ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে কোনো একটা চলন্ত গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। হয়ত করেও বসত সেরকর্ম কিছু। বদিউজ্জামান স্যার তাকে দু'ঘণ্টা তাঁর সামনের চেয়ারে বসিয়ে রাখলেন। যতবারই সে বলছে, স্যার উঠি? ততবারই স্যার বলেছেন, আহা বোস না। এত তাড়া কিসের? সে বসেছিল মাথা নিচু করে। শুধু সামনে বসে থাকা.... কোনো কথাবার্তা নেই। এক সময় তিনি বললেন, আচ্ছা যা এখন বাড়ি যা। একা তোর জন্যে একটা গ্রুপ করে দেব। ভালই হবে। কাজকর্ম ভাল শিখবি। আরেকটা কথা শোন ছোটখাটো দুঃখ-কষ্টকে আমল দিতে নাই। ক্লাসে মেয়েরা তোকে পছন্দ করছে না তাতে কিছু যায় আসে না। আমি তো করছি। আমার তো মনে হয় তোর মত ভাল মেয়ে আমি আমার শিক্ষকতা জীবনে কম দেখেছি। ছত্রিশ বছর ধরে মাস্টারি করছি, কম দিন তো নয়। কি বলিস? তুই ভাল মেয়ে। খুব ভাল। এটা কখনো ভুলবি না।

এটা স্যারের একটা মিথ্যা কথা। ক্লাসের সব মেয়েকেই স্যার এই কথা কোনো না কোনো সময় বলেছেন। কিন্তু কত মধুর সেই মিথ্যাটি পৃথিবীতে মধুর মিথ্যার সংখ্যা এত কম কেন ভাবতে ভাবতে রানু চোখ মুছল।

বিয়ের পর সে গিয়েছিল স্যারের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি চিনতে পারলেন না। অবাক হয়ে বললেন, তুমি কোন ব্যাচের মা? কি যেন নাম তোমার? রানু মৃদু স্বরে বলেছিল, আপনি আমাকে একবার আশা ও আনন্দের কথা শুনিয়েছিলেন। সেই কথাগুলি আমি প্রায়ই ভাবি। আমার হ্যাসব্যান্ডকে আপনার কথা বলেছিলাম। তিনি আপনাকে দাওয়াত করেছেন। আপনি কী একবার আসবেন আমাদের বাসায়?

কি করেন তোমার স্বামী?

তিনি একজন লেখক। আপনি হয়ত চিনবেন।

স্যার চিনলেন এবং উচ্ছ্বসিত হলেন।

মা তোমার পরম সৌভাগ্য তুমি এমন একজনের পাশে আজ যিনি একজন অত্যন্ত উঁচুদরের মানুষ। যিনি শোকে ও দুঃখে মানুষকে পথ দেখান, আশা ও আনন্দের কথা বলেন। এরা মানব জাতির বিবেক। এদের পাশে থাকা ভাগ্যের কথা। কিন্তু মা তার সঙ্গে দেখা করতে আমি যাব না। তাঁর সঙ্গে দেখা করার যোগ্যতা আমার নাই। আমি সামান্য মানুষ।

ভোর হচ্ছে।

একতলায় মোরগ ডাকছে। রানু উঠে পড়ল। উঁকি দিল পাশের ঘরে। টগরের মাথা বালিশ থেকে সরে গেছে। কিন্তু দু'হাতে সে অপলাকে জড়িয়ে ধরে আছে।

কত চমৎকার সব দৃশ্য চারদিকে। তবু কত অর্থহীন এই বেঁচে থাকা।

## ২৯

সারা বিকাল আকাশ মেঘলা ছিল। সন্ধ্যা বেলা চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। রানু অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল বৃষ্টির শব্দে। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে। ঘরের ভেতর প্রচুর হাওয়া। রানু চোখ না মেলেই হাত বাড়ল, টগর নেই। তার সঙ্গেই শুয়েছিল। এক ফাঁকে উঠে চলে গেছে।

টগর! টগর!

কী মা?

কি করছ তুমি?

কিছু করছি না।

টগর কথা বলছে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বৃষ্টিতে ভিজছে নিশ্চয়ই। রানু এসে দেখে সত্যি তাই। রেলিং ধরে টগর বসে আছে। গা মাথা ভিজে সপ সপ করছে। চুল বেয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। দৃশ্যটি কেমন যেন অন্য রকম। যেন এই ছেলেটির কেউ নেই। বারান্দায় বসে বসে কাঁদছে।

বৃষ্টিতে ভেজা ঠিক না টগর। ভেতরে আস।

আসছি।

টগর এল না। ঠিক আগের মতই বসে রইল। রানুর ইচ্ছা হল কড়া গলায় একটা ধমক দিতে। সে ধমক দিল না। নিজেকে চট করে সামলাল। ছোট বাচ্চাদের খানিকটা নিজের মত থাকতে দিতে হয়। কিছুক্ষণ ভিজলে এমন কি আর ক্ষতি হবে?

টগর!

কি মা?

অপলা কোথায়? আসেনি এখনো?

না।

তুমি কি অপলার জন্যেই রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছ?

টগর জবাব দিল না। সম্ভবত সে অপলার জন্যেই অপেক্ষা করছে। অপলা খাতাপত্র কি সব কেনবার জন্যে নিউমার্কেটে গিয়েছে। এতক্ষণে চলে আসার কথা। আসছে না কেন, কে জানে।

রানুর মনে হল অপলার অনেক সাহস হয়েছে। আগে একা একা কোথাও যেত না। এখন যাচ্ছে। গত সপ্তাহে কলেজ থেকে ফিরল সন্ধ্যা পার করে। তাদের কি নাকি ফাংশান ছিল। রানু দেখল ফর্সা মত রোগা একটি ছেলে এসেছে তার সঙ্গে। অনেক দিনের পরিচিত এমন ভঙ্গিতে ছেলেটি কথা বলছিল। অপলা বলল, চা খেয়ে যাও সিরাজ। ছেলেটি তার উত্তর দেয়নি। মাথা ঝাঁকিয়েছে। যার মানে হ্যাঁ কিংবা না দুই হতে পারে।

রানু একবার ভেবেছিল বলবে, রিকশায় একজন ছেলের সঙ্গে আসা ঠিক না। এ রকম আর কোনো দিন আসিস না। রিকশায় দুজন পাশাপাশি বসা মানেই গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসা। 'এভাবে বসলেই শরীর কথা বলতে শুরু করে।' শেষ পর্যন্ত অবশ্য এসব কথা বলা হয়নি। কারণ কথাগুলি তার নিজের নয়। ওসমানের কথা। অন্যের কথা নিজের ভেবে বলার কোনো অর্থ হয় না।

রানু বাতি জ্বালাতে গিয়ে দেখল ইলেকট্রিসিটি নেই। শহরের ইলেকট্রিসির এমন অবস্থা। একটু ঝড়বৃষ্টি হলেই কারেন্ট নেই। আর একবার নেই হলে সারা রাতের জন্যে নেই। রানু হারিকেন জ্বালাল। হারিকেনে তেল নেই। কতক্ষণ জ্বলবে কে জানে। ড্রয়ারে মোমবাতি ছিল। কিন্তু এখন

নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সে চায়ের পানি চাপিয়ে আবার বারান্দায় এল। টগরের ঠাণ্ডা লাগছে। কিছুক্ষণ পর পরই কেঁপে উঠছে। নীল হয়ে আছে ঠোঁট। কতক্ষণ ধরে সে বৃষ্টিতে ভিজছে?

টগর!

কী মা?

এসো মাথা মুছিয়ে দেই।

টগর উলে এল। কোনো আপত্তি করল না।

চা খাবে বাবা? তোমাকে একটু আদা চা করে দেই?

টগর অবাক হয়ে বলল, আমি বড় হয়ে গেছি, না?

হ্যাঁ তুমি বড় হয়েছ। অনেক বড়।

এখন আমি রোজ চা খাব?

হ্যাঁ খাবে।

রানু মাথা মুছিয়ে দিতে দিতে হালকা গলায় বলল, শুধু চা না, চাইলে সিগারেটও এনে দেব।

দূর।

রানু হেসে ফেলল। টগর উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। শীতে সে অল্প অল্প কাঁপছে। রানুর বড় মায়া লাগল। নির্বিরোধ শান্ত ছেলে হয়েছে টগর। কারো প্রতি তার কোনো অভিযোগ নেই।

রানু পিরিচে চা ঢেলে দিল। টগর কেমন বিড়ালের বাচ্চার মত চুক চুক করে চা খাচ্ছে। একবার মুখ তুলে মাকে দেখল এবং হেসে ফেলল।

আমাদের টগর সোনামণি আজ এত খুশি কেন?

এমনি।

না এমনি নয়। নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে।

টগর লজ্জিত ভঙ্গিতে পকেটে হাত দিয়ে এক টুকরো কাগজ বের করল। নীল রঙের চিঠির কাগজ। সে কাগজটা মার দিকে বাড়াল না। টেবিলে রেখে মাথা নিচু করে হাসতে লাগল।

কি এটা? চিঠি?

হুঁ।

কার চিঠি? কে লিখেছে?

আব্বা।

রানু কাগজ তুলে নিল। ওসমানের চিঠি নয়। চিঠিটা অপলার লেখা। বাবার চিঠি এসেছে এই বলে সে নিশ্চয়ই টগরকে বুঝিয়েছে। মেয়েলি ধরনের একটা ট্রিক। রানু অপ্রসন্ন মুখে চিঠিতে চোখ বোলাতে লাগল।

প্রিয় টগর সোনা,

তুমি কেমন আছগো? তোমার কথা খুব ভাবি। লেখালেখি নিয়ে খুব ব্যস্ত তাই আসতে দেরি হচ্ছে। তুমি এক কাজ কর না কেন— চলে এসো এখানে। তুমি এলে খুব মজা হবে। আমরা খুব বেড়াব।

পুকুরে সাঁতার কাটব। আসবে না তুমি? না এলে আমি রাগ করব। আসবে, আসবে, আসবে।

রানু ভ্রূ কুঁচকে দীর্ঘ সময় চিঠিটির দিকে তাকিয়ে রইল। এই নকল চিঠিটা কি উদ্দেশ্যমূলক নয়? অপলা কি এখানে সূক্ষ্ম একটা চাল দেয়ার চেষ্টা করছে না? সে নিশ্চয়ই ভেবেছে টগর চিঠি পেয়েই ব্যস্ত হয়ে উঠবে বাবার কাছে যাবার জন্যে। টগর অবশ্যি সে রকম কিছু করছে না। রানু একবার ভাবল বলে, টগর, এটা একটা নকল চিঠি। এ চিঠি তোমার বাবার লেখা নয়। কিন্তু সে তা বলল না।

বাইরে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে। অপলার দেখা নেই। কত দেরি করবে সে? রানুর মনে হল অপলাকে কিছু বলা দরকার। স্বাধীনতা মানে রাত করে বাড়ি ফেরা নয়। সে নিজে একজন স্বাধীন মহিলা কিন্তু সে কি রাত-বিরেতে বাড়ি ফিরে না।

অপলা ফিরল কাক ভিজা হয়ে। কাগজ কিনতে গিয়েছিল কিন্তু সঙ্গে কোনো কাগজপত্র দেখা গেল না। সে গুন গুন করতে করতে বাথরুমে কাপড় বদলাতে গেল। বাথরুম থেকেই বলল, ক্যাটস এন্ড ডগস বৃষ্টি নেমে গেছে তাই না আপা? আমি আজ অবশ্যি ইচ্ছা করেই ভিজলাম। যখন

খুব তেজে বৃষ্টি নামল তখন রিকশার হুড ফেলে দিলাম। রাস্তায় যারা ছিল সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল আমাকে পাগল ভেবেছে বোধ হয়।

রানু তার কথার কোনো জবাব দিল না। মেয়েটি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এটা ঠিক সহজভাবে গ্রহণ করা মুশকিল। তাকে বললে কেমন হয়- অপলা তুই এরকম হয়ে যাচ্ছিস কেন?

অপলা মোমবাতি খুঁজে বের করল। যেন কিছুই হয়নি। এমন ভঙ্গিতে পড়তে বসল। পড়া আগালো না। এক জায়গায় বসে সে পড়তে পারে না। ঘুরে ঘুরে পড়তে হয়। বই বন্ধ করে সে টগরের সঙ্গে গল্প করতে বসল। পাশেই রানু আছে। সে দিকে সে কিছুমাত্র লক্ষ্য করছে না। যেন এ ঘরে মানুষ নামের কেউ নেই।

ভূতের গল্প শুনবি টগর?

হুঁ।

হুঁ কি? ভাল করে বল। বল, হ্যাঁ, শুনব।

হ্যাঁ শুনব।

ভয় পেয়ে কাঁদবি না তো?

না কাঁদব না।

সত্যি ভূতের গল্প শুনবি না মিথ্যা ভূতের গল্প?

সত্যি ভূতের গল্প।

অপলা হারিকেনের আলো আরো খানিকটা কমিয়ে দিল। রানু লক্ষ্য করল টগর অপলার কোমর জড়িয়ে কোলে মাথা গুঁজে শুয়ে আছে। অপলা টগরের মাথায় বিলি কাটতে কাটতে গল্প করছে। রানু কি ঈর্ষা বোধ করছে? করছে বোধ হয়। তার ইচ্ছা করছে টগরকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে। এই সন্ধ্যাবেলা কিসের ভূতের গল্প।

বৃষ্টি কমে এসেছিল। রাত দশটার দিকে আবার প্রবল বেগে বর্ষণ শুরু হল। বাতাস বইতে লাগল। প্রচণ্ড শব্দে। ঝড় শুরু হল নাকি? দূর থেকেই হৈচৈ চিৎকারের শব্দ আসছে। বস্তীর কাঁচা ঘরবাড়ি কিছু উড়ে গেছে নিশ্চয়ই। অপলা বলল, কেমন ভয় ভয় লাগছে আপা। পুরুষ কেউ নেই।

পুরুষ মানুষ থাকলে কি করত? ঝড় থামিয়ে দিত?

তা দিত না, তবে সাহস পাওয়া যেত। ঘরে কোনো পুরুষ মানুষ না থাকলে কেমন একা একা লাগে।

এরকম মেয়েলি ধরনের কথা বলিস না তো, গা-জ্বালা করে।

মেয়ে মানুষ মেয়েলি ধরনের কথাই তো বলব? তোমার নিজেরও কিন্তু আপা ভয় ভয় করছে, শুধু মুখে স্বীকার করছ না।

রানু ঘুমুতে গিয়ে দেখল টগর বিছানায় নেই। আবার অপলার কাছে চলে গিয়েছে। মশারি ফেলতে গিয়ে এমন এক পলকের জন্যে মনে হল ঝড়-বৃষ্টির রাতে একজন কেউ পাশে থাকলে ভালই হয়।

আপা।

কি?

তোমার তো একা একা ভয় লাগবে। সবাই মিলে আজ একসঙ্গে ঘুমুলে কেমন হয়?

আমার এত ভয়-টয় নেই, তুই ঘুমুতে যা। আর শোন একটা কথা, বানিয়ে বানিয়ে টগরকে চিঠি খেলার দরকার নেই।

বেচারা তার বাবার জন্য মন খারাপ করে থাকে।

থাকতে থাকতে এক সময় অভ্যাস হবে। তখন আর খারাপ লাগবে না।

অভ্যাস হবার দরকার কি? বাবার জন্যে মন খারাপ হওয়াটা কি খারাপ?

গত তিন মাসে যে বাবার ছেলের কথা একবারের জন্যেও মনে হয়নি, তার জন্যে মন খারাপ হওয়া ঠিক না।

একবারও ছেলের কথা মনে হয়নি সেটা তুমি কিভাবে বলছ? চিঠি লিখেননি তার মানে এই নয় যে...

তোর কাছে মানে শুনতে চাই না।

শোন আপা, আমি যদি টগরকে নিয়ে দুলাভাইয়ের গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাই তোমার

আপত্তি আছে? মেডিকেল কলেজ দু'দিন বন্ধ থাকবে। সোমবার এবং বুধবার। মঙ্গলবার মিস করলে তিন দিন ছুটি পাওয়া যায়। যাব?

রানু অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। বলে কি এই মেয়ে!

কি আপা যাব? যাওয়া কোনো সমস্যা হবে না। ট্রেনে যাব তার পর...

ছুটি হয়েছে, নিজের বাড়িতে যা।

নিজের বাড়িতে আমার আছে কে বল? তা ছাড়া এক দু'দিনের জন্যে গিয়ে হবেটা কি। গরমের ছুটিতে তো এমনিতেই যাব। যাব না?

অপলা রানুর পাশে বসল। সে কী আগের চেয়ে রূপবতী হয়েছে, না হারিকেনের অস্পষ্ট আলোয় তাকে সুন্দর লাগছে? এত লম্বা চুল ছিল অপলার তা আগে লক্ষ্য করা যায়নি। অপলা হালকা গলায় বলল, তোমার সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে আপা। তোমার কোথাও কেউ নেই, আমারো নেই। এটা এমন কোনো হাসির কথা নয়, কিন্তু অপলা হাসল। রানু বলল, অনেক অমিলও আছে।

তা আছে। স্বভাব-চরিত্র দুজনের দু'রকম।

তোর স্বভাব-চরিত্র অবশ্যি দ্রুত বদলাচ্ছে।

তোমারও বদলাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে তুমি ততই কঠিন হচ্ছ। এটা ঠিক না। আপা। নিজের কষ্ট পাচ্ছ। অন্যকেও কষ্ট দিচ্ছ।

অপলা ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। উঠে দাঁড়াল। রানু কিছুই বলল না। অপলা দরজার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল এবং শান্ত স্বরে বলল, আমি ঠিক করেছি আমি যাব। টগরকে তুমি আমার সঙ্গে না দিতে চাও দিও না। আমি একাই যাব।

হঠাৎ তোর এত আগ্রহের কারণ কি?

আমি দুলাভাইয়ের একটি চিঠি পেয়েছি। তিনি আমাকে যাবার জন্যে লিখেছেন।

চিঠি কবে পেয়েছিস?

গতকাল।

সেখানে কী লেখা আছে টগরকে সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে?

না নেই।

তুই একাই যা। ওকে নেবার দরকার নেই।

আপা, তুমি কী চিঠিটি পড়তে চাও?

না আমি পড়তে চাই না। অন্যের চিঠি পড়ার অভ্যেস আমার নেই। ব্যক্তিগত চিঠি আমি পড়ি না।

পড়তে চাইলে পড়তে পার। তোমার টেবিলের উপর রেখে এসেছি। টগরকে আমার সঙ্গে যেতে দাও আপা। প্লিজ!

অপলা ঘুমুতে গেল। অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম এল না। সে খানিক্ষণ কাঁদল। কত অদ্ভুত দুঃখ কষ্ট আছে মানুষের। এরকম সুন্দর একটি রাতে কেউ কাঁদে? রানু হঠাৎ ঠিক করল টগরকে সে অপলার সঙ্গে যেতে দেবে।

রানু ভাবতেও পারেনি অপলা সত্যি সত্যি টগরকে নিয়ে রওনা হবে। এ জীবনে আমরা অনেক কিছুই করতে চাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত করা হয়ে ওঠে না। কল্পনাকে কাজে লাগানো কঠিন। রানু কলেজে উঠে একবার ঠিক করেছিল একা একা শোনাবো। কিন্তু রানু চুপচাপ। সে কোনো রকম আগ্রহ দেখাচ্ছে না। অপলা যখন বলল, টগরের জন্যে কী গরম কাপড় নেব আপা? রানু হেসে বলল, এই গরমে গরম কাপড় কেন?

তাহলে থাক। নেবার দরকার নেই। তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে কিনা কে জানে? হয়ত রাতে উঠে কাঁদতে শুরু করবে।

কাঁদবে না।

আমারও মনে হয় কাঁদবে না। আমার কী মনে হয় জান আপা? আমার মনে হয় বাবাকে ছেড়ে আসতেই চাইবে না।

আসতে না চাইলে রেখে আসিস।

অপলা ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল তাহলে কিন্তু আমি সত্যি সত্যি রেখে আসব। রানু গম্ভীর হয়ে বলল, বললাম তো রেখে আসিস।

কিন্তু তুমি মুখ কালো করে বলছ। এটা রাগের বলা। এই কথাটি তুমি কী হাসি মুখে বলতে পারবে? দেখি হাসতে হাসতে বল তো?

রানু কিছু বলেনি। বিরক্ত হয়েছে। ইদানীং অপলা তাকে বেশ বিরক্ত করছে। যা সে পছন্দ করে না তা করতে চেষ্টা করছে। ইচ্ছা করেই করছে বোধ হয় কেন সবাই এমন বৈরী হয়ে উঠছে?

অপলা যাবে সকাল সাড়ে এগারোটায়। রানু অফিসে গেল না। খুব ঘন ঘন অফিস কামাই হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এ নিয়ে কেউ তাকে কিছু বলছে না। কিন্তু এক সময় হয়ত বলবে। সিদ্দিক সাহেব মিষ্টি মিষ্টি গলায় খুব কড়া কড়া কিছু কথা শুনিয়ে দেবেন। এই লোকটিও এখন তার পছন্দ হচ্ছে না। পছন্দ না হবার কোনো কারণ নেই। সিদ্দিক সাহেব মানুষটি ভদ্র, কাজ বোঝেন এবং প্রচুর কাজ করেন। সমস্যাটি কোথায় তাহলে? এ রকম হচ্ছে কেন রানুর?

টগর সকাল থেকেই বেশ গম্ভীর। বারবার তার নিজের ছোট্ট স্যুটকেস নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। রানু ভেবেছিল শেষ মুহূর্তে টগর মত বদলাবে। মাকে ছেড়ে যেতে চাইবে না। কিন্তু টগরের ভাবভঙ্গি সেরকম নয়। সে মাকে কিছুটা এড়িয়ে চলছে। সম্ভবত তার ধারণা হয়েছে মা হঠাৎ বলবে, 'তোমার যাবার দরকার নেই, টগর। তুমি চলে গেলে আমি একলা হয়ে যাব। রাতে ভয় লাগবে। তুমি থেকে যাও।'

টগর অপলার পাশে পাশে ঘুরছে। মাঝে মাঝে আড়চোখে দেখছে মাকে। চোখে চোখ পড়ামাত্র মাথা ঘুরিয়ে নিচ্ছে। যেন সে মাকে চিনতে পারছে না। ওরা রওনা হবার আগে আগে রানু টগরকে নিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

টগর খুব সাবধানে থাকবে কেমন? একা একা পুকুরে যাবে না। আচ্ছা?

টগর মাথা নাড়ল। সে যাবে না।

ঠিকমত খাওয়া দাওয়া করবে।

করব।

বাবার জন্যে কি নিয়ে যাচ্ছ টগর?

টগর অবাক হয়ে তাকাল মার দিকে? ঠিক এই প্রশ্ন সে আশা করেনি।

বাবার জন্যে কিছু একটা নিয়ে যাওয়া উচিত না? সে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে কি আনলে আমার জন্যে? তখন কি বলবে তুমি?

কি নেব?

তুমি ভেবে-টেবে বের কর কি নিতে চাও।

তুমি বলে দাও।

এমন কিছু নিতে হবে যাতে সে খুশি হয়। ভেবে-টেবে বের করতে হবে কি নিলে খুশি হবে। এসো আরো ভাবি। বোকা ছেলে এমন করে কেউ বুঝি ভাবে? ভাবতে হয় গালে হাত দিয়ে।

টগর সত্যি সত্যি গালে হাত দিল। রানু হেসে ফেলল। চমৎকার একটি ছবি। ছেলে গালে হাত দিয়ে ভাবছে বাবার জন্যে কি নেয়া যায়? এর মধ্যে কোথায় যেন মন খারাপ করার মত একটা ব্যাপার আছে।

রানু বলল,

আমার জন্যে মন খারাপ লাগবে না?

লাগবে।

তুমি কাঁদবে না আমার জন্যে?'

হুঁ। কাদব।

তাহলে একটু কাঁদ আমি দেখি।

টগর ফিক করে হেসে ফেলল। ছোট্ট ছোট্ট হাতে জড়িয়ে ধরল মাকে। রানু একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন সে এই শিশুটিকে দেখবে না। আর সে ফিরে আসবে না মার কাছে।

রানু ভেবেছিল ঘর থেকেই সে তাদের বিদেয় দেবে। কি মনে করে সে ওদের ট্রেনে উঠিয়ে দিতে গেল। ট্রেন ছাড়বার আগে অপলা বলল, তুমি একা একা ও বাড়িতে থাকতে পারবে না আপা। তুমি খালার কাছে চলে যাও। খালার সঙ্গে থাক। রানু গম্ভীর স্বরে বলল, আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। তুই টগরকে চোখে চোখে রাখবি। পানিতে যেন না নামে।

কোনো ভয় নেই আপা।

পৌঁছেই টেলিগ্রাম করবি।

টেলিগ্রাম পৌঁছবার আগে তো আমরাই চলে আসব।

তবু করবি।

ঠিক আছে করব।

রানু হঠাৎ লক্ষ্য করল টগর কাঁদছে। অপলা বিরক্ত হয়ে বলল, এই কাঁদছিস কেন? টগর জবাব দিল না। শাড়ির আঁচলে সে মুখ ঢেকে রেখেছে। বারবার তার ছোট্ট শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। অপলা বলল, মার জন্যে খারাপ লাগছে?

হুঁ।

তাহলে যাবার দরকার নেই। তুই থেকে যা।

টগরের কান্না আরো বেড়ে গেল। গার্ড হুইসেল দিয়েছে। গাড়ি চলতে শুরু করবে অপলা বিব্রত মুখে বলল, 'আপা, তুমিও উঠে এসো না। প্লিজ।'

রানু জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে রইল। এবং এক সময় ট্রেন ছেড়ে দিল। তার নিজের চোখেও কী পানি আসছে? আসছে বোধ হয়। সব কেমন ঝাপসা লাগছে। রানু সান গ্লাস চোখে দিল; জল-ভরা চোখ কাউকে দেখাতে ইচ্ছা করে না। ট্রেন চলে যাবার পরও সে কিছুটা সময় ঘুরে বেড়াল স্টেশনে। সিলেট মেল এসে থেমেছে। ব্যস্ত হয়ে যাত্রীরা নামছে। কত বিচিত্র ধরনের মানুষ আছে এই পৃথিবীতে। একজন মানুষের সঙ্গে অন্য জনের কোন মিল নেই। ছোট একটি বাচ্চা গর্বিত ভঙ্গিতে গট গট করে হাঁটছে। তার মা হাত ধরতে চাচ্ছে। সে কিছুতেই হাত ধরতে দেবে না। কি গম্ভীর শিশুটির চলার ভঙ্গি। টগরের মত হয়েছে বোধ হয়। রানুর চোখ আবার ভিজে উঠছে। মন দুর্বল হয়ে গেছে। ভাল কথা নয়।

রানুর মামা ইসমাইল সাহেব, রানুকে দেখে খুবই অবাক হলেন। দীর্ঘ দিন পর সে বাড়িতে এল। ইসমাইল সাহেব বারান্দায় ইজি চেয়ারে শুয়ে ছিলেন। তিনি উঠে বসতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। এখন প্রায় অথর্ব অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন। নিজে নিজেই কিছুই প্রায় করতে পারেন না।

কেমন আছ মামা?

ভাল আছি। বেশ ভাল। তুই কী মনে করে?

দেখতে এলাম। বাসায় কেউ নেই নাকি? ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

বিয়ে বাড়িতে গেছে। চলে আসবে। সন্ধ্যার আগেই চলে আসবে। তুই বোস।

রানু বসল। ইসমাইল সাহেব হাত বাড়িয়ে রানুকে কাছে টানলেন। হালকা গলায় বললেন, এখনো রাগ পুষে রেখেছিস?

না মামা কারো ওপর আমার রাগ-টাগ নেই।

এদিকে তো আসিস না।

ইচ্ছে করেই আসি না।

কেন?

তোমার কথা না শুনে বিয়ে করেছিলাম। খুবই রাগ করেছিলে তুমি। বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলে, মনে আছে?

ইসমাইল সাহেব কিছু বললেন না। রানু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, সেই বিয়ের আজ এই অবস্থা। লজ্জাতেই আসি না।

আজ কী মনে করে এলি?

কিছু করার ছিল না। কোথাও যাবার ছিল না  তাই এসেছি।

টগরকে কার কাছে রেখে এসেছিস?

ও তার বাবার কাছে গেছে। গ্রামের বাড়িতে। ওর বাবা কিছু দিন ধরে গ্রামের বাড়িতে আছেন।

জানি।

কিভাবে জানলে?

কোন পত্রিকা যেন দেখলাম  কথাসাহিত্যিকের নির্বাসন।

রানু চুপ করে গেল। ইসমাইল সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, গ্রাম নিয়ে কিছু লিখবেন বোধ হয়?

জানি না। লিখলে লিখবে। লেখালেখির ওপর আমার কোনো ভক্তি নেই। উৎসাহ-ও নেই। ঐ প্রসঙ্গ থাক মামা। অন্য কিছু নিয়ে আলাপ কর। তোমার শরীর এখন কেমন?

ভাল না। সময় বোধ হয় শেষ হয়ে আসছে।

আফসোস হয়?

না, দায়িত্ব পালন করেছি। মেয়েগুলির বিয়ে দিয়েছি। ছেলেটা চাকরি করে। আফসোস থাকবে কেন? কোন আফসোস নাই।

মামা, চা খাব।

নিজে বানিয়ে খেতে হবে। কাজের ছেলেটা কোথায় যেন গেছে।

তুমি খাবে?

চা-সিগারেট আমার জন্যে নিষিদ্ধ তবে তোর খাতিরে খাব এক কাপ।

রানু চা বানাতে গেল। সে প্রায় বার বছর এ বাড়িতে কাটিয়েছে কিন্তু তবু সব কেমন অচেনা লাগছে। পুরনো আসবাব প্রায় কিছুই নেই। ঝক ঝক করছে চারদিক। তার সময় এরকম ছিল না। এলোমেলো থাকত সব কিছু। এখন ঘর সাজায় কে? এ বাড়িতে কোনো মেয়ে নেই। মামা তার ছেলের বিয়ে দেননি। নাকি দিয়েছেন কিন্তু তাকে জানাননি? বোধ হয় তাই। মামার সঙ্গে তার এখন আর সম্পর্ক নেই। রানু সবার কাছ থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে।

মামা তোমার চা। চিনি দেইনি। চিনি নিশ্চয় খাও না?

না, খাই না।

ইসমাইল সাহেব নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। চায়ে চুমুক দেবার ভঙ্গি, বসে থাকার ভঙ্গি সব কিছুতেই গম্ভীর ক্লান্তির ছোঁয়া। সত্যি সত্যি কি তাঁর সময় শেষ হয়ে এসেছে? যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। রানুর বড় মায়া লাগল। ইসমাইল সাহেব বললেন, আজ রাতটা আমার এখানে থেকে যা। বুলুর বিয়ে দিয়েছি, ওর বৌকে দেখবি।

বুলুর বিয়ের কথা আমাকে তো কিছু বলনি।

বলার মত বিয়ে নয়। বলার মত হলে বলতাম।

ইসমাইল সাহেব ক্লান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে মাথা রাখলেন।

তোমার শরীর এত খারাপ তবু সবাই তোমাকে একা ফেলে চলে গেল?

ওরা যেতে চায়নি আমি জোর করে পাঠিয়েছি। সব সময় সবাই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত, এটা সহ্য হয় না।

রানু খানিক্ষণ ইতস্তত করে বলল, মামা আমি টগরকে নিয়ে যখন আলাদা হয়ে গেলাম তুমি কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করলে না কেন এরকম করলাম?

ইসমাইল সাহেব চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন কিছু বললেন না।

আমি আশা করেছিলাম তুমি অন্তত জানতে চাইবে। আমার সব কথা শুনবে এবং শেষ পর্যন্ত বলবে, যা করেছিস ভালই করেছিস।

ইসমাইল সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, যা করেছিস ভালই করেছিস।

তুমি কিছু না জেনেই বলেছ। মামা মন দিয়ে শোন, মনিকা নামের একটি মেয়ের সঙ্গে টগরের বাবার খুব ভাব ছিল। মেয়েটি দারুণ রূপবতী এবং চমৎকার মেয়ে। মামা তুমি কী আমার কথা শুনছ?

ইসমাইল সাহেব জবাব দিলেন না। রানু, দেখল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।

সন্ধ্যা মিলিয়েছে। গাছে গাছে পাখ-পাখালি ডাকছে। আকাশে মেঘ। আজও বোধ হয় ঝড়বৃষ্টি হবে। রানু ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল।

## ৩০

অপলা পৌঁছল সন্ধ্যা মিলবার পর।

ট্রেন থেকে নেমেই সে একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। আকাশ মেঘে কালো হয়ে আছে, ঘন ঘন বিজলি চমকাচ্ছে। অল্প কিছু লোক নেমেছে ট্রেন থেকে, তারা মুহূর্তের মধ্যে উধাও। ফাঁকা স্টেশন। চারদিক নিশুতি রাতের মত নীরব। অপলা টগরের হাত ধরে বলল, ভয় লাগছে টগর?

না। কিসের শব্দ হচ্ছে খালা?

কি জানি, ঝিঁঝি পোকা বোধ হয়। তোর ভয় লাগছে না তো?

না।

ভয়ের কিছু নেই। তোদের দাদার বাড়ি এখানে সবাই চিনে। বললেই হবে, মোক্তার বাড়ি। স্টেশন থেকে কোয়ার্টার মাইল।

কোয়ার্টার মাইল কী?

কোয়ার্টার মাইল হচ্ছে খুব কাছে। তোর ভয় লাগছে না তো?

না।

বৃষ্টি নামার আগে আগেই পৌছে যাব। আর না হয় বৃষ্টিতে অল্প ভিজব। কি বলিস মজাই হবে।

টগর উত্তর দিল না। তার মোটেই ভয় লাগছে না। বেশ মজাই লাগছে। বৃষ্টি নামলে আরো মজা হয়। শুধু ঝিঁঝি পোকার ডাকটা শুনতে কেমন লাগছে। এই পোকাগুলি মানুষকে কাড়য়ায় কিনা কে জানে। এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছে, কিন্তু সে জানে জিজ্ঞেস করলে ঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। অপলা বলবে, না না কামড়ায় না। টগর লক্ষ্য করল খালামণি কেমন অসহায় ভঙ্গিতে স্যুটকেস হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে বোধ হয় কাউকে জিজ্ঞেস করতে চান কোনদিকে যেতে হবে। কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করবে বুঝতে পারছে না।

খালামণি চল।

দাঁড়া একটু, এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? ঐ লোকটা আসছে ওকে জিজ্ঞেস করব। ও বোধ হয় স্টেশন মাস্টার।

কি ভাবে বুঝলে?

অপলা উত্তর দিল না। লোকটির দিকে এগিয়ে গেল।

স্টেশন মাস্টার অবাক হয়ে বললেন, কোথায় যাবেন? মোক্তার বাড়ি? ফয়সল সাহেবের বাড়ি? সে তো অনেকটা দূর।

কত দূর?

মাইল খানেকটা তো হবেই। গ্রামের মাইল শহরের মাইলের মত না, হাঁটতে হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে যাবে তবু মাইল শেষ হবে না। পুরুষ মানুষ কেউ নেই আপনাদের সাথে?

জি না।

মোক্তার সাহেবের বাড়িতে তো কেউ থাকে না, সেখানে কার কাছে যাবেন?

অপলার বুক ধক করে উঠল। ট্রেনে উঠার পর থেকে এ রকম একটা আশঙ্কা তার হচ্ছিল গিয়ে দেখবে বাড়ি তালাবদ্ধ। দুলাভাই চলে গেছেন ঢাকা কিংবা অন্য কোথাও। বাড়ি দেখাশোনার জন্যে যারা ছিল তারাও নেই। মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে গেছে কিংবা অন্য কোনো গ্রামে যাত্রা দেখতে গেছে। ঢাকা ফিরে আসার কোনো ট্রেন নেই তারা রাত কাটাচ্ছে স্টেশনে। এমন সময় দুষ্ট কিছু লোকজন তাদের ঘিরে ধরল। তাদের মধ্যে একটি লোক খুব লম্বা তার সরু সরু হাত লোমে ভর্তি। সে খপ করে অপলার হাত ধরে বলল...

দুশ্চিন্তাগুলি এত স্পষ্ট হয় কেন কে জানে? ট্রেনে ওঠার পর থেকে তার আশপাশের সবাইকে অপলার দুষ্ট লোক বলে মনে হচ্ছিল। একজন টগরকে বাদাম কিনে দিল, অপলার সঙ্গে খুব খাতির জমানোর চেষ্টা করল। অপলার দৃঢ় ধারণা হল, লোকটার কোনো একটা মতলব আছে। সেই ধারণা ঠিক হয়নি, লোকটি ময়মনসিংহ স্টেশনে নেমে গেছে এবং নেমে যাবার আগে অপলাকে বলেছে -- যদি দেখেন পৌছতে পৌছতে রাত হয়েছে তাহলে স্টেশন মাস্টারকে বলবেন পৌছে দিতে। অন্য কাউকে বলবেন না। আজকাল গ্রামেও টাউট শ্রেণীর একদল মানুষ তৈরি হয়েছে।

স্টেশন মাস্টার যথেষ্ট করলেন। একজন কুলী জোগাড় করলেন। হারিকেন এবং ছাতার ব্যবস্থা করলেন। এবং বার বার বললেন, মেয়ে মানুষের এতটা সাহস থাকা উচিত না। ছোট একটা বাচ্চাকে নিয়ে একা একা রওনা হওয়া। কি সর্বনাশের কথা। দিনকালও ভাল না। যখন তখন ঝড়টর হচ্ছে।

পথে নেমে টগরের খুব আনন্দ হল। কত অদ্ভুত সব দৃশ্য চারদিকে। এবং সবই অচেনা। কতরকম শব্দ উঠছে -- আর সারাক্ষণই কেমন মজার একটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটা বাঁশ ঝাড়ের কাছে এসে সে থমকে দাঁড়াল।

ঐ সব কি জোনাকি খালামণি?

হ্যাঁ।

ওরা কি করছে?

খেলা করছে বোধ হয়।

এখানে এত জোনাকি কিন্তু শহরে জোনাকি নেই কেন?

জানি না কেন। তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করবে, চল টগর দাঁড়িয়ে থাকবে না। দেরি হচ্ছে বৃষ্টি নামবে।

বেশিক্ষণ দাঁড়াব না। অল্প একটু দাঁড়াব।

বৃষ্টি নামবে তো।

নামুক।

টগর কিছুক্ষণ পরপরই দাঁড়িয়ে পড়েছে। তাকে আর নাড়ানো যাচ্ছে নাক। অপলা তাকে কোলে তুলতে চেষ্টা করল সে কোলে উঠবে না। সমস্তটা পথ হেঁটে হেঁটে যাবে।

কিসের শব্দ হচ্ছে খালামণি?

ঘণ্টা। ঘণ্টার শব্দ হচ্ছে।

ঘণ্টার শব্দ হচ্ছে কেন?

হিন্দুরা পূজা করছে। ওরা ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা করে।

ওরা ঘণ্টা বাজিয়ে পূজা করে কেন?

জানি না কেন। ওদের জিজ্ঞেস কর।

টগর ভেবে পেল না এত সুন্দর সব দৃশ্য, এত সুন্দর সব শব্দ কিন্তু খালামণির ভাল লাগছে না কেন। একটা জায়গায় দেখা গেল লক্ষ লক্ষ ব্যাঙ ডাকছে। প্রথমে একটা ব্যাঙ মোটা গলায় কয়েকবার ডাকে তার পরপর অন্য ব্যাঙগুলি লাফালাফি করে ডাকতে ডাকতে হঠাৎ চুপ করে যায়। এ রকম করে কেন ওরা?

খালামণি!

না আর একটি কথাও না। তুমি আমার কোলে আস টগর। এখনো অনেক দূর।

ব্যাঙরা সবাই একসঙ্গে কথা বলে কেন?

জানি না কেন। চুপ করে থাক তো এখন বৃষ্টি হলে কি অবস্থা হয় দেখবে।

বাড়িব কাছাকাছি আসতে সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামল। প্রথমে ছোট ছোট ফোঁটা তারপরই মুষল বর্ষণ। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস। ছাতা মেলতেই সেটা উল্টে গেল। টগর বলল, ছাতা উল্টে গেল কেন খালামণি?

এবার কিন্তু চড় খাবি টগর।

সঙ্গের কুলি জিজ্ঞেস করল আশপাশের কোনো বাড়িতে গিয়ে দাঁড়াবে কি না। অপলা রাজি হল না। তারা বাড়িতে পৌঁছল কাকভেজা হয়ে। অপলার শাড়ি কাদায় মাখামাখি। সে দু'বার কাদায় পা পিছলে পড়েছে। স্যান্ডেলের ফিতা গিয়েছে খুলে। রাগে-দুঃখে তার কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু টগরের আনন্দের সীমা নেই। তার পাঁচ বছরের ক্ষুদ্র জীবনে এত আনন্দের ভ্রমণ সে এর আগে আর করেনি। এবং কে জানে ভবিষ্যতেও হয়ত আর করবে না। তীব ও তীক্ষ্ণ আনন্দের মুহূর্ত একজন মানুষের জীবনে বার বার আসে না।

ওসমান সাহেব বাড়িতেই ছিলেন। হৈচৈ শুনে হারিকেন হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। দেখতে কেমন সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী লাগছে : তিনি শিশুদের গলায় চেঁচালেন, আরো কারা এসেছে। কাউকেই তো চিনতে পারছি না। এই ছোট ছেলেটা কে? চেনা চেনা লাগছে কেন? টগর ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তিনি, তাকে কোলে তুলতেই সে মুখ লুকালো তার বুকে। তার কেন জানি বড় লজ্জা লাগছে। কাউকে এখন আর মুখ দেখাতে ইচ্ছা করছে না। অপলা বলল, দুলাভাই, আপনার জামাকাপড় তো সব কাদায় মাখামাখি করে দিল।

দিক। তুমি কেমন আছ অপলা?

ভাল আছি। আপনি দাড়ি-গোঁফ রেখে এমন রবীন্দ্রনাথে সেজেছেন কেন?

ব্লেড পাওয়া যায় না। ব্লেডের অভাবেই এই কাণ্ড।

আপনাকে দাড়ি-গোঁফে কিন্তু ভালই লাগছে।

ওসমান শব্দ করে হেসে উঠলেন। ভরাট গলায় হাসি।

টগরও হাসতে শুরু করল। সে যেন এই রসিকতাটা বুঝতে পেরেছে। ওসমান সাহেব বললেন,

আজ তোমরা আসবে এটা কিন্তু আজি জানতাম।

বাজে কথা বলবেন না দুলাভাই।

বাজে কথা না। তোমাদের জন্য রান্না করতে বলেছি। ফুলির মাকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

জানতেন তাহলে স্টেশনে থাকলেন না কেন?

সেটা অবৈজ্ঞানিক কাণ্ড হত। অবৈজ্ঞানিক কিছু তো আমি করতে পারি না। মনের কোনো খেয়ালকে খানিক প্রশ্রয় দেয়া যায় বেশি প্রশ্রয় দেয়া যায় না।

কি করে বুঝলেন আজ আমরা আসব?

তা জানি না। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হল। টেলিপ্যাথি বোধ হয়। দুজন আসবে সেটা বুঝিনি। আমার মনে হচ্ছিল তোমরা তিনজনই আসবে।

অপলা থেমে থেমে বলল, আপাও আসত ছুটি পায়নি তাই। বলেই অপলার মনে হল দুলাভাই যেন অন্য এক রকম ভঙ্গিতে হাসলেন। শিশুদের মিথ্যা কথা প্রশ্রয় দেবার মত ভঙ্গিতে হাসা। মিথ্যাটি না বললেই হত।

দুলাভাই, আমরা আসায় আপনি কী খুশি হয়েছেন?

হ্যাঁ।

আপনার নির্জন তপস্যায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করলাম তাই না?

তপস্যা-টপস্যা কিছু না। মহাপুরুষরা তপস্যা করেন। আমি অতি সাধারণ একজন মানুষ। যাও, গোসল কর কাপড় বদলাও। চা করতে বলেছি। ফুলির মা বাথরুমে পানি তুলে দেবে।

আপনাদের নাকি পাকা ঘাট দেয়া চমৎকার পুকুর আছে। বৃষ্টির মধ্যে সেই পুকুর সাঁতার কাটতে নাকি দারুণ মজা।

কার কাছে শুনলে?

আপার কাছে। আপা বলে দিয়েছে।

ওসমান সাহেব একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। অপলা সুন্দর একটি স্মৃতি মনে করিয়ে দিয়েছে। বিয়ের পর পর রানুকে নিয়ে গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন। শ্রাবণ মাসের এক দুপুরে খুব বৃষ্টি হচ্ছিল সেই বৃষ্টিতে দুজনে পুকুরে নেমেছিলেন। রানু কিছুতেই নামতে চাচ্ছিল না। তিনি প্রায় জোর করে তাকে রাজি করিয়েছিলেন। তার পর সে আর উঠে আসতে চায় না। যত বার তিনি বলে, রানু চল; উঠা যাক। রানু ততবারই বলে, আর একটু, আর একটু।

সুখের উপকরণ চারদিকে ছড়ানো থাকে। আমরা প্রায় সময়ই তা বুঝতে পারি না। হঠাৎ এক সময় তার দেখা পাই এবং অভিভূত হয়ে পড়ি।

অপলা পুকুরে গোসল করতে যাবে বলে ঠিক করল। ফুলির মা আপত্তি করবার চেষ্টা করছে। ভর সন্ধ্যায় খোলা চুলে পুকুরে নামা ঠিক না। কিন্তু তার আপত্তি গ্রাহ্য হয়নি। টগরও তার খালামণির সঙ্গে পুকুরে নামবে। সেও নাকি সাঁতার কাটবে।

ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ওসমান সাহেব ছাতা মাথায় দিয়ে একটি হারিকেন হাতে পুকুর ঘাটে এসেছেন। জলে নেমেছে টগর এবং অপলা। ফুলি পানিতে পা ডুবিয়ে পুকুর ঘাটে বসে আছে। ওসমান সাহেব বললেন, বেশি দূর যেও না অপলা।

আমাকে নিয়ে ভয় নেই দুলাভাই। আমি চমৎকার সাঁতার জানি। আপনি টগরকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যান। ওর ঠাণ্ডা লাগবে।

তুমি না উঠলে ও উঠবে না।

আমি এখানে অনেকক্ষণ থাকব। বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত উঠবে না।

ওসমান সাহেব মৃদু হাসলেন। কিছু বললেন না। বিশেষ ঘটনা কি মানুষের জীবনে বারবার ফিরে আসে? ঠিক অপলার মত গলায়। রানুও তো একদিন এই কথাই বলেছিল। সেদিন তিনি অবশ্যি রানুর পাশে ছিলেন।

আজ ছাতা মাথায় একটি কড়ই গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রকৃতি কি একই ঘটনা বিভিন্ন রকমভাবে মানুষের সামনে উপস্থিত করে? এ রকম একটি ঘটনা কি আবার তঁর জীবনে ঘটবে? অসম্ভব নয়। একদিন হয়ত টগরের ভালবাসার একটি মেয়ে এ রকম বৃষ্টির রাতে পুকুরে নামবে এবং অবিকল রানুর মত গলায় বলবে— বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত আমি উঠব না, তিনি দূর থেকে শুনে

ফেলবেন।

ওসমান সাহেব মৃদু স্বরে ডাকলেন, অপলা গ্রামে বসে বসে একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করলাম।

কি সেটা?

গাছের যৌবন বার বার ফিরে আসে কিন্তু মানুষের যৌবন মাত্র একবার।

কথা শেষ হওয়া মাত্র জোর বৃষ্টি শুরু হল। টগর মহানন্দে হাততালি দিল।

## ৩১

অপলা ভেবে রেখেছিল সে দু'দিন থাকবে, শুক্র ও শনি। খুব বেশি হলে তিন দিন। সোমবার ড. মাইতির ক্লাস। ঐ ক্লাসটি ধরতেই হবে। এ্যাবসেন্ট করলে তিনি নামের পাশে দাগ রাখেন এবং পরের দিন এমন সব প্রশ্ন করেন যার উত্তর কারোরই জানা থাকে না। প্রশ্নতেই শেষ নয় শান্ত মুখে এমন সব বলেন যা শুনলে ক্লাস ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। যেমন রীতাকে একদিন বললেন, ডাক্তার যে তোমাকে হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। তোমার হাবভাব ডাক্তারের মত নয়, বিরহী প্রেমিকের মত। বুঝতে পারছ? এখন তুমি আমাকে বল, তোমার ডান হাতের কব্জির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাড়টির কী নাম। উঁচু গলায় বল যেন সবাই শুনতে পায়।

রীতা কোনোমতে বলল, আমি জানি না স্যার। বলেই সে বসে পড়ল এবং খুব ঘামতে লাগল। মাইতি স্যার বললেন, তোমাকে কিন্তু এখনো আমি বসতে বলিনি। কেউ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বসে পড়লে আমার খারাপ লাগে। কাজেই তোমাকে আমি এখন এমন প্রশ্ন করব যার উত্তর তোমার জানা আছে বলে আমার ধারণা। বল, প্রেম এবং ভালবাসার মধ্যে পার্থক্য কী?

ক্লাসের সবাই হো হো করে হাসতে লাগল। এই হচ্ছে মাইতি স্যার। তাঁর ক্লাস মিস করার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু অপলা রোববার ভোরে বেশ সহজভাবেই বলল, আজ ঢাকা না গেলে কেমন হয় রে টগর? টগর গম্ভীর হয়ে বলল,

ভাল হয়।

কিন্তু মাইতি স্যার যে আমাকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। সবার সামনে কাঁদিয়ে ছাড়বে। চিনিস তো না তাঁকে।

তা হলে চলে যাই।

শরীরটা ভাল লাগছে না। কেমন যেন জ্বর জ্বর লাগছে, দেখ তো গায়ে হাত দিয়ে।

অপলার গাঁ নদীর জলের মতো শীতল কিন্তু টগর উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, উফ খুব জ্বর তো।

যা, স্যুটকেস খুলে কাপড় বের করে ফেল। আগামী সোমবারের আগে ঢাকা গিয়ে পৌঁছলেই হবে। তোর আবার মন খারাপ লাগছে না তো?

না।

মার জন্যে কান্না আসছে না?

না।

একটু ও না?

টগর তার জবাবে হেসে ফেলল। এবং পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। সম্ভবত মনে করল, হাসাটা ঠিক নয়। মার জন্যে কিছুটা হলেও মন খারাপ করা দরকার। কিন্তু তার সত্যি সত্যি মার কথা মোটেও মনে পড়ছে না। বরং মার কাছে ফিরে যেতে হবে ভেবেই খারাপ লাগছিল।

বাবা তার সঙ্গে খুব কথা-টথা বলে না। তবু তাকেই কেন জানি বেশি ভাল লাগে। এর কারণ কী সে প্রায়ই ভাবে। পরশু রাতে অপলাকে জিজ্ঞেস করল। অনেক ইতস্তত করে বলল - খালামণি, বাবা বেশি ভাল, না মা?

দুজনই ভাল।

মন রাখা কথা। টগর বিশ্বাস করেনি। দুজন লোক সমান সমান ভাল হতে পারে না। একজন একটু বেশি ভাল হলে অন্য জন একটু কম ভাল হবে। তাই নিয়ম। অপলা হাই তুলে বলল, কে বেশি ভাল, কে কম ভাল এসব দিয়ে কী করবি?

কিছু করব না।

কিছু না করলে ঘুমো। নাকি বাবার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছে করে?

না না। মনে হচ্ছে করে, আয় রেখে আসি।

অপলা সত্যি সত্যি তাকে রেখে আসতে গেল। টগর লক্ষ্য করেছে অপলা খালামণি যা বলে সঙ্গে সঙ্গে তা করে। অন্য কোনো মেয়ে হলে, আয় রেখে আসি বলেও রেখে আসার কোনো রকম লক্ষণ দেখাত না। এবং এক সময় বড় বড় হাই তুলে ঘুমিয়ে পড়ত। কিন্তু অপলা খালামণি সে রকম নয়। সে যা বলবে তাই করবে। এজন্যেই তাকে এত ভাল লাগে। গত পরশু কালবৈশাখী ঝড় হল। ভীষণ ঝড়। হঠাৎ অপলা খালামণি বলল, চল টগর আম কুড়াতে যাই। কালবৈশাখীতে আম কুড়াতে হয়। টগরের ইচ্ছা করছিল, আবার ভয় ভয়ও করছিল। কী অন্ধকার চারদিক! আবার কেমন শোঁ শোঁ শব্দ উঠছে। বাবা বললেন, মাথার উপর গাছের ডাল ভেঙে পড়বে। যেও না অপলা। খালামণি বলল, আমার উপর গাছের ডাল ভেঙে পড়লে কারো কোন ক্ষতি হবে না। বলেই সে নেমে গেল উঠোনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফুলিও গেল।

তারা ছুটোছুটি করে আম এনে ঝুড়ি ভর্তি করছে। কি সুন্দর লাগছে দেখতে। বাবা বললেন, টগর তোমাব যেতে ইচ্ছা করছে?

হুঁ।

আমার মনে হয় এ রকম ক্ষেত্রে যাওয়াই উচিত। ভয়কে প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না। তা ছাড়া কালবৈশাখীর ঝড়ে বাচ্চাদের ওপর কখনো ডাল ভেঙে পড়ে না। নিযম নেই।

কার নিয়ম?

প্রকৃতির নিয়ম।

বাবা খুব হাসতে লাগলেন। বড়দের সব কথা সব সময় বোঝা যায় না। টগর অবশ্যি খুব বুঝতে চেষ্টা করে। বড়দের কথা শুনতে তার খুব ভাল লাগে।

রোজ রাতে তারা সবাই বারান্দায় বসে অনেকক্ষণ গল্প করে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে তবু সে জেগে থাকতে চেষ্টা করে। কত রকম কথা বলে বাবা আর খালামণি। বেশিব ভাগ কথারই সে অর্থ বুঝতে পারে না। তবু শুনতে ভাল লাগে।

অপলা টগরকে আমার বিছানায় শুইয়ে দেবার কোনো দরকার নেই। তুমি একা একা ভয় পাবে; ও থাকুক তোমার সঙ্গে।

আমার এত ভয়টয় নেই।

বল কী' এ বাড়িতে কিন্তু ভূত আছে। সাদা চাদর গায়ে দিয়ে অশরীরী কে একজন বারান্দায় হাঁটাহাঁটি করে। ফুলির মা তোমাকে সেই গল্প বলেনি?

বলেছে।

ভূত বিশ্বাস কর না?

করব না কেন, করি?

সে কী, আমার তো ধারণা ডাক্তাররা ভূত বিশ্বাস করে না।

কোনো কোনো ডাক্তার আবার করেও। তা ছাড়া আমি তো এখনো ডাক্তার হইনি।

ডাক্তাররাই যদি ভূতে বিশ্বাস করে তাহলে আমরা সাধারণ মানুষেরা যাব কোথায়?

আপনি বুঝি সাধারণ মানুষ?

তোমার কী ধারণা আমি অসাধারণ?

লেখকরা সাধারণ মানুষ নন।

আমি লেখক তোমাকে কে বলল? এক সময় ছিলাম, এখন না। ঐ সব পূর্ব জন্মের কথা। এখন আর মনে করতে চাই না।

আপনাকে আবার লেখালেখি শুরু করতে হবে।

আর হবে না।

হতেই হবে। আপনাকে দিয়ে নতুন একটি লেখা শুরু করিয়ে তার পর যাব। তার আগে যাব না।

আর যদি শুরু করতে না পারি তা হলে কী থেকে যাবে?

হ্যাঁ।

টগর লক্ষ্য করল হ্যাঁ বলার পর পরই খালামণি খুব গম্ভীর হয়ে পড়ল। তার পর হঠাৎ উঠে চলে গেল। বড়দের কথাবার্তার মত তাদের আচার আচরণও দুর্বোধ্য। খালামণি যে ভাবে উঠে চলে গেছে তাতে মনে হয় সে খুব রাগ করেছে। কেন সে শুধু শুধু রাগ করবে? বাবা কী রাগ করার মত কিছু বলেছে? কিছুই বলেনি।

রাতে ঘুমুবার সময় টগর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, খালামণি - তুমি বাবার ওপর রাগ করেছ? অপলা অবাক হয়ে বলল, রাগ করব কেন? আমি কারো সঙ্গে রাগটাগ করতে পারি না।

বাবাও কারো সঙ্গে রাগ করে না।

উনি মহাপুরুষ কী না তাই।

মহাপুরুষর কী খালামণি?

জানি না কী; ঘুমো। নাকি বাবার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা করছে?

তোমার সঙ্গেই ঘুমুতে ইচ্ছা করছে।

টগর অপলার গলা জড়িয়ে ধরল। অপলা বিরক্ত স্বরে বলল, গরমের মধ্যে এরকম জাপটে ধরে আছিস কেন? একটু দূরে যা। টগর দূরে সরে গেল।

রাগ করলি নাকি টগর?

না।

তুই তোর বাবার মত হবি বড় হলে। কারো জন্যে কোনো টান থাকবে না। পাথরের মত মানুষ।

বাবা পাথরের মত?

হ্যাঁ শক্ত পাথর।

আর মা কিসের মত?

সেও পাথরের মত। তোমাদের সবাই পাথর।

অপলা খুব হাসতে লাগল। টগর অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, হাসতে হাসতে খালামণির চোখে পানি এসে গেছে। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছছে আর হাসছে। হাসির দমকায় খাট কাঁপছে। ও ঘর থেকে বাবা এসে বললেন, কী হচ্ছে এখানে? টগর বলল, খালামণি শুধু হাসছে।

শুধু শুধু কেউ এ রকম হাসে?

অপলা গম্ভীর হয়ে বলল, আমি হাসি। কোনো কারণ ছাড়াই আমি হাসি এবং কাঁদি। আপনি ঘুমুতে যান। ইচ্ছা করলে আপনি আপনার পুত্রকেও নিতে পারেন।

বসি কিছুক্ষণ তোমার কাছে। হাসির গল্পটি বল। আমারো হাসতে ইচ্ছা করছে।

আমার আর করছে না। ঘুম পাচ্ছে।

বাবা উঠে চলে গেলেন। টগর অনেক রাত পর্যন্ত জেগে রইল। তার কেবলি মনে হতে লাগল খালামণি এখানে এসে বদলে গেছে। তার ধারণা বাবাও সেটা জানেন। এবং তিনিও তার মতই জেগে জেগে খালামণির ব্যাপারটা ভাবেন। তাঁকে একদিন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, কেন খালামণি এ রকম করছে? পরশু দিনের আগের দিন বিকেলে খালামণি বলল, আজ নদীর পাড়ে যাব। একটা নৌকা ভাড়া করে খুব ঘুরব। দুলাভাই তৈরি হয়ে নিন। ফ্লাক্সে করে চা নিয়ে যাব। দৃশ্য দেখতে দেখতে চা খাব। বাবা বললেন, নদী তো অনেকখানি দূর। চার পাঁচ মাইল হবে।

হলে হবে। আপনি তৈরি হন। খাতা-কলম সঙ্গে নিন। হঠাৎ কোনো ভাব এসে গেলে লিখে ফেলবেন।

ঝড় বৃষ্টি হতে পারে।

হলে হবে।

খালামণি ফ্লাক্স ভর্তি করে চা করল। কী একটা খাবার তৈরি করল। তারপর হঠাৎ মত বদলাল। গম্ভীর হয়ে বলল, দুলাভাইকে নিয়ে কোনো কাজ নেই। আমি আর তুই যাব।

বাবা কাপড় আনছে তো।

পরেছে পরুক। কাপড় পরে বসে থাকুক। চল আমরা রওনা দিয়ে দিই। সন্ধ্যার আগে ফিরতে হবে। হাতে সময় নেই।

টগর মৃদু স্বরে বলল, বাবাকে নিয়ে যাই? অপলা বিরক্ত হয়ে বলল, তুই তাহলে থাক তোর বাবার সঙ্গে। আমি চললাম। অপলা সত্যি সত্যি একা একা রওনা হয়ে গেল। বাবা পেছন থেকে ডাকল, এ্যাই অপলা, এ্যাই। খালামণি ফিরেও তাকাল না। ফ্লাক্স দোলাতে দোলাতে হন হন করে ছুটতে লাগল। বাবা ফুলির আব্বাকে বলে দিলেন সঙ্গে যেতে। তার পর হাসি মুখে টগরকে বললেন, তোর খালার কী হয়েছে রে?

জানি না কী হয়েছে।

রাগ নাকি?

হুঁ।

কার ওপর রাগ?

তোমার ওপর।

আমার ওপর রাগ, তো তোকে কেন নেয়নি?

আমার ওপরও রাগ।

বলিস কী। পৃথিবীর সবার ওপরই সে রাগ করেছে নাকি?

হুঁ।

বাবা খুব হাসতে লাগলেন। এতে হাসির কী আছে? বড়রা অকারণে কেন হাসে? এবং কেন মাঝে মাঝে ছোটদের মত পৃথিবীর সবার সঙ্গে রাগ করে? এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। হয়ত বড় হলেই উত্তর জানা যাবে। কিংবা কে জানে হয়ত জানা যাবে না।

তিন দিনের জায়গায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল। অপলার ঢাকা ফিরে যাবার কোন লক্ষণ নেই। রানু দুটি আর্জেন্ট টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছে। দুটিতেই লেখা, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। অপলার মধ্যে ফিরে যাবার কোন লক্ষণ নেই। ওসমান সাহেব বললেন, পড়াশোনা বন্ধ করে এখানে পড়ে আছ। যাওয়া উচিত না।

হ্যাঁ উচিত।

কবে যাবে? এখানকার স্কুলের একজন টিচার তোমাদের সঙ্গে যাবেন। তাঁকে বলে রেখেছি। কাল রওনা দিলে কেমন হয়।

আপনি যাচ্ছেন না?

আমি আরো কয়েকদিন থাকব।

তাহলে আমিও থাকব। টগরকে কারো সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।

ঠিক বলছ তুমি!

ঠিকই বলছি।

এক রাতে ঘুম ভেঙে টগর দেখল খালামণি কাঁদছে। সে ফিসফিস করে বলল, কী হয়েছে তোমার? অপলা ধরা গলায় বলল, জানি না কী হয়েছে।

## ৩২

অনেক রাতে ওসমান সাহেব জেগে উঠলেন।

ঘুম ভাঙলেই সময় জানতে ইচ্ছে করে। এ বাড়িতে কোনো ঘড়ি ছিল না। এখন ঘড়ি আছে। অপলার ছোট্ট লেডিস ঘড়ি। তাকে ডেকে কী জিজ্ঞেস করবেন কটা বাজে? নাকি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে সময় আঁচ করবার চেষ্টা করবেন। শেষ রাত হলে— দক্ষিণ আকাশে দেখা যাবে বৃশ্চিক নক্ষত্রমণ্ডলী যার উজ্জ্বলতম নক্ষত্রটির নাম জ্যেষ্ঠা। বৃশ্চিকের কাছেই থাকবে ধনু নক্ষত্রমালা। যার ঠিক উপরে মঙ্গল গ্রহ। এদের অবস্থান থেকে সময় বলে দেয়া খুব অসম্ভব নয়। ওসমান সাহেব বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। মিল্কিওয়ে দেখা যাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহের কাছাকাছি উজ্জ্বল একটি তারা। এর নাম কী? শনি, কিন্তু এত কাছাকাছি কী শনির থাকার কথা? আকাশ সম্পর্কে এক সময় প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন গ্রহ-নক্ষত্র দেখামাত্র চিনতে পারতেন। এখন সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মঙ্গল গ্রহের পাশের উজ্জ্বল বস্তুটি কী?

তিনি শোবার ঘরে ফিরে এলেন। তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। টেবিলে পানির গ্লাস ও জগ। পর পর দু'গ্লাস পানি খেলেন কিন্তু তৃষ্ণা কমল না। বুক শুকিয়ে ঝাঁ ঝাঁ করছে। ঘুমনোর চেষ্টা করা অর্থহীন। ঘুম আসবে না, তিনি একটি দুঃস্বপ্ন দেখে জেগেছেন। দুঃস্বপ্নের রেশ যতক্ষণ পুরোপুরি না কাটবে ততক্ষণ ঘুমুনো যাবে না। ওসমান সাহেব ভ্রূ কুঁচকে ভাবলেন একে দুঃস্বপ্ন ভাবাটা কী হচ্ছে? একজন প্রিয় এবং পরিচিত কাউকে স্বপ্ন দেখাটা দুঃস্বপ্ন হতে পারে না।

স্বপ্নে দেখেছেন মিলিকে। স্বপ্নের চেহারাগুলি কখনো খুব স্পষ্ট হয় না। মিলিকে মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল ফুলি মেয়েটির মত। হাত পা নাড়ার ভঙ্গি অনেকটা অপলার মতো। মিলি যেন খুব ক্লান্ত। এসেছে অনেক দূরের কোনো জায়গা থেকে। অল্পক্ষণ থেকেই তাকে চলে যেতে হবে। সে বলল, ভাইয়া তুমি আমাকে চিনতে পারছ, আমি মিলি।

হ্যাঁ চিনতে পারছি।

আমি মরে গেছি, তুমি জান তো? বিষ খেয়েছিলাম

না বিষ-টিস খাসনি। চিকিৎসা হচ্ছে তোর।

উঁহু তুমি জান না একগাদা ঘুমের বড়ি খেয়ে ফেললাম।

তাই না-কী?

হ্যাঁ।

এখন কেমন আছিস?

বেশি ভাল না। সারাদিন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছুটোছুটি করতে হয়। বেশিক্ষণ এক জায়গায় থাকা যায় না।

তাই নাকি? জানতাম না তো। সুখে আছিস, না কষ্টে আছিস?

সুখেও না কষ্টে ও না। এখানে সব অন্য রকম। তোমাকে বোঝাতে পারব নরা। আত্মাটা আমাদের সঙ্গে থাকে না।

বলিস কী? কোথায় থাকে?

তাও জানি না। সারাক্ষণ এমন ছুটোছুটি কী জন্যে? আত্মা খুঁজে বেড়াই।

আশ্চর্য তো!

তোমার এখানে খাবার কিছু আছে? খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে খাবা-দাবার খুঁজেতে লাগলেন। খুঁজতে খুঁজতে তাঁর মনে হল এটা স্বপ্ন। মিলি করুণ মুখে তাঁর সামনে বসে আছে এটা একটা স্বপ্ন দৃশ্য। কাজেই ব্যস্ত হয়ে খাবার খোঁজা অর্থহীন। অথচ মিলি এমন করুণ ভঙ্গিতে বসে আছে যে খাবার না খুঁজেও পারা যায় না। তিনি খানিকটা গম ছাড়া কিছুই পেলেন না। তাঁর কপাল বেয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়তে লাগল। এই গম দিয়ে তিনি কী করবেন? মিলি কিন্তু তার রোগা হাত বাড়িয়ে মুঠো মুঠো গম নিয়ে মুখে পুরছে। কচ কচ করে চিবোচ্ছে। ওসমান সাহেব জেগে উঠলেন। এ জাতীয় একটি স্বপ্ন দেখার কোনো মানে হয় না। কিন্তু অর্থহীন কিছুই তো ঘটে না পৃথিবীতে। এ রকম একটি স্বপ্ন দেখার পেছনে নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। ওসমান সাহেব সিগারেট ধরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। মঙ্গল গ্রহ আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। আকাশ অসম্ভব পরিস্কার। মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি এত পরিস্কারভাবে এর আগে তিনি দেখেননি। এই ছায়াপথ ধরেই মৃত মানুষেরা পৃথিবীতে নেমে আসে। কোথায় যেন পড়েছিলেন। বিভূতিভূষণের 'দেবযান'-এ না অন্য কোথাও?

তিনি সিগারেট টানতে টানতে স্বপ্নটার কথা ভাবতে লাগলেন। এর একটি লৌকিক সংখ্যা বের করা উচিত। নয়ত স্বপ্নের রেশ কাটবে না। তাঁকে বাকি রাতটা কেটে জাগাতে হবে। কারণ স্বপ্ন দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ হয়েছে। জেগে উঠে দেখেছেন বালিশ ঘামে ভিজে গেছে। অথচ ভয়ের কিছুই ছিল না স্বপ্নে। অস্বাভাবিকতা যা আছে, তার সব স্বপ্নেই থাকে। তিনি শোবার ঘর থেকে ইজিচেয়ার টেনে আনলেন বারান্দায়। শীতল হাওয়া দিচ্ছে। বসে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। এরা রোজ ইজি চেয়ারটা বারান্দা থেকে টেনে শোবার ঘরে নিয়ে যায় কেন? ইজি চেয়ারটা ফিট করতে কষ্ট হচ্ছে। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। খট খট শব্দ হচ্ছে। টগর বা অপলা জেগে উঠতে পারে। তিনি কাউকে জাগাতে চান না। এক সময় দুঃস্বপ্ন দেখলেই রানুকে ডেকে তুলতেন। রানু খুব বিরক্ত হত। মুখ ঝাঁকিয়ে বলত, তুমি একজন বয়স্ক মানুষ না? ভয়ে অস্থির হয়ে যাচ্ছ কেন? চোখে মুখে পানি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়।

স্বপ্নটা কেন দেখলাম সেটা তোমাকে বলি।

বলার দরকার কী?

তুমি না শুনলে বাকি রাতটা আমার ঘুম হবে না।

এ রকম অদ্ভুত স্বভাব কেন তোমার?

রানু ঘুম চোখে বসে থাকত। ঘন ঘন হাই তুলত। এবং তিনি অনেক সময় নিয়ে স্বপ্ন দেখার কারণ ব্যাখ্যা করতে শুরু করতেন। এক সময় ব্যাখ্যা শেষ হত। তিনি হৃষ্ট গলায় বলতেন, যুক্তিগুলি তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

আমার পছন্দ অপছন্দ দিয়ে তো কিছু না। তোমার পছন্দ হলেই হল। তোমার কথা শেষ হয়েছে?

হুঁ।

তাহলে ঘুমুতে আস। নাকি তোমার জন্যে বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হবে?

তিনি রানুকে জড়িয়ে ধরে ঘুমুতে যেতেন। রানু যদি বলত, গরমের সময় এত ঘেঁষাঘেঁষি করে শুতে ভাল লাগছে না। তিনি মৃদুস্বরে বলতেন, ভয়টা পুরোপুরি কাটেনি রানু।

ওসমান সাহেব ইজিচেয়ারে বসে ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপলা শোবার ঘর থেকে চেঁচাল -- কে কে? অপলা নিশ্চয়ই তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পায়নি--- ঘুমের ঘোরেই চেঁচিয়েছে। কোন সাড়া-শব্দ না পেলে চুপ করে যাবে। কিন্তু অপলা আবার বলল, কে কে?

আমি। ঘুমাও অপলা।

আপনি বারান্দায় কী করছেন?

অপলা দরজা খুলে বেরিয়ে এল। বিড়বিড় করে বলল, যা ভয় পেয়েছি। অনেকক্ষণ ধরে আমি জেগে আছি। শুনলাম ঘরে কী সব যেন টানাটানি করা হচ্ছে। তার পর দরজা খোলা হচ্ছে। আমি ভাবলাম চোর।

ওসমান সাহেব বললেন, ক'টা বাজে অপলা? অপলা অনেকক্ষণ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রইল। সময় বলতে পারল না। অন্ধকারে ডায়াল দেখা যাচ্ছে না।

বাতি না জ্বালিয়ে বলা যাবে না। আপনার কাছে দিয়াশলাই আছে?

তিনি দিয়াশলাই জ্বালালেন, তিনটা দশ। অথচ মনে হচ্ছে ভোর। অপলা বলল, আপনি এত রাতে বারান্দায় বসে আছেন কেন?

একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি, তার পর আর ঘুম আসছে না।

কী দুঃস্বপ্ন?

তিনি আগ্রহ করে স্বপ্নের কথা বললেন। অপলা মৃদু স্বরে বলল, খুব অদ্ভুত স্বপ্নটা। তিনি বললেন,

না, অদ্ভুত না। এরকম স্বপ্ন কেন দেখেছি তা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। অনেক দিন আগে একটা বই পড়েছিলাম— দি ভেইল, সেখানে কিছু মানুষের কথা লেখা হয়েছে - যাদের আত্মা ঈশ্বর জমা রেখেছেন। তারা ব্যাকুল হয়ে স্বর্গ মর্ত্যে তাদের আত্মা খুঁজছে। গল্পটা খুব দাগ কেটেছিল। এই গল্পটিই স্বপ্নে একটু অন্যভাবে এসেছে।

মিলি আপা বসে বসে গম খাচ্ছেন এটা দেখলেন কেন?

ও খুব দুঃখী মেয়ে। অভাবি মেয়ে। ওর দুঃখটা স্বপ্নে এই ভঙ্গিতে এসেছে। ওর প্রতি আমার খুব মমতা।

উনি কেমন আছেন?

জানি না।

জানবার চেষ্টাও বোধ হয় করেননি।

তিনি জবাব দিলেন না। অপলা হাই তুলে বলল, শীত শীত লাগছে। আপনার লাগছে না?

লাগছে। কাছেই কোথাও শিলাবৃষ্টি হয়েছে। শীত লাগছে সেই কারণে।

আপনি পৃথিবীর সব স্বপ্নের জবাব জানেন না কী?

না, জানি না। তবে জবাব পেতে চেষ্টা করি। অনেকেই সেটা করে না। চৈত্র মাসের রাতে হঠাৎ বাতাস এত ঠাণ্ডা হবে কেন, এই নিয়ে আমি ভাবছিলাম।

ওসমান সাহেব হাসলেন। অপলা হাসল না। কেন জানি সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ল।

ঘুমুতে যাও অপলা।

আপনি ঘুমুবেন না?

না, আমি আরো খানিকক্ষণ বসে থাকব।

বসে বসে জটিল সব প্রশ্নের উত্তর ভাববেন?

তা বলতে পার।

তিনি সিগারেট ধরালেন। অপলা মৃদুস্বরে বলল, আপনাকে একটা সহজ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, দেখি আপনি জবাব দিতে পারেন কী না।

কী প্রশ্ন?

আমি এখানে এসেছিলাম দু'দিন থাকব ভেবে। কিন্তু আজ নিয়ে আট দিন হল এখানে আছি। ভেবে-টেবে বলুন তো কেন আছি? দয়া করে সত্যি কথাটা বলবেন।

আমি জানি না অপলা।

আপনি জানেন। খুব ভালই জানেন।

ঘুমুতে যাও অপলা।

না আমি ঘুমুতে যাব না, আপনাকে আমার প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন, অপলা কাঁদতে শুরু করেছে।

নিঃস্বার্থ কান্না নয়। শব্দ করে শিশুদের মত কান্না।

এসো অপলা ঘরে যাই।

অপলা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি কাল ভোরে চলে যাব। যাবার আগে জানতে চাই যে আপনি জানেন, কেন আমি এখানে এতদিন থাকলাম।

আমি জানি। জানব না কেন? আমি যথেষ্ট বুদ্ধিমান।

বুদ্ধিমান কিন্তু হৃদয় বলে আপনার কিছু নেই। আপা ঠিকই বলেন।

ঘুমুতে যাও অপলা।

আমি যাব না। আপনি যান। আরাম করে ঘুমুন। আমি বসে থাকব এখানে।

এ বাড়িতে কিন্তু ভূত আছে।

কেন বাজে কথা বলছেন। কেন আপনি আমাকে একটা ছোট্ট খুকি মনে করেন?

ছোট্ট খুকি মনে করি না।

টগর জেগে উঠেছে। সে ভয় পাওয়া গলায় ডাকল, খালামণি, খালামণি। অপলা ভেতরে চলে গেল। ওসমান সাহেব লক্ষ্য করলেন অপলা বেশ সহজ ভঙ্গিতেই টগরকে বাথরুম করাতে নিয়ে গেল। ছোটখাটো কথাবার্তাও বলতে লাগল। যেন একটু আগে কিছুই হয়নি।

তিনি নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁর কেন জানি মনে হতে লাগল টগরকে ঘুম পারিয়ে অপলা আবার আসবে এ ঘরে। তিনি তার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু অপলা এল না।

## ৩৩

ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ভোর ন'টায়। আটটা থেকেই মতিয়ুর বলছে, কোনোরকম পাগলামী করবে না। যা জিজ্ঞেস করবে জবাব দেবে। ফ্রিলি কথা বলবে। বানিয়ে বানিয়ে কিছু বলবে না। সবচেয়ে বড় কথা পাগলামী করবে না।

মিলি করুণ স্বরে বলল, আমি পাগল মানুষ কিছু পাগলামী তো করবই। সেটা উনি চিকিৎসা করে ভাল করবেন। সেই জন্যেই এত দূর আসা।

মতিয়ুর গম্ভীর হয়ে গেল। মিলি বলল, জায়গাটা আমার পছন্দ হচ্ছে, কেমন বিদেশ বিদেশ ভাব।

এটা বিদেশ, বিদেশ বিদেশ ভাব থাকবে না? তোমার কী ধারণা এটা ঢাকা?

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল এটা ঢাকা। আমি লরিতে গিয়ে ভাইয়ার নাম্বারে একটা টেলিফোন করে ফেললাম। রিং হচ্ছে কেউ ধরছে না। তখন রিসিপশনের মেয়েটা হিন্দিতে বলল, আপনি কোন নাম্বার চান?

মতিয়ুর বিরক্ত হয়ে বলল, কেন মিথ্যা কথা বলছ? তুমি ঘরেই ছিলে, কোথাও যাওনি। মিলি হেসে ফেলল।

হাসছ কেন?

মিথ্যা কথাটা কেমন করে ধরা পড়ে গেল তাই হাসছি। মজা লাগছে খুব।

মিলি সাজগোজ করতে লাগল। ফুলদানীতে হোটেল থেকে ফুল দিয়ে গেছে, সেই ফুল সে খোঁপায় গুঁজতে গুঁজতে বলল, সুন্দর হয়ে যাওয়া দরকার। নয়ত ডাক্তার ভাববেন বাংলাদেশের মেয়েগুলি দেখতে পচা। তাই না?

মতিয়ুর জবাব দিল না। রাগী চোখে তাকিয়ে রইল।

ডাক্তার দেবশর্মা বিশাল ব্যক্তি। বিশাল ব্যক্তিদের সাধারণত কোমল একটি মুখ থাকে। ইনার

তাও নেই। প্রকাণ্ড একটা গোঁফের আড়ালে সব কোমলতা ঢাকা পড়েছে। চশমার কাচ এত মোটা যে চোখ দেখা যায় না। মিলি সহজভাবে বলল, কেমন আছেন ডাক্তার সাহেব?

ডাক্তার দেবমর্শা কোমল গলায় বললেন, ভাল আছি।

ও আমাকে বলেছিল আপনি বাঙালি কিন্তু আপনাকে দেখে আমার বিশ্বাস হয়নি। এখন কথা শুনে বিশ্বাস হচ্ছে।

চট করে কোন কিছু বিশ্বাস করা ঠিক না। অনেক বিদেশীরা চমৎকার বাংলা বলেন। তাছাড়া আমি নিজেও কিন্তু পুরোপুরি বাঙালি না। আমার মা ইউ পি-র মেয়ে।

মিলি হাসতে হাসতে বলল, আমি যা শুনি সব বিশ্বাস করে ফেলি। পাগল মানুষ তো।

পাগল নাকি আপনি?

হ্যাঁ। আমি এই জন্যই তো আপনার কাছে চিকিৎসার জন্যে এসেছি। আপনি আমাকে ভাল করে দিন

আপনি কবে থেকে পাগল হয়েছেন?

খুব ছোটবেলা থেকে।

সময়টা বলুন। খুব ছোট, মানে কত ছোট?

ক্লাস সিক্স থেকে।

বুঝলেন কী করে?

তা বলতে পারব না। আমরা দু'ভাই-বোনই ছিলাম পাগল। আমার বড় ভাইকে আপনি চিনবেন না। খুব নাম করা লেখক। আপনারা তো আর আমাদের লেখকদের বই পড়েন না, কাজেই তাঁর নাম জানবেন না। আমাদের দেশে সবাই তাঁকে চেনে।

তাই নাকি?

জি আমাকে নিয়েও একটা বই লিখেছে নাম হল 'চৈত্রের দুপুর'। এটা পড়ে কাঁদতে কাঁদতে আপনার চোখে ঘা হয়ে যাবে।

ডাক্তার দেবর্শমা হেসে ফেললেন। মিলি আহত স্বরে বলল, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না তাই না?

হ্যাঁ করছি।

তা হলে হাসছেন কেন?

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে হাসির কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি এত সুন্দর করে কথা বলছেন যে শুনেই আমার হাসি আসছে। ভাল কথা 'চৈত্রের দুপুর' বইটি আমি পড়তে চাই। আপনার সম্পর্কে জানবার জন্যে। চোখে ঘা করবার জন্যে নয়। চা দিতে বলি?

বলুন।

ডাক্তার চা দিতে বললেন। ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কথা বলতে লাগলেন। মিলির ভদ্রলোককে বেশ লাগল।

মিলি!

বলুন।

আপনার কী কী সমস্যা বলুন তো?

আমার তো কোনো সমস্যা নেই। আমার ভাইয়ের অনেক রকম সমস্যা।

বলুন তার সমস্যার কথাই বলুন।

ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমার ভাই এবং ভাবী আলাদা আলাদা থাকে।

ছাড়াছাড়ি কেন হল?

ভাইয়ের একটা দোষ হচ্ছে সে সব সময় সত্যি কথা বলবে। এই জন্যেই ছাড়াছাড়ি হয়েছে।

সত্যি কথা বলার এত সমস্যা তা তো জানতাম না।

সমস্যা তো হবেই। রানু ভাবী একদিন জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা তোমার অনেক উপন্যাসে মনিকার নাম আছে। মনিকার প্রতি তোমার কোন দুর্বলতা আছে? ভাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, আছে। অনেকখানি আছে। একজন মানুষের অনেকের প্রতিই দুর্বলতা থাকতে পারে তাতে কিছু যায় আসে না।

মনিকা কে?

মনিকা হচ্ছে একটি খুব বাজে ধরনের মেয়ে।

খুব সুন্দর বুঝি?

জানি না, আমার সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি।

তাহলে কী করে বললেন, বাজে ধরনের মেয়ে?

মিলি হাসতে হাসতে বলল, আপনি ঠিক ভাইয়ার মত তর্ক করেন।

আপনার ভাই খুব তর্ক করতে পারে বুঝি?

খুব পারে। কেউ তাকে তর্কে হারাতে পারবে না।

ভাইকে খুব পছন্দ করেন?

হ্যাঁ।

খুব পছন্দ?

হ্যাঁ খুব।

সবচেয়ে অপছন্দ করেন কাকে।

কাউকে না।

আপনার স্বামীর কোন ব্যাপারটা আপনার সবচেয়ে খারাপ লাগে? মিলি চুপ করে রইল। দেবশর্মা হাসতে হাসতে বললেন, প্রতিটি মানুষেরই কিছু কিছু খারাপ দিক আছে। আপনার স্বামীরও নিশ্চয়ই আছে। আছে না?

হ্যাঁ আছে।

সেই সম্পর্কে বলুন।

সেই সম্পর্কে আমি বলতে পারব না। আমি কাউকে বলি না। আপনাকেও বলব না। আপনি ডাক্তার হন যাই হন।

ডাক্তার দেবশর্মা হাসিখুশি মেয়েটির গম্ভীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তিনি মেয়েটির সমস্যাটি ঠিক ধরতে পারছেন না।

হোটেলে ফিরে মিলি অনেকক্ষণ ঘুমুল। ঘুম ভাঙল বিকেলে। মতিয়ুর বেরুচ্ছে। মিলি বলল, আমি একা একা থাকব?

হুঁ বিশ্রাম কর।

বিশ্রাম লাগবে না, আমিও যাব তোমার সাথে।

তোমার যেতে হবে না। তুমি থাক।

একা একা আমার ভয় লাগবে না?

ভয়ের কী আছে। চারদিক লোকজন।

মিলি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। হোটেলের লবিতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ লোক চলাচল দেখল। তারপর রুমে ফিরে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখল রানুকে। চিঠি শেষ হবার পর বালিশে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কাঁদল।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। সে নেমে গেল নিচে। লবি ফাঁকা ফাঁকা। রিসিপশনে এখন একটি ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলায় একটি মেয়ে থাকে। গুজরাটি মেয়ে। তার সঙ্গে বেশ খাতির হয়েছে মিলির। মেয়েটি মাথা নেড়ে নেড়ে সুন্দর গল্প করে। ইংরেজি কথাবার্তা। মিলি তার বেশির ভাগই বুঝতে পারে না তবু খুব মাথা নাড়ে, যেন সব বুঝতে পারছে। ঐ মেয়েটি থাকলে বেশ হত। গল্প করা যেত। মিলি আবার উপরে উঠে এল। ঘর অন্ধকার। ঢুকতে ভয় লাগছে। সুইস টিপলেই বাতি জ্বলবে। কিন্তু বাতি জ্বালাতে ইচ্ছা করছে না। মিলি খাটে বসে রইল চুপচাপ। ঘর অন্ধকার থাকলেই তার বাচ্চাটির কথা মনে পড়ে। এখন যেমন মনে হচ্ছে।

যেন সে খাটে ঘুমিয়ে আছে। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। দু'বার সে ডাকল - মা মা বলে। তারপর উঠে বসল। একা একা খাট থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গেল নিচে। চিৎকার করে সে কাঁদছে কিন্তু কেউ শুনতে পারছে না। কারণ সবাই এখন একতলার ঘরে বসে ভিসি আর দেখছে। ভিসিআরে খুব একটা দুমধাড়াক্কা ছবি হচ্ছে। সবাই ছবি দেখছে। কেউ তার কান্না শুনতে পাচ্ছে না।

মিলি ছটফট করতে লাগল। মাঝে মাঝে তার এমন কষ্ট হয়। ইচ্ছা করে কৌটা খুলে ঘুমের ওষুধগুলি বের করতে। না, সে খাবে না। শুধু দেখবে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। বোতলটার দিকে তাকিয়ে থাকতেও কেন জানি ভাল লাগে। মিলি স্যুটকেস খুলল। দরজার কাছে শব্দ হল। মতিয়ুর ফিরে এসেছে নাকি? মিলি উৎকর্ণ হয়ে রইল। না, মতিয়ুর না। মিলি বোতল বের করল।

সব মিলিয়ে ছাপ্পান্নটি ট্যাবলেট আছে। একটি বেশিও না কমও না। গুণে রাখা ট্যাবলেট। এখন সে আবার গুণবে। গুণতে গুণতে সে কাঁদবে। নিজের কথা ভেবে কাঁদবে। তাঁর মেয়েটির কথা ভেবে কাঁদবে, রানু ভাবী এবং ভাইয়ের কথা ভেবে কাঁদবে। তারপর আবার বোতলটি লুকিয়ে রাখবে স্যুটকেসে।

মতিয়ুরের ফিরতে অনেক দেরি হল। সে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। অচেনা শহরে একা একা অনেকক্ষণ ঘুরতে হয়েছে। সে এসে দেখল মিলি দরজা খোলা রেখে ঘুমুচ্ছে? কী সব কাণ্ড মিলির। অচেনা অজানা একটা হোটেলে দরজা খোলা রেখে কেউ ঘুমায়? অন্য কিছু হোক না জিনিসপত্র তো নিয়ে যেতে পারত। একটা স্যুটকেস হাতে নিয়ে নেমে গেলে কে ধরতে পারত?

রাত এগারোটায় মতিয়ুর প্রথম বুঝতে পারল মিলি এক গাদা ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। মতিয়ুরের কিছু করার ছিল না। কারোরই কিছু করার ছিল না। তবু হোটেলের লোকজন প্রচুর ছোটাছুটি করল। হাসপাতালের ডাক্তাররা রাত তিনটা পর্যন্ত চেষ্টা করলেন। কিছুই কাজে লাগল না। রাত তিনটায় মিলি ঘোলা চোখে চারদিকে তাকাল। হাত বাড়িয়ে কাউকে খুঁজতে চেষ্টা করল। বিড়বিড় করে কী যেন বলল। কাকে সে খুঁজল, কী সে বলল তা কেউ জানল না। কোন দিন জানবেও না।

## ৩৪

প্রিয় রানু ভাবী,

এর আগে তোমাকে দু'টি চিঠি দিয়েছি। শুধু তোমাকে না যাদের যাদেব চিনতাম সবাইকেই দিয়েছি। একটা কলকাতা থেকে, একটা এখান থেকে। কেউ জবাব দেযনি। কী করে দেবে, আমি তো কোনো ঠিকানা দেইনি।

এখন বাজছে সাড়ে পাঁচটা। চারদিক অন্ধকাব। আমি ঘরে এখনো বাতি জ্বালাইনি। অন্ধকাবে লিখছি। অন্ধকারে চিঠি লিখতে বেশ লাগে তাই না ভাবী?

আজ সকালে ডাক্তার দেবশর্মার কাছে গিয়েছিলাম। বিশাল পর্বতেব মত এক ভদ্রলোক। রাগী রাগী চেহারা। ভদ্রলোককে দেখে প্রথমে যা ভয় পেয়েছিলাম। পরে দেখি ভযেব কিছু নেই। বেশ হাসিখুশি মানুষ। চা খাওয়ালেন। মজার ব্যাপার কী জান ভাবী? চাযের সঙ্গে বিস্কিট ছিল, ভদ্রলোক চায়ে বিস্কিট ডুবিয়ে ডুবিয়ে খাচ্ছিলেন। এত বড় একজন ডাক্তার এরকমভাবে বিস্কিট খায়? আমার যা হাসি লাগছিল। একটা বিস্কিট ভেঙে চায়ের কাপে পড়ে গেল। তিনি আবার একটা চামুচ দিয়ে সেই বিস্কিট তুলতে গিয়ে নিজের শার্টে ফেলে দিলেন। একটু হলেই আমি হেসে ফেলতাম। ভাগ্যিস হাসি চেপে রাখতে পেরেছি। না পারলে কী একটা লজ্জার কাণ্ড হত বল দেখি।

ভাবী, আমি এখন আমার রুমে একা। ও বেড়াতে গেছে। আমাকে সঙ্গে নেয়নি। পাগল মানুষকে নিয়ে কোনো ঝামেলা হয় সেই ভযে। আমারো যেতে ইচ্ছে করছিল না। শহরটা যা নোংরা। তবে হোটেলটা খুব সুন্দর। সিনেমার যে রকম হোটেল থাকে সে রকম। রিসিপশনে একটা মেয়ে থাকে, ওর নামটা এখন মনে পড়ছে না। এই মেয়েটা ভাল। আমার মত বক বক করে, তবে মেযেটার একটা খুব বাজে স্বভাব আছে। সেটা চিঠিতে লেখা যবে না। যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে তখন বলব। আমার বলতে মনে না থাকলে তুমি মনে করিয়ে দিও।

পরশু রাতে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। সাদা উইলি শিফনটা পরে তুমি যেন কোথায় যাচ্ছ। বিয়ের পরপর তুমি যেমন সুন্দর ছিলে তোমাকে ঠিক সে রকম সুন্দর লাগছিল। অবশ্যি স্বপ্নে সব মেয়েকেই সুন্দর লাগে। আর পুরুষদের লাগে বিচ্ছিরি। আমি স্বপ্নে যে ক'টা পুরুষকে দেখেছি তাদের সবাই খুব বিচ্ছিরি। অনেক আজেবাজে কথা লিখে ফেলেছি। তাই না ভাবী? অবশ্যি ভাইয়ার ধারণা আমি খুব সুন্দর চিঠি লিখি। যা মনে আসে তাই লিখে ফেলি বলেই নাকি আমর চিঠিগুলি সুন্দর হয়। ভাইয়া কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলে। ওমা, তোমার কাছে ভাইয়ার কথা কেন বলছি? আমার চেয়ে তুমি তো তাকে অনেক ভাল জান।

আচ্ছা ভাবী, তোমার কী মনে আছে বিয়ের পর তুমি যখন প্রথম আমাদের বাড়িতে এলে তখন আমি কেমন রেগে গেলাম তোমার ওপর, কথায় কথায় ঝগড়া করতাম। তবু অবাক হয়ে শুনলাম তুমি একদিন ভাইয়াকে বলছ, মিলি বেচারীর অনেক সমস্যা। বাবা তাকে দেখলেই কেন জানি রেগে যান, এমন সব কথাবার্তা বলেন যে সহ্য করা মুশকিল। আমার এত ভাল লাগল তোমার কথা শুনে। তার পর তোমার সঙ্গে ভাব হল। মনে আছে প্রায়ই তোমাকে বলতাম, ভাবী

আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুব। তুমি বালিশ নিয়ে আমার ঘরে ঘুমুতে আসতে।

বেশ কিছু দিন থেকে আমার আবার তোমার সঙ্গে ঘুমুতে ইচ্ছা হচ্ছে। ভাইয়ার সঙ্গে তোমার যখন মিটমাট হয়ে যাবে তখন আমি তোমাদের সঙ্গে কিছু দিন থাকব। তোমাকে ঠিক ছোটবেলার মত বলব, ভাবী ভয় লাগছে আজ রাতে তোমার সঙ্গে ঘুমুব। তখন তুমি যদি বল, উঁহু আমি পাগল সঙ্গে নিয়ে ঘুমুব না তাহলে কিন্তু ভাবী আমি খুব রাগ করব। পাগলরা রাগ করলে কী অবস্থা হয় তুমি তো জান না। খুব খারাপ অবস্থা হয়।

চিঠি এই পর্যন্তই। রানু চিঠি শেষ করে শীতল চোখে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইল মতিয়ুরের দিকে। মতিয়ুর শুকনো মুখে একটা সোফায় বসে আছে। অসম্ভব রোগা লাগছে তাকে। যেন খুব বড় একটা অসুখ করেছে। রানু বলল, মিলির ভাইকে খবর দিয়েছেন?

ঢাকায় পৌঁছে খবর দিয়েছি। টেলিগ্রাম করেছি।

মিলি তাকিয়ে রইল মতিয়ুরের দিকে। মতিয়ুর বলল, ভাবী আমি যাই? রানু কিছু বলল না। মাথা নিচু করে বসে থাকা এই লোকটিকে সে এই মুহূর্তে আর সহ্যই করতে পারছে না।

ভাবী, আমি তার চিকিৎসার কোন ক্রুটি করিনি।

ক্রুটি করেছ এমন কথা কেউ বলছে না।

কারোর বলার দরকার নেই ভাবী। আমার নিজেরই মনে হচ্ছে কোথাও মস্ত বড় একটা গণ্ডগোল করেছি।

রানুকে অবাক করে দিয়ে মতিয়ুর রহমান হাউ মাউ করে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল। শোকের এমন তীব্র প্রকাশ বহুদিন দেখা হয়নি। এই লোকটিকে সান্ত্বনাসূচক কিছু কথাবার্তা বলা উচিত কিন্তু বলতে ইচ্ছা করছে না। কাজের মেয়েটি ছুটে এসেছে। অবাক হয়ে দৃশ্যটি দেখছে।

রানু বলল, বাসায় যাও মতিয়ুর। মতিউর ভাঙা গলায় বলল, বাসায় গিয়ে আমি কী করব? বাসায় আমার কে আছে?

কী অদ্ভুত কথা বাসায় কে আছে? রানু বিরসমুখে তাকিয়ে আছে। কান্নাকাটি, চিৎকার কিছুই তার মনে দাগ কাটছে না। সবটাই মনে হচ্ছে বানানো, মেকি। লোকটির টাকা-পয়সা হয়েছে, কিছু দিনের মধ্যেই সে পুতুল পুতুল ধরনের একটি মেয়ে বিয়ে করবে। গয়নায় তার শরীর ঢেকে দেবে। সেই মেয়েটি পর পর কয়েকটি বাচ্চা দিয়ে সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে যাবে, গালের হাড় বড় হয়ে যাবে, দাঁতগুলি হয়ে যাবে উঁচু। পৃথিবীর প্রতি অপরিসীম বিরক্তি নিয়ে এই মেয়েটি দুপুর বেলা নিউ মার্কেটে শাড়ির প্যাকেট নিয়ে হাঁটবে।

কে মনে রাখবে মিলির কথা? কেউ না? তার মেয়েটিও না। সবাই চেষ্টা করবে মিলিকে দ্রুত ভুলে যেতে। ভুলে যাওয়াই ভাল। পাগল মাকে মনে রাখার কোনো দরকার নেই। কেউ কাউকে মনে রাখে না।

## ৩৫

ঘরে একটু আগে হারিকেন দিয়ে গেছে। বাইরে এখনো আলো আছে। কিন্তু ঘরের ভেতরটা অন্ধকার। ওসমান সাহেব বসে আছেন চেয়ারে। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে বসেছেন। যেন বাইরের পৃথিবীর প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। তিনি তাকিয়ে আছেন অন্ধকারের দিকে। আজ তাঁর জীবনের একটি বিশেষ দিন। রানু এসেছে। দুপুর বেলা হঠাৎ দেখলেন একটা ছোট্ট ব্যাগ হাতে নিয়ে সে খানিকটা সঙ্কোচিত ভঙ্গিতে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। মৃদু স্বরে ডাকছে, অপলা অপলা। অথচ তার ডাকা উচিত ছিল টগরকে। সে টগরকে ডাকল না কেন? এর মানে কী এই যে সে টগরের জন্যে আসে নি। যদি তাই হয়ে থাকে তা হলে আজ তাঁর জন্যে একটি বিশেষ দিন। কিন্তু তাঁর আনন্দ হচ্ছে না কেন? বরং কেমন যেন একটা কষ্ট হচ্ছে।

তিনি রানুর জন্যে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন নিজের ঘরে। সে এল না। তিনি নিজেও গেলেন না তার কাছে যেতে। ইচ্ছে করল না।

এখন সন্ধ্যা। বারান্দায় টগরের হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। সে তার আনন্দ কিছুতেই সামলাতে পারছে না। রানু কথা বলছে অপলার সঙ্গে। রানুর গলা তিনি শুনতে পাচ্ছেন না কিন্তু অপলার কথা শুনা যাচ্ছে।

তুমি খুব চিন্তা করেছ আমাদের জন্য তাই না আপা? পরশু দিন আমরা চলে যেতাম। সব

ঠিকঠাক তার পর হঠাৎ টগরের গা গরম হল। পুকুরে খুব ঝাপাঝাপি করেছে তো সেই থেকে ঠাণ্ডা লেগে জ্বর।

রানু কিছু বলল, তার উত্তরে। তার পর পরই তিনি অপলার হাসির শব্দ শুনলেন। সেই হাসিও চট করে থেমে গেল।

ওসমান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। টেবিলে কাগজ-কলম সাজানো। একটি পেনসিল পর্যন্ত আছে। হারিকেন জ্বলছে। আধো আলো আধো ছায়া পরিবেশ। দীর্ঘ দিন পর টেবিলটি তাঁকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করল। কেন জানি মনে হচ্ছে অরণ্যের গল্পটি তিনি এখন লিখতে পারবেন। অরণ্য এগিয়ে আসছে। গ্রাস করছে শহরকে। আতঙ্কগ্রস্ত শহরের মানুষ নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে। কাগজ কলম নিয়ে বসার আগে রানুর সঙ্গে দেখা করা উচিত। কিন্তু কেন যেন ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছা করছে না।

দীর্ঘ দিন পর আবার তিনি লিখতে বসলেন। আগের মত কলম আটকে গেল না। কিন্তু যে গল্প লেখা হচ্ছে তা অরণ্যের গল্প নয়। শহরের গল্প। শহর গ্রাস করছে অরণ্যকে। তিনি দ্রুত গতিতে লিখছে

"সন্ধ্যার পর থেকে নীলুর কেমন যেন লাগতে লাগল। এক ধরনের অস্বস্তি, হঠাৎ ঘুম ভাঙলে যে রকম লাগে সে রকম। সমস্ত শরীর ঝিম ধরে আছে। মাথার ভেতরটা ফাঁকা ফাঁকা।

নীলু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এ বাড়ির বারান্দাটা সুন্দর। কল্যাণপুরের দিকে শহর তেমন বাড়তে শুরু করেনি। গ্রাম গ্রাম একটা ভাব আছে। বারান্দায় দাঁড়ালে ঝিলের মত খানিকটা জায়গা চোখে পড়ে। গত শীতের আগের শীতে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস নেমেছিল। কী অদ্ভুত দৃশ্য' এ বৎসর নামবে কী না কে জানে। বোধ হয় না। শহর এগিয়ে আসছে। পাখিরা শহর পছন্দ করে না।"

অনেক রাতে রানু এসে দাঁড়াল দরজার পাশে। তিনি এমনভাবে তাকালেন যেন রানুকে চিনতে পারছেন না। এ যেন অচেনা কেউ। রানু বলল, কেমন আছে?

ভাল। তুমি ভাল আছ রানু?

হ্যাঁ। কী করছ! লিখছ?

তিনি মাথা নাড়লেন। রানু বলল, লেখা এগুচ্ছে?

হ্যাঁ।

অনেক দিন পর লিখতে বসলে তাই না?

হ্যাঁ, অনেক দিন পর। ভেতরে এসে বস রানু।

সে কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে ভেতরে এসে দাঁড়াল। বসল খাটে। কেমন কোমল দেখাচ্ছে রানুর মুখ। কেমনা দুঃখি দুঃখি চেহারা। তাকে আজ এমন দেখাচ্ছে কেন?

মিলির একটি চিঠি আমার কাছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তুমি পড়বে?

হ্যাঁ পড়ব।

রানু চিঠিটা এগিয়ে দিল। চিঠি পড়তে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করলেন তাঁর চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে এসেছে। তিনি কিছু পড়তে পারলেন না। রানু মৃদু স্বরে বলল, মিলির খবরটা পেয়ে তোমার জন্যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। তোমাদের দুই ভাই-বোনের মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে। খুব বড় রকমের মিল। অনেক ভেবেছি বের করতে পারি না। তুমি চিঠিটা আমার কাছে দাও আমি পড়ে শুনাচ্ছি। তুমি পড়তে পারছ না।

রানু চিঠি পড়তে শুরু করল। তিনি তাকিয়ে আছেন রানুর দিকে। চশমার ঝাপসা কাচের ভেতর দিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না। মাঝে মাঝে খুব কাছের মানুষও অস্পষ্ট হয়ে যায়।

টগর পা ঝুলিয়ে খাটে বসে আছে। তার মা চলে এসেছে এটি তার এখনো ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তার বারবার মনে হচ্ছে তার মা বোধ হয় আসেনি। এই যে মা চলে গেল পাশের ঘরে, সত্যি কী গেল? হয়ত সে ঘরে উঁকি দিলে মাকে সে দেখবে না। দেখা যাবে করুণ মুখ করে বাবা বসে আছে।

টগর খাট থেকে নামল। তাকাল অপলার দিকে। অপলা শীতল গলায় বলল, কোথায় যাচ্ছ?

ঐ ঘরে।

ঐ ঘরে এখন যেও না।

কেন যাব না?

একটু পরে যাও। আস আমরা দু'জন গল্প করি।

শিশুরা অনেক জিনিস চট করে বুঝে ফেলে। টগরও হয়তবা কিছু বুঝল। আবার উঠে বসল খাটে। পা দুলাতে দুলাতে ভয়ে ভয়ে বলল, মা কী এখন থেকে বাবার সঙ্গে থাকবে? অপলা গাঢ় স্বরে বলল, হ্যাঁ থাকবে।

টগর ছোট্ট করে হাসল। ছেলেমানুষি হাসি। দেখতে এত ভাল লাগে।

খালামণি।

বল।

সত্যি থাকবে?

হ্যাঁ থাকবে।

তুমি কী করে জান?

আমি জানি।

টগর আর কিছু বলল না। পা দুলাতে লাগল। তার মনে হল খালামনি কাঁদছে। খালামণি এখন অন্যদিকে তাকিয়ে আছে। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু টগর বুঝতে পারছে।

তুমি কাঁদছ কেন খালামণি?

কাঁদছি না তো।

কিন্তু খালামণি কাঁদছে। তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। বড়দের কত অদ্ভুত দুঃখ-কষ্ট থাকে। টগরের নিজেরও খুব কান্না পেয়ে গেল। কিন্তু ছেলেদের কাঁদতে নেই। সে প্রাণপণে নিজের কান্না সামলাবার চেষ্টা করতে লাগল। অপলা ধরা গলায় বলল, টগর তুমি শান্ত হয়ে বসে থাকবে এখানে, বাবার ঘরে যাবে না। কেমন?

আচ্ছা।

আমি একটু নিচে যাব। একা একা হাঁটব।

কেন?

অপলা চোখ মুছে শান্ত গলায় বলল, বড়দের মাঝে মাঝে একা একা থাকতে ইচ্ছে করে।

রাত অনেক হয়েছে। ওসমান সাহেব মাথা নিচু করে লিখে যাচ্ছেন। টগর ঘুমিয়ে পড়েছে। রানু রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কী অপূর্ব জোছনার রাত উঠোনে একা একা দাঁড়িয়ে আছে অপলা। কী দেখছে সে? রানু একবার ভাবল নিচে নেমে যাবে, অপলার হাত ধরে বলবে, কাঁদছিস কেন বোকা মেয়ে? কিন্তু সে তা করল না। তাকিয়ে রইল মাঠের দিকে। রানু ডাকল, অপলা! অপলা ফিরে তাকাল। চাঁদের আলোয় ভেজা কী সুন্দর একটি মুখ। তাঁকে ঘিরে জোছনা কেমন থর থর করে কাঁপছে। অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছে রানুর। সে আবার ডাকল, অপলা, অপলা!



# আকাশ জোড়া মেঘ

ছাপ্পান্ন মিনিট পার হল।

ফিরোজ বসে আছে। কারো কোনো খোঁজ নেই। ঘুমন্ত রাজপুরীর মতো অবস্থা। কোনো শব্দটব্দও পাওয়া যাচ্ছে না, যা থেকে ধারণা করা যায় এ-বাড়িতে জীবিত লোকজন আছে। সে যে এসেছে, এ-খবরটি ছাপ্পান্ন মিনিট আগে পাঠানো হয়েছে। বেঁটেখাটো একজন মহিলা বলে গেল আফা আসতাছে। ব্যস, এই পর্যন্তই। ফিরোজ অবশ্যই আশা করে না যে, সে আসামাত্র চারদিকে ছোটাছুটি পড়ে যাবে। বাড়ির কর্তা স্বয়ং নেমে আসবেন এবং 'এনাকে চা দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন?' বলে চেঁচামেচি শুরু করবেন। তবে এক ঘণ্টা শুধু শুধু বসে থাকতে হবে, এটাও আশা করে না। সময় এখনো এত সস্তা হয়নি।

'আপনি কী আমাকে ডাকছিলেন?'

পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ফিরোজ মনে-মনে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। চমৎকার মেয়েগুলি সব এমন-এমন জায়গায় থাকে যে, ইচ্ছা করলেই হুট করে এদের কাছে যাওয়া যায় না। দূর থেকে এদের দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে হয় এবং মনে মনে বলতে হয় আহা, এরা কি সুখেই না আছে!

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। সালামের মতো একটা ভঙ্গি করল। এটা করতে তার বেশ কষ্ট হল। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে এ-রকম সম্মানের সঙ্গে সালাম করার কোনো মানে হয়!

ফিরোজ বলল, 'আমি আপনার বাবার কাছে এসেছি।'

'বাবা তো দেশে নেই, আপনাকে কী এই কথা বলা হয়নি?'

'হয়েছে।'

'তাহলে?'

মেয়েটির চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। যেন কৈফিয়ত তলব করছে, কেন তাকে ডাকা হল। ফিরোজ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আপনার বাবা নেই বলেই আপনাকে খবর দিতে বলেছি। গল্পগুজব করার উদ্দেশ্যে খবর দেয়া হয়নি।'

অপালা পর্দা ছেড়ে ঘরের ভেতর ঢুকল। লোকটিকে চট করে রেগে যেতে দেখে তার বেশ মজা লাগছে। বয়স্ক মানুষেরা মাঝে-মাঝে খুবই ছেলেমানুষি করে।

'আপনার বাবা আমাকে কমিশন করেছেন বসার ঘরটি বদলে নতুন করে সাজিয়ে দিতে। এই সাজ তাঁর পছন্দ নয়।'

'আপনি কী একজন আর্টিস্ট?'

'না। আর্টিস্টরা মানুষের ঘর সাজায় না। তারা ছবি আঁকে। আমার কাজ হচ্ছে আপনাদের মতো পয়সাওয়ালাদের ঘর সাজিয়ে দেয়া।'

'বেশ, সাজিয়ে দিন।'

'আপনি জানেন তো, আপনার বাবা ড্রইংরুমটা বদলাতে চাচ্ছেন?'

'না, জানি না। বাবার মাথায় একেকটা খেয়াল হঠাৎ করে আসে, আবার হঠাৎ করে চলে যায়। আপনি বসুন।'

ফিরোজ বসল। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। এইসব পরিবারের মেয়েরা অসম্ভব অহঙ্কারী হয়। একজন হাউস ডেকোরেটরের সঙ্গে এরা বসবে না। এতে এদের সম্মানের হানি হবে।

'আমি ভাবছিলাম আজই কাজ শুরু করব।'

'করুন।'

'আপনার বাবা আমাকে টাকাপয়সা কিছু দিয়ে যাননি। জিনিসপত্র কিনতে আমার কিছু খরচ আছে।'

'আপাতত খরচ করতে থাকুন। বাবা এলে বিল করবেন।'

'এত টাকা তো আমার নেই। আপনি কী কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন?'

'আমি কী ব্যবস্থা করব?'

'আপনার বাবা বলেছিলেন, 'যে-কোনো প্রয়োজনে আপনাদের একজন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে  নিশানাথবাবু। কিন্তু তাঁর ঠিকানা আমাকে দিয়ে যাননি।'

'আপনি অপেক্ষা করুন, আমি ম্যানেজার কাকুকে খবর দিয়ে নিয়ে আসছি। আপনাকে কী ওরা চা দিয়েছে?'

'না।'

'চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'আপনার অসীম দয়া।'

অপালা হেসে ফেলল। অসীম দয়া বলার ভঙ্গির জন্যে হাসল, না অন্য কোনো কারণে, তা বোঝা গেল না। সে দোতলায় উঠে ম্যানেজার সাহেবকে টেলিফোনে আসতে বলল। নিশানাথবাবুকে এ-বাড়িতে সবাই ম্যানেজার ডাকে, তবে ম্যানেজারি ধরনের কোনো কাজ উনি করেননি। উনি বসেন মতিঝিল অফিসে। গুরুত্বহীন কাজগুলি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে করেন। টাটকা মাছ কেনার জন্যে প্রায়ই ভোররাতে দাউদকান্দি চলে যান। এই জাতীয় কাজে তাঁর সীমাহীন উৎসাহ।

অপালার টেলিফোন পেয়েই বললেন, 'এক্ষুণি চলে আসছি মা। এই ধর পাঁচ মিনিট। এর সঙ্গে আরো দু'মিনিট যোগ করে নাও, রাস্তাঘাটের অবস্থা তো বলা যায় না! ঠিক না মা?'

'তা তো ঠিকই।'

'এক মাইল চওড়া রাস্তা; এর মধ্যেও ট্রাফিক জ্যাম। দেশটার কী হচ্ছে, তুমি বল? একটা অনেস্ট অপিনিয়ন তুমি দাও...

নিশানাথবাবু বক-বক করতে লাগলেন। তিনি দশ মিনিটের আগে টেলিফোন ছাড়বেন না। কথার বিষয় একটাই  দেশ রসাতলে যাচ্ছে। মুক্তির কোনো পথ নেই। দেশের সব ক'টা মানুষকে বঙ্গোপসাগরে চুবিয়ে আনতে পারলে একটা কাজের কাজ হত ইত্যাদি।

অপালা রিসিভার কানে নিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল কখন বলা যাবে, কাকা, টেলিফোন রাখলাম।

ফিরোজ ভেবেছিল একটি খুব সুদৃশ্য কাপে এক কাপ চা-ই শুধু আসবে। অন্য কিছুই থাকবে না। অসম্ভব বড়লোকরা এককথার মানুষ  যখন চায়ের কথা বলেন তখন শুধু চা-ই আসে, অন্য কিছু আসে না। অথচ প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। ভোর সাতটায় পরোটা-ভাজি খাওয়া হয়েছিল, এখন বারটা দশ। খিদেয় নাড়ি পাক দিয়ে উঠছে। মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে এতটা হৃদয়হীন হবে না। সঙ্গে কিছু-না-কিছু থাকবে। এদের ফ্রিজ খাবারদাবারে সবসময় ভর্তি থাকে। চট করে চমৎকার একটা স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেয়া এদের কাছে ছেলেখেলা। দু'টি রুটির মাঝখানে কয়েক টুকরো পনির, শসার কুচি, এক চাকা টমেটো। ফ্রেঞ্চ ড্রেসিং-এর আধচামচ। গোলমরিচের গুঁড়ো। চমৎকার!

কাজের মেয়েটি ট্রে নিয়ে ঢুকল। যা ভাবা গিয়েছে তাই। সুদৃশ্য কাপে চা এবং রুপোর একটা গ্লাসে এক গ্লাস হিমশীতল পানি। খিদে নষ্ট করার জন্যে ফিরোজ সিগারেট ধরাল। সেন্ট্রাল টেবিলে চমৎকার একটি অ্যাশট্রে। নিশ্চয়ই অনেক টাকা খরচ করে কেনা। একটি পরী নিচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরীটির গা থেকে কাপড় খুলে যাচ্ছে। সে কাপড় সামলাতে ব্যস্ত। অগোছালো কাপড়ের কারণে লজ্জায় তার গাল রক্তিম। এ-জাতীয় অ্যাশট্রেগুলিতে কেউ ছাই ফেলে না। এতটা দুঃসাহস কারো নেই। ফিরোজ ছাই দিয়ে সেটা মাখামাখি করে ফেলল। তার খুব ইচ্ছা করছে উঠে যাবার সময় এদের কোনো একটা ক্ষতি করতে। কার্পেটের খানিকটা সিগারেটের আগুনে পুড়িয়ে দেয়া, কাপটা ভেঙে ফেলা। এ-রকম ইচ্ছা তার প্রায়ই হয়।

ম্যানেজার নামক জীবটির এখনো কেন দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েটি খবর দিয়েছে কী না কে জানে! নিজের ঘরে গিয়ে হয়ত গান শুনছে কিংবা ভিসিআর-এ 'আকালের সন্ধানে' চালু করে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের চিন্তায় মগ্ন।

ফিরোজ কাপ হাতে নিয়ে জানালার পাশে এসে দাঁড়াল। ছাগল-দাড়ির এক লোক দু'টি অ্যালসেশিয়ানকে গোসল দিচ্ছে। সাবান দিয়ে হেভি ডলাডলি। কুকুর দু'টি বেশ আরাম পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। নড়াচড়া করছে না। লোকটি কুকুর দু'টির সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় কথা বলছে। কাম

কাম, সিট ডাউন, নটি বয়, বি কোয়ায়েট জাতীয় শব্দ শোনা যাচ্ছে। কুকুররা বিদেশী ভাষা এত ভাল বোঝে কেন কে জানে! দেশী ঘিয়ে ভাজা কুত্তাকেও 'কাম হিয়ার' বললে কুঁই-কুঁই করে এগিয়ে আসে। ফিরোজের বাথরুম পেয়ে গেল। কোনো বাড়িতে গিয়ে ফট করে বলা যায় না ভাই, আপনাদের বাথরুম কোথায়? মালদার পার্টিদের ড্রইংরুমের পাশেই ব্যবস্থা থাকে। এখানে নেই। ড্রইং রুম নাম দিয়ে কুৎসিত একটা জিনিস বানিয়ে রেখেছে। ছাদ পর্যন্ত উঁচু শো-কেসে রাজ্যের জিনিস। যেন একটা মিউজিয়াম। পয়সার সঙ্গে-সঙ্গে রুচি বলে একটা বস্তু নাকি চলে আসে। ডাহা মিথ্যে কথা। এই জিনিস সঙ্গে নিয়ে জন্মাতে হয়।

একটা পাঁচ বাজে। ম্যানেজার বাবুর দেখা নেই। ফিরোজের উচিত স্লামালিকুম বলে উঠে যাওয়া। স্লামালিকুম বলারও কেউ নেই। অহঙ্কারী মেয়েটি এ-ঘরে আর ঢোকেনি। হয়তো ভেবেছে এ-ঘরে ঢুকলেই থার্ড রেট একটি ছেলের সঙ্গে প্রেম হয়ে যাবে। আরে বাবা, প্রেম এত সস্তা নয়! হুট করে হয় না! হুট করে প্রেম হয় কনজারভেটিভ ফ্যামিলিগুলিতে। ঐ সব ফ্যামিলির মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে মিশতে পারে না, হঠাৎ যদি সুযোগ ঘটে যায় তাহলেই বড়শিতে আটকে গেল। উপরতলার মেয়েদের এই সমস্যা নেই। কত ধরনের ছেলের সঙ্গে মিশছে!

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। শো-কেসটির সামনে কিছুক্ষণ কাটানো যায়। ভদ্রলোক দেশ-বিদেশে ঘুরে এত সব জিনিস এনেছেন, কেউ একজন দেখুক। এই বাড়িতে যারা বেড়াতে আসে তাদের শো-কেসও এ-রকম জিনিসে ভর্তি। এরা নিশ্চয়ই দেখার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ বোধ করে না। আর থাকা যায় না, চলে যাওয়া উচিত। ডেকোরেশনের ফার্মটা তার হলে এতক্ষণে চলেই যেত। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, ফার্মটা তার নয়। একদিন যে এ-রকম একটা ফার্ম তার হবে, সে-রকম কোনো নমুনাও বোঝা যাচ্ছে না।

ম্যানেজার বাবু ঠিক দেড়টার সময় এলেন। ফিরোজ প্রথম যে-কথাটি বলল, তা হচ্ছে বাথরুমটা কোথায়, আপনার কী জানা আছে?

অনেকক্ষণ থেকেই টেলিফোন বাজছে।

অপালা বারান্দায় ছিল, শুনতে পায়নি। ঘরের দিকে রওনা হওয়ামাত্র শুনল। টেলিফোন বেজেই যাচ্ছে, আহা না জানি কে! টেলিফোনের রিং হলেই অপালার কেন জানি মনে হয়, কেউ ব্যাকুল হয়ে ডাকছে। তার খুব একটা বড় সমস্যা। এই মুহূর্তেই তার কথা শোনা দরকার। এক বার সত্যি-সত্যি হলও তাই। রিসিভার তুলতেই ভারি মিষ্টি গলায় একটি মেয়ে বলল, 'সালাম ভাইকে কী একটু ডেকে দেবেন? আমার খুব বিপদ।'

অপালা বলল, 'সালাম ভাই কে?'

'আপনাদের একতলায় থাকে। প্লিজ, আপনার পায়ে পড়ি।'

'আমাদের একতলায় তো সালাম বলে কেউ থাকে না।'

'তাহলে এখন আমি কী করব?'

বলতে-বলতে সত্যি-সত্যি মেয়েটি কেঁদে ফেলল। অপালা নরম স্বরে বলল, 'আপনার রঙ নাম্বার হয়েছে, আবার করুন, পেয়ে যাবেন। আমি রিসিভার উঠিয়ে রাখছি, তাহলে আর এই নাম্বারে চলে আসবে না।'

মেয়েটি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'নাম্বার ঠিক হলেও লাভ হবে না। ওরা ডেকে দেয় না।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। শুধু যূঁথী বলে একটা মেয়ে আছে, ও ডেকে দেয়। কে জানে, আজ হয়তো যূঁথী নেই।'

'থাকতেও তো পারে, আপনি করে দেখুন।'

'আমাকে আপনি-আপনি করে বলছেন কেন? আমি মাত্র ক্লাস টেনে উঠেছে। আমাকে তুমি করে বলবেন।'

মেয়েটার সঙ্গে তুমি-তুমি করে কথা বলার আর সুযোগ হয়নি। তার টেলিফোন নাম্বার জানা নেই। মেয়েটিও অপালার নাম্বার জানে না। রঙ নাম্বারের একটি ব্যাপারে অল্প পরিচয়। কত দিন হয়ে গেল, এখনও সেই মিষ্টি গলার স্বর অপালার কানে লেগে আছে। টেলিফোন বেজে উঠলেই মনে হয়, ঐ মেয়েটি নয়ত?

না, ঐ মেয়ে না। সিঙ্গাপুর থেকে অপালার বাবা ফখরুদ্দিন টেলিফোন করেছেন।

'কেমন আছ মা?'

'খুব ভাল।'

'তোমার মা'র কোনো চিঠি পেয়েছ?'

'আজ সকালেই একটি পেয়েছি। মা এখন প্রায় সুস্থ।'

'সেকেন্ড অপারেশনের ডেট পড়েছে?'

'সে-সব কিছু তো লেখেননি।'

'এই মহিলা প্রয়োজনীয় কথাগুলি কখনো লেখে না। তুমি সন্ধ্যা সাতটা-সাড়ে সাতটার দিকে টেলিফোন করে জেনে নিও। এখানে সন্ধ্যা সাতটা মানে লন্ডনে ভোর ছয়টা।'

'আচ্ছা, আমি করব।'

'খুব একা-একা লাগছে নাকি?'

'না, লাগছে না। তুমি আসছ কবে?'

'আরো দু'দিন দেরি হবে। কোনো খবর আছে?'

'না, কোনো খবর নেই।'

'বসার ঘরটা নতুন করে সাজাতে বলে গিয়েছিলাম। কিছু হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, হচ্ছে। ভীষণ রোগা আর লম্বা একটা ছেলে রোজ এসে কি সব যেন করছে। তার সাথে মিস্ত্রি-টিস্ত্রিও আছে।'

'কাজকর্ম কত দূর এগোচ্ছে?'

'তা তো জানি না বাবা! আমি নিচে বিশেষ যাই না।'

'একটু বলে দিও তো, যাতে আমি আসার আগে-আগে কমপ্লিট হয়ে থাকে।'

'আমি এক্ষুণি বলছি।'

'আর শোন, তোমার মাকে কিছু জানিও না। সে এসে সারপ্রাইজড হবে।'

'আচ্ছ।'

'ঐ ছেলেটার নাম কী?'

'কোন ছেলেটার?'

'কাজ করছে যে।'

'নাম তো বাবা জানি না। জিজ্ঞেস করিনি। নাম দিয়ে তোমার কী দরকার?'

'কোনো দরকার নেই। মতিন বলে একটা ছেলেকে দিতে বলেছিলাম। ওর কাজ ভাল। কিন্তু তুমি তো বলছ রোগা, লম্বা। ঐ ছেলে তো তেমন লম্বা নয়।'

'আমি নাম জিজ্ঞেস করব। যদি দেখি ও মতিন নয়, তাহলে কী করব?'

'কাজ বন্ধ রাখতে বলবে। আমি স্পেসিফিক্যালি বলেছি মতিনের কথা। তোমার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে মা?'

'ভাল হচ্ছে না।'

'খুব বেশি খারাপ হচ্ছে?'

'কেমন যেন মাঝামাঝি হচ্ছে! মাঝামাঝি কোনো কিছুই আমার ভাল লাগে না।'

ফখরুদ্দিন সাহেব উঁচু গলায় হাসতে লাগলেন। অপালার এই কথায় হঠাৎ করে তিনি খুব মজা পেলেন।

'আচ্ছা মা, রাখলাম।'

'তুমি ভালো আছ তো বাবা?'

'অসম্ভব ভালো আছি। খোদা হাফেজ।'

অপালা নিচে নেমে এল। ঐ ভদ্রলোক বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আছেন। তার সঙ্গে দুজন লোক করাত দিয়ে কাঠ টুকরো করছে। অপালা বসার ঘরে উঁকি দিল। সমস্ত ঘর লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। পেইনটিংগুলি নামিয়ে রাখা হয়েছে, শো-কেসটি নেই। কার্পেট ভাঁজ করে এক কোণায় রাখা। অপালা বলল, 'আপনি কেমন আছেন?'

ফিরোজ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, আপনাকেই। আপনার নাম কী মতিন?'

'আমার নাম মতিন হবে কী জন্যে? আমার নাম ফিরোজ।'

'আপনার নাম ফিরোজ হলে বড়ো রকমের সমস্যা— কাজ বন্ধ।'

'কাজ বন্ধ মানে?'

'কাজ বন্ধ মানে হচ্ছে আপনি আপনার জিনিসপত্র গুছিয়ে বাড়ি চলে যাবেন।'

ফিরোজের মুখ হাঁ হয়ে গেল। যেন এমন অদ্ভুত কথা এর আগে সে শোনেনি। অপালা হেসে ফেলল। সে অবশ্যি হাসি মুহূর্তের মধ্যেই সামলে ফেলল। শান্ত গলায় বলল, 'বাবা টেলিফোনে বললেন, মতিন নামের একজনের নাকি কাজটা করার কথা।'

'কিন্তু আমি তো ঠিক তার মতোই করছি।'

'আপনি করলে হবে না।'

'মতিন এখন ছুটিতে আছে। তার বড়ো বোনের অসুখ। বরিশাল গেছে।'

'বরিশাল থেকে ফিরে এলে আবার না-হয় করবেন।'

ফিরোজ সিগারেট ধরাল। মেয়েটির কথা তার এখন বিশ্বাস হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সে ঠাট্টা করছে। যদি ঠাট্টা না হয়, তাহলে তার জন্যে বড়ো ধরনের ঝামেলা অপেক্ষা করছে। এই কাজটি সে জোর করে হাতে নিয়েছে। করিম সাহেবকে বলেছে, 'কোনো অসুবিধা নেই, মতিনের চেয়ে কাজ খারাপ হবে না।' করিম সাহেব বিরক্ত হয়ে বলেছেন, 'আরে না। ভদ্রলোক মতিনের কথা বলেছেন।'

'আমি নিজে তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। সে বলেছে, আমি করলেও চলবে। কাজ ভাল হলেই চলবে।'

'দেখেন, পরে আবার ঝামেলা না হয়। বড়লোকের কারবার। মুডের ওপর চলে। মাঝখানে যদি বন্ধ করে দেয়....'

'পাগল হয়েছেন! কাজ দেখে চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।'

এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে ফিরোজেরই চোখ ট্যারা হয়ে যাবার জোগাড়। বি. করিম লোকটি মহা ত্যাঁদড়। হয়তো বলে বসবে, 'ফিরোজ সাহেব, এই ফার্মে আপনার কাজ ঠিক পোষাচ্ছে না। দু'দিন পর-পর ফার্মকে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে ফেলছেন। আপনি ভাই অন্য পথ দেখুন।'

করিম সাহেবের পক্ষে এটা বলা মোটেই অস্বাভাবিক নয়, বরং খুবই স্বাভাবিক। ব্যাটা অনেকদিন থেকেই সুযোগ খুঁজছে। মাঝে-মাঝে ইশারা-ইঙ্গিতও করছে। গত সপ্তাহে বেতনের দিন বলল, 'খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হয়ে গেছে। কাজের চেয়ে মানুষ বেশি। বার হাত কাঁকুড়ের আঠার হাত বিচি।

ফিরোজ আধ-খাওয়া সিগারেট ফেলে দিয়ে অপালার দিকে তাকাল। অপালা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখ হাসি-হাসি। মনে হচ্ছে কায়দা করে এই মেয়েটিকে রাজি করিয়ে ফেলা যাবে। উনিশ-কুড়ি বছর বয়সী মেয়েদের মন তরল অবস্থায় থাকে। দুঃখ-কষ্টের কথা বললে সহজেই কাবু হয়ে যায়। মুশকিল হচ্ছে বলাটাই। এই বয়সী মেয়েদের সঙ্গে ভিখিরির গলার স্বরে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। তাতে নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়।

'আমি বরং কাজটা শেষ করি। আমার ধারণা, আপনার বাবা যখন দেখবেন একটা চমৎকার কাজ হয়েছে... মানে চমৎকার যে হবে এই সম্পর্কে..'

অপালা হাসি মুখে বলল, 'না।'

ফিরোজ স্তম্ভিত। হাসিমুখে কাউকে না বলা যায়।

'এইভাবে আমি যদি চলে যাই তাহলে আমার নিজের খুব অসুবিধা হবে। চাকরিটা হয়ত থাকবে না। আপনি আপনার বাবাকে বুঝিয়ে বলতে পারেন। আমার ধারণা, আপনার কথা উনি শুনবেন।'

'আপনার ধারণা ঠিক নয়।'

এই বাজারে আমার চাকরি নিয়ে সমস্যা হলে কী যে অসুবিধায় পড়ব, আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন না। আপনাদের বোঝার কথাও নয়। নিজ থেকে বলতে আমার খুবই লজ্জা লাগছে....'

অপালা মৃদু স্বরে বলল, 'যাবার আগে ঘরটা আগের মতো করে যাবেন। এ-রকম এলোমেলো ঘর দেখলে বাবা খুব রাগ করবেন।'

ফিরোজ দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। তার সঙ্গের লোক দু'টি চিন্তিত মুখে জিরোজের দিকে

তাকাচ্ছে। ফিরোজ নিচু গলায় বলল, 'যাও, ঘরটা গুছিয়ে ফেল।'

অপালা চলে যাচ্ছে। ফিরোজের গা জ্বালা করছে, মেয়েটি এক বার বলল না- সরি। মানবিক ব্যাপারগুলি কী উঠেই যাচ্ছে? গল্প-উপন্যাস হলে এই জায়গায় মেয়েটির চোখে পানি এসে যেত। সে ধরা গলায় বলত – আমার কিচ্ছু করার নেই। ফিরোজ ভাই। আমার বাবাকে তো আপনি চেনেন না – একটা অমানুষ!

ফিরোজ বলত, তুমি মন খারাপ করো না? তোমার মন খারাপ হলে আমারও মন খারাপ হয়। এই বলে সে উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকত।

কিন্তু জীবন গল্প-উপন্যাস নয়। জীবনে কুৎসিত সব ব্যাপারগুলি সহজভাবে ঘটে যায়। অপরূপ রূপবতী একটি মেয়ে হাসতে-হাসতে কঠিন-কঠিন কথা বলে।

'চা নিন।'

ফিরোজ দেখল, কাজেব মেয়েটি ট্রেতে করে এক কাপ চা নিয়ে এসেছে। ফিরোজ ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'চা কেন?'

'আপা দিতে বললেন।'

তার এক বার ইচ্ছা হল বলে- চা খাব না। কিন্তু এ-রকম বলার কোনো মানে হয় না। শীতের সকালবেলা এক কাপ চা মন্দ লাগবে না। সে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল। চা খাওয়া শেষ হলে আছাড় দিয়ে কাপটা ভেঙে ফেললেই হবে।

বি. করিম সাহেব বেশ কিছুক্ষণ মুখ ছুঁচালো করে রাখলেন।

চেঁচামেচি হৈচৈ কিছুই করলেন না। কবলে ভাল হত। স্টিম বের হয়ে যেত। স্টিম বেব হল না- এর ফল মারাত্মক হতে পারে। ফিরোজ ফলাফলেব অপেক্ষা কবছে। তার মুখ দার্শনিকেব মত। যা হবার হবে এই রকম একটা ভাব।

'ফিরোজ সাহেব।'

'জি।'

'হাজার পাঁচেক টাকার ক্ষতি হয়ে গেল, কী বলেন?'

'ক্ষতি হবে কেন? মতিন এইগুলি দিয়েই কাজ করবে।'

'পাগল, মতিন এই সব ছোঁবে? সে সব কিছু আবার নতুন কবে করাবে।'

'তা অবশ্যি ঠিক।'

'বেকায়দা অবস্থা হয়ে গেল ফিরোজ সাহেব।'

'তা খানিকটা হল।'

'আপনাকে আগেই বলেছিলাম, যাবেন না। কথা শুনলেন না। রক্ত গবম, কারো কথা কানে নেন না।'

'রক্ত এক সময় গরম ছিল, এখন ঠাণ্ডা মেরে গেছে।'

'আমার যা সবচেয়ে খারাপ লাগছে তা হচ্ছে, আপনি আমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলেছেন। আপনি বলেছিলেন, ফখরুদ্দিন সাহেবের মেয়েব সঙ্গে কথা হযেছে। আপনার কথার ওপর ভরসা করে...'

করিম সাহেব বাক্য শেষ করলেন না। পেনসিল চাঁছতে শুরু করলেন। এটি খুব অশুভ লক্ষণ। পেনসিল চাঁছা শেষ হওয়ামাত্র বুলেটের মতো কিছু কঠিন বাক্য বের হবে। তার ফল সদূরপ্রসারী হতে পারে।

'ফিরোজ সাহেব।'

'জি।'

'আপনি বরং সিনেমা লাইনে চলে যান।'

'অভিনয় করার কথা বলছেন?'

'আরে না! অভিনয়ের কথা বলব কেন? সেট-টেট তৈরি করবেন। আপনি ক্রিয়েটিভ লোক, অল্প সময়েই নাম করবেন। জাতীয় পুরস্কার একবার পেয়ে গেলে দেখবেন কাঁচা পয়সা আসছে।'

ফিরোজ মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। কাঁচা পয়সা জিনিসটা কী, কে জানে? পয়াসার কাঁচা-পাকা নেই। পয়সা হচ্ছে পয়সা।'

'ফিরোজ সাহেব।'

'জি।'

'ঐ করুন।'

'সিনেমা লাইনে চলে যেতে বলছেন?'

'হ্যাঁ। আমরা বড়-বড় কাজটাজ পেলে আপনাকে ডাকব তো বটেই। আপনি হচ্ছেন খুবই ডিপেন্ডেবল। এটা আমি সব সময় স্বীকার করি।'

'শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। আগে জানতাম না।'

'সিনেমা লাইনের লোকজন আপনাকে লুফে নেবে।'

'কেন বলুন তো?'

'সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, আপনার আর্ট কলেজের ডিগ্রি নেই। ডিগ্রিধারী কাউকে এরা নিতে চায় না। ওদের তেল বেশি থাকে। ডিরেক্টরের ওপর মাতব্বরি করতে চায়। আপনি তা করবেন না।'

'ডিগ্রি না-থাকার তো বিরাট সুবিধা দেখছি! এই ফার্মের চাকরি কী আমার শেষ?'

করিম সাহেব কথার উত্তর দিলেন না। তাঁর পেনসিল চাঁছা শেষ হয়েছে। তিনি সেই পেনসিলে কী যেন লিখতে শুরু করেছেন। ফিরোজ হাই তুলে বলল, 'আপনি কী আমাকে আরো কিছু বলবেন, না আমি উঠব?'

'আমার পরিচিত একজন ডিরেক্টর আছে। তার কাছে আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। চিঠি নিয়ে দেখা করুন, একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'আপনি তো দেখছি রীতিমত মহাপুরুষ ব্যক্তি! চিঠিটা পেনসিলে না লিখে দয়া করে কলম দিয়ে লিখুন।'

'ইচ্ছা করেই পেনসিল দিয়ে লিখছি। পেনসিলের চিঠিতে একটা পারসোনাল টাচ থাকে, যে-জিনিসটা টাইপ– করা চিঠিতে বা কলমের লেখায় থাকে না।'

'গুড। এটা জানতাম না। এখন থেকে যাবতীয় প্রেমপত্র পেনসিলে লিখব।'

ডিরেক্টর সাহেবের বাসা কল্যাণপুর। সারা দুপুর খুঁজে সেই বাড়ি বের করতে হলো। ডিরেক্টর সাহেবকে পাওয়া গেল না। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বাড়িওয়ালার কাছে জানা গেল, ডিরেক্টর সাহেব ছ'মাসের বাড়ি-ভাড়া বাকি ফেলে চলে গেছেন। শুধু তাই নয়, যাবার সময় বাথরুমের দুটি কমোড হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে ভেঙেছেন।'

ফিরোজ চোখ কপালে তুলে বলল, 'বলেন কী!'

'ফিল্ম লাইনের লোক। বাড়ি-ভাড়া দেয়াই উচিত হয়নি। আপনি তার কে হন?'

'আমি কেউ হই না। আমিও একজন পাওনাদার।'

'কত টাকা গেছে?'

'প্রায় হাজার দশেক।'

'ঐ টাকার আশা ছেড়ে দিন। ঐ টা আর পাবেন? টাকা এবং স্ত্রী - এই দুই জিনিস হাতাছাড়া হলে আর পাওয়া যায় না।'

ফিরোজ প্রায় বলেই বসছিল– আপনার স্ত্রীও কী তাঁর সাথে ভ্যানিশ হয়েছেন? শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল। এখন রসিকতা করতে ইচ্ছা করছে না। সে ক্লান্ত স্বরে বলল, 'এক গ্লাস পানি খাওয়াতে পারেন?'

'নিশ্চয়ই পারি। আসুন, ভেতরে এসে বসুন। এত মন-খারাপ করবেন না। কী করবেন বলুন, দেশ ভরে গেছে জোচ্চোরে। আমার মত পুরনো লোক মানুষ চিনতে পারে না, আর আপনি হচ্ছেন দুধের ছেলে!'

শুধু পানি নয়। পানির সঙ্গে সন্দেশ ও লুচি চলে এল। ভদ্রলোকের স্ত্রী পর্দার ও-পাশে থেকে উঁকি দিচ্ছেন। দেখছেন। দেখছেন কৌতূহলী চোখে।

ভদ্রলোক ফুর্তির স্বরে বললেন, 'এই ছেলের কথাই তোমাকে বলছিলাম। একে ফতুর করে দিয়ে গেছে। কী-রকম অবস্থা একটু দেখ। হায়রে দুনিয়া!'

দশ মিনিটের ভেতর এই পরিবারটির সঙ্গে ফিরোজের চূড়ান্ত খাতির হয়ে গেল। ভদ্রলোক

এক পর্যায়ে বললেন, 'দুপুরবেলা ঘোরাঘুরি করে লাভ নেই। হাত-মুখ ধুয়ে ভাত খেয়ে ফেল। বড়-বড় পাবদা মাছ আছে।'

ফিরোজের চোখ প্রায় ভিজে উঠল। এই জীবনে সে অনেকবারই অযাচিত ভালবাসা পেয়েছে। এই জাতীয় ভালবাসা মন খারাপ করিয়ে দেয়।

অপলার মা হেলেনা প্রথমে লন্ডনের সেন্ট লিউক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তাঁর হার্টের একটি ড্যামেজড ভাল্ব এখানেই রিপেয়ার করা হয়। রিপেয়ারের কাজটি তেমন ভাল হয়নি। ডাক্তাররা এক মাস পর আর একটি অপারেশন করতে চাইলেন। তবে এও বললেন যে, অপারেশন নাও লাগতে পারে। তবে এই মুহূর্তে বলা হচ্ছে না। এক মাস অবজারভেশনে রাখতেই হবে।

ফখরুদ্দিন সাহেব লন্ডনের সাবার্বে লাল ইটের ছোটখাটো একটি নার্সিং হোম খুঁজে বের করলেন। এই হাসপাতালটি ঘরোয়া ধরনের। সবার প্রাণপণ চেষ্টা, যেন হাসপাতাল মনে হয় না। কিছু অংশে তারা সফল। চট করে এটাকে হাসপাতাল মনে হয় না। তবে তার জন্যে রুগীদের প্রচুর টাকা দিতে হয়। এখানে বড় হাসপাতালের খরচের দেড়গুণ বেশি খরচ হয়। টাকাটাও আগেভাগেই দিতে হয়। ভালই লাগে। ফখরুদ্দিন সাহেব নিজে যখন দরিদ্র, তখনো তাঁর এই স্বভাব ছিল। পড়াশোনার খরচ দিতেন বড়মামা। তাঁর অবস্থা নড়বড়ে ছিল, তবু তিনি মাসের তিন তারিখে একটা মানিঅর্ডার পাঠাতেন। প্রায়ই এমন হয়েছে, মাসের ছ'তারিখেই সব শেষ। তখন ছোটাছুটি দৌড়াদৌড়ি। ফখরুদ্দিন সাহেবের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল একটিই প্রচুর টাকা রোজগার করা, যাতে দু'হাতে খরচ করেও শেষ করা না যায়। ফখরুদ্দিন সাহেবের মেধা ছিল। ভাগ্যও প্রসন্ন ছিল। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ব্যবসা জমিয়ে ফেললেন। চারদিক থেকে টাকা আসতে শুরু করল। বিয়ে করলেন সাঁইত্রিশ বছর বয়সে। বাসর রাতে স্ত্রীকে বললেন, 'টাকাপয়সা তোমার কাছে কেমন লাগে?'

হেলেনার বয়স তখন মাত্র সতের। আই.এ পরীক্ষা দিয়ে বড় ফুপার বাড়ি বেড়াতে গিয়েছে। সেখানেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিয়ে। বাসর রাতে টাকা প্রসঙ্গে স্বামীর এই অদ্ভুত প্রশ্নের সে কোনো আগামাথা পেল না। সে চুপ করে রইল। ফখরুদ্দিন সাহেব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই হচ্ছে - টু বিকাম রিচ। ভেরি রিচ। টাটা-বিড়ালদের মত। তোমার কি ধারণা, আমি পারব?'

হেলেনা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার কেন জানি মনে হতে লাগল, এই লোকটি ঠিক সুস্থ নয়। সুস্থ মানুষ বিয়ের প্রথম রাত্রে স্ত্রীকে নিশ্চয়ই এ জাতীয় কথা বলে না।

'বুঝলে হেলেনা, আমার মনে হয় আমি পারব। আমি খুব দ্রুত ভাবতে পারি। ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দেখতে পাই। এটা মেজর এ্যাডভানটেজ। অন্যরা যা আজ চিন্তা করে, আমি সেটা দু'বছর আগেই চিন্তা করে রেখেছি।'

হেলেনার বিয়ে হয়েছিল শ্রাবণ মাসে। হুট করে বিয়ে। আত্মীয়স্বজন দূরের কথা, নিজের মা পর্যন্ত খবর জানেন না। টেলিগ্রাম করা হয়েছে, এখনো হয়তো পৌঁছেনি। ঘটনার আকস্মিকতা, বিয়ের উত্তেজনায় এমনিতেই হেলেনার মাথার ঠিক নেই, তার ওপর লোকটি ক্রমাগত কী-সব বলে যাচ্ছে!

'হেলেনা।'

'জি।'

'আমি আজ কিঞ্চিৎ মদ্যপান করেছি, যেটা আমি কখনো করি না। আজ বাধ্য হয়ে নার্ভ স্টেডি রাখার জন্যে করতে হল। তুমি সম্ভবত গন্ধ পাচ্ছ।'

হেলেনা কোনো গন্ধটন্ধ পাচ্ছিল না। এখন পেতে শুরু করল। তার ইচ্ছে করল চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে।

'এই পৃথিবীতে আমি মোটামুটিভাবে একা। মানুষ করেছেন বড়মামা। তাঁর সঙ্গে কিছুদিন আগে বিরাট একটা ঝগড়া হয়েছে। আজ তোমাকে বলব না, পরে বলব। আজ বরং আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলি তোমাকে বলি।'

ঝুম-ঝুম করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। খোলা জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। ফখরুদ্দিন সাহেব হাতে সিগারেট ধরিয়ে চক্রাকারে হাঁটছেন এবং কথা বলছেন। সিগারেটের ধোঁয়ায় হেলেনার

দম বন্ধ হবার জোগাড়। লোকটি একটির পর একটি সিগারেট ধরাচ্ছে। পুরোটা টানছে না, কয়েকটি টান দিয়েই ফেলে দিচ্ছে। হেলেনার ভয় ভয় করতে লাগল। এ-কেমন ছেলে! কার সঙ্গে তার বিয়ে হল?

'এখনকার ট্রেন্ডটা হচ্ছে কি, জান? চট করে ইন্ডাসট্রি দিয়ে দেয়া। এতে সমাজে প্রেস্টিজ পাওয়া যায়। লোকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। কিন্তু এসব ইন্ডাস্ট্রি শেষপর্যন্ত হাতিপোষার মতো হয়। হাতির খাবার জোগাতে গিয়ে প্রাণান্ত। বুঝতে পারছ, কী বলছি?

'না।'

'র মেটিরিঅ্যাল নিয়ে কেউ চিন্তা করে না। ইন্ডাস্ট্রির খাবার হচ্ছে র মেটিরিঅ্যাল, যার প্রায় সবই আনতে হয় বাইরে থেকে। আমি তা করব না। আমি যখন কোনো ইন্ডাস্ট্রি দেব তার প্রতিটি ব মেটেবিঅ্যাল তৈরি করব আমি নিজে।'

হেলেনা হাই তুলল। ফখরুদ্দিন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, 'তোমার ঘুম পাচ্ছে নাকি?'

'না।'

'শুধু ব্যবসা নিয়ে কথা বলছি বলে কী বিরক্তি লাগছে?'

'না।'

'টাকা খুব ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস, বুঝলে হেলেনা। যে-সোসাইটির দিকে আমরা যাচ্ছি, সেই সোসাইটির ঈশ্বর হচ্ছে টাকা। একটা সময় আসবে, যখন তুমি টাকা দিয়ে সব কিনতে পারবে। সুখ, শান্তি, ভালবাসা সব।'

হেলেনা দ্বিতীয় বার হাই তুলল। ফখরুদ্দিন সেই হাই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বলেন, 'খুব বেশি দূব তোমাকে যেতে হবে না। আজকের কথাই ধর। তোমার যদি প্রচুর টাকা থাকে, তাহলে তুমি সেই টাকায় বেহেশতে নিজের জন্যে একটা জায়গার ব্যবস্থা করতে পার।'

'কীভাবে?'

'টাকা খরচ করে হাসপাতাল দেবে, স্কুল-কলেজ দেবে, এতিমখানা বানাবে, লঙ্গরখানা বসাবে। এতে পুণ্য হবে। সেই পুণ্যেব বলে বেহেশত। কাজেই টাকা দিয়ে তুমি পরকালের জন্যে ব্যবস্থা কবে ফেললে, যে-ব্যবস্থা একজন ভিখিরি করতে পাববে না। ইহকালে সে ভিক্ষা করেছে, পরকালেও সে নবকে পচবে কারণ তাব টাকা নেই। হা হা হা।'

তাঁব হাসি আর থামেই না। মাঝে-মাঝে একটু কমে, তাব পরই আবার উদ্দাম গতিতে শুরু হয। হেলেনা ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়াল। বন্ধ দরজার পাশে বাড়ির মেযেরা এসে দাঁড়িযেছে। তাদের একজন দবজায় ধাক্কা দিলে বলল, 'কী হযেছে?'

ফখরুদ্দিন সাহেব হাসতে-হাসতেই বললেন, 'নাথিং। এ্যাবসলুটলি নাথিং। পানি খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। ব্রিং মি সাম ওয়াটার।'

হেলেনা হাপাতালেব বেডে শুযে পুরনো কথা ভাবেন।

স্মৃতি বোমন্থনেব জন্যে নয়, সময কাটানোর জন্যে। বইপত্র ম্যাগাজিন স্তূপ হযে আছে। বেশিক্ষণ এ-সব দেখতে ভাল লাগে না। টিভির অনুষ্ঠানও একনাগাড়ে দেখা যায় না। কথাবার্তা বোঝা যায় না। সবাই কেমন ধমক দেয়ার মত করে ইংরেজি বলে। পুরোটাও বলে না। অর্ধেক গলাব মধ্যেই আটকে রাখে। যেন কথাগুলি নিযে গার্গল কবছে।'

'হেলেন।'

তিনি তাকালেন। স্ট্রিমার মেরি এসে দাঁড়িয়েছে। এরা সবাই তাঁকে হেলেন ডাকে, যদিও তিনি অনেক বার বলেছেন, তাঁর নাম হেলেনা হেলেন নয়।

'তোমার একটি টেলিফোন এসেছে। কানেকশন এ-ঘরে দেয়া যাচ্ছে না। টেলিফোন সেটটায় গণ্ডগোল আছে। তুমি কী কষ্ট করে একটু আসবে?'

'নিশ্চয়ই আসব।'

তিনি বিছানা থেকে নামলেন। এই হাসপাতালে সিস্টার মেরিই একমাত্র ব্যক্তি, যার প্রতিটি কথা তিনি বুঝতে পারেন। এই মহিলার গলার স্বরও সুন্দর। শুনতে ইচ্ছে করে। সে কথাও বলে একটু টেনে-টেনে।

টেলিফোন ঢাকা থেকে এসেছে। অপালার গলা।

'মা, কেমন আছ?'
'ভাল।'
'আমি কেমন আছি জিজ্ঞেস করলে না তো?'
'কেমন আছিস?'
'ভাল। আমার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে জিজ্ঞেস কর।'
'পরীক্ষা কেমন হচ্ছে?'
'ভাল না। মাঝারি ধরনের।'
'বলিস কি! তুই এমন সিরিয়াস ছাত্রী, তোর পরীক্ষা মাঝারি ধরনের হবে কেন?'
'এখন হলে আমি কী করব?'
'তুই কি আমার কথা ভেবে-ভেবে পরীক্ষা খারাপ করলি?'
'হতে পারে। তবে কনশাসলি ভাবি না। অবচেতন মনে হয়ত ভাবি।'
'সেটা বুঝলি কীভাবে?'
'প্রায়ই স্বপ্নে দেখি, তোমার অপারেশন হচ্ছে। অপারেশনের মাঝখানে ডাক্তাররা গণ্ডগোল করে ফেলল...এইসব আরকি।'
'সেকেন্ড অপারেশনটা আমার বোধহয় লাগবে না।'
'তাই নাকি! এত বড় একটা খবর তুমি এতক্ষণে দিলে?'
'এখনো সিওর না! ডাক্তাররা আরো কী-সব টেস্ট করবে।'
'কবে নাগাদ সিওর হবে?'
'এই সপ্তাহটা লাগবে। তোর বাবা কেমন আছে?'
'জানি না। ভালই আছে বোধহয়। একটা ভাল খবর দিতে পারি মা।'
'দিতে পারলে দে।'
'এখন থেকে ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হবে। বাবা সিঙ্গাপুর থেকে ইংল্যান্ড যাচ্ছে।'
'ভাল।'
'তুমি মনে হচ্ছে তেমন খুশি হওনি!'
'খুশি হয়েছি।'
'গলার স্বর কিন্তু কেমন শুকনো-শুকনো লাগছে।'
'এই বয়সে কি আর খুশিতে নেচে ওঠা ঠিক হবে?'
'খুশি হবার কোনো বয়স নেই মা, যে-কোনো বয়সে খুশি হওয়া যায়।'
'তা যায়।'
'তুমি বাবার সঙ্গে চলে এসো।'
'যদি সব ঠিকঠাক থাকে, তাহলে চলে আসব।'
'সব ঠিকঠাকই থাকবে।'
'থাকলেই ভাল।'
'মা, তোমার শরীর কি সত্যি-সত্যি সেরেছে?'
'হ্যাঁ।'
'কিন্তু এমন করে কথা বলছ কেন? যেন কোনো উৎসাহ পাচ্ছ না। একটু হাস তো মা।'
তিনি হাসলেন। বেশ শব্দ করেই হাসলেন। আজ সারা দিনই তিনি খানিকটা বিষণ্ন বোধ করছিলেন। সেই ভাবটা কেটে গেল। তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সুন্দর রোদ উঠেছে। আকাশ অসম্ভব পরিষ্কার। রোদে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতে তাঁর ভাল লাগছে। বাতাস অবশ্যি খুব ঠাণ্ডা। সুঁচের মতো গায়ে বেঁধে। ভেতর থেকে ওভারকোটটি নিয়ে এলে ভাল হত। কিন্তু ভেতরে যেতে ইচ্ছে করছে না।

চোখ মেলতেই প্রিয় দৃশ্যটি দেখা গেল।
জানালার কাছে চায়ের কাপ। একটি চড়ুই পাখি কাপের কিনারায় বসে ঠোঁট ডুবিয়ে চা খাচ্ছে। মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে ফিরোজের দিকে। এই ব্যাপারটি প্রথম ঘটে ডিসেম্বর মাসের ১১ তারিখে।

চায়ের দোকান থেকে যথারীতি জানালার পাশে গরম চা রেখে ডাক দিয়েছে— স্যার উঠেন। ফিরোজ ঘুম-ঘুম চোখে দেখেছে। হাত বাড়াতে বাড়াতে আবার ঘুম। ঘুম ভাঙল এগারটার দিকে কিচিরমিচির শব্দে। চায়ের কাপ ঘিরে পাঁচ-ছ'টা চড়ুই পাখি। মহানন্দে কাপে ঠোঁট ডুবিয়ে কিচিরমিচির করছে। সেই থেকে রোজ হচ্ছে। পাখিগুলি মনে হয় অপেক্ষা করে থাকে কখন চা আনবে। সেই চা ঠাণ্ডা হবে। রোজ তাদের সে সুযোগ হয় না। বিছানায় আধশোয়া হয়ে ফিরোজ কাপ টেনে নেয়। চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত। তিক্ত, কষা ও মধু— এই তিন স্বাদের সমাচার। ভোরের প্রথম শারীরিক আনন্দ।

আজ ফিরোজের কোনোই কাজ নেই। কোথাও যেতে হবে না। দেনদরবার করতে হবে না। সাধারণত যে দিন কোনো কাজ থাকে না, সে দিন সূর্য ওঠার আগেই ঘুম ভেঙে যায়। কাজের দিন কিছুতেই ঘুম ভাঙতে চায় না। মনে হয় আরো খানিকক্ষণ শুয়ে থাকি। আজ উল্টো ব্যাপার ঘটল। কোনো কাজকর্ম নেই, তবু বেশ খানিকক্ষণ ঘুমুনো গেল। চড়ুই পাখিটি কৃতজ্ঞ চোখে তাকাচ্ছে।

তার সঙ্গীরা আজ কেউ আসেনি। এলেও চা-পর্ব সমাধা করে চলে গিয়েছে। এই ব্যাটা যাচ্ছে না। হিন্দি ভাষায় ফিরোজ পাখিটির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাল। পশু পাখিরা বাংলা ভাষাটা তেমন বোঝে না।

'কেয়া ভাই চিড়িয়া, হালাত কেয়া?'

'চিকির চিকির চিক।'

'চিনি উনি সব ঠিক থা?''

'চিকির চিকির।'

'আউর এক দফা হোগা কেয়া নেহি?'

'চিক চিকির চিকির।'

ফিরোজের ধারণা, পাখিরা মোর্স কোডে কথা বলে। চিকির এবং চিক এই দু'টি শব্দই নানান পারমুটেশন কম্বিনেশনে বেরিয়ে আসছে। এই বিষয়ে একটা গবেষণা হওয়া উচিত। সময় থাকলে দু'একজন পক্ষীবিশারদের সাথে কথা বলা যেত। পশুপাখিদের ভাষাটা জানা থাকলে নিঃসঙ্গ মানুষদের বড় সুবিধা হত।

ফিরোজ টুথপেস্ট হাতে বারান্দায় এল। তার ঘর দোতলায়। একটি শোবার ঘর। জানালাবিহীন অন্য একটি কামরা একশ ওয়াটের বাতি জ্বাললেও অন্ধকার হয়ে থাকে। সেই ঘরের উল্টো দিকে বাথরুম, যা অন্য এক ভাড়াটে রমিজ সাহেবের সঙ্গে শেয়ার করতে হয়। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যখনি ফিরোজের বাথরুমে যাবার দরকার হয়, তখনি রমিজ সাহেবকে বাথরুমের ভেতর পাওয়া যায়। ভদ্রলোকের ব্যাপার সব অদ্ভুত। বাথরুমে একবার ঢুকলে আর বেরুবেন না। ফিরোজের ধারণা, বসে থাকতে-থাকতে ভদ্রলোক ঘুমিয়ে পড়েন।

'এই যে ব্রাদার, অনেক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি।'

রমিজ সাহেব খুক-খুক করে দু'বার কাশলেন।

'আজ অফিসে যাননি? এগারটা বাজে, এখনো বাথরুমে বসে আছেন?

আবার খুক-খুক কাশি। নাক ঝাড়ার শব্দ।

'বেরিয়ে আসুন ভাই। খানিক্ষণ পর না-হয় নতুন উদ্যমে আবার যাবেন। বাথরুম তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

রমিজ সাহেব ভয়ঙ্কর বিরক্ত হয়ে বের হয়ে এলেন। কড়া গলায় বললেন, 'রোজ রোজ এইসব কী বাজে কথা বলেন?'

'বাজে কথা কি বললাম?'

'এইসব আমি পছন্দ করি না। খুবই অপছন্দ করি। দরজায় ধাক্কাধাক্কি করেন কেন? এইটা কী-ধরনের ভদ্রতা?'

'আজ কিন্তু ধাক্কা দিইনি।'

'অভদ্র ছোকরা।'

রমিজ সাহেব রাগে গর-গর করতে-করতে নিজের ঘরে গেলেন। ভদ্রলোক সম্ভবত অসুস্থ। গলায় মোটা মাফলার। চোখ-মুখ ফোলা-ফোলা। অফিসেও যাননি। ফিরোজ কিঞ্চিৎ লজ্জিত বোধ করল। একজন অসুস্থ মানুষকে নিয়ে রসিকতা করা ঠিক হচ্ছে না। রসিকতার প্রচুর বিষয় আছে।

বেরুতে-বেরুতে সাড়ে চারটা বেজে গেল। একতলার বারান্দায় বাড়িওয়ালা বসে আছেন। আজ তাঁকে দেখে চট করে সরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। দু'মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি ছিল। গত সপ্তাহেই সেটা দিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাড়িওয়ালার ছোট মেয়েটির জন্যে সে একজন পাত্রের খোঁজে আছে, এমনও বলেছে। এটা বলার দরকার ছিল। কারণ বাড়িওয়ালা হাজি আসমত আলি ওপরের দু'জন ভাড়াটেকে উৎখাত করতে চাইছেন। সেখানে নাকি তাঁর বড় জামাই থাকবেন। বড় জামাইয়ের চাকরি নেই। বাড়ি-ভাড়া দিয়ে থাকতে পারছেন না। চাকরিবাকরির কোনো ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকবেন।

ফিরোজ আঁতকে উঠে বলেছে, 'খাল কেটে লোকজন কুমির আনে, আপনি তো হাঙর আনার ব্যবস্থা করছেন! জামাই এক বার ঢুকলে উপায় আছে?'

হাজি আসমত আলি বলেছেন, 'করব কী তাহলে, ফেলে দেব?'

'অফকোর্স ফেলে দেবেন। জামাই, শালা এবং ভাগ্নে—এই তিন জিনিসকে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না যদি বাঁচতে চান।'

'আপনি সবসময় বড় আজেবাজে কথা বলেন।'

'কোন কথাটা আজেবাজে বললাম?'

'এই নিয়ে আপনার সঙ্গে বক-বক করতে চাই না। আপনি ভাই ডিসেম্বর মাসের ত্রিশ তারিখে বাড়ি ছেড়ে দেবেন। এক মাসের নোটিশ দেবার কথা—দিলাম।'

'আচ্ছা, ছেড়ে দেব। উনত্রিশ তারিখেই ছেড়ে দেব। একদিন আগে।'

মেয়ে বিয়ের প্রসঙ্গ এর পরপরই ফিরোজকে আনতে হয়েছে। কাল্পনিক এক পাত্র দাঁড় করাতে হয়েছে। এই ব্যাপারে হাজি সাহেব যে আগ্রহ দেখাবেন বলে আশা করা গিয়েছিল, তার চেয়েও বেশি দেখলাম। ফিরোজ যথাযোগ্য গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলল, 'ছেলে এম.এ পাস করেছে গত বছর। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়ার কথা ছিল, পায়নি। সেকেন্ড ক্লাস ফোর্থ হয়েছে। একটা পেপার খুবই খারাপ হয়েছে। দেখতে রাজপুত্র নয়, সেটা আগেই বলে দিচ্ছি। চেহারা মোটামুটি, তবে ভাল ফ্যামিলির ছেলে। ঢাকায় নিজের বাড়ি। পুরনো ধরনের বাড়ি। তবে ময়মনসিংহ শহরে বিরাট বাড়ি। চার বোন তিন ভাই। ভাই-বোনের বিয়ে হয়নি। ভাইরা সবাই স্টাব্লিশড।

'ছেলে করে কী?'

'এখনো কিছু করে না। মাত্র তো পাস করল। তবে পারিবারিক অবস্থা যা, কিছু না করলেও হেসে-খেলে দু'তিন পুরুষ কেটে যাবে।'

'ওদের সঙ্গে আপনার পরিচয় কীভাবে?'

'আমার আপন ফুপাতো ভাই। আপনি আপনার মেয়ের ছবি দিয়ে দেবেন, বাকি যা করার আমি করব। আরো ছেলে আছে আমার হাতে, নো প্রবলেম। ভাল কথা, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট এবং কালার—দু'ধরনের ছবিই দেবেন।'

'আচ্ছা দেব। ছবি দেব। যদি মেয়ে দেখতে চান, কোনো অসুবিধা নাই, যেখানে বলবেন। কালার ছবি ঘরে নেই, স্টুডিওতে তুলতে হবে।'

'তুলে ফেলুন। কালারের যুগ এখন।'

'বিয়ের ঐ আলাপ-আলোচনার পর বাড়ি ছাড়ার প্রসঙ্গ চাপা পড়ে গেল। দু' মাসের ভাড়াও হাজি সাহেব চাওয়া বন্ধ করলেন। অবশ্যি ভাড়া দিয়ে দেয়া হয়েছে, তবু মনে সন্দেহ, আবার বাড়ি ছাড়ার প্রসঙ্গ ওঠে কি না।'

হাজি সাহেব ফিরোজকে বেরুতে দেখেও কিছুই বললেন না। বিষণ্ন ভঙ্গিতে বসে রইলেন। ফিরোজ এগিয়ে এল, 'রোদ পোহাচ্ছেন?'

'জি।'

'খুব ভাল, শরীরে ভিটামিন সি প্রডিউস হচ্ছে।'

'ঐ ছেলের ব্যাপারে তো আর কোনো খবর দিলেন না।'

'ছবি? ছবি চাচ্ছে তো!'

'ছবি তো তুলে রেখেছি। চান না, তাই...'

'কী মুশকিল, চাইব না কেন! নিয়ে আসুন। আজ ছেলের বড় ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হবার সম্ভাবনা আছে। দেখা যে হবেই তা বলছি না—একটা প্রবাবিলিটি।'

ছবি দেখে ফিরোজের মন উদাস হয়ে গেল। ভারি মিষ্টি চেহারার একটি মেয়ে। চোখ ছল-ছল করছে। হাজি সাহেবের মেয়েগুলি বোরকা পরে। ফিরোজ কখনো এদের মুখ দেখেনি। ভাগ্যিস দেখেনি। দেখলেই এই বোরখাওয়ালির প্রেমে পড়ে যেতে হত।

'আপনার মেয়ে তো খুবই রূপবতী।'

হাজি সাহেব কিছুই বললেন না। ফিরোজ বলল, 'এই রকম একটা মেয়ের বিয়ে নিয়ে কেউ চিন্তা করে? আশ্চর্য!'

'হাজি সাহেব ক্লান্ত গলায় বললেন, অন্য সমস্যা আছে।'

'কী সমস্যা?'

'ওর পায়ে একটু দোষ আছে।'

'কী দোষ?'

'পোলিও হয়েছিল।'

'বলেন কী!'

'হাঁটা-চলায় কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু।'

ফিরোজের অসম্ভব মন খারাপ হয়ে গেল। তার প্রচণ্ড ইচ্ছে হতে লাগল বলে ফেলে - আমি এই মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। শেষ পর্যন্ত বলল না। তার আবেগ দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

'আমি টাকাপয়সা যথেষ্ট খরচ করব। এই মেয়েটা আমার খুব আদরের। যদি একটা ভাল ছেলে দিতে পারেন।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ফিরোজ লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল। যদিও তার খুব মন-খারাপ ছিল, রাস্তায় নেমে মন ভাল হয়ে গেল। কী সুন্দর ঝকঝকে রোদ! ঘন নীল আকাশ! বাতাস কত মধুর! বেঁচে থাকার মত আনন্দ আর কী হতে পারে?

ফিরোজ হাঁটছে ফুর্তির ভঙ্গিতে। কোনো কাজকর্ম নেই, চিন্তা করতেই ভাল লাগছে। যদিও উল্টোটাই হওয়া উচিত ছিল। তার ফুর্তির মূল কারণ হচ্ছে পকেট একেবারে ফাঁকা নয়। আটশ ত্রিশ টাকা আছে। এতগুলো টাকা পকেটে নিয়ে শুধু-শুধু দুশ্চিন্তা করার কোনো মানে হয় না। দুশ্চিন্তা মানেই পেপটিক আলসার, ক্ষুধামন্দা, অনিদ্রা। তারচেয়ে হাসিমুখে ঢাকার রাস্তায় হাঁটা অনেক ভাল।

ঢাকার রাস্তাগুলি এখন বেশ সুন্দর। হেঁটে বেড়ানোর জন্যে এবং ভিক্ষা করবার জন্যে আদর্শ। ফুটপাতে ভিক্ষুকরা কী সুন্দর ঘর-সংসার সাজিয়ে ভিক্ষা করছে!

ফিরোজ এই মুহূর্তে কৌতূহলী হয়ে একটি ভিক্ষুক-পরিবারকে দেখছে। এক বুড়ো তার দুপাশে দু'টি ছোট-ছোট বাচ্চাকে নিয়ে ভিক্ষা করছে। তাদের একটু পেছনেই ইটের চুলায় রান্না হচ্ছে। ঘোমটা-দেয়া গৃহস্থ প্যাটার্নের একটি মেয়ে মাটির হাঁড়িতে চাল দিচ্ছে। এই পরিবারটির চোখে-মুখে দুঃখ-বেদনার কোনো ছাপ নেই। বরং বুড়োর মুখে একটা প্রশান্তির ভাব আছে। বাচ্চা দু'টি একটু পর-পর দাঁত বের তরে হাসছে। ফিরোজ কী মনে করে একটা চকচকে পাঁচ টাকার নোট বুড়োর থালায় ফেলে দিল। ভিখিরিরা এই জাতীয় ঘটনায় আবেগে উদ্বেলিত হয়। এই বুড়ো নিস্পৃহ ভঙ্গিতে নোটটা নিজের বুক-পকেটে রেখে দিল। খুবই বুদ্ধিমানের কাজ। থালায় একটি নোট থাকলে পয়সাকড়ি পড়বে না। ফিরোজের আফসোসের সীমা রইল না। টাকাটা জলে গেল। দাতা সাজবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। অদূর ভবিষ্যতে তাকে যদি এরকম টিনের থালা নিয়ে বসতে হয় এবং কেউ যদি একটা পাঁচ টাকার নোট ফেলে দেয়, তাহলে সে আনন্দের এমন প্রকাশ দেখাবে যে চারদিকে লোক জমে যাবে। দর্শকদের আনন্দের জন্যে সে বাঁদর-লাফ দিতেও রাজি আছে।

বাচ্চা দু'টির মধ্যে কী-কারণে যেন মারামারি লেগে গেছে। দুজনই এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারছে। একজন মনে হচ্ছে খামচিবিশারদ। একেক বার খামচি দিয়ে ছাল চামড়া নিয়ে আসছে। জমাট দৃশ্য। কিন্তু বুড়োর এই দৃশ্যেও কোনো ভাবান্তর হচ্ছে না। সন্ন্যাসীর নির্লিপ্ততা নিয়ে সে বসে আছে, রন্ধনরতা ঘোমটা-দেয়া মেয়েটিও কিছু বলছে না।

ফিরোজের ইচ্ছে করছে একটু দূরে দাঁড়িয়ে এই পরিবারটিকে দেখে-দেখে দুপুরটা কাটিয়ে দেয়। সেটা করা ঠিক হবে না। লোকে অন্য অর্থ করবে। যে মেয়েটি রাঁধছে তার বয়স অল্প। মুখে

লাবণ্য এখনো খানিকটা আছে। এই মেয়ের আশপাশে দীর্ঘ সময় থাকার একটি মানেই হয়। বুড়ো যে পাঁচটি টাকা পেয়েও বিরস মুখে বসে রইল তার মানেও এই। বুড়ো অন্য কিছু ভেবে বসেছে। ফিরোজ মগবাজারের দিকে লম্বা-লম্বা পা ফেলতে লাগল। এখন সে যাবে তাজিনদের বাসায়। তাজিন তার বড় বোন। মবগাজার ওয়ারলেস কলোনিতে থাকে। ফিরোজের যখন টাকাপয়সার টানাটানি হয় তখন দুপুরে এই বাড়িতে খেতে আসে।

'কেমন আছিস রে আপা?' তোর পুত্র-কন্যারা কোথায়? বাসা একেবারে খালি মনে হচ্ছে!'

তাজিন মুখ অন্ধকার করে রাখল।

'হয়েছে কী? কথা বলছিস না কেন? কর্তার সঙ্গে আবার ফাইটিং?'

তাজিন থমথমে গলায় বলল, 'তুই কি একটা মানুষ, না অন্য কিছু?'

'কেন?'

'রুমি এত করে বলে দিল তার জন্মদিনে আসাব জন্যে, তুই আসতে পারলি না? মেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে অস্থিব। বাচ্চাগুলি তোকে এত পছন্দ কবে, আব তুই এ-বকম করিস? ভালবাসাব দাম দিতে হয় না?'

'খুব কেঁদেছিল?'

'জিনিসপত্র ফেলে-ছড়িয়ে একাকাব করেছে, শেষে তোর দুলাভাইকে পাঠালাম তোর খোঁজে।'

'আপা, হয়েছে কি জান...আমাদের এক কলিগ. .'

'চুপ কর, আব মিথ্যা কথা বলতে হবে না। ভাত খেতে এসেছিস, খেয়ে বিদায় হ।'

'আজ তোদের রান্না কী?'

তাজিন জবাব না-দিয়ে টেবিলে ভাত বাড়তে লাগল।

'তোদের টেলিফোন ঠিক আছে আপা?'

'আছে।'

'তুই রেডি কব সব কিছু, আমি টেলিফোন কবে আসছি। দারুণ একটা খবব আছে। আগামী সপ্তাহে বিয়ে করছি।'

এই দারুণ খবরেও তাজিনকে বিচলিত মনে হল না।

'বিশ্বাস হচ্ছে না? এই নে, মেয়েব ছবি দেখ। কি, এখন বিশ্বাস হচ্ছে?'

ফিরোজ টেলিফোন করতে গেল। বি কবিম সাহেবকে জিজ্ঞেস কববে, মতিন কাজটা কবেছে কি না। বি. করিম সাহেবকে পাওয়া গেল। তিনি অত্যন্ত উৎসাহেব সঙ্গে বললেন, 'কে, ফিবোজ সাহেব নাকি?'

'আমার কি সৌভাগ্য। গলা চিনে ফেলেছেন!'

'ঠাট্টা কবছেন নাকি ভাই?'

'পাগল হয়েছেন! আপনার সঙ্গে কি আমার ঠাট্টাব সম্পর্ক?'

আমার চিঠিটা নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলাম। বহু কষ্টে ব্যাটার ঠিকানা বের কবতে হয়েছে।'

'কী বলেছেন উনি?'

'আপনার পারসোনাল টাচওয়ালা পেনসিলের চিঠিটা পড়ে মুখ বিকৃত করে বলল বি. করিম এই শালা আবার কে? আমার কাছে পেনসিলে চিঠি লেখে, আস্পর্ধা তো কম নয়!'

করিম সাহেব বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে মেঘস্বরে বললেন, 'ফিরোজ সাহেব, একটা কথা শুনুন।'

'বলুন।'

'কেন সবসময় এ-রকম উল্টোপাল্টা কথা বলেন?'

'সত্যি কথা বলছি। শুধু-শুধু মিথ্যা বলব কেন?'

'ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়েছে। আপনি তাঁর কাছে এখনো যাননি। তিনি ঠিকানা বদলেছেন, এখন থাকেন রামকৃষ্ণ মিশন রোডে।'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনি গেলেই উনি আপনাকে কাজ দেবেন।'

'মেনি থ্যাংকস।'

'ফিরোজ সাহেব।'
'জি।'
'আচার-আচরণ সাধারণ মানুষের মত করার চেষ্টা করুন। ইয়ারকি-ফাজলামি তো যথেষ্ট করলেন। বয়স কত আপনার?'
'পঁয়ত্রিশ।'
'বয়স তো মাশাআল্লাহ কম হয়নি। আরেকটা কথা।'
'বলুন, শুনছি।'
'ফখরুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে একবার যাবেন।'
'কেন?'
'ওনার মেয়ে টেলিফোনে আপনাকে চাচ্ছিল।'
'বলেন কী! কী-রকম গলায় চাইল?'
'কী-রকম গলায় মানে!'
'প্রেম-প্রেম গলা, না রাগ-রাগ গলা?'
বি. করিম সাহেব তার উত্তর দিলেন না। টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। রাগে তাঁর গা জ্বলে যাচ্ছে। ফিরোজ হৃষ্টচিত্তে খেতে বসল। প্রচুর আয়োজন। টেবিলের দিকে তাকাতেই মন ভরে যায়।
'সিরিয়াস এক বড়লোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়ে গেছে, বুঝলে আপা। একেবারে লদকালদকি প্রেম।'
তাজিন কিছু বলল না। একটা বিশাল আকৃতির সরপুঁটি ভাজা ফিরোজের পাতে তুলে দিল।
'ঐ মেয়ে আমার খোঁজ দিনে চার বার পাঁচ বার করে অফিসে টেলিফোন করছে। বি. করিম সাহেবের কান ঝালাপালা।'
'সত্যি-সত্যি বলছিস?'
'এই যে মাছ হাতে নিয়ে বলছি। বাঙালির ছেলে মাছ হাতে মিথ্যা কথা বলে না।'
'মেয়েটার নাম কি?'
'অপালা। বিয়ের পর অপা করে ডাকব। অপালা শব্দটার মানে কী, জানিস নাকি?'
'জানি না। মেয়েটাকে ছবিতে যে-রকম দেখাচ্ছে আসলেও কি সে-রকম সুন্দর?'
ফিরোজ ভাত মাখতে-মাখতে বলল, 'তুই একটা মিসটেক করে ফেললি রে আপা। ছবির মেয়ে আর ঐ মেয়ে দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। তুই গুবলেট করে ফেলেছিস।'
তাজিন রাগ করতে গিয়েও বলতে পারল না। তাদের পাঁচ বোনের পর এই এক ভাই। আদরে-আদরেই ওর মাথা নষ্ট হয়েছে। জীবনে কিছুই করল না। কোনো দিন যে করতে পারবে তাও মনে হচ্ছে না।
'ফিরোজ।'
'বল।'
'সবটাই কি তোর কাছে একটা খেলা।'
'খেলা হবে কেন?'
তাজিন আর কিছু বলল না। ফিরোজের খাওয়া দেখতে লাগল। কেমন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে খাচ্ছে। গালভর্তি দাড়ি। হঠাৎ দাড়ি রাখার সখ হল কি জন্যে কে বলবে? তার হাসি আসে না, রাগ ধরে যায়। চড় মারতে ইচ্ছে করে।
'দাড়িতে আমাকে কেমন লাগছে রে আপা?'
'ভাল।'
'রবীন্দ্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ ভাব চলে এসেছে না?'
তাজিন কিছু বলল না।
'রবীন্দ্রনাথের মুখের গঠনের সাথে আমার মুখের গঠনের অদ্ভুত মিল আছে। চুল-দাড়িগুলি আরেকটু লম্বা হোক, দেখবি।'
'তখন কী করবি? একটা আলখাল্লা কিনবি?'
'এটা মন্দ বলিসনি আপা। একটা আলখাল্লা কিনলে হয়। রেডিমেড বোধহয় পাওয়া যায় না।

অর্ডার দিয়ে বানাতে হবে। তারপর সেই আলখাল্লা পরে বাংলা একাডেমির কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে সবাইকে ভড়কে দেব। চারদিকে ফিসফাস শুরু হবে -গুরুদেব এসে গেছেন।"

'চুপ কর দেখি!'

'সরি, আমার আবার মনেই থাকে না তুই বাংলার ছাত্রী। দে, একটা পান দে। চমনবাহার থাকলে চমনবাহার দিয়ে দেয়।'

অপালা যে-বার ক্লাস এইটে বৃত্তি পেল, সে-বার তার বাবা তাকে চমৎকার একটা উপহার দিয়েছিল। লিসবন থেকে কেনা মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই-করা পাঁচশ পাতার বিশাল একটা খাতা। মলাটে একটি স্প্যানিস নর্তকীর ছবি। চামড়ায় এত সুন্দর ছবি কী করে আঁকা হল কে জানে! দেখলে মনে হয় মেয়েটি চামড়া ফুঁড়ে বের হয়ে এসে নাচা শুরু করবে।

ভেতরের পাতাগুলির রঙ মাখনের মতো। কী মসৃণ! প্রতিটি পাতায় অপূর্ব সব জলছাপ। গাছপালা, নদী আকাশের মেঘ।

ফখরুদ্দিন সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, 'উপহারটি মনে হয় খুব পছন্দ হয়েছে?'

আনন্দে অপালার চোখে পানি এসে গিয়েছিল। সে নিজেকে সামলে গাঢ় গলায় বলল, হ্যাঁ।'

'এখন থেকে এই খাতায় গল্প, কবিতা, নাটক - এইসব লিখবে।'

'এইসব তো আমি লিখতে পারি না বাবা।'

'লিখতে-লিখতেই লেখা হয়। চেষ্টা করবে। ঐ সব না পার, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা লিখে রাখবে। এই যে তুমি বৃত্তি পেলে, এটা তো বেশ একটা বড় ঘটনা। সুন্দর করে এটা লিখবে। তারপর তোমার যখন অনেক বয়স হয়ে যাবে, চুল হবে সাদা, চোখে ছানি পড়বে তখন ঐ খাতাটা বের করে পড়বে, দেখবে কত ভাল লাগে।'

'আমি কোনোদিন বুড়ো হব না বাবা।'

'তাই বুঝি?'

ফখরুদ্দিন সাহেব ঘর কাঁপিয়ে অনেক্ষণ ধরে হাসলেন।

চমৎকার সেই খাতায় প্রথম এক বছর অপালা কিছুই লিখল না। তার অনেক বার লিখতে ইচ্ছে করল, কলম দিয়ে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুন্দর পাতাগুলি নষ্ট করতে ইচ্ছে করল না। সে খাতা খুলে রেখে মনে মনে পাতার পর পাতা লিখে যেতে লাগল। অনেক লেখা পছন্দ হল না, সেগুলি মনে-মনেই কেটে নতুন করে লিখল।

ক্লাস নাইনে হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষার শেষ দিনে সে প্রথম বারের মত লিখল। সাধু ভাষায় লেখা সেই অংশটিই এই—

"আজ আমার পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। আমার মনে কোনো আনন্দ হইতেছে না। পরীক্ষা বেশ ভাল হইয়াছে। তবে কেন আমার আনন্দ হইতেছে না? আমি সঠিক জানি না। মাঝে-মাঝে খুব আনন্দের সময় আমার দুঃখ লাগে। আমি কাঁদিয়া ফেলি। গত বছর আমরা নেপালের 'পোখরা' নামক একটি স্থানে গিয়েছিলাম। চারিদিকে বিশাল পাহাড়। কত সুন্দর দৃশ্য! বাবা এবং মা'র মনে কত আনন্দ হইল। বাবা ক্যামেরা দিয়া একের পর এক ছবি তুলিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনো কারণ ছাড়াই আমার মনে খুব দুঃখ হইল। গলা ভার-ভার হইল। চোখ দিয়া পানি আসিতে লাগিল। ভাগ্যিস কেহ দেখিতে পায় নাই।"

অপালার খাতাটি ক্রমে ভরে উঠতে লাগল। ক্লাস টেনে উঠে প্রথম গল্প লিখল। বয়সের সঙ্গে তার গল্পটি মিশ খায় না। গল্পের নাম রাজ-নর্তকী। গল্পের বিষয়বস্তু পনের বছরের মেয়ের কলমে ঠিক আসার কথা নয়। শুরুটা এ-রকম :

**রাজ-নর্তকী**

মহিমগড়ের রাজপ্রসাদে থাকে এক নর্তকী। রাজসভাতে গান করে, নাচে। তার নাচ যে-ই দেখে সে-ই মুগ্ধ হয়। সেই রাজসভায় একদিন এলেন ভিনদেশী এক কবি। তিনি নর্তকীর নাচ দেখে মুগ্ধ হলেন। তার হাত জোড় করে বললেন, 'দেবী, আমি কি আপনার নাম জানতে পারি?'

নর্তকী হাসিমুখে বলল, 'আমার নাম অপালা।'

'দেবী, আমি কি নিভৃতে আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?'
হ্যাঁ, পারেন। আসুন গোলাপ-বাগানে।'
তারা দুজন গোলাপ-বাগানে গেল। ফুলে-ফুলে চারদিকে আলো হয়ে আছে। রাজ-নর্তকী অপালা বলল, 'কী আপনার নিবেদন, কবি? আপনি আমার কাছে কী চান?'
'যা চাই তাই কি আমি পাব? এত বড় সৌভাগ্য সত্যি কি আমার আছে?'
তা তো বলতে পারছি না। আগে আমাকে বলতে হবে, আপনি কি চান?'
'আমি আপনাকে নিয়ে একটি কবিতা লিখতে চাই।'
'বেশ তো লিখুন।'
'আপনার অপূর্ব দেহ-সুষমা নিয়ে একটি কবিতা লিখতে চাই।'
'বেশ তো।'
কিন্তু দেবী, তার জন্যে আপনার দেহটিকে তো আমার দেখতে হবে।'
'দেখতেই তো পাচ্ছেন। পাচ্ছেন না?'
'না, পাচ্ছি না। আপনার অপূর্ব দেহটি আড়াল করে রেখেছে কিছু অপ্রয়োজনীয় পোশাক। এইগুলি খুলে ফেলুন। পোশাক আপনার জন্যে বাহুল্য। এত সুন্দর একটি শরীরকে পোশাক ঢেকে রাখবে এটা কিছুতেই আমি মেনে নিতে পারছি না।'
সে খানিকক্ষণ ভাবল, তারপর একে-একে খুলে ফেলল সব। শুধু গলায় রইল একটি চন্দ্রহার। সে চন্দ্রহারও খুলে ফেলতে গেল। কিন্তু কবি চেঁচিয়ে উঠলেন, না না, চন্দ্রহার খোলার দরকার নেই। চন্দ্রহার সরিয়ে ফেললে দেহের সমস্ত সৌন্দর্য একসঙ্গে আমার চোখে পড়বে। আমি তা সহ্য করতে পারব না।
গলায় শুধুমাত্র চন্দ্রহার পরে সে বাগানে হাঁটতে লাগল। আর রাজকবি একটি গাছের ছায়ায় তাঁর কবিতার খাতা নিয়ে বসলেন। আকাশ ঘন নীল। সূর্য তার হলুদ ফুল ছুড়ে দিচ্ছে চারদিকে। বাতাসে সেই হলুদ ফুলের নেশা-ধরানো গন্ধ। গাছে-গাছে পাখি ডাকছে।

গল্পের শেষ অংশ বেশ নাটকীয়। হঠাৎ বাগানে প্রবেশ করলেন রাজা। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। রাজ-নর্তকী অপালার মৃত্যুদণ্ড হল। কবির চোখ অন্ধ করে দেয়া হল। অন্ধ কবি পথে-পথে ঘুরে বেড়ান এবং নর্তকীকে নিয়ে গীত রচনা করেন। অপূর্ব সব গীত। তিনি নিজেই তাতে সুর দেন। নিজেই গান। বনের পশু-পাখিরা পর্যন্ত সেই গান শুনে চোখের জল ফেলে।

পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠা জুড়ে কবির লেখা গীত। গীতগুলি গদ্যের মতো সরল নয়। ছেলেমানুষি ছড়া।

এই লেখার পর প্রায় দু'বছর আর কিছু লেখা হয়নি। দু'বছর পর হঠাৎ লেখা আমার জীবন। গদ্য এখানে অনেক স্বচ্ছ, গতিময়। হাতের লেখাও বদলে গেছে। আগের গোটা গোটা হরফ উধাও হয়েছে। এসেছে প্যাঁচানো ধরনের অক্ষর। আগের কোনো লেখায় কোনো রকম কাটাকুটি নেই। মনে হয় আগে অন্য কোথাও লিখে পরে খাতায় তোলা হত। আমার জীবন লেখাটিতে প্রচুর কাটাকুটি।

### আমার জীবন

আমি কি খুব বুদ্ধিমতী? মনে হয় না। কেউ কোনো হাসির কথা বললে আমি বুঝতে পারি না। আজ বড় খালার বাসায় সবাই আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছিল। এটা যে ঠাট্টা, আমি বুঝতে পারিনি। কী নিয়ে কথা হচ্ছে তাও বুঝতে পারছি না। অবাক হয়ে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছি। বড় খালার মেয়ে বিনু হেসে গড়িয়ে পড়ছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। বড় খালা বললেন, কম বোঝাই তোমার জন্যে ভাল। বেশি বুঝলে বা বুঝতে চাইলে ঝামেলায় পড়বে। আমি এই কথারও মানে বুঝলাম না। মন-খারাপ করে বাসায় চলে এলাম। সারা দুপুর ভাবলাম। তখন একটা জিনিস আমার কাছে পরিষ্কার হল— আমাকে বাবা এবং মা ছাড়া কেউ পছন্দ করে না। যেমন বড় খালা, তিনি ছোট খালার ছেলেমেয়েকে তুই করে বলেন, মেজো খালার ছেলেমেয়েকে তুই করে বলেন; আমাকে

বলেন তুমি করে।

সন্ধ্যাবেলা বাবাকে আমি এই কথাটা বললাম। বাবা চট করে খালাদের ওপর রেগে গেলেন এবং বলতে লাগলেন-- যাও কেন তাদের বাসায়? আর যাবে না। ওরাও এ-বাড়িতে আসবে না। দারোয়ানকে বলে দেব এলে যেন গেট খোলা না হয়।

বাবার রাগ যেমন চট করে ওঠে তেমনি চট করে নেমে যায়। এইবার তা হল না। কী লজ্জার কাণ্ড! পরদিন সকালবেলা বাবা বড় খালাকে টেলিফোন করে বলেন-- আপনি সবাইকে তুই-তুই করে বলেন, আমার মেয়েটাকে তুমি করে বলেন কেন?

ভাগ্যিস বাবার এসব কাণ্ডকারখানা মা জানতে পারেননি। জানলে খুব মন-খারাপ করতেন। মা'র হার্টের অসুখ খুব বেড়েছে। নড়াচড়াই করতে পারেন না। এই অবস্থায় মন-খারাপ করার মত কোনো ঘটনা ঘটতে দেয়া উচিত নয়। কিন্তু বাবা এসব কিচ্ছু শুনবেন না। যা তাঁর মনে আসে, করবেন। আমার মাঝে-মাঝে মনে হয় মা'র এই অসুখের মূল কারণ হয়ত-বা বাবা। কী লিখছি আবোল-তাবোল, হার্টের অসুখের কারণ বাবা হতে যাবেন কেন? তাঁর মত ভাল মানুষ ক'জন আছে?

আজ অনেক দিন পর অপালা তার খাতা নিয়ে বসেছে। কোনো কিছু লেখার উদ্দেশ্যে নয়। পুরনো লেখায় চোখ বোলানোর জন্যে। রাজ-নর্তকী গল্পটি সে পড়েছিল। এ-রকম একটা অদ্ভুত গল্প এত অল্প বয়সে সে কেন লিখেছিল ভাবতে-ভাবতে লজ্জায় গাল লাল হয়ে উঠল। এই গল্পটি ছিঁড়ে ফেলতে হবে। কিন্তু খাতা থেকে পাতা ছিঁড়তে মায়া লাগে। এই গল্পটি এখন ভাল লাগছে না, আজ থেকে কুড়ি বছর পর হয়তবা ভাল লাগবে।

'আফা।'

অপালা চমকে তাকাল। রমিলা যে উঠে এসেছে, তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, সে লক্ষই করেনি।

'আপনেরে নিচে ডাকে।'

'কে?'

'ঐ যে দাড়িওয়ালা লোকটা, ঘর ঠিক করে যে।'

'ও, আচ্ছা। বসতে বল, আমি আসছি।'

রমিলা গেল না, দাঁড়িয়ে রইল। অপালা শান্ত স্বরে বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বলবে?'

'আপনে দুপুরে কিছু খাইলেন না আফা।'

'খিদে ছিল না।'

'অখন এট্টু নাস্তাপানি আনি?'

'আন। আর ঐ লোকটাকে আগামীকাল আসতে বল। আমার নিচে নামতে ইচ্ছে করছে না।'

'জি আচ্ছা।'

ফিরোজ ঘড়ি আনতে ভুলে গিয়েছে, কাজেই কতক্ষণ পার হয়েছে বলতে পারছে না। এই অতি আধুনিক বসার ঘরটিতে কোনো ঘড়ি নেই। সাধারণত থাকে কোকিল-ঘড়ি বা এ জাতীয় কিছু। এক ঘণ্টা পার হলেই খুট করে দরজা খুলে একটা কোকিল বের হয়। কু-কু করে মাথা ধরিয়ে দেয়। সময় পার হচ্ছে, ব্যাপারটা যন্ত্রণাদায়ক। এর মধ্যে কু-কু করে কেউ যদি সেটা মনে করিয়ে দেয়, তাহলে আরো খারাপ লাগার কথা। ঘড়ি চলবে নিঃশব্দে। কেউ জানতে চাইলে সময় দেখবে। যদি কেউ জানতে না চায়, তাকে জোর করে জানানোর দরকার কী?

অ্যাশট্রেতে চারটি সিগারেট পড়ে আছে। এই থেকে বলা যেতে পারে, পঞ্চাশ মিনিটের মতো পার হয়েছে। পঞ্চাশ মিনিট অবশ্যি একজন রাজকন্যার দর্শনলাভের জন্যে যথেষ্ট নয়। রাজকন্যাদের জন্যে পঞ্চাশ ঘণ্টা বসে থাকা যায়।

পর্দা সরিয়ে রমিলা ঢুকল, দাঁত কেলিয়ে বলল, আফা আসতাছে। ফিরোজ মনে-মনে বলল, ধন্য হলাম। রাজকন্যার আগমনবার্তা নকিব ঘোষণা করল। এখন সম্ভবত জাতীয় সঙ্গীত বাজবে-- আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

'ফিরোজ সাহেব, আপনি কি ভাল আছেন?'

'জি, ভাল।'

'আপনি ঐ দিন এসেছিলেন, আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, নিচে নামতে ইচ্ছা করছিল না। আপনি কিছু মনে করেননি তো?'

'না না, কিচ্ছু মনে করিনি। একা-একা বসে থাকতে আমার ভালই লাগে।'

'আপনার ঐ কাজের ব্যাপারটা নিয়ে বাবার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। তিনি 'ওকে' বলেছেন।

'প্রথমে তো আপনি 'নো' বলে দিয়েছিলেন, আবার কেন...'

'আপনার চাকরি চলে যাবে বলেছিলেন যে, তাই। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

ফিরোজ বসল। বসতে গিয়ে মনে হল, এই মেয়েটি বসবে না। কথা বলবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে-কোনোভাবেই হোক, বুঝিয়ে দেবে, তুমি আর আমি একই আসনে পাশাপাশি বসতে পারি না। সেটা শোভন নয়। কিন্তু অবাক কাণ্ড, মেয়েটি বসল! ফিরোজ বলল, 'আমি অবশ্যি খুব ভয়ে-ভয়ে এসেছি। ভেবেছি আপনি গালাগালি করবার জন্যে আমাকে ডেকেছেন।'

'কী আশ্চর্য! গালাগালি করব কেন?'

'যেদিন আপনি আমার কাজ বন্ধ করে দিলেন, সেদিন রাগ করে আপনাদের একটা দামি কাপ ভেঙে ফেলেছিলাম।'

'তাই নাকি! বাহ্, বেশ তো!'

'আপনি জানতেন না?'

অপালা অবাক হয়ে বলল, 'সামান্য কাপ ভাঙার ব্যাপারে আমি জানব কেন?'

'ও, আচ্ছা।'

'আপনি যে দিন ইচ্ছা শুরু করতে পারেন। যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে কথা বললেই হবে। আমি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত, নিচে সাধারণত নামি না।'

'কিসের এত পড়াশোনা?'

'অনার্স ফাইন্যাল।'

'ও আচ্ছা! আপনাকে অবশ্যি অনার্স ফাইন্যালের ছাত্রী মনে হয় না। মনে হয় কলেজ-টলেজে পড়েন।'

অপালা কিছু বলল না। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। ফিরোজ সেটা লক্ষ্য করল না। ফুর্তির ভঙ্গিতে বলতে লাগল, 'পড়াশোনা করতে-করতে যদি ব্রেইন টায়ার্ড হয়ে যায়, তাহলে চলে আসবেন, আমি কাজ বন্ধ রেখে আপনার সঙ্গে গল্প-গুজব করব, ব্রেইন আবার ফ্রেশ হয়ে যাবে।'

'তার মানে? আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?'

ফিরোজ অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটির মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। ঠোঁট অল্প-অল্প কাঁপছে। এতটা রেগে যাবার মত কিছু কী সে বলেছে?

'আপনি হঠাৎ এমন রেগে গেলেন কেন? আমি অন্য কিছু ভেবে এটা বলিনি। আপনার চেয়ে অনেক-অনেক রূপবতী একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। সেই মেয়েটিকে আগামী সপ্তাহে আমি বিয়ে করছি। দেখুন, তার ছবি দেখুন।'

ফিরোজ হাজি সাহেবের মেয়ের ছবিটি টেবিলে রাখল। ভাগ্যিস ছবিটি সঙ্গে ছিল! মেয়েটি একদৃষ্টিতে ছবিটির দিকে তাকিয়ে আছে। ফিরোজ সহজ স্বরে বলল, 'আপনাকে গল্প করতে এখানে আসতে বলার পেছনে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। আশা করি এটা আপনি বুঝতে পারছেন। আরেকটি কথা, যদি সে-রকম কোনো উদ্দেশ্যে আমার থাকে, তাহলে সেটা কী খুব দোষের কিছু? ভাগ্যগুণে বিরাট এক বড়লোকের ঘরে আপনার জন্ম হয়েছে, আমার ভাগ্য তেমন সুপ্রসন্ন ছিল না। তাই বলে আমার যদি আপনাকে ভাল লাগে, সেটা আমি বলতে পারব না? যদি বলি সেটা দোষের হয়ে যাবে?'

অপালা উঠে দাঁড়াল। ফিরোজ বলল, 'কথার জবাব-না দিয়েই চলে যাচ্ছেন? আমি কাজ করব কী করব না, সেটা অন্তত বলে যান।'

'কাজ করবেন না কেন? অবশ্যি আপনার ইচ্ছা না-করলে ভিন্ন কথা।'

ফিরোজ কাজে লেগে পড়ল। মতিনের ডিজাইন রাখল না। সম্পূর্ণ নিজের পরিকল্পনা। পছন্দ হলে হবে, না হলে হবে না। এক সপ্তাহ সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কাজ। এর মধ্যে

অপালাকে একটি বারের জন্যেও নিচে নামতে দেখা গেল না। এক বার কিছু সময়ের জন্যে বারান্দায় এসেছিল, ফিরোজের দিকে চোখ পড়তেই চট করে সরে গেল। অপমানিত হবার মত ঘটনা, কিন্তু ফিরোজকে তা স্পর্শ করল না। এক বার কাজে ডুবে গেলে অন্য কিছু তার মনে থাকে না। দেয়ালের ডিসটেম্পার বদলাতে গিয়ে মনে-মনে ভাবল--- এই অহঙ্কারী মেয়ে থাকুক তার অহঙ্কার নিয়ে, আমার কিছুই যায়-আসে না। ডিসটেম্পারের রঙ কিছুতেই পছন্দ হচ্ছে না। তার প্রয়োজন আকাশি রঙ, কিন্তু সেটা পাওয়া যাচ্ছে না। হয় বেশি গাঢ় হয়ে যাচ্ছে কিংবা বেশি হালকা। কড়া হলুদ এক বার দিয়ে দেখলে হয়। এতে রোদের এফেক্ট চলে আসতে পারে। হলুদ সবার অপছন্দের রঙ। ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে ম্যাজিকের মত এফেক্ট সৃষ্টি হতে পারে। সে চতুর্থ বার ডিসটেম্পার বদলে আবার আগের নীল রঙে ফিরে গেল। গৃহসজ্জায় দেয়াল খুবই জরুরি। এই দেয়ালের রঙ ঘরকে বন্দি করে ফেলবে কিংবা মুক্তি দেবে।

কাজ শেষ হবার পরও অপালা দেখতে গেল না। রমিলাকে বলল, 'চলে যেতে বল। আর ম্যানেজার বাবুকে বল টাকাপয়সা মিটিয়ে দিতে।'

'দাড়িওয়ালা লোকটা আফনের পছন্দ হয়েছে কী না জানাতে চায়।'

'পছন্দ হয়েছে। বেশ পছন্দ হয়েছে।'

'দেখলেন না তো আফা!'

'দেখতে ইচ্ছা করছে না।'

অপালা তার দু' দিন পর নিশানাথবাবুর সঙ্গে ঘর দেখতে গেল। তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ কী অদ্ভুত কাণ্ড! কি-রকম ফাঁকা-ফাঁকা শান্তি-শান্তি ভাব। মেঝেতে এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত কার্পেটের মতো শীতল পাটি। ছোট-ছোট বেতের চেয়ারে হালকা নীল রঙের গদি। চেয়াবগুলি একটি গোল সেন্ট্রাল টেবিলের চারপাশে এমনভাবে সাজানো, যেন পদ্মফুল ফুটে আছে। শীতল পাটিটিকে লাগছে দিঘির কালো জলের মত। দেয়ালে একটিমাত্র জলরঙ ছবি। ঘন বন, মাঝখানে ছোট্ট একটি জলা। সেই জলার পানিতে আকাশের নীল রঙের ছায়া পড়েছে। একটি ছোট্ট মেয়ে সেই পানিতে ভাসছে। সমস্ত ঘরটায় একটা স্বপ্ন-স্বপ্ন ভাব চলে এসেছে। অপালার বিস্ময় কাটতে দীর্ঘ সময় লাগল।

'ম্যানেজার কাকু, কেমন লাগছে আপনার কাছে?'

'ভালই তো!'

'শুধু ভালই তো! আরো কিছু বলুন।'

'ছোকরা এলেমদার, তবে বিরাট ফক্কড়। যত টাকা নিয়েছে এই ঘর করতে, এর সিকি টাকাও লাগে না। ছোকরা বিরাট ফোরটোয়েন্টি।'

অপালা খিলখিল করে হেসে উঠল। এ-রকম শব্দ করে সে কখনো হাসে না। নিশানাথবাবু এই মেয়েটির হঠাৎ এই উচ্ছ্বাসের কারণ বুঝতে পারলেন না।

'ম্যানেজার কাকু।'

'বল মা।'

'আপনি ফিরোজ সাহেবকে জানিয়ে দেবেন যে তাঁর সাজানো ঘর আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জানাবেন।'

'দরকার কী? কাজ করেছে পয়সা নিয়েছে।'

'না, আপনি লিখবেন। আজই লিখবেন। কী লিখলেন, সেটা আমাকে দেখিয়ে নেবেন।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

'ম্যানেজার কাকু, ঐ ছবিটার দিকে দেখুন। একটা ছোট্ট মেয়ে পানিতে ভাসছে। আচ্ছা, মেয়েটা কী সাঁতার কাটছে, না পানিতে ডুবে মারা গেছে?'

'হবে একটা কিছু।'

'ছবিটার মধ্যে একটা গল্প আছে। ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, আপনার মধ্যে একটা কষ্টের ভাব হবে।'

নিশানাথবাবু অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অবাক হয়ে বললেন, 'কই, আমার তো কিছু হচ্ছে না।'

অপালা আবার খিলখিল করে হেসে ফেলল।

ফখরুদ্দিন সাহেবের মেজাজ অল্পতেই খারাপ হয়। দেশের মাটিতে সেই মেজাজ প্রকাশের যথেষ্ট পথ থাকলেও বিদেশে সম্ভব হয় না। আজ একের পর এক যে-সব কাণ্ড ঘটেছে, তাতে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে গেলেও দোষের ছিল না। তিন্তু তিনি মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে। প্লেনে তাঁর পাশের সহযাত্রিণী অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে হড়-হড় করে বমি করল, তার খানিকটা এসে পড়ল তাঁর গায়ে। তিনি মুখ বিকৃত করে বললেন, 'ইটস অলরাইট।' এয়ার হোস্টেস সাবান-পানি দিয়ে তাঁর কোট কয়েকবার মুছে দিল। তবু বমির উৎকট গন্ধ গেল না। টয়লেটে গিয়ে কাপড় বদলানো যেত। কিন্তু তাঁর সঙ্গে একটিমাত্র ব্রিফকেস। বড় স্যুটকেস দু'টি লাগেজ-কেবিনে।

প্লেন থেকে নামার সময়ও ছোট্ট দুর্ঘটনা ঘটল। সিঁড়িতে বেকায়দায় পা পড়ে পা মচকে গেল।

ইমিগ্রেশন অফিসারের সঙ্গেও কিছু কথা কাটাকাটি হল। অফিসারটি বলল, 'তুমি লন্ডনে কী জন্যে যাচ্ছ?'

তিনি বললেন, 'তা দিয়ে তোমার কী দরকার? আমার পাসপোর্টে ভিসা দেয়া আছে। সেই ভিসায় আমি ঢুকব।'

'তুমি আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কেন যাচ্ছ, বিজনেস ট্রিপ, না প্লেজার ট্রিপ?'

ফখরুদ্দিন সাহেব বিরস গলায় বললেন, 'সর্দি ঝাড়ার জন্যে যাচ্ছি। তোমার এই দেশ নাকের সর্দি ফেলার জন্যে অতি উত্তম।'

'তুমি কী আমার সঙ্গে রসিকতা করবার চেষ্টা করছ?'

'হ্যাঁ, করছি।'

'তোমার ব্রিফকেস খোল, হ্যান্ডব্যাগ খোল। চেকিং হবে।'

'এক বার হয়েছে।'

'আরো দশ বার হবে। তোমার সঙ্গে টাকাপয়সা কী পরিমাণ আছে?'

'যথেষ্টই আছে।'

'পরিমাণটা বল।'

পরিমাণ তোমাকে বলার প্রয়োজন দেখছি না। লিখিতভাবে আগেই এক বার বলা হয়েছে।'

'সুবোধ বালকের মতো আরো এক বার বল।'

'যদি বলতে না চাই?'

'তুমি এস আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

'অতি উত্তম প্রস্তাব। চল, যাওয়া যাক।'

ফখরুদ্দিন সাহেবকে তিন ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হল। যখন ছাড়া পেলেন, তখন তাঁর শরীর অবসন্ন। একটু পর পর বমি আসছে। বমির বেগ সামলাতে হচ্ছে। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা।

হোটেলে পৌঁছেই বাংলাদেশে কল বুক করতে চাইলেন। বলা হল— স্যাটেলাইটে ডিসটারবেন্স আছে, ওভারসিজ কল ছ' ঘণ্টার আগে করা যাবে না।

হেলেনার খোঁজে তাঁর নাসিং হোমে টেলিফোন করলেন। এ্যাটেনডেন্ট নার্স বলল, 'পেসেন্ট ঘুমুচ্ছে।

ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'আমি ওর স্বামী।'

নার্স মধুর হেসে বলল, 'তুমি পেসেন্টের স্বামীই হও বা প্রেমিকই হও, হার্টের রুগীকে ঘুম থেকে ডেকে তোলা যাবে না। সকাল আটটায় টেলিফোন করো, কেমন? এখন শান্ত হয়ে ঘুমাও। রাত কত হয়েছে সেটা বোধহয় তুমি জান না। গুড নাইট।'

রুম-সার্ভিসকে কফি দিতে বলেছিলেন। সেই কফি এল এক ঘণ্টা পর। চুমুক দিয়ে তাঁর মনে হল, তিনি কুইনাইন-গোলা গরম পানি খাচ্ছেন।

সারা রাত তাঁর ঘুম হল না। ছটফট করতে লাগলেন। শেষরাতের দিকে প্রবল জ্বরে সমস্ত চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল। তাঁর মনে হল এই হোটেলে তাঁকে মরতে হবে। আত্মীয়-পরিজনহীন নির্জন একটি ঘরে। শেষ মুহূর্তে পানি পানি করে চেঁচাবেন- - কেউ শুনবে না। কোনো প্রিয় মানুষের মুখ দেখতে চাইবেন, দেখতে পারবেন না।

প্রিয় মুখ এই সংসারে তাঁর নেই। বাবার মুখ অবছাভাবে মনে পড়লেও মা'র মুখ মনে পড়ে না। বাবার মুখও অস্পষ্ট, তাঁর মুখে বসন্তের দাগ ছিল। মাথায় চুলগুলি ছিল লালচে ধরনের কোঁকড়ানো। স্মৃতি বলতে এই। অবশ্যি এ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা কোনোকালেই ছিল না। যা চলে গিয়েছে, তা নিয়ে বুক চাপড়ানো এক ধরনের বিলাসিতা। এই বিলাসিতা কবি এবং শিল্পীর জন্যে ঠিক আছে। তাঁর জন্যে ঠিক নয়। তাঁর চোখ পেছনের দিকে নয়, সামনের দিকে।

তিনি রুম-সার্ভিসের বোতাম টিপলেন। লাল বাতি জ্বলে জ্বলে উঠছে। কেউ আসছে না। অসম্ভব ক্ষমতাবান লোকেরা প্রায় সময়ই নিঃসঙ্গ অবস্থায় মারা যায়।

দরজায় নক হচ্ছে। কেউ বোধহয় এসেছে। ফখরুদ্দিন সাহেব বহু কষ্টে বললেন, 'কাম ইন।'

লাল চুলের বেঁটেখাটো একজন মহিলা উঁকি দিল। ভয-পাওয়া গলায় বলল, 'তোমার কী হয়েছে?'

ফখরুদ্দিন সাহেব জবাব দিতে পারলেন না। শূন্যদৃষ্টিতে তাকালেন।

মনে হচ্ছে ফিরোজের বৃহস্পতি এখন তুঙ্গে।

বি. করিম সাহেবের বন্ধু তাঁকে সহকারী ডিজাইনার হিসেবে নিয়েছেন। ভদ্রলোক ছোটখাটো। মাগুর মাছের মত কালো রঙ। ফিটফাট বাবু সেজে থাকেন। তাঁর কাছে গেলেই আফটার শেভ লোশনের কড়া গন্ধে মাথা ধরে যায়। তাঁর নাম মন্তাজ মিয়া। ছবির লাইনে পনের বছর ধরে আছেন। এখন পর্যন্ত কোনো ছবি হিট করেনি। তাঁর ধারণা, এবারের ছবিটি করবে। ছবির নাম 'নয়া জিন্দেগি'— ইংরেজিতে ফ্রেশ লাইফ, নিউ লাইফ নয।

এই ছবি হিট করবে, এ-রকম আশা করার সঙ্গত কারণ আছে। ছবিতে তিনজন হিরোইন। দুজন মারা যায়। শেষ পর্যন্ত একজন টিকে থাকে। হিরো এবং হিরোইন নয়া জিন্দেগি শুরু করবে। ছ'টা গান আছে। প্রতিটি গানই কলকাতার আর্টিস্টদের দিয়ে গাওযানো। ব্যালে ড্যান্স আছে, যা রেকর্ড করা হয়েছে কলকাতার এক ক্যাবারেতে। প্রিন্সেস সুরাইযা এমন এক ড্যান্স দিযেছে, যা দেখে এই বুড়ো বয়সেও মন্তাজ মিযার বুক ধবফড় করে। সেন্সার এই জিনিস কেটে দিলে সর্বনাশ হবে। ছবির অর্ধেক কাজ বিদেশে হয়েছে, বাকি অর্ধেক দেশে হবে। বেশির ভাগই আউটডোরে। ইনডোরে হিরোর বসার ঘর এবং বারান্দা। এমন সেট করতে হবে, যাতে রিকশাওযালা শ্রেণীব দর্শকদের চোখ কোটর থেকে ঠেলে বের হয়ে আসে। ক্রমাগত সিটি বাজাতে থাকে।

মন্তাজ মিয়ার সঙ্গে ফিরোজের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হল :

'তুমি করে বললে আপত্তি আছে?'

'জি না।'

'গুড। সবাইকে আমি তুমি করে বলি। এ-দেশের যে টপ নায়িকা, যার সাইনিং মানি পঁচিশ হাজার টাকা, তাকেও তুমি করে বলি।'

ফিরোজ তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

'তুমি কাজে লেগে পড়। কীভাবে কী করতে হয়, আগে শেখ। আমি যা চাই সেটা হচ্ছে গ্ল্যামার। জি এল এ এম ও ইউ আর। বুঝলে?'

'জি, বুঝলাম।'

'বোম্বের ছবিগুলি দেখ। দেখে কাজ শেখ।'

'হ্যাঁ, তাই করব।'

'বি. করিম সাহেব বলেছেন, তুমি প্রতিভাবান লোক। সত্যি নাকি?'

'জি না, সত্যি না।'

'গুড। ভেরি গুড। জি ও ও ডি। প্রতিভাবান লোকদের দিয়ে কিছু হয় না। আমি চাই কাজ। ওয়ার্ক। ডাবলিউ ও আর কে। বুঝলে?'

'জি, বুঝলাম।।'

'মদ্যপানের অভ্যাস আছে?'

'না।'

'অল্পসল্প খেতে পার। এতে দোষ নেই। অল্প খেলে মেডিসিনের মতো কাজ করে। ব্রেইন শার্প হয়। ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলি যে এত দূর এগিয়ে গেছে জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, সংস্কৃতিতে - এর

পেছনে অ্যালকোহলের একটা ভূমিকা আছে বলে আমার ধারণা।'

'আপনার ধারণা সত্যি হবারই সম্ভাবনা।'

'নায়িকাদের সঙ্গে খাতির জমাবার চেষ্টা করবে না। দূর থেকে ম্যাডাম বলে স্লামালিকুম দেবে। তারপর ভ্যানিশ হয়ে যাবে। ফিল্ম লাইনে তোমার হবে বলে আমার ধারণা।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। আমার ই এম পি ক্ষমতা আছে। আগেভাগে বলে ফেলতে পারি। মন্দিরা যখন প্রথম ফিল্ম লাইনে আসে, তাকে দেখেই আমি বললাম, তোমার হবে।'

'হয়েছে?'

'হয়েছে মানে! দু' লক্ষ টাকার আর্টিস্ট এখন। শিডিউল নিতে হয় এক বছর আগে। আমাকে এখানে খুব মানে। সেদিন এক পত্রিকার ইন্টারভ্যুতে আমার নাম বলেছে।'

'মন্দিরা কাজ করছে নাকি আপনার ছবিতে?'

'তুমি এখন ফিল্ম লাইনের লোক। নায়িকাদের নাম ধরে কথা বলবে না। এখন থেকে প্র্যাকটিস কর। বল— মন্দিরা ম্যাডাম।'

ফিরোজ হেসে বলল, 'মন্দিরা ম্যাডাম।'

'হাসবে না। ফিল্ম লাইনে দাঁত বের করতে নেই। আচ্ছা, এখন যাও। কাল দু'নম্বর স্টুডিওতে চলে আসবে।'

ফিরোজ সেট তৈরি করে দিল। মন্তাজ মিয়া চোখ-মুখ কুঁচকে দীর্ঘ সময় সেই সেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ফিরোজ বলল, 'মনে হচ্ছে আপনার মনমত হয়নি?'

মন্তাজ মিয়া তারও জবাব দিলেন না।

'পছন্দ না হলে অদলবদল করে দেব। হাতে তো সময় আছে।

'পছন্দ হযেছে। ছোকরা, তোমাব হবে।'

সেই সপ্তাহেই মধুমিতা মুভিজ-এর ব্যানারে নতুন যে-ছবিটি হবে, তার চিফ ডিজাইনার পদেব অফার ফিবোজের কাছে চলে এল। ফিরোজ বলল, 'ভেবে দেখি।'

মধুমিতা মুভিজ-এর মালিক বললেন, 'ক'দিন লাগবে ভাবতে?'

'সপ্তাহখানেক লাগবে।'

'বেশ, ভাবুন। সপ্তাহখানেক পর আবার যোগাযোগ করব। আপনার টেলিফোন আছে?'

'জি না।'

একটা টেলিফোন নিয়ে নিন। ছবির লাইনে টেলিফোনটা খুবই দরকারি।'

'নিয়ে নেব। শিগগিরই নিয়ে নেব। তারপর একটা গাড়ি কিনব। লাল রঙের। টু-ডোর। গাড়ি সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা আছে? মানে কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ?'

পর পর দু'দিন ফিরোজ ঘুমিয়ে কাটাল।

এ-রকম সে করে। তার ভাষায়, দুঃসময়ের জন্যে ঘুম স্টক করে রাখা। সেই স্টক-করা ঘুমের কারণে ভবিষ্যতে কোনো রকম আলস্য ছাড়াই না-ঘুমিযে থাকতে পারে। উট যেমন দুঃসময়ের জন্যে পানি জমা করে রাখে, অনেকটা সে-রকম। শুধু দুপুরে খাবার সময় পাশের 'ইরাবতী' হোটেলে খেতে গেছে। বাংলাদেশ হওয়ায় এই একটি লাভ; সুন্দর-সুন্দর নামের ছড়াছড়ি। পানের দোকানের নাম 'ময়ূরাক্ষী'; জুতোর দোকানের নাম 'সোহাগ পাদুকা'।

ইরাবতী রেস্টুরেন্টের নাম হওয়া উচিত ছিল - 'নালাবতী'। পাশ দিয়ে কর্পোরেশনের নর্দমা গিয়েছে। নর্দমাগুলি বানানোর কায়দা এমন যে, পানি চলে যায়, কিন্তু ময়লা জমা হয়ে থাকে। সেই পূতিগন্ধময় নরকের পাশে খাবার ব্যবস্থা। তবে রান্না ভাল। পচা মাছও এমন করে রেঁধে দেয় যে দ্বিতীয় বার যেতে ইচ্ছে করে। ইরাবতী রেস্টুরেন্টে ফিরোজের তিনশ টাকার মত বাকি ছিল। সে বাকি মিটিয়ে আরো দু'শ টাকা অ্যাডভান্স ধরে দিল। দিনকাল পাল্টে গেছে। অ্যাডভান্স পেয়েও লোকজন খুশি হয় না। ম্যানেজার এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কিছুক্ষণ আগে একটি জ্যান্ত ইঁদুর গিলে ফেলেছে। সেই ইঁদুর হজম হয়নি, পেটে নড়াচড়া করছে।

ফিরোজ বলল, 'আছেন কেমন ভাইসাব?'

'ভালই। আপনারে তো দেখি না।'

'সিনেমা নিয়ে ব্যস্ত। সিনেমায় নেমে পড়েছি, বুঝলেন?'

ম্যানেজার ফুস করে বলল, 'ভালই।'

'আপাতত হিরোইনের বড় ভাইয়ের রোল করছি। মোটামুটি একটা সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার। বই রিলিজ হলে দেখবেন। পাস দিয়ে দেব।''

'নাম কী বইয়ের?'

'নয়া জিন্দেগি। হিট বই হবে।'

ফিরোজ রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে মিষ্টি পান কিনল। রাতে আর খেতে আসবে না। ঘরেই যা হোক কিছু খেয়ে নেবে, কাজেই পাউরুটি, কলা এবং এক কৌটা মাখন কিনল। বাজারে নতুন বরই উঠেছে. খেতে ইচ্ছা করছে। ভাংতি টাকা সব শেষ। একটা পাঁচশ টাকার নোট আছে, সেটা ভাঙাতে ইচ্ছা করছে না। বরই না কিনেই সে ফিরে এল। ছেলেমানুষি একটা আফসোস মনে জেগে রইল।

হাজি সাহেব বারান্দায় ইজি চেয়ারে বসে আছেন। ফিরোজ হাসিমুখে এগিয়ে গেল।

'স্লামালিকুম।'

'ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন ফিরোজ সাহেব?'

'জি, ভাল।'

'ক'দিন ধরে দেখি না আপনাকে?'

'দারুন ব্যস্ত! আজ একটু ফাঁকা পেয়েছি, ভাবলাম আপনাকে জরুরি কথাটা বলে যাই।'

'কী জরুরি কথা?'

'ঐ যে আপনার মেয়ের ছবি নিয়ে গেলাম যে!'

'ও, আচ্ছা। বসেন. চা খাবেন?'

'তা খাওয়া যায়।'

হাজি সাহেব ভেতরে গিয়ে চায়ের কথা বলে এলেন। ফিরে এসে আগ্রহী চোখে তাকিয়ে রইলেন।

'ঐ যে আপনার কাছ থেকে ছবি নিয়ে গিয়েছিলাম. ছবি দেখে সবার এক কথা - মেয়ে কী ছবির মত সুন্দর? ফটোজেনিক ফেস ভাল থাকলে অনেক সময় এলেবেলে মেয়েকেও রাজকন্যার মত লাগে।'

হাজি সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন।

'মেয়ে যদি ছবির কাছাকাছিও হয়, তাহলেও ওদের কোনো আপত্তি নেই। যেদিন বলবেন. সেদিনই বিয়ে।'

আপনি কী মেয়ের অসুবিধার কথাটা বলেছেন?'

'পাগল হয়েছেন। এখন আমি এইসব বলব? কথাবার্তা মোটামুটি পাকা হয়ে যাবার পর খুব কায়দা করে...।'

'না, যা বলবার এখনই বলবেন। মেয়েকে আমি একটা বাড়ি লিখে দেব. এটাও বলবেন। ৪৩ কাঁঠাল বাগান। একতলা বাড়ি। ইচ্ছা করলে বাড়ি দেখে আসতে পারেন।'

'মেয়েই দেখলাম না, আর বাড়ি!'

'বাড়িটাই লোকে আগে দেখে, মেয়ে দেখে পরে। তবে মেয়েকে আপনি দেখবেন। আসতে বলেছি। আসুন, ভেতরে গিয়ে বসি।'

তারা বসার ঘরে পা দেয়ামাত্র হাজি সাহেবের ছোট মেয়েটি ঘরে ঢুকল। কী শান্ত স্নিগ্ধ মুখ! গভীর কালো চোখে ডুবে আছে চাপা কষ্ট। সেই কষ্টের জন্যেই বুঝি এমন টলটলে চোখ।

ফিরোজ বলল, 'দাঁড়িয়ে আছ কেন, বস।'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বসল। তার আচার-আচরণে কিছুমাত্র জড়তা লক্ষ্য করা গেল না। সে সরাসরি তাকিয়ে আছে, চোখ নামিয়ে নিচ্ছে না।

'কী নাম তোমার?'

'লতিফা।'

'প্রায় চার বছর তোমাদের এদিকে আছি। নামটা পর্যন্ত জানি না। খুবই অন্যায়। তুমি কী

আমার নাম জান?'

'জানি।'

হাজি হাসেব বললেন, 'লতিফা, তুই এখন ভেতরে যা। চা দিতে বল।'

লতিফা সঙ্গে সঙ্গে উঠে চলে গেল। ফিরোজ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে ফেলল। তার ইচ্ছে করছে, বলে— পাত্র হিসেবে আমাকে আপনার কেমন লাগে?

বলা হল না। আধুনিক সমাজে বাস করার এই অসুবিধে। মনের কথা খোলাখুলি কখনো বলা যায় না। একটি মেয়েকে ভাল লাগলেও তাকে সরাসরি সেই কথা বলা যাবে না। অনেক ভনিতা করতে হবে। অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হবে।

হাজি সাহেব বললেন, 'আমার মেয়েটা বড় আদরের।'

ফিরোজ কিছু বলল না। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। এই মুহূর্তে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটার একটা আলাদ মজা আছে। যে-কোনো দিকে যাওয়া যায়, যেখানে ইচ্ছে সেখানে থেমে যাওয়া যায়। এই সৌভাগ্য ক'জনার হয়? সবাই ব্যস্ত। সবাই ছুটছে। এর মধ্যে দু'একজন অন্য রকম থাকুক না, যাদের ছোটার ইচ্ছে নেই, প্রয়োজনও নেই।

এখন প্রায় বিকেল। হাঁটতে-হাঁটতে অপালাদের বাড়ির সামনে চলে যাওয়া যায়। কেন জানি এই অহঙ্কারী মেয়েটিকে দেখতে ইচ্ছে করছে। তার কঠিন মুখ, চোখের তীব্র দৃষ্টিও কেন জানি মধুর। এর ব্যাখ্যা কী? কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই রহস্যময় পৃথিবীর অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যায় না। কবি, দার্শনিক, শিল্পী— এঁরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা কত যুগ আগে শুরু হয়েছে, এখনও চলছে। ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয়নি।

'ফিরোজ সাহেব, কী ভাবছেন?'

'কিছু ভাবছি না। শরীরটা খারাপ লাগছে।'

'সে কী!'

'আজ আর চা-টা কিছু খাব না। ডাক্তারের কাছে যাব। বমি-বমি লাগছে।'

ফিরোজ বমির ভঙ্গি করে চোখ-মুখ উল্টে দিয়ে বলল, 'কাল রাতেও চার বার বমি হয়েছে। আমি উঠলাম।'

অপালাদের বাড়ির সামনে ফিরোজ দাঁড়িয়ে আছে। এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন তাকে দেখা না-যায়। মানুষের অদৃশ্য হবার ক্ষমতা থাকলে বেশ হত। মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে দেখা যেত সে কী করছে। এই মুহূর্তে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। চেইনে বাঁধা ভয়াবহ কুকুর দু'টি চেইন ছিঁড়ে ফেলবার একটা কসরত করছে। মালীকে নিড়ানি হাতে দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া সব ফাঁকা।

'স্যার।'

ফিরোজ চমকে উঠল।

'আপনাকে ডাকে স্যার।'

'কে ডাকে?'

'আপা আপনাকে যাইতে বলছে।'

'কোন আপা?'

'অপালা আপা।'

'সে কী! কোথায় তিনি?'

অপালাদের দারোয়ান তার উত্তর দিল না। দারোয়ান-শ্রেণীর লোকেরা কথা কম বলে।

মেয়েটিকে সম্পূর্ণ অন্য রকম লাগছে। ফিরোজ ভেবে পেল না একই মেয়েকে একেক দিন একেক রকম লাগে কেন। এর পেছনের রহস্যটা কী? সাজগোজের একটা ব্যাপার থাকতে পারে। তার ভূমিকা কতই-বা আর হবে? চোখে কাজল দিয়ে চোখ দু'টিকে টানা-টানা করা যায়। চুল মাঝখানে সিঁথি না-করে বাঁ দিকে করে খানিকটা বদলানো যায়। পার্ম করে চুলে ঢেউ খেলানো নিয়ে আসা যায়, কিন্তু তার পরেও তো মানুষটি ঠিকই থাকবে!

'বসুন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

ফিরোজ বসল। বসতে-বসতে মনে হল অপালার গলার স্বরও এখন অন্য রকম লাগছে।

একটু যেন ভারী। আগেকার তরল কণ্ঠস্বর নয়।

'আপনি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এর আগেও একদিন এসে ছিলেন। বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যান। কেন বলুন তো?'

ফিরোজ কী বলবে ভেবে পেল না। কিছু এই মুহূর্তেই বলা উচিত। মেয়েটি জবাব শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছে। জবাবের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে। জবাব যদি তার পছন্দ হয়, তাহলে সে ফিরোজের সামনের চেয়ারটায় বসবে, পছন্দ না-হলে বসবে না। অহঙ্কারী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকবে।

অপালা বলল, 'আপনার যদি আপত্তি থাকে তাহলে বলার দরকার নেই।'

'না, কোনো আপত্তি নেই। আপনার সঙ্গে দেখা হবে এই আশাতেই দাঁড়িয়ে থাকি। দু'দিন মাত্র নয়, তার আগেও কয়েকবার এসেছি।'

ফিরোজ লক্ষ্য করল, মেয়েটির চেহারা কঠিন হতে শুরু করেছে। কী প্রচণ্ড রাগ এই মেয়ের! গাল কেমন টকটকে লাল হয়ে গেল— ঠোঁট কাঁপছে। মেয়েটি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে। সামলাতে পারছে না। মানুষের সঙ্গে কথা বলে এই মেয়ের তেমন অভ্যাস নেই। অভ্যাস থাকলে খুব সহজেই নিজেকে সামলাতে পারত। ফিরোজ বলল, 'আমার সব কথা না শুনেই আপনি রেগে যাচ্ছেন। সবটা আগে শোনা ভাল নয় কি?'

'বলুন, শুনছি।'

'আপনি বসুন, তারপর বলছি। আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন আর আমি বসে-বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে কথা বলব, তা তো হয় না। আর আপনি যদি মনে করেন যে আমার স্তর আর আপনার স্তর আলাদা, তাহলে অবশ্যি ভিন্ন কথা।'

অপালা বসল। সে তাকিয়ে আছে ফিরোজের দিকে, এক বারও চোখ ফিরেয়ে নিচ্ছে না। এটিও একটা মজার ব্যাপার। এই বয়সের অবিবাহিত মেয়েরা দীর্ঘ সময় পুরুষ মানুষের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না। অসংখ্য বার তারা চোখ নামিয়ে নেয়।

'কী বলবেন, বলুন।'

'আমি নিজের মতো করে আপনাদের একটা ঘর সাজিয়ে দিয়েছি। সেটা আপনাদের পছন্দ হয়েছি কী হয়নি আমাকে কিচ্ছু বলেননি। আমার জানতে ইচ্ছা করে। জানবার জন্যেই আসি।'

'আসেন তো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?'

'আপনাদের দু'টি বিশাল কুকুর আছে। আমি কুকুর ভয় পাই। ছোটবেলায় আমাকে দু'বার পাগলা কুকুরে কামড়েছে।'

অপালার কঠিন মুখ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। গালের লাল রঙ এখন অনেকটা কম, নিঃশ্বাস সহজ।

'আপনার কাজ আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আমি ম্যানেজার কাকুকে বলেছিলাম, চিঠিতে আপনাকে জানানোর জন্যে। তিনি বোধহয় জানাতে ভুলে গেছেন।'

'চিঠিতেই যখন জানানোর জন্যে বলেছেন, আপনি নিজেও তো জানাতে পারতেন। পারতেন না?'

'হ্যাঁ, পারতাম।'

'কাজ আপনার ভাল লেগেছে শুনে খুশি হলাম। এখন তাহলে উঠি।'

ফিরোজ উঠে দাঁড়াল। মনে ক্ষীণ আশা, মেয়েটি বলবে, বসুন, চা খেয়ে যান। সন্ধ্যাবেলা এইটুকু ভদ্রতা সে কী করবে না?'

অপালা বলল, 'আপনি বসুন। আমার সঙ্গে চা খান।'

ফিরোজ সঙ্গে-সঙ্গে বসে পড়ল। একবার ভেবেছিল রাগ দেখিয়ে বলবে চা লাগবে না। সেটা বিরাট বোকামি হত। এ যে-ধরনের মেয়ে, দ্বিতীয় বার অনুরোধ করবে না। দু'জন চুপচাপ বসে আছে। মেয়েটি চায়ের কথা বলার জন্যে ভেতরে যাচ্ছে না, কিংবা কাউকে ডেকেও কিছু বলছে না। এই পয়েন্টটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মানে হল, মেয়েটি তাকে ডাকতে পাঠাবার আগেই বলে দিয়েছে— আমরা খানিকক্ষণ গল্প করব, তখন আমাদের চা দেবে। অর্থাৎ কিছুক্ষণ সে গল্প করবে।

অপালা বলল, 'আসুন, আমরা বারান্দায় বসে চা খাই। আমার চা খাবার একটা আলাদ

জায়গা আছে। বিকেলের চা বন্ধ ঘরের ভেতরে বসে খেতে ইচ্ছা করে না।'

চা খাবার জায়গাটি অপূর্ব! যেন একটি পিকনিক স্পট। চারদিকে ফুলের টব। বড় কসমস ফুটে রয়েছে। দিনের সামান্য আলোতেও তারা আনন্দে ঝলমল করছে। টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। সেই সরঞ্জাম দেখে ফিরোজ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস চাপল। কারণ একটিমাত্র চায়ের কাপ। ওরা একজনের চা-ই দিয়েছে।

অপালা টেবিলের পাশে দাঁড়ানো মেয়েটিকে বলল, 'অরুণা ও বরুণাকে বেঁধে রাখতে বল। আরেকটি চায়ের কাপ দিয়ে যাও।'

কাজের মেয়েটি সন্দেহজনক দৃষ্টি ফেলতে-ফেলতে যাচ্ছে। কর্মচারীর মত যে ঢুকেছে, সে মুনিবের মেয়ের সঙ্গে চা খাচ্ছে, দৃশ্যটিতে সন্দেহ করার মত অনেক কিছুই আছে।

'আমার চায়ের জায়গাটা আপনার কেমন লাগছে?'

'খুব ভাল লাগছে।'

'আপনার বোধহয় একটু শীত-শীত লাগছে। এ-রকম একটা পাতলা জামা পরে কেউ শীতের দিনে বের হয়!'

আহ, কী সহজ-স্বাভাবিক সুরে মেয়েটি কথা বলছে! কী প্রচুর মমতা তার গলায়! ফিরোজের মন কেমন যেন অন্য রকম হয়ে গেল।

'আপনার বিয়েটা এখনো হয়নি, তাই না?'

'কোন বিয়ে?'

'ঐ যে একটি মেয়ের ছবি দেখালেন। বলছিলেন, এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে হবে।'

'ও, আচ্ছা। না, এখনো হয়নি। সামনের মাসে হবার সম্ভাবনা। মেয়ের এক চাচা আমেরিকাতে থাকেন। ছুটি পাচ্ছেন না বলে আসতে পারছেন না। মেয়ে আবার খুব আদরের। কেউ চায় না যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে বিয়ে হোক। বাঙালি হচ্ছে সেন্টিমেন্টাল জাত, বুঝতেই পারছেন।'

প্রচুর মিথ্যা বলতে হয় বলেই মিথ্যা বলা আর্ট ফিরোজের খুব ভাল জানা। মিথ্যা কখনো এক লাইনে বলা যায় না। মিথ্যা বলতে হয় আঁটঘাট বেঁধে। সত্যি কথার কোনো ডিটেল ওয়ার্কের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু মিথ্যা মানেই প্রচুর ডিটেল কাজ।

অপালা বলল, 'আপনি যে এখনো বিয়ে করেননি, সেটা কিভাবে বুঝলাম বলুন তো?'

'কীভাবে বুঝলেন?'

'আপনার গায়ের পাতলা জামা দেখে। এই ঠাণ্ডায় আপনার স্ত্রী কিছুতেই এমন একটা জামা গায়ে বাইরে ছাড়তেন না।'

ফিরোজ লক্ষ্য করল, মেয়েটি ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে হাসছে, যেন এই বিরাট আবিষ্কারে সে উল্লসিত।

'আপনি কী আরেক কাপ চা খাবেন?'

'হ্যাঁ, খাব। এক কাপ খেলে খালে পড়ার সম্ভাবনা।'

'আপনি নিশ্চয়ই আমাকে খুব অহঙ্কারী মেয়ে ভেবে বসে আছেন, তাই না? আমি কিন্তু মোটেই অহঙ্কারী না।'

'তাই তো দেখছি!'

'একা-একা থাকতে-থাকতে স্বভাবটা আমার কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে।'

'একা-একা থাকেন কেন?'

'ইচ্ছা করে কি আর থাকি? বাধ্য হয়ে থাকতে হয়। মা অসুস্থ। বাবা সারাক্ষণই বাইরে-বাইরে ঘুরছেন।'

'অন্য আত্মীয়স্বজনরা আসেন না?

'না।'

'কেন?'

'জানি না কেন। আমাকে বোধহয় পছন্দ করেন না।'

'আপনাকে পছন্দ না-করার কী আছে? আমার তো মনে হয় আপনার মত চমৎকার মেয়ে এই গ্রহে খুব বেশি নেই।'

ফিরোজ লক্ষ্য করল, মেয়েটি আবার রেগে যাচ্ছে। তার মুখে আগের কাঠিন্য ফিরে আসছে।

ফিরোজের আফসোসের সীমা রইল না। অপালা বলল, 'আসুন, আপনাকে গেট পর্যন্ত আগিয়ে দিই।'

অর্থাৎ অত্যন্ত ভদ্র ভাষায় বলা— বিদেয় হোন। ফিরোজের মন-খারাপ হয়ে গেল। আরেক বার আসার আর কোনো উপলক্ষ নেই। দিন সাতেক পর সে যদি এসে বলে- ঐদিন একটা খাম কি আপনার এখানে ফেলে গেছি— তাহলে তা কী বিশ্বাসযোগ্য হবে? মনে হয় না। এই মেয়েটি অসম্ভব বুদ্ধিমতী।'

সে গেট পর্যন্ত ফিরোজের সঙ্গে-সঙ্গে এল, কিন্তু একটি কথাও বলল না। ফিরোজ যখন বলল, 'যাই তাহলে।' সে তার জবাবেও চুপ করে রইল। শুধু দারোয়ানকে বলল, 'অরুণা এবং বরুণাকে এখন ছেড়ে দাও।'

নিশানাথবাবু রাতের বেলা খবর নিতে এলেন। এই মানুষটি সাধারণত খুব হাসিখুশি। কিন্তু আজ কেমন যেন গম্ভীর লাগছে। মুখে খুব চিন্তিত একটা ভঙ্গি। অপালা, বলল, 'ম্যানেজার কাকু, আপনার কী শরীর খারাপ?'

'না, শরীর ভালই আছে।'

'বাবার কোনো খবর পেয়েছেন?'

'না। ইংল্যান্ডে পৌঁছেছেন, সেই খবর জানি। তারপর আর আমি কিছু জানি না। স্যার মাঝে মাঝে এ রকম ডুব মারেন, তখন সব সমস্যা একসঙ্গে শুরু হয়।'

'কোনো সমস্যা হচ্ছে কী?'

'না, তেমন কিছু না।'

নিশানাথাবাবু এড়িয়ে গেলেন। অপালার মনে হল, বড় কোনো সমস্যা হয়েছে। কারখানা-সংক্রান্ত কোনো সমস্যা, যা এরা অপালাকে বলবে না। অপালারও এ-সব শুনতে ইচ্ছে করে না। সমস্যা থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।

'ম্যানেজার কাকু!'

'কী মা?'

'ফিরোজ বলে যে-ছেলেটি আমাদের ঘর ঠিক করে দিল, তাকে একটি চিঠি দিতে বলেছিলাম, দেননি কেন?'

নিশানাথবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'দিয়েছি তো!'

'ও, তাহলে উনি বোধহয় পাননি। রেজিস্ট্রি করে দেয়া দরকার ছিল।'

'রেজিস্ট্রি করেই তো দিয়েছি! চিঠির সঙ্গে একটা রেভিনিউ স্ট্যাম্প-বসানো রিসিট ছিল। উনি তো সেখানে সই করে ফেরত পাঠিয়েছেন! কাজেই আমার চিঠি না-পাওয়ার তো কোনো কারণ নেই। আমি বরং কাল তাঁকে জিজ্ঞেস করব।'

'না, জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।'

নিশানাথবাবু ইতস্তত করে বললেন, 'ছেলেটি আজ এখানে এসেছিল, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এদের বেশি প্রশ্রয় দেয়া ঠিক না, মা। কাজ করেছে টাকা নিয়েছে, ব্যস, ফুরিয়ে গেল। আবার এসে এত কিসের চা খাওয়াখাওয়ি!'

অপালা অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। নিশানাথবাবুর হঠাৎ এখানে আসার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হচ্ছে। তিনি এমনি-এমনি আসেননি। নিশ্চয়ই তাঁকে খবর দেয়া হয়েছে। টেলিফোনে জানানো হয়েছে।

'মা অপালা।'

'জি।'

'তুমি একা-একা থাক, তোমার বোধহয় খারাপ লাগে।'

'না, আমার খারাপ লাগে না।'

'খারাপ না-লাগলেও লোনলি তো নিশ্চয়ই লাগে! আমি তোমার কাকিমাকে বলেছি, সে এসে থাকবে।'

'কোনো দরকার নেই।'

'না, দরকার আছে।'

'বেশ, দরকার থাকলে তাঁকে নিয়ে আসুন। তবে আপনি কিন্তু কাকু শুধু-শুধু ভয় পাচ্ছেন। ঐ ছেলে আর এখানে আসবে না।'

নিশানাথবাবুকে কোনো কথা বলার সুযোগ না-দিয়ে অপালা উঠে গেল। তার প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

ফখরুদ্দিন সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, 'আমি একটা টেলিফোন করব। দয়া করে ব্যবস্থা করে দিন।'

যে-নার্স তাঁর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে, সে বলল, 'আরো একটু ভালো হয়ে নাও, তারপর করবে।'

'আমি ভাল আছি।'

'তুমি মোটেও ভাল নও। খুবই অসুস্থ।'

'কতটা অসুস্থ?'

'অনেকটা তুমি কোথায় চলে গিয়েছিল - ঈশ্বরের অনুগ্রহে ফিরে এসেছ।'

'এখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাকে একটি টেলিফোন করতে দাও।'

'নিশ্চয়ই করবে। আত্মীয়স্বজনকে খবর দিতে চাও তো? সে-ব্যবস্থা আমরা করেছি। তোমাদের এম্ব্যাসিকে জানানো হয়েছে। তারা নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।'

'আমাদের এম্ব্যাসির কাজকর্ম সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই। ওরা কিছুই করেনি। যে-নোট তোমারা পাঠিয়েছ, সেই নোট ওরা এখনো পড়েনি। খাম খোলা হয়নি বলেই আমার ধারণা।'

নার্স কোনো কথা বলল না। ফখরুদ্দিন সাহেবের বাঁ হাতে একটি ইনজেকশন করল। ফখরুদ্দিন সাহেব আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙল রাত ন'টায়। টেলিফোনে প্রথম কথা বললেন অপালার সঙ্গে।

'বাবা, তুমি! সবাই চিন্তায় অস্থির। তোমার কোনো খোঁজ নেই। মা'র সঙ্গে ঐ দিন কথা হল, মাও তোমার কোনো খোঁজখবর জানে না। তুমি আজ কেমন আছ?'

'খুব ভাল আছি।'

'গলার স্বর এমন লাগছে কেন?'

'সর্দি লেগেছে। কথাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এখন তো তাও কথা বলতে পারছি।'

'তুমি কথা বলছ কোত্থেকে?'

'লন্ডন থেকেই বলছি।'

'এতদিন ডুব মেরে ছিলে কেন?'

'দেখলাম ডুব মেরে থাকতে কেমন লাগে। একদিন ডুব মারতেই হবে। হা হা হা। তোমার খবর কি?'

'আমার কোনো খবর নেই। বসার ঘর ঠিক করা হয়েছে বাবা। এত সুন্দর করে সাজিয়েছে যে, দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না মা। কিসের ঘর?'

'ও-মা, ভুলে গেছ! বসার ঘরের ডেকোরেশন বদলানো হল না?'

'ও, আচ্ছা।'

'তোমার তো এটা ভুলে যাবার কথা নয় বাবা! তুমি তো কিছুই ভোলো না।'

'এখন মনে হয় কিছু কিছু ভুলে যাচ্ছি। বয়স হয়ে যাচ্ছে। গেটিং ওল্ড। বসার ঘরটা খুব সুন্দর হয়েছে বুঝি?'

'খুব সুন্দর! এক বার বসার ঘরে ঢুকলে তোমার বেরুতে ইচ্ছা করবে না।'

'তাহলে তো ডেকোরেশন ঠিক হয়নি। বসার ঘরে এমন হবে, যেন কেউ বেশিক্ষণ না বসে। যেন খুব অস্বস্তি বোধ করে। চট করে চলে যায়। হা হা হা।'

'বাবা।'

'কি মা?'

'তোমার হাসিটাও কেমন যেন অন্য রকম লাগছে।'

'কী-রকম লাগছে?'

'মনে হচ্ছে হাসির তেমন জোর নেই।'

'আচ্ছা, দেখ তো এখন কেমন হয়— হা হা হা।'

ফখরুদ্দিন সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রেখে ক্লান্ত ভঙ্গিতে চোখ মুছলেন। তাঁর আরো কয়েকটি কল করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। মনে হচ্ছে শরীর একেবারেই গেছে। দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে। দেশের মাটিতে মরতে হবে, এ রকম কোনো সেন্টিমেন্টাল চিন্তা-ভাবনা তাঁর নেই। এ-রকম চিন্তা-ভাবনা থাকবে বড় বড় কবি-সাহিত্যিকদের, দেশপ্রেমিক-রাজনীতিবিদদের। তিনি তাঁদের কেউ নন। নিতান্তই এলেবেলে ধরনের একজন মানুষ। তাঁর কোনো রোমান্টিক চিন্তা-ভাবনা থাকার কথা নয়। কিন্তু তবু রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তিনি বৃষ্টির শব্দ শুনলেন। ঝম-ঝম বৃষ্টি আষাঢ় মাসের প্রবল বর্ষণ। তিবি বেল টিবে নার্সকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নার্স?'

নার্স অবাক হয়ে বলল, 'কই না তো!'

'হয়তো হচ্ছে, তুমি বুঝতে পারছ না। দয়া করে একটু বারান্দায় দেখে আসবে? এ-রকম বৃষ্টি শুধু আমাদের দেশেই হয়। তুমি বোধহয় জানো না, আমাদের দেশ হচ্ছে বৃষ্টির দেশ।'

'আমি তো শুনেছিলাম তোমাদের দেশ হচ্ছে অভাবের দেশ।'

'আমাকে দেখে কি খুব অভাবী লোক বলে মনে হচ্ছে?'

'তোমাদের দেশের সবাই তোমার মত?'

'হ্যাঁ। এখন দয়া করে একটু দেখে এস বৃষ্টি হচ্ছে কি না।'

'বললাম তো, হচ্ছে না।'

'আমি শুনতে পাচ্ছি, তুমি পাচ্ছ না? দয়া করে একটু দেখে এস না! বারান্দায় যেতে তোমার কী খুব কষ্ট হবে?'

'না, হবে না।'

নার্স বারান্দায় গেল না, একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল। ডাক্তার রুগীর প্রেসার মাপলেন, গায়ের তাপ দেখলেন এবং কড়া সিডেটিভ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

লোকটিকে এই বসার ঘরে ঠিক মানাচ্ছে না। রোগা ধরনের অভাবী টাইপের একজন মানুষ। চোখে মোটা কাচের চশমা। স্যান্ডেল ঘরের বাইরে খুলে রেখে এসেছে। সেই স্যান্ডেলগুলির জরাজীর্ণ অবস্থা। অন্য কেউ হলে ফেলে দিত। এই লোক ফেলতে পারছে না।

এই ঘরে যে লোকটিকে মানাচ্ছে না, তা সে নিজেও বুঝতে পারছে। বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। হাত দু'টি অবসন্ন ভঙ্গিতে কোলের ওপর ফেলে রাখা। গায়ে হলুদ রঙের একটা চাদর। কড়া হলুদ। এই নীল নীল বসার ঘরে হলুদ রঙ বড় চোখে লাগে। লোকটির বয়স পঞ্চাশের মত হবে কিংবা তার চেয়ে কমও হতে পারে। অভাবী লোকদের অল্প বয়সেই চেহারা নষ্ট হয়ে যায়।

অপালা পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি এক বার শুধু তাকিয়েছে। তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিয়েছে। অথচ অপালা এমন একটি মেয়ে, যার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। অপালা বলল, 'আপনি কি বাবার কাছে এসেছেন?'

লোকটি হাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। কিন্তু অপালার দিকে তাকাল না। মাথা ঘুরিয়ে জলরঙা ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইল।

'বাবা তো দেশে নেই। সপ্তাহখানেক পরে ফিরবেন। আপনি বরং এক সপ্তাহ পরে আসুন।'

'আচ্ছা।'

লোকটি কিন্তু উঠে দাঁড়াল না, বসেই রইল। এবার সে তাকিয়ে আছে জানালার পর্দার দিকে। যেন পৃথিবীর সমস্ত রহস্য ও সৌন্দর্য জানালার ঐ পর্দাটিতে। অপালা বলল, 'আপনি কি কিছু বলবেন?'

'তোমার মা আছেন?'

অদ্ভুত ব্যাপার তো, এই লোক তাকে তুমি করে বলছে! অপালাকে তুমি করে বলার মত বাচ্চা এখনো নিশ্চয়ই দেখাচ্ছে না। তার বয়স একুশ। একুশ বছরের একটি মেয়েকে শাড়ি পরলে অনেকখানি বড় দেখায়। কিংবা কে জানে, লোকটি হয়ত ভাল করে তাকে লক্ষ্যই করেনি।

'আমার মাও দেশের বাইরে। চিকিৎসার জন্যে গিয়েছেন।'

লোকটি ঠিক আগের মত ভঙ্গিতে পর্দার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

'আপনার যদি জরুরি কিছু বলার থাকে, আমাকে বলতে পারেন।'

লোকটি হলুদ চাদরের ভেতর থেকে একটা কার্ড বের করল। বিড়বিড় করে বলল, 'আমার বড় মেয়ের বিয়ে ১৭ই পৌষ।'

অপালা হাত বাড়িয়ে কার্ডটি নিল।

'বাবা এলেই আমি তাঁকে দিয়ে দেব। তিনি কী আপনাকে চেনেন?'

'হ্যাঁ। আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।'

অপালা হাসিমুখে বলল, 'বাবার মন ভাল থাকলে তিনি সাহায্য-টাহায্য করেন। তাঁর কাছে যেতে হয় মুড বুঝে।'

লোকটি উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরোবার সময় হঠাৎ বলে বসল, 'ছেলেটা ভাল পেয়েছি। ব্যাঙ্কে কাজ করে। অগ্রণী ব্যাঙ্কে।'

'বাহ, খুব ভাল!'

'অফিসার্স গ্রেড। কোয়ার্টার পেয়েছে।'

অপালার বড় মায়া লাগল। সে নিতান্তই অপরিচিত একটি মেয়ে। অথচ এই লোকটি কত আগ্রহ করে তার সৌভাগ্যের কথা বলছে। নিশ্চয়ই মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কিছু সাহায্যের জন্যে এসেছিল। লোকটি নিচু গলায় বলল, 'যাই।'

অপালা তার পেছন পেছন বারান্দা পর্যন্ত এল। গেটের বাইরে বার-তের বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে। লোকটি গেট খুলে বেরোতেই এসে তার হাত ধরল। এই মেয়েটি নিশ্চয়ই লোকটির সঙ্গে এসেছিল। ভেতরে ঢোকেনি। অপলা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। মেয়েটি এলেই পারত। বিশাল বাড়ি দেখে হয়তো ভরসা পায়নি। আগ্রহ এবং কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষা করেছে বাইরে। ভারি মিষ্টি চেহারা মেয়েটির! লোকটি কেমন— মেয়েটিকে গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে!

অপা, এই অপা।'

অপালা বিরক্ত মুখে তাকাল। দোতলার গেট থেকে নিশানাথককাকুর স্ত্রী তাকে ডাকছেন। অপালা জবাব দিল না। এই মহিলা গত তিন দিন ধরে এ-বাড়িতে আছেন। প্রথম দিন থেকেই অপলাকে আদর করে অপা ডাকছেন। এই আদর তার সহ্য হচ্ছে না। এক বার ভেবেছিল বলবে— আপনি আমাকে অপা ডাকবেন না। বলতে পারেনি। বয়স্ক একজন মহিলাকে মুখের ওপর এমন কঠিন কথা বলা যায় না। তা ছাড়া ভদ্রমহিলা প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন অপালাকে খুশি রাখতে। প্রথম রাতে অপালার ঘরে ঘুমুতে এলেন। অপালা বলল, 'এই ঘরে আপনার ঘুমানোর দরকার নেই।'

'কেন, দু'টা খাট তো আছে!'

'থাকুক। আমার একা একা থাকতে ভাল লাগে।'

'ও-মা, কেমন কথা! ঘুমুবার আগে খানিক্ষণ গল্পগুজব করলে তোমার ভালই লাগবে মা। আমি খুব মজার মজার গল্প জানি মা।'

'মজার মজার গল্প আমার শুনতে ভাল লাগে না।'

'না-শুনেই কী করে বলছ, শুনতে ভাল লাগে না! আচ্ছা, এইটা শোন, তারপর দেখি না-হেসে থাকতে পার কিনা। একটা মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হল কোনটা বেশি দরকার — চেহারা না ব্রেইন। মেয়েটি বলল, চেহারা। কারণ চেহারা দেখা যায়, ব্রেইন দেখা যায় না। কী, গল্পটা মজার না?'

'হ্যাঁ, মজার।'

'এ-রকম গল্প আমি লক্ষ-লক্ষ জানি।'

অপালা অস্থির হয়ে পড়ল। উঠতে-বসতে একটা হাসির গল্প। কখনো বীরবলের, কখনো গোপাল ভাঁড়ের, কখনো-বা নাসিরুদ্দিন হোজ্জার।

এই ভদ্রমহিলা দোতলার বারান্দা থেকে অপালা-অপালা ডাকছেন, এক্ষুণি তিনি নেমে এসে একটা হাসির গল্প বলবেন, যা শুনে মোটেও হাসি আসবে না। ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই ম্যানেজারকাকুর মাথা খারাপ করে দিয়েছেন।

'এই যে অপা।'

'বলুন।'

'কখন থেকে ডাকছি, কথা বলছ না কেন?'

'আমি কথা কম বলি, কাকিমা।'

'এটা ভাল কথা না, মা। কথা বেশি বলবে। হাসবে, খেলবে, গান গাইবে। তুমি দিনরাত এমন গম্ভীর থাক, আমার ভয় লাগে। ঐ লোকটা কে?'

'কোন লোকটা?'

'ঐ যে, তুমি এগিয়ে দিলে?'

'আমি চিনি না। অচেনা মানুষ।'

'কী সর্বনাশ! তুমি অচেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলছ কেন?'

'কথা বলা কি নিষেধ? এইসব আপনি কী বলছেন! হাসির গল্প বলতে চান বলুন, এ রকম অদ্ভুত কথা বলবেন না। আপনিও তো একজন অচেনা মানুষ। আমি কী আপনার সঙ্গে কথা বলছি না?'

'তুমি শুধু-শুধু আমার ওপর রাগ করছ মা। সব জান না, তাই রাগ করছ। কারখানায় বিরাট গণ্ডগোল। দুজন শ্রমিক মারা গেছে। সবার ধারণা, মালিকপক্ষ মারিয়েছে। এখন প্রতিশোধ নেয়ার জন্য ওরা কিছু করেও বসতে পারে। পারে না?'

অপালা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সে এ-সবের কিছুই জানে না।

'আমি যে মা এখানে আছি, এ জন্যেই তো আছি।'

'আমাকে তো কেউ কিছু বলেনি!'

'তোমাকে শুধু-শুধু বলবে কেন? আমিও বলতাম না। তুমি রাগ করছ দেখে বললাম।'

'বাবা এ সব জানেন!'

'জানেন। বড় সাহেবের সঙ্গে গতকাল কথা হয়েছে। বড় সাহেবের শরীর খারাপ, তাই আসতে পারছে না। শরীর ভাল থাকলে এসে পড়তেন।'

'শরীর খারাপ? কই, আমি তো এই খবরও জানি না!'

'তুমি তো মা কোনো খবরই জানো না। কোন দুনিয়ায় তুমি বাস কর বল তো? উদাসীর মতো শুধু ঘুরে বেড়ালে তো হয় না, পৃথিবীর খোঁজখবর রাখতে হয়।'

অপালা একটি কথাও বলল না— তাকিয়ে রইল। ভদ্রমহিলা ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তোমাকে আরেকটা কথা বলি মা, মন দিয়ে শোন— আমি তোমার মায়ের বয়সী, তোমার মতো মেয়ে আমার ঘরে আছে। আর তুমি এ রকম কর, যেন আমি রাস্তার একটা মেয়ে।'

ভদ্রমহিলার চেঁচামেচিতে বাসার অন্য সবাই বের হয়ে এল। কী লজ্জার কথা! অপালার কান ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। ইচ্ছে করছে ছুটে বেরিয়ে যেতে। পৃথিবীতে বাস করার এত যন্ত্রণা! আজ সারা দিনে এক পাতাও পড়া হবে না। কী যে হবে পরীক্ষায়, কে জানে!'

অপালা তার নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দুপুরে ভাত খাবার সময় কাজের মেয়েটি ডাকতে এল। অপালা বলল, 'বিরক্ত করবে না। আমি কিছু খাব না।' বিকেলে চা খাওয়ার জন্যেও নামল না। সন্ধ্যাবেলা নিশানাথবাবু এসে দরজায় টোকা দিলেন। সে খুব স্বাভাবিকভাবে দরজা খুলল। সহজ স্বরে বলল, 'কেমন আছেন ম্যানেজার কাকু।'

'ভাল আছি মা।'

'কারখানায় কী-সব ঝামেলা?'

'ঝামেলা তো আছেই মা। বিষয়-সম্পত্তি মানেই হচ্ছে ঝামেলা। একমাত্র সাধু-সন্ন্যাসীরাই ঝামেলামুক্ত।'

'দুজন নাকি মারা গেছে?'

'হুঁ'। নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করে মরেছে, দোষ পড়েছে মালিকপক্ষের। তুমি এই নিয়ে কোনো চিন্তা করবে না। আসগর সাহেব চলে এসেছেন, উনি দেখছেন। খুবই কাজের লোক।'

'আসগর সাহেব কে?'

'আমাদের চিটাগাং ব্রাঞ্চের জি.এম., উনি একতলায় বসে আছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'আমার সঙ্গে কিসের কথা?'

'স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। বড় রকমের ডিসিশনের ব্যাপার। তুমি একটু নিচে এস মা।'

আসগর সাহেব মানুষটি সুপুরুষ। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। গোলগাল ভালমানুষের

মত মুখ। কথা থেমে-থেমে বলেন। মনে হয় প্রতিটি শব্দ বলার আগে খানিক্ষণ ভাবেন। অপালা ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালেন, এবং অপালা না-বসা পর্যন্ত নিজে বসলেন না।

'খুবই দুঃখিত যে আপনাকে ডিসটার্ব করতে হচ্ছে। মাই অ্যাপোলজি। এদিকে স্যার অসুস্থ, স্যারের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না।'

'কী বলবেন, বলুন।'

'দু' লাখ টাকার মত খরচ করেল ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। এক লাখ দিতে হবে ইউনিয়নকে। ওদের ঠাণ্ডা করতে হবে। পুলিশকে দিতে হবে বড় এ্যামাউন্ট। তা ছাড়া...'

ভদ্রলোকের কথার মাঝখানেই অপালা বলল, 'এতে কি মালিকপক্ষের দোষই স্বীকার করে নেয়া হচ্ছে না? সবাই কি তাহলে ভাববেন না, এটা আমরাই করিয়েছি?'

আসগর সাহেব গম্ভীর মুখে বললেন, 'আমরা যে ধোয়া তুলসীপাতা, তাও কিন্তু না মিস অপালা। ছোট হলেও আমাদের একটা ভূমিকা আছে।'

'ও-আচ্ছা, আছে তাহলে!'

'আপনার সেফটির ব্যাপারটাও দেখতে হয়। আপনার নিরাপত্তা হচ্ছে আমাদের টপ প্রায়োরিটি।'

'আমার নিরাপত্তার ব্যাপারটা আসছে কেন?'

'প্রতিশোধের ব্যাপার আর কি। ধরুন, একটা হাতবোমা এসে ফেলে দিল, অ্যাসিড ছুড়ে মারল...'

অপালা চুপ করে রইল। আসগর সাহেব বললেন, 'আগেও এ রকম ঝামেলা হয়েছে। টাকাপয়সা দিয়ে মিটমাট করা হয়েছে। অবশ্যি এত বড় স্কেলে ঝামেলা হয়নি। দিস টা...'

'আপনারা যা ভাল মনে করেছেন, তা করাই ভাল।'

'আপনাকে একটা অনুরোধ, একা-একা বাইরে যাবেন না। সবচেয়ে ভাল হয়, প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে না বেরুলে।'

'আমি এমনিতেই ঘর থেকে বের হই না।'

'ডি.সি সাউথকে আমি অবশ্যি রিকোয়েস্ট করেছি কয়েক দিনের জন্যে বাড়ির সামনে একটা ফিক্সড সেন্ট্রির ব্যবস্থা করতে। কথায় আছে না, প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর? আজ তাহলে উঠি। আপনাকে কষ্ট দিলাম।'

রাতে অপালা অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখল। যেন বিকেল হয়েছে। সূর্য ডুবে যাবার আগের মায়াবী আলো চারদিকে। সে একা-একা বাগানে হাঁটছে। হঠাৎ কে যেন ডাকল— এই...এই। অপালা চমকে তাকাল কেউ তো কোথাও নেই! কে ডাকল! অপালা ভয়-পাওয়া গলায় বলল, 'কে ডাকছে আমাকে?'

'আমি। আমি ডাকছি আপনাকে।'

অপালা দেখল, গেটের বাইরে সেই এগার-বার বছরের মেয়েটি দাঁড়িয়ে, যে তার বাবার সঙ্গে ঘরে ঢোকেনি। একা-একা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল।

'নাম কী তোমার?'

মেয়েটি নাম বলল না। খুব হাসতে লাগল।

'ঐ দিন তুমি ঘরে ঢোকনি কেন? কেন তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলে?'

এই প্রশ্নেরও কোনো জবাব দিল না মেয়েটি। অপালার বুক কাঁপতে লাগল, কারণ এই মেয়েটিকে তার চেনা-চেনা লাগছে। খুব চেনা— অসম্ভব চেনা। কিন্তু তবুও অচেনা।

এ কেমন স্বপ্ন! ঘুম ভাঙার পরও অপালার হাত-পা কাঁপছে। পানির পিপাসায় বুক শুকিয়ে কাঠ। তার খুব ইচ্ছে করছে চেঁচিয়ে কাঁদে।

ঐ মেয়েটিকে সে কেন স্বপ্নে দেখল? মানুষের অবচেতন মনে কত রহস্যই-না খেলা করে। কোনো দিন মানুষ তা জানতে পারে না। অপালার বড় জানতে ইচ্ছে করে।

হেলেনা ভিজিটার্স রুমে ঢুকে একটু অবাক হলেন।

ফখরুদ্দিন সাহেব বসে আছেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত চুরুট। হেলেনা অবশ্যি তাঁর বিস্ময় গোপন

করলেন। সহজ স্বরে বললেন, 'কেমন আছ?'

'খুব ভাল।'

'চুরুট টানছ? স্মোকিং এখানে নিষিদ্ধ। দেয়ালে লেখা চোখে পড়েনি?'

'পড়েছে। দেয়ালে লেখা "ধূমপান না করার জন্যে অনুরোধ করছি।" আমি অনুরোধটা রাখলাম না। হা হা হা।'

'তোমার কী শরীর খারাপ?'

'না, শরীর বেশ ভালই আছে।'

'কোথায় ডুব দিয়েছিলে?'

'আশপাশে ছিলাম। তোমার অবস্থা কি?'

'ভাল।'

'কী-রকম ভাল?'

'বেশ ভালো। অপারেশনটা লাগবে না। ইচ্ছা করলে দেশে ফিরে যেতে পারি।

'ইচ্ছা করছে?'

হেলেনা জবাব দিলেন না। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'এই মুহূর্তে দেশে ফিরতে পারছি না। এখানে আমার কিছু কাজ আছে। কাজ শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

'ক'দিন লাগবে কাজ শেষ হতে?'

'দিন দশেক লাগবে।'

'কি কাজ?'

ফখরুদ্দিন সাহেব এ-প্রশ্নের জবাব দিলেন না। ডাক্তাররা তাঁর শরীরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চায়। দিন দশেক সময় এই কারণেই তারা চাচ্ছে। হেলেনাকে তা বলার তিনি কোনো প্রয়োজন বোধ করছেন না। আজ যে হাসপাতাল থেকে বের হয়েছেন, সেও বহু কষ্টে। বলে এসেছেন দু'ঘণ্টার মধ্যে ফিরবেন। তাও সম্ভব হবে কি না কে জানে? দু'ঘণ্টার এক ঘণ্টা তো এখনই শেষ।

'হেলেনা।'

'বল।'

'চল, একটু হেঁটে আসি।'

'কোথায় হাঁটবে?'

'এই বাগানেই হাঁটব। বেশি দূর যাব না। তোমার হাঁটাহাঁটিতে কোনো বাধা নেই তো?'

'না, নেই।'

'গুড। গায়ে ওভারকোট জাতীয় কিছু একটা চাপিয়ে এস।'

ছবির মতো সুন্দর বাগান। এত সুন্দর যে কৃত্রিম মনে হয়। বড় বেশি সাজানো। ফখরুদ্দিন সাহেব মাঝে মাঝে কাশছেন, কিন্তু কোনো কথাই বলছেন না। হেলেনা হঠাৎ বললেন, 'তুমি যে খুব অসুস্থ, একটা হাসপাতালে আছ, এই খবর কিন্তু আমি জানি।'

'জানলে তো ভালই।'

'অন্যের কাছ থেকে জানতে হল।'

ফখরুদ্দিন সাহেবের চুরুট নিভে গিয়েছিল, অনেক কায়দা করে সেটা ধরাতে হল। তিনি কিছু বললেন না।

'আমাকে খবরটা না জানানোর পেছনে তোমার যুক্তিগুলি কি, একটু বল তো শুনি।'

'কোনো যুক্তি নেই। এস, কোথাও একটু বসা যাক। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে।'

তাঁরা বসলেন। হেলেনা মৃদু স্বরে বললেন, 'এখনো কি তুমি বিশ্বাস কর, টাকা দিয়ে সব পাওয়া যায়?'

'হ্যাঁ, করি।'

'মানুষ হিসেবে তুমি কি সুখী?'

'হ্যাঁ, সুখী। তোমার মত বানানো দুঃখ-কষ্ট আমার নেই। আমার বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নস্তরের। আমার মত মানুষের কোনো কাল্পনিক দুঃখ-কষ্ট থাকে না। ঐ সব থাকে খুব উচ্চমার্গের লোকদের।'

'আমার কিন্তু ধারণা, তুমি খুব দুঃখী মানুষ।'

'তাই নাকি? ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

'তুমি যে খুব দুঃখী, এটা তুমি নিজেও জানো।'

ফখরুদ্দিন সাহেব চুরুটটা ছুড়ে ফেললেন। ঢালু জায়গা পেয়ে চুরুটটা গড়াতে গড়াতে নিচে নামছে। সেই দিকে তাকিয়ে বিদ্যুতের মতো তাঁর মাথায় এল, মানুষের জীবনও কি এ-রকম গড়িয়ে যাওয়া নয়? কেউ কিছু দূর গিয়ে আটকে যায়, আবার কেউ যেতেই থাকে। এমন কিছু উচ্চশ্রেণীর দার্শনিক চিন্তা নয়, তবু ফখরুদ্দিন সাহেবের বেশ ভাল লাগছে। তিনি পকেট থেকে আরেকটি চুরুট বের করে গড়িয়ে দিলেন। হেলেনা বললেন, 'কি করছ?'

'এক ধরনের খেলা, তুমি বুঝবে না?'

'না-বোঝারই কথা। তোমার বেশির ভাগ কাজকর্মই আমি বুঝি না।'

'তুমি কি করে বুঝবে বল, আমি নিজেই বুঝি না।'

বলতে বলতে ফখরুদ্দিন সাহেব খুব হাসলেন। হাসতে-হাসতে তাঁর চোখে পানি এসে গেল। তিনি পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছলেন। হেলেনা বললেন, 'তোমার অসুখটা কী?'

'জানি না, কি। ডাক্তাররা জানার চেষ্টা করছে। কেন জানি মনে হচ্ছে, ডাক্তাররা খুঁজে খুঁজে একটা খারাপ অসুখই বের করবে। রাজকীয় কোনো অসুখ। ডায়রিয়া বা আমাশার মত অসুখে আমাকে মানাবে না; এইসব হচ্ছে ভিখিরিদের অসুখ। আমি কী ভিখিরি? হা হা হা।'

লন্ডনের আকাশ আজ ঘন নীল। বাতাস মধুর। রোদের রঙ কাঁচা সোনার মত। অদ্ভুত সুন্দর একটি দিন। ফখরুদ্দিন সাহেব এমন চমৎকার একটি দিনেও খানিকটা বিষণ্ন হলেন। সুনীল আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। হেলেনা বললেন, 'আজ তুমি অপালার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলো।'

'কেন বল তো?'

'ওর বোধহয় খুব মন-খারাপ। কি-একটা দুঃস্বপ্ন দেখে খুব কেঁদেছে। আমাকে বলতে বলতেও কাঁদল।'

'কী দুঃস্বপ্ন?'

'একটা ছোট্ট মেয়ে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে, এইসব কি হাবিজাবি!'

'দুঃস্বপ্নটা কী, তা তো বুঝলাম না। রাক্ষস-খোক্ষস স্বপ্নে দেখলেও না হয় কথা ছিল। ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তো কী হয়েছে?'

হেলেনা ক্লান্ত গলায় বললেন, 'মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখেও মানুষ ভয় পায়। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলবে।'

'আমি এক্ষুণি টেলিফোন করছি।'

'ফখরুদ্দিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

ফিরোজের দুপুরে ঘুমানোর অভ্যেস নেই।

তার ধারণা গৃহী টাইপের মহিলা এবং ডায়াবেটিক প্রৌঢ়রাই নিয়ম করে দুপুরে ঘুমায়। একজন ইয়ংম্যান, যার রক্তে উত্তেজনা টলমল করছে, তার দুপুরে ঘুমানোর প্রশ্নই উঠে না। ফিরোজের ধারণা, সে নিজে একজন ইয়াংম্যান এবং তার রক্তে উত্তেজনা টলমল করছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এইসব ধারণা থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক দিন ধরে তাকে নিয়মিত ঘুমুতে দেখা যাচ্ছে। মশারি খাটিয়ে বেশ একটা আয়োজনের ঘুম।

মশারি খাটানোর কারণ হচ্ছে, এ-বাড়ির মশারা দিন এবং রাত্রির পার্থক্য বোঝে না। এরা দিনে বেশি কামড়ায়।

দুপুরে ঘুমানোর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে, ঘুম ভাঙলেই বিচিত্র কারণে মন স্যাঁতস্যোঁতে হয়ে থাকে। কোনো কিছুই ভাল লাগে না। মন-খারাপ ভাব কিছুতেই কাটতে চায় না। ফিরোজের ধারণা, বেশির ভাগ যুবক আত্মহত্যা করে দুপুরে ঘুমের পর। একটি উদাহরণ তার কাছে আছে। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সমু, এক দুপুরে লম্বা ঘুম দিয়ে উঠল। চায়ের দোকানে চা খেয়ে এসে দীর্ঘ একটি চিঠি লিখল। সেই চিঠিতে কোনো সম্বোধন নেই, কাজেই বোঝা গেল না কাকে লেখা। চিঠি শেষ করে তাদের তিনতলার ছাদ থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ল।

দুপুরবেলায় ঘুমুলে ফিরোজেরও এ-রকম নাটকীয় কিছু করতে ইচ্ছে করে। এই মুহূর্তেই

করছে। সে বারান্দায় কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটল, তারপর ঠিক করল অপালা মেয়েটির সঙ্গে এক কাপ চা খাবে। সে-বাড়িতে যাবার জন্যে একটা অজুহাত ভেবে-চিন্তে বের করতে হবে। সেটা যে এখনই বের করতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। পথে যেতে যেতে ভাবলেই হবে।

এই মেয়েটি তাকে এত ভোগাচ্ছে কেন? রোজ খানিক্ষণের জন্যে হলেও এর কথা মনে পড়ে। এটা মোটেও ভাল লক্ষণ নয়। আসল কথা হল, কেন বার বার মনে পড়ছে?

মেয়েটি রূপবতী! এটা এমন কোনো ব্যাপার নয়। এ শহরে প্রচুর রূপবতী মেয়ে আছে। এদের কারো কারো সঙ্গে তার পরিচয়ও আছে। কই, ওদের কথা তো মনে পড়ে না!

মেয়েটির মধ্যে রহস্য আছে! সে তো সব মেয়ের মধ্যেই আছে। মেয়ে মানেই তো রহস্য। আনসলভড মিস্ট্রি।

মেয়েটি অন্য কোনো মেয়ের মত নয়। এটা কোনো কথা হল না। কোনো মেয়েই অন্য কোনো মেয়ের মত নয়। প্রতিটি মেয়েই আলাদা।

ফ্রয়েডীয় তাত্ত্বিকদের মত চিন্তা করা যাক। এই মেয়েটির চেহারা বা আচার-আচরণে কোথাও ফিরোজের মা'র সঙ্গে মিল আছে। মায়ের সঙ্গে মিল আছে সেই জাতীয় মেয়ের প্রতি পুরুষেরা প্রচণ্ড আকর্ষণ বোধ করে। বোগাস কথা! ফিরোজের মা ফিরোজের জন্মের সময় মারা যান। সেই মহিলার কোনো স্মৃতি ফিরোজের মনে থাকার প্রশ্নই উঠে না।

মেয়েটির প্রচুর টাকা-পয়সা -- এটা কি একটা কারণ হতে পারে? না, হতে পারে না। টাকার লোভ ফিরোজের আছে, তবে তা নিশ্চয়ই খুব প্রবল নয়। প্রবল হলে সিনেমার কাজ ছেড়ে দিত না। মোটামুটি ভাল টাকাপয়সার একটা সম্ভাবনা ঐ লাইনে ছিল।

অপালাদের বাড়ির সামনে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। এর মানে কী? মেয়েটির বাবা কি মন্ত্রী-ফন্ত্রী হয়ে গেলেন নাকি? পয়সাওয়ালা লোকজন হঠাৎ করে মন্ত্রী হয়ে যান। ইনিও হয়ত হয়েছেন। বাণিজ্যমন্ত্রী কিংবা পাটমন্ত্রী। আচ্ছা, দেশে পাটমন্ত্রী আছে, চা-মন্ত্রী নেই কেন?

রপ্তানিযোগ্য প্রতিটি আইটেমের ওপর একজন করে মন্ত্রী থাকলে ভালো হত। চামড়া-মন্ত্রী, রেডিমেড গার্মেন্ট-মন্ত্রী, চিংড়ি-মন্ত্রী। সবচেয়ে ভাল হয় একজন ব্যাঙ-মন্ত্রী থাকলে। ব্যাঙও তো আজকাল রপ্তানি হচ্ছে। তবে এই দপ্তর হতো কেউ নিতে চাইবে না। কে আর সখ করে ব্যাঙ-মন্ত্রী হবে?

অপালাদের গেটে বিশাল একতালা, এ-ও রহস্যজনক। দিনে-দুপুরে গেটে তালা থাকবে কেন? দারোয়ান ব্যাটা টুলে বসে আছে। ফিরোজকে দেখেও সে বসে রইল। এটাই স্বাভাবিক। সে যদি চট করে উঠে দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে বসত, তাহলেই অস্বাভাবিক হত।

'এই যে দারোয়ান, গেটটা খোল।'

দারোয়ান তাকে ভালই চেনে। ফিরোজ বেশ কিছুদিন এ-বাড়িতে কাজ করেছে, তাকে না চেনার কোনোই কারণ নেই। দেখা হয়েছে দু'বেলা। তবু এই ব্যাটা এমন করে তাকাচ্ছে, যেন ফিরোজ খুনের পলাতক আসামি -- এই বাড়িতে আশ্রয়ের খোঁজে এসেছে।

'আফনে কার কাছে যাইবেন?'

'তোমার আপার কাছে। উনিই আসতে বলেছেন।'

'দাঁড়ান, খবর দেই।'

দারোয়ান গেট খুলল না। খবর দেবার জন্যে রওনা হল। গদাইলস্করি চাল বোধহয় একেই বলে। দশ মিনিট পর-পর একেকটা পা ফেলছে। এভাবে হাঁটলে বারান্দা পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে রাত এগারটা বাজবে।

ফিরোজ অতি দ্রুত এ বাড়িতে উপস্থিত হবার অজুহাত মনে মনে সাজিয়ে ফেলতে চেষ্টা করল। সেই সঙ্গে কী কথাবার্তা হবে, তা নিয়ে একটা স্টেজ রিহার্সল। 'মেয়েটি এসেছে। মুখ হাসি-হাসি। ফিরোজ বলছে -- হঠাৎ এসে বিরক্ত করলাম। মেয়েটি বলল -- না না, বিরক্ত কিসের, এসেছেন খুশিই হয়েছি। আসুন, একসঙ্গে চা খাওয়া যাবে। খুব লোনলি ফিল করছিলাম। অ্যাজ এ ম্যাটার অব ফ্যাক্ট, মনে হচ্ছিল আপনি আসবেন।

'আমার বিয়েটা ভেঙে গেল, ঐ খবরটা দিতে এসেছিলাম।'

'বিয়ে ভেঙে গেল নাকি?'

'হ্যাঁ। মেয়ের আমেরিকা প্রবাসী চাচা আমাকে পছন্দ করলেন না।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। এখন দেখছি সেটা ঠিক না। ভীষণ মন-খারাপ হয়ে গেছে। সারা দুপুর শুয়ে-শুয়ে স্যুইসাইড করার কথা ভাবলাম। এখন যে ভাবছি না, তা নয়। এখনো ভাবছি।'

'ছিঃ, এ সব ভাবনা মনেও আনবেন না। আমার এখানে এসেছেন ভাল করেছেন, গল্প করে মন হালকা করুন।...'

চিন্তা এই পর্যন্তই এসে কেটে গেল। দারোয়ান গদাইলস্করি চালে ফেরত আসছে। ব্যাটার মুখ অন্ধকার। নিশ্চয়ই এতক্ষণ বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্যে দাবড়ানি খেয়েছে।

'আপা কী বলল?'

'আফনেরে চইল্যা যাইতে কইছে।'

'চলে যেতে বলেছে?'

'জি।'

'আমার কথা বলেছিলে ঠিকমত?'

'জি, বলছি।'

'কী বলেছ?'

'বলছি, ঐ যে ভদ্রলোক ঘর সাজাইয়া দিছে হে আসছে....

'আর তোমার আপা কী বলল?'

'এক কথা কয়বার কমু, কন। চইল্যা যাইতে কইছে।'

ফিরোজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাবার চেষ্টা করছে। পারছে না। হাত কেঁপে যাচ্ছে। পাশে দাঁড়ানো পুলিশটি সহানুভূতির চোখে তাকাচ্ছে। খাকি পোশাক পরা কেউ সহানুভূতি দেখাতে পারে, এটা ফিরোজের কল্পনায় ছিল না। সে কেমন যেন অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগল। ছুটে পালিয়ে যেতে পারলে সবচেয়ে ভাল হত। তা করা যাচ্ছে না। তাকে হেঁটে-হেঁটে সদর রাস্তা পর্যন্ত যেতে হবে, এবং যতক্ষণ তাকে দেখা যাবে ততক্ষণ পুলিশ এবং দারোয়ান তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তাদের চোখে থাকবে সহানুভূতি ও করুণা।

ফিরোজ মাথা নিচু করে পা বাড়াল। হাতের সিগারেটটি নিভে গেছে। আবার ধরাতে ইচ্ছে করছে না। কোথায় এখন যাওয়া যায়? যাবার তেমন কোনো জায়গা নেই। তাজিন আপার কাছে যাওয়া যেতে পারে। অনেক দিন যাওয়া হয়নি। মনসুরের বাসায় গিয়ে কিছুক্ষণ ওকে বিরক্ত করা যেতে পারে। নতুন বিয়ে করেছে। সন্ধ্যার পর কেউ বেড়াতে গেলে অসম্ভব বিরক্ত হয়। মুখ হাঁড়ির মত করে রাখে, একটু পর পর ঘড়ির দিকে তাকায়, রাত আটটা বাজতেই লোক দেখানোর হাই তুলতে শুরু করে।

মনসুরের ওখানেও যেতে ইচ্ছে করছে না। আজ সারারাত পথে-পথে হাঁটলে কেমন হয়? এই পাগলামির বয়স কি তার কাছে?

ফিরোজের ঠাণ্ডা লাগছে। ইচ্ছে করেই আজও পাতলা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে এসেছিল। যদি অপালা পাতলা শার্ট নিয়ে ঐ দিনের মত কিছু বলে!

ফিরোজ অনেক রাত পর্যন্ত পাতলা জামা গায়ে দিয়ে শহরে ঘুরে বেড়াল। এক সময় তার মাথা ভারী হয়ে এল। বোঝাই যাচ্ছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লেগে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশপাতাল জ্বর আসবে। আসুক। পেতেছি সমুদ্রে শয্যা শিশিরে কি ভয়?

রান্নাঘরে নিশানাথবাবুর স্ত্রী। চারদিকে বাসনপত্র ছড়িয়ে কী-সব যেন করছেন। বাবুর্চি গোমেজ, চোখ-মুখ কুঁচকে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে। গোমেজ এই মহিলাটিকে পছন্দ করছে না। এই মহিলা সরাসরি তার সাম্রাজ্যে হস্তক্ষেপ করছে। যখন-তখন রান্নাঘরে ঢুকে জিনিসপত্র এলোমেলো করে দিচ্ছে। এখন আর কোনো কিছুই হাতের কাছে পাওয়া যায় না। গতকাল লবণের কৌটা খুঁজতে তার দশ মিনিট লেগেছে। অথচ লবণের কৌটা থাকে দ্বিতীয় তাকের সবচেয়ে প্রথমে। আগে চোখ বন্ধ করে বের করতে পারত।

'গোমেজ।'

'জি।'

'দেখছ কী তুমি? ব্যাটাছেলের রান্নাঘরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকা বড় খারাপ লাগে।

'আমার কাজই তো রান্নাঘরে।'

'ও, আচ্ছা। তাই তো, মনে থাকে না। তুমি রান্না শিখেছ কার কাছে?'

গোমেজ জবাব দিল না। ভদ্রমহিলা চালের গুঁড়োয় পানি ছিটাতে-ছিটাতে বললেন, 'বাঙালি রান্না কিছু জানো, না শুধু সাহেবি রান্না?'

এই প্রশ্নেরও সে জবাব দিল না। কঠিন মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল। উড়ে এসে জুড়ে বসা এই মহিলাটি বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে।

'গোমেজ, তুমি যাও তো, অপালাকে ডেকে নিয়ে এসো। বলো, ভাপা পিঠা বানাচ্ছি, সে যেন দেখে যায়। তাকে শিখিয়ে দেব।'

'আমি রান্না ছাড়া অন্য কাজ করি না।'

'এটা কেমন কথা! তুমি ডেকেও আনতে পারবে না?'

'জি না। তা ছাড়া আমাদের দোতলায় যাওয়া নিষেধ আছে। শুধু রমিলা দোতলায় যেতে পারে।'

'এইসব নিয়ম-কানুন কে করেছে?'

'বড় সাহেব।'

'বড় সাহেব তো এখন নেই, তুমি যাও ডেকে নিয়ে এস। এ রকম হাবার মত দাঁড়িয়ে থেকো না।'

গোমেজ বের হয়ে এল, কিন্তু দোতলায় উঠল না। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা ভিড়িয়ে দিল। গোমেজের ঘর মূল বাড়ির দক্ষিণে আলাদা দু'টি কামরা। একটিতে শোবার ব্যবস্থা, অন্যটিতে রান্নার। এ বাড়িতে মোট আট জন কাজের লোকের জন্যে আলাদা রান্না হয়। সেই রান্নাও গোমেজ করে। গোমেজ ঠিক করল আজ সে কোনো রান্নাবান্না করবে না। তার এ-রকম অভ্যেস আছে। মাঝে মাঝে মেজাজ বিগড়ে গেলে এ রকম করে। রান্না তো শুধু হাঁড়িতে কিছু জিনিস ফেলে নাড়াচাড়া করা নয়। এটা খুব কঠিন ব্যাপার। মন বসাতে হয়। তা সবসময় সম্ভব হয় না। আজ যেমন হবে না। আজ সে দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে। গোপনে কিঞ্চিৎ মদ্যপান করবে। এই অভ্যেসও তার পুরনো।

নিশানাথবাবুর স্ত্রী অনেক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই অপালার খোঁজে গেলেন। মেয়েটি তাঁকে পছন্দ করে না, কিন্তু তাঁর প্রচণ্ড মায়া পড়ে গেছে। পাগলা-পাগলা ধরনের মেয়ে। একা-একা থেকে কেমন যেন হয়ে গেছে।

'অপা, কি করছ তুমি?'

'পড়ছি কাকিমা, আজ আমার ফিফথ পেপার পরীক্ষা।'

'ও-মা! কই, আমি তো জানি না।'

'আপনি জানবেন কেন? আপনার তো জানার কথা নয়।'

'পরীক্ষা কখন?'

'বিকেলে দু'টার সময় আরম্ভ হবে, শেষ হবে পাঁচটায়।'

'তাহলে তো আমার দুপুরের খাবার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করতে হয়।'

'আপনি ব্যস্ত হবেন না কাকিমা, পরীক্ষার আগে আমার খুব টেনশান থাকে, আমি কিছু খেতে পারি না।'

'সে কী কথা! কিছুই খাবে না?'

'একটু চা খাব, একটা স্যান্ডউইচ খাব। ঐ নিয়ে আপনি ভাববেন না।'

'দৈ আছে কি না ঘরে, কে জানে। দৈ খেলে পেটটা ঠাণ্ডা থাকবে। দাঁড়াও, আমি দৈয়ের ব্যবস্থা করছি। ঘরে-পাতা দৈ। তোমার ম্যানেজার কাকু ঘরে-পাতা দৈ ছাড়া খেতে পারে না।'

'আপনাকে কোনো ঝামেলা করতে হবে না।'

ঝামেলা কিচ্ছু না। যাব আর নিয়ে আসব। গাড়ি তো আছেই।'

অপালা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি যখন বেরুচ্ছেন, তখন একটা কাজ করতে পারবেন?'

'পারব না মানে! কী কাজ?'

'দামি একটা শাড়ি কিনে আনতে পারবেন? যেন খুব ভাল হয়।'

'তোমার জন্যে।'

'না, আমার জন্যে না। আমি একজনকে উপহার দেব?'

'কাকে?'

অপালা মনে-মনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এই মহিলাকে কিছু বলাই বোকামি। এক লক্ষ প্রশ্ন করবে। বিরক্ত করে মারবে।

'কাকে দেবে শাড়ি?'

'এক ভদ্রলোক তাঁর মেয়ের বিয়েতে দাওয়াত দিয়ে গিয়েছেন। ভদ্রলোককে আমি চিনি না। খুব আগ্রহ করে দাওয়াত দিয়েছেন। খুব মায়া লেগেছে। তা ছাড়া বাবা এখানে থাকলে নিশ্চয়ই কিছু-একটা দিতেন।'

'উনি যখন নেই, তখন তোমার এত মাথাব্যথা কেন?'

'আপনি না-পারলে ম্যানেজার কাকুকে বলুন।'

'পারব না কেন? কত টাকার মধ্যে কিনব?'

'আগেই তো বলেছি, দামি একটা শাড়ি।'

'একেক জনের দামি তো একেক রকম মা। আমার কাছে তো তিন শ' টাকা দামের শাড়িই মনে হয় অনেক দামি।'

'আপনি পছন্দ করে কিনুন। আর কাকিমা, এখন যান। আমি পড়ছি, একটা চ্যাপ্টার এখনো বাকি।'

'মেয়েটা কেমন, ফর্সা না কালো? শাড়ি তো সেইভাবেই কিনতে হবে।

'আমি মেয়েটাকে দেখিনি। বাঙালি মেয়ে যে-রকম হয়, সে-রকম হবে। খুব বেশি ফর্সা নয়, কালোও নয়। কাকিমা, আপনি এখন যান।'

'ভাপা পিঠা খাবে? ভাপা পিঠা বানাচ্ছি।'

'আমি এখন কিচ্ছু খাব না।'

আজ অপালার ফিফথ পেপার। এই পেপারেই তার প্রিপারেশন সবচেয়ে কম। পরীক্ষা খুব খারাপ হবে। একটা চ্যাপ্টার এখনো পুরো বাকি। পরীক্ষার ঠিক আগে আগে পড়বে ভেবেছিল, যাতে মনে থাকে, এলোমেলো না-হয়ে যায়। কিন্তু সকাল থেকেই একটার পর একটা ঝামেলা। বই নিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে একটা মেয়ে ফোন করল। অপালা 'হ্যালো' বলামাত্র একনাগাড়ে কথা বলতে লাগল নমিতা, আজ কী হয়েছে শোন। ভাই, আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। এত অপমানিত হয়েছি! আমি আমার জীবনে এত অপমানিত হইনি-- বিশ্বাস কর, এক ঘণ্টা কেঁদেছি। রিকশায় কাঁদতে কাঁদতে এসেছি। রাস্তায় সমস্ত লোক আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। রিকশাওয়ালা পর্যন্ত ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেছে...

অপালা বলার সুযোগই পেল না যে এটা রঙ নাম্বার, আর তার নাম নমিতা নয়। মেয়েটা নিজের কথা বলতে-বলতে ফোঁপাতে শুরু করল। কী অস্বস্তিকর অবস্থা! অপালা বলল, 'শুনুন, আমার নাম নমিতা নয়। আপনার রঙ নাম্বার হয়েছে।'

ফোনের ও-পাশে মেয়েটি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আপনি কে?'

'আমার নাম অপালা।'

'ও, আচ্ছা। আপনি আমার এইসব কথা কাউকে বলবেন না, প্লিজ।'

কী অদ্ভুত কথা! অপালা কাকে এ-সব কথা বলবে? আর বললেই-বা কী? কে চিনবে এই মেয়েকে?

ফোন রেখে বই নিয়ে বসেও মেয়েটির কথা মনে হতে লাগল। বইয়ে মন বসছে না। পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু পড়াটা মনে ধরছে না। তখন টঙ্গির কারখানা থেকে টেলিফোন। মিজান বলে কে এক লোক! সুপারভাইজার। তাকে অপালা কোনো দিন চোখেও দেখেনি। লোকটি তাকে ম্যাডাম ডাকছে। অপালা কঠিন স্বরে বলল, 'আমাকে ফোন করেছেন কেন? আমার সঙ্গে আপনার কী দরকার?'

'ম্যাডাম, একটা খুব বড় ঝামেলা হয়েছে।'

'কি ঝামেলা?'

'অফিসার লেভেলের সবাইকে শ্রমিকরা একটা ঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে দিয়েছে। ঘেরাও।'

'আমাকে এটা জানাচ্ছেন কেন? আমি কী করব?'

'না, মানে, আপনার কিছু করার নেই। আমরা পুলিশে খবর দিয়েছি। শুধু আপনাকে জানিয়ে রাখলাম।'

'আমাকে জানিয়ে রাখার কোনো দরকার নেই। প্লিজ, আমাকে শুধু শুধু বিরক্ত করবেন না।'

'ম্যাডাম, ভেরি সরি।'

অপালা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। এত ঝামেলা নিয়ে কিছু করা যায়? বারটা পর্যন্ত একনাগাড়ে পড়বে ভেবেছিল সে। এগারটা বাজতেই উঠে পড়ল। বাগানে রোদে খানিক্ষণ হাঁটল। মালী বলল, 'ফুল দেব আপা?' বলেই সে অপেক্ষা করল না, বিরাট বড় একটা গোলাপ ছিঁড়ে দিল। এত সুন্দর একটা গোলাপ হাতে নিলে কেমন মন খারাপ হয়ে যায়।

'আরো দেব আপা?'

'না আর লাগবে না।'

অপালা গোলাপ হাতে নিয়ে বাগানে হাঁটছে। অরুণা এবং বরুণা অলস পায়ে তার পেছনে পেছনে হাঁটছে। শীতের দিনের ঝকঝকে সোনালি রোদে এদের তিন জনকে চমৎকার লাগছে। মালি কাজ ভুলে এদের দিকে তাকিয়ে আছে।

ফিরোজের জ্বর তৃতীয় দিনে নেমে গেল। তার ধারণা হয়েছিল ব্রংকাইটিস, নিউমোনিয়া এইসব কিছু একটা হয়েছে। তা নয়, ঠাণ্ডা লেগেছিল। তা তাকে তেমন কাবু করতে পারল না। এই তো আজ বেশ উঠতে বসতে পারছে। সিগারেটের তৃষ্ণা হচ্ছে। সিগারেটের তৃষ্ণা হবার মানে রোগ সেরে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নিচে নেমে গেল।

হাজি সাহেব নিড়ানি হাতে বাগানে। ফুলের বাগান নয়, টমেটো গাছ লাগিয়েছিলেন। বাজারভর্তি পাকা টমেটো, কিন্তু হাজি সাহেবের গাছে সবে ফুল ফুটছে। ফিরোজ সাহেবের ধারণা, অতিবিক্ত যত্নের কারণে এই অবস্থা।

'হাজি সাহেব, কেমন আছেন?'

'ভাল। আপনার জ্বর সেরে গেছে নাকি?'

'পুরোপুরি সারেনি। সারব-সারব করছে। আপনার গাছে ফুল ফুটেছে দেখছি' মিবাকল করে ফেলেছেন!'

'ফুল পর্যন্তই, ফল হয় না। ফুল ফোটে, দু'দিন পর ঝরে যায়। আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

'কোথাও না, রাস্তায়।'

'চা খাবেন?'

'না।'

'ঐ ব্যাপারটা কিছু করেছেন?'

'আপনার মেয়ের কথা বলছেন?'

'জি।'

'জ্বরে আটকা পড়ে সব জট পাকিয়ে গেছে। দেখি, কাল-পরশুর মধ্যে বেরুব।'

হাজি সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, 'আরেকটা সম্বন্ধ এসেছে।'

'বলেন কী! ছেলে কী করে?'

'করে না কিছু। ক্যাশ টাকা পেলে বিজনেস করবে বলেছে।'

'ক্যাশ টাকা কে দেবে, আপনি?'

'আমি ছাড়া আর কে?'

'একেবারেই পাত্তা দেবেন না। নেকস্ট টাইম যখন আসবে, এক চড় দিয়ে বিদায় করে দেবেন। আমি তো ব্যবস্থা করছিই। আমি বসে আছি নাকি? ভাবেন কী আমাকে? কথা দিয়েছি না? কথার একটা দাম আছে না?'

হাজি সাহেবকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি খুব-একটা ভরসা পাচ্ছেন না।

'ঐ লোক এলে হাঁকিয়ে দেবেন, বুঝলেন, ব্যাটা আছে টাকার তালে। এদের ধরে ধরে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া দরকার, তাহলে বিয়ের সখ ঘুচে যাবে।'

রাস্তায় নেমে ফিরোজের মনে হল জ্বর আবার চেপে আসছে। রোদ চোখে লাগছে। মাথা হালকা মনে হচ্ছে। সিগারেট টান দিয়ে মনে হল এক্ষুণি বমি করে সব ভাসাবে। পেটের ভেতরে ক্রমাগত পাক দিচ্ছে। কী ভয়াবহ অবস্থা। দু'টাকা দিয়ে কেনা বেনসন এ্যান্ড হেজেস। শুধুমাত্র মহাপুরুষরাই একটান দিয়ে দু'টাকা দামের সিগারেট ফেলে দিতে পারেন। ফিরোজ মহাপুরুষ নয়, মহাপুরুষ হবার কোনো আগ্রহও তার নেই। সে জ্বলন্ত সিগারেট হাতে এলোমেলো পা ফেলতে লাগল।

আপনি এখানে কী করছেন?'

ফিরোজ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মনে হচ্ছে জ্বরের ঘোরে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। হ্যালুসিনেশন হচ্ছে। কারণ সে যে দৃশ্যটি দেখছে, তা তার এই অবস্থায় দেখতে পাওয়ার কোনো কারণ নেই। বাংলা সিনেমাতেও এই ঘটনাটাকে নাটকীয় মনে হবে।

'আপনি কী আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'চিনতে পারব না কেন? আপনি, একজন অসম্ভব রাগী হৃদয়হীন অহঙ্কারী তরুণী। এখানে কী করছেন?'

অপালা হেসে ফেলল। হাসতে-হাসতেই বলল, 'বেশ কিছুক্ষণ থেকে আপনাকে লক্ষ্য করছি। এ-রকম পাগলের মতো পা ফেলছেন কেন? আপনি কী অসুস্থ?'

'হ্যাঁ। তার আগে বলুন, এমন সহজ ভঙ্গিতে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলছেন কেন? ঐ দিন এমন অপমান করলেন! নেহায়েত সাহসের অভাবে সুইসাইড করিনি।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না। কিসের অপমান?'

'ঐ যে ঐ দিন দেখা করতে গেলাম, আপনি বলে পাঠালেন দেখা হবে না।'

'ঐ দিন মন ভাল ছিল না। কথা বলতে ভাল লাগছিল না। এতে অপমান বোধ করার কী আছে।'

'আজ কি আপনার মন ভাল?'

'হ্যাঁ, ভাল। গতকাল আমাব একটা পরীক্ষা ছিল। খুব ভাল পরীক্ষা দিয়েছি।'

'এখানে কী করছেন?'

'একজনকে খুঁজছি।'

'আমাকে না তো?'

'না, আপনাকে কেন খুঁজব? এ-রকম করে কথা বলছেন কেন?'

'শরীর খাবাপ তো, কাজেই উল্টোপাল্টা কথা বলছি। ঐ সব ধরবেন না। আপনি একা একা হাঁটছেন, আপনার বর্ডিগার্ডরা কোথায়? গাড়ি কোথায়?'

অপালা হাসতে-হাসতে বলল, 'কাউকে না বলে একা একা বেরিয়েছি। একজনকে একটা গিফট দেব। ঠিকানা লেখা আছে, খুঁজে বের করতে পারছি না।'

'দিন ঠিকানা, এক্ষুণি বের করে দিচ্ছি।'

'এইভাবে লুঙ্গি পরে যাবেন? আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি, আপনি চট করে কাপড় বদলে আসুন।'

'রাস্তায় দাঁড়িয়ে না-থেকে আপনি বরং আমার সঙ্গে আসুন। কোথায় কীভাবে থাকি দেখে যান, কাজে লাগবে।'

'কী কাজে লাগবে?'

'বাংলাদেশে কিছু দরিদ্র মানুষও থাকে, এটা জানবেন।'

'আপনার ধারণা, আমি জানি না?'

'আমার সে-রকমই ধারণা।'

খুবই আশ্চর্যে ব্যাপার, শাড়ির প্যাকেট হাতে অপালা ফিরোজের পেছনে পেছনে আসছে। অপালার ভালই লাগছে। কেন ভাল লাগছে তাও ঠিক বুঝতে পারছে না। এই মানুষটি তাকে দেখে অসম্ভব খুশি হয়েছে। তা ফুটে উঠেছে তার চোখে-মুখে, কথা বলার ভঙ্গিতে। তার সিগারেটে আগুন নেই। সেই নেভানো সিগারেটই সে টানছে এবং ধোঁয়া ছাড়বার মত ভঙ্গি করছে। লোকটি জানে না যে তার সিগারেট নেভানো। অপালার মনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ খেলা করছে। এই সন্দেহটিকে প্রশ্রয় দেয়া বোধহয় ঠিক হবে না।

ফিরোজ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্মিত গলায় বলল, 'আপনি সত্যি সত্যি আমার সঙ্গে আসছেন!'

'আপনি তো আসতে বললেন।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো। কথার কথা হিসেবে বলেছিলাম, সত্যি সত্যি চলে আসবেন ভাবিনি। আপনি কী রোমান হলিডে নামের কোনো ছবি দেখেছেন?'

'না। কেন?'

'যে-ঘটনাটা আমার জীবনে ঘটছে, তার সঙ্গে ঐ ছবিটার অদ্ভুত মিল আছে। ঐ ছবিতে একজন রানী একদিন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন, সারাটা দিন কাটান একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। সন্ধ্যাবেলা আবার রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।'

'আপনি এমনভাবে কথা বলছেন কেন?'

'আগেই তো বলেছি, আমি অসুস্থ, আমার মাথা এলোমেলো হয়ে আছে। যা মনে আসছে বলে ফেলছি। আপনি চলে যাবার আগে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইব। সাবধানে উঠবেন, সিঁড়িটা পিছল।'

ফিরোজ অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটা কী সুন্দর গুট-গুট করে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে! তার মনে হল, মেয়েটির মাথাও খানিকটা এলোমেলো। কিংবা লোকজনের সঙ্গে মিশে তার অভ্যেস নেই। সাধারণ একটি মেয়ে কখনো কোনো অবস্থাতেই এমন পরিচয়ে তার ঘরে আসবে না। ব্যাপারটির অস্বাভাবিকতা মেয়েটির চোখেই পড়ছে না, কিংবা কে জানে হয়ত এটাই স্বাভাবিক। আচ্ছা, এটা স্বপ্নদৃশ্য নয় তো? সমস্ত ব্যাপারটা হয়ত স্বপ্নে ঘটে যাচ্ছে। না, তা নয়। ফিরোজ সেন্টের গন্ধ পাচ্ছে। ঘন নীল রঙের আকাশ দেখতে পাচ্ছে। স্বপ্ন হয় গন্ধ ও বর্ণহীন।

অপালা কৌতূহলী হয়ে দেখছে। দেখার মত কিছু নেই। অপরিচ্ছন্ন নোংরা একটি ঘর। অন্য দিন এর চেয়ে পরিষ্কার থাকে। অসুস্থ থাকার কারণে কোনো কিছুতেই হাত দেয়া হয়নি। এখনো মশারি খাটানো। মেঝেতে সিগারেটের টুকরো। ময়লা কাপড়। দু'টি শেষ না-হওয়া পেইন্টিং। রঙের টিউব, ব্রাশ। পিরিচে রঙ, চেয়ারে রঙ, মেঝেতে রঙ। জানালার পাশে আধা-খাওয়া চায়ের কাপের দিকে সারি বেঁধে লাল পিঁপড়ার দল যাচ্ছে। অপালা বলল, 'আপনি মনে হচ্ছে খুব গোছানো মানুষ।'

ফিরোজ জবাব দিল না।

'আপনি ড্রেস চেঞ্জ করুন, আমি বারান্দায় দাঁড়াচ্ছি।'

অপালা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সুখী সুখী চোখে তাকিয়ে রইল রাস্তার মানুষজনদের দিকে। কত ব্যস্ত হয়েই না এরা ছুটছে, দেখে মনে হয় এদের কারোর বিন্দুমাত্র অবসর নেই। সবার ভীষণ তাড়া।

ফিরোজ বেরিয়ে এসে বলল, 'আপনাকে এনে লজ্জাই লাগছে।'

অপালা বলল, 'আমি ভেবেছিলাম আপনার স্ত্রীকে এ বাড়িতে দেখব। এখনো বিয়ে হয়নি?'

'না।'

'হবে তো শেষ পর্যন্ত?'

'হ্যাঁ, হবে।'

'আপনি বানিয়ে বানিযে এ সব বলছেন না তো?'

'বানিয়ে বলব কেন? আমার কী স্বার্থ?'

'তাও তো ঠিক। আচ্ছা শুনুন, একটা মজার জিনিস দেখলাম আপনার এখানে দুটো চড়ুই পাখি চা খাচ্ছে।'

'ওরা আমার পোষা চড়ুই। চা খাইয়ে-খাইয়ে পোষ মানিয়েছি।'

'আপনি কেন বানিয়ে বানিয়ে এত মিথ্যা কথা বলেন?'

'চড়ুইগুলো যদি কথা বলতে পারত, তাহলে এরা বলত যে এটা সত্যি। দুর্ভাগ্যক্রমে এদের কথা আমরা বুঝি না।'

বাসা খুঁজে পেতে অনেক সময় লাগল। গলির পর গলি, তস্য গলি। টিনের একটা ঘর। এর আবার নামও আছে আনন্দ কুটির।

ফিরোজ বলল, 'আমিও কী আসব আপনার সঙ্গে?'

'না, আপনি কেন আসবেন?'

'অপেক্ষা করব এখানে?'

'না, আমি নিজেই চলে যাব।'

'আমি না হয় থাকি, আপনাকে রিকশায় তুলে তারপর যাব।'

'না। কেউ অপেক্ষা করে থাকলে আমার অস্বস্তি লাগে।'

ফিরোজ নিজেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। প্রচণ্ড জ্বরের আগমন সে টের পাচ্ছে। চোখ মেলে রাখতে পারছে না, বমি-বমি ভাব হচ্ছে। ফিরোজের ধারণা, অপালা এটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সে একটি কথাও বলছে না। সহজ ভদ্রতার দু'টি কথা কি বলা যায় না? সে যদি জিজ্ঞেস করে-- আপনার কী খুব খারাপ লাগছে নাকি? তাতে তো জগৎ-সংসারের কোনো ক্ষতি হবে না। ফিরোজ বলল, 'হয়ত ওরা বাসায় নেই, কোথাও বেড়াতে-টেড়াতে গিয়েছে। আমি দাঁড়াচ্ছি, আপনি খোঁজ নিয়ে আসুন।'

অপালা হেসে ফেলল। ফিরোজ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল, 'আপনি হাসছেন? এখন বাচ্চাদের পরীক্ষ-টরীক্ষা হয়ে গেছে, এই সময়ই সবাই নানার বাড়িতে বেড়াতে যায়।'

'যে-বাড়িতে যাচ্ছি, তাদের বড় মেয়েটির বিয়ে, কাজেই ওরা কোথাও যাবে না।'

'হয়ত দল বেঁধে কেনাকাটা করতে গিয়েছে। বড় মেয়ের বিয়েতে দল বেঁধে কেনাকাটা হয়। আমার বড় বোনের বিয়ের সময় দেখেছি। কাজের মেয়েটিকে পর্যন্ত আমরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছি। ঘর তালাবন্ধ করে গেলাম, ফিরে এসে দেখি চোর সব সাফা করে দিয়েছে।'

'ফিরোজ সাহেব।'

'জি।'

'এখন চলে যান। প্লিজ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে তর্ক করতে ভাল লাগছে না।'

ফিরোজ গেল না। একটু শুধু সরে গেল। তার কেন জানি মনে হচ্ছে অপালা এক্ষুণি বেরিয়ে আসবে। তখন তার সঙ্গে অনেকক্ষণ হাঁটা যাবে। পাশাপাশি সাত পা হাঁটলে সাত পাকে বাঁধা পড়ে। অনেক বেশি পা হাঁটা হয়েছে। আরো হোক। সে লক্ষ পা হাঁটবে।

আশপাশে কোনো চায়ের দোকান নেই যে বসা যায়। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। সামান্য জ্বরে শরীর বড় বেশি কাবু হয়েছে। অসুখ-অসুখ একটা গন্ধ বেরুচ্ছে গা থেকে। পেটে আবার পাক খেতে শুরু করেছ। এবার নির্ঘাত বমি হবে। অপালা ঘর থেকে বেরিয়ে দেখবে সে রাস্তায় উবু হয়ে বসে বমি করছে। সে বড় কুৎসিত দৃশ্য। এই দৃশ্য অপালাকে কিছুতেই দেখানো যায় না। ফিরোজ একটা রিকশায় উঠে পড়ল।

অপালা অনেকক্ষণ হল কড়া নেড়েছে। ভেতর থেকে মিষ্টি গলায় একটি মেয়ে বলল, 'কে?'

অপালা কী বলবে ভেবে পেল না। সে যদি বলে— 'আমি অপালা'। তাহলে কেউ কিছু বুঝবে না। শুধু 'আমি' বলারও কোনো মানে নেই। সে আবার কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে সেই মেয়েটি আবার বলল, 'কে?' যেন জবাব না পেলে দরজা খুলবে না।

অপালা বলল, 'দরজাটা কী খোলা যাবে?'

খুট করে দরজা খুলল, তাও পুরোপুরি নয়। অল্প একটু ফাঁক করে বার-তের বছরের মেয়েটি মুখ বের করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এই মেয়েটিকেই অপালা তাদের গেটের বাইরের দেখেছে। মেয়েটি কী যে অবাক হয়েছে! চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে। নিঃশ্বাস পর্যন্ত ফেলছে না। অপালাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ছুটে ভেতরে চলে গেল। তার পরপরই অনেকগুলো পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। বাড়ির সবাই যেন একসঙ্গে ছুটে আসছে। অপালার লজ্জা করতে লাগল।

এ-বাড়িতে বোধহয় কোনো ছেলে নেই। পাঁচটি বিভিন্ন বয়সের মেয়ে তাকে ঘিরে আছে। এদের সবার মুখের দিকে খানিকক্ষণ করে তাকাল। একটি শীতল স্রোত বয়ে গেল অপালার গা দিয়ে। এই মেয়েগুলো দেখতে তার মতো, বিশেষ করে বড় মেয়েটি। অপালা কাঁপা গলায় বলল, 'তোমরা কেমন আছ?' কেউ কোনো জবাব দিল না। বাড়ির ভেতর থেকে একজন মহিলা বললেন, 'ওকে ভেতরে নিয়ে আয়, ওকে ভেতরে নিয়ে আয়।' বড় মেয়েটি চাপা গলায় বলল, 'আস, ভেতরে আস।' বলেই সে অপালার হাত ধরল। যেন সে এদের অনেক দিনের পরিচিত কেউ। অপালা বলল, 'তোমরা কী আমাকে চেন?' তারা কেউ সে প্রশ্নের জবাব দিল না। ভেতর থেকে ভদ্রমহিলা বললেন, 'ওকে নিয়ে আয় ওকে ভেতরে নিয়ে আয়।'

চাদর গায়ে একজন মহিলা বিছানায় শুয়ে আছেন। অপালা ঘরের ভেতর পা দেয়ামাত্র তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। কান্নার দমকে তাঁর ছোট্ট শরীর থর-থর করে কাঁপছে। বড় মেয়েটি ছুটে গিয়ে তার মাকে ধরল। ফিসফিস করে বলল, 'কিছু হয় নাই মা, কিছু হয় নাই, তুমি চুপ কর।' ভদ্রমহিলা চুপ করতে পারছেন না।'

অপালা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'আপনি কী আমাকে চেনেন?'

ভদ্রমহিলা না-সূচক মাথা নাড়লেন।

'আপনি তাহলে এ-রকম করছেন কেন?'

বড় মেয়েটি একটি হাতপাখা নিয়ে তার মাকে দ্রুত হাওয়া করছে। মেজো মেয়েটি অপালার হাত ধরে বলল, 'তুমি বস। চেয়ারটায় বস।'

অপালা বসল। হাতের শাড়ির প্যাকেটটি নামিয়ে রেখে ক্লান্ত গলায় বলল, 'এ বাড়ির যে মেয়েটির বিয়ে, তার জন্যে এই শাড়িটা এনেছি। বিয়ের দিন তো আসতে পারব না, তাই। বেশি লোকজন আমার ভাল লাগে না।'

অপালা কী বলছে নিজেও বুঝতে পারছে না। সে যেন ঘোরের মধ্যে কথা বলছে। পাঁচটি মেয়ের কেউই তার কথা শুনছে বলে মনে হল না। সাবাই চোখ বড় বড় করে অপালার দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু বড় মেয়েটি তার মাকে নিয়ে ব্যস্ত। ভদ্রমহিলা এখন আর কোনো সাড়াশব্দ করছেন না। তাঁর চোখ বন্ধ। হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। বড় মেয়েটি তার মা'র গলা পর্যন্ত চাদর টেনে মৃদু স্বরে বলল, 'এস, আমরা পাশের ঘরে যাই।'

'উনি কী ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'হ্যাঁ। মা'র শরীর খুব খারাপ। মাঝে মাঝে তাঁর এ রকম হয়।'

'উনি আমাকে দেখে এ-রকম করলেন কেন?'

বড় মেয়েটি তার জবাব না-দিয়ে বলল, 'চল, পাশের ঘরে যাই।'

অপালা বলল, 'না, আমি পাশের ঘরে যাব না। আমি এখন চলে যাব। আমার ভাল লাগছে না। আমার একটুও ভাল লাগছে না।'

সে উঠে দাঁড়াল। আবার বলল, 'তোমরা কী আমাকে চেন?'

বড় মেয়েটি বলল, 'না, চিনি না।'

'সত্যি চেন না?'

'তোমার বাবা আমার বাবাকে অনেক সাহায্য করেছেন, সেই ভাবে চিনি। আমার বাবার কোনো টাকা-পয়সা ছিল না। প্রায় না খেয়ে ছিলেন। বাবা-মা আর তাদের তিন মেয়ে। তখন তোমার বাবা আমাদের সাহায্য করেন। টাকা-পয়সা দেন। বাবাকে একটা দোকান দিয়ে দেন। সেইভাবে তোমাকে চিনি।'

'সেই রকম চেনায় কেউ কী আমাকে তুমি বলবে?'

'তুমি বলায় কী রাগ করেছ?'

অপালা জবাব না-দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। সে ঠিকভাবে পা ফেলতে পারছে না। তার যেন প্রচণ্ড জ্বর আসছে। নিঃশ্বাসও ঠিকমত ফেলতে পারছে না। অপালার সঙ্গে-সঙ্গে ওরা পাঁচ জনও বেরিয়ে এসেছে। মেজো মেয়েটি অপালার হাত ধরে কী বলতে চাইল। অপালা সেই হাত কাঁপা ভঙ্গিতে সরিয়ে প্রায় ছুটে গেল রাস্তার দিকে। তার মনে হচ্ছে, সে রাস্তা পর্যন্ত যেতে পারবে না, তার আগেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়বে। তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে যাচ্ছে।

পাঁচ বোন দরজা ধরে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, যেন তারা কোনো কারণে খুব ভয় পেয়েছে।

রাত দশটা।

নিশানাথবাবু দোতলায় উঠে এসে অপালার দরজায় ধাক্কা দিলেন।

'মা, একটু দরজা খুলবে?'

অপালা দরজা খুলল। তার চোখ লাল। দৃষ্টি এলোমেলো। নিশানাথবাবু মৃদু স্বরে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'কই, কিছু হয়নি তো। কী হবে?'

'আজ তুমি কোথায় গিয়েছিলে?'

'ম্যানেজার কাকু, আজ আমার কথা বলতে ভাল লাগছে না। আপনি এখন যান। আপনার পায়ে পড়ি।'

নিশানাথবাবু আবার নিচে নেমে গেলেন। সেই রাতে তিনি আর বাড়ি ফিরলেন না। একতলার গেস্টরুমে রাত কাটালেন।

ফখরুদ্দিন সাহেব গভীর রাতে টেলিফোন করলেন। গভীর রাতের টেলিফোন গলা অন্যরকম শোনা যায়। চেনা মানুষকেও অচেনা মনে হয়। অপালা বলল, 'আপনি কে?'

ফখরুদ্দিন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তুমি কী আমাকে চিনতে পারছ না, মা?'

'ও, বাবা তুমি?'

'হ্যাঁ, আমি। তোমার কী হযেছে?'

'কই, কিছু হয়নি তো!'

'মা, সত্যি করে বল তো।'

'সত্যি বলছি, আমার কিছু হয়নি, শুধু...'

'শুধু কী?'

'আমার খুব একা-একা লাগছে বাবা।'

ফখরুদ্দিন সাহেব টেলিফোনেই কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। তাঁর অসম্ভব মন খারাপ হয়ে গেল।

'মা, তুমি কী কাঁদছ?'

'হ্যাঁ, কাঁদছি। আর কাঁদব না।'

'কিছু একটা তোমার হয়েছে। সেটা কী?'

অপালা চুপ করে রইল। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'আমাকে বলতে কী তোমার কোনো বাধা আছে?'

'বলার মত কিছু হয়নি বাবা।'

'কোনো ছেলের সঙ্গে কী তোমার ভাব হয়েছে? নিশানাথ বলছিল আর্টিস্ট একটা ছেলে নাকি আসে প্রায়ই। তুমি কী আজ তার কাছে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, গিযেছিলাম।'

'সে কী এমন কিছু বলেছে, যাতে তোমার মন খারাপ হয়েছে?'

'না।'

'এই ছেলেটিকে তোমার কী পছন্দ হয়? যদি হয় আমাকে বল। তুমি যা চাইবে তাই হবে। যা হওয়ার নয়, তাও আমি হওয়াব। আমার প্রচুর ক্ষমতা।'

ফখরুদ্দিন সাহেবের মনে হল, অপালা আবার কাঁদতে শুরু করেছে। তিনি বললেন, 'ঐ ছেলে যদি তোমাকে কষ্ট দিয়ে থাকে, আমি টেনে তার জিভ ছিঁড়ে ফেলব।'

'ঐ সব কিছু না বাবা, এমনিতেই আমার মন খারাপ। তুমি তো জান, মাঝে মাঝে আমার মন-খারাপ হয়।

'এটা তো ভাল কথা না। এটা একটা অসুখ, এর নাম মেলাংকলি। আমি ঢাকায় এসেই বড় বড় ডাক্তার দেখাব।'

'কবে আসবে ঢাকায়?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলা শেষ হলেই আমি ট্রাভেল এজেন্টকে ফোন করব। এখানে আমার অনেক ঝামেলা, তবুও আমি ফার্স্ট এ্যাভেইলেবল ফ্লাইটে চলে আসব। তোমার মা'কেও নিয়ে আসব।'

'আচ্ছা।'

'তুমি কী আর কিছু বলবে?'

'না।'

'তুমি কী জেগে ছিলে নাকি মা?'

'হ্যাঁ।'

'এত রাত পর্যন্ত জেগে জেগে কী করছিলে?'

'ছবি দেখছিলাম।'

'কী ছবি দেখছিলে?'

'আমার ছবি। কত ছবি যে তোমরা আমার তুলেছ!'

'দ্যাটস রাইট। ফটোগ্রাফির হবিটা একসময় বেশ জোরালই ছিল। এখন নেই। ভাবছি, আবার শুরু করব। একটা ডার্ক রুম বানিয়ে নিজেই ছবি ডেভেলপ করব। কেমন হবে?'

'ভালই হবে। বাবা।'

'বল মা।'

'আমার এত ছবি, কিন্তু খুব ছোটবেলার ছবি নেই কেন?'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'জন্মের পর পর তোলা ছবি। এক বছর-দু'বছর বয়সের ছবি।'

ফখরুদ্দিন সাহেব বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তাঁর নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। অপালা যখন দ্বিতীয় বার প্রশ্নটি করতে যাবে তখন তিনি বললেন, 'তোমার ছোটবেলার ছবিও আছে। না-থাকার তো কোনো কাবণ নেই। আমি এসে তোমাকে খুঁজে দেব।'

'আচ্ছা।'

'তোমার ছোটবেলায় আমি একটা ঝামেলায় পড়েছিলাম। ব্যবসা-সংক্রান্ত ঝামেলা। মন-মেজাজ ভাল ছিল না। প্রচুর ছোটাছুটি করতে হত, ছবি তোলার তেমন মুড ছিল না। ছবি তোলা, কবিতা এবং গল্প লেখার মতই একটা মুডের ব্যাপার।'

'তা ঠিক।'

'একেবারেই যে তুলিনি তা নয়। কিছু কিছু নিশ্চয়ই তোলা হয়েছে। তবে আরো বেশি তোলাব প্রয়োজন ছিল। আমি ফিরে আসি, তারপর দেখবে প্রতিদিন এক রোল করে স্ন্যাপ নেব।'

'বাবা।'

'বল মা।'

'আগামীকাল আমার একটা পরীক্ষা আছে।'

'ও, আই অ্যাম সরি। এতক্ষণ তোমাকে ডিস্টার্ব করা খুবই অনুচিত হয়েছে।'

অপালা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'কাল যদি পরীক্ষাটা না দিই, তাহলে কী তুমি বাগ করবে?'

'মা, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।'

'কাল আমার পরীক্ষা দিতে ইচ্ছা করছে না। যদি পরীক্ষার হলে যাই, তাতেও লাভ হবে না। একটা লাইনও লিখতে পারব না।'

'কেন?'

'আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে।'

'শরীর খারাপ লাগলে তো পরীক্ষা দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না। মা, তুমি শুযে থাক। আমি আসছি, এসেই সব ঠিক করে দেব।'

অপালা টেলিফোন রেখে খাবার ঘরে গেল। এত রাত হযেছে, তবু কেউ ঘুমাযনি। সবাই জেগে আছে। সে আজ সারা দিন কিছু খায়নি, রাতেও খায়নি  এই জন্যেই জেগে আছে হয়ত।'

'রমিলা।'

'জি আফা।'

'আমি এক কাপ কফি খাব। খুব কড়া করে এক কাপ কফি দাও।'

'সাথে আর কিছু দিব আফা?'

'এক টুকরো পনির কেটে দিও। আমার ঘরে নিয়ে এসো। আর শোন, তোমরা সবাই জেগে আছ কেন? শুয়ে পড়।'

অনেক দিন পর অপালা তার খাতা নিয়ে বসেছে। ঘুম ঘুম একটা ভাব ছিল, কফি খাওয়ায় সেই ভাব কেটে গেছে। খুব ক্লান্তি লাগছে, আবার ইচ্ছেও করছে কিছু একটা লিখতে। অপালা লিখতে শুরু করল।

## আমার বাবা

যখন ক্লাস নাইনে পড়ি তখন বাংলার স্যার একটা রচনা লিখতে দিলেন  তোমার প্রিয় মানুষ। কেউ লিখল রবীন্দ্রনাথ, কেউ শরৎচন্দ্র। কিছু-কিছু স্মার্ট মেয়েরা বিদেশের নামকরা লোকদের প্রিয় মানুষ বানিয়ে রচনা লিখল, লেনিন, আইনস্টাইন, মাদার তেরেসা। আমি

লিখলাম, আমার প্রিয় মানুষ আমার বাবা। কেন তিনি আমার প্রিয় মানুষ তাও লিখলাম। ছোট ছোট কিছু ঘটনার কাথা লিখলাম— যেমন, আমার এক বার টনসিল অপারেশন হল। সলিড কিছু খেতে পারি না। বাবার তা দেখে খুব কষ্ট হল। তিনি বললেন, আমার মা যত দিন সুস্থ না হয়েছে, তত দিন আমিও সলিড কিছু খাব না। সত্যি সত্যি তিন দিন তাই করলেন। দুধ, মুরগির সুপ এইসব খেয়ে কাটালেন। আরেক বার আমার প্রচণ্ড দাঁতে ব্যথা। মাঢ়ীর হাড়ে কী যেন হয়েছে। কত ওষুধ কত ডাক্তার, ব্যথা কমে না। আমার কষ্ট দেখে বাবা যেন কী-রকম হয়ে গেলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোট বাচ্চাদের মত শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার! বাবার কান্না শুনে আমার ব্যথা কমে গেল। আমি বললাম, বাবা তুমি কাঁদবে না, আমার ব্যথা কমে গেছে। বাবা মনে করলেন আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলছি। তিনি আরো শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। এই মানুষটি যদি আমার প্রিয় না হয়, তাহলে কে হবে? রবীন্দ্রনাথ, আইনস্টাইন, মাদার তেরেসা— এঁরা মহাপুরুষ পর্যায়ের মানুষ, পৃথিবীর সবার প্রিয়। কিন্তু আমি সামান্য মানুষ, আমার প্রিয় মানুষটিও সামান্য।

এই রচনা নিয়ে কত কাণ্ড! আমাদের বাংলার স্যার কবিরউদ্দিন খুব খুশি। ক্লাসে সবাইকে পড়ে শোনালেন। শুধু তাই না, লেখাটা কপি করে তিনি দৈনিক বাংলার শিশুদের পাতায় ছাপতে দিলেন। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, লেখাটা সেখানে ছাপাও হল। এটাই আমার প্রথম ছাপা লেখা এবং এটাই শেষ।

বাবা এই লেখা পড়লেন না। কারণ তিনি জানেনই না যে তাঁর মেয়ের একটা লেখা ছাপা হয়েছে। আমার খুব ইচ্ছা করছিল বাবাকে লেখাটা পড়াই, আবার লজ্জাও লাগছিল। নিজের গোপন ভালবাসার কথা জানাতে লজ্জা করে...।

আমার মনে হয় লজ্জা একটু বেশি। মা এত অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে, আমার এত খারাপ লাগে, কিন্তু নিজের খারাপ লাগার কথা মা'কে কখনো জানাই না। জানাতে ইচ্ছা করে না। সব সময় মনে হয় নিজের মনের কথা থাকুক না মনে! কী হবে সবাইকে জানিয়ে?'

ভোরবেলা খুব সহজভাবে অপালা নিচে নেমে এল। নাশতার টেবিলে বসল। নিশানাথবাবুর স্ত্রী প্রায় ছুটে এলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অপালা বলল, 'একটা হাসির গল্প বলুন তো কাকিমা।'

তিনি খুবই অবাক হলেন। এত অবাক হলেন যে হাসির গল্প মনে এল না। তিনি হাসির গল্পের জন্যে আকাশপাতাল হাতড়াতে লাগলেন। অপালা নাশতা শেষ করে অরুণা-বরুণার খোঁজে গেল। অরুণা তাকে বিশেষ পছন্দ করে না, তবে বরুণা তার জন্যে পাগল। আজ দু'জনই ছুটে এল। লাফালাফি করতে লাগল। বরুণার স্বভাব হচ্ছে আদর দেখানোর জন্যে পা কামড়ে ধরার ভঙ্গি করা। অপালা যখন বলে— এই, এ সব কী! তখন তার ফুর্তির সীমা থাকে না। অনেকটা দূরে ছুটে যায়, আবার দৌড়ে এসে কামড়ের ভঙ্গি করে। আজ দুজনই এক খেলা খেলছে। দুজনের মনেই আনন্দ।

গোমেজ এসে বলল, 'আপা, আপনার টেলিফোন।'

গোমেজের হাতে এক কাপ কফি।

'আপা, কফিটা নিন। অন্য রকম করে বানিয়েছি।'

'অন্য রকম মানে? লবণ দিয়েছ নাকি গোমেজ ভাই?'

'খেয়ে দেখেন আপা।'

অপালা কফির কাপ হাতে টেলিফোন ধরতে গেল। টেলিফোন করেছেন মা। তাঁর গলাটা কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে। যেন খুব সূক্ষ্মভাবে কাঁপছে।

'মা, তুই কেমন আছিস?'

'আমি ভাল আছি। আমি খারাপ থাকব কেন? আমার তো আর হার্টের অসুখ হয়নি।'

'আজ তোর পরীক্ষা না?'

'হ্যাঁ, বিকেলে।'

'তোর বাবা বলছিল, তুই নাকি পরীক্ষা দিবি না?'

'পরীক্ষা দেব না কেন? এত পড়াশোনা শুধু শুধু করলাম? তবে পরীক্ষাটা খুব খারাপ হবে।

'তুই কাল তোর বাবাকে কী বলেছিলি? সে সারা রাত ঘুমুতে পারেনি।'

'ও-মা, সে কী কথা! আমি তো কিছু বলিনি। কই, বাবাকে দাও তো, তোমার কাছে আছেন না?'

'না। টিকিটের জন্যে ছোটাছুটি করছে। টিকিট পাচ্ছে না। এখন গেছে অ্যারোফ্লটের অফিসে মস্কো হয়ে ঢাকায় যাবে।'

'তোমাদের এত ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমার কিছু হয়নি। আমি খুব ভাল আছি।'

'সত্যি ভাল আছিস"

'হ্যাঁ, সত্যি ভাল। মিথ্যা ভালো আবার কেউ থাকে নাকি?'

অপালা হেসে ফেলল।

প্রশ্ন হাতে নিয়ে অপালার জ্বর এসে গেল। সব অচেনা। মনে হচ্ছে অন্য কোনো সাবজেক্টের প্রশ্ন ভুল করে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, লিখতে গিয়ে দেখল সে লিখতে পারছে। উত্তরগুলো বেশ ভালই হল। রিগ্রেশন মডেলের একটা জটিল অঙ্কও শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে ফেলল। কে জানে, হয়ত এই শেষ পরীক্ষাটাই তার সবচেয়ে ভাল হয়েছে।

অনার্সের কঠিন কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে। বেশ লাগছে তার। ইচ্ছে করছে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে। গাড়িতে করে নয়, হেঁটে হেঁটে। ফিরোজ নামের ঐ ছেলেটিকে সঙ্গে নিলে কেমন হয়? তাকে গিয়ে সে যদি বলে, আপনি আপনার বান্ধবীর কাছে আমাকে নিয়ে চলুন, ঐ মেয়েটিকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে।

হাজি সাহেব অবাক হয়ে একটি দৃশ্য দেখলেন। বিশাল একটা নীল রঙের গাড়ি তাঁর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েছে। লম্বা, ফর্সা একটা মেয়ে নামছে গাড়ি থেকে। বেশ সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দোতলায় উঠে যাচ্ছে। যেন অনেক বার সে এসেছে। সব কিছু তার খুব ভাল চেনা। দোতলায় এই মেয়েটি কার কাছে যাচ্ছে? মেয়েটির বয়স এমন যে চট করে তুমি বলা যায় না। আবার তাঁর মত একজন বয়স্ক লোকের পক্ষে আপনি করে বলাও মুশকিল তাঁর বড় মেয়ের বয়স নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি। হাজি সাহেব ইতস্তত করে বলেই ফেললেন, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

অপালা সিঁড়ির মাঝামাঝি থেমে গেল। দু'পা নেমে এসে বলল, 'ফিরোজ বলে একজন ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর কাছে।'

'উনি তো হাসপাতালে।'

'সে কী, কেন?'

'আকাশপাতাল জ্বর। আমিই হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছি।'

'কোন হাসপাতাল, কত নম্বর বেড, এইসব বলতে পারবেন?'

'মুখস্থ বলতে পারব না। আমার কিচ্ছু মনে থাকে না। তবে লেখা আছে। আমার সঙ্গে এস, দিচ্ছি।'

অপালা নেমে এল। হাজি সাহেব বললেন, 'ফিরোজ তোমার কে হয়?'

'কিছু হয় না। আমার খুব পরিচিত।'

হাজি সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। বেফাঁস কিছু বলে ফেলছিলেন, বহু কষ্টে নিজেকে সামলালেন। মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে হাসপাতালের নাম-ঠিকানা দেবার কোনো আগ্রহ এখন আর অনুভব করছেন না। তবু মুখের ওপর বলা যায় না— তুমি চলে যাও, তোমাকে কিচ্ছু দেব না।

অপালা হাজি সাহেবের পেছনে-পেছনে বসার ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখানে তার জন্যে বড় রকমের একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। হাজি সাহেবের ছোট মেয়ে বিছানার ওপর বসে আছে। তার ছবিই সে ফিরোজের কাছে দেখেছে। মেয়েটি ছবির চেয়েও অনেক সুন্দর। তবে সে বোধহয় নিজের পরিবারের বাইরে কারো সঙ্গে মিশতে অভ্যস্ত নয়। খুব হকচকিয়ে গেছে। একটি কথাও না-বলে চলে যাচ্ছে ভেতরের দিকে। কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাঁটছে। এমনভাবে হাঁটছে কেন?

অপালা বলল, 'এই মেয়েটির সঙ্গেই কী ফিরোজ সাহেবের বিয়ের কথা হচ্ছে?'

হাজি সাহেব এবং তাঁর মেয়ে দুজনই চমকে উঠল। মেয়েটি দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাজি সাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর হাতে একটা নোটবই। নোটবইটা হাত থেকে মেঝেতে

পড়ে গেল। তিনি অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'বিয়ের কথা তুমি কী বললে?'

'আমি বোধহয় কোনো ভুল করেছি। কিছু মনে করবেন না।'

'ভুল না, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি গোড়া থেকে সে রকমই সন্দেহ করছিলাম। ওর মা'কে বলেছিও কয়েক বার।'

দরজা ধরে দাঁড়ানো মেয়েটি চট করে সরে গেল। হাজি সাহেব বললেন, 'মুখ ফুটে নিজের কথা বললেই হয়, কিংবা আত্মীয়স্বজনদের দিয়ে বলাতে পারে, তা না!'

বিস্মিত অপালা বলল, 'বিয়ের ব্যাপারে তাহলে উনি আপনাদের কিছু বলেননি?'

'আরে না! একেক সময় একেক কথা বলে। এক বার বলল - বিয়ের সব দায়িত্ব আমার। তখনই সন্দেহ হল। চালাক ছেলে। তুমি বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন? দাঁড়াও, চায়ের কথা বলে আসি। আর এই হল ঠিকানা, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ওয়ার্ড নাম্বার পাঁচ। বেড নাম্বার তেতাল্লিশ। ওয়ার্ডে ঢুকেই প্রথম বিছানাটা।'

অপালাকে ঘণ্টাখানেক বসতে হল। হাজি সাহেবের স্ত্রী এই এক ঘণ্টা ক্রমাগত কথা বললেন। মোটাসোটা ধরনের মহিলা, কথা বলার সময় খুব হাত নাড়ান। শুরুই করলেন 'মা' ডাক দিয়ে।

'মা, তোমার নাম কী?'

'অপালা।'

'ও-মা, কী অদ্ভুত নাম! তুমি আমার কথায় কিছু মনে করলে না তো?'

'জি না।'

'তুমি আসায় খুব খুশি হয়েছি। একটা ঝামেলা মিটে গেল। ছেলের মনে কী ছিল তা তো আর আমরা জানি না। জানলে এত দিনে শুভ কাজ সমাধা হয়ে যেত ইনশাআল্লাহ।'

হাজি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এসেই কী বকবক শুরু করলে? চুপ কর তো।'

'চুপ করব কেন? আমরা মেয়েতে-মেয়েতে কথা বলছি, তুমি এর মধ্যে থাকবে না। বারান্দায় গিয়ে বস।'

মেয়েটি চায়ের ট্রে নিয়ে ঢুকেছে। একটা প্লেটে পাঁপর ভাজা, অন্য একটা প্লেটে সুজির হালুয়া। সে খুব সাবধানে ট্রে নামিয়ে রাখল। এক বারও চোখ তুলে তাকাল না। ভয়ে-সঙ্কোচে সে এতটুকু হয়ে গেছে। এখন ভাল লাগছে মেয়েটিকে দেখতে।

হাজি সাহেবের বাড়ি থেকে বেরুতে-বেরুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা কারো বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করে না। সন্ধ্যাবেলা শুধু পশু এবং পাখিরাই ঘরে ফিরবার জন্যে ব্যাকুল হয়। মানুষ হয় না। ঊষা এবং গোধূলি হচ্ছে গৃহত্যাগের লগ্ন।

ড্রাইভার বলল, 'বাসায় যাব আপা?'

'না, এমনি একটু রাস্তায় চালান।'

'মীরপুর রোড ধরে যাব?'

'যান।'

শ্যামলীতে বড় খালার বাড়ি। তাঁর সঙ্গে এক বার দেখা করে এলে কেমন হয়? কত দিন ও-বাড়িতে যাওয়া হয় না। খালাও আসেন না। মা মাঝে মাঝে এ-বাড়িতে আসেন, কিন্তু অপালাকে সঙ্গে আনেন না। কেন আনেন না এ নিয়ে সে কখনো মাথা ঘামায়নি। আজ তার মাথায় ঝম-ঝম করে বাজতে লাগল - মা আমাকে এ বাড়িতে আনেন না, মা আমাকে এ বাড়িতে আনেন না। যেন রেকর্ডে পিন আটকে গেছে, তুলে না দেয়া পর্যন্ত বাজতেই থাকবে।

'ড্রাইভার সাহেব।'

'জি আপা।'

'শ্যামলী চলুন। বড় খালার বাসায়। বড় খালার বাসা চেনেন না?'

'জি, চিনি। চিনব না কেন?'

বড় খালা অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'তারপর রাজকন্যা, কেমন আছ?'

অপালা হেসে ফেলল।

'আমি ভাল আছি বড় খালা।'

'সন্ধ্যাবেলা কী মনে করে? আমাদের বাড়িঘর তো তোমার জন্যে নিষিদ্ধ এলাকা। ফরবিডেন জোন।'

'ফরবিডেন জোন হবে কেন?'

'আমি তো জানি না, আছে নিশ্চয়ই কোনো কারণ। রাজকন্যার কী সব জায়াগায় যেতে পারে, না যেতে পারা উচিত? বস, দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'বসব না খালা। আমি এখন যাব।'

'এখন যাবে মানে! তাহলে এসেছ কেন?'

অপালা বসল। বড় খালা গম্ভীর মুখে বললেন, 'এমনিতে তো তোমাদের খবর পাওয়ার উপায় নেই। পত্রিকায় অবশ্যি ইদানীং পাচ্ছি।'

অপালা বিস্মিত হয়ে বলল, 'পত্রিকায় খবর মানে! পত্রিকায় আবার কী খবর?'

'সে কী! তুমি পত্রিকা পড় না?'

'জি না।'

'দেশী পত্রিকা তোমার বাবা পড়তে দেন না বোধহয়।'

'তা নয় খালা, ইচ্ছা করে না। কী খবর বেরিয়েছে?'

'দু'টা খুন হয়েছে তোমাদের টঙ্গির কারখানায়। খুনি ধরা পড়েছে। তার ছবিটবি দিয়ে নিউজ হয়েছে। সে বলছে, তোমার বাবার নির্দেশেই এই কাণ্ড সে করেছে। সব পত্রিকাতেই তো আছে, তুমি কিছুই জানো না?"

'জি না।'

'না জানাই ভাল।'

'খুব চিন্তা লাগছে খালা।'

'চিন্তা লাগার কী আছে? টাকাওয়ালা মানুষদের এইসব সামান্য জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। তোমার বাবা আসুক। দেখবে, সব ঠিক হয়ে গেছে। ঐ খুনিই তখন উল্টো কথা বলবে। বস তুমি, আমি দেখি, চা-টার ব্যবস্থা করি। তোমার ঠিকমত যত্ন হয়নি এই খবর তোমার বাবার কানে উঠলে উনি রেগে যাবেন। জগৎ শেঠদের রাগাতে নেই।'

অপালা একা একা বসে রইল। এক বার বড় খালার মেয়ে বিনু এসে বলল, 'ছবি দেখবে আপা? "বালিকা বধূ" আছে। খুব ভাল প্রিন্ট।'

'তুমি দেখ। আমার ইচ্ছা করছে না।'

'আমি চার বার দেখেছি আপা। তুমি দেখলে তোমার সঙ্গে আবার দেখব।'

'আমার আজ একটুও ইচ্ছা করছে না। ভীষণ মাথা ধরছে।'

মাথা ধরার ব্যাপারটা মিথ্যা নয়। আসলেই প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। ইচ্ছে করছে ছুটে বেরিয়ে যেতে। তা সম্ভব নয়। বড় খালা তার সামনে প্রচুর খাবারদাবার সাজিয়ে রাখছেন। তাঁর মুখে কী অদ্ভুত এক ধরনের কাঠিন্য!

'বড় খালা।'

'বল।'

'আমার জন্ম কী হাসপাতালে হয়েছিল?'

'তা দিয়ে তোমার কী দরকার?'

'এমনি জিজ্ঞেস করছি। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, জানেন না?'

'জানব না কেন? নাও, চা খাও। তুমি কী এই কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে এসেছিল?'

'জি না। হঠাৎ মনে হল।'

'তোমার বাবা-মা ফিরবেন কবে?'

'টিকিট নিয়ে কী সব ঝামেলা হচ্ছে, ঝামেলা মিটলেই ফিরবেন।'

'একা একা থাক -- আমাদের খোঁজখবর নেয়া উচিত, কিন্তু নিতে পারি না। কেন জানো?'

'জি না।'

'তোমাদের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা মানেই আগ বাড়িয়ে গালে চড় খাওয়া। পত্রিকায় খবর দেখার পর তোমাকে টেলিফোন করেছিলাম। কী বলল, জানো?'

'কী বলল?'

'বলল, তুমি পড়াশোনা করছ, তোমাকে ডাকা যাবে না।'
'ওদের দোষ নেই খালা আমিই বলে দিয়েছিলাম।'
'ভাল, খুব ভাল।'

প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা নিয়ে অপালা বাসায় ফিরল। বাসায় অনেক মানুষ। ড্রয়িং রুমে আলো জ্বলছে। কিছু লোকজন বসে আছে সেখানে। বারান্দায় চিন্তিত মুখে ম্যানেজারবাবু এবং চিটাগাং ব্রাঞ্চের জি এম. হাঁটাহাঁটি করছেন। নিশানাথবাবু ছুটে এলেন, 'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

অপালা তার জবাব দিল না। নিশানাথবাবু বললেন, 'তুমি একটু বসার ঘরে এসো। পুলিশের কয়েকজন অফিসার এসেছেন।'

'আমার সঙ্গে তো তাঁদের কোনো দরকার নেই।'

'আমরা বলেছি। তবু তাঁরা কথা বলতে চান। অনেকক্ষণ বসে আছেন।'

'আমি তাঁদের সঙ্গে কোনো কথা বলব না।'

'মা, তুমি বুঝতে পারছ না।'

'আমার কিছু বোঝার দরকার নেই। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। আমি এখন ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকব।'

'দু'এক মিনিটের ব্যাপার।'

'ম্যানেজার কাকু, আপনি আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

অপালা দোতলায় উঠে গেল। এক বারও ফিরে তাকাল না। নিশানাথবাবুর চিন্তিত মুখ আরো ঝুলে পড়ল।

নার্সদের মুখশ্রী ভাল থাকা উচিত।

ফিরোজের তাই ধারণা। যেন মুখের দিকে তাকিয়েই মন প্রফুল্ল হয়। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল মোমবাতি হাতে হেঁটে যাচ্ছেন— এই দৃশ্য দেখে রুগীরা নতুন আশায় বুক বেঁধেছে। কারণ ঐ মহিলা ছিলেন অসম্ভব রূপবতী। ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল যদি তাড়কা রাক্ষসীর মতো হতেন, তাহলে রুগীরা নিশ্চয়ই রাতের বেলা এই দৃশ্য দেখ ভিরমি খেত।

এই হাসপাতালে যে-ক'টি নার্স ফিরোজ দেখেছে সবাই হয় তাড়কা রাক্ষসী, নয়ত তাড়কা রাক্ষসী হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ডাক্তার এবং নার্সদের প্রেম নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প-উপন্যাস আছে। সে সব নিশ্চয়ই বানানো। এই ওয়ার্ডে যে গত দু'দিন ধরে আসছে তার চেহারা মন্দ নয়, তবে কথাবার্তা অসহ্য।

ধমক না দিয়ে কোনো কথা বলে না। আজ সকালেই ফিরোজের সঙ্গে বড় রকমের কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। মেয়েটি ওয়ার্ডে ঢুকেই কড়া গলায় বলল, 'এই যে লোক, বসে আছেন কেন?'

'এই যে লোক' বলে কেউ সম্বোধন করতে পারে, এটাই ফিরোজের ধারণা ছিল না। সে বহু কষ্টে রাগ সামলে বলল, 'বসে থাকা নিষেধ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আছে। শুয়ে-শুয়ে রেস্ট নিন। ডন-বৈঠকের জন্যে হাসপাতাল না।'

ফিরোজ শুয়ে পড়ল। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। রাত-দুপুরে আজেবাজে কোনো ওষুধ খাইয়ে দিতে পারে। একটা থ্রিলারে এ রকম একটা ঘটনা ছিল। নার্স রাত-দুপুরে ঘুমের ওষুধ বলে আফিমের ঢেলা গিলিয়ে দিত। অবশ্যি সেই নার্স ছিল রূপবতী এবং সে বেছে বেছে এই কাণ্ডগুলো করত রূপবান তরুণ রুগীদের সঙ্গে।

ফিরোজ গলা পর্যন্ত চাদর টেনে কৌতূহলী চোখে নার্সটাকে দেখছে। এই মহিলা এক-একটা বেডের কাছে যাচ্ছে এবং বিনা কারণে রুগীদের ধমকাচ্ছে। গরিব রুগীদের তুমি-তুমি করে বলছে। সে ঘুরে-ঘুরে আবার ফিরোজের কাছে ফিরে এল।

'আপনার জ্বর রেমিশন হয়েছে।'

ফিরোজ জবাব দিল না। নার্স তার এ্যাপ্রনের পকেটে হাত দিয়ে বলল, 'আপনার একটা চিঠি এসেছে। গতকাল দিতে ভুলে গেছি। এই নিন।'

'ফিরোজ থমথমে গলায় বলল, 'আপনি চিঠি পড়েছেন কেন? খামের মুখ খোলা।

'আপনার চিঠি পড়ার আমার দরকারটা কী? মুখখোলা অবস্থাতেই এসেছে। চিঠি পড়ুন, বালিশের নিচে রেখে দিচ্ছেন কেন?'

'আপনি এখান থেকে যান, তারপর পড়ব।'

নার্স চলে যাবার পরও সে চিঠি পড়ল না। হাসপাতালে বসে চিঠি পাওয়ার বিস্ময়টা তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করা যাক। নার্স যে চিঠিটা পড়েছে, তাতে তাকে ঠিক দোষ দেয়া যায় না। হাসপাতালের রুগীদের কেউ চিঠি লেখে না, দেখতে আসে। গত দশ বছরে এটাই হয়ত প্রথম চিঠি এবং ফিরোজের ধারণা, হাসপাতালের জমাদারনী, মালী, ওয়ার্ডবয়··· সবাই এই চিঠি পড়েছে।

কে লিখতে পারে এই চিঠি? তাজিন? হতে পারে। পরিচিতদের মধ্যে একমাত্র সে-ই তাকে দেখতে আসেনি। দুলাভাই বলেছেন-- রাগ করে আসেনি। ফিরোজ অবাক হয়ে বলেছে, 'রাগ কী জন্যে?'

'নিজের দিকে তুমি তাকাবে না। অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে খবর পাঠাবে, সে রাগ করবে না? শোন ফিরোজ, তুমি কথা দাও, রিলিজ হলে আমার বাসায় গিয়ে উঠবে।'

'কথা দিলাম।'

'আমরা যে-মেয়ে ঠিক করব, চোখ বন্ধ করে তাকে বিয়ে করবে।'

'কথা দিলাম।'

'তোমাকে কেবিনে ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করছি। সব ধরাধরির ব্যাপার। একজন মেজর জেনারেলকে আজ ধরব। আমার ভাবির ফুপাত ভাই।'

'কাউকে ধরতে হবে না দুলাভাই। ওয়ার্ডে আমি ভালই আছি। আশপাশের রুগীদের সঙ্গে খাতির হয়েছে। গল্পগুজব করে সময় কেটে যাচ্ছে।'

'কার সঙ্গে খাতির হল?'

'বাঁ পাশের বেডের রুগীর সঙ্গে। খাতিরটা আরো জমত. বেচারা হঠাৎ মরে যাওয়ায় খাতিরটা জমতে পারল না।'

'সব সময় এমন ঠাট্টা-তামাশা করো না। মৃত্যু নিয়ে রসিকতা করবে না।'

'আর করব না। আপনি দুলাভাই, বড় আপাকে পাঠিয়ে দেবেন। আপাকে দেখতে ইচ্ছা করছে।'

'বাজে কথা বলবে না। তোমার কাউকেই দেখতে ইচ্ছা করে না।'

তাজিনই নিশ্চয় এই পত্রলেখক। চিঠিপত্র লেখার অভ্যেস তার আছে। জন্মদিন, নববর্ষ এইসব বিশেষ দিনগুলোতে তার একটা সুন্দর কার্ড আসবেই।

এটাও বোধহয় একটা কার্ড। 'গেট ওয়েল' কার্ড। বড় আপার কাছে নানান ধরনের কার্ডের বিরাট সংগ্রহ।

ফিরোজ ভেবেছিল গভীর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে চিঠি পড়বে। এতক্ষণ ধৈর্য ধরতে পারল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, চিঠির রচয়িতা হয়তবা অপালা। এ রকম মনে হবার কোনো কারণ নেই, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে।

খাম খুলে ফিরোজের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। অপালাই লিখেছে। আহ্, এত গভীর আনন্দের ব্যাপারও ঘটতে পারে! চিঠিটি পড়তে ইচ্ছে করছে না। পড়া মানেই তো ফুরিয়ে যাওয়া। বরং গুটি-গুটি লেখা তিনটি পৃষ্ঠা নিয়ে সে সারা রাত জেগে বসে থাকবে। মাঝে-মাঝে ঘ্রাণ নেবে। এই কাগজ কোনো ফুলের গুচ্ছ নয়। তবু নেশা-ধরানো সৌরভ নিশ্চয়ই লুকানো আছে। সবাই সে সৌরভ পাবে না। যার পাবার শুধু সে-ই পাবে।

*ফিরোজ সাহেব।*

*আপনার হাসপাতালের ঠিকানা কোথায় পেয়েছি বলুন তো? না, এখন বলব না, আপনি ভাবতে থাকুন। এটা একটা ধাঁধা। দেখি আপনি কেমন বুদ্ধিমান। ধাঁধার জবাব দিতে পারেন কী না। আমি হাসপাতলে আপনাকে দেখতে আসিনি, যদিও খুব আসার ইচ্ছা ছিল। কেন আসিনি জানেন? ছোটবেলায় আমাদের একজন কাজের মেয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আসে। তাকে দেখবার জন্যে একদিন হাসপাতালে এসে কী দেখি, জানেন? দেখি দু'তিন মাস বয়সী একটা বাচ্চাকে বড় একটা গামলায় শুইয়ে রাখা হয়েছে। বাচ্চাটা মরা। বাচ্চার নাভি ও নাকে লাল-লাল পিঁপড়া। এই কুৎসিত*

*দৃশ্যটি দুঃস্বপ্ন হয়ে বার-বার আমার কাছে ফিরে আসে। হাসপাতালে যেতে আমার এই কারণেই ইচ্ছা করে না।*

*এখন বলি আপনার ঠিকানা কোথায় পেলাম। আপনার বান্ধবীর বাবার কাছ থেকে। আপনার বান্ধবীর সঙ্গেও আমার আলাপ হয়েছে। খুব লাজুক মেয়ে, তবু কিছু কথা শেষ পর্যন্ত বলেছে। তবে আমার ধারণা, আপনার সঙ্গে সে খুব বক-বক করবে।*

*আচ্ছা, আপনি আমাকে কিন্তু একটা ভুল কথা বলেছেন। আপনাদের বিয়ের ব্যাপারে। ভুল আমি ভেঙে দিয়েছি। আপনার বান্ধবী, তার বাবা এবং মা সবাই খুব খুশি। তারা মনে-মনে সুপাত্র হিসেবে আপনাকে কামনা করছিলেন। মনের কথাটা পর্যন্ত বললেন না! আপনার সঙ্গে এই দিকে আমার কিছু মিল আছে। আমিও নিজের মনের কথাটা কিছুতেই বলতে পারি না। আমার একটা ডাইরি আছে, মাঝে মাঝে তাতে লিখি। এই মুহূর্তে আপনাকে আমার একটা মনের কথা বলি। আমাব মনে হচ্ছে, এখন বললে সেটা খুব দোষেব হবে না। কথাটা হচ্ছে, আমি যখন জানলাম— আপনার একজন ভালবাসার মানুষ আছে, তখন আমার কেন জানি মন-খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মন-খারাপ ভাবটা এখনো পুরোপুরি কাটেনি। কাটতেই যে হবে, এমন তো কোনো কথা নেই। না কাটাই ভাল। কী বলেন আপনি? আমি ঠিক বলিনি? কিছু কিছু কষ্ট আছে সুখের মত। আবার কিছু কিছু কষ্ট খুব কঠিন।*

*এখন আপনি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন। আপনি সুস্থ হয়ে উঠলেই আপনাকে নিয়ে এক জায়গায় বেড়াতে যাব। যেখানে যাব, সেখানে চমৎকাব একটা রহস্য আছে। দেখি, আপনি রহস্য ভেদ কবতে পাবেন কি না। আমার মনে হয় আপনি পাববেন। কারণ, আপনার খুব বুদ্ধি— অন্তত আমার তাই ধাবণা।*

*এই চিঠি আপনি পাবেন কী না বুঝতে পারছি না। কে জানে হয়ত চিঠি পৌঁছবার আগেই সুস্থ হয়ে ফিবে যাবেন। আগ্রহ নিয়ে এই চিঠি লিখছি, আপনি তা না পেলে খুব কষ্টের ব্যাপার হবে।*

*বিনীতা*
*অপালা*

সারা রাত ফিরোজ ঘুমুতে পারল না।

কত বার যে চিঠিটা পড়ল! প্রতিবারই মনে হল এটা তো আগে পড়া হয়নি। এ্যাটেনডিং ফিজিশিয়ান এক সময় বললেন, 'আপনি এমন ছটফট করছেন কেন? কোনো অসুবিধা হচ্ছে কী?'

'জি হচ্ছে। অস্থির-অস্থির লাগছে।'

'অস্থির-অস্থির লাগার তো কোনো কারণ দেখছি না। অসুখ সেরে গেছে, কাল-পরশুর মধ্যে রিলিজ অর্ডার হবে। আসুন, আপনাকে একটা ট্রাংকুলাইজার দিয়ে দিই।'

'একটায় কাজ হবে না, বেশি করে দিন।'

'আপনার কী হয়েছে বলুন তো?'

'খুব আনন্দ হচ্ছে ডাক্তার সাহেব।'

ফিরোজ ঘুমুতে গেল শেষরাতের দিকে। ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। নাশতা নিয়ে এসেছে। দরিদ্র দেশের হাসপাতালের তুলনায় বেশ ভাল নাশতা। দু' পিস রুটি, একটা সেদ্ধ ডিম, একটা কলা, এক গ্লাস দুধ। নাশতা যে দিতে আসে, সে ট্রে নামিয়ে দিয়েই চলে যায় না। অপেক্ষা করে। কোনো রুগী যখন বলে 'ভাল লাগছে না, কিছু খাব না', তখন যে বড় খুশি হয়। ট্রে উঠিয়ে নিয়ে যায়। আজ তাকে খুশি করা গেল না। ফিরোজের খুব খিদে পেয়েছে। জানালা গলে শীতের রোদ এসেছে। খুবই ভাল লাগছে সেই রোদের দিকে তাকিয়ে থাকতে। বেড নাম্বার চল্লিশের বুড়ো রুগীটি খুব কষ্ট পাচ্ছে। গোঙানির মত শব্দ করছে। গভীর বেদনায় ফিরোজের মন ভরে গেল। তার ইচ্ছে করতে লাগল, রুগীর মাথার কাছে গিয়ে বসে। মাঝে মাঝে পৃথিবীর সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

ফিরোজ সত্যি সত্যি বেড নম্বর চল্লিশের দিকে এগিয়ে গেল। নরম গলায় বলল, 'আপনার কী খুব কষ্ট হচ্ছে?'

দরজা খুলল বড় মেয়েটি।

অপালা এর নাম জানে না। শুধু এর কেন, কারোরই নাম জানে না। আজও হয়ত জানা হবে

না। অপালা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'ভেতরে আসব?' বড় মেয়েটি হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। শুধু দরজা ছেড়ে একটু সরে গেল। অপালা বলল, 'তোমার নাম কী?'

'আমার নাম সোমা।'

'তোমারই কী বিয়ে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'বিয়েটা যেন কবে? আমার তারিখটা মনে নেই। কার্ড হারিয়ে ফেলেছি।'

'এগার তারিখ।'

'আমি আবার আসায় তুমি কী রাগ করেছ?'

'রাগ করব কেন?'

সোমা অপালার কাঁধে হাত রাখল। অপালা বলল, 'তুমি কী আমার বড়, না ছোট?'

সোমা সে কথার জবাব দিল না । হালকা গলায় বলল, 'এসো, ভেতরে এসে বসো।'

'বাসায় কেউ নেই? কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।'

'ওরা বাজারে গিয়েছে।'

'বিয়ের বাজার?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মা? উনি যাননি?'

'মা অসুস্থ, এখন ঘুমুচ্ছে। তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

তারা ভেতরের দিকে একটা ছোট্ট ঘরে এসে দাঁড়াল। দু'দিকে দু'টি চৌকি পাতা। একটা পড়ার টেবিল। সুন্দর করে গোছানো।

'এটা তোমার ঘর?'

'হ্যাঁ।'

'কে কে শোয় এখানে?'

'আমরা চার বোন। দুজন দুজন করে। তুমি বস।'

অপালা বসল। বসতে বসতে বলল. 'শাড়িটা কী তোমার পছন্দ হয়েছে?'

সোমা এবারও হ্যাঁ-না কিছুই বলল না। সে বসেছে অপালার মুখোমুখি। কিন্তু এক বারও অপালার দিকে তাকাচ্ছে না। মাথা নিচু করে আছে।

'যে ছেলেটির সঙ্গে তোমার বিয়ে হচ্ছে তাকে কী তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ।'

'ছেলেটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'না।'

'পছন্দ হয়নি কেন?'

'সোমা উত্তর দিল না। তার মুখ ঈষৎ কঠিন হয়ে গেল। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল সে। অপালা বলল, 'আচ্ছা, আমরা দুজন কী যমজ বোন? দুজন দেখতে অবিকল এক রকম, তাই না?'

সোমা এবারও চুপ করে রইল।

'আমার মনে হচ্ছে আমরা যমজ বোন। ছোটবেলায় আমাদের বোধ হয় একই রকম জামা-জুতো পরানো হত। হত না?'

অপালা লক্ষ্য করল, সোমা কাঁদছে। নিঃশব্দ কান্না। মাঝে মাঝে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। গালে সূক্ষ্ম জলের রেখা।

'সোমা।'

'বল।'

'আমার কী নাম ছিল তখন? আমার কী ধারণা, জানো? আমার ধারণা, সোমার সঙ্গে মিলিয়ে আমার নাম ছিল রুমা।'

সোমা শাড়ির আঁচলে চোখ মুছল। সে বোধহয় চোখে কাজল দিয়েছিল, সারা মুখে কাজল লেপ্টে গেল।

'তোমার চোখ তো এমনিতেই সুন্দর, কাজল দিতে হবে কেন? আমাদের দুজনের মধ্যে কে বেশি সুন্দর? তোমাদের ঘরে বড় আয়না আছে? এস না, দুজন পাশাপাশি দাঁড়াই।'

সোমা যেভাবে বসেছিল, সেভাবেই বসে রইল। অপালা স্পষ্ট স্বরে বলল, 'আমি যদি ফিরে আসি, তাহলে কার সঙ্গে ঘুমুবো? তোমার সঙ্গে?

ভেতর থেকে সোমার মা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, 'কে কথা বলে? কে ওখানে?'

সোমা বলল, 'কেউ না মা, কেউ না।'

'আমি স্পষ্ট শুনলাম!'

ভদ্রমহিলা নিজে-নিজেই বিছানা থেকে উঠলেন। পা টেনে-টেনে সোমাদের ঘরের দরজার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। অপালা বলল, 'আপনি ভাল আছেন?'

এই বলেই সে অস্পষ্টভাবে হাসল। ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। টলে পড়ে যাচ্ছেন। সোমা ছুটে গিয়ে তার মা'কে ধরল। একা সে সামলাতে পারছে না। সে তাকাল অপালার দিকে। অপালা নড়ল না, যেভাবে বসে ছিল, সেভাবেই বসে রইল। সোমা বলল, 'তুমি একটু পানি এনে দেবে? মুখে পানির ছিটা দেব।'

অপালা উঠে দাঁড়াল। হালকা পায়ে বারান্দায় চলে এল। ঐ তো পানির কল। মগে করে পানি নিয়ে আসা যায়। সে পানির কলের দিকে গেল না। নিঃশব্দে ঘর ছেড়ে চলে এল। তার খুব কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কান্না আসছে না।

ফখরুদ্দিন সাহেব ঘণ্টাখানেক আগে এসে পৌঁছেছেন। হেলেনারও টিকিটি ছিল। তিনি আসতে পারেননি। ডাক্তাররা শেষ মুহূর্তে ঠিক করেছেন হার্টে বাই পাস সার্জারির প্রয়োজন, এবং তা অল্পদিনের মধ্যেই করতে হবে। ফখরুদ্দিন সাহেব সব ব্যবস্থা করে এসেছেন। দিন সাতেকের মধ্যে তিনি অপালাকে নিয়ে ফিরে যাবেন।

বাড়িতে পা দিয়েই তিনি মেয়ের খোঁজ করলেন। মেয়ে বাড়িতে নেই। কোথায় গিয়েছে কেউ বলতে পারেনি। গাড়ি নিয়ে যায়নি। আজকাল প্রায়ই গাড়ি ছাড়া বের হয়। ফখরুদ্দিন সাহেব কিছুই বললেন, না। সারপ্রাইজ দেবার জন্যে খবর না দিয়ে এসেছেন। সেই সারপ্রাইজটি দেয়া গেল না।

তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে গোসল সারলেন। পর পর তিন কাপ বিস্বাদ কালো কফি খেলেন। চুরুট ধরিয়ে নিচে নেমে এলেন। নিশানাথবাবুর সঙ্গে আগেই তাঁর দেখা হয়েছে। তিনি কোনো কথা বলেননি, এখন বললেন।

'কেমন আছেন?'

'জি স্যার, ভাল।'

'বসার ঘরটির এই অবস্থা করেছে?'

'অপালা মা খুব পছন্দ করেছে।'

'তার জন্যে এ রকম ঘর একটা সাজিয়ে দেয়া যাবে। আপনি এক্ষুণি আগের ডেকোরেশনে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করুন।'

'স্যার, করছি।'

'আর্টিস্ট লোকটি কী প্রায়ই এ বাড়িতে আসে?'

'কার কথা বলছেন স্যার?'

'যে এই অদ্ভুত ডেকোরেশন করেছে, তার কথাই বলছি।'

'জি না স্যার।'

'আপনি না জেনে বলছেন। দারোয়ানকে ডেকে নিয়ে আসুন।'

নিশানাথবাবু ছুটে গেলেন। দারোয়ানের কাছে একটা বড় খাতা থাকার কথা। সেখানে সে লিখে রাখবে কে আসছে কে যাচ্ছে। কখন আসছে কখন যাচ্ছে। দারোয়ান খাতা নিয়ে এল। ফখরুদ্দিন সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, 'যাও, আমার ঘরে রেখে এস। নিশানাথবাবু।'

'জি স্যার।'

'আপনার স্ত্রী এখানে কেন?'

'অপালা মা একা-একা থাকে...।'

'সে কী বলেছিল তাঁকে আনবার কথা?'

'জি না স্যার।'

'তাহলে...?'

নিশানাথবাবু ঘামতে লাগলেন। ফখরুদ্দিন সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, 'খবরের কাগজে এত কেচ্চা-কাহিনী ছাপা হল, আপনারা ছিলেন কোথায়? পি.অ.র-ও সাহেবকে আসতে বলুন। যে সব পুলিশ অফিসার এই ঘটনার তদন্ত করছেন, তাঁদেরকে খবর দিন যে আমি এসেছি। তাঁরা ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

পুলিশ অফিসার ভদ্রলোক এক ঘণ্টার মধ্যেই চলে এলেন। পুলিশ অফিসার বলে মনে হয় না, অধ্যাপক-অধ্যাপক চেহারা। পায়জামা-পাঞ্জাবির ওপর একটা শাল চাপানো। শাল গায়ে দিয়ে কেউ অপরাধের তদন্ত করতে আসে! ফখরুদ্দিন সাহেব বিরক্তি চেপে রেখে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন।

'কী জানতে চান আমার কাছ থেকে, বলুন?'

'একটা তারিখ আপনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাই। আসামি বলছে, সে আপনার নির্দেশে এই কাজ করেছে। কোন তারিখে সে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে, তাও সে বলেছে। আমরা দেখতে চাই, ঐ তারিখে আপনি দেশে ছিলেন কী না।'

'আমার কাছ থেকেই জানতে চান?'

'জি স্যার।'

'এটা একটা কাঁচা কাজ হচ্ছে না কী? এয়ারপোর্টে কাগজপত্র দেখলেই তো তা জানতে পারেন। আমার মুখের কথার চেয়ে ঐ সব প্রমাণ নিশ্চয়ই অনেক মূল্যবান।'

'তাও স্যার করা হবে। আপনার একটা স্টেটমেন্ট নেব।'

'ভাল কথা, নেবেন। আপনার নাম কী?'

'রশিদ। আব্দুর রশিদ।'

'শুনুন রশিদ সাহেব, এই ধরনের কোনো কিছু আমার বলার ইচ্ছা যদি থাকে, তাহলে আমি কী তা সরাসরি বলব? অন্যদের দিয়ে বলাব। এমন একটা কাঁচা কাজ কী আমি করতে পারি?'

'মাঝে মাঝে খুব পাকা লোকও স্যার কাঁচা কাজ করে ফেলে।'

'হ্যাঁ, তা করে। কথাটা আপনি ভালই বলেছেন। ওয়েল সেইড।'

পুলিশ অফিসার আধ ঘণ্টা সময় নিয়ে স্টেটমেন্ট নিলেন। তাঁকে চা-বিসকিট কিছু দেয়া হল না। ভদ্রলোক চলে যাবার পরপরই পি. আর. ও. আবসার সাহেবকে ফখরুদ্দিন সাহেব ডেকে পাঠালেন।

'আবসার সাহেব।'

'জি স্যার।'

'পুলিশ অফিসার আব্দুর রশিদ সম্পর্কে খোঁজখবর নিন। লোকটির টাকা নেয়ার অভ্যেস আছে কী না দেখুন। পুলিশ অফিসারদের মধ্যে কেউ কেউ আবার ত্যাঁদড় ধরনের থাকে। টাকাপয়সা নেয় না। তবে আমার ধারণা, এ নেয়। এর গায়ের শালটি বেশ দামি। বেতনের টাকায় এ-রকম শাল কেনার কথা নয়।'

'আমি স্যার খোঁজ নেব।'

'আজ সন্ধ্যার মধ্যে নেবেন। ইনভেসটিগেশন টিমে আর কে-কে আছে দেখুন। ডি.আই.জি. রহমতউল্লাহ সাহেব এখন কোথায় আছেন, কোন সেকশনে, তাও দেখবেন।

'জি স্যার।'

'আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি এই সমস্যার পুরো সমাধান চাই।'

'জি স্যার।'

'আপনি এখন যান।'

'অফিসে আসবেন স্যার?'

'হ্যাঁ। তিনটার দিকে যাব।'

'জি আচ্ছা স্যার।'

দুপুরে ফখরুদ্দিন সাহেব একা একা ভাত খেলেন। অপালা এখনো ফেরেনি। ভাত খেতে খেতে দারোয়ানের দিয়ে যাওয়া খাতাটি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়লেন। ফাঁকে-ফাঁকে গোমজের সঙ্গে রান্নাবান্না নিয়ে গল্প করলেন। এটি তাঁর পুরনো অভ্যেস।

'গোমেজ।'

'জি স্যার।'

'পৃথিবীর সব দেশে রান্নায় পনির ব্যবহার করে, বাংলাদেশে কেন করে না?'

'আমি তো স্যার বলতে পারব না।'

'এমন তো নয় যে এ দেশে পনির তৈরি হত না। হাজার-হাজার বছর ধরে পনির তৈরি হচ্ছে। হচ্ছে না?'

'জি স্যার।'

'আমাদের দেশী রান্নায় খানিকটা পনির দিয়ে দিলে কেমন হবে বলে তোমার ধারণা?'

'আমি তো স্যার বলতে পারছি না।'

'এক বার দিয়ে দেখবে।'

'জি আচ্ছা স্যার।'

তিনি বিশেষ কিছু খেতে পারলেন না। কিছুদিন ধরেই তাঁর খিদের সমস্যা দেখা দিয়েছে।

'গোমেজ।'

'জি স্যার।'

'লাঞ্চের পর কাউকে তুমি মার্টিনি খেতে দেখেছ?''

'জি স্যার, দেখেছি। মেক্সিকান এক সাহেবকে দেখেছি।'

'একটা মার্টিনি তৈরি কর তো।'

মার্টিনি খেয়ে তাঁর শরীর আরো খারাপ লাগতে লাগল, তবু তিনি ঠিক তিনটায় অফিসে গেলেন। ডেকে পাঠালেন ঢাকা ব্রাঞ্চের এ. জি. এম. মোস্তফা সাহেবকে। অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'মোস্তফা, আমার ধারণা যাবতীয় ঝামেলার পেছনে আপনি আছেন।'

'এইসব আপনি কী বলছেন স্যার!'

'আমি ঠিকই বলছি। ভুল বললে এত দূর আসতে পারতাম না, অনেক আগেই মুখ থুবড়ে পড়ে যেতাম। আপনি আপনার চার্জ বুঝিয়ে দিন।'

'স্যার, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আপনি ঠিকই বুঝতে পারছেন।'

ফখরুদ্দিন সাহেব কোটের পকেট থেকে বরখাস্তের চিঠি বের করলেন। এই চিঠি তিনি ইংল্যান্ড থেকেই টাইপ করে নিয়ে এসেছেন।

চিঠি হাতে মোস্তফা দাঁড়িয়ে, তিনি তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পি.এ.-কে বললেন, 'বাসায় টেলিফোন করে দেখ তো আমার মেয়ে ফিরেছে কী না।

পি.এ. জানাল এখনো ফেরেনি। ফখরুদ্দিন সাহেবের কপালে সূক্ষ্ম একটা ভাঁজ পড়ল। সেই ভাঁজ স্থায়ী হল না। তিনি পি.এ.-কে বললেন, 'গাড়ি বের করতে বল, আমি কারখানা দেখতে যাব। ইউনিয়নের নেতাদেরও খবর দিতে বল-- আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব।'

'আপনার ওখানে এখন যাওয়াটা ঠিক হবে না স্যার।'

'আমাকে উপদেশ দেয়া তোমার কাজের কোনো অঙ্গ নয় বলেই আমি জানি। তোমাকে যা করতে বলেছি, কর।'

'স্যার, এক্ষুণি ব্যবস্থা করছি।'

'গুড। ভেরি গুড।'

হাজি সাহেবের স্ত্রী ভিজিটার্স আওয়ারে ফিরোজকে দেখতে এসেছেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, ভদ্রমহিলার গায়ে বোরকা নেই। ফিরোজ তাঁকে আগে দেখেনি। সে অবাক হয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাকে চিনতে পারছি না।'

ভদ্রমহিলা একগাদা ফলমূল নিয়ে এসেছেন। এর সঙ্গে আছে একটা হরলিকস, একটা ওভালটিন। তিনি বেশ সহজ ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি হাজি সাহেবের স্ত্রী।'

'ও আচ্ছা। বসুন বসুন।'

'বেশিক্ষণ বসতে পারব না। হাসপাতালে ফিমেল ওয়ার্ডে আমাদের একজন রুগী আছে, তাকে দেখতে যাব। তোমাকেও চট করে দেখে গেলাম।'

'এইসব খাবারদাবার আমার জন্যে এনেছেন, না ওনার জন্যে?'

ভদ্রমহিলা হেসে ফেললেন। ভদ্রমহিলার এই হাসি ফিরোজের পছন্দ হল। রসবোধ আছে। মেয়েদের এই জিনিসটা একটু কম। সাধারণ রসিকতাতেও এরা রেগে যায়।

'আপনি আমাকে দেখতে আসবেন, এটা তো স্বপ্নেও ভাবিনি!'

'কেন দেখতে আসব না? শুধু আমি একা না, আমার মেয়েও এসেছে।'

'সে-কী।'

'ভেতরে আসতে লজ্জা পাচ্ছে— বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। থাকুক দাঁড়িয়ে, আমি আমার রুগী দেখে আসি।'

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। তাঁর ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা হাসির রেখা। ফিরোজ বাইরে এসে দেখল সমস্ত বারান্দা আলো করে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। এত সুন্দর হয় মানুষ!

'এই মেয়ে, তুমি একা একা দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, ভেতরে এস।'

সে সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হল। তার গায়ে হালকা গোলাপি রঙের শাড়ি। মাথায় ঘোমটা দেয়ার জন্যে কেমন বউ-বউ লাগছে।

'বোরকা কোথায় তোমার?'

মেয়েটিও তার মায়ের মতো ভঙ্গিতে হাসল।

'এস, বস।'

বেডের সামনে একটা খালি চেয়ার। সে সেখানে বসল না। বিছানায় মাথা নিচু করে বসে রইল।

'তুমি কী আমাকে দেখতে এসেছ, না আরেকজন যে রুগী আছে, তাকে দেখতে এসেছ?'

মেয়েটি বিস্মিত গলায় বলল, 'আর তো কোনো রুগী নেই!'

ফিরোজ কী বলবে ভেবে পেল না। কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করছে। বড় মায়া লাগছে মেয়েটির জন্যে।

'তুমি চা খাবে?'

'জি না।'

'খাও-না এক কাপ। তোমার সঙ্গে আমিও খাব। এখানে একটা বয় আছে, ওকে বললেই নিচ থেকে চা এনে দেয়।'

'বলুন।'

ফিরোজ চায়ের কথা বলে এল। মেয়েটি কৌতূহলী হয়ে রুগীদের দিকে দেখছে।

'হাসপাতাল নিশ্চয়ই তোমার খুব খারাপ লাগে, তাই না?'

'জি না। অনেক দিন আমি হাসপাতালে ছিলাম, হাসপাতাল আমার ভালই লাগে। আপনার অসুখ এখন সেরে গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

চা এসে গেল। মেয়েটি ছোট ছোট চুমুকে চা খাচ্ছে। বার-বার তাকাচ্ছে ফিরোজের দিকে। এখন আর সেই দৃষ্টিতে কোনো লজ্জা আর সঙ্কোচে নেই। ফিরোজ আন্তরিকভাবেই বলল, 'তুমি এসেছ, আমার খুব ভাল লাগছে।'

মেয়েটি অত্যন্ত মৃদু স্বরে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'অপালা বলে যে-মেয়েটি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, ওকে আপনি কীভাবে চেনেন?'

'হঠাৎ করে পরিচয়। ও আমাকে সুন্দর একটা চিঠি লিখেছে, তুমি কী ঐ চিঠিটা পড়বে?'

'জি না।'

'তুমি পড়, তুমি পড়লে আমার ভাল লাগবে।'

ফিরোজ চিঠি বের করল। মেয়েটি তাকিয়ে আছে তার দিকে। কী সুন্দর স্বচ্ছ চোখ। শুধু চোখের দিকে তাকালেই যেন এই মেয়েটির অনেকখানিই দেখে ফেলা যায়।

বিকেল হয়ে আসছে। দিনের আলো কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। চেনা পৃথিবীও এই আলোতে অচেনা হয়ে যায়।

ফখরুদ্দিন সাহেব বাগানে চেয়ার পেতে বসে আছেন। তাঁকে চা দেয়া হয়েছে। তিনি চা খাচ্ছেন না। তাঁর পায়ের কাছে অরুণা ও বরুণা। তিনি বরুণার পিঠ মাঝে মাঝে চুলকে দিচ্ছেন। তাঁর

কাছেই গোমেজ দাঁড়িয়ে। তাকে তিনিই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এখন কিছু বলছেন না। গোমেজ যেতে পারছে না, অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'গোমেজ'।

'জি স্যার।'

'ক'টা বাজে বল তো?'

'সাড়ে চারটা বাজে স্যার।'

'মাত্র সাড়ে চার, কিন্তু চারদিক এমন অন্ধকার হয়ে আসছে কেন? সূর্য ক'টার সময় ডোবে?'

'ঠিক বলতে পারছি না স্যার।'

'খবরের কাগজে দেখ তো ওখানে দেয়া আছি কী না। সানসেট এবং সানরাইজ যদি দেয়া না থাকে, তাহলে আবহাওয়া অফিসে টেলিফোন করবে।'

'জি আচ্ছা স্যার।'

'ঘট-ঘট শব্দ হচ্ছে কিসের?'

'বসার ঘরটা নতুন করে সাজানো হচ্ছে স্যার।'

'ওদের নিষেধ করতে বল। আমার মেয়ে পছন্দ করে সাজিয়েছে ওটা, যেমন আছে তেমন থাকুক।'

'জি আচ্ছা স্যার।'

গোমেজ চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। মৃদু স্বরে বলল, 'আপাকে কী খুঁজেত বের হব?'

'না।'

ফখরুদ্দিন সাহেব অরুণার পিঠ চুলকে দিতে লাগলেন। বাগান এখন প্রায় অন্ধকার। তাঁর শীত লাগছে, তবু তিনি বসেই আছেন। আকাশে একটি-দুটি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে। গোলাপ-ঝাড় থেকে ভেসে আসছে মিষ্টি সৌরভ।

অপালা বাড়ি ফিরল সন্ধ্যা মেলানোর পর। সে ভেবেছিল, গেটের পাশে সবাই ভিড় করে থাকবে। তা নয়, গেট ফাঁকা। অন্য সময় তালা দেয়া থাকে, আজ তাও নেই। দারোয়ান টুলের ওপর বসে বসে ঝিমুচ্ছে। অপালাকে দেখে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু কিছু বলল না।

অপালা বারান্দায় উঠে এসে প্রথম লক্ষ্য করল বাগানে বেতের চেয়ারে কে যেন বসে আছে। বাগানের আলো জ্বলছে না। জায়গাটা অন্ধকার। সিগারেটের আগুন ওঠানামা করছে। অপালা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাকল, 'বাবা!'

ফখরুদ্দিন সাহেব উত্তর দিলেন না। সিগারেট ছুড়ে ফেললেন। অপালা ছুটে গিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বালিকার মতো শব্দ করে কাঁদতে শুরু করল। ফখরুদ্দিন সাহেবের একটা হাত মেয়ের পিঠে। তিনি গাঢ় স্বরে বার-বার বলছেন, 'মাই চাইল্ড। মাই চাইল্ড।'

অপালা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'কখন এসেছ?'

'এই তো সকালে। তুমি সারা দিন কোথায় ছিলে?'

'নানান জায়গায় ছিলাম। তুমি কেমন আছ বাবা?'

'ভাল। আমি খুব ভাল আছি।'

'ঠাণ্ডার মধ্যে এখানে বসে আছ কেন?'

'তোমার জন্যে বসে আছি।'

'মা আসেনি, তাই না?'

'কী করে বুঝলে?'

'মা এলে সেও তোমার সঙ্গে বসে থাকত। তুমি এসেছ, বাবা, আমার খুব ভালো লাগছে।' অপালা আবার ফোঁপাতে শুরু করল।

'মা এল না কেন?'

'ডাক্তাররা এখন বলছে, বাই পাস সার্জারি লাগবে।'

'একেক সময় এরা একেক কথা বলে কেন?'

'কি জানি, কেন!'

'বাবা এস, তোমাকে আমাদের বসার ঘরটা দেখাই, কী সুন্দর যে করেছে!'

ফখরুদ্দিন সাহেব এই ঘর আগেই দেখেছেন, তবু মেয়ের সঙ্গে ঢুকলেন।

'কেমন লাগছে বাবা?'

'ভাল।'

'শুধু ভাল? এর বেশি কিছু না?'

'না মা, এর বেশি কিছু না। তবে তোমার ভাল লাগছে, এটাই বড় কথা। আমার পুরনো চোখ। পুরনো চোখ সহজে মুগ্ধ হয় না।'

'বাবা, তুমি চা খেয়েছ?'

'হ্যাঁ। তবে আরেক বার খেতে পারি।'

'তুমি বাগানে গিয়ে বস, আমি তোমার জন্যে চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।'

'তোমার বানাতে হবে না, তুমি আমার সঙ্গে এসে বস।'

'না, আমিই বানাব। আর শোন, একটা চাদর গায়ে দিয়ে যাও। নাও, আমারটা নাও।'

অপালা তার গায়ের নীল চাদর তার বাবার গায়ে জড়িয়ে দিল।

'তুমি রাতে কী খাবে, বাবা?'

'কেন?'

'আমি রান্না করব।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ফখরুদ্দিন সাহেব আবার বাগানে গিয়ে বসলেন। অরুণা এবং বরুণা দুজন দু'পাশ থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে। গভীর আনন্দে ফখরুদ্দিন সাহেবের চোখ ভিজে উঠছে। চোখের জল মানেই দুর্বলতা। তাঁর মধ্যে কোনোরকম দুর্বলতা থাকা উচিত নয়। এই অশ্রুবিন্দু এক্ষুণি মুছে ফেলা উচিত। কিন্তু তিনি মুছলেন না। চারপাশে গাঢ় অন্ধকার। এই অন্ধকারে তাঁর দুর্বলতা কেউ দেখে ফেলবে না।

অপালা আসছে চা নিয়ে। বারান্দার আলো তার মুখে পড়েছে। কী সুন্দর লাগছে মেয়েটাকে।

এখন দুপুর।

গরমের দুপুরে চারদিক ঝিম ধরে থাকে। ভূতে মারে ঢিল। কিন্তু শীতের দুপুরগুলো অন্য রকম। সকাল-সকাল একটা ভাব লেগে থাকে। রোদে পিঠ মেলে খবরের কাগজ হাতে বসে থাকতে চমৎকার লাগে।

ফিরোজ বেশিক্ষণ রোদে বসে থাকতে পারল না। ছায়া এসে পড়ল। তার ঘুম-ঘুম পাচ্ছে। সমস্ত শরীর জুড়ে আরামদায়ক আলস্য। ফিরোজ লেপের ভেতর ঢুকে পড়ল। জানালার রোদ পড়ে লেপ ওম হয়ে আছে। কুসুম-কুসুম গরমে কী চমৎকারই না লাগছে! হাসপাতাল থেকে সে ছাড়া পেয়েছে গত পরশু। শরীর এখনো পুরোপুরি সারেনি। আরামদায়ক একটা ক্লান্তি সারাক্ষণ তাকে ছুঁয়ে থাকে। সে ঘুমিয়ে পড়ল। সুন্দর একটা স্বপ্নও দেখে ফেলল।

যেন অপালা তার ঘরে এসেছে। অনেকক্ষণ ধরে দরজার কড়া নাড়ছে। কিন্তু তার ঘুম ভাঙছে না। অপালা বার-বার বলছে — প্লিজ উঠুন, প্লিজ উঠুন। এমন অসময়ে কেউ ঘুমায়? সে সব শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু তার ঘুম ভাঙছে না।

একসময় সত্যি সত্যি সে জেগে উঠল। অবাক হয়ে দেখল ঘরের ভেতর শাড়িপরা একজন কে যেন হাঁটছে। না, অপালা নয়, বড় আপা। ফিরোজের মনে হল, যা দেখছে তাও সত্যি নয়। স্বপ্নেরই কোনো অংশ। একমাত্র স্বপ্নের মধ্যেই একজন মানুষ চট করে অন্য একজন হয়ে যায়। সেই পরিবর্তনটাকেও মনে হয় খুব স্বাভাবিক।

তাজিন বলল, 'এই ওঠ। আর কত ঘুমুবি? সন্ধ্যা বানিয়ে ফেললি তো!'

ফিরোজ ধড়মড় করে উঠল। এটা মোটেই স্বপ্ন নয়। ঐ তো বড় আপা।

'কখন এসেছিস?'

'অনেকক্ষণ। কত রকম শব্দটব্দ করছি। তোর ঘুম আর ভাঙেই না। এক বার চোখ মেলে খানিকক্ষণ দেখিস, তারপর আবার ঘুম। তোর শরীর এত খারাপ?'

'কিছুটা তো খারাপই।'

'তোকে নিতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'কোথায় আবার, আমার বাসায়। একা আসিনি। দলবল নিয়ে এসেছি।'

'দলবল তো দেখছি না।'

'দেখবি কী করে, ওরা হাজি সাহেবের বাড়িতে মচ্ছবে লেগে গেছে।'

'মচ্ছবে লেগে গেছে মানে?'

'তোর বিয়ে নিয়ে ফাইন্যাল কথাবার্তা হচ্ছে।'

ফিরোজ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। কী বলবে ভেবে পেল না। তাজিন বলল, 'শোকে পাথর হয়ে গেলি মনে হচ্ছে! এ রকম করে তাকাচ্ছিস কেন?'

'কথাবার্তা বলছে কে দুলাভাই?'

'দুলাভাই কথাবার্তা বলার লোক? বড় মামা এসেছেন, ফুপা এসেছেন।'

'কী সর্বনাশ!'

'কাপড় পর। চল নিচে যাই।'

'আমি নিচে যাব কেন?'

'আমি বলছি, এই জন্যে নিচে যাবি। সারা জীবন তুই চললি নিজের মত। কারো কথা শুনলি না। বয়স তো তোর কম হল না। এখনো যদি লাইফের একটা পারপাস না পাওয়া যায়...।'

'বক্তৃতার দরকার নেই।'

'নে, তোর জন্যে একটা পাঞ্জাবি এনেছি, এটা গায়ে দে।'

'পাঞ্জাবি গায়ে দেব কেন?'

'কী-রকম বোকার মতো কথা! তুই কী পাঞ্জাবি কখনো গায়ে দিস না? সারা জীবন তো গায়ে আধময়লা পাঞ্জাবিই দেখলাম।'

ফিরোজ পাঞ্জাবি গায়ে দিতে-দিতে বলল, 'এখানে আসার ব্যাপারটা কী আগে থেকেই এ্যারেঞ্জ করা ছিল, না হঠাৎ ঠিক হয়েছে?'

'খবর দেয়া ছিল। তোকে কোনো খবর দেয়া হয়নি। কারণ, আমাদের সবার ভয়, বিয়ের কথায় তুই পালিয়ে যেতে পারিস। আমি কোনো রিস্ক নিতে চাইনি। তোর ওপর নজর রাখার জন্যে লোক ছিল।'

তাজিন তরল গলায় হাসল।

'মন্টু সকাল থেকে তোর সঙ্গে ছিল না?'

'হ্যাঁ, ছিল।'

'তার দায়িত্ব ছিল তোকে আটকে রাখা। নে, পায়জামাটা পর। ভাল করে চুল আঁচড়া।'

'আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'নিচে নামলেই বুঝতে পারবি। এজিন কাবিন হবে। রুসমত সামনের মাসের সতের তারিখ।'

ফিরোজ চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইল।

'এ রকম করে তাকাচ্ছিস কেন? তুই নিজে আমাকে বলেছিস, মেয়েটিকে তোর খুব পছন্দ। আমাদের ওপর রাগটাগ যা করবার, পরে করবি। এখন নিচে নেমে আয়। সবাই অপেক্ষা করছে।'

ফিরোজ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। ছ'সাতটা গাড়ি হাজি সাহেবের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। খোলা মাঠে সুন্দর সুন্দর পোশাক পরা একগাদা ছেলেপুলে ছোটাছুটি করে খেলছে। ফিরোজকে দেখতে পেয়েই তাজিনের সবগুলো মেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল— 'মামার বিয়ে, মামার বিয়ে।'

সূর্য প্রায় ডুবে যাচ্ছে। চারদিকে তার অপরূপ সোনালি আলোর শেষ ছটা। এই আলোয় এমনিতেই সবার মন কেমন করে। ফিরোজের হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হল যদিও এই মেয়েটিকে সে সত্যি-সত্যি কামনা করে। সে নিশ্চিত, এই মেয়েটি তার জীবনে কল্যাণময়ীর ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে, তাকে সারা জীবন ডুবিয়ে রাখবে গভীর ভালবাসায়।

ফখরুদ্দিন সাহেব অফিসে এলেন ঠিক দশটায়।

তিনি অফিসে পা দেয়ামাত্র বড় দেয়াল-ঘড়িতে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। তিনি নিজের ঘর না ঢুকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব ক'টা ঘণ্টা শুনলেন। এই অভ্যেস তাঁর দীর্ঘকালের। এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্যও খুব পরিষ্কার। অফিসের সবাইকে বুঝিয়ে দিতে চান যে, ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে

তিনি চলেন, এবং আশা করেন অন্যরাও তাই করবে।

এখন তিনি যেখানে আছেন, সেটা একটা বড় হলঘরের মতো। সাত জন কর্মচারী পাশাপাশি টেবিলে কাজ করেন। সবাই এসে গেছে, শুধু ওয়ার্ড প্রসেসরের মেয়েটি আসেনি। এই মেয়েটিকে চার মাস আগে চাকরি দেয়া হয়েছে।। তাকে প্রায়-সময়ই তিনি দেখেন না। এই মেয়েটির বয়স অল্প, একে ধমক দিতে তাঁর মায়া লাগে। আজ তাকে কিছু বলবেন।

'মুনিম সাহেব।'

'জি স্যার।'

'ঐ মেয়েটি আসেনি?'

'এসে পড়বে স্যার।'

'এসে পড়বে, সেটা কী করে বললেন? না-ও তো আসতে পারে। আজ হয়ত সে কোনো কারণে বাড়িতে ছুটি কাটাবে।'

মুনিম সাহেব চুপ করে রইলেন। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'বসুন, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন?'

মুনিম সাহেব তবু বসলেন না, দাঁড়িয়ে রইলেন। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'মেয়েটির নাম মনে পড়ছে না। ওর কী নাম?'

'রেখা।'

'রেখা নিশ্চয়ই ডাকনাম। ভাল নাম কী?'

'সুলতানা। সুলতানা বেগম।'

'সুলতানা বেগমকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

'জি আচ্ছা স্যার।'

তিনি নিজের ঘরে ঢুকলেন। তাঁর খাস বেয়ারা তৎক্ষণাৎ গরম এক কাপ চা তাঁর টেবিলে এনে রাখল।

'ইদ্রিস, কী খবর তোমার?'

'জি স্যার, ভাল।'

'নিশানাথবাবুকে খবর দাও।'

ফখরুদ্দিন সাহেব চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে প্যাড টেনে নিলেন। আজ দুপুর একটা পর্যন্ত কী-কী কাজ করবেন, সেগুলো লিখে ফেলবেন। একেকটা কাজ শেষ হবে, তিনি লাল কালিতে সেটা কাটবেন। একটা বাজার আগেই সব কাটা হয়ে যাবে। আলাদা একটি ফাইলে সেই কাগজ তুলে রাখবেন। এই ফাইলটি ব্যক্তিগত। সবসময় নিজের কাছে রাখেন। আজ তিনি যা-যা লিখলেন তা হচ্ছে :

১. পুলিশ তদন্ত : কত দূর কী হল?

২. চিটাগাং ব্রাঞ্চ অফিস : কেন পেপার মিল বন্ধ?

৩. ইউনিয়ন কর্মকর্তা জলিল : শায়েস্তা করতে হবে।

৪. মোস্তাক মিয়া : সে কী চায়?

৫. সুলতানা বেগম : কেন সে রোজ দেরি করে আসে?

৬. টেলিফোন : হেলেনা কেমন আছে?

ফখরুদ্দিন সাহেব লেখা অক্ষরগুলোর দিকে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন। পাঁচ নম্বর পয়েন্টটি কেটে দিলেন। অতি ক্ষুদ্র ব্যাপারে তাঁর মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই।

'স্যার, আসব?'

'আসুন নিশানাথবাবু। কেমন আছেন?'

'জি স্যার, ভাল। কী জন্যে ডেকেছেন?'

'আপনি আমার আশপাশেই থাকবেন। দরকার হলেই যেন পাই।'

'তা তো স্যার থাকি।'

'পুলিশ ইনকোয়ারি কোন পর্যায়ে আছে এটা আপ-টু-ডেট জানতে চাই।'

'জি আচ্ছা স্যার।'

'মোস্তাক মিয়া নামে এক লোককে আজ আমি সাড়ে এগারটায় আসতে বলেছি। সে এলে

তাকে দক্ষিণের ঘরটায় বসাবেন।'

'সে স্যার এসে গেছে।'

'বেশ, ঐ ঘরে নিয়ে বসান। চা দিন। তার সঙ্গে কোনো গল্পগুজব করার প্রয়োজন নেই।'

'জি না স্যার। গল্পগুজব কেন করব?'

'ঠিক আছে, যান। পি.এ.-কে বলুন লন্ডনের সেন্ট লিউক হাসপাতালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। আমি হেলেনার ব্যাপারে খোঁজ নেব। পি.এ.-র কাছে টেলিফোন নাম্বার আছে।'

নিশানাথবাবু ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ামাত্র তিনি চার নাম্বার পয়েন্টটি কেটে দিলেন। ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে এগারোটা বাজতে এখনো অনেক দেরি। তিনি মোস্তাককে সাড়ে এগারটায় আসতে বলেছেন; তিনি ততক্ষণ অপেক্ষা করবেন।

দক্ষিণের যে ঘরটিতে মোস্তাক মিয়া বসে ছিল, সেটা একটা মিনি কনফারেন্স রুম। অল্প কিছু লোকজনের সঙ্গে বিশেষ কোনো গোপনীয় আলাপের প্রয়োজন হলে ঘরটি ব্যবহার করা হয়। একটিমাত্র দরজা -- এটা বন্ধ করামাত্র বাইরে লাল আলো জ্বলে।

ফখরুদ্দিন সাহেব ঠিক সাড়ে এগারটায় সেই ঘরে ঢুকলেন। নিজেই হাত দিয়ে টেনে দরজা বন্ধ করলেন।

'দাঁড়িয়ে আছ কেন? বস।'

তিনি সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে নিজে ধরালেন, একটি বাড়িয়ে দিলেন।

'নাও, সিগারেট নাও। নাও, নাও।'

তিনি নিজেই মোস্তাকের সিগারেট ধরিয়ে দিলেন।

'তুমি ভাল আছ?'

'জি স্যার।'

তিনি লক্ষ্য করলেন, লোকটির সামনে চায়ের কাপ। চা ঠাণ্ডা হয়ে হালকা সর পড়েছে। সে চায়ে মুখ দেয়নি। ফখরুদ্দিন সাহেব ঠিক তার সামনের চেয়ারটিতে বসলেন। সহজ স্বরে বললেন, 'তুমি আমার কাছে কী চাও?'

'স্যার, আমি তো কিছু চাই না।'

'না-চাইলে কেন তুমি আমার বাসায় এসেছিলে? কেন আমার মেয়ের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'আমি বড় মেয়েটার বিয়ে দিচ্ছি, দাওয়াতের কার্ড নিয়ে...'

'দাওয়াত দিতে গিয়েছিলে?'

'আমার মেয়েগুলো খুব সরল। বড় মেয়েটা কান্নাকাটি করছিল।'

'শোন মোস্তাক মিয়া, তুমি এক সময় না খেয়ে মরতে বসেছিলে। আমি তোমাকে সাহায্য করেছিলাম, যে-কারণে আজ তুমি ফর্সা জামাকাপড় গায়ে দিচ্ছ, মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কার্ড ছাপানোর পয়সাও তোমার হয়েছে।'

'আপনি আমাকে সাহায্য করেননি স্যার।'

'তার মানে? পনের হাজার টাকা নগদ তোমার হাতে দিয়েছি। তোমাকে একটা দোকান করে দিয়েছি।'

'তার বদলে আমি আমার মেয়েটাকে দিয়েছি...'

'কথা বলতেও শিখেছ মনে হচ্ছে।'

ফখরুদ্দিন সাহেব আরেকটি সিগাটে ধরালেন। তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। বমি-বমি ভাব হচ্ছে। তিনি তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

'আমার মেয়ে গিয়েছে তোমার ওখানে?'

'জি।'

'দু'বার গিয়েছে, তাই না?'

'আমার সঙ্গে দেখা হয়নি।'

'তোমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তোমার মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তোমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কারণে সে নিদারুণ মানসিক কষ্টে আছে। মেয়েটাকে কেন কষ্ট দিলে?'

'ইচ্ছা করে দিইনি স্যার।'

'আমার মেয়েকে দেখে তোমার স্ত্রী, তোমার কন্যারা কী খুশি হয়েছে? আমাকে বল, কেমন

আনন্দ-উল্লাস হল।'

মোস্তাক মিয়া চুপ করে রইল। ফখরুদ্দিন সাহেব বললেন, 'চুপ করে আছ কেন, বল? তোমার স্ত্রী কেমন খুশি?'

'ওর বোধশক্তি নেই স্যার - মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। কিছু বুঝতে পারে না। মেয়েটা যাওয়ার পর থেকে এই অবস্থা স্যার।'

'তুমি তো সুস্থই আছ। আছ না? তোমার মাথায় আশা করি কোনো গণ্ডগোল হয়নি। নাকি হয়েছে?'

মোস্তাক জবাব দিল না।

'মোস্তাক।'

'জি স্যার।'

'আগামীকাল সকাল দশটার মধ্যে তুমি ঐ বাড়ি ছেড়ে দেবে। অন্য কোথাও চলে যাবে। মেয়ের বিয়ে দেয়া পর্যন্ত সময় তোমাকে আমি দিচ্ছি, বিয়ের পর-পর ঢাকা শহর ছেড়ে যাবে। তোমাকে যেন আমি ঢাকা শহরের ত্রিসীমানায় না দেখতে পাই।'

'কেন?'

'আমি চাচ্ছি, এই জন্যে। আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমাকে আমি দিচ্ছি, নাকি আরো বেশি চাই?'

'টাকা লাগবে না, আমি চলে যাব।'

'টাকা লাগবে না কেন? খুবই লাগবে। নাও, টাকাটা রাখ। আরেকটা সিগারেট নাও। নাও না, নাও। মোস্তাক মিয়া।'

'জি স্যার।'

'আমি মানুষ খুব খারাপ, তুমি বোধহয় জানো না। এই বার তোমাকে ক্ষমা করলাম। দ্বিতীয় বার করব না। এখন তুমি যেতে পার। তুমি টাকা নিলে না?'

'টাকার স্যার আমার দরকার নেই।'

ফখরুদ্দিন সাহেব নিজের কামরায় ফিরে এলেন। মাথার যন্ত্রণা তাঁর ক্রমেই বাড়ছে। এমন শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে কোনো কিছুতেই মন বসানো যায় না। এক কাপ কালো কফির কথা বললেন। এক চুমুক দিয়ে তাও বিস্বাদ লাগল। তিনি বেল টিপলেন।

'লন্ডনের লাইন এখনো পাওয়া যায়নি?'

'পাওয়া গিয়েছিল স্যার। আপনি তখন কনফারেন্স রুমে ছিলেন।'

'আবার চেষ্টা কর।'

নিশানাথবাবু ঢুকলেন।

'স্যার, পুলিশের ইনকোয়ারির ব্যাপারটা খোঁজ নিয়েছি। ফাইনাল রিপোর্ট এখনো হয়নি। রমনা থানার অফিসার ইন-চার্জ...

'এখন থাক। পরে শুনব।'

'আপনার কী শরীর খারাপ স্যার?'

তিনি জবাব দিলেন না। নিশানাথবাবু বললেন, 'আপনি স্যার বাসায় গিয়ে রেস্ট নিন।'

'আপনি আপনার কাজ করুন। আমার স্বাস্থ্য নিয়ে আপনার বিচলিত হবার কোনো কারণ দেখছি না।'

'আদাব স্যার।'

ফখরুদ্দিন সাহেব ড্রয়ার খুলে দুটি প্যারাসিটামল বের করলেন। ট্যাবলেট শুধু-শুধু গেলার কোনো উপায় নেই। পানির জন্যে বেল টিপতে তাঁর ইচ্ছে করছে না। আবার মাথার যন্ত্রণাও সহ্য করতে পারছেন না।

'স্যার, আসব?'

'এস।'

'লাইন পাওয়া গেছে স্যার, কথা বলুন।'

পি.এ. দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিঃশব্দে বের হয়ে গেল। এই ঘরটি সাউন্ডপ্রুফ। দরজা বন্ধ করে দিলে পৃথিবী থেকে এই ঘরটি আলাদা হয়ে যায়।

'হ্যালো, কে কথা বলছেন?'

'আমি ডক্টর মেজন।'

'আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। হেলেনা।'

'আমি হেলেনার ফিজিসিয়ান বলছি।'

'হেলেনা কী অসুস্থ?'

'হ্যাঁ। গুরুতর অসুস্থ -- তাঁর হার্ট ফাংশান কাজ করছে না। লাইফ সেভিং ডিভাইস ব্যবহার করতে হচ্ছে।'

'ব্যাপারটা কখন ঘটল?'

'খুব বেশি আগে নয়। ন'-দশ ঘণ্টা হবে। আপনি কী এগজ্যাক্ট সময় জানতে চান?'

'না, চাই না। রুগীর অবস্থা কেমন?'

'অবস্থা ভাল নয়।'

'ভাল নয় বলতে আপনি কী মিন করছেন?'

'আমি সবচেয়ে খারাপটাই আশঙ্কা করছি। হার্ট এ্যান্ড লাং মেশিনে রুগীকে আপনি দীর্ঘ সময় রাখতে পারবেন না। আমাদের হাতে অন্য কোনো বিকল্প নেই।'

'আই সি।'

'তার ওপর রুগীর ঠাণ্ডা লেগেছে। নিউমোনিয়ার লক্ষণ। ব্যাপারটা খুব ওমিনাস।'

'বুঝতে পারছি। আপনি একটি টেলিফোন নাম্বার লিখুন, খারাপ কিছু হলে জানাবেন।'

ফখরুদ্দিন সাহেব তাঁর শোবার ঘরের নাম্বার দিলেন। এটি তাঁর ব্যক্তিগত নাম্বার। কাউকেই দেননি। ডাইরেক্টরিতেও নেই। এখানে থেকে তিনি টেলিফোন করেন। কখনো রিসিভ করেন না।'

ডক্টর মেজন বললেন, 'আপনি কী আর কিছু জানতে চান?'

'রুগিনীর কী জ্ঞান আছে?'

'না, নেই। উনি কমায় চলে গিয়েছেন।'

'জ্ঞান ফিরবে, এ রকম কি আশা করা যায়?'

'না, যায় না। আমি খুবই দুঃখিত।'

'আপনার দুঃখিত হবার কোনো কারণ নেই।'

ফখরুদ্দিন সাহেব টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন। মনে করতে চেষ্টা করলেন, লন্ডনে এই মুহূর্তে কাকে বলা যায়? তাঁর লন্ডনে কোনো অফিস নেই। করার কথা মনে হয়েছে, শেষপর্যন্ত করা হয়ে ওঠেনি। একটা অফিস থাকলে এখন কাজে দিত। এখন সাহায্যের জন্যে অন্যদের কাছে যেতে হবে যাদের লন্ডনে নিজস্ব অফিস আছে, লোকজন আছে। ওদেরকে বলতে হবে, একটা ডেডবডি দেশে আসবে, দয়া করে সব ব্যবস্থা করুন। সেটা কোনো সমস্যার নয়।

তিনি পি.আর.ও-কে ডেকে পাঠালেন।

'লন্ডনে কাদের অফিস আছে, বলতে পারেন? দেশী কোম্পানির অফিস।'

'ব্যাংক-এর কথা বলছেন?'

'না, ব্যাংক নয়, বিজনেস অফিস।'

'মেফতা ইনজিনিয়ারিং-এর আছে। বাকিগুলো তো স্যার অফহ্যান্ড বলতে পারব না। একটা ওষুধ কোম্পানিরও আছে, নামটা মনে পড়ছে না।'

'বের করুন।'

'করছি স্যার। ব্যাপারটা কী, যদি জানতে পারতাম...'

'ব্যাপারটা আপনার জানার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনি এখন যান।'

পি.আর.ও. নিঃশব্দে বেরিয়ে এলেন। ইউনিয়নের কয়েকজন নেতা এসে বসে আছে। স্যারের সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুবই নাকি জরুরি। অথচ পি.আর.ও. সাহেব এটা বলতে ভুলে গেলেন। দ্বিতীয় বার ঢুকে এটা বলতে তাঁর সাহসে কুলাল না। ইউনিয়নের নেতাদের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে। এরা আজ দেখা করবেই।

ফখরুদ্দিন সাহেব তাঁর সামনের নোটটির দিকে আরেক বার চোখ বোলালেন। একটা প্রায় বাজতে চলল। আজ কিছুই করেননি। চার নাম্বার পয়েন্টটা শুধু দেখা হয়েছে। মোস্তাক মিয়া। লোকটির কিছু পয়সা হয়েছে মনে হয়। ঘাড় শক্ত হয়েছে। কত বড় সাহস, বলে কিনা— আপনি

আমাকে সাহায্য করেননি!'

'স্যার, আসব?'

তিনি চোখ তুলে অবাক হয়ে গেলেন। লালপাড় সিল্কের শাড়ি পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘোমটা টানা। মেয়েটি কে? পরিচিত মনে হচ্ছে।

'স্যার, আসব?'

'প্লিজ কাম ইন। কী ব্যাপার?'

'আপনি স্যার আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন।'

'আমি? কেন?'

'তাহলে বোধহয় স্যার আমার ভুল হয়েছে। আই অ্যাম সরি স্যার।'

'আপনি কে?'

মেয়েটি অত্যন্ত অবাক হয়ে বলল, 'স্যার, আমার নাম রেখা। সুলতানা বেগম।'

'ও আচ্ছা আচ্ছা, আমি কনফিউজ করে ফেলেছি। বস, তুমি বস। চেয়ারটায় বস।'

মেয়েটি আড়ষ্ট হয়ে বসল। ফখরুদ্দিন সাহেবের অস্বস্থির সীমা রইল না। তিনি অফিসের কোনো মহিলা কর্মচারীকে তুমি বলেন না। একে কেন বললেন? মেয়েটি বসে আছে চুপচাপ। তাকাচ্ছে ভয়ে-ভয়ে। এই মেয়েটি অফিসে রোজ দেরি করে আসছে। তাকে কিছু শক্ত কথা বলা দরকার, কিন্তু তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন, কোনো শক্ত কথা তাঁর মনে আসছে না। কী কারণ থাকতে পারে?

'সুলতানা বেগম।'

'জি স্যার।'

'আমি ভুলে আপনাকে তুমি বলেছি। আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'ছিঃ ছিঃ স্যার, এটা আপনি কী বলছেন! আমি আপনার মেয়ের বয়সী।'

'মেয়ের বয়সী কথাটা উঠছে কেন? আমার কোনো মেয়ে নেই।'

বলেই ফখরুদ্দিন সাহেব চমকে উঠলেন। এটা তিনি কী বললেন। অনুশোচনায় তাঁর মন ভরে গেল।

'সুলতানা বেগম, আপনি এখন যান।'

'আপনার কী স্যার শরীর খারাপ?'

'আমার শরীর ভালই আছে।'

'যাব স্যার?'

ফখরুদ্দিন সাহেব উত্তর দিলেন না।

'স্লামালিকুম স্যার।'

মেয়েটি চলে যাবার পর তিনি বুঝতে পারলেন, কী কারণে একে তিনি কোনো কড়া কথা বলতে পারেননি। এই মেয়েটি তাঁকে হেলেনার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। হেলেনার সঙ্গে তার কোনো মিল নেই, কিন্তু মনে হল। সম্ভবত ঘোমটার কারণে। হেলেনার ঘোমটা দেয়ার বাতিক ছিল। তিনি কত বার বলেছেন, 'সব সময় ঘোমটা কেন?' হেলেনা হেসে বলেছে, 'ভাল লাগে, বউ-বউ মনে হয়।'

বউ সাজার এই সখ বিয়ের ত্রিশ বছরেও কাটল না।

অফিসের সবাই লক্ষ্য করল, তিনটা বেজে গেছে, তবু বড়সাহেব ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। সাড়ে তিনটার সময় ফখরুদ্দিন সাহেবের বেয়ারা ইদ্রিস এসে বলল, 'সুলতানা আপাকে স্যার আরেক বার একটু ডেকেছেন।'

সুলতানা ছিল না। তার আজ এক জায়গায় জন্মদিনের দাওয়াত— সে তার স্বভাবমত কাউকে কিছু না বলে আগে-আগেই চলে গেছে।

অপালার হাতে ক্যাডবেরি চকলেটের দুটি চৌকো টিন।

সে বেশ কিছু সময় হল দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কড়া নাড়তে কেন জানি ভয় লাগছে। ইচ্ছে করছে ফিরে চলে যেতে। দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ অপালার কান্না পেয়ে গেল। সে বহু কষ্টে কান্না থামিয়ে কড়া নাড়ল। মিষ্টি গলায় ভেতর থেকে বলল, 'কে?'

অপালা জবাব দিল না। তার খুব ইচ্ছে করতে লাগল বলে, আমি তোমাদের একজন বোন। তোমরা আমাকে বাইরে ফেলে দিয়েছ।

'কে কে?'

অপালা ধরা-গলায় বলল, 'আমি।'

দরজা খুলে গেল। আজ বাড়িতে মেয়েরাই শুধু আছে, অন্য কেউ নেই। পাঁচটি পরীর মতো মেয়ে আগের মতোই অবাক বিস্ময়ে তাকে দেখছে। অপালা চকলেটের বাক্স দুটি এগিয়ে ধরল। কেউ হাত বাড়াল না।

সোমা শেষপর্যন্ত এগিয়ে এসে নিল। অপালা বলল, 'এদের নাম কী?'

সোমা নিচু গলায় বলছে, কিন্তু কিছু অপালার মাথায় ঢুকছে না। তার অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে। এর আগে দু'দিন এমন কষ্ট হয়নি। আজ কেন হচ্ছে?

সোমা বলল, 'তুমি বসবে না?'

'না, বসব না। আমি চলে যাব।'

'একটু বস। বাবা মাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে গিয়েছে, আসতে অনেক দেরি। একটু বস।'

অপালা বলল, 'ছোটরা জানে, আমি কে?'

'হ্যাঁ, জানে। কেন জানবে না? কত কথা আমরা বলি তোমাকে নিয়ে!'

মেজো মেয়ে, যার নাম বিনু, সে হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনি যখন হলিক্রস স্কুলে পড়তেন, তখন কত দিন আমরা আপনাকে দেখার জন্যে ফার্মগেট দাঁড়িয়ে থেকেছি!'

'তাই বুঝি?'

'জি। একদিন আপনি গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে একটা রিকশার নিচে পড়ে গেলেন। আপনার সেটা মনে আছে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ আছে, মনে আছে। খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। সেদিন স্কুলে যাই নি।'

'হ্যাঁ, আপনি চলে গিয়েছিলেন। তখন কী হয়েছিল জানেন? আব্বার ঐ রিকশাওয়ালার ওপর খুব রাগ হয়ে গেল। তখন আব্বা হঠাৎ ছুটে গিয়ে রিকশাওয়ালাকে একটা চড় মারলেন। তখন সব রিকশাওয়ালা আব্বাকে মারতে লাগল। কী যে অবস্থা! আমরা কাঁদতে-কাঁদতে বাসায় এসেছি।'

'তুমি আমাকে আপনি করে বলছে কেন?'

বিনু মাথা নিচু করে অল্প হাসল। সোমা বলল, 'বিনু ক্লাস এইটের বৃত্তি পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়েছে।'

'তাই নাকি?'

'ও আবার কবি। কবিতা লেখে। বিনু, তোর কবিতার খাতাটা আন না।'

বিনু সঙ্গে-সঙ্গে খাতা নিয়ে এল। অপালার হাতে খাতা দিতেই অপালার চোখ দিয়ে টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল।

সোমা এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে। একটা হাত রেখেছে অপালার কাঁধে। অন্য বোনরা তীক্ষ্ণ চোখে দেখছে অপালাকে। শুধু বিনু ফ্রকের আঁচলে চোখ চাপা দিয়েছে। সোমা বলল, 'তোমরা সবাই যাও তো, অপালার জন্যে চা বানাও।'

মুহূর্তে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। সোমা বলল, 'আমাদের ওপর তোমার খুব রাগ, তাই না?'

'না। রাগ করব কেন?'

'জানো অপালা, তোমার ঘটনাটা জানার পর থেকে আমি বাবার সঙ্গে কথা বলি না। আজ চৌদ্দ বছর। আমি একটি কথাও বলি না। তোমার বিশ্বাস হয়? বাবা এই জন্যে ঘরেও বিশেষ থাকে না।'

'তাঁর হয়তো উপায় ছিল না। যা করেছেন, বাধ্য হয়ে করেছেন।'

অপালা খুব কাঁদছে। কিছুতেই কান্না থামাতে পারছে না। সোমা তার পাশেই বসে আছে মূর্তির মতো। তার চোখ শুকনো। ছোটবেলা থেকেই সে কাঁদতে পারে না। কত দুঃখ-কষ্ট বয়ে গেছে জীবনের ওপর দিয়ে, অথচ তার চোখে জল আসেনি। আজ তার খুব কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কান্না আসছে না।

রান্নাঘরের চার বোন মহা উৎসাহে রান্না চাপিয়েছে। একজন আবার ময়দা বের করল। ছোট ছোট হাতে বিনু ময়াদা মাখছে। ময়দা দিয়ে সে কিছু একটা বানাবে। কী বানাবে, তা এখনো জানে না। তাদের খুব আনন্দ হচ্ছে।

অপালা শান্ত ভঙ্গিতে হাঁটছে।

সোমাদের বাড়ি থেকে বের হয়েছে অনেক আগে, কিন্তু এখনো তার বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। কত-কত জায়গায় সে গেল! একটি গলি ছাড়িয়ে অন্য একটি গলি, তারপর একটা বড় রাস্তা। আবার একটা গলি। একসময় সে একটা ফাঁকা মাঠের কাছে এসে পড়ল। চারদিক অন্ধকার হয়ে এলেও একদল ছেলেমেয়ে মাঠে খেলছে। কী সুন্দর লাগছে তাদের।

বিচিত্র ধরনের খেলা। একটা ছেলে ছুটতে থাকে সবাই তার পেছনে ছোটে। একসময় ছেলেটা বসে পড়ে ছড়ার মত কী একটা বলে, অমনি দলের সবাই উল্টো দিকে ছুটতে থাকে। অপালা গভীর আগ্রহে ওদের খেলা দেখতে লাগল।

ফিরোজ বলল, 'তোমার নামটা গ্রাম্য ধরনের। এই যুগে লতিফা কারোর নাম হয়? নামটা আমি বদলে দেব।'

'কী নাম দেবেন?'

'আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে এখন থেকে তোমার নাম ফিরোজা। কী, পছন্দ হয়েছে?'

'উল্টোটা করলে কেমন হয়? আমার নামের সঙ্গে মিলিয়ে আপনার নাম হোক লতিফ।'

বলেই লতিফা খিলখিল করে হেসে ফেলল। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল ফিরোজ। মেয়েরাও যে রসিকতা করতে পারে, বিশেষ করে এই মেয়ে, যার জীবন এ-পর্যন্ত বোরকার আড়ালে কেটেছে তা ফিরোজ কল্পনাও করেনি।

'আপনি রাগ করলেন না তো?'

'না, রাগ করিনি। আপনি-আপনি করছ, এই জন্যে রাগ লাগছে।'

'একদিনে কাউকে তুমি বলা যায়?'

'ইচ্ছা করলেই যায়। তোমার কি হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?'

'হচ্ছে।'

'দাঁড়াও, একটা রিকশা নিয়ে নিই।'

ফিরোজ রিকশার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। রিকশাওয়ালা পছন্দেরও একটা ব্যাপার আছে। এমন একজনকে নিতে হবে, যে তাদের দু'জনের কথা কান পেতে শুনবে না। বুড়ো কোনো রিকশাওয়ালা। তেমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

অনেক ঝামেলা করে সে লতিফাকে বের করে এনেছে। হাজি সাহেব বাসায় থাকলে তা কিছুতেই সম্ভব হত না। হাজি সাহেবকে অনেক কায়দা করে খিলগাঁয়ে পাঠানো হয়েছে। এই কাজটা করেছেন ফিরোজের শাশুড়ি। যদিও তিনি বার-বার বলেছেন বিয়ে তো এখনো পুরোপুরি হয়নি। এখন দু'জনে একসঙ্গে বের হওয়া ঠিক না। কিন্তু এটা তাঁর মুখের কথা, কারণ হাজি সাহেবকে খিলগাঁয়ে পাঠানোর বুদ্ধিটা তাঁরই।

লতিফা বলল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

ফিরোজ হেসে বলল, 'আছে একটা জায়গা, এখন বলব না।'

'আমি জানি আপনি কোথায় যেতে চান।

'তাই নাকি! বল তো কোথায়?'

'অপালা বলে আপনার যে চেনা একজন আছেন, তাঁর বাসায়।'

বলতে-বলতেই লতিফা মুখ নিচু করে হাসল। ফিরোজ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি হাসছ কেন?'

'এমনি হাসছি। মাঝে-মাঝে আমার খুব হাসি পায়।'

'কই, আমার তো পায় না।'

'সব মানুষ তো আর এক রকম হয় না। সবাই যদি এক রকম হত, তাহলে এখন আর আপনি ঐ বাড়িতে যেতে চাইতেন না। আমাকে সঙ্গে নিয়েই বেড়াতেন।'

'এটা আবার কী ধরনের কথা?'

'আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন?'

ফিরোজ সিগারেট ধরাল। সে সত্যি-সত্যি রেগে গিয়েছে। রাগ কমানোর চেষ্টা করছে। ফিরোজের ধারণা ছিল, এই শান্ত স্নিগ্ধ চেহারা মেয়েটি সাত চড়েও কথা বলবে না। এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা তা নয়। মেয়েটা কথা বলতে পারে। কথা বলে খুব গুছিয়ে।

'লতিফা, তোমার একটা ভুল আমি ভেঙে দিতে চাই। অপালাদের বাসায় যাবার জন্য আমি

তোমাকে নিয়ে বের হইনি। তোমাকে নিয়ে বের হয়েছি একটু হাঁটব, কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসব। চট করে একটা ধারণা করা ঠিক না।'

লতিফা চুপ করে রইল। ফিরোজের মনে হল মেয়েটি কান্না চাপার চেষ্টা করছে। এ-রকম কড়া গলায় কথা বলা উচিত হয়নি। এই মেয়ে খুব আদরে মানুষ হয়েছে, যে কারণে সে এত অভিমানী। কেঁদে ফেললেও অবাক হবার কিছু নেই, শুধু অবস্থাটা খুব অস্বস্তিকর হবে। রূপবতী একটা মেয়ে কাঁদছে, সে ভ্যাবলার মত পাশে দাঁড়িয়ে সন্দেহজনক চোখে সবাই তাকাবে।

'লতিফা।'

'জি।'

'কেঁদে ফেলার চেষ্টা করছ নাকি?'

'যাতে কেঁদে না ফেলি, সেই চেষ্টা করছি।'

ফিরোজ আশ্চর্য হয়ে বলল, 'তুমি কী সবসময় এ-রকম কথার পিঠে কথা বল, না আমার সঙ্গেই বলছ?'

'আপনার সঙ্গেই বলছি। আমি কথা খুব কম বলি।'

'তুমি তো মনে হচ্ছে আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলবে।'

'না, তুলব না। একসময় আমার কথা শুনে আপনার অভ্যাস হয়ে যাবে।'

তারা একটা রিকশায় উঠল। ফিরোজ রিকশাওয়ালাকে অপালাদের বাড়ির দিকেই যেতে বলল। লতিফার গায়ে একটা চাদর। তার হাত চাদরের নিচে। ফিরোজ ভয়ে-ভয়ে লতিফার হাতে তার হাত রাখল। লতিফা ভীষণভাবে চমকে উঠেও সামান্য হাসল।

'লতিফা।'

'জি।'

'অপালাদের বাসায় আমরা কেন যাচ্ছি, বল তো?'

'ওনাকে আপনার দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে, তাই যাচ্ছেন। তা ছাড়া হঠাৎ বিয়ে করে নিজেকে আপনার খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।'

'চুপ কর তো, কী বক-বক শুরু করলে? অপরাধী মনে করার কী আছে! আমি চুরি করেছি, না ডাকাতি করেছি? এই মেয়ের সঙ্গে যেদিন আমার পরিচয়, সেদিনই আমি তাকে বলেছি যে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিকঠাক। যদি আমার কথা বিশ্বাস না-হয়, তাকেই জিজ্ঞেস করো।'

আজ দারোয়ান তাকে গেটে আটকাল না। রূপবতী একটি মেয়ে পাশে থাকার অনেক রকম সুবিধা আছে। কাজের মেয়েটি যত্ন করে বসার ঘরে নিয়ে বসাল। তার কাছে জানা গেল, অপালা সারা দিন বাসায় ছিল না। এই কিছুক্ষণ আগে ফিরেছে।

লতিফার চোখে বিস্ময়। এত বিশাল বাড়ি সে কল্পনাও করেনি। যা দেখছে তাতে মুগ্ধ হচ্ছে। এক সময় চাপা গলায় বলল, 'এদের বসার ঘরটা কত সুন্দর দেখেছেন?'

'সুন্দর লাগছে তোমার কাছে?'

'খুবই সুন্দর! ইস, আমাদের যদি এ রকম একটা বসার ঘর থাকত, তাহলে আমি আর কিচ্ছু চাইতাম না।'

'এই বসার ঘরটা আমার তৈরি করে দেয়া। ডিজাইন, ডেকোরেশন সব আমার।'

'সত্যি।'

'হ্যাঁ, সত্যি। তুমি চাইলে এর চেয় সুন্দর একটা ঘর আমি তোমার জন্যে বানিয়ে দেব।'

''আমি চাই। আমি একশ বার চাই। ঐ ছবিটাও তোমার আঁকা?'

এই প্রথম লতিফা তুমি বলল। সে নিজেও তা বুঝতে পারল না। তার মুগ্ধ দৃষ্টি ছবিটির দিকে।

'ছবিটা ভাল লাগছে?'

'হুঁ।'

'কেন ভাল লাগছে?'

'তা তো জানি না।'

ফিরোজ মৃদু স্বরে বলল, 'আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এইটা। অনেক সময় আমাদের অনেক কিছু ভাল লাগে, কিন্তু কেন ভাল লাগে তা আমরা বুঝতে পারি না। বুঝতে চেষ্টাও করি না।'

'সব কিছু বুঝে ফেলাও ভাল না।'

ফিরোজ মনে-মনে হাসল। এই মেয়েটি দার্শনিক টাইপ নাকি? কত সহজে কঠিন কঠিন কথা বলছে।

কাজের মেয়েটি ট্রেতে করে চা এবং নানান ধরনের খাবার-দাবার নিয়ে এসেছে। সে চায়ের কাপ টেবিলে রাখতে রাখতে মৃদু স্বরে বলল, 'আপার শরীরটা ভাল না। আপা আজকে একতলায় নামবে না। আপনেরা আরেক দিন আসেন।' ফিরোজের মুখ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। লতিফা বলল, 'আমি উপরে গিয়ে ওনাকে দেখে আসি?'

কাজের মেয়েটি বলল, 'জি না। বাইরের মানুষের উপরে উঠা নিষেধ আছে।' লতিফা চায়ের কাপে চিনি ঢেলে হালকা গলায় বলল, 'মিষ্টি হয়েছে কী না দেখ।' ফিরোজ কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে, যেন এই মুহূর্তে রেগেমেগে একটা কাণ্ড করবে। লতিফা মৃদু স্বরে বলল, 'চা না খেয়ে যাওয়াটা আরো খারাপ হবে। চা খাও, কিছুক্ষণ বস। কাপগুলো কী সুন্দর, দেখেছ? তুমি আমাকে এ রকম এক সেট কাপ কিনে দিও।'

ফিরোজ চুপ করে আছে। লতিফা শাড়ির আঁচলে গা ভাল মত জড়াতে-জড়াতে বলল, 'আজ বেশ শীত পড়েছে। তোমার শীত লাগছে না?'

এ প্রশ্নেরও কোনো জবাব পাওয়া গেল না। ফিরোজ রিকশায় বসে আছে পাথরের মতো, তাকিয়ে আছে শূন্যদৃষ্টিতে। তার কিছুই ভাল লাগছে না। লতিফা চাপা গলায় বলল, 'তোমাকে একটা কথা বলি? তুমি শুধু নিজের কথাটাই দেখছ। নিশ্চয়ই ওনার কোনো সমস্যা হয়েছে। কেউ কি আর ইচ্ছা করে কাউকে অপমান করে?'

'চুপ করে থাক। তুমি বেশি বক-বক কর।'

'সবার সঙ্গে করি না। কোনোদিন করবও না। শুধু তোমার সঙ্গে করব, রাগ কর আর যাই কর।'

লতিফা তার হাত রাখল ফিরোজের হাতে। সেই হাত কেঁপে কেঁপে উঠছে। ফিরোজ বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি হয়েছে লতিফা?'

'কিছু হয়নি।'

কাঁদছ নাকি?'

'হ্যাঁ, কাঁদছি। তুমি এত লজ্জা পেয়েছ, তাই দেখে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

ফিরোজের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ তো বড় অদ্ভুত মেয়ে! সত্যি সত্যি কাঁদছে। ফিরোজ বিব্রত স্বরে বলল, 'কী শুরু করলে তুমি, কান্না থামাও তো!'

লতিফা ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'চেষ্টা করছি, পারছি না।'

ওরা চলে যাবার পরপরই খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অপালা নিচে নেমে এল। তাকে দেখে মনে হল, সে দীর্ঘ সময় নিয়ে সাজগোজ করেছে। গায়ে হালকা লাল রঙের শাড়ি। গলায় গাঢ় লাল রঙের রুবি-বসানো হার। কানের দুলের পাথর অবশ্যি রুবি নয় স্বচ্ছ টোপাজ। লাল শাড়ির প্রতিফলনে সেগুলোও লালচে দেখাচ্ছে। অপালাকে দেখে মনে হচ্ছে এক্ষুণি কোথাও বেরুবে।

বারান্দায় গোমেজ দাঁড়িয়ে ছিল। সে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অপালা লাজুক গলায় বলল, 'আমাকে কেমন লাগছে?'

'খুব সুন্দর লাগছে আপা।'

'বাবা কোথায়?'

'বাগানে বসে আছেন।'

'আমাদের দু'কাপ চা দাও।'

অপালা হালকা গায়ে বাগানে নেমে গেল। বাগান অন্ধকার। বারান্দার বাতি নেভানো বলে সব কিছুই কেমন অস্পষ্ট লাগছে। ফখরুদ্দিন সাহেব অরুণা এবং বরুণাকে দু'পাশে নিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। তাঁর হাতে জ্বলন্ত চুরুট। অন্ধকারে চুরুটের আগুন ওঠানামা করছে। অপালা তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

'অন্ধকারে বাগানে বসে আছ কেন বাবা?'

'এমনি বসে আছি, কিছু করার নেই।'

'তোমার শীত লাগছে না?'

'কিছুটা লাগছে।'

'এস ঘরে এস। এই ঠাণ্ডায় তোমার পাশে বসতে পারব না।'

অপালার গলা সতেজ। কথায় ফুর্তির একটা ভঙ্গি, যা তার স্বভাবের সঙ্গে একেবারেই মিশছে না। সে বড় একটা সাদা চন্দ্রমল্লিকা ছিঁড়ে খোঁপায় পরল।

'বসে রইলে কেন বাবা, এস।'

অপালা ফখরুদ্দিন সাহেবের হাত ধরল। তিনি বিস্মিত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

'তোকে খুব খুশি-খুশি মনে হচ্ছে।'

'সবাই মুখ গোমড়া করে রাখলে চলবে? তোমার কারখানার ঝামেলা মিটেছে?'

'প্রায় মিটেছে। কিছু সমস্যা এখনো রয়ে গেছে। আরো টাকা খরচ হবে, এই আর কি।'

'ধনী হবার কত সুবিধা, তাই না বাবা? সব সমস্যা চট করে মিটিয়ে ফেলা যায়।'

'গরিব হবারও সুবিধা আছে। গরিবদের এ ধরনের কোনো সমস্যা থাকে না।'

অপালা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে হালকা গলায় বলল, 'তা ঠিক, গরিবদের একমাত্র সমস্যা কীভাবে বেঁচে থাকবে। এই বেঁচে থাকার জন্যে কত কাণ্ড এরা করে! নিজের ছেলেমেয়েদের পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়।'

ফখরুদ্দিন সাহেব হাতের চুরুট ছুড়ে ফেললেন। তাকালেন মেয়ের দিকে। অন্ধকারে অপালার মুখের ভাব দেখতে পেলেন না। শুধু মনে হল, মেয়েটির গলার স্বর হঠাৎ করে যেন খানিকটা বিষণ্ন হয়ে গেছে এবং মেয়েটি নিজেও তা বুঝতে পেরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলতে।

তারা বসল বারান্দায়। গোমেজ চায়ের ট্রে নামিয়ে বাতি জ্বেলে দিল। অপালা চায়ে চিনি মেশাতে-মেশাতে বলল, 'আমাকে কেমন লাগছে বাবা?'

'সুন্দর লাগছে। তবে লাল চন্দ্রমল্লিকা হলে বোধহয় আরো ভাল লাগত।'

'না, তা লাগত না। কালো চুলের সঙ্গে সাদা ফুলের সুন্দর কনট্রাস্ট হয়। কালোর সঙ্গে লাল মিশ খায় না' তোমার চায়ে চিনি হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে! হঠাৎ আজ এত সাজের ঘটা?'

'ইচ্ছা করল, তাই। কারণ নেই কোনো।'

'চল, বাইরে কোথাও গিয়ে রাতের খাবার খেয়ে আসি। যাবে?'

'কেন যাব না?'

'মন ভাল না লাগলে থাক।'

মন ভাল লাগবে না কেন? আমার খুব ভাল লাগছে।'

রেস্তোরাঁতে অপালা কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গেল। কথা বললেন ফখরুদ্দিন সাহেব। সবই ব্যবসায়িক কথা। মোট সম্পদের একটা আবছা ধারণা দিতে লাগলেন। অপালা বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমাকে এ-সব কেন বলছ বাবা?'

'তোমাকে ছাড়া কাকে বলব? আমার শরীর ভাল না। যে কোনো সময় কিছু একটা হবে। তখন হাল ধরবে কে?'

অপলা ক্ষীণ স্বরে বলল, 'মা'র কথা তুমি আমাকে অনেক দিন ধরেই কিছু বলছ না। তাঁর শরীর কি খুব খারাপ?'

'না তো! শরীর মোটামুটি ভাল আছে।'

'না বাবা, ভাল নেই। আমি আজ খুব ভোরে হাসপাতালে টেলিফোন করেছিলাম। ডাক্তাররা বলেন, অবস্থা খুবই খারাপ বাবা।'

'বল।'

'তুমি এখনো কেন এখানে বসে আছ? তুমি যাচ্ছ না কেন?'

অপলা খুব শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বলল, 'মা'র এখন জ্ঞান নেই, কিন্তু যদি জ্ঞান ফেরে, তখন মা একজন প্রিয় মানুষের মুখ দেখতে চাইবেন। মা তখন কাকে দেখবে?'

'রাইট। রাইট আসলেই তাই। মৃত্যুর সময় প্রিয়জনদের দেখতে ইচ্ছা করে। আমি এটা খুব ভাল জানি। আমার মাও তাই চেয়েছিল। আমি, আমি...'

ফখরুদ্দিন সাহেব কথা শেষ করলেন না। অপালা বলল, 'চল উঠে পড়ি, আমার আর খেতে

ইচ্ছা করছে না।'

রাত প্রায় একটার মত বাজে। অপালা এখনো তার খোঁপা থেকে চন্দ্রমল্লিকা তুলে ফেলেনি। তার গায়ে এখনো লাল শাড়ি। গলার হার আগুনের মত জ্বলছে। তাকে দেখাচ্ছে তার ডাইরিতে আঁকা নর্তকীর মত। সেই রকম চোখ, সেই রকম মুখ। এই অদ্ভুত ব্যাপারটা আগে অপালা লক্ষ্য করেনি। সে অনেক্ষণ আয়নায় নিজেকে দেখল। ফিসফিস করে বলল, 'আয়নার এ মেয়েটি তো ভারি সুন্দর!' বলেই সে তাকাল তার ডায়েরির ছবির দিকে। 'এত মিল আমাদের মধ্যে, কিন্তু আগে কেন এটা চোখে পড়ল না?' এই বলেই সে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ডাইরি খুলে ছোট-ছোট অক্ষরে লিখল

'বাবা, তোমার ওপর আমার কোনো রাগ নেই।'

তার কাছে মনে হল, এই লেখা পড়ে সবাই ভাববে, মেয়েটি কোন বাবার কথা বলছে? কেউ তা বুঝতে পারবে না। বোঝার কথাও নয়। বেশ চমৎকার একটা ধাঁধা। যে ধাঁধার উত্তর শুধু একজনই জানে। সে সেই উত্তর কাউকে দিয়ে যাবে না। থাকুক না খানিকটা রহস্য।

ঘরের বাতি নিভিয়ে অপালা টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে দিল। তার ডাইরির শেষ লেখাটি অতি দ্রুত লিখতে লাগল।

ফিরোজ সাহেব,

আপনাদের দুজনকে আমি জানালা দিয়ে আসতে দেখলাম। বিকেলবেলার আলোয় সব কিছুই ভাল দেখায়, কিন্তু আপনাদের দুজনকে যে কী সুন্দর লাগছিল! আমি দেখলাম, আপনার বান্ধবী (নাকি স্ত্রী?) একটা হোঁচট খেলেন, আপনি সঙ্গে-সঙ্গে হাত দিয়ে তাঁকে ধরে ফেলে কী যেন বললেন, তারপর দুজন অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। কী যে অপূর্ব দৃশ্য! আনন্দে আমার চোখ ভিজে গেল। কত আনন্দ আমাদের চারদিকে, তাই না?

আমি আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসিনি। কারণটি জানলেই আপনারা দুজনই সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণটা হচ্ছে, কেন জানি গোড়া থেকেই আমার মনে হচ্ছিল, আপনার এই বান্ধবীর ব্যাপারটা সব বানানো। মিথ্যা অজুহাতে আপনি বার-বার আমার কাছেই আসেন। কিন্তু তা তো নয়। এটা আমি কিছুতেই সহজভাবে নিতে পারছিলাম না। আপনি আমাকে সত্যি কথা বলেছিলেন। আমিও সত্যি কথাই বললাম। আমি আপনাকে নিয়ে একটা বাড়িতে যেতে চেয়েছিলাম। সেটা আর সম্ভব হল না। তবে আপনাকে একটা মজার কথা বলি   যদি হঠাৎ কোনোদিন অবিকল আমার মত কোনো মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়, আপনি কিন্তু চমকে উঠবেন না। তার কাছে গিয়ে বলবেন   অপলা নামের খুব চমৎকার একটি মেয়ে ছিল। তাকে আমি চিনতাম। সেই মেয়েটি খুব দুঃখী ছিল, কিন্তু তার দুঃখের কথা সে কাউকেই কোনোদিন বলেনি। এবং কারো ওপর তার কোনো রাগ নেই।

মেয়েটির ঠিকানা আমি আপনাকে দেব না! কারণ আমি জানি, একদিন-না-একদিন তার সঙ্গে আপনার দেখা হবে। আপনি ভীষণ চমকে উঠবেন। কল্পনায় আপনার সেই চমকে ওঠার দৃশ্য আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। আমার খুব মজা লাগছে।

ফখরুদ্দিন সাহেব ঘুমুতে যাবার আগে দু'টি ঘুমের ট্যাবলেট খান। সোনারিলের বড় একটা কৌটা তাঁর বিছানার পাশের সাইড-টেবিলে থাকে। আজ কৌটাটা খুঁজে পাচ্ছেন না। হয়ত হাত লেগে নিচে পড়ে গেছে। খুঁজতে ইচ্ছে করছে না। তিনি বিছানায় উঠে বাতি নিভিয়ে দিলেন : খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, সেই রাতে তাঁর খুব ভাল ঘুম হল। চমৎকার একটা স্বপ্নও দেখলেন। নদী, বন, ফুল, পাখি নিয়ে স্বপ্ন। ঘুমের মধ্যেই তিনি বুঝলেন, এটা স্বপ্ন   এর কোনো অর্থ নেই, তবু তাঁর মন গভীর প্রশান্তিতে ভরে গেল। অনেক দিন স্বপ্ন দেখা হয় না।



# সাজঘর

কেরোসিনের চুলায় জাম্বো সাইজের এক কেতলি। মনজু পাশে বসে আছে - একটু পর পর কেতলির মুখ তুলে পানি ফুটছে কিনা তা দেখার চেষ্টা করছে। তার হিসেবমত ইতিমধ্যে পানি ফুটে যাওয়া উচিত। অথচ ফুটছে না। ব্যাপারটা কি?

মজনুর বয়স তেরো-চৌদ্দ কিন্তু দেখায় অনেক বেশি। তার মুখ চিমসে গিয়েছে, গালের হাড় উঁচু, মাথার চুল জায়গায় জায়গায় পড়ে গেছে। উপরের পাটির দুটি দাঁত ভাঙা। ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচ করে থুথু ফেলা ছাড়া তার মধ্যে আর কোনো ছেলেমানুষি নেই।

মজনু 'পূর্বা নাট্যদলের' টি বয়। এদের সঙ্গে সে গত তিন বছর ধরে লেগে আছে। তার কাজ হচ্ছে রিহার্সেল চলাকালীন সময়ে একশ থেকে দেড়শ কাপ চা বানানো। এর বিনিময়ে মাসে সে নব্বুই করে টাকা পায় এবং রিহার্সেলের এই ঘরে রাতে ঘুমুতে পারে। এমন কোনো লোভনীয় চাকরি নয়। প্রতি সপ্তাহে মজনু একবার করে ভাবে চাকরি ছেড়ে দেবে। ছাড়তে পারে না। তার নেশা ধরে গেছে। রিহার্সেল না শুনলে তার ভাল ঘুম হয় না। বৃহস্পতি এবং শুক্র এই দু'দিন রিহার্সেল হয় না। মজনুর খুব অস্থির লাগে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার এই কথা ভেবে এখন থেকেই মজনুর মেজাজ খারাপ। মেজাজ খারাপ হলে সে কিছুক্ষণ পর পর দাঁতের ফাঁক দিয়ে থুথু ফেলে। এখনো ফেলছে এবং আড়ে আড়ে দরজার দিকে তাকাচ্ছে। কেউ দেখে ফেললে কপালে যন্ত্রণা আছে। তার থুথু ফেলা কেউ সহ্য করে না।

প্রণব বাবু দরজা দিয়ে ঢুকলেন। মজনু অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে পড়ল। প্রণব বাবুকে সে দু'চোখে দেখতে পারে না। তার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই সে মনে মনে বলে, 'হারামজাদা মালাউন।'

'মজনু।'

মজনু জবাব দিল না। তাকালও না।

'মজনু, জল ফুটল না কি রে?'

'না।'

'চুলায় আগুন আছে নাকি দেখ তো, তুই দেখি রাত বারোটা বাজাবি।'

মজনু প্রণব বাবুর উল্টোদিকে মুখ নিয়ে খুব সাবধানে একদলা থুথু ফেলে মনে মনে বলল, 'হারামজাদা কুত্তা।'

এই দলের দুজন লোককে মজনু সহ্য করতে পারে না। একজন প্রণব বাবু, অন্যজন জলিল সাহেব। অথচ এই দু'জনই নিতান্ত ভালমানুষ। বিভিন্ন উপলক্ষে মজনুকে টাকাপয়সা দেন।

প্রণব বাবু পকেট থেকে কুড়িটা টাকা বের করে মজনুর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মধুর স্বরে বললেন, 'পাঁচটা ফাইভ ফাইভ নিয়ে আয়। বিদেশী। যাবি আর আসবি।'

মজনু বেরিয়ে গেল। বিদেশী সিগারেট আনতে তার খুব আগ্রহ। দেশীটাই সে কেনে, কেউ ধরতে পারে না। সব বেকুবের দল। অথচ তারা নিজেরা তা জানে না। পৃথিবীতে বোকার সংখ্যা এত বেশি কেন এই জিনিসটা নিয়ে প্রায়ই মজনু ভাবে।

রিহার্সেল হয় পুরানা পল্টনের জনতা পাবলিক লাইব্রেরির হল ঘরে। দুটো চৌকি একত্র করে একটা স্টেজ তৈরি করা আছে। এই পাবলিক লাইব্রেবির প্রতিষ্ঠাতা পূর্বা নাট্যদলের সঙ্গে জড়িত বলে এখানে রিহার্সেলের সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তবে বেশিদিন পাওয়া যাবে না। হল ঘরটা লাইব্রেরির রিডিং রুম হয়ে যাবে।

হল ঘরে নাটকের পাত্র-পাত্রীরা উপস্থিত হচ্ছে। মহড়া শুরু হতে দেরি হচ্ছে; কারণ আসিফ এখনো এসে উপস্থিত হয়নি। আসিফের স্ত্রী লীনা অনেক্ষণ হল এসেছে। অন্য কোনো মেয়ে এখনো উপস্থিত হয়নি।

লীনার বয়স পঁয়ত্রিশ ছাব্বিশ। তাকে কখনো সে রকম মনে হয় না। হালকা পাতলা গড়নের জন্য আঠারো-উনিশ বছরের তরুণীর মত মনে হয়। লীনার মুখটি স্নিগ্ধ। তবে আজ তাকে কিছুটা

বিষণ্ন দেখাচ্ছে। মিজান বসেছে লীনার পাশে। সে জিজ্ঞেস করল, 'ভাবী আপনার শরীরটা কি খারাপ?'

লীনা জবাব না দিয়ে হাসল। যে হাসির মানে হচ্ছে শরীর ভালই আছে।

মিজান বলল, 'আসিফ ভাই দেরি করছেন কেন জানেন?'

'জানি।'

লীনা আবার হাসল। তার হাসি রোগ আছে। যে কোনো কথা বলবার আগে একটু হলেও হাসে। এবং কথা কখনো পুরোপুরি বলে না।

মিজান বিরক্ত হয়ে বলল, 'জানলে বলুন। আপনি অর্ধেক কথা বলেন, অর্ধেক পেটে রেখে দেন, বড় বিরক্ত লাগে।'

'লীনা বলল, 'ও তার বোনের বাসায় যাবে। ওর ভাগ্নির শরীর খারাপ। ওখানেই মনে হয়ে দেরি হচ্ছে!' মিজান ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কোনোদিন টাইমলি রিহার্সেল শুরু করতে পারিনা। কোনো মানে হয়?'

লীনার বেশ মজা লাগছে। মিজানের কথা বলার ভঙ্গিটাই মজার। এমন ভাবে সে কথা বলে যেন পুরো নাটকের দায়িত্ব তার ঘাড়ে : অথচ সে এই বছরেই মাত্র গ্রুপে জয়েন করেছে। নাটকে এখনো কোনো রোল পায় নি। পাওয়ার সম্ভাবনাও কম। মিজানের গলাটা মেয়েলি। তবে এ নিয়ে তার কোনো ক্ষোভ নেই। সে যে লেগে থাকতে পারছে এতেই সে খুশি।

মিজানদের থেকে একটু দূরে জলিল সাহেব কয়েকজনের সঙ্গে নিচু গলায় আড্ডা দিচ্ছেন। আড্ডা ঠিক না। কথা বলছেন জলিল সাহেব একাই। অন্যরা খুব আগ্রহ নিয়ে শুনছে। আদিরসের গল্প। জলিল সাহেব আদিরস বিষয়ক রসিকতা অতি চমৎকার করেন। তবে সব সময় করেন না। এমন সময় করেন যখন আশপাশে মেয়েরা কেউ থাকে। আজ লীনা কাছেই আছে।

জলিল সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, 'গল্পটা হচ্ছে একটা ভীমরুল নিয়ে। ভীমরুল হুল ফুটিয়ে দিয়েছে। ভীমরুল হুল ফোটালে কি হয় জানো তো? ফুলে বিশাল হয়ে যায়। এখন চিন্তা কর, একজন লোকের একটা বিশেষ জায়গায় যদি ভীমরুল হুল ফোটায় তাহলে?'

জলিল সাহেবের কথা শেষ হল না, তার আগেই একেকজন হাসতে হাসতে ভেঙে পড়েছে।

লীনা বলল, 'মিজান, ওরা হাসাহাসি করছে কি নিয়ে জানো?'

মিজান বলল, 'জলিল সাহেব আজেবাজে গল্প বলেন, ঐ নিয়ে হাসাহাসি হয়।'

'আজেবাজে গল্প মানে কি রকম গল্প?'

'বাদ দেন তো ভাবী।'

জলিল সাহেবের গল্প আরো খানিকটা অগ্রসর হয়েছে। আবার সবাই হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ছে। ঘরের ভেতর খুব গরম লাগছে। লীনা বারান্দায় চলে এল। বারান্দা থেকেই দেখল মেয়েরা সব চলে এসেছে। মেয়েদের আনার জন্যে একটা গাড়ি যায়। নতুন মেয়েটির আজ আসার কথা, সে এসেছে কি না কে জানে।

মজনু চা বানাচ্ছে। প্রথম কাপটা সে লীনার দিকে বাড়িয়ে দিল।

লীনা বলল, 'চা খাব না রে।'

'গরম লাগছে?'

'ঠাণ্ডা কিছু আইন্যা দিমু?'

'না।'

'আফনের শইলডা কি খারাপ আফা?'

'না-শরীর খারাপ না।'

লীনা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার শরীরটা আসলেই খারাপ। কেন খারাপ তা সে নিজেও ঠিক জানে না। রাতে ঘুম ভাল হচ্ছে না। একবার ঘুম ভাঙলে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না : কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

যে চার জন মেয়ে এসেছে তাদের একজন আজই প্রথম এল। শ্যামলা একটি মেয়ে, মুখ থেকে বালিকা ভাবটা এখনো যায়নি। সে অবশ্য লালমাটিয়া কলেজে আই.এ. পড়ছে। এবার সেকেন্ড ইয়ার। ভাল নাম ইসরাত বেগম। সবাই অবশ্যি তাকে পুষ্প পুষ্প ডাকছে।

মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে সে খুব লজ্জা পাচ্ছে, তবে কৌতূহলী চোখে চারদিক দেখছে।

সে একা পড়ে গেছে। অন্য মেয়েরা জলিল সাহেবের কাছে চেয়ার টেনে বসেছে। জলিল সাহেব ভূতের গল্প শুরু করেছেন। ভূতের গল্পগুলি অবশ্যি আদিরসের গল্পের মত জমছে না।

লীনা বারান্দা ছেড়ে আবার ঘরে ঢুকল। পুষ্পের পাশে চেয়ারে এসে বসল। হাসি মুখে বলল, 'নাম কি তোমার?'

'পুষ্প।'

'বাহ খুব ভাল নাম।'

বলে লীনা নিজেই একটু লজ্জা পেল। 'বাহ খুব ভাল নাম তো।' এই জাতীয় কথাগুলি সাধারণত ছোট বাচ্চাদের বলা হয়। এই মেয়েটি ছোট বাচ্চা নয়।

'তুমি কি আগে অভিনয় করেছ?'

'জি না। আমি হয়ত পারব না।'

'কেন পারবে না। নিশ্চয়ই পারবে। অভিনয় কঠিন কিছু নয়। আমি যদি পারি তুমিও পারবে।'

'বাসা থেকে করতে দেবে কি না তাও তো জানি না।'

'সে কি। বাসায় কাউকে কিছু বলনি?'

'জি না।'

'বলনি কেন?'

'বাসায় বললাম, তারপর এখানে কিছু পারলাম না, আপনারা বাদ দিলেন...'

লীনা খানিকটা অবাক হল। এই মেয়েকে যতটা লাজুক শুরুতে মনে হচ্ছিল, এ ততটা লাজুক নয়। গলার স্বর পরিষ্কার ও স্পষ্ট। এ পারবে। লীনা বলল, 'আমাদের দিকটাও কিন্তু তুমি দেখনি। ধরা যাক আমরা তোমাকে নিলাম, তারপর বাসা থেকে বলল... হবে না। তখন আমরা ঝামেলায় পড়ব না?'

'আমি আপনাদের দিকটা ভাবিনি, আমি শুধু আমার নিজের দিকটাই ভেবেছি।'

'সবাই তাই ভাবে পুষ্প।'

নাটক পরিচালক বজলু ভাই এসে ঢুকেছে। আজ তিনিও দেরি করেছেন। অসম্ভব রোগা, অসম্ভব কালো এবং প্রায় ছ'ফুটের মত লম্বা একজন মানুষ। খানিকটা কুঁজো হয়ে হাঁটেন বলে তাঁর অন্য নাম হচ্ছে 'হাঞ্চ ব্যাক অব মীরপুর।'

বজলু ভাই এসেই বিরক্ত স্বরে বললেন, 'তোমরা বসে আছ কেন? শুরু করে দিলেই হত।'

জলিল সাহেব বললেন, 'আপনি নেই, শুরু করব কি ভাবে?'

'আমি না থাকলে শুরু হবে না। এটা কেমন কথা?'

'আসিফ ভাইও এখনো আসেননি।'

'বল কি? এদের হয়েছে কি? দেখি চা দিতে বল। চা খেয়ে ম্যারাথন। আজ ফুল রিহার্সেল হবে। নতুন মেয়ে একটা আসার কথা। এসেছে? কুসুম কিংবা পুষ্প এ জাতীয় নাম।'

পুষ্প উঠে দাঁড়াল। বজলু সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। পুষ্প খুব অস্বস্তি বোধ করছে। এতক্ষণ কেউ তেমন করে তার দিকে তাকায়নি, এখন একসঙ্গে সবাই তাকাচ্ছে।

'তোমারই নাম কুসুম?'

'আমার নাম পুষ্প।'

'একই ব্যাপার। তৈলাধার পাত্র কিংবা পাতাধার তৈল—অভিনয় করেছ কখনো?'

'জি না।'

'এই তো একটা ভুল কথা বললে—অভিনয় তো আমরা সারাক্ষণই করছি। করছি না? বাড়িতে মেহমান এসেছে, তুমি খুব বিরক্ত, তবু তার সঙ্গে হাসি মুখে গল্প করতে হচ্ছে। দেখাতে হচ্ছে যে তুমি আনন্দিত। এটা অভিনয় না? অভিনয় তো বটেই। কঠিন অভিনয়। আমাদের প্রতিনিয়ত অভিনয় করতে হয়।'

পুষ্প তাকিয়ে আছে। এই লোকটিকে তার পছন্দ হচ্ছে না। কথা বলার সময় লোকটির মুখ থেকে থুথু ছিটকে আসছে। আর কথা বলছে কেমন মাস্টারের ভঙ্গিতে। কথাবার্তায় একটা সবজান্তা ভাব। এই রকম সবজান্তা লোক তার ভাল লাগে না।

'পুষ্প।'

'জি।'

'তুমি একটা কাজ কর। একটু দূর থেকে হেঁটে হেঁটে এখানে এসে দাঁড়াও। তারপর তুমি তোমার মা'কে ডাক। এমন ভাবে ডাকবে যেন তাঁকে তুমি জরুরি খবর দিতে চাচ্ছ।'

'কি খবর?'

'মনে কর একটা দুঃসংবাদ।'

পুষ্প তাই করল। যদিও তার মোটেও ভাল লাগছে না। একটু দূর থেকে হেঁটে এসে বলল, 'মা, মা।'

বজলু সাহেব বিরক্ত মুখে বললেন, 'কিছুই তো হল না, আবার কর।'

পুষ্পের মুখ লাল হয়ে গেছে। সে একবার ভাবল কিছু করবে না। দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু তা কী ঠিক হবে? সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে। পুষ্প আবার একটু দূরে সরে গেল। এগিয়ে এল জড়ানো পায়ে। আবার ডাকল। 'মা, মা।'

বজলু সাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'রোবটের মত কথা বলছ। ফ্রিলি বল। পরিষ্কার গলায় বলল। জায়গাটা আবার কর।

পুষ্প বলল, 'আর করব না, আমার ইচ্ছে করছে না।'

'ইচ্ছে করছে না মানে?'

'আমি অভিনয় করব না।'

পুষ্প লীনার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল। তার চোখে পানি এসে যাচ্ছে। কি রকম বিশ্রী ভঙ্গিতে লোকটা বলল...কিছুই তো হল না। কিছুই না হওয়াটা যেন তার অপরাধ।

পুষ্পের ইচ্ছা করছে বাসায় ফিরে যেতে। রাত এখনো তেমন হয়নি। সে একটা রিকশা নিয়ে চলে যেতে পারবে। তার এত ভয়-টয় নেই। তবে ইচ্ছা করলেই তো আর যাওয়া যায় না। মীনা আপা তাকে নিয়ে এসেছেন। ফিরতে হবে মীনা আপার সঙ্গেই। মীনা আপার কাণ্ড কারখানাও অদ্ভুত। তাকে নিয়ে আসার পর আর কোনো খোঁজখবর নেই। ফর্সা মতো একটা লোকের পাশে বসে ক্রমাগত কথা বলছে। ফর্সা লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছে না সে এইসব কথা মন দিয়ে শুনছে। বরং মনে হচ্ছে ফর্সা লোকটা বিরক্ত হচ্ছে।

মীনা আপা পুষ্পদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন। কৃষি ব্যাংকে কাজ করেন আর নাটক থিয়েটার করেন। বয়স ত্রিশ ছাড়িয়ে গেছে। এখনো বিয়ে হয়নি। পুষ্পের ধারণা বিয়ে হবার সম্ভাবনা খুব কম। মীনা আপা বছর তিন আগে থেকে মোটা হতে শুরু করেছেন। এখন প্রায় মৈনাক পর্বত। থুতনিতে ভাঁজ পড়েছে। হাঁটার সময় থপ থপ শব্দ হয়।

মীনা আপার ধারণা টনসিল অপারেশনের জন্যে তাঁর এটা হয়েছে। টনসিল অপারেশন না হলে আগের মতো হালকা পাতলা থাকতেন। এই নাটকে মীনা আপা কিসের পার্ট করেন কে জানে?

আসিফ এসে ঢুকল ঠিক সাড়ে আটটায়। দরজা থেকেই লীনার দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসল। এই হাসির অনেকগুলি অর্থ। আট বছর পাশাপাশি থাকায় লীনা এখন সব ক'টি অর্থ ধরতে পারে। অর্থগুলি হচ্ছে.... দেরির জন্যে আমি লজ্জিত, সারাদিনের পরিশ্রমে আমি খানিকটা ক্লান্ত এবং একটা খারাপ খবর আছে।

আসিফকে ঠিক সুপুরুষ বলা যাবে না। শক্ত সমর্থ গড়ন। মাথা ভর্তি অগোছালো কোঁকড়ানো চুল। চোখ দু'টি ছোট, ঠোঁট বেশ পুরু। চওড়া কাঁধ। সব কিছু মিলিয়েও আলাদা কিছু আকর্ষণ তার মধ্যে আছে।

লীনা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। আট বছর এর সঙ্গে বিবাহিত জীবন কাটানোর পরেও এই মানুষটাকে দেখলে তার মধ্যে তরল অনুভূতি হয়। পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে।

আসিফকে ঢুকতে দেখেই বজলু সাহেব চায়ের কাপ নামিয়ে হুংকার দিলেন, 'স্টার্ট কর। দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে শুরু হবে। আজ কোনো প্রম্পটিং হবে না। একবার ডায়ালগ ভুলে গেলে পাঁচ টাকা করে জরিমানা। আসিফ যাও স্টেজে উঠে পড়। তোমরা চেয়ার আর টেবিল দাও, বাঁ দিকে একটু পেছনে। দর্শকরা যেন শুধু সাইড ভিউ পায়।'

মিজান বলল, 'পেছনের চৌকির পশ্চিম দিকের কোণায় একটা ভাঙা আছে। খেয়াল রাখবেন কাইন্ডলি।'

আসিফ বলল, 'এক কাপ চা খেয়ে নিই বজলু ভাই। খুব টায়ার্ড ফিল করছি।'

'এক চুমুকে চা শেষ কর। কুইক। সাতদিন পর শো, অথচ এখনো একটা দিন ফুল রিহার্সেল দিতে পারলাম না।'

লীনা ভেবেছিল আসিফ চায়ের পেয়ালা হাতে তার পাশে এসে দাঁড়াবে। টুকটাক কিছু কথাবার্তা বলবে। তা সে করল না। চায়ের কাপ হাতে প্রণবকে নিয়ে বারান্দায় চলে গেল। আসিফ নিজের বাসার বাইরে এলে স্ত্রীর সঙ্গে কেমন যেন আলগা একটা ব্যবহার করে। যেন সে লজ্জা পায়।

পুষ্প বলল, 'চায়ের কাপ হাতে বারান্দার দিকে যে গেলেন, উনি কি এই নাটকের নায়ক?'

লীনা হেসে বলল, 'তার চেহারাটা কি তোমার কাছে নায়কের মত মনে হল?'

'না, তা না।'

'হ্যাঁ, এ-ই নায়ক। নাটকের শুরুটা বলি, তোমার ভাল লাগবে। এক জন বিখ্যাত লেখকের উপন্যাস থেকে নাটক করা। গল্পটা খুব চমৎকার। শুনতে চাও?'

'হ্যাঁ চাই।'

'এই নাটকের নায়ক হচ্ছেন একজন লেখক। নতুন বিয়ে করেছেন। স্ত্রীর দিকে তার যতটা সময় দেয়া দরকার ততটা দিতে পারছেন না। রাত দশটার পর উনি লেখার খাতা নিয়ে বসেন। স্ত্রী বেচারী একা একা শুয়ে থাকে। মেয়েটির বয়স খুব কম, এই ধর আঠারো-উনিশ। তার খুব ইচ্ছে করে স্বামীর সঙ্গে রাত জেগে গল্প করতে। স্বামী বেচারা তা বুঝতে পারে না। সে তার উপন্যাস নিয়ে ব্যস্ত। ঘটনাটা শুরু হয়েছে এক রাতে। স্বামী লিখছে। হঠাৎ ঝড় বৃষ্টি শুরু হল। ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। লেখকের স্ত্রী একটা জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে বসার ঘরে ঢুকল।'

'লেখকের নাম কী?'

'পুরো নাটকে লেখকের কোনো নাম নেই। তাকে সব সময় লেখক বলা হয়েছে, তবে লেখকের স্ত্রীর নাম হচ্ছে জরী।'

'আপনি হচ্ছেন লেখকের স্ত্রী, তাই না?'

'হ্যাঁ। কি করে বুঝলে?'

'আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল।'

নাটক শুরু হল। স্টেজের এক প্রান্তে লেখার টেবিল। চেয়ারে পা তুলে আসিফ বসে আছে। বজলু সাহেব বললেন, 'চেয়ারে পা তুলে বসেছে কেন? এটা কি রকম বসা?'

আসিফ বলল, 'ঘরোয়াভাবে বসেছি বজলু ভাই। খুব রিলাক্সড হয়ে বসা। পা নামিয়ে ঠিকঠাক মত বসলে ফর্মাল একটা ভাগ চলে আসে।'

'দেখতে ভাল লাগছে না। দেখতে ভাল লাগার একটা ব্যাপার আছে। দর্শক হিসাবে জিনিসটা দেখতে ভাল লাগতে হবে। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি...'

বজলু সাহেব কথা শেষ করলেন না। আসিফ বলল, 'বজলু ভাই আমি চাচ্ছি যেন আমাকে ভালো না লাগে। লেখকের সব কাণ্ডকারখানায় তার স্ত্রী যেমন বিরক্ত...আমি চাই দর্শকরাও যেন ঠিক তেমনিভাবে বিরক্ত হয়।'

বজলু সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'তুমি পা নামিয়ে বস।' আসিফ পা নামাল।

'বা হাতে মাথা হেলান দিয়ে লিখতে শুরু কর।'

পুষ্প মুগ্ধ হয়ে দেখছে। মুগ্ধ হয়ে দেখার মতই ব্যাপার। একজন লেখক গভীর আগ্রহ নিয়ে লিখছেন এটা এত সুন্দর বোঝা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে লেখা থেমে যাচ্ছে, আবার শুরু হচ্ছে। লেখক একটা সিগারেট মুখে দিলেন। দেশলাই দিয়ে সিগারেটে আগুন ধরাতে গিয়ে ধরালেন না। নতুন কিছু মাথায় এসেছে। দেশলাই ফেলে কলম তুলে নিয়ে আবার ঝড়ের বেগে লিখতে শুরু করেছেন—এমন সময় বাতি নিভে গেল। লেখক কি প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়েই না তাকাচ্ছেন টেবিল ল্যাম্পটার দিকে। লেখকদের প্রতি সহানুভূতিতে পুষ্পের চোখে প্রায় পানি এসে যাচ্ছে। এমন সময় দেখা গেল লেখকের স্ত্রী জরী আসছে। তার হাতে মোমবাতি। বাতাসের ঝাপটা থেকে বাতি আড়াল করে আসছে। তার মুখে কেমন যেন দুষ্টু দুষ্টু হাসি। পুষ্প দেখছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছে। লেখক কথা বললেন। কি চমৎকার ভরাট গলা। স্বপ্ন মাখা স্বর।

লেখক : জরী তুমি এখনো জেগে আছ?

জরী : ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ শুনি খাটের নিচে খুট খুট শব্দ হচ্ছে। কে যেন আবার

খুক খুক করে কাশল। পুরুষ মানুষের কাশি। ভয়ে আমি অস্থির। খাটের নিচে কে যেন বসে আছে।

লেখক : আবার আজেবাজে কথা শুরু করেছ?

জরী : মোটেই কোনো আজেবাজে কথা না। আমার মনে হচ্ছে আমাদের খাটের নিচে একটা ভূত থাকে। পুরুষ ভূত। ভূতটার গায়ে তামাকের গন্ধ।

লেখক : জরী, তুমি দয়া করে মোমবাতিটা এখানে রেখে ঘুমিয়ে পড়। প্লিজ, প্লিজ...এই দেখ হাতজোড় করছি।

জরী : ঝড় বৃষ্টির রাতে একা একা ঘুমুব? ভূতটা যদি আমাকে কিছু করে। ওর মতলবটা আমার কাছে বেশি ভাল মনে হচ্ছে না।

লেখক : তোমার সঙ্গে ঘুমুতে পারলে আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু তুমি একটা জিনিস বুঝতে পারছ না... লেখালেখির একটা মুডের ব্যাপার। মুড সব সময় আসে না।

জরী : এখন এসেছে?

লেখক : হ্যাঁ এসেছে। সারারাত আমি লিখব।

জরী : আর আমি সারারাত ঐ ভূতটার সঙ্গে ঘুমুব?

লেখক : আমি একটা ক্লাইমেক্সে এসে থেমে আছি। আমার নায়ক অভাবে অনটনে পর্যুদস্ত। বেকার, হাতে একটা পয়সা নেই। সকালবেলা খবর পেয়েছে তার প্রেমিকার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। সে ঠিক করেছে আত্মহত্যা করবে...।

জরী : এখনো করেনি?

লেখক : না করেনি। তবে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখন পথে পথে ঘুরছে।

জরী : সিদ্ধান্ত যখন নিয়েই ফেলেছে তাহলে আর দেরি করছ কেন? কোনো একটা ট্রাকের নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। ঝামেলা চুকে যাক। আমরা আরাম করে ঘুমুতে যাই।

লেখক : বড্ড যন্ত্রণা করছ জরী।

জরী : আমি আর কত যন্ত্রণা করছি? তোমার নায়ক অনেক বেশি যন্ত্রণা করছে। স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েও পথে পথে ঘুরছে। এত ঘোরার দরকার কিরে ব্যাটা? লাফ দিয়ে কোনো একটা ট্রাকের নিচে পড়ে যা। ঢাকা শহরে কি ট্রাকের অভাব?

লেখক : (কড়া স্বরে) জরী।

জরী : আচ্ছা ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। যদি চাও তো এক কাপ চা বানিয়ে দিতে পারি।

লেখক : এই মুহূর্তে আমি একটা জিনিস চাই, তা হচ্ছে নীরবে কাজ করার স্বাধীনতা।

জরী : বেশ স্বাধীনতা দিচ্ছি। স্বাধীনতার সঙ্গে এক কাপ চাও দিয়ে যাচ্ছি।

পুষ্প দেখল জরী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বামীর কাছ থেকে চলে আসছে। ঢুকেছে রান্নাঘরে। চা বানাচ্ছে। চা বানাতে বানাতে তার চোখে পানি এসে গেল। সে চোখে আঁচল দিয়ে খানিক্ষণ কাঁদল তারপর চায়ের কাপ হাতে বসার ঘরে ঢুকল।

বজলু সাহেব চেঁচিয়ে বললেন, 'স্টপ'। অভিনয় থেমে গেল। বজলু সাহেব বিরক্ত গলায় বললেন, 'পুরো ব্যাপারটা স্লো হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই নাটক স্লো। এরকম একটা স্লো নাটকে তার চেয়েও স্লো এ্যাকশন পাবলিক মোটেও একসেপ্ট করবে না। চা বানানোর জন্য পাশের ঘরে যাওয়া মানেই নাটক স্লো করে দেয়া। জরী, তোমাকে লেখকের পাশেই থাকতে হবে। ঐ ঘরেই ফ্লাস্কে চা বানানো আছে। তুমি শুধু ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দেবে।'

লীনা বলল, 'বজলু ভাই একটা সমস্যা আছে তো। ইমোশন বিল্ড আপ করার জন্যে আমার কিছু সময় দরকার। এই সময় তো আমি পাচ্ছি না।'

'যা করার সময়ের মধ্যেই করতে হবে।'

'এত অল্প সময়ে চোখে পানি আনতে পারব বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'পারবে। অবশ্যই পারবে। না পারলেও ক্ষতি নেই। সাজেসানের ওপর দিয়ে কেটে বের হয়ে যাবে। নাও শুরু কর। স্টার্ট। লেখকের পাশে তুমি দাঁড়িয়ে আছ। শান্ত ভঙ্গিতে বলছ বেশ স্বাধীনতা দিচ্ছি। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এক কাপ চা দিয়ে যাচ্ছি। ওকে স্টার্ট। জরী, ডেলিভারি এত সফট দিও না। একটু হার্ড দিও।'

অভিনয় শুরু হল। লেখক একমনে লিখছেন। জরী ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালতে ঢালতে লেখকের দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। তার মন বিষাদে ভারাক্রান্ত। এক সময় টপ টপ করে চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। পুষ্প অবাক হয়ে দেখল কত সহজে মেয়েটির চোখে পানি এসে গেছে। এটা যেন অভিনয় নয়। বাস্তব জীবন। স্বামীসঙ্গ কাতর একটি মেয়ের অভিমানের অশ্রু। লেখক চোখ তুলে তাকালেন এবং অবাক হয়ে বললেন --

লেখক : কি হয়েছে, চোখে পানি কেন?

জরী : (চোখ মুছতে মুছতে) আমার খুব বাজে একটা চোখের অসুখ হয়েছে। রাত হলে চোখ কড় কড় করে, চোখ দিয়ে পানি পড়ে।

লেখক : পল্টুকে একবার দেখাও না কেন?

এই বলেই লেখক আবার লিখতে শুরু করেছেন।

জরী চলে আসছে। দরজার পাশে এসে থমকে দাঁড়াল। জরী তাকিয়ে আছে লেখকের দিকে। লেখক একমনে লিখছেন। জরীর চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

পুষ্প বুঝতেও পারেনি যে তার চোখ দিয়েও পানি পড়তে শুরু করেছে। মেয়েটির কষ্টে তার বুক ভেঙে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে সে এক্ষুণি চেঁচিয়ে লেখককে বলবে—পাষণ্ড কোথাকার। সে কিছুই বলতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল। সবাই অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। তার খুবই খারাপ লাগছে, কিন্তু সে চোখের পানি থামাতে পারছে না। আসিফ এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে।

আসিফ বলল, 'তোমার নাম কি?'

পুষ্প ধরা গলায় বলল, 'আমার নাম দিয়ে আপনার কোনো দরকার নেই।'

এটা সে কেন বলল কে জানে? লেখকের ওপর তার অসহ্য রাগ লাগছিল। এই রাগের জন্যেই হয়তো বলেছে। এখন আবার তার জন্যে খারাপ লাগছে।

হলঘরের ভেতর অসহ্য গরম।

বাইরে এসে একটু আরাম লাগছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। লীনা হালকা গলায় বলল, 'বৃষ্টি হবে নাকি?' আসিফ জবাব দিল না। মনে হচ্ছে সে অন্য কিছু ভাবছে।

লীনা বলল, 'কিছু ভাবছ নাকি?'

'না।'

'বড্ড পানির তৃষ্ণা পেয়েছে। ঠাণ্ডা কিছু খেলে কেমন হয়?'

'ভালই হয়।'

তারা দুজন কনফেকশনারি দোকানে ঢুকল। লীনার কি যে একটা বলার কথা, অথচ কিছুতেই মনে পড়ছে না। মাঝে মাঝে তার এ রকম হয়। খুব জরুরি কথা, যেটা না বললেই নয়— অথচ মনে পড়ে না।

'লীনা।'

'কি?'

টিভিতে একটা অফার পেয়েছি, যাব কি না বুঝতে পারছি না।'

'যাবে না কেন?'

'কখনো করিনি তো। বুঝিও না। তাছাড়া...।

'তাছাড়া কি?'

'রোলটা খুব ছোট। নায়কের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। নায়কের কাছে দু'বার টাকা ধার চাইতে আসে। এই পর্যন্তই। অভিনয়ের কোনো স্কোপ নেই।'

'তা হলে যাবে কেন? তোমার মত এত বড় অভিনেতা। তুমি যদি টিভিতে যাও সুপার স্টার হয়ে যাবে।'

আসিফ হাসল। লীনা বলল, 'আমি মোটেও হাসির কথা বলিনি। তুমি হচ্ছ সুপার সুপার স্টার। তুমি নিজেও সেটা খুব ভালো করেই জান। জান না?'

আসিফ জবাব দিল না। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা বেশ উঁচু। সে খুব ভাল করেই জানে তার

ক্ষমতা কতটুকু। তার আশপাশে যারা আছে তারাও জানে। ক্ষমতা যেমন কাজে আসছে না। তাদের দলটা ছোট...অভিনেতা-অভিনেত্রী তেমন নেই। মঞ্চে যেদিন শো হয়, সেদিন অডিটোরিয়াম প্রায় ফাঁকা থাকে। বড় কোনো দলে যদি সুযোগ পাওয়া যেত। তবে দলটির প্রতি তার মমতা আছে। এরা তার জন্যে অনেক করেছে। প্রথম বারেই প্রধান চরিত্র তাকে দিয়েছে। অন্য কোনো দল তা করত না।

লীনা বলল, 'তুমি কোনো কিছু নিয়ে খুব চিন্তা করছ বলে মনে হচ্ছে।'

'না তা করছি না। কোক শেষ হয়েছে? চল রওনা দিই। বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে।'

লীনা বলল, 'কিছুক্ষণ হাঁটি, তারপর রিক্সা নেব। হাঁটতে ভাল লাগছে।'

'বেশ তো চল হাঁটি।'

লীনা ছোট ছোট পা ফেলে হাঁটছে। সে আসিফের হাত ধরে আছে। রিহার্সেলের সময় খুব ক্লান্তি লাগছিল। এখন বেশ ভালো লাগছে। আসিফ ঘড়ি দেখল— রাত দশটা। আশপাশে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ছিনতাই পার্টির সামনে না পড়লেই হল।

লীনা বলল, 'তোমাকে কি একটা জরুরি কথা বলতে যাচ্ছিলাম, এখন আর কিছুতেই মনে পড়ছে না।'

'তাহলে বোধ হয় তেমন জরুরি নয়।'

'না, জরুরি। খুব জরুরি। আমার মাথায় কি যেন হয়েছে বুঝলে— কিছু মনে থাকে না। ব্রেইন টিউমার ফিউমার কিছু একটা হয়েছে।'

আসিফ তার জবাব দিল না। সিগারেট ধরাল। হাত ইশারা করে খালি রিকশা ডাকল। ক্লান্ত গলায় বলল, 'আর হাঁটতে পারছি না, চল রিকশায় উঠি। তোমার জরুরি কথাটা মনে পড়েছে?'

'না। তুমি যখন আশপাশে থাকবে না তখন হয়ত মনে পড়বে। আমি ঠিক করেছি মনে পড়লেই একটা কাগজে লিখে ফেলব। কাগজটা থাকবে আমার ব্যাগে।'

'বুদ্ধিটা খারাপ না।'

রিকশা দ্রুত চলছে। হাওয়ায় লীনার শাড়ির আঁচল উড়ছে। লীনা শাড়ির আঁচল সামলাতে সামলাতে বলল, 'এক সময় আমরা একটা গাড়ি কিনব, বুঝলে। তারপর রোজ রাতে গাড়িতে ঘুরব। তুমি চালাবে। আমি তোমার পাশে থাকব।'

আসিফ জবাব দিল না। লীনা যখন কথা বলে তখন সে বেশির ভাগ সময় চুপচাপ থাকে। বিয়ের প্রথম দিকে লীনার অসুবিধা হত। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। আসিফ কথা না বললেও তার অসুবিধা হয় না।

'আজ রিহার্সেলে নতুন মেয়েটাকে দেখেছ? পুষ্প নাম।'

'হ্যাঁ দেখলাম। কথাও তো বললাম। অভিনয় না কি পারে না, বজলু ভাই বলছিলেন।'

'মেয়েটা অভিনয় দেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।'

'হুঁ।'

'এই দেখে তোমার কোনো স্মৃতি মনে পড়েনি?'

'কোন স্মৃতি?'

'একটু মনে করে দেখ।'

আসিফ তেমন কিছু মনে করতে পারল না। লীনার খানিকটা মন খারাপ হল। সে চাপা গলায় বলল, 'তোমার সঙ্গে ঠিক এইভাবে আমার পরিচয় হয়েছিল। মনে আছে? ময়মনসিংহ টাউন ক্লাবে নাটক করছিলে। তুমি হলে মধু পাগলা। মনে আছে?'

'আছে।'

'তোমার ছেলে মরে গেছে, তার ডেডবডি নিয়ে তুমি যাচ্ছ। আপন মনে কথা বলছ। অভিনয় যে এত সুন্দর হতে পারে ঐদিন প্রথম বুঝলাম কেঁদে-কেটে একটা কাণ্ড করেছি। শেষে বাবা আমাকে হলের বাইরে নিয়ে যান। তখনো আমি ফোঁপাচ্ছিলাম। তোমার কিছু মনে নেই, তাই না।'

'মনে থাকবে না কেন? মনে আছে— নাটকটা সুবিধার ছিল না। মেলোড্রামা। খুবই দুর্বল সংলাপ।'

রিকশা গলির মোড়ে থামল। জায়গাটা হচ্ছে শান্তিবাগ। গলির ভেতর তিনতলা বাড়ির দোতলায় তারা থাকে। একটাই ফ্ল্যাট। দু'টি পরিবার শেয়ার করে। কমন রান্নাঘর। তবে তাতে তেমন

অসুবিধা হয় না।

বাড়ির গেটের কাছে এসে আসিফ থমকে দাঁড়াল। বিব্রত গলায় বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে আর যাচ্ছি না। সকালে ফিরব।'

লীনা অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে!'

'শেলীর এ্যাপিন্ডিসাইটিস অপারেশন হবে রাত এগারটায়। থাকা দরকার। দুলাভাই চিটাগাং গেছেন। বড় আপা একা।'

'এতক্ষণ এটা আমাকে বলনি কেন?'

'এই তো বললাম।'

'চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।'

'তোমার যাওয়ার দরকার নেই। তুমি বিশ্রাম নাও। তোমার শরীর খারাপ— রেস্ট দরকার।'

'আমার শরীর খারাপ তোমাকে বলল কে?'

'কয়েক রাত ধরেই তো ঘুমুতে পারছ না। যতবার উঠি, দেখি চুপচাপ বিছানায় বসে আছ।'

লীনা বলল, 'বেশ তো যাবে যাও— ভাত খেয়ে যাও।'

'ভাত খাব না। একদম খিদে নেই। সন্ধ্যাবেলা ভাজাভুজি কি সব খেয়েছি, টক ঢেকুর উঠছে। যাই লীনা।'

লীনা বেশ মন খারাপ করে গেটের কাছে দাঁড়িয়ে রইল। জরুরি কথাটা এখন তার মনে পড়েছে। চেঁচিয়ে ডাকবে আসিফকে? ডেকে বলবে জরুরি কথাটা? ডাকাটা কি ঠিক হবে? এখন মনে হচ্ছে কথাটা তেমন জরুরি নয়।

দোতলার ফ্ল্যাটটা লীনারা যাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকছে, তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা তিন। স্বামী স্ত্রী এবং তিন বছর বয়েসি একটি মেয়ে। একজন কাজের ছেলে আছে, সে বেশির ভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটায়। পরিবারের কর্তা হাশমত আলি বেশ বয়স্ক লোক। চল্লিশের মতো বয়স। আগে একবার বিয়ে করেছিলেন। ঐ পক্ষের দু'টি মেয়ে আছে। মেয়েরা তাদের নানার বাড়িতে থাকে। নানার বাড়ি টঙ্গীতে। মাঝে মাঝে আসে, সারাদিন থেকে সন্ধ্যাবেলা চলে যায়। হাশমত সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী বেনু। এই মেয়েটার বয়স খুবই কম। পনেরো-ষোল হওয়া বিচিত্র নয়। গ্রামের মেয়ে। তবে শহরে চাল-চলন দ্রুত আয়ত্ত করে ফেলেছে। মেয়েটি সুন্দরী, তাবে বাচ্চা হবার পর গাল-টাল ভেঙে গেছে। বাচ্চাটা মায়ের কোল ছাড়া থাকতেই পারে না। বেনুকে সারাদিন বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘুরতে হয়। লীনাকে সে খুবই পছন্দ করে। যতক্ষণ লীনা বাসায় থাকে বেনু তার পেছনে থাকে। ব্যাপারটা লীনার পছন্দ না হলেও কিছু বলে না। এই সাদাসিধা অল্প বয়েসী মেয়েটাকে লীনার ভালই লাগে। সেই তুলনায় হাশমত আলিকে তার একেবারেই ভাল লাগে না। লোকটার সব কিছু কেমন যেন গ্রাম্য। রেলের বাঁধা মাইনের চাকরিতেও তার রোজগার সন্দেহজনকভাবে ভাল। তবে তার ব্যবহার ভাল। গত মাসে সে একটা ফ্রিজ কিনেছে এবং লীনাকে বলেছে, 'কিছু এরিয়ার টাকা পেলাম, তারপর প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নিলাম, তারপর কিনে ফেললাম। একটা সখ ছিল ভাবী।'

লীনা বলল, 'ভাল করেছেন।'

'এখন আরাম করে ঠাণ্ডা পানি খেতে পারবেন। হা হা হা। বেনু, ভাবীকে একটা পেপসি দাও।'

'এখন থাক।'

'না ভাবী খান। খেতে হবে। এটা ভাবী আপনি নিজের ফ্রিজ ভাববেন। রিকোয়েস্ট। বেনু শোন, নিচের একটা তাক ভাবীর। খবরদার কিছু রাখবে না। যদি দেখি তোমার কিছু আছে তাহলে অসুবিধা আছে। জিনিসটা কেমন কিনলাম ভাবী?

'খুব ভাল। খুব সুন্দর।'

'অনেকগুলি টাকা চলে গেল, তবু সখের একটা জিনিস, তাই না ভাবী?'

'তা তো বটেই।'

হাশমত আলির মধ্যেও এক ধরনের সরলতা আছে। এটা লীনার ভাল লাগে।

এরা সুখেই আছে। নিজেদের নিয়ে আনন্দে আছে। পৃথিবী সমাজ-টমাজ এইসব নিয়ে বিন্দুমাত্র

মাথাব্যথা নেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসে এরা গভীর আনন্দ খুঁজে পায়। প্রায়ই দেখা যায় অনেক রাত হাশমত আলি বড়-সড় একটা মাছ কিনে এনেছে। বেনু সেই মাছ কাটছে। হাশমত আলি উবু হয়ে তার সামনে বসে আছে। মাছটা কি রকম, সেই নিয়ে গবেষণা হচ্ছে।

'পুকুরের মাছ, কি বল বেনু? রঙটা কেমন কালো দেখ না। শ্যাওলার নিচে থেকে কালো হয়ে গেছে। নদীর মাছ হলে লাল হত। তেলটা ঠিক আছে কি না দেখ তো।'

'ঠিক আছে।'

'তেল দিয়ে বড়া বানাতে পারবে। মাছের তেলের বড়া – তার স্বাদই অন্য রকম। দুটো বড় করে পিস কাট। ভেজে লীনা ভাবীদের দিয়ে এস।'

'ওরা বোধ হয় শুয়ে পড়েছে। সকালে দেব।'

'আরে না এখনই দাও। টাটকা জিনিসের একটা আলাদা ব্যাপার আছে।'

গভীর রাতে প্লেটে ভাজা মাছ নিয়ে হাশমত আলি নিজেই দরজা ধাক্কায় 'ভাবী ঘুমিয়ে পড়লেন না কী? ও ভাবী, ভাবী।'

পরিষ্কার বোঝা যায় এই পরিবারটি লীনাদের বেশ পছন্দ করে। কেন করে সেও এক রহস্য। এতদিন একসঙ্গে আছে, এর মধ্যে একদিনও নাটক দেখার ব্যাপার কোনো আগ্রহ দেখায়নি। হাশমত আলি অবশ্যি প্রায়ই বলে, 'একদিন যাব। বুঝলেন ভাবী, আপনাদের কাণ্ড কারখানা দেখে আসব। মেয়েটাকে নিয়ে হয়েছে মুশকিল। সারাক্ষণ ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে। বাচ্চা নিয়ে কী যাওয়া যায় ভাবী? বেনুকে একদিন নিয়ে দেখাব। গ্রামের মেয়ে, কিছু তো এই জীবনে দেখেনি।'

সিঁড়ির বাতি বোধ হয় আবার চুরি হয়েছে। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে উঠতে হচ্ছে। একটা সিঁড়ি আছে ভাঙা। বাড়িওয়ালাকে কতবার বলা হয়েছে। এখনো কিছু করছে না।

দরজা খুলে দিল বেনু। অবাক হয়ে বলল, 'এত রাতে একা একা আসলেন ভাবী!'

'না একা না। তোমার ভাই নামিয়ে দিয়ে গেছে।'

'ভাই আবার গেলেন কই?'

'তার এক ভাগ্নির অপারেশন।'

'ও আল্লা! কী হইছে?'

কী হয়েছে লীনা নিজেও ভালমতো জানে না। জানা উচিত ছিল। কথাবার্তা শুনে হাশমত বেরিয়ে এল। হাসিমুখে বলল, 'একটা ভিসিপি ভাড়া করে নিয়ে এসেছি ভাবী।'

'তাই নাকি?'

'তিনশ' টাকা দিয়ে এক সপ্তাহের জন্যে ভাড়া করলাম। মনের সখ মিটিয়ে ছবি দেখব।'

'ভালই তো।'

'খাওয়া-দাওয়া করে আসেন। একসঙ্গে দেখি— এগারোটা ছবি এনেছি। সব ভাল ভাল ছবি। আসিফ ভাই কই?'

'ওর এক ভাগ্নিকে দেখতে গেছে। ভোরবেলা আসবে।'

'আমি ভাবী দু'দিনের ছুটি নিয়ে নিয়েছি। ক্যাজুয়েল লিভ। দিনরাত ছবি দেখব।'

'ভাল। দেখুন।'

'আপনি ভাত খেয়ে আসুন। একা একা ছবি দেখে সুখ নেই ভাবী।'

প্লেটে ভাত নিয়ে লীনা শোবার ঘরে চলে এসেছে। লীনার পেছনে পেছনে ঢুকেছে বেনু। ভাত খাওয়া হলে জোর করে তাকে ছবি দেখাতে নিয়ে যাবে। লীনার চোখ ঘুমে জড়িয়ে যাচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে তাকে ছবি দেখতেই হবে।

'ভাবী?'

'কী বেনু।'

'আপনি এত কাজ সারাদিনে ক্যামনে করেন তাই ভাবি। দিনে স্কুল। রাতে নাটক থিয়েটার।'

'তুমিও তো অনেক কাজ কর। ঘরের সব কাজ সামলাও, বাচ্চা দেখ। বাচ্চা কী ঘুমিয়ে পড়েছে?'

'জি। অনেক কষ্টে ঘুম পাড়াইছি। এরে একটা তাবিজ-টাবিজ দিতে হইব ভাবী।'

'তুমি কোলে নিয়ে নিয়ে মেয়েটাকে নষ্ট করেছ বেনু।'

'তাও ঠিক।'

'বেনু তৃপ্তির হাসি হাসল। যেন সে মেয়েকে নষ্ট করায় খুব আনন্দিত। সব মায়েরা যা পারে না সে তা পেরেছে।

'ভাবী।'

'বল।'

বেনু ইতস্তত করে বলল, 'একটা শরমের কথা ভাবী। খুকির আব্বা কেমুন একটা ছবি আনছে। অসভ্য কাণ্ডকারখানা। দেখলে শইল ঝিম-ঝিম করে।'

'না দেখলেই হয়।'

'আমি খুকির আব্বারে বলছি – এই ছবি দেখলে পাপ হইব। সে খালি হাসে। এইসব ক্যামনে বানায় আফা?'

'জানি না বেনু।'

লীনাকে ছবি দেখার জন্যে বসতে হল। দিদার নামের কী একটা পুরনো সিনেমা হচ্ছে। হিন্দী প্রতিটি বাক্য হাশমত আলি অনুবাদ করে দিচ্ছে। খুব বিরক্তিকর ব্যাপার। প্রচণ্ড ঘুমে শরীর আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

ছবি মাঝপথে রেখে লীনা উঠে এল। আর আশ্চর্য, বিছানায় শোয়ামাত্র ঘুম উধাও। লীনা অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করল। মাথায় পানি দিয়ে এল, লাভ হল না। এই রাতটাও সম্ভবত অঘুমে কাটাতে হবে। এ রকম হচ্ছে কেন? তার মনে কি কোনো গোপন দুঃখ আছে? কোনো হতাশা আছে? থাকার তো কথা নয়। তাহলে এ রকম হচ্ছে কেন?

বাবার অভিশাপ লাগল নাকি?

লীনার বাবা ডিস্ট্রিকট জাজ ওয়াদুদুর রহমান সত্যি সত্যি মেয়েকে অভিশাপ দিয়েছিলেন। জাজ শ্রেণীর মানুষরা কখনো খুব বেশি রাগতে পারেন না। কিন্তু তিনি রেগে গিয়েছিলেন। রাগে অন্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'কি আছে ঐ ছেলের? অভিনয় করে। অভিনয়টা আবার কি? অভিনয় হচ্ছে অনুকরণ। একটা বানরও অনুকরণ করে। তাই বলে একটা বানরকে বিয়ে করা যায়?'

লীনা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'এসব তুমি কী বলছ বাবা?'

ওয়াদুদুর রহমান সাহেব রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'যা বলেছি ঠিকই বলেছি। ঐ ছেলের আর আছে কী? ঘাড়ে-গর্দানে এক ছেলে। থার্ড ক্লাস পেয়েছে বি.এ.তে। ব্যাংকে চাকরি করে। ঐ চাকরির বেতন কত তুই জানিস? এগারোশ টাকা। এগারোশ টাকা দিয়ে ও নিজে খাবে, না তোকে খায়োবে? নাকি না খেয়ে থাকবে আর অভিনয় করে দেখাবে যে খুব খাওয়া হল?'

'ছিঃ, বাবা, এই ভাবে কথা বল না।'

'আমার যা বলার আমি বললাম। এখন তোর যা ইচ্ছা করবি। তোর স্বাধীন ইচ্ছায় আমি বাধা দেব না। তবে এই বাড়িতে বিয়ে হবে না। বিয়ের খরচ আমি দেব। সেই টাকা আলাদা করা।'

'তোমার টাকা আমার লাগবে না বাবা।'

'নাটকের লোক বিয়ে করার আগেই নাটকের সংলাপ শুরু করেছিস। জীবন নাটক না, এটা হাড়ে-হাড়ে টের পাবি। জীবন এক সময় অসহ্য বোধ হবে।'

'অভিশাপ দিচ্ছ?'

'সত্যি কথা বলছি। মাঝে মাঝে সত্যি কথা অভিশাপের মত মনে হয়।'

লীনার বিয়ে হল বড় খালার বাড়িতে। সেই বিয়েতে ওয়াদুদুর রহমান সাহেব এলেন না। তবে লীনার ধারণা তার বাবার অভিশাপ লাগেনি। তারা সুখী। প্রচণ্ড সুখী। টাকা-পয়সার কষ্ট তো আছেই। এই কষ্ট তেমন কোনো কষ্ট নয়। সহনীয় কষ্ট। অসহনীয় কষ্ট হচ্ছে ভালবাসার অভাবের কষ্ট। সে কষ্ট লীনাদের হয়নি। লীনা এখনো তার স্বামীর প্রতি তীব্র ভালবাসা বোধ করে। ভালবাসা কখনো একপক্ষীয় হয় না। আসিফও নিশ্চয়ই তার প্রতি সমপরিমাণ ভালবাসা লালন করে। কিন্তু সত্যি কী করে?

লীনা উঠে পড়ল। আবার মাথায় কিছু পানি দিল। পাশের ঘরে ভিসিপি চলছে। যুগল সংগীত। সুর বেশ সুন্দর। কথাগুলির মানে কী কে জানে ও মেরা পানছেরি।

পানছেরি শব্দের মানে কি? হাশমত সাহেবকে কাল একবার জিজ্ঞেস করতে হবে। মনে থাকলে হয়। আজকাল কিছু মনে থাকে না।

বেনুর বাচ্চা জেগে উঠেছে। কাঁদছে ট্যাঁ ট্যাঁ করে। বেনু তাকে নিয়ে বারান্দায় হাঁটছে আর

বলছে, 'ও খুকি কান্দে না। ও খুকি কান্দে না।'

কি বিশ্রী নাম-- খুকি। এর পর যদি ছেলে হয় হয়ত নাম রাখবে খোকা।

লীনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তাদের প্রথম মেয়ের নাম সে রেখেছিল লোপামুদ্রা, পরের মেয়েটি নাম ত্রপা। ওরা কোথায় গেল? মৃত্যুর পর শিশুরা কোথায় যায়? সেই দেশে একা একা ওরা কী করে? বাবা মা'র জন্যে অপেক্ষা করে কি? একদিন লীনা যখন যাবে ওরা কি তখন সেই ছোটটিই থাকবে না বড় হয়ে যাবে? যদি ছোট থাকে তাহলে কি চিনতে পারবে মা'কে? মা মা বলে ছুটে আসবে তার দিকে? যদি ছুটে আসে তাহলে কাকে সে প্রথমে কোলে নেবে? লোপাকে না ত্রপাকে?

লীনার বুক জ্বালা করছে। সে দরজা খুলে বারান্দায় এল। বেনু বলল 'ঘুমান নাই আফা?'

'না।'

'দেখেন না কী বিরক্ত করে। ইচ্ছে করতাছে একটা আছাড় দেই।'

'ছিঃ এসব কী কথা। দেখি আমার কাছে দাও তো।'

বেনু তার মেয়েকে লীনার কাছে দিল। মেয়েটির কান্না থামল না। লীনা বলল, 'গরম লাগছে বোধ হয়, জামাটা খুলে দেব?'

'দেন।'

'মেয়ের তো খুব ঘামাচি হয়েছে। আমার ঘর থেকে পাউডার নিয়ে এস তো বেনু, পাউডার দিয়ে দিই।'

গায়ে পাউডার দেয়াতে হয়ত একটু আরাম হয়েছে। খুকি ঘুমিয়ে পড়েছে। হাত-পা ছড়িয়ে ঘুম। মেয়েটা দেখতে সুন্দর হয়নি। বাবার মত ভোঁতা ধরনের চেহারা। দাঁতগুলিও সম্ভবত উঁচু তবু কী সুন্দরই না লাগছে। মানব শিশুর মত সুন্দর এ পৃথিবীতে আর কিছুই বোধ হয় নেই।

লীনার খুব ইচ্ছে করছে বলে- বেনু, তোমার মেয়ে আজ থাকুক আমার এখানে। তা সে বলতে পারল না। সহজ গলায় খুব সাধারণভাবে যা বলল তা হচ্ছে, 'নিয়ে যাও বেনু, ঘুমিয়ে পড়েছে।'

বেনু তার মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। লীনা ঠিক আগের ভঙ্গিতে খাটের উপর বসে আছে। পানি খেতে পারলে ভাল হত। বুক শুকিয়ে কাঠ, কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করছে না।

পাশের ঘরে এখনো ভিসিপি চলছে। এরা কি সত্যি সত্যি সারা রাত ছবি দেখবে নাকি' হাশমত আর বেনু দুজনেই খুব হাসছে। এ রকম হাসাহাসির মধ্যে বাচ্চা ঘুমুবে কি করে? এই সহজ জিনিসটা বোঝে না কেন?

লীন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। তার লোপার কথা মনে পড়ছে। কেমন থপ থপ করে হাঁটত। চলন্ত কোনো পোকা-টোকা দেখলেই খপ করে ধরে মুখে পুরে ফেলত। সেই মুখ তখন কিছুতেই হাঁ করান যেত না। যেন পৃথিবীর সবচে লোভনীয় খাবারটি তার মুখে। এক বছর বয়সে কত কথা শিখে গেল। কিছু কিছু কথার আবার কোনো অর্থই নেই। যেমন ইরি কিরি মিরি মিরি।

লীনা বলত, 'এসব কোন পৃথিবীর ভাষা মা?'

লোপা তাতে আরো মজা পেত। হাত নেড়ে নেড়ে আরো অনেক উৎসাহ নিয়ে বলত, 'ইরি, কিরি, মিরি মিরি,।

লীনার চোখ জ্বালা করছে। সে বিছানায় উঠে বসল। কী করা যায়? কী করলে এই মেয়েটার কথা ভুলে থাকা যায়? লোপা-ত্রপা এদের কথা সে কিছুতেই মনে করতে চায় না। কিছুতেই না।

পাশের ঘরে খুকি কাঁদছে। বেনুর বিরক্ত গলা শোনা যাচ্ছে। লীনা কী উঠে গিয়ে ওদের দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলবে, 'বেনু, ওকে আমার কাছে দিয়ে যাও।'

নাকি চুপচাপ বিছানায় বসে থাকবে।

একা একা বসে থাকতে আসিফের কখনো খারাপ লাগে না।

আজ লাগছে। সোফাটায় কোনো ঝামেলা আছে কিনা কে জানে। কোনোভাবে বসেই আরাম পাওয়া যাচ্ছে না। সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে খাওয়া যাচ্ছে না। সাইন বোর্ড ঝুলছে - ধূমপান সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। চোখের সামনে এ রকম কড়া একটা সাইন বোর্ড নিয়ে সিগারেট ধরান যায় না। তা ছাড়া ঘরে ফিনাইলের গন্ধ। এইগন্ধ নাকে এলেই কেমন যেন নিজেকে অসুস্থ মনে হয়।

আসিফ ঘড়ি দেখল, বারটা দশ। যে অপারেশন এগারোটায় হবার কথা সেটা এখন হবে রাত

একটায়। এনেসথেসিস্ট পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি নাকি কোন বিয়ে বাড়িতে গেছেন, বলে গেছেন বারোটার দিকে ফিরবেন। সেইভাবেই ব্যবস্থা হয়েছে। আসিফের বড় বোন রেহানা খুব ছটফট করছেন। একবার তিন তলায় যাচ্ছেন আবার আসছেন এক তলায়। এই ক্লিনিকটা বেশ ভাল। লিফট আছে। মাঝরাতেও লিফটম্যান আছে। রেহানা লিফটে উঠছেন না। সিঁড়ি ভেঙে ওঠা-নামা করছেন। রেহানার শরীর বিশাল, কিন্তু তাতেও তেমন অসুবিধা হচ্ছে না। শুধু মুখ টকটকে লাল হয়ে আছে এবং তিনি খুব ঘামছেন।

আসিফ বলল, 'তুমি শান্ত হয়ে বস তো আপা। এ রকম করছ কেন?'

'এনেসথেসিস্ট তো এখনও এল না। অন্য কোনো ক্লিনিকে নিয়ে যাব?'

'এসে পড়বেন। তুমি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছ। বস আমার পাশে। তোমার নিজের হার্ট এ্যাটাক হয়ে যাবে।'

রেহানা বসলেন না। ছটফটিয়ে আবার তিন তলায় রওনা হলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এনেসথিসিস্ট এসে পড়ল। এক ধরনের টেনশান আসিফের মধ্যেও ছিল। এখন আর তা নেই। আশ্চর্যের ব্যাপার, সোফায় বসতেও তার আরাম লাগতে শুরু করেছে। ঘুম-ঘুমও পাচ্ছে। এ ভাবে বসে থাকলে ঘুম এসে যেতে পারে। আসিফ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে করছে, ধরানো যাচ্ছে না। চারদিকে আত্মীয়স্বজন। ঢাকা শহরে যেখানে যে ছিল সবাই চলে এসেছে। ক্লিনিকের সামনে ছ'সাতটা গাড়ি।

আসিফদের পাঁচ বোনের চার জনই থাকে ঢাকাতে। তারা সবাই এসেছে। তাদের আত্মীয়স্বজনরা এসেছে। হুলস্থূল ব্যাপার। এদের প্রায় কাউকেই সে ভালমত চেনে না। কয়েকবার হয়ত দেখা হয়েছে, 'কি কেমন? ভাল?' এই জাতীয় কথাবার্তা হয়েছে। এর বেশি কিছু না। বোনদের স্বামীর বাড়ির লোকজনদের সে যেমন চেনে না, ওরাও চেনে না। তবু কয়েকজন চকচকে চেহারার মানুষ আসিফকে বলল, 'কি, ভালো?'

আসিফ খুবই পরিচিত ভঙ্গিতে হেসেছে। কথাবার্তা পর্ব এই পর্যন্তই।

এটা খবুই আশ্চর্যের ব্যাপার যে গার্লস হাই স্কুলের একজন দরিদ্র এ্যাসিস্টেন্ট হেড মাস্টার তাঁর পাঁচ মেয়েকেই খুব ভাল বিয়ে দিয়েছেন, অথচ মেয়েগুলি পড়াশোনা বা দেখতে শুনতে এমন কিছু না। আসিফ তার বাবা মা'র পাঁচ কন্যাব পরেব সন্তান। শুধুমাত্র এই কারণেই যতটুকু আদর তার পাওয়া উচিত ছিল তার শতাংশও সে পায়নি। আসিফের বাবা সিরাজুদ্দিন সাহেব তাঁর সর্বশেষ সন্তানকে কঠিন হাতে মানুষ করতে শুরু করলেন। তাঁর এই ছেলে যে হীরেব টুকরো ছেলে এটা তিনি সবাইকে দেখিয়ে দিতে চান। অন্য বাচ্চাবা যখন এক দুই শিখছে, তখন তাঁর ছেলে শিখছে তিনের ঘরের নামতা। ক্লাস টুতে উঠেই সে রবীন্দ্রনাথের বীরপুরুষ কবিতা গোটাটা মুখস্থ বলে লোকজনদের চমকে দিতে শিখে গেল। সিবাজুদ্দিন সাহেবও পুত্রের প্রতিভায় মুগ্ধ। বাড়িতে কেউ এলে আসিফকে তার প্রতিভার পরীক্ষা দিতে হয়। বীবপুরুষ কবিতা মুখস্থ বলবার পর সিরাজুদ্দিন সাহেব নিজেই বলেন, 'আচ্ছা বাবা, তিন আঠারো কত বল তো?'

আসিফ গম্ভীর গলায় বলে, 'চুয়ান্ন'। অতিথি চমকে উঠে বলেন, 'আঠারোর ঘরের নামতা জানে নাকি!' সিরাজুদ্দিন সাহেব উচ্চাঙ্গের হাসি হেসে বলেন, 'ইংরেজি জিজ্ঞেস করেন। বানান জিজ্ঞেস করেন। আচ্ছা বাবা, জিবাফ বানানটা কি বল তো?'

আসিফ বানান বলে। অতিথি যত না চমৎকৃত হন, বাবা হন তারচে বেশি। গম্ভীর গলায় বলেন, 'সবই হচ্ছে ট্রেনিং। যত্ন নিতে হয়। প্রপার গাইডেন্স দরকার।'

ক্লাস এইট পর্যন্ত আসিফ প্রতিটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হল। তারপর একদিন খুবই স্বাভাবিক গলায় বাবাকে এসে বলল, 'আমি আর পড়াশোনা করব না বাবা।' সিরাজুদ্দিন সাহেব হতভম্ব হয়ে বললেন, 'সে কি!'

আসিফ সহজ স্বরে বলল, 'আমার ভাল লাগে না বাবা।'

সিরাজুদ্দিন সাহেব থেমে থেমে বললেন, 'আজ আর কাল এই দু'দিন পড়তে হবে না। বিশ্রাম কর। মাঝে মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন আছে।'

'বিশ্রাম না বাবা। আমি আর পড়াশোনাই করব না।'

'টান দিয়ে কান ছিঁড়ে ফেলব হারামজাদা।'

'কান ছিঁড়ে ফেললেও পড়ব না।'

সিরাজুদ্দিন সাহেব অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

তখন তাঁর তৃতীয় মেয়ের বিয়ের আয়োজন চলছে। বাড়ি ভর্তি মেহমান। কিছু বলা বা শাসন করার মত মানসিক অবস্থা তাঁর নেই। তিনি অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। আসিফের মা চিররুগ্না মহিলা। সংসারের কোনো ব্যাপারেই তাঁর কোনো ভূমিকা নেই। তবু তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'বাদ দাও। কয়েকটা দিন যাক। ছেলে মানুষ বয়সটা দেখবে না?'

সিরাজুদ্দিন অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন আসিফ পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। সকালবেলা বের হয়। সারাদিন কোথায় কোথায় ঘোরে। স্টার ড্রামাটিক ক্লাবে নাটকেও নাকি নাম-দিয়েছে। রাত আটটা ন'টা পর্যন্ত রিহার্সেল হয়। বিহার্সেল শেষ করে সে খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাড়ি ফেরে। সিরাজুদ্দিন সাহেব ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকেন আর হতভম্ব হয়ে ভাবেন এসব কি হচ্ছে? হচ্ছেটা কি?

স্টার ড্রামাটিকে ক্লাবের এ্যানুয়েল নাটক হল জেলা স্কুলের মাঠে। বিরাট হৈচৈ। সিরাজুদ্দিন সাহেব নাটক দেখতে গেলেন। ত্রিপুরা রাজপরিবার নিয়ে জমকালো নাটক। তিন রাজকুমারের গল্প। বড় রাজকুমার, মধ্যম রাজকুমার এবং ছোট রাজকুমার। বড় এবং ছোট রাজকুমারের অত্যাচারে মধ্যম রাজকুমার জর্জরিত। একদিন তার দুচোখ নষ্ট করে দিয়ে দুই ভাই তাকে গভীর বনে ফেলে দিয়ে এল। ক্লান্ত শ্রান্ত মধ্যম রাজকুমার যে দিকে যেতে চায় গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায়। কোনোমতে উঠে দাঁড়ায়, আবার ধাক্কা খেয়ে পড়ে যায় এবং কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'কে কোথায় আছ? বন্ধু হও, শত্রু হও কাছে এস ভাই। দৃষ্টিহীন, ভাগ্যহীন, আত্মীয় বান্ধবহীন মধ্যম কুমার আজ পথের ধূলায়।'

মধ্যম রাজকুমারের অভিনয় দেখে সিরাজুদ্দিন সাহেব অভিভূত হয়ে পড়লেন। তাঁর চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়তে লাগল। বুকের মধ্যে হু হু করতে লাগল। চারদিকে প্রচণ্ড হাততালি পড়ছে। সেই শব্দ ছাপিয়ে তাঁর কানে বাজছে মধ্যমকুমারের হাহাকার 'কে কোথায় আছ? বন্ধু হও, শত্রু হও কাছে এস ভাই। দৃষ্টিহীন, ভাগ্যহীন, আত্মীয় বান্ধবহীন, মধ্যম কুমার আজ পথের ধূলায়।'

গলায় একটা রুপার মেডেল ঝুলিয়ে আসিফ বাড়ি ফিরল। সিরাজুদ্দিন সাহেব আগেই পৌঁছেছেন। একা একা অন্ধকার বারান্দার জায়নামাজে বসে আছেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে গভীর চিন্তায় তিনি মগ্ন। আসিফ ঘরে ঢুকতেই তাঁর আচ্ছন্ন ভাব দূর হল। শান্ত গলায় বললেন, 'আয় আমার সাথে।'

ছেলেকে তিনি বাসার পেছনের কুয়োতলায় নিয়ে গেলেন। সহজ গলায় বললেন, 'গলার মেডেলটা খুলে কূয়ার মধ্যে ফেল।'

তাঁর কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যে আসিফ কোনো কথা না বলে মেডেল ফেলে দিল। গহীন কূয়া। মনে হল যেন দীর্ঘ সময় পর পানিতে ঝপ করে শব্দ হল।

সিরাজুদ্দিন সাহেব বললেন, 'এখন বল, আর কোনোদিন অভিনয় করব না। বল, বল হারামজাদা।'

আসিফ কিছু বলল না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সিরাজুদ্দিন সাহেব বললেন, 'বল, আর কোনোদিন অভিনয় করব না। নয়ত তোকে আজ খুন করে ফেলব। বল, হারামজাদা। বল।'

আসিফ ক্ষীণ গলায় বলল, 'কেন বাবা?'

'বল তুই। বল। নয়ত খুন করে ফেলব।'

সিরাজুদ্দিন সাহেবের চোখে-মুখে উন্মাদ ভঙ্গি। তিনি ছেলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। দুহাতে চুলের মুঠি ধরে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, 'বল আর অভিনয় করব না। বল।'

আসিফ যন্ত্রের মত বলল, 'আর অভিনয় করব না।'

সিরাজুদ্দিন সাহেব ছেলের মাথা কূয়ার মুখের কাছে ধরলেন। হিস হিস করে বললেন, 'বল, আবার বল। তিন বার বল।'

আসিফ বলল। গহীন কূয়া সেই শব্দ ফেরত পাঠাল। কূয়ার তল থেকে গমগমে অথচ শীতল একটি স্বর ফিরে এল। 'আমি অভিনয় করব না... অভিনয় করব না। করব না।'

আসিফ তার কথা রেখেছিল। বাবা জীবিত থাকাকালীন সময়ে সে অভিনয় করেনি। তার জীবনের দ্বিতীয় অভিনয় সে করে বাবার মৃত্যুর এক বছর পর। গ্রাম্য কবিয়ালের একটা ভূমিকা। যে কথায়

কথায় পদ বাঁধে। সেই পদ লোকজনদের বলে বলে শোনায় এবং গভীর আগ্রহে বলে, 'পদটা কেমন হইছে ভাইজান এটু কন দেহি। বুকের মইধ্যে গিয়া ধরে, ঠিক না? আহারে কি পদ বানছি'

হলুদ পাখি সোনার বরণ কালা তাহার চউখ,
ছোট্ট একটা পাখির ভিতরে কত্ত বড় দুঃখ
ও আমার সোনা পাখিরে। ও আমার ময়না পাখিরে।

গ্রাম্য গীতিকারের অভিনয় করে সে ময়মনসিংহ শহরে একটা হৈচৈ ফেলে দিল। অভিনয়ের শেষে স্টেজের পেছনে গ্লাসে করে চা খাচ্ছে, জেলা স্কুলের হেড মাস্টার সাহেব ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঢুকে বললেন, 'আসিফ একটু বাইরে আস তো, ডিসট্রিক জাজ ওয়াদুদুর রহমান সাহেব তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'চা-টা শেষ করে আসি স্যার।'

'চা পরে খাবে আস তো তুমি।'

আসিফ বাইরে এসে দেখে ওয়াদুদুর রহমান সাহেব হাতে চুরুট নিয়ে বিমর্ষ ভঙ্গিতে টানছেন। তাঁর গা ঘেঁষে লম্বা রোগামতন একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়েটির মুখে দীঘির শীতল জলের মত ঠাণ্ডা একটা ভাব। মেয়েটি কিছু বলল না। ওয়াদুদুর রহমান সাহেব বললেন, 'ইয়াং ম্যান, তোমার অভিনয় দেখে আমার মেয়ে খুব ইমপ্রেসড। ওয়েল ডান।'

আসিফ কি বলবে বুঝতে পারল না। ওয়াদুদুর রহমান সাহেব বললেন, 'আমার মেয়ের খুব ইচ্ছা তুমি একদিন আমাদের বাসায় এসে লাঞ্চ বা ডিনার কর। আমি নিজেও খুশি হব।'

'জি আচ্ছা, আমি যাব।'

'ভেরি গুড। ইয়াং ম্যান, পরে একদিন দেখা হবে, কেমন?'

আসিফ জবাব দেবার আগেই লীনা বলল, 'আপনি আজই চলুন না। আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে। আপনাকে বাসায় পৌঁছে দেবে। প্লিজ।'

ওয়াদুদুর রহমান সাহেব শীতল গলায় বললেন, 'বেচারা অভিনয় করে ক্লান্ত হয়ে আছে। আজ থাক। কোনো একটা ছুটির দিনে বরং....।'

'না বাবা আজ। ভাল লাগাটা থাকতে থাকতে ওকে বাসায় নিয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। আপনার কি খুব অসুবিধা হবে? প্লিজ আসুন না, প্লিজ।'

আসিফ গেল। ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের পরিবারের অন্য সবার সঙ্গে এক টেবিলে বসে ভাত খেল।

ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের স্ত্রী খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করলেন- - বাবা কি করেন? ভাই-বোন ক জন? বোনদের কোথায় বিয়ে হয়েছে? সে কি পড়ছে? ম্যাট্রিক রেজাল্ট কি?

আই. এ. তে কি রেজাল্ট?

লীনা এক সময় বিরক্ত হয়ে বলল, 'চুপ কর তো মা। কি শুধু উকিলের মত প্রশ্ন করছ। ওকে ভাত খেতে দাও।'

মা চুপ করলেন না। প্রশ্ন করা ছাড়াও তাঁর পরিবারের সমস্ত তথ্য দিয়ে দিলেন। তার তিন মেয়ে এক ছেলে। ছেলে আন্ডারগ্র্যাজুয়েট, পড়ছে নিউ জার্সি স্টেট কলেজে। বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে। জামাই ডাক্তার। সম্প্রতি এফআরসিএস করেছে। এখন আছে পিজিতে। লীনা দ্বিতীয় মেয়ে। ম্যাট্রিকে চারটা লেটার এবং স্টার মার্ক নিয়ে ছেলেমেয়ে সবার মধ্যে ফিফথ হয়েছে। আইএ তে খুব ভালো করতে পারেনি। সায়েন্স থেকে আর্টস-এ আসায় একটু অসুবিধা হয়েছে। তবু ফার্স্ট ডিভিশন ছিল। এখন পড়ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। হলে থাকে। গরমের ছুটি কাটাতে এসেছে। ছোট মেয়েকে শান্তিনিকেতনে দিয়েছিলেন। কলাভবনের ছাত্রী। তবে ওর সেখানে থাকতে ভাল লাগছে না। গরমের সময় খুব গরম পড়ে। মেয়ের আবার গরম সহ্য হয় না।

ফেরার পথে লীনা তাকে গাড়িতে তুলে দিতে এল। নরম গলায় বলল, 'মা নিজেদের কথা বলতে খুব পছন্দ করেন। আপনি আবার কিছু মনে করলেন না তো?'

আসিফ বলল, 'না। কিছু মনে করিনি।'

'আমি আপনার জন্যে একটা উপহার এনেছি। সবার সামনে দিতে লজ্জা লাগল। আপনি যদি এটা নেন আমি খুব খুশি হব। আপনার অভিনয় আমার কি যে ভাল লেগেছে। অনেকদিন ধরেই

আমার মনটা অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে ছিল। হঠাৎ সেখানে এক ঝলক আলো পড়ল। খুব কাব্য করে কথা বলে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না, এই নিন।'

শাড়ির আঁচলের ভাঁজ থেকে লীনা কালো রঙের কি যেন বের করল। আসিফ বলল, 'এটা কি?'

'নটরাজের একটা মূর্তি।' আমার ছোটবোন শান্তিনিকেতন থেকে আমার জন্যে এনেছিল। আমার খুব প্রিয়। আপনি নিন। আপনার টেবিলে সাজিয়ে রাখবেন। প্লিজ, প্লিজ।'

তখন আসিফের বয়স ছিল অল্প। হৃদয় আবেগে পরিপূর্ণ। রাতটাও ছিল অন্য রকম। চৈত্র মাসের রহস্যময় রাত। চারদিকে উথাল পাথাল চাঁদের আলো। পাশে নটরাজের মূর্তি হাতে দেবীর মত এক তরুণী। তরুণীর কণ্ঠস্বর বড় স্নিগ্ধ। আসিফের চোখে জল এসে গেল। সেই জল গোপন করার কোনো চেষ্টা সে করল না। কেন যেন তার মনে হল, এই নারীর কাছে তার গোপন করার কিছুই নেই। এই নারী সর্বজ্ঞ ঈশ্বর।

নটরাজের মূর্তি আসিফ নিজের কাছে রাখেনি। রুপার মেডেলের মত মূর্তিটি সে কূয়ায় ফেলে দিয়েছিল। কেন সে এটা করল? পৃথিবীর মতো, চৈত্র মাসের চাঁদের মত, গহীন অরণ্যের মত মানুষও রহস্যময়।

'ঘুমুচ্ছিস নাকি রে আসিফ?'

আসিফ চমকে উঠল। সে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। তার বেশ লজ্জা লাগছে। ভাগ্নির এত বড় একটা অপারেশন হচ্ছে, আর সে কি না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিচ্ছে। রেহানা বললেন, 'অপারেশন হয়ে গেছে। পুতুল ভালো আছে। জ্ঞান ফিরেছে, কথা-টথা বলল।'

'বাহ্ চমৎকার তো! তুমি এখন রেস্ট নাও আপা। খুব ধকল গেছে।'

রেহানা ক্লান্ত ভঙ্গিতে আসিফের পাশে বসল। ক্লিনিকের এই ঘরটা এখন প্রায় ফাঁকা। আত্মীয়স্বজন যারা এসেছিল সবাই চলে গেছে। আসিফের মেঝ বোন এখনো আছে। সে দাঁড়িয়ে আছে ইনটেনসিভ কেয়ার ঘরটার পাশে। তারও চলে যাবার কথা। গাড়ি গিয়েছে একজনকে নামিয়ে দিতে। গাড়ি এলেই সেও চলে যাবে। এখানে থাকার আর কোনো মানে হয় না।

রেহানা বলল, 'আসিফ তুই কী করবি? থাকবি না চলে যাবি?'

'আমার অসুবিধা নেই, থাকতে পারি।'

'তোর খিদে লেগেছে বোধ হয়। রাতে তো খাসনি।'

'না খিদে লাগেনি।'

'তোর বউ কেমন আছে?'

'ভালই।'

'অনেক দিন দেখি না। তোরা আসিস না কেন?'

'ব্যস্ত থাকি।'

'নাটক নিয়ে ব্যস্ত?'

'হুঁ।'

'কে যেন বলছিল— বউকেও নামিয়েছিস। এসব কি কাণ্ড বল তো। নিজে যা করছিস তাই যথেষ্ট, তার ওপর যদি...।'

আসিফ কিছু বলল না। হাই তুলল। রেহানা বললেন, 'নাটক নাটক করে তোর লাভটা কি হয়েছে শুনি? এমন তো না যে দশটা লোক তোকে চেনে। তোর তো কিছুই হয়নি।'

'তা ঠিক।'

'এই জীবনের কোথাও স্থির হতে পারলি না। আজ এই চাকরি, কাল ঐ চাকরি। তোর বয়স হচ্ছে না?'

'হচ্ছে।'

'বয়স হলে মানুষের একটা সিকিউরিটির দরকার হয়। একটা বাড়ি। কিছু টাকা পয়সা... তোর আছে কি?'

'এইসব বাদ দাও।'

'বাদ দাও বললেই বাদ দেয়া যায়? এই যে পুতুলের অপারেশন হল— বারো-তের হাজার টাকা খরচ হয়েছে। টাকা ছিল বলে খরচ করতে পেরেছি। যদি না থাকত? তোর এই রকম কিছু

হলে তুই কি করবি?'

'কি আর করব? হাসপাতাল যাব। বিনা পয়সায় চিকিৎসার চেষ্টা করব।'

'তুই হয়ত ভাবিস তোকে নিয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করি না। এটা ঠিক না। প্রায়ই আমাদের বোনদের মধ্যে আলোচনা হয়। খুবই কষ্ট লাগে।'

'কষ্ট লাগার কি আছে?'

'কষ্ট লাগার কিছু নেই? কি বলছিস তুই! একটা বাড়িতে থাকিস, সেই বাড়ির রান্নাঘর অন্য একজনের সঙ্গে শেয়ার করতে হয়। এটা কেমন কথা?'

'সবার তো সব কিছু হয় না।'

'চেষ্টা করলে ঠিকই হয়। চেষ্টা না করলে হবে কিভাবে?' কোনো রকম চেষ্টা নাই, বড় হবার ইচ্ছা নাই — নাটক, নাটক, নাটক।'

'এই সব বাদ দাও আপা, দেখি চা পাওয়া যায় কিনা।' মাথা ভার ভার লাগছে। চা খেলে ভাল লাগবে।'

'রাত দুপুরে চা পাবি কোথায়? চুপ করে বোস। তোর সঙ্গে দেখাই হয় না। সুযোগ পাওয়া গেল।

আসিফ সিগারেট ধরাল। তার সত্যি সত্যি ঘুম পাচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়া দিয়েও ঘুম তাড়ানো যাচ্ছে না। রাত জাগার জন্যই বোধ হয় প্রচণ্ড খিদেও লাগছে। খালি পেটে সিগারেট — নাভিতে পাক দিচ্ছে। মনে হচ্ছে বমি হয়ে যাবে।

'আসিফ।'

'বল আপা।'

'তুই আমাকে একটা সত্যি কথা বল তো।'

'বেশির ভাগ সময়ই আমি সত্যি কথা বলি।'

'তোর কি এখন চাকরি নেই?'

'এই কথা বলছ কেন?'

'তুই তোর দুলাভাইকে বলেছিস তোর জন্যে একটা কিছু দেখে দিতে। এই থেকে অনুমান করছি। তোর কি চাকরি নেই?'

'না নেই।'

'ক'দিন ধরে নেই?'

'মাস দুই।'

'তোর বউ জানে?'

'জানবে না কেন? জানে।'

'তবু তুই নাটক করবি? এর পরেও তোর শিক্ষা হয় না? তুই কি মানুষ না জানোয়ার?'

রেহানা উঠে চলে গেলেন। আসিফ একা একা বসে রইল।

বেশিক্ষণ একা বসে থাকতে হল না। রেহানা আবার এসে ঢুকলেন। তিনি খুব কঠিন কিছু কথা বলতে এসেছিলেন — বলতে পারলেন না। আসিফের বসে থাকার ভঙ্গিটি দেখে তাঁর খুব মায়া লাগল।

লীনা যে স্কুলে পড়ায় তার নাম — লিটল ফ্লাওয়ার্স। ইংরেজি স্কুল। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। নানান কায়দা কানুন। সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষা। মাসে একবার আউটিং।

আজ সেই আউটিংয়ের দিন। লীনাকে ক্লাস ওয়ানের ছেলেমেয়েদের নিয়ে যেতে হবে সাভার স্মৃতিসৌধে। একটা মাইক্রোবাস জোগাড় করা হয়েছে। লীনার সঙ্গে যাচ্ছে অতসী দি। গেম টিচার। মাইক্রোবাসে ওঠবার ঠিক আগ মুহূর্তে লীনা অতসীকে বলল, 'আমার না শরীরটা খুব খারাপ লাগছে অতসী দি।'

অতসী বলল, 'যেতে চাও না?'

'না। শরীরটা খুবই খারপ লাগছে। মনে হচ্ছে ফেইন্ট হয়ে যাব।'

অতসী বলল, 'তুমি কি কনসিভ করেছ নাকি?'

লীনা জবাব দিল না। এসব নিয়ে কথা বলতে ভাল লাগে না অথচ বিবাহিত মেয়েরা কত

স্বাভাবিক ভাবেই না এসব নিয়ে আলাপ করে। লীনার মাঝে মাঝে মনে হয় - তার মধ্যে কিছুটা অস্বাভাবিকা আছে।

'তুমি এখন না গেলে বড় আপা খুব রাগ করবেন।'

'শরীরটা খুব খারাপ লাগছে অতসী দি।'

'তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি। দাঁড়াও, আপার সঙ্গে আলাপ করে আসি।' লীনা ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল। বাচ্চাগুলি মাইক্রোবাসে উঠে বসে আছে। কোনো সাড়াশব্দ করছে না, যেন একদল রোবট। ট্রেনিং দিয়ে দিয়ে এদের রোবট বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। হুকুম ছাড়া এরা মুখ খুলবে না। এর কোনো মানে হয়। শিশুরা থাকবে শিশুদের মত। হৈচৈ করবে, মারামারি করবে, কাঁদবে, হাসবে।

অতসী ফিরে এসে বলল, 'ব্যাপার সুবিধার না লীনা। বড় আপা খুব রেগে গেছে। তুমি যাও শুনে আস।'

প্রিন্সিপ্যাল জোবেদা আমিন সত্যি সত্যি রেগেছেন। লীনাকে ঢুকতে দেখে তিনি শুকনো গলায় বললেন, 'বোস।' বলেই টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'হ্যালো, প্রিন্সিপ্যাল জোবেদা আমিন বলছি...'

এইসব কেজি স্কুলগুলির প্রধানরা বিচিত্র কারণে প্রিন্সিপ্যাল পদবি নেন। কেজি স্কুলগুলিতে কোনো হেড মিসট্রেস নেই। সব প্রিন্সিপ্যাল। এরা কথাবার্তায় সত্তুর ভাগ ইংরেজি বলেন। অদ্ভুত ধরনের ইংরেজি।

'লীনা।'

'জি আপা।'

'আপনি এসব কি শুরু করেছেন বলুন তো?'

'তেমন কিছু তো শুরু করিনি আপা। শরীরটা ভাল না, এটাই বলছি।'

'একটা এ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পূর্ণ হবার পর আপনারা বলবেন শরীর খারাপ, তাহলে কি করে হবে বলুন? আর এই শরীর খারাপ ব্যাপারটাও তো নতুন না। দু'দিন পর পর শুনছি শরীর খারাপ। এ ভাবে তো আপনি মাস্টারি করতে পারবেন না। আপনি বরং অন্য কোনো প্রফেসন খুঁজে বের করুন যেখানে তেমন কাজকর্ম নেই।'

লীনা উঠে দাঁড়াল।

জোবেদা আমিন ঝাঁঝালো গলায় বললেন, 'যাচ্ছেন কোথায়?'

'বাসায় চলে যাব। শরীরটা ভাল লাগছে না।'

জোবেদা আমিন কঠিন চোখে তাকিয়ে আছেন। লীনার খুব ইচ্ছা করছে বলে, 'আপনি কি আপা কখনো লক্ষ্য করেছেন যে আপনার গোঁফ আছে? গায়ের রঙ কালো বলে তেমন বোঝা যাচ্ছে না। ফর্সা হলে রোজ শেভ করতে হত।'

কথাটা বলা হল না। লীনা বাসায় চলে এল। বাসায় এসেই শরীর খারাপ ভাবটা কেন জানি কেটে গেল। সে রেনুর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করল। খুকিকে গামলায় পানি নিয়ে গোসল করিয়ে দিল।

দুপুরে দরজা জানালা বন্ধ করে খানিকক্ষণ ঘুমুল। ঘুম ভাঙার পর মনে হল আসিফ থাকলে বেশ হত। দু'জন বিকেলে কোথাও বেড়াতে যাওয়া যেত। মীরপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন কিংবা বলধা গার্ডেন।

আসিফকে আজকাল কাছেই পাওয়া যায় না। বেচারা চাকরির জন্যে ব্যস্ত হয়ে সারাদিন ঘোরে। কোথায় কোথায় ঘোরে, কার কাছে যায় কে জানে!

আজ অবশ্যি আসিফ চাকরির সন্ধ্যানে ঘুরছিল না। সে চুপচাপ টেলিভিশন রিহার্সেল রুমে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত ঋণপ্রার্থী লোকটির ক্ষুদ্র ভূমিকা নিতে সে রাজি হয়েছে। কৌতূহল থেকেই রাজি হয়েছে। দেখাই যাক না টিভি অভিনয় ব্যাপারটা কি? টেলিভিশন এখন অতি শক্তিশালী একটি মাধ্যম। একে উপেক্ষা করার প্রশ্নই ওঠে না।

অভিনেতা-অভিনেত্রীরা সবাই এসে গেছেন। আসিফ এদের কাউকে চিনতে পারছে না। তার ঘরে টিভি নেই। টিভি তারকারা তার কাছে অপরিচিত।

প্রযোজক এলেন পাঁচটার দিকে। মধ্যবয়স্ক একজন ভদ্রলোক। হাসি-খুশি ধরনের মানুষ। ঘরে ঢুকেই কি একটা রসিকতা করলেন। কেউ হাসল না। আসিফ কি করবে বুঝতে পারল না। এই ভদ্রলোক এখন মনে হচ্ছে তাকে চিনতে পারছেন না। একবার চোখে চোখ পড়ল, তিনি চোখ

সরিয়ে নিলেন।

সবাইকে স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেয়া হয়েছে। আসিফ কোনো স্ক্রিপ্ট পেল না। ছোট রোলের আর্টিস্টদের হয়ত স্ক্রিপ্ট দেয়া হয় না। কিন্তু সংলাপগুলি তো জানতে হবে।

আসিফ উঠে দাঁড়াল; বেশ খানিকটা দ্বিধা নিয়ে এগিয়ে গেল প্রযোজকের দিকে। প্রযোজক তাকে এইবার মনে হল চিনতে পারলেন। হাসি মুখে বললেন, 'ভেরি সরি ভাই, একটা সমস্যা হয়েছে।'

আসিফ বলল, 'কি সমস্যা?'

'লাস্ট মোমেন্টে নাটকে কিছু কাট-ছাঁট করা হয়েছে। ষাট মিনিটের বেশি হয়ে যাচ্ছিল, কাজেই বাধ্য হয়ে— আপনি ভাই কিছু মনে করবেন না। নেক্সট নাটকে দেখব আপনাকে একটা রোল দেয়া যায় কি না।'

আসিফের কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। সবার চোখে মুখে সহানুভূতির ছায়া। আসিফ বলল, 'আমি তাহলে যাই?'

প্রযোজক বললেন, 'বসুন না, চা খেয়ে যান। একটা রিডিং হবার পরই চা আসবে।'

আসিফ নিজের জায়গায় এসে বসল। এরকম একটা পরিস্থিতিতে চট করে চলে যাওয়া যেমন মুশকিল, আবার বসে থাকাও মুশকিল।

রিহার্সেল শুরু হয়েছে। রিহার্সেলের ধরনটা অদ্ভুত। সবাই নিজের নিজের জায়গায় বসে রিডিং পড়ে যচ্ছে। একেক জনের পড়া হয়ে যাওয়া মাত্র সে পাশের জনের সঙ্গে গল্প করছে। মনে হচ্ছে পুরো নাটকটার ব্যাপারে কারো কোনো আগ্রহ নেই। নিজের অংশটা হয়ে গেলেই যেন দায়িত্ব শেষ।

একজন অভিনেতা পড়ার মাঝখানেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তো ভাই আর থাকতে পারছি না। জরুরি এ্যাপয়েন্টমেন্ট। প্রযোজক তাঁকে রাখতে চেষ্টা করছেন। তিনি রাজি হচ্ছেন না।

আসিফ মনে মনে ভাবল অতটা অনাগ্রহ নিয়ে এরা নাটক কেন করে? তার মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

বজলু ভাই রাগী গলায় বললেন, 'এসব তুমি কি বলছ লীনা আসবে না মানে? এর মানেটা কি?'

আসিফ বলল, 'লীনার শরীরটা ভাল না। ক'দিন ধরেই শরীর খারাপ যাচ্ছে।'

'কালই তো দেখলাম ভাল।'

'বাইরে থেকে ভাল মনে হয়েছে। আসলে ভাল না।'

'সবাই যদি এ রকম অসুখ-বিসুখ বাঁধিয়ে বসে থাকে তাহলে নাটক চলবে কিভাবে? নাটক-ফাটক বন্ধ করে চল বাসায় চলে যাই।'

'প্রক্সি দিয়ে কোনো মতে চালিয়ে নিন।'

'প্রক্সি দিয়ে এইসব হয়? প্রত্যেকের তার নিজের রোল আছে, প্রক্সিটা দেবে কে? মুভমেন্ট সিনক্রোনাইজ করতে হবে না?'

'বজলু ভাই, আপনার সঙ্গে একটু আড়ালে কথা বলা দরকার। আসুন বাইরে যাই।'

'আমার সঙ্গে আবার আড়ালে কথা কি? ফিসফিসানি, গুজগুজানি এর মধ্যে আমি নেই। চল কোথায় যাবে।'

দুজন রাস্তায় চলে এল। বজলু সিগারেট ধরালেন। তাঁর প্রেসার আছে। অল্পতেই প্রেসার বেড়ে যায়। সামান্যতম টেনশান সহ্য করতে পারেন না। এখন তাঁর টেনশান খুব বেড়েছে। আসিফ কি বলবে কে জানে।

'একটা সমস্যা হয়েছে বজলু ভাই।'

'কি সমস্যা?'

'লীনা অভিনয় করতে পারবে বলে মনে হয় না।'

'কি বলছ তুমি এসব!'

'ওর শরীরটা খারাপ।'

'শরীর খারাপ, শরীর ঠিক হবে। চিরজীবন কারোর শরীর খারাপ থাকে? আজ রাতটা রেস্ট

নিক। দরকার হলে আগামীকালও রেস্ট নেবে। আজ রিহার্সেলের পর আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখে আসব।'

'ওর বাচ্চা হবে বজলু ভাই। আপনি তো ওর অবস্থাটা জানেন। এর আগে দুটো বাচ্চা মারা গেছে। জন্মের কিছু দিনের মধ্যেই বাচ্চাগুলি মরে যায়। ডাক্তাররা বলছে-- পুরো রেস্টে থাকতে।'

'তুমি তো ভয়াবহ খবর দিলে আসিফ। আমার তো মনে হচ্ছে হার্ট এ্যাটাক হয়ে যাচ্ছে। শো পিছিয়ে দিতে হবে। এ তো মাথায় বাড়ি।'

'শো পেছানোর দরকার নেই। অন্য কাউকে এই রোলটা দিন। এটা তো খুব কমপ্লিকেটেড রোল নয়। যে কেউ পারবে।'

'এটা কি সাপ-লুডু খেলা যে, যে কেউ পারবে। ফালতু কথা আমার সঙ্গে বলবে না তো। যে কেউ পারবে। যে কেউ পারলে তো কাজই হত।'

'ঐ দিন যে মেয়েটি এসেছিল--- পুষ্প, ও পারবে, ওকে...

'মাথাটা তোমার কি খারাপ হয়ে গেল নাকি? অভিনয়ের অ জানে না যে মেয়ে, গলা দিয়ে স্বর বের হয় না...।'

'আমি ওকে শিখিয়ে পড়িয়ে ঠিক ঠাক করে দিতে পারব।'

'আমার কাছ থেকে একটা জিনিস শিখে রাখ ছবি আঁকা, গান গাওয়া আর অভিনয়, এই তিন জিনিস শেখানো যায় না-- ভেতরে থাকতে হয়।'

'ঐ মেয়ের মধ্যে অভিনয় আছে। খুব সহজে মেয়েটা ইনভলভড হতে পারে। অভিনয় দেখতে দেখতে মেয়েটা কাঁদছিল।'

'অভিনয় দেখেই যে কেঁদে ফেলে, সে আবার অভিনয় করবে কি?'

'কে অভিনয় পারবে, কে পারবে না, এটা আমি বুঝি বজলু ভাই। লীনাকে আমি অভিনয়ে নিয়ে এসেছিলাম। লীনা কিন্তু আগে কোনোদিন করেনি।'

'মেয়েটা রাজি হবে কি না কে জানে। যেতে বলছ?'

'হ্যাঁ বলছি।'

'এখনই চলে যাই মীনাকে সাথে নিয়ে যাই। ও-ই প্রথম দিন মেয়েটিকে এনেছিল। তুমি বরং থার্ড সিন শুরু করে দাও।'

বজলু আরেকটা সিগারেট ধরালেন। তাঁর টেনশান যেমন দ্রুত আসে তেমনি দ্রুতই চলে যায়। এখন টেনশান একেবারেই নেই।

'আসিফ, শো কি সময় মত যাবে?'

'অবশ্যই যাবে।'

'টেনশান ফিল করছি।'

'টেনশানের কিছু নেই।'

'জাতীয় উৎসব, বড় বড় দল আসবে। কলকাতা থেকেও নাকি দুটি টিম আসছে।'

'আসুক না।'

'তোমাকে সত্যি কথা বলি আসিফ, নাটককটা আমার কাছে বেশি সুবিধার মনে হচ্ছে না। কোনো কনফ্লিকট নেই। রিলিফ নেই। ক্লাইমেক্স নেই।'

'জিনিস কিন্তু ভাল।'

'ভালর তুমি কি দেখলে?'

'প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন স্বপ্ন ব্যাপার আছে। কঠিন কিছু কথা খুব নরম করে বলা।'

'নরম করে বললে এই দেশে কিছু হয় না। শক্ত করে বলতে হয়। পাছায় লাথি দিতে হয়।'

'সবাই তো পাছায় লাথি দেয়া নাটক নিয়ে যাবে। আমরা না হয় একটা নরম নাটক নিয়ে যাই। নরম হলেও এটা খুব নামকরা নাটক বজলু ভাই। কবি এমিলি জোহানের কাব্যনাটক। বাংলায় ভাবানুবাদ করা। সত্যি করে বলুন তো আপনার ভাল লাগে না?'

'আর আমার ভাল লাগা। তোমাকে আরেকটা সত্যি কথা বলি আসিফ, আজ পর্যন্ত কাউকে বলিনি। তোমাকে বলছি- নাটক ভাল না মন্দ এটা আমি বুঝি না। আমি শুধু বুঝি -- অভিনয় ঠিকমত হচ্ছে কি না।'

'আপনি সবই বোঝেন। শুধু বোঝেন বললে কম বলা হবে, খুব ভালই বোঝেন। দেখুন বজলু

ভাই, আমি মানুষটা খুব অহংকারী, আমি অভিনয় ভাল করি। নিজে সেটা জানি — অভিনয়ের ব্যাপারে আমি কারোর কোনো উপদেশ শুনি না, কিন্তু আপনার কথা আমি শুনি। বজলু ভাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে, আপনি চলে যান।'

রিহার্সেল শুরু হতে খানিকটা দেরি হল। প্রণব বাবুর বড় মেয়ে বৃত্তি পেয়েছে সেই উপলক্ষে তিনি প্রচুর খাবার দাবার এনেছেন। হৈ হৈ করে খাওয়াদাওয়া হচ্ছে। গ্রুপের মেয়েরা কেউ নেই সবাই বজলু সাহেবের সঙ্গে পুষ্প মেয়েটির কাছে গেছে। এই সুযোগে জলিল সাহেব আদিরসের দুটো গল্প বলে ফেললেন। দুটোর মধ্যে একটা 'হিট' করল। কারোর হাসি আর থামতেই চাচ্ছে না। এই দলটিকে দেখলে কে বলবে এদের জীবনে কোনো দুঃখ কষ্ট আছে? এদের দেখে মনে হচ্ছে গভীর আনন্দে এদের হৃদয় পরিপূর্ণ। রিহার্সেলের ঘরে এরা যখন ঢোকে জীবনের সমস্ত হতাশা ও বঞ্চনা পেছনে ফেলে ঢোকে। নাটক তাদের দ্বিতীয় জীবন। এই জীবনটাই তারা আঁকড়ে ধরে। দ্বিতীয় জীবনই এক এক সময় প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় দৃশ্য শুরু হল। এটিও রাতের দৃশ্য। লেখক শোবার ঘরে। বিছানায় বসে আছেন। পাশেই তাঁর স্ত্রী   কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। লেখক লিখে যাচ্ছেন। হঠাৎ একটা শব্দ হল। লেখক চমকে তাকালেন   ঘরের মধ্যে কে যেন দাঁড়িয়ে। যে দাঁড়িয়ে, তার চেহোরা ভাল না। সে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখের দৃষ্টি নিস্প্রভ। তার নাম ছলিমুদ্দিন। ছলিমুদ্দিনের ভূমিকায় অভিনয় করছেন প্রণব বাবু।

লেখক অবাক হয়ে ছলিমুদ্দিনকে দেখছেন। চিনতে পারছেন না। এই গভীর রাতে শোবার ঘরে লোকটা কোত্থেকে এল বুঝতে পারছেন না। তিনি খানিকটা ভীত।

লেখক : কে কে কে?

ছলিমুদ্দিন : আস্তে। চেঁচাবেন না। আপনার স্ত্রী জেগে উঠতে পারেন।

লেখক : কে কে? আপনি কে?

ছলিমুদ্দিন : চিনতে পারছেন না? কি অদ্ভুত কথা। নিজের সৃষ্টি করা চরিত্র নিজেই চিনতে পারছেন না। ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, জীবন যুদ্ধে পরাজিত, ক্লান্ত শ্রান্ত একজন মানুষ, আজ সারাদিন যার খাওয়া হয়নি। যার প্রেমিকা অন্য এক পুরুষের হাত ধরে.....

লেখক : ও আচ্ছা, আপনি ছলিমুদ্দিন।

ছলিমুদ্দিন : হ্যাঁ ছলিমুদ্দিন। আপনি আমার জন্যে একটা ভাল নাম পর্যন্ত খুঁজে পাননি। নাম দিয়েছেন ছলিমুদ্দিন। সুন্দর, শোভন, আনন্দদায়ক কিছুই আপনি আমার জন্যে রাখেননি। একটি ভাল নাম কি আমার হতে পারত না?

লেখক : না, পারত না। আপনার জন্ম হয়েছে কৃষক পরিবারে। আপনার বাবা একজন বর্গাদার। সে তার পুত্রদের এ রকম নামই রাখবে। একজন কৃষক তার পুত্রের নাম নিশ্চয়ই আবরার চৌধুরী রাখবে না।

ছলিমুদ্দিন : আপনি ইচ্ছা করলে সবই সম্ভব। কলম আপনার হাতে। আপনি ইচ্ছা করলেই কোর্টে এফিডেভিট করে আমি আমার নাম পাল্টে আবরার চৌধুরী করতে পারি। আপনি ইচ্ছা করলেই বিদেশী কোনো কোম্পানিতে আমার চমৎকার একটা চাকরি হতে পারে। ছলিমুদ্দিন নামটা যদি আপনার এতই প্রিয় হয়, বেশ তো আপনার ড্রাইভারের ঐ নাম দিয়ে দিন।

লেখক : তা সম্ভব নয়।

ছলিমুদ্দিন : কেন সম্ভব নয়? একের পর এক আপনার কারণে আমি জীবন যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছি। কেন আপনি এ রকম করছেন?

লেখক : এ রকম করছি কারণ, তোমার মাধ্যমে আমি সমাজকে তুলে আনছি। তুমি আলাদা কেউ নও। তুমি এই সমাজেরই একজন প্রতিনিধি। তোমাকে দেখে পাঠক চমকে উঠবে। ঘা খাবে।

ছলিমুদ্দিন : আপনি আমাকে তুমি করে বলছেন কেন? নিজের লেখা পড়ে দেখুন, বয়সে আমি আপনার চেয়ে বড়। এ জীবনে তো আপনি আমাকে কিছুই দেননি। সামান্য সম্মানটুকু অন্তত দিন।

লেখক : আমার ভুল হয়েছে। ক্ষমা করবেন। এখন থেকে আপনি করে বলব।

ছলিমুদ্দিন : ধন্যবাদ, আপনাকে যতটা হৃদয়হীন মনে করেছিলাম তত হৃদয়হীন আপনি নন। এটাই যখন করলেন তখন আরেকটু করুন। আমার প্রেমিকাকে আপনি ফিরিয়ে দিন। অর্থ বিত্ত, কিছুই চাই না। আমি পথে পথে না খেয়ে ঘুরতে রাজি আছি। আপনি শুধু আমার প্রেমিকাকে ফেরত দিন।

লেখক : তা হয় না।

ছলিমুদ্দিন : অবশ্যই হয়। আপনি নিজে তো আপনার স্ত্রীকে পাশে নিয়ে আরাম করে বসে আছেন। আমি কেন বসব না? সমাজ দোষ করতে পারে, রাষ্ট্র দোষ করতে পারে -- আমি তো কোনো দোষ করিনি। আমি কেন শাস্তি পাব?

লেখক : এই পচা সমাজে নির্দোষ যারা, তারাই শাস্তি পায়।

ছলিমুদ্দিন : সমাজ করুক। আপনি কেন করবেন? আপনি মানবপ্রেমিক একজন লেখক। আপনি আমার প্রতি করুণা করুন। আপনি শেষের কুড়িটা পাতা ছিঁড়ে ফেলুন। আবার নতুন করে লিখুন। এর মধ্যে আমি আপনার জন্যে চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।

লেখক : আপনাকে হাত জোড় করে অনুরোধ করছি, আপনি এ ঘর থেকে যান।

ছলিমুদ্দিন : না, আমি যাব না।

লেখক : যাবেন না মানে?

ছলিমুদ্দিন : মানে হচ্ছে, যাব না। প্রয়োজন হলে আপনাকে খুন করব।

লেখক : খুন করবেন।

ছলিমুদ্দিন : হ্যাঁ অস্ত্র নিয়ে এসেছি-- এই দেখুন। এগারো ইঞ্চি ছোরা। এটা সোজা আপনার পেটে বসিয়ে দেব। আমি কেন আত্মহত্যা করব? আমার কি দায় পড়েছে?

লেখক : (ভয় পেয়ে) জরী, জরী একটু ওঠ তো। এই জরী।

নাটক এক পর্যায়ে থেমে গেল। বজলু সাহেব ফিরে এসেছেন। পুষ্প তার সঙ্গে আছে। পুষ্পের চোখ-মুখ আনন্দে ঝলমল করছে। বজলু সাহেব অতিরিক্ত গম্ভীর। তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, 'এই মজনু, চা দে।' আসিফ স্টেজ থেকে নেমে এল। বজলু তাকে নিয়ে বাইরের বারান্দায় চলে গেলেন। তিক্ত গলায় বললেন, 'অপমানের চূড়ান্ত হয়েছি। শালার নাটক-ফাটক ছেড়ে দেব।'

আসিফ বলল, 'মেয়েকে তো নিয়েই এসেছেন দেখতে পাচ্ছি।'

'ভেতরের ঘটনা জানলে এটা বলতে না। আমি নাটকের কথাটা বলতেই বাড়িতে আগুন ধরে গেল। সবাই এমন ভাব করতে লাগল, যেন আমি একজন মেয়ের দালাল। বুড়োমত এক লোক, সম্ভবত মেয়ের চাচা-টাচা কিছু হবে, সরু গলায় বলছে, 'এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি।' রাগে আমার গা জ্বলে গেল। ব্যাটা বলে কী? আমি কি অভদ্রলোক নাকি?'

'রাজি করালেন কিভাবে?'

'আমাকে কিছু করতে হয়নি, মেয়ে নিজেই উল্টে গেল। সে নাটক করবেই। কান্নাকাটি করে বিশ্রী এক কাণ্ড এমন অবস্থা যে চলেও আসতে পারি না। বসেও থাকতে পারি না। ব্যাঙের সাপ গেলার মত অবস্থা। এরকম সুপার ইমোশনাল মেয়ে নিয়ে কাজ করা যাবে না। শুধু শুধু পরিশ্রম।'

আসিফ বলল, 'আমি মেয়েটার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলি। তারপর ছ নম্বর দৃশ্যটা হোক। বাড়তি লোক চলে যেতে বলুন। মেয়েটা পারবে কি পারবে না আজই বোঝা যাবে।'

'তোমার মনে হয় পারবে?'

'হ্যাঁ পারবে। ভালই পারবে।'

আসিফ পুষ্পকে বলল, 'এস আমরা ঐ কোণার দিকে গিয়ে বসে কিছুক্ষণ গল্পগুজব করি। গল্পগুজব করলে টেনশান কমবে। অভিনয় করা সহজ হবে।'

'আমার মধ্যে কোনো টেনশান নেই।'

'আছে। যথেষ্ট আছে। টেনশানের সময় মানুষ খুব উঁচু পর্দায় কথা বলে; তুমিও তাই বলছ। এস আমার সঙ্গে।'

পুষ্প এগিয়ে গেল। আসিফ বলল, 'চা খাবে?'

পুষ্প বলল, 'না।'

'একটু খাও। চা খাবার সময় মানুষ একটা কাজের মধ্যে থাকে। কাজের মধ্যে থাকলে আপনাআপনি মানুষ খানিকটা ফ্রি হয়ে যায়। তখন কথাবার্তা সহজ হয়।'

'এত কিছু আপনি জানেন কিভাবে!'

'রাত-দিন তো এটা নিয়েই ভাবি। কাজেই কিছু কিছু জানি।'

পুষ্প চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনার কী মনে হয় আমি পারব?'

'অবশ্যই পারবে। যারা অভিনয় করে না, তারা মনে করে অভিনয় ব্যাপারটা বুঝি খুবই কঠিন। আসলে তা না। অভিনয় খুবই সহজ।'

'আপনি আমাকে সাহস দেয়ার জন্যে এটা বলছেন।'

'মোটেই না। তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। মনে কর তুমি একজনের চরিত্রে অভিনয় করছ। অভিনয়ের অংশটা হচ্ছে প্রিয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর তোমার রিএ্যাকশান। এখন দেখ এই অভিনয়ের কোনো সেট প্যাটার্ন নেই। পৃথিবীতে অসংখ্য ধরনের মানুষ। একেকজন মানুষ মৃত্যুর খবর একেকভাবে নেবে। এর যে কোনো একটা করলেই হল। তুমি গড়াগড়ি করে কাঁদলেও ঠিক আছে, আবার স্তব্ধ হয়ে গেলেও ঠিক আছে।'

'এত সোজা?'

'হ্যাঁ, এই অংশটা সোজা। তবে সবচে কঠিন কাজ হচ্ছে, একবার একটা প্যাটার্ন নিয়ে নিলে গোটা নাটকে তা বজায় রাখতে হবে। বুঝতে পারছ?'

'পারছি।'

'এই নাটকে তুমি বালিকা বধূর চরিত্রে অভিনয় করছ। ঐ চরিত্রের একটা প্যাটার্ন তোমাকে তৈরি করতে হবে। কোনটা তুমি নেবে? সবচে সহজটা নাও, যেটা তুমি জানো।'

'কোনটা আমি জানি?'

'তোমার নিজের চরিত্র তুমি জানো। ঐ চরিত্রটাই তুমি স্টেজে নিয়ে আসবে। মঞ্চে তুমি দেখবে তোমার স্বামীকে। এই স্বামী কিন্তু মিথ্যা স্বামী না। মঞ্চে সে তোমার সত্যিকার স্বামী। এটা যখন তোমার মনে হবে তখনই তুমি পাস করে গেলে।'

'আমার ভয় ভয় লাগছে।'

'কোনো ভয় নেই। তুমি সংলাপগুলি একটু দেখে নিয়ে মঞ্চে যাও, আমি তোমার ভয় কাটিয়ে দিচ্ছি।'

'জি আচ্ছা।'

'পুষ্প, আরেকটা কথা তোমাকে বলি শোন, এটাও খুব জরুরি। রিহার্সেলে রোজ বালিকা বধূর মতো সেজে আসবে। এতে সাহায্য হয়। ঘরোয়া ধরনের শাড়ি পরবে, চুলগুলি খোলা রাখবে। একটু পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে ফেলবে। কাচের চুড়ি আছে না তোমার? হাতে বেশ কিছু কাচের চুড়ি পরে নিও। কথা বলার সময় হাত নাড়বে; চুড়ির ঝনঝন শব্দ হবে   এতে খুব সাহায্য হবে।'

'জি আচ্ছ।'

'এখন যাও নাটকটা একটু পড়। ছোট্ট দৃশ্য। দু'তিনবার পড়লেই মনে এসে যাবে। তোমার ভয়টা একটু কমেছে, না ভয় এখনো আছে?'

'এখনো আছে।'

'থাকবে না।'

দৃশ্যটা আসলেই ছোট। এই দৃশ্যও লেখকের স্ত্রী লেখকের সঙ্গে রসিকতা করতে থাকে। লেখক ক্রমেই রেগে যেতে থাকে। এক সময় রাগ অসম্ভব বেড়ে যায়। সে তার স্ত্রীর গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়। ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে যে লেখক হতভম্ব হয়ে যান। গভীর বিস্ময় ও গভীর বেদনা নিয়ে লেখকের স্ত্রী লেখকের দিকে তাকান। লেখক এসে জড়িয়ে ধরেন তাঁর স্ত্রীকে। দু'হাতে স্ত্রী মুখ তুলে চুমু খান তাঁর ঠোঁটে। পুষ্পের কেমন জানি লাগছে। সত্যি কি চুমু খাবে? সত্যি জড়িয়ে ধরবে? পুষ্পের গা কাঁপছে, খুব অস্থির লাগছে। তার ইচ্ছা করছে সে চেঁচিয়ে বলে- - আমি এই দৃশ্য করব না। আবার করতেও ইচ্ছা করছে। স্বামীর প্রতি তার খুব রাগ লাগছে, আবার খুব মমতাও লাগছে। এ রকম একজন লেখক স্বামী যদি তার হত তাহলে বেশ হত। তার ভাগ্যে কি আর এ রকম কেউ আসবে? হয়ত এলেবেলে ধরনের কারো সঙ্গে বিয়ে হবে। রাত জেগে গল্প

করার বদলে সে হয়ত ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুবে। ঘুমের ঘোরে ভারী একটা পা তুলে দেবে তার গায়ে।

আসিফ মঞ্চে এসে দাঁড়াল। সহজ স্বরে বলল, 'এস শুরু করা যাক।' বলেই সে বদলে গেল। পুষ্প মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখল এই লোকটা নিমিষের মধ্যে কি করে যেন বদলে গিয়ে লেখক হয়ে গেল। লেখক এবং তার স্বামী। খুবই নিকটের কেউ।

লেখক : অসাধারণ একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে জরী। অসাধারণ উপন্যাসের ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় এটা শুরু হবে। একটা শহর। মনে করা যাক এই ঢাকা শহর। এর উপর ঝড় আসছে, প্লাবন আসছে, মহামারী আসছে। শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু। কেমন হবে বল তো?

জরী : খুব ভাল হবে।

লেখক : একের পর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রথমে ঝড়, তারপর বন্যা, তারপর...

জরী : একটা ভূমিকম্প দিয়ে দাও।

লেখক : রাইট, ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

জরী : বিরাট একটা ভূমিকম্প হোক। সেই ভূমিকম্পে পুরো ঢাকা শহর তলিয়ে যাক।

লেখক : ঠাট্টা করছ?

জরী : না, ঠাট্টা করছি না। একদিন দেখা যাবে যেখানে ঢাকা শহর ছিল, সেখানে বিরাট একটা হ্রদ।

লেখক : কি বলছ তুমি!

জরী : আমরা সেই হ্রদের পাশে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘর বানাব। আমাদের একটা নৌকা থাকবে। নৌকায় করে আমরা হ্রদের ঘুরব।

[লেখক প্রচণ্ড রাগে স্ত্রীর গালে চড় বসিয়ে দিলেন। পরমুহূর্তেই স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলছেন।]

লেখক : প্লিজ, জরী প্লিজ। আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি ভুল করে ফেলেছি।

অভিনয় শেষ হয়েছে। আসিফ এখনো পুষ্পকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। হাতের বাঁধন এতটুকুও আলগা না করে সে বলল, 'মজনু গ্লাসে করে পানি আন তো, মেয়েটা ফেইন্ট হয়ে গেছে।'

আসিফ খুব সাবধানে পুষ্পকে টেবিলে শুইয়ে দিয়ে সহজ গলায় বলল, 'বজলু ভাই, খুব বড় মাপের একজন অভিনেত্রী পেয়ে গেলেন। আপনার উচিত আমাকে মিষ্টি খাওয়ানো।'

বজলু ভাই মানিব্যাগ বের করে সত্যি সত্যি একশ টাকার একটা নোট বের করলেন মিষ্টির জন্যে।

পুষ্প টেবিলে উঠে বসে ঘোর লাগা চোখে চারদিকে তাকাচ্ছে। আসিফের দিকে চোখ পড়তেই আসিফ বলল, 'তুমি যে কত ভাল করেছ তুমি নিজেও জান না।'

পুষ্প কিছু বুঝতে পারছে না। সব কিছু তার কেমন জানি এলোমেলো হয়ে গেছে। এই জায়গাটা কি? তাদের বাসা? নাকি অন্য কোনো জায়গা?'

হাশমত আলি বিকেলে বাজার করে ফিরেছে। সস্তায় পেয়েছে দুটো বিশাল সাইজের ইলিশ। বৈশাখ মাসের শুরু ইলিশ মাছে স্বাদ এসে গেছে। এই সময়ে এত সস্তায় ইলিশ পাওয়ার কথা না। ভাগ্যক্রমে পাওয়া গেছে।

বারান্দায় মাছ কাটা হচ্ছে। বটিটা বেশ ধারালো কচ কচ করে কেটে যাচ্ছে। দেখতে ভাল লাগছে। খুকিকে কোলে নিয়ে হাশমত আলি মুগ্ধ চোখে মাছ কোটা দেখছে। তার জীবনের এটা একটা আনন্দঘন মুহূর্ত।

লীনা চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। হাশমত বলল, 'ভাবী মাছ দেখলেন? পেটটা কেমন গোল। এর স্বাদই অন্য রকম। রাতে আমাদের সঙ্গে খাবেন ভাবী, মনে থাকে যেন।'

লীনা বলল, 'আমি তো খেতে পারব না। আপনার ভাইকে খাইয়ে দেবেন। আমি একটু মা'র বাসায় যাচ্ছি।'

'তাহলে এমনি এমনি এক টুকরা মাছ খান। বেনু ভেজে দেবে।'

'না ভাই থাক।

'এক মিনিট লাগবে। ইলিশ মাছ ভাজা হতে এক মিনিটের বেশি লাগে না।'

'আমার ইচ্ছা করছে না। শরীরটা ভাল না। ফ্রিজে থাকুক। একসময় খাব।'

'ফ্রেস জিনিস তো আর পাচ্ছেন না ভাবী।'

'ফ্রেস জিনিস তো সব সময়ই আপনার কাছ থেকে পাচ্ছি, তাই না? হাশমত সাহেব।'

'জি ভাবী।'

'আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল আপনি কী একটু বসার ঘরে আসবেন। বেনুর সামনে বলতে কেমন জানি সংকোচ বোধ করছি।'

বেনু বিস্মিত হয়ে তাকাল। হাশমত আলি নিঃশব্দে উঠে এল বসার ঘরে। অবাক হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার ভাবী?'

'এ মাসের বাড়ি ভাড়াটা কী আপনি দিয়ে দেবেন? একটু সমস্যা হচ্ছে। আমি দিন দশেকের মধ্যে--'

'এটা কোনো ব্যাপারই না ভাবী। এটা নিয়ে আপনি চিন্তাই করবেন না। এই মাস কেন? দরকার হলে ছ'মাসের ভাড়া দিয়ে রাখব। আপনি আমাকে ভাবেন কী?'

লীনা খুব কৃতজ্ঞ বোধ করছে। হাশমত আলিকে এই কথাটা কি করে বলবে এটা ভাবতে তার মাথা ধরে গিয়েছিল। এখন মাথা ধরাটা নিমিষের মধ্যে চলে গেছে।

হাশমত আলি বলল, 'কথাটা বেনুর সামনে না বলে ভাল করছেন। টাকা-পয়সার কোনো কথায় মেয়েছেলে থাকা উচিত না।'

লীনা হেসে বলল, 'আমি নিজেও তো মেয়েছেলে।'

'কি যে বলেন ভাবী, কোথায় আপনি আর কোথায় বেনু। আকাশ আর পাতাল ফারাক।'

লীনা বলল, 'আপনার ভাই এলে বলবেন আমি মা'র কাছে গিয়েছি। রাতই ফিরব। সে যেন খেয়ে নেয়।'

'জি আচ্ছা বলব। আপনি একটা ছাতা নিয়ে যান ভাবী। দিনের অবস্থা ভাল না । ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।'

'ছাতা লাগবে না।'

'লাগবে না বলছেন কি? অবশ্যই লাগবে। লেডিস ছাতা ঘরে আছে। ব্রান্ড নিউ। জাপানি।'

হাশমত নিজেই লেডিস ছাতা বের করে আনল।

লীনার বাবা ওয়াদুদুর রহমান সাহেব চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর বাড়ি তৈরিতে হাত দিয়েছিলেন। ঝিকাতলায় তাঁর জমি কেনা ছিল। রিটায়ার করবার সঙ্গে সঙ্গে যুবকের উৎসাহে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর সার্বক্ষণিক ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে বাড়ি। চমৎকার দখিনদুয়ারি বাড়ি। ইস্টার্ন রীতি অনুযায়ী বিরাট বারান্দা থাকবে, আবার ওয়েস্টার্ন ধরনে প্রতিটি ঘরে থাকবে বিল্ট ইন কাবার্ড। লোকজন বাথরুম বানানোয় কিপটেমী করে, তিনি করবেন না। বাথরুমে ঢুকেই যেন খোলামেলা ভাব হয়। প্রতিটি বাথরুমে থাকবে ঝকঝকে বাথটাব। দরজা-জানালা হবে সিজন করা বার্মা টিকের। আজকাল কি সব কাঠ দিয়ে দরজা-জানালা করে, গরম কালে ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হয়।

ওয়াদুদুর রহমান সাহেব প্রতিটি জিনিস নিজে পছন্দ করে কিনলেন। মিস্তিরিরা সিমেন্ট বালি মিশিয়ে মশলা তৈরি করে, তিনি পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। ইট বিছিয়ে দেয়াল তৈরি হয় তিনি আগ্রহে দেখেন, মাঝে মাঝে দির্দেশ দেন ঐ ইটটা বদলে দাও বসির মিয়া। ইটটা বাঁকা।

বসির মিয়া বদলাতে চায় না। তিনি বড়ই বিরক্ত হন।

'আহা বদলাতে বললাম না? ইটের কি অভাব হয়েছে যে একটা ক্রিপলড ইট দিতে হবে। চেঞ্জ ইট।'

রিটায়ার করার পরও হয়ত ওয়াদুদুর রহমান সাহেবের কুড়ি বছরের মতো আয়ু ছিল, সেই আয়ু বাড়ি তৈরি করতে গিয়ে তিনি খরচ করে ফেললেন। ছাদ ঢালাইয়ের পর দিন স্ট্রোকে মারা গেলেন।

কারো জন্যেই কিছু থেমে থাকে না। যথাসময় বাড়ি শেষ হল। দোতলা করা গেল না। একতলা বানাতেই সঞ্চিত প্রতিটি পয়সা শেষ হয়ে গেল। লীনার মা সুলতানা বেগম একতলা বাড়ির দুটো ঘর নিয়ে থাকেন। বাকিটা ভাড়া দিয়েছেন তাঁর ডাক্তার জামাইকে। এই ডাক্তার জামাই বাড়িটাকে মোটামুটি একটা হাসপাতাল বানিয়ে ফেলেছে। রোজ বিকাল চারটা থেকে রাত

আটটা পর্যন্ত এখানে রুগী দেখা হয়। ভদ্রলোকের ভাল পসার হয়েছে। রুগীতে সারাক্ষণ বাড়ি ভর্তি থাকে। সুলতানার গা শিরশির করে, কিন্তু জামাইকে কিছু বলতে পারেন না।

আজ শুক্রবার। ডা. জামান শুক্রবারে রুগী দেখেন না, তবু দু-তিন জন রুগী বাইরের বারান্দায় বসে আছে। ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা না করে তারা কিছুতেই যাবে না। লীনাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে তাকেই ধরল, 'আপা ডাক্তার সাহেবকে একটু বলে দেন। খুব বিপদে পড়েছি।'

লীনা মা'র শোবার ঘরে ঢুকতেই একসঙ্গে সবাই হৈচৈ করে উঠল। লীনার বড় বোন দীনা বলল, 'ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রিকশা নিয়ে চলে এলি? তোকে আনতে গাড়ি গেছে।' সবচে ছোট বোন নীনা বলল, 'একটা লেটেস্ট মডেল গাড়িতে চড়া মিস করলে আপা। দুলাভাই নতুন গাড়ি কিনেছে। বড় আপাদের এখন দুটো গাড়ি।' সুলতানা বললেন, 'জামাইকে আনলি না কেন? আমরা নাটক করি না বলে বুঝি আমাদের বাড়িতে আসা যাবে না।'

নাটকের একটা খোঁচা না দিয়ে সুলতানা মেজো জামাই সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন না। আজও পারলেন না। লীনার মনটা খারাপ হয়ে গেলেও সহজ স্বরে বলল, 'ওর কাজ আছে মা, রাত দশটার আগে ছাড়া পাবে না।'

সুলতানা তিক্ত গলায় বললেন, 'আমার তিন জামাইয়ের মধ্যে মেজোটাই সবচে কাজের হয়েছে। রাত দশটা-এগারোটার আগে কোনোদিন ছাড়া পায় না।'

লীনা বলল, 'জামাই প্রসঙ্গ থাক মা। সবাই তো আর এক রকম হয় না। কেউ কাজের হয়, কেউ হয় অকাজের - কি আর করা। কি জন্যে ডেকেছ বল? কারো জন্মদিন-টিন নাকি? আমি তো কিছু মনে করতে পালাম না। ফুল নিয়ে এসেছি। যার জন্মদিন সে নিয়ে নিক।'

নীনা ছুটে এসে ফুল নিয়ে নিল। নীনার কাছ থেকে ফুল নেবার জন্যে বড় জামাই ঝাঁপিয়ে পড়ল। নীনা তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'প্লিজ আমার ফুলগুলি সেভ কর।' বলেই সে ফুলের তোড়া ক্রিকেট বলের মত ছুড়ে মারল স্বামীর দিকে। সুলতানা কপট বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে বললেন, 'এরা সব সময় কি যে যন্ত্রণা করে। এই তোরা চা খাবি না কফি খাবি? যেটাই খাবি একটা। দু-তিন পদের জিনিস বানাতে পারব না।'

দীনা ও দীনার স্বামী জামান সাহেব বললেন, 'কফি।'

নীনা বলল, 'চা।'

নীনার স্বামী লুৎফুল হক চেঁচিয়ে বলল, 'সরবত।'

চারদিকে তুমুল হাসি শুরু হল। লীনা মনে মনে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এই সব চমৎকার হাসিখুশির মুহূর্তগুলিতে আসিফ কখনো অংশ নিতে পারে না। মাঝে মাঝে সে যে উপস্থিত থাকে না তা নয়। থাকে, কিন্তু বড়োই বিব্রত বোধ করে। দেখে মনে হয় তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

সবাইকে একত্র করার উদ্দেশ্য ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জামান সাহেব বললেন, 'রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর অফিসিয়ালি সেটা বলা হবে। টপ সিক্রেট। এখন আমি আমার নতুন গাড়িতে সবাইকে নিয়ে একটা চক্কর দেব। এখান থেকে সাভার যাব - সাভার থেকে ফিরে আসব। টাটকা হাওয়ায় খিদেটা জাগবে। আমাকে বিশ মিনিটের জন্যে ক্ষমা করতে হবে। আমার কয়েকটা রুগী বসে আছে। বিদেয় করে আসি।'

লুৎফুল বলল, 'ছুটির দিনেও রুগী দেখেন! এত টাকা দিয়ে করবেন কি দুলাভাই? লোকজন ব্লাড প্রেসারে মারা যায়- আপনি দেখি টাকার প্রেসারে মারা যাবেন।'

জামান সাহেব ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। সুখী মানুষের হাসি। সুখী মানুষ অতি তুচ্ছ রসিকতায় হেসে ভেঙে পড়তে পারে।

নিমন্ত্রণের রহস্য জানা গেল রাতের খাবারের পর। জামান সাহেব ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দিলেন। তিনি সবাইকে নিয়ে কাশ্মির যেতে চান। শুধু কাশ্মির না - আগ্রা। জয়পুর এবং কাশ্মির। থাকা খাওয়ার যাবতীয় খরচ তাঁর। দুই শ্যালিকা এবং শাশুড়ির টিকিটও উনি কাটবেন। অন্য কেউ যেতে চাইলে তাদের টিকিট তাদের কাটতে হবে। এই ভ্রমণে বাচ্চারা কেউ যাবে না।

লুৎফুল বলল, 'আমার টিকিট কাটবেন না, এর মানেটা কি দুলাভাই?'

'আমার কর্তব্য হচ্ছে শ্যালিকা পর্যন্ত, এর বাইরে না।'

নীনা বলল, 'আপনি কি সত্যি মিন করছেন দুলাভাই?'

'তোমার সন্দেহ আছে নাকি?'

'হ্যাঁ আছে। আপনার মধ্যে যে একজন হাতেমতাই লুকিয়ে আছে সেটা জানা ছিল না।'

'এখন জানলে?'

'তা জানলাম। যাচ্ছি কবে আমরা?'

'সামনের মাসের এগারো তারিখে, ফিরব বাইশ তারিখ। দীনা, তুমি ওদের টিকিট ওদের দিয়ে দাও।'

নীলা বিস্মিত হয়ে বলল, 'টিকিটও কেটে ফেলেছেন!'

'অফকোর্স। আমি কাঁচা কাজ করি না। ঢাকা-দিল্লি-ঢাকা রিটার্ন টিকিট।'

লীনা কিছুই বলল না। চুপচাপ বসে রইল। জামান সাহেব বললেন, 'আমার মেজো শালীকে দেখে মনে হচ্ছে তার ফাঁসির হুকুম হয়েছে। লীনা তুমি এমন মুখ কালো করে বসে আছ কেন?'

'আমার শরীরটা ভাল না দুলাভাই।'

'তুমি যাচ্ছ তো।'

'না দুলাভাই।'

'না কেন? তোমার বরকে ছেড়ে এই দশটা দিন তুমি থাকতে পারবে না?'

'তা না।'

'তাহলে অসুবিধাটা কোথায়।'

'অসুবিধা কিছু নেই।'

জামান সাহেব নিজেই লীনাকে গাড়ি করে পৌঁছে দিলেন। কোমল গলায় বললেন, 'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেতে চাচ্ছ না।'

লীনা বলল, 'আপনি ঠিকই বুঝেছেন।'

'কর্তাকে ছাড়া যেতে মন চাচ্ছে না?'

লীনা চুপ করে রইল। জামান সাহেব বললেন, 'লীনা তোমাকে আমি খোলাখুলি কিছু কথা বলি। কিছু কিছু কথা সরাসরি হওয়াই ভাল। দেখ লীনা, তোমাদের আর্থিক অবস্থার কথা আমি ভালভাবেই জানি। সেটা জেনে তোমার কর্তার জন্যে একটা টিকিট আমার কেন উচিত। কিনতেও আমার কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু মুশকিল কি জানো? তোমাদের আত্মসম্মান বোধ অনেক বেশি। তোমরা আহত বোধ করবে। ভাল করতে গিয়ে মন্দ করা হবে। আমি সত্যি চাই তুমি যাও আমাদের সঙ্গে। তোমার শরীর খারাপ। বেশ খারাপ। বাইরে একটু ঘুরে-টুরে এলে ভাল লাগবে।'

লীনা কিছুই বলল না।

জামান সাহেব বললেন, 'আসিফকে নিয়ে গেলে আরেকটা বাস্তব সমস্যা আছে, সেটাও তোমাকে খোলাখুলি বলি। তোমার মা, আই মিন আমার শাশুড়ি আসিফকে তেমন পছন্দ করেন না। এগারো দিন এক সঙ্গে থাকতে হবে। এর মধ্যে তিনি অনেকবার আসিফকে নিয়ে অনেক অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলবেন। তোমার খুব খারাপ লাগবে।'

লীনা বলল, 'আপনিইবা হঠাৎ দল বেঁধে বাইরে যাবার ব্যাপারে এত উৎসাহী হলেন কেন?'

'খুব ক্লান্ত লাগছে। টাকা বানানোর একটা মেশিন হয়ে পড়েছি। সারাদিন হাসপাতালে থাকি। বাসায় ফিরে বিশ্রামের বদলে রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত রুগী দেখি। জীবনটা মানুষের রোগ-শোকের মধ্যে আটকা পড়ে আছে। মুক্তি চাচ্ছি। কিছু সময়ের জন্যে হলেও মুক্তি। মাঝে মাঝে তোমাদেরকে আমার বেশ হিংসাই হয়। মনে হয় বেশ সুখেই তো তোমরা আছ।'

'আপনি কী অসুখে আছেন?

'হ্যাঁ অসুখেই আছি। উত্তরায় বাড়ি করছি। কত রকম প্ল্যানিং; কত পরিকল্পনা। ফলের গাছ কি কি থাকবে, ফুলের গাছ কি কি থাকবে। অথচ আমি নিজে ডাক্তার, আমি খুব ভাল করে জানি আমরা যে বেঁচে আছি এইটাই পরম আশ্চর্যের ব্যাপার। দীর্ঘ পরিকল্পনা অর্থহীন।'

'ফিলসফার হয়ে যাচ্ছেন দুলাভাই। এটা তো ভাল লক্ষণ না।'

'ফিলসফার হতে পারলে তো কাজই হত। হাইলি মেটেরিয়েলিস্টিক মানুষ হয়ে জন্মেছি। এ ভাবেই মরব। আমার মত সাকসেস্‌ফুল ডাক্তারদের এটাই হচ্ছে ডেসটিনি।'

অনেক রাতে আসিফের ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার, বাইরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়েছে। খোলা জানালায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে। হাওয়ায় মশারি উড়ে উড়ে যাচ্ছে। আসিফ বিছানায় উঠে বসল। লীনা

পাশে নেই এটা নতুন কিছু না প্রায় রাতেই ঘুম ভাঙলে লীনাকে পাশে দেখা যায় না। সে একাকী বারান্দার বেতের চেয়ারটায় বসে বাড়ির সামনের ঝাঁকড়া কাঁঠাল গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে। আজও নিশ্চয়ই তাই আছে।

আসিফ বাতি জ্বালাল না। নিঃশব্দে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। লীনা তার দিকে তাকিয়ে হাসল। যেন সে জানত এই মুহূর্তে আসিফ এসে তার পাশে বসবে।

'কি করছ লীনা?'

'কিছু না। বৃষ্টি দেখছি।'

'ঘুম আসছে না?'

'উঁহু।'

'ডাক্তার দেখাচ্ছ না কেন?'

'দেখাব। বস আমার পাশে। বৃষ্টি দেখতে দেখতে খানিকক্ষণ গল্প করি।'

আসিফ বসতে বসতে মৃদু স্বরে বলল, 'একা একা বসে তুমি কি ভাব বল তো?'

'সাধারণত কিছু ভাবি না, আজ অবশ্যি ভাবছিলাম--- কাশ্মির জায়গাটা দেখতে কেমন হবে। নিশ্চয়ই খুব সুন্দর, তাই না?'

'সুন্দর তো বটেই।'

'সব সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলি ইন্ডিয়াতে পড়ে গেল। রাগ লাগে না তোমার?'

'লাগে।'

'কাশ্মির জায়গাটা কেমন হবে ভাবতে ভাবতে কি ঠিক করলাম জানো? ঠিক করলাম আমি দুলাভাইয়ের সঙ্গে ঘুরেই আসব।'

'খুব ভাল, যাও ঘুরে আস। তোমার কাছে যদি ভাল লাগে তাহলে পরে আমরা দুজন আবার যাব। হাউস বোট ভাড়া করে থাকব।'

'কাশ্মির দেখার জন্যে আমি যাচ্ছি না। কিন্তু আমি যাচ্ছি অন্য কারণে।'

'অন্য কারণটা কি?'

'আমি আজমীর যাব। আজমীর শরীফে গিয়ে যা চাওয়া যায় তাই নাকি পাওয়া যায়। আমি ঐ জন্যেই যাব। যেন আমাদের এই বারের বাচ্চাটা বেঁচে থাকে।'

'ওর বয়স কত হল লীনা?'

'তিন মাস। তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি কিন্তু ওর হার্টবিট বুঝতে পারি।'

'সত্যি।'

'হ্যাঁ সত্যি। তবে সব সময় না। গভীর রাতে যখন একা একা বসে থাকি তখন।'

'এই জন্যেই কি তুমি রাত জাগ?'

হুঁ'।

আসিফ সিগারেট ধরাল। তার পাশে বসে থাকা এই মেয়েটি তার কত দিনের চেনা, অথচ গভীর রাতে সে যখন একা একা বসে থাকে তখন কেমন অচেনা হয়ে যায়।

লীনা বলল, 'অনেকদিন তোমাদের রিহার্সেলে যাই না। রিহার্সেল কেমন হচ্ছে?'

'বেশি ভাল হচ্ছে না। শো পিছিয়ে দিয়েছে, সব কেমন ঢিলাঢালা হয়ে গেছে'

'পুষ্প মেয়েটা কেমন করছে?

'ভাল করছে।'

'আমার চেয়েও ভাল?'

'হ্যাঁ, তোমার চেয়েও ভাল।'

'আমাকে যেমন অভিনয়ের আগে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলে, ওকেও কি দিয়েছিলে?'

হুঁ।

'আচ্ছা ষষ্ঠ দৃশ্যে তুমি যখন পুষ্পকে জড়িয়ে ধর, তখন তোমার কেমন লাগে?'

আসিফ অবাক হয়ে বলল, 'এই প্রশ্ন করছ কেন?'

'এমনি করছি, কিছু মনে করো না।'

বৃষ্টির বেগ আরো বাড়ছে। ঝড়ের মত হচ্ছে।

জামগাছের পাতায় শোঁ শোঁ শব্দ। ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়েছে। সমস্ত শহর অন্ধকারে ডুবে

গেছে। আসিফ বলল, 'চল শুয়ে পড়ি'। লীনা বিনাবাক্যব্যয়ে উঠে এল। দুজনের কেউই বাকি রাত ঘুমুতে পারল না। আসিফ জেগে জেগে শুনল বৃষ্টির শব্দ, লীনা শুনতে চেষ্টা করল অনাগত শিশুটির হৃৎপিণ্ডের শব্দ।

হাঞ্চ ব্যাক অব মীরপুর পিঠ সোজা করে মতিঝিলের ট্রাভেল এজেন্সি সুরমা ট্রাভেলস-এ ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে আসিফ। বিশাল অফিস। দুজন স্টেনো বা রিসিপশনিস্ট ধরনের মেয়ে বসা। একজনের দিকে তাকানো যায় না। মৈনাক পর্বত। তবে অন্য জন রূপবতী। মৈনাক পর্বত মধুর গলায় বলল, 'আপনাদের জন্যে কি করতে পারি?'

বজলু সাহেব বললেন, 'কেরামত আছে?'

'জি আছেন। এখন একটু ব্যস্ত।'

'আমিও ব্যস্ত। আপনি দয়া করে বলুন, ভৈরবের বজলু।'

মৈনাক পর্বত বিরক্ত ভঙ্গিতে ভেতরে চলে গেল। বজলু আসিফকে নিচু গলায় বললেন, 'তুমি এখানেই বসে থাক। আমি একা যাই। দরকার হলে তোমাকে ডাকব।'

আসিফ বলল, 'দরকার হবে বলে মনে করছেন?'

'অবশ্যই হবে। কেরামত আমার কথা ফেলবে না। ওর সেই ক্ষমতাও নেই। এসএম হলে লিটারেলি আমিই ওকে ফেলেছি।'

'পুরনো কথা কেউ মনে রাখে না বজলু ভাই।'

'দেখা যাক। আগেই ডিসহার্টেড হচ্ছ কেন?'

বজলু এসেছেন আসিফের চাকরির ব্যাপারে। এসেছেন খুবই উৎসাহ নিয়ে। তাঁর ধারণা এই মুহূর্তেই একটা কিছু হবে। আসতে আসতে বলেছিলেন, 'তোমার চাকরি কোনো ব্যাপারই না। যে কোনো অফিসের একজন বসকে ধরে এনে নাটক একটা দেখিয়ে দিলেই ব্যাটেল ইজ ও'ন।'

আসিফ কোনো প্রতিবাদ করেনি। যদিও বলতে চেয়েছিল নাটকের ক্ষেত্রে এটা কখনো হয় না। খেলোয়াড়দের ব্যাপারে হয়। ভাল ফুটবল প্লেয়ার, ক্রিকটে প্লেয়ারদের ডেকে ডেকে চাকরি দেয়। এরা অফিসের শোভা। কিন্তু নাটক করা লোককে কে রাখবে?

মৈনাক পর্বত বজলু সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেল। আসিফ বসে রইল। সুন্দরী মেয়েটি বলল, 'আপনি চা খাবেন?

'জি খাব।'

মেয়েটি কেমন যেন আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছে। কোনো একটা নাটক কী সে দেখেছে? অসম্ভব কিছু তো নয়। দেখতেও তো পারে। সুন্দরী মেয়েটি নিজেই চায়ের কাপ নিয়ে এগিয়ে এল। মিষ্টি গলায় বলল, 'আপনি কী মাধবীর ভাই?'

'জি না।'

মেয়েটির সব আগ্রহ শেষ। সে ফিরে গেল নিজের জায়গায়। ব্যস্ত হয়ে পড়ল টেলিফোন নিয়ে। সম্ভবত চা এনে দেয়ায় নিজের ওপরই সে এখন রাগ করছে।

কেরামত যতটা আন্তরিকতা দেখাবে বলে বজলু ভেবেছিলেন, সে তার চেয়েও বেশি দেখাল। জড়িয়ে ধরে নাচানাচি করল খানিকক্ষণ। গদগদ গলায় বলল, 'ভৈরবের বজলু যে তুমি তা বুঝতে পারিনি দোস্ত। বিশ্বাস কর। এই টাকা ছুঁয়ে বলছি। ব্যবসায়ী কখনো টাকা ছুঁয়ে মিথ্যা কথা বলে না।'

'ব্যবসা কেমন চলছে?'

'টুকটাক। ফাজিলের দেশ। ফাজিলের দেশে ব্যবসা করে সুখ নেই।'

'তুই তো মনে হচ্ছে সুখে আছিস।'

'টাকা আছে। মনে শান্তি নাই রে দোস্ত। কি জন্যে এসিছিস বল।'

'চাকরি দিতে হবে একটা।'

'এটা ছাড়া আর কিছু বলার থাকলে বল।'

'আর কিছু বলার নেই।'

কেরামত গম্ভীর হয়ে গেল। বজলু সিগারেট ধরালেন। এই ঘরের এয়ার কন্ডিশনার অনেক নিচে সেট করা। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। মনে হচ্ছে ফ্রিজের ভেতর তিনি বসে আছেন। কেরামত বলল, 'চাকরি কার?'

'আমার গ্রুপের একজন।'

'তোর আবার কিসের গ্রুপ।'

'নাটকের গ্রুপ।'

'ও আচ্ছা, এখনো নাটক নিয়ে আছিস? ভাল শিল্প সাহিত্যের কোনো খবর রাখি না। আমার বউ বলছিল মহিলা সমিতিতে ভাল ভাল নাটক হয়। সে একদিন দেখে আসল কমেডি ধরনের কিছু হবে। রাতে ঘুমুতে গিয়েও একটু পর পর হেসে ওঠে।'

বজলু বললেন, 'আসল কথা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিস।'

'তোর ক্যান্ডিডেটের যোগ্যতা কি? মানে নাটক ছাড়া আর কি জানে?'

'বি এ পাস। শুরুতে ব্যাংকে চাকরি করত, তারপর ইস্টার্ন ট্রান্সপোর্টে কিছু দিন ছিল। জীবন বীমাতে কিছুদিন কাজ করেছে।'

'অচল মাল গছাতে চাচ্ছিস।'

বজলু সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'আসিফের মত ছেলেকে চাকরির জন্য মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে এইটাই হচ্ছে আফসোসের ব্যাপার। বিলেত আমেরিকা হলে এই ছেলে টাকার ওপর শুয়ে থাকত।'

কেরামত বলল, 'কষ্ট করে কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করে এই ছেলেকে বিলেত আমেরিকা পাঠিয়ে দিলেই হয়।'

বজলু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

কেরামত বলল, 'ঠাট্টা করলাম রে দোস্ত। তোকে সত্যি কথা বলি বিজনেসের অবস্থা খুবই টাইট। তবু তুই এসেছিস এই খাতিরে আমি যা করতে পারি সেটা হচ্ছে টাইপিস্টের একটা চাকরি দিতে পারি। তবে টাইপ জানতে হবে।'

বজলু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তবু বললেন, 'তোব এখানে হবে না বুঝলাম। উঠি।'

কেরামত বলল, 'রাগ করে উঠে যাচ্ছিস তা বুঝতে পারছি। উপায় নেই দোস্ত। আমার জায়গায় তুই থাকলে তুইও ঠিক এই কথাই বলতি। পুরনো দিনের খাতিরে এক কাপ চা অন্তত খেয়ে যা। আমি মানুষটা খারাপ হতে পারি আমার অফিসের চা কিন্তু ভাল।'

বজলু চা খেলেন না। অফিস থেকে বের হবামাত্র তাঁর পিঠ আবাব কুঁজো হয়ে গেল। তবে বেশ শক্ত গলায় বললেন, 'তুমি কোনো চিন্তা করবে না। আমি একটা ব্যবস্থা করব। অবশ্যই করব। চল কোথাও বসে চা-টা কিছু খাওয়া যাক।'

আসিফ বলল, আমি একটু পুরানা পল্টনের দিকে যাব। এগারোটার মধ্যে না গেলে কাজ হবে না। চা থাক।'

'চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপার?'

'জি।'

'আচ্ছা যাও। তবে শোন, বিকেলে রিহার্সেলে আসার সময় অনেক কপি বায়োডাটা নিয়ে আসবে।'

'দেয়ার মতো বায়োডাটা তো কিছু নেই।'

'যা আছে তাই আনো না। আমার এক খালু আছেন খুবই হাই লেভেলের লোক। মন্ত্রী লেভেলের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ। তাঁকে দিয়েই কার্য উদ্ধার করতে হবে। তুমি একেবারেই চিন্তা করবে না।'

'জি আচ্ছা।'

'লীনার শরীর এখন কেমন?'

'ভাল।'

'ভেরি গুড। আমি দেখতে যাব। আজই যাব। রিহার্সেলের পর চলে যাব। রাতে খাব তোমার সাথে।

'জি আচ্ছা।'

শোন আসিফ, টাকা পয়সা কিছু লাগবে?'

'এই মুহূর্তে না।'

'কোনোরকম সংকোচ করবে না। তোমার মত মানুষকে এটা জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে— কি আফসোস বল তো।'

আসিফ হেসে ফেলল।

'হাসবে না, বুঝলে? এটা হাসির কোনো ব্যাপার না।' এটা হচ্ছে একটা গ্রেট ট্র্যাজেডি।'

আসিফের তেমন কোথাও যাবার কথা ছিল না। বজলু সাহেবের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়াই তার প্রথম উদ্দেশ্য। বজলু কাউকে ধরলে সহজে ছাড়েন না। আসিফ এখন কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। বাসায় ফিরে যাওয়া যায়। খালি বাসায় ফিরে গিয়েই বা কী হবে? লীনা আছে স্কুলে। আজ আবার স্কুলে কিসের যেন পরীক্ষা। ছুটি হবে বিকেল পাঁচটায়। ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছিল — নামঞ্জুর হয়েছে। স্কুলের চাকরিটা লীনার ছেড়েই দিতে হবে। ভয়ানক দিন সামনে। আসিফ হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে এইসব নিয়ে গুছিয়ে একটা নাটক লিখতে পারলে বেশ হত। তবে এই নাটক দর্শক নিত না। নাটকের বক্তব্য যাই হোক, তার মধ্যে বিনোদন থাকতে হবে। রিলিফ থাকতে হবে। ফিকাসোর যে ছবি, তারও বিনোদনের একটি দিক আছে।

সবচে কঠিন বক্তব্যের নাটকেও আছে রিলিফের ব্যবস্থা। কুইনাইন সরাসরি গেলা যায় না। মিষ্টি চিনির প্রলেপ দিয়ে দিতে হয়।

দুপুর দেড়টার দিকে আসিফ উপস্থিত হল তার বড় দুলাভাইয়ের অফিসে। নিকট আত্মীয়দের মধ্যে অল্প যে ক'জনের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে ফরহাদ সাহেব হচ্ছেন তাঁদের একজন। এক সময় সরকারি চাকুরে ছিলেন। রোডস এন্ড হাইওয়েজের ইঞ্জিনিয়ার। চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন কনসট্রাকশান ফার্ম দিয়েছেন। সাধারণত ইঞ্জিনিয়াররা ব্যবসা শুরু করলে দ্রুত বড়লোক হয়ে যায়। এর বেলায় ব্যতিক্রম হয়েছে। আগে যা ছিলেন এখন তাই আছেন। কাজকর্ম নাকি তেমন জোগাড় করতে পারেন না। আসিফ যখন তাঁর কাছে আসে, দেখে - তিনি চেয়ারে পা তুলে বসেছেন। হাতে ম্যাগাজিন। দেশী-বিদেশী অসংখ্য ম্যাগাজিন তাঁর টেবিলে থাকে। তিনি সব ম্যাগাজিন গভীর আগ্রহে পড়েন।

ফরহাদ সাহেব মানুষটা ছোটখাটো। বেমানান বিশাল গোঁফ আছে। গোঁফের আড়ালে ঠোঁট ঢাকা বলে কখন হাসছেন তা বোঝা যায় না, মনে হয় সারাক্ষণই রেগে আছেন। আসিফকে ঢুকতে দেখে হাতের ম্যাগাজিন না নামিয়ে এবং আসিফের দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'টাকা ধার চাইতে এসেছ?'

আসিফ বলল, 'হ্যাঁ।'

'কত?'

'লাখ খানিক।'

'বস।'

আসিফ বসল। ফরহাদ ম্যাগাজিন নামিয়ে রাখলেন, গোঁফের আড়ালে হাসলেন। পর মুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিছু হয়নি এখনো?'

'না।'

'হবে বলে কি মনে হচ্ছে?'

'না হচ্ছে না।'

'হতাশ?'

'জি হতাশ।'

'খুব হতাশ?'

'হ্যাঁ।'

'দুপুরে খাওয়া হয়েছে?'

'জি না।'

'চল কোথাও গিয়ে খাই। পেটে খুব ক্ষুধা থাকলে হতাশ ভাবটা বেশি থাকে। জাতি হিসেবেই আমরা হতাশ কেন জানো? হতাশ, কারণ বেশির ভাগ মানুষ ক্ষুধার্ত। বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

'না বোঝনি। এটাই সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ, যেখানে ক্ষুধাকে খুব সম্মানের চোখে দেখা হয়। এই দেশের কবি লেখেন, 'হে দারিদ্র্য তুমি মোরে করেছ মহান।' দারিদ্র্য মানুষকে মহান করে না, পঙ্গু করে ফেলে।'

'খুবই ফিলসফিক কথাবার্তা বলছেন দুলাভাই।'

'বলছি, কারণ আমার অবস্থা কাহিল। তোমার বোন সেই খবরটা এখনো জানে না। সে সুখে আছে।'

'ব্যবসাপাতি খারাপ যাচ্ছে?'

'ইয়েস। কি পরিমাণ খারাপ, তুমি চিন্তা করতে পারবে না। মোটা এমাউন্টের টাকা ঘুষ দিয়ে একটা কনট্রাক্ট দেই। কাজ শুরু মাত্র সবাই হাঁ করে ফেলে— প্রতিটি মানুষকে টাকা খাওয়াতে হয়। যে রাস্তায় ছ'ইঞ্চি বিটুমিন দেওয়ার কথা সেখানে দিই এক ইঞ্চি। প্রথম বৃষ্টিতেই সেই বিটুমিন ধুয়ে মুছে যায়। আবার টেন্ডার হয়। আবার টাকা খাওয়াখাওয়ি। তুমি বিশ্বাস কর— বাংলাদেশে কোথাও কোন সৎ মানুষ নেই। সৎ মানুষ এখন আছে কোথায় জানো? গল্প, উপন্যাস এবং তোমাদের নাটকে।'

ফরহাদ সাহেব আসিফকে নিয়ে দামি একটা রেস্টুরেন্টে গেলেন। নতুন রেস্টুরেন্ট, বিদেশীরাই বেশির ভাগ ভিড় করছে। রেস্টুরেন্টের বিশেষত্ব হচ্ছে সঙ্গে বার আছে। ফরহাদ সাহেব খাবারের অর্ডার দিয়ে পর পর ছ'পেগ হুইস্কি খেয়ে চোখ লাল করে ফেললেন। আসিফ অবাক হল। ফরহাদ সাহেবের এই ব্যাপারটা তার জানা ছিল না। ভাল মানুষ ধরনের লোক ছিলেন। তাঁর ব্যবহার এবং স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে দুপুরবেলায় মদ্যপানটা ঠিক মানাচ্ছে না।

ফরহাদ সাহেব বললেন, 'আসিফ তোমরা নাটক কেন কর?'

আসিফ কিছু বলল না। ফরহাদ সাহেব মুখ খানিকটা এগিয়ে এনে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'পত্রিকা ওল্টাতেই দেখি গ্রুপ নাটকের মটো হচ্ছে – আমরা নাটক করি সমাজ বদলাবার জন্যে। এইসব ফালতু কথা তোমরা কেন বল? মহিলা সমিতির ফ্যানের নিচে দেড় ঘণ্টার একটা নাটক করে তোমরা সমাজ বদলে ফেলবে? সমাজ কোথায় আছে তোমরা জানো?'

আসিফ হাসল। ফরহাদ সাহেব থমথমে গলায় বললেন, 'হেসে ফেললে? আমি কি খুব হাস্যকর কিছু বলেছি? আমার দৃঢ় বিশ্বাস সমাজ কোথায় আছে তোমরা জানো না।'

'আপনি জানেন?'

'কিছুটা জানি। মাঝে মাঝে প্রচুর মদ্যপান যখন করি তখন কিছুটা ইনসাইট ডেভেলপ করে।'

ফরহাদ সাহেব আরো এক পেগের অর্ডার দিলেন। আসিফ একবার ভাবল বলবে— দুলাভাই বেশি হয়ে যাচ্ছে।

কিছু বলল না। ফরহাদ সাহেব গলা নিচু করে বললেন, 'থিয়েটার-ফিয়েটার কর। তোমার সন্ধানে সতেরো-আঠারো বছরের কচি মেয়ে আছে? যে সাতান্ন আটান্ন বছরের একজন বুড়োর সঙ্গে কোনো একটা ভালো হোটেলে এক রাত থাকবে? আছে এরকম কিছু তোমার সন্ধানে?'

'দুলাভাই, আপনি কি বলছেন, কিছু বুঝতে পারছি না।'

'বুঝতে পারবে না জানি। বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমার আঠারো লাখ টাকার একটা বিল আটকে আছে। আটকেছে মাত্র এক জায়গায়। যেখানে আটকেছে সেখানে যিনি আছেন তাঁর বয়স সাতান্ন-আটান্ন। তিনি আমাকে ডেকে বলেছেন, লাইফ খুব ডাল হয়ে যাচ্ছে –এটাকে ইন্টারেস্টিং করার একটা ব্যবস্থা করতে পারেন?'

'আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই পারি।'

উনি বললেন, 'আমাকে বলতে একটু ইয়ে লাগছে– '

আমি বললাম, 'আপনি কোনোরকম সংকোচ করবেন না স্যার।' তখন উনি বললেন, 'আজকাল শুনতে পাই ভেরি ইয়াং গার্লস, অনেক এ্যাডভেঞ্চারের লোভে হোটেলে হোটেলে রাত কাটাচ্ছে....বুঝতে পারছেন কি মিন করছি?'

আমি বললাম, 'পারছি।'

তিনি বললেন, 'জাস্ট একটা এক্সপেরিয়েন্সের জন্যে। পারা যাবে? আমি বললাম, 'অবশ্যই। এটা কোনো ব্যাপারই না।'

আসিফ বলল, 'আপনি কি কোনো ব্যবস্থা করলেন?'

ফরহাদ সাহেব বললেন, 'আমি কি করলাম শোন, অফিসে এসে দরজা বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলাম। আমার মেঝ মেয়ে সুমি...ওর বয়স সতেরো। চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠল, যেন সুমি এই লোকটার কোমর জড়িয়ে হোটেলে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছে। মাথায় আগুন লেগে

গেল। কি করলাম জানো?'

'কি করলেন?'

'ভদ্রলোকের স্ত্রীকে টেলিফোন সমস্ত ব্যাপারটা বললাম।'

'তারপর?'

'তারপরের কথা কিছু জানি না।'

'আপনার বিল? আপনার বিলের কি হল?'

'ঐসব এখন জানতে চাওয়া কী অর্থহীন না?'

ফরহাদ সাহেব খাবার মুখে দিচ্ছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি ঘাস চিবুচ্ছেন। অনেক কষ্টে কুৎসিত কিছু গিলে ফেলার চেষ্টা করছেন। খানিক্ষণ পর পর পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন।

'আসিফ।'

'জি।'

'মনটা খুব অস্থির। কোনো কিছুই ভাল লাগে না। অফিসে বসে সারাদিন শুধু ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাই। নাটক-ফাটক দেখলে মনটা ভাল হবে নাকি বল তো? ভাল কিছু কি হচ্ছে?'

আসিফ জবাব দিল না।

ফরহাদ সাহেব বললেন, 'রিয়েল ওয়ার্লড থেকে আনরিলে ওয়ার্লডে খানিক্ষণের জন্যে হলেও ঢুকতে ইচ্ছে করে। টিপু সুলতান, সিরাজদ্দৌলা এইসব নাটক কি আজকাল হয়, আসিফ?'

'মফস্বলের দিকে হয়।'

'তোমরা কর না কেন? ফ্যান্টাসি ধরনের জিনিস দেখতে ইচ্ছা করে। মশিয়ে লালী, নানা ফারনাবিশ, ভেরি ইন্টারেস্টিং, তাই না? তারপর একটা মেয়ে ছিল না? যে বলল – আমার বাপুজী জৌতিষ চর্চা করেন। টিপু সুলতান বলল, কে তোমার বাপুজী, কি তার পরিচয়? মেয়েটি বলল, বাপুজীকে আপনার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন তাঁর গণনায়।'

আসিফ বলল, 'দুলাভাই আপনার মনে হয় খানিকটা নেশা হয়ে গেছে।'

ফরহাদ সাহেব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'হ্যাঁ হয়েছে। আমি নিজেই বুঝতে পারছি। অভ্যাস নেই। তার ওপর গরমটাও পড়েছে প্রচণ্ড। অল্পতেই ...চল উঠে পড়ি।'

'আপনি তো কিছুই খেলেন না।'

'ইচ্ছা করছে না। টেস্টলেস সব খাবার। মনে হচ্ছে মানুষের বমি খাচ্ছি। ভাল কথা, বমির ইংরেজি কি জানো না কি? কয়েকদিন ধরেই ভাবছি কাউকে জিজ্ঞেস করব – মনে থাকে না।'

গাড়িতে উঠে ফরহাদ সাহেব আরো ঝিম মেরে গেলেন। আসিফ বলল, 'দুলাভাই আপনি কি গাড়ি চালাবেন?'

'ইয়েস। ভয় নেই, এক্সিডেন্ট করব না। স্টিয়ারিং হুইল ধরামাত্র আমি সোবার হয়ে যাই। তাছাড়া ধর এক্সিডেন্ট যদি করেই ফেলি, তেমন কী আর হবে?'

গাড়িতে উঠে ফরহাদ সাহেব সত্যি সত্যি সোবার হয়ে গেলেন। সহজভাবে গাড়ি চালাতে লাগলেন। হাসিমুখে বললেন, 'ভয় কমেছে?'

'কমেছে।'

'আসিফ, তোমার জন্যে আমি একটা ব্যবস্থা করে দেব। চিন্তা করবে না। আমাকে খানিকটা সময় দাও- ধর মাস খানিক।'

'থ্যাংকস দুলাভাই।'

'কোথায় যাবে বল, তোমাকে নামিয়ে দিই।'

'যে কোনো এক জায়গায় নামিয়ে দিলেই হবে। আমার বিশেষ কোথাও যাবার প্রোগ্রাম নেই।'

ফরহাদ সাহেব গাড়ি পার্ক করলেন। আসিফ নেমে পড়ল। ফরহাদ সাহেব বললেন, 'এক সেকেন্ডের জন্যে দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে কিছু মিথ্যা কথা বলা হয়েছে। সত্যি কথাটা বলে ফেলি।'

'কোন বিষয়ে?'

'আমি ঐ লোকের স্ত্রীকে টেলিফোন করিনি। ভদ্রলোক যেমন চেয়েছেন সেই মতো ব্যবস্থা হয়েছে। গত পরশু আমি বিল পেয়েছি। যাই, কেমন?'

ফরহাদ সাহেব গাড়ি নিয়ে ছুটে বের হয়ে গেলেন। রাস্তায় যানবাহনের জটলা, কিন্তু তাঁর গাড়ি

দ্রুত চলছে। আসিফ লাল রঙের গাড়িটির দিকে তাকিয়ে রইল।

একজন মানুষের সঙ্গে অন্য একজন মানুষের সম্পর্কের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। আসিফ নিজের আত্মীয়-স্বজন কারোর সঙ্গেই কেমন যেন সহজ হতে পারে না। অদৃশ্য একটা পর্দা থেকেই যায়। অথচ এই মানুষটিকে খুবই আপন মনে হয়। যদিও আসিফের বোনের সঙ্গে এই লোকটির তেমন অন্তরঙ্গতা বিয়ের এত বছরেও তৈরি হয়নি। কুৎসিত সব ঝগড়া।

অন্য বোনদের সঙ্গে তাদের স্বামীদের ভাব-টাব কেমন আসিফ জানে না। অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই হয়। মা বেঁচে থাকতে খানিকটা যোগাযোগ ছিল। মা পালা করে এককে মেয়ের বাসায় থাকতেন। ঈদ উপলক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বোনদের সঙ্গে দেখা হত। বোনরা কড়া কড়া কথা শোনাত, যার মূল ভাব একটিই-- আসিফ ভয়াবহ একটা চরিত্র। আসিফের মেজো বোন একটি কথা প্রায় সরাসরি বলে, 'বাবা এত সকাল মরে গেল শুধু আসিফের কারণে। আসিফ বাবাকে কষ্ট দেয়ার জন্যেই ইচ্ছা করেই পড়াশোনা ছেড়ে দিল। নয়ত যে ছেলে ফাইভের বৃত্তি পরীক্ষায় ডিসট্রিক্টে ফার্স্ট হয়, সে কি করে মেট্রিক প্রথমবারে ফেল করে দ্বিতীয়বারে থার্ড ডিভিশনে পাস করে, আইএ তে কম্পার্টমেন্টাল পায়! বাবা মরে গেল এই দুঃখে।'

যে কোনো কথাই অনেকবার শুনলে সেটাকে সত্যি মনে হয়। রেসকোর্সের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এই মুহূর্তে আসিফের মনে হচ্ছে মেজো আপার কথা সত্যি হলেও হতে পারে। বৈশাখ মাসের দুপুরে হাঁটতে হাঁটতে সে খানিকটা বিষণ্ন বোধ করল। তার মনে হল সব মানুষের অন্তত একবার করে হলেও জীবন গোড়া থেকে শুরু করবার সুযোগ থাকলে ভালো হত। বড় ধরনের ভুলগুলির একটি অন্তত শোধরানো যেত।

তার সবচেয়ে বড়ো ভুল কোনটা? নাটক? আর লীনা? লীনাও কি তার মত বড়ো কোনো ভুল করেছে? একবার তাকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়?'

আসিফ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। প্রচণ্ড পানির পিপাসা হচ্ছে। আশপাশে পানি খাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। ঢাকা শহরের নানান জায়গায় এখন চমৎকার ফোয়ারা। এই সব ফোয়ারার পানি কি খাওয়া যায়? প্রেসক্লাবের কাছের ফোয়ারার পানি একবার এক তৃষ্ণার্ত বৃদ্ধকে খুব আগ্রহ করে খেতে দেখেছিল। বৃদ্ধের চেহারা বেশ সম্ভ্রান্ত। হাতে মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভের লোকদের মত চামড়ার ব্যাগ। সেই এই ব্যাগ রেখে ফোয়ারার পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে বেশ আয়োজন করে পানি খেল। দৃশ্যটা আসিফের এতই মজা লাগল যে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে আসিফকে বললেন, 'সরকার পানি খাওনের ভাল ব্যবস্থা করেছে। খুবই উত্তম ব্যবস্থা!'

আসিফের ইচ্ছা করছে এই রকম কোনো একটা ফোয়ারার কাছে গিয়ে ঐ বৃদ্ধের মত হাত-মুখ ধুয়ে খুব আয়োজন করে খানিকটা পানি খায়। লোকজন পাগল ভাববে নিশ্চয়ই। ভাবুক। মাঝে মাঝে পাগল হতে ইচ্ছা করে।

সে সত্যি সত্যি হেঁটে হেঁটে প্রেসক্লাবের কাছের ফোয়ারাটার কাছে এল। ফোয়ারা বন্ধ। শুকিয়ে খট খট করছে। কিছু জিজ্ঞেস না করতেই একজন বলল, সন্ধ্যার সময় লাল নীল বাতি জ্বালাইয়া ছাড়ে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সে কী অপেক্ষা করবে? অপেক্ষা করলে কেমন হয়?'

আসিফ নিজের পাগলামীতে নিজেই হেসে ফেলল।

ঝুম বৃষ্টি পড়ছে।

মজনু চুলায় কেতলি চাপিয়ে বিরক্ত মুখে বৃষ্টি দেখছে। বৃষ্টি মানেই যন্ত্রণা। চা বেশি লাগবে। দু'বারের জায়গায় তিনবার কেতলি বসাতে হবে। তিনবারের মত চা পাতা নেই। চা পাতা আনতে যেতে হবে। রিহার্সেলের সময় বাইরে যেতে তার ভাল লাগে না। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না দেখলে মজা কোথায়? তা ছাড়া বৃষ্টির সময় সবাই আসেও না। রিহার্সেল ঠিকমত হয় না। আগে আগে শেষ হয়ে যায়। রিহার্সেল বাদ দিয়ে গোল হয়ে বসে গল্পগুজব করে। আগে কাজ, পরে গল্পগুজব। এ জিনিসটা এরা বোঝে না। ছাগলের দল।

কেতলিতে চায়ের পাতা ফেলে মজনু একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মনে হচ্ছে লাস্ট সিনটা আজও হবে না। লাস্ট সিনটাই সবচে মারাত্মক। প্রায় দিনই এই সিন হচ্ছে না। আজমল সাহেব আসে না। তাঁর নাকি মায়ের অসুখ। লাস্ট সিনে মেইন এক্‌টর হচ্ছে আজমল হুদা। মনজুর মতে আজমল সাব হচ্ছে এই টিমের দুই নম্বর একটর। এক নম্বর আসিফ সাব। এই দুই জন না থাকলে

টিম কানা। তবে নতুন মেয়ে পুষ্প মন্দ না। লীনা আপার কাছাকাছি। কিংবা কে জানে লীনা আপার চেয়েও বোধ হয় ভাল। তবে লীনা আপা ডায়লগ দেবার সময় শুরুর সব কথাতেই কি সুন্দর করে হাসে, এই মেয়ে সেটা করে না। এই মেয়ে একটু বেশি গম্ভীর। এই গাম্ভীর্যটাও ভাল লাগে। হাসিটাও ভাল লাগে। কে জানে কোনটা বেশি ভাল।

মজনু ভেতরে উঁকি দিল। উঁকি দেবার মূল কারণ আজমল হুদা এসেছে কি না তা দেখা।

না আসেনি।

তার মায়ের অসুখ বোধ হয় আরো বেড়েছে। এইসব বুড়া-বুড়ি মা বাবা নিয়ে বড়ো যন্ত্রণা। কাজের কাজ কিছু করে না, অসুখ বাঁধিয়ে অন্য সবের কাজের ক্ষতি করে। মনজুর খুবই মন খারাপ হল। এর মধ্যেও যা একটা ব্যাপার তা হচ্ছে অনেকদিন পর লীনা আপা এসেছে। একদম কোণার দিকের একটা চেয়ারে একা একা বসে আছে। স্টেজের উপরে আসিফ এবং পুষ্প। আসিফ নিচু গলায় পুষ্পকে কি যেন বলছে, পুষ্প মন দিয়ে শুনছে। লীনা এক দৃষ্টিতে ঐ দিকে তাকিয়ে আছে।

মজনু লীনার সামনে এসে বলল, 'কেমন আছেন আফা?'

'ভাল। তুই কেমন আছিস রে মজনু?'

'জি ভাল।'

লীনা হাসি মুখে বলল, 'পুষ্প কেমন পার্ট করছে রে মজনু? তোর তো আবার সব কিছুতেই নম্বর দেয়া। পুষ্প কত নম্বর?'

'তিন নম্বরে আছে আফা।'

'দু নম্বর কে আছে?'

'আজমল সাব?'

'তাই নাকি?'

'জি। কাজটা অনুচিত হইছে আফা। আজমল সাবের মত লোকরে ছোড একটা পাট দিছে।'

'ছোট হলেও খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল। তার ওপর ভর করেই তো নাটক দাঁড়িয়ে আছে।'

'কথাডা ঠিক।'

মজনুর বড়ো ভাল লাগে। লীনা আপা তার সাথে হেলাফেলা করে কথা বলে না। তার কথা শুনে অন্যদের মত হেসে ফেলে বলে না –যা ভাগ। কি সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল কেন আজমল সাবের পার্ট এত ছোট। জিনিস থাকলে ছোট পার্ট দিয়েও আসর মাত করা যায়।

আজমল সাব যতক্ষণ স্টেজে থাকে ততক্ষণ শরীর রক্ত গরম হয়ে থাকে। মনে হয় কি শালার দুনিয়া। লাথি মারি দুনিয়ায়।

লীনা বলল, 'আজ আমাকে একটু চা দিস তো মজনু। চা খেতে ইচ্ছা করছে।'

'আনতাছি আফা। হুনলাম বিদেশে যাইতেছেন?'

'ইন্ডিয়া যাচ্ছি, দূরে কোথাও না। তুই কার কাছে শুনলি?'

'বলাবলি করতেছিল। কবে যাইতেছেন আফা?'

'পরশু। পরশু রাত ন'টার ফ্লাইটে। তোর জন্যে কি কিছু আনতে হবে?'

'না আফা।'

আনন্দে মজনুর চোখে পানি এসেই যেত, যদি না প্রণব বাবু চেঁচিয়ে বলতেন, 'গাধা, চা কই? এক ঘন্টা আগে চা দিতে বলেছি।' মজনু চা আনতে গেল। চা বানাতে বানাতেই শুনল সেকেন্ড সিন হচ্ছে। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে। প্রতিটি ডায়ালগ তার মুখস্থ। অনেকেই যেমন গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গান গায়, মজনুও অভিনেতার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় করে। তার বড়ো ভাল লাগে। এই মুহূর্তে কে করছে লেখকের ভূমিকা। তার মনে হচ্ছে সে খুব ভাল করছে। মনটা তার খানিকটা খারাপও লাগছে। এত চমৎকার অভিনয়, অথচ কেউ দেখতে পারছে না। অন্তত একজন যদি দেখত।

মজনুর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হল। মোটর সাইকেল ভট ভট করতে করতে আজমল চলে এসেছে। লাস্ট সিনটা আজ তাহলে হবে। ঘুম ভেঙে আজ সে কার মুখ দেখেছিল কে জানে। বিউটি সেলুনের ছেলেটার মুখ বোধ হয়। ঐ ছেলেটার মুখ দেখলে তার দিনটা খুব ভাল যায়।

আজমল লীনার পাশের চেয়ারে এসে বসেছেন। সে সিটি কলেজের অঙ্কের অধ্যাপক। তার বিশাল চেহারা, বিশাল গোঁফ দেখে ঠিক অনুমান করা যায় না। বড়ো-সড় চেহারার মানুষগুলির

গলার স্বর সাধারণত খুব কোমল হয়। আজমলের বেলায় তা হয়নি। সে কথা বললে হল কাঁপে।'

লীনা বলল, 'আপনার মা'র শরীর এখন কেমন?'

আজমল বলল, 'ভাল, মানে খুব না, খানিকটা ভাল। হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি। হাঁটুতে কি একটা অপারেশন নাকি হবে।'

'কবে হবে?'

'জানি না কবে। বউ দৌড়াদৌড়ি করছে, সে-ই জানে?'

স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে আজমল ভ্রূ কুঞ্চিত করল। লীনা হাসি মুখে বলল, 'ভাবীর সঙ্গে আবার ঝগড়া হয়েছে?'

'হুঁ।'

'এবার কি নিয়ে ঝগড়া করলেন?'

'তার ধারণা আমি কোনো কিছুই দেখি না। শুধু নাটক নিয়ে থাকি।'

'ধারণা কি ভুল?'

'অবশ্যই ভুল। নিয়মিত ক্লাস করি। প্রাইভেট টিউশনি করি, প্রতিদিন সকালে বাজার করি। এরচে বেশি কোন পুরুষটা কি করে? ঝগড়া করার জন্যে অজুহাত দরকার, এটা হচ্ছে একটা অজুহাত। ঐ যে সিংহ-ছাগল ছানার গল্প। সিংহ বলল, ব্যাটা তুই জল ঘোলা করছিস কেন?...'

লীনা বলল, 'আপনি মনে হচ্ছে ভাবীর ওপর খুব রেগেছেন।'

'রাগব না? অফকোর্স রাগব।— ভাবী, এটাই কি নতুন মেয়ে নাকি? বাহ্, অভিনয় তো খুব ভাল করছে। একসেলেন্ট -- নাম কি?'

'পুষ্প।'

'মনটা খারাপ হয়ে গেল ভাবী।'

'কেন?'

'এই মেয়েকে বেশিদিন ধরে রাখা যাবে না। টেলিভিশন ছোঁ মেরে নিয়ে নেবে, তারপর আসবে ফিল্মের লোকজন। আর তা যদি নাও আসে মেয়েটির অভিনয় দেখে কোনো একজন ছেলে তার প্রেমে পড়বে। বিয়ে হয়ে যাবে। বিয়ের পর ঐ ছেলে আর মেয়েটিকে অভিনয় করতে দেবে না। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল ভাবী। খুবই খারাপ। মেয়েটার কি নাম বললেন?'

'পুষ্প।'

'আমি নিজেই তো মনে হচ্ছে প্রেমে পড়ে যাচ্ছি। মাই গড, দারুণ মেয়ে তো!'

লীনা খিলখিল করে হেসে ফেলল। স্টেজ থেকে বিরক্ত চোখে আসিফ তাকাচ্ছে। লীনা হাসি বন্ধ করার জন্যে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বারান্দায় চলে গেল। তার এই জাতীয় হাসাহাসির মূল কারণ হচ্ছে যখনই গ্রুপে কোনো নতুন মেয়ে আসে, আজমল সবাইকে বলে বেড়ায় যে এই মেয়েটির প্রেমে পড়ে গেছে।

আসিফ লীনাকে নিয়ে রিকশা করে ফিরছে। জলিল সাহেব একটা পিকআপ নিয়ে এসেছিল। তিনি লিফট দিতে চাইলেন। আসিফ রাজি হল না। বৃষ্টিতে আধভেজা হয়ে বাড়ি ফেরার নাকি আলাদা একটা মজা আছে।

বৃষ্টি অবশ্য থেমে গেছে। তবে আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বিজলি চমকাচ্ছে। ব্যাঙ ডাকছে। ঢাকা শহরে এখনো ব্যাঙ আছে। এবং বৃষ্টি দেখলে এরা ফুলিয়ে ডাকে -- এটাই একটা আশ্চর্যজনক ঘটনা। লীনা বলল, 'ব্যাঙ ডাকছে, শুনছ?'

'হ্যাঁ শুনছি।'

'গ্রাম গ্রাম লাগছে না?'

'কিছুটা।'

'এত বড় শহর হয়েও ঢাকার মধ্যে ব্যাপারটা রয়েই গেল!'

'হ্যাঁ। আজিমপুরের কাছে যারা থাকে তারা শেয়ালের ডাকও শোনে। ঐ দিকটায় এখনো শেয়াল আছে।

খানাখন্দ ভরা রাস্তা। রিকশা খুব ঝাঁকুনি দিচ্ছে। আসিফ ডান হাত দিয়ে লীনাকে জড়িয়ে ধরল। লীনার গা একটু যেন কেঁপে উঠল। সে নিজে এতে খানিকটা অবাকও হল। এত দিন পরেও

আসিফ তার গায়ে হাত রাখলে গা কেঁপে ওঠে। মনটা তরল ও দ্রবীভূত হয়ে যায়। কোত্থেকে যেন উড়ে আসে খানিকটা বিষণ্ণতা।

'আসিফ বলল, 'শীত লাগছে লীনা?'

'না।'

'পুষ্পের অভিনয় কেমন দেখলে?'

'ভাল, খুব ভাল। কল্পনা করা যায় না এমন ভাল।'

'আসলেই তাই।'

লীনা খানিক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'ও যে কেন এত ভাল অভিনয় করছে তা কি তুমি জান?'

আসিফ গম্ভীর গলায় বলল, 'জানি।'

'বল তো কেন?'

'ধাঁধা?

'হ্যাঁ, ধাঁধা। বলতে পারলে তোমার জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।'

'কি পুরস্কার?'

লীনা ইংরেজিতে বলল, 'ঝড়-বৃষ্টির রাতে যে ধরনের পুরস্কারে পুরুষরা সবচে বেশি আনন্দিত হয় সেই পুরস্কার।'

আসিফ সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে সহজ গলায় বলল, 'মেয়েটা খুব ভাল অভিনয় করছে, কারণ স্নে আমার প্রেমে পড়ে গেছে। ধাঁধার জবাব কি ঠিক হয়েছে লীনা?'

লীনা বেশ খানিক্ষণ চুপ থেকে বলল, 'হ্যাঁ ঠিক হয়েছে। ব্যাপারটা তুমি কখন টের পেলে?'

'প্রথম দিনেই টের পেলাম। অভিনয়ের এক পর্যায়ে তার হাত ধরতে হয়। হাত ধরেছি, হঠাৎ দেখি থরথর করে তার আঙুলগুলি কাঁপছে।'

'ভয় থেকেও কাঁপতে পারে। নার্ভাসনেস থেকেও পারে।'

'তা পারে। তবে এতদিন হয়ে গেল অভিনয় করছে, এখনো তার হাত ধরলে এরকম হয়।'

লীনা চুপ করে রইল। আসিফ হেসে বলল, 'একই ব্যাপার কিন্তু তোমার বেলায়ও ঘটে। হাত ধরলে তুমিও কেঁপে ওঠ। তুমি নিজে বোধ হয় তা জানো না। নাকি জান?'

লীনা গাঢ় স্বরে বলল, 'জানি।'

আসিফ বলল, 'পুষ্পের ব্যাপারে তোমারে কি...'

লীনা আসিফকে কথা শেষ করতে দিল না। কথার মাঝখানেই বলল, 'আজিমপুরের দিকে সত্যি সত্যি শেয়াল ডাকে নাকি? একদিন শেয়ালের ডাক শোনার জন্যে যেতে হয়। অনেকদিন শোনা হয়নি।'

'তুমি ইন্ডিয়া থেকে ঘুরে আস, তারপর একদিন যাব।'

আসিফ বাঁ হাতে লীনার হাত মুঠো করে ধরল। লীনার আঙুল কেঁপে উঠল। আসিফ লীনার দিকে না তাকিয়েই তরল গলায় হাসল।

পুষ্প থাকে পুরনো ঢাকায়।

চানখাঁর পুল থেকে ভেতরের দিকে যেতে হয়। বিরাট দোতলা বাড়ি। উপরের তলা ভাড়া দেয়া। নিচের তলায় ভাগাভাগি করে পুষ্পরা থাকে এবং পুষ্পের বড়চাচা থাকেন। পুষ্পের বাবা এবং বড়চাচা দুজনেই ওকালতি করেন। দুজনেরই পসার নেই। পুষ্পের বাবা এজাজুদ্দিন ওকালতি ছাড়াও হোমিওপ্যাথি করেন। হোমিওপ্যাথিতে তাঁর কিছুটা পসার আছে। লোকজন বাসায় এসে ভিজিট দিয়ে ব্যবস্থা পত্র নেয়।

পুষ্পদের বাসায় অনেকগুলি ভাইবোন। নিজের এবং চাচাতো বোনদের সংখ্যা সাত। ভাই ছ'জন। এরা রাতে কে কোথায় ঘুমায় কোনো ঠিক নেই। প্রায়ই দেখা যায় অনেক রাতে একজন পড়াশোনা শেষ করে উঠেছে। কোথায় ঘুমাবে জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে।

রান্না দু'বাড়িতেই আলাদাভাবেই হয়, তবে কে কোন বাড়িতে খাবে তারও কোনো ঠিক নেই। পুষ্পের বড়চাচা খলিলুদ্দিন বেশির ভাগ সময়ই পুষ্পদের সঙ্গে খান। নিজের স্ত্রীর রান্না তিনি খেতে পারেন না। খেতে বসে বেশির ভাগ সময়ই খুব অপমানসূচক কথা বলেন। আজ তাই

বলছেন। আজ রান্না হয়েছে তেলাপিয়া মাছ। তিনি মুখে দিয়েই থু করে ফেলে দিলেন। এবং থমথমে গলায় বললেন, জিনিসটা কি?'

তাঁর স্ত্রী হাসিনা ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'তেলাপিয়া মাছ।'

'তেলাপিয়া মাছ রাঁধতে তোমাকে কে বলল?'

'সবাই খায়।'

'সবাই খায়? কোন শালা তেলাপিয়া মাছ খায়? বল কোন শালা খায়?'

তিনি মাছের বাটি উল্টে ফেলে গট গট করে উঠে পাশে ছোট ভাইদের বাসায় খেতে গেলেন। সেখানেও তেলাপিয়া মাছ রান্না হয়েছে। তবে সেখানে তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না।

পুষ্প এই দুই পরিবারেরই বড় মেয়ে। পরিবারে সবচে বড় মেয়েকে কখনো ঠিক বড় মনে হয় না। মনে হয় সে ছোটই রয়ে গেছে। পুষ্প সম্পর্কে এই ধারণা আরো কিছুদিন থাকত, তবে এখন আর নেই। পুষ্প রিহার্সেলে রোজ শাড়ি পরে যাচ্ছে। শাড়ি পরলেই মেয়েটাকে তরুণীর মত দেখায়।

পুষ্পের বাবা এজাজুদ্দিন ভেবেছিলেন দুএক দিনের ব্যাপার। এখন মনে হচ্ছে দু একদিনের ব্যাপার না। রোজই যাচ্ছে। ওরা অবশ্যি গাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছে দিয়ে যাচ্ছে। এবং দোতলায় ভাড়াটে মেয়েটাও যাচ্ছে। তবু একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। স্বভাব-চরিত্রে কোনো দাগ পড়ে গেলে মুশকিল।

এজাজুদ্দিন স্ত্রীকে ক'দিন ধরেই এই কথাটা বোঝাতে চেষ্টা করছেন। গম্ভীর গলায় বলছেন, 'একটা দাগ পড়ে গেলে মুশকিল। দাগ তো শরীরের কোনো অসুখ না যে থুজা টু হানড্রেড দেব আর রোগ আরাম হবে।'

এজাজুদ্দিন সাহেবের স্ত্রী মমতা তাঁর স্বামীর কোনো মমতাকেই তেমন পাত্তা দেন না। মেয়ের নাটক করার ব্যাপারে তাঁর সায় আছে। রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হয়েও আছে। কেন আছে এই ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার নয়। একদিন তিনি মেয়ের অভিনয়ও দেখে এলেন। মেয়েকে শুধু বললেন, 'ছেলেটার গায়ের উপর এমন লেপ্টে পড়ে যাওয়ার দরকার কী? একটু দূরে দূরে থাক।'

পুষ্প বলেছে, 'আচ্ছা।'

মমতা বলেছেন, 'যখন ছেলেটা হাত ধরবে, তখন হাত ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিবি। যে বউয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না, খালি বই লেখে--- তার সঙ্গে এত কি মাখামাখি? বুঝলি, হাত ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিবি।'

পুষ্প হেসে বলেছে, 'আচ্ছা।'

'তোর স্বামী হয়েছে যে, ঐ ছেলেটা কে?'

'তার নাম আসিফ।'

'বিয়ে করেছে?'

'হুঁ।'

'বউকে তো দেখলাম না।'

'উনি এখন আসেন না। শরীর ভাল না।'

'দেখতে কেমন?'

'খুব সুন্দরী। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়।'

ছেলেটির স্ত্রী খুবই সুন্দরী, এটা শোনার পর মমতার দুশ্চিন্তা পুরোপুরি চলে যায়। থিয়েটারের লোকগুলিকে তাঁর ভালই লাগে। বিশেষ করে মেয়েগুলিকে। এর মধ্যে একজন -- যে মায়ের ভূমিকা করে তাঁকে তাঁর খুবই মনে ধরল। দেখেই মনে হয় শক্ত ধরনের মহিলা। এরকম শক্ত ধরনের মহিলা থাকলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। মমতা পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলেন। মহিলাকে বললেন, 'আমার মেয়েটাকে একটু চোখে চোখে রাখবেন।' সেই মহিলা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'সে কি, আপনার মেয়ে তো আমারও মেয়ে।' মমতা বড় শান্তি পেলেন।

পুষ্প যে পরিবার থেকে এসেছে, সেই পরিবারের সদস্যরা কোনো কিছুই নিয়েই তেমন মাথা ঘামায় না। এতগুলি ছেলেমেয়ে যেখানে বড়ো হয় সেখানে কারো ওপর তেমনভাবে নজর রাখা যায় না। কেউ অন্যায় কিছু করলেও তা মনে থাকে না। এজাজুদ্দিন সাহেব একদিন দেখলেন এ বাড়ির এক ছেলে রাস্তায় পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরে এলেন। অপরাধী কে তা তিনি ঠিক ধরতে পারলেন না। কে ছিল? বাবলু না মহিন? অনেকক্ষণ

হৈচৈ করার পর তাঁর রাগ কমল।

পুষ্প হৈচৈ কান্নাকাটি করে থিয়েটারে যোগ দেবার ব্যবস্থা করেছে। প্রথমে ব্যাপারটায় সবার খুব আপত্তি থাকলেও এখন মনে হচ্ছে কারোর মনেই নেই। পুষ্পর চাচা একদিন রাতে গাড়ি থেকে নামতে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'কোত্থেকে আসছিস?'

পুষ্প বলল, 'থিয়েটার থেকে।'

'থিয়েটার! কিসের থিয়েটার?'

'ভুলে গেছেন চাচা? আমি একটা নাটক করছি না?'

'নাটক, কবে?'

'সামনের মাসে।'

'ও আচ্ছা। রাত-বিরাতে ফিরতে হয় নাকি? এটা তো ভাল কথা না। দশটা বাজে। দশটা পর্যন্ত নাটক করলে পড়বি কখন?'

'এই নাটকটা করে আর করব না চাচা।'

'গুড। ভেরি গুড।'

রিহার্সেল থেকে পুষ্প সব সময় হাসিখুশি হয়ে ফেরে। আজ তার মুখটা কালো। যেন বিরাট কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে। অথচ রিহার্সেলে তার সময়টা খুব ভাল কেটেছে। আজমল নামের একজন ভারিক্কি ধরনের লোক তাকে অনেক মজার মজার কথা বলেছে। সেই সব কথার মধ্যে একটা হচ্ছে, 'এই মেয়ে, ফস করে কাউকে বিয়ে করে বসবে না। তাহলে নাটক মাথায় উঠবে। তোমার অভিনয় খুব ভাল হচ্ছে। কিছুদিন পর দেখবে পথে বের হতে পারবে না। অটোগ্রাফ অটোগ্রাফ বলে লোকজন মাথা খারাপ করে দেবে। অটোগ্রাফ কি করে দিতে হয় সেটাও শিখে নাও। খুব সহজ একটা সিগনেচার তৈরি কর, যাতে খুব দ্রুত অটোগ্রাফ দিতে পার। কালো চশমা পরা অভ্যেস করতে হবে। যাতে লোকজন চট করে চিনতে না পারে।'

লীনা আপাও তার সঙ্গে অনেক কথা বললেন। গায়ে হাত রেখে এত আন্তরিকভাবে কথা বললেন যে, তার চোখ প্রায় ভিজে উঠল। রিহার্সেল পুরোপুরি শেষ হবার পর সবাই মিলে যখন চা খাচ্ছে তখন তাকে বললেন, 'তোমার জন্যে কি কিছু আনতে হবে পুষ্প? আমি ইন্ডিয়া যাচ্ছি। তোমার পছন্দের কোনো জিনিস যদি থাকে তাহলে বল, আমি অবশ্যই নিয়ে আসব। তবে খুব দামি কিছু আনতে বলবে না। আমার হাতে তেমন টাকা পয়সা নেই।'

পুষ্প বলল, 'আমার জন্যে চন্দন কাঠের একটা পুতুল আনবেন।'

'অবশ্যই আনব।'

'আপনি কতদিন থাকবেন?'

'শুরুতে কথা হয়েছিল দশদিনের। এখন শুনছি এক মাসের প্রোগ্রাম হচ্ছে। তবে আমি এতদিন কাটাব না। তোমাদের নাটকের আগে অবশ্যই ফিরে আসব।'

পুষ্প বলল, 'নাটক আপনাদের খুব প্রিয়?'

'হ্যাঁ প্রিয়। খুবই প্রিয়। নাটকের একটা দল মানে পরিবারের বাইরে একটা পরিবার।'

পুষ্প চুপ করে রইল।

লীনা বলল, 'কিছুদিন যাক, তখন তুমিও এটা বুঝবে। সবাই কিছু দিন পরপর একসঙ্গে হতে না পারলে দেখবে ভাল লাগছে না। অস্থির অস্থির লাগছে। গ্রুপ নাটকের কত সমস্যা, তার পরেও যে গ্রুপ নাটক টিকে আছে -- কেন আছে?' এই কারণেই আছে।'

বিদায় নেবার সময় লীনা আপা তার দিকে তাকিয়ে এমন মিষ্টি করে হাসল, তবু তার অসম্ভব মন খারাপ হল। কারণটা খুব অদ্ভুত।

বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। তারা সবাই বারান্দায়। জলিল ভাই বললেন, 'সবাইকে আমি গাড়িতে পৌঁছে দেব। দরকার হলে দু'ট্রিপ দেব। নো প্রবলেম। সবাই তাতে খুশি। আর আশ্চর্য, আসিফ ভাই বলল, 'আমাদের পৌঁছে দিতে হবে না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রিকশায় করে যাওয়ার অন্য রকম আনন্দ আছে। কাজেই শুভ রাত্রি।'

তারা সত্যি সত্যি রাস্তায় নামল। আসিফ ভাই লীনা আপার হাত ধরে হাঁটছেন। বৃষ্টির মধ্যে দুজন নেমে যাচ্ছে।

গা ঘেঁষাঘেঁষি করে হাঁটছে। কি অপূর্ব দৃশ্য! প্রথম কয়েক মুহূর্ত পুষ্পের মন আনন্দে পূর্ণ

হল। তার পরপরই চোখে পানি এসে পড়ার মত কষ্ট হতে লাগল।

কেন তার কষ্ট হচ্ছে এটা সে জানে। কিন্তু তার বিশ্বাস করতে মন চাচ্ছে না। তার কষ্টের কারণটা সে জানে, অথচ কাউকে সে বলতে পারবে না-- এও একটা বিরাট কষ্ট। ভাল একজন বন্ধু যদি তার থাকত, তাহলে কি সে তাকে এটা বলতে পারত? না পারত না। কোনোদিন কাউকে এটা বলা যাবে না। চিরকাল গোপন রাখার মত কিছু কিছু ঘটনা সব মানুষের জীবনেই হয়ত ঘটে। বাইরের কেউ কোনোদিন তা জানতে পারে না। বড়চাচার মেয়ে মিতুরও একটা গোপন কথা আছে, যা সে কাউকে বলতে পারবে না। শুধু পুষ্পকে একদিন কাঁদতে কাঁদতে বলেছে, 'একটা গোপন কথা তোকে বলব। কাউকে না বলতে পারলে আমি মরে যাব।'

পুষ্প বলল, 'কী?'

মিতু বলল, 'কিছু না, এমনি ঠাট্টা করছি।' বলতে বলতে আবার কেঁদে অস্থির হল। মিতুর গোপন কথা পুষ্প জানে না। মিতু বলেনি। কাউকে হয়ত সে আর বলবে না। গোপন কথা বলতে গোপনই থেকে যাবে।

পুষ্প বাড়িতে ঢুকে শান্ত ভঙ্গিতে হাত-মুখ ধুয়ে মা'কে গিয়ে বলল, 'ভাত দাও মা।'

মমতা বললেন, 'তোর কি হয়েছে রে? এমন লাগছে কেন?'

'ভীষণ মাথা ধরেছে। খেয়ে শুয়ে পড়ব।'

'তোর চাচির ওখানে গিয়ে খেয়ে আয়। ডাল ছাড়া ঘরে আর কিছু খাবার নেই।'

'ডাল দিয়েই খাব। ও ঘরে এখন আর যেতে ইচ্ছা করছে না।'

মমতা উঠে গিয়ে রান্নাঘরেই মেয়েকে ভাত বেড়ে দিলেন। পুষ্প বলল, 'তুমি খাবে না মা?'

মমতা বললেন, 'বুকে অম্বলের ব্যথা উঠেছে, এক কাপ দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ব। তোকে একটা ডিম ভেজে দেই।'

'দাও।'

মমতা ডিম ভাজতে ভাজতে বললেন, 'আজ এক কাণ্ড হয়েছে সন্ধ্যাবেলা একটা গাড়ি করে দু'তিন জন মহিলা এসে উপস্থিত। কাউকে চিনি না বললাম- কাকে চান?'

'মোটামত একজন মহিলা বললেন, আমরা আপনার প্রতিবেশী, বেড়াতে এসেছি। আমার তখনি সন্দেহ হল। প্রতিবেশী হলে গাড়ি করে আসবে কেন? কেমন অস্বস্তি অস্বস্তি ভাব। হেন তেন নানান কথার পর ফস করে বলল, আপনার বড় মেয়েটার কি বিয়ে দেবেন? চিন্তা কর অবস্থা। চিনি না জানি না এসেই বলে কি না— বড় মেয়ের বিয়ে দেবেন?'

পুষ্প বলল, 'তুমি কি বললে?'

'আমি আবার কি বলব? আমি বললাম, জি না। মেয়ের বিয়ের কথা এখনো ভাবছি না। ওমা, তার পরেও যায় না। বসেই আছে।'

পুষ্প বলল, 'চুপ কর তো মা। শুনতে ভাল লাগছে না।'

'আহা, আসল মজাটা তো শুনলি না। খুব ফর্সা করে একজন মহিলা আছেন, উনি বললেন বিয়ের সম্পর্ক এলে মুখের ওপর না বলতে নেই আপা। প্রপোজাল শুনুন, তারপর বলুন না।'

'আমি বললাম, এম এ পাস করার আগে মেয়ের বাবা মেয়ের বিয়ে দেবে না। ভদ্রমহিলা বললেন, এম এ পাস তো বিয়ের পরেও করতে পারে। কি যে যন্ত্রণা! কিছুতেই যাবে না।'

'তারপর বিদেয় করলে কি ভাবে?'

'শেষপর্যন্ত বললাম, আপা, আমাদের এক জায়গায় যাবার কথা আছে। তারপর উঠল।'

পুষ্প বলল, 'তোমার মজার কথা শেষ হয়েছে, না আরো বাকি আছে?'

'আসলটাই তো বলা হয়নি। ওরা চলে গেলে দেখি টেবিলের উপর চশমা পরা একটা ছেলের ছবি। ইচ্ছা করে ফেলে গেছে। মিতুর কাছে ছবিটা আছে। দেখতে চাইলে ওকে বল।'

'আমি কেন দেখতে চাইব?'

'আহা রেগে যাচ্ছিস কেন? দেখতে না চাইলে দেখবি না। নাটক থিয়েটার করতে পারিস, একটা ছেলের ছবি দেখলে তোর মান যাবে নাকি?'

'নাটক থিয়েটার আমি আর করব না।'

'কি বললি?'

'নাটক আমি আর করব না।'

'হঠাৎ কি হল?'

'আমার ভাল লাগছে না।'

পুষ্প উঠে চলে গেল। সে রাতে মিতুর সঙ্গে শোয়। আজ নিশ্চয়ই দেশের বাড়ি থেকে কেউ এসেছে। চিড়িয়াখানা দেখবে কিংবা চিকিৎসা করাবে। কারণ মিতুর বিছানায় অপরিচিত একজন মহিলা ঘুমুচ্ছেন। মিতুও তার স্বভাবমত হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। পুষ্প তার নিজের শোবার জায়গা খোঁজার জন্যে ব্যস্ত হল না। ভেতরের দিকে বারান্দায় চলে গেল। রেলিং দেয়া বারান্দায় এক কোণে একটা ইজিচেয়ার। পুষ্পর বাবা এই চেয়ারে বসে রোজ সকালে খবরের কাগজ পড়েন। রাতে চেয়ারটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। আজ নেয়া হয়নি।

পুষ্প চেয়ারে এসে বসল। বৃষ্টি হচ্ছে না। ঝিঁঝি ডাকছে। ঝিঁঝি ডাকা মানে বাকি রাতটায় আর বৃষ্টি হবে না। আকাশ পরিষ্কার হয়ে চাঁদ উঠবে। চাঁদ উঠলে পুষ্পদের বাড়ির ভেতরটা খুব সুন্দর দেখা যায়। ভেতরের উঠোনে দুটো প্রকাণ্ড কামিনী গাছ আছে। সেই গাছে চাঁদের আলো পড়ে। বড়োই রহস্যময় লাগে।

পুষ্প চুপচাপ বসে আছে। বসে থাকতে থাকতে এক সময় সে ঘুমিয়েও পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চমৎকার একটা স্বপ্নও দেখল। এই স্বপ্নটি বড়ো মধুর ছিল, তবু সে ঘুমের মধ্যেই খুব কাঁদল।

খুব ভোরে লীনার ঘুম ভাঙল। এই ভোরগুলিকেই বোধ হয় কাকভোর বলে। তারস্বরে কাক ডাকছে। ঘরের ভেতর আঁধার ও আলো। সেই আলো-অন্ধকারে মিশে পৃথিবীটাকে অন্যরকম করে রেখেছে। শহরের ভোরে পাখির ডাক শোনা যায় না। কর্কশ কাক ডাকে। কাককে তো আর কেউ পাখি ভাবে না।

আসিফ পাশ ফিরে ঘুমুচ্ছে। একটা হাত মুখের উপর ফেলে রাখার মুখ দেখা যাচ্ছে না। লীনার একবার ইচ্ছা করল, আসিফকে ডেকে তোলে। এত আরাম করে সে ঘুমুচ্ছে যে ডাকতে ইচ্ছা করল না। লীনা দরজা খুলে বাইরে এল। রান্নাঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। বেনু তার বাচ্চার জন্যে দুধ গরম করছে। লীনা রান্নাঘরের ঢুকল। চায়ের পানি চড়াবে। অনেকদিন বেড-টি খাওয়া হয় না।

বেনু মুখ তুলে লীনাকে দেখল। কিছু বলল না। বেনুর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। লীনা বলল, 'বাচ্চা জেগে গেছে?'

'জি।'

'চা খাবে বেনু? আমি চা করছি।'

'চা খাব না। আজ আপনি চলে যাবেন, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'মন খারাপ লাগে?'

'একটু লাগে। তোমারও কী মন খারাপ? কেমন যেন লাগছে। ঝগড়া-টগড়া হয়েছে?'

বেনু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমার মনটা খুব খারাপ। খুকির বাবা কাল রাতে আমাকে চড় দিয়েছে। নিজের বাবা-মা কোনোদিন আমার গায়ে হাত তুলে নাই। আর ও কি না...।'

বেনুর বাচ্চা কাঁদছে। সে দুধ নিয়ে চলে গেল। লীনাকে সুন্দর ভোরবেলায় অসুন্দর একটি ছবির মুখোমুখি হতে হল। বেচারা বেনু। আজ সারাদিন খুব মন খারাপ করে থাকবে।

আগামীকাল বা পরশুও এরকম যাবে। তারপর আস্তে আস্তে সব ভুলে যাবে। স্বামীর সঙ্গে হাসবে, গল্প করবে। স্বামীর প্রয়োজনে লাজুক ভঙ্গিতে ব্লাউজের হুক খুলবে। তারপর আবার একদিন এ রকম একটা কাণ্ড ঘটবে। স্বামী চড় বসাবে কিংবা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবে মেঝেতে।

লীনা দু'কাপ চা বানিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। আসিফ একটা চাদর টেনে গলা পর্যন্ত ঢেকে নিয়েছে। বেচারার বোধ হয় শীত করছিল। ডেকে তুলে চা খেতে বলবে? না থাক, বেচারা ঘুমুক। যদিও ডেকে তুললেই ভাল হত। আজ লীনা চলে যাবে। যাবার দিনটায় যত বেশি পারা যায় গল্প করা উচিত।

লীনা আসিফের পাশে বসে চা খাচ্ছে। চা খেতে খেতে হঠাৎ তার মনে হল— তাদের দুজনের সম্পর্কে একটা অস্বাভাবিকতা আছে। আসিফ কখনো কোনো কারণেই তার সঙ্গে রাগ করেনি। চড়া গলায় কথা বলেনি। লীনা নিজে কোনো মহামানবী নয়। আসিফের রাগ করার মত এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে অনেক কিছুই সে করেছে। অথচ সে সব যেন আসিফকে স্পর্শই করেনি। এর কারণটা কী? এও কী এক ধরনের অভিনয় নয়?

একজন বড়ো মাপের অভিনেতা কি সব সময়ই অভিনয় করে না? একজন দক্ষ, শুধু দক্ষ নয়-- অসাধারণ প্রতিভাবান অভিনেতা নিজেকে সব সময় দখলে রাখেন। সারাক্ষণ অভিনয় করে যান।

অভিনয় সব মানুষই করে। যে স্ত্রীকে অসহ্য বোধ হয়, তার সঙ্গেও সে হাসি মুখে কথা বলে। অভিনেতা সেই জিনিসটাকেই অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে যান।

লীনা অস্বস্তি বোধ করছে। আসিফ সম্পর্কে এ রকম ধারণা তার শুধু আজ না, অনেকবারই হয়েছে। বিয়ের দ্বিতীয় বছরে সন্দেহটা তার প্রথম হল। সে লক্ষ্য করল ভালবাসাবাসির সময় আসিফ একেক সময় একেক রকম আচরণ করে। যেন সে ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করছে। একজন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করতে পারে, কিন্তু তার মূল সুরটি কিছুতেই কাটবে না। মূল সুর অবশ্যই বজায় থাকবে। আসিফের বেলায় তা থাকে না। পুরো ব্যাপারটাই তার বেলায় বদলে যায়। অভিনয় ছাড়া এ জিনিস সম্ভব নয়।

লীনা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে একটা হাত আসিফের গায়ে রাখল। মৃদু স্বরে ডাকল, 'এ্যাই।'

আসিফ সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল। লীনা বলল, 'হাত-মুখ ধুয়ে আস, চা গরম করে আনছি।'

'আরেকটু ঘুমুতে ইচ্ছা করছে যে।'

'তাহলে ঘুমাও।'

লীনা আবার বারান্দায় চলে এল। যদিও সে জানে, আসিফ ঘুমুবে না, উঠে আসবে। সে ঠিক তাই করবে যা একজন আদর্শ স্বামীর করা উচিত। এর বাইরে সে একচুলও যাবে না।

আসিফ সত্যি সত্যি উঠে এল। বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে পাশে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'এ তো মনে হচ্ছে একেবারে প্রত্যুষ লগ্ন।'

লীনা বলল, 'তুমি কি বেরুবে নাকি আজ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবে?'

'ব্রিটিশ কাউন্সিলে যাব। এগারটার সময় একটা ছোটখাটো ওয়ার্কশপের মত হবে। ব্রিটিশ একজন মহিলা নাটকের বিশেষজ্ঞ এসেছেন। নাটক নিয়ে কথা বলবেন, শুনে আসি। তুমি যাবে?'

'না।'

'তোমার প্লেন তো রাতে। চল না যাই।'

লীনা জবাব না দিয়ে চা আনতে গেল।

পাশের ঘরে উঁচু গলায় হাশমত আলি চিৎকার করছে, 'তুই পেয়েছিস কী? তুই ভাবস কী? তুই কী ইয়ার্কি করস? তুই আমারে চিনস না?'

গ্রাম্য ভাষা, কুৎসিত ভঙ্গির চেঁচামেচি। বেনুর গলা পাওয়া যাচ্ছে না। তবে সে ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। লীনা লক্ষ্য করল, আসিফ খুব আগ্রহ নিয়ে ঝগড়ার কথাবার্তা শোনার চেষ্টা করছে। এই আগ্রহ অশোভন। অন্যদের কুৎসিত চেঁচামেচি সে এত আগ্রহ নিয়ে শুনবে কেন? লীনা রাগ করতে গিয়েও করতে পারল না। তার মনে হল— ঝগড়াটা আসিফের শোনা উচিত। একজন অভিনেতাকে চারপাশ থেকে শিখতে হবে। ক্যারেক্টর এ্যানালাইসিস করতে হবে। ঝগড়ার সময় কোন পর্দায় চেঁচাবে, কোন ভঙ্গিতে কথা বলবে, মুখের কোন মাংসপেশী ফুলে ফুলে উঠবে, ভ্রূ কোঁচকাবে কি কোঁচকাবে না, এসব লক্ষ্য না করতে পারলে বড় হবার পথ কোথায়?

লীনা চা এনে দিল। আসিফ চায়ে চুমুক দিয়ে একটা তৃপ্তির ভঙ্গি করল। লীনা বলল, 'হাশমত সাহেবের চেঁচামেচি শুনতে কেমন লাগছে?'

'ইন্টারেস্টিং! একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম-- ঝগড়ার সময় বা প্রচণ্ড রাগের সময় মানুষের গলায় কোনো রকম ভেরিয়েশন থাকে না। এক স্কেলে সে কথা বলে, এবং বলে অতি দ্রুত। আমার ধারণা, তার কথা বলার স্পিড তখন তিনগুণ বেড়ে যায়।'

লীনা ক্লান্ত গলায় বলল, 'তুমি দয়া করে হাশমত সাহেবকে বল তো চুপ করার জন্যে। এই ভোরবেলায় উনি কি শুরু করেছেন? খুব খারাপ লাগছে।'

আসিফ সঙ্গে সঙ্গে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে উঠে চলে গেল। ভারী এবং গম্ভীর গলায় ডাকল, 'হাশমত সাহেব, এই যে হাশমত সাহেব।'

'জি।'

'একটু বাইরে আসুন তো ভাই।'

'কেন?'

'আসুন। আমার সঙ্গে একটা সিগারেট খান।'

হাশমত সাহেব বিরক্ত মুখে বের হয়ে এলেন, 'ঝাঁঝাল গলায় বললেন, 'অসহ্য, বুঝলেন ভাই। অসহ্য, কানের কাছে রাতদিন ঘ্যানঘ্যান, ঘ্যানঘ্যান। লাইফ হেল করে দিয়েছে।'

'তাই বুঝি?'

'আর বলেন কেন ভাই। আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছে।'

'মাঝে মাঝে মাথায় রক্ত ওঠা ভাল। এত ব্রেইন পরিষ্কার থাকে।' বলতে বলতে আসিফ হাশমত সাহেবের কাঁধে হাত রেখে হাসল। লীনা দূর থেকে লক্ষ্য করল, এই হাসি শুধু হাসি নয়, এর মধ্যে অনেকখানি অভিনয় মিশে আছে। এই হাসি দিয়েই আসিফ অনেক কিছু বলতে চাচ্ছে। বুঝিয়ে দিচ্ছে সংসারে অবুঝ মেয়েরা থাকে। তারা অনেক অন্যায় করে। এইসব অন্যায় দেখতে হয় ক্ষমা ও প্রশ্রয়ের চোখে। সব কিছু ধরতে নেই।

'নিন হাশমত সাহেব। একট সিগারেট ধরান, তারপর এই চমৎকার সকালটা একটু দেখুন।'

'আর ভাই সকাল। রাতে ঘুমাতে দেয় নাই। খালি ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ।'

আসিফ আবার হাসল। নিজেই সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'আরেক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে। ভাবীকে ডেকে বলুন তো, আমাদের দুজনকে দু'কাপ চা দিতে। এরকম ভোরবেলায় রাগারাগি করা ঠিক হচ্ছে না। রাগারাগিটা রাতের জন্য মুলতবি থাক। রাতে আবার নতুন উদ্যমে শুরু করবেন।'

হাশমত আলি সত্যি সত্যি খুবই সহজ এবং স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, 'ও বেনু, দেখি আমাদের চা দাও তো। নোনতা বিসকিট কিছু আছে কিনা দেখ। আমার আবার খালি পেটে চা সহ্য হয় না।'

বেনু চোখ মুছে চা বানাতে গেল।

আসিফ বলল, 'বুঝলেন হাশমত সাহেব, অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি ভোর নিয়ে একটা কবিতা মনে করতে। মনে করতে পারছি না। বাঙালি কবিরা ভোর নিয়ে বেশি কবিতা লেখেননি বলে মনে হচ্ছে।'

'লিখবে কোত্থেকে বলেন? কয়টা কবি ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে? এরা রাত দুটো-তিনটে পর্যন্ত জাগে, ওঠে সকাল দশটার পর।'

আসিফ শব্দ করে হেসে উঠল।

হাসি ভয়াবহ সংক্রামক ব্যাধির চেয়েও সংক্রামক। হাশমত আলিও হাসতে শুরু করলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'ভোরের একটা কবিতা মনে পড়ছে রে ভাই— ভোর হল দোর খোল...হা হা হা।'

বেনু চা নিয়ে এসেছে। হাশমত বলল, 'বেনু, আসিফ ভাইকে বলেছ যে ক'দন ভাবী থাকবে না দু'বেলা আমাদের সঙ্গে খাবে। না খেলে আমরা খুবই মাইন্ড করব। ভাল করে বলে দাও।'

'ভাইজান কি আমার কথা শুনব?'

'অফকোর্স শুনবে। আমরা থাকতে বাইরে খাবে, এটা কি কথা। ভাইসাবের উপলক্ষে ভাল-মন্দ কিছু খাব। বেনু, জিরা বাটা দিয়ে তুমি যে গোশত রাঁধ, এইটা রাঁধবে মনে করে।'

আসিফের বড় ভাল লাগছে। কিছুক্ষণ আগে কি কুৎসিত চেঁচামেচি হচ্ছিল। এখন কি চমৎকার করেই না দুজন কথা বলছে। এরা দুজন ভোরের আনন্দ অনেক গুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

লীনা কাপড় গোছাচ্ছে। ঠিক হয়েছে, আসিফ ব্রিটিশ কাউন্সিলে যাবার পথে লীনার মা'র বাড়িতে তাকে রেখে আসবে।

লীনা বলল, 'তুমি আবার এয়ারপোর্টে উপস্থিত হয়ো না।'

'কেন?'

'তুমি একা থাকবে, আমি চলে যাব— ভাবতেই খারাপ লাগছে। শেষে কেঁদে-টেনে ফেলব। দুলাভাই এটা নিয়ে সারাজীবন ঠাট্টা করবেন। কেউ তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করলে আমার ভাল লাগে না।'

আসিফ বলল, 'তোমার প্লেন তো সেই রাতে। সারাদিন তোমার মা'র বাসায় কি করবে? তার চেয়ে চল, ঐ ব্রিটিশ মহিলা কি বলেন শুনি। অনেক শেখার ব্যাপার থাকতে পারে।'

'শেখার ব্যাপার থাকলে তুমি শেখ। আমার আর কিছু শিখতে ইচ্ছা করছে না।'

আসিফ ইতস্তত করে বলল, 'তোমার সঙ্গে টাকা-পয়সা বিশেষ কিছু দিতে পারলাম না। কিছু মনে কর না লীনা। যা দরকার লাগে, তুমি তোমার দুলাভাইয়ের কাছ থেকে নিও, আমি পরে ব্যবস্থা করব।'

লীনা বলল, 'সঙ্গে যা আছে, যথেষ্টই আছে। ঐ নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার জন্যে কি আনব বল।'

'একটা কাজ করা পাঞ্জাবি আর জয়পুরী স্যান্ডেল।'

'আর কিছু?'

'আর কিছু না।'

'নাটকের ওপর বইপত্র যদি কিছু পাই, আনব না?'

'অবশ্যই আনবে।'

লীনা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। আসিফ বলল, 'হাসছ কেন?

'এমনি হাসছি। এটা যদি অভিনয়ের দৃশ্য হত, তাহলে বোধহয় হাসাটা ঠিক হত না। তাই না?'

'কি বলছ তুমি বুঝতে পারছি না।'

'আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। আজ ভোর থেকে মাথার মধ্যে শুধু আবোল-তবোল চিন্তা ঢুকছে। দেশের বাইরে যাচ্ছি, সে জন্যেই বোধ হয়। দেশের বাইরে তো কখনো যাইনি।'

'তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'শরীর ঠিক আছে।'

'তুমি কেন জানি আজ অতিরিক্ত রকমের গম্ভীর হয়ে আছ। কী ব্যাপার লীনা?'

লীনা বলল, 'একটু অপেক্ষা কর। ব্যাগটা গুছিয়ে নিই, তারপর হাসি মুখে তোমার সঙ্গে গল্প করব। তুমি চাইলে জানালা বন্ধ করে, দরজার পর্দা ফেলে ঘর একটু আঁধার করে নেব। তারপর দুজনে মুখোমুখি, গভীর দুঃখে দুঃখি, আঁধারে ঢাকিয়া গেছে আর সব।'

আসিফ তাকিয়ে আছে। লীনা হাসছে তরল ভঙ্গিতে।

ব্রিটিশ মহিলার বক্তৃতা আসিফের মোটেই ভাল লাগল না। প্রথমত কথা বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে প্রতিটি শব্দ তিনি খানিকক্ষণ চিবিয়ে ছোবড়া বানিয়ে বলছেন। যা বলছেন, তার সঙ্গে অভিনয়ের যোগ তেমন নেই বলেই আসিফের ধারণা। ভদ্রমহিলা বলছেন স্টেজের ব্যাকগ্রাউন্ডের আলো এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিকের সমন্বয় বিষয়ে। সবটাই মনে হচ্ছে কচকচানি থিওরি। সিমিট্রি রেখে কি করে সিমিট্রি ভাঙতে হবে, এই সব বিষয়। ডায়নামিক ড্রামা এবং স্ট্যাটিক ড্রামার সঙ্গে আলো এবং শব্দের সম্পর্ক। এক পর্যায়ে ভদ্রমহিলা ব্ল্যাকবোর্ডে হাবিজাবি ইকোয়েশন লিখতে শুরু করলেন।

আসিফের পাশে লিটল ঢাকা গ্রুপের মন্তাজ সাহেব বসেছিলেন। তিনি নিতান্ত বিরক্ত হয়ে এক পর্যায়ে বললেন, 'এই হারামজাদী তো মনে হচ্ছে বিরাট ফাজিল। এ তো দেখি অংক করছে!'

আসিফের কাছেও সমস্ত ব্যাপারটা বোগাস বলেই মনে হচ্ছে। উঠে চলে যেতে ইচ্ছা করছে। সে বসেছে মাঝামাঝি জায়গায়, এখান থেকে চলে যাওয়া মুশকিল। একজন উঠে দাঁড়িয়েছিল, ভদ্রমহিলা তার দিকে তাকিয়ে খড়খড়ে গলায় বললেন, 'আমি কী আমার কথায় আপনাকে আকৃষ্ট করতে পারছি না? কথায় না পারলেও রূপে তো আপনাকে আটকে ফেলার কথা। আমি কি যথেষ্ট রূপবতী নই?'

চারদিকে তুমুল হাসির মধ্যে ভদ্রলোককে মুখ কাঁচুমাচু করে বসে পড়তে হল। এ রকম অবস্থায় হলঘর ছেড়ে উঠে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। ভদ্রমহিলার বক্তৃতার প্রথম পর্ব শেষ হল এক ঘণ্টা পর। আসিফের কাছে মনে হল, সে অনন্তকাল ধরে এই চেয়ারে বসে আছে। বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্ব শোনার মত মনের জোর পাচ্ছে না।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, দ্বিতীয় পর্ব হল অসাধারণ। ভদ্রমহিলা কিছু ছবি বানিয়ে নিয়ে এসেছেন। অভিনয় অংশ প্রতিটিতেই এক। হুবহু এক, কিন্তু আলো এবং শব্দের মিশ্রণ একেকটা একেক রকম। শুধু এই কারণে কেমন বদলে যাচ্ছে— অর্থ অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা ছবি দেখাতে দেখাতে ভদ্রমহিলা ব্যাখ্যা করছেন।

'দেখুন, নাটক শুরু হয় গীর্জায়। ধর্মযাজকরা গীর্জায় নাটকের মাধ্যমে লোকদের ধর্ম শিক্ষা

দিতেন। তার মানে এই নয় যে, নাটক ব্যাপারটায় ঐশ্বরিক কিছু আছে। কিছুই নেই। নাটকের মাধ্যমে আমরা মানুষের মনে আবেগ তৈরি করি। নাটকের গবেষকরা এখন কাজ করছেন আবেগ তৈরির মেকানিজম নিয়ে। নাটক তার রহস্যময়তা হারাতে বসেছে। এখন আমরা আবেগের ব্যাপারটা বিজ্ঞানের চোখে দেখতে শুরু করেছি। বিজ্ঞানের কাছে হৃদয় কিন্তু একটা রক্ত পাম্প করার যন্ত্র ছাড়া কিছুই নয়।'

আসিফ মুগ্ধ হয়ে গেল। বারবার মনে হল, লীনা পাশে থাকলে চমৎকার হত। একটা চমৎকার জিনিস বেচারি 'মিস' করল। আসিফের খুব ইচ্ছা করছিল ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করে -- আধুনিক কালের নাটকে কী অভিনেতা-অভিনেত্রীর গুরুত্ব কমে আসবে?

গুছিয়ে ইংরেজিটা তৈরি করতে পারল না বলে জিজ্ঞেস করতে পারল না। লিটল ঢাকার মন্তাজ সাহেব বলতে বাধ্য হলেন, 'শালী জানে ভালই! শেষ দৃশ্যে এসে শালী জমিয়ে দিয়েছে। কি বলেন আসিফ সাহেব?'

আসিফ কিছু বলল না। তার মনে এক ধরনের মুগ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। কথা বলে এই মুগ্ধতা সে নষ্ট করতে চায় না।

সারাদিনেও তার মুগ্ধতা কাটল না। কানে বাজতে লাগল রূপবতী মহিলার চমৎকার ব্যাখ্যা। একের পর এক যুক্তির ইট বিছিয়ে বিশাল ইমারত তৈরি করা।

অবশ্যি মাঝে মাঝে এইসব যুক্তিতে ভুল থাকে। ভুল যুক্তির ইটে বিশাল ইমরাতও তৈরি হয়। এক সময় সেই ভুল ধরা পড়ে। সুবিশাল প্রাসাদ মুহূর্তে ধসে যায়।

আসিফের সারাদিন কিছুই করার ছিল না। অনেক দিন পর দুপুরে টানা ঘুম দিল। ঘুম থেকে জেগে উঠে মনে হল লীনার সঙ্গে শেষবারের মত দেখা করে এলে কেমন হয়। এই চিন্তাও দীর্ঘস্থায়ী হল না। লীনার কাছে যাওয়া মানেই এমন অনেকের সঙ্গে দেখা হওয়া, যাদের সঙ্গে তার ভাল লাগে না। তারচে লীনা নেই, এই ধরনের বিরহ ভাল লাগছে।

বেনু যত্নের চূড়ান্ত করছে। দুপুরে সাত-আট পদের রান্না করেছে। এর মধ্যে জিরা-মাংসও ছিল। খেতে মোটেই ভাল হয়নি, তবু আসিফ যখন বলল, 'বাহ্, এরকম কখনো খাইনি তো!' এতেই বেনুর চোখে পানি এসে গেল। বড় ভাল লাগল আসিফের।

ঘুম ভেঙে বিছানায় উঠে বসবার আগেই বেনু এসে উপস্থিত। ট্রেতে করে চা-লুচি হালুয়া নিয়ে এসেছে। তার মুখ হাসি হাসি। তাকে দেখে কে বলবে এই মেয়ে সকালে কেঁদে কেটে কি কাণ্ড করেছে।

চায়ে চিনি মেশাতে মেশাতে বেনু বলল, 'এইবার আপনাদের নাটক দেখব ভাইজান।'

'অবশ্যই দেখবেন। আমি নিয়ে যাব।'

'আপনাকে কতবার বলছি ভাইজান, আমারে তুমি করে বলবেন। আপনারে আমি বড় ভাইয়ের মত দেখি।'

'আচ্ছা বলব। তোমাদের ঝগড়া মিটে গেছে?'

বেনু জবাব দিল না। লজ্জিত মুখে হাসল।

'লুচিটা গরম গরম ভাজছি ভাইজান। একটু খান।'

'পেটে একদম জায়গা নেই।'

'কিচ্ছু হবে না ভাইজান, খান। একটা খান। একটা লুচিতে কি হয়? কিছু হয় না।'

সন্ধ্যা মেলাবার পরপরই আসিফ রিহার্সেলে উপস্থিত হল। আজ একটা ফুল রিহার্সেল হবার কথা। কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় রিহার্সেল শুরু হবে, এর রকম কথা।

আসিফ দেখল সবাই প্রায় এসে গেছে। সবার মুখই বেশ গম্ভীর। বজলু বললেন, 'বিরাট প্রবলেম হয়েছে আসিফ।'

'কি প্রবলেম?'

'ঐ মেয়েকে নিয়ে প্রবলেম। পুষ্প।'

'কি প্রবলেম?'

'মেয়ে জানিয়েছে অভিনয় করবে না।'

'সে কি!'

'এইসব চেংড়ি-ফেংড়ি নিয়ে এখন তো দেখছি গভীর সমুদ্রে পড়লাম। কি করা যায় বল তো?'

'অভিনয় করবে না কেন?'

'তাও তো জানি না। মীনা ফিরে আসার পর আমি নিজেই গেলাম, বুঝলে— আমরা যেমন অবাক, ওদের বাসার লোকজনও অবাক। আমার প্রায় কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা, বুঝলে। আমার অবস্থা দেখে পুষ্পের বাবা নিজেই বললেন, 'শেষ সময়ে তুমি তাদের অসুবিধায় ফেলছ, এটা তো ঠিক না। অন্যায়। খুবই অন্যায়।'

'পুষ্প কি বলল?'

'কিছুই বলে না। মাথাটা বাঁকা করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছু বললেই বলে- না। আমার ইচ্ছা করছিল চড় দিয়ে বাঁদীর নখরামী ঘুচিয়ে দিই।'

বজলু রাগে চিড়বিড় করতে লাগলেন। থমথমে গলায় বললেন, 'তুমি একটু আমার সঙ্গে বারান্দায় আস তো। আড়ালে তোমার সঙ্গে দু'একটা কথা বলব।'

আসিফ বারান্দায় গেল। বজলু সাহেব তিক্ত গলায় বললেন, 'তুমি একবার যাও। তুমি গেলে আসবে।'

'আমি গেলে আসবে কেন?'

'তুমি গেলে সে কেন আসবে সেটা তুমি নিজেও জানো, আমিও জানি। খামোখা কথা বাড়িয়ে লাভ আছে? তুমি তাকে নিয়ে আস— তারপর এই শো'টা পার হলে মেয়েটাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেই হবে। এই যন্ত্রণাটা পার হোক। যাও, জলিলের গাড়ি আছে। গাড়ি নিয়ে যাও।'

'আজ থাক। আরেক দিন যাব।'

'আজই যাও। এটা ফেলে রাখার ব্যাপার না। তুমি এক্ষুণি যাও।'

'যাওয়াটা কী ঠিক হবে?'

'ঠিক হবে না বেঠিক হবে এটা নিয়ে পরে বিচার-বিবেচনা করা যাবে। তুমি কথা বাড়িও না, যাও।'

পুষ্পের বাবা আসিফকে বললেন, 'আপনি বসুন, আমি দেখি মেয়েকে আনা যায় কি না। সে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। মেয়েকে অভিনয় করতে পাঠিয়েও এক যন্ত্রণার মধ্যে পড়লাম।'

আসিফ বলল, 'আমি খুব লজ্জিত, আপনাদের অসুবিধায় ফেলালম। অবস্থা এমন যে, পুষ্প না এলে আমাদের নাটক বন্ধ করে দিতে হবে। চালিয়ে নিতে পারে, এ রকম দ্বিতীয় কেউ নেই।'

'বসুন চা খান। দেখি কি করা যায়।'

চিনি দিয়ে সরবত করে ফেলা এক কাপ ঠাণ্ডা চা আসিফ শেষ করল। পুষ্পের দেখা নেই। এক সময় পুষ্পের বাবা এসে শুকনো গলায় বললেন; 'কিছু মনে করবেন না, মেয়ে দরজাই খুলছে না।'

আসিফ খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আমি কী একবার বলে দেখব? যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে।'

পুষ্পের বাবা বললেন, 'যান বলে দেখুন। রুমি, ওনাকে দোতলায় নিয়ে যা।'

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আসিফ বলল, 'পুষ্প, দরজা খোল।'

পুষ্প সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে বলল, 'আপনি এসেছেন? আপনি নিজে এসেছেন? কি আশ্চর্য, আমাকে তো কেউ বলেনি আপনি এসেছেন!'

'তুমি অভিনয় করবে না পুষ্প?'

পুষ্প ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'আপনি যা করতে বলবেন, আমি তা-ই করব।'

'তাহলে মুখটা ধুয়ে নাও! চল আমার সঙ্গে।'

গাড়িতে পুষ্প সারাক্ষণই কাঁদল। একবার শুধু ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমি কী আপনার হাতটা একটু ধরব?'

আসিফ বলল, 'অবশ্যই। কেন ধরবে না?'

রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত রিহার্সেল হল। ফুল রিহার্সেল, প্রথম দৃশ্য থেকে শেষ দৃশ্য। বজলু সাহেব হৃষ্ট চিত্তে বললেন, 'জিনিস মনে হচ্ছে দাঁড়িয়ে গেছে। তোমাদের কি ধারণা?'

প্রণব বাবু বললেন, 'শেষ দৃশ্য আমার কাছে একটু লাউড মনে হয়েছে।'

'লাউড তো বটেই। এটার প্রয়োজন আছে। আর কারো কোনো কথা আছে? থাকলে বল। ফ্রি ডিসকাশন হোক। আমার মন বলছে, একটা ভাল জিনিস দাঁড়া হয়েছে। তবে আমার ধারণা, থার্ড সিন স্লো হয়েছে।'

'থার্ড সিন তো শ্লোই হবে।'

'এতটা হবে না। ডেলিভারিতে এতটা সময় খাওয়ার কিছু নেই। একজন শ্লো করবে, একজন করবে ফাস্ট। দুজনই শ্লো করলে হবে না। ভেরিয়েশন দরকার।'

'আমার মতে থার্ড সিন ঠিকই আছে।'

'অন্য সবারও কি তাই মত? যদি তাই হয়, তাহলে দয়া করে এখনই বলেন। আমি কোনো রকম খুঁত রাখতে চাই না।'

মজনু চা নিয়ে এল। চায়ের কাপ হাতে নিতে নিতে বজলু সাহেব বললেন, 'জিনিস দাঁড়িয়েছে কেমন, বল তো মজনু।'

মজনু দাঁত বের করে বলল, 'ফাটাফাটি জিনিস হইছে।'

'সত্যি বলছিস?'

'সত্যি না বললে আমি বাপের ঘরের না।'

বজলু সাহেব আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। যেন মজনুর কথায় তিনি খুব ভরসা পেলেন।

আসিফের বাসায় ফিরতে রাত এগারটা বেজে গেল। দরজার বেল টিপতেই লীনা এসে দরজা খুলে দিল।

আসিফ হতভম্ব হয়ে বলল, 'কি ব্যাপার?'

লীন হাসি মুখে বলল, 'কোনো ব্যাপার না। যেতে ইচ্ছা করল না।'

'যেতে ইচ্ছা করল না মানে? ওরা চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ। মা, দুলাভাই খুব রাগারাগি করছিল।'

'যাওনি কেন?'

'ঘরে আস, তারপর বলি।'

আসিফ ঘরে ঢুকল। তার বিস্ময় এখনো পুরোপুরি কাটেনি। লীনা বলল, 'আমাকে দেখে খুশি হয়েছ?'

'তুমি যাওনি কেন সেটা আগে শুনি।'

'এয়ারপোর্টে যাবার পর হঠাৎ মনটা খারাপ হয়ে গেল। মনে হল একা একা বাসায় ফিরবে। একা একা শুয়ে থাকেব। মনে হতেই চোখে পানি এসে গেল। তারপর চলে এলাম।'

'এইসব কি পাগলামী লীনা!'

'তুমি কী আমাকে দেখে খুশি হওনি?'

'হয়েছি।'

'কতটুকু খুশি হয়েছ?'

'অনেকখানি।'

'তাহলে তুমি এখনো আমাকে জড়িয়ে ধরছ না কেন?'

আসিফ গভীর আবেগে তার স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল।

লীনা গাঢ় স্বরে বলল, 'আজ সারাদিন আমার কি মনে হচ্ছিল জান? মনে হচ্ছিল তুমি আমাকে ভালবাস না। তোমার ভালবাসার মধ্যে অনেকখানি অভিনয় আছে।'

'এখনো কী সে রকম মনে হচ্ছে?'

'না।'

সারারাত দুজন জেগে রইল। কত অর্থহীন কথা, কত অর্থহীন হাসি। বারবার লীনার চোখে পানি আসছে, সেই পানি মুছে সে হাসছে।

আসিফ বলল, 'একটা গান কর না লীনা।' লীনা শব্দ করে হাসল। হাসতে হাসতে বলল, 'আমার গান হয় নাকি?'

'এক সময় তো গুনগুন করতে। এখনো না হয় কর।'

'মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো?'

'কি মনে হয়?'

'মনে হয় অভিনয় না করে গান করলে পারতাম। গানের দিকে আমার ঝোঁক ছিল। তোমার জন্যে অভিনয়ে চলে এলাম।'

'তোমার কি মনে হয় ভুল করেছ?'

লীনা তার জবাব না দিয়ে বলল, 'সত্যি গান শুনতে চাও, গাইব?'

'গাও।'

'মাত্র চার লাইন কিন্তু।'

'গান চার লাইনেই ভাল।'

লীন মৃদুস্বরে গাইল - 'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে।' চার লাইন পর্যন্ত যেতেই পারল না। কেঁদে-কেটে অস্থির হল। আসিফ বলল, 'কাঁদছ কেন?'

'জানি না কেন? আমার প্রায়ই কাঁদতে ইচ্ছে করে। তোমার করে না?'

আসিফ জবাব দেবার আগেই লীনা হঠাৎ করে বলল, 'আমি না যাওয়ায় তুমি খুশি হয়েছ তো?'

'একবার তো বললাম, খুশি হয়েছি।'

'আরেকবার বল।'

'খুশি হয়েছি। খুব খুশি হয়েছি।'

'না যাবার আরেকটা কারণও আছে। এটা তোমাকে বলিনি, কারণ তোমার মনটা খারাপ হবে।'

'মন খারাপ হবে না। তুমি বল।'

'এ মাসের সতের তারিখে আমাদের বড় মেয়ের মৃত্যুদিন। এই দিনে আমরা দুজন দু'জায়গায় থাকব তা কি করে হয়!'

'না, তা হয় না।'

'এ দিন আমার দুজন হাত ধরাধরি করে সারাক্ষণ পাশাপাশি বসে থাকব।'

লীনা চোখের পানি মুছে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'আমার মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানো? আমরা যদি আমাদের জীবনের সবচে প্রিয় জিনিস ছেড়ে দিই, তাহলে হয়ত আমাদের এবারের বাচ্চাটা বেঁচে যাবে। এক ধরনের সেক্রিফাইস। আমার এই কথায় তুমি কি কিছু মনে করলে?'

দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে আসিফ বলল, 'না, কিছু মনে করিনি।'

'এটা একটা কথার কথা।'

'কথার কথা কেন হবে? তোমার মনের মধ্যে এটা আছে। আছে না?' লীনা চুপ করে রইল।

আসিফ বলল, 'বড় তৃষ্ণা পেয়েছে। এক গ্লাস পানি খাওয়াবে?'

লীনা বিছানা থেকে নেমে বাতি জ্বালাল। আর তখনি ওয়ারড্রোবের মাথায় রাখা ছবির ফ্রেম দুটির দিকে আসিফের চোখ পড়ল। লোপা এবং ত্রপার বাঁধান ছবি। ট্রাঙ্কে তালাবদ্ধ থাকে। কখনো বের করা হয় না। আজ বের করা হয়েছে।

লীনা ছবি দু'টির দিকে তাকিয়ে বলল, 'সতের তারিখের পর আবার লুকিয়ে ফেলব।'

আসিফ বলল, 'লুকিয়ে ফেলার দরকার কি, থাকুক। তুমি যাও, পানি নিয়ে এস।'

আসিফ তাকিয়ে রইল ছবি দুটির দিকে। আহ্‌, কি সুন্দর দুই মা-মণি! একজন আবার রাগ করে ঠোঁট উল্টে আছে। অন্যজন কেমন চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছে। যেন পৃথিবীর রহস্য দেখে তার বিস্ময়ের সীমা নেই।

আসিফের বুক জ্বালা করতে লাগল। ছবি দুটির দিকে তাকালেই তার অসহ্য কষ্ট হয়। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'ত্রপা, ত্রপা মামণি। কেমন আছ গো?'

ত্রপা জবাব দিল না, জবাব দিল লীনা। সে স্নিগ্ধ গলায় বলল, 'পানি নাও।'

আসিফ এক চুমুকে পানি শেষ করে সহজ গলায় বলল, 'আমি আর অভিনয় করব না লীনা। তোমাকে কথা দিচ্ছি। বাতি নিভিয়ে দাও, চোখে আলো লাগছে।'

'তুমি কি আমার ওপর রাগ করলে?'

'না লীনা। রাগ করিনি।'

'আমি একটা কথার কথা বললাম।'

'বাতি নিভিয়ে দাও লীনা। বাতি নিভিয়ে দাও।'

লীনা বাতি নিভিয়ে দিল।

আসিফদের শো হল না। শো-এর দিন আসিফ এবং লীনা ছাড়া দলের সবাই একত্রিত হল। মজনু বারান্দায় চায়ের কেতলি বসিয়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। বজলু সাহেব তিক্ত গলায় বললেন,

'কেউ গিয়ে চড় দিয়ে গাধাটাকে থামাও তো, অসহ্য!' বলতে বলতে তিনি নিজেও কেঁদে ফেললেন। এবং কাঁদলেন শিশুদের মত শব্দ করে। তাঁকে ঘিরে মূর্তির মতো সবাই বসে রইল। কেউ একটি শব্দও করল না। শুধু পুষ্পকে দেখে মনে হল, যে কোনো মুহূর্তে এই মেয়েটি ভেঙে পড়বে। তবে সে ভেঙে পড়ল না। সাজঘরের এক কোণায় চুপচাপ বসে রইল। বজলু সাহেব যখন বললেন, 'খামোখা বসে আছে কেন সবাই? যাও, বাসায় চলে যাও।' তখনি শুধু তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। কেউ এসে সান্ত্বনার হাত তার মাথায় রাখল না।

কিছুদিন পরই থিয়েটারের এই দলটি নতুন নাটকের মহড়া শুরু করল। নাটকের নাম-- হলুদ নদী, সবুজ বন। মজনু আবার তার জাম্বোসাইজের কেতলিতে চায়ের পানি বসিয়ে দিল। জলিল সাহেব জমিয়ে আদিরসের গল্প শুরু করলেন। বজলু সাহেব উত্তেজিত ভঙ্গিতে ছোটাছুটি করতে লাগলেন। সবই আগের মত, শুধু আসিফ এবং লীনা নেই। এরা দুজন যেন হঠাৎ উবে গেছে। অথচ সবাই জানে তারা আগের জায়গাতেই আছে, সেই আগের বাসায়। পূর্বা নাট্যদলের যেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি, তেমনি আসিফ এবং লীনারও কোনো পরিবর্তন হয়নি। আসিফ শুধু বলেছে, সে অভিনয় করবে না। কেন অভিনয় করবে না, সমস্যাটা কি  এই কথা পূর্বা নাট্যদলের কেউ জানতে পারেনি। অনেক চেষ্টা করেও পারেনি। শুধু পুষ্প খানিকটা জানে। তাকে আসিফ একটা চিঠি লিখেছিল।

পুষ্প,

আমার খুব ইচ্ছা ছিল মুখোমুখি কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গে কথা বলি, কেন অভিনয় ছেড়ে দিলাম তা তোমাকে গুছিয়ে বলি। তা সম্ভব হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, জানতে চেও না।

দেখ পুষ্প, অভিনয় আমায় বড়ই সখের জিনিস। এর কারণে আমি যেমন একদিকে সব কিছু হারিয়েছি, আবার তেমনি অনেক পেয়েছিও। লীনার মতো একটি মেয়েকে পাশে পাওয়া কত বড় ভাগ্যের ব্যাপার, তা আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। আর শুধু কি লীনা? তোমাকেও কি আমি অভিনয়ের কারণেই পাইনি? লজ্জা পেও না পুষ্প, সত্যি কথাটা বলে ফেললাম। বেশির ভাগ সময়ই আমরা সত্যি কথা লুকিয়ে রাখি, তবু মাঝে মাঝে বলতে ইচ্ছে করে।

যে কথা বলছিলাম, অভিনয় আমার জীবনের অনেকখানি, কে জানে হয়তবা সবখানি। সেই অভিনয় থেকে সরে আসা যে কি কষ্টের, তা মনে হয় তুমি বুঝতে পারছ। কেন সরে এলাম? পুরোটা তোমাকে বলতে পারছি না। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, আমার এবং লীনার জীবনে একটি গভীর ট্র্যাজিডি আছে। গহীন একটি ক্ষত। লীনার কেন জানি মনে হয়েছে, আমরা দুজনই যদি বড় কোনো সেক্রিফাইস করি, তাহলে হয়তবা ট্র্যাজিডির অবসান হবে। লীনার মনের শান্তির জন্যে এইটুকু আমাকে করতেই হবে। অভিনয় তো জীবনের চেয়ে বড় নয়, তাই না?

তোমাকে এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য কিন্তু দুঃখের কাঁদুনি গাওয়া নয়। এই জিনিস আমি কখনো করি না। তোমাকে চিঠি লেখার একটিই কারণ, তা হচ্ছে  তুমি যেন অভিনয় ছেড়ে না দাও। অভিনয়ের যে অসম্ভব ক্ষমতা নিয়ে তুমি জন্মেছ, সেই ক্ষমতাকে নষ্ট করো না। সব মানুষকে সব ক্ষমতা দিয়ে পাঠানো হয় না। যাদেরকে দেয়া হয়, তাদের ওপর আপনাতেই সেই বিশেষ প্রতিভার লালন করার দায়িত্ব এসে পড়ে। তুমি অনেক বড় হবে পুষ্প। অনেক অনেক বড়। এইটি আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

সত্যি সত্যি যদি তাই হয়, তাহলে সেদিন আমার চেয়ে সুখী কেউ হবে না, এই কথাটি তোমাকে জানানোর জন্যেই আমার দীর্ঘ চিঠি। ভাল থেক, সুকে থেক।

পনের বছর পরের কথা।

আসিফ তার স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে ঢাকা থেকে ট্রেনে করে ময়মনসিংহে আসছেন। মেয়েটির বয়স চৌদ্দ। তার নাম চন্দ্রশীলা। অসম্ভব চঞ্চল মেয়ে। এক দণ্ডও সুস্থির হয়ে বসতে পারে না। ট্রেনে সারাক্ষণ বকবক করেছে। তার মাথায় একটা রঙিন স্কার্ফ বাঁধা ছিল, জানালা দিয়ে অনেকখানি মাথা বের করায় হাওয়ায় সেই স্কার্ফ উড়ে চলে গেছে। লীনা খুব রাগ করেছেন। সেই রাগ অবশ্যি চন্দ্রশীলাকে মোটেই স্পর্শ করেনি। সে বাবার গায়ে হেলান দিয়ে কি একটা বই পড়ে হেসে কুটি কুটি হচ্ছে। লীনা বললেন, 'এসব কি হচ্ছে? চুপ করে ভদ্রভাবে বস না।'

চন্দ্রশীলা বলল, 'তুমি নিজে চুপ করে ভদ্রভাবে বসে থাক তো মা, আমাকে বকবে না। এমনিতেই স্কার্ফ হারিয়ে আমার মনটা খারাপ।'

লীনা কঠিন কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। মেয়েটার মুখের দিকে তাকালেই সব কঠিন কথা কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। মেয়েটা অবিকল ত্রপার মত হয়েছে। কঠিন কিছু বললেই নিচের ঠোঁট উল্টে ফেলে।

আসিফ সাহেব বললেন, 'বই-টই সব ব্যাগে গুছিয়ে ফেল মা, এসে পড়েছি।'

চন্দ্রশীলা বলল, 'এত তাড়াতাড়ি এসে পড়লাম কেন বাবা? আমার নামতে ইচ্ছা করছে না।'

'কী করতে ইচ্ছা হচ্ছে?'

'ট্রেনেই থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। আচ্ছা বাবা, সারাজীবন যদি আমরা ট্রেনে ট্রেনে থাকতাম, তাহলে ভাল হত না?'

'হ্যাঁ, ভালই হত।'

স্টেশনে অসম্ভব ভিড়। আসিফ সাহেব অনেক কষ্টে স্ত্রী এবং মেয়েকে নিয়ে নামলেন। ভিড় ঠেলে এগুতে পারছেন না, এমন অবস্থা লীনা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বল তো?'

আসিফ বললেন, 'মনে হচ্ছে বিখ্যাত কেউ ট্রেন থেকে নেমেছেন। লোকজনদের হাতে প্রচুর মালা-টালা দেখা যাচ্ছে।'

চন্দ্রশীলা বাবার হাত ধরে সাবধানে ভিড় ঠেলে এগুচ্ছে। সে আড়ে আড়ে ভীত চোখে মা'র দিকে তাকাচ্ছে, কারণ ভিড়ের চাপে তার বাঁ পায়ের স্যান্ডেলটি সে হারিয়ে ফেলেছে। মা জানতে পারলে আবার খোঁজাখুজি শুরু করবেন। চন্দ্রশীলার ইচ্ছা খুব তাড়াতাড়ি বের হয়ে যাওয়া। একটা স্যান্ডেল গিয়েছে তো কী হয়েছে? আরেক জোড়া কিনলেই হবে। এই জোড়াটা এমনিতেও তার পছন্দ না। ক্যাটক্যাটে হলুদ রঙ। সে এবার মেরুন রঙের স্যান্ডেল কিনবে।

চন্দ্রশীলা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। হতভম্ব হয়ে যাওয়া গলায় বলল, 'বাবা দেখ, ট্রেন থেকে কে নামছেন দেখ। পুষ্প, পুষ্প। বাবা, উনি পুষ্প না? কি আশ্চর্য, আমরা এক ট্রেনে এসেছি!'

আসিফের কাছে ভিড়ের রহস্য স্পষ্ট হল। আজকের পত্রিকায় অবশ্যি ছিল  পুষ্প ময়মনসিংহ টাউন ক্লাবে যাবে। সেখানে কি একটা অনুষ্ঠান করার কথা।

'বাবা, উনি কি পুষ্প?'

'হ্যাঁ।'

'বাবা, উনি কি আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন?'

'এই ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে যাবার কোনো উপায় নেই মা।'

পুষ্প বিরাট একটা কালো চশমায় চোখ ঢেকে রেখেছে। তাঁকে ঘিরে আছে বলিষ্ঠ কিছু ছেলেমেয়ে, যেন কেউ কাছে যেতে না পারে। তবু লোকজন এগুতে চেষ্টা করছে।

'বাবা একটু দেখ না, ওনার একটা অটোগ্রাফ পাওয়া যায় কি না। আমার খুব সখ। উনি দেখতেও তো সুন্দর, তাই না বাবা?'

আসিফ মেয়েকে নিয়ে ভিড় ঠেলে কাছে যেতে চেষ্টা করছেন। লীনা একা একা দাঁড়িয়ে দৃশ্যটি দেখছেন। তাঁর চোখ জ্বালা করছে। জল আসবার আগে আগে চোখ এমন জ্বালা করে।

আসিফ মেয়েকে নিয়ে পুষ্পের কাছাকাছি পৌছে গেছেন। চন্দ্রশীলা ছোট নোটবুক উঁচু করে ধরে আছে।

পুষ্প তার হাত থেকে নোটবুক নিয়ে দ্রুত কী সব লিখে নোটবুক ফেরত দিল। চোখের কালো চশমা খুলে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল আসিফের দিকে, তারপর সবাইকে হতভম্ব করে নিচু হয়ে তাঁর পা স্পর্শ করল। পরমুহূর্তেই এগিয়ে গেল সামনে। মানুষের ভিড় বড়ই বাড়ছে। স্টেশন থেকে বের হয়ে যেতে হবে। তার দাঁড়িয়ে থাকার সময় নেই।

চন্দ্রশীলা কান্না কান্না গলায় বলল, 'বাবা, উনি তোমাকে চেনেন? তুমি তো কোনোদিন বলনি। তুমি এরকম কেন বাবা?'

অভিমানে তার নিচের ঠোঁট বেঁকে গেছে। চোখে জল টলমল করছে। হয়ত সে কেঁদে ফেলবে। এই বয়সী মেয়েরা অল্পতেই কেঁদে ফেলে।



# জনম জনম

তিথি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

কেন দাঁড়িয়ে আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্যি আঠার-উনিশ বছরের মেয়েরা বিনা কারণেই আয়নার সামনে দাঁড়ায়। তিথির বয়স একুশ। সেই হিসেবে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার একটা অর্থ করা যেতে পারে। এই বয়সের মেয়েরা অন্যের মাঝে নিজের ছায়া দেখতে ভালবাসে। যে কারণে পুকুর দেখলেই পুকুরের পানির উপব ঝুঁকে পড়ে। আয়নার সামনে থমকে দাঁড়ায়। নিজেকে দেখতে বড় ভাল লাগে।

তিথির বয়স একুশ হলেও এইসব যুক্তি তাব বেলায় খাটছে না। কারণ ঘর অন্ধকার। আয়নায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না। যদিও বাইরে শেষ বেলার আলো এখনো আছে। সেই আলোর খানিকটা এ ঘরে আসা উচিত কিন্তু আসছে না। বৃষ্টির মধ্যে দরজা-জানালা বন্ধ কবে রাখা হয়েছে। সারাদিন অবিশ্রান্ত বর্ষণ হযেছে। এখন বৃষ্টি নেই। দরজা-জানালা অবশ্যি খোলা হয়নি। কারণ আবার বৃষ্টি আসবে। আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে।

এই ঘরে সে ছাড়াও আরো একজন মানুষ আছে, তাব বাবা শিয়ালজানি হাই স্কুলের রিটায়ার্ড অ্যাসিসেটেন্ট হেড মাস্টার জালালুদ্দিন সাহেব। জালালুদ্দিন সাহেব চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন। খানিকক্ষণ আগে তাঁর ঘুম ভেঙেছে। তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে সমস্যা আছে। চোখ প্রায় নষ্ট। কিছুই দেখতে পান না। কড়া রোদে আবছা আবছা কিছু দেখেন। সত্যি দেখেন না কল্পনা করে নেন তা বোঝা মুশকিল। আজ তাঁর কাছে মনে হচ্ছে তিনি তাঁর বড় মেয়েকে এই অন্ধকারেও দেখতে পাচ্ছেন। শ্যামলা মেয়েটির বালিকাদেব মত সরল মুখ, বড় বড় চোখ সব তিনি পবিষ্কাব দেখতে পাচ্ছেন। কী আশ্চর্য কাণ্ড!

জালালুদ্দিন সাহেব প্রচণ্ড উত্তেজনা বোধ কবলেন। তাঁর চোখ কি তাহলে সেরে গেল নাকি? গত সাতদিন ধরে একটা কবিরাজি ওষুধ তিনি চোখে দিচ্ছেন 'নেত্র সুধা'। ওষুধটা মনে হচ্ছে কাজ করেছে। জালালুদ্দিন চিকন গলায় ডাকলেন ও তিথি।

তিথি বাবার দিকে ফিবে তাকাল। কিছু বলল না।

চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি রে মা। তোর পরনে একটা লাল শাড়ি না? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি।

তিথি বলল, শাড়ির রঙ নীল। বলেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আজ সে বাইরে যাবে। বাইরে যাবার আগে কারো সঙ্গে কথা বলতে তার ভাল লাগে না।

তিথি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিযে বইল আবার বৃষ্টি আসবে কি না বুঝতে চেষ্টা করল। বৃষ্টি আসুক বা না আসুক তাকে বেরুতেই হবে। সে রান্নাঘরে ঢুকল। রান্নাঘরে তিথির মা মিনু চুলা ধরানোর চেষ্টা করছেন। কাঠ ভেজা। কিছুতেই আগুন ধরছে না। বোতল থেকে কেরোসিন ঢাললেও লাভ হয় না। ধপ করে জ্বলে উঠে কিছুক্ষণ পর আগুন নিভে যায়। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া বেরুতে থাকে। তিথি একটা মোড়ায় বসে মাকে দেখছে। মিনু বিরক্ত গলায় বললেন তুই বসে বসে ধোঁয়া খাচ্ছিস কেন? বারান্দায় গিয়ে বোস। তিথি নিঃশব্দে উঠে এলো। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। আবার বৃষ্টি হচ্ছে। টিনের চালে ঝমঝম শব্দ। ঘোর বর্ষা।

তাদের বাসাটা কল্যাণপুর ছাড়িয়েও অনেকটা দূরে। জায়গাটার নাম সুতাখালি। পুরোপুরি গ্রাম বলা যায়। চারদিকে ধানি জমি। তবে ঢাকা শহরে লোকজন বেশির ভাগ জমিই কিনে ফেলেছে। তিন ফুট উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘিরে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে দিস প্রপার্টি বিলংস টু... দেয়াল ঘেরা অংশে পানি থৈ থৈ করে। পানির বুক চিরে যখন-তখন হলুদ রঙের সাপ সাঁতরে যায়। জায়গাটায় সাপখোপের খুব উপদ্রব। তবে অবস্থা নিশ্চয়ই এ রকম থাকবে না। তিন-চার বছরের মধ্যেই চার-পাঁচতলা দালান উঠে যাবে। ইলেকট্রিসিটি গ্যাস চলে আসবে। সন্ধ্যাবেলা চারদিক ঝলমল করবে। তিন কামরার একটি বাড়ির ভাড়া তিন-চার হাজার টাকা। তিথিদের এই বাড়িটার

ভাড়া মাত্র ছ'শ। রান্নাঘর ছাড়াই তিনটা কামরা আছে। এক চিলতে বারান্দা আছে। করোগেটেড টিনের শিটের বেড়া দিয়ে ঘেরা। রান্নাঘরের পাশে তিনটা পেঁপে গাছ আছে। তিনটা গাছেই প্রচুর পেঁপে হয়। ছ'শ টাকায় এ-ই বা মন্দ কী?

মিনু চায়ের কাপ দিয়ে বারান্দায় এসে বিরক্ত মুখে বলল, আবার বৃষ্টি নামল! এই বৃষ্টির মধ্যে যাবি কিভাবে? তিথি জবাব দিল না। আকাশের মেঘের দিকে তাকাল। মেঘ দেখতে সব মেয়েরই বোধ হয় ভাল লাগে। তিথির চোখে-মুখে এক ধরনের মুগ্ধতা।

মিনু বললেন, চায়ে চুমুক দিয়ে দেখ মিষ্টি লাগবে কি-না।

চা খাব না মা। বাবাকে দিয়ে দাও।

তোর বাবার জন্যে তো বানিয়েছি, তুই খা।

ইচ্ছা করছে না।

শরীর খারাপ নাকি রে?

না। শরীর ভালই আছে। টুকু ঘরে আছে কি-না দেখ তো মা। আমাকে এগিয়ে দেবে।

টুকু ঘরে ছিল। বাবার সাথে চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিল। মিনু চাদর সরিয়ে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিলেন-- হারামজাদা বাঁদর। সন্ধ্যাবেলায় ঘুম। টান দিয়ে কান ছিঁড়ে ফেলব।

জালালুদ্দিন বিড়বিড় করে বললেন ঘুমন্ত অবস্থায় মারধর করা ঠিক না। ব্রেইনে এফেক্ট করে।

মিনু তীব্র গলায় বললেন তুমি চুপ করে থাক। তোমাকে মারধর করা হয়নি। সামনে চায়ের কাপ আছে ফেলে একাকার করবে না।

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছাবার আগেই হীরুকে দেখা গেল পানিতে ছপছপ শব্দ করতে করতে আসছে। হীরু তিথির এক বছরের বড়। মুখ ভর্তি গোঁফ দাড়ির জঙ্গলের জন্য বয়স অনেক বেশি মনে হয়। হীরুর এক হাতে দড়িতে বাঁধা ইলিশ মাছ। অন্য হাতে টর্চ। ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়ায় ঝাপসামত আলো বেরুচ্ছে। হীরু পাঁচদিন আগে আধমণ চাল কিনবার টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল- আজ ফিরছে। তিথি না দেখার ভান করল।

হীরু গম্ভীর গলায় বলল, তোরা কোথায় যাচ্ছিস?

তিথি জবাব দিল না। যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল। যেন সে এই মানুষটাকে চেনে না। এ যেন রাস্তার একজন মানুষ। পরিচিত কেউ নয়।

কি রে, কথা বলছিস না কেন?

তোর সঙ্গে কথা বলার কিছু আছে?

আরে কি মুশকিল, এত রেগে আছিস কেন? বৃষ্টি-বাদলা দিনে এত রাগ ভাল না। বাসায় চল।

বাসায় গিয়ে কী হবে?

হবে আবার কী? গরম গরম ভাত আর ইলিশ মাছ ফ্রাই খাবি। চল্লিশ টাকা দিয়ে কিনলাম। এমনিতে সত্তর টাকা দাম। বৃষ্টি-বাদলা বলে বাজারে লোক নেই। পানির দামে সব ছেড়ে দিচ্ছে।

তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না। বাসায় যা। বাসায় গিয়ে ইলিশ মাছ ভাজা খা।

রাতে ফিরবি তো? ফিরলে কখন ফিরবি বলে যা, বাস স্ট্যান্ডে থাকব। দিনকাল ভাল না।

আমার জন্যে কাউকে দাঁড়াতে হবে না। আর একটা কথা বললে আমি কিন্তু চড় লাগাব। ফাজিল কোথাকার। চোরের চোর।

আরে কি মুসিবত, মুখ খারাপ করছিস কেন? আমি তোর সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছি, তুই আমার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করবি। আমি কী গালাগালি করছি?

চুপ কর।

ধমক দিচ্ছিস কেন? তোর বড় ভাই হই মনে থাকে না? সংসারকে দুটা পয়সা দিয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস। পয়সা কিভাবে আনছিস সেটা বুঝি আমি জানি না? এই শর্মা মায়ের বুকের দুধ খান না। সব বুঝে। তোর ঐ পয়সায় আমি পেচ্ছাব করে দেই। আই মেক ওয়াটার। বুঝলি ওয়াটার। আমার স্ট্রেইট কথা। পছন্দ হলে হবে। না হলে - নো প্রবলেম।

তিথি দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। সে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। হীরু লম্বা লম্বা পা ফেলে বাড়ির দিকে রওনা হল।

বারান্দায় উঠেই সে সহজ গলায় বলল মা, মাছটা ধর তো। তার বলার ভঙ্গি থেকে মনে

হতে পারে সে কিছুক্ষণ আগে মাছ কেনার জন্যেই গিয়েছিল। কিনে ফিরেছে।

মিনু রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ছেলের দিকে। হীরু মা'র দৃষ্টি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, ঘরে সর্ষে আছে মা? যদি থাকে, সর্ষে বাটা লাগিয়ে দাও। কুমড়ো পাতা খোঁজ করছিলাম। পাইনি। পেলে পাতুরি করা যেত। বর্ষা-বাদলার দিনে পাতুরির মত জিনিস হয় না।

মিনু শান্ত কণ্ঠে বললেন, তুই বেরিয়ে যা। হীরু অবাক হয়ে বলল, কোথায় বেরিয়ে যাব?

যেখানে ইচ্ছা যা। এই বাড়িতে তোকে দেখতে চাই না।

ঠিক আছে যেতে বলছ যাব।

এক্ষুণি যা।

আচ্ছা ঠিক আছে। মাছটা সখ করে এনেছি, রান্নাবান্না কর খেয়ে তারপর যাই। এক ঘণ্টা আগে গেলেও যা পরে গেলেও তা।

মিনু মাছ উঠোনের কাদার মধ্যে ছুড়ে ফেলে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। হীরু উঁচু গলায় বলল, আমার ওপর রাগ করছ কর মাছের ওপর রাগ করছ কেন? এই বেচারা তো কোনো দোষ করেনি। একের অপরাধে অন্যের শাস্তি — এটা কি রকম বিচার?

মিনু রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন — ঘরে ঢুকলে বঁটি দিয়ে তোকে চাকা চাকা করে ফেলব। খবরদার! হীরুর তেমন কোনো ভাবান্তর হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই হীরুকে দেখা গেল গামছা লুঙ্গির মত করে পরে বঁটি দিয়ে অন্ধকারে মাছ কুটতে বসেছে। কথা বলছে নিজের মনে। এমন ভাবে বলছে যেন রান্নাঘর থেকে মিনু শুনতে পান —

সব কিছু না শুনেই রাগ। আরে আগে ঘটনাটা কি ঘটেছে শুনতে হবে না? না শুনেই চিৎকার, চেঁচামেচি। চাল কিনতে বাজারে ঢুকেছি। নাজিরশাল চাল। দেখেশুনে পছন্দ করলাম। বস্তার মধ্যে নিলাম বিশ সের। টাকা দিতে দিয়ে পকেটে হাত দিয়ে দেখি — পরিষ্কার। সাফা করে দিয়েছে। চাল না নিয়ে বাসায় ফিরি কিভাবে? চক্ষু লজ্জার ব্যাপার আছে না? গেলাম রশীদের কাছে টাকা ধার করতে। সেইখানে গিয়ে দেখি রশীদ শালা টেম্পোর সঙ্গে একসিডেন্ট করে এই মরে সেই মরে... গেলাম হাসপাতালে, দিলাম ব্লাড। ব্লাড দেয়ার পরে দেখি নিজের অবস্থা কাহিল ভিরমি খেয়ে পড়ে যাচ্ছি, সিস্টার এসে ধরল...

মিনু রান্নাঘর থেকে জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ নিয়ে বের হলেন। শীতল স্বরে বললেন — আর একটা কথা না। হীরু চুপ করে গেল।

জালালুদ্দিন নিচু গলায় বললেন, খালি পেটে চা খাওয়াটা ঠিক হবে না। আলসার ফালসার হয়। ঘরে আর কিছু আছে?

মুড়ি আছে। মুড়ি মেখে দেব?

থাকলে দাও। খিদে খিদে লাগছে।

ঐ একটা জিনিসই তো তোমার লাগে — ক্ষিধা। সকালে ক্ষিধা, বিকালে ক্ষিধা, সন্ধ্যায় ক্ষিধা।

মিনু আবার রান্নাঘরে ঢুকলেন। চাপা স্বরে বিড়বিড় করতে লাগলেন, এর নাম সংসার। স্বামী-পুত্র-কন্যার সুখের সংসার। এত সুখ আমার কপালে। আমি হলাম গিয়ে সুখের রানী — চম্পাবতী।

জালালুদ্দিনের চোখ এখন বন্ধ। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখ করকর করে। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। তিনি হাতড়ে হাতড়ে চায়ের কাপ নিলেন। চুমুক দিয়ে তৃপ্তির একটা শব্দ করলেন। নরম স্বরে ডাকলেন — ও টুকু। টুকন রে।

টুকু জবাব দিল না। বিনা কারণে মার খেয়ে তার মন খুব খারাপ হয়েছে। সে বসে আছে গম্ভীর মুখে। জালালুদ্দিন আবার ডাকলেন, ও টুকু। ও টুকুন।

কী?

চোখটা মনে হচ্ছে সেরেই গেছে। খানিক্ষণ আগে তিথিকে দেখলাম। পরিষ্কার দেখলাম। শাড়ির রঙটা অবশি ধরতে পারিনি।

টুকু কিছুই বলল না।

তিনি তাতে খুব একটা ব্যথিত হলেন না। এ বাড়িতে বেশির ভাগ লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না। তার এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

ও টুকু?

কী?

মাগরেবের আজান হয়েছে?

জানি না।

চা খাবি? পিরিচে ঢেলে দেই? জ্বরের মধ্যে চা ভাল লাগবে। ওষুধের মত কাজ করবে। পাতার রসটা ডাইরেক্ট আসছে। কুইনিন কী জিনিস? গাছের বাকলের রস। গাছের রস। খুবই উপকারী।

টুকু কোনো কথা না বলে খাট থেকে নেমে গেল। তার বয়স তের। কিন্তু দেখে মনে হয় ন-দশ। শরীর খুবই দুর্বল। কিছু দিন পরপরই অসুখে পড়ছে। আজ জ্বরের জন্যে সে অবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

বারান্দায় বালতিতে বৃষ্টির পানি ধরে রাখা। টুকু মগ ডুবিয়ে পানি তুলছে। বরফ শীতল সেই পানিতে মুখ ধুতে গিয়ে শীতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। নিশ্চয়ই এখনো গায়ে জ্বর আছে। নয় তো পানি এত ঠাণ্ডা লাগত না। মুখে পানি ঢালতে ঢালতে সে তিথির দিকে তাকাল। আপাকে কি সুন্দর লাগছে! আপা আর একটু ফর্সা হলে কি অদ্ভুত হত!

তিথি বলল, টুকু আমাকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিবি?

টুকু মাথা নাড়ল। ভেতর থেকে জালালুদ্দিন ডাকলেন তিথি, শুনে যা তো মা।

তিথি বারান্দা থেকে নড়ল না। সেখান থেকেই বলল কি বলবে বল।

এই সন্ধ্যাবেলা কোথায় বেরুচ্ছিস? কি রকম ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে দেখছিস না।

আমার কাজ আছে।

ঝড়বৃষ্টির মধ্যে কিসের কাজ? বাদ দে।

সে জবাব দিল না। জালালুদ্দিন বললেন, খবরদার বেরুবি না। কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাক। মানুষ কী পিঁপড়া নাকি যে রাতদিন কাজ করবে।

মিনু ঝাঁঝাল গলায় বললেন, চুপ কর। সব সময় কথা বলবে না।

এই বৃষ্টির মধ্যে যাবে নাকি?

তোমাকে এটা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

বৃষ্টিতে ভিজে একটা জ্বরজ্বারি বাঁধাবে...সিজন চেঞ্জ হচ্ছে।

বললাম তো তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

তিথি যখন বেরুল তখন সন্ধ্যা নেমে গেছে। চারদিক অন্ধকার। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সে ঘর থেকে বেরুবার সময় কাউকে কিছু বলে বেরুল না। মিনু বারান্দাতেই ছিলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে একবার বললও না মা, যাচ্ছি। যেন সে তাঁকে দেখতেই পায়নি।

ঘরে ছাতা নেই। তিথি মোটা একটা তোয়ালে মাথায় জড়িয়ে রাস্তায় নেমেছে। খালি পা। স্যান্ডেল জোড়া হাতে। কাঁচা রাস্তা, খুব সাবধানে পা ফেলতে হচ্ছে। টুকু আগে আগে যাচ্ছে। তার মাথায় কিছু নেই। বৃষ্টিতে মাথার চুল এর মধ্যেই ভিজে জবজবে। তিথি বলল, বাসায় গিয়ে ভাল করে মাথা মুছে ফেলবি। নয় তো জ্বরে পড়বি।

টুকু মাথা কাত করল। মৃদু গলায় বলল, রাতে ফিরবে না আপা?

না।

সকালে আসবে?

হুঁ। এবার বর্ষা আগেভাগে এসে গেল তাই না রে টুকু। মনে হচ্ছে শ্রাবণ মাস। তাই না?

হুঁ।

গতবারের মত এবারও ঘরে পানি উঠবে কি-না কে জানে। তোর কি মনে হয় উঠবে?

টুকু জবাব দিল না। তার গা কাঁপিয়ে জ্বর আসছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না।

কলাবাগানের ভেতরের দিকে একটা বাড়ির সামনে তিথি এসে উপস্থিত হয়েছে। তার শাড়ি কাদা-পানিতে মাখামাখি। হোঁচট খেয়ে স্যান্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে। নখের খানিকটা ভেঙে যাওয়ায় রক্ত পড়ছে। অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর মাঝবয়েসী এক লোক দরজা খুলল। তার খালি গা। হাঁটু পর্যন্ত উঁচুতে লুঙ্গি উঠে আছে। পরার ধরন এমন যে মনে হয় যে কোনো মুহূর্তে খুলে পড়ে যাবে। তার কোলে তিন-চার বছরের একটি বাচ্চা। ভদ্রলোক বাচ্চাকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করছেন। বাচ্চা ঘুমুচ্ছে না। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ঝিম করে থাকে আবার মাথা তুলে 'হিক'

জাতীয় বিচিত্র শব্দ করে।

তিথি বলল, নাসিম ভাই কেমন আছেন? নাসিম বিরক্ত গলায় বলল, এই তোমার বিকাল পাঁচটা, ক'টা বাজে তুমি জানো?

তিথি চুপ করে রইল।

নাসিম বলল, আটটা পঁচিশ।

তিথি হালকা গলায় বলল, দূরে থাকি। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তাই দেরি হল।

দূরে তুমি একা থাক নাকি? অন্যরা থাকে না? কতবার বললাম খুব ভাল পার্টি হাজার খানিক টাকা পেয়ে যাবে। বেশিও দিতে পারে। নতুন পয়সা-হওয়া পার্টি। এদের টাকার মা-বাপ আছে? উপকার করতে চাইলে এই অবস্থা।

ভেতরে আসতে দিন নাসিম ভাই। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি। মনে হচ্ছে জ্বর এসে যাচ্ছে।

আস আস, ভেতরে আস। পা কেটেছে নাকি?

হুঁ।

ইস, রক্ত বের হচ্ছে দেখি। যাও, বাথরুমে ঢুকে শাড়ি বদলে ফেল। তোমার ভাবীকে বল শাড়ি দিবে। আজ রাতে তো আর কিছু পাওয়া যাবে না। ভাল একটা পার্টি চলে গেল।

আজ তাহলে চলে যাব?

ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যাবে কোথায়? কথা বলে সময় নষ্ট করছ কেন? বুকে ঠাণ্ডা বসে গেলে মুশকিলে পড়বে।

নাসিম ভাই, এখানে কোনো জায়গা থেকে একটা টেলিফোন করা যাবে?

কোথায় টেলিফোন করবে?

তিথি চুপ করে রইল। নাসিম বলল, শোন তিথি একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোন পার্টির সাথে বাড়তি খাতির রাখবে না। যত দূরে থাকা যায়। ফেল কড়ি মাখ তেল। এর বেশি কিছু নয়।

সে রকম কিছু না নাসিম ভাই।

সে রকম কিছু না হলেই ভাল।

নাসিম গলা উঁচিয়ে বলল রীনা, কই চা দাও দেখি। ঘরে স্যাভলন-ট্যাভলন আছে? বাথরুমের তাকে দেখ তো। আর এক বান্দরের বাচ্চা তো ঘুমাচ্ছে না। ইচ্ছা করছে আছাড় দিয়ে পেটটা গালিয়ে দেই। চুপ কানবি না। একদম চুপ।

রীনা এসে বাচ্চাটিকে নিয়ে গেল। একবার শুধু সরু চোখে দেখল তিথিকে। আগেও অনেকবার দেখেছে কখনো কথা হয়নি। আজও হল না। রীনার বয়স ষোল-সতের। এর মধ্যে দুটি বাচ্চার মা হয়েছে। তৃতীয় বাচ্চা আসার সময়ও প্রায় হয়ে এল। রোগা শরীরের কারণে তার সন্তানধারণজনিত শারীরিক অস্বাভাবিকতা খুবই প্রকট হয়ে চোখে পড়ে।

নাসিম বলল, এখনো দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, ভেতরে গিয়ে শাড়ি বদলে আস। পায়ে কিছু দাও।

শাড়ি বদলাব না চলে যাব।

এত রাতে?

রাত বেশি হয়নি। বাস আছে।

রাতবিরাতে এরকম চলাফেরা ভাল না, কখন কোন বিপদ হয়।

রীনা চা নিয়ে এসেছে। এত দ্রুত সে চা বানাল কি করে কে জানে। মেয়েটা খুবমই কাজের। তিথির চা খেতে ইচ্ছা করছে না। মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে। জ্বর আসবে কি-না কে জানে। নাসিম পিরিচে ঢেলে বড় বড় চুমুকে চা খাচ্ছে। প্রতিবার চুমুক দিয়ে আহ্ করে একটা শব্দ করছে। সামান্য চায়ে এত তৃপ্তি। কিছু কিছু মানুষ খুব অল্পতে সুখী হয়।

তিথি।

জি।

থাকতে চাইলে থাক, অসুবিধা কিছু নেই। খালি ঘর আছে।

না থাকব না।

পরশু, তরশু একবার এসো। দেখি যদি এর মধ্যে ভাল কোনো পার্টি পাই। ফরেনার পাওয়া গেলে ভাল এদের দরাজ দিল। খুশি হলে হুঁশ থাকে না। তবে সব না। কিছু আছে বিরাট খচ্চর।

চামড়া সাদা হলেই যে দরাজ দিল হয় এটা ঠিক না। সাদা চামড়ার মধ্যেই খচ্চর বেশি।

নাসিম নিজের ছাতা হাতে তিথিকে বাসে তুলে দিতে গেল। যাবে   জানা কথা। যে অল্প কিছু ভাল মানুষের সংস্পর্শে তিথি এসেছে   নাসিম তার মধ্য একজন। সে বাসে তিথিকে শুধু সে উঠিয়েই দিয়ে আসবে তাই না বাসের ড্রাইভারকে বলে আসবে   একটু খেয়াল রাখবেন ভাইসাব, একা যাচ্ছে।

বৃষ্টি ধরে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। রাস্তায় জায়গায় জায়গায় পানি উঠে গেছে। পানি ভেঙে যেতে হচ্ছে। নাসিম বলল, এক ফোঁটা বৃষ্টি হলে দুই হাত পানি হয়ে যায়। এই রহস্যটা কি বুঝলাম না। তিথি কিছু বলল না। নাসিম বলল, তোমার ভাই চাকরি-বাকরি কিছু পেয়েছে?

না।

মটর মেকানিকের কাজ শিখবে নাকি জিজ্ঞেস করো তো। লাগিয়ে দেব। ভালমত কাজ শিখতে পারলে কাঁচা পয়সা আছে, জিজ্ঞেস করো।

আচ্ছা জিজ্ঞেস করব।

টেলিফোন করতে চেয়েছিলে   কার কাছে টেলিফোন?

চেনা একজন।

পাওয়ারফুল কেউ হলে যোগাযোগ রাখবে   কখন দরকার হয় কিছু বলা যায় না।

বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছানো মাত্র বাস পাওয়া গেল। ফাঁকা বাস। পেছনের দিকে তিন-চারজন মানুষ বসে আছে। নাসিম বাসের ড্রাইভারকে বিনীত ভঙ্গিতে বলল, ভাইজান একটু দেখেশুনে নামাবেন, মেয়েছেলে একা যাচ্ছে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা এগিয়ে দিল। নাসিম সিগারেট খায় না, অন্যকে দেবার জন্যে সব সময় সঙ্গে রাখে।

তিথির হাতে সে একশ টাকার নোট গুঁজে দিল। এটা হচ্ছে ধার। হাতে টাকা এলে শোধ দিতে হবে।

বাস না ছাড়া পর্যন্ত নাসিম ফুটপাতে দাঁড়িয়ে রইল। তিথি ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল   এই মানুষটা তার চমৎকার একজন বড় ভাই হতে পারত। কেন হল না?

## ২

হারিকেন জ্বালাতে গিয়ে মিনু দেখলেন তেল নেই। অথচ কাল হারিকেনে তেল ভরার পরও বোতলে চার আঙুলের মত অবশিষ্ট ছিল। গেল কোথায়? টুকু ফেলে দিয়েছে? সকালবেলা কেরোসিনের বোতল নিয়ে কি যেন করছিল। মিনুর বিরক্তির সীমা রইল না। টুকু বাড়ি নেই। সকালে টুকুকে তিনি কিছু শাস্তি দিয়েছেন। দু'বার চুল ধরে দেয়ালে মাথা ঠুকে দিয়েছেন। সে নিঃশব্দে কেঁদেছে কিন্তু কিছু বলেনি। তিনি একাই চেঁচিয়েছেন   কঠিন কঠিন বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। টুকু শুধু শুনে গেছে, মাঝে মাঝে এমন ভঙ্গিতে তাকিয়েছেন যাতে মনে হয় পৃথিবীর হৃদয়হীনতায় সে খুব অবাক হচ্ছে। এতে মিনুর রাগ আরও বেড়েছে। সেই রাতের চরমতম প্রকাশ তিনি দেখালেন দুপুরে ভাত খাবার সময়। টুকুর সামনে থেকে ভাতের থালা সরিয়ে দিয়ে কর্কশ গলায় বললেন, যা তোর ভাত নেই।

টুকু মায়ের দিকে কয়েকবার ভয়ে ভয়ে তাকাল। উঠে গেল না। বসেই রইল। সে ক্ষিধে সহ্য করতে পারে না। মিনু কঠিন গলায় বললেন   উঠ, নয় তো পিঠে চ্যালাকাঠ ভাঙব। টুকু তবু বসে রইল। তিনি সত্যি সত্যি হাতে চ্যালাকাঠ নিলেন। টুকু উঠে বারান্দার জলচৌকিতে বসে রইল। তার মনে ক্ষীণ আশা   কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়ার ডাক আসবে। বিশেষ করে আপা আজ বাসায় আছে। সে নিশ্চয়ই তাকে ফেলে খাবে না। টুকু অবাক হয়ে দেখল   আপা তাকে রেখেই ভাত খেল। খাওয়ার শেষে বারান্দায় হাত ধুতে এসে বলল, টুকু আমাকে মোড়ের দোকান থেকে একটা পান এনে দে। বমি বমি লাগছে।

টুকু পান এনে দিয়ে আবার এসে বসল বারান্দায়। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল, মা রান্নাঘরের ঝামেলা শেষ করে দরজায় শিকল তুলে দিচ্ছেন। এই বাড়ির একজন যে না খেয়ে আছে, এই কথা তিনি বোধ হয় সত্যি ভুলে গেছেন। টুকু তবুও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল। ভয়ে ভয়ে শোবার ঘরে উঁকি দিল   মা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। হয়ত ঘুমিয়েই পড়েছেন। সে ঘর থেকে

বেরিয়ে গেল।

টুকু ভীতু ধরনের ছেলে। সাধারণত সন্ধ্যার আগেই ফিরে। আজ এখনো ফিরছে না। দিন খারাপ করেছে। আজও হয়ত ঝড়বৃষ্টি হবে। ক'দিন ধরে রোজ সন্ধ্যায় বৃষ্টি হচ্ছে। মিনু তেলশূন্য হারিকেন নিয়ে তিথির ঘরে এলেন।

তিথি চাদর গায়ে বিছনায় বসে আছে। তার গায়ে জ্বর। ঐদিন বৃষ্টিতে ভেজার পর থেকেই সে জ্বরে পড়েছে। এখন জ্বর খানিকটা বেড়েছে। খোলা জানালা দিয়ে যে বাতাস আসছে তা তেমন ঠাণ্ডা নয় তবু তিথির গা শিরশির করছে। উঠে জানালা বন্ধ করতে ইচ্ছা করছে না।

মিনু ঘরে ঢুকেই বলল – চার আঙুল তেল ছিল বোতলে। কোথায় গেল জানিস? তিথি বলল, জানি না।

বাতাসে তো উড়ে যায়নি।

বিড়াল ফেলে দিয়েছে হয়ত।

এখন কাকে দিয়ে তেল আনাই?

টুকু আসেনি এখনো?

না।

ও এলে এনে দিবে। তুমি জানালা বন্ধ করে দাও তো মা, ঠাণ্ডা লাগছে।

এই গরমে ঠাণ্ডা লাগছে? জ্বর নাকি? দেখি।

মিনু, তিথির কপালে ছুঁয়ে দেখতে গেলেন। তিথি একটু সরে গিয়ে বলল, গায়ে হাত দিও না মা। মিনু বিস্মিত হয়ে বললেন — গায়ে হাত দিলে কি?

কিছু না। আমার ভাল লাগে না।

মা গায়ে হাত দিলে ভাল লাগে না, এটা কি ধরনের কথা? বলছিস কি এসব?

তোমার সঙ্গে বকবক করতেও ইচ্ছা করছে না। জানালাটা বন্ধ করে চলে যাও।

মিনু জানালা বন্ধ করে চলে গেলেন। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হল। সমস্ত বাড়ি অন্ধকার। রান্নাঘরে চুলায় আগুন জ্বলছে। বাড়িতে এইটুকুই আলো।

মিনু রান্না চড়িয়েছেন। আয়োজন তেমন কিছু না। গতকালের ঝড়ে একটা পেঁপে গাছ পড়ে গেছে। সেই পেঁপের একটা তরকারি আর ডাল। চাল ক'জনের জন্যে নেয়া হবে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। তিথির জ্বর এসেছে, সে নিশ্চয়ই রাতে কিছু খাবে না। হীরু আসবে কি আসবে না কে জানে। গত তিন দিন ধরে রাতে খাওয়ার সময় আসছে। আজও হয়ত আসবে। টুকু এখনো ফেরেনি তবে সে অবশ্যই ফিরবে তার যাবার জায়গা নেই। একদিন যখন হীরুর মত কোথাও জায়গা হবে তখন সেও আসা বন্ধ করবে।

জালালুদ্দিন রান্নাঘরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। আজ তাঁর চোখের যন্ত্রণাটা একটু কম। আগের কবিরাজি ওষুধ বাদ দিয়ে পদ্মমধু দিচ্ছেন — এতে সম্ভবত কাজ হচ্ছে। তবে চোখ আটা আটা হয়ে থাকে – এই যা কষ্ট।

জালালুদ্দিন নিচু গলায় বললেন — এক ফোঁটা চা হবে? মিনু ঠাণ্ডা গলায় বললেন – না।

চুলা বন্ধ?

হুঁ।

বৃষ্টি-বাদলায় গলাটা খুসখুস করে। কর একটু চা। আদা-চা।

জালালুদ্দিন খানিকটা দূরত্ব রেখে স্ত্রীর কাছে বসলেন। আজ তাঁর চোখের যন্ত্রণা কম থাকায় মনটা বেশ ভাল। মিনুর সঙ্গে গল্পসল্প করতে ইচ্ছা করছে। প্রথম যৌবনে তাদের যখন নতুন সংসার হল – সোহাগী স্টেশনের কাছে বাসা নিয়েছিলেন। রান্নাঘর অনেক দূরে। মিনু একা রান্না করতে ভয় পেত। তখন কতই বা তার বয়স? তের কিংবা চৌদ্দ। নিতান্তই বাচ্চা মেয়ে। তাকে রাতের বেলা রান্নার সময় সারাক্ষণ স্ত্রীর পাশে বসে থাকতে হত। রান্না হবার পর খাওয়া-দাওয়া শেষ করে একবার শোবার ঘরে আসা। কত মধুর স্মৃতি। কত বর্ষার রাত রান্নাঘরে পাশাপাশি বসে কেটেছে। অর্থহীন কত গল্প হাসি তামাশা। মান-অভিমান। আজকের এই কঠিন মিনু সেদিন কোথায় ছিল?

জালালুদ্দিন ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস গোপন করে বললেন – চোখের যন্ত্রণা একেবারেই নেই। এই যে আগুনের দিকে তাকিয়ে আছি – চোখ কিন্তু কড়কড় করছে না।

না করলে তো ভালই।

দেখি একটু আগুন। সিগারেট খাই একটা। হীরু একটা প্যাকেট দিয়ে গেল।

মিনু দেয়াশলাই এগিয়ে দিলেন। জালালুদ্দিন সিগারেট ধরিয়ে হৃষ্টচিত্তে টানতে লাগলেন। নরম গলায় বললেন, পদ্মমধু আসলে খুব ভাল মেডিসিন। তবে খাঁটি জিনিস হতে হবে। দুনিয়া ভর্তি ভেজাল। পাবে কোথায় খাঁটি জিনিস?

মিনু জবাব দিলেন না। ডাল চড়িয়েছিলেন, ডালের হাঁড়ি নামিয়ে এলুমিনিয়ামের একটা মগ চুলায় বসিয়ে দিলেন। চা হচ্ছে। জালালুদ্দিনের চোখ চকচক করছে। তিনি স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে খুশি খুশি গলায় বললেন -- চোখ সত্যি সেরে গেলে প্রাইভেট টিউশ্যানি ধরব। দু'তিনটা ছেলেকে পড়ালেই হাজার বার'শ টাকা চলে আসবে। ঢাকা শহরে প্রাইভেট টিউটরের খুবই অভাব। নাই বললেই হয়। তুমি কি বল?

মিনু কিছু বললেন না, বিচিত্র একটা ভঙ্গি করলেন। জালালুদ্দিন চোখের অসুখের কারণে সেই ভঙ্গি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলে তাঁর খুব মন খারাপ হত। তিনি বললেন, সংসারটা তখন ঠিকঠাক করা যাবে। তারপর হীরু একটা দোকান নেয়ার কথা বলছে, যদি সত্যি সত্যি দেয় টাকা আসবে পানির মত।

দোকান দিচ্ছে?

বলল তো। কালই বলল।

দোকানের টাকা পাচ্ছে কোথায়?

বন্ধু-বান্ধব আছে। ঢাকা শহরে বুঝলে মিনু টাকা কোন সমস্যা না, তবে কায়দা-কানুন জানা থাকা চাই। ঢাকা শহরের বাতাসে পয়সা উড়ে। কেউ ধরতে পারে কেউ পারে না।

মিনু চায়ের কাপ স্বামীর দিকে এগিয়ে দিলেন। জালালুদ্দিন চায়ে চুমুক না দিয়েই বললেন- চমৎকার! তুমিও এক কাপ খাও। বৃষ্টি-বাদলার দিন ভাল লাগবে।

মিনু বিরক্ত গলায় বললেন--- তোমার খাওয়া তুমি খাও। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না।

তিনি তিথির জন্যে লেবুর শরবত নিয়ে শোবার ঘরে গেলেন। ঘর নিকষ অন্ধকার। এই অন্ধকারে তিথি এখনো ঠিক আগের মতই বসে আছে।

লেবুর শরবত এনেছি--- নে।

তিথি বলল-- কিছু খাব না, খেতে ইচ্ছে করছে না। টুকু এসেছে?

না।

বৃষ্টির মধ্যে ভিজছে বোধ হয়। আবার একটা বড় অসুখ বাঁধাবে।

মিনু তীব্র গলায় বললেন- আজ আসুক আমি হারামজাদার বিষ ঝাড়ব। তিথি শীতল গলায় বলল, বিষ ঝেড়ে ঝেড়ে তো হীরুর এই অবস্থা করেছ। আর না হয় নাই ঝাড়লে।

মিনু তিথিকে একটা কঠিন কথা বলতে গিয়েও বললেন না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালেন।

উঠোনে ছপছপ শব্দ হচ্ছে। মিনু বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন - টুকু এসেছে বোধ হয়। টুকু না হীরু এসেছে। সে তার মায়ের মুখের উপর টর্চ ফেলে বলল, চারদিক এমন ডার্ক করে রেখেছ ব্যাপার কি?

তিনি জবাব দিলেন না। হীরু মাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, বাতি টাতি জ্বালাও। কারো কোনো সাড়াশব্দও পাচ্ছি না। সব ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? রাত তো বেশি হয়নি। আপা বাসায় আছে?

সে এই কথারও জবাব পেল না। এ বাড়িতে তার অবস্থাও তার বাবার মত। বেশির ভাগ কথারই কেউ কোনো জবাব দেয় না। জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করে না।

হীরু অন্ধকারেই গোসল সেরে ফেলল। কেরোসিনের অভাবে বাতি জ্বলছে না জেনেও তার মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। সে অতি উৎসাহে তিথিকে বলতে শুরু করল কি করে সে আজ ব্রান্ড নিউ একটা ছাতা জোগাড় করে ফেলেছে।

বুঝলি তিথি, বাস থেকে নামার সময় হঠাৎ দেখি আমার পায়ের কাছে একটা ছাতা। আমার পাশে এক গর্দভ নাম্বার ওয়ান বসে ছিল। ছাতা না নিয়েই ঐ শালা বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়েছে।

তুই ঐ ছাতা নিয়ে চলে এলি?

হ্যাঁ। আমি না নিলে অন্য কেউ নিত। কি- নিত না? ব্রান্ড নিউ জিনিস। লেবেলটা পর্যন্ত

আছে।

আমার সামনে থেকে যা, বকবক করিস না। মাথা ধরেছে।

যার কাছেই যাই সেই বলে সামনে থেকে যা। আমি যাবটা কোথায়? একদিন বাড়িঘর ছেড়ে চলে যাব তখন বুঝবি।

চলে যা। তোকে ধরে রাখছে কে?

যাবই তো। কয়েকটা দিন। জাস্ট ফিউ ডেজ। একদিন হঠাৎ দেখবি ফুড়ুৎ। পাখি নেই। নো বার্ড।

হীরু সিগারেট ধরাল। সিগারেটের আলোয় দেখা গেল সে দাড়ি কেটে ফেলেছে। তবে গোঁফ এখনো আছে। তিথি বলল, তুই মটর মেকানিকের কাজ শিখবি?

হীরু অবাক হয়ে বলল, আমি মোটর মেকানিকের কাজ শিখব? ইয়ার্কি করছিস? চোর-ছ্যাঁচড়ের কাজ শিখব আমি? অন্য কেউ এ কথা বললে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতাম। নেহায়েত তুই বলে এক্সকিউজ করে দিলাম।

হীরু কেরোসিন নিয়ে এসেছে। আশপাশে খানিকটা খুঁজেও এসেছে। টুকুও নেই। এই নিয়ে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ দেখা গেল না। ভাত খাবার সময় অত্যন্ত সহজভাবে বলল, দুই-এক রাত বাইরে না কাটালে ছেলেপুলে শক্ত হয় না। থাকুক বাইরে। হার্ড লাইফ সম্পর্কে ধারণা হোক। মেয়ে হলে ভয়ের কথা ছিল। মেয়ে তো না।

মিনু একটি কথাও বললেন না। যথানিয়মে খাওয়া-দাওয়া করলেন। বাসন-কোসন ধুয়ে রান্নাঘরে শিকল উঠিয়ে দিলেন। রান্নাঘরের কাজ রাতের মত শেষ হল। আবার ভোরবেলায় খোলা হবে। গভীর রাতে বন্ধ হবে। এই ছোট্ট ঘরটার পেছনে জীবন কেটে যাবে।

তিথির জ্বর বেশ বেড়েছে। রাতে সে কিছুই খায়নি। মিনু দুটি আটার রুটি বানিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সে বিরক্ত হয়ে বলেছে রুটি বানাতে তোমাকে বলেছে কে?

না খেয়ে থাকবি?

হ্যাঁ, না খেয়ে থাকব। তুমি যাও ঘুমাও।

আমার সঙ্গে এরকম করে কথা বলছিস কেন?

ভাল করে কথা বলা ভুলে গেছি। এখন আমি শুধু বাইরের মানুষের সঙ্গে ভাল করে কথা বলতে পারি। খুব মিষ্টি করে বলি।

মিনু ঘর ছেড়ে বারান্দায় এলেন। উঠোনের পানি বেড়ে বারান্দা ছুঁয়েছে। এবারো কি আগের বছরের মত ঘরে পানি উঠবে? এবারো হয়ত ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে হবে। কিন্তু যাবেনইবা কোথায়?

মিনু সারারাত বারান্দায় বসে কাটালেন। টুকুর জন্যে অপেক্ষা? হয়ত বা তাই। তবে টুকু বাড়ি না-ফেরায় তাঁকে খুব কাতর মনে হল না। তিনি ছেলে প্রসঙ্গে তেমন কোনো দুশ্চিন্তাও করলেন না। শুধু বসেই রইলেন। শেষ রাতে মেঘ কেটে আকাশে চাঁদ উঠল। সুন্দর জ্যোৎস্না। একা একা জ্যোৎস্না দেখতে তাঁর ভালই লাগল।

অথচ হীরু যখন প্রথম কাউকে কিছু না বলে বাইরে রাত কাটাল কি অসম্ভব দুশ্চিন্তাই না তিনি করেছিলেন। ঘরের একটি মানুষও ঘুমায়নি। এখন সময় পাল্টে গেছে। টুকুর বাড়ি না-ফেরায় কারো কিছু যাচ্ছে আসছে না। নিতান্তই যেন স্বাভাবিক ব্যাপার। যেন সবাই ধরে নিয়েছে এরকম হবেই। আগামীকাল ভোরে যথাসময়ে সবার ঘুম ভাঙবে। দিনের কাজকর্ম শুরু হবে। আবার রাত আসবে। এর মধ্যে টুকু ফিরে এলেই ভালই, ফিরে না এলেও কিছু আসে যায় না। কে জানে হয়তবা ভালই হয়। তখন হাঁড়িতে চাল কিছু কম দিলেও চলবে।

যখন আকাশ ফরসা হল ঠিক তখন মিনু বারান্দা ছেড়ে উঠলেন। অনেক দিন পর ফজরের নামাজ পড়লেন। এ বাড়ি থেকে ধর্মকর্মও উঠে গেছে। ধর্ম সুখী মানুষের জন্যে, যাদের ইহজগতের কামনার পরও পরবর্তী জগতের জন্যে কামনা থাকে। তাঁর এখন কোনো কামনা-বাসনা নেই। শুধু বেঁচে থাকা। তিনি রান্নাঘরে ঢুকলেন। চুলা ধরাতে খুব বেগ পেতে হল। শুকনো কাঠ নেই। এবারের বর্ষা তাঁকে খুব কষ্ট দেবে।

তিথির ঘুম ভেঙেছে। মুখ না ধুয়েই সে এসেছে রান্নাঘরে। সে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, টুকু বাড়ি

ফিরেনি?

মিনু খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, না। তোর জ্বর কমেছে?

তিথি বলল, তুমি এত সহজভঙ্গিতে কথা বলছ কি করে? তোমার চিন্তা লাগছে না?

আমার এত চিন্তা-টিন্তা নেই।

তাই তো দেখছি।

তোর কাছে শ'খানিক টাকা হবে? চাল কিনতে হবে।

ঐ দিন না কিনলে?

কিনেছি- শেষ হয়েছে। আমি একা খেয়ে শেষ করিনি। বুড়ো বয়সে কি আর শুধু শুধু চাল চিবিয়ে খাওয়া যায়?

এসব কেমন ধরনের কথা, মা?

মুখ ধুয়ে আয়। চা খা। আজ কোনো নাশতা নেই। শুধু চা।

জালালুদ্দিন সাহেব যখন শুনলেন আজ শুধু চা তখন একটা হৈচৈ বাঁধাবার চেষ্টা করলেন। মিনু বরফশীতল গলায় বলল — কোনো রকম ঝামেলা করবে না। একবেলা নাশতা না খেলে কিছু হয় না।

জালালুদ্দিন ক্ষীণ স্বরে বললেন— সকালের নাশতা হচ্ছে সারারাতের উপবাসের পর প্রথম খাওয়া। দুপুরে না খেলে কোন অসুবিধা নেই কিন্তু সকালে...

চুপ।

তিনি চুপ করে গেলেন। টুকু ফিরেছে কি ফিরেনি এই ব্যাপারে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। দুপুরের আগে কিছু খেতে পারবেন না - এই চিন্তাটাই তাকে অস্থির করে ফেলল।

তিথি একশ' টাকা দিয়েছে। এই টাকায় দুপুরের বাজার হবে।

চাল কিনতে মিনু নিজেই গেলেন। হীরুকে টাকা দিয়ে পাঠানোর কোনো মানে হয় না। ঘণ্টাখানেক পর এসে শুকনো মুখে বলবে— গ্রেট ট্র্যাজেডি। পকেট সাফা করে দিয়েছে। অল গন। দেশটা হয়ে গেছে চোরের। সবাই থিফ। গ্রেট থিফ। কিংবা দশ কেজি চাল এনে বলবে পনের কেজি। এই সংবারে বাজার অনেক দিন থেকেই মিনু করেন। এই বয়সেও পনের কেজি চালের ভারী বস্তা টেনে এনে বাকি সময়টা শরীরের ব্যথায় নড়তে পারেন না। রান্নাঘরে মাদুর পেতে শুয়ে থাকেন। দিনের বেলায় তিনি কখনো শোবার ঘরে ঘুমুতে যান না। দিনের বেলায় রান্নাঘরেই তাঁর শোবার ঘর।

হীরু মায়ের সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে। মিনু একবার বললেন, তুই আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছিস কেন?

এমনি আসছি।

না, তুই আসবি না।

আরে কি মুশকিল, এটা পাবলিকের রাস্তা। যার খুশি যাবে। যার খুশি যাবে না। তুমি বলার কে?

বলছি তো তুই আমার সঙ্গে আসবি না।

আরে এ তো বড় যন্ত্রণা দেখি, বাজারে গিয়ে টুকুর খোঁজখবর করব না? সারা রাত ধরে একটা ছেলে মিসিং। চিন্তা হয় না?

আমি দাঁড়াচ্ছি। তুই যা। তুই যাবার পর আমি যাব। সঙ্গে সঙ্গে যাব না।

আমি সঙ্গে গেলে কি তোমার মান যাবে নাকি? কি মুশকিল- এরকম করে তাকাচ্ছ কেন? আচ্ছা বাবা চলে যাচ্ছি। নো হার্ড ফিলিংস।

হীরু চলে যাবার পরও তিনি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কাঁচা রাস্তা পানিতে ডুবে গেছে। বাজারে রওনা হয়েছেন খালি পায়ে। থকথকে নোংরা কাদায় পা ফেলে যেতে হচ্ছে। এককালে তাঁর শুচিবায়ুর মত ছিল। নোংরা দেখলেই গা ঘিনঘিন করত। যে শাড়ি পরে রাতে ঘুমুতেন ভোরবেলা উঠেই সেটা খুলে ফেলতেন। কোথায় গেছে শুচিবায়ু। এখন নোংরা আবর্জনা পাশে নিয়েও হয়ত ঘুমুতে পারবেন।

তিথি বেরুচ্ছিল। জালালুদ্দিন বললেন, তুই বাইরে যাচ্ছিস? অর্থহীন কথা। জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু তিথি বলল - হুঁ।

আমার চোখটা বেশ ভালই লাগছে। রোদের দিকে তাকাতে পারছি। পদ্মমধু জিনিসটা অসাধারণ।

তিথি কিছু বলল না। জালালুদ্দিন বললেন -- একটু দেখ তো মা-- হীরু মনে হয় সিগারেটের প্যাকেট ফেলে গেছে। প্যাকেটটা দিয়ে যা। সিগারেট জিনিসটা খারাপ হলেও মাঝে মাঝে মেডিসিনের মত কাজ করে। সব খারাপ জিনিসের একটা ভাল দিক আছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে না- - এভরি ক্লাউড হ্যাজ এ সিলভার লাইনিং।

হীরু সত্যি সত্যি প্যাকেট ফেলে গেছে। বেশ দামি সিগারেট বেনসন অ্যান্ড হেজেস। চারটা সিগারেট আছে। জালালুদ্দিন একটা ধরালেন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিথি শীতল গলায় বলল, টুকু যে বাড়ি ফিরেনি তুমি জানো?

জানব না কেন, জানি।

চিন্তা লাগছে না তোমার?

চিন্তা তো লাগছেই! চিন্তা লাগবে না কেন? খুবই চিন্তা লাগছে।

দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সুখেই আছ।

চিন্তা করে হবেটা কি? হীরুর বেলায় তো কম চিন্তা করিনি। তাতে লাভটা কি হয়েছে?

তা ঠিক। কোনো লাভ হয়নি।

মাঝে মাঝে তোর বেলায়ও তো এরকম হয়। রাতে বাড়ি ফিরিস না। তোর বেলাতেই যদি...।

জালালুদ্দিন কথা শেষ করলেন না। তাঁর সিগারেট নিভে গিয়েছিল। তিনি সিগারেট ধরাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তিথি বলল, আমি যাচ্ছি বাবা। ভয় নেই। রাতে ফিরে আসব। তোমাকে দুশ্চিন্তা করতে হবে না। তিনি তার জবাব দিলেন না। সিগারেটটা ধরছে না। এত দামি সিগারেট অথচ বর্ষায় কেমন ড্যাম্প মেরে গেছে। চুলার পাশে রেখে দিলে হত। সিগারেটের সঙ্গে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করছে। তিথিকে বললে লাভ হবে না। সে এখন আর রান্নাঘরে ঢুকবে না। মিনু কখন ফিরবে কে জানে। বাজারে গেলে ফিরতে দেরি করে।

তিথি এখনো যায়নি। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। জালালুদ্দিন চোখে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তবু তাঁর মনে হচ্ছে মেয়েটাকে খুব সুন্দর লাগছে। চেহারা কেমন মায়া মায়া। তবে স্বভাব কঠিন হয়েছে। বয়সকালে এই মেয়ে তার মায়ের চেয়েও কঠিন হবে। তিথি বলল,

বাবা।

কি?

তোমাকে একটা কথার কথা জিজ্ঞেস করি - ধর, আমি যদি কোনোদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যাই এবং আর ফিরে না আসি তা হলে কি হবে?

জালালুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন কোথায় যাবি তুই? এসব কি ধরনের কথা?

তিথি জবাব না দিয়ে উঠোনে নামলো। উঠোনে অনেক পানি। স্যান্ডেল জোড়া হাতে নিতে হয়েছে। অসম্ভব কাদা। বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত খালি পায়ে যেতে হবে। কি বিশ্রী অবস্থা।

## ৩

তিথি কখনো তার সঙ্গের পুরুষের দিকে ভাল করে তাকায় না। সব পুরুষকেই তার কাছে এক রকম মনে হয়। একদল কদাকার হাঁসের ছানার মত। সব একই রকম। কাউকে আলাদা করা যায় না। তবে তিথি তার আজকের সঙ্গীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। যদিও খুঁটিয়ে দেখার মত কিছু এই লোকটির নেই।

এর বয়স চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। কিছু বেশিও হতে পারে। গোঁফ অর্ধেকের বেশি পাকা--- অবশ্যি মাথার চুল পাকেনি। হয়ত মাথায় কলপ দিয়েছে। গোঁফে দেয়নি। কিংবা দিয়েছিল--- বারবার ধোবার কারণে উঠে গেছে। লম্বাটে মুখ। খুব খাড়া নাক। চোখে বেমানান এক চশমা। চশমা সাধারণত চোখের সঙ্গে লেগে থাকে- নাকের কারণে এর চোখ চশমা থেকে অনেকখানি দূরে। লোকটির মাথার চুল খুব পাতলা। কপালের অনেকখানি পুরোপুরি ফাঁকা। হয়ত আগে কখনো অপরিচিত মেয়ে নিয়ে বের হয়নি। এই ধরনের পুরুষ বেশ ভাল। এরা কিছুতেই জড়তা কাটাতে পারে না। অসম্ভব ঘাবড়ে যায়। এবং এক সময় বিব্রত গলায় বলে, তুমি চলে যাও— আমার কিছু লাগবে না। কেউ কেউ আবার হঠাৎ করে মহাপুরুষ সেজে ফেলে। গম্ভীর গলায় বলে, তোমার মত মেয়ে এই লাইনে কেন? এই সব ছেড়ে বিয়ে-টিয়ে করে সংসারী হও। এখনো সময় আছে। তারপর বলে বাড়িতে আছে কে? ফ্যামিলি মেম্বার কত? এই লাইনে আসবার কারণটা

কি? না--- সোসাইটিটা একবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

এই লম্বামুখো মানুষটা কি বলবে কে জানে। উদ্ভট কিছু করবে কি? বিচিত্র নয়। নার্ভাস ধরনের পুরুষ প্রায় সময়ই উদ্ভট কাণ্ডকারখানা করে। বুড়ো ধরনের এক লোক একবার কাঁদো কাঁদো গলায় বলল— কিছু মনে করো না। তুমি আমার মেয়ের মত। বিশ্রী অবস্থা। এ জাতীয় বিশ্রী অবস্থা মনে হচ্ছে এবারও হবে।

লোকটি একটির পর একটি সিগারেট টেনে যাচ্ছে। তার ধোঁয়া টানার ভঙ্গি, সিগারেটের ছাই ফেলার ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে এ সিগারেট খায় না। তারা মগবাজারের একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে মুখোমুখি বসে আছে। এগুলিকে বলে ফ্যামিলি রুম। বেলা তিনটা চারটার দিকে ফ্যামিলি রুমগুলি ভর্তি হয়ে যায়। বয় পর্দা টেনে দেয়। হুট করে ঢুকে পর্দা-ঘেরা মানুষগুলোকে বিরক্ত করে না। যার জন্যে মোটা বকশিস পাওয়া যায়।

লোকটি চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে চশমার কাচ মুচছে। কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এর বেশি কিছু না।

তোমার নাম কি?

সে প্রশ্নটা করল তিথির দিকে না তাকিয়ে। তিথি বলল আমার নাম দিয়ে তো আপনার কোনো দরকার নেই। লোকটি এই উত্তর হয়ত আশা করেনি। কেমন হচকচিয়ে গেল।

আমি আগে কখনো এভাবে কারো সঙ্গে আসিনি। আমার ইচ্ছাও ছিল না। আমি একজন ফ্যামিলি ম্যান। আমার কোনো বদঅভ্যেস নেই। মাঝে-মধ্যে সিগারেট খাই। আগে পান খেতাম জর্দা দিয়ে। ডাক্তার বলল জর্দাটা হার্টের জন্য খুব খারাপ। সিগারেটের চেয়েও খারাপ, তাই পানও ছেড়ে দিয়েছি। অবশ্যি এমনিতে পানটা কিন্তু খারাপ না, ভিটামিন সি আছে। ভিটামিন সি-টা শরীরের জন্যে খুবই দরকার।

তিথি বলল, আমাকে এসব কথা কেন বলছেন?

লোকটি অস্বস্তিতে রুমাল দিয়ে নাক ঘষতে লাগল। যেন খুব ধাঁধায় পড়ে গেছে। কি করবে - কি বলবে বুঝতে পারছে না।

তুমি গান জানো?

না, জানি না। আর জানলেও আপনি নিশ্চয়ই চান না এখানে আমি একটা গান শুরু করি। না-কি চান?

না না, তা চাই না। সব কিছুরই একটা সময় আছে। তুমি বস। আমি সিগারেট নিয়ে আসি। সিগারেট শেষ হয়ে গেছে।

একজন বয়কে বললেই এনে দেবে। আপনার যেতে হবে না।

না থাক, আমিই যাচ্ছি।

লোকটি দ্রুত বের হয়ে গেল। তার চলে যাবার ভঙ্গি দেখে মনে হল সে আর ফিরবে না। না ফিরলে মন্দ হয় না। তিথির ঘুম পাচ্ছে। সে মনে মনে ঠিক করল মিনিট দশেক অপেক্ষা করে চলে যাবে। না লোকটি চলে যায়নি। সিগারেট নিয়ে ফিরছে। মুখ ভর্তি পান। তার গায়ের ধবধবে সাদা পাঞ্জাবিতে পানের পিকের দাগ। অথচ একটু আগেই বলছিল-- পান খায় না। তিথি বলল, আপনি কি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাবেন? নাকি সারাক্ষণ এখানেই কাটাবেন?

লোকটি খুবই অবাক হয়ে বলল, আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না। কোথায় নিয়ে যাব তোমাকে?

সে তো আপনি ঠিক করবেন। কোনো হোটেলে কিংবা আপনার বাসায়।

কি সর্বনাশের কথা! বাসায় আমার স্ত্রী আছে— বড় মেয়ে ক্লাস সেভেনে পড়ে। আজিমপুর গার্ল স্কুলে। ফরিদা যদি এইসব ব্যাপারে কিছু জানতে পারে তাহলে সে আমাকে কিচ্ছু বলবে না। সোজা ছাদে উঠে ছাদ থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ে যাবে। ফরিদা হচ্ছে আমার স্ত্রীর নাম।

বুঝতে পারছি।

খুবই চমৎকার মেয়ে। আদর্শ মা, আদর্শ স্ত্রী। এখন অবশ্যি শরীরটা খুবই খারাপ। বছর তিনেক ধরে বিছানায় পড়ে আছে। একেবারে কংকাল। ডাক্তার খুব খারাপ ধরনের অসুখ বলে সন্দেহ করছে। বাঁচবে না।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই। ইয়ে তোমার নামটা কিন্তু বলনি।

আমার নাম পরী।

বাহ সুন্দর নাম।

এটা আমার আসল নাম না। নকল নাম।

নামের আবার আসল-নকল আছে নাকি?

কেন থাকবে না। মানুষের মধ্যেও তো আসল মানুষ নকল মানুষ আছে। যেমন আমি একজন নকল মানুষ।

ভদ্রলোক মনে হচ্ছে খুব ধাঁধায় পড়ে গেছে। সে বেশ খানিক্ষণ চুপচাপ থেকে আচমকা বলল, তুমি ঠাণ্ডা কিছু খাবে? ফান্টা কিংবা পেপসি?

না।

খাও, একটা ফান্টা খাও। এই বয়, দুটা ফান্টা দাও। আমি আবার ফান্টা ছাড়া কিছু খেতে পারি না। কোক পেপসি এইসব আমার কাছে ওষুধের মত লাগে। আমার নাক আবার খুব সেনসেটিভ। ফরিদাও আমার মত। মানে ওর নাকও খুব সেনসেটিভ। দুধের কোনো জিনিস খেতে পারে না, গন্ধ লাগে। অথচ দুধটা এখন তার খাওয়া দরকার। আচ্ছা, তুমি কি দুধে গন্ধ পাও?

তিথি হেসে ফেলল।

লোকটি বিব্রত স্বরে বলল, আমি খুব আবোল-তাবোল কথা বলছি তাই না?

না ঠিক আছে। বলুন, যা বলতে ইচ্ছা করে। শুধু ছ'টার আগে ছেড়ে দেবেন। আমি অনেক দূরে থাকি।

কোথায় থাক?

তা দিয়ে তো আপনার দরকার নেই। আপনি নিশ্চয় আমার বাসায় বেড়াতে যাবেন না। না-কি যাবেন?

তুমি ঐসব মেয়েদের মত না। তুমি অন্য রকম।

আপনি কি ঐসব মেয়েদের সঙ্গে আগেও মিশেছেন?

না।

তাহলে বুঝলেন কি করে, ঐসব মেয়েরা কেমন?

না মানে যে রকম ভেবেছিলাম তুমি সে রকম না। অন্য রকম।

কি রকম ভেবেছিলেন?

লোকটি জবাব দিল না। রুমাল দিয়ে মাথা ঘষতে লাগল। তিথি বলল, গল্প করতে চাচ্ছিলেন গল্প করুন। চুপ করে বসে আছেন কেন?

না মানে ওঠা দরকার, ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে। পাঁচটার সময় অ্যায়েন্টমেন্ট। তোমাকে ওরা টাকা দিয়ে দিয়েছে তো?

হ্যাঁ।

ভাল, খুব ভাল। খুবই ভাল।

চলুন, তাহলে উঠি। পাঁচটা বাজতে দেরি নেই।

আরেকটু বস। এই ধর দশ মিনিট। অবশ্যি তোমার যদি কোনো কাজ না থাকে।

আমার কোনো কাজ নেই।

লোকটি ভয়ে ভয়ে তার একটা হাত তিথির ডান হাতের উপর রাখল। রেখেই সরিয়ে নিল। মনে হচ্ছে এই কাজটি করে সে খুব লজ্জা পেয়েছে।

তিথি বলল, আপনার টাকাটা তো মনে হচ্ছে জলে গেল।

লোকটি নিচু গলায় বলল, তুমি একটি চমৎকার মেয়ে।

আমি চমৎকার মেয়ে, এটা আপনাকে বলল কে?

বোঝা যায়। চেহারা দেখে বোঝা যায়।

আচ্ছা আপনি কি করেন?

ছোটখাটো ব্যবসা করি। তেমনি কিছু না। তবে খারাপও না। গত বছর গাড়ি কিনলাম একটা। তবে আমি অবশ্যি গাড়িতে চড়ি না। কেমন যেন দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। রিকশাটা এদিক দিয়ে

ভাল। হাওয়া খেতে খেতে যাওয়া যায়।

পাঁচটা বেজে গেছে--- চলুন উঠি।

তুমি আগে যাও, আমি পরে আসছি।

কেউ দেখে ফেলবে সে জন্যে?

লোকটি তার জবাব দিল না। তিথি উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনি কি আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পারেন? আমি এসএসসি পাস করেছি।

কি রকম চাকরি?

যে কোন চাকরি। টাইপিস্টের চাকরি বা এই জাতীয় কিছু।

টাইপিং জানো?

জি-না। তবে আমি শিখে নিতে পারব। আমি খুব দ্রুত শিখতে পারি।

আমার কাছে কোনো চাকরি নেই। আমার অফিসে অল্প কিছু কর্মচারী আছে নতুন লোক নেওয়ার অবস্থা অফিসে নেই। তাছাড়া...

তাছাড়া কি?

হঠাৎ করে সুন্দরী একটা মেয়েকে চাকরি দিলে নানান কথা উঠবে। আমার স্ত্রী শুনতে পেলে মনে কষ্ট পাবে। আমাকে অবশ্যি কিছু বলবে না।

ছাদ থেকে লাফিয়েও পড়তে পারে, তাই না?

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে মানিব্যাগ থেকে ভিজিটিং কার্ড বের করে নিচু গলায় বলল, এইখানে ঠিকানা আছে, দবির উদ্দিন বি.এ। দবির ইন্ডাস্ট্রিজ ৩১/৩ জিগাতলা, তুমি মাস তিনেক পর একবার খোঁজ নিও।

মাস তিনেক পর খোঁজ নিতে বলছেন কেন? আপনার কি ধারণা মাস তিনেকের মধ্যেই আপনার স্ত্রীর ভালমন্দ কিছু হয়ে যাবে?

লোকটি শীতল গলায় বলল, তোমাকে যতটা ভাল মেয়ে আমি ভেবেছিলাম ততটা ভাল তুমি না। তোমার মত মেয়ে যে রকম সাধারণত হয় তুমিও সেই রকমই। আলাদা কিছু না।

তিথি হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, আমাকে রাগিয়ে দেয়াটা কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। কার্ডে আপনার বাসার ঠিকানা আছে। সেই ঠিকানায় যদি হঠাৎ উপস্থিত হয়ে যাই তখন কি হবে?

দবির উদ্দিন জবাব দিল না। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল।

তিথির ঠোঁটে এখন আর হাসি নেই। সে কঠিন চোখে তাকাচ্ছে। দবির এই মেয়েটির দ্রুত ভাবান্তরের রহস্য ধরতে পারছে না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

তিথি নিচু গলায় বলল, পুরো টাকাটা জলে ফেলবেন কেন? কিছুটা অন্তত উসুল হোক. ব্লাউজ খুলে ফেলছি, আপনি আমার বুকে হাত দিন। আর যদি তাও না চান অন্তত তাকিয়ে দেখুন। আপনার অসুস্থ স্ত্রীর বুক নিশ্চয়ই আমার বুকের মত সুন্দর না।

দবিরের চেহারা ছাইবর্ণ হয়ে গেছে। সে অল্প অল্প কাঁপছে। তিথির মুখের কঠিন ভাঁজগুলি হঠাৎ সতেজ হয়ে গেল। সে বলল, আমি আপনার সঙ্গে ঠাট্টা করছিলাম। আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনি চমৎকার মানুষ। চলুন, আমরা যাই।

## ৪

হীরুকে ঘণ্টাখানিক ধরে একতলা একটা টিনের ঘরের আশপাশে ঘুরঘুর করতে দেখা যাচ্ছে। এই এক ঘণ্টায় বাড়ির কাছাকাছি এসে কয়েকবার তীক্ষ্ণ শিস দিয়েছে। দু'বার ইটের টুকরা টিনের চালে ফেলেছে। এসব হচ্ছে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা। চেষ্টায় কোনো ফল হচ্ছে না। কেউ বেরুচ্ছে না বা জানালা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে না।

বাড়িটা ইসমাইল সাহেবের।

ইসমাইল সাহেব মীরপুর কৃষি ব্যাংকের ক্যাশিয়ার। তাঁর ছয় মেয়ে। এই ছ'মেয়ের তৃতীয়জনের নাম এ্যানা। এ্যানা এই বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। রেজাল্ট হয়নি। এখন রেজাল্টের জন্যে অপেক্ষার কাল চলছে। হীরুর শিস এবং চালে ঢিল সবই এ্যানার উদ্দেশ্যে। তৃতীয় দফায় ঢিল এবং শিস দেবার সঙ্গে সঙ্গে বসার ঘরের একমাত্র খোলা জানালাটাও বন্ধ হয়ে

গেল। হীরু চাপা গলায় বলল, হারামজাদী। রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। এ্যানার কাণ্ডকারখানা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। হারামজাদী আজ বেরুচ্ছে না কেন? বাবা বাসায় আছে নাকি?

হীরু রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে পরপর তিনটা স্টার সিগারেট খেয়ে ফেলল। বুক পকেটে একটা বিদেশী ফাইভ ফাইভ আছে। সে ঠিক করে রেখেছিল — এ্যানা বের হলে এটা ধরানো হবে। এখন মনে হচ্ছে হারামজাদী বেরুবে না। অবশ্যি তার হয়ত দোষ নেই। ছোটলোক বাপ হয়ত ঘরে বসে আছে। এই ছোটলোকটা প্রায়ই অফিস কামাই করে। ঘরে বসে বসে ঝিমায়। যার ছ'টা মেয়ে এবং সাত নম্বর মেয়ে স্ত্রীর পেটে বড় হচ্ছে তার ঝিমানো ছাড়া গতি কি? হীরু কয়েকবার দেখেছে এ্যানার মা'কে। রোগা কাঠি। শ্যাওড়া গাছের ডালে এলোচুলে বসে থাকলেই এ মহিলাকে বেশি মানাতো। তা না করে তিনি কল্যাণপুরের একটা টিনের ঘরে বাস করেন এবং ভাঙা গলায় সারাক্ষণ ছয় কন্যাকে বকাঝকা করেন। হীরু নিজেও একবার বকা খেয়েছে।

এ্যানাদের বসার ঘরের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে একবার ছোট্ট করে শিস দিতেই এই মহিলা জানালা দিয়ে মুখ বের করে বললেন, এই ছেলে তুই কি চাস?

হীরু হতভম্ব!

এই যুগে তার বয়েসী কোনো ছেলেকে কোনো মেয়ের বা যে 'তুই' করে বলতে পারে তা সে কল্পনাও করেনি। সে এতই অবাক হল যে মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। ভদ্রমহিলা তার ভাঙা গলায় তিনবার বললেন, চাস কি তুই? রোজ জানালার সামনে শিস! জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব।

হীরু থতমত খেয়ে বলল, কিছু চাই না ম্যাডাম। একটা অ্যাডড্রেস খুঁজছি। সতের বাই তিন। ইকবাল সাহেবের বাসা। এটা কি ইকবাল সাহেবের বাসা?

ভদ্রমহিলা খট করে জানালা বন্ধ করে দিলেন। হীরুর প্রায় ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মত অবস্থা। একি যন্ত্রণা!

এই বাড়ির মেয়েগুলিও হয়েছে মায়ের মত। সব ক'টা মেয়ে পুরুষদের মত গলায় কথা বলে। চেহারাও পুরুষদের মত। হাবভাবও সে রকম। হীরু যে এদের একজনের জন্যে রোজ এতটা সময় নষ্ট করে এতেই এদের কৃতার্থ থাকা উচিত। হীরুর ধারণা 'নরম্যাল পদ্ধতিতে' এদের একটারও বিয়ে হবে না। প্রেম-টেম করে যদি দু'একটা পার পায়। অথচ বাপ-মা এই জিনিসটাই বুঝে না।

এ্যানার বাবা ইসমাইল সাহেবের কাজকর্ম একজন জেলের সুপারিনটেনডেন্টের মত। যতক্ষণ বাসায় থাকবেন কোনো মেয়ে ঘর থেকে বেরুতে পারবে না। উঁকি-ঝুঁকি দিতে পারবে না। ঘরের জানালা থাকবে বন্ধ। আজকের লক্ষণও সে রকম। হীরু ঠিক করল মীরপুর গিয়ে দেখে আসবে ভদ্রলোক অফিসে গেছেন না ছুটি নিয়ে বাসায় বসে আছে। যদি অফিসে না গিয়ে থাকেন তাহলে তো কিছুই করার নেই। আর যদি দেখা যায় ভদ্রলোক অফিসেই আছেন তাহলে আরেকটা এটেম্পট নেয়া যায়। এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়া ঠিক না।

ভদ্রলোক অফিসেই আছে। বিশাল চেহারা। ব্যাঙের চোখের মত বড় বড় চোখ। কচকচ করে পান খাচ্ছে। হীরু মনে মনে বলল, 'খা ব্যাটা পান খা। আর প্রতি বছর একটা করে মেয়ে পয়দা কর।' বলেই হীরুর মনে হল — বলাটা ঠিক হল না। তার শ্বশুর হবার একটা ভীষণ সম্ভাবনা এই কোলা ব্যাঙের আছে। হবু শ্বশুর সম্পর্কে এরকম মন্তব্য করা ঠিক না। শ্বশুরদের সম্পর্কে ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা দরকার। তবে এই লোক তার শ্বশুর হলেও বিপদ আছে। ঈদের দিন কোলাকুলি করতে হবে।

হীরু একটা রিকশা নিয়ে নিল। মীরপুর থেকে কল্যাণপুর ফেরার এই সময়টায় বাসে গাদাগাদি ভিড় থাকে। এ্যানার সঙ্গে দেখা হবে ভেবে ইস্ত্রী করা শার্ট পরে এসেছে। চাপাচাপিতে শার্ট ভর্তা হয়ে যাবে। রিকশা ভাড়ায় বাড়তি টাকা চলে যাচ্ছে। উপায় আর কি?

এ্যানার সঙ্গে তার পরিচয় দীর্ঘদিনের নয়। আড়াই মাসের মত। পরিচয় পর্বটা খারাপ না। এসএসসি পরীক্ষায় দ্বিতীয় দিন। হীরু মীরপুর রোডে এসে দাঁড়িয়েছে — কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। বছর তিন চারেক আগে এই সময়ে মেয়েদের স্কুলে নকল সাপ্লাই করত। বয়সের কারণে এটা এখন মানায় না তবু পরীক্ষার সময় গম্ভীর মুখে একবার ঘুরে আসে। অনেক দিনের অভ্যাস। চট করে ছাড়া মুশকিল।

হীরু ভাবছিল কোন স্কুলে যাবে। আশপাশের সব ক'টা সেন্টার ঘুরে দেখা দরকার। রোজ রোজ একই সেন্টারে যাবার কোনো মানে হয় না। এই রকম যখন তার মনের অবস্থা তখনি এ্যানাকে তার চোখে পড়ল। বেচারী রিকশা পাচ্ছে না। কোনো রিকশা নেই। যাও আছে যাত্রী বোঝাই। মেয়েটা ছোটাছুটি করছে রিকশার জন্যে। ব্যাপারটা দেখতেই হীরুর বেশ মজা লাগছে। মেয়েটা দারুণ ভয় পেয়েছে। তার হাত থেকে এক সময় জ্যামিতি বাক্স পড়ে গেল। চাঁদা, কম্পাস এসব ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। সে বসে বসে এইসব তুলছে এবং চোখ মুছছে।

একটা রিকশাওয়ালাকে পাওয়া গেল - সে দশ টাকা ভাড়া চায়। মেয়েটার সঙ্গে বোধ হয় দশ টাকা নেই। সে অনুনয়-বিনয় করছে সাত টাকায় যাবার জন্যে।

হীরুর এতক্ষণ বেশ মজাই লাগছিল এখন খানিকটা খারাপ লাগল - সব এসএসসি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে কয়েকজন করে আত্মীয়-স্বজন থাকে। ও যাচ্ছে একা এবং সঙ্গে দশ টাকাও নেই।

হীরু তখন এগিয়ে গেল। গলার স্বর যথাসম্ভব গম্ভীর করে বলল, খুকী আমার কাছ থেকে দশটা টাকা নিয়ে নাও। এক সময় দিয়ে দিলেই হবে। আমি এই দিকেই থাকি।

মেয়েটি শীতল চোখে খানিক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আমার কাছে টাকা আছে। আর যদি নাও থাকে আপনার কাছ থেকে নেব কেন?

হীরু হতভম্ব। নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগল। মেয়েটি বলল, পাঁচ টাকা ভাড়া হয় আমি শুধু শুধু তাকে দশ টাকা দেব কেন?

তা তো বটেই। তবে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?

হোক দেরি।

তোমার কোন স্কুলে সিট পড়েছে?

মেয়েটি জবাব না দিয়ে বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গেল। একটা বাস এসে থেমেছে। বাসে যথেষ্ট ভিড়। বাস স্ট্যান্ডেও অপেক্ষমাণ ছোটখাটো জনতা। মেয়েটি সেই ভিড় কাটিয়ে বাসে উঠে পড়ল।

দূর থেকে হীরু মনে মনে বলল— সাবাস। বলেই তার খেয়াল হল যে তার পকেট ফাঁকা একটা টাকাও নেই। মেয়েটা যদি তখন বলত— দিন দশটা টাকা, তাহলে উপায়টা কি হত?

মেয়েটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হতে বেশি সময় লাগল না। দেখা হলে সে কথা বলে। হীরু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দু'একটা রোমান্টিক কথাও বলেছে তেমন কোনো রি-অ্যাকশান অবশ্যি তাতে বোঝা যায়নি। এর মধ্যে একটা ডায়ালগ ছিল এ রকম - আজ তো তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে।

মেয়েটি হেসে ফেলল বলেছে – শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলেন কেন? যে সুন্দর না তাকে সুন্দর বললে তার খুব খারাপ লাগে - এটা আপনি জানেন?

মেয়েটার এইটাই হচ্ছে একটা সমস্যা। ফটফট করে কথা বলে। বেশি চালাক। মেয়েছেলের বেশি চালাক হওয়া ঠিক না।

হীরু এ্যানাদের বাসার ঠিক সামনের রিকশা থেকে নামল। রিকশায় আসতে আসতে সে ঠিক করে রেখেছে - এ্যানাদের বসার ঘরের জানালার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কয়েকবার কাশবে। যক্ষ্মারুগীর কাশি না — ভদ্র কাশি। যাতে এ্যানা ভেতর থেকে শুনতে পেয়ে বের হয়ে আসে।

হীরুকে কাশতে হল না। সে দেখল এ্যানা বাসার সামনের দোকান থেকে কি যেন কিনছে। এদের বাড়িতে কোনো কাজের লোক নেই বলে দোকানের টুকটাক বাজার মেয়েদেরই করতে হয়। হীরু এগিয়ে গেল।

এ্যানা আধ কেজি চিনি কিনছে। হীরু গম্ভীর মুখে দোকানদারকে বলল, পাল্লাটা ঠিকমত ধরেন ভাইজান। পাল্লায় ফের আছে? নগদ পয়সায় পাবলিক জিনিস কিনবে আর আপনি পাবলিককে ঠকাবেন তা তো হয় না।

এ্যানা বলল, নগদ পয়সায় কিনছি না। বাকিতে কিনছি।

বলেই হীরুকে দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে চিনির ঠোঙা হাতে নিয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল। যেন হীরুকে সে চেনে না। যেন হীরু রাস্তার একটা ছেলে। হীরু মনে মনে বলল, হারামজাদী।

তার মন খারাপ হয়ে গেল। আজ দিনটাই তার জন্যে খারাপ। হাতও পুরোপুরি খালি। যে

সামান্য কিছু টাকা ছিল তার সবটাই রিকশা ভাড়ায় চলে গেছে। শ'খানেক টাকা সঙ্গে না থাকলে কেমন অস্থির লাগে। কোথায় পাওয়া যায় টাকা? হীরু দ্রুত চিন্তা করতে লাগল — ঢাকায় ধার চাওয়ার মত আত্মীয়স্বজন কে কে আছে যাদের কাছ থেকে এখনো ধার চাওয়া হয়নি। তেমন কারোর নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। উত্তর শাহজাহানপুরে দূর-সম্পর্কের এক মামা আছেন। তাঁর কাছে যাওয়া যায়। তবে ঐ ভদ্রলোকের নিজেরই দিনে আনি দিনে খাই অবস্থা। ধার চাইতে গিয়ে কোনো বিপদে পড়তে হয় কে জানে।

হীরু জমা করে রাখা বিদেশী সিগারেটটা বের করল। জমা করে রাখার কোন অর্থ হয় না।

সে সিগারেট ধরিয়ে দু'টা টান দিয়েছে তখন দেখা গেল এ্যানা আবার আসছে। এবং তার কাছেই যে আসছে এটাও নিশ্চিত। হীরু ঠিক করে রাখল কোনো কথা বলবে না। যে মেয়ে তাকে অপমান করে, দেখতে পেয়েও না দেখার ভান করে চলে যায় তার সঙ্গে কথা বলার কোনো মানে হয় না।

এ্যানা এসে হীরুর সামনে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটাকে হীরুর সত্যি সত্যি সুন্দর লাগছে। যত দিন যাচ্ছে মেয়েটা কি ততই সুন্দর হচ্ছে? তা কেমন করে হয়?

এ্যানা বলল, এরকম বিশ্রী করে শিস দিচ্ছিলেন কেন? কতবার না বললাম এ রকম করবেন না। আর ছাদে ঢিল মারলেন কেন? এইসব কি?

কথা না বলার প্রতিজ্ঞা টিকল না। হীরু বলল, মন-মেজাজ খুব খারাপ মাথার ঠিক নাই। কি করতে কি করি।

মাথার ঠিক নাই কেন?

আর বলো না, ছোট ভাই মিসিং হয়ে গেছে। দৌড়াদৌড়ি ছোটাছুটি সব তো আমার ঘাড়ে। বড় ছেলে হবার বিরাট যন্ত্রণা।

আপনার ছোট ভাই হারিয়ে গেছে নাকি?

হুঁ, পালিয়ে গেছে। যাকে বলে...

হীরু থেমে গেল। সে পালিয়ে গেছের একটা ইংরেজি বলতে চেয়েছিল — বলতে পারছে না। কারণ পালিয়ে গেছের ইংরেজি তার জানা নেই।

এ্যানা বলল, পুলিশকে খবর দিয়েছেন?

না, পুলিশ-ফুলিশে হবে না। পীর সাহেবের কাছে যেতে হবে। কলতা বাজারের পীর। জ্বীন সাধনা আছে। আমার সঙ্গে খুবই খাতির। অত্যন্ত স্নেহ করেন।

এ্যানা বলল, আপনাকে স্নেহ করেন? আপনাকে স্নেহ করার কি আছে?

হীরুর বিস্ময়ের সীমা রইল না। এই মেয়ে বলে কি? কষে একটা চড় দিতে ইচ্ছা করছে। যে সব চমৎকার কথা বলবে বলে হীরু এসেছিল তার সবই এলোমেলো হয়ে গেল। হীরু বলল, যাই তাহলে?

আচ্ছা।

দিন পনের দেখা হবে না। ঢাকার বাইরে যাচ্ছি। বিজনেসের ব্যাপার।

যান, বিজনেস করে আসুন।

তোমার ঠিকানাটা লিখে দাও তো, সময় যদি পাই একটা চিঠি-ফিটি ছেড়ে দেব।

চিঠি দিতে হবে না। বাবা জানলে আমাকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

হীরুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল।

মন খুব বেশি খারাপ হলে সে সাধারণত পীর সাহেবের কাছে যায়। আজ তাও যাওয়া যাবে না, হাত একদম খালি। পীর সাহেব টাকা-পয়সা কিছুই নেন না। তবে বিদেশী সিগারেট দিলে খুশি হন। এক প্যাকেট বেনসনের দাম কম হলেও পাঁচ পঞ্চাশ টাকা — এই টাকাটা সে পাবে কোথায়?

হীরু ভেবে পেল না তার এবং এ্যানার ব্যাপারটা সে পীর সাহেবকে বলবে কি বলবে না। লজ্জা লজ্জা করে তবে একবার বলে ফেললে চির জীবনের জন্যে নিশ্চিন্ত।

তাছাড়া টুকুর জন্যেও যাওয়া দরকার। হারানো মানুষ বাড়ি ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে এই পীর হচ্ছে এক নাম্বার। পীর সাহেবের এগারটা জ্বীন আছে। জ্বীনের মারফত খবর পান।

হীরু খালি হাতেই পীর সাহেবের সন্ধানে রওনা হল।

টুকু পার্কের একটা বেঞ্চিতে শুয়ে আছে।

তার সমস্ত শরীরে এক ধরনের আরামদায়ক আলস্য। শুধু মাথাটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। এসব হচ্ছে প্রবল জ্বরের লক্ষণ। সে বুঝতে পারছে তার গায়ে জ্বর। অনেকখানি জ্বর। জ্বরের জন্যেই শ্রাবণ মাসের পড়ন্ত দিনের রোদ তার কাছে এত আরামদায়ক মনে হচ্ছে। রোদটা আরেকটু কড়া হলে ভাল হত। শীত শীত ভাবটা দূর হত।

টুকু চোখ মেলল। আকাশ অনেকখানি নিচে নেমে এসেছে। সকালে প্রথম যখন জ্বরের ভাবটা টের পেল তখন থেকেই সে লক্ষ্য করছে আকাশ ক্রমশ নেমে আসছে। বাসায় যখন জ্বর আসত তখনো এমন হত। মনে হত ছাদটা নিচে নেমে এসেছে। এখন মাথার উপর ছাদ নেই। চকচকে আকাশ। সে আকাশ এত দ্রুত নিচে নামছে যে তার ভয় ভয় করছে। টুকু চোখ বন্ধ করে ফেলল।

আজ নিয়ে দু'দিন সে পানি ছাড়া কিছু খায়নি। ইচ্ছা করলে খেতে পারত। তার পকেটে সতের টাকা। এই জীবনের পুরো সঞ্চয়। এই টাকার সবটাই সে পেয়েছে তিথির কাছ থেকে। যতবার সে তিথিকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেছে ততবার বাসে উঠবার আগে হাত ব্যাগ খুলে তিথি তাকে একটা টাকা দিয়ে বলেছে নে রেখে দে। টুকু প্রতিবার বলেছে লাগবে না। তিথি বলেছে, না লাগলেও রেখে দে। টুকুর একচল্লিশ টাকার মত জমেছিল। বাকি টাকাটা খরচ হয়েছে গ্রিন বয়েজ ক্লাবের চাঁদায়। এই ক্লাবটা নতুন হয়েছে। ক্লাবের সেক্রেটারি বজলু ভাই। উকিল সাহেবের বাড়ির গ্যারেজে ক্লাবের অফিস ঘর এবং লাইব্রেরি। লাইব্রেরিতে বইয়ের সংখ্যা একশ আটান্ন। লাইব্রেরিতে ভর্তি হবার নিয়ম হল - একটা বই দিতে হবে এবং ভর্তি ফি দশ টাকা দিয়ে মেম্বার হতে হবে। মেম্বার হয়ে গেলে প্রতি মাসে চাঁদা তিন টাকা।

টুকু এই লাইব্রেরির প্রথম সদস্য। শুধু তাই না - গ্রিন বয়েজ ক্লাবের মাসিক মুখপাত্র 'নতুন দেশ'-এর সে একজন চিত্রকর। এই খবর টুকুদের বাসায় কেউ জানে না। কেউ জানে না টুকু শুধু যে একজন চিত্রকর তাই না সে গল্পও লেখে। একটি গল্প ইত্তেফাকের কচিকাঁচার আসরে ছাপা হয়েছে। গল্পের নাম 'রাজকন্যা চম্পাবতী'। রূপকথা। রূপকথা লিখতেই টুকুর ভাল লাগে। তার মাথায় এই জিনিসই ঘুরে বেড়ায়।

ভোরবেলায় সে যখন বাড়ি থেকে বের হল তখনো তার মাথায় ছিল একটা রূপকথার গল্প। যেন সে একজন রাজকুমার। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বের হয়েছে। বের হবার কারণ ভয়ংকর একটা দৈত্য। দৈত্যটার নাম 'করুবেক'। এই করুবেক দৈত্যের ভয়ে সমস্ত পৃথিবী থরথর করে কাঁপছে। একে কেউ মারতে পারছে না। কারণ করুবেক অমর। শুধু একজন পারে করুবেককে মারতে- সেই একজন হচ্ছে সে নিজে। তবে তার জন্যে তাকে সাধনা করতে হবে। সাতদিন উপবাস। উপবাসের অষ্টম দিনে তার কাছে আসবেন একজন দেবদূত। তিনি নরম গলায় বলবেন -- হে বালক! তোমার সাধনায় তুষ্ট হয়েছি। তুমি কি চাও বৎস? তিনটি বর তুমি প্রার্থনা কর। সে তখন চাইবে করুবেককে হত্যার অস্ত্র।

টুকুর উপবাসের আজ দ্বিতীয় দিন।

প্রথম দিন সে কষ্টটা হচ্ছিল আজ তা হচ্ছে না। টুকুর ধারণা আগামী দিন আরো কম হবে। বাসায় থাকলে কষ্ট হত। ক্ষিধের এই ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। বাসায় থাকলেই ক্ষিধে বেশি লাগে এবং যখন জানা যায় ঘরে খাবার নেই তখন হঠাৎ করে ক্ষিধের কষ্ট লক্ষগুণ বেড়ে যায়। জগৎ-সংসার অন্ধকার মনে হয়।

এরকম কষ্ট অবশ্যি টুকুকে খুব বেশি করতে হয়নি। এই জীবনে মাত্র তিনবার। প্রথমবার যখন ব্যাপারটা হল তখন কষ্টের চেয়েও বিস্ময় প্রধান হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ একদিন দুপুরবেলা রান্না হল না। টুকুর বাবা বারান্দায় বসে বারবার বলতে লাগলেন-- ভেরি ব্যাড টাইম। যাকে বলে দুঃসময়। কি করা যায়? না খেয়ে তো থাকা সম্ভব না। ও মিনু, করা যায় কি বল তো?

টুকুর মা রান্নাঘরের বারান্দায় মোড়াতে বসা ছিলেন। সেখান থেকে তিনি তীক্ষ্ণ গলায় বললেন-- তুমি কথা বলবে না।

জালালুদ্দিন বিস্মিত গলায় বললেন- কথা না বললে হবে কি করে? একটা বুদ্ধি বের করতে হবে না? চুপচাপ গালে হাত দিয়ে বসে থাকলে হবে?

খবরদার একটা কথা না।

তোমাকে নিয়ে বড় যন্ত্রণা হল তো? সমস্যা বুঝতে পারছ না। মানব জীবনে সমস্যা আসবেই। সেই সমস্যার সমাধান ঠাণ্ডা মাথায় বের করতে হবে। কুল ব্রেইনে ভাবতে হবে।

সমস্যার সমাধান বের করা আছে। তোমাকে ভাবতে হবে না।

জালালুদ্দিন উৎসাহী গলায় বললেন, কি সমাধান?

ঘরে ইঁদুর মারার বিষ আছে। ঐ খানিকটা করে খেয়ে শুয়ে থাক।

পাগল হয়ে গেলে নাকি মিনু?

পাগল হইনি, পাগল হব কেন?

আত্মহননের চিন্তা যে মাথায় এসেছে এটাই হচ্ছে পাগলামির সবচেয়ে বড় লক্ষণ। বড় বড় মনীষীদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবে। বিপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

আর একটা কথা যদি তুমি বল জোর করে তোমাকে বিষ খাইয়ে দেব। সব সময় ফাজলামি।

জামালুদ্দিন চুপ করে গেলেন।

টুকুরও ভয় ভয় করতে লাগল। মা'র চেহারা কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। রূপকথার ডাইনীদের মত লাগছে।

হীরু বাড়ি এল সন্ধ্যার আগে আগে। মুখ ভর্তি পান। হাতে সিগারেট। দুপুরে বাড়িতে খাওয়া হয়নি শুনে সে চোখ কপালে তুলে বলল বিগ প্রবলেম মনে হচ্ছে।

জালালুদ্দিন বললেন, তোর কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে নাকি রে হীরু?

আমার কাছে টাকা-পয়সা থাকবে কেন? কিছুই নেই। বিশ্বাস না হয় পকেটে হাত দিয়ে চেক করতে পার। পাঁচটা টাকা ছিল এক প্যাকেট সিগারেট কিনে ফেললাম।

জালালুদ্দিন ক্লান্ত গলায় বললেন-- দেখি একটা সিগারেট দে। সিগারেটের ক্ষিধে নষ্ট হবার ক্ষমতা আছে।

জালালুদ্দিন বসে বসে সিগারেট টানতে লাগলেন। তার সামনেই বসল হীরু। কিছুক্ষণ পরপর সে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। কপালের রগ টিপে ধরছে। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে জালালুদ্দিন বলতে বাধ্য হলেন এত চিন্তা করিস কেন? এত চিন্তার কি আছে? রিজেকের মালিক হচ্ছেন আল্লা স্বয়ং। সেই রিজিক নিয়ে বেশি চিন্তা করার মানেই হচ্ছে আল্লাহকে বিশ্বাস না করা। মহাপাপের সামিল।

আল্লাহর ওপর প্রবল বিশ্বাস রেখে তিনি হীরুর কাছ থেকে নিয়ে পরপর তিনটি সিগারেট খেয়ে ফেললেন। আশ্চর্যের ব্যাপার- দেখা গেল স্বয়ং আল্লাহ জালালুদ্দিনোর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখলেন। মিনু কোনো-এক গভীর গোপন থেকে গলার একটা হার বের করলেন। কি করে এটা অবশিষ্ট রয়ে গেল কে জানে। দু'ভরি থেকে আড়াই ভরির মত ওজন।

জালালুদ্দিন একগাল হাসলেন। হৃষ্টচিত্তে বললেন- কি বলেছিলাম না। সব সমস্যার সমাধান আছে। বিশ্বাস তো কর না।

হীরু গয়না নিয়ে বেরুল। আগেরগুলিও তার হাতেই বিক্রি হয়েছে। তার নাকি কোন-এক চেনা দোকান আছে। ভাল দাম দেয়। খাদের জন্য কিছুই কাটে না।

জালালুদ্দিন বললেন, ঐ সঙ্গে সপ্তাহের বাজার করে আনবি, বুঝলি। চাল, ডাল, চা চিনি। নোনা ইলিশ পাস কি-না দেখবি। কচুর লতি দিয়ে নোনা ইলিশের কোনো তুলনা হয় না। একেবারে বেহেশতী খানা— বুঝলি। হীরু গয়না নিয়ে বেরুল আর ফিরল না।

বেঞ্চে শুয়ে শুয়ে টুকু পুরনো কথা ভাবছে। ভাবতে বেশ মজা লাগছে। হীরু ভাইয়া না ফেরায় বাবা ঐ রাতে কি অবাকই না হয়েছিলেন। রাত এগারটার দিকে ভয় পাওয়া গলায় বললেন, ও মিনু গয়না নিয়ে পালিয়ে গেল নাকি?

মিনু সহজ গলায় বললেন -- হ্যাঁ।

এখন কি করব?

ঘুমিয়ে পড়। আর কি করবে?

বল কি তুমি!

মিনু সত্যি সত্যি ঘুমুবার আয়োজন করলেন। মশারি ফেলতে ফেলতে বললেন-- ঘুমুতে না চাও জেগে থাক। রিজিকের জন্যে আল্লাহকে ডাক। তিনি ব্যবস্থা করবেন।

ক্ষুধার্ত মানুষ ঘুমুতে পারে না বলে প্রচলিত যে ধারণা আছে তা ঠিক না। ক্ষুধা পেলে ঘুম ভাল হয়। ঐ রাতে শোয়ামাত্র টুকু ঘুমিয়ে পড়ল। রাত তিনটার দিকে তার ঘুম ভাঙানো হল। ডাল-ভাত রান্না হয়েছে। আগুন গরম ভাত ফুঁ দিয়ে তার বাবা খাচ্ছেন। তাঁর মুখে মিবলানন্দ। জানা গেল দু'বেলার মত খাবার ঘরে ছিল। সামনের দিন কেমন যাবে তা বোঝার জন্যে মিনু এই ব্যবস্থা করেছে। সবাই আকণ্ঠ খেল। শুধু তিথি ভাতের থালা সামনে নিয়ে বসে রইল। কিছু মুখে দিল না। জালালুদ্দিন বললেন, খাচ্ছিস না কেন?

তিথি বলল, রুচি হচ্ছে না বাবা। তোমরা খাও।

দু'এক গাল মুখে দে। তাহলেই দেখবি রুচি হচ্ছে। ডাল কাঁচামরিচ দিয়ে ডলা দে দেখবি কি রকম টেস্ট হয়। মিনু ওকে একটা পেঁয়াজ দাও। ঘরে পেঁয়াজ আছে না?

তিথি বলল, না-খাওয়া অভ্যাস করি বাবা। সামনের দিনগুলিতে তো না খেয়েই থাকতে হবে। সে থালা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। মিনু একবারও তাকে খেতে ডাকলেন না।

আজ সকাল থেকে টুকুর মাথায় এসব ঘটনা ছবির মত আসছে। পাশাপাশি আসছে রূপকথার গল্পটা। টুকুর পায়ের কাছে এক ঠোঙা ঝালমুড়ি নিয়ে কে-একজন এসে বসল। টুকুর মনে হল এ করুবেকের গুপ্তচর। তার সাধনা ভাঙাতে এসেছে। ঝালমুড়ির লোভ দেখাচ্ছে। যাতে সে লোভে পড়ে ঝালমুড়িওয়ালাকে ডেকে দু'টাকার মুড়ি কিনে ফেলে'। একবার কিনে ফেললেই সব শেষ। করুবেককে হত্যা করা তখন আর সম্ভব হবে না।

লোকটি একবার তার দিকে তাকিয়ে বলল, কি হইছে?

টুকু জবাব দিল না। চোখ বন্ধ করে ফেলল। লোকটি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল না। এই দুঃসময় কেউ বেশি প্রশ্ন করে না। বেশি প্রশ্ন করলেই যদি কাঁধে দায়িত্ব এসে পড়ে। দায়িত্ব খুব খারাপ জিনিস। এর থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই ভাল।

টুকু একবার ভাবল- কেউ কি তাকে খুঁজতে বের হবে? সেই সম্ভাবনা কতটুকু? খুব বেশি না। খোঁজাখুঁজির যন্ত্রণায় কেউ যাবে না। একজন মানুষ কমে গেলেই সংসারের জন্যে ভাল। তবে বজলু ভাই খবর পেলে নিশ্চয়ই বের হবেন। এবং খুঁজে বের করতে পারলে খুশি খুশি গলায় বলবেন তুই যে ঘর থেকে পালাতে পারলি এটা খুবই শুভ লক্ষণ। সব গ্রেটম্যানরাই কোনো না কোনো সময়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। একমাত্র ব্যতিক্রম রবি ঠাকুর। বাড়ি থেকে পালাননি বলে তাঁর লেখায় পুতপুত ভাবটা বেশি। বাড়ি থেকে পালালে অভিজ্ঞতা হয়। নানান ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশা যায়। গুড ম্যান, ব্যাড ম্যান সব ধরনের মানুষ। পরবর্তী সময়ে এইসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগে। তোর জন্যে এটা তো খুবই দরকার। লেখালেখি লাইনে যখন আছিস। আমাদের দেশের লেখকরা বড় হতে পারল না কেন? অভিজ্ঞতার অভাবে। ম্যাক্সিম গোর্কির অভিজ্ঞতা ক'জনের আছে তুই বল? একজনেরও নেই। আমাদের দেশের লেখকরা কি করে? খায় দায় ঘুমায় আর আড্ডা দেয়। এদের একবিন্দু অভিজ্ঞতা নেই। আমি খুব খুশি যে তোর অনেক অভিজ্ঞতা হয়ে গেল।

মজার ব্যাপার হচ্ছে টুকুর তেমন কোনো অভিজ্ঞতাই হয়নি। সে নিজের মনে সময় কাটিয়েছে। বেশির ভাগ সময় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমিয়েছে, কেউ তাকে বিরক্ত করেনি। শুধু একবার একটা বুড়ি তাকে বলেছে-- এই ছ্যামড়া তোর হইছে কি? শইলে কি জ্বর?

বুড়ির গলায় স্নেহ-মমতার লেশমাত্র নেই। টুকু সেই প্রশ্নের জবাব দেয়নি। চোখ বন্ধ করে ফেলেছে। বুড়ি আবার বলেছে, এই ছ্যামড়া উইঠ্যা ব দেহি। তোর বাড়ি কই?

টুকু বিরক্ত হয়ে উঠে গেছে। নিজের পরিবারের মানুষদের বাইরের গত দু'দিন এই বুড়ি এবং ঝালমুড়ির ঠোঙা হাতে লোক- এদের দু'জনের সঙ্গেই কথা হয়েছে। বিরাট কোন অভিজ্ঞতা নয়।

সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে টুকু উঠে বসল। আকাশটা অনেকখানি নেমে আছে। আকাশের রঙ ঘন লাল। সন্ধ্যাবেলা আকাশ খানিকটা লাল হয়। এতটা লাল হয় নাকি? তার ধারণা হল জ্বর খুব বেড়েছে। এতটা বাড়তে দেয়া ঠিক হয় নি। সে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ঘুরে নিচে পড়ে গেল। মুড়ির ঠোঙা হাতের লোকটি তাকিয়ে দেখল। কিছুই বলল না। তার খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল সে ঠোঙা ছুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল। অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে সে হাঁটছে। একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছে না। দিনকাল বদলে যাচ্ছে। কেউ এখন আর বাড়তি ঝামেলায় যেতে চায় না।

৬

দেখতে দেখতে ছ'দিন হয়ে গেল- টুকুর খোঁজ নেই। মিনু প্রায় দুপুরবেলা নিজেই ছেলেকে খুঁজতে বের হন। কাউকে তা বলেন না। টুকুর প্রসঙ্গে কোনো রকম কথাবার্তায় তিনি অংশগ্রহণ করেন না। যেন টুকু নামে তাঁর কেউ ছিল না।

এই ক'দিন তিথি টুকুর প্রসঙ্গ তুলেনি। আজ তুলল। হীরুকে বলল, থানায় খবর দিয়েছিস?

হীরু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, না।

না কেন?

আরে থানায় খবর দিয়ে হবেটা কি? কিছুই হবে না। উল্টা শালাদের টাকা খাওয়াতে হবে।

টাকা খাওয়াতে হবে কেন?

পুলিশের কাছে যাবি আর টাকা খাওয়াবি না এটা একটা কথা হল নাকি। পুলিশ সম্পর্কে তুই কিছুই জানিস না। থানায় খবর দেওয়ার ব্যাপারটা তুই ফরগেট করে ফেল।

আমরা কিছুই করব না? হাত গুটিয়ে বসে থাকব?

তোকে এই নিয়ে চিন্তা করতে হবে না ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

কি ব্যবস্থা

ঐসব জেনে তুই কী করবি? আমার ওপর ছেড়ে দে।

তোর ওপর ছেড়ে দিয়ে তো এই অবস্থা...

হীরু কোনো উত্তর না দিয়ে খাওয়া শেষ করে উঠে গেল। হাত-মুখ ধুয়ে তাকে এখন সিগারেট কিনতে যেতে হবে। টুকু না থাকায় এই একটা সমস্যা হয়েছে ছোট ছোট কাজে নিজেকেই যেতে হচ্ছে। ভরা পেটে হাঁটতে ভাল লাগে না।

টুকুকে নিয়ে যে তিথি চিন্তা করছে এতেও সে বেশ মজা পাচ্ছে। পীর সাহেবের কথামত দশ দিনের দিন টুকুর ফিরে আসার কথা। আসবে সেটা তো প্রায় নিশ্চিত। কাজেই ছোটাছুটি হৈচৈ এর কোনো দরকার নেই। সিগারেট কিনতে কিনতে হীরুর মনে হল আজ কী একবার যাবে পীর সাহেবের কাছে? এমনি গিয়ে একটু কদমবুসি করে আসা আর কি?

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পরপরই মিনু বের হয়ে গেলেন। একটা ভবঘুরে কেন্দ্রের খোঁজ পেয়েছেন। পুলিশ ট্রাক ভর্তি ভিখিরি নিয়ে ঐখানে আটকে রাখে বলে শুনেছেন। কে জানে টুকুকেও রেখেছে কি-না।

তিনি ফিরলেন সন্ধ্যা মেলাবার পর। ঘর অন্ধকার। বারান্দায় তার বড় মেয়ে অরুর বর আব্দুল মতিন বসে আছে। রাগে মিনুর গা জ্বলে গেল। এ ছেলেকে দেখলেই তার এ রকম হয়।

আব্দুল মতিনের হাতে সিগারেট। শাশুড়িকে দেখে সিগারেট লুকাবার একটা ভঙ্গি করে উঠে এল। সিগারেট হাতেই পা ছুঁয়ে সালাম করল।

কেমন আছেন আম্মা?

মিনু শুকনো গলায় বললেন তুমি কখন এলে?

চারটার সময়। দেখি কেউ নাই। তখন থেকে একলা বসে আছি। বাসার আর লোকজন কোথায়?

জানি না কোথায়।

আব্দুল মতিন বিস্মিত হয়ে বলল, ঘর খালি রেখে সব চলে গেছে কি আশ্চর্য ব্যাপার। যে তালা দিয়েছেন এটা তো আম্মা বাতাস লাগলে খুলে যাবে।

খুলে গেলে কি আর করা। ঘরে আছেই বা কি যে সিন্দুকের তালা লাগাতে হবে। অরু আছে কেমন?

আছে মোটামুটি।

মোটামুটি কেন?

আরেকটা সন্তান হবে এই জন্যেই শরীরটা একটু ইয়ে। ডাক্তার বলেছে রক্তের অভাব। আয়রন ট্যাবলেট দিয়েছে। ঐ খাচ্ছে দিনে তিনটা করে।

তুমি ঢাকায় এসেছ কী জন্যে, কোনো কাজে না এমনি...

বিনা কাজে কী আর আম্মা আমার মত মানুষ আসা-যাওয়া করতে পারে? ঢাকা-কুমিল্লা যেতে

আসতেই পঞ্চাশ টাকা খরচা। কাজে এসেছি।

কাজটা কী?

জি বলব। একটু চা দিতে পারবেন? গত রাতে এক ফোঁটা ঘুম হয় নাই, শরীরটা একেবারে ইয়ে হয়ে গেছে। গোসল করব ভেবেছিলাম। বাথরুমে দেখি সাবান নাই...

কি আর করবে সাবান ছাড়াই গোসল কর।

মিনু রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন।

ঘরে কিছু নেই। শুধু চা দিতে হল। তার জন্যে মিনু কোনো রকম সংকোচ বোধ করলেন না।

মতিন চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, টাকাটার জন্যে আসলাম আম্মা। বিপদে পড়েছি। যার টাকা তাকে দিতে হয়। রোজ তাগাদা দিচ্ছে। মিনু বিস্মিত হয়ে বলল - কিসের টাকা?

ঐ যে গত মাসে হীরু গিয়ে নিয়ে আসল।

হীরু টাকা নিয়ে এল? কিসের টাকা?

আব্বার চোখ অপারেশনের টাকা। আমার হাতে তখন একেবারে খালি। তা অরু এমন কান্নাকাটি শুরু করল। আমি কি আর করব ধার করে জোগাড় করলাম। এমনিতে তো কেউ টাকা দেয় না সুদ কবুল করে ধার। তা ভাবলাম কী আর করা চোখ বলে কথা।

কত টাকা?

মতিন অবাক হয়ে বলল, কত টাকা আপনি জানেন না? মিনু বিরক্ত গলায় বললেন, জানলে তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম? জানি না বলেই জিজ্ঞেস করছি। কত টাকা এনেছে?

দুই হাজার।

কী সর্বনাশ বল কী তুমি!

আপনি কিছুই জানেন না? এ তো দেখি আরেক মুসিবত হয়ে গেল। হীরু মনে হচ্ছে ফাটকি মেরে টাকা নিয়ে এসেছে। এখন কী করি আমি?

হীরু আসুক হীরুকে বল। যাকে টাকা দিয়েছে তার ঘাড় ধরে টাকা আদায় কর। আমার কাছে কী?

আপনার কাছে কী মানে? এইসব আপনি কী বলছেন আম্মা?

সত্যি কথাই বলছি। হীরুর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ তো বিরাট সমস্যায় পড়লাম। হীরুকে কী আমি টাকা দিয়েছি নাকি? টাকা দিলাম আপনাদের। রাত দশটার ট্রেনে ফিরব - এর মধ্যে যা হোক একটা ব্যবস্থা করেন। পুরোটা না হলেও অন্তত হাজার খানিক। নয়ত বিরাট বেইজ্জত হব।

বললেই তো হবে না। টাকা পাব কোথায়? টাকা গাছ তো বাবা পুঁতা নাই। সংসারের হাল অবস্থা তো জান। জেনেশুনে এ রকম অবুঝের মত কথা বললে হবে নাকি?

আমি কী অবুঝের মত কথা বললাম? পুরো বেইজ্জত হব লোকের সামনে...

না হয় শ্বশুর বাড়ির জন্যে খানিকটা বেইজ্জত হলেই।

আম্মা আপনি ব্যাপারটাই বুঝতে পারছেন না।

মিনু ক্লান্ত গলায় বললেন, এ টাকার আশা তুমি ছেড়ে দাও বাবা।

আব্দুল মতিন চোখ কপালে তুলে ফেলল।

ছেড়ে দেব? কী বলছেন?

যা সত্যি তা বললাম।

আব্দুল মতিন খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে থেকে উঠে চলে গেল। কোথায় যাচ্ছে মিনু কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। যাক যেখানে ইচ্ছা। পুরোপুরি চলে গেলেই ভাল। তবে পরোপুরি চলে যায়নি। হ্যান্ড ব্যাগ ফেলে গেছে। হ্যান্ড ব্যাগের জন্য আসবে। সম্ভবত হীরুর খোঁজে গিয়েছে।

তিথি সন্ধ্যার একটু পরই বাড়ি ফিরে দেখে হুলস্থূল কাণ্ড। দুলাভাই এবং মা দু'জনেই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে। কি নিয়ে কথা হচ্ছে বোঝার কোনো উপায় নেই। তিথি বলল, এসব কী হচ্ছে দুলাভাই?

মতিন চোখ লাল করে বলল, কী হচ্ছে তুমি জানো না?

জি না।

বাজে কথা বলবে না। কি হচ্ছে তোমরা সবাই জান। এখন ভাল মানুষ সেজেছ। ভাইকে পাঠিয়ে টাকা আনবার সময় মনে ছিল না। এখন অস্বীকার যাচ্ছ।

কিছুই অস্বীকার যাচ্ছি না। আগে আপনি আমাকে ব্যাপারটা গুছিয়ে বলুন। এরকম রাগ করছেন কেন?

মতিন পুরোপুরি গুছিয়েও বলতে পারল না। কথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। তবু মূল ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে। তিথি ক্লান্ত গলায় বলল, আপনার টাকা দিয়ে দেব। এক সঙ্গে সবটা না পারলেও ভাগে ভাগে দেব। প্লিজ চিৎকার করবেন না। আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে দুলাভাই?

মতিন কি-একটা বলতে গেল, বলতে পারল না। রাগে তার মুখে কথা আটকে যাচ্ছে। সে হ্যান্ড ব্যাগ হাতে নিয়ে নিয়েছে। তিথি বলল, যাচ্ছেন কোথায় দুলাভাই?

মিনু বললেন, যেখানে ইচ্ছা যাক। তুই কথা বলিস না। ফাজিলের ফাজিল।

মতিন বাড়ি থেকে বের হবার আগে তীব্র গলায় বলল — এর ফল ভাল হবে না। এর ফল কিন্তু ভাল হবে না। তখন কিন্তু আমাকে দুষবেন না।

তিথি বলল, কাজটা কী ভাল করলে মা? দুলাভাই গিয়ে আপার ওপর শোধ তুলবে।

তুললে তুলুক। মুখে অ্যাসিড মারুক। গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিক — যা ইচ্ছা করুক।

হয়েছে কী তোমার?

কিছু হয়নি।

বাবা কোথায় মা?

জানি না কোথায়। যাক যেখানে ইচ্ছা।

তিথি এক দৃষ্টিতে মাকে দেখছে। বোঝার চেষ্টা করছে। যতই দিন যাচ্ছে মা বদলে যাচ্ছে। পরিবর্তন অতি দ্রুত হচ্ছে বলে খুব চোখে লাগছে।

তিথি লক্ষ্য করল মা শান্ত ভঙ্গিতে নিজের জন্য চা বানিয়ে জলচৌকিতে বসে খাচ্ছে। তার চেহারায় কোনো রকম বিকার নেই।

## ৭

জালালুদ্দিন হীরুর সঙ্গে তার পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পীর-ফকিরের প্রতি তাঁর কোনো রকম বিশ্বাস নেই তবু এসেছেন। কারণ ঘর থেকে বের হতে ইচ্ছে করছে। তাঁর মনে ক্ষীণ আশা ছিল যেহেতু চোখে দেখতে পান না হীরু হয়ত একটা রিকশা ভাড়া করবে। অন্ধ বাপকে তো আর হাঁটিয়ে নেবে না।

হীরু রিকশার ধার দিয়েও গেল না। ঠেলেঠুলে এক বাসে তুলে ফেলল। সেই বাসে গাদাগাদি ভিড় — এর মধ্যেও বসার জায়গা করে ফেলল। জানালার পাশে বসেছে এমন একজন মানুষকে খুঁজে বের করল যাকে দেখে মনে হয় এর হৃদয়ে দয়ামায়া আছে, অনুরোধ করলে ফেলবে না। হীরু তার কাছে গিয়ে বিনয়ে প্রায় গলে গিয়ে বলল, ব্লাইন্ড পারসন নিয়ে এসেছি ভাই — জায়গা দিন। ব্লাইন্ড এবং সিক দুটাই একসঙ্গে। যায় যায় অবস্থা বলতে পারেন।

সঙ্গে সঙ্গে জায়গা হল। হীরু বলল, থ্যাংকস ভাই। মেনি থ্যাংকস। হীরুর কাছে মনে হল আজকের দিনটা খারাপ না। শুভ। পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে। সব দিন দেখা হয় না। লোকজনের ভিড় থাকে। কোনো কোনো দিন পীর সাহেব চিল্লায় বসেন। চিল্লা ব্যাপারটা কী সে জানে না। তবে তার ধারণা ব্যাপারটা খুবই জটিল কিছু। কারণ পীর সাহেব যেদিন চিল্লায় বসেন সেদিন তাঁর খাদেমরা ইশারায় কথা বলেন। তখন কোনো রকম শব্দ করা নিষিদ্ধ।

যা ভাবা গিয়েছিল তাই। যাওয়ামাত্র পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। যে কোনো কারণেই হোক আজ লোকজন একেবারেই নেই। পীর সাহেব বারান্দায় বিমর্ষমুখে একা একা বসে আছেন। অনেকটা দূরে দুজন বোরকা পরা মেয়ে। মেয়ে দুটি কাঁদছে। পীর সাহেব বললেন, খবর কি রে তোর?

হীরু বলল, আপনার দোয়া স্যার। আমি আমার ফাদারকে নিয়ে এসেছি। আপনার খুব ভক্ত।

পীর সাহেব নিস্পৃহ গলায় বললেন, ভাল করেছিস। খুব ভাল করেছিস।

ছোট ভাইয়ের ব্যাপারটাও স্যার একটু মনে করিয়ে দিতে আসলাম। খুবই চিন্তাযুক্ত আছি। বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।

পীর সাহেব বড় করে হাই তুললেন।

হীরু বাবার কানে কানে বলল, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? পা ছুঁয়ে সালাম কর। জালালুদ্দিন বিরক্ত গলায় বললেন-- পা দেখতেই পাচ্ছি না, সালাম করব কী?

হীরু পীর সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বলল বাবার চোখে একটা সমস্যা আছে স্যার। বলতে গেলে ব্লাইন্ড। একটু দয়া করে যদি দেখেন।

পীর সাহেব হীরুর দিকে না তাকিয়েই বললেন, চোখ ঠিক হয়ে যাবে। হীরু তার বাবার কানে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, এক কথায় ঝামেলা মিটিয়ে দিলাম। এখন বাড়িতে গিয়ে নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও। জালালুদ্দিন বিশেষ ভরসা পেলেন বলে মনে হল না। ফিসফিস করে বললেন, কাঁদছে কে রে? হীরু বলল, মেয়েছেলে কাঁদছে। ওরা কাঁদবেই। মেয়েছেলে মানেই কান্দন পার্টি।

## ৮

যাদের সঙ্গে তিথির সময় কাটাতে হয় তাদের কারোর চেহারাই তার মনে থাকে না। যেন স্বপ্নদৃশ্য। ঘুম ভাঙলে স্বপ্নদৃশ্যের কাঠামো মনে থাকে, কিন্তু যাদের নিয়ে দৃশ্য তাদের চেহারা মনে থাকে না।

তিথি হ্যান্ড ব্যাগ থেকে কার্ড বের করল। ইংরেজিতে লেখা কার্ড। তিনটা টেলিফোন নম্বর দেয়া। বেশ পয়সাওয়ালা মানুষ নিশ্চয়ই। লোকটির চেহারা মনে পড়ছে না লম্বা না বেঁটে, রোগা না মোটা কিছুই মনে নেই। তবে নার্ভাস ধরনের মানুষ ছিল এটা খুব মনে আছে। বারবার তার স্ত্রীর কথা বলছিল। স্ত্রীর নাম ফরিদা। বড় মেয়ে আজিমপুর গার্লস স্কুলে সেভেনে পড়ে তাও মনে আছে, কিন্তু লোকটির চেহারা মনে নেই। কার্ডে লেখা মোঃ দবিরউদ্দিন বিএ (অনার্স)। কারখানার ঠিকানা এবং বাসার ঠিকানা দুটোই দেয়া আছে। তিথি ঠিক করল বাসাতেই যাবে। এই সময় ভদ্রলোককে বাসাতেই পাওয়া যাবে। ন'টা এখনো বাজেনি। এত ভোরে। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কারখানায় চলে যাননি। তাছাড়া বাসায় যাবার অন্য একটা উদ্দেশ্যও আছে। অদৃশ্য চাপ সৃষ্টি করা। বাসায় গিয়ে তিথি যদি বলে, আপনি আমাকে একটা চাকরি দেবেন বলেছিলেন, তখন ভদ্রলোক হকচকিয়ে যাবেন। চেষ্টা করবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে বিদেয় করতে। তখন চাকরির প্রসঙ্গে ভদ্রলোক হয়ত বলবেন, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ব্যবস্থা করছি। তুমি কাল আমার অফিসে এসো।

তুমি করে নাও বলতে পারে। হয়ত আপনি করে বলবে। না চেনার ভানও করতে পারে। তবে এই লোক তা করবে না। এ নার্ভাস ধরনের ভীতু একজন লোক।। নার্ভাস এবং ভীতু মানুষ চট করে মিথ্যা বলতে পারে না। মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে, কিন্তু বলার সময় সত্যি কথাই বলে। সে যে ভুল করে সত্যি কথা বলছে তা নিজে শুরুতে বুঝতে পারে না। যখন বুঝতে পারে তখন সে আরো নার্ভাস হয়ে যায়। তিথি নিজের মনেই খানিকক্ষণ হাসল। কেন জানি তার খুব মজা লাগছে। যদিও মজা লাগার মত কিছু হয়নি।

বাসা খুঁজে পেতে দেরি হল না। দোতলা একটা বাড়ি। তিনতলার কাজ চলছে। বাড়ির সামনে ইট, সিমেন্ট, রড গাদাগাদি করে রাখা। ছ'সাত জন মিস্ত্রী কাজ করছে। চৌবাচ্চার মত একটা জায়গার চারপাশে গোল হয়ে বসে ইট পরিষ্কার করছে। ব্রাশ দিয়ে ইট ঘষে পানি ঢালছে। সেই ইট মাথায় করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দোতলার ছাদে। তিথি বলল, এটা কী দবির সাহেবের বাসা? ছুঁচালো দাড়ির এক মিস্ত্রী বিরক্ত মুখে বলল, জানি না কার বাসা। আফনে জিগান গিয়া। এই বলে সে নিচু গলায় আরো কী যেন বলল। কোন কুৎসিত ইঙ্গিত কিংবা কোনো অশ্লীল রসিকতা। কারণ সঙ্গী সবাই শব্দ করে হেসে উঠল। দু'জন আড়চোখে তাকাল তিথির দিকে। মেয়ে হয়ে জন্মানোর অনেক সমস্যা। কুৎসিত ইঙ্গিত রসিকতা সব সময় মেয়েদের নিয়েই করা হয়। পুরুষদের নিয়ে নয়।

তিথি ছুঁচালো দাড়ির মিস্ত্রীটির দিকে তাকিয়ে শীতল গলায় বলল, তুমি কী বললে? মিস্ত্রী এই প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিল না। সে আমতা আমতা করতে লাগল। তিথি বলল, তোমার দাড়ি ধরে তোমাকে আমি এই পানির মধ্যে চুবিয়ে ধরব বুঝতে পারছ?

মিস্ত্রীদের কেউ কোনো কথা বলল না। তারা ইট পরিষ্কারের ব্যাপারে এখন অতিরিক্ত মনোযোগী। ওদের একজন লজ্জিত গলায় বলল, কিছু মনে লইয়েন না আফা। এইডা দবির স্যারের বাসা। ডাইন দিকে যান।

তিথি এগিয়ে যাচ্ছে। দাড়িওয়ালা মিস্ত্রীটি কী বলেছিল কে জানে। তার জানতে ইচ্ছা করছে। অনেক কিছুই আমাদের জানতে ইচ্ছা করে, শেষ পর্যন্ত জানতে পারি না। এটা একদিক দিয়ে ভাল। সবচে সুখী মানুষ তারাই যারা সবচে কম জানে। এটা তিথির বাবা জালালুদ্দিন সাহেবের কথা। জালালুদ্দিন সাহেব এক সময় দার্শনিকের কথাবার্তা বলতেন। এখন বলেন না। তাঁর এখনকার সব কথা নিজের চোখ নিয়ে এবং খাদ্যদ্রব্য নিয়ে। আজও তিথি বেরুবার সময় অনেকক্ষণ বকবক করলেন।

একজন বড় চোখের ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে যা তো মা। বাঁ চোখটায় এখন আর কিছুই দেখতে পাই না। আগে কিছুটা দেখতাম. হীরুর পীরের কাছে যাওয়ার পর থেকে একেবারে সাড়ে সর্বনাশ। এই দেখ, ডান চোখ বন্ধ করে তোর দিকে তাকাচ্ছি। তোকে দেখছি না। কিছু না অন্ধকার। ঐ শালা পীরের কাছে কেন যে গেলাম।

ডানটা কী ঠিক আছে?

এখনো আছে আর কিন্তু বেশিদিন থাকবে না। একটা গেলে অন্যটা যায় এটাই নিয়ম। তিথি অন্যমনস্ক স্বরে বলল তুমি দেখি অনেক নিয়ম-কানুন জান। তার উত্তরে জালালুদ্দিন কিছু বলেননি। অদ্ভুত চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়েছেন। তিথি বলেছে সামনের সপ্তাহে একজন বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

দেরি হয়ে যাবে তো।

দেরি হলেও কিছু করার নেই। হাত খালি। ডাক্তার বিনা পয়সায় তোমাকে দেখবে না। নগদ একশ টাকা দিতে হবে। জালালুদ্দিন নিচু গলায় বললেন, আমার কাছে কিছু আছে।

তিথির জন্যে এই খবরটা অবাক হবার মত। রান্না হয়নি, খাওয়া-দাওয়া হয়নি এমন দিনও তাদের গেছে। জালালুদ্দিন শব্দ করেননি। শুকনো মুখে উপোস দিয়েছেন। অথচ তাঁর কাছে টাকা ছিল। তিথি বলল,

কত টাকা আছে?

তিনি জবাব দেননি। চোখ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একটা হাত একবার ডান চোখের সামনে ধরছেন একবার বাঁ চোখের সামনে। তিথি বলল, কত টাকা বল? আমি তো নিয়ে যাচ্ছি না।

আছে কিছু।

সেই কিছুটা কত?

এই ধর শ পাঁচেক।

এতগুলি টাকা নিয়ে ঘাপটি মেরে ছিলে? তুমি তো বেশ মজার মানুষ বাবা। দাও আমাকে একশ টাকা ধার দাও। ভয় নেই, ফিরিয়ে দেব। তিনি না-শোনার ভান করলেন। খাট থেকে নেমে হাতড়ে হাতড়ে রওনা হলেন বাথরুমের দিকে। তিথি বাড়ি থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত তিনি বেরুলেন না।

তের-চৌদ্দ বছরের রোগা একটা মেয়ে দরজা খুলে দিল। মেয়েটির চেহারা খুব মায়াকাড়া। ভারি কোমল চোখ। গোলাকার মুখ। যেন কেউ কাঁটা কম্পাস দিয়ে মুখ এঁকেছে। পাতলা ঠোঁট। এত পাতলা যে মনে হয় তীক্ষ্ণ চোখে তাকালে রক্ত চলাচল দেখা যাবে।

দবির সাহেবের বাসা?

জি।

উনি আছেন?

জি গোসল করছেন।

কে হন তোমার?

আমার বাবা।

আমি উনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বসুন। বাবা বের হলে বলব। উনার বের হতে অনেক দেরি হয়।

তোমার নাম কী?

অজন্তা।

বাহ খুব সুন্দর নাম তো।

আমার ভাল নামটা খুব খারাপ।

ভাল নাম কী?

অজন্তা কিছু বলল না। আগ্রহ নিয়ে সে তিথিকে দেখছে। মনে মনে বলছে, এই মেয়েটার গলার স্বর এত মিষ্টি কেন? শুধু শুনতে ইচ্ছা করে। তার একটু মন খারাপও হল। অজন্তার ধারণা তার গলার স্বরটা খুব বাজে। কর্কশ, কানে লাগে। এই জন্যে বাইরের মানুষের সামনে সে কথাবার্তা একেবারেই বলে না। তবু এই মহিলাটির সঙ্গে সে অনেক কথা বলে ফেলেছে। এখন মন খারাপ লাগছে। তার ধারণা এই মহিলা মনে মনে বলছেন অজন্তা মেয়েটা এত সুন্দর কিন্তু তার গলার স্বর এরকম কাকের মত কেন? তিথি বলল,

তোমার আজ স্কুল নেই অজন্তা?

উঁহু।

কিসের ছুটি?

এসএসসি পরীক্ষার ছুটি। আমাদের স্কুলে সিট পড়েছে।

তুমি ক্লাস সেভেনে পড়, তাই না?

অজন্তা অবাক হয়ে বলল, কি করে বুঝলেন? তিথি হাসিমুখে বলল, চেহারা দেখে আমি অনেক কিছু বলতে পারি। এখন দেখ তোমার বাবা বের হয়েছেন কী না।

বের হননি।

কী করে বুঝলে?

বাথরুমের দরজা খুলেই তিনি আমাকে ডাকেন লেবুর শরবত দেবার জন্যে। গোসল শেষ করে তিনি এক গ্লাস লেবুর শরবত খান। ভিটামিন সি আছে শরবতে। বেশি করে ভিটামিন সি খেলে মাথায় চুল ওঠে।

তিথি হেসে ফেলল। অজন্তা সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল। নিজের ওপর তার খুব রাগ লাগছে। কাকের মত গলায় সে এতক্ষণ ধরে কথা বলেছে। কী লজ্জা জিভটা কেটে ফেলতে পারলে বেশ হত। ভেতর থেকে ভারী গলা ভেসে এল অজু, মা অজু। অজন্তা মুখ কালো করে বলল, বাবা আমাকে আদর করে অজু ডাকেন। কী বিশ্রী যে লাগে শুনতে। দবির সাহেব খালি গায়ে, কাঁধে শুধু একটা ভেজা গামছা জড়িয়ে বসার ঘরে ঢুকেই পাথরের মূর্তির মত হয়ে গেলেন। তিথি উঠে দাঁড়াল। তিনি ভাঙা গলায় বললেন বস। বস। তিথি বলল, আপনি কী আমাকে চিনতে পারছেন...

হুঁ।

আমার নাম মনে আছে আপনার?

না, নাম মনে নাই। আমার কোনো মানুষের নাম মনে থাকে না। চেহারা মনে থাকে। একবার কাউকে দেখলে সারা জীবন মনে থাকে। তুমি বস, আমি একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আসি।

আমি কী আপনাকে কোনো অস্বস্তিতে ফেলেছি।

হুঁ, তা তা তা কিছুটা... কী জন্যে এসেছ?

আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।

আমি, আমি আসতে বলেছিলাম? বল কী!

একটা কার্ড দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই ঠিকানা পেলাম।

ও আচ্ছা আচ্ছা।

বলেছিলেন আমাকে একটা চাকরি জোগাড় করে দেবেন।

চাকরি? চাকরি আমি কোথায় পাব?

তা তো জানি না। আপনি আমাকে আসতে বলেছিলেন, তাই এসেছি। চলে যেতে বললে চলে যাব।

না না বস। একটু বস। চা খাও। আমি একটা শার্ট গায়ে দিয়ে আসছি। ঘরে কোনো কাজের লোক নেই। চারজন ছিল। গত সোমবার একসঙ্গে চারজনকে বরখাস্ত করেছি। ছাব্বিশ ইঞ্চি একটা কালার টিভি চুরি হয়েছে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ছাড়া সেটা সম্ভব না। আমার ধারণা, ওরা ধরাধরি করে টিভিটা চোরের রিকশায় তুলে দিয়ে এসেছে। আই অ্যাম পজিটিভ।

দবির উদ্দিন শার্ট গায়ে দেবার জন্যে দোতলায় চলে গেলেন। তাঁর ঘর তাঁর স্ত্রী ফরিদার ঘরের পাশে। এক সময় তারা দুজন এক খাটে ঘুমুতেন। এখন তা সম্ভব না। ফরিদার গায়ে একটু হাত রাখলে সে ব্যথায় নীল হয়ে যায়। দীর্ঘদিন বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে তার পিঠে দগদগে ঘা

হয়েছে। সেখান থেকে কটু গন্ধ আসে। দবির উদ্দিন সেই গন্ধ সহ্য করতে পারে না। সমস্ত শরীর পাঁক দিয়ে ওঠে। মনে হয় বমি করে ফেলবেন। বহু কষ্টে বমির চাপ সামলাতে হয়। সামলাতে না পারলে খুব খারাপ ব্যাপার হবে। ফরিদা মনের কষ্টেই মরে যাবে।

দবির উদ্দিন ফরিদার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়ালেন। সকাল বেলার এই সময়টায় সে আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে থাকে। কিছু জিজ্ঞেস করলে কথা বলে না। তাকায় না পর্যন্ত। কথা বলতে শুরু করে বিকেলের দিকে। আজ অন্য রকম হল। ফরিদা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকলেন  এই শোন। দবির উদ্দিন ঘরে ঢুকলেন। দরজার ও-পাশ থেকে বললেন  কী?

ঐ মেয়েটা কে?

কোন মেয়েটা?

ফরিদা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যার সঙ্গে এতক্ষণ কথা বললে। দবির উদ্দিন ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন। ফরিদা বললেন, মেয়েটাকে আমার এখানে একটু আসতে বল। আমি কথা বলব।

তিথি অনেকক্ষণ কিছু দেখতেই পেল না। জানালা ভারী পর্দায় ঢাকা। ঘরের তিনটি দরজার দুটোই বন্ধ। যেটা খোলা, সেখানেও জানালার মতই ভারী পর্দা। অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার আগেই তিথি শুনল কেউ একজন তীক্ষ্ণ গলায় বলছে, ভেতরে এসে দাঁড়াও। পর্দা ধরে দাঁড়িও না। পর্দার কাঠ আলগা হয়ে আছে, মাথার উপর পড়বে।

তিথি খানিকটা এগুলো। এগুতেও ভয় লাগছে। কোনো কিছুর সঙ্গে হয়ত ধাক্কা লাগবে।

তোমার বাঁ দিকে চেয়ার আছে, তুমি চেয়ারে বস।

সে বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। চোখে অন্ধকার সয়ে গেছে। ঘর দেখা যাচ্ছে। পুরনো আমলের পালংক দেখা যাচ্ছে। পালংকে শুয়ে থাকা মহিলাকে দেখা যাচ্ছে। খুব রুগ্ন মানুষকে আমরা কংকাল বলি। এই মহিলাটি তাও নয়। তার কংকালও যেন শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। হাঁটু পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। মাথার উপর শ্লথগতিতে একটা ফ্যান ঘুরছে। ঘরের ভেতর চাপা এক ধরনের গন্ধ।

বসতে বললাম, বসছ না কেন?

তিথি বসল। তাকিয়ে রইল দেয়ালের দিকে। ফরিদা বললেন, চেয়ারটা ঘুরিয়ে বস। তোমার মুখ দেখতে পারছি না। তিথি চেয়ার ঘুরিয়ে বসল।

তোমার চেহারা তো বেশ সুন্দর। বেশ্যাদের এত সুন্দর চেহারা থাকে জানতাম না। আমি শুনেছি ওদের শরীর ভাল থাকে, চেহারা ভাল থাকে না। তিথি তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না।

তোমাকে বেশ্যা বলায় রাগ করলে নাকি? ও আমাকে তোমার বিষয়ে বলেছে। ও আমাকে সব কিছু বলে। কোনো কিছু লুকিয়ে রাখতে পারে না।

আপনি মনে হচ্ছে খুব ভাগ্যবতী।

ঠাট্টা করলে নাকি?

তিথি কিছু বলল না। ফরিদা বললেন, আমি অবশ্যি শুনেছি তোমার মত মেয়েরা খুব ঠাট্টা-তামাশা করতে পারে।

আমাদের সম্পর্কে এত খবর জানলেন কী ভাবে?

ইচ্ছা করলেই জানা যায়। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে জেনেছি।

তিথি বলল, আপনার কথা কী শেষ হয়েছে  আমি এখন উঠব?

না বস। আরো খানিকক্ষণ বস। তোমার কাজের ক্ষতি হলেও বস, আমি পুষিয়ে দেব।

কীভাবে পুষিয়ে দেবেন? ঘণ্টা হিসেবে টাকা দেবেন?

হ্যাঁ দেব। তুমি বস। চা খেয়েছ তুমি? চা দিয়েছে?

না দেয়নি। চা খেলে আপনার কাপ নোংরা হয়ে যাবে না?

হবে। আমার এত শুচিবায়ু নেই। আচ্ছা তুমি বল ও তোমার সঙ্গে কী কী করেছিল?

আপনার স্বামী আমার সঙ্গে কী কী করেছিল তা শুনতে চান?

হুঁ।

উনি আপনাকে কিছু বলেননি?

বলেছে। তবু তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই। তুমি বল। আমি তোমাকে টাকা দেব।

এটা বলার জন্যে আপনি আমাকে টাকা দেবেন?

হ্যাঁ দেব। ও ভীষণ লাজুক। ওর মত লাজুক একটা মানুষ তোমার মত সুন্দরী একটা মানুষ নিয়ে কী করল তাই জানতে চাই।

আপনিও তো এক সময় সুন্দরী ছিলেন। আপনাকে নিয়ে উনি কী কী করেছিলেন?

আমি আর তুমি এক হলাম?

এক না? আমাদের দুজনের শরীরই তো এক রকম? তাই নয় কী?

তুমি খুবই ফাজিল একটা মেয়ে।

আমার মত মেয়েরা ফাজিলও হয় এই খবরটা বোধ হয় আপনি জানেন না। অন্য মেয়েদের সঙ্গে আমরা খুব ফাজলামী করি আবার ছেলেদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার। এখান থেকে যাবার সময় আমি করব কী জানেন? আপনার মুখে থুথু দিয়ে যাব। আপনার শরীরের যে অবস্থা আপনি আমার সেই থুথু মুখে মেখে শুয়ে থাকা ছাড়া কিছু করতে পারবেন না।

খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার ফরিদা এই কথায় রাগ করলেন না, বরং তার মুখের রেখাগুলি কোমল হয়ে গেল। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, তোমার নাম কী?

আমার দশটা নাম আছে। কোনটা আপনাকে বলব?

সত্যি নামটা বল।

সত্যি নাম আমার নেই। আমার সবই নকল নাম।

তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ। আমি খুবই অসুস্থ একজন মানুষ। আর অল্প কিছু দিন বেঁচে আছি। এরকম একজন মানুষের ওপর রাগ করা ঠিক না।

আপনার মত রোগীরা সহজে মরে না। আপনি দীর্ঘদিন বাঁচবেন। এই বাড়ির প্রতিটি মানুষের হাড় ভাজা ভাজা করবেন। এই বাড়ির প্রতিটি মানুষ একদিন মনে মনে আপনার মৃত্যু কামনা করবে - তবু আপনি মরবেন না।

ফরিদা বললেন, তুমি সত্যি কথাই বলেছ। তুমি আমার আরো কাছে আস তো তোমাকে ভাল করে দেখি। জানালার একটা পর্দাও সরিয়ে দাও। ঘর বেশি অন্ধকার হয়ে আছে। আজ এত অন্ধকার কেন বল তো? ঝড়বৃষ্টি হবে নাকি? আকাশে কী মেঘ আছে? তিথি একটি প্রশ্নের জবাবও দিল না। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, যাই। ফরিদা বললেন, থুথু দিয়ে গেলে না? তিথি তার জবাব না দিয়ে নিচে নেমে গেল। দবির উদ্দিন বারান্দায় মেয়ের মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। তিথি তাদের পাশ দিয়ে হেঁটে উঠোনে নামল। দবির উদ্দিন শংকিত চোখে তাকিয়ে রইলেন কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। অজন্তা বাবাকে জিজ্ঞেস করল, এই মেয়েটা কে বাবা? দবির উদ্দিন মেয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। কিছু একটা বলতে গেলেন, গলা দিয়ে শব্দ বের হল না। গলার মধ্যে আটকে গেল।

## ৯

টুকু অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতেই পারল না সে কোথায় আছে। অন্ধকার এবং অপরিচিত একটা ঘর। সে শুয়ে আছে মেঝেতে। তার গায়ে দুর্গন্ধ মোটা একটা কাঁথা। সে শুনল ইনিয়ে-বিনিয়ে অল্প বয়েসী একটা বাচ্চা কাঁদছে। কান্নার শব্দ শুনতে শুনতে টুকু চোখ বন্ধ করল। এই মুহূর্তে সে কিছু ভাবতে চায় না। ঘুমুতে চায়। আরামে তার শরীর অল্প অল্প কাঁপছে। ঘুম এত আরামের হয় সে আগে কখনো ভাবেনি। এখানে সে কী ভাবে এল? নিজে নিজে নিশ্চয়ই আসেনি। কেউ এসে দিয়ে গেছে। কতদিন আগে দিয়ে গেছে? একদিন দু'দিন না সাত দিন? বাড়ি থেকে যেদিন সে বের হল সেদিন কী বার ছিল? সোমবার না মঙ্গলবার? এটা কোন কাল? শীত না গ্রীষ্ম? কিছুই মনে পড়ছে না।

গায়ের উপর রাখা মোটা কাঁথা থেকে দুর্গন্ধ আসছে। ঘুমের মধ্যেও সেই দুর্গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। আরো যেন বেশি পাওয়া যাচ্ছে। পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে। বমি বমি লাগছে।

টুকু দ্বিতীয়বার চোখ মেলল। সঙ্গে সঙ্গে মোটা একটা গলা শোনা গেল নাম কী তোর? এই নাম কী রে?

টুকু জবাব দিল না। জবাব দেবার আগে লোকটাকে দেখতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু লোকটা বসেছে এমনভাবে যে তাকে দেখতে হলে মাথা ঘুরিয়ে তাকাতে হয়। মাথা ঘুরাতে ইচ্ছা করছে না।

এই পোলা, এই! কিছু খাবি? খাবি? কথা কস না ক্যান? বোবা নাহি। এই এই।

টুকু কথা না বলাই ভাল বিবেচনা করল। কথা বলতে শুরু করলেই এরা অসংখ্য প্রশ্ন করবে।

বাড়ি কোথায়? বাবার নাম কী? থাক কোথায়? পড়াশোনা কর? কী হয়েছে তোমার?

এরচে এই যে চুপচাপ পড়ে আছে এটা কী ভাল না? টুকু আগ্রহ করে আশপাশের জীবনযাত্রা দেখছে। যে লোকটি তার সঙ্গে কথা বলছে তার চোহারা সে এখনো দেখেনি। তার কথা শুনে মনে হচ্ছে বুড়ো কেউ হবে। কথার সঙ্গে সঙ্গে সে খুব কাশছে।

এই পোলা, ভুখ লাগছে? কিছু খাবি? ও মতির মা, এই পুলারে খাওন দেও।

মতির মা ঘরে ঢুকল। হাতে এলুমিনিয়ামের বাটি এবং চামচ। বাটিতে তরল সবুজ রঙের কি একটা জিনিস। মতির মা'র পরনে গাঢ় সবুজ রঙের একটা শাড়ি। বয়সও খুব কম। একে দেখে মনে হয় না মতি বলে তার কোনো ছেলে আছে।

মতির মা, এই পুলার জবান বন্ধ। তার মুখে তুইল্যা চাইরডা খাওয়াইয়া দাও।

মতির মা চামচে করে সবুজ রঙের ঐ জিনিস টুকুর মুখের কাছে ধরল। মতির মা'র মুখ ভাবলেশহীন। এই ছেলে কিছু খাক না খাক তাতে তার কিছু যায় আসে না। টুকু আগ্রহ করে খেল। জিনিসটা খেতে ভাল। টকটক এবং প্রচণ্ড ঝাল। মতির মা যতবার চামচটা মুখের কাছে ধরছে ততবারই তার হাতের চুড়ি টুনটুন করে বাজছে। মেয়েটির হাত ভর্তি গাঢ় লাল রঙের চুড়ি। সবুজ শাড়ি পরা একটি মেয়ের যদি হাত ভর্তি লাল চুড়ি থাকে তাহলে দেখতে অন্য রকম লাগে।

বুড়ো কাশতে কাশতে ডাকল,

ও মতির মা।

কী?

এই পুলার তো জবান বন্ধ। তারে ঘরে আইন্যা তো দেহি আরেক বিপদে পড়লাম।

ফালাইয়া দিয়া আহ।

পুলার গায়ে জ্বর আছে কি-না দেহ দেহি।

মতির মা টুকুর গায়ে হাত না দিয়েই বলল, জ্বর নাই।

আর একটা দিন দেখি তারপরে যেখান থাইক্যা আনছি হেইখানে ফালাইয়া থুইয়া আসমু।

যা ইচ্ছা কর।

টুকু আগ্রহ করে চারদিকে লক্ষ্য করছে। এটা নিশ্চয়ই বস্তির কোনো-একটা ঘর। চৌকি-টৌকির কোনো ব্যবহার নেই। ঘরের এ-মাথা ও-মাথা পর্যন্ত চাটাই বিছানো। যখন যার ইচ্ছা এসে খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে যাচ্ছে। রান্না এবং খাওয়ার ব্যবস্থা বারান্দায়। বিরাট একটা হাঁড়িতে কি যেন রান্না হয়েছে। বাড়ির লোকজন নিজের নিজের ইচ্ছামত খেয়ে চলে যাচ্ছে। এই পরিবারের লোক ক'জন টুকু ধরতে চেষ্টা করল। পারল না। মনে হচ্ছে অনেকগুলি মানুষ। এতগুলি মানুষের মেঝেতে ঘুমুবার জায়গা হয় কী করে জানে? এর মধ্যে একটি মেয়ের মনে হয় নতুন বিয়ে হয়েছে। সবাই তাকে নয়া বৌ নয়া বৌ বলছে। মেয়েটা বেশ সেজেগুজে আছে।

বিকেলের দিকে টুকু উঠে বসল। ঘোর বর্ষা। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নেমেছে। এই ঘরে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়ছে না - এই আনন্দেই বাড়ির মানুষগুলি উল্লসিত। আধবুড়ো একটা লোক বারবার বলছে - পলিথিনের কাগজ দিয়ে কেমুন মেরামত করালাম দেখছ? পঁচিশ টাকা খরচ হইছে কিন্তু আরাম হইছে কত টেকার? পঁচিশ হাজার টেকার আরাম।

নয়া বৌ এই কথায় খিলখিল করে হাসল। বুড়ো টুকুর দিকে তাকিয়ে বলল, শইলডা এখন কেমন লাগে?

টুকু কিছু বলল না। ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে রইল।

পেশাব-পায়খানা করবি নাকি? এই পুলা?

টুকু তাকিয়ে রইল। চোখের পলক ফেলল না।

বুড়ো দুঃখিত মুখে বলল, আহা জবানডা বন্ধ। ঐ পুলা থাক শুইয়া থাক।

টুকু সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। কে তাকে এখানে এনেছে তা জানতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে না। কেউ তাকে কিছু বলছেও না। জবান বন্ধ অবস্থায় থাকার খুব মজা আছে।

নয়া বৌ-এর স্বামী শ্যামলী সিনেমা হলের গেট ম্যান। সে বাড়ি ফিরল রাত বারটায়। টুকুকে দেখে বলল, হারামজাদা এখনো আছে?

বুড়ো বলল, গাইলমন্দ করিস না। এই পুলার জবান বন্ধ। গুংগা পুলা। লোকটি বাড়ি ঢুকেই

শাড়ি টানিয়ে ঘরের কোণায় পর্দা ঘেরা একটা জায়গা তৈরি করে ফেলল। এই ঘরের ছোট ক'টা বাচ্চা ছাড়া সবাই প্রায় জেগে আছে। সে এই সব অগ্রাহ্য করে পর্দা ঘেরা জায়গায় চলে গেল।

পর্দার ভেতরে একটা কুপি জ্বলছে বলে এদের দুজনের কালো ছবি পর্দায় পড়ছে। এরা কি করছে না করছে সব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। বাড়ির অন্যান্যদের সঙ্গে টুকুও খুব আগ্রহ নিয়ে পর্দার দিকে তাকিয়ে আছে। সমস্ত ব্যাপারটা তার এত অদ্ভুত লাগছে।

পুরো ব্যাপারটা অবশ্যি দেখা গেল না। বুড়ো বিরক্ত গলায় বলল, ঐ হারামজাদা পুলা। বাতি নিভা। তাড়াতাড়ি বাতি নিভা।

বাতি নিভে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। অপূর্ব ছায়াছবির শেষটা দেখা গেল না বলে টুকুর মনটাই খারাপ হয়ে গেল। সারা রাত বৃষ্টি হল। তুমুল বৃষ্টি। ঘরের দরজা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে। তাতে কারো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। টুকুর ঘুম আসছে না। তার চমৎকার লাগছে। মজার মজার সব চিন্তা মাথায় আসছে। সেই সব চিন্তার একটা হচ্ছে এটা যেন বস্তির কোনো ঘর না। এটা হচ্ছে সমুদ্রগামী জাহাজ। ঝড়ে এই জাহাজের কলকব্জা নষ্ট হয়ে গেছে, জাহাজ ভেসে যাচ্ছে নিরুদ্দেশের পথে। জাহাজের যাত্রীরা সবাই মরণাপন্ন ; কারণ জাহাজে খাদ্য নেই, পানি নেই। জাহাজের তলানীতে একটা ফুটো হয়েছে। সেই ফুটো দিয়ে কলকল করে পানি আসছে। ফুটো বন্ধ করার চেষ্টা করেও লাভ হয়নি। এখন সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। দুলতে দুলতে জাহাজ এগুচ্ছে।

টুকু সত্যি সত্যি এক ধরনের দুলুনি অনুভব করতে করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। আকাশ খানিকটা আলো হয়েছে। মেঘ নেই। বৃষ্টি ভেজা টাটকা একটা দিন। টুকু সাবধানে ঘুমন্ত মানুষদের ডিঙিয়ে ঘর থেকে বেরুল। হাঁটা শুরু করল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না।

একটা সময় আছে যখন আমাদের পেছন ফিরতে ইচ্ছা করে না।

## ১০

পীর সাহেব বলেছিলেন টুকু সাতদিনের মাথায় ফিরে আসবে। কিন্তু সত্যিই যে সাতদিনের মাথায় টুকু এসে উপস্থিত হবে এই বিশ্বাস হীরুর ছিল না। কাজেই ভোর বেলা দরজা খুলে টুকুকে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে সে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে। মনে মনে দু'বার বলল, এ ভেরি গ্রেট পীর সাহেব। এ ভেরি গ্রেট পীর সাহেব।

মুখে সে অবশ্যি রাগ এবং বিরক্তির ভঙ্গি ফুটিয়ে বলল, টুকু নাকি? একি চেহারা হয়েছে। তুই তো দেখি কংকাল হয়ে গেছিস। স্কেলিটন। শরীরে তো হাড্ডি ছাড়া কিছু দেখছি না। ছিলি কোথায়?

টুকু জবাব দিল না। কথা না-বলা তার অভ্যাস হয়ে গেছে।

হীরু বলল, বাসার সবাই একটা গ্রেট চিন্তার মধ্যে ছিল ; আমি অবশ্যি চিন্তা করছিলাম না। পীর সাহেব চিন্তা করতে নিষেধ করেছিলেন। কলতা বাজারের পীর। তোকে একদিন নিয়ে যাব। হেভি পাওয়ার লোকটার। আমার ধারণা শ' খানেক জ্বীন তাঁর হাতে আছে। বেশিও হতে পারে।

টুকুকে ফিরতে দেখে বাসার কেউ কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না। মিনু একটি কথাও বললেন না। সকালে খিচুড়ি নাশতা হল। সেই খিচুড়ির এক থালা টুকুর সামনে রেখে তিনি কঠিন গলায় বললেন খা। খেয়ে আমাকে উদ্ধার কর। টুকুর সঙ্গে এই হল তাঁর প্রথম কথা।

তিথি ভাইকে দেখল কিন্তু কিছু বলল না, হাসল। সেই হাসি চিন্তা দূর হবার হাসি। যা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয় টুকু ফিরে আসায় সে খুশি হয়েছে।

জালালুদ্দিন রাগী গলায় খানিকক্ষণ বকাঝকা করলেন। বকাঝকার ফাঁকে ফাঁকে উপদেশ দিলেন বাড়ি পালানো হচ্ছে একটা অসুখ। সব অসুখের চিকিৎসা আছে কিন্তু বাড়ি পালানো অসুখ এবং ক্যানসার এই দুয়ের কোনো চিকিৎসা নেই। একবার যার বাড়ি পালানো রোগ হয়েছে সে দু'দিন পর পর পালাবে। এটা জানা কথা।

তিনি বেশিক্ষণ উপদেশ দিতে পারলেন না। তাঁর প্লেটের খিচুড়ি শেষ হয়ে গেছে। শূন্য থালা সামনে নিয়ে কথা বলতে তাঁর ভাল লাগে না। তিনি নিচু গলায় বললেন, ও মিনু খিচুড়িটা তো আসাধারণ হয়েছে। আতপ চাল ছিল তাই না? আতপ চাল ছাড়া এই জিনিস হয় না। আছে নাকি আরো?

মিনু বললেন    না।

এক হাতা দাও দেখি। মুখের ক্ষিধেটা যাচ্ছে না। পেট অবশ্যি ভর্তি। তবু মুখের ক্ষিধের ব্যাপার আছে।

বললাম তো নাই।

ও আচ্ছা, ঠিক আছে। না থাকলে কী আর করা। আজ দুপুরেও খিচুড়ি করলে কেমন হয়? আতপ চাল কী আরো আছে?

চুপ কর তো। খাওয়া, খাওয়া আর খাওয়া। খাওয়া ছাড়াও তো আরো জিনিস আছে।

সেই জিনিসটা কী?

চুপ কর।

জালালুদ্দিন চুপ করতে পারলেন না। টুকুকে আবার উপদেশ দিতে শুরু করলেন    বুঝলি টুকু, ঘর হচ্ছে মানুষের মা। শিশু থাকে মায়ের পেটের ভেতর। আমরা থাকি ঘরের পেটের ভেতর। সেই জন্যে ঘর হচ্ছে আমাদের মা। ঘর থেকে পালান মা'কে অপমান করা। এই কাজ খবরদার করবি না। মায়ের পেট থেকে যে বের হয়ে যায় সে আর মায়ের পেটে ঢুকতে পারে না। তেমনি ঘর থেকে যে বের হয়ে যায় সে আর ঘরে ঢুকতে পারে না। বুঝলি?

টুকু মাথা নাড়ল। যেন সে এই জটিল ফিলসফি বুঝে ফেলেছে। তার মাথা নাড়া জালালুদ্দিন দেখতে পেলেন না তবে টুকু যখন নিজের থালার খিচুড়ি বাবার থালায় ঢেলে দিল তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। চিকন গলায় বললেন, তুই খাবি না?

না।

না কেন? জিনিসটা তো ভাল হয়েছে।

ক্ষিধে নেই।

এইটুকু খিচুড়ি খেতে ক্ষিধে লাগে নাকি? এ তো দেখি পাগলের প্রলাপ। ও মিনু একটা শুকনো মরিচ পুড়িয়ে এনে দাও তো।

টুকু বসে বসে বাবার খাওয়া দেখল। তার বড় ভাল লাগল। দুপুরে গেল বজলু ভাইয়ের খোঁজে।

বজলু তাকে দেকে আঁৎকে উঠে বলল, কী সর্বনাশ তোর একি অবস্থা! কোথায় ছিলি? টুকু সহজ গলায় বলল,

এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বেড়াতে যাবি, বলে যাবি না? তোর বড় ভাইকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম – টুকু কোথায়? সে বলল, আমি কী করে বলব কোথায়? আমি কী ডিটেকটিভ? কী কথার কী উত্তর। তা তোর স্বাস্থ্যের এই অবস্থা কেন?

জ্বর হয়েছিল।

কাজের সময় জ্বরজ্বারি বাঁধিয়ে দিস, আশ্চর্য। তোর জন্যে শ্রাবণ সংখ্যা দেয়াল পত্রিকা বের হল না। শিল্প-সাহিত্য এইসব তো ছেলেখেলা না। একদিন করবি দশদিন করবি না তা তো হবে না। কমিটমেন্ট দরকার।

দুপুর থেকেই টুকু কাজে লেগে গেল। এবারে শ্রাবণ সংখ্যা দেয়াল পত্রিকা নতুন আঙ্গিকে বেরুচ্ছে। পুরো দেয়াল পত্রিকা পলিথিনের কাগজে মুড়ে বৃষ্টির মধ্যে রেখে দেয়া হবে। শ্রাবণ সংখ্যা পড়তে হলে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে পড়তে হবে। এই অসাধারণ আইডিয়া বজলুর মাথাতে এসেছে। এরকম আইডিয়া তার প্রায়ই আসে।

সন্ধ্যা না মেলানো পর্যন্ত টুকু দেয়াল পত্রিকার কাজ করল। সন্ধ্যা মেলাবার পরপর কাউকে কিছু না বলে চলে গেল বস্তির ঐ ঘরে।

বুড়ো লোকটি বারান্দায় বসে কাঠের চেয়ারে বেতের কাজ করছিল সে টুকুকে দেখে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল – ও মতির মা, ও মতির মা! ঐ পুলা আবার আসছে। জবান বন্ধ পুলা। ঐ হারামজাদা তুই কৈ গেছিলি? আমরা চিন্তায় চিন্তায় অস্থির! ঐ পুলা দেহি এদিকে আয়।

শুধু মতির মা না, ঘরের সবাই বের হয়ে এল। টুকু এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন সে কিছুই বুঝতে পারছে না। মতির মা বলল, নয়া বৌ এই পুলাডার খাওন দাও। এ না খাইয়া সারাদিন কই কই যেন ঘুরছে।

নতুন বৌ তৎক্ষণাৎ ভাত বেড়ে ফেলল। ভাত এবং ডাঁটা দিয়ে রান্না করা ছোট মাছের তরকারি। তরকারিতে এমন ঝাল দেয়া হয়েছে যে মুখে দিলেই চোখে পানি এসে যায়। টুকু সেই আগুন ঝাল তরকারি তৃপ্তি করে খেল। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। তার ঘুমের জন্যে জায়গাও করে দেয়া হয়েছে। তবে সে ঘুমুচ্ছে না, অনেক কষ্টে জেগে আছে। তার এখানে আসার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে - শাড়ি দিয়ে ঘেরা অংশে নতুন বৌ এবং তার স্বামীর অভিনীত অংশটা দেখা। টুকু মনে মনে আশা করছে আজো যেন কুপী নিভাতে ওরা ভুলে যায়।

## ১১

হীরু বলল, মনটা খুবই ব্যাড হয়ে আছে।

এ্যানা হেসে ফেলল।

হীরু রাগী গলায় বলল, হাসলে কেন?

আপনি বললেন মনটা খুব ব্যাড হয়ে আছে — এই শুনে হাসলাম। বললেই হয় মনটা খারাপ হয়ে আছে।

হীরু গম্ভীর হয়ে গেল। এই মেয়ে ইদানীং উল্টাপাল্টা কথা বলে তাকে কষ্ট দিচ্ছে। অবশ্যি এটাই মেয়েদের নেচার। কোনো না কোনো ভাবে মানুষকে কষ্ট দেয়া।

ওরা দুজনে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের দেখা হয়ে গেছে কাকতালীয় ভাবে। হীরু যাচ্ছিল পীর সাহেবের কাছে। বাস স্টপে এসে দেখে — এ্যানা। চার-পাঁচদিন চেষ্টা করেও তার সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। পরশু দিন তো প্রায় গোটা দিন এ্যানাদের বাসার সামনে হাঁটাহাঁটি করে কাটাল। লাভ হল না।

আর আজ কি-না দেখা হয়ে গেল বাস স্টপে। একি যোগাযোগ। সে মধুর স্বরে বলল, যাচ্ছ কোথায় এ্যানা?

যাত্রাবাড়িতে। আমার ছোট চাচার বাড়িতে।

যাত্রাবাড়িতে যাচ্ছ? বল কী! আমিও তো ঐ দিকে যাচ্ছি। আমার এক ফ্রেন্ডের বাসা। ক্লোজ ফ্রেন্ড। জন্ডিস হয়ে পড়ে আছে। খবর পাঠিয়েছে যাবার জন্যে। মেইন রোডে বাসা।

এ্যানা হেসে ফেলল।

হীরু বলল, হাসলে কেন?

আপনি যে সারাক্ষণ মিথ্যা কথা বলেন এই জন্যে হাসলাম।

কী মিথ্যা বললাম?

যাত্রাবাড়িতে বন্ধুর কাছে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরো মিথ্যা। আমি যদি বলতাম, আমি বাসাবো যাচ্ছি, তাহলে আপনি বলতেন আপনিও বাসাবো যাবেন। আপনার এক বন্ধু আছে বাসাবোতে। তার জন্ডিস। এখন-তখন অবস্থা।

হীরু এ্যানার বুদ্ধি দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। একটু মন খারাপও হল। এরকম একটা বুদ্ধিমতী মেয়েকে বিয়ে করে শেষে কোন যন্ত্রণা হয় কে জানে। বিয়ে না করেও তো উপায় নেই। প্রেম যখন হয়ে গেছে।

বাসগুলিতে অসম্ভব ভিড়।

পরপর দুটা বাস মিস হল — চেষ্টা করেও তারা উঠতে পারল না। হীরুর খুব ইচ্ছা একটা রিকশা নিয়ে দুজনে চলে যায়। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। তার ওপর আছে এ্যানার গা ঘেঁষে বসার আনন্দ। সমস্যা হচ্ছে তার কাছে আছে মাত্র দশটা টাকা। সত্তর টাকা ছিল। পীর সাহেবের জন্যে এক প্যাকেট বেনসন কিনতে গিয়ে ষাট টাকা বের হয়ে গেল। অবশ্যি কোনো-একটা দোকানে বেনসনের প্যাকেট বেচে দেয়া যায়। চল্লিশ টাকা বললে ওরা লুফে নেবে।

এ্যানা।

কী।

চল একটা রিকশা নিয়ে নেই। এক দানে যাওয়া যাবে না। ভেঙে ভেঙে যেতে হবে। এখান থেকে নিউ মার্কেট। নিউ মার্কেট থেকে গুলিস্তান — তারপর গুলিস্তান থেকে যাত্রাবাড়ি।

হীরুকে অবাক করে দিয়ে এ্যানা বলল, রিকশা নিয়ে নিন।

সত্যি বলছ? ট্রুথ?

হুঁ, সত্যি।

রিকশা নেবার আগে হীরু বেনসনের প্যাকেট বিক্রি করল পঁয়তাল্লিশ টাকায়। তার মনে একটু খচখচানি রইল পীর সাহেবের জন্যে কেনা জিনিস বিক্রি করা ঠিক হল না।

রিকশায় উঠে সেই খচখচানি দূর হয়ে গেল। এত ভাল লাগল এ্যানাকে পাশে নিয়ে বসতে। এ্যানা একটা হাত রেখেছে হীরুর ডান পায়ের উপরে। একটা মেয়ে তার হাত রেখেছে হীরুর হাঁটুতে এতেই এত আনন্দ হচ্ছে কেন? হীরুর চোখে পানি এসে যাচ্ছে। হীরু বলল, মনটা খুব খারাপ এ্যানা। খুবই খারাপ।

কেন?

টুকুকে পাওয়া যাচ্ছে না।

টুকু আবার কে?

আমার ইয়ংগার ব্রাদার।

সে তো অনেক আগেই গেছে।

এসেছিল। সকালে এসে সারাদিন থাকল সন্ধ্যাবেলা আবার গন।

কোথায় গেছে?

জানি না কোথায়। পীর সাহেবের কাছে যাব। দেখি উনি কী বলেন।

কিছু-একটা হলেই আপনি পীর সাহেবের কাছে চলে যান, তাই না?

সাংঘাতিক পাওয়ার উনার। তোমাকে একদিন নিয়ে যাব।

পীর সাহেবের কাছে যাবার আমার কোনো সখ নেই। পীর আবার কী? শুধু টাকা নেওয়ার ফন্দি।

তওবা কর এ্যানা, এক্ষুণি তওবা কর। ইমিডিয়েট।

চুপ করুন তো। আমি তওবা-টওবা করতে পারব না।

তওবা না করলে আমি কিন্তু নেমে যাব।

এ্যানা বলল, নেমে যান। আপনাকে কে আটকাচ্ছে। আমি কী দড়ি দিয়ে আপনাকে বেঁধে রেখেছি?

হীরুর রাগ উঠে যাচ্ছে। রাগটা কনট্রোল করার জন্যে সে সিগারেট ধরাল। এ্যানা বলল, সিগারেট ফেলুন তো। চোখে ছাই পড়ছে।

ছাই পড়লে অসুবিধা কী? চোখ কী ক্ষয়ে যাচ্ছে নাকি?

হ্যাঁ, ক্ষয়ে যাচ্ছে।

তুমি বড় যন্ত্রণা করছ এ্যানা।

আপনি নিজেই যন্ত্রণা করছেন। ফেলুন সিগারেট।

মেয়েছেলের কথায় ফস করে সিগারেট ফেলে দেয়া খুবই অপমানের ব্যাপার। তবু হীরু সিগারেট ফেলে দিল। দুনিয়াটাই এরকম যে মেয়েছেলের মন রক্ষা করে চলতে হয়।

এ্যানা বলল, নামার কথা বলে আবার দেখি বসে আছেন। আপনার লজ্জা নেই?

এইসব করলে কিন্তু সত্যি সত্যি নেমে যাব।

বেশ তো নেমে যান। এই রিকশা থাম তো উনি নামবেন।

রিকাশা থামল। হীরু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। বোঝা যাচ্ছে এই মেয়ে তাকে যন্ত্রণা দেবে। একে বিয়ে করলে জীবনটা ভাজা ভাজা হয়ে যাবে। কিন্তু বিয়ে না করেই বা উপায় কী? প্রেম বলে কথা। প্রেম না থাকলে এতক্ষণে একটা চড় দিয়ে সে নেমে পড়ত। প্রেমের কারণে চড়টা দেয়া যাচ্ছে না।

এ্যানা বলল, কই নামলেন না?

মেয়েছেলে একা একা যাবে এই জন্যে বসে আছি।

একা একা যাওয়া আমার অভ্যাস আছে। আপনি নেমে যান। নেমে গেলেই ভাল।

ভাল কেন?

আপনাকে আমার অসহ্য লাগছে।

অসহ্য লাগার এমন কী করলাম? সিগারেট ফেলতে বলেছ। ফেলে দিয়েছি। মামলা ডিসমিস।

কেন খালি খালি কথা বাড়াচ্ছেন? এত বকবক করা শিখলেন কার কাছে? আপনার পীর সাহেবের কাছে?

এর পরে আর বসে থাকা যায় না।

হীরু নেমে গেল।

তার মনে ক্ষীণ আশা, রিকশা থেকে নামা মাত্র এ্যানা তার ভুল বুঝতে পারবে এবং মধুর গলায় বলবে, উঠে আসুন। হীরু অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে উঠবে না। এতে মান থাকে না। এ্যানা তখন বলবে, না হয় একটা ভুল করেছি তাই বলে আপনি এমন করবেন? তখন হীরু উঠবে। কারণ মেয়েছেলের ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা ঠিক না। মেয়েছেলের কাজই হচ্ছে ভুল করা। তারা ভুল করবেই। বিবি হাওয়া তাদের পথ দেখিয়ে গেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এ্যানা কিছুই বলল না। রিকশা ফরফর করে এগিয়ে চলল। রাগে হীরুর ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। সে মনে মনে তিনবার বলল হারামজাদী, হারামজাদী, হারামজাদী। রাগ এতে পড়ে গেল। তিন সংখ্যার এই গুণ। রাগ করে তিনবার কোনো একটা কথা বললে রাগ পড়ে যায়। মন শান্ত হয়ে আসে।

হীরুর মন এখন শান্ত। বেশ অনুশোচনাও হচ্ছে, রিকশা থেকে নেমে পড়াটা বিরাট বোকামি হয়েছে। ইংরেজিতে যাকে বলে গ্রেট মিসটেক। বেচারীর কাছে রিকশা ভাড়া আছে কি-না কে জানে। মনে হচ্ছে নেই। বেচারী রিকশা থেকে নেমে মনটা খারাপ করবে। রিকশাওয়ালার সঙ্গে খচখচি করবে। আজকাল রিকশাওয়ালারা মেয়েছেলের সম্মান রেখে কথা বলে না। মেয়েছেলের সঙ্গে ইচ্ছে করে যেন আরো খারাপ ব্যবহার করে।

হীরু একটা চায়ের স্টলে ঢুকে পড়ল। সারাটা দিন কী করে কাটাবে তার একটা পরিকল্পনা করা উচিত। সন্ধ্যাবেলায় আরেকবার এ্যানার খোঁজে গেলে কেমন হয়? সঙ্গে একটা চিঠি নিয়ে যাবে। একটা মাত্র লাইন সেখানে লেখা থাকবে। এমন লাইন যে পড়া মাত্র মনটা উদাস হয়ে যায়। চোখ হয় ছলোছলো এ রকম লাইন খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্ট। চা খেতে খেতে এটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

আজ হীরুর ভাগ্যটাই খারাপ। কাপ থেকে চা ছলকে পড়ল পাঞ্জাবিতে। চায়ের এই দাগ সহজে উঠবে না। দুধ দিয়ে ধুয়ে দিতে পারলে হয়ত উঠত। এখানে দুধ পাবে কোথায়? হীরু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। এ রকম যে হবে সে জানত। পীর সাহেবের নামে কেনা সিগারেট সে বিক্রি করে দিয়েছে। কাজেই একের পর এক অঘটন ঘটবে। এ্যানা যে তাকে রিকশা থেকে নামিয়ে দিল এর কারণ তো আর কিছুই না পীর সাহেবের বরদোয়া। এই জন্যেই পীর-ফকিরের সঙ্গে মেলামেশা কম করতে হয়। সব জিনিসের ভাল-মন্দ দুটা দিকই আছে। পীর-ফকিরের সঙ্গে খাতির থাকা যেমন ভাল আবার তেমনি মন্দ। এখন মনে হচ্ছে মন্দটাই বেশি।

হীরু উদাস ভঙ্গিতে দ্বিতীয় কাপ চায়ের অর্ডার দিল।

## ১২

জালালুদ্দিন বললেন, কে?

তিনি বারান্দায় এসে আছেন। সকাল নটার মত বাজে। বাড়িতে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই। মিনু গেছেন বাজারে। তিথি কোথায় গেছে তিনি জানেন না। যাবার আগে তাঁকে বলে যায়নি। হীরু গত রাতে বাড়ি ফিরেনি। টুকু অবশ্যি রাতে বাড়িতেই ছিল। ভোরবেলা কোথায় বেরিয়ে গেছে। এই ছেলে কখন আসছে কখন যাচ্ছে কোনো ঠিক নেই। শক্ত মারধর করতে পারেন না এই একটা সমস্যা। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হয় মায়ের দায়িত্বটা তাকেই নিতে হবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নিতে হবে।

টুকু থাকলে সুবিধা হত। এই যে লোকটা এতক্ষণ এসেছে। কথাবার্তা বলছে না দাঁড়িয়ে আছে, তার ব্যাপারটা কি তা টুকু চট করে ধরে ফেলত। লোকটা কোনো বদ মতলবে এসেছে কি-না কে জানে।

জালালুদ্দিন আবার বললেন, কে?

লোকটি এইবার কথা বলল। তার গলার স্বর নরম এবং সে ইতস্তত ভঙ্গিতে কথা বলছে। কাজেই লোকটা সম্ভবত খারাপ না। খারাপ লোক এইভাবে কথা বলে না।

আমার নাম দবির। আমার ছোটখাটো ব্যবসা আছে। আপনি আমাকে চিনবেন না। আপনার সঙ্গে আগে আমার দেখা হয়নি।

দেখা হলেও চিনতাম না। আমি চোখে দেখি না।

তাই নাকি?

জালালুদ্দিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, বিরাট যন্ত্রণায় আছি ভাই। আপনি বাইরের মানুষ। ভেতরের কথা আপনাকে কি বলব? সামান্য চিকিৎসা করালেই অসুখ সারে। সেটা কেউ করাবে না। আপনি কার কাছে এসেছেন?

দবির ইতস্তত করে বললেন, পরী কিংবা তিথি বলে কেউ কি এখানে থাকেন?

পরী বলে কেউ থাকে না। তবে তিথি আছে। আমার দ্বিতীয় কন্যা। ভাল নাম ইশরাত জাহান। ও কোথায় যেন গেছে।

কোথায় গেছে জানেন?

জি না। আমাকে কিছু বলে যায়নি। আগে বলত এখন আর বলে-টলে না। সম্ভবত ওর মাকে বলে গেছে। বসুন, ওর মা এসে পড়বে। ওর মা কাঁচার বাজারে গেছে। ঘরে কাজের লোক নেই। নিজেদেরই সব করতে হয়। ঐখানে একটা জলচৌকি আছে। টেনে নিয়ে বসুন। ঘরের ভেতর চেয়ার আছে, ঘরে তালা দিয়ে গেছে এই জন্যে চেয়ার দিতে পারছি না। নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

দবির বললেন, আমি বসব না। কাজ ফেলে এসেছি। আপনি দয়া করে তিথিকে বলবেন, আমি এসেছিলাম। নাম বললেই হবে। আমার নাম দবির তাকে একটু বলবেন যেন আমার বাসায় যায়। আমার স্ত্রীর কিছু কথা আছে তার সঙ্গে। জরুরি কথা।

বলব। অবশ্যই বলব। বাসার ঠিকানা কি তিথি জানে?

জি জানে। তাছাড়া এই কার্ডটাও রেখে গেলাম। কার্ডে ঠিকানা আছে।

বলব। তিথি আসলেই বলব। তা এসেছেন যখন খানিকক্ষণ বসেই যান। আমার স্ত্রী এসে পড়বেন। তখন চা খেতে পারবেন। কষ্ট করে এসেছেন শুধু মুখে যাবেন। এটা কেমন কথা।

জি না। আজ আর বসব না।

জালালুদ্দিন খানিকক্ষণ দ্বিধাগ্রস্ত থেকে বললেন, ভাইসাব আপনার কাছে সিগারেট আছে? প্যাকেটটা রয়েছে ভেতরে। আমার স্ত্রী ঘরে তালা দিয়ে চলে গেলেন। চাবিটাও নেই। থাকলে আপনাকে বলতাম না।

দবির বললেন, সিগারেট তো আমি খাই না। তবে এনে দিচ্ছি

তাহলে দরকার নেই। বাদ দেন। সঙ্গে থাকলে ভিন্ন কথা।

কোনো অসুবিধা নেই।

জালালুদ্দিন, ঐই অপরিচিত লোকটির ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন। লোকটা এক প্যাকেট ফাইভ ফাইভ এবং একটা দিয়াশলাই কিনি দিয়ে গেছে। শুধু তাই না একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে গেছে। এরকম একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সঙ্গে তার মেয়ের পরিচয় আছে ভাবতেই ভাল লাগছে। এমন চমৎকার একজন মানুষকে চা খাওয়ানো গেল না। এই দুঃখে তিনি খুবই কাতর হয়ে পড়লেন। পরের বার এলে চা এবং চায়ের সঙ্গে দুটা মিষ্টি দিতে হবে। এইটুকু ভদ্রতা না করলে খুবই অন্যায় হবে।

মিনু চলে এসেছেন। তাঁর পায়ের শব্দ কানে যেতেই জালালুদ্দিন সিগারেটের প্যাকেট লুকিয়ে ফেললেন। মেয়েদের মন থাকে সন্দেহে ভরা। হাজারটা প্রশ্ন করবে। কি দরকার? তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, বাজার কি আনলে মিনু?

মিনু জবাব দিলেন না। স্বামীর প্রশ্নের জবাব দেয়া তিনি ইদানীং ছেড়েই দিয়েছেন।

মাছ-টাছ কিছু পাওয়া গেল?

মিনু সেই প্রশ্নেরও উত্তর দিলেন। না। বাজার নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। জালালুদ্দিন তাতে মন খারাপ করলেন না। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে বললেন, এক ফোঁটা চা দিও তো মিনু। বুকে কফ বসে গেছে। চা কফের জন্যে খুবই উপকারী। আমার কথা না। বড় বড় ডাক্তাররা বলেন।

মিনু এই কথায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন না। এটা খুবই ভাল লক্ষণ। হয়ত চা পাওয়া যাবে। চা এলে চায়ের সঙ্গে একটা সিগারেট ধরাতে হবে। সব জিনিসের একটা অনুপান আছে। চায়ের অনুপান হচ্ছে সিগারেট। দৈ-এর অনুপান মিষ্টি।

তিথির অবাক হবার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে।

কিছুতেই সে এখন আর অবাক হয় না। হীরু যদি তাকে কোনোদিন এসে বলে, দেখ তিথি আমি এখন আকাশে উড়তে পারি। এবং সত্যি সত্যি যদি খানিক্ষণ উড়ে দেখায়, তাহলেও বোধ

হয় তিথি অবাক হবে না।

অথচ দবির উদ্দিনের রেখে-যাওয়া কার্ড দেখে সে অবাক হল। এই লোক তার ঠিকানা পেল কোথায়? সে তো কোনো ঠিকানা রেখে আসেনি। তার ঠিকানা জানার কথা নয়! দবির উদ্দিনের স্ত্রী তার সঙ্গে কথা বলতে চান। এই খবরটিও অবাক হবার মত। তাতে তিথি অবাক হল না। ভদ্রমহিলা অসুস্থ, তাঁর নিশ্চয়ই সময় কাটে না। গল্পগুজব করবার জন্যে তাঁর কিছু মজার চরিত্র দরকার। তিথির মত মজার চরিত্র তিনি আর কোথায় পাবেন।

ঐ বাড়িতে তিথির যেতে ইচ্ছা করছে না। তবু সে হয়ত যাবে। দবির উদ্দিন নামের ঐ লোক তার ঠিকানা কোথায় পেল এটা জানার জন্যেই তাকে যেতে হবে। আর যেতে যখন হবে তখন আজ গেলে কেমন হয়?

তিথি কাপড় বদলাল।

হালকা রঙের একটা শাড়ি পরল। চুলে বেণী করল। আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাবল একটু কাজল কি দেবে? চোখের পল্লব ঘেঁষে হালকা রেখা যা চোখে পড়বে না আবার পড়বেও।

মিনু ঘরে ঢুকে দেখলেন তিথি খুব সাবধানে চোখে কাজল দিচ্ছে। তিথি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিথি বলল, তুমি কিছু বলবে?

না।

তাহলে দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলে যাও।

মিনু ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুই কি আমাকে দেখতে পারিস না তিথি? তিথি মা'র দিকে না তাকিয়ে বলল, না। পারি না।

আমি কি করেছি? আমার দোষটা কী?

তোমাকে কি আমি কোনো দোষ দিয়েছি? দোষ ছাড়াই তোমাকে দেখতে পারি না।

মিনু খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আগের চেয়েও ক্ষীণ গলায় বললেন, অরু চিঠি দিয়েছে।

তিথি কিছু বলল না।

মিনু বললেন, তোর টেবিলের উপর রেখেছি।

আমার টেবিলের উপর রেখেছ কেন? আমি ঐ সব চিঠি-ফিঠি পড়ব না। ভাল্লাগে না।

মিনু চলে গেলেন। তিথি অবশ্যি ঘর থেকে বেরুবার আগে বোনের চিঠি পড়ল। একবার না দুবার পড়ল। খুবই সংক্ষিপ্ত চিঠি। মার কাছে লেখা।

মা,

আমার সালাম নিও। আমি বুঝতে পারছি তোমরা ওর টাকাটা দিতে পারছ না কিংবা দিচ্ছ না। আমি ঐ নিয়ে আর কিছু বলব না। কিন্তু মা তোমার পায়ে পড়ি আমাকে কিছু দিন তোমাদের কাছে এনে রাখ। এখানে আমি মরে যাচ্ছি। হীরুকে পাঠাও মা, আমাকে নিয়ে যাক।

তোমার অরু।

এত সংক্ষিপ্ত চিঠি অরু কখনো লেখে না। তার চিঠি হয় দীর্ঘ। চিঠির শেষের দিকে এসে বাবার বাড়ির সবার সম্পর্কে কিছু না কিছু লেখা থাকে। এই চিঠিতে সে সব কিছু নেই। তিথি ভাবতে চেষ্টা করল বড় আপা কি ধরনের কষ্টে আছে? কষ্টের নমুনাটা কি? বড় আপার কষ্টের সঙ্গে তার নিজের কষ্টের কি কোনো মিল আছে? সম্ভবত নেই। সে যে জাতীয় যাতনা বোধ করছে বড় আপার সে সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই, ধারণা থাকার কথাও না। তার বয়স তখন কত? পনেরো কি ষোল? এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে, তখনো রেজাল্ট হয়নি বাবা তাকে পাঠালেন মনজুর সাহেবের কাছে। বাবার দূর-সম্পর্কের ভাই। তিথি তাঁকে কখনো দেখেনি। ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। এ জি অফিসে কাজ করেন। থাকেন সরকারি কোয়ার্টারে। তাঁকে একটা চিঠি দিতে হবে। চিঠিটা বাবার জবানীতে লিখেছে তিথি। চিঠির বিষয়বস্তু খুবই সাধারণ জালালুদ্দিন সাহেব তাঁর ফুফাতো ভাইকে জানাচ্ছেন যে তিনি সাময়িকভাবে খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। যদি দু'শ টাকা তাকে দেয়া হয় তাহলে তিনি চির কৃতজ্ঞ থাকবেন। টাকাটা তিনি সামনের মাসে যে করেই হোক ফেরত দেবার ব্যবস্থা করবেন। তিনি নিজেই আসতেন ইদানীং চোখের একটা সমস্যার জন্যে আসতে পারছেন না।

চিঠি নিয়ে যাবার কথা হীরুর। সে গম্ভীর গলায় বলল, এটা তো ভিক্ষা চাওয়া চিঠি। যাকে বলে

'বেগিং'। আমি বেগিং বিজনেসে থাকতে পারব না। জালালুদ্দিন কিছুতেই তাকে রাজি করাতে পারলেন না। শেষটায় মেয়েকে বললেন, তুই যাবি তিথি? গভর্মেন্ট কোয়ার্টার। খুঁজে বের করতে কোনো অসুবিধা হবে না। পারবি মা?

তিথি বলল, উনি যদি চিনতে না পারেন?

বলিস কি তুই? চিনতে পারবে না মানে! পরিচয় পেলে দেখবি কত খাতির-যত্ন করে।

টাকা যদি না দেন তাহলে তো বাবা খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

তোর কিসের লজ্জা? তুই তো আর টাকা চাসনি। আমি চেয়েছি। লজ্জা হলে আমার হবে।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে উনি খুব খারাপ ব্যবহার করবেন! বিরক্ত হবেন।

আহা গিয়ে দেখ না। বিশিষ্ট ভদ্রলোক।

যদি চিনতে না পারেন?

মনজুর সাহেব তাকে চিনতে পারলেন। হাসিমুখে বললেন, তোমাকে খুব ছোটবেলায় দেখেছি। তোমার মনে নেই। তবে তোমার বড় বোনের নিশ্চয়ই মনে আছে। কি নাম যেন তার? অরুমিনা না?

জি। ডাকনাম অরু।

তোমার বাবার তো আমার খুব কাব্যিক নাম রাখার বাতিক। তোমার নাম কি?

তিথি।

বাহ্ খুব সুন্দর নাম। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। তিথিদের অবস্থা শুনে খুবই দুঃখিত হলেন এবং আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, এই সাময়িক সাহায্য তো কিছু হবে না। স্থায়ী কিছু করতে হবে। কিভাবে করা যায় সেটা হচ্ছে কথা। তোমার ভাইকে পাঠিয়ে দিও। আমার কিছু জানাশোনা আছে দেখি কোথাও লাগিয়ে দেয়া যায় কি-না। তিথির মনে যে চাপা উদ্বেগ ছিল তা দূর হয়ে গেল। বাবার এই ফুফাতো ভাইকে তার পছন্দ হল। ছোটখাটো মানুষ। সারাক্ষণ পান খাচ্ছেন। একটু পরপর পানের রস গড়িয়ে পড়ছে। সরুয়া টানার মত সেই রস টেনে নিচ্ছেন। মাথায় এক গাছিও চুল নেই। চকচকে টাক। কিছুক্ষণ পরপর টাকে হাত বুলাচ্ছেন। তখন তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হয় টাকে হাত বুলিয়ে তিনি খুব আরাম পাচ্ছেন। তিথি খানিক গল্পগুজবও করল। সহজ স্বরে বলল, বাসায় আর কেউ নেই কেন? চাচী কোথায়?

ও থাকে গফরগাঁয়ে। ছেলেমেয়েরা ঐখানেই স্কুলে-কলেজে পড়ে। ঢাকার এত খরচ চালান কি সোজা ব্যাপার। সরকারি বাসা পাওয়ায় রক্ষা হয়েছে। অর্ধেক সাবলেট করে দিয়েছি। আমি দু'টা ঘব নিয়ে থাকি।

একা একা খারাপ লাগে না আপনার?

না। সপ্তাহে সপ্তাহে যাই। বৃহস্পতিবারে দুপুরে চলে যাই শনিবার সকালে আসি। খানিকটা কষ্ট হয়। কি আর করা বল।

খাওয়া-দাওয়া কোথায় করেন?

বেশির ভাগ সময় নিজেই রাঁধি। বাইরেও খাই।

তিনি তিথিকে সুজির হালুয়া রেঁধে খাওয়ালেন। দু'শ টাকা দিয়ে নিজে এসে একটা রিকশা ঠিক করে রিকশা ভাড়াও দিয়ে দিলেন। তিথিকে বললেন, একা একা ঢাকা শহরে ঘোরাফিরা করা ঠিক না। তোমার বাবাকে বলবে আর যেন তোমাকে এ ভাবে না পাঠান।

তিথিকে পরের মাসে আবার আসতে হল। এবারের আবেদন একশ টাকার। যে করেই হোক দিতে হবে।

.মনজুর সাহেব টাকা দিয়ে দিলেন এবং সেদিনও সুজির হালুয়া রেঁধে খাওয়ালেন। তবে ঐ দিনের মত গল্পগুজব হল না বা এগিয়ে এসে রিকশা ঠিক করে দিলেন না।

তার পরের মাসে তিথি আবার এল। সারাপথ কাঁদতে কাঁদতে আসল। টাকা চাইতে হবে এই দুঃখে তার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। বাসে বসে তার মন চাইছিল একটা ট্রাকের সঙ্গে এই বাসটার অ্যাকসিডেন্ট হোক। সেই অ্যাকসিডেন্টে সে যেন মারা যায়। সে মরল না। এক সময় মনজুর সাহেবের বাসার কড়া নাড়ল। মনজুর সাহেব দরজা খুললেন তবে তাকে দেখে খুব অবাক হলেন না। শুকনো গলায় বললেন, কি খবর? তিথি মাথা নিচু করে বলল, বাবা একটা চিঠি দিয়েছেন।

আবার চিঠি। এস ভেতরে এস। তিথি ভেতরে এসে বসল। মনজুর সাহেব বললেন, এইবার কত টাকা চেয়েছে?

একশ।

তিথির ধারণা ছিল এবারে তিনি টাকা দেবেন না। কিন্তু তার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। তিনি পঞ্চাশ টাকার দু'টা নোট তিথির হাতে দিলেন এবং বললেন, ঘেমে-টেমে কি হয়েছে ফ্যানের নিচে বস। বিশ্রাম কর।

জি-না। তাড়াতাড়ি বাসায় যেতে হবে। টুকুর খুব জ্বর। ডাক্তার আনতে হবে।

দু'তিন মিনিট বসে গেলে ক্ষতি হবে না। তিনি হাত ধরে তিথিকে তার পাশে বসালেন। পরমুহূর্তেই তিথিকে জড়িয়ে ধরলেন। তিথি ভয়ে কাঠ হয়ে গেল। কোনোমতে বলল, ছাড়ুন চাচা। আমাকে ছেড়ে দিন।

তিনি আহ্ বলে বিরক্ত প্রকাশ করলেন। তিথিকে ছাড়লেন না। তিথি চিৎকার করতে চেষ্টা করলেন- গলা দিয়ে কোনো শব্দ বের হল না। সিগারেটের গন্ধ ভরা, পান খাওয়া একটা মুখ তার মুখের ওপর লেপ্টে রইল। দুটি হাত মাকড়সার মতো তার সারা শরীরে কিলবিল করতে লাগল। এর পর কি কি ঘটল সে মনে করতে পারছে না। শুধু যা মনে আছে তা হচ্ছে সে বেতের সোফায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে। মজনুর সাহেব একটা বাটিতে হালুয়া বানিয়ে তাকে বললেন এই তিথি, নাও হালুয়া খাও। এর পরেও অনেকবার তিথিকে তাঁর কাছে আসতে হয়েছে। প্রতিবারেই মনজুর সাহেব তাকে টাকা দিয়েছেন। এবং বলেছেন, দরকার হলেই আসবে। কোনো অসুবিধা নেই।

তিথি বড় আপার চিঠি টেবিলে রাখতে রাখতে মৃদু স্বরে বলল, তুমি তো সুখেই আছ আপা। কত সুখে আছ তুমি জানো না। জানলে এ রকম চিঠি লিখতে না।

এ হচ্ছে নিজের সঙ্গে বিড়বিড় করে কথা বলা। নিজের সঙ্গে কথা বলার এই অদ্ভুত অসুখ তিথির ইদানীং হয়েছে। মনে মনে ভাবা কথাগুলি সশব্দে বের হয়ে আসে। রিকশায় আসতে আসতে একবার এরকম হল। রিকশাওয়ালা তিথির বিড়বিড় শুনে চমকে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল। অবাক হয়ে বলল, কি কন আফা? এগুলি কি পাগল হবার লক্ষণ? এক সময় সে কি পাগল হয়ে যাবে? হয়ত হবে। কিংবা কে জানে এখনি হয়ত সে খানিকটা পাগল।

বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে হীরুর সঙ্গে দেখা। হীরু বলল, তিথি যাচ্ছিস কোথায়? তোর সঙ্গে আমার খুব জরুরি কথা আছে, ভেরি আর্জেন্ট।

তিথি বলল, আমার কোনো জরুরি কথা নেই। বিরক্ত করিস না তো?

হীরু সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। তিথি বলল, কেন বিরক্ত করছিস?

তুই আমাকে থ্রি থাউজেন্ড টাকা জোগাড় করে দিতে পারবি?

না।

এর জন্যে তুই আমাকে তোর পা ধরতে বলিস আমি তোর পা ধরে বসে থাকব। টাকাটা আমার খুবই দরকার।

দরকার হলে চুরি কর। ছিনতাই কর। কানে দুল পরে মেয়েরা যায়। ঐ দুল টান দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে পালিয়ে যা।

তুই পাগল হয়ে গেলি তিথি? আমি ভদ্রলোকের ছেলে না?

হ্যাঁ, ভদ্রলোকের ছেলে। তুই ভদ্রলোকের ছেলে, আমি ভদ্রলোকের মেয়ে। আমি টাকা কিভাবে আনি তুই জানিস? নাকি তোর জানা নেই?

হীরু চুপ করে গেল। তিথি বলল, আমি কিভাবে টাকা আনি সেটা কেউ জানে না, আবার সবাই জানে। মজার একটা খেলা। তুই আমার পেছন পেছন আসবি না। যদি আসিস তাহলে ধাক্কা দিয়ে নর্দমায় ফেলে দেব।

হীরু দাঁড়িয়ে পড়ল। তিথিকে বিশ্বাস নেই এই কাণ্ড সে সত্যি সত্যি করে বসতে পারে। একবার নর্দমায় পড়ে গেলে চৌদ্দবার গোসল করলেও গন্ধ উঠবে না। হীরুর মন খারাপ হয়ে গেল। তিথির কাছ থেকে সে টাকা পাবে না এটা জানত। টাকা চাওয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন। হীরুর ধারণা ছিল টাকার কথা শুনেই তিথি বলবে এত টাকা দিয়ে তুই কি করবি? তখন হীরু কারণটা ব্যাখ্যা করবে।

কারণটা বেশ অদ্ভুত।

আজ হাঁটতে হাঁটতে সে পীর সাহেবের কাছে গিয়েছে। খালি হাতে গিয়েছে, এই জন্যে সে

আর তাঁর সঙ্গে দেখা করল না। উঠোনে মাথা কামানো এক লোকের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল। মাথা কামানো লোকটির নাম সবুর। তার বাড়ি কালিয়াকৈর। মাস তিনেক আগে বিয়ে করেছে। গত সপ্তাহে তার বৌ হঠাৎ পালিয়ে গেছে। অনেক জায়গায় খোঁজখবর করেও সে কোনো সন্ধান না পেয়ে পীর সাহেবের কাছে এসেছে। পীর সাহেবের সঙ্গে এখনো দেখা হয় নি। হীরু বলল, ঠিক জায়গায় এসে পড়েছেন ভাইজান। মোটেই চিন্তা করবেন না, এক মিনিটের মামলা। পীর সাহেব ফড়ফড় করে সব বলে দেবেন।

সত্যি?

সত্যি মানে? আমার নিজের ইয়ং ব্রাদার মিসিং হয়ে গেল। তার নাম টুকু। পীর সাহেবকে বললাম। উনি বললেন - চিন্তা করিস না। এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরবে।

ফিরল এক সপ্তাহের মধ্যে?

ফিরবে না মানে? পীর সাহেবের সঙ্গে ইয়ার্কি চলে না। ডাইরেক্ট অ্যাকশান। আপনি খালি হাতে আসেননি তো?

একশ টাকা এনেছি - গরিব মানুষ।

টাকা-পয়সা পীর সাহেব নিবেন না। টাকা-পয়সা উনার কাছে তেজপাতা। সিগারেট দিতে হবে, বিদেশী সিগারেট।

বিদেশী কি সিগারেট?

ধরেন ডানহিল, বেনসন। মোড়ের দোকানে গিয়ে বললেই হবে - পীর সাহেবের সিগ্রেট। ওরা জানে। বাজারের চেয়ে কম রেইটে পাবেন। যান সিগ্রেট নিয়ে আসেন। পীর সাহেবকে কদমবুসি করে সিগ্রেটের প্যাকেটটা বাম দিকে রাখবেন।

সবুর মিয়া সিগ্রেট আনতে গেল আর তখনি বাড়ির ভেতর থেকে পীর সাহেব খালি পায়ে বের হয়ে এলেন। বারান্দায় এবং উঠোনে এতগুলি লোক বসা, কাউকে কিছু না বলে হীরুকে হাত ইশারা করে ডাকলেন। হতভম্ব হীরু ছুটে গেল। পীর সাহেব বললেন, তুই বিসমিল্লাহ বলে একটা ব্যবসা শুরু কর। ব্যবসা তোর তরক্কি হবে। স্বয়ং নবী করিম ব্যবসা করতেন। হীরু কাঁপা গলায় বলল, কিসের ব্যবসা করব? পীর সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, তোর ব্যবসা হবে গরম জিনিসের। একটা চায়ের দোকান দিয়ে দে। এই বলেই পীর সাহেব আবার ঘরে ঢুকে গেলেন। আর কি আশ্চর্য যোগাযোগ - তার পরদিনই যে কল্যাণপুরের বশীর মোল্লার চায়ের দোকানে চা খেতে গেছে, বশীর মোল্লা বলল, দোকান বেচে দিব হীরু ভাই। খদ্দের যদি পান একটু বলবেন।

হীরু গম্ভীর হয়ে বলল, বেচবেন কেন? চালু দোকান।

চালু কোথায় দেখলেন? দিনে পঞ্চাশ কাপ চা বেচতে পারি না। বিশ-পঁচিশ কাপ পাড়ার ছেলেরা খায়। দাম চাইলে বলে খাতায় লিখে রাখেন।

দাম কত চান দোকানের?

দশ হাজার পাইলে রাখমু না।

দশ হাজার? দোকানে আপনার আছে কি? দুইটা কেতলী, পনের-বিশটা কাপ। হাজার তিনেক হলে আমাকে বলবেন ক্যাশ দিয়ে নিয়ে যাব। নো প্রবলেম।

বশীর মোল্লা আর কিছু বলল না। চিন্তিত মুখে দাঁত খুঁচাতে লাগল। এই সবই হচ্ছে যোগাযোগ। এরকম যোগাযোগ আপনা-আপনি হয় না। উপরের নির্দেশ লাগে। পীর সাহেবের দোয়ায় অ্যাকশন শুরু হয়ে গেছে। এঁরা হচ্ছেন অলি মানুষ - এঁদের দোয়া কোরামিন ইনজেকশনের মত। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন।

হীরুর ইচ্ছা ছিল টাকা চাওয়ার উপলক্ষে পুরো ঘটনাটা তিথিকে বলবে। তিথি সেই সুযোগ দিল না। পীর সাহেবের দোয়ার ফল তো সে একা ভোগ করবে না। সবাই মিলে ভোগ করবে। তার টাকা-পয়সা হলে সে কি ভাই বোন ফেলে দিবে? অবশ্যই না। ভাই-বোন, ফাদার-মাদার এরা থাকবে মাথার উপরে।

## ১৩

ফরিদার চোখ দুটি আজ যেন উজ্জ্বল আরো তীক্ষ্ণ। চুলার গনগনে কয়লার মত ঝকঝক করছে। তাঁর পরনের শাড়িটাও লাল। মাথার চুলগুলিও কেন জানি লালচে দেখাচ্ছে। শুধু মুখের চামড়া

আরো হলুদ হয়েছে। এমন হলুদ যে মনে হয় হাত দিয়ে ছুঁলে হাতে হলুদ রঙ লেগে যাবে। ফরিদা বললেন, বস তিথি। চেয়ার টেনে বস।

তিথি বলল, আপনি আমাকে ডেকেছেন?

ফরিদা চুপ করে রইলেন তবে খুব আগ্রহ নিয়ে তিথির দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর জ্বলজ্বলে চোখের মণিতে এক ধরনের কৌতুক। এক সময় হাসিমুখে বললেন, তুমি কি চোখে কাজল দিয়েছ না-কি?

তিথি শান্ত স্বরে বলল, হ্যাঁ দিয়েছি। কেন, আমার মত মেয়েব কি চোখে কাজল দেয়া নিষেধ?

ফরিদা তিথির প্রশ্নের প্রতি মোটেই গুরুত্ব দিলেন না। নিজের মনে বললেন, বিয়ের আগে আমারও চোখে কাজল দেয়ার সখ ছিল। খুব কাজল দিতাম। একদিন আমার মামা আমাকে বললেন, চোখে কাজল দেয়া ঠিক না। কাজল হচ্ছে কারবন। কারবনের সূক্ষ্ম কণা চোখের ক্ষতি করে। ঐ মামার কথা আমরা খুব বিশ্বাস করতাম...

তিথি ফরিদাকে থামিয়ে বলল, আপনি আমাকে কি জন্যে ডেকেছেন?

গল্প করাব জন্যে। কেন তুমি কি রাগ করছ? আমি পুষিয়ে দেব।

কিভাবে পুষিয়ে দেবেন? গল্পের শেষে টাকা দেবেন ঘণ্টা হিসেবে?

ফরিদা হেসে ফেললেন। যেন তিথি খুব মজার কিছু বলেছে। তিথি বিস্মিত হল। ফরিদা কেন হেসে ফেলেছে তা বুঝতে না পেরে খানিকটা বিব্রতও বোধ করল।

ফরিদা বললেন, ঐ দিন তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। তারপব থেকে আমার মনটা খারাপ ছিল। নিজের পরিচিত মানুষজন, আত্মীয়-স্বজন যদি রাগ কবে আমার খাবাপ লাগে না। তুমি বাইবের একটি মেয়ে। তুমি কেন আমার ওপব রাগ করবে?

আপনি কি এটা বলার জন্যে ডেকেছেন?

হ্যাঁ। আমার আরেকটা উদ্দেশ্যও আছে। সেটা তোমাকে পরে বলছি। তাব আগে তোমার জন্যে একটা ধাঁধা আছে। এখানে একটা ছবি আছে। এই ছবিতে তিনটি মেয়ে বসে আছে। এই তিনজনের একজন আমি। সেই একজন কে তুমি বের করে দেবে।

যদি বের করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই টাকা-পযসা দেবেন?

তুমি চাইলে দেব কিন্তু তুমি আমার সঙ্গে এমন কঠিন ভাষায় কথা বলছ কেন? খানিকক্ষণ সহজভাবে আমার সঙ্গে কথা বল। অসুস্থ একজন মানুষের এই কথাটা রাখ।

তিথি ছবিটা হাতে নিল। দেখেই মনে হচ্ছে তিন স্কুল বান্ধবী কোনো উপলক্ষে প্রথম শাড়ি পরেছে। তিনজনই হাত ধরাধরি করে বসে আছে। পেছনে গোলাপ ঝাড়ে অনেক গোলাপ ফুটে আছে। ফটোগ্রাফার নিশ্চয়ই ভেবেচিন্তে এই কম্পোজিশন বের কবেছেন।

দেরি করছ কেন? বল কোন মেয়েটি আমি?

বলতে পারছি না।

মেয়েগুলি দেখতে কেমন?

রূপবতী।

কি রকম রূপবতী সেটা বল।

খুব রূপবতী।

এই তিনটি মেয়ের মধ্যে আর কোনো মিল দেখতে পাচ্ছ?

না।

খুব ভাল করে দেখ। আলোর কাছে নিয়ে দেখ।

আমি আর কোনো মিল দেখতে পাচ্ছি না। তিনটি মেয়ের মুখ তিন রকমের।

আরেকটা মিল আছে। এই তিনজনের চিবুকের কাছে তিল আছে। ছবিতেও বোঝা যায় আমরা খুব বন্ধু ছিলাম। গলায় গলায় বন্ধু। ধর আমাদের মধ্যে একজনের অসুখ হয়েছে সে স্কুলে যায়নি। আমরা দুজন স্কুলে গিয়ে যখন দেখতাম একজন আসেনি তখন আমরাও স্কুল ফেলে বাসায় চলে আসতাম।

আপনাদের চিবুকে তিল ছিল বলেই আপনাদের এত বন্ধুত্ব ছিল?

শুধু তিল না আরো অনেক মিল ছিল আমাদের মধ্যে। আমরা তিনজনই বেশ ভাল ছাত্রী ছিলাম। একজন তো ছিল খুবই ভাল ছাত্রী। স্কুলে বরাবর ফার্স্ট সেকেন্ড হত। অথচ ম্যাট্রিক

রেজাল্ট বের হলে দেখা গেল তিনজনই সেকেন্ড ডিভিশন পেয়েছি।

তাই নাকি?

কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময়ই তিনজনের বিয়ে হয়ে গেল। তার পরেও মিল আছে। বল তো মিলটা কি?

আপনারা তিনজনই এখন অসুস্থ?

না। দুজন মারা গেছে। আমি শুধু বেঁচে আছি। এই বাঁচা তো মৃত্যুর মতই। তাই না?

হ্যাঁ তাই! আপনার ঐ দুই বান্ধবী কিভাবে মারা গেলেন?

প্রথম মারা গেল তৃণা। বাচ্চা হতে গিয়ে মারা গেল। তারপর মারা গেল বরুনা। ম্যানিনজাইটিস হয়েছিল।

কথা বলতে বলতে ফরিদা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হাতের ইশারায় তিনি তিথিকে পানির গ্লাস আনতে বললেন। তিথি পানি এনে দিল। সবটা খেতে পারলেন না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লেন। তিথি বলল, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ।

কোনো ওষুধপত্র কি আছে যা খেলে কষ্ট কমবে?

না।

আমি কি চলে যাব? নাকি আপনি আমাকে আরো কিছু বলবেন? ফরিদা চোখ না মেলেই বললেন, যাও। তিথি বলল, আপনার কি খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ।

আমি বরং আপনার পাশে বসে থাকি। ব্যথা যখন আরেকটু কমবে তখন যাব।

ব্যথা কমবে না। তুমি যাও।

তিথি উঠে দাঁড়াতেই ফরিদা বললেন, একটু বস। তিথি বসল না। দাঁড়িয়ে রইল। ফরিদা চোখ মেলে তাকালেন। খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, তোমার নিচের চিবুকেও তিল আছে - এটা কি তুমি কখনো লক্ষ্য করেছ? তিথি কিছু বলল না। ফরিদা কঠিন কণ্ঠে বললেন, তোমার ভাগ্যও আমার মতই হবে।

হলে কি আপনি খুশি হন?

না খুশি হই না।

তিনি চোখ বন্ধ করে ফেললেন। তাঁর বন্ধ চোখের পাতা উপচে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল। মানুষের মন বড় বিচিত্র। তিথি ফরিদার চোখের পানি দেখে হঠাৎ অভিভূত হয়ে গেল। তার নিজের বুক ঠেলে কান্না উঠে আসতে লাগল।

ফরিদা বললেন, তুমি কি একটু অজন্তার বাবাকে ডেকে আনবে? পাঁচটার মধ্যে সে আসে। এখন পাঁচটা দশ বাজে। সে নিচে আছে। তিথি দবির উদ্দিনকে পেল না। বসার ঘরে অজন্তা একা একা বসে ছিল। সে বলল, বাবা ছিলেন, আপনি এসেছেন শুনে শার্ট গায়ে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। বলতে বলতে অজন্তা মুখ টিপে হাসল। এবং একটু যেন লজ্জাও পেল। এই লজ্জার কারণ তার নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়।

## ১৪

ভাদ্র মাসের শুরুতে অরু এসে উপস্থিত। হাতে একটা স্যুটকেস। তাকে নিয়ে এসেছে সদ্য গোঁফ উঠা মুখচোরা ধরনের এক ছেলে। ভীতু ছাউনি, একবারও মাথা উঁচু করে তাকাচ্ছে না। স্যুটকেস নামিয়ে রেখেই সে উধাও হয়ে গেল। মিনু বললেন, ব্যাপার কি রে?

অরু মায়াকান্না জুড়ে দিল।

কান্নার ফাঁকে ফাঁকে ভাঙা ভাঙা কথা থেকে যা জানা গেল তা হচ্ছে— স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সে পালিয়ে এসেছে। যে তাকে পৌঁছে দিয়েছে তার নাম সাঈদ। কলেজে আইকম পড়ে। পাশের বাড়িতে লজিং থাকে। মিনু কঠিন গলায় বললেন, তোর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? পেটে ছয় মাসের বাচ্চা নিয়ে পালিয়ে চলে এলি? তার আগে বিষ খেয়ে মরতে পারলি না। বাজারে বিষ পাওয়া যায় না?

অরু শুকনো গলায় বলল, সব কিছু না শুনেই তুমি এই কথা বললে? বেশ, বিষ এনে দাও

আমি খাব। সময় তো শেষ হয়ে যায়নি।

জালালুদ্দিন বললেন, কি শুরু করলে মিনু, মেয়েটা একটু ঠাণ্ডা হোক। সব আগে শুনি। না শুনেই বকাঝকা।

মিনু ঝাঁঝিয়ে উঠল, সব কিছুর মধ্যে কথা বলবে না। কথা শোনাশুনির এখানে কি আছে? বোকার বেহদ্দ মেয়ে। পেটে ছ'মাসের বাচ্চা নিয়ে চলে এসেছে। কি সর্বনাশের কথা!

জালালুদ্দিন বললেন, একটা ব্যবস্থা হবেই। এত চিন্তার কি? বিপদ দেবার মালিক যিনি, বিপদ ত্রাণ করার মালিকও তিনি। তুমি এক কাপ গরম চা মেয়েটিকে দাও। মুড়ি থাকলে তেল-মরিচ দিয়ে মেখে দাও। অরু মা, তুই আয় আমার কাছে। ঘটনা কি শুনি। মিনু বললেন,

তোমাকে কোনো ঘটনা শুনতে হবে না।

তিনি মেয়েকে নিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এখন বল কি হয়েছে? তোর এত বড় সাহস কেন হল শুনি! অরু কিছুই বলল না, মাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। সমস্ত দিনেও এই কান্না থামল না।

তিথি এল চারটার দিকে। তিথিকে দেখে অরুর কান্না আরো বেড়ে গেল। জালালুদ্দিন বললেন, মেয়েটা কিছুই খায়নি। তিথি মা দেখ তো কিছু খাওয়াতে পারিস কি-না। বিরাট সমস্যা হয়ে গেল। বেশি কান্না ভাল না। চোখের ক্ষতি হয়।

হীরু এল সন্ধ্যার আগে আগে। সে কিছু না শুনেই খুব লাফঝাঁপ দিতে লাগল -- দুলাভাই বলে রেয়াত করব না। চটি জুতা দিয়ে পিটিয়ে চামড়া ঢিলা করে দেব। দাঁত সব কটা খুলে ফেলব। শালাকে ডেনটিস্টের কাছে গিয়ে দাঁত বাঁধাতে হবে। তিথি এসে ধমক দিয়ে হীরুকে থামাল। এবং বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টেলিগ্রাম করতে পাঠাল। টেলিগ্রাম করা হবে আবদুল মতিনকে। সেখানে লেখা থাকবে- "অরু এখানে আছে। চিন্তার কোনো কারণ নাই।"

হীরু টেলিগ্রাম করে টাকা নষ্ট করার তেমন কোনো প্রয়োজন অনুভব করল না। বললেই হবে--- টেলিগ্রাম করা হয়েছে। চিঠি যদি মিস হতে পারে তাহলে টেলিগ্রামও হতে পারে। বর্তমানে হাত একেবারেই খালি। টেলিগ্রাম উপলক্ষে পাওয়া বিশ টাকার নোটটা কাজে লাগবে। হীরু চলে এল ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে।

এ্যানার মা চারদিন হল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বেশির ভাগ সময় রাতে এ্যানা তাঁর সঙ্গে থাকে। ভাগ্য ভাল হলে আজও হয়ত সেই আছে।

অবশ্যি হাসপাতালে গিয়েও কোনো লাভ হবে না। ভদ্রমহিলার এখন-তখন অবস্থা। সারাক্ষণই নাকে অক্সিজেনের নল ফিট করা। মাকে এই অবস্থায় ফেলে মেয়ে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে বকবক করবে না। তবু চেষ্টা করতে তো দোষ নেই।

ফিমেল ওয়ার্ডের দোতলায় জানালা ঘেঁষে এ্যানার মার বেড। ফিমেল ওয়ার্ডে যাবার ব্যাপারে খানিকটা কড়াকড়ি আছে। হীরুর তেমন সমস্যা ছিল না। কলাপসেবল গেটের দারোয়ানকে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ভাই আমার মা ছিলেন হাসপাতালে। মারা গেছেন এ রকম সংবাদ পেয়ে এসেছি। একটু যদি কাইন্ডলি...

হাসপাতালের লোকজনও মৃত্যুর খবরে বিচলিত। দারোয়ান তাকে ছেড়ে দিল। হীরু চলে এল দোতলায়। আশ্চর্য ব্যাপার এ্যানা বারান্দাতেই আছে! রেলিং-এ ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। কাঁদছে নাকি? তার মার কি ভাল-মন্দ কিছু হয় গেল? তেমন কিছু হলে চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তোলার কথা। হাসপাতালে বোধ হয় সে রকম কিছু করার নিয়ম নেই।

এই এ্যানা?

এ্যানা চমকে তাকাল। বিরক্ত গলায় বলল, আবার হাসপাতালে চলে এসেছেন? পরশু দিন না বললাম হাসপাতালে আসবেন না।

তোমার কাছে তো আসিনি। আমার এক ক্লোজ ফ্রেন্ড ইমতিয়াজ, ব্যাটার হঠাৎ পেটে ব্যথা, অ্যাপেনডিসাইটিস-ফাইটিস হবে। হাসপাতালে নিয়ে এসেছি, ব্যাটার এখন অপারেশন হচ্ছে। অপারেশন হওয়া পর্যন্ত থাকতেই হবে। কাজেই ভাবলাম খোঁজ নিয়ে যাই। তোমার মা, তার মানে বলতে গেলে আমারো মা।

আপনার মা হবে কেন? কি-সব উল্টাপাল্টা কথা বলেন! এইসব আর করবেন না। রাগে গা জ্বলে যায়।

উনি আছেন কেমন?

তা দিয়ে আপনার দরকারটা কি? মার খোজে তো আপনি আসেননি।

তোমার মার খোঁজে আসিনি-- তাহলে এলাম কেন?

এসেছেন আমাকে বিরক্ত করতে।

হীরু অতি দ্রুত প্রসঙ্গ পাল্টে ফেলল, নিচু গলায় বলল, এখানে সিগারেট খাওয়া যায় এ্যানা?

না, খাওয়া যায় না। আপনি এখন চলে যান তো।

তুমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছো কেন?

মা ঘুমুচ্ছে তাই দাঁড়িয়ে আছি।

তুমি ঘুমাও কোথায়?

ঘুমাবো আবার কোথায়? এখানে কেউ কি আমার জন্যে বিছানা করে রেখেছে?

সারা রাত জেগে থাক?

হুঁ, অনেকেই বারান্দায় চাদর পেতে ঘুমায়। আমি পারি না। ঘেন্না লাগে।

বলতে বলতে এ্যানা হাই তুলল। বেচারীর শরীর খারাপ হয়ে গেছে, ভেজা ভেজা চোখ। মুখ শুকিয়ে কেমন হয়ে গেছে। হীরুর মনটা মায়ায় ভরে গেল। সে কোমল গলায় বলল, চা খাবে নাকি এ্যানা?

কি-সব কথাবার্তা আপনার। এখানে চা খাব কোথায়? এটা কি রেস্টুরেন্ট?

হাসপাতালের গেটের ভেতর এক বুড়ো চা বিক্রি করছে। চা খেলে তোমার রাত জাগতে সুবিধা হবে। চল না।

এক কাপ চা খেলেই আপনি চলে যাবেন?

চলে যাব না তো কি? আমার ঐ ফ্রেন্ডের অপারেশনের কি হল খোঁজখবর করে বাসায় যেতে হবে। বিরাট সমস্যা বাসায়। আমার বড় বোন পালিয়ে চলে এসেছে। হেভি ক্রাইং হচ্ছে।

আপনার বাসাটা তো খুব অদ্ভুত। সব সময় কেউ পালিয়ে যাচ্ছে। কিংবা পালিয়ে আসছে।

হীরু এর উত্তর দিল না। তার বড় ভাল লাগছে। রাতের বেলা এ্যানাকে পাশে নিয়ে চা খাওয়া, এত আনন্দ সে রাখবে কোথায়? মেয়েটা যে তার দিকে কি রকম 'উইক' এই ঘটনায় তাও প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। এক কথায় চা খেতে চলল। এদিকে তার মা এখন-তখন অবস্থা। মুখে অবশ্যি এই মেয়ে সারাক্ষণ উল্টো কথা বলছে। তা বলুক, এটা মেয়েছেলের ধর্ম। সোজা কথা সোজাভাবে বললে আর মেয়েছেলে রইল কোথায়?

চায়ে চুমুক দিয়ে এ্যানা বলল, চা'টা তো ভাল। হীরু দরাজ গলায় বলল, ভাল লাগলে আরেক কাপ খাও।

এ্যানা হেসে ফেলল। এত সুন্দর লাগল মেয়েটার হাসিমুখ। আজ আবার শাড়ি পরেছে। ছাপা শাড়ি। পরীর মত লাগছে দেখতে। আল্লাহতালা মেয়েগুলিকে এত সুন্দর করে পাঠিয়েছেন কেন কে জানে। মেয়েদের সবই সুন্দর। এরা রাগ করলেও ভাল লাগে, অপমান করলেও ভাল লাগে। ভালবাসার কথা বললে কেমন লাগবে কে জানে। এ্যানার মুখ থেকে ভালবাসার একটা কথা শুনতে ইচ্ছা করে।

এ্যানা।

বলুন কি বলবেন?

আমি নিজে চায়ের দোকান দিচ্ছি। ভেরি সুন।

খুব ভাল।

নাম একটা মনে মনে ঠিক করে রেখেছি এখনো ফাইন্যাল করিনি। নাম হচ্ছে— এ্যানা টি স্টল।

এ্যানা চায়ে চুমুক দিয়েছিল। হঠাৎ হাসি এসে যাওয়ায় বিষম খেল। হীরু অপ্রস্তুত গলায় বলল, হাসির কি হল?

কিছু হয়নি, এমনি হাসছি।

পীর সাহেবের কথামত দিচ্ছি। পীর সাহেব বলে দিলেন।

চায়ের দোকান দিতে বললেন।

হুঁ।

পীর সাহেবের কথা ছাড়া আপনি কিছুই করেন না?

না।

তাহলে উনার কাছে আমি একদিন যাব।

হীরু উৎসাহিত হয়ে উঠল। উৎসাহটা প্রকাশ করল না। মেয়েটা ঠাট্টা করছে কি না বুঝতে পারল না। ঠাট্টা হবারই সম্ভাবনা।

উনার কাছে সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে যেতে হবে তাই না?

হুঁ। টাকা-পয়সা নেন না। টাকা-পয়সা উনার কাছে তেজপাতা।

দিনে ক প্যাকেট সিগারেট পান?

অনেক। ত্রিশ চল্লিশ, পঞ্চাশ।

একটা মানুষ কি এত সিগারেট খেতে পারে?

হীরু সাবধান হয়ে গেল। প্রশ্ন কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারল না। এই মেয়ে বড়ই ধুরন্ধর। এই মেয়েকে বিয়ে করলেই জীবনটা শেষ হয়ে যাবে।

এ্যানা বলল, আপনার পীর সাহেব ঐ সব সিগারেট বাজারে বেচে দেয়। এখন বুঝলেন ব্যাপারটা? পঞ্চাশ প্যাকেট সিগারেট একটা লোক খেতে পারে না, তাই না?

পীর-ফকির সম্পর্কে সাবধানে কথা বলবে এ্যানা। কখন ফট করে বরদোয়া লেগে যাবে।

লাগুক।

এ্যানা চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। হীরুর বুক ছাঁৎ করে উঠল। এখন নিশ্চয়ই চলে যাবে। ইস আরো কিছুক্ষণ যদি আটকে রাখা যেত!

এ্যানা গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। তারও সম্ভবত রুগ্ন মায়ের পাশে সারাক্ষণ থাকতে ভাল লাগে না।

আপনার চায়ের দোকান কবে স্টার্ট হচ্ছে?

শিগগির— ক্যাপিটালের অভাবে আটকা পড়ে আছে। হাজার পাঁচেক টাকা পেলেই ধাঁ করে বেরিয়ে যেতাম।

টাকাটা জোগাড় হচ্ছে না?

হয়ে যাবে। পীর সাহেব বলে দিয়েছেন। ঐ নিয়ে চিন্তা করি না।

আপনি এত বোকা কেন?

হীরু আহত চোখে তাকিয়ে রইল। রাগ হবার কথা। কিন্তু রাগ লাগছে না। মনটা খারাপ হয়ে গেছে। চোখে পানি এসে যাচ্ছে। এ্যানা বোধ হয় ব্যাপারটা টের পেল। সে কোমল গলায় বলল, আরেক কাপ চা খাব।

হীরুর মন খারাপ ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে কেটে গেল। সে মনে মনে বলল অসাধারণ মেয়ে। অসাধারণ। এই মেয়ে পাশে থাকলে চোখ বন্ধ করে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়া যায়। বাঘের মুখের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে দেয়া যায়।

এ্যানা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আপনাকে একটা কথা বলব।

কি কথা?

আমার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে?

কি বলছ এই সব।

মা'র খুব ইচ্ছা। মরবার আগে বিয়ে দেখতে চায়।

তোমার বড় বোনেরই তো বিয়ে হয়নি?

ওদের সম্বন্ধ আসে না। আমার এসেছে। ছেলে আরব বাংলাদেশ ব্যাংকে কাজ করে। অফিসার। বড় অফিসার। আগে একটা বিয়ে করেছিল। বউ মরে গেছে। ছেলেপুলে কিছু নেই।

এইসব পাগলামী চিন্তা একদম করবে না। স্টপ। কমপ্লিট স্টপ।

এ্যানা তরল গলায় বলল, কষ্ট করতে ভাল লাগে না। বড়লোকের বউ হতে ইচ্ছা করে। রোজ গাড়ি করে ঘুরব।

ঠাট্টা ভাবলে ঠাট্টা। আমি এখন যাচ্ছি। মা'র বোধহয় ঘুম ভেঙেছে। ঘুম ভেঙে আমাকে না দেখলে পাগলের মত হয়ে যাবে।

বিয়ের ব্যাপারটা ঠাট্টা না সত্যি?

ঠাট্টা ভাবলে ঠাট্টা। সত্যি ভাবলে সত্যি।

এ্যানা চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে শাড়ির আঁচলে মুখ মুছল। হীরুর দিকে না তাকিয়ে বলল-- যাই। হীরু কিছুই বলতে পারল না। তার মনে হল সে ঠিকমত নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। যতটা বাতাস তার দুই ফুসফুসের জন্যে দরকার ততটা বাতাস এখন নেই। চায়ের বুড়ো দোকানদারের সামনে হীরু দাঁড়িয়ে রইল, নড়ল না। তার কেবলি মনে হচ্ছে এক্ষুণি এ্যানা নেমে এসে বলবে -- আপনার সঙ্গে তামাশা করছিলাম। আপনি এমন বোকা কেন? মেয়েদের কোন কথা চট করে বিশ্বাস করতে নেই-- বুঝলেন সাহেব।

এক ঘন্টা পার হল, এ্যানা নামল না। হীরুর মনে হল নির্ঘাত মার ঘুম ভেঙে গেছে! মাকে খাইয়ে টাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে তারপর নামবে।

অপেক্ষা করতে করতে রাত এগারোটা বাজল। এ্যানা নামল না।

চায়ের দোকানদার এক সময় বলল, আর কত চা খাইবেন? বাড়িত যান। চা বেশি খাওয়া ঠিক না। ভাইজান আপনের চা হইছে তেরটা। আপনের এগারোটা আপার দুইটা। তের টাকা পাওনা।

হীরু টাকা বের করে দিল। হাসপাতালের গেট পার হয়ে খোলা রাস্তায় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একজন রিকশাওয়ালা বলল, স্যার ভাড়া যাবেন? সে বিনা বাক্যব্যয়ে রিকশায় উঠে বসল। পরক্ষণেই নরম গলায় বলল, না আমি যাব না। ভাই আপনি কিছু মনে করবেন না। এক্সকিউজ করে দেন।

রিকশায় উঠেই তার মনে হয়েছে, এ্যানা নেমে এসে তাকে না দেখে ফিরে যাচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা, এ্যানার মা'র যদি এই রাতে ভালমন্দ কিছু হয় তাহলে তো বেচারী বিরাট প্রবলেমে পড়বে। এ্যানা তাকে যাই বলুক রাতটা তার থেকে যাওয়াই উচিত।

হীরু দ্বিতীয়বারে ফিমেল ওয়ার্ডে ঢুকতে পারল না। কলাপসেবল গেট অবশ্যি খোলা। দুজন দারোয়ান সেখানে বসে আছে। তারা পাস না দেখে কাউকে ছাড়বে না। রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান ডিউটিতে আছেন। তিনি খুবই কড়া লোক। পাস ছাড়া কাউকে দেখলে তাদের না-কী চাকরি চলে যাবে।

হীরু রাত একটার দিকে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরল। সারা পথ প্রতিজ্ঞা করতে করতে এল -এই জীবনে মেয়েছেলের সঙ্গে সে কোনো কথা বলবে না। মেয়েছেলের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে কাঁচা গু খাওয়া ভাল।

অরু বিছানা থেকে নেমে বারান্দায় গিয়ে বসল। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। অরুর চোখ আবার ভিজে উঠতে শুরু করল। বড় খারাপ লাগছে। সুমনের জন্যে বুকের মাঝখানে সন্ধ্যা থেকেই যন্ত্রণা হচ্ছিল সেই যন্ত্রণা এখন তীব্র হয়ে তাকে অভিভূত করে দিচ্ছে।

সুমনের বয়স তিন। এই বয়সেই সে সব কথা বলতে পারে। তিনটা ছড়া জানে। তাল গাছ ছড়াটা বলার সময় কেমন এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে। পুরো ছড়াটা সে এক পায়ে দাঁড়িয়ে বলতে চেষ্টা করে, শেষ পর্যন্ত অবশ্যি পারে না। ধুপ করে পড়ে যায়। তখন ছলোছলো চোখে বলে-- আম্মা, তালগাছ ব্যথা দেয়।

অরুকে তখন বলতে হয়--আহারে ময়না সোনা।

দিনের মধ্যে কতবার যে ধুপ করে এসে তার কোলে বসবে মিষ্টি মিষ্টি গলায় বলবে, আদর খাও আম্মা। আদর খাও।

তখন অরুকে হামহুম করে আদর খাওয়ার ভঙ্গি করতে হয় আর হেসে লুটুপুটি খায় সুমন। হাসির মধ্যেই সুমন বলে, আরো আদর খাও আম্মা। আরো খাও।

তুমি বড় বিরক্ত করছ সোনামণি। এখন যাও খেলা কর।

না আম্মা তুমি আদর খাও।

সুমনের ছোট হল রিমন। বয়স দেড় বছর। এমন শান্ত বাচ্চা এ পৃথিবীতে আর জন্মেছে বলে অরুর মনে হয় না। ক্ষিধে পেলেও কাঁদবে না। মুখে চুক চুক শব্দ করতে থাকবে। একবার খাইয়ে দিলে হাত-পা এলিয়ে ঘুমুবে কিংবা নিজের মনে খেলা করবে।

বিছানায় চারজনের একসঙ্গে জায়গা হয় না। সুমন ঘুমায় তার দাদীর সঙ্গে। রাতের বেলা চুপিচুপি উঠে এসে অরুর পায়ের কাছে গুটিসুটি মেরে পড়ে থাকে। একদিন দু'দিন না, এই কাণ্ড

হয় রোজ রাতে। আজ বেচারা কার সঙ্গে ঘুমিয়েছে? ঘুম ভেঙে সে কী অরুকে খুঁজছে না?

অরুর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল।

তিথি এসে অরুর সামনে দাঁড়াল। কোমল গলায় বলল, আপা।

অরু চোখ তুলে তাকাল। কিছু বলল না। সে কান্না থামাতে চেষ্টা করছে, পারছে না। কান্না বন্যার জলের মত। বাঁধ দিতে চেষ্টা করলেই যেন বড় বেশি ফুলে ওঠে।

এস আপা বিছানায় শুয়ে গল্প করি।

অরু ধরা গলায় বলল, সুমনের জন্যে মনটা ভেঙে যাচ্ছে রে তিথি।

খুব বেশি খারাপ লাগলে ফিরে যাও।

না-রে ফিরে যাওয়া যাবে না।

এখানে তুমি যে কষ্ট পাবে তারচে বেশি কষ্ট কী দুলাভাইয়ের ওখানে? ওখানে তো তোমার সুমন, রিমন আছে। এখানে কে আছে? আমরা তোমার কেউ না আপা। এস ঘুমুতে এস।

অরু উঠে এল, এখন সে শান্ত। এখন আর কাঁদছে না। কাঁদারও হয়ত সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করার পর কেউ কাঁদতে পারে না। সে শুয়েছে তিথির সঙ্গে। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। আবার উঠে বসে। খাট থেকে নেমে বারান্দায় যায়, জলচৌকির উপর গিয়ে বসে। তিথি এক সময় বলল, বড় বিরক্ত করছ আপা।

ঘুম আসছে না।

চুপচাপ শুয়ে থাক। ছটফট করে লাভ হবে কিছু?

অরু ক্ষীণ গলায় বলল, এখানে এসে ভুল করেছি তাই না?

ভুল করেছ কি শুদ্ধ করেছ তা জানি না। কোনটা ভুল কোনটা ভুল না, তা এখন আব আমি জানি না।

তোরা সবাই বদলে গেছিস।

তিথি তরল গলায় হেসে উঠল। অরু তীক্ষ্ণ গলায় বলল, হাসছিস কেন?

সিরিয়াস সিরিয়াস সময়ে আমার কেন জানি হাসি আসে।

তোর সম্পর্কে যে সব শুনি সেগুলি কী সত্যি?

কি শোন?

অরু চুপ করে রইল। তিথি বলল, মুখে আনতে লজ্জা লাগছে, তাই না? তোমার কী আমার সঙ্গে ঘুমুতে এখন ঘেন্না লাগছে? ঘেন্না লাগলে মায়ের সঙ্গে ঘুমাও।

যা শুনছি সবই তাহলে সত্যি?

হ্যাঁ সত্যি।

বলতে তোর লজ্জা লাগল না?

না।

আমি হলে গলায় দড়ি দিয়ে মরে যেতাম।

না মরতে না। এই যে এত যন্ত্রণার মাঝ দিয়ে তুমি যাচ্ছ তুমি কী গলায দড়ি দিয়েছ? দাওনি। বাঁচার চেষ্টা করছ। করছ না?

অরু ক্ষীণ গলায় বলল, বাচ্চা দু'টার জন্যে বেঁচে আছি। নয়ত কবেই...

তিথি আবার হেসে উঠল। অরু বলল, হাসিস না।

আচ্ছা যাও হাসব না। তুমিও ঘুমুবার চেষ্টা কর।

ঘুম আসছে না।

আমার কাছে ঘুমের অষুধ আছে, খাবে? মাঝে মাঝে আমি খাই। দু'টা আস্ত বোতল আছে এককটাতে বত্রিশটা করে ট্যাবলেট এর পনেরটা খেলেই ঘুম হবে খুবই আনন্দের। খাবে আপা?

অরু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ঠাট্টা করছিস তিথি? আমার এই অবস্থায় তুই ঠাট্টা করতে পারিস?

হ্যাঁ পারি। আমি যে কী পরিমাণ বদলে গেছি তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

তুই আমাকে ফিরে যেতে বলছিস?

বলছি।

একটা ব্যাপার শুধু তোকে বলি তার পরেও যদি তোর মনে হয় আমার চলে যাওয়াই ভাল, আমি চলে যাব।

বেশ তো বল।

অরু কিছু বলল না, চুপ করে রইল। তিথি বলল, বলতে যদি তোমার খারাপ লাগে তাহলে বলার দরকার নেই।

খারাপ লাগবে না, তুই শোন কোন-একজনকে বলার দরকার। কাকে বলব বল? আমার বলার লোক নেই।

অরু খানিকক্ষণের জন্যে থামল। তারপর নিচু গলায় বলতে লাগল - তোর দুলাভাই যে খুব নামাজী মানুষ তা তো তুই জানিস। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে, তাহাজ্জুত পড়ে। রোজ ভোরবেলা আধঘণ্টা কুরআন শরীফ পড়ে।

রাতের বেলা সে কখনো স্বামী-স্ত্রীর ঐ ব্যাপারটায় যাবে না। কারণ তাতে তার শরীর অপবিত্র হবে। গোসল করতে হবে, নয়ত ফজরের নামাজ হবে না। কাজেই সে ফজরের নামাজ শেষ করে কুরআন শরীফ পড়া শেষ করে আমার ঘুম ভাঙাবে। দিনের পর দিন এই যন্ত্রণা। শারীরিক সম্পর্কের মধ্যে কী প্রেম-ভালবাসা থাকতে নেই? তুই কী আমার যন্ত্রণা বুঝতে পারছিস তিথি?

পারছি।

আরো শুনবি?

না।

তিথি দু'হাত বোনকে জড়িয়ে ধরল। দুজন দীর্ঘ সময় বসে রইল চুপচাপ। এক সময় অরু বলল, বাচ্চা দু'টাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না রে তিথি। আমি কাল সকালে চলে যাব।

তিথি কিছু বলল না। অনেকদিন পর তার কান্না পাচ্ছে, অনেক অনেক দিন পর।

## ১৫

ফরিদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কে?

দরজার পাশ থেকে কে যেন সরে গেল। ফরিদা বললেন, ভেতরে এস অজন্তা। অজন্তা ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকল। তার গায়ে স্কুলের পোশাক, হাতে বই-খাতা এবং পানির ফ্লাস্ক। বলল, স্কুলে যাচ্ছ? অজন্তা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মা'কে সে খুব ভয় পায়।

তুমি আরেকটু কাছে আস তো। তোমাকে ভাল করে দেখি।

অজন্তা পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। ফরিদা বললেন, তুমি আগের চেয়ে একটু লম্বা হয়েছ তাই না?

হুঁ।

কত লম্বা হয়েছ জানো সেটা? মেপেছ কখনো?

না।

তাহলে বুঝলে কী করে লম্বা হয়েছ?

জামাটা ছোট হয়েছে।

তাই তো, জামা ছোট হয়েছে। আজ তোমার বাবাকে বলবে কাপড় কিনে যেন দরজির দোকানে দিয়ে আসে।

আচ্ছা।

তুমি কী স্কুলে যাবার আগে রোজই আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাক?

অজন্তা জবাব দিল না। মাথা নিচু করে ফেলল।

আমি বেঁচে আছি কিনা তাই দেখ, ঠিক না?

অজন্তা কথা বলল না, মাথাও তুলল না। তার খুব অস্বস্তি লাগছে।

মা'কে কেন জানি একই সঙ্গে ভয় লাগে এবং ভাল লাগে। ফরিদা বললেন, আমি আরো মাসখানিক বেঁচে থাকব।

অজন্তা এবার চোখ তুলে তাকাল। তার চোখে স্পষ্ট শংকার ছায়া। ফরিদা বললেন, তোমাকে আগেভাগে বললাম যাতে মনে মনে তৈরি হতে পার। এখন যাও।

অজন্তা দরজা পর্যন্ত যেতেই ফরিদা বললেন, তোমার বাবাকে বলবে আজ যেন সে তোমাকে স্কুলে দিয়ে বাসায় চলে আসে। তার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা আছে। বলবে মনে করে। আর নিচে

খটখট শব্দ হচ্ছে কিসের দেখ তো। শব্দ আমার সহ্য হয় না তবু সবাই মিলে এত শব্দ করে। ফরিদা চোখ বন্ধ করে ক্লান্ত শ্বাস ফেললেন।

দবির সাহেবের খুব অস্বস্তিবোধ হচ্ছে। ফরিদা তাকে কী বলতে চায় এটা তিনি ঠিক আঁচ করতে পারছেন না। তিনি মেয়েকে কয়েকবারই জিজ্ঞেস করলেন সে কী বলেছে জরুরি কথা?

অজন্তা বলল, হু।

কী এমন জরুরি কথা তা তো বুঝলাম না।

অজন্তা বলল, বাবা তুমি কী মা'কে ভয় পাও?

দবির সাহেব লজ্জা পেয়ে গেলেন। ভয় পান না এত বড় মিথ্যা মেয়েকে সরাসরি বলতে পারেন না। তার এই মেয়ে খুব বুদ্ধিমতী হয়েছে।

অজন্তাকে স্কুলে নামিয়ে চিন্তিতমুখে দবির সাহেব বাসার দিকে রওনা হলেন। তাঁর কেবলি মনে হতে লাগল. ফরিদা নিশ্চয়ই তিথির কথা তুলবে।

তিথি প্রসঙ্গে ফরিদা এখন পর্যন্ত তাঁকে কিছুই বলেনি। যদিও তিনি নিজ থেকে হড়বড় করে অনেক কিছু বলেছেন। ফরিদা চোখ বড় বড় কবে শুনেছে। কিছুই বলেনি। এটা ফরিদার স্বভাব। কোনো-একটা ঘটনা ঘটে যাবার অনেক দিন পর ফরিদা সেই প্রসঙ্গে কথা বলবে। মনে হয় দীর্ঘদিন সে ঘটনা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। এক সময় স্থির সিদ্ধান্তে আসে। তখন কথা বলে। আজো কী সে কোনো সিদ্ধান্তে এসেছে?

আসব ফরিদা!

ফরিদা হেসে ফেলে বললেন, আমার ঘরে আসতে তো আগে কখনো অনুমতি নিতে না। আজ নিচ্ছ কেন? এস, বস। দবির উদ্দিন শুকনো গলায় বললেন, তোমার শরীর কেমন?

ভালই। খুবই ভাল।

দবির উদ্দিন চিন্তিত মুখে ফরিদাকে লক্ষ্য করলেন -- আজ তাকে অন্য রকম দেখাচ্ছে। চোখে-মুখে অস্বাভাবিক এক উজ্জ্বলতা। ফরিদা বললেন,

আমি আর মাসখানিক আছি।

কী বললে বুঝলাম না।

আমি আর মাসখানিক তোমাকে বিরক্ত করব তারপর তোমার মুক্তি!

দবির উদ্দিন অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কী যে তুমি বল।

ফরিদা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, এখন পর্যন্ত আমি কী কখনো আজেবাজে কথা কিছু বলেছি?

দবির উদ্দিন হ্যাঁ-না কিছু বলতে পারলেন না। ফরিদা মৃদু হাসলেন। পর মুহূর্তেই হাসি গিলে ফেলে বললেন, কী করে বুঝলাম এক মাস আছি তা তো জিজ্ঞেস করলে না।

কী করে বুঝলে?

আমার দুই বান্ধবীর কথা তোমাকে বলেছি না? কাল শেষরাতে তারা আমার ঘরে এসেছিল। এসে বসল আমার পায়ের কাছে। তখন রাত চারটা দশ। আমার মনে আছে, ওরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘড়ি দেখলাম। ওরা বলল. ফরিদা তোকে ছাড়া আমাদের কেমন জানি একলা লাগে। তুই চলে আয়। আমরা তোকে নিতে এসেছি। আমি বললাম, আমার নিজেরো এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না। তোরা এসেছিস ভালই হয়েছে। তবে এখানকার কাজকর্ম গুছিয়ে তারপর যাব। তোরা এক মাস পরে আয়। তারা বলল. আচ্ছা।

দবির উদ্দিন বললেন, এইসব হচ্ছে স্বপ্ন। স্বপ্নে মানুষ কত কিছু দেখে. স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামানো ঠিক না।

তুমি সব সময় বাজে কথা বল। আমি কী বলছি শোন এটা স্বপ্ন না।

আচ্ছা বেশ, স্বপ্ন না।

আমি আমার মেয়েটার জন্যে চিন্তা করি। আমি মারা যাবার পর সে খুব কষ্টে পড়বে।

কষ্টে পড়বে না। ওকে আমি কী পরিমাণ ভালবাসি এটা তুমি জানো না।

জানি। জানব না কেন। তুমি অজন্তার নামে এই বাড়িটা লিখে দাও। দলিল-টলিল করবে মিউটেশন করবে। সব ঝামেলা এক মাসের মধ্যে শেষ করবে।

তার কোনো দরকার আছে?

না থাকলে বলছি কেন।

তুমি যা চাও তাই হবে।

ফরিদা চোখ বন্ধ করে ফেললেন। এতক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলে তিনি সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। চোখ মেললেন অনেকক্ষণ পরে। দবির উদ্দিন বললেন, আমি কী এখন চলে যাব? জরুরি কিছু কাজ ছিল।

আর খানিকক্ষণ বস। তোমাকে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন। আজই বলে ফেলি।

বল।

তিথিকে নিয়ে তুমি যে বের হয়েছিলে এতে আমি রাগ করিনি। মানুষ ফেরেশতা নয়। তুমি দিনের পর দিন একা কাটিয়েছ। শরীরের একটা দাবি তো আছেই। আমি কিছু মনে করি না।

তিথির সঙ্গে কথা বলা ছাড়া আমি...

জানি। তবে কথা বলার বাইরে কিছু হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। এই ব্যাপারটা আমার নিজেরই দেখা উচিত ছিল। দেখতে পারিনি।

দবির উদ্দিন ক্ষীণ গলায় বললেন, এই প্রসঙ্গটা থাক।

থাকবে কেন? লজ্জা পাচ্ছ?

হুঁ।

লজ্জার কিছু নেই। তুমি তাকে নিয়ে বের হতে যদি লজ্জা না পাও কথা বললে লজ্জা পাবে কেন? তাছাড়া তোমাকে লজ্জা দেবার জন্যেও বলছি না। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা উচিত তাই আলোচনা করছি।

বেশ আলোচনা কর।

দবির উদ্দিন মাথা নিচু করে ফেললেন, ফরিদা এই দৃশ্য দেখে কেন জানি হেসে ফেললেন।

তুমি কী আমাকে পাশ ফিরিয়ে দিবে? এখন আর নিজে নিজে পাশ ফিরতে পারি না।

দবির উদ্দিন স্ত্রীকে পাশ ফিরিয়ে দিলেন। ফরিদা বললেন, তুমি যখন লজ্জা পাচ্ছ তখন ঐ প্রসঙ্গ থাক। তোমাকে লজ্জা দিতে ইচ্ছা করছে না। বরং অন্য একটা প্রসঙ্গে কথা বলি।

বল।

আমি সংসারের খরচ থেকে কিছু টাকা আলাদা করে রাখতাম এটা তুমি নিশ্চয়ই জানো?

জানি।

পরশু হিসাব করলাম। আমার ধারণা ছিল অনেক টাকা হয়েছে। আসলে অনেক হয়নি অল্পই জমেছে...

তোমার টাকার দরকার থাকলে বল আমি তোমাকে দিচ্ছি।

কথা শেষ করার আগেই তুমি কথা বল কেন? বড় বিরক্ত লাগে। যা বলছিলাম শোন, আমি পরশুদিন দেখি মাত্র এগার হাজার তিনশ তেত্রিশ টাকা জমেছে। এই টাকাটা দিয়ে কী করা যায় বল তো?

কী করতে চাও?

সেটাই তো বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারলে কী তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম?

অজন্তাকে দিয়ে দাও।

না। ওকে যা দেবার তুমিই দেবে, আমি এই টাকাটা তিথিকে দিতে চাই।

দবির উদ্দিন এই কথায় তেমন বিস্মিত হলেন না। তাঁর কেন যেন মনে হচ্ছিল ফরিদা এই কাজটিই করবে। তিনি বললেন, ও তোমার টাকা নেবে না।

কেন নেবে না?

তা জানি না। তবে সে যে নেবে না এইটুকু জানি।

আমারও তাই ধারণা। তবে ও যেন নেয় সেই ব্যবস্থা সহজেই করা যায়।

কী ভাবে?

আমি মরবার পর তুমি তাকে বল টাকাটা আমি তার জন্যে রেখে গেছি তাহলে সে একটা সমস্যায় পড়বে। জীবিত মানুষের কথা আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি মৃত মানুষের কথা পারি না। তাছাড়া আমি তাকে একটা চিঠিও লিখে রেখে যাব। তুমি খুব দামী কিছু কাগজ কিনে এনো তো।

দামী কাগজ লাগবে কেন?

শেষ চিঠিটা দামী কাগজে লিখতে ইচ্ছা করছে।

বেশ, আনব দামী কাগজ। এখন তাহলে উঠি?

না, আরেকটু বস।

ফরিদা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন। দবির উদ্দিন অস্বস্তি বোধ করছেন তাঁর কাছে ফরিদার দৃষ্টি খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। তার চোখ তো এত উজ্জ্বল কখনো ছিল না। ফরিদা বললেন, চিঠিটা লিখব কী করে বল তো? আমি তো হাতই নাড়তে পারি না।

আমি লিখে দেব।

ফরিদা হাসলেন। প্রথমে মৃদু স্বরে, পরক্ষণেই সেই হাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। দবির উদ্দিন হাসির কারণটা ধরতে পারলেন না। তার কাছে মনে হচ্ছে এই হাসি স্বাভাবিক মানুষের হাসি না একজন অসুস্থ মানুষের হাসি।

ফরিদা বললেন, তুমি আমার হাতটা একটু ধর তো, দেখি কী ভাবে হাত ধর।

কী বললে?

আমার হাতটা একটু ধর।

দবির উদ্দিন, ফরিদার হাতে হাত রাখলেন। রোগশীর্ণ পাণ্ডুর হাত। নীল শিরাগুলি পর্যন্ত ফুটে রয়েছে। ফরিদা অস্পষ্ট স্বরে বললেন, কারণে-অকারণে তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, তুমি কিছু মনে করো না।

ফরিদার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

## ১৬

টুকু অরুকে ফিরিয়ে দিতে যাচ্ছে।

যাচ্ছে বাসে। অরু বসার জায়গা পেয়েছে টুকু তার পাশেই হ্যান্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে। অরু বলল, টুকু তুই আমার কোলে বোস।

টুকু খুব লজ্জা পেল। কারো কোলে বসে যাবার বয়স কী আছে? তার বয়স বাড়ছে এই কথাটা কারোরই মনে থাকে না। টুকুর প্যান্টের স্টাব সিগারেটের প্যাকেটে তিনটা সিগারেট পর্যন্ত আছে। এই খবর জানতে পারলে আপার নিশ্চয়ই খুব মন খারাপ হবে।

দাউদকান্দিতে পৌঁছবার পর টুকু বসার জায়গা পেল। অরুর পাশের বৃদ্ধা নেমে গেছেন। অরু বলল, তুই জানালার পাশে বসবি টুকু?

না।

আয় না বোস, সুন্দর দেখতে দেখতে যাবি।

তুমি দেখতে দেখতে যাও।

আপার দিকে তাকাতে টুকুর বড় ভাল লাগছে। ফিরে যাবার আনন্দে আপার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে আছে, কেমন ছটফট করছে - আনন্দে ধরে রাখতে পারছে না।

অরু নিচু গলায় বলল, টুকু তোর কী মনে হয়, আমাদের দেখলে তোর দুলাভাই রাগারাগি করবে?

জানি না আপা।

কিছু তো করবেই। পুরুষ মানুষের এমনিতেই রাগ বেশি থাকে। তোকে হয়ত কিছু বকাঝকা দিবে, তুমি কিছুই মনে করিস না।

আমি কিছু মনে করি না।

মনে না করাই ভাল। এত কিছু মনে পুষে রাখলে সংসার চলে না।

কথা বলো না আপা। সবাই শুনছে।

অরু চুপ করে গেল, কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ থাকতে পারল না। ফিসফিস করে বলল -- সুমন আমাকে দেখলে কী করবে আন্দাজ কর তো টুকু?

টুকু জবাব দিল না। অরু বলল, প্রথম এরকম ভান করবে যে আমাকে চিনতে পারছে না। ওর এই স্বভাব। তার বাবা একবার তিন দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিল, ফিরে আসার পর সুমন এমন ভাব করেছে যেন বাবাকে চেনে না অথচ ঠিকই চিনেছে। রিমন আবার ঠিক তার উল্টো। শব্দ পেলেই ঝাঁপ দিয়ে কোলে পড়বে।

আপা চুপচাপ বস তো।

রিমনের শার্টটা ছোটই হয় কিনা কে জানে। সুমনের জন্যে একটা পাঞ্জাবি কিনেছি আর রিমনের জন্যে শার্ট। একটু বড় কেনার দরকার ছিল। ওদের কাপড়গুলি তুই দেখেছিস?

না।

দেখবি?

এখন দেখব না আপা। আর তুমি এত কথা বলছ কেন?

কেউ তো আর শুনতে পারছে না, ফিসফিস করে বলছি।

চুপচাপ বসে থাক আপা, ঘুমুবার চেষ্টা কর।

দূর বোকা, বাসে কেউ ঘুমায়?

তারা বাড়িতে পৌঁছল সন্ধ্যার ঠিক আগে আগে। আব্দুল মতিনের সঙ্গে দেখা হল বাংলাঘরের সামনে। সে মাগরেবের নামাজের জন্যে অজু করছিল। মতিন কড়া গলায় বলল, কে?

টুকু বলল, দুলাভাই আমরা।

আমরা! আমরাটা আবার কে?

আপাকে নিয়ে এসেছি দুলাভাই।

কে আনতে বলেছে?

অরু নিচু গলায় বলল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকাবকি করছ কেন? ঘরে যাই তারপর...

এ দেখি ফড়ফড় করে কথাও বলে।

টুকু বিস্মিত গলায় বলল, এই সব কী বলছেন দুলাভাই?

আব্দুল মতিন খেঁকিয়ে উঠল, চামচিকা দেখি আমাকে ধমক দেয়। দূর হ হারামজাদা।

টুকু হতভম্ব হয়ে গেল। হৈচৈ শুনে লোকজন জড়ো হয়েছে। ভেতর থেকে অরুর এক মামাশ্বশুর বের হয়েছেন। তিনি কোনো কথা বললেন না। সুমন তার গলা জড়িয়ে ধরে আছে এবং ভীত চোখে তাকাচ্ছে তার বাবার দিকে। অরু অসহায় ভঙ্গিতে ছেলের দিকে এগিয়ে গেল। আব্দুল মতিন চেঁচিয়ে উঠল, এই কোথায় যাস তুই, খবরদার।

অরুর চোখে পানি এসে গেছে, সে গুছিয়ে কিছু চিন্তা করতে পারছে না। কী করবে সে? ছুটে গিয়ে তার স্বামীর পায়ে উপুড় হয়ে পড়বে। কিন্তু এত লোকজন চারদিকে জড়ো হচ্ছে— আহা, যদি কেউ না থাকত। অরু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, তুমি এ রকম করছ কেন?

চুপ। চুপ।

বয়স্ক অপরিচিত এক ভদ্রলোক বললেন, ভিতরে নিয়া যান। যা হওনের হইছে। আব্দুল মতিন কঠিন গলায় বলল, যেটা জানেন না সেটা নিয়ে কথা বলবেন না। এর ছোট বোন বেশ্যাবৃত্তি করে এটা জানেন?

অরু জলভরা চোখে টুকুর দিকে তাকিয়ে বলল, চল, চলে যাই।

টুকু বলল, চল।

অরু তার ছেলের দিকে তাকাল। সুমনের চোখে অপরিচিতের দৃষ্টি। যেন মা'কে সে চিনতে পারছে না।

টুকু বোনের হাত ধরল। কোমল গলায় বলল, চল আপা। এতগুলি মানুষ তাদের চারপাশে- কেউ কিছুই বলল না।

রাত দু'টায় ঢাকা যাওয়ার একটা ট্রেন আছে। তারা স্টেশনে বসে রইল। টুকু ভেবেছিল আপা পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। দেখা গেল অরু বেশ শক্তই আছে। টুকু বলল, কিছু খাবে আপা?

অরু বলল, টাকা আছে?

আছে কিছু।

টিকিট কাটার তো টাকা লাগবে। ঐ টাকা আছে?

আমার টিকিট লাগবে না। তোমার টিকিটা কাটব।

তাহলে যা কিছু কিনে আন। খুব ক্ষিধে লেগেছে।

পরোটা ভাজি আনব আপা?

আন।

টুকু পরোটা, আলুভাজি আর কলা নিয়ে এল। অরু বেশ আগ্রহ করেই খেল। তার সত্যি সত্যিই খুব ক্ষিধে পেয়েছিল।

আপা।

কী রে?

আমার কী মনে হচ্ছে জানো? আমার মনে হচ্ছে - ওরা আমাদের খোঁজে স্টেশনে আসবে। বাড়িতে মুরুব্বি আছে, তারা যখন শুনবে তখন...

অরু সহজ গলায় বলল, কেউ আসবে না। টুকু, আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। কী করি বল তো? কয়েক রাত ঘুম হয়নি এখন ঘুমে একেবারে চোখ জড়িয়ে আসছে।

মেয়েদের ওয়েটিং রুমে বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমাও। চল যাই।

চল।

লম্বা কাঠের বেঞ্চিতে অরু কুণ্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে পড়ল। মাথার নিচে হ্যান্ড ব্যাগ। শোবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘুমিয়ে পড়ল। টুকু সারাক্ষণই বোনের পাশে বসে রইল। এক সময় দেখল ঘুমের মধ্যেই অরু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত টুকুর প্রথম গল্পে এই দৃশ্যটি ছিল। চমৎকার একটি গল্প, যদিও বেশির ভাগ মানুষই এই গল্প পড়ল না। পত্রিকার সাহিত্য সম্পাদক কী মনে করে জানি টুকুকে একটি চিঠি লিখলেন। সেই চিঠিতে অনেক খানি উচ্ছ্বাস ছিল। সাহিত্য সম্পাদকরা কখনো এই জাতীয় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন না।

বাড়ি ফিরেও অরু তেমন কোনো আবেগ বা উচ্ছ্বাস দেখাল না। মনে হল জীবনের কঠিন বাস্তবকে সে সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। একবারও নিজের বাচ্চা দুটির কথা বলল না। তিথিকে বলল, তুই কী আমার জন্যে কোনো চাকরি-টাকরি জোগাড় করে দিতে পারবি?

তিথি বলল, আমি চাকরি কোথায় পাব আপা?

অরু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তাও তো ঠিক। যে কোনো ধরনের চাকরি হলেই হয়। আয়ার কাজও করতে পারি। আজকাল তো শুনেছি বড়লোকদের বাড়িতে বেতন দিয়ে আয়া রাখে।

আমি এইসব খোঁজ রাখি না আপা।

পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিলে লাভ হবে?

জানি না আপা।

তোর তো অনেকের সঙ্গে জানাশোনা সবাইকে যদি বলে-টলে রাখিস...

আমার সঙ্গে কারোর কোনো জানাশোনা নেই, এইসব নিয়ে আমাকে বিরক্ত করো না তো আপা।

আচ্ছা আর বিরক্ত করব না।

দিন পনের পরে আব্দুল মতিনের পক্ষ থেকে উকিলের চিঠি এসে উপস্থিত হল। সেই চিঠির বক্তব্য হচ্ছে আব্দুল মতিন তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে নিতে সক্ষম হচ্ছে না। কারণ তার স্ত্রী নষ্ট চরিত্রের অধিকারী। আব্দুল মতিন স্ত্রীর চরিত্র সংশোধনের অনেক চেষ্টা করেও সফলকাম হয়নি। স্ত্রীর কারণে সে সামাজিকভাবে অপদস্ত হয়েছে। মানুষের সামনে মুখ দেখাতে পারছে না। কাজেই সে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের এবং দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে তার স্ত্রী শাহানা বেগম ওরফে অরুকে ইসলামী বিধি মোতাবেক তালাক দিচ্ছে।

এই চিঠিতেও অরুর কোনো ভাবান্তর হল না। মনে হল সে আগে থেকেই জানত এ ধরনের একটি চিঠি আসবে। মিনু খুব কান্নাকাটি করতে লাগলেন।

জালালুদ্দিন গম্ভীর হয়ে বললেন, কান্নাকাটি করে লাভ নেই, সবই কপালের লিখন। শুধু বংশের ওপর একটা দাগ পড়ে গেল - এটাই আফসোসের কথা। এত বড় বংশ।

হীরু খুব চেঁচামেচি করতে লাগল, হারামজাদা ভেবেছে কী, হারামজাদাকে আমি হাইকোর্টে নিয়ে তুলব। জেলের ভাত খাওয়াব। জেলের মোটা ভাত পেটে পড়লে বুঝবে 'লাইফ' কাকে বলে। এমনি এমনি ছাড়ব আমি সেই পাত্রই না। কাস্টডি মামলা করব। সুমন, রিমন থাকবে তার মা'র সাথে।

অরু বলল, চেঁচাস না তো- চুপ কর।

চুপ করব কেন? কাস্টডি মামলা করলে বাপ বাপ করে সুমন, রিমনকে দিয়ে যাবে।

ওদের এখানে দিয়ে গেলে লাভ কী হবে? খাওয়াব কী? যেখানে আছে, ভালই আছে। তুই

খামোখা চিৎকার করিস না।

তোমার নিজের বাচ্চাদের জন্যে তোমার হার্টে কোনো 'লাভ' নেই?

না।

বল কী?

এত গাধা তুই কী করে হলি, বল তো হীরু?

গাধা?

হ্যাঁ গাধা। যত দিন যাচ্ছে তুই ততই গাধা হচ্ছিস।

হীরু মন খারাপ করে বেরিয়ে গেল। মেয়েছেলের মতিগতি বোঝা খুব মুশকিল। ভাল বললে মন্দ বুঝে। কী অদ্ভুত একটা জাত আল্লাহতালা সৃষ্টি করেছেন। এই জাতের মুখের দিকে তাকানও উচিত না। নিমক হারাম জাত।

নারী জাতির ওপর হীরুর ভক্তি-শ্রদ্ধা কোনো কালেই বেশি ছিল না। ইদানীং নারী জাতিকে সে সহ্যই করতে পারছে না। কারণ এ্যানার বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে গেছে। এ্যানার মা হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে মেয়ে বিয়ের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। শেষপর্যন্ত যে ছেলেটির সঙ্গে বিয়ে ঠিকঠাক হয়েছে সে ডাক্তার। প্রাইভেট ক্লিনিকে চাকরি করে। চেহারাও ভাল। অপছন্দ করার মত কিছু তার মধ্যে নেই। হীরু খোঁজ নিয়ে জেনেছে ইতিমধ্যে এ্যানা দু'দিন সেই ডাক্তারের সঙ্গে চাইনিজ খেতে গিয়েছে।

হীরু পীর সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, লজ্জার মাথা খেয়ে পীর সাহেবকে ব্যাপারটা বলেছে। পীর সাহেব হাসিমুখে বলেছেন- চিন্তার কিছু নাই রে ব্যাটা। চিন্তার কিছু নাই। সবই আল্লাহর হুকুম।

হীরু বিনীতভাবে বলেছে, আল্লাহর হুকুমটা কী সেটা যদি একটু জেনে দেন। বড় অশান্তিতে আছি।

পীর সাহেব অভয় দেয়া স্বরে বললেন, তোর চিন্তার কিছু নাই।

হীরু এই প্রথম পীর সাহেবের কথায় বিশেষ ভরসা পেল না। ডাক্তার ছেলে, চেহারা ভাল, বয়স অল্প, নারায়ণগঞ্জে বাড়ি আছে- এই ছেলেকে ফেলে এ্যানা আসবে তার কাছে। গাধা টাইপ মেয়ে হলেও একটা কথা ছিল। এ্যানার মত বুদ্ধিমতী একটা মেয়ে কী কখনো এই কাজ করবে?

ডাক্তার ছেলেটিকে একটা উড়ো চিঠি পাঠানোর চিন্তা হীরুর মাথায় এসেছিল। সেই উদ্দেশ্যে অনেক ঝামেলা করে নারায়ণগঞ্জের ঠিকানাও জোগাড় করেছিল। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে চিঠির একটা খসড়াও দাঁড় করিয়েছিল।

ডাক্তার সাহেব,

সালাম পর সমাচার এই যে, পরম্পরায় শুনিতে পাইলাম এ্যানা নাম্নী জনৈকার সহিত আপনার বিবাহ। এক্ষণে আপনাকে জানাইতেছি যে, এই মেয়েটির চরিত্র উত্তম নয়। পাড়ার যে কোনো ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেই ইহা জানিতে পারিবেন। চরিত্র দোষ ছাড়াও এই মেয়েটির মেজাজ অত্যন্ত উগ্র। বিবাহ করিবার আগে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করিবেন। তাহা যদি না করেন তা হইলে আপনার বাকি জীবন ছারখার হইয়া যাইবে।

ইতি-

আপনার জনৈক বন্ধু।

শেষপর্যন্ত চিঠিটা হীরু পাঠাতে পারল না। এ্যানা সম্পর্কে আজেবাজে কথা লিখতে ইচ্ছা করল না। একটা ভাল মেয়ের নামে বদনাম দেয়াটা ঠিক না। তারচে বরং ছেলেটার নামে কিছু বদনাম এ্যানার কানে উঠিয়ে দিয়ে দেখা যেতে পারে। অনেক চেষ্টায় সেই সুযোগ পাওয়া গেল। বাস স্টপে এ্যানাকে একা পাওয়া গেল। হীরু হাসি মুখে এগিয়ে গেল।

কী খবর এ্যানা?

এ্যানা সহজ ভঙ্গিতে বলল, কোন খবরটা জানতে চান?

বিয়ে হচ্ছে শুনলাম।

ঠিকই শুনেছেন।

ডেট হয়ে গেছে না-কী?

এখনো হয়নি তবে শিগগিরই হবে।

ব্যাপারটা নিয়ে একটা সেকেন্ড থট দাও। বিয়ে দু'একদিনের ব্যাপার না। সারা জীবনের ব্যাপার। শেষে আফসোসের সীমা থাকবে না।

এ্যানা হাসি হাসি মুখে বলল, ছেলের চরিত্র খুব খারাপ তাই না?

হীরু খানিকটা হকচকিয়ে গেল। যে কথা তার নিজের বলার কথা সেই কথা এ্যানা বলে ফেলায় গুছিয়ে রাখা কথাবার্তা সব এলোমেলো হয়ে গেল।

এ্যানা বলল, আপনি কী ভেবেছেন ছেলেটার চরিত্র খারাপ শোনামাত্র আমি বিয়ে ভেঙে দেব?

কবে নাগাদ হবে বিয়েটা?

বললাম তো এখনো ডেট হয়নি। ডেট হলে আপনাকে জানাব।

তোমার রেজাল্ট কবে হবে?

রেজাল্ট তো গত সপ্তাহেই হল। আপনার পীর সাহেবের খবর ছাড়া আপনি দেখি আর কোনো খবরই রাখেন না।

পাস করেছ?

হ্যাঁ। ফার্স্ট ডিভিশন, চারটা লেটার।

ঠাট্টা করছ?

ঠাট্টা করব কেন? আপনি কী আমার দুলাভাই?

হীরু এর উত্তরে কী বলবে ভেবে পেল না। কথাবার্তা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকাও ভাল দেখায় না। অথচ কোনো কথাই মনে আসছে না।

কোন কলেজে ভর্তি হবে?

জানি না। ও যেখানে ভর্তি করায়।

কী পড়বে?

আইএসসি পাস করে ডাক্তারি পড়ব। স্বামী-স্ত্রী দুজন ডাক্তার হলে খুব ভাল হয়।

হীরু মনে মনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। মনটা ক্রমেই বেশি খারাপ হযে যাচ্ছে। এই মেয়ে জাতটা বড় অদ্ভুত। কী বললে পুরুষ মানুষের মন ভাল হয় সেটা যেমন জানে আবার কী বললে পুরুষ মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যায় সেটাও জানে।

বাস এসে গেল। এ্যানা বাসের দিকে এগুতে এগুতে অবলীলায় বলল, বিয়েতে আসবেন কিন্তু। রাগ করে বাসায় বসে থাকবেন না।

এ্যানা বাসে উঠে গেল।

হীরু হতভম্ব হয়ে লক্ষ্য করল তার চোখে পানি এসে গেছে। কী লজ্জার কথা! সে একজন পুরুষ মানুষ আর তার চোখে কি-না পানি? সম্ভবত এটা কেয়ামতের নিশানা। পীর সাহেব একবার বলেছিলেন— "কেয়ামত যত কাছে আসবে উল্টাপাল্টা ব্যাপার ততই বেশি হতে থাকবে। মেয়েছেলে হবে পুরুষের মত তাদের দাড়ি-গোঁফ গজাবে, হায়েজ-নেফাস হবে বন্ধ। আর পুরুষ হবে মেয়েদের মত। পুরুষদের দাড়ি উঠবে না। প্রতি মাসে কয়েক দিন তাদের লিঙ্গ দিয়ে দুষিত রক্ত বের হবে। ওহ আল্লাহতালার কী কুদরত! বলেন— ইয়া নবী সালাম আলায় কা..."

## ১৭

অনেকদিন পর তিথি, নাসিমুদ্দিনের কাছে এসেছে। নাসিম দরজা খুলে অবাক, আরে তুমি?

তিথি নিচু গলায় বলল, কেমন আছেন নাসিম ভাই? শরীর এমন কাহিল লাগছে কেন?

ইনফ্লুয়েঞ্জার মত হয়েছিল। প্রতি বছর শীতের শুরুতে এরকম হয়। জ্বরজ্বারি। এবার খুব বেশি হয়েছে। এস ভেতরে এস।

তিথি ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ভাবী বাসায় নেই?

না, বাপের বাড়ি গেছে। ছেলেপুলে হবে।

আবার?

নাসিম লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল। দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, তুমি অনেকদিন আস না দেখে ভাবলাম তোমার সমস্যার সমাধান হয়েছে। বিয়ে-শাদী করে সংসার পেতেছ। এ রকম হয়। চিরকাল তো আর খারাপ যায় না।

কারোর কারোর আবার যায়।

তোমাকে দেখে মনটাই খারাপ হয়ে গেল। মেয়েদের এই কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না-- আর অমিই কি-না এর দালালি করি।

কেন করেন?

অভাব, বুঝলে তিথি-- অভাব। প্রথম যখন এই রকম দালালি করলাম তখন মনের অবস্থাটা কী হয়েছে শোন -- তিনশ টাকা পেয়েছি। টাকাটা বাসায় নিয়ে আসলাম। রাত তখন এগারটা, ঝুম বৃষ্টি। এই বৃষ্টির মধ্যে...

বৃষ্টির মধ্যে কী?

বাদ দাও। ঐ সব বলে কী হবে। আমি এই লাইন ছেড়ে দিব তিথি। মীরপুরে একটা দোকান নিচ্ছি - টেইলারিং শপ।

দরজির কাজ আপনি জানেন?

না জানি না। কারিগর রাখব। নিজে শিখে নিব।

ভালই তো। কিন্তু আমাদের মত মেয়েদের কি অবস্থা হবে? আমরা তো সেই পথে পথেই ঘুরব। আপনার মত একজন ভাল মানুষ পাশে থাকলে মনে সাহস থাকে।

ভালমানুষ। আমি ভালমানুষ? এই কথা না বলে স্যান্ডেল খুলে তুমি আমার গায়ে একটা বাড়ি দিলে না কেন? তাহলেও তো কষ্ট কম পেতাম। চা খাবে?

না।

খাও একটু চা। তোমার উপলক্ষে আমিও এক ফোঁটা খাই।

রান্নাবান্না নিজেই করেন?

হ্যাঁ। চারটা ডালভাত খাবে আমার সাথে?

জি-না।

নাসিম রান্নাঘরে গিয়ে গ্যাসের চুলায় কেতলি বসিয়ে দিল। তিথি পেছনে পেছনে গেল। নাসিম বলল, তুমি কী কাজের সন্ধানে এসেছে?

হুঁ।

একটা কাজ হাতে আছে। কোরিয়া থেকে তিনজনের একটা টিম এসেছে। জয়েন্ট ভেনচারে বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রি খুলবে। ওদরে খুশি করবার জন্যে বাংলাদেশী পার্টনাররা উঠেপড়ে লেগেছে। ওদের তিনজনের জন্যে তারা তিনজন বান্ধবী চায়। এরা তাদের সাথে ঘুরবে। রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার এই সব জায়গায় যাবে, চার-পাঁচদিনের ব্যাপার। তুমি যাবে?

তিথি জবাব দিল না।

নাসিম বলল, টাকা-পয়সা ভালই পাবে। ওদের সঙ্গে ঘুরলে মনটাও হয়ত ভাল থাকবে।

তিথি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, মন ভাল থাকবে?

এমনি বললাম তিথি। কথার কথা। নাও.চা নাও।

তিথি নিঃশব্দে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগল। নাসিম বলল, তুমি যদি যেতে চাও তাহলে ১১ তারিখের মধ্যে জানাবে। ওরা ১২ তারিখ রওনা হবে।

টাকা কেমন দেবে জানেন?

না। হাজার পাঁচেক তো পাবেই।

আজ তাহলে উঠি নাসিম ভাই?

এস তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি, যাবে কোথায়? বাসায় তো?

হ্যাঁ।

চল।

নাসিমুদ্দিন তাকে উঠিয়ে দিল। জোর করে হাতে একশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিল। বাস ছেড়ে না-দেয়া পর্যন্ত বাস স্টপে দাঁড়িয়ে রইল।

জালালুদ্দিন সাহেব খুবই আদরের সঙ্গে বললেন, জনাব আপনার নাম এবং পরিচয়? ভদ্রলোক বললেন, আমার নাম দবির উদ্দিন। আগেও একবার এসেছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

কিছুই মনে থাকে না ভাই সাহেব। চোখে না দেখরে মনে থাকবে কী ভাবে বলেন? দৃষ্টিশক্তি নেই। সামান্য চিকিৎসায় আরাম হয়। সেটাই কেউ করাচ্ছে না। বসুন ভাই।

আমি আপনার মেয়ের কাছে এসেছিলাম, তিথি।

তিথি বাসায় নেই। এসে পড়বে। একটু বসেন। সুখ-দুঃখের কথা বলি, আপনের দেশ কোথায়?

দবির উদ্দিন তাঁর দেশ কোথায় সেই প্রসঙ্গে গেলেন না। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন।

আপনার জন্যে এক প্যাকেট সিগারেট এনেছিলাম।

সত্যি?

জি, এই নিন।

সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিয়ে আনন্দ ও বিস্ময়ে জালালুদ্দিন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। পৃথিবীতে এখনো এত ভালমানুষ আছে?

ভাই সাহেব বড়ই খুশি হলাম। বসুন একটু চায়ের কথা বলে আসি। দিবে কী না বলতে পারছি না। আপনি বন্ধু মানুষ, আপনাকে বলতে বাধা নেই — এই সংসারে আমি কুকুর-বিড়ালের অধম। বিড়াল যদি একবার ম্যাও করে — তার সামনে একটা কাঁটা ফেলে দেয়। আমার বেলায় তাও না।

জালালুদ্দিন সাহেব চায়ের কোনো ব্যবস্থা করতে পারলেন না। মিনু চায়ের কথা শুনে এমন এক ধমক দিলেন যে জালালুদ্দিন সাহেবের মনে হল সংসারে বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না। এরচে রাস্তায় ভিক্ষা করা এবং রাতে কমলাপুর রেলস্টেশনে শুয়ে থাকা অনেক ভাল। শেষপর্যন্ত হয়ত তাই করতে হবে। এমন বিশিষ্ট একজন মেহমান অথচ তাকে এক কাপ চা খাওয়ানো যাচ্ছে না। এরচে আফসোসের ব্যাপার আর কী হতে পারে?

ভাই সাহেব নিজগুণে ক্ষমা করবেন। চা খাওয়াতে পারলাম না।

ঐ নিয়ে চিন্তা করবেন না। তিথি কখন আসবে বলে আপনার মনে হয়?

কিছুই বলতে পারছি না ভাই সাহেব। এই সংসারের কোনো নিয়ম-কানুন নাই। যার যখন ইচ্ছা আসে। যখন ইচ্ছা যায়। সরাইখানারও কিছু নিয়ম-কানুন থাকে এই বাড়ির তাও নাই।

আমার খুবই জরুরি কাজ আছে আমাকে চলে যেতে হবে। আমি আপনার কাছে কী একটা প্যাকেট রেখে যাব — তিথিকে দেবার জন্যে। রেখে যান।

আপনার মনে থাকবে তো? ভুলে যাবেন না তো আবার?

জি-না ভুলব না।

প্যাকেটের ভেতর একটা জরুরি চিঠিও আছে।

আমি দিয়ে দেব। আপনি চিন্তা করবেন না। আসামাত্র দিয়ে দেব।

আজ তাহলে উঠি?

কোন মুখে আর আপনাকে বসতে বলি? এক কাপ চা পর্যন্ত দিতে পারলাম না। বড়ই শরমিন্দা হয়েছি ভাই সাহেব। নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

দবির উদ্দিনের চিঠিটি দীর্ঘ এবং সুন্দর করে লেখা। চিঠি পড়লেই বোঝা যায় ভদ্রলোক বেশ সময় নিয়ে লিখেছেন। ঠিকঠাক করেছেন। একটা রাফ কপি করবার পর আবার ফেয়ার কপি করা হয়েছে — কারণ চিঠিতে কোনো রকম কাটাকুটি নেই।

তিথি খুব আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা পড়ল। অনেক দিন পর কেউ তাকে চিঠি লিখল। তাও এমন গুছিয়ে লেখা চিঠি।

প্রিয় তিথি,

একটা দুঃসংবাদ দিয়ে চিঠি শুরু করছি। আমার স্ত্রী ফরিদা মারা গেছে। এই মাসের ১৮ তারিখে। সৌভাগ্যক্রমে মৃত্যুর সময় আমি তার পাশে ছিলাম। সে আমাকে বলল, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। মনে কোনো রাগ রেখো না। তার মৃত্যু খুব সহজ হয়নি। নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হল। এই কষ্ট চোখে দেখা যায় না। এই প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যেও সে হাসি হাসি মুখ হয়ে বলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই সব কষ্ট শেষ হবে ভাবতেই আনন্দ লাগছে।

ফরিদা তোমার জন্যে কিছু টাকা রেখে গেছে। আশা করি মৃত মানুষের প্রতি সম্মান দেখিয়ে টাকাটা তুমি গ্রহণ করবে। টাকার পরিমাণ তেমন কিছু না তবে প্রতিটি টাকাই ফরিদার। সে কোন-এক বিচিত্র কারণে তোমাকে পছন্দ করেছে। ফরিদার ঘৃণা এবং ভালবাসা দুইই খুব তীব্র।

ফরিদার মৃত্যুর পর বুঝলাম তাকে আমি কী পরিমাণ ভালবাসতাম। আজ আমার দুঃখ ও বেদনার কোনো সীমা নেই।

অজন্তা খুব কষ্ট পাচ্ছে। তবু এই কষ্টের মধ্যেও আমার কষ্টটা তার বুকে বাজছে। সে তার নিজের মতো করে আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে। এই দৃশ্যটিও মধুর।

তিথি এই মধুর দৃশ্যটি কী তুমি এসে দেখে যাবে? যদি এই দৃশ্য তোমার ভাল লাগে তাহলে তুমি এসে যোগ দাও আমাদের সঙ্গে। তোমার শুরুর জীবনটা কষ্টের ছিল, শেষেরটা মধুর হতে ক্ষতি কী? এস ধরে নেই যে, আমাদের কারোর কোনো অতীত ছিল না। যা আমাদের আছে তা হচ্ছে বর্তমান।

তিথি, এককালে আমি খুব গুছিয়ে চিঠি লিখতে পারতাম। আমি খুব চেষ্টা করছি এই চিঠিটিও গুছিয়ে লিখতে। পারছি না। তবে মনে মনে অপূর্ব একটি চিঠি তোমার কাছে এই মুহূর্তে লিখছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই চিঠি কোনো না কোনো ভাবে তোমার কাছ পৌঁছবে।

তিথির চোখ ভিজে উঠল। সে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে মনে মনে ভাবল, আশ্চর্য এখনো আমার চোখে পানি আসে।

তিথি!

তিথি দেখল হীরু দরজা ধরে শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে। যেন কোনো কারণে অসম্ভব ভয় পেয়েছে। তিথি শুকনো গলায় বলল, কী ব্যাপার?

একটু বাইরে আয়।

যা বলার এখানে বললেই হয়।

না, একটু বাইরে আয়।

তিথি উঠোনে এসে দাঁড়াল। হীরু নিচু গলায় বলল, সর্বনাশ হয়েছে রে তিথি। ভেরি বিগ প্রবলেম।

প্রবলেমটা কী?

এ্যানা চলে এসেছে।

এ্যানা চলে এসেছে মানে? এ্যানাটা কে?

বলেছিলাম না একটা মেয়ের কথা, আমার সঙ্গে ইয়ে আছে। আজ সকালেই তার গায়ে হলুদ হয়েছে। আর এখন এই সন্ধ্যাবেলায় কী গ্রেট ঝামেলা, এক কাপড়ে চলে এসেছে।

চলে এসেছে মানে? তোর কাছে কী ব্যাপার?

আহ্ কী যন্ত্রণা আমাদের মধ্যে একটা Love চলছে না। এখন করি কী বল?

মেয়েটা কোথায়?

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। কী যে প্রবলেমে পড়লাম। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়াই তো ভাল। কী বলিস তিথি?

তিথি বিস্মিত হয়ে বাইরে এসে দেখল, কাঁঠাল গাছের অন্ধকারে হলুদ শাড়ি পরা একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিথি তীক্ষ্ণ গলায় বলল, কে?

এ্যানা সহজ গলায় বলল, আপা আমি এ্যানা।

তুমি এইসব কী পাগলামি করছ? বাসায় যাও। চল আমি তোমাকে দিয়ে আসি।

বাসায় ফিরে যাবার জন্যে তো আসিনি আপা।

তুমি বিরাট বড় একটা ভুল করছ এ্যানা।

জানি আপা।

আমার তো মনে হয় না তুমি জানো। আমার ভাইকে আমি খুব ভাল করে চিনি। ওর জন্যে তুমি এত বড় ডিসিশান নিতে পার না।

হীরু শুকনো মুখে বলল, তিথি 'রাইট' কথা বলছে। ভেরি রাইট এবং ওয়াইজ কথা।

এ্যানা বিরক্তমুখে বলল, তোমাকে কত বার বলেছি কথার মধ্যে মধ্যে বিশ্রী ভাবে ইংরেজি বলবে না।

এই প্রথম এ্যানা হীরুকে 'তুমি' করে বলল। হীরুর বুক কেমন ধড়ফড় করতে লাগল। চোখ পানিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে। এই মেয়েটার জন্যে কিছু করতে ইচ্ছা করছে। কী করা যায়? মেয়েটাকে খুশি করবার জন্যে সে অনেক কিছু করতে পারে। হাসিমুখে চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। ডান হাতটা কেটে পানিতে ফেলে দিতে পারে।

তিথি বলল, এখনো সময় আছে এ্যানা। এখনো সময় আছে।

এ্যানা মিষ্টি করে হাসল। মেয়েটা দেখতে তত সুন্দর না। কিন্তু তার হাসিটি বড়ই স্নিগ্ধ। তিথি বলল, এখন যে কত রকম ঝামেলা হবে তুমি কল্পনাও করতে পারছ না। তোমার বাবা পুলিশে খবর দেবেন। পুলিশ আসবে, তোমাকে এবং হীরুকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাব। এ্যানা বলল,

এইসব কিছুই হবে না আপা। আমি বাসায় না বলে তো আসিনি। বলেই এসেছি। সবাই জানে আমি কোথায়। কেউ কোনো ঝামেলা করবে না। কারণ আমি তাদের এমন একটা কথা বলে এসেছি...

কথা শেষ না করেই এ্যানা হাসল। তিথি বলল, কী কথা বলে এসেছ?

এটা আপা বল যাবে না।

এস ঘরে এস।

এ্যানা জালালুদ্দিন সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করল। জালালুদ্দিন বিস্মিত হয়ে বললেন, কে?

এ্যানা বলল, বাবা আমার নাম এ্যানা। আমি আপনার একজন মেয়ে।

জালালুদ্দিন হকচকিয়ে গেলেন। কী ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে বললেন, মা আপনার শরীর কেমন?

এ্যানা বলল, আমার শরীর ভাল।

মিনুকে সালাম করতে যেতেই মিনু বললেন, খবরদার তুমি আমার পায়ে হাত দিও না।

এ্যানা সহজ গলায় বলল, আমার সঙ্গে এমন কঠিন করে কথা বললে তো হবে না মা। আমি এই বাড়িতেই থাকব। আমাদের তো মিলেমিশে থাকতে হবে। হবে না?

রাত সাড়ে দশটায় কাজী এনে বিয়ে পড়ানো হল। এ্যানার বাবাকে খবর দেয়া হল। আশ্চর্যের ব্যাপার-- তিনি বিয়েতে এলেন। হীরু যখন তাঁকে সালাম করল তখন হীরুকে একটা আংটি এবং দু'শ টাকা দিলেন।

টাকাটা পাওয়ায় হীরুর খুব লাভ হল। তার হাতে একটা পয়সা ছিল না। কেন জানি তার মনে হল এ্যানা খুব পয়মন্ত মেয়ে। এইবার সংসারের হাল ফিরবে।

## ১৮

হীরুর খুব ইচ্ছা ছিল তার চায়ের দোকানের নাম রাখবে "এ্যানা টি স্টল"। এ্যানার কারণে তা হল না। এ্যানা কঠিন গলায় বলল, ফাজলামি করবে না তো। ফাজলামি করলে চড় খাবে। হীরু অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, চড় খাব মানে? এটা কী ধরনের কথা! ওয়াইফ হয়ে হাসবেন্ডকে চড় দেয়ার কথা বলছ। 'সান' কী আজ পূর্বদিকে 'রাইজ' করল?

হ্যাঁ, করল। চায়ের দোকানের কোনো নাম লাগবে না।

একটা দোকান দেব তার নাম থাকবে না?

না। পাঁচ পয়সা দামের দোকান তার আবার নাম।

পাঁচ পয়সা দামের দোকান মানে? নগদ চার হাজার সাতশ' টাকা নিজের পকেট থেকে দিলাম।

নিজের পকেট তেকে তুমি একটা পয়সাও দাওনি। তিথি আপা টাকাটা দিয়েছে।

একই হল।

না একই হয়নি। এখন যাও-- যথেষ্ট বকবক করেছ।

হীরু মন খারাপ করে বের হয়ে এল। তার এখন সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে এই মেয়েকে বিয়ে করে 'গ্রেট' ভুল করা হয়েছে। এই মেয়ে তার জীবনটা ভাজা ভাজা করে ফেলবে। দিনরাত ঝগড়া করবে। ঘরের চালে কাক-পক্ষী বসতে দেবে না।

মিনুর সঙ্গে এ্যানার বড় রকমের একটা ঝগড়া হয়ে গেল তিন দিন না পেরুবার আগেই। এ্যানা রান্নাঘরে ভাত বসিয়েছে। মিনু বললেন -- কী করছ?

ভাত বসিয়েছি।

তোমাকে ভাত বসাতে বলেছি?

না, বলেননি। বলতে হবে কেন? আপনার কী ধারণা আমি ভাত রাঁধতে জানি না?

মিনু স্তম্ভিত গলায় বললেন, এ রকম করে কথা বলা তোমাকে কে শিখিয়েছে?

কেউ শেখায়নি। ভাত বসিয়েছি তা নিয়ে আপনিই বা এত হৈচৈ করছেন কেন? মিনু চাপা

গলায় বললেন, তুমি তো ভয়ংকর বদ মেয়ে।

এ্যানা সহজ স্বরে বলল, আমি বদ মেয়ে না। আপনার ছেলেটা বদ। আপনার ছেলের ভাগ্য ভাল যে আমি তাকে বিয়ে করেছি।

মেয়েটির গালে প্রচণ্ড একটা বড় চড় কষিয়ে দেবার ইচ্ছা মিনু অনেক কষ্টে দমন করলেন। নতুন বউয়ের গায়ে এত তাড়াতাড়ি হাত তোলা ঠিক হবে না। তাছাড়া ছেলের বউকে শায়েস্তা করতে হয় ছেলেকে দিয়ে। তিনিও তাই করবেন।

জালালুদ্দিন এ্যানাকে বেশ পছন্দ করলেন। তেজী মেয়ে। এই সংসারের জন্যে এ রকম তেজী মেয়েই দরকার। মেয়েটির সঙ্গে খাতির রাখলে ভবিষ্যতে সুবিধা হবে— এই ধারণা নিয়ে তিনি ভাব জমানোর প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। মধুর স্বরে যখন-তখন ডাকেন— মা এ্যানা, একটু শুনে যাও তো। এ্যানা সঙ্গে সঙ্গে এসে পুরুষালী গলায় বলে, কী জন্যে ডাকছেন?

এমনি ডাকছি মা। এমনি। গল্প করি।

কী গল্প করবেন?

সুখ-দুঃখের গল্প।

গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে না। চা খেতে চাইলে বলুন চা এনে দিচ্ছি।

আচ্ছা দাও, তাই দাও। চোখ দু'টা যাওয়ায় একেবারে অচল হয়ে পড়েছি। চিকিৎসাও হচ্ছে না।

চিকিৎসা হচ্ছে না কেন?

কে করাবে চিকিৎসা?

কেন— আপনার ছেলে করাবে?

আমার ছেলে আমার চিকিৎসা করাবে?

আপনার ছেলে আপনার চিকিৎসা করাবে না তো বাইরের মানুষে চিকিৎসা করাবে?

এই সংসারের মানুষ তুমি চিন না মা। এই সংসারের মানুষগুলি কেমন তোমাকে বলি...

জালালুদ্দিন বিমলানন্দ ভোগ করছেন। সংসারের মানুষ চিনিয়ে দেবার দায়িত্ব খুব সহজ দায়িত্ব নয়। মনোযোগী শ্রোতার সঙ্গে দার্শনিক কথাবার্তা বলতে তাঁর ভাল লাগে। এই মেয়েটার মনোযোগী শ্রোতা হবার সম্ভাবনা আছে।

সংসারে মানুষ থাকে তিন রকমের— অগ্নি-মানুষ, মাটি-মানুষ আর জল-মানুষ। অমানুষও থাকে তিন পদের... জালালুদ্দিনের হঠাৎ সন্দেহ হল সামনে কেউ নেই। মানুষ কয় প্রকার ও কী কী এই প্রসঙ্গ বন্ধ রেখে মৃদু স্বরে ডাকলেন— মা কোথায় গো? মা কোথায়? মা'র জবাব পাওয়া গেল না। মা চা বানাতে গেছে। শ্বশুরের দার্শনিক কথাবার্তায় তার কোনো আগ্রহ নেই।

বাবা চা নিন।

জালালুদ্দিন গম্ভীর মুখে হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিলেন। চায়ে চুমুক দিলেন— চমৎকার চা, কিন্তু তাঁর গম্ভীর মুখভঙ্গির বদল হল না। এ্যানাকে তিনি বুঝতে পারছেন না। কাউকে বুঝতে না পারলে অস্বস্তি লেগে থাকে। কে জানে এই মেয়েটা ঘর ভাঙানি মেয়ে কি-না। ঘর যদি ভেঙে দেয় তাহলে তিনি যাবেন কোথায়? তাঁর এই বয়সে, শরীরের এই অবস্থায় একটি শক্ত আশ্রয় প্রয়োজন। চা তাঁর বিস্বাদ মনে হল।

হীরুর ইচ্ছা ছিল তার চায়ের দোকানের প্রথম চা খাওয়াবে পীর সাহেবকে। তাঁকে হাতে-পায়ে ধরে নিয়ে আসবে। এতে দোকানের একটা পাবলিসিটিও হবে। এত বড় পীর এসে চা খেয়ে গিয়েছে কম কথা না। পীর সাহেব আসতে রাজি হলেন না তবে চায়ের বিশাল কেতলিতে ফুঁ দিয়ে দিলেন। বললেন, এতেই কাজ হবে। হীরু বিশেষ ভরসা পেল না।

জুন মাসের তিন তারিখ ভোর ছ'টায় তার চায়ের দোকান চালু হল। চা, পরোটা, সবজি ভাজি এবং ডাল এই তিন আইটেম। পরোটা, ভাজি এবং ডালের জন্য একজন কারিগর রাখা হল। কারিগরের নাম— মজনু মিয়া। কারিগরের দেশ ফরিদপুর। বয়স পঞ্চাশ। ছোটখাটো মানুষ, কথা বলে ফিসফিস করে এবং সেই সব কথার বেশির ভাগই বোঝা যায় না। কারিগরের বাঁ হাতটা অচল। সেই অচল হাত শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে আছে। শরীরের অনাবশ্যক অঙ্গ হিসেবে হাতটা কাঁধের সঙ্গে ঝুলতে থাকে। একটি সচল হাত কারিগর মজনু মিয়ার জন্যে যথেষ্ট। এই হাতে অতি দ্রুতগতিতে সে পরোটা ভাজে। সেই দৃশ্য মুগ্ধ হয়ে দেখার মতো দৃশ্য।

মজনু মিয়া নামকরা কারিগর। তাকে নিয়ে যে ক'টা রেস্টুরেন্ট শুরু হয়েছে সব ক'টা টিকে

গেছে। রমরমা বিজনেস করছে। মজনু মিয়ার নিয়ম হল— কোনো রেস্টুরেন্ট যখন টিকে যায় তখন সে সরে পড়ে। রেস্টুরেন্ট বড় হওয়া মানে নতুন নতুন কারিগরের নিযুক্তি। নতুনদের সঙ্গে তার বনে না। সে কাজ করতে চায় একা। কাজের সময় সে কারো দিকে তাকায় না, কথা বলে না, হ্যাঁ-হুঁ পর্যন্ত না। কাজের সময় সে শুধু ভাবে। ভাবে নিজের একটা রেস্টুরেন্ট হয়েছে। গমগম করছে রেস্টুরেন্ট। কাস্টমার আসছে যাচ্ছে। পরোটা ভেজে সে কূল পাচ্ছে না। এই স্বপ্ন সে গত ত্রিশ বছরে ধরে দেখছে। আজ সেই স্বপ্নকে বাস্তব করার মতো ক্ষমতা তার আছে। ত্রিশ বছর সে কম টাকা জমায়নি। টাকা না জমিয়েই বা কী করবে? টাকা খরচের তার জায়গা কোথায়? আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই। থাকার আলাদা ঘর এই জীবনে করা হয়নি। যে রেস্টুরেন্টে কাজ করেছে সেই রেস্টুরেন্টের বেঞ্চিতেই রাত কাটিয়েছে। নিজের একটি ঘরের প্রয়োজন সে ত্রিশ বছর আগেও বোধ করেনি। আজো করে না।

রেস্টুরেন্ট চালুর দিনে হীরু অসম্ভব উত্তেজনা বোধ করল। তার মনে হচ্ছে কানের পাশ দিয়ে ভোঁ-ভোঁ করে গরম হাওয়া বের হচ্ছে। এই গরম হওয়া শরীরের ভেতরই তৈরি হচ্ছে কিন্তু বের হচ্ছে কোন পথে তা সে ধরতে পারছে না। বুকে হৃৎপিণ্ড বেশ শব্দ করেই লাফাচ্ছে। তার হার্টের কোনো অসুখ আছে কী-না কে জানে। সম্ভবত আছে। আগে ধরা পড়েনি। এখন ধরা পড়ছে। পীর সাহেব বলে দিয়েছেন, প্রতিদিন দোকান খোলার আগে তিনবার সুরা ফাতেহা এবং তিনবার দরুদ শরীফ পড়তে। লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে হীরুর কোনো দরুদ শরীফ মুখস্থ নেই। ভেবেছিল একটা নামাজ শিক্ষা এনে রাখবে। নামাজ শিক্ষায় সব দোয়া-দরুদ বাংলায় লেখা থাকে। দেখে দেখে তিনবার পড়ে ফেললেই হবে। কিন্তু নানান ঝামেলায় নামাজ শিক্ষা কেনা হয়নি। বিরাট খুঁত রয়ে গেল। হীরু খুবই বিষণ্ন বোধ করল। তার বিষণ্নভাব দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রথম দিনেই রেস্টুরেন্ট জমে গেল। কারিগর মজনু মিয়ার ভাজি এবং পরোটা দুইই অতি চমৎকার হল। ভাজির রঙ লালাভ, একটু টকটক এবং প্রচণ্ড ঝাল। শুধু খেতেই ইচ্ছা করে। মজনু মিয়া কিছু একটা দিয়েছে সেখানে— কী কে জানে। হীরুর মনে হল ভাজির রান্নার গোপন কৌশল শিখে রাখা দরকার। না শিখে রাখলে পরে সমস্যা হবে। মজনু মিয়া যদি দোকান ছেড়ে যায় তাহলে সে একেবারে পথে বসবে। তার রেস্টুরেন্টে তখন কেউ থুথু ফেলতেও আসবে না।

টুকু অরুকে নিয়ে বের হয়েছে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে কিছুই বলছে না। কয়েকবার জিজ্ঞেস করেও অরু কোনো জবাব পায়নি। টুকু শুধু বলেছে— চল না যাই।

অরু সুতির একটা শাড়ি পরেছে। সাধারণ শাড়ি, কিন্তু কোনো বিচিত্র কারণে এই সাধারণ শাড়িটি তাকে খুব মানিয়ে গেছে। তাকে দেখাচ্ছে কিশোরী একটি মেয়ের মতো। যে মেয়ের চোখে পৃথিবী তার রহস্য ও আনন্দের জানালা একটি একটি করে খুলতে শুরু করেছে।

টুকু বলল, এইখানে একটু দাঁড়াও আপা। একতলা সাদা রঙের একটা দালানের সামনে অরু দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির সামনের জায়গাটা ফুলের গাছে ভর্তি। নিকেলের চশমা পরা বৃদ্ধ একজন ভদ্রলোক বাগানে কাজ করছেন। অরু বলল, এটা কার বাড়ি?

ওসমান সাহেবের বাড়ি।

এই বাড়িতে কী?

আছে একটা ব্যাপার। তুমি দাঁড়াও। আমি উনার সঙ্গে কথা বলে আসি।

ব্যাপারটা কী তুই আমাকে বলবি না?

একটা চাকরির ব্যাপার। তোমার একটা চাকরি হয় কী-না দেখি।

তুই আমার চাকরি জোগাড় করে দিবি?

না, আমি দেব কিভাবে? বজলু ভাই চেষ্টা-চরিত্র করছেন।

বজলু ভাইটা কে?

তুমি চিনবে না, গ্রিন বয়েজ ক্লাবের সেক্রেটারি। বজলু ভাইয়ের এখানে থাকার কথা। দাঁড়াও, আমি খোঁজ নিয়ে আসি। বজলু ভাই এসে চলে গেলেন কী-না কে জানে।

অরু দাঁড়িয়ে রইল। সুন্দর একটা বাড়ির গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার এক ধরনের লজ্জা আছে। গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার মানে— এই সুন্দর বাড়ির ভেতরে ঢোকার অনুমতি তার নেই। সে বাইরের একজন। অরু দেখল বুড়ো ভদ্রলোক নিজের মনে কাজ করছেন। টুকু হাত কচলে কচলে কী-সব বলছে। টুকুর ভঙ্গি বিনীত প্রার্থনার ভঙ্গি। অভাব দুঃখ-দুর্দশার কথা বলছে

বোধ হয়। অরুর খুব লজ্জা লাগছে। কী আশ্চর্য, ভদ্রলোক একবার মুখ তুলে তাকাচ্ছেনও না। কী হয় একবার তাকালে? একটা মানুষ নিশ্চয়ই বাগানের গাছগুলির চেয়েও তুচ্ছ না।

টুকু ফিরে এল। তার মুখ লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছে। ছোট ছোট নিঃশ্বাস ফেলছে। কী কথা হয়েছে কে জানে। অরু বলল, চল যাই। টুকু বলল, আচ্ছা চল শুধু শুধু আসলাম। অরু বলল, তোকে অপমান করেনি তো?

আরে না। অপমান করবে কী। খুব যারা বড় মানুষ তারা কাউকে অপমান করে না। তারা খুব মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলে। অভাবী মানুষদের কথা শুনলে আবেগে আপ্লুত হয়ে যায়। তখনি আমার রাগ লাগে। অসম্ভব রাগ লাগে।

তোকে দেখে কিন্তু মনে হয় না তোর শরীরে রাগ আছে। তোর চেহারাটা কেমন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

টুকু হঠাৎ গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফেলে বলল, তুমি কোনো রকম চিন্তা করবে না আপা, বজলু ভাই একটা ব্যবস্থা করবেই। খুব ছোটাছুটি করছে।

তোর বজলু ভাইয়ের হাতে বুঝি অনেক চাকরি?

না। বজলু ভাই আমাদের মতই গরিব মানুষ। তবে অন্য গরিবের জন্যে খুব ছোটাছুটি করতে পারে।

কেন ছোটাছুটি করে?

জানি না। ছোটাছুটি করতে বোধ হয় ভাল লাগে।

একটা রিকশা নে টুকু, আর হাঁটতে পারছি না। আমার কাছে টাকা আছে।

টুকু রিকশা নিল। অরু বলল, ফেরার পথে হীরুর রেস্টুরেন্ট দেখে যাই চল।

টুকুর রেস্টুরেন্টে যাবার কোনো ইচ্ছা নেই। সে ক'দিন ধরেই হীরুকে এড়িয়ে চলছে। কারণ হীরু চায় টুকু ক্যাশে এসে বসুক। হীরু হচ্ছে দোকানের মালিক তাকে তো সারাক্ষণ ক্যাশ বাক্স নিয়ে বসে থাকলে চলে না। ক্যাশে বসবে টুকু। সে হবে ম্যানেজার। রেস্টুরেন্টের ম্যানেজার। খুব সহজ ব্যাপার তো না। এই বাজারে ম্যানেজারি পাওয়া আর বাঘের দুধ পাওয়া এক কথা। টুকু রাজি হয় না। তার ভাল লাগে পথে পথে ঘুরতে।

হীরু ক্যাশে বসে ছিল। টুকুদের নামতে দেখে অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে গেল। এই প্রথম নিজের লোক রেস্টুরেন্ট দেখতে আসছে। এ্যানা বা তিথি এখনো আসেনি। বাসায় কারো মনে হচ্ছে কোনো আগ্রহ নেই। যাক তবু দুজন এল।

অরু বলল, হীরু তোর কাজকর্ম দেখতে এলাম। বাহ্ সুন্দর তো। হীরুর মনটা ভাল হয়ে গেল। চারদিকে সবুজ কাগজ সেঁটে দোকানটাকে সে মন্দ সাজায়নি? টেবিলে ধবধবে সাদা ওয়াল ক্লথ। তিন দিকের দেয়ালে ক্যালেন্ডার থেকে সুন্দর সুন্দর ছবি কেটে বসানো হয়েছে। তার সীমিত সাধ্যে যতটুকু সম্ভব সে করেছে। হীরু বলল, গরিব মানুষের রেস্টুরেন্ট আপা। দেখার কিছু নেই। কেবিনে চলে যাও। কেবিনে বসে চা খাও। এই   এক নম্বর কেবিনে দু'টা চা দে। কাপ গরম পানি দিয়ে ধুয়ে আনবি।

কেবিনও আছে না-কী?

থাকবে না! কী বল তুমি! মেয়েছেলের জন্যে দু'টা কেবিন। এক নম্বর কেবিন আর দু'নম্বর কেবিন।

চা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না?

পরোটা-ভাজি আর ডাল আছে। আগামী সপ্তাহ থেকে দুপুরে তেহারি হবে- ফুল প্লেট দশ, হাফ প্লেট ছ'টাকা। তেহারির সঙ্গে সালাদ ফ্রি।

অরু এবং টুকু চা খেল। কেবিন অরুর খুব পছন্দ হল। পর্দা টেনে দিলেই নিজদের ছোট্ট আলাদা একটা জগৎ। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলল তার যদি সত্যি কোনোদিন চাকরি-টাকরি হয় তাহলে সে প্রায়ই কোনো বন্ধু-বান্ধব জোগাড় করে এই রেস্টুরেন্টের কেবিনে বসে চা খেতে খেতে গল্প করবে। সুখ-দুঃখের একান্ত কিছু গল্প।

অরুরা চলে যাবার সময় হীরু বলল, চায়ের দাম দিয়ে যাও আপা। ফ্রি'র কোনো কারবারই নেই। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবার নগদ পয়সা দিতে হবে। রাগ কর বা না কর-- এটা হল ব্যবসা।

অরু বলল, কত দিতে হবে রে?

দু'টাকা। অরু হাসিমুখে দু'টাকা বের করল।

হীরুর সময় এত ব্যস্ততায় কাটছে যে এ্যানার সঙ্গে সুখ-দুঃখের গল্প করারও সময় পাচ্ছে না। অফিস-আদালত ছুটির দিনে বন্ধ থাকে কিন্তু রেস্টুরেন্ট ছুটির দিনে সকাল সকাল খুলতে হয়, বন্ধ করতে হয় গভীর রাতে। অবশ্যি রাত যতই হোক এ্যানা তার জন্য অপেক্ষা করে। কড়কড়া ঠাণ্ডা ভাত খেতে হয় না। হীরু বাসায় পা দেয়ামাত্র এ্যানা সব কিছু গরম করতে বসে। একজন তার জন্যে না খেয়ে অপেক্ষা করছে এটা ভাবতেও ভাল লাগে।

রাতে পাশাপাশি ঘুমুতে গিয়ে হীরুর প্রায়ই মনে হয় সবটাই বোধ হয় কল্পনা। তার মত একটা ছেলেকে এ্যানা বিয়ে করবে কেন? এ্যানা নিশ্চয়ই অন্য কাউকে বিয়ে করে মহাসুখে আছে। তার পাশে যে শুয়ে আছে সে ধরা-ছোঁয়ার কেউ না। কল্পনার একজন মানুষ। হীরু খুব দীর্ঘ একটা স্বপ্ন দেখে চলছে। একদিন স্বপ্ন কেটে যাবে। সে দেখবে তার পাশে কেউ নেই। পকেটে দু'টা ডেম্প সিগারেট, একটা দেয়াশলাইয়ের বাক্স এবং ন্যাতন্যাতে ময়লা কয়েকটা নোট নিয়ে সে রাস্তায় হাঁটছে। ঘুমুতে যাবার আগে হীরুর খুব ইচ্ছা করে এ্যানার সঙ্গে আবেগ এবং ভালবাসার কিছু কথা বলতে। রেস্টুরেন্টের কথা না, সংসারের কথা না, অন্য রকম কিছু কথা। যা বলতে হয় অস্বাভাবিক নরম গলায়। যা বলার সময় গলার স্বর কেঁপে যায়, বুকের গভীরে সুখের মত কিছু ব্যথা বোধহয়। হীরু এসব কথা কখনো বলতে পারে না। বলতে গেলেই এ্যানা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, চুপ কর তো। এই সব কথা কোত্থেকে শিখলে। ছিঃ! হীরু আহত হয়ে বলে    ছিঃর কী আছে?

ঘুমাও। সিনেমা সিনেমা কথা আমার অসহ্য লাগে।

হীরুর চোখে পানি আসার উপক্রম হয়। চোখের পানি আটকাতে তার খুব বেগ পেতে হয়। এ্যানা এই ফাঁকে সংসারের কথা নিয়ে আসে। এইসব কথা শুনতে হীরুর একেবারে ভাল লাগে না। তবু সে মন দিয়ে শোনে। এ্যানার সঙ্গে কথা বলারও আলাদা আনন্দ আছে। এই মেয়েটি একান্তই তার অন্য কারোর নয়। গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে তারা দু'জন কথা বলছে    এও তো এক পরম বিস্ময়। তার মতো ক'জন মানুষের এই সৌভাগ্য হয়? হীরু ভয়ে ভয়ে এ্যানার গায়ে হাত রাখে। সারাক্ষণই তার মনে হয় এই বুঝি এ্যানা তার হাত সরিয়ে দিল। এ্যানা হাত সরায় না। এও কী কম আনন্দের ব্যাপার? এ্যানা ঘুমঘুম গলায় বলে, তিথি আপা সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরে বল তো?

জানি না।

কারো সঙ্গে কথাও বলে না। চুপচাপ থাকে।

একেক জনের একেক স্বভাব।

তিথি আপাকে নিয়ে অনেক আজেবাজে কথা শুনি    এসব কী সত্যি?

না।

টুকু যে কিছু করে না, পড়াশোনা না কিছু না    রাতদিন ঘোরাফিরা। তোমরা কিছু বল না কেন?

বললেও শুনে না।

বলে দেখেছ কখনো?

হীরুর ঘুম পায়। সে কোনো উত্তর দেয় না। এ্যানা শান্তভঙ্গিতে বলে, তুমি হচ্ছ সংসারের বড়। তোমাকেই তো সব দেখতে হবে।

দেখাদেখি করে কিছু হয় না    সব ভাগ্য।

আমার কলেজে ভর্তির ব্যাপারেও তো তুমি কিছু বলছ না।

হীরুর ঘুম কেটে যায়। সে শংকিতে গলায় বলে, তুমি কলেজে পড়বে না-কী?

পড়ব না - পড়ব না কেন?

মেয়েছেলের পড়াশোনার কোনো দরকার নেই। শুধু শুধু সময় নষ্ট আর পয়সা নষ্ট।

এইসব বাজে কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে?

শেখানোর কী আছে? সবাই তো জানে।

আজেবাজে কথা আর আমার সামনে বলবে না।

আচ্ছা।

গা থেকে হাত সরাও। হাত সরিয়ে ঘুমাও।

একবার ঘুম কেটে গেলে হীরুর আর সহজে ঘুম আসতে চায় না। সে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। এ বাড়িতে গভীর রাত পর্যন্ত আরো অনেকেই জাগে। জাগেন মিনু, প্রায় রাতেই তাঁর এক

ফোঁটা ঘুম আসে না। জাগে তিথি ও অরু। দুজন এক খাটে ঘুময়। দুজনই জানে অন্যজন জেগে আছে তবু একজন অন্যজনকে তা জানায় না। শুধু নিশ্চিন্ত মনে ঘুমান জালালুদ্দিন। আজকাল রাতে তার ভাল ঘুম হয়। এক ঘুমে রাত শেষ করে দেন। ঘুমের মধ্যে নানান রকম স্বপ্ন দেখেন। চোখে দেখতে পান না বলেই বোধ হয় রাতের স্বপ্নগুলির জন্যে মনে মনে অপেক্ষা করে থাকেন। তাঁর কাছে স্বপ্নের মানুষগুলিকে বাস্তবের মানুষদের চাইতেও অনেক বেশি সুন্দর মনে হয়।

## ১৯

জুন মাসের মাঝামাঝি অরুর চাকরি হয়ে গেল। ময়মনসিংহের হালুয়াঘাটে পোস্টিং। একটি বিদেশী এনজিওর অস্থায়ী চাকরি। চাকরির মেয়াদ তিন থেকে চার মাস। একুশ শ টাকা বেতন। খাওয়া-থাকা ফ্রি। হালুয়াঘাটে গারো ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কুল করা হয়েছে। সেই স্কুলে টিচার। অংক, বাংলা, ইংরেজির সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ সেলাই এসব শেখাতে হবে।

টুকু বলল, আপা আজ দিনের মধ্যে ওদের জানাতে হবে তুমি যাবে কী যাবে না। যদি যাও তাহলে আজই ঢাকার হেড অফিসে জয়েন করবে। আজ থেকেই তোমার বেতন শুরু হবে। তুমি যাবে?

বুঝতে পারছি না।

টুকু বিরক্ত হয়ে বলল, সবই তো বুঝিয়ে বললাম, আর কী বুঝতে পারছ না?

চাকরি করতে পারব কী পারব না— এইটাই বুঝছি না। আমাকে দিয়ে কী এইসব হবে?

অন্য মেয়েরা কিভাবে করে?

আমি কী অন্য মেয়েদের মত?

কেন, তুমি আলাদা কীভাবে?

তুই বুঝতে পারছিস না। বাসা থেকে ওরা ছাড়বে কেন? এত দূরে চাকরি, ঢাকায় হলেও একটা কথা ছিল।

তুমি তাহলে চাকরি নেবে না?

নেব না তো বলিনি, ভাবছি।

যা ভাবাভাবির ঘণ্টাখানিকের মধ্যে ভেবে নাও। বাসার কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। বাসার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক।

টেম্পোরারি চাকরি। চার মাস পর ছাড়িয়ে দেবে।

চার মাসের অভিজ্ঞতা হল না, এই অভিজ্ঞতা তখন কাজে লাগবে। এটা দেখিয়ে অন্য চাকরি জোগাড় করব।

কাউকে কিছু বলব না?

না।

তুই বলছিস সত্যি সত্যি আমার চাকরি হয়ে গেছে? আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।

তুমি মনস্থির কর আপা। কী করবে ভেবে ফেল। অনেক কষ্টে এই চাকরি পাওয়া গেছে।

চল যাই। চাকরি করব কী করব না যেতে যেতে ঠিক করব।

অরু ভেবেছিল বিরাট কোনো অফিস হবে। দেখা গেল সে রকম কিছু না। ধানমণ্ডিতে একতলার ছোট্ট বাড়ি। বসার ঘর বেতের সোফা দিয়ে সাজানো। বসার ঘরে শিশুদের হাসিমুখের বড় বড় কিছু পোস্টার। প্রতিটি পোস্টারের নিচে লেখা— এই শিশুটি যুদ্ধ চায় না সে আনন্দে বাঁচতে চায়। বসার ঘরে আরো কয়েকজন মহিলা বসে আছেন। টুকু অরুকে তাদের পাশে বসিয়ে রেখে চলে গেল। ভেতরে খবর দেয়া হয়েছে। যথাসময়ে ডাক পড়বে। যে ভদ্রলোক কথা বলবেন তার নাম ড. বরার্ট গোরিং। ফিলসফির অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে এই সংস্থার প্রধান। অরু বলল, আমি তো ইংরেজি বলতে পারি না, উনার সঙ্গে কথা বলব কী করে?

উনি বাংলা জানেন। তোমার চেয়ে ভাল বাংলা বলেন।

অরু অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘণ্টাখানিক বসে থাকার পরও তার ডাক পড়ল না। অরুর ধারণা হল ভদ্রলোক হয়ত তার কথা ভুলেই গেছেন। তার কী উচিত চলে যাওয়া? না-কি তার উচিত যাবার আগে ভদ্রলোকের সঙ্গে নিজেই যেচে গিয়ে কথা বলা?

মিস শাহানা বেগম কী আপনার নাম?

অরু শূন্যদৃষ্টিতে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। শাহানা বেগম তারই নাম। এই নামে কেউ কখনো ডাকে না। সবাই অরু ডাকে। এই বিদেশীর মুখে শাহানা নামটা কি রকম অচেনা লাগছে। আর এ রকম একজন বিদেশী এত সুন্দর করে বাংলা বলছে কিভাবে?

আপনার নাম কী মিস শাহানা?

জি।

আমি এতক্ষণ আপনাকে বসিয়ে রেখেছি সেই কারণে আপনি কী আমার ওপর রাগ হয়েছেন?

জি-না আমি রাগ করিনি। রাগ করব কেন?

আপনি কী আমার বাংলা বুঝতে পারছেন?

পারছি। আপনার খুব সুন্দর বাংলা।

আসুন আমার ঘরে আসুন।

অরু অবাক হয়ে লক্ষ্য করল শুরুর অস্বস্তির কিছুই এখন আর তার নেই। গাঢ় নীল রঙের চকচকে হাওয়াই শার্ট পরা এই বিদেশীকে তার ভাল লাগছে। দূরের কেউ বলে মনে হচ্ছে না। এ রকম মনে হবার কারণ কী? সে চমৎকার বাংলা বলছে— এটাই কি একমাত্র কারণ? না-কী তার গলার স্বরের আন্তরিক ভাব অরুকে আকৃষ্ট করেছে? না-কি ভদ্রলোকের মাথাভর্তি সোনালি চুল? চুলগুলি হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

মিস শাহানা।

জি।

আপনার তাহলে এই ধারণা হয়েছে যে আমি ভাল বাংলা বলি?

জি।

আপনার ধারণা যথাযথ নয়। প্রায়ই আমি ক্রিয়াপদগুলি এলোমেলো করে ফেলি। তাছাড়া আপনাদের বাংলা ভাষার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা আমি এখনো বুঝতে পারি না। আমার কাছে খুবই অদ্ভুত মনে হয়।

কী বৈশিষ্ট্য?

যেমন ধরুন 'দেখা' শব্দটির মানে হচ্ছে To see, চোখ দিয়ে দেখা। অথচ আপনারা নানানভাবে শব্দটি ব্যবহার করেন— গানটা শুনে দেখি। মিষ্টিটা খেয়ে দেখি। একটু বসে দেখি। গান শোনা, মিষ্টি খাওয়া বা বসার সঙ্গে চোখের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে আপনারা 'দেখা' শব্দটা ব্যবহার করছেন।

অরু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এভাবে সে কখনো ভাবেনি। সত্যি তো মজার ব্যাপর!

তারপর মিস শাহানা বেগম, বাংলা ভাষা নিয়ে গবেষণা এখন স্থগিত। অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলি— চাকরিটি কী আপনার পছন্দ হয়েছে?

জি, হয়েছে।

পছন্দ হবার মত তেমন কিছু নয় তবু খারাপ লাগবে না, জায়গাটা খুব সুন্দর। তাছাড়া যাদের সঙ্গে আপনি কাজ করবেন তাদের আপনার ভাল লাগবে। আপনি কাজ করবেন শিশুদের নিয়ে। শিশুদের মত সুন্দর আর কিছু তো হয় না। তাই না?

জি অবশ্যই।

এখন বাজছে একটা পাঁচ। চা খবর সময় নয় তবু যদি আপনি আমার সঙ্গে চা খান আমি খুশি হব। লাঞ্চ করতে বলতে পারছি না করণ আমার লাঞ্চের একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

অরু চা খেল। পটে করে চা নিয়ে এসেছিল। ভদ্রলোক অরুকে লজ্জায় ফেলে নিজেই চা বানিয়ে এগিয়ে দিলেন। এটা হয়ত ওদের সাধারণ ভদ্রতা। অথচ কী সুন্দর এই ভদ্রতা।

আমি আপনার অতীত ইতিহাস সবই শুনেছি। আমরা আমাদের কাজের জন্যে আপনার মত মেয়েদের খুঁজে বের করি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে দেখছি, আপনার মত মহিলারা সুযোগ পেলেই তাদের অসাধারণ কর্মদক্ষতা দেখানোর চেষ্টা করেন, প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন যে, তারা তুচ্ছ নন।

ভদ্রলোক গাড়ি করে অরুকে বাসায় পাঠালেন। গাড়িতে উঠবার সময়ও একটা কাণ্ড হল, তিনি নিজে এসে দরজা খুলে দিলেন। বললেন, আপনি ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে হালুয়াঘাট যেতে পারেন। আমি আগামী সপ্তাহে বাই রোডে যাব। আর বাই রোডে যেতে না চাইলে ট্রেনে করে চলে

যাবেন। আপনার থাকা-খাওয়ার যাবতীয় ব্যবস্থা করে রাখবার জন্য আমি মেসেজ পাঠিয়ে দেব।

অরু বলল, আমি আপনার সঙ্গেই যাব। বলেই তার মনে হল যে অন্যায় কোনো কথা বলছে। এরকম কথা তার বলা উচিত হয়নি। ভদ্রলোক কিছু মনে করলেন কি-না কে জানে। কিছু মনে করলে খুব লজ্জার ব্যাপার হবে।

অরু ভেবেছিল তার ঢাকার বাইরে চাকরি করতে যাওয়ার খবরে খুব হৈচৈ হবে। দেখা গেল কোনো রকম হৈচৈ হল না। মিনু বললেন, যা ইচ্ছা কর। আমি কাউকেই কিছু বলব না। জালালুদ্দিন বললেন, অধ্যাপনা অতি উত্তম ধর্ম। পৃথিবীর সবচে বড় দান হচ্ছে বিদ্যা দান। তাছাড়া বেতন ভাল। মনে হচ্ছে খ্রিস্টান করে ফেলবে। ঐ দিকে নজর রাখবি। এই বংশের কেউ খ্রিস্টান হয়ে গেলে লজ্জার সীমা থাকবে না। শুধু তিথি আপত্তি করল। নরম গলায় বলল, এদের সম্পর্কে নানান রকম গুজব আছে আপা। মেয়েদের নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করে। ওদের সম্পর্কটা অনেক খোলামেলা, ওরা এটাকে বড় কিছুও মনে করে না।

তুই কী বলছিস আমি যাব না?

তা বলছি না। এখানে থেকেই বা তুমি কী করবে। শুধু বলছি যে, সাবধানে থাকবে।

নিতান্ত কাকতালীয় একটা ব্যাপার ঘটল অরুর হলুয়াঘাট রওনা হবার ঠিক আগের দিন— একটি রেজিস্ট্রি চিঠি এসে উপস্থিত। প্রাপক শাহানা বেগম। প্রেরক আব্দুল মতিন। খাম খুলে দেখা গেল বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্র। ধুপচাঁচা গ্রামের মৌলানা আবু বকর সাহেবের তৃতীয় কন্যা মোসাম্মত নূরুর নাহার বেগম (লাইলীর) সহিত কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামের জনাব আব্দুল কুদ্দস সাহেবের প্রথম পুত্র আব্দুল মতিনের শুভ বিবাহ। বিবাহ অনুষ্ঠানে সবান্ধব উপস্থিত থাকার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছে। অরুকে আহত করবার জন্যেই চিঠি পাঠানো। তবে অরু আহত হল কি-না বোঝা গেল না। তার চেহারায় মনের অবস্থার কোনো ছাপ পড়ল না।

অরু হালুয়াঘাট পৌঁছে কোনো খবর দিল না। তিথি পরপর দুটি চিঠি লিখল— সেই চিঠিরও জবাব এল না। এক মাসের মাথায় টুকু চিন্তিত হয়ে ধানমণ্ডির বাসায় খোঁজ নিতে গেল। ড. গোরিং অফিসেই ছিলেন। তিনি সব শুনে চিন্তিত মুখে বললেন চিঠির জবাব দিচ্ছেন না কেন তা তো বুঝতে পারছি না। তার সঙ্গে গত সপ্তাহেই দেখা হয়েছে। সে বেশ ভাল আছে - এইটুকু বলতে পারি।

চিঠি কী হাতে পৌঁছোচ্ছে না?

না পৌঁছানোর কোনো কারণ নেই। তাছাড়া তোমাদের চিঠি না পেলেও তো সে তার খোঁজ দেবে। দেবে না?

দেওয়ার তো কথা।

আমার কী মনে হয় জানো— সে নিজেকে আড়াল করে ফেলতে চেষ্টা করছে। পরিচিত জগৎ থেকে লুকিয়ে পড়তে চাইছে। তোমাদের বাংলাদেশী মেয়েরা সামাজিক অমর্যাদার ব্যাপারে খুব সেনসেটিভ। তুমি বরং প্রিপেড টেলিগ্রাম করে দাও। তারপরে যদি জবাব না আসে নিজেই চলে যাও। হালুয়াঘাট এমন কিছু দূরের জায়গা নয়।

প্রিপেড টেলিগ্রামের জবাব এল। অরু জানিয়েছে— সে ভাল আছে। তার কিছুদিন পর টুকুর কাছে দুই লাইনের চিঠি এল।

টুকু,

আমি ভাল আছি। কাজ শুরু করেছি। আমাকে নিয়ে শুধু শুধু কেউ যেন দুশ্চিন্তা না করে।

ইতি— অরু আপা।

অরুর সঙ্গে তার পরিবারের এই হচ্ছে শেষ যোগাযোগ। এই পরিবারের সদস্যরা অরুর আর কোনো খোঁজ পায়নি। টুকু এবং গ্রিন বয়েজ ক্লাবের সেক্রেটারি বজলুর রহমান খুঁজে বের করার অনেক চেষ্টা করল তেমন কিছু জানা গেল না। এই এনজিও কাজকর্ম গুটিয়ে স্বদেশে চলে গেছে। এখানকার কেউ তেমন কিছু বলতে পারে না। ড. গোরিং একজন বাঙালি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বাইরে চলে গেছেন— এইটুকু জানা গেল। তবে সেই একজন অরু কী-না তা কেউ নিশ্চিত হয়ে বলতে পারল না। নিউইয়র্ক এনজিওর হেড অফিসে যোগাযোগ করেও কিছু জানা গেল না।

হেড অফিস জানাল ড. গোরিং এখন আর তাদের সঙ্গে কর্মরত নয়। কাজেই তারা তাঁর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে কিছু বলতে পারছে না।

শুধু হীরুর পীর সাহেব হীরুর কান্নাকাটিতে গলে গিয়ে জ্বীনের মারফত খবর এনে দিলেন--- অরু ভালই আছে। তার একটি কন্যাসন্তান হয়েছে। মাতা ও কন্যা সুখেই আছে। পীর সাহেবের কোনো কথাই হীরু অবিশ্বাস করে না। এইটা করল। ক্ষীণ স্বরে বলল, কী বললেন স্যার? কন্যাসন্তান হয়েছে?

হ্যাঁ বাবা হয়েছে। জ্বীনের মারফত খবর পেয়েছি।

জ্বীন কোনো ভুল করেনি তো? মানে মিসটেক। মানুষ যেমন ভুল করতে পারে জ্বীনও নিশ্চয়ই পারে।

তুমি এখন যাও হীরু।

অন্য একটা জ্বীনকে দিয়ে যদি স্যার একটু ট্রাই করেন মানে আমরা খুব কষ্টে আছি।

তুমি বিদেয় হও তো।

হীরু মুখ কালো করে চলে এল। এই প্রথম পীরের আস্তানা থেকে বের হয়ে সে মনে মনে বলল শালা ফটকাবাজ।

## ২০

তিথি অনেকক্ষণ ধরে হাঁটছে। হাঁটতে তার ভাল লাগছে। আকাশ ঘন নীল। ঝলমল করছে। রোদে শিশুদের গায়ের ওম। এমন সময় হাঁটতে ভাল লাগারই কথা। তিথির কোনো গন্তব্য নেই। একটা ফুলওয়ালীর কাছ থেকে সে ফুল কিনল। একজন ভদ্রলোক তার কাছে জানতে চাইলেন, দিলু রোড কোন দিকে? সে ভদ্রলোককে খুব ভাল করে দিলু রোডে যাবার পথ বলে দিল। ভদ্রলোক কৃতজ্ঞচোখে চলে যাচ্ছেন। সে হাঁটছে। বড় ভাল লাগছে হাঁটতে।

একেকটা দিন এ রকম হয় হাঁটতে ভাল লাগে। বিশেষ করে যখন গন্তব্য বলে কিছু থাকে না। যাবার কোনো বিশেষ জায়গা না থাকার মানেই হচ্ছে সব জায়গায় যাওয়া যায়।

তিথি বিকেলের দিকে নিতান্ত ক্লান্ত ও বিরক্ত হবার পরই নাসিমুদ্দিনকে দেখতে গেল। সে অনেকদিন ধরে হাসপাতালে পড়ে আছে। তাকে দেখতে যাওয়া হয় না। বিশেষ কোথাও যেতে তিথির ইচ্ছা করে না। নাসিমুদ্দিন যদি রাস্তায় থাকত বেশ হত। অনেকবার দেখা হত।

নাসিম বত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের বারান্দায় পড়ে আছে। তিথিকে দেখে উজ্জ্বল চোখে তাকাল, এস তিথি এস। একমাত্র তুমিই আস। আর কেউ আসে না। আমার স্ত্রীও আসে না।

আপনি কেমন আছেন?

ভাল না। পায়ে কী যেন হয়েছে কেউ কিছু বলেও না। পা না-কি কেটে বাদ দিতে হবে। পাপে ধরেছে, বুঝলে তিথি পাপ। এই জীবনটা মহাপাপ করতে করতে কাটালাম।

খুব ব্যথা হয়?

আমার কথা বাদ দাও। তুমি কেমন আছ?

ভাল আছি।

তোমার ভাইয়ের ব্যবসা না-কি ভাল হচ্ছে?

হ্যাঁ।

তোমাকে সহ্য করে তো। একবার টাকা-পয়সার মুখ দেখলে পুরোনো কথা কেউ মনে রাখে না। তোমার ভাই কী তোমাকে হাতখরচ দেয়?

দেয়।

ভাল। খুব ভাল। শুনে খুশি হলাম। তোমার মুখ এমন শুকনো লাগছে কেন তিথি? কিছু খাবে? একটা কলা খাও। এরা হাসপাতাল থেকে কলা ডিম এইসব দেয়, খেতে পারি না। তুমি কলাটা খাও।

তিথি বিনা বাক্যব্যয়ে কলা খেল। তার ক্ষিধে পেয়েছে। আসলেই সারাদিন কোনো খাওয়া হয়নি।

তিথি।

জি।

তোমার যে একটা বোন কোথায় চলে গিয়েছিল তাকে কী পাওয়া গেছ?

জি না।

ঢাকা শহর হল অদ্ভুত শহর। এই শহর হঠাৎ মানুষ গিলে খেয়ে ফেলে। আর খোঁজ পাওয়া যায় না।

আমি উঠি?

না-না বস। আর একটু বস। কেউ আসে না। তুমি মাঝে-মধ্যে আস ভাল লাগে। পাপের শাস্তি হচ্ছে। মহাপাপ করেছিলাম।

আপনি কোনো পাপ করেননি। আপনি না থাকলে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম? আপনার কাছে আমার অনেক ঋণ।

এইটা ভুল কথা বললে তিথি। খুব ভুল কথা। আমাদের কারোর কাছে কারার কোনো ঋণ নাই।

যাই এখন?

বস। আরেকটু বস।

তিথি বসে। তার তো যাবারো তেমন জায়গা নেই। বসে থাকতেই বা অসুবিধা কী? রাত বাড়ে ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষটার মাথার কাছে তিথি বসে থাকে। এক সময় নাসিম বলে -- এখন চলে যাও। রাত হচ্ছে। তিথি বলে -- আরেকটু বসি। কোনো অসুবিধা নেই।

জালালুদ্দিনের চোখের অপারেশন হল প্রাইভেট ক্লিনিকে। হীরু দরাজ গলায় বলল, ফাদার-মাদারের জন্য টাকা খরচ করব না তো কোন শালার জন্যে করব? টাকা-পয়সা হচ্ছে আমার কাছে তেজপাতা। অপারেশনের পর ডাক্তার চোখে হলুদ আলো ফেলে বললেন, কিছু দেখতে পাচ্ছেন, ক'টা আঙুল বলুন তো?

পরিষ্কার বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে তিনটা।

তার মানে কিছু দেখছেন না।

কে বলল দেখছি না? পরিষ্কার দেখছি। আপনার আঙুল হচ্ছে দু'টা -- ঠিক না?

ডাক্তারের মুখ বিমর্ষ হয়ে যায় কিন্তু জালালুদ্দিন বড়ই আনন্দ বোধ করেন। এতগুলি টাকা শুধু তার জন্যই খরচ হচ্ছে-- এটা কী কম কথা? দরকার হলে আরো খরচ হবে। হীরু তো বলেছে— টাকা-পয়সা তার কাছে তেজপাতা। এ হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ সন্তান। শুরুতে বুঝতে পারেননি। শুরুতে আসলে কিছুই বোঝা যায় না। "মর্নিং শোজ দা ডে।" কথাটাই ভুল। দেখা যায় সকালে ঝলমলে আলো দুপুর হলেই চারদিক অন্ধকার করে ঝড়।

এসব কথা সব বদলে ফেলা দরকার। কোমলমতি শিশুদের ভুল কথা শেখানো হচ্ছে। উচিত না। কাজটা খুবই অনুচিত হচ্ছে।

ও বাবা হীরু।

জি।

চোখটা তো মনে হয় সেরেই গেল। ডাক্তারের হাতের আঙুলগুলি পরিষ্কার দেখলাম। গুণতে পারলাম না। দেখা এক জিনিস আর গোণা এক জিনিস। ঠিক কী-না বাবা বল।

তা তো ঠিকই। এখন চল বাড়ি যাই।

আরো কয়েকটা দিন থাকি। এদের আদর-যত্ন অসাধারণ। একটা নার্স আছে নাম রুচিতা। ভাবছি এই মেয়েটাকে ধর্ম মেয়ে বানিয়ে ফেলব। অসাধারণ একটা মেয়ে।

পহেলা শ্রাবণ হীরু নতুন বাড়িতে উঠল। সেই উপলক্ষে কাঙালি ভোজ হল। মিলাদ হল। বাড়ি বিশাল কিছু না, তবে ভবিষ্যতে বড় হবে। তিনতলা ফাউন্ডেশন। নতুন বাড়িতে ঢুকে আনন্দে ঘুমুতে পারেন না জালালুদ্দিন। ঘন ঘন এ্যানাকে ডাকেন।

ও বৌমা বৌমা।

এ্যানার হাতে শতেক কাজ তবু সব বিরুক্তি মুছে পাশে দাঁড়ায়। জালালুদ্দিন ধরা গলায় বললেন, সব তোমার জন্যে হচ্ছে গো মা— সবই তোমার জন্য। তোমার একটা ছবি বড় করে বাঁধিয়ে আমার ঘরে সাজিয়ে রাখ তো মা।

সাজিয়ে রাখলে কী হবে? আপনি তো আর দেখতে পারবেন না?

আমি না পারলাম। অন্যে দেখবে। যেই আসবে তাকেই বলব, এই দেখ গো সবই আমার বৌমার ভাগ্যে হল। এই হচ্ছে আমার বৌমা।

আপনি বড় বেশি কথা বলেন। কথা কম বলবেন। চা খেতে চাইলে বলেন চা এনে দিচ্ছি।

একটু কফি দাও। কফির কাছে চা দাঁড়ায় না গো মা। কফির মজাই অন্য।

এ্যানা কফি আনতে যায়। আপনমনে কথা বলেন জালালুদ্দিন। নিজের মনে কথা বলতে তার বড় ভাল লাগে। জীবনটা বড়ই মধুর মনে হয়। বড়ই সুখের বলে বোধ হয়। গুনগুন করে আজকাল গানও গান— ওগো দয়াময়। বড় দয়া তোমার মনে ওগা দয়াময়-- সবই তাঁর স্বরচিত গান। তিনি যে একজন স্বভাবকবি এই তথ্য আগে জানা ছিল না। হীরুর বেশ কিছু কর্মচারীও এই বাড়িতে থাকে। তাদের সাথেও তার বড় মধুর সম্পর্ক। জীবন কী? জীবনের অর্থ কী? এসব গূঢ় কথা তিনি তাদের বলেন। খুব আগ্রহ নিয়ে বলেন--

ভাগ্য— সবই ভাগ্য। এই জিনিসটা তোমরা খেয়াল রাখবা। আজ যে রাজা কাল সে পথের ফকির। এর কারণ কী? এর কারণ ভাগ্য। এখন ভাগ্য কী...

তিনি সবাইকে ভাগ্য কী তা ব্যাখ্য করেন। সবাই মন দিয়ে শোনে। আশ্চর্যের ব্যাপার মন দিয়ে শুনে টুকু। টুকু কেন এত আগ্রহ নিয়ে বাবার কথা শোনে তা জালালুদ্দিনও ঠিক বুঝতে পারেন না।

টুকুর ঘুরে বেড়ানোর স্বভাব আরো বেড়েছে। মাঝে মাঝে মাসের পর মাস তার কোনো রকম খোঁজ পাওয়া যায় না। তারপর হঠাৎ একদিন মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ নিয়ে উদয় হয়। হীরু ভীষণ বিরক্ত হয়, আমার আপনা ভাই ঘরে আর আমার কি-না তিন হাজার টাকা বেতন দিয়ে ম্যানেজার রাখতে হয়। আফসোস। বড়ই আফসোস। এখন আমার দরকার নিজের লোক।

হীরুর নিজের লোকের অভাবে সত্যি সত্যি অসুবিধা হয়। অনেক টাকার লেন-দেন। সব একা সামলাতে হয়। মাথার ঠিক থাকে না। টুকু লেখালেখির চেষ্টা করে। তার খুব ইচ্ছা করে নিজেদের জীবনের কথাটাই সুন্দর করে লিখে ফেলতে। দুঃখ, বেদনা ও গ্লানির মহান সংগীতকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা করে। পারে না। তবে মনে হয় পারবে। একদিন না একদিন জনম জনমের গল্প বের হয়ে আসবে।

হীরু নিজেদের ব্যবহারের জন্যে রিকন্ডিসান্ড টয়োটা স্টারলেট একটা কিনেছে। সেই গাড়িতে রোজ জালালুদ্দিন সাহেব খানিকক্ষণ হাওয়া খান। রোজ খানিকটা ফ্রেশ অক্সিজেন না নিলে তার না-কি রাতে ভাল ঘুম হয় না।

এই পরিবারের একজন মাত্র মানুষ রাতে এক ফোঁটা ঘুমুতে পারেন না। তিনি মিনু। চোখ মেলে তিনি সারারাত তিথির পাশে শুয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে একটা হাত রাখেন তিথির গায়ে। তিথি সেই হাত সরিয়ে দিয়ে কঠিন গলায় বলে— গায়ে হাত দিও না মা।

এত আদর করে গায়ে হাত রাখি তুই এমন করিস কেন মা?

তিথি কঠিন গলায় বলে, গায়ে হাত দিলেই মনে হয় পুরুষ মানুষের হাত। কেমন গা ঘিনঘিন করে।

মা-রে তুই শুধু আমাকে শাস্তি দিচ্ছিস কেন?

আমি কাউকে শাস্তি দিচ্ছি না মা।

এত সখ করে হীরু গাড়ি কিনেছে একবার চড়ে দেখবি না?

চড়ব। কালই চড়ব। এখন ঘুমাও। মিনু ঘুমুতে চান। ঘুমুতে পারেন না। রাত বাড়ে।

## ২১

এক সন্ধ্যায় মনুজর সাহেব হীরুদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। রমরমা দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। তিনি মেয়ে বিয়ে দিচ্ছেন। সেই বিয়ের দাওয়াতের কার্ড নিয়ে এসেছেন। চারদিকের কায়দা-কানুন দেখে হকচকিয়ে গেছেন। তিথি বের হয়ে বলল, কেমন আছেন চাচা? তিনি হকচকিয়ে গেলেন। বিড়বিড় করে বললেন, ভাল আছি। আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ মা? তিথি তীক্ষ্ণ গলায় বলে, আপনি কী আমাকে চিনতে পারছেন? ঐ যে অভাবের সময় টাকার জন্যে যেতাম। আপনি এত আদর করতেন। মনে আছে। মনজুর সাহেব কিছু বলেন না। মুখ শক্ত করে বসে থাকেন।

মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন বুঝি?

হুঁ।

বড় মেয়ে না ছোট মেয়ে?

ছোট মেয়ে। যেও কিন্তু।

যাব। অবশ্যই যাব। আপনার কাছ থেকে আদর খেয়ে আসব। আপনার আদরের কথা সব সময় আমার মনে হয়।

উঠি তিথি।

না, না আপনি কেন উঠবেন। আমি আপনাকে চা বানিয়ে খাওয়াব। আপনার মনে আছে চাচা আপনি একদিন হালুয়া বানিয়ে চামুচে করে আমাকে খাইয়েছেন। মনে আছে, না মনে নেই?

মনজুর সাহেব বড়ই অস্বস্তি বোধ করেন। তার অস্বস্তি দেখে গভীর করুণায় তিথির মন হঠাৎ কেমন যেন ভরে যায়। হঠাৎ মনে হয় কী দোষ এই লোকটার? কোনো দোষই তো নেই।

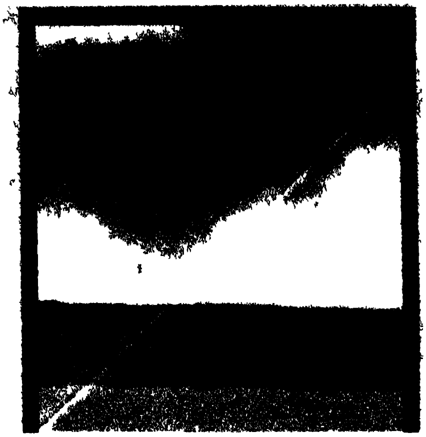
অরুর চিঠি এসেছে। সে চিঠি লিখেছে নিউ জার্সি থেকে। "সে ভাল আছে। সুখে আছে। স্বামীর সঙ্গে আছে।" এই হচ্ছে চিঠির বক্তব্য। স্বামী কে? সে কোথায় আছে সেই সব কিছুই নেই। বড়ই সংক্ষিপ্ত চিঠি। শুধু চিঠির এক কোণায় লেখা তিথি, তোকে রোজ স্বপ্নে দেখি। তিথি তোর কী হয়েছে রে?

তিথির কী হযেছে সে নিজেও জানে না। সে শুধু জানে যে তার হাঁটতে ভাল লাগে। মতিঝিল থেকে টিপু সুলতান রোড, সেখান থেকে গেণ্ডাবিয়া। গেণ্ডারিয়া থেকে সূত্রাপুর। এত ভাল লাগে কেন হাঁটতে? শুধু মাঝে মাঝে হঠাৎ মেঘে মেঘে আকাশ যখন কালো হয়ে যায়, যখন চক্রাকারে আকাশে সোনালি ডানার চিল উড়তে থাকে। তখন কেন জানি সব ছেড়েছুড়ে ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। এমন কোনো ঘর যে ঘরে দু'বাহু বাড়িয়ে কেউ-একজন অপেক্ষা করে আছে। যে ঘরে পা দেযা মাত্র বলবে মেঘলা দিনে কোথায় কোথায ঘুরছিলে বল তো? তিথি হাসবে। সেই মানুষটা কোমল অথচ রাগী গলায বলবে, হাসবে না তো। হাসির কোনো ব্যাপার না। দেখ না কেমন ঝড় শুরু হল। এই দিনে কেউ বাইরে থাকে? তিথি বলবে, হোক ঝড়। এস না আমরা খানিকক্ষণ ভিজি।

তুমি কী পাগল হলে তিথি?

হ্যাঁ পাগল হয়েছি। এস তো।

তিথি সেই মানুষটাকে নিয়ে বৃষ্টিতে ভিজবে। লোকটি যতই রাগ করবে সে ততই মজা পাবে। কিন্তু তিথির জন্যে তেমন কেউ অপেক্ষা করে নেই, কোনোদিন করবেও না। তার জন্যে অপেক্ষা করবে বিশাল আকাশ। যে আকশ সবার জন্যেই অপেক্ষা কবে আবাব কাবো জন্যেই কবে না।



# কোথাও কেউ নেই

গেটের কাছে এসে মুনা ঘড়ি দেখতে চেষ্টা করল। ডায়ালটা এত ছোট কিছুই দেখা গেল না। আলোতেই দেখা যায় না, আর এখন তো অন্ধকার। রিকশা থেকে নেমেই একবার ঘড়ি দেখেছিল সাড়ে সাত। গলির মোড় থেকে এ পর্যন্ত আসতে খুব বেশি হলে চার মিনিট লেগেছে। কাজেই এখন বাজে সাতটা পঁয়ত্রিশ। এমন কিছু রাত হয়নি। তবু মুনার অস্বস্তি লাগছে। কালও ফিরতে রাত হয়েছে। তার মামা শওকত সাহেব একটি কথাও বলেননি। এমন ভাব করেছেন যেন মুনাকে দেখতেই পাননি। আজও সে রকম করবেন।

মুনা গেট খুলে খুব সাবধানে ভেতরে ঢুকল। জায়গাটা প্যাচপ্যাচে কাদা হয়ে আছে। সকালে বাবুকে দু'বার বলেছিল ইট বিছিয়ে দিতে। সে দেয়নি। বারান্দায় বাতিও জ্বালায়নি। পা পিছলে উল্টে পড়লে শাড়ি নষ্ট হবে। নতুন জামদানী শাড়ি। আজই প্রথম পরা হয়েছে। একবার কাদা লেগে গেলে আর তোলা যাবে না। মুনা পা টিপে টিপে সাবধানে এগুতে লাগল।

মামার গলা পাওয়া যাচ্ছে। বকুলকে ইংরেজি পড়াচ্ছেন। সকাল বেলা রাখাল বালক বাঁশি বাজাইতেছিল, বল ইংরেজি কী হবে? বকুল ফোঁপাচ্ছে। চড়টর খেয়েছে হয়ত। ইদানীং মামার মেজাজ বেশ খারাপ যাচ্ছে। মুনা মনে মনে ট্রানস্লেশনটা করতে চেষ্টা করল। রাখাল বালকের ইংরেজি কী হবে? ফারমার বয়? না অন্য কিছু? অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সে দরজার কড়া নাড়ল -- একবার, দু'বার, তিনবার। দরজা খুলতে কেউ এগিয়ে আসছে না। মুনা নিচু স্বরে ডাকল বকুল, এই বকুল।

বকুল ভয়ে ভয়ে তাকাল বাবার দিকে। শওকত সাহেব ধমকে উঠলেন-- একটা ট্রানস্লেশন করতে একদিন লাগে? 'বাঁশি বাজাইতেছিল' এই ইংরেজি কী বল? বকুল ভয়ে ভয়ে বলল - বাবা, মুনা আপা এসেছে। শওকত সাহেব কড়া গলায় বললেন, তোর পড়া তুই পড়। দরজা খোলার লোক আছে। মন থাকে বাইরে, পড়াটা হবে কিভাবে? মাথাতে তো গোবর ছাড়া কিছু নেই। বকুল মাথা নিচু করে ফেলল। তার চোখে পানি আসছে। বাবা দেখে ফেললে আরো রেগে যাবেন। আজেবাজে কথা বলবেন। তিনি একবার রেগে গেলে এমন সব কথা বলেন যে মরে যেতে ইচ্ছা করে। পরশু বলছিলেন পাতিলের তলার মত মুখ তবু সাজগোজের তো কোনো কমতি দেখি না। একশ' টাকার লাগে শুধু পাউডার।

মুনা আবার কড়া নাড়ল। শওকত সাহেব উঁচু গলায় ডাকলেন বাবু, বাবু। বাবু ফ্যাকাশে মুখে ঘরে ঢুকল। সে পড়ে ক্লাস সেভেনে। রোজ সন্ধ্যায় তার মাথা ধরে বলেই ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকে। শওকত সাহেব বাবুকে দেখেই রেগে উঠলেন কানে শুনতে পাস না? বাবু ভয়ে ভয়ে তাকাল বকুলের দিকে। শওকত সাহেব হুংকার দিয়ে উঠলেন দরজা খুলতে পারিস না গরু কোথাকার।

বাবু দরজা খুলল। শওকত সাহেব মুনার দিকে ফিরেও তাকালেন না। কোনো রকম কারণ ছাড়াই বকুলের গালে ঠাস করে একটা চড় বসালেন। ব্যাপারটা ঘটল আচমকা। বকুলের মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠল এক মুহূর্তে। মাথা অনেকখানি ঝুঁকিয়ে সে তার খাতায় কী সব লিখতে চেষ্টা করল। লেখাগুলি সব ঝাপসা। চোখ থেকে পানি উপচে পড়ছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শওকত সাহেব কর্কশ স্বরে বললেন- মাথা তোল, ঢং করিস না। বকুল মাথা তুলল না। তার ছোট্ট হালকা শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। মুনা শান্ত স্বরে বলল মামা, এত বড় মেয়ের গায়ে হাত তোলা ঠিক না। শওকত সাহেব কিছু বললেন না।

মুনা আরো কিছু বলবে ভেবেছিল, বলল না। নিজেকে সামলে নিয়ে তার শোবার ঘরে ঢুকল। এ বাড়িতে দুটি মাত্র শোবার ঘর। একটিতে মামা এবং মামি থাকেন, অন্যটিতে থাকে মুনা, বকুল এবং বাবু। মুনার রুমটি অসম্ভব ছোট। তবু সেখানে দুটি চৌকি ঢোকানো হয়েছে। এক কোণায় একটা আলনা। আলনার পাশে বকুলের পড়ার টেবিল। টেবিলের উল্টোদিকের ফাঁকা জায়গাটা

একটা বিশাল কালো রঙের ট্রাঙ্ক। তার উপরে প্যাকিং বক্সের ভেতর শীতের লেপ-কাঁথা। এখানে ঢুকলেই দম আটকে আসে। পুব দিকের একটা বড় জানালায় আলো-হাওয়া খেলত। শওকত সাহেব পেরেক মেরে সেই জানালা বন্ধ করে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা খোলা জানালায় গুণ্ডা ছেলেরা এসিড-ফ্যাসিড ছুড়বে। অসহ্য গরমের দিনেও সে জানালা আজ আর খোলার উপায় নেই।

মুনা শোবার ঘরে বাতি জ্বালাল। বাবু বাতির দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে। মুনা বলল, আজও মাথাব্যথা?

হুঁ।

বেশি?

বাবু জবাব দিল না। মুনা বলল, বাবু তুই একটু বাইরে দাঁড়া তো, আমি কাপড় ছাড়ব। বাবু বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এক চিলতে বারান্দা। সেখানে একটা ক্যাম্পখাট পাতা আছে। গ্রামের বাড়ি থেকে কেউ এলে এখানে ঘুমুতে দেয়া হয়। বাবু নিঃশব্দে বসল ক্যাম্পখাটে। মাথাব্যথাটা এখন একটু কমের দিকে। বমি বমি ভাবটাও কেটে যেতে শুরু করেছে। বাবু লক্ষ্য করেছে মুনা আপা বাসায় এলেই তার মাথাব্যথা কমতে শুরু করে।

মুনা কাপড় বদলে বারান্দায় এসে হাতে-মুখে পানি ঢালল। বাবু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে কিছু বলবে। তবে নিজ থেকে সে কখনো কিছু বলে না। জিজ্ঞেস করতে হয়। মুনা বলল, বাবু কিছু বলবি?

হুঁ।

বলে ফেল।

বাকের ভাই আজ দুপুরে জিজ্ঞেস করছিল।

কী জিজ্ঞেস করছিল?

তোমার কথা।

পরিষ্কার করে বল' অর্ধেক কথা পেটে রেখে দিলে বুঝব কিভাবে?

বাবু ইতস্তত করতে লাগল। মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, বল কী বলল?

বলল, কী রে তোর আপামণি নাকি বিয়ে করছে?

তুই কী বললি?

আমি কিছু বলিনি।

কিছুই বলিসনি?

বাবু ইতস্তত করে বলল, বলেছি, আমি কিছুই জানি না। মুনা বিরক্ত স্বরে বলল, মিথ্যা বললি কেন? সত্যি কথাটা বলতে অসুবিধা কী? সত্যি কথা বললে সে কী তোকে মারত? আবার যদি কোনোদিন জিজ্ঞেস করে, তুই বলবি -- হ্যাঁ বিয়ে করবে। বাবু মুখ ফিরিয়ে নিল, যেন সত্যি কথাটা সে স্বীকার করতে চায় না। এই ব্যাপারটার জন্যে সে যেন লজ্জিত। মুনা কড়া গলায় বলল, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছিস কেন? তাকা আমার দিকে। বাবু তাকাল। মুনা হালকা স্বরে বলল, তোরা সবাই এ রকম ভাব করিস যেন আমি মস্ত একটা অন্যায় করে ফেলেছি। একটা মেয়ে যদি একটা ছেলেকে পছন্দ করে এবং বিয়ে করে তাহলে তার মধ্যে লজ্জার কিছুই নেই। তুই যখন বড় হবি তখন তুইও এ রকম পছন্দ করে একটা মেয়েকে বিয়ে করবি।

যাও।

তুই দেখি লজ্জায় একেবারে মরে যাচ্ছিস।

মুনা আপা ভাল হবে না কিন্তু।

তুই মুনা আপা মুনা আপা করিস কেন? শুধু আপা ডাকবি। কিংবা বড় আপা। সঙ্গে আবার মুনা কী জন্যে?

আচ্ছা। আপা, তোমাদের বিয়ে কবে?

সামনের মাসে।

বাবু আর কিছু জিজ্ঞেস করল না। সে মনে হল বেশ লজ্জা পাচ্ছে। মুনা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তোরা কেউ আমাকে সহ্য করতে পারিস না। বাবু লজ্জিত স্বরে বলল, কী যে তুমি বল।

ঠিকই বলি। ইট বিছিয়ে রাখতে বলেছিলাম, বিছিয়েছিস? সন্ধ্যার পর বারান্দায় বাতি জ্বালিয়ে

রাখতে বলেছিলাম তাও তো রাখিসনি।

বাবু কী যেন বলতে চাইল, মুনা তা শোনার জন্যে অপেক্ষা করল না। মামা-মামির শোবার ঘরে ঢুকল। এই ঘরটিতে কিছু জায়গা আছে। একটা আলমারি, ছোট একটা ড্রেসিং টেবিল; তার পাশে বিয়েতে পাওয়া পুরনো আমলের ভারী খাট, একটা কালো রঙের আলনা। তবুও কিছু ফাঁকা জায়গা আছে।

মুনা ঘরে ঢুকতেই তার মামি লতিফা হাত ইশারা করে তাকে কাছে ডাকলেন। তাঁর হাত ইশারা করে ডাকার ভঙ্গি ও তাকানোর ধরন-ধারণ দেখেই টের পাওয়া যায় কিছু একটা ঘটেছে। মুনা বিছানার পাশেই বসল।

মামি শরীর কেমন?

ভালোই।

জ্বর আসেনি তো?

উঁহু।

মুখে উঁহু বললেও বোঝা যাচ্ছে গায়ে জ্বর আছে। চোখ লালচে। কপালের চামড়া শুকিয়ে খড়খড় করছে। চারদিকে অসুস্থ অসুস্থ গন্ধ। লতিফা তাঁর রোগা হাতে মুনার হাত চেপে ধরলেন। গলার স্বর অনেক খানি নিচে নামিয়ে বললেন, তোর মামা যায় নাই।

কেন, যায়নি কেন?

আমি কী করে বলব?

আংটি দেখিয়েছিলে?

হুঁ। আংটি দেখে আরো রাগ করেছে। বাবু সামনে পড়ে গেল তখন। রাগের চোটে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলেছে খাটে। জিব কেটে গেছে বোধ হয়। রক্ত পড়ছিল।

বল কী'

হুঁ।

লতিফা কান্নার মত শব্দ করতে লাগলেন। মুনা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করল। আজ দুপুরে লতিফার বড় ভাই মোজাম্মেল হোসেন সাহেবের ছোট মেয়ের আকিকা। সেই উপলক্ষে এ বাড়ির সবার দাওয়াত ছিল। শওকত সাহেব যেতে রাজি হলেন না। দাওয়াত প্রসঙ্গে অত্যন্ত তেতো ধরনের কিছু কথা বললেন, ফকির খাওয়ানোর বদলে আমাদের খাইয়ে দিচ্ছে। তু বলে ডাকলেই যাব নাকি? পেয়েছি কী আমাকে? আমি ভিখিরি নাকি? আমি তো যাই না এ বাড়ির কেউ যদি যায় ঠ্যাং ভেঙে দেব।

লতিফা এই জাতীয় কথায় বিশেষ কান দেননি। তাঁর বড় ভাই তাঁকে করুণার চোখে দেখে বলেই হয়ত গোপন সঞ্চয় ভেঙে মুনাকে দিয়ে একটা আংটি কিনিয়ে এনেছিলেন। তাঁর আশা ছিল রাগটাগ ভাঙিয়ে দুপুরের দিকে পাঠাতে পারবেন। কিন্তু পারেননি।

মুনা উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, তুমি খাওয়া-দাওয়া কিছু করেছ? লতিফা জবাব দিলেন না। মুনা বলল, কাল অফিসে যাবার সময় আংটি দিয়ে আসব আর বলব তোমার অসুখের জন্যে কেউ আসতে পারেনি। কথাটা তো মিথ্যাও না। লতিফা কী যেন বললেন। মুনা শোনার অপেক্ষা না করে রান্নাঘরে চলে গেল। ভাত চড়াতে হবে। কাজের ছেলেটি চলে যাওয়ায় খুব ঝামেলা হচ্ছে। সারাদিন অফিস করে চুলার পাশে এসে বসতে ইচ্ছা করে না। বড় খারাপ লাগে।

মুনা আপা, বাবা ডাকে।

মুনা দেখল বাবুর মুখ রক্তশূন্য। যেন বড় রকমের কোনো বিপদ আশংকা করছে সে। মুনা স্বাভাবিক ভাবেই বলল, এখন যেতে পারব না। ভাত চড়াচ্ছি, দেরি হবে।

না, তুমি এখন চল।

কী ব্যাপার?

বাবু কিছু বলল না। তার চোখ-মুখ ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য চেহারা। সে বেশ ভয় পেয়েছে।

শওকত সাহেব চেয়ারে পা তুলে শক্ত হয়ে বসে আছেন। ছোটখাটো মানুষ। মাস তিনেক আগেও স্বাস্থ্য ভাল ছিল। এখন অসম্ভব রোগা হয়ে গেছেন। গালটাল ভেঙে একাকার। চুল উঠতে শুরু করেছে। মাথা ভর্তি চকচকে টাকের আভাস। মেজাজও হয়েছে খারাপ। কথায় কথায় রেগে ওঠেন। গতকাল প্রায় বিনা কারণে কাজের ছেলেটিকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন।

শওকত সাহেবের চোখে চশমা। এটি একটি বিশেষ ঘটনা। কারণ চশমা তিনি পরেন না। তাঁর ধারণা চশমা পরলেই চোখ খারাপ হতে থাকবে এবং বুড়ো বয়সে পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে হবে। আজ হঠাৎ চশমা চোখে দেয়ার কারণ স্পষ্ট নয়। খুব সম্ভব পরিবেশ বদলাতে চাচ্ছেন।

মুনা ঢোকা মাত্র তিনি ইশারায় তাকে বসতে বললেন। মুনা বসল না। শওকত সাহেব কঠিন স্বরে বললেন, তুই আমার ছেলেমেয়েগুলিকে নষ্ট করছিস।

কীভাবে?

তোর কাছ থেকে সাহস পেয়ে এরা এ রকম করে। সামান্য একটা চড় দিয়েছি, এতেই মেয়ে উঠে গিয়ে বাথরুমে দরজা বন্ধ করে বসে আছে। এত বড় সাহস।

সাহস না মামা, লজ্জা।

লজ্জা? লজ্জার কী আছে এর মধ্যে?

তুমি বুঝবে না মামা।

বুঝব না কেন?

মুনা চেয়ার টেনে মামার মুখোমুখি বসল। শওকত সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। মুনাকে কেন জানি তিনি একটু ভয় করেন। মুনা শান্ত স্বরে বলল, এতবড় মেয়ের গায়ে হাত তোলা ঠিক না মামা।

এত বড় মেয়ে কোথায় দেখলি তুই?

মেট্রিক দিচ্ছে তিন মাস পর। সে ছোট মেয়ে নাকি?

নিজের মেয়েকে শাসনও করতে পারব না?

না।

না মানে?

না মানে না। আর কিছু বলবে?

তুই এ বাড়ি থেকে যাবি কবে?

বিয়ে হোক তারপর তো যাব। বিয়ের আগে যাই কী করে? নাকি তুমি চাও এখনই চলে যাই?

শওকত সাহেব সিগারেট ধরালেন। মুনা সহজ স্বরে বলল  মামা, তুমি আমার সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করছ কেন?

কী রকম ব্যবহার করছি?

কথাটথা বল না। যেন আমাকে চিনতেই পার না।

রোজ রাতদুপুরে বাসায় ফিরবি আর আমি তোকে কোলে নিয়ে নাচব? এটা ভদ্রলোকের বাসা না? পাড়ার লোকের কাছে আমার ইজ্জত নেই?

কয়েকটা দিন মামা। তারপর তুমি তোমার ইজ্জত নিয়ে থাকতে পারবে।

মুনা উঠে দাঁড়াল।

শওকত সাহেব চুপ করে গেলেন। মুনা বলল, তুমি আর কিছু বলবে? তিনি জবাব দিলেন না। মুনা চলে এল রান্নাঘরে। বাথরুমের দরজা খুলে বকুল বের হয়েছে। তার চোখ-মুখ ভেজা। আচার-আচরণ বেশ স্বাভাবিক। সে আবার তার বাবার কাছে পড়তে গেল। যেন কিছুই হয়নি। শওকত সাহেব শুকনো মুখে মেয়েকে ইংরেজি গ্রামার পড়াতে লাগলেন। বকুল এবার ইংরেজিতে তেইশ পেয়েছে। হেড মিসট্রেস প্রগ্রেস রিপোর্টে লিখে দিয়েছেন ইংরেজের একজন টিচার রাখার জন্যে।

ভাত চড়াবার আগে মুনা দু'কাপ চা বানাল। বাবুকে দিয়ে এক কাপ পাঠাল মামার কাছে। অন্য কাপটি রাখল নিজের জন্যে। বড় ক্লান্ত লাগছে। রান্নার ব্যাপারে কোনো উৎসাহ পাওয়া যাচ্ছে না।

খাওয়া-দাওয়া সারতে রাত হল। ভাদ্র মাস। বিশ্রী গরম। গা ঘামে চটচট করছে। মুনা বকুলকে সঙ্গে নিয়ে বাইরের বারান্দায় মোড়া পেতে বসেছে। কিছু বাতাস পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু শোবার ঘর নরক হয়ে আছে। আজ রাতে ঘুমানো যাবে বলে মনে হয় না। বকুল বলল, আপা তোমরা বাসা পেয়েছ?

না। মালিবাগে একটা ফ্ল্যাট দেখলাম। বেশ ভাল, চার তলায়। খুব হাওয়া, পনেরশ টাকা চায়।

নিয়ে নাও।

নিয়ে নিলে খাব কী? ও বেতনই পায় পনেরশ।

তুমিও তো পাও।

আমি পাই নয়শ পঁচাত্তর। নয়শ পঁচাত্তরে দুজনের চলবে?

বকুল কিছু বলল না। মুনা হালকা স্বরে বলল, মনে হয় বৃষ্টি হবে। বিজলি চমকাচ্ছে। বৃষ্টি নামলে আজ ভিজব।

তোমার টনসিলের দোষ। টনসিল ফুলে যাবে।

যা ইচ্ছা হোক, আজ ভিজব। সারা রাত যদি বৃষ্টি হয় সারা রাতই ভিজব। দেখিস তুই।

বকুল অস্পষ্ট স্বরে হাসল। মুনা আপার অনেক পাগলামি আছে। রাতের বেলা বৃষ্টে হলেই সে ভিজে অসুখ বাঁধায়। যেন অসুখ বাঁধাবার জন্যেই ভিজে। বকুল নিচু গলায় বলল, বাকের ভাই তোমার ব্যাপারে খোঁজখবর করছিল জানো?

জানি।

খুব নাকি হম্বিতম্বি করছিল?

মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, হম্বিতম্বি মানে? সে হম্বিতম্বি করার কে? তার অনুমতি নিয়ে আমাকে বিয়ে করতে হবে?

বাবুকে নাকি কী সব আজেবাজে কথা বলেছে।

কই বাবু তো আমাকে কিছুই বলেনি। আয় তো যাই জিজ্ঞেস করি।

বকুল উঠল না। তার বসে থাকতে ভালই লাগছে। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হয়ত সত্যি সত্যি বৃষ্টি নামবে। এই বাড়ির ছাদে টিনের হওয়ায় বৃষ্টির শব্দ চমৎকার পাওয়া যায়। মুনা বিরক্ত স্বরে ডাকল এই চল, জিজ্ঞেস করে আসি বাবুকে।

বাবু তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আরেকটু বস। তোমাকে একটা মজার ঘটনা বলব।

বকুল মজার ঘটনা বলতে শুরু করার আগেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ভাদ্র মাসের বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকে না। মুনা বকুলকে নিয়ে ভেতরের উঠোনে ভিজতে নামল। বকুল খানিকটা সংকোচ বোধ করছিল কারণ শওকত সাহেব ভেতরের বারান্দায় চশমা পরে বসে আছেন। বকুলের ধারণা তিনি বাজে ধরনের একটা ধমক দেবেন। কিন্তু শওকত সাহেব তেমন কিছুই করলেন না। তাঁর নিজেরও কেন জানি পানিতে নেমে যেতে ইচ্ছা করছিল। এবং এর রকম একটা ইচ্ছার জন্যে লজ্জিত বোধ করছিলেন। মুনা উঁচু গলায় বাবুকে ডাকল, এই বাবু নেমে আয়। বাবু নামল না। ভয়ে ভয়ে তাকাল বাবার দিকে। মুনা বিরক্ত স্বরে বলল এত ঢং করছিস কেন? আয়।

শওকত সাহেব বাবুকে সুযোগ দেবার জন্যেই হয়ত শোবার ঘরে ঢুকে পড়লেন। বাবু বসেছে উঠোনে। বকুল একবার বলল আপা ঠাণ্ডা লেগে যাবে। মুনা নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল লাগুক।

তোমার টনসিল।

আমার টনসিলের ভাবনা আমি ভাবব। তোর ভিজতে ইচ্ছা না করলে উঠে যা।

তুমি যতক্ষণ থাকবে আমিও ততক্ষণ থাকব।

আমি থাকব সারারাত।

আমিও।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘনঘন। ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এক সময় ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। বাবু শীতে কাঁপতে কাঁপতে বলল আমি উঠলাম আপা। উঠতে গিয়ে সে আবার পিছলে পড়ল। খিলখিল করে হেসে উঠল মুনা। অন্ধকার বৃষ্টির রাতে সেই হাসি এমন চমৎকার শোনাল।

## ২

দশটা থেকে এগারটা এই এক ঘণ্টা মামুন মুনার অফিসে বসে রইল। মুনার দেখা নেই। অপরিচিত লোকজনদের মাঝে বসে থাকা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। সবাই যে অপরিচিত তা নয়, পাল বাবু তাকে চিনতে পেরেছেন এবং বাকি সবার সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছেন এই যে ইনি মামুন সাহেব। আমাদের মুনা ম্যাডামের সঙ্গে এনার সামনের মাসে বিয়ে হচ্ছে। কেউ কোনো উৎসাহ দেখায়নি। সম্ভবত মুনার সঙ্গে এদের সম্পর্ক ভাল নয়। পাল বাবু চা এনে দিয়েছেন এক কাপ। চায়ে ঘন সর। তার মধ্যে একটা বেশ তাজা কালো রঙের পিঁপড়া ভাসছে। মামুন আঙুল ডুবিয়ে

পিঁপড়া সরাল। চায়ে চুমুক দিতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কিন্তু সময় কাটানোর জন্যে একটা কিছু করা দরকার। মামুন পিঁপড়াটার দিকে তাকিয়ে চায়ে চুমুক দিল। চায়ে অন্য কোনো পোকা-মাকড় ডুবে থাকলে কেউ সে চা খায় না কিন্তু পিঁপড়া ডুবে থাকলে কেউ আপত্তি করে না। এর কারণ কী? মামুন সিগারেট ধরাল। এক ঘণ্টার মধ্যে এটা হচ্ছে চতুর্থ সিগারেট। বাঁ পাশের ভদ্রলোক ভ্রূ কুঁচকে তাকাচ্ছে। তিনি হয়ত সিগারেটের ধোঁয়া সহ্য করতে পারেন না। মামুন লক্ষ্য করেছে যে ক'বারই সে সিগারেট ধরিয়েছে এই লোকটি ভ্রূ কুঁচকে বিরক্তি প্রকাশ করেছে। একে নির্ভয়ে সিগারেট অফার করে ভদ্রতা দেখানো যায়। সিগাটে নেবে না, ভদ্রতাও বজায় থাকবে। মামুন হাসিমুখে সিগারেটের প্যাকেটটা বাড়াল। মামুনকে অবাক করে দিয়ে ভদ্রলোক সিগারেট নিলেন এবং আবার নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এই অফিসে কাজকর্ম একটু বেশি হয় নাকি? সবাই ব্যস্ত। কোণার দিকে একটি মেয়ে একবারও মাথা না তুলে ক্রমাগত টাইপ করে যাচ্ছে। মুনা বলছিল এই অফিসের বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে মেয়েটির কী নাকি একটা বাজে ঝামেলা হয়েছে। বাজে ঝামেলাটা কী সেটা পরিষ্কার করে বলেনি। আগে মেয়েটি বিশ্বাস সাহেবের সঙ্গে বসত, এখন অফিসের সবার সঙ্গে বসে। মামুন আড়চোখে মেয়েটিকে কয়েকবার দেখল। বাজে ঝামেলাটা কোন পর্যায়ের হতে পারে আন্দাজ করবার চেষ্টা করল। তেমন কোনো আকর্ষণীয় চেহারা নয়। মোটা ঠোঁট, চাপা নাক।

মামুন সাহেব!

মামুন তাকিয়ে দেখল পাল বাবু এক কপি দৈনিক বাংলা নিয়ে ঢুকেছেন।

বড় সাহেবের ঘর থেকে নিয়ে এলাম। বসে বসে পড়ুন। চা খাবেন নাকি আর এক কাপ?

জি না। ও বোধ হয় আজ আর আসবে না।

আসবে আসবে। মেয়েরা ইন জেনারেল অফিস কামাই করে না। দেরি করে আসে। সাজতে-গুজতে দেরি হয়।

পাল বাবু মামুনের পাশের চেয়ারটায় বসলেন। পানের কৌটা বের করলেন। হাসিমুখে বললেন  পান খাবেন?

জি না।

খান একটা, ভাল জর্দা আছে।

মামুন পান নিল। বসে থাকার চেয়ে পান চিবানো ভাল। জর্দাটা কড়া। চট করে মাথায় ধরেছে। মুখ ভর্তি হয়ে গেছে পানের পিকে। ফেলার জায়গা নেই, গিলে ফেলতেও সাহস হচ্ছে না। পাল বাবু তরল গলায় বললেন  বাড়ি না, অফিসই মেয়েরা বেশি পছন্দ করে। বাড়িতে শতেক রকমের কাজ। ওই রান্না করবে, এই এক গ্লাস পানি দাওরে, এই চা বানাওরে। অফিসে এসব ঝামেলা নেই। মামুন কিছু বলল না, জর্দার রস ভর্তি পিক গিলে ফেলায় তার সত্যি সত্যি বমি বমি লাগছে। সে বলল, এগারটা বিশ বাজে। আজ আর বোধ হয় আসবে না।

যদি আসে কিছু বলতে হবে?

বলবেন ছুটির পর আমার মেসে যেতে। খুব দরকার।

বলব।

পাল বাবু তাকে অফিসের সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। এই লোকটি সম্ভবত ফাঁকিবাজ, শুধু সময় নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এখন আবার এক আমসত্তওয়ালার সঙ্গে দরদাম করা শুরু করেছে। দরদামের নমুনা দেখেই মনে হচ্ছে কিনবে না। সময় কাটানোর একটা ব্যাপার।

মামুন হাঁটছে ধীরপায়ে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারদিকে। তার মনে ক্ষীণ আশা, হঠাৎ দেখবে মুনা নামছে রিকশা থেকে। কিংবা মাথা নিচু করে দ্রুত হেঁটে আসছে অফিসের দিকে। সে সিগারেট কেনার অজুহাতে পান বিড়ির দোকানটির সামনে মিনিট দশেক দাঁড়াল। মুনার দেখা পাওয়া গেল না।

আজকের দিনটাই মাটি হয়েছে। তিনদিনের ক্যাজুয়েল লিভের আজ হচ্ছে প্রথম দিন। কথা ছিল মুনা অফিসে এসে কোনো একটা অজুহাত দেখিয়ে সাড়ে এগারটার দিকে বেরুবে। তারপর দুজনে মিলে বাড়ি দেখতে যাবে কল্যাণপুরে। সেখানে নাকি ন'শ টাকায় চমৎকার একটা দু'রুমের ফ্ল্যাট আছে। কথা দেয়া আছে একটার সময় বাড়িওয়ালা চাবি নিয়ে থাকবেন। হাতে এখনো সময় আছে। নিউ পল্টন থেকে মুনাকে উঠিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু মুনার কঠিন নিষেধ যেন কোনোদিন তার

মামার বাড়িতে মামুন না যায়। নিষেধ সব সময় মানতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু সে রেগে যাবে। একবার রেগে গেলে তার রাগ ভাঙান মুশকিল। দিনের পর দিন কথা না বলে থাকবে। দশটা কথা জিজ্ঞেস করলে একটা কথার জবাব দেবে। তাও এক অক্ষরের জবাব। হ্যাঁ কিংবা না।

মামুন গুলিস্তান থেকে মীরপুরের বাসে উঠল। জর্দা দিয়ে পান খাবার জন্যেই তার মাথাটা হালকা লাগছে। বমি বমি ভাব কাটেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে বেশ ক্ষিধেও লেগেছে। দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ব্যাপার এক সঙ্গে কিভাবে ঘটছে কে জানে। মামুন একটা সিনেমার কাগজ কিনে ফেলল। প্রথম পাতা জুড়ে তিন রঙা বিশালবক্ষা মেয়ের ছবি। ভালই লাগে দেখতে।

বলা হয়েছিল মেইন রোডের পাশেই দোতলা বাড়ি। আসলে তা নয়, বেশ খানিকটা ভেতরে যেতে হল। বাড়ি দেখে যে কোনো আশাবাদী মানুষেরই আশাভঙ্গ হবে, মামুনেরও হল। অর্ধ-সমাপ্ত একটি বাড়ি। সামনে চুনসুড়কির পাহাড়। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি এমন যে দুজন মানুষও পাশাপাশি উঠতে পারে না। বাড়িওয়ালা হাজী সাহেবকেও খুব সুবিধার লোক মনে হল না। যেন বাড়ি দেখানোর তাঁর কোনো গরজ নেই। দুপুর একটায় আসতে হওয়ায় তাঁর যে কত বড় ক্ষতি হল সেই কথা তিনি চার-পাঁচ বার বললেন। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বললেন, স্ত্রীকে নিয়ে আসবেন বলেছিলেন, আনলেন না কেন?

একটা কাজে আটকা পড়ে গেছে। পরে আসবে।

বারবার তো বাড়ি দেখানো যাবে না। নিতে যদি চান আজই বলবেন। নিতে না চাইলেও আজ বলবেন।

দোতলার বারান্দায় উঠেই মামুন বলল, বাড়ি পছন্দ হযেছে, আমি নেব।

না দেখেই পছন্দ, ভাল করে দেখেন।

মামুন হৃষ্টচিত্তে ঘুরে ঘুরে বাড়ি দেখল। চমৎকার বাড়ি। দু'টি বিশাল ঘর। দু'টি ঘরের সঙ্গেই অ্যাটাচড বাথরুম। রান্নাঘরের পাশে ছোট্ট একটা স্টোর রুম। চমৎকার একটা বারান্দা। উথাল-পাথাল হাওযা খেলছে। হাজী সাহেব বললেন, আপনি আসবেন কবে?

সামনের মাসেব দশ-পনের তারিখেই আসব। কিছু অ্যাডভান্স দিয়ে যাই আপনাকে?

অ্যাডভান্স দেযার দরকার নেই। আর আপনি যদি সামনের মাসের আগেই উঠতে চান বা জিনিসপত্র বাখতে চান রাখবেন। তার জন্যে কোনো বাড়তি ভাড়া দিতে হবে না।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

ধন্যবাদের দরকার নেই। বাড়িটার যত্ন করবেন, সাত তারিখের মধ্যে ভাড়া দিবেন ব্যস। দেশ কোথায় আপনার?

ময়মনসিংহ।

ময়মনসিংহের লোক খুব পাজি হয়। আমার বাড়িও ময়মনসিংহ। তবে আপনি প্রফেসর মানুষ। এটাই ভরসার কথা।

মেসে ফিরতে ফিরতে চারটা বেজে গেল। ঘরে ঢুকে দেখে মুনা তার চৌকির ওপর একা একা বসে আছে। তার গলায় নীল রঙের একটা মাফলার। নাক দিয়ে ক্রমাগত পানি ঝরছে। দেখেই বোঝা যায় গায়ে জ্বর। মুনা ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, সেই কখন থেকে বসে আছি, কোথায় ছিলে? মামুন আজ সারাদিন ভেবেছে মুনার সঙ্গে দেখা হলেই খুব কথা শোনাবে। খুব রাগ করবে। কিন্তু রাগ করা গেল না। মুনার ওপর রাগ করা মুশকিল। মামুন গম্ভীর গলায় বলল, একটার সময় আমাদের এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল না?

যাব কিভাবে? অফিসেই গিয়েছি দেড়টার সময। আমার জ্বর, গলা ব্যথা। টনসিল!

আবার টনসিল, বল কী?

বৃষ্টিতে ভিজলাম। আমি ভিজলাম, বকুল ভিজল, বাবু ভিজল। ওদের কারো কিছু হয়নি। আমার অবস্থাই কাহিল।

মুনা অসহায়ের মত মুখ করল। মামুন এগিয়ে এসে হাত রাখল তার গলায়। মতলব ভাল নয়। মুনা বলল, কী অসভ্যতা করছ, হাত সরাও।

না সরাব না।

মামুনের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। কখন কে এসে পড়বে। বারান্দায় লোকজন চলাচল

করছে। মামুন তার হাত সরিয়ে নিল না। তার হাসি হাসি মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে রকম কোনো ইচ্ছাও তার নেই। মামুন নরম স্বরে বলল, কাল তোমার কী প্ল্যান?

কোনো প্ল্যান নেই, কেন?

চল কাল তোমাকে কল্যাণপুরের বাড়িটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।

মুনা হ্যাঁ-না কিছু বলল না। মামুন বলল – দু'একটা ফার্নিচারও কিনব। তুমি সঙ্গে থাকলে ভাল হয়।

কী ফার্নিচার?

বড় দেখে একটা খাট!

এমন অসভ্যের মত কথা বল কেন?

মামুন শব্দ করে হাসল। চোখ ছোট করে বলল, খাট কেনার মধ্যে অসভ্যতার কী দেখলে তুমি?

ভদ্র হয়ে বস।

ঠিক আছে বসছি ভদ্র হয়ে। কাল কখন আসবে বল।

কাল আসতে পারব না, অনেক কাজ আছে। ঘরে কাজের লোক নেই। মামির অসুখ।

কোনো কথা শুনব না। কাল আসতেই হবে। প্লিজ মুনা। দুপুরে কোনো রেস্টুরেন্টে বসে খাব। ফাইন হবে।

রেস্টুরেন্টে বসে খাবার মধ্যে ফাইন কী আছে?

আছে, তুমি বুঝবে না। মুনা, আসবে তো?

দেখি।

দেখাদেখি না। আসতেই হবে। সকাল ন'টার মধ্যে চলে আসবে, পজিটিভলি।

মুনা হ্যাঁ-না কিছু বলল না। এখান থেকে সে যাবে মামির ভাইয়ের বাড়ি। আংটি দিয়ে আসবে। মামুন বলল — কী আশ্চর্য, এখনি উঠছ কেন?

কাজ আছে আমার।

এত কাজের মেয়ে হয়ে উঠলে কবে থেকে?

মুনা কিছু বলবার আগেই মামুন চট করে তার ঠোঁটে চুমু খেল। মুনা সরে গেল মুহূর্তেই। বিরক্ত স্বরে বলল, কেন সব সময় বিরক্ত কর? দরজা খোলা। লোকজন যাওয়া-আসা করছে।

মামুন হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছি।

থাক দরজা বন্ধ করতে হবে না।

তুমি আসছ তো?

দেখি।

কাল ন'টায়। পজিটিভলি।

মামির ভাই বাসায় ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী ছিলেন। ভদ্রমহিলা মুনাকে দেখেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন কাল তোমরা কেউ আসলে না যে, ব্যাপারটা কী?

মামির শরীরটা ভাল না।

তোমাদের শরীর তো ঠিক ছিল, না তোমাদের সবার একসঙ্গে শরীর খারাপ হল?

মুনা কিছু বলল না।

শ'দেড়েক লোক খেয়েছে। অথচ নিজের আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। বস তুমি। চা-টা কিছু খাবে?

জি না।

এক বাটি গোসত তুলে রেখেছিলাম তোমাদের জন্যে, যাওয়ার সময় নিয়ে যেয়ো।

মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল, গোসতের বাটি নিয়ে যাব কিভাবে?

বাটি নিয়ে যাবে কেন? টিফিন ক্যারিয়ারে ভরে দেব।

মুনাকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হল। এ বাড়িতে অনেক লোকজন থাকে। এদের কাউকেই সে ভাল করে চেনে না। সে যে অনেকক্ষণ ধরে একা একা বসে আছে এটা কেউ তেমন লক্ষ্যই করছে না। পাশের কামরায় বেশ কিছু ছেলেমেয়ে ভি সি আর দেখছে। একটি মেয়ে এসে এক ফাঁকে বলে

গেল - অমিতাভের ছবি হচ্ছে, দেখবেন? বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে ছুটে চলে গেছে।

মুনা টিফিন বক্সের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। কাজের ছেলেটি তার সামনে একটা পেপসির বোতল রেখে গেছে। বাড়ির কর্ত্রী টেলিফোন ধরতে গিয়ে আর ফিরছেন না। মুনা ঘড়ি দেখল, সাড়ে ছ'টা বাজে। আজও বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

৩

মুনার মনে হল তার জ্বর আসছে।

মুখ তেতো, মাথায় ভোঁতা একটা যন্ত্রণা। সকালে নাশতা খেতে গিয়ে টের পেল গলাব্যথা আরো বেড়েছে। গলা দিয়ে কিছুই নামছে না। মুনা ক্লান্ত স্বরে বলল - বকুল, একটু গরম পানি করে দে, গোসল করব। বকুল সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

নাশতা শেষ করে যা। বলা মাত্রই দৌড়াতে হবে নাকি?

আমার নাশতা খাওয়া হয়ে গেছে।

বকুল রান্নাঘরে ঢুকে গেল। মুনা বলল, মামা কোথায় রে বাবু?

সকালবেলা কোথায় যেন গেছেন।

নাশতা খেয়ে গেছেন?

না। বকুল বলেছিল চা খেয়ে যেতে।

মুনা বিরক্ত হয়ে বলল, বকুল বকুল করছিস কেন? কতবার বলেছি আপা বলতে।

আপাই তো বলি।

আবার মিথ্যা কথা? চড় খাবি।

গার্গল করেও লাভ হল না। পানি বেশি গরম ছিল, মাঝখান থেকে জিব পুড়ে গেল। বকুল বলল, তোমার চোখ লাল হয়ে আছে। শুয়ে থাক গিয়ে। মুনা কিছু বলল না। বকুল ইতস্তত করে বলল, ফজলু ভাইদের বাসায় একটু যাব আপা? মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কেন?

যেতে বলেছিল আমাকে। খুব নাকি দরকার।

কী দরকার?

জানি নাকি, শুধু বলেছেন খুব জরুরি। বোধ হয় ভাবীর সঙ্গে আবার ঝগড়া-টগড়া হয়েছে।

সেটা ওদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, তুই কেন যাবি?

বকুল আর কিছু বলল না। ফজলুর রহমান সাহেব গলির ওপাশেই থাকেন। মাস ছয়েক হল এসেছেন। খুব সামাজিক ধরনের মানুষ। এসেই আশপাশের সব বাড়িতে গেছেন। বিয়ের সময় নিজে এসে দাওয়াত করে গেছেন। মুনার নিজের ধারণা লোকটি গায়ে-পড়া ধরনের। প্রথম আলাপেই খালা, খালু, আপামণি ডাকাডাকি তার ভাল লাগেনি। বকুলের সঙ্গে ভদ্রলোকের স্ত্রীর খুব খাতির। এটাও মুনার ভাল লাগেনি। অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে একজন বিবাহিত মহিলার এত ভাব থাকা ঠিক না। বকুল আবার বলল, আপা যাব?

মুনা জবাব দিল না। ব্যাপারটা সে এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু বকুলের চোখে-মুখে আগ্রহ ঝলমল করছে। মুনা বলল, কী নিয়ে তোদের এত গল্প?

বকুল মাথা নিচু করে হাসতে লাগল। তার গালে লাল আভা। নিশ্চয়ই নিষিদ্ধ গল্পগুজব হয়। নতুন বিয়ে হওয়া মেয়েরা সুযোগ পেলেই অন্য মেয়েদের সঙ্গে রাতের অন্তরঙ্গতার গল্প করতে চায়। মুনা এ ধরনের অনেক গল্প শুনেছে। শুনতে ভালই লেগেছে। বকুলেরও নিশ্চয়ই লাগে।

আপা যাব?

না, রান্নাবান্না করতে হবে না? আজ আমি বাইরে যাব। ফিরতে সন্ধ্যা হবে।

জ্বর নিয়ে কোথায় যাবে?

মুনা জবাব দিল না। বকুল বলল-- বেশিক্ষণ থাকব না আপা। যাব আর আসব। যাই?

ঠিক আছে যা।

লতিফা বিছানা ছেড়ে উঠলেন দশটার দিকে। আজ তাঁর শরীর বেশ ভাল। দশ-বারো দিনের মধ্যে আজ এই প্রথম ঘর ছেড়ে বের হলেন। বাবু ছুটে গিয়ে মাকে বসার জন্যে একটা মোড়া এগিয়ে দিল। তিনি অবশ্যি বসলেন না। দেয়াল ধরে ধরে বসার ঘরে চলে এলেন। বাবু বলল, বেশি

হাঁটাহাঁটি করবে না মা। লতিফা বললেন, তোর বাবা কোথায়?

জানি না।

বকুল, বকুল কোথায় গেল?

ফজলু ভাইদের বাসায় গেছে। ডেকে নিয়ে আসব?

না ডাকতে হবে না।

তিনি একটি বেতের চেয়ারে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন।

মুনাকে বল তো আমাকে এক কাপ আদা চা দিতে।

মুনা আপার জ্বর, শুয়ে আছে। আমি বানিয়ে দেই?

না থাক। হাতটাত পুড়বি।

না হাত পুড়ব না।

বাবু খুব উৎসাহ নিয়ে চা বানাতে গেল। লতিফা এলেন তার পেছনে পেছনে। বিরক্ত স্বরে বললেন, ইস কী অবস্থা রান্নাঘরের।

তোমাকে একটা চেয়ার এনে দেব মা? বসবে?

না চেয়ার লাগবে না।

লতিফা নোংরা মেঝেতেই পা ছড়িয়ে বসলেন। বাবু বলল, মা দেখ তো লিকার কড়া হয়ে গেছে?

না ঠিকই আছে। মুনার জ্বর কী খুব বেশি?

হুঁ। ঐ দিন বৃষ্টিতে সবাই ভিজলাম তো। কারো কিছু হল না, মুনা আপার টনসিল ফুলে গেল।

চায়ে চুমুক দিয়েই লতিফার বমি বমি ভাব হল। শরীরটা গেছে। তিনি সাবধানে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর পা কাঁপছে।

চা খাবে না?

উঁহু তুই খেয়ে ফেল। শরীরটা খারাপ লাগছে। শুয়ে থাকব। মুনাকে বল তো একটু আসতে।

তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। তাঁর মনে হল আর কোনোদিন এ ঘর থেকে বেরুতে পারবেন না। বাকি জীবনটা এ ঘরেই কাটাতে হবে। আজকাল প্রায়ই তাঁর এ রকম মনে হয়। মুনা এসে দেখল লতিফা কাঁদছেন। সে না দেখার ভান করে সহজ ভাবেই বলল ডেকেছিলে মামি?

তুই একটু বোস আমার পাশে।

মুনা বসল। লতিফা কী বলবেন মনে করতে পারলেন না। কি একটা যেন বলতে চেয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন ধরে এ রকম হচ্ছে। কিছুই মনে থাকছে না।

কি জন্যে ডেকেছিলে মামি?

এমনি এমনি ডাকলাম! শরীরটা বড় খারাপ।

তোমার নিজের জন্যেই তোমার শরীর ঠিক হচ্ছে না মামি। দুপুর একটার আগে কিছু মুখে দাও না। রুগীদের আরো বেশি করে খেতে হয়।

ইচ্ছা করে না, বমি আসে।

আসলে আসুক।

লতিফা ক্লান্ত স্বরে বললেন, বকুলের একটা বিয়ের ব্যবস্থা কর। তোর মামাকে বল। মুনা অবাক হয়ে বলল, কেন? ওর কী বিয়ের বয়স হয়েছে নাকি? কী যে তুমি বল।

বয়স খুব কমও তো না। নভেম্বর মাসে পনেরো হবে।

পনেরো বছর বয়সে কোনো মেয়ের বিয়ে হয় নাকি?

বিয়ে দিলেই বিয়ে হয়। আমার বিয়ে হয়েছিল চৌদ্দ বছর বয়সে।

তুমি বলছ তেত্রিশ বছর আগের কথা।

লতিফা ক্ষীণ স্বরে বললেন, আমার শরীর ভাল না। তুইও চলে যাচ্ছিস। আমার সাহস হয় না। তোর মামাকে বল ঐ ছেলেটার সঙ্গে কথা বলতে। তুই বললে শুনবে।

কোন ছেলেটার সঙ্গে?

বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল যে। গ্রিন রোডে ফার্মেসি আছে ছেলেটার। মামা মিডফোর্ডের ডাক্তার।

বাঁটু বাবাজীর কথা বলছ? তিন ফুট বামুন?

লতিফা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। মুনা বলল, বকুলের বিয়ে প্রসঙ্গে আমি কারো সঙ্গে

কোনো কথাটথা বলতে পারব না। ওর মতো সুন্দরী মেয়ে খুব কম আছে। ওর বিয়ে নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

লতিফা মৃদু স্বরে বললেন, আমি বেশি দিন বাঁচব না।

মুনা বিরক্ত হয়ে বলল, না বাঁচলে, তাই বলে বাচ্চা মেয়েকে ধরে বিয়ে দিতে হবে? এই সব কী?

তুই চলে গেলে ঝামেলা হবে।

কী ঝামেলা হবে?

ছেলেরা চিঠিফিটি লেখে।

চিঠি তো লিখবেই। সুন্দরী মেয়েদের এইসব সহ্য করতে হয়। এসব কিছু না।

মুনা উঠে চলে এল। বকুল গিয়েছে দেড় ঘণ্টা আগে, এখনো ফেরার নাম নেই। কখন রান্না হবে কে জানে। মামা বাজার নিয়ে ফিরবেন কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। মুনা একবার ভাবল ভাতটা চড়িয়ে দেয়। কিন্তু আগুনের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে জ্বর চেপে আসছে।

বাবু গম্ভীর হয়ে বসার ঘরে বসে আছে। মুনাকে ঢুকতে দেখে সে কী মনে করে হাসল। মুনা বলল, ছুটির দিনে ঘরে বসে আছিস কেন? বাইরে খেলাধুলা করগে।

বাবু আবার মুখ টিপে হাসল।

হাসছিস কেন?

এমনি।

আমার জ্বর কী-না দেখ তো।

হুঁ তোমার জ্বর।

গায়ে হাত না দিয়েই টের পেয়ে গেলি?

বাবু লজ্জিত মুখে কাছে এগিয়ে এল। তার হাত বেশ ঠাণ্ডা; তার মানে বেশ জ্বর গায়ে। বাসায় কোনো থার্মোমিটার নেই। জ্বর কত বোঝার উপায় নেই।

মুনা আপা তুমি শুয়ে থাক, আমি মাথার চুল টেনে দেব।

চুল টানতে হবে না, তুই বকুলকে ডেকে নিয়ে আয়। এক্ষুণি যা। এতক্ষণ কেউ অন্যের বাড়িতে থাকে?

বাবু সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। মুনা আপার কাজ করতে তার এত ভাল লাগে। সারাক্ষণই ইচ্ছা করে কিছু একটা করে মুনা আপাকে খুশি করতে।

বকুলই রান্না করল। ভাত ডাল এবং ইলিশ মাছের ঝোল। শওকত সাহেব ভর দুপুরে বাজার নিয়ে এসেছেন। রান্না করতে তাই দুটো বেজে গেল। শওকত সাহেব দু'বার এসে খোঁজখবর নিলেন তরকারি নেমেছে কিনা। বকুল তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সব কিছুই কেমন এলোমেলো করে ফেলতে লাগল।

খেতে বসে শওকত সাহেব কঠিন কঠিন কিছু কথা বললেন। এত বড় মেয়ে সামান্য একটা তরকারি রাঁধতে পারে না কেন এই নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। গলা টেনে টেনে বললেন, লবণ কী সস্তা হয়েছে? আধাসের লবণ দিয়ে দিয়েছিস তরকারিতে। সবটা তুই একা খেয়ে শেষ করবি।

বকুলের লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করল। শওকত সাহেব প্লেট ঠেলে দিয়ে হাত ধুতে গেলেন। বকুল বাবুকে ফিসফিস করে বলল, লবণ খুব বেশি হয়ে গেছে?

হুঁ।

শুধু মাছটা খা। ডালের সঙ্গে মিশিয়ে খা।

তুমি খাবে না?

না।

বকুল সত্যি সত্যি কিছু মুখে দিল না। নিজের জন্যে তার খুব কষ্টও হল না। এটা তার অভ্যেস আছে। প্রায়ই সে রাগ করে না খেয়ে থাকে।

মুনা দুটা প্যারাসিটামল খেয়েছে। মাথা ধরা তবু কমেনি। আরো যেন বেড়েই যাচ্ছে। আজ কোথাও বেরুনোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মামুন অপেক্ষা করে করে মহা বিরক্ত হবে। মুনা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মামুনের সঙ্গে যে কবার কোথাও যাবার প্রোগ্রাম করা হয়েছে সে কবারই এ রকম ঝামেলা।

মুনা আপা।

কী।

কিছু খাবে না?

না। মামিকে খেতে দিয়েছিস?

মা ভাত খাবে না। রুটি বানিয়ে দিতে বলছে।

বানিয়ে দে। আটাটা গরম পানিতে সেদ্ধ করে নিবি। নয় তো রুটি নরম হবে না।

ঘরে আটা নেই।

বাবুকে দোকানে যেতে বল।

বাবু যেন কোথায় গেছে। আমি গিয়ে নিয়ে আসব?

না, তুই কি যাবি। মামাকে গিয়ে বল।

আমি বলতে পারব না। তুমি বল।

ঠিক আছে, আমিই বলব।

শওকত সাহেব কোনো রকম বিরক্তি প্রকাশ না করেই আটা আনতে গেলেন। বকুল বলল আপা, টিনা ভাবীর বাচ্চা হবে। মুনা বলল, এখনই বাচ্চা হবে কি, সেদিনই না বিয়ে হল।

সেদিন না। ছয় মাস এগার দিন হয়েছে।

তোর দেখি একেবারে দিন-তারিখ মুখস্থ। এত খাতির কেন তোর সাথে?

খাতির কোথায় দেখলে? আর খাতির হওয়াটাও কি খারাপ?

বেশি হওয়াটা খারাপ। বেশি কোনোটাই ভাল না।

কেন?

মুনা প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। সে লক্ষ্য করল বকুল আজকাল বেশ কঠিন ভঙ্গিতে কথা বলছে। এটা ভাল লক্ষণ। মেয়েদের এত পুতুপুতু থাকলে চলে না।

বকুল বলল মুনা আপা, ওরা শুক্রবারে কাবলিওয়ালা দেখতে যাবে। ইন্ডিয়ান অ্যাম্বেসিব অডিটোরিয়ামে। আমাকেও সাথে যেতে বলছে। আমার জন্যেও টিকিট এনেছে।

ওরা স্বামী-স্ত্রী দেখতে যাবে, তাদের মধ্যে তুই যাবি কেন?

আমি তো যেতে চাই না। ওরা জোর করছে। আপা যাব?

শুক্রবার আগে আসুক তারপর দেখা যাবে।

তুমি আগে থেকে বাবাকে বলে রাখবে, নয়ত শেষে রাজি হবে না। তুমি আজ আর কোথাও যাবে না?

না।

বকুল মৃদু হেসে বলল, মামুন ভাই অপেক্ষা করে থাকবে। মুনা কিছু বলল না। বকুল তরল গলায় বলল, আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তিনি তোমাকে দেখার জন্যে আজ এখানে চলে আসবেন।

বকুল লক্ষ্য করল মুনা এই প্রসঙ্গটি পছন্দ করছে না। সে কিছুটা বিব্রত বোধ করল। প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, তোমার চোখ লাল টকটকে হয়ে আছে। শুয়ে থাক না।

সন্ধ্যার দিকে মুনার জ্বর খুবই বাড়ল। শওকত সাহেব একটা থার্মোমিটার কিনে আনলেন। জ্বর একশ তিনের কাছাকাছি। তিনি থমথমে স্বরে বললেন, বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপাঝাঁপি, জ্বর তো হবেই। শরীর বেশি খারাপ লাগছে? মুনা ক্লান্ত স্বরে বলল, কানের কাছে বকবক করলে খারাপ লাগে। তুমি যাও তো ঘর থেকে। শওকত সাহেব নড়লেন না। পাশেই বসে রইলেন।

বাতি নিভিয়ে দাও মামা, চোখে লাগছে।

বাবু বাতি নিভিয়ে বারান্দায় একা একা বসে রইল। বকুল রাতের রান্না চড়িয়েছে। একা একা রান্নাঘরে তার একটু ভয় লাগছে। সে বেশ কয়েকবার বাবুকে ডেকেছে। বাবু আসেনি। লতিফার পানির তৃষ্ণা হয়েছিল। ক্ষীণ কণ্ঠে কয়েকবার পানির কথা বললেন, কেউ শুনল না। তিনি আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। বেশিক্ষণ জেগে থাকতে পারেন না। চোখ জড়িয়ে আসে।

মুনা বলল, মামা তুমি আমার পাশে এ রকম বসে থাকবে না তো! অন্য ঘরে যাও।

তোর কোনো অসুবিধা করছি নাকি?

করছ। ভোস-ভোস করে সিগারেট টানছ। গন্ধে থাকতে পারছি না।

শওকত সাহেব আধাখাওয়া সিগারেটটা ফেলে দিলেন। মৃদু স্বরে বললেন, গ্রিন ফার্মেসিতে

বলে এসেছি, ডাক্তার এলেই পাঠিয়ে দেবে।

মুনা পাশ ফিরল।

গায়ের ওপর কাঁথাটা দিয়ে রাখ না। ফেলে দিচ্ছিস কেন?

গরম লাগছে তাই ফেলে দিচ্ছি। ঠাণ্ডা লাগলে আবার দেব। তুমি ও-ঘরে গিয়ে বস না মামা।

শওকত সাহেব উঠলেন না। গলার স্বর অনেকখানি নামিয়ে বললেন, তোর বাবা তোর বিয়ের জন্যে আলাদা করে কিছু টাকা দিয়ে গিয়েছিল আমাকে। নয় হাজার টাকা। সেই আমলে নয় হাজার টাকা অনেক টাকা। বুঝলি মুনা, টাকাটা সংসারে খরচ হয়ে গেছে।

খরচ হয়েছে ভাল হয়েছে। এখন চুপ কর।

আমি প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ছয় হাজার টাকা তুলে রেখেছি। তুই নিয়ে নিস। বাকিটা পরে দেব। ভাগে ভাগে দেব।

মামা আমাকে কোনো টাকা-পয়সা দেয়ার দরকার নেই। তোমরা না দেখলে আমার যাওয়ার জায়গা ছিল? তুমি আমাকে যে আদর কর তার দশ ভাগের এক ভাগ নিজের ছেলেমেদের কোনোদিন করেছ? আর আজ তুমি টাকার কথা তুললে? ছিঃ ছিঃ!

না মানে...।

মাঝে মাঝে তুমি এমন সব আচরণ কর যে মেজাজ ঠিক থাকে না।

কী করলাম?

এই যে দুপুরে খেতে বসে চেঁচামেচিটা করলে। বেচারী বকুল কেঁদেকেটে অস্থির। ভাত খায়নি দুপুরে।

ননীর পুতুল একেকজন। ধমক দিলে খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। চড় দিয়ে দাঁত ফেলে দিতে হয় এদের।

তুমি যাও তো মামা, ওকে দু'একটা মিষ্টি কথা বল। আমার কানের কাছে বসে ঘ্যান ঘ্যান করবে না।

শওকত সাহেব উঠে পড়লেন। বারান্দায় গিয়ে প্রচণ্ড একটা ধমক দিলেন বাবুকে- বই নিয়ে বসার কথাটা বলে দিতে হবে?

বাবু শুকনো মুখে বই আনতে গেল।

অংক বই খাতা নিয়ে আয়। গায়ে তো কারো বাতাস লাগে না? শক্ত মার দিলে হুঁশ হবে। তার আগে হুঁশ হবে না। শয়তানের ঝাড়। দুপুরবেলা হুট করে কোথায় গিয়েছিলি?

বাবু কোনো জবাব দিল না। অংক খাতা ও বই নিয়ে বসল। তার মুখ সাদা হয়ে গেছে। বাবাকে সে খুব ভয় পায়। শওকত সাহেব রান্নাঘরে উঁকি দিলেন। বকুল বাবাকে দেখে জড়সড় হয়ে গেল।

রান্নাঘরটাকে একেবারে দেখি পায়খানা বানিয়ে রেখেছিস। গুছিয়ে-টুছিয়ে নিতে পারিস না। কোনোটাই তো দেখি হয় না। পড়াশুনা না কাজকর্মও না। করবিটা কি? কারো বাড়িতে ঝিগিরিও তো পাবি না। এক কাপ চা বানিয়ে দিয়ে যা।

বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, দুধ চা?

একটা হলেই হল। তোর মা কিছু খেয়েছিল দুপুরে?

রুটি খেয়েছিল।

মুনার জন্যে হালকা করে বার্লি বানা। লেবুর রস দিয়ে লবণ দিয়ে ভাল করে বানা। বার্লি আছে না ঘরে?

আছে।

শওকত সাহেব চলে গেলেন। তখন বকুলের মনে পড়ল ঘরে বার্লি নেই। এই কথাটা এখন বাবাকে বলবে কে? রাগে নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা হচ্ছে। সে বাবার জন্যে চায়ের পানি চড়াল। ঘরটা একটু গোছাতে চেষ্টা করল। তার আবারও কেন জানি ভয় ভয় করছে। রান্নাঘরে একা থাকলেই একটা ভয়ের গল্প মনে হয়। ঐ যে রান্নাঘরে একটি বউ একা একা মাছ ভাজছিল হঠাৎ জানালা দিয়ে একটা রোগা কালো হাত বেরিয়ে এল। নাকি সুরে একজন কে বলল- মাঁছ ভাঁজা দেঁ। তাছাড়া আজ দুপুরেও ভাবী পাঁচ-ছ'টা ভূতের গল্প বলেছে। তাঁর কোন খালার নাকি জ্বীনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। সেই জ্বীন সুন্দর সুন্দর সব জিনিসপত্র এনে দিত। একবার নাকি একটা ফুলের

মালা এনে দিয়েছিল যার সবগুলি ফুল কুচকুচে কালো রঙের। দিনের বেলা গল্পগুলি শুনে হাসি এসেছে কিন্তু এখন আবার কেমন ভয় ভয় লাগছে। সবগুলি গল্পই মনে হচ্ছে সত্যি। ভাবী বলছিল— তুমি যা সুন্দর, সাবধানে থাকবে ভাই। ভর দুপুরে আর সন্ধ্যায় এলোচুলে থাকবে না। বকুল অবাক হয়ে বলেছিল, এলোচুলে থাকলে কি হয়?

খারাপ বাতাস লাগে।

খারাপ বাতাস লাগে মানে?

জ্বীন-ভূতের আছর হয়। সুন্দরী মেয়েদের ওপর জ্বীনের আছর হওয়া খুব খারাপ। সারা রাত এরা ঘুমুতে দেয় না। বিরক্ত করে।

কিভাবে বিরক্ত করে?

এখন বুঝবে না। বিয়ে হওয়ার পর বুঝবে।

এই বলে ভাবী মুখ টিপে টিপে হাসল। রহস্যময় হাসি।

কি বকুল শুনতে চাও কিভাবে বিরক্ত করে?

না শুনতে চাই না।

অবশ্যি অনেকে সেটা পছন্দও করে। আমার ঐ খালার কথা বলছিলাম না সেই খালা জ্বীন না এলে কেমন অস্থির হয়ে যেত কাপড়-টাপড় খুলে ফেলে বিশ্রী কাণ্ড করত।

এখন তিনি কোথায় থাকেন?

চাঁদপুরে। এখন আর এইসব নেই। খুব ভাল মানুষ। এক ওভারশিয়ারের সাথে বিয়ে হয়েছে। তিন ছেলেমেয়ে। জ্বীন-ভূতের কথা আর কিছুই মনে নেই।

ডাক্তার এল সাড়ে ন'টার সময়। তার সঙ্গে এল বাকের। বাকেরের গায়ে চকচকে লাল রঙের একটা শার্ট। শার্টের পকেটে ফাইভ ফাইভের প্যাকেট উঁচু হয়ে আছে। তার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। যেন অসুখের ব্যাপারে দারুণ চিন্তিত। বাকেরকে দেখে মুনার বিরক্তির সীমা রইল না। তাকে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে— এ বাড়িতে যেন কোনোদিন না আসে। তবু কেমন নির্লজ্জের মত এসেছে। আর বাবুর কাণ্ড, একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে আসতে হবে। সে তো আর ডাক্তার না। মুনা বিরক্ত চোখে তাকিয়ে রইল। বাকের বলল, খুব ফ্লু হচ্ছে চারদিকে। কাহিল অবস্থা। জ্বর বেশি নাকি তোমার?

মুনা জবাব দিল না। তাকাল ডাক্তারের দিকে। এই ডাক্তার এ পাড়ায় নতুন এসেছে। দেখে মনে হয় নাইন-টেনে পড়ে। স্টেথিসকোপ হাতে নিয়ে এমন ভাবে চারদিক দেখেছে যেন যন্ত্রটি নিয়ে সে কি করবে মনস্থির করতে পারছে না। কিংবা হয়ত স্টেথিসকোপ বুকে বসাতে সাহস করছে না। মুনা বলল, আমার গলাটা দেখুন। ঢোঁক গিলতে পারি না।

ডাক্তার সাহেব গলায় ছোট্ট একটা টর্চের আলো ফেললেন। বাকের বলল, দেখি আমি টর্চ ধরছি, আপনি দেখুন ভাল করে। ডাক্তারের কিছু বলার আগেই সে টর্চ নিয়ে নিল। মুনা বলল, আপনি বসার ঘর গিয়ে বসুন না। ওঁকে দেখতে দিন।

উনিই তো দেখছেন। আমি দেখছি নাকি? আমি কী ডাক্তার? হা হা হা।

ডাক্তার সাহেব বললেন, কানে ব্যথা আছে?

জি না।

আপনার কি আগেও টনসিলের প্রবলেম ছিল?

জি।

বাকের একগাল হেসে বলল, একেবারে ছেলেবেলা থেকে মুনার এই প্রবলেম। বৃষ্টির একটা ফোঁটা পড়ল, ওমনি তার গলা ফুলে গেল। পিকিউলিয়ার।

ডাক্তার সাহেব নিচু স্বরে বললেন, একটা থ্রোট কালচার করা দরকার।

বাকের বলল, দরকার হলে করবেন। একবার কেন দশবার করবেন। হা হা হা।

মুনা, বলল, আপনারা বসার ঘরে গিয়ে বসুন। আমি চা দিতে বলি।

বাকের বলল, চা-টা কিচ্ছু লাগবে না। রোগীর বাসায় কোনো খাওয়া-দাওয়া করা ঠিক না। কি বলেন ডাক্তার সাহেব? ডাক্তার কিছু বললেন না। বকুলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে একটু পানি দেবেন? হাত ধোব।

এই প্রথম বোধ হয় বয়স্ক একজন কেউ বকুলকে আপনি বলল। বকুলের গাল টকটকে লাল

হয়ে গেল মুহূর্তেই। সে অনেকখানি মাথা নিচু করে ফেলল। বাকের বলল, সাবান আর পানি নিয়ে আস বকুল। পরিষ্কার দেখে একটা টাওয়ালও আনবে।

মুনু বলল, বাকের ভাই, আপনি বসার ঘরে চলে যান। মামার সঙ্গে কথা বলুন। এই ঘরটা গরম।

ফ্যানটা ছাড় না।

ফ্যান নষ্ট। কয়েল নষ্ট হয়ে গেছে।

তাই নাকি! আচ্ছা সকাল বেলা লোক পাঠিয়ে দেব খুলে নিয়ে যাবে। মদনাকে বললেই এক ঘণ্টার মধ্যে ঠিক করে দেবে।

ঝামেলা করতে হবে না।

কোনো ঝামেলা না। মদনা শালাকে একটা ধমক দিলেই হবে।

বাকের বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে সিগারেটের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করল। চকচকে লাইটার বের করে অনেক সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল।

ডাক্তার সাহেব বারান্দায় হাত ধুতে গিয়ে মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম আপনার? উত্তর দিতে বকুলের খুব লজ্জা লাগতে লাগল। তার মনে হল যেন এর উত্তর দেয়াটা ঠিক না। সে অস্পষ্ট স্বরে বলল, বকুল। আমাকে তুমি করে বলবেন। আমি স্কুলে পড়ি।

তাই নাকি! কোন স্কুলে?

মডেল গার্লস স্কুলে?

মেট্রিক দেবে এবার?

জি।

সায়েন্স?

জি না।

সায়েন্স পড়লে ভাল করতে। ডাক্তার হতে পারতে। ডাক্তারের খুব দরকার আমাদের। মেয়ে ডাক্তারের দরকার আরো বেশি।

বকুল কিছু বলল না। জগে করে পানি ঢেলে দিতে লাগল। ডাক্তার সাহেবের হাত পরিষ্কার করতে অনেক সময় লাগল। যাবার সময় তিনি ভিজিটও নিলেন না। কেন ভিজিট নিচ্ছেন না সেই কারণটিও স্পষ্ট করে বলতে পারলেন না। হড়বড় করে যা বললেন তার মানে হল— সবার কাছ থেকে তিনি ভিজিট নেন না। ডাক্তারি তো কোনো ব্যবসা না। ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাকে দেখা ঠিক না...ইত্যাদি।

তারা বেশ কিছু সময় বসার ঘরে বসে রইল। ডাক্তার সাহেব বললেন তিনি চা খান না, তবুও শেষ পর্যন্ত চা খেলেন। বাকের বলল ঘরে কাজের লোক নেই এটা তাকে বললেই একটা ব্যবস্থা করতে পারত। বাবুকে সে ছোটখাটো একটা ধমকও দিল, রোজ দেখা হয়, আমাকে বললেই পারতি।

পরদিন সকালে মদন মিস্ত্রীর লোকজন এসে ফ্যান খুলে নিয়ে গেল। বলে গেল বিকেলের মধ্যে দিয়ে যাবে। তার কিছুক্ষণ পর এলেন ডাক্তার সাহেব। তিনি নাকি পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন রুগী কেমন আছে দেখে যেতে এসেছেন। বকুল তাঁকে চা বানিয়ে খাওয়াল। চা'টা তাঁর কাছে খুব চমৎকার লাগল। কোন দোকান থেকে চায়ের পাতা কেনা হয়েছে তা জানতে চাইলেন। বকুল চোখ-মুখ লাল করে তার সামনে বসে রইল। ডাক্তার সাহেব যাবার আগে বললেন, বকুল যাই। বকুলের কিছু একটা বলা উচিত। কিন্তু সে বলতে পারল না।

## 8

পাল বাবু অবাক হয়ে বললেন, এ কি অবস্থা ম্যাডাম!

মুনা বলল, ক'দিন খুব ভুগলাম। টনসিলাইটিস। আপনারা ভাল তো?

ভালই। তিন দিনের জ্বরে কারো এমন অবস্থা হয় জানতাম না। আপনার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। গেছো পেত্নীর মত লাগছে। রাগ করলেন নাকি?

মুনা রাগ করল না, তবে বিরক্ত হল। পাল বাবু বড় বিরক্ত করতে পারেন। মেয়েদের টেবিল বেছে বেছে বসবেন. সামান্য জিনিস নিয়ে বকবক করে মাথা ধরিয়ে দেবেন।

আপনার ভাবী স্বামী এসেছিলেন। তারও দেখলাম মুখ শুকনো। সিক লিভের দরখাস্ত করেছেন শুনে মুখ আরো শুকিয়ে গেল। উনি গিয়েছিলেন নাকি আপনাদের ওখানে?

না যায়নি।

সেটাই ভাল, ঘন ঘন শ্বশুর বাড়ি যাওয়া ভাল না। এই আমাকে দেখেন, প্রতি বৃহস্পতিবার শ্বশুরবাড়ি যাই-- শুক্র, শনি দু'দিন থাকি। এতে লাভটা কী হয়েছে জানেন? শ্বশুরবাড়িতে প্রেস্টিজ আমার কিছুই নেই।

মুনা শুকনো গলায় বলল, তাই নাকি?

হ্যাঁ। গত সপ্তাহে শ্বশুরমশাই আমাকে বললেন, বাবা রেশনটা একটু তুলে দিতে পারবে? চিন্তা করেন অবস্থা, জামাইকে বলছে রেশন তুলতে।

মুনা সবচেয়ে উপরের ফাইলটা খুলল। দশটা এখনো বাজেনি। অফিস ফাঁকা। ইলিয়াস সাহেব আর আখতারুজ্জামান সাহেব এসেছেন। ওদের টেবিল ঘরের শেষ প্রান্তে। মুনার সঙ্গে তাদের তেমন আলাপ নেই। তবু আখতারুজ্জামান সাহেব জিজ্ঞেস করলেন - শরীর ঠিক হয়েছে? খুব কাহিল হয়েছে দেখি। মুনা বলল, আপনারা ভাল ছিলেন সবাই? বলেই মনে হল কথাটা খুব মেয়েলি হয়ে গেল। তিন দিন পর এসেই আপনারা ভাল ছিলেন সবাই জিজ্ঞেস করাটা আদিখ্যেতার মত।

কী হয়েছিল আপনার, ফ্লু?

মুনা জবাব দেবার আগেই পাল বাবু বললেন ম্যাডামের হয়েছে টনসিলের ব্যারাম, হা হা হা।

কিছু কিছু লোক থাকেন এমন বিশ্রী স্বভাবের। পাল বাবুর মত আরেকজন আছে সিদ্দিক সাহেব। সব সময় গলা নিচু করে এমন ভাবে কথা বলবেন যেন মনে হয় ষড়যন্ত্র করছেন। ম্যাচের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাবেন এবং কাঠিগুলো টেবিলের ওপর ফেলে রেখে যাবেন। অসহ্য।

বড় সাহেবের বেয়ারা মুনির এসে বলল, আপনারে স্যার ডাকে। পাল বাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, অফিস তো এখন শুরু হয় নাই, এখনই কিসের ডাকাডাকি? যাও, বল দশ মিনিট পরে আসবে। না না ম্যাডাম, ডাকা মাত্রই ছুটে যাওয়া ঠিক না। বসেন চা খান, তারপর যান। চায়ের কথা বলে এসেছি।

চা তো আমি বেশি খাই না।

আরে খান না। খাওয়ার পর একটা পান খান, মাইল্ড একটা জর্দা আছে। মুর্শিদাবাদ থেকে আমার এক মামা-শ্বশুর পাঠিয়েছেন।

মুনাদের অফিসের বড় সাহেব লোকটি ছোটখাটো। বালক বালক চেহারা কিন্তু লোকটি কাজ জানে এবং কাজ করতেও পারে। কাজ জানা সমস্ত মানুষদের মত সেও অফিসের খুব অপ্রিয়। তাঁর নামে নানান রকম গুজবও আছে। টিফিন টাইমে সে নাকি মেয়েদের ঘরে ডেকে নিয়ে যায়। এবং কাজের প্রশংসা করবার ছলে পিঠ চাপরায় কিংবা হাত ধরে। একবার নাকি ডিসপ্যাস সেশনের নিনু খানের ব্লাউজ খুলে ফেলেছিল। বিরাট কেলেংকারি। মুনির সেই সময় চা নিয়ে ঢুকেছিল বলে তার চাকরি যায় যায় অবস্থা।

মুনার সঙ্গে এরকম কিছু এখন পর্যন্ত ঘটেনি। তবু যতবারই সে বড় সাহেবের ঘরে ঢোকে ততবারই দারুণ অস্বস্তি ভোগ করে। আজও সে ঢুকল ভয়ে ভয়ে। ইসরাইল সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, খুব কাহিল হয়েছে তো?

জি স্যার। টনসিল ফুলে গিয়েছিল।

ভালমত চিকিৎসা করান। কেটে ফেলে দিন। নয়ত রেগুলার অফিস কামাই হবে। গত তিন মাসে আপনি নয় দিন ছিলেন সিক লিভে। ফাইলটা সেদিন দেখলাম।

মুনা কিছু বলল না। ইসরাইল সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, বসুন দাঁড়িয়ে আছেন কেন? মুনা আড়ষ্ট হয়ে সামনের একটি চেয়ারে বসল। ইসরাইল সাহেব থেমে থেমে বললেন, না দেখে চিঠিতে সই করেন কেন? টাইপিস্টরা ভুল করেই। কাজেই এদের টাইপ করা প্রতিটি শব্দ চেক করতে হয়। বিশেষ করে ফিগারগুলো

মুনা ঠিক বুঝতে পারল না ঝামেলাটা কি। বড় রকমের কিছু হওয়ার কথা না। সে চিঠিপত্র দেখেই সই করে।

এনকো কর্পোরেশনের কাছে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট লেখা হয়েছে এগার হাজার নয়শ ছত্রিশ। একচুয়েল ফিগার হবে এগার হাজার ছয়শ ছত্রিশ। কমন মিসটেক, ছয় হয়েছে নয়। আমি জাস্ট আউট অব কিউরিওসিটি ফাইলটা আনিয়ে দেখি এই ব্যাপার।

মুনা সাবধানে একটি নিঃশ্বাস ফেলল। ইসরাইল সাহেব বললেন, এর জন্যেই ডেকেছিলাম, যান।

স্লামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম। শুনুন, আপনার শরীর বেশি খারাপ মনে হচ্ছে। আজ দিনটা বরং রেস্ট দিন। ঘণ্টা খানিক থেকে ফাইলপত্র অন্য কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে চলে যান।

মুনা থ্যাংক ইউ বলতে গিয়েও বলতে পারল না। এই লোকটির সামনে সে ঠিক সহজ হতে পারে না। মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার যাই।

ঠিক আছে যান। তারেক সাহেব থাকলে একটু পাঠিয়ে দেবেন।

জি আচ্ছা স্যার।

ঘণ্টা খানিক থেকে চলে যেতে বললেও মুনা লাঞ্চ ব্রেক পর্যন্ত থাকল। জমে থাকা কাজগুলি নিখুঁতভাবে করতে চেষ্টা করল। মাথা হালকা হয়ে আছে। খুব মন দিয়ে কিছু পড়তে গেলেই আপনাতেই চোখ বন্ধ হয়ে আসে। চোখ বন্ধ করে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিতে হয়। তারেক একবার বলেই ফেলল, ঘুমাচ্ছেন নাকি আপা?

নারে ভাই। মাথা ঘুরছে।

বড় সাহেব যেতে বলেছে চলে যান না। জরুরি কাজ যা আছে দিয়ে যান আমার টেবিলে, অবসর পেলে করে দেব।

কাজ তেমন নেই কিছু।

তাহলে শুধু শুধু বসে আছেন কেন? মুনিরকে বলেন একটা রিকশা ডেকে দেবে।

মুনা মুনিরকে ডাকল। অফিসের আশপাশে রিকশা পাওয়া যায় না। মোড় থেকে ডেকে আনতে হয়। এ রকম এক অন্ধগলিতে এত বড় অফিস কোম্পানি কেন বানাল কে জানে। অফিস থাকবে মতিঝিলে।

তারেক, যাই ভাই।

ঠিক আছে আপা যান। কাল কথা হবে। বাসার দিকেই তো যাবেন?

হুঁ।

মুনা অফিসের এই একটিমাত্র ছেলেকে নাম ধরে ডাকে এবং তুমি বলে। যদিও সে নিশ্চিত তারেক বয়সে বড়ই হবে। তুমি ডাকার ব্যাপারটিও কিভাবে শুরু হয়েছে মুনা নিজেও জানে না। প্রায় অবাক হয়েই একদিন সে লক্ষ্য করেছে তারেক আপনি বললেও সে নিজে বলছে তুমি। মামুনের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারটা এত পাকাপাকি না থাকলে অফিসে এই নিয়ে একটা আলোচনা হত। পাল বাবু সস্তা ধরনের কিছু রসিকতা করারও চেষ্টা করতেন।

রিকশায় উঠেই মুনার মনে হল্ বাসায় এই সময় ফিরে কোনো লাভ নেই। দুপুরে ঘুমুলেই সারাটা বিকাল এবং সারাটা সন্ধ্যা তার খুব খারাপ কাটে। রাতের বেলা ঘুম আসে না। রাত দুটো তিনটে পর্যন্ত জেগে থাকতে হয়। মুনা রিকশাওয়ালাকে বলল মগবাজারের দিকে যেতে। এ সময় মামুনের মেসে থাকার কথা নয়। তাকে পাওয়া যাবে না এটা প্রায় একশ ভাগ সত্যি। তবু একবার দেখে গেলে ক্ষতি নেই কোনো। না পাওয়া গেলে কলেজে গিয়ে খোঁজ নেয়া যাবে। কোন বইতে যেন পড়েছিল পুরুষরা সবচে খুশি হয় যখন তারা মেয়েদের কাছ থেকে সিগারেট উপহার পায়। মামুনকে সে আগেও কয়েকবার সিগারেট দিয়েছে, কোনোবারই মনে হয়নি সে খুব খুশি হয়েছে। এমন ভাবে প্যাকেট খুলেছে যেন এটা তার প্রাপ্য। আজও তাই করবে।

মামুন মেসে ছিল না। তার পাশের-রুমের আলম সাহেব বললেন, উনি তো টেলিগ্রাম পেয়ে দেশে গেছেন। তার এক বোন মারা গেছে, আপনি কিছু জানেন না?

না।

অনেক দিন ধরে অসুস্থ ছিল। উনার সবচে ছোট বোন।

মুনা একটু বিব্রত বোধ করতে লাগল। এত বড় একটা ব্যাপার মামুন তাকে কোনোদিন বলেনি। তার একটি ছোট বোন আছে তা সে জানত কিন্তু এই বোনের এমন একটা অসুখ তা মামুন

কোনোদিন বলেনি।

বসবেন আপনি?

জি না, বসব না। ও দেশে গেছে কবে?

পরশু সকালে। টেলিগ্রাম এসেছে তার আগের রাত্রে। ট্রেন ছিল না, যেতে পারেনি।

কবে আসবে কিছু বলে গেছে?

জি না কিছু বলেনি। আজ-কালের মধ্যে এসে পড়বে। মরবার পর তো আর কিছু করার থাকে না, শুধু শুধু ঘরে বসে থেকে হয়টা কি?

মুনা ক্লান্ত ভঙ্গিতে এসে রিকশায় উঠল। কড়া রোদ এসেছে। চকচক করছে চারদিক। তাকালেই মাথা ধরে যায়। মুনা হ্যান্ড ব্যাগ খুলে সানগ্লাস বের করল। রোদটা খুব চোখে লাগছে।

সানগ্লাস ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। চোখে পরবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিক কেমন মেঘলা হয়ে যায়। একটু যেন মন খারাপও লাগে। মুনা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। অস্পষ্ট ভাবে তার মনে হতে লাগল-- মামুন কখনো তার নিজের ভাই-বোন-মা-বাবার কথা নিয়ে তার সঙ্গে গল্প করেনি। এমন একজন অসুস্থ বোন ছিল তার এটাও পর্যন্ত বলেনি। না বলার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। মুনার খুব জানতে ইচ্ছে হল এই বোনটি কি ওর খুব আদরের ছিল? নামই বা কি তার? নাম মামুন বলেছিল, খুবই কমন একটা নাম বলে এখন মনে পড়ছে না। রোকেয়া বা সাবিহা জাতীয়।

মুনার মনে হল একটা চিঠি লিখে রেখে এলে ভাল হত। অল্প কয়েক কথার সুন্দর একটা চিঠি--

'হঠাৎ করে তোমার বোনের মৃত্যু সংবাদ শুনলাম।

সে যে অসুস্থ তা তো তুমি কখনো বলনি।...'

চিঠিটা ঠিক হচ্ছে না। অভিযোগের ভঙ্গি এসে পড়েছে। কেন অসুস্থতার খবর আগে বলা হয়নি সেই নিয়ে অভিযোগ। পুরোপুরি মেয়েলি অভিযান। মৃত্যুর মত এত বড় একটা ব্যাপারের পাশে মেয়েলি অভিযোগ একেবারেই মিশ খায় না।

মুনা মনে মনে চিঠিটা অন্যভাবে লিখতে চেষ্টা করল। এবং এক সময় খুবই অবাক হয়ে লক্ষ্য করল তার চোখ ভিজে উঠেছে। কেন মামুন তাকে আগে বলল না?

বকুলদের স্কুলে কোনোদিনই পুরোপুরি ক্লাস হয় না। প্রায় দিনই সেভেনথ পিরিয়ডে ছুটি হয়ে যায়। আজ সেভেনথ পিরিয়ডে রেহানা আপার ক্লাস। এই ক্লাসটা হবে না ধরেই নেয়া যায়। কারণ রেহানা আপার অনেক রকম যোগাযোগ আছে। সে সব নিয়ে তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। মেয়েদের টিফিন এবং কোঅপারেটিভদের দোকান তিনিই চালান। 'গার্লস গাইড' এবং 'সবুজ সেবিকা'র ব্যাপারগুলিও তাঁকে দেখতে হয়। নিয়মিত ক্লাস নেবার সময় কোথায় তাঁর! কিন্তু আজ তাঁকে ক্লাসে আসতে দেখা গেল। তাঁর মুখ গম্ভীর, হাতে প্রকাণ্ড একটা গ্লোব। তিনি ক্লাসে ঢুকেই ব্ল্যাকবোর্ডে বড় বড় করে লিখলেন, 'জলবায়ু'। জলবায়ু তিনি গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহে পড়িয়েছেন, কেউ অবশ্যি তাঁকে সেটা বলল না।

ফরিদা তুই বল জলবায়ু মানে কি?

ফরিদা ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ছাত্রীদের মোট সংখ্যা গুণতে লাগলেন। সব মিলিয়ে আটত্রিশ জন ছাত্রী উপস্থিত। তিনি মুখ অন্ধকার করে বললেন, আটত্রিশ জন প্রেজেন্ট, কিন্তু টিফিন এনেছিস একচল্লিশটা, কেন?

ক্লাস ক্যাপ্টেন অনিমার মুখ শুকিয়ে গেল।

বল একচল্লিশটা টিফিন কেন?

অনিমা আমতা আমতা করতে লাগল।

চুরি শিখে গেছিস এই বয়সে, বাবা কি করে?

অনিমার মুখে কথা জড়িয়ে গেল। রেহানা আপা আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, জলবায়ু কাকে বলে বল দেখি? এটি একটি কাঁচা কাজ হয়ে গেল। কারণ অনিমা খুবই ভাল ছাত্রী। জলবায়ু কি এটি সে তাঁর চেয়েও অনেক গুছিয়ে বলল।

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের জলবায়ু কী বল?

আপা এটা এখনো পড়ানো হয়নি?

সব কিছু পড়িয়ে দিতে হবে? নিজে নিজে পড়া যায় না? তুই আজ ক্লাস শেষে আমার সঙ্গে দেখা করবি। বসছিস কি জন্যে? বসতে বলেছি? দাঁড়িয়ে থাক। ফরিদা তুইও দাঁড়িয়ে থাক।

তিনি প্রায় দশ মিনিট ধরে মেয়েদের মিথ্যা বলার অভ্যাস এবং চুরি করার অভ্যাসের ওপর বক্তৃতা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ক্লাসে টুঁ শব্দও হল না। তিনি কপালের ঘাম মুছে ক্লান্ত স্বরে বললেন, বকুল ক্লাসে এসেছে?

সবচে পেছনের বেঞ্চ থেকে বকুল ভয়ে ভয়ে উঠে দাঁড়াল।

তোকে গতকাল টিফিন পিরিয়ডে আমার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম, করেছিলি?

আপা, আমি গিয়েছিলাম, আপনি হেড আপার সঙ্গে কথা বলছিলেন।

কথা কি আমি সারা জীবন ধরে বলেছিলাম? পাঁচ মিনিট দাঁড়ানো গেল না?

বকুল প্রায় আধা ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল, কিন্তু সে কিছু বলল না।

আজ ক্লাস শেষ হবার সাথে সাথে আসবি। বাংলাদেশের জলবায়ু কি রকম বল?

বকুল ঘামতে লাগল।

বইয়ের সঙ্গে কারো কোনো সম্পর্ক নেই? মৌসুমী বায়ু কাকে বলে? কেউ জানো না? কে জানে? হাত তোল।

শুধু অনিতা হাত তুলল। তিনি অনিমাকে কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। বিমর্ষ মুখে বাংলাদেশের জলবায়ুর কথা বলতে লাগলেন। গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহেও একই কথা বলেছিলেন। তাঁর মনে নেই। ক্লাসের মেয়েরা ঘণ্টা পড়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। ঘণ্টা আর পড়ছে না। তাদের মনে হল তারা অনন্তকাল ধরে ক্লাসে বসে আছে।

বকুল টিচার্স কমন রুমে ভয়ে ভয়ে উঁকি দিল। রেহানা আপা হাত নেড়ে নেড়ে অংক আপার সঙ্গে কথা বলছে। তিনি ইশারায় বকুলকে অপেক্ষা করতে বললেন। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। অন্য ছাত্রীরা সব চলে যাচ্ছে। স্কুল ঘর দ্রুত ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। আজ তার একা একা যেতে হবে। বকুল কিছুক্ষণ পর পর্দা ফাঁকা করে আবার উঁকি দিল। রেহানা আপা এবং অংক আপা দুজনেই খুব হাসছে। অংক আপা কখনো হাসেন না। তাঁর হাসি দেখে বকুল খুবই অবাক হল। অংক আপা বকুলকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। রেহানা আপার মুখ অবশ্যি এখনো হাসি হাসি। তিনি চটের ব্যাগটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

বকুল তুই আয়, হাঁটতে হাঁটতে কথা বলি। রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দেব। তারপর রিকশা নিয়ে চলে যাবি। কাল যখন স্কুলে আসবি তখন মনে করে তোর একটা ছবি নিয়ে আসবি।

বকুল অবাক হয়ে তাকাল। রেহানা আপা বললেন, শাড়ি পরা ভাল ছবি আছে?

জি না আপা।

তাহলে এক কাজ কর, আজ বিকেলেই একটা তুলিয়ে ফেল। চুলগুলি সামনে ছড়িয়ে দিবি। যাতে কত লম্বা সেটা টের পাওয়া যায়।

বকুল ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, জি আচ্ছা।

খুব দরকার, ভুলে যাবি না যেন আবার।

বকুল কথা বলল না। রেহানা আপা বললেন, তুই তো সবার বড়, তাই না?

জি আপা।

ক' ভাই-বোন তোরা?

এক ভাই এক বোন।

বাহ ছোট ফ্যামিলি তো। একদিন যাব তোদের বাসায়। তোর মাকে বলিস।

জি আচ্ছা।

পড়াশুনা করছিস তো ঠিকমত?

করছি।

লাস্ট বেঞ্চে বসিস কেন সব সয়? ফার্স্ট বেঞ্চে বসবি। মনে থাকবে?

থাকবে।

রেহানা আপা রাস্তার মোড়ে বকুলের জন্যে একটা রিকশা ঠিক করে, রিকশাওয়ালার হাতে দু'টাকা ভাড়া দিয়ে দিলেন।

বকুল হুড তুলে দে। হুড না তুলে মেয়েদের রিকশা করে যাওয়া আমার পছন্দ না।

বকুল সারা পথ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মেয়েদের কাছে রেহানা আপার ছবি চাওয়া কোনো নতুন ব্যাপার না। তিনি উপরের ক্লাসের সুন্দরী মেয়েদের কাছে (বেছে বেছে, সবার কাছে না) ছবি চান এবং তার দিন দশেকের মধ্যে সেই সব মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। আজেবাজে বিয়ে নয়, ভাল বিয়ে।

রেহানা আপার ধারণা ক্লাস টেনে পড়া মেয়েরা হচ্ছে বিয়েব পাত্রী হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ। এই সময়টা মেয়েরা ছেলেদের সম্পর্কে প্রথম কৌতূহলী হয় এবং প্রেম করবার জন্যে ছোঁক ছোঁক করে। বিয়ের পর হাতের কাছে স্বামীকে পায় বলেই প্রথম প্রেম হয় স্বামীর সঙ্গে। সে প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হয়। ক্লাস টেনে পড়া মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর নানা রকম থিওরি আছে। এই সব থিওরি তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে প্রচার করে থাকেন।

শওকত সাহেব বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি বকুলকে রিকশা থেকে নামতে দেখে অবাক হলেন। তাকে রিকশা ভাড়া দেয়া হয় না। স্কুল এত দূরে নয় যে, রিকশা করে যাওয়া-আসা করতে হবে। সংসারে কোনো কাঁচা পয়সা নেই। বকুল বোধ হয় মুনার কাছ থেকে নিচ্ছে। মুনা এই সংসারে নানান ভাবে টাকা খরচ করে। এটা তাঁর পছন্দ নয়। কোন বইতে যেন পড়েছিলেন, যে সংসারে মেয়েদের রোজগারের টাকা খরচ হয় সেই সংসারের কোনো আয়-উন্নতি হয় না।

বকুল ঘরে ঢুকল খুব ভয়ে ভয়ে। তার ধারণা ছিল বাবা অকারণেই তাকে একটা ধমক দেবে। 'দেরি হল কেন?' 'রিকশা করে এসেছিস কেন?' কিন্তু শওকত সাহেব তেমন কিছুই করলেন না। মেয়ের দিকে ভালমত তাকালেনও না।

চারদিক ফাঁকা ফাঁকা। মুনা আপা বা বাবু কেউ নেই। সে মার ঘরে উঁকি দিল। লতিফা হাত ইশারায় তাকে আসতে বললেন। তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছে, যেন বড় একটা কিছু ঘটেছে। তিনি ফিসফিস করে বললেন, তোর বাবার কি হযেছে?

কেন? হবে আবার কি?

মিষ্টি কিনে এনেছে।

কোথায় মিষ্টি?

ঐ দেখ ড্রেসিং টেবিলের উপর।

বকুল অবাক হযে দেখল সত্যি সত্যি এক প্যাকেট মিষ্টি। সে বলল, তুমি জিজ্ঞেস করনি কিছু?

না, তুই জিজ্ঞেস করে আয়।

মুনা আপা আসুক, সে জিজ্ঞেস করবে.

লতিফা নিজের মনে বললেন, আজ তোব বাবা চেঁচামেচি রাগারাগি কিছু করেনি। অফিস থেকে এসেছেও সকাল সকাল।

বকুল বলল, আজ তোমার শরীর কেমন?

ভালই। যা তোর বাবাকে চা বানিয়ে দে। ঘরে মুড়ি আছে। পেঁয়াজ-মরিচ দিয়ে মেখে দে।

বকুল বারান্দায় গেল। বাবা আগের মতই হাঁটাহাঁটি করছেন। কারো জন্যে অপেক্ষা করছেন বোধ হয়। বকুল ক্ষীণ স্বরে ডাকল বাবা।

কি?

চা আনি?

আন।

চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে? ঘরে মুড়ি আছে। মেখে দেই।

দে। বেশি করে ঝাল দিবি। আর শোন, মিষ্টি এনেছি। তোর মাকে দে। তুইও খা।

বকুল ভয়ে ভয়ে বলল, মিষ্টি কি জন্যে?

এমনি আনলাম।

শওকত সাহেব সিগারেট ধরিয়ে বিব্রত ভঙ্গিতে কাশতে লাগলেন। মিষ্টি এনে তিনি যেন একটা অপরাধ করে ফেলেছেন।

বকুল ছবির কথা তুলল রাতের খাবার সময়। অন্য সবার খাওয়া হয়ে গেছে। মুনা এবং সে বসেছে শেষে। এ-কথা সে-কথার পর বকুল খুব স্বাভাবিক ভাবে রেহানা আপার ছবি-চাওয়ার কথা

বলল। মুনা খাওয়া বন্ধ করে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কেন, ছবি দিয়ে কি হবে?

আমি কি করে জানব আপা?

তুই কিছু জিজ্ঞেস করিসনি?

না।

ঠিক কি কি কথা হয়েছে তোর সাথে?

বকুল কথাগুলো গুছিয়ে বলতে চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিকমত বলতে পারল না।

মুনা বলল, শাড়ি পরা ছবি চেয়েছে?

হ্যাঁ।

তোকে বিয়ে দিতে চায় নাকি?

বকুল কোনো জবাব দিল না।

কি, কথা বলছিস না কেন?

বোধ হয়। আপা এ রকম মেয়েদের কাছে ছবি চায়। তারপর ওদের বিয়ে হয়ে যায়। শায়লার এ রকম বিয়ে হল। ডাল নাও আপা। ডাল নিয়ে খাও।

খেতে ইচ্ছা করছে না।

মুনা প্লেট ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

তুমি কি আমাব ওপর রাগ করেছ আপা?

তোর ওপর বাগ করব কেন? তুই আয়, তোব সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

বাবু বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল। পড়ার ভঙ্গি দেখে মনে হতে পারে গল্পের বই। কিন্তু গল্পের বই না। বাবা যে কোনো সময় ঘরে ঢুকতে পারেন রাত দশটার আগে হাতে গল্পের বই দেখলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

মুনা ঘরে ঢুকতেই বাবু হাসিমুখে বলল, ফ্যান দেখেছ আপা? নতুন ফ্যান। বাকের ভাই বলে গেছেন পুরানটা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত এটা থাকবে। মুনা বিরক্ত চোখে ফ্যান দেখল। কিছু বলল না। বাবু বলল, আরাম করে ঘুমানো যাবে, ঠিক না আপা?

হুঁ। তোর মাথাব্যথা হয়নি?

না।

বিকেলে খেলতে গিয়েছিলি?

হুঁ।

এখন থেকে রোজ যাবি। নিয়মিত খেলাধুলা করলে মাথাব্যথা থাকবে না। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, যাবি।

আচ্ছা যাব।

যা তো আমার জন্যে একটা পান নিয়ে আয়। কেমন যেন বমি বমি আসছে।

বাবু পান আনতে গিয়ে আর ফিরল না। শওকত সাহেব তাকে আটকে ফেললেন। ইংরেজি বানান ধরতে লাগলেন। মসকুইটো, এমব্রয়ডারি, ইনকুইজিটিভনেস এই জাতীয় বানান। বাবু তালগোল পাকিয়ে ফেলতে লাগল। যেটাতেই সে আটকাচ্ছে সেটাই ডিকশনারি খুঁজে বের করতে হচ্ছে। এবং বিশবার করে সশব্দে বানান করতে হচ্ছে।

রান্নাঘর গুছিয়ে বকুল যখন শোবার ঘরে উঁকি দিল তখন রাত দশটা বাজে। মুনা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। বকুল মৃদু স্বরে ডাকল, আপা।

কি?

ঘুমাচ্ছ নাকি?

না।

কি যেন বলবে বলেছিলে আমাকে?

মুনা একটা লম্বা বক্তৃতা তৈরি করে রেখেছিল কিন্তু বক্তৃতাটা দেয়া গেল না। সে শুধু বলল, তুই রেহানা আপাকে বলিস, আমার বাবা ছবি দিতে রাজি হলেন না। বকুল বলল, এটা কেমন করে বলব?

অন্য কথাগুলি যেমন করে বলিস ঠিক তেমনি বলবি।

আপা দারুণ রাগ করবে।

রাগ করলে করবে। রাগ কমানোর জন্যে বাচ্চা একটা মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবে? তুই কী বুঝিস বিয়ের?

আপা আস্তে। বাবা শুনবে।

মাস্টারদের দায়িত্ব হচ্ছে পড়ানো। বিয়ে দেয়া না। যখন সময় হবে তখন আপনাতেই বিয়ে হবে। এই নিয়ে তোর এত চিন্তা কিসের?

আমি আবার কখন চিন্তা করলাম?

ছবি দেয়ার ব্যাপারে তোর এত আগ্রহ কেন?

তুমি বুঝতে পারছ না। আপা খুব রাগ করবে।

রাগ করলে করবে। যা আমার জন্যে একটা পান বানিয়ে আন। বাবুকে পাঠিয়েছিলাম, সে আর ফিরবে না। আটকে গেছে।

আপা নতুন ফ্যান দেখেছ?

দেখলাম।

বাকের ভাই নাকি এসে অনেকক্ষণ ছিল। অনেক গল্পটল্প করল।

কার সঙ্গে করল?

বাবার সঙ্গে। বাবা আজ সকাল ফিরেছিলেন। বাকের ভাই এসেই গল্প জুড়ে দিল। কাল-পরশুর মধ্যে একটা কাজের লোকও এনে দেবে বলেছে।

এনে দিলে তো ভালই। তুই যা, পানটা নিয়ে আয়।

আমার সাহসে কুলাচ্ছে না। বাবার সামনে দিয়ে যেতে হবে। তুমি নিজেই যাও না আপা।

মুনা উঠে বসল। বকুল বলল, মিষ্টি কি জন্যে আনলেন এটাও একটু জিজ্ঞেস করবে। জানতে ইচ্ছা করছে।

জানতে ইচ্ছে হলে তুই নিজেই জিজ্ঞেস কর।

আমার এত সাহস নেই।

বসার ঘর থেকে শওকত সাহেব ডাকলেন, বকুল বকুল। বকুল মুখ অন্ধকার করে উঠে গেল।

শওকত সাহেবের সামনে বাবু কানে ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখ লাল। বকুল এসে ঢুকতেই শওকত সাহেব বললেন, পাটিগণিত নিয়ে আয়।

## ৫

টেলিগ্রামে লেখা ছিল -- ফরিদা সিরিয়াস, কাম ইমমিডিয়েটলি। মামুন ধরেই নিয়েছিল সে মারা গেছে। আলম সাহেবকে যাবার বেলায় বলেও গেল, বোনটা মারা গেছে বোধহয়। মৃত্যুর খবরে লোকজন সব সময়ই হকচকিয়ে যায়, আলম সাহেবও হকচকিয়ে গেলেন।

কীভাবে মারা গেছে?

সে সব কিছু লেখেনি - - অসুস্থ ছিল। ওর মৃত্যুটা আমাদের সবার জন্যেই রিলিফ। বড় কষ্টে ছিল।

তাই নাকি?

জি। বাড়িতে গেলে ঘুমাতে পারতাম না। চিৎকার করত সারা রাত। চোখে দেখা যায় না এমন কষ্ট।

হয়েছে কি?

স্নায়ুর মধ্যে কি যেন হয়েছে। চিকিৎসা নেই কোনো। ব্যথা কমানোর ইনজেকশন দিয়েও কিছু হয় না। বাড়ি যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

কথা খুবই সত্যি। মামুন গত এক বছরে একবার মাত্র গিয়েছিল একদিন থেকে পালিয়ে এসেছে। সারারাত উঠোনে মোড়া পেতে কাটিয়েছে। ভয়ংকর একটা রাত। এখন বাড়িতে গেলে সে রকম কোন ঝামেলা হবে না। ঘুমানো যাবে না।

তাদের গ্রামের বাড়িটি সুন্দর। পাকা দালান। পেছনের পুকুরটি বুজে গেছে। এটা ঠিকঠাক করতে হবে। মুনাকে নিয়ে গ্রামে আসতে হবে। সে কোনোদিন গ্রাম দেখেনি। গ্রাম সম্পর্কে তার ধারণা খুবই খারাপ। ধারণা পাল্টে যাবে।

মামুন বাড়ি পৌঁছল সন্ধ্যার পর। চারদিকে কেমন অস্বাভাবিক নীরবতা। বসার ঘরের বারান্দায় হারিকেন জ্বালিয়ে কয়েকজন মুরব্বি বসে আছেন। মামুনকে দেখে তাঁরা এগিয়ে এলেন। মৃদু স্বরে কি সব যেন বলতে লাগলেন। কিছুই বোঝা গেল না। মামুনের বড় চাচা বললেন, তোমার লাগি অপেক্ষা। তুমি না আওনে দম বাইর হইতাছে না। যাও ভিতরের বাড়িতে যাও। ভইনের সাথে কথা কও।

ফরিদা বড় খাটটায় পড়ে আছে। ঘরে দুটো হারিকেন। একটা কুপী। অনেক মেয়েদের ভিড়। মামুন ঘরে ঢুকতেই ফরিদার গোঙানি থেমে গেল। সে পরিষ্কার গলায় ডাকল, ভাইজান!

মামুন অসহায়ের মত তাকাল চারদিকে।

ভাইজান বড় কষ্ট।

হারিকেনেব আলোয় চকচক করছে ফরিদার চোখ। চোখগুলো এখনো এত সুন্দর?

ফরিদার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। টেনে টেনে শ্বাস নিচ্ছে। মামুনের কি উচিত কাছে গিয়ে বসা? হাতে হাত রাখা। কিন্তু জন্তুর মত শব্দ যে করছে সে কি ফরিদা? একজন কে হারিকেন উঁচু করে ধরলেন। ভালমত দেখাতে চান বোধ হয়। কী আছে দেখানোর?

ফরিদা শ্বাস টানার ফাঁকে ফাঁকে বলল, গত বছর আপনি আসছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। আমার মনে কষ্ট হয়েছে।

এমন কোনো মনের কষ্ট আছে যা এই তীব্র শারীরিক যন্ত্রণাকে স্পর্শ করতে পারে? মামুন ঘোলাটে চোখে তাকাতে লাগল চারদিকে।

একজন বুড়ো মহিলা বললেন, পশ্চিম দিকে মুখ কইরা দেন। কলমা তৈয়ব পড়েন। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলাল্লাহ।

শ্বাসকষ্ট সন্ধ্যা রাত্রিতে শুরু হলেও ফরিদা মারা গেল পরদিন সকাল ন'টায়। একেকবার কষ্টটা কমে যায়, সে চোখ বড় বড় করে তাকায় সবার দিকে। সেই তাকানো দেখেই মনে হয় সে বুঝতে পারছে সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্যে সে খুশি। সে অপেক্ষা করছে আগ্রহ নিয়ে।

মামুন বাড়ি যাবার সময় ঠিক করে রেখেছিল দু'দিন থাকবে। কলেজ থেকে ছুটি নেয়া হয়নি। কাউকে কিছু বলে যাওয়া হয়নি। দু'দিনের বেশি থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু সে থাকল এগারো দিন। বারো দিনের মাথায় ঢাকায় ফিরে এল। তার মুখ ভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনিদ্রাজনিত কারণে চোখ লাল। আলম সাহেব তাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। মামুন শুকনো হাসি হেসে বলল, সব ভাল তো?

ভাল, সবই ভাল। আপনি কেমন?

ভালই। চিঠিপত্র আছে কিছু?

জিনা, চিঠিপত্র নেই।

মুনা খোঁজ করেছিল?

জি, এসেছিল একদিন।

মামুন আর কিছুই জিজ্ঞেস করল না। সারাদিন কাটাল ঘুমিয়ে। সন্ধ্যাবেলা একা একা একটা সিনেমা দেখতে গেল - 'দি বিস্ট'। একজন মানুষ পূর্ণিমা রাতে কেমন করে নেকড়ে হয়ে যায় তার গল্প। প্রথমদিকে গল্পটি কিছুই ধরা যাচ্ছিল না। শেষ দিকে দারুণ জমে গেল। মামুন অবাক হয়ে লক্ষ্য করল সে বেশ উত্তেজনা অনুভব করছে। শেষ দৃশ্যে সুন্দরী একটি তরুণী মেয়ের কৌশলের কাছে জন্তুটির পরাজিত হবার ঘটনাটি তাকে অভিভূত করে ফেলল। চারদিকে হাততালি পড়ছে। সে বহু কষ্টে হাততালি দেবার লোভ সামলাল। প্রথম থেকে ছবিটি মন দিয়ে না দেখার জন্যে তার আফসোসের সীমা রইল না।

মেসে রাতে খাবার ব্যবস্থা আছে তবুও সে হেঁটে হেঁটে নবাবপুরের এক দোকানে বিরিয়ানী খেতে গেল। ছাত্র থাকাকালীন দল বেঁধে এখানে আসত। অনেক দিন পর আবার আসা। সব কিছু আগের মত আছে। একশ বছর পরেও বোধ হয় দোকানটা এ রকমই থাকবে। তবে বিরিয়ানী আগের মত লাগল না, চাল পুরোপুরি সেদ্ধ হয়নি। লবণও কম হয়েছে। আগে তেঁতুলের টক দিত। এখন বোধ হয় দিচ্ছে না। কাঁচা মরিচে কোনো ঝাল নেই। মিষ্টি মিষ্টি লাগছে খেতে। মামুন প্লেট শেষ না করেই উঠে পড়ল। ঘুমঘুম লাগছে কিন্তু মেসে ফিরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে না। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানোরও কোনো অর্থ হয় না।

মামুন সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে চলে গেল। অনেককাল আগে দল বেঁধে সবাই আসত এখানে। একবার নৌকা ভাড়া করেছিল আধা ঘণ্টার জন্যে। বশিরের জন্যে নৌকা ডোবার উপক্রম হয়েছিল। মামুন একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। লঞ্চ টার্মিনাল আগের মত নেই। অনেক দিন আসা হয় না এদিকে। সব বদলে যাচ্ছে।

আলম সাহেব জেগে বসে ছিলেন। মামুনকে আসতে দেখে উঠে এলেন   কোথায় ছিলেন এত রাত পর্যন্ত? মামুন অস্পষ্ট ভাবে হাসল। আপনি যাওয়ার পরপরই আপনার বান্ধবী এসেছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিলেন। মামুন কোনো উৎসাহ দেখাল না।

আপনাকে কাল সকালে তাদের বাসায় যেতে বলেছেন।

কাল যাব কিভাবে, কাল কলেজ আছে।

কাল শুক্রবার না। কাল তো ছুটি।

ও হ্যাঁ।

চিঠিও লিখে গেছেন একটা। আপনার টেবিলে রেখে দিয়েছি। আর ভাত-তরকারিও ঢাকা দিয়ে রেখেছি। আপনার শরীর ভাল তো মামুন সাহেব?

জি ভাল।

চোখ লাল হয়ে আছে।

সারাদিন ঘুমিয়েছি তো তাই।

সন্ধ্যাবেলা কোথায় গিয়েছিলেন?

একটা ছবি দেখলাম। নাজ সিনেমায়। দি বিস্ট। ভাল ছবি।

আলম সাহেব অবাক হয়ে বললেন, সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন?

জি। মনটা ভাল ছিল না। তাই ভাবলাম যাই দেখে আসি।

ভালই করেছেন।

ছাত্র জীবনে খুব ছবি দেখতাম। রোমান হলিডে ছবিটা মোট এগারো বার দেখেছিলাম। ঐ মেয়েটার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম।

মামুন চিঠিটা পড়ল। দু'লাইনের চিঠি। 'আগামীকাল আমাদের বাসায় দুপুরে ভাত খাবে। সকালে চলে আসবে।' ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। ওদের এখানে যাওয়ার ব্যাপারে মুনার খুবই আপত্তি। মামা পছন্দ করেন না। একবার গিয়ে তো বেইজ্জতী অবস্থা। ভদ্রলোক একটা কথাও বললেন না। সালামের জবাব পর্যন্ত দিলেন না। রাগ দেখাবার জন্যে তার সামনেই কাজের মেয়েটাকে বিনা কারণে এমন একটা চড় দিলেন যে মেয়েটা উল্টে চেয়ারের ওপর পড়ে গেল। বিশ্রী অবস্থা।

মামুন সাহেব।

জি।

ভাত খান।

না ভাত খাব না। ভাত খেয়ে এসেছি।

চা খাবেন? চলেন মোড়ের দোকান থেকে চা খেয়ে আসি।

মামুন কোনো রকম আপত্তি করল না। চা খেতে গেল। আলম সাহেব হালকা স্বরে বললেন, দুঃখ-কষ্ট সংসারে থাকেই। দুঃখ-কষ্ট নিয়ে বাঁচতে হয়। জন্ম নিলেই মৃত্যু লেখা হয়ে যায়। কি বলেন?

তা তো বটেই।

আপনি এই সব নিয়ে ভাববেন না।

না আমি ভাবি না।

চা খেতে খেতে আলম সাহেব মৃদু স্বরে বললেন, দাড়ি-টাড়িগুলি কেটে ফেলেন। ভাল লাগছে না

জি কাটব। কালই কাটব।

মুনা সকাল থেকেই মামুনের জন্যে অপেক্ষা করছিল। এগারোটার দিকে তার কেন যেন মনে হল মামুন আসবে না। এ রকম মনে হবার কারণ নেই। কিন্তু মনে যখন হচ্ছে তখন মুনার মনে হয় মামুনের সঙ্গে দেখা হবে না, তখন হয় না।

শওকত সাহেব ফর্সা একটা পাঞ্জাবি পরে অপেক্ষা করছিল। মুনা গিয়ে বলল, মামা, তোমার কোথাও যাবার থাকলে যাও, ও আসবে না।

আসবে না কেন?

তা আমি কি করে বলি। হয়ত খবর পায়নি।

শওকত সাহেব অত্যন্ত বিরক্ত হলেন। রাগী গলায় বললেন, আসতে বললে আসবে না — এর মানে কি? যখন আসতে বলা হয় না তখন তো দশবার আসে।

এটা তো মামা ঠিক বললেন না। সে এ বাসায় একবারই এসেছিল। তুমি একটি কথাও বলনি। উল্টো এমন ব্যবহার করেছ লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে। তোমার বোধ হয় মনে নেই।

শওকত সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, বাবুকে ঠিকানা দিয়ে পাঠা, ও গিয়ে নিয়ে আসুক।

তুমি হঠাৎ এত ব্যস্ত কেন?

বিয়েটা কবে হবে কি, এইটা ফয়সালা করতে চাই। লোকজন কথা বলাবলি শুরু করেছে।

মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কে আবার কী কথা বলল?

নওয়াব সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, ভাগ্নীর বিয়ে দিচ্ছেন কবে? তিনি তোদের দেখেছেন এক রিকশায় যেতে। আমি লজ্জায় বাঁচি না। বিয়ের আগে কোনো মেয়ে ছেলের সঙ্গে এক রিকশায় যেতে পারে? দেশটা তো বিলাত-আমেরিকা এখনো হয়নি।

মুনা কিছু বলল না। শওকত সাহেব সিগারেট ধরালেন। দামী সিগারেট। আজকের এই বিশেষ উপলক্ষে তিনি পাঁচটি ফাইভ ফাইভ কিনেছেন।

মুনা, যা বাবুকে ঠিকানা দিয়ে পাঠা।

না, ওর যেতে হবে না।

মুনা রান্নাঘরে ঢুকল। বকুল সারা সকাল চুলোর পাশে বসে। তার ফর্সা গাল লাল টুকটুক করছে। মুনাকে ঢুকতে দেখে সে হাসিমুখে বলল, পোলাওটা খুব ভাল হয়েছে আপা।

পোলাও কেন? পোলাও কে করতে বলেছে?

বাবা।

আমি না বললাম সিম্পল ব্যবস্থা করতে — আমরা যা খাই।

বকুল কিছু বলল না, মুখ টিপে হাসল। মুনা বিরক্ত মুখে বলল, হাসছিস কেন?

তুমি আসলে আপা খুশিই হয়েছ, কিন্তু মুখে বলছ এই কথা, এ জন্যেই হাসছি।

কি সব পাকা পাকা কথা বলছিস। গা জ্বালান কথা। এই বয়সে এত পাকা কথা বলা লাগে না।

বকুল বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, রাগছ কেন আপা? ঠাট্টা করছিলাম।

এ রকম ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

গোসতের লবণ একটু দেখবে আপা।

আমি দেখতে পারব না, তুই দেখ। চুলা খালি থাকলে আমাকে একটু চা করে দে। মাথা ধরেছে। আমি শুয়ে থাকব।

মামুন ভাই এত দেরি করছে কেন আপা? তুমি কখন আসতে বলেছ?

মুনা তার কথার জবাব না দিয়েই চলে গেল। বকুল ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল। গত কয়েক দিন থেকেই মুনা আপা তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে। কেন করছে কে জানে। রেহানা আপা ছবি চাইলে সে কী করতে পারে? সে তো বলতে পারে না — না আপনি ছবি চাইতে পারবেন না। কেন ছবি চাইবেন?

বকুল চায়ের কাপে চা ঢালল। আর তখনই বাবু এসে গম্ভীর স্বরে বলল — ডাক্তার সাহেব এসেছে। বকুলের হাত কেঁপে গেল। বাবুর মুখ রাগী রাগী। যেন ডাক্তারের আসা একটা অপরাধ। এবং এর জন্যে বকুল দায়ী। বকুল বলল, ডাক্তার এসেছে তো আমি কি করব? বাবু বলল, কথা বলছে বাবার সঙ্গে।

বলছে বলুক, যা তুই মুনা আপাকে চা দিয়ে আয়।

বাবু আগের চেয়েও গম্ভীর হয়ে বলল, তুমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে কেন?

বকুল চমকে উঠল। ক্ষীণ স্বরে বলল, কে বলল?

আমি দেখলাম।

ডেকেছিল তাই গিয়েছিলাম — কী হয়েছে তাতে?

আমি মুনা আপাকে বলে দেব।

দিস। যা এখন চা নিয়ে যা।

বাবু চা নিয়ে চলে গেল। সে অবশ্যি মুনা আপাকে কিছুই বলবে না। তার স্বভাবের মধ্যে এটা নেই। একজনের কথা অন্যজনকে কখনো বলবে না। তবু বকুলের হাত-পা কাঁপতে লাগল।

ডাক্তারের কাছে যাওয়াটা এমন কিছু নয়। সে স্কুল থেকে ফিরছিল - চিশতি মেডিকেল কর্নারের কাছে আসতেই দেখে ডাক্তার সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখেই ডাকলেন, এই যে বকুল, এই। এস দেখি। বকুল নিশ্চয়ই না-শোনার ভান করে চলে যেতে পারে না। সে গিয়েছে। ডাক্তার সাহেব বলেছেন, ইস ঘেমে-টেমে কি অবস্থা। ভেতরে এসে ফ্যানটার নিচে দাঁড়াও তো। ঠাণ্ডা কিছু খাবে? বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, জি না। তিনি শুনলেন না। একটা ছেলেকে পাঠালেন খুব ঠাণ্ডা দেখে এক বোতল পেপসি কিংবা কোক নিয়ে আসতে। বকুল বলতে গেলে কোনো কথাই বলেনি। পেপসি অর্ধেক শেষ করে চলে এসেছে। ভয়ে তার সমস্ত শরীর কাঁপছিল। কেউ যদি দেখে ফেলে। তার ধারণা ছিল কেউ দেখেনি। কিন্তু ধারণা সত্যি নয়। বাবু দেখেছে। বকুলের কান্না পেতে লাগল। তার ভয় হচ্ছিল এক্ষুণি কেউ এসে বলবে, ডাক্তার সাহেব তোমাকে ডাকে। কিন্তু কেউ সে রকম কিছু বলল না। বকুল নিজের মনে রান্না সারতে লাগল। সে ভেবে পেল না তাকে নিয়ে কেন এত ঝামেলা হচ্ছে।

বাবু এসে বলল, ডাক্তার সাহেবকে এক কাপ চা দাও। বকুল নিঃশব্দে চা বানাতে লাগল। বাবু বলল, ডাক্তার সাহেব মিষ্টি নিয়ে এসেছেন। তার এক বোনের মেয়ে হয়েছে - এই জন্যে। বকুল কিছুই বলল না।

কড়া নাড়ার শব্দে মামুনের ঘুম ভাঙল। সে দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়েছিল। চারদিক অন্ধকার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে নাকি? মামুন ক্লান্ত স্বরে বলল, কে?

আমি। আমি মুনা।

মামুন তেমন কোনো আবেগ অনুভব করল না। আজ দুপুরে ওদের ওখানে খেতে যাবার কথা। যাওয়া হয়নি। তার জন্যে তেমন অনুশোচনাও হল না।

মুনা বলল, কি হয়েছে তোমার?

কিছু হয়নি।

যাওনি কেন?

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শরীরটা ভাল না।

মামুন হাই তুলল। টেনে টেনে বলল, এস ভেতরে এসে বস।

মুনা একবার ভাবল বলবে - না বসব না। এবং গম্ভীর মুখ করে চলে যাবে। কিন্তু যেতে পারল না। মুখ ভর্তি দাড়িতে এমন অদ্ভুত লাগছে মামুনকে। মুখের ভাব ধরা যাচ্ছে না। মুখ কেমন রোগা রোগা। সারাদিন ঘুমানোর জন্যে চোখ লাল। মুনা ভেতরে ঢুকল।

বস, চেয়ারটায় বস। চা খাবে?

হুঁ।

কাউকে পেলে হয়। ছুটির দিন তো। লোকজন থাকে না। এই বলেই মামুন বেশ শব্দ করে হাসতে লাগল, যেন খুব-একটা হাসির কথা। মুনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগল।

তুমি বসে থাক। আমি হাত-মুখটা ধুয়ে আসি। একা একা বসে থাকতে ভয় লাগবে না তো?

ভয় লাগবে কেন?

মামুন আবার হেসে উঠল। সুস্থ মানুষের হাসি না। ছাড়া ছাড়া হাসি। হাসার সময় কেমন অদ্ভুত ভাবে গা দোলাচ্ছে।

হাত-মুখ ধুতে মামুনের অনেক সময় লাগল। তার মনেই রইল না ঘরে একজন অপেক্ষা করছে। কাজের ছেলেটি দু'কাপ চা দিয়ে গেছে। সেই চা পিরিচ ঢেকে রাখা সত্ত্বেও জুড়িয়ে জল হয়েছে।

মামুন বিস্বাদ ঠাণ্ডা চাতেও চুমুক দিয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। মুনা বলল, চা ভাল লাগছে?

হ্যাঁ ভালই তো।

ঠাণ্ডা না?

একটু অবশ্যি ঠাণ্ডা।

আগে তো ঠাণ্ডা চা মুখেই দিতে পারতে না।

মামুন চুপ করে রইল। মুনা বলল, দুপুরে কিছু খেয়েছে?

না।

কেন, খাওনি কেন?

ঘুমিয়ে পড়লাম। দশটার দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। ক্ষিধেও হয়নি।

এখন হয়েছে?

হুঁ।

চল আমার সঙ্গে।

কোথায়?

আমাদের বাসায়। রাতে খাবে।

ঠিক আছে চল।

কাপড় বদলাতে বদলাতে মামুন বলল. তোমার শরীর ভাল মুনা?

হ্যাঁ ভাল।

টনসিলের ঐটা কমেছে, তাই না?

হ্যাঁ। তুমি দাড়ি রেখেছ কেন?

দাড়ি রাখব কেন? কয়েকদিন কাটা হয়নি সেই জন্যে ।

তোমাদের বাড়ির খবর কি বল।

বাড়ির কোনো খবর নেই। ছোট বোনটা মারা গেছে।

ওর কথা তো তুমি আমাকে কখনো কিছু বলনি।

মামুন চুপ করে রইল।

মুনা বলল, তুমি নিজের কথা কখনো কাউকে কিছু বল না। এটা ঠিক না। এতে মনের ওপর চাপ পড়ে।

হুঁ।

তোমার ভাই-বোনদের কথা আমি কিছুই জানি না।

মামুন চাপা স্বরে বলল, ঐ একটি বোন আমার। মরবার সময় খুব কষ্ট পেয়েছে। খুব কষ্টের মৃত্যু।

সব মৃত্যুই কষ্টের, সুখের মৃত্যু তো কিছু নেই।

তাও ঠিক।

মামুন হাসতে চেষ্টা করল। সিগারেট ধরিয়ে খুব উৎসাহের সঙ্গে টানতে শুরু করল। মুনা ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, কষ্টের ব্যাপারগুলি নিয়ে বেশি চিন্তা করা ঠিক না।

না চিন্তা করি না তো। ঐ সব নিয়ে আমি ভাবি না। চল যাই।

মুনা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল. দাড়িটা কেটে ফেল। খুব খারাপ দেখাচ্ছে।

খুব খারাপ লাগছে, না?

হুঁ।

কোনো একটা সেলুনে গিয়ে কাটাতে হবে। দাড়ি বেশি বড় হয়ে গেছে, নিজে নিজে কাটা যাবে না। মেসের সামনেই একটা আছে সেখানে কাটাব।

একটি ছেলে শেভ করাচ্ছে। তার পাশেই একটি রূপসী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে— দৃশ্যটি অদ্ভুত। লোকজন কৌতূহলী হয়ে দেখছে। মামুন খানিকটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিব্রত স্বরে বলল - তুমি বাইরে যাও না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকার দরকার কি? মুনা কিছু বলল না, বাইরেও গেল না। তার কেন জানি পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেই ভাল লাগছে।

দাড়ি কাটার পর মামুনকে আরো রোগা এবং ফর্সা দেখাচ্ছে। তারা একটা রিকশা নিল। রিকশায় উঠলেই মামুন এক হাতে মুনাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে। আজ সে রকম কিছু করল না। লাজুক প্রেমিকের মত সংকুচিত ভাবে বসে রইল। মুনা বলল, তোমরা ক'ভাই-বোন? মামুন জবাব দিল না। মুনার মনে হল এই প্রশ্নটি সে আগেও করেছে - মামুন এড়িয়ে গেছে। মনের ভুলও হতে পারে। হয়ত জবাব দিয়েছে, মুনার মনে নেই। নাকি এই প্রশ্ন সে কোনোদিন করেনি?

মুনা আবার জিজ্ঞেস করল, ক'ভাই-বোন তোমার?

দু'ভাই এক বোন।

অন্য ভাইটি কি করে?

ছোটবেলায় মারা গেছে। পানিতে ডুবে মারা গেছে।

মুনা কিছু বলল না। মামুন বলতে লাগল— আমরা দু'ভাই পুকুরে গোসল করতে গিয়েছিলাম। আমি সাঁতার জানি না ও জানে। একটা পেতলের কলসী উল্টে তার কানায় ধরে সাঁতার কাটছি, হঠাৎ...। মুনা বলল থাক বলার দরকার নেই। শুনতে চাই না।

শুনতে চাইবে না কেন? শোন। কলসী হাতছাড়া হয়ে গেল হঠাৎ। ডুবে যেতে ধরেছি, বড় ভাই সাঁতরে এসে আমাকে ধরল। মরিয়া হয়ে আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং ডুবে গেলাম দুজনেই।

মুনা প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল - হুডটা তুলে দাও না।

মামুন হুড তুলল না। গাঢ় স্বরে গল্প শেষ করতে লাগল তারপর কি হয়েছে শোন, দুজনকে আধমরা অবস্থায় উদ্ধার করা হল। একজন বাঁচল, একজন বাঁচল না।

মুনা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। মামুন বলল— আমরা ছিলাম তিনজন। এখন আমি একজন। এবং আমার কি মনে হয় জানো? আমার মনে হয় আমিও থাকব না।

সে তো কেই থাকবে না।

না তুমি বুঝতে পারছ না। আমি নিজেও বেশিদিন বাঁচব না।

রিকশা থামিয়ে মামুন সিগারেট কিনল। জর্দা দিয়ে পান বানিয়ে রিকশায় উঠে এল। মুনা অবাক হয়ে বলল - পান খাবে নাকি?

হুঁ। কেমন যেন বমি বমি আসছে। আমার শরীরটা বেশি ভাল না মুনা।

মুনা তার হাত ধরল। তাদের পরিচয় প্রায় তিন বছরের। এই দীর্ঘদিনে আজই প্রথমবারের মত মুনা নিজ থেকে তার হাত বাড়াল এবং এর জন্যে তার কোনো লজ্জা লাগল না। মুনা নরম স্বরে বলল - তোমার গা গরম। মনে হয় জ্বর আছে।

থাকতে পারে। মাথা ধরে আছে।

এই মাথা ধরা নিয়ে সিগারেট টানছ?

অভ্যাস। অভ্যাসের বসে টানছি। টানতে ভাল লাগছে না তবু টানছি।

ফেলে দাও।

মামুন সিগারেট ফেলে দিয়ে হালকা স্বরে বলল— এখন কেমন জানি একা একা লাগে। এই মাসের মধ্যে একটা বিয়ের তারিখ হলে তোমার আপত্তি আছে? কল্যাণপুরের বাসাটাও তোমাকে দেখিয়ে আনব। কাল সময় হবে?

অফিস ছুটির পর হবে।

আজ তোমার মামার সঙ্গে কথা বলে একটা ডেট করে ফেলি। কি বল?

এত বড় একটা দুঃসংবাদের পর হুট করে বিয়ের তারিখ ফেলা কি ঠিক হবে? যাক কয়েকটা দিন।

না আমার ভাল লাগছে না। আজই সব ঠিকঠাক করব।

বাকি রাস্তা কাটল চুপচাপ। দুজনের কেউই কথা বলল না।

## ৬

এই বাবু, যাস কোথায়? শুনে যা এদিকে।

বাবু এগিয়ে গেল। বাকের ভাই পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। বাবু ভয়ে ভয়ে বলল, কি?

বাকের সানগ্লাস খুলে কাচ পরিষ্কার করতে করতে বলল— কাল সন্ধ্যায় কে এসেছিল তোদের বাসায়?

কেউ না।

লম্বা করে, ফর্সা মত একটা ছেলে ঢুকল, মুনা ছিল সাথে। কে সে? চোখে চশমা।

বাবু তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারল না। অসহায় ভাবে এদিক-ওদিক তাকাল। কী বলা উচিত বুঝতে পারছে না।

এই ছেলের সাথেই মুনার বিয়ে হচ্ছে নাকি?

হুঁ।

এটা বলতে এতক্ষণ লাগল কেন? টান দিয়ে বাঁ কান ছিঁড়ে ফেলব। আমার সাথে ফাজলামি। বিয়েটা কবে?

সামনের মাসের তিন তারিখে।

বাকের সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে হঠাৎ উদাস হয়ে গেল। ঠাণ্ডা গলায় বলল যা ভাগ। বাবু তবুও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। লজ্জায় তার চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। বহু কষ্টে সে পানি সামলানোর চেষ্টা করছে। বাকের সব সময় তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। সে যখন ক্লাস ফাইভে পড়ত তখন বাকের একবার একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিল। কেন দিয়েছিল বাবু বহু চেষ্টা করেও বের করতে পারেনি। সে ফিরছিল স্কুল থেকে। হঠাৎ বাকেরের সঙ্গে দেখা, সাইকেলে করে কোথায় যেন যাচ্ছে। বাবুকে দেখে সাইকেল থামিয়ে নেমে পড়ল। কড়া গলায় ডাকল এই এদিকে আয়! বাবু এগিয়ে যেতেই কথা নেই বার্তা নেই প্রচণ্ড এক চড়। বাবু কিছু বুঝে উঠবার আগেই বাকের সাইকেলে উঠে চলে গেল। যেন কিছুই হয়নি।

আজকের রাগের কারণটা অবশ্যি স্পষ্ট। বাবু সে কারণ ভালই বুঝতে পারে। তার মনে ক্ষীণ সন্দেহ, এককালে মুনা আপার সঙ্গে বাকের ভাইয়ের কিছুটা ভাব ছিল। কে জানে বিয়ের দিন এসিড-ট্যাসিড ছুড়ে মারবে হয়ত। দারুণ মন খারাপ করে বাবু ঘরে ফিরল। সে বড় ভয় পেয়েছে।

মুনা বাইরে বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। মামুনের সঙ্গে কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কেনার কথা। সংসার তৈরি হবার আগেই সংসারের জন্যে জিনিসপত্র কেনার কথা ভাবতে কেমন লজ্জা লজ্জা লাগে। আবার ভালও লাগে। আজ তারা কিনবে চায়ের কাপ পিরিচ। রান্নার জন্যে বাসন কোসন। গত রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর মুনা একটা লিস্ট করেছে। তার সারাক্ষণই ভয় এই বুঝি বকুল জেগে উঠে চোখ কচলে জিজ্ঞেস করবে, কি করছ আপা? বকুলের ঘুম খুব পাতলা। একটু নড়াচড়া হলেই জেগে উঠে বলে, কি হয়েছে আপা? কি হয়েছে?

মুনা ঘর থেকে বেরুবার আগে বলে গেল ফিরতে দেরি হবে। বকুলকে বলল ভাত চড়িয়ে দিতে। বকুল চাপা হেসে বলল, ভাত ক'জনের জন্যে রান্না হবে? ঠিক করে বলে যাও।

ক'জনের জন্যে রান্না হবে মানে?

মামুন ভাইও কি এখানে খাবেন?

মুনা ধমক দিতে গিয়েও দিতে পারল না। মামুন ইদানীং বেশ কয়েকবার এখানে ভাত খেয়েছে। বকুল বলল, মামুন ভাই আজ এখানে খেলে মুশকিল হবে। খাবার কিছু নেই, ডিমও নেই।

মুনা কোনো উত্তর না দিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়ল। মামুনের রাতের এখানে খাওয়ার ব্যাপারটা তার নিজেরও পছন্দের নয়। কিন্তু সে আজকাল রাত আটটার দিকে হঠাৎ এসে পড়ে এবং বসার ঘরে চুপচাপ বসে থাকে। মামা তার সঙ্গে কোনো কথা বলেন না। তাতে সে কোনো রকম অস্বস্তি বোধ করে না। বকুল যখন গিয়ে বলে মামুন ভাই, আপনি কী এখানে খাবেন? সে সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ। দাও ভাত দাও।

ঘরে খাবার কিন্তু খুব খারাপ।

অসুবিধা নেই।

আসুন তাহলে। ভাত বাড়ছি।

মামুন সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে। যেন ভাতের জন্যেই এতক্ষণ বসে ছিল। এমন লজ্জা লাগে মুনার। মামুন কেমন যেন অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে। কোনো কিছুতেই কোনো উৎসাহ নেই।

বকুল বলল - মুনা আপা, এই শাড়িতে কিন্তু তোমাকে ভাল লাগছে না। বদলে যাও। সবুজ শাড়িটা পর। মুনা গম্ভীর গলায় বলল, শাড়ি-টাড়ি নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না। যা পরেছি সেটাই যথেষ্ট। তোর এসব নিয়ে ভাবতে হবে না।

রাগ করছ কেন?

পাকামো কথা শুনে রাগ করছি।

বকুল আহত স্বরে বলল, পাকা কথা কি বললাম? শাড়িটাতে তোমাকে মানাচ্ছে না। এর মধ্যে পাকামির কি আছে?

মুনা লক্ষ্য করল বকুল বেশ শীতল স্বরে তর্ক করছে। এই স্বভাব তার আগে ছিল না। আগে

সে কোনো কথার জবাব দিত না। আজকাল দিচ্ছে। প্রেমে পড়লে মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র পাল্টায়। বকুল কারো প্রেমে-ট্রেমে পড়িনি তো? মুনা বলল, চায়ের পাতা শেষ হয়েছে বোধ হয়। বাবুকে দিয়ে আনিয়ে রাখ।

টাকা? টাকা দেবে কে? দোকানে এখন বাকি বন্ধ।

মুনা নিঃশব্দে একটা দশ টাকার নোট বের করল। শওকত সাহেব ঘরে না থাকলে টুকিটাকি কেনা এখন মুশকিল। শওকত সাহেব আগে সংসার খরচের কিছু টাকা লতিফাকে দিতেন। ইদানীং দেন না। আধা সের লবণ কেনার টাকাও এখন তাঁর কাছে চাইতে হয়।

বকুল বলল, তুমি ফিরবে কখন আপা?

সন্ধ্যার আগেই ফিরব। কেন?

না এমনি জিজ্ঞেস করলাম। শাড়িটা বদলে যাও আপা। প্লিজ। আর যাবার আগে মা'র সঙ্গে দেখা করে যাও। আজ বেশ কয়েকবার তোমাকে খোঁজ করেছেন। খুব নাকি জরুরি।

কই আগে তো বলিসনি?

আগে মনে ছিল না। এখন মনে পড়ল।

মুনা শাড়ি বদলাল না। বকুলের কথায় শাড়ি বদলানোর কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া এটা এমন কোনো খারাপ না। গত সপ্তাহেই বকুল বলেছিল সুন্দর মানিয়েছে। এক সপ্তাহ আগে যে শাড়িতে মানায় এক সপ্তাহ পরে তাতে মানায় না, এ কেমন কথা?

লতিফা আজ বেশ সুস্থ। গত রাতে ভাল ঘুম হয়েছে। সকালে নাশতা খেয়েছেন। দুপুরে ভাত খেয়ে ঘুমিয়েছেন। সারাদিন একবারও জ্বর আসেনি। অনেক দিন পর প্রথমবারের মত তাঁর মনে হয়েছে হয়ত শরীর আবার আগের মত হবে। সংসার ফিরে পাওয়া যাবে। তাকে কেউ আর এড়িয়ে চলবে না।

মুনা বলল, তুমি ডেকেছিলে নাকি মামি?

লতিফা উজ্জ্বল চোখে বললেন, বোস তুই। অনেক কথা আছে। আমার পাশে বোস।

তোমার শরীর আজ মনে হয় ভাল?

হুঁ। জ্বর নেই। দেখ গায়ে হাত দিয়ে দেখ।

মুনা তাঁর কপালে হাত লাগাল। গা ঠাণ্ডা। জ্বর সত্যি সত্যি আসেনি। লতিফা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন - কি, জ্বর আছে?

না। এখন বল কি বলবে। আমার হাতে সময় নেই। এক জায়গায় যাব।

দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে আয়।

এমন কি কথা দরজা বন্ধ করতে হবে?

আহ বন্ধ করতে বলছি কর না।

মুনা অবাক হয়েই দরজা বন্ধ করল। লতিফা বিছানায় উঠে বসলেন গতকাল বকুলের স্কুলের একজন মিসট্রেস বাসায় এসেছিলেন। মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কে? রেহানা আপা?

হুঁ। বকুলের জন্যে একটা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। খুবই ভাল ছেলে। ভাল বংশ। উনার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়।

মুনা বিরক্ত স্বরে বলল, এই সব আমি শুনতে চাই না। বাদ দাও তো।

সবটা না শুনেই এ রকম করিস কেন? সবটা আগে শোন। বাবা-মা'র একমাত্র ছেলে। জাপানে গেছে গত বছর। কম্পিউটার না কিসে যেন ডিগ্রি করেছে। বকুলকে সে দেখেছে। খুব পছন্দ হয়েছে।

দেখল কোথায়?

ছেলে এই মিস্ট্রেসের কাছে গিয়েছিল। তারপর উনি বকুলকে ক্লাস থেকে ডেকে নিয়ে যান। বকুল অবশ্যি কিছু বুঝতে পারেনি।

মুনা বলল বুড়ো ছেলে, বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, ওর মাথা-টাথা কি খারাপ নাকি? এইসব চিন্তা বাদ দাও তো মামি। লতিফা অবাক হয়ে বললেন - এরকম ছেলে পরে তুই পাবি কোথায়? ছেলের ছবি আছে। ছবি দেখ তুই। ছবি দেখার পর...।

আমার ছবি-টবি দেখতে হবে না।

আগেই রাগ করছিস কেন? বকুলের একটা ভাল বিয়ে হোক এটা তুই চাস না?

চাইব না কেন, চাই। কিন্তু ওর বিয়ের বয়স হতে হবে তো? কেন এত ব্যস্ত হয়েছ? মেট্রিকটা অন্তত পাস করতে দাও। ছেলে অপেক্ষা করুক।

না, ছেলে অপেক্ষা করতে পারবে না। তিন মাসের ছুটিতে এসেছে, বিয়ে করে বউ নিয়ে যাবে। তুই অমত করিস না। তোর মামার সঙ্গে কথা বলছিলাম, সে রাজি আছে।

আমাদের রাজি আর অরাজিতে কিছু আসে যায় না। বকুল কিছুতেই রাজি হবে না। কেঁদে বাড়ি মাথায় তুলবে। কেন বুঝতে পারছ না?

লতিফা গম্ভীর স্বরে বললেন, না ও কাঁদবে না।

বুঝলে কি করে কাঁদবে না?

বকুলের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওর মত আছে। বলেছে আমাকে।

বল কি তুমি!

লতিফা টেনে টেনে বললেন, রাজি কেন হবে না বল? মেয়ে তো বোকা না। যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। কোনটাতে ভাল হবে সেটা সে জানে।

জানলে তো ভালই। বিয়ে দিয়ে দাও। আর কি?

মুনা মুখ কালো করে উঠে দাঁড়াল।

যাচ্ছিস কোথায়? কথা শেষ হয়নি আমার।

কথা শোনার আমার তেমন কোনো ইচ্ছা নেই। তোমরা নিজেরা নিজেরাই শোন।

বকুল ভাত চাপিয়েছে। তার মুখ একটু বিষণ্ন। মুনা আপা অকারণে তার ওপর এতটা রাগ করবে সে ধারণাও করেনি। সবাই তার সঙ্গে এমন খারাপ ব্যবহার করে কেন? বকুল দেখল মুনা দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে অবাক হয়ে বলল, তুমি এখনো যাওনি?

না।

কী করছিলে? এতক্ষণ মা'র সঙ্গে এমন কি আলাপ?

মুনা কড়া গলায় বলল, গতকাল তোর টিচার এসেছিল এই কথা তুই আমাকে বললি না কেন?

তুমি রাগ করবে এজন্যে বলিনি।

শুনলাম জাপানের ঐ ছেলের সঙ্গে বিয়েতে তোর মত আছে। মামিকে নাকি তুই বলেছিস?

বকুল জবাব দিল না। মুনা তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, কথার জবাব দে। চুপ করে আছিস কেন?

বকুল থেমে থেমে বলল মা আমাকে খুব আগ্রহ করে বলছিল। তার মুখের ওপর না বলতে খারাপ লাগল। মা বেশিদিন বাঁচবে না। তাঁকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করছিল না।

মুনা তাকিয়ে রইল বকুলের দিকে। বকুল সহজ স্বরে বলল তোমার মা যদি এ রকম অসুস্থ হত আর সে যদি তোমার হাত ধরে কাঁদতে কাঁদতে বিয়ের কথা বলত তাহলে তুমিও রাজি হতে। হতে না?

এ রকম বাজে তর্ক কার কাছে শিখেছিস?

বকুল জবাব দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। আজ সে একটা ছাপা শাড়ি পরেছে। এত সুন্দর লাগছে তাকে দেখতে। মুনা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। আরো কড়া কড়া কিছু কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। প্রতিমার মত একটি কিশোরীকে কোনো কড়া কথা বলা যায় না। মুনা কোমল স্বরে বলল, কাঁদছিস কেন তুই? বকুল চোখ মুছে বলল, তোমরা সবাই আমার সঙ্গে এ রকম করবে আর আমি কাঁদতে পারব না?

সেকেন্ড পিরিয়ডে রীতা আপার ক্লাস। ইংলিস সেকেন্ড পেপার। রীতা আপাকে ছাত্রীরা আড়ালে ডাকে রয়েল বেঙ্গল। ভয়ানক রাগী। এবং তিনি বেছে বেছে এমন সব ছাত্রীদের পড়া জিজ্ঞেস করেন যারা সেদিন শিখে আসেনি। সবার ধারণা কপালের মাঝখানে তাঁর একটা তিন নম্বর চোখ আছে, যেই চোখ দিয়ে তিনি দেখে ফেলেন কে পড়া করেছে কে করেনি।

বকুল বসে বসে ঘামছিল। রীতা আপা ক্লাসে ঢুকে প্রথম প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করবেন তাকে। প্রথম দাঁড়াতে বললেন। তারপর শীতল চোখে তাকাবেন। ক্লাসের সমস্ত সাড়াশব্দ যখন থেমে যাবে তখন প্রশ্ন করবেন। প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করবেন আলাদা আলাদা ভাবে। এবং এমন প্রশ্ন করবেন যার উত্তর ক্লাসের কেউই জানে না।

আজও তাই হল। রীতা আপা ক্লাসে ঢুকেই বললেন বকুল দাঁড়া। বকুল দাঁড়াল। আপা

তাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, কমন রুমে চলে যা। রেহানা আপা তোকে ডাকছেন। বই-খাতা নিয়ে যা।

রেহানা আপা দারুণ ব্যস্ত। হাতে একগাদা কাগজপত্র কিন্তু মুখ হাসি হাসি। বকুল তার পাশে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, বকুল তুই বাড়ি চলে যা। আজ বিকেল পাঁচটার সময় তোকে দেখতে আসবে, মাকে বলবি। সাজগোজ বেশি দরকার নেই। ছেলের মা আর এক ফুফু আসবে। খবর না দিয়ে হঠাৎ গিয়ে দেখার কথা। সেজেগুজে থাকলে বুঝে ফেলবে। বুঝেছিস?

বকুল মাথা নাড়ল। সে বুঝেছে।

যা একটা রিকশা নিয়ে বাড়ি চলে যা। শাড়ি পরে থাকবি। কামিজটামিজ না। আর শোন, দুপুরে কাঁচা হলুদ গায়ে দিয়ে গোসল করবি, রঙ খুলবে। অবশ্যি তোর রঙ খারাপ না। চাপা রঙ। এটাই ভাল।

বকুল সরাসরি বাড়ি এল না। গেল টিনা ভাবীদের বাড়ি। অনেক দিন পর আসা। টিনা ভাবী ঘুমুচ্ছিল। সে ঘুমঘুম চোখে দরজা খুলে দিল।

কেমন আছে ভাবী?

আর কেমন আছি। আমাদের খোঁজখবর কে করে? তোর ফজলু ভাই দারুণ রেগে আছে, তোকে মজা দেখাবে। কাবলিওয়ালা দেখতে এলি না কেন?

বাসা থেকে আসতে দেয়নি। মুনা আপা নট বলে দিয়েছিল।

এরকম দারোগা আপা জোগাড় করলি কোত্থেকে?

বকুল মৃদু হাসল।

তোর এই আপাকে আমার একেবারেই সহ্য হয় না। কি রকম পুরুষ পুরুষ মেয়ে।

বকুল অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মুনা আপার নামে কেউ কিছু বললে তার খারাপ লাগে। টিনা ভাবী বললেও লাগে। যদিও তার প্রায়ই মনে হয় টিনা ভাবীকেই সে সবচে বেশি ভালবাসে।

তোর বিয়ে হচ্ছে  এ রকম একটা গুজব শোনা যাচ্ছে, এটা কি সত্যি?

বলেছে কে তোমাকে?

যেই বলুক, সত্যি কি না বল?

না সত্যি না।

টিনা ঘাড় কাত করে হাসতে লাগল।

বকুল বলল, হাসছ কেন?

এমনি।

এই ক'দিনের মধ্যে তোমার পেট অনেকখানি বড় হয়ে গেছে ভাবী।

তা হয়েছে। আমার মনে হয় যমজ। দুজন আছে এখানে।

যমজ হলে ভালই হয়।

তোর হোক তখন বুঝবি-- ভাল কি মন্দ। রাতে ঘুমুতে পারি না। সবচে অসুবিধা হয় তোর ভাইয়ের। বেচারা ক'দিন ধরে দারুণ মনোকষ্টে আছে।

কেন?

তা বলা যাবে না।

টিনা রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। বকুল লজ্জা পেয়ে গেল। টিনা বলল, তুই এমন টমেটোর মত লাল হয়ে গেলি কেন? বুঝতে পেরেছিস নাকি কি জন্যে মনোকষ্টে আছে?

না।

আবার মিথ্যা কথা। ঠিকই বুঝেছিস। আজ তুই সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকবি। তোর ফজলু ভাই আসুক, তারপর যাবি। সে অনেকদিন তোকে না দেখে মন খারাপ করে আছে।

আজ থাকতে পারব না ভাবী, আমার কাজ আছে।

কি কাজ? এত কাজের লোক হলি কবে থেকে? বস গল্প করব। বিছানায় পা উঠিয়ে বস না।

বকুল বসল। টিনা এসে বসল তার পাশে। একটা হাত রাখল বকুলের কোলে। মৃদু স্বরে বলল, তুই দিন দিন যা সুন্দর হচ্ছিস। আমারই লোভ লাগে।

কি যে বল তুমি।

যে তোকে বিয়ে করবে সে প্রথম তিন মাস এক ফোঁটাও ঘুমুতে দেবে না। সারা রাত জাগিয়ে

রাখবে। যদি না রাখে আমার নাম বদলে ফেলব।

থাক তোমার নাম বদলানোর দরকার নেই।

টিনা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল আমার চেহারা-ছবি তো দেখছিস। এই আমাকেই তোর ভাই এক মাস রাতে ঘুমুতে দেয়নি। সারা রাত জেগে থাকি দিনের বেলায় ফাঁক পেলেই ঘুমাই। শ্বশুর বাড়িতে সবাই হাসাহাসি করে।

বকুল কিছু বলবে না ভেবেও বলে ফেলল, এখন আর তোমাকে জাগায় না?

না। আগের মত না।

বকুল তিনটা পর্যন্ত থাকল সেখানে। টিনা ভাবীর সঙ্গে কথা বলা একটা নেশার মত। কিছুতেই আসতে ইচ্ছা করে না। পুরুষদের নিয়ে এমন সব মজার মজার গল্প সে জানে শুধু শুনতে ইচ্ছা করে। আজ সে একটা গল্প বলেছে যে শুনলেই গা ঝিমঝিম করে।

টিনা ভাবীর এক খালার বিয়ে হয়েছে রাজশাহীতে। টিনা ভাবী তখন মাত্র মেট্রিক দিয়েছে। সেও গিয়েছে বিয়েতে। সমবয়সী মেয়েরা শাড়ি পরে ছুটোছুটি করছে। সেও করছে। রাত ন'টার সময় বর এল। সবাই ছুটে গেল গেট ধরতে। সে গেল ছাদে। সেখান থেকে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে দেখা যাবে। তখন হঠাৎ ইলেকট্রিসিটি চলে গেল। ছাদে পাঞ্জাবি পরা একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, খুকী ভয় লাগছে? তারপর...।

গল্প শেষ হবার পর বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, তুমি ফজলু ভাইকে বলেছ এই ঘটনা?

পাগল হয়েছিস? সবাইকে সব কথা বলা যায়! মেয়েদের অনেক কথা পুরোপুরি গিলে ফেলতে হয়।

ঐ লোকটির সঙ্গে আর দেখা হয়েছিল?

না। আর হলেই কি? তুই দেখি গল্প শুনে ঘামতে শুরু করেছিস। মেয়ে হয়ে জন্মানোর অনেক কষ্ট রে বকুল।

এ সময় বাড়িতে মা ছাড়া অন্য কারো থাকার কথা নয়। কিন্তু বকুল অবাক হয়ে দেখল বাবা খালি পায়ে বারান্দায় ক্যাম্পখাটে বসে আছেন। তাঁরও কি অফিস ছুটি? নাকি তিনি খবর পেয়েছেন রেহানা আপা আসবেন ছেলের মাকে নিয়ে?

শওকত সাহেবের মুখ অত্যন্ত বিমর্ষ। খালি গায়ে থাকার জন্যেই হয়ত তাঁকে দেখাচ্ছে বুড়ো মানুষের মত। তিনি বকুলের দিকে না তাকিয়েই বলল আজ ক্লাস হয়নি? কি অবস্থা, তিন মাস পর মেট্রিক পরীক্ষা।

বকুল কিছু বলল না। মেট্রিক পরীক্ষার এখনো অনেক দেরি। সেদিন মাত্র ক্লাস টেইনে হাফ ইয়ার্লি হল। কিন্তু বাবার মাথায় কি করে যেন তিন মাস ঢুকে গেছে।

স্কুলে পড়ায় না?

পড়ায়।

আর পড়া। পড়াশোনা কি দেশে আছে? ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দে।

বকুল পানি নিয়ে এল। শওকত সাহেব তৃষ্ণার্তের মত পানি পান করলেন। তৃষ্ণা মিটল না।

আরেক গ্লাস পানি দে।

সরবত বানিয়ে দেব? ঘরে কাগজি লেবু আছে।

দে। তোর মার শরীর আজ কেমন?

ভাল।

ভাল? এর নাম ভাল। বিছানা থেকে নামতে পারে না আর শরীর ভাল। খাওয়া-দাওয়া করেছে?

আমি তো জানি না। সকালে স্কুলে চলে গেলাম।

যা আগে খোঁজ নিয়ে আয়। মা-বাপের দিকে একটু লক্ষ্য রাখিস। এটা আবার বলে দিতে হয় কেন?

লতিফা জেগেই ছিলেন। বকুলকে ঢুকতে দেখে মাথা উঁচু করে বললেন-- তোর বাবা এসেছে নাকি? কথা শোনা যাচ্ছে।

এসেছে।

দরজা খুলল কিভাবে?

দরজা খোলা ছিল বোধ হয়।

না। আমি নিজের হাতে বন্ধ করলাম। তুই জিজ্ঞেস করে আয় দরজা খুলল কিভাবে?

জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। আমি পারব না।

জিজ্ঞেস করতে অসুবিধা কি? তোকে তো খেয়ে ফেলবে না।

বকুল বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকাল। অসুস্থ হবার পর লতিফাব এমন হয়েছে। সামান্য ব্যাপারে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

বকুল, তোর বাবা রোজ এমন সকাল সকাল বাড়ি আসছে কেন?

রোজ আসছে নাকি?

কালও তো একটার সময় চলে এসেছে। এর আগের দিন এসেছে দু'টার সময়।

অফিসে কাজ-টাজ বোধ হয় বেশি নেই।

কাজ থাকবে না কেন? কি যে বলিস। যা তো জিজ্ঞেস কবে আয় রোজ এত সকাল সকাল আসে কেন?

আমি জিজ্ঞেস করতে পারব না মা।

তাহলে ডেকে দে, আমি জিজ্ঞেস করছি।

ঠিক আছে দিচ্ছি তুমি কিছু খেয়েছিলে মা?

দুধ-মুড়ি খেয়েছি। যা তোর বাবাকে আসতে বল।

শওকত সাহেব নিঃশব্দে সরবত খেলেন। গ্লাস শেষ করে বিবক্ত স্বরে বললেন, ছেঁকে দিতে পারলি না, লেবুর ছোবরায় গ্লাস ভর্তি। কোনো একটা কাজ ঠিকমত কবতে পাবিস না, না?

বকুল চুপ করে রইল। শওকত সাহেব বললেন, তোব মা কিছু খেয়েছে?

হ্যাঁ। দুধ-মুড়ি।

রোজ দুধ-মুড়ি। মুড়ির মধ্যে আছেটা কি? এর চাইতে এক বাটি ডাল খেলে পুষ্টি বেশি হয়। যত বেকুবের মত কাজ।

বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, মা তোমাকে ডাকে।

এখন তার ভ্যাজর ভ্যাজর শুনতে পাবব না। আমার পাঞ্জাবি এনে দে বাইরে যাব।

কখন ফিরবে?

শওকত সাহেব জবাব দিলেন না। ছেলে-মেয়েদেব সব কথাব তিনি জবাব দেন না।

রেহানা আপা আসাব কথা বিকাল পাঁচটায়, তিনি চারটাব মধ্যেই চলে এলেন। তাঁর সঙ্গে অসম্ভব বেঁটে অতিরিক্ত মোটা এক মহিলা। ইনিই সম্ভবত ছেলেব মা। আবেকজন তাঁব মত বেঁটে কিন্তু দারুণ রোগা ছেলের ফুফু হবেন। বেহানা আপা বকুলকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল শাড়ি পরতে বলেছিলাম না? এখনো স্কুলেব ড্রেসই পরে আছিস? মাথায় বুদ্ধি-শুদ্ধি কিছু আছে না সবটাই গোবব?

আপনি বলেছিলেন পাঁচটার সময় আসবেন।

পাঁচটার সময় আসব বলেছি বলেই তুই পাঁচটা বাজাব দু'মিনিট আগে কাপড় বদলাবি? আব তুই পা ছুঁয়ে সালাম করলি না কেন?

এখন করব?

এখন কববি কোন অজুহাতে? যাবার সময় করিস। আব মুখ এমন আমসি কবে আছিস কেন? হাসিমুখে থাক। তাই বলে কথায় কথায় হাসার দবকার নেই।

ছেলের মাকে বকুলের পছন্দ হল। খুব রসিক মহিলা। ছোটখাটো জিনিস নিয়ে মজার মজার রসিকতা করতে লাগলেন। এবং এক ফাঁকে বকুলকে বললেন আমাকে দেখে অনেকেই মনে করে আমার ছেলেমেয়েগুলি বোধ হয় আমার সাইজের। আসলে তা না, ওরা সবাই ওদেব বাবাব মত লম্বা। তবে আমি নিশ্চিত আমার নাতিগুলি হবে আমার সাইজের। এই বলে তিনি খুব হাসতে লাগলেন। হাসি এমন আন্তরিক যে সবাই তাতে যোগ দিল। বকুলের সঙ্গে তার কথাবার্তা হল খুবই কম। একবার শুধু জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ভাল নাম কি মা? তার উত্তর শোনার জন্যেও অপেক্ষা করলেন না, অন্য প্রশ্ন করলেন। বেশ মহিলা।

যাবার সময় বকুল পা ছুঁয়ে সালাম করতেই তিনি তাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলেন। অনেকদিন বকুলকে এমন ভাবে কেউ আদর করেনি।

৭

মামুন বলল  কি কেমন দেখছ? বাসা পছন্দ হয়? মুনা এতটা আশা করেনি। সে মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, খুবই সুন্দর। তুমি মোটামুটি বলেছিলে কেন? মামুন হাসতে শুরু করল।

এস পেছনের বারান্দাটা দেখ।

পেছনেও বারান্দা আছে নাকি?

থাকবে না মানে। এখন বল বাসা কেমন?

চমৎকার! সত্যি চমৎকার।

একটু দূর হয়ে গেল তাই না?

হোক দূর।

বসবার কোনো ব্যবস্থাই নেই। মামুন পা ছড়িয়ে মেঝেতে বসল - জিনিসপত্র কিনে ঘর-দুয়ার গোছাও এখন। চল আজ ফেরার পথে বড় দেখে একটা খাট কিনে ফেলি।

তোমার মাথায় শুধু খাট ঘুরছে।

তা ঘুরছে। ফোমের একটা গদি কিনব  বুঝলে মুনা। সাড়ে ন'শ টাকা দাম।

বাজে খরচ করার পয়সা আমাদের নেই।

ঐটা আমি কিনবই, তুমি যাই বল না কেন। দাঁড়িয়ে আছ কেন বস।

মামুন হাত ধরে মুনাকে টেনে পাশে বসাল। কেমন নির্জন চারদিক। একটু যেন গা ছমছম করে। মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল  হাত সরাও প্লিজ।

এ রকম করছ কেন তুমি? আমার ওপর বিশ্বাস নেই তোমার?

মুনা জবাব দিল না। মামুন তাকে কাছে টানল। গাঢ় স্বরে বলল  এমন শক্ত হয়ে আছ কেন? কেউ তো দেখছে না।

চল আজ যাই, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

হোক সন্ধ্যা, তুমি বস তো।

তুমি এ রকম কর, বসতে ভাল লাগে না।

কিচ্ছু করব না তুমি সহজ হয়ে বস।

ওয়ার্ড অব অনার?

হ্যাঁ, ওয়ার্ড অব অনার। শুধু আমার হাত থাকবে তোমার হাতে। নাকি তাতেও আপত্তি?

না তাতে আপত্তি নেই।

মামুন গাঢ় স্বরে বলল  চল তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলি  আর ভাল্লাগছে না। আগে যে রকম কথা ছিল সে রকমই করি। কাজীর অফিসে গিয়ে ঝামেলা মিটিয়ে দি।

মামা রাজি হবে না। ছোট করে হলেও একটা অনুষ্ঠান করতে হবে। মুনার কথা শেষ হবার আগেই মামুন তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। মুনা কোন বাধা দিল না। তারা সন্ধ্যা না মিলানো পর্যন্ত থাকল সেখানে।

রহস্যময় কিছু সময় কাটল তাদের।

মুনা রোজ ভাবে সকাল সকাল ঘুমুতে যাবে কিন্তু রোজই দেরি হয়। আজও দেরি হল। বারোটার সময় বাতি নেভাতে যেতেই বকুল বলল, একটু পরে আপা। আমার পাঁচ পৃষ্ঠা বাকি আছে। মুনা বিরক্ত স্বরে বলল - মশারির ভেতরে বসে গল্পের বই পড়িস কেন? চোখ নষ্ট হবে। আর প্রতিদিন একটা করে বই জোগাড় করিস কোত্থেকে?

ফজলু ভাই এনে দেয়।

আমি বারান্দায় বসছি। বই শেষ হলে ডেকে দিস।

আজ গরম নেই। আশ্বিনের শেষাশেষি। শেষ রাতের দিকে ভাল ঠাণ্ডা পড়ে। মুনা ক্যাম্পখাটে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। পাঁচ পৃষ্ঠা বাকি কথাটা মিথ্যা। অনেকখানিই বাকি। মুনাকে ডাকতে কেউ আসে না।

শওকত সাহেবকে বারান্দার দিকে আসতে দেখা গেল। তিনি মুনাকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, অন্ধকারে বসে আছিস কেন? সাড়ে বারোটা বাজে।

এমনি বসে আছি। তুমি নিজেও তো অন্ধকারে হাঁটাহাঁটি করছ। কিছু খুঁজছ নাকি?

দড়ি আছে?

দড়ি দিয়ে কি করবে?

মশারি খাটাব।

মশারি তো খাটানোই আছে। আবার নতুন করে খাটাবে কি?

শওকত সাহেব থেমে থেমে বললেন বসার ঘরে বিছানা করেছি। আজ থেকে আলাদা শোব।

কেন?

প্রত্যেক দিন রুগীর সাথে শুয়ে শুয়ে শরীরটাই আমাব খাবাপ হয়ে গেছে।

শওকত সাহেব বিরক্তির ভঙ্গি করে বসার ঘরের দিকে গেলেন। সেখানে সত্যি সত্যি একটা বিছানা করা হয়েছে। নোংরা একটা মশারি খাটানোর চেষ্টাও হচ্ছে। মশারির তিন কোণা শিথিলভাবে ঝুলছে। দড়ির অভাবে চার নম্বর কোণাটির গতি হচ্ছে না। মুনা বলল দুপুর রাতে দড়ি পাওয়া যাবে না। তুমি একটা কয়েল জ্বালিয়ে শুয়ে থাক।

কয়েল আছে?

আছে, এনে দিচ্ছি। আচ্ছা মামা, সত্যি করে বল তো তোমার কি হয়েছে?

কি আবার হবে? রুগীর সাথে ঘুমাতে চাই না। এর মধ্যে হওয়া-হওযির কি আছে?

এই কথা না। তুমি নাকি প্রতিদিন দুপুরে অফিস-টফিস বাদ দিয়ে ঘরে এসে বসে থাক?

কে বলেছে, লতিফা?

হ্যাঁ। ব্যাপার কি?

ব্যাপার কিছু না। অফিসে একটা ঝামেলা যাচ্ছে।

ঝামেলা গেলে তো সেখানেই বেশিক্ষণ থাকা উচিত। কি ঝামেলা বল?

শওকত সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, ভ্যাজব ভ্যাজব করিস না। কয়েল জ্বালিয়ে দিয়ে যা। আর দেখ হাতপাখা পাওয়া যায় কি না। বিশ্রী গরম।

গরম কোথায়? বেশ তো ঠাণ্ডা।

শওকত সাহেব গুম হয়ে বসে রইল। এখন তিনি আর কথা-টথা বলবেন না। মুনা কয়েল আনতে গেল। মামির ঘবের ড্রয়ারে এক প্যাকেট কয়েল আছে।

লতিফা জেগে ছিলেন। মুনা ড্রয়ার খুলতেই তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, তোর মামা আলাদা ঘুমাচ্ছে কেন রে?

এই ঘরে গরম লাগে। বাতাস-টাতাস নেই।

ফ্যান আছে তো।

ফ্যানের বাতাসে তার ঘুম হয না। একেক জনের একেক স্বভাব।

লতিফা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, এতদিন তো ঘুম হয়েছে। আজ হবে না কেন? বলতে বলতেই তার গলা ভারী হয়ে এল। মুনা এসে বসল বিছানার পাশে। লতিফা বললেন, এক সময় তোব মামা আমাকে বিয়ে করার জন্যে কত কাণ্ড করেছে।

এই গল্প মুনার জানা। মামির কাছ থেকে অসংখ্যবার শুনেছে। আজ রাতে আবেকবাব হযত শুনতে হবে।

মুনা, কি সব পাগলামি কাণ্ড যে সে করেছে। একবার শুনলাম সে বিষ খাবে। এক বোতল র‍্যাটম না কি যেন জোগাড় করেছে। আমি ভযে বাঁচি না। কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড। বাড়িতে সবাই দোষ দিচ্ছে আমাকে। আমি কি জানি বল? আমার সঙ্গে কোনোদিন তার একটা কথাও হয়নি।

বলতে বলতে শাড়ির আঁচলে লতিফা চোখ মুছলেন। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে মুনা বলল, বকুলের হবু শাশুড়ী নাকি লম্বায় দেড় ফুট? বিয়ের ডেট-ফেট ফেলে দিয়েছ নাকি মামি?

না ডেট হয়নি। বিয়ে নিয়ে কোনো কথাবার্তাই হয়নি।

দুই বেয়ানে কি নিয়ে গল্প করলে?

লতিফা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। সম্ভবত মনে করতে চেষ্টা করছেন। কিছুই মনে করতে পারলেন না। মুনা বলল, শুয়ে থাক মামি। বাতি নিভিয়ে দেই। লতিফা চাপা স্বরে বললেন, আমি বেশিদিন বাঁচব না রে।

বুঝলে কিভাবে?

কয়েকদিন আগে স্বপ্নে দেখলাম আমি আর তোর মা দুজনে ভাত খাচ্ছি। স্বপ্নে মরা মানুষদের সঙ্গে খেতে বসা খুব খারাপ। যে দেখে সে আর বাঁচে না।

কি দিয়ে ভাত খাচ্ছিলে?

লতিফা জবাব দিলেন না। চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইলেন। মুনা বাতি নিভিয়ে বের হয়ে এল। বকুলের পাঁচ পৃষ্ঠা এখনো শেষ হয়নি। মুনা কোনো কথা না বলে বাতি নিভিয়ে দিল। বকুল বলল, আর একটা পাতা আপা, প্লিজ।

কোনো কথা না, ঘুমো।

এই পাতাটা শেষ না করলে আমার ঘুম আসবে না।

ঘুম না এলে জেগে থাক। কথা বলিস না। কি বই এটা?

উপন্যাস।

কার লেখা?

সতীনাথ ভাদুড়ির অচিন রাগিনী। ফজলু ভাই এনে দিয়েছে লাইব্রেরি থেকে।

ভাল নাকি খুব?

মোটামুটি।

মোটামুটি? তুই যেভাবে পড়ছিস তাতে তো মনে হয় রসগোল্লা ধরনের উপন্যাস।

বকুল খিলখিল করে হেসে উঠে জড়িয়ে ধরল মুনাকে। মুনা বিরক্ত স্বরে বলল, হাত উঠিয়ে নে। গরম লাগছে। বকুল হাত সরাল না। আরো কাছে ঘেঁষে এসে বলল, তুমি এত ভাল কেন মুনা আপা?

জানি না কেন। বিরক্ত করিস না।

বকুল মৃদু স্বরে বলল, একটা গল্প বল না আপা।

কি মুশকিল, রাত দেড়টার সময় গল্প কিসের?

একটা বল আপা। তোমার পায়ে পড়ি? ভূতের গল্প। সত্যি সত্যি তোমার পায়ে ধরছি কিন্তু।

আহ্ কেন সুড়সুড়ি দিচ্ছিস?

আপা প্লিজ, প্লিজ।

মুনাকে গল্প শুরু করতে হল। ওপাশের বিছানা থেকে বাবু ক্ষীণ স্বরে বলল, একটু জোরে বল আপা, আমিও শুনছি। মুনা অবাক হয়ে বলল, এখনো জেগে আছিস?

হুঁ। ঘুম আসছে না, কি করব?

বাবু অস্পষ্ট ভাবে কি যেন বলল। পরিষ্কার বোঝা গেল না। মুনা উঁচু গলায় বলল - কি বলছিস ভাল করে বল। বোবা ধরেছিল?

হ্যাঁ।

কাল সকালে মনে করিস তোকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব।

ঠিক আছে।

গল্প শেষ হতে হতে অনেক রাত হয়ে গেল। বকুল বলল, বাথরুমে যেতে হবে তুমি একটু দাঁড়াও। বাবুরও বাথরুম পেয়ে গেল। বাবু বলল, আজ না ঘুমিয়ে সারারাত গল্প করলে কেমন হয় আপা? মুনা বিরক্ত স্বরে বলল, ফাজলামি করিস না, বাথরুম শেষ করে ঘুমুতে যা। আর একটি কথাও না।

তারা তিনজন দরজা খুলে বাইরে বেরিয়েই দেখল শওকত সাহেব উবু হয়ে বারান্দায় বসে আছেন। অন্ধকার বারান্দা। তাঁর হাতে জ্বলন্ত সিগারেট শুধু উঠানামা করছে। মুনা ডাকল মামা! তিনি ফিরে তাকালেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

একা একা কি করছ মামা?

কিছু করছি না।

শওকত সাহেব নিঃশব্দে ঘরের ভেতর ঢুকে গেলেন। বকুল চাপা স্বরে বলল, বাবার কি হয়েছে মুনা আপা? মুনা বলল, কিছুই হয়নি। ঘুম আসছে না তাই বসে ছিল বারান্দায়। কেন জানি বকুলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। বাবার বসে থাকার ভঙ্গিটা কেমন দুঃখী দুঃখী। তার মনে হল বাবা লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছিল। মানুষের কত রকম গোপন দুঃখ থাকে। তার নিজেরও আছে। প্রায়ই সে এ রকম একা একা কাঁদে। তার মত দুঃখ তো বাবা-মা'দেরও থাকতে পারে। ভাবতে ভাবতে বকুলের চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। অল্পতেই তার কান্না পায়।

৮

সকাল ন'টার মত বাজে।

বাকের জলিল মিয়ার চায়ের দোকানের সামনে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। কড়া রোদ বাইরে। বাকেরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জলিল মিয়া ডাকল- বাকের ভাই, আসেন চা খান। বাকের জবাব দিল না। সব কথার জবাব দেয়া ঠিক না। এতে মানুষের কাছে পাতলা হয়ে যেতে হয়। সে এগিয়ে গিয়ে পান-বিড়ির দোকানটার সামনে দাঁড়াল। বেশ কয়েকজন কাস্টমার দাঁড়িয়ে আছে সেখানে, দোকানদার সবাইকে বাদ দিয়ে হাসি মুখে জিজ্ঞেস করল, কি দিব বাকের ভাই?

সিগ্রেট দে।

ফাইভ ফাইভ?

বাকের এমন ভাবে তাকাল যেন সে দারুণ বিরক্ত হয়েছে। তাকে ক্ষমা করে দেয়ার ভঙ্গিতে বলল, অন্য কোনো সিগ্রেট খাই? দোকানদার জিবে কামড় দিয়ে একটা সিগ্রেট বের করল। বাকের গম্ভীর গলায় বলল, এক প্যাকেট দে। সে একটা চকচকে একশ টাকার নোট ছুড়ে ফেলল।

আজ তার মন নানান কারণে খারাপ হয়ে আছে। গত রাতে খবর পাওয়া গেছে ইয়াদ চাকবি পেয়েছে। দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা ইয়াদের সঙ্গে ওঠাবসা অথচ এই খবরটা ইয়াদ তাকে দেয়নি। অন্যের কাছে জানতে হল। খবরটা যাচাই করবার জনে সে সাত সকালে গিয়েছিল ইয়াদের বাড়ি। ইয়াদ হাই তুলে বলল, আর কতদিন এমনি এমনি ঘুরব? আর চাকরিটাও খারাপ না। ঘোরাঘুরি আছে। টি এ ডি এ পাওয়া যায়।

কবে থেকে চাকরি?

সামনের মাসের এক তারিখ থেকে। দেরি আছে। চল যাই চা খেয়ে আসি। নাশতা করেছিস?

চা খেতে খেতেই বাকের একবার বলল, আমরা চারজন মিলে যে স্পেয়ার পার্টস-এর দোকান দেব বলেছিলাম তার কি?

আরে দূর এইসব কি আর হয় নাকি? দুইজন তো ভেগেই গেল, বিয়ে-শাদী করে একেবারে গেরস্ত।

তুই আর আমি দুইজনে মিলে করতে পারতাম।

পয়সা কই?

ইয়াদ খানিকক্ষণ পরই গলা নিচু করে বলতে লাগল, বড় ভাই এদিকে আবার ফ্যাচাং বাঁধিয়ে ফেলেছে। আই.এ. পাস এক মেয়ের সাথে সম্বন্ধ করে ফেলেছে। মেয়ে কালো কিন্তু সুইট দেখতে। একটু অবশ্যি রোগা।

বাকের একটি কথাও বলল না। গম্ভীর হয়ে রইল। ইয়াদ নিজের মনেই কথা বলে যেতে লাগল- আমি নিজে তো মেট্রিকটা পাস করতে পারলাম না। এদিকে বউ হল গিয়ে এই-এ। শালা কেলেঙ্কারি অবস্থা। এখন বউ যদি বি.এ. পড়তে চায় তাহলে গেছি। বড় ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে গেলাম। ইয়াদের মুখ দেখে মনে হল না ঝঞ্ঝাটের জন্যে সে বিরক্ত। বরং মনে হল সে সমস্ত ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করছে।

বাকের চা শেষ না করেই উঠে এল। এটা ঠিক যে পাড়ার সবাই তাকে খাতির করে। কিন্তু দল ভেঙে যাচ্ছে। এ সব লাইনে দল ভেঙে গেলে খাতির থাকে না। দেখতে দেখতে চ্যাংড়ারা উঠে আসবে। গত সপ্তাহেই তার চোখের সামনে মজনু সিগারেট টানতে টানতে রিকশায় উঠল। একটা চড় দিলে দুটো চড়ের জায়গা নেই যার তার এত বড় সাহস।

বাকের জলিল মিয়ার চায়ের স্টলে ঢুকল। জলিল মিয়া নিজেই গলা উঁচিয়ে ডাকল- গফফর, গরম পানি দিয়া ভাল কইরা বাকের ভাইরে চা দে। কাপ ধুইয়া দিস। বাকের বসে রইল উদাস ভঙ্গিতে। এখানে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া এখন আর কোনো কাজ নেই। স্কুলের সময় হয়ে গেছে, পাড়ার মেয়েরা স্কুলে রওনা হয়েছে দল বেঁধে। দেখতে এত ভাল লাগে। বাকের লক্ষ্য করতে লাগল কোনো ছোকরা শিসটিস দেয় কিনা। টেনে জিব ছিড়ে ফেলবে সে। তার পাড়ায় মেয়েছেলের অসম্মান হতে দেবে না।

মুনা ঘর থেকে বেরুল দশটার দিকে। অফিস পৌছতে পৌছতে নিশ্চয়ই এগারোটা বেজে যাবে। রোজ দেরি হয়। কালও সে ঘর থেকে বের হয়েছে এগারোটায়। বাকের চায়ের স্টল ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

এই যে মুনা অফিসে যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ। সকালবেলা আর কোথায় যাব?

মামাকে বলবে কাজের মেয়ে একটা জোগাড় করেছি।

ঠিক আছে বলব।

বাকের সঙ্গে সঙ্গে আসতে শুরু করল। মুনা কিছু বলল না। বাকের হালকা স্বরে বলল, তোমাদের অফিসে যাব একদিন। মেয়েছেলেরা কাজ করছে দেখলে ভাল লাগে।

আপনারা কিছু করবেন না, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবেন। মেয়েরাও যদি তাই করে তাহলে হবে কিভাবে?

তোমাদের জন্যেই তো কিছু করতে পারি না। মেয়েরা সব কাজকর্ম নিয়ে নেয়। বাংলাদেশ একেবারে নারীমহল হয়ে যাচ্ছে। আমরা এখন অন্দরে ঢুকে রান্নাবান্না করব। হা হা হা।

বাকের রাস্তা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। নিজের কথা তার নিজেরই খুব মনে ধরেছে। সে বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত গেল। এ সময় রিকশা পাওয়া মুশকিল, কিন্তু সে ছুটোছুটি করে রিকশা নিয়ে এল। রিকশাওয়ালাকে গম্ভীর গলায় বলল, আপামণিকে তুরন্ত নিয়ে যাবি। মুনার ধন্যবাদ জানিয়ে কিছু-একটা বলা উচিত। কিন্তু সে কিছু বলল না। বাকের বলল  মুনা, ভাড়া দিতে হবে না।

কেন? দিতে হবে না কেন?

দিয়ে দিয়েছি।

বাকের উদাস ভঙ্গিতে সিগারেট ধরাল। তার এখন কিছু করার নেই। মোটর পার্টস-এর দোকানে আগে এই সময়টায় আড্ডা দিতে বসত  সে আড্ডাটা এখন আর নেই। লোকজন আসে না। একা একা কতক্ষণ বসে থাকা যায়? সে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগল। কোনো কিছুই তাকে আকর্ষণ করছে না। রাস্তার পাশে রিকশাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে প্যাসেঞ্জারের ঝগড়া বেঁধে গেছে। অন্য সময় হলে প্যাসেঞ্জারের পক্ষ নিয়ে রিকশাওয়ালার গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিত। আজ সে ইচ্ছাও হল না। মুনার সঙ্গে রাস্তাঘাটে দেখার হবার পর তার এ রকম হয়। বেশি কিছু সময় কিছুই ভাল লাগে না।

বাকের গ্রিন ফার্মেসিতে উঁকি দিল। ডাক্তার ছেলেটি এখনো আসেনি। সে এলে তার সঙ্গে কিছুক্ষণ বসা যেত। বাকের গম্ভীর গলায় বলল  ডাক্তার কখন আসবে?

দুপুরের পরে।

দেখি টেলিফোনটা দেখি।

ফার্মেসির নীল শার্ট পরা লোক বিরক্ত স্বরে বলল— ফোন তালা দেয়া। চাবি নেই। এই লোকটি নতুন এসেছে, তাকে বোধ হয় ঠিক চেনে না। বাকের ঠাণ্ডা গলায় বলল, চাবি না থাকলে তালা ভাঙার ব্যবস্থা কর। লোকটি তাকিয়ে আছে সরু চোখে। বাকের থমথমে গলায় বলল, ফাজলামি কথাবার্তা আমার সাথে বলবে না। চড় দিয়ে চাপার দাঁত ফেলে দেব। টেলিফোন তালা দেওয়া। তোমার বাবার টেলিফোন?

লোকটি টেলিফোন বের করল। সত্যি বোধ হয় চাবি নেই। সেফটিপিন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তালা খুলল।

কাকে ফোন করা যায়? মুনাকে করলে কেমন হয়? মাঝে মাঝে সে মুনার সঙ্গে কথা বলে। মুনা ভীষণ বিরক্ত হয়। তবু করে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে টেলিফোনটি বড় সাহেবের ঘরে। মুনাকে ডেকে আনতে হয়। আজও তাই হল। বড় সাহেব তাকে লাইনে থাকতে মুনাকে আনতে খবর পাঠালেন।

হ্যালো, আমি বাকের।

কি ব্যাপার?

রিকশা ভাড়া দাওনি তো? আমি অলরেডি দিয়ে দিয়েছিলাম।

সে তো আপনি আমাকে বলেছিলেন। আবার টেলিফোন কেন?

তোমার কাছ থেকে আবার সেকেন্ড টাইম ভাড়া নিল কি না সেটা জানার জন্যে। রিকশাওয়ালারা যা হারামি হয়। হা হা হা।

আর কিছু বলবেন?

না। তোমাদের বিয়ের ডেট হয়েছে নাকি?

না এখনো হয়নি।

হ্যালো মুনা, আমার কানেকশন আছে, আমি হাফ প্রাইসে একটা কম্যুনিটি সেন্টার ভাড়া করে দেব। জাস্ট দশ দিন আগে আমাকে বলতে হবে।

ঠিক আছে বলব। এখন টেলিফোন রাখি?

হ্যালো শোন-- তোমাদের ঐ ফ্যানটার কিছু করা গেল না। অসুবিধা নেই, যেটা আছে সেটা ইউজ কর। নো প্রবলেম।

ঠিক আছে, এখন রাখছি আমার কাজ আছে।

মুনা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। বাকের অলস ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, একটা খুব ঠাণ্ডা দেখে পেপসি নিয়ে আস তো। বলবে, বাকের ভাই চায়।

নীল শার্ট পরা লোকটি পেপসি আনতে গেল। বাকের রাস্তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

শওকত সাহেব অফিসে এলেন লাঞ্চের পর। সবাই তখনো লাঞ্চ সেরে ফেরেনি-- অফিস ফাঁকা ফাঁকা। শওকত সাহেবের মনে হল সবাই তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছে। ডিসপ্যাচ সেকশনের মল্লিক বাবু তাঁকে দেখেই যেন হঠাৎ করে ফাইলপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শওকত সাহেব বললেন, ভাল আছেন মল্লিক বাবু? মল্লিক বাবু অতিরিক্ত ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, জি ভাল। আপনি ভাল তো?

বড় সাহেব আছেন?

আছেন, অফিসেই আছেন। যান না, দেখা করুন গিয়ে।

শওকত সাহেব বড় সাহেবের কাছে গেলেন না। যাবার সাহস সঞ্চয় করতে তাঁর কিছু সময় লাগবে। ছোকড়া মত একটি ছেলেকে দেখা যাচ্ছে ক্যাশ সেকশনে। নতুন অ্যাপয়েন্টেমেন্ট হয়েছে নাকি? মল্লিক বাবু বললেন, চা খাবেন?

জি না।

ক্যাশ সেকশনের নতুন ছেলেটি আড়চোখে তাঁর দিকে তাকাচ্ছে। তাঁর খবর শুনেছে বোধ হয়।

জসিম সাহেব ঢুকলেন। খুব ফুর্তিবাজ লোক। রসিকতা না করে এক সেকেন্ডও থাকতে পারেন না। শওকত সাহেবকে দেখে তিনিও কেমন জানি হকচকিয়ে গেলেন। শুকনো হাসি হেসে বললেন, কি ভাল?

জি ভালই।

দেখা হয়েছে বড় সাহেবের সঙ্গে?

জি না। দেখা করতে বলেছেন?

না কিছু বলেননি। তবে আমার মনে হয় দেখা করা উচিত। ইনকোয়ারি কমিটি রিপোর্ট দিয়েছে।

শওকত সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, কি রিপোর্ট?

জসিম সাহেব উত্তর না দিয়ে ড্রয়ার খুলে কি নিয়ে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

বড় সাহেবের কাছে কি এখনই যাব?

যান এখুনি যান। দি আরলিয়ার দি বেটার।

শওকত সাহেব ভীত স্বরে বললেন, কিছু শুনেছেন রিপোর্ট সম্বন্ধে?

জি না ভাই। কিছু শুনিনি।

তিনি কথাটা মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন। তার মানে এটা মিথ্যা। সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে কেউ মিথ্যা বলতে পারে না। মিথ্যা বলতে হয় অন্যদিকে তাকিয়ে।

বড় সাহেব মানুষটি ছোটখাটো। হাশিখুশি ধরনের। সহজে রাগ করেন না। কড়া ধরনের কথা বলতে পারেন না। কিন্তু তিনিও গম্ভীর। শওকত সাহেবকে দেখে মুখ অন্ধকার করে বললেন, ইনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট ভাল না শুনেছেন বোধ হয়?

শওকত সাহেব মূর্তির মত বসে রইলেন।

ইনকোয়ারি কমিটির সুপারিশ হচ্ছে, যে টাকার গরমিল দেখা যাচ্ছে সেটা আপনি দশ দিনের ভেতর যদি ফেরত দেন তাহলে আপনার বিরুদ্ধে কোনো পুলিশ অ্যাকশন নেয়া হবে না। আর তা না হলে কেইস পুলিশ হ্যান্ডওভার করা হবে, বুঝতেই পারছেন একটা কেলেংকারি ব্যাপার হবে।

আপনি টাকাটা ফেরত দিয়ে দেন।

টাকা আমি কোথায় পাব স্যার?

বড় সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন।

আমি স্যার কিছুই জানি না।

এটা তো শওকত সাহেব ঠিক বললেন না। আপনি না জানা মতে এটা হওয়া সম্ভব না। কাজটা করেছেন কাঁচা। আমি নিজেও ইনকোয়ারি কমিটির একজন মেম্বার - এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন? থানা-পুলিশ হলে একটা বেইজ্জতী ব্যাপার হবে, তার হাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করুন। শুধু শুধু এখানে বসে থেকে সময় নষ্ট করবেন না। হেড ক্লার্কের কাছে ইনকোয়ারি কমিটির রিপোর্টের কপি আছে। সেটা নিয়ে যান। ভাল করে পড়ুন।

৯

বকুলের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে এই খবরটি বকুল কাউকে বলেনি। টিনা ভাবীকে পর্যন্ত না। অথচ বকুল অবাক হয়ে লক্ষ্য করল ক্লাসের সবাই এটা জানে। সেকেন্ড পিরিয়ডে ইংরেজি আপা আসেননি। সবাই খুব হৈচৈ করছে। অনিমা গিয়ে এক ফাঁকে বোর্ডে লিখল আজ বকুলের গায়ে হলুদ, কাল বকুলের বিয়ে। দারুণ হাসাহাসি শুরু হল। হাসতে হাসতে একজন অন্যজনের গায়ে গড়িয়ে পড়ছে। বকুল বেঞ্চে মাথা রেখে কেঁদে ভাসাতে লাগল।

ফোর্থ পিরিয়ডে ছুটি নিয়ে চলে গেল টিনা ভাবীদের বাসায়। ভেবেছিল পাঁচটা পর্যন্ত থাকবে— কিন্তু টিনা ভাবীর দেশের বাড়ি থেকে লোকজন এসেছে। বাসা ভর্তি মানুষ। কিছু কিছু দিন এমন খারাপ ভাবে শুরু হয়। বাসায় ফেরার পথে ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

এই যে বকুল না? এ রকম মাথা নিচু হয়ে হাঁট কেন? গাড়ির নিচে পড়বে।

বকুল কি বলবে ভেবে পেল না।

এস পেপসি খেয়ে যাও।

জি না, লাগবে না।

লাগবে না কেন। লাগবে। আস তো। চল ফার্মেসিতে বসি, যা গরম।

গরম কোথায়? আজ তো ঠাণ্ডা।

এই তো কথা ফুটছে। আমার তো ধারণা ছিল তুমি কথা বলতেই জানো না।

জানব না কেন?

বকুল অবাক হয়ে লক্ষ্য করল, সে বেশ কথার পিঠে কথা বলছে।

কয়েকদিন আগে কি তুমি শাড়ি পরে কোথাও গিয়েছিলে? নীল শাড়ি?

টিনা ভাবীর বাসায় গিয়েছিলাম।

আমি চিনতে পারিনি। সারাক্ষণ ভাবছিলাম চেনা চেনা লাগছে অথচ চিনছি না কেন? আচ্ছা বকুল বল তো, কাদের পথে দেখলে চেনা চেনা মনে হয়, কিন্তু আসলে ওরা চেনা নয়।

বকুল অনেকক্ষণ ভেবেও কিছু বলতে পারছে না। ডাক্তার ছেলেটি হাসতে হাসতে বলল, টিভি বা সিনেমায় যারা অভিনয় করে ওদের রাস্তায় দেখলে চেনা চেনা মনে হয় ঠিক না?

আমি ওদের কাউকে কখনো রাস্তায় দেখিনি।

আমি অনেক দেখেছি।

সুবর্ণাকে দেখেছেন কখনো?

না তাকে দেখিনি।

আমি দেখেছি। আমি আর অনিমা একদিন নিউ মার্কেটে গিয়েছিলাম। তখন তাকে দেখলাম কাগজ কিনছে। প্রিন্টের সাদা শাড়ি পরা ছিল।

বকুল প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত ফার্মেসিতে একটি টুলের ওপর বসে বসে গল্প করল। এতটা সময় গিয়েছে সে নিজেও বুঝতে পারেনি।

বাসায় ফিরতে ভয় ভয় লাগছিল। তার মনে হল বাবু নিশ্চয়ই আজও দেখেছে এবং হয়ত বলে দেবে মুনা আপাকে। কিংবা কে জানে বাবা নিজেই হয়ত দেখেছেন। তিনি পাঁচটার দিকে মাঝে মাঝে অফিস থেকে ফেরেন। বেছে বেছে হয়ত আজই ফিরেছেন। বকুল ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

বাড়িতে কেউ নেই। বাবা, মুনা আপা, বাবু কেউই ফেরেনি। দশ-এগারো বছরের একটা কাজের মেয়েকে দেখা গেল, তার নাম 'সখী'। এ রকম অদ্ভুত নাম থাকে নাকি মানুষের? যতবার তার নাম ধরে ডাকা হয় ততবারই এমন হাসি লাগে। লতিফা এক সময় বিরক্ত হয়ে বললেন, ওকে সখিনা ডাকবি। সখী ডাকছিস কি?

যে নাম ওর বাবা-মা রেখেছে সেটা ডাকবে না?

না ঐ নামে ডাকতে হবে না। সখিনা ডাকবি।

মেয়েটা খুব কাজের। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘর-দুয়ার গুছিয়ে ঝকঝকে করে ফেলেছে। বকুলকে জিজ্ঞেস করল, চা খাবে কি না। লতিফা চিন্তিত মুখে বললেন এই মেয়ে বেশিদিন থাকবে না। যারা কাজ জানে তারা এ বাড়িতে বেশিদিন টেকে না।

লতিফার শরীর আজ বেশ ভাল। অনেক দিন পর তিনি আজ রান্নাঘরে ঢুকে হালুয়া বানালেন। সবাই চায়ের সঙ্গে খাবে। গরম পানি দিয়ে ভালমত গোসল করলেন। তাঁর শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে। বকুল বলল— তুমি গোসল-টোসল সেরে এমন সেজেগুজে বসে আছ কেন?

সাজগোজের কি দেখলি? পরিষ্কার একটা শাড়ি পরলাম শুধু।

তোমাকে বেশ ফ্রেশ লাগছে মা।

লতিফা মনে মনে খুশি হলেন। শরীর যদি সত্যি সত্যি সেরে গিয়ে থাকে তাহলে শক্ত হাতে এবার সংসারের হাল ধরতে হবে। সব জলে ভেসে যাচ্ছে।

বকুল!

কি?

তোর রেহানা আপা আর আসে না ক্লাসে?

আসবে না কেন, রোজই আসে।

তোর বিয়ের কথা কিছু বলে না?

না।

তুই নিজে কিছু জিজ্ঞেস করিস না?

কি যে তুমি বল মা। আমি গিয়ে জিজ্ঞেস করব - আমার বিয়ের কি করলেন আপা?

লতিফা হেসে ফেললেন। মনে মনে ভাবলেন বড় কথা শিখেছে তো এই মেয়ে। মেয়েরা কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। কয়েকদিন আগেও খালি গায়ে ফ্রক পরে ঘুরে বেড়াত, আজ বিয়ের কথা হচ্ছে। হয়ত সত্যি সত্যি বিয়েও হয়ে যাবে। জাপানে না কোথায় চলে যাবে এইটুকু মেয়ে। একদিন তারও ছেলেমেয়ে হবে। ওদেরও বিয়ের বয়স হবে। লতিফার চোখ ভিজে ওঠার উপক্রম হল। বকুল বলল, তুমি শুয়ে থাক তো মা। আবার জ্বর এসে যাবে।

আসবে না। আয় বারান্দায় একটু বসি।

তারা দুজন বারান্দায় মোড়া পেতে বসল।

তোমার শরীর সতি সত্যি সেরে গেছে নাকি মা?

বোধ হয় সেরেছে। বাবুর স্কুল ছুটি হয় কখন?

এখন ছুটি হয়ে গেছে। ও খেলতে যায়, সন্ধ্যা হয় আসতে আসতে।

আর মুনা? ও কখন আসে?

একেক দিন একেক সময় আসে।

বলতে বলতেই শওকত সাহেবকে লম্বা পা ফেলে আসতে দেখা গেল। লতিফা বললেন তোর বাবার শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে তো।

হুঁ।

যত্ন করার কেউ নেই। কখন খায় কি করে কে জানে।

বকুল বলল, চল ভেতরে যাই মা। বাবা এখানে আমাদের বসে থাকতে দেখলে রাগ করবেন।

শওকত সাহেব কিন্তু রাগ করলেন না। সন্ধ্যাবেলা বই নিয়ে বসবার জন্যেও কাউকে বললেন না। নতুন কাজের মেয়েটা তাঁর চোখের সামনে একটা গ্লাস ভেঙে ফেলল, তিনি শুধু মৃদু স্বরে বললেন— কাজকর্ম সাবধানে করবি। অন্য সময় হলে এর জন্যে চড়-চাপড় মারতেন। চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলতেন। রাতের খাবারও খেলেন নিঃশব্দে। মুনা একবার বলল, তোমার শরীর ভাল তো মামা?

হুঁ ভাল।

অফিসে ঝামেলা মিটেছে?

হুঁ মিটেছে।

লতিফা বসেছেন ওদের সঙ্গে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এখনো তাঁর জ্বর আসেনি। মাথা একটু হালকা লাগছে। এ ছাড়া শারীরিক আর কোনো অসুবিধা নেই। তিনি নিজেও ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছেন না। বকুল বসেছে তাঁর পাশে। তিনি একবার বললেন -- দেখ তো আমার গা গরম কি না। বকুল বলল না। অসুখটা বোধ হয় সেরেই গেল। তাঁর চোখ চকমক করতে লাগল। শওকত সাহেব খাওয়া শেষ করে উঠবার সময় বললেন -- মুনা, তুই একটু শুনে যা।

অফিসের ঝামেলার ব্যাপারটা মুনা শুনল। শান্ত স্বরে বলল এটা কতদিন আগের ব্যাপার?

এক মাস।

এতদিন তুমি এটা হজম করে রেখেছিলে?

শওকত সাহেব জবাব না দিয়ে সিগারেট টানতে লাগলেন।

এখন ওরা পুলিশ কেইস করবে?

হুঁ। টাকাটা রিকভার না হলে করবে।

তোমাকে তো তাহলে ধরে নিয়ে যাবে হাজতে।

হুঁ।

টাকার ব্যাপারে তুমি কিছু জানো?

না। কিছুই জানি না।

মুনা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল -- তুমি জানো না ঠিক না মামা। তুমি জানো। তবে তুমি একা এটা করনি তা ঠিক। এত সাহস তোমার নেই। সঙ্গে অন্য লোক ছিল। তুমি খানিকটা শেয়ার পেয়েছ? কত পেয়েছ?

শওকত সাহেব চুপ করে রইলেন। মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কত পেয়েছ?

দশ হাজার।

আমাকে যে ছ'হাজার দিতে চেয়েছিলে সেটা ওখান থেকেই?

হ্যাঁ।

বাকি চার হাজার কোথায়?

ধার-টার ছিল। শোধ দিয়েছি।

ঐ দিন যে মিষ্টি আনলে সেটা কি এই টাকা থেকে?

শওকত সাহেব জবাব দিলেন না। দ্বিতীয় সিগারেট ধরিয়ে খুকখুক করে কাশতে লাগলেন। মুনা বলল -- মামা, তুমি কাল সকালেই অফিসে গিয়ে বলবে, আমি টাকাটা ফেরত দেব, তবে আমাকে দু'মাস সময় দিতে হবে।

দু'মাসের মধ্যে কোথায় পাব এত টাকা?

পাবে না। তবে এর মধ্যে আমরা বকুলের বিয়ে দিয়ে দেব। তোমাকে জেলে নিয়ে ঢোকালে ঐ মেয়ের কি আর বিয়ে হবে, না পড়াশোনা হবে? যত সুন্দরীই হোক চোরের মেয়েদের আমাদের সমাজে জায়গা নেই। বুঝলে মামা? তুমি কালই অফিসে যাবে এবং দু'মাস সময় নেবে।

ঠিক আছে নেব।

মুনা উঠে পড়ল। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না তার। সে বুঝতে পারল বকুলও জেগে আছে, কিন্তু সাড়াশব্দ দিচ্ছে না। সে কি কিছু আঁচ করতে পারছে?

বকুল?

কি?

জেগে আছিস তো কথা বলছিস না কেন?

বাবা এতক্ষণ ধরে কি বললেন?

তেমন কিছু না। তোর বিয়ে নিয়ে কথা হল। বুঝলি বকুল, আমি অনেক ভেবে-টেবে দেখলাম অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া খারাপ না। এর কিছু কিছু ভাল দিকও আছে।

বকুল ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল।

এই সময়ে মেয়েদের মনে প্রচুর ভালবাসা থাকে। ভালবাসাটা খুবই জরুরি। সব কিছুর

অভাবই সহ্য করা যায়, কিন্তু ভালবাসার অভাব সহ্য করা যায় না।

বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, তোমাকে একটা কথা বলব মুনা আপা?

বল।

তুমি রাগ করবে না তো?

রাগ করবার মতো কথা না হলে রাগ করব কেন? বল কি বলবি?

বকুল মুনার কাছে সরে এসে আলতো করে একটা হাত রাখল তার গায়ে। প্রায় ফিসফিস করে বলল, ক্লাস টেনের একটা মেয়ে যদি কোনো ছেলেকে পছন্দ করে তাহলে সেটা কি খারাপ আপা?

মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, ছেলেটা কে?

বকুল জবাব না দিয়ে দু'হাতে মুনাকে জড়িয়ে ধরল। মুনা লক্ষ্য করল বকুল থরথর করে কাঁপছে।

ভোরবেলা সূর্য ভালভাবে ওঠার আগেই বাড়িতে পুলিশের ওসি এবং তিনজন কনস্টেবল এল। তাদের সঙ্গে সার্চ ওয়ারেন্ট আছে। জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে তারা টাকা খুঁজল।

লতিফা রক্তশূন্য মুখে দরজা ধরে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলেন। কেউ তা বুঝতে পারল না। শওকত সাহেব বসে রইলেন বেতের চেয়ারে। তিনি খুব ঘামতে লাগলেন। তার ঠিক সামনেই বসেছেন ওসি সাহেব। এ জাতীয় দৃশ্য তিনি তাঁর জীবনে অনেক দেখেছেন। কাজেই এ দৃশ্য তার মনে কিছুমাত্র রেখাপাত করল না। তবু তিনি একবার লতিফার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভয়ের কিছু নেই, আপনি শান্ত হয়ে বসুন।

এই ভোরবেলাতেও বাড়ির সামনে এবং তার লাগোয়া রাস্তায় প্রচুর লোক জমে গেল। এ বাড়িতে একটি মেয়ে খুন হয়েছে এ রকম একটা গুজব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। রোদ বাড়তে লাগল কিন্তু কৌতূহলী মানুষের ভিড় কমল না।

সার্চ শেষ হতে হতে আটটা বেজে গেল। ওসি সাহেব বললেন, শওকত সাহেব আপনার নামে একটা ওয়ারেন্ট আছে, আপনাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে। ভয়ের কিছু নেই, জামিনের ব্যবস্থা হবে। মুনা বলল, আমি কি যেতে পারি আপনার সঙ্গে?

হ্যাঁ নিশ্চয়ই পারেন। একজন পুরুষ মানুষ হলে ভাল হত। উকিল-টুকিলের ব্যবস্থা করতে হবে। অনেক ছোটাছুটির ব্যাপার আছে।

মুনা বাবুকে পাঠাল পরিচিত যদি কাউকে পাওয়া যায়। আশপাশের বাসার অনেকের সঙ্গেই এদের চেনা-জানা তবু কেউ আসতে রাজি হল না। সাবধানী মানুষ, ইচ্ছা করে কোনো বাজে ঝামেলায় জড়াতে চায় না।

বাকেরকে শুধু পাওয়া গেল। সে ঘুমুচ্ছিল। খবর পেয়েই ছুটে এসেছে। তার মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। সিগারেট ধরিয়ে দায়িত্বশীল মানুষের মত সে মুনাকে বলল, নো প্রবলেম, এক ঘণ্টার মধ্যে জামিনে ছাড়িয়ে আনব। ছেলেখেলা নাকি। তোমরা সব দরজা বন্ধ করে বসে থাক। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে কোনো উত্তর দেবে না। ঘরে টাকা-পয়সা আছে তো?

বকুল তার ঘরে একা একা বসে ছিল। শওকত সাহেবকে বের করে নিয়ে যাবার সময় সে শুধু বেরিয়ে এল। অত্যন্ত কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করল, আমার বাবাকে আপনারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? ওসি সাহেব সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। শওকত সাহেব অপ্রকৃতিস্থ মানুষের মত চারদিকে তাকাতে লাগলেন। উপদেশ দেবার মত ভঙ্গিতে বললেন, ঠিকমত পড়াশোনা করিস মা। দু'দিন পর মেট্রিক পরীক্ষা।

বাসার সামনে অসম্ভব ভিড়, সেই ভিড় ঠেলে তারা এগুতে লাগল। শওকত সাহেব শিশুদের মত শব্দ করে কাঁদতে লাগলেন। বাকের তাঁর একটা হাত ধরে আছে। সে মৃদু স্বরে বলল- মামা কাঁদবেন না। কিচ্ছু হবে না, এক ঘণ্টার মধ্যে জামিন হবে। আমার চেনা লোকজন আছে।

বাসার সামনে লোকের ভিড় বাড়তেই লাগল।

উকিল ভদ্রলোক দেখতে পান-বিড়ির দোকানদারের মত।

রোগা দড়ি পাকানো চেহারা। কথাও ঠিকমত বলতে পারেন না- জড়িয়ে যায়। কিন্তু তিনি নাকি ফৌজদারী মামলায় একজন মহা ওস্তাদ আদমি। তাঁর হাতে মামলা গেলে নাকে তেল দিয়ে ঘুমানো যায়।

কিন্তু মুনা বিশেষ ভরসা পাচ্ছে না। তাকে সামনে বসিয়ে উকিল সাহেব গভীর যত্নে দাঁত খোঁচাচ্ছেন। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে প্রতিটি দাঁতের গোড়ায় গোসত আটকে আছে এবং এই মুহূর্তেই সেগুলো বের করা দরকার।

মুনার পাশের চেয়ারে বসে আছে বাকের। তার ভাবভঙ্গি খুব বিনীত। বাকেরই তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। বাকেরের ধারণা এই লোক এক নম্বর আসল জিনিস, খাঁটি বাঘের বাচ্চা।

বাঘের বাচ্চারা এত দীর্ঘ সময় নিয়ে দাঁতের পরিচর্যা করে তা মুনার জানা ছিল না। সে অস্বস্তি নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। উকিল সাহেব মাঝে মাঝে দাঁত খোঁচানো বন্ধ রেখে এক দৃষ্টিতে মুনার দিকে তাকাচ্ছেন। তাঁর দৃষ্টি মুনার বুকের কাছে এসে থমকে যাচ্ছে। এমন নির্লজ্জ মানুষও আছে নাকি?

আসামি আপনার কে হয়?

আমার মামা।

আপন মামা? মায়ের ভাই?

জি।

মুনা ভেবে পেল না আপন মামা না পর মামা, তার সঙ্গে এই মামলার সম্পর্ক কী? নাকি উকিল-মোক্তারদের স্বভাবই হচ্ছে খামোকা প্রশ্ন করা।

ভয়ের কিছু নেই, ক্রিমিন্যাল মিস এপ্রোপ্রিয়েশন। চারশ তিন ধারা। ম্যাক্সিমাম পেনাল্টি হচ্ছে দু'বছরের জেল। এত নার্ভাস হবার তো কিছু দেখি না। ডোন্ট গেট নাভার্স।

মুনা নড়েচড়ে বসে রুমাল দিয়ে নাক ঘষল। বড্ড ঘাম হচ্ছে। এ জন্যেই বোধ হয় তাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে।

আপনার নাম কী?

মুনা।

মিস নাকি মিসেস?

এই সব কী ধরনের প্রশ্ন? মুনা মৃদু স্বরে বলল, মিস।

মিস মুনা, এখন আপনি বলুন আপনার মামা কী চুরি সত্যি সত্যিই করেছেন?

মুনা কী জবাব দেবে ভেবে পেল না। তাকাল বাকেরের দিকে। বাকের দাঁত বের করে হাসছে। কেন হাসছে কে বলবে। এটা একটা লজ্জায় ফেলার প্রশ্ন, এতে হাসির কিছু নেই।

উকিল সাহেব অ্যাসট্রেতে একগাদা থুথু ফেলে সেদিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রইলেন। যেন এই মুহূর্তে থুথুটায় বিরাট একটা কিছু ঘটবে। সেই ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করতে চান। এক সময় তাঁর দেখা শেষ হল। তিনি গম্ভীর গলায় বললেন চুরি যদি না করে থাকেন তাহলে খালাস করে আনা মুশকিল। আর যদি সত্যি চুরি করে থাকেন সহজেই খালাস হয়ে যাবে।

মুনা অবাক হয়ে বলল, তার মানে?

অপরাধীদের খালাস করা অতি সহজ। এরা যখন অপরাধ করে কিছুটা সাবধান হয়েই করে। কোর্টে অপরাধ প্রমাণ করা কঠিন হয়। আর যারা অপরাধী না, ভাল মানুষ— তারা পড়ে যায় প্যাঁচকলে। হা হা হা।

মুনা অবিশ্বাসী চোখে তাকিয়ে রইল। ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, অপরাধীদের খালাস করে আনার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। আইনের পশ্চাৎদেশে লাথি বসানোর আনন্দ। আমি এটা খুব এনজয় করি।

বাকের শব্দ করে হাসতে লাগল। সে মুগ্ধ। মুনা কিছু বলল না। উকিল সাহেব জড়ানো স্বরে বললেন এই জাতীয় ছোটখাটো মামলা আমি নিই না। তবে আপনারটা নেব।

মুনা একবার ভাবল বলে আমারটা কেন নেবেন? কিন্তু সে কিছু বলল না। উকিল সাহেবের চোখ তার বুকের ওপর স্থির হয়ে আছে। শাড়ির আঁচল টেনে দেয়া উচিত। সেটা অভদ্রতা হবে। এতটা অভদ্র হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। মুনা বলল, আমরা কী তাহলে উঠব?

হ্যাঁ উঠবেন। যাবতীয় কাগজপত্র এবং আসামিকে সঙ্গে নিয়ে আসবেন। কবে আসবেন সেটা আমার মুহুরির কাছ থেকে জেনে যান।

মুহুরি কোথায়?

পাশের ঘরে। আর শুনুন— আমার ফিস কিন্তু বেশি। এবং ফিসের টাকার সবটা আমি অ্যাডভান্স

নেই। আজ এক টাকা কাল আট আনা — এই ভাবে নেই না।

আপনার ফিস কত?

সেটা বলব কাগজপত্র দেখে।

বাকের দাঁত বের করে বলল, একটু স্যার কনসেশন করতে হবে। গরিব মানুষ স্যার ভেরি নিডি।

কনসেশন কিছু নেই। অন্যের বেলায় যা আপনাদের বেলাতেও তা। মাছের বাজার তো না।

মুনা বেরিয়ে এসেই বিরক্ত স্বরে বলল ভেরি নিডি, গরিব মানুষ, এসব বলার দরকার কী?

দরদাম করতে হবে না? বল কী তুমি? বাড়িতে তো তোমার টাকার গাছ নেই।

লোকটাকেও আমার পছন্দ হয়নি। আস্ত ছোটলোক।

ছোটলোক কী বড়লোক এটা দিয়ে আমাদের দরকার কী? আমরা দেখব কাকে দিয়ে কাজ উদ্ধার হয়। এই শালাকে দিয়ে হবে। এ হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ধনুকর।

ধনুকর মানে?

ধনুকর মানে হচ্ছে যে ধুনে দেয়। এই শালা ধুনে দেবে। এক ধাক্কায় মামাকে খালাস করে নিয়ে আসবে। এখন যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে টাকা। মানি। এখন শুরু হবে টাকার খেলা। টাকা-পয়সা কেমন আছে তোমাদের?

মুনা জবাব দিল না। টাকা-পয়সা তেমন কিছু নেই। মামার কাছে ছ'হাজার টাকা ছিল। তার থেকে এখন কত আছে কে জানে। তার নিজের একাউন্টে পাঁচ হাজার টাকার মত আছে। বেতনের টাকা থেকে জমানো। মামির কিছু গোপন সঞ্চয় আছে। তাঁর ভাই তাঁকে ঈদ উপলক্ষে টাকা-পয়সা যা দেন তার সবটাই মামি জমিয়ে রাখেন। একটা পাই পয়সাও খরচ করেন না।

বাকের বলল, কোল্ড ড্রিংক-ট্রিংক কিছু খাবে? ফান্টা, পেপসি?

মুনা বিরক্ত স্বরে বলল— ঠাণ্ডার মধ্যে ফান্টা-পেপসি খাব কী জন্যে?

তাহলে গরম কিছু খাও। চা খাবে?

আমি এখন কিছু খাব না। আপনি চলে যান, আমার অন্য কাজ আছে।

কী কাজ?

এক জায়গায় যাব।

চল আমি দিয়ে আসি। আমার এখন কোনো কাজ নেই, ফ্রি আছি।

আপনি তো সব সময়ই ফ্রি।

বাকের শুকনো মুখে বলল, মামুন সাহেবের কাছে যাচ্ছ? তিনি তো আমার মত ফ্রি না। কলেজ-টলেজ আছে। তাকে কী এখন পাবে?

মামুন সত্যি সত্যি ছিল না। গতকাল রাতের ট্রেনে দেশের বাড়িতে চলে গেছে। কেন গিয়েছে তা মেসের কেউ বলতে পারে না। কাউকে জানিয়ে যায়নি। মুনা বড়ই অবাক হল। এমন হুট করে চলে যাবে? কিছু বলেও যাবে না। কবে ফিরে আসবে তাও কেউ বলতে পারল না।

বেলা সাড়ে এগারোটা। মুনা বাসায় ফিরে যাবার জন্যে রিকশা নিল, কিন্তু মাঝপথে ঠিক করল অফিসে যাবে। পর পর দু'দিন কামাই হয়েছে। আজ নিয়ে তিন দিন হবে। এটা ঠিক না। কিন্তু অফিসে যেতে ইচ্ছা করছে না। কিছুতেই মন বসছে না।

আকাশে মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে বোধ হয়। রিকশাওয়ালা প্রচণ্ড গতিতে রিকশা টানছে। একটা অ্যাকসিডেন্ট-ট্যাকসিডেন্ট বাধাবে। মুনা একবার ভাবল বলবে আস্তে চালাও ভাই। কিন্তু কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। কেন যেন শুধু কান্না পাচ্ছে। দুঃসময়ে কাউকে কাছে থাকতে হয়।

## ১০

শওকত সাহেব সারাদিন কোথায় কোথায় যেন ঘুরে বেড়ান। বাসার সঙ্গে সম্পর্ক নেই বললেই হয়। নাশতা খেয়েই বেরিয়ে পড়েন, ফেরেন সন্ধ্যা মেলাবার পর। কারো সঙ্গে কোনো কথা বলেন না। হাত-মুখ ধুয়ে বারান্দায় ক্যাম্পখাটে শুয়ে থাকেন। বকুল ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে চা দেব?

তিনি হ্যাঁ-না কিছুই বলেন না। তবে চা এনে দিলে নিঃশব্দে খান। আগের মত 'চিনি কম হয়েছে', 'লিকার পাতলা হয়েছে' বলে চেঁচামেচি করেন না। বকুল যদি বলে চায়ের সঙ্গে আর

কিছু খাবে? মুড়ি মেখে দেব? তিনি মৃদু স্বরে বলেন - না লাগবে না।

রাত বাড়তে থাকে। তিনি বারান্দার বাতি জ্বালান না। অস্পষ্ট আলোতে পত্রিকার একটা পাতা চোখের সামনে ধরে রাখেন। বকুলের বড় মন খারাপ লাগে। খুব ইচ্ছা করে বাবার পাশে এসে বসতে, কিন্তু সাহসে কুলোয় না।

আজও তিনি অন্য দিনের মত ক্যাম্পখাটে বসে আছেন। খালি গা। ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। এবার শীত পড়ে গেছে আগেভাগে। শীতে একেকবার তিনি কেঁপে কেঁপে উঠছেন, বকুল একটা পাঞ্জাবি তাঁকে এনে দিল। তিনি যন্ত্রের মত পাঞ্জাবি গায়ে দিলেন। বকুল ভয়ে ভয়ে বলল বাবা তোমার কী শরীর খারাপ? তিনি কিছুক্ষণ থেমে বললেন শরীর ঠিক আছে রে মা। বকুলের চোখ ভিজে গেল। গলা ব্যথা ব্যথা করতে লাগল। আর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে সে হয়ত কেঁদেই ফেলবে। সে মাথা নিচু করে তার মা'র ঘরে ঢুকে পড়ল।

লতিফা বললেন তোর বাবা কী করছে?

বসে আছেন।

মুনা? মুনা এখনো আসেনি?

এসেছে শুয়ে আছে। মাথা ধরেছে।

ওকে একটু ডেকে আন।

বললাম না মাথা ধরেছে। এখন ডাকলে রাগ করবে।

লতিফা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর অসুখ খুবই বেড়েছে। নতুন একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে। শ্বাস কষ্ট। এত বাতাস চারদিকে অথচ প্রায়ই নিঃশ্বাস নেবার মত বাতাসের টান পড়ছে তাঁর। সারারাত এ ঘরের সব ক'টি জানালা খোলা থাকে, ফ্যান চলে ফুল স্পিডে। তবু তিনি বাতাস পান না।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে শ্বাস কষ্ট শুরু হলেই শওকত সাহেব তাঁর পাশে এসে বসেন। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে, তবু তিনি একটা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করেন। লতিফার লজ্জা লাগে। আবার ভালও লাগে।

শওকত সাহেব অনেকদিন পর এ ঘরে ঘুমুতে এলেন। মিনমিন করে একটা অজুহাতও দিলেন বিছানায় পিঁপড়া উঠেছে। লাজুক ভঙ্গি। বিয়ের প্রথম ক'দিন এ রকম হয়েছিল। দীর্ঘদিন পর যেন বিয়ের প্রথম দিকের রাত ফিরে এল। পৃথিবীতে কিছুই বোধ হয় শেষ হয় না। পুরনো ঘটনা আবার ঘুরেফিরে আসে। অর্থহীন কথার্বাতাও তাঁদের মধ্যে হল। লতিফা বললেন, বকুলের বিয়ে সত্যি সত্যি হলে মন্দ হয় না, কী বল? তিনি বললেন, ভালই হয়।

এ রকম ছেলে পাওয়া ভাগ্যের কথা ঠিক না?

হুঁ।

তবে বড় বেশি বড়লোক। এত বড়লোকের সঙ্গে সম্পর্ক করতে ভয় ভয় লাগে।

ভয়ের কী?

শওকত সাহেব অন্ধকারে একটা সিগারেট ধরান। বড় মায়া লাগে লতিফার। ইচ্ছা করে একটা হাত গায়ের ওপর উঠিয়ে দিতে কিন্তু লজ্জার জন্যে পারেন না।

যৌবনের কথা অস্পষ্ট ভাবে তাঁর মনে পড়ে। কত রহস্যময় রাত গিয়েছে। গল্প করতে করতেই কতবার ভোর হল। পাখ-পাখালি ডাকতে লাগল। কতবার আফসোস করেছেন রাতগুলি এত ছোট কেন?

মানুষের সব কিছুই ছোট ছোট। জীবন ছোট। ভালবাসাবাসির দিন ছোট শুধু দুঃখের কাল দীর্ঘ। ভাবতে ভাবতেই নিজের অজান্তে ফুঁপিয়ে ওঠেন। শওকত সাহেব ব্যস্ত হয়ে বলেন কী হয়েছে?

কিছু হয়নি।

শ্বাসের কষ্ট?

হুঁ।

পানি খাবে? পানি এনে দেই?

না, কিছু আনতে হবে না। তুমি ঘুমোও।

লতিফা তার রোগজীর্ণ শ্রীহীন হাত বাড়িয়ে দেন। গত রাতটা তাঁরা দুজন জেগেই কাটিয়েছেন। আজও কী সে রকম হবে?

বকুল কেমন রাগী রাগী মুখ করে বসে আছে বিছানার পাশে। এমন বিরক্ত তার মুখের ভাব যে কিছু বলতেই ভরসা হয় না। তবু লতিফা ক্ষীণ স্বরে বললেন তোর বাবা কী করছে?

একবার তো বলেছি মা; কিছু করছেন । ক্যাম্পখাটে বসে আছে।

ডেকে নিয়ে আয় না।

কী জন্যে?

এমনি। তোকে ডাকতে বলছি ডাক।

বকুল চলে যায়। লতিফা আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করেন। কেউ আসে না এই ঘরে। বকুল নিশ্চয়ই বলেনি কিছু। বাবার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের যোগাযোগ খুব কম। সবাই কেন তাকে এত ভয় পায়? ভয় পাওয়ার মত কী আছে এই মানুষটার?

রাত ন'টার দিকে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়তে লাগল। মুনা ঘুম ঘুম চোখে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দুটো প্যারাসিটামল খেয়েও তার মাথাধরা সারেনি। কেমন যেন বমি বমি ভাব হচ্ছে এখন। হাত বাড়িয়ে সে বৃষ্টির ফোঁটা ধরতে চেষ্টা করল। তার কিছুই ভাল লাগছে না। তবু সে ফুর্তির আগলা একটা ভাব এনে উঁচু গলায় বলল এই বাবু, বৃষ্টিতে ভিজবি? বাবু কিছুই বলল না। বকুলও রাজি হল না।

একা একাই উঠোনে নামল মুনা। বৃষ্টি ফোঁটাগুলি অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা। গা কেঁপে কেঁপে উঠছে। তবুও ভালই লাগছে। বাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে। মুনা আবার ডাকল এই বাবু আয় না। বাবু কোনো জবাব দিল না। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়তে লাগল।

## ১১

স্কুল টিচারদের বাড়ি যে রকম থাকে রেহানা আপার বাড়ি সে রকম নয়। বাড়ি দেখেই মনে হয় স্কুল মাস্টারি তিনি সখের জন্যে করেন। মুনা অবাক হয়ে চারদিক দেখতে লাগল। ভারী ভারী সোফা। লাল কার্পেট ঝকমক করছে। দেয়ালে কামরুল হাসানের ছবি। তিনটি মেয়ে নদীতে নাইতে নেমেছে। রেহানা আপা বললেন অরিজিন্যাল পেইনটিং। মুনা বলল চমৎকার তো!

উনি আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় হন। বাসায় প্রায়ই আসেন।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। তুমি চা-টা কিছু খাও।

জি না। আমার শরীর ভাল না। গলাব্যথা। রেহানা আপা সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহী হলেন।

টনসিল নাকি?

জি।

এক গ্লাস গরম পানির মধ্যে কয়েক দানা লবণ আর পেঁয়াজের রস দিয়ে গার্গল কর, দেখবে সেরে যাবে।

জি আচ্ছা করব।

এখানেই কর, আমি এনে দিচ্ছি।

মুনা না বলবার সময় পেল না। রেহানা আপা ভেতরে চলে গেলেন। মুনা বসে রইল একা একা। এ বাড়িতে অনেক লোকজন। কিন্তু কেউ বসবার ঘরে উঁকি দিচ্ছে না। তবে বেশ কয়েকবারই টের পাওয়া গেল পর্দার ওপাশে কৌতূহলী মেয়েরা উঁকি দিচ্ছে। কৌতূহলের কারণটি স্পষ্ট হচ্ছে না। তারা কী জেনেছে সে বকুলের বোন। যার সঙ্গে এ বাড়ির কোনো একটি ছেলের বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি। সে কথাও জানার কথা নয়। মুনা শুধু রেহানা আপাকেই বলেছে আমি বকুলের বোন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। তিনি নিশ্চয়ই সে কথা বাড়ির ভেতরে সবাইকে বলেননি। তাঁকে সে রকম মনে হয় না।

মুনাকে গার্গল করতে হল। অপরিচিত কোনো বাড়িতে বেড়াতে এসে শব্দ করে গার্গল করা খুব অস্বস্তিকর। কিন্তু উপায় নেই, রেহানা আপা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, এখন একটু আরাম লাগছে না?

জি লাগছে।

এস, আমরা বসার ঘরে না বসে অন্য কোথাও বসি।

চলুন।

রেহানা আপা তাকে দোতলার বারান্দায় নিয়ে এলেন। চমৎকার বারান্দা। ছবির মত সাজানো। ধবধবে সাদা বেতের চেয়ার। ছোট্ট একটা বেতের টেবিল। এই সাত সকালেও টেবিলের ফুলদানিতে টাটকা ফুল রাখা হয়েছে। রোজই কী এ রকম রাখা হয়? রেহানা আপা বললেন বল কী বলবে? মুনা ইতস্তত করতে লাগল। কীভাবে কথাটা শুরু করা যায় বুঝতে পারল না।

কোনো রকম সংকোচ বা লজ্জা করবে না। বল।

বকুলের ঐ বিয়েটার ব্যাপারে খোঁজ নিতে এসেছিলাম। আমার মামা-মামির খুব আগ্রহ।

আমাদেরও আগ্রহ। তোমার বোন মেয়েটি ভাল। একটু বোধ হয় বোকা। সেটাও ভাল। বোকা মেয়েরা বৌ হিসেবে ভাল হয়।

মুনা তাকিয়ে রইল। এই নিয়ে আলাপ চালিয়ে যেতে তার ইচ্ছা হচ্ছে না। তবু সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল আপনারা একবার বলেছিলেন, পনেরো দিনের মধ্যে কাবিনের ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে চান।

হ্যাঁ তা চাই।

আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আপনারা যখন বলবেন তখনই আমরা রাজি আছি।

রেহানা আপা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন একটা বড় রকমের প্রবলেম হয়েছে। তোমার সঙ্গে খোলাখুলি বলি। বকুলের বাবা শুনলাম অ্যারেস্ট হয়েছে। কথাটা বোধ হয় সত্যি। সত্যি না?

জি। ওঁকে একটা মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে।

সেটা তুমি জানো এবং আমরা জানি কিন্তু অন্যরা তো জানে না। তারা নিজেদের মত করে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করবে। করবে না?

জি করবে।

ব্যাপারটা কী রকম সেনসেটিভ বুঝতে পারছ। পারছ না?

পারছি।

ধর, তোমার নিজের একটি ছেলের তুমি বিয়ে দিচ্ছ। বিয়ের এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ দেখলে মেয়ের বাবাকে পুলিশ চুরির দায়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেমন লাগবে তোমার?

আপা ওটা একটা মিথ্যা মামলা। বিশ্বাস করুন।

বিশ্বাস করব না কেন? বিশ্বাস করছি। চা খাও, দাঁড়াও চা দিতে বলি।

মুনা না বলবার আগেই রেহানা আপা চা আনতে ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। চা বোধ হয় তৈরিই ছিল। শুধু চা নয় সঙ্গে প্রচুর খাবার-দাবার।

রেহানা আপা আন্তরিক স্বরে বললেন, খাও কিছু খাও। আমার বাড়ি থেকে কেউ না খেয়ে যেতে পারে না। মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল বিয়েটা তাহলে হবে না?

না। তারা অন্য মেয়ে দেখেছে। কথাও মোটামুটি পাকা করে ফেলেছে।

ও।

দিনাজপুরের মেয়ে। হোম ইকনমিক্সের ছাত্রী। বাবা রিটায়ার্ড সেশন জজ।

মুনা কিছু বলল না। রেহানা আপা বললেন বকুলের বিয়ে নিয়ে চিন্তা করবে না। ওর বিয়ে আমি দিয়ে দেব। এই ছেলের চেয়েও অনেক ভাল ছেলে জোগাড় করব।

কী ভাবে করবেন? ওরাও নিশ্চয়ই বাবা সম্পর্কে জানতে চাইবে।

তা চাইবে। কিন্তু এ সব কথা লোকজন বেশি দিন মনে রাখে না। প্রথম কিছু দিন খুব হৈচৈ হয়, তারপর সবাই ভুলে যায়।

মুনা বলল আমি উঠি।

একটু বস।

আমার অফিসে যেতে হবে দেরি হয়ে যাচ্ছে।

না দেরি হবে না। আমার এক ননদ গাড়ি নিয়ে এসেছে, তাকে বলেছি সে তোমাকে পৌঁছে দেবে।

মুনা বসে রইল। রেহানা আপা বললেন কেইস শুরু হবে করে?

খুব শিগগিরই শুরু হবার কথা।

ভাল উকিল দিয়েছ তো?

দিয়েছি।

আমার নিজের জানাশোনা কিছু উকিল আছে। আমি বললে ওরা বিনা ফি'তে মামলা দেখে দেবে। বলব?

তার দরকার নেই।

বকুল স্কুলে আসে না অনেক দিন থেকে। ওকে স্কুলে আসতে বলবে। পরীক্ষার ডেট দিয়ে দিয়েছে।

মুনা বিস্মিত হল। বকুল স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে তার জানা ছিল না। রেহানা আপা বললেন   বাবা কী করেছে না করেছে তার জন্যে মেয়ে কেন লজ্জিত হয়ে ঘরে বসে থাকবে? তুমি খুব কড়া করে ধমক দিয়ে তাকে স্কুলে পাঠাবে।

জি আচ্ছা।

মুনাকে দিয়ে আবার তিনি গার্গল করালেন; এবং সত্যি সত্যি তার গলাব্যথা অনেকখানি কমে গেল।

সে অফিসে ঢুকল ভয়ে ভয়ে। গত  দু'দিন নানান ছোটাছুটিতে অফিসে আসা হয়নি। ঘন ঘন কামাই হচ্ছে। বড় সাহেবের কানে উঠেছে নিশ্চয়ই। নিজের জায়গায় বসে মুনার ধারণা আরো দৃঢ় হল। সবাই তাকাচ্ছে তার দিকে। পাল বাবু এসে বললেন   বড় সাহেব খোঁজ করেছিলেন আপনাকে।

কবে?

পরশু খোঁজ করলেন। কাল খোঁজ করলেন। আমরা বলেছি অসুস্থ।

কি জন্যে খোঁজ করেছেন   জানেন?

না। যান জেনে আসুন। স্যার আছেন।

মুনা ঠাণ্ডার মধ্যে ঘামতে লাগল।

বড় সাহেব শুকনো গলায় বললেন   বসুন, দাঁড়িয়ে কেন?

মুনা বসল। এই ঘরটায় ঢুকলেই তার এমন অস্বস্তি লাগে দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। সব সময় মনে হয় এক্ষুণি এই ছোটখাটো লোকটি চেঁচিয়ে উঠবে। যদিও কোনো সময়ই তিনি তা করেন না।

শরীর খারাপ ছিল?

জি না স্যার, একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। খুব ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।

ঝামেলাটা কী বলুন? অবশ্যি যদি আপত্তি না থাকে। আপনার ঝামেলার জন্যে অফিসের কাজকর্মের ক্ষতি হচ্ছে। কাজেই আপনার সমস্যা জানার রাইট আমার আছে।

মুনা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল এবং ক্ষীণ স্বরে তার মামার কথা বলল। বড় সাহেব চোখ বন্ধ করে সিগারেট টানতে লাগলেন। তাঁর ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তিনি কিছু শুনছেন না কিন্তু মুনা জানে তিনি খুব মন দিয়েই শুনছেন।

আপনিই সব দেখাশোনা করছেন?

জি।

বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই?

আছে স্যার। আমার ছোট ভাই। খুব ছোট। ক্লাস সেভেনে পড়ে।

মামলাটা শেষ হতে কতদিন লাগবে?

উকিল সাহেব বলেছেন এক মাসের মত লাগবে।

বড় সাহেব সিগারেট অ্যাসট্রেতে গুঁজে রাখলেন। গম্ভীর গলায়, আপনি মেডিক্যাল গ্রাউন্ডে এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করুন। আমি ব্যবস্থা করে দেব। নিজের সমস্যা ভালমত মেটান।

মুনা ক্ষীণ স্বরে বলল, থ্যাংকয়্যু স্যার।

বড় সাহেব সহজ গলায় বললেন, আমরা বাবা মারা যান যখন আমরা সবাই খুব ছোট। সেই সময় আমার বড় বোন শুধু এম.এ. পড়তেন। তিনি একটা চাকরি নেন। নানান রকম ঝামেলার মধ্যে দিয়ে আমাদের বড় করতে থাকেন। তিনি কোনোদিন ঠিকমত অফিসে যেতে পারতেন না। প্রায়ই অফিস কামাই হত। তাঁর বস  প্রতি সপ্তাহেই বলতেন, তোমার চাকরি শেষ। আগামীকাল থেকে আর আসবে না।

মুনা চুপ করে রইল। বড় সাহেব দ্বিতীয় সিগারেট ধরিয়ে হাসি মুখে বললেন, কিন্তু ওটা ছিল মুখের কথা। ঐ বড় সাহেব একজন অসাধারণ মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদেব অনেক সমস্যার সমাধান করলেন এই অজুহাতে যেন আমার আপা ভালমত অফিসের কাজে মন দিতে পারেন। সবাই বলে মানুষের খারাপ সময়ে কাউকে পাশে পাওয়া যায় না। কথাটা ঠিক না। মানুষকে পাশে পাওয়া যায় দুঃসময়ে। আচ্ছা আপনি যান।

স্যার স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম সালাম। যদি কখনো মনে করেন আমাকে দিয়ে কিছু করানো সম্ভব, জানাবেন। আমি করব।

অফিসের বাইরে এসে মুনা চোখ মুছল। বড় সাহেবের এই সামান্য কথা তাকে অভিভূত করেছে। মাঝে মাঝে আমরা অতি অল্পেই অভিভূত হই। নিজের টেবিলে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তারেক এসে উপস্থিত। তার মুখ হাসি হাসি। যেন খুব মজার একটা ঘটনা ঘটেছে। তারেক খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, আপনাকে একটা খবর দেয়া হয়নি, আমি বিয়ে করেছি।

সে কি! কবে?

হুট করে হয়ে গেল। গত পরশু। মায়ের অসুখ শুনে দেখতে গিয়েছিলাম, গিয়ে এই কাণ্ড। তারেক লজ্জিত ভঙ্গিতে মানি ব্যাগ থেকে ছবি বের করল। লম্বা রোগা একটি মেয়ে। মিষ্টি চেহারা। তারেক মৃদু স্বরে বলল, অফিসে আপনিই প্রথম জানলেন, আর কাউকে বলিনি। মুনা অস্পষ্ট স্বরে বলল, খুব সুন্দর বউ হয়েছে।

ছবিতে যত সুন্দর দেখা যাচ্ছে, তত সুন্দর সে না। ফটোজিনিক ফেস আর কী। নাম হচ্ছে তনিমা।

সুন্দর নাম।

ডাকনামটাই সুন্দর। ভাল নাম শুনলে চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে উঠবেন। হা হা হা।

তারেক বেশ শব্দ করে হাসতে লাগল। একজন সুখী মানুষের হাসি। দেখতে ভাল লাগে।

তুমি মনে হয় খুব খুশি?

তা বলতে পারেন। আপনাদের বিয়েটা কবে হচ্ছে আপা?

বুঝতে পারছি না।

শুধু শুধু ঝুলিয়ে রাখবেন না। দি আরলিয়ার দি বেটার।

বিয়ে করার পর এ রকম মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ তা হচ্ছে।

বিয়ের ব্যাপারটা তাহলে খুব খারাপ না?

তারেক মৃদু হাসল। মুনা ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল। অস্পষ্ট ভাবে তার মনে হল মামুন কী তার কাছে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? কী করছে সে এখন গ্রামে? একটা চিঠি লিখবে নাকি? চিঠি লেখার ইচ্ছা দীর্ঘস্থায়ী হল না। প্রচুর কাজ জমে আছে।

## ১২

শওকত সাহেব সকাল থেকে বসে আছেন। উকিল খুব ব্যস্ত, সময় দিতে পারছেন না। বাকের শওকত সাহেবের পাশেই বসে আছে। মাঝে মাঝে বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে আসছে। একবার মুহুরি বলে এল আমাদের একটা কাজ আছে ভাই, কাইন্ডলি একটু দেখেন না। মুহুরি তাকে পাত্তাই দিল না। বাকের একবার ভাবল গরম দেখাবে। কিন্তু জায়গা খারাপ, গরম দেখানো ঠিক হবে না। ডাক্তার এবং উকিল এই দু'জায়গায় গরম দেখানো যায় না।

মামা, চা খাবেন?

শওকত সাহেব হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না।

চলুন গলাটা ভিজিয়ে আসি, দেরি হবে মনে হয়। মারাত্মক উকিল। ভিড়টা কেমন দেখলেন। বিকালের আগে চান্স পাওয়া যাবে না।

শওকত সাহেব চা খেতে গেলেন না। একা একা বসে রইলেন। তাঁর খুব-একটা খারাপও লাগছে না। এমনিতেও তো বসেই থাকতেন। অফিস-টফিসের ঝামেলা তো আর নেই। অবশ্যি গতকাল অফিসে গিয়েছিলেন। কোনো কাজের যাওয়া না, এমনি হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হওয়া।

একুশ বছরের অভ্যাস চট করে ছাড়া মুশকিল। তাঁকে দেখে সাধারণ ভাবে একটা মৃদু উত্তেজনা হল। শমসের আলি হঠাৎ খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন আরে শওকত ভাই যে, আসেন আসেন। চেঁচানোটা এত উঁচু স্বরে হল যে অফিসের সবাই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

কোনো কাজে এসেছেন নাকি?

নাহ্।

কাজ থাকলে বলেন। এতদিনের সম্পর্ক এক কথায় শেষ করে দিলেন। এটা একটা কথা হল?

শমসের আলি জোর করে তাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গেলেন। হঠাৎ করে এই লোকটির এরকম দরদী হয়ে ওঠার কারণ তাঁর কাছে স্পষ্ট হল না।

তারপর বলেন মামলার তদ্বির কেমন চালাচ্ছেন?

চালাচ্ছি।

ঢিল দেবেন না। একটুও ঢিল দেবেন না। নেন সিগারেট নেন।

শওকত সাহেব সিগারেট নিলেন। শমসের আলি গলা অনেকখানি নিচু করে বললেন ভেতরের খবর দেই একটা, সাদেক সাহেবের বিরুদ্ধে মামলা উইথড্র করা হচ্ছে। আগে তো দুজনের বিরুদ্ধে চার্জ ছিল। এখন শুধু আপনার বিরুদ্ধে।

তাই নাকি?

গুজবটা এ রকমই। গত মঙ্গলবারে সাদেক সাহেব অফিসে এসেছিলেন খুব হাসি হাসি মুখ। বিপদ আসে গরিবের উপরে, রুই-কাতলা পার পেয়ে যায়।

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। শমসের আলি নিচু গলায় কথা চালিয়ে যেতে লাগলেন একজনকে উইথড্র করা মানে কেইস দুর্বল করা। চোখ বন্ধ করে ঘুমান, খালাস পেয়ে যাবেন। শুধু খালাস না। চাকরিও ফেরত পাবেন। নাইন্টি নাইন পারসেন্ট গেরান্টি।

শওকত সাহেব প্রায় তিন ঘণ্টার মত সময় বিনা কারণে অফিসে বসে কাটালেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন সবাই খুব অস্বস্তি বোধ করছে, তবু তাঁর চলে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

তাঁর চেয়ারে নতুন একটি ছেলে এসেছে। প্রথম চাকরিতে ঢুকেছে বোধ হয়। কিছুই জানে না। বার বার চেয়ার ছেড়ে উঠে অন্যদের জিজ্ঞেস করছে। এইসব অল্প বয়সী ছোকড়া দিয়ে কাজ হয়? ফাইলিং শিখতেই এক বছর লাগবে।

উকিল সাহেবের কাছে তাদের ডাক পড়ল একটার দিকে। উকিল সাহেব টিফিন-ক্যারিয়ার খুলে আলু ভাজা এবং পরোটা খাচ্ছেন। এত নামী ডাকি একজন মানুষ আলুভাজা এবং পরোটা দিয়ে লাঞ্চ খায় শওকত সাহেবের ধারণা ছিল না। উকিল সাহেব দরাজ গলায় বললেন, বসেন বসেন, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বাকের হাত কচলে বলল স্যার ভাল আছেন?

ভালই আছি।

আমাদের কেইসটা দেখেছেন?

হ্যাঁ দেখলাম। কনভিকসন হবে না। নিশ্চিন্ত থাকেন। এই কেইসে যদি আমার ক্লায়েন্টের কনভিকসন হয় তাহলে তো আমাকে ওকালতি ছেড়ে কাঠমিস্ত্রি হতে হবে। হা হা হা।

উকিল সাহেবের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বাকেরও হাসল। সে মুগ্ধ। শওকত সাহেব ক্ষীণ স্বরে বলল, চাকরি ফিরে পাব?

কনভিকসন না হলে নিশ্চয়ই ফিরে পাবেন। কনভিকসন না হওয়ার মানে হল আপনি অপরাধী নন। যে অপরাধী না তার চাকরি থাকবে না কেন? তবে ওরা যদি কোর্টে না এসে ডিপার্টমেন্টাল অ্যাকশন নিত, তাহলে চাকরি থাকত না। ওরা সেটা নেয়নি। কোর্টে এসেছে। আপনার জন্যে শাপে বর হয়েছে। কোনো রকম দুঃশ্চিন্তা করবেন না। ভরসা রাখেন আমার ওপর।

বাকের দাঁত বের করে বলল, আপনার ওপরই স্যার ভরসা। নব্বই পারসেন্ট ভরসা আপনার ওপর। আর দশ পারসেন্ট আল্লার ওপর।

উকিল সাহেব বাকেরের কথা পছন্দ করলেন বলেই মনে হয়। তিনি তাঁর পান খাওয়া কালো কালো দাঁত বের করে হো হো করে হাসতে লাগলেন। যেন খুব-একটা মজার কথা।

বকুল অনেকদিন পর টিনা ভাবীর বাসায় এসেছে। সাড়াইটা বাজে। বেড়াতে আসার মত সময় নয়। কিন্তু টিনা ভাবীর বাসায় তার অসময়ে আসতেই ভাল লাগে। বকুল কড়া নেড়ে চুপ করে

দাঁড়িয়ে রইল। দরজা খুলল এক অপরিচিত মেয়ে। টিনা ভাবীর বোন হবে। তাঁর মত দেখতে।

টিনা ভাবী আছে?

আছে। ঘুমাচ্ছে।

বকুল সরাসরি শোবার ঘরে ঢুকে গেল। টিনা ঘুমাচ্ছিল না। শেষ পর্যায়ে এসে সে খুব কাহিল হয়ে পড়েছে। চিৎ হয়ে ছাড়া ঘুমুতে পারে না। কাত হয়ে শুলেই মনে হয় পেট শরীর থেকে খসে আসবে। সে বিরক্ত স্বরে বলল, বকুল তুই কী মনে করে?

কেমন আছ ভাবী?

জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগে না? এত দিন পর তুই কী মনে করে এলি?

আসতে ইচ্ছা করছিল না ভাবী। কোথাও যাই না আমি। স্কুলেও যাই না।

তোর বাবা দোষ করেছে, তুই তো করিসনি?

বাবা কিছু করেনি।

তোদের আচার-আচরণে তো এরকম মনে হয় না। ঐ দিন বাবু যাচ্ছিল বাসার সামনে দিয়ে। আমি এত ডাকলাম, সে ফিরেও তাকাল না। এ রকম ভাব করল যেন শুনতে পায়নি।

বকুল প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল তোমার পেট তো ভাবী হিমালয় পর্বতের মত হয়ে গেছে।

তা হয়েছে। আগে ভেবেছিলাম যমজ, এখন মনে হচ্ছে যমজ না, তিনজন বাস করছে। তিন বাচ্চাকে কী বলে ট্রিমজ?

বকুল খিলখিল করে হেসে ফেলল। বহুদিন এমন প্রাণ খুলে সে হাসেনি। সে সন্ধ্যা পর্যন্ত টিনা ভাবীর সঙ্গে থাকল। বাচ্চাদের জন্যে কাঁথা বানানো হল খানিকক্ষণ। খানিকক্ষণ ছাদে বসে গল্প হল। তেঁতুল এবং কাঁচা কলার ভর্তা বানিয়ে মহানন্দে খাওয়া হল। এ বড় সুখের সময়।

টিনা একসময় বলল, তুই একবার আমার সঙ্গে সারারাত থাকবি। রাত জেগে গল্প করব।

কী গল্প?

কিছু কিছু গল্প রাতেই করতে হয়; সেই সব গল্প।

টিনা রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। বাড়ি ফেরার আগে বকুল হঠাৎ নিচু স্বরে বলল, আচ্ছা ভাবী, যদি কোনো মেয়ের কোনো ছেলেকে ভাল লাগে তাহলে তার কী করা উচিত? ধর ছেলেটার মেয়েটাকে ভাল লাগছে না। শুধু মেয়েটারই লাগছে।

টিনা বেশ কিছু সময় চুপ চাপ থেকে বলল মেয়েটা যদি তোর মত সুন্দরী হয় তাহলে তার উচিত একদিন ভাল লাগার ব্যাপারটি ছেলেটিকে বলা।

আর যদি অসুন্দর হয়?

টিনা জবাব দিল না। সহজ ভাবেই অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে এল।

তোর বিয়ের কী হল?

কিছু হয়নি।

এর জন্যে কী তোর মন খারাপ?

নাহ্।

বকুল বাড়ি ফিরল মন খারাপ করে। যদিও মন খারাপ করার মত কিছুই ঘটেনি সেখানে।

বাবু আজ স্কুলে যায়নি।

অথচ সকাল বেলা বই-খাতা নিয়ে বের হয়েছে। স্কুলের গেট পর্যন্ত গিয়ে নান্টুকে বলল আমার মাথা ধরেছে, আজ যাব না। অথচ তার মাথা ধরেনি।

সে অন্যমনস্কভাবে এদিক-ওদিক খানিকক্ষণ ঘুরল। স্কুলের লাগোয়া মিউনিসিপ্যালিটির একটি শিশু পার্ক আছে। সেখানে বসে রইল একা একা। এখান থেকে স্কুলের ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। সেকেন্ড পিরিয়ড শেষ হবার ঘণ্টা শুনে সে পার্ক থেকে বেরুল।

রাস্তার পাশে একজন বুড়ো মানুষ ম্যাজিক দেখিয়ে নিম টুথ পাউডার বিক্রি করছিল। সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখল। পুরনো ধরনের ম্যাজিক। চারটা হরতনের বিবি চারটা টেক্কা হয়ে যায়। দড়ি মাঝখানে কেটে রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখার পর সেই দড়ি জোড়া লেগে যায়। এই সব হাবিজাবি। বুড়োটা যখন বলল বাচ্চা লোগ তালি লাগাও। তখন সে চলে এল। ছেলে-বুড়ো সবাই মহানন্দে তালি দিচ্ছে, তার তালি দিতে ইচ্ছা করছে না।

হঠাৎ করে তার মন খারাপ লাগছে। বাবুর ইচ্ছা করল হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে কোথাও চলে যায়। দূরের সেই অচেনা দেশে থাকবে শুধু অপরিচিত মানুষ। কেউ তাকে চিনবে না। সেও চিনবে না কাউকে। কেউ ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের স্ত্রীর মত জিজ্ঞেস করবে না তোমাদের সংসার এখন কে চালাচ্ছে বাবু? কিংবা আলমের বাবার মত কেউ বলবে না তোমরা নাকি এই বাসা বদলি করছ? সত্যি নাকি?

বাবুর ইচ্ছে হচ্ছিল বলে, আমরা এ বাড়ি ছাড়লে আপনার কী? কিন্তু সে কিছু বলেনি। সে মুনা আপার মত না। কারো মুখের ওপর সে কথা বলতে পারে না। শুধু চাপা একটা রাগ হয়। রাগের জন্যে মাথা ধরে যায়। প্রথম দিকে অল্প অল্প ধরে, তারপর যন্ত্রণাটা বাড়তে থাকে। ধ্বক ধ্বক শব্দ হয়ে মাথায়। পুলের উপর ট্রেন গেলে যে রকম শব্দ হয় সে রকম শব্দ।

ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না। সেদিন ক্লাসের ইরাজুদ্দিন স্যার হঠাৎ বললেন এই তোর বাবা নাকি জেল হাজতে, সত্যি নাকি? বাবুর কান্না এসে যাচ্ছিল, সে বহু কষ্টে কান্না সামলাল। স্যার আবার বললেন সত্যি নাকি রে? বাবু চাপা স্বরে বলল, সত্যি না স্যার। বাবুদের ক্লাস ক্যাপ্টেন বলল, মামলা চলছে স্যার। রায় হয় নাই। পড়া বাদ দিয়ে ইরাজুদ্দিন স্যার মামলার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে উঠলেন এবং সবশেষে অন্য সবার মত বললেন, সংসার চলছে কী ভাবে?

বাবু মনে মনে বলেছিল, আমাদের সংসার যে ভাবেই চলুক তাতে আপনার কী স্যার? আপনি কেন সবার সামনে এইসব কথা বলবেন? কেন আপনি অন্য রকম ভাবে তাকাবেন? কেন আমার বাবার নামে আজেবাজে কথা বলবেন?

কেউ অবশ্যি তার মনের কথা শুনতে পেল না। ভাগ্যিস কেউ মনের কথা টের পায় না। এক সময় ইরাজুদ্দিন স্যার সমাজ পাঠ পড়াতে শুরু করলেন। সে পড়া বাবুর কানে ঢুকল না তার মাথাব্যথা শুরু হয়েছে। এবং এত দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে যে বাবুর মনে হচ্ছে এই ক্লাস শেষ হবার আগেই মারা যাবে।

সেটা খুব-একটা খারাপ হবে না বোধ হয়। মরার কথা মনে হলেই আগে তার ভয় লাগত। এখন সে রকম লাগে না।

কড়া রোদ উঠেছে। কিন্তু বাতাস ঠাণ্ডা। বাবু উদ্দেশ্যহীন ভাবে এগোতে লাগল। আজ প্রথম যে সে এ রকম করেছে তা না। আগেও কয়েকবার সে স্কুল ফাঁকি দিয়ে হেঁটে হেঁটে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়েছে। একবার তো লালবাগ কেল্লার কাছে এসে পথ হারিয়ে ফেলল। যা ভয় লেগেছিল। ছেলে ধরার মত দেখতে একটা লোক তার পিছু পিছু আসছিল। আজ অবশ্যি পিছু পিছু কেউ আসছে না। সকালবেলা সবাই নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। বিকালবেলার দিকে এরকম একা একা হাঁটলে কম হলেও দু'তিনজন লোক জিজ্ঞেস করবে, কী খোকা কোথায় যাচ্ছ? আজ এখনো কেউ সে রকম কিছু জিজ্ঞেস করেনি।

শাহবাগের কাছে এসে বাবু দেখল বড় মামা হকারের কাছ থেকে পত্রিকা কিনছেন। সে দ্রুত উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করল। তাকে দেখলেই বড় মামা এক লক্ষ প্রশ্ন করবেন। শুধু প্রশ্ন না, এমন কথা বলবেন যা শোনা মাত্রই মাথা ধরে যাবে।

বড় মামাকে সে কোনোদিনই পছন্দ করেনি। মুনা আপার সঙ্গে গণ্ডগোলটার পর সে ঠিক করে রেখেছে, কোনোদিন বড় মামার সঙ্গে সে কথা বলবে না। মরে গেলেও না।

বড় মামার সঙ্গে মুনা আপার গণ্ডগোলটার প্রথম অংশ বাবু দেখতে পায়নি। সে গিয়েছিল বিসকিট, চানাচুর কিনতে মামা এসেছেন, তাঁকে শুধু চা তো দেয়া যায় না। মামা অবশ্যি এসব কিছুই মুখে দেবেন না। চায়ের কাপে তিন চারটা চুমুক দিয়ে উঠে পড়বেন, তবু তাঁকে শুধু চা দেয়া যাবে না।

বাবু বিসকিটের ঠোঙা নিয়ে ঘরে ঢুকেই শোনে বড় মামা চিবিয়ে চিবিয়ে বলছেন, উকিল-টুকিল সব তুমিই ঠিক করেছ? মুনা আপা বলল হ্যাঁ।

স্ত্রী-বুদ্ধিতে সংসার চলছে এখন?

কী করবে মামা, পুরুষ-বুদ্ধির কাউকে তো পাওয়া গেল না। কেউ তো সাড়া শব্দ করল না।

সাড়াশব্দ করবে কী ভাবে? কেউ কী কখনো এসেছে আমার কাছে?

আপনার কাছে যেত হবে কেন মামা? আপনার তো নিজেরই আসা উচিত

উচিত-অনুচিত আমার শিখতে হবে তোমার কাছ থেকে?

শিখতেই যে হবে এমন কোনো কথা নেই, আপনার শিখতে ইচ্ছে না হলে শিখবেন না।

মুখ সামলে কথা বল।

আমার সঙ্গে এমন চিৎকার করে কথা বলবেন না। আশপাশে লোকজন আছে, ওরা কী মনে করবে?

মামা রেগে অস্থির হয়ে এমন সব কথা বলতে লাগলেন যে, বাবুর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরে গেল। বকুল কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল বড় মামা, ছিঃ ছিঃ আপনি মুনা আপাকে এসব কী বলছেন? বড় মামা কাঁপতে কাঁপতে বললেন ঠিকই বলেছি। একটা কথাও ভুল বলিনি। তোমাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না এই সব কারণে।

সেই রাতটা যে কী খারাপ কেটেছে বাবুর। মুনা আপার জন্যে এমন কষ্ট হয়েছে। মনে হয়েছে মুনা আপাকে জড়িয়ে ধরে সে খানিকক্ষণ কাঁদে। মুনা আপা অবশ্যি খুব শক্ত মেয়ে। মা যখন বললেন কিছু মনে করিস না মুনা, রাগের সময় মানুষের মাথা ঠিক থাকে না। তখন মুনা আপা বেশ সহজ ভাবেই বলেছে এসব আমি পাত্তা দেই না। যার যা ইচ্ছা বলুক।

মুনা আপা যে এসব জিনিস একেবারেই পাত্তা দেয় না, তাও ঠিক না। গভীর রাতে বাবু বাথরুমে যাবার জন্যে জেগে উঠে দেখে মুনা আপা বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আছে। অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তবু বাবু পরিষ্কার বুঝল তার গাল ভেজা।

মুনা আপা তাকে দেখে বলল কী, বাথরুম?

হুঁ।

এক রাতে তিনবার চারবার বাথরুমে যাস, তোর ডায়াবেটিস নাকি?

বলতে বলতেই মুনা আপা শব্দ করে হাসল। কী সহজ স্বাভাবিক আচরণ। যেন তার কিছুই হয়নি। এমনি এমনি বারান্দায় বসে আছে। বাবু ভয়ে বলল, তোমার মন খারাপ আপা?

না। মন খারাপ হলে বারান্দায় বসে থাকব কেন? মন ভাল করার জন্যে বারান্দায় কিছু আছে নাকি? ঘুম আসছে না তাই বসে আছি।

ঘুম আসছে না কেন?

কী মুশকিল, ঘুম আসছে না কেন সেটা আমি কী করে বলব? আমি কী ডাক্তার?

দুপুর বারোটার দিকে বাবু মগবাজার চৌরাস্তায় উপস্থিত হল। আর হাঁটতে ভাল লাগছে না। এখন আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে রওনা হওয়া যেতে পারে। যে পথে এসেছে সেই পথেই যাবে না অন্য কোনো পথ ধরবে এটা ঠিক করতে বাবুর কিছু সময় কাটল। চেনা পথ ধরে ফেরাই ভাল। কিন্তু নান্টু সব সময় বলে যে পথে আসা হয়েছে সে পথে ফিরে যেতে নেই। সে পথে ফিরলে বিপদ হয়। বাবু কী করবে বুঝতে পারছে না। ঠিক তখন সে একট অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখল। তার বাবা আইসক্রিমওয়ালার কাছ থেকে আইসক্রিম কিনছেন। নিজের জন্যেই কিনছেন নাকি? বাবুর উচিত পালিয়ে যাওয়া, কিন্তু সে মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে রইল। বাবা একবার তাকালেন তার দিকে। তাঁর চোখে-মুখে চিনতে পারার কোনো লক্ষণ ফুটে উঠল না। তিনি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মত লাল রঙের আইসক্রিমটি কামড়ে কামড়ে খেতে লাগলেন। তাঁর বগলে একটি ছাতা। প্রচণ্ড রোদেও ছাতা না খুলে নিশ্চয়ই প্রচুর হাঁটাহাঁটি করেছেন। ঘামে ভেজা মুখ হয়েছে আয়নার মত চকচকে। তিনি আইসক্রিম হাতে রাস্তা পার হলেন। রাস্তা পার হওয়াও শিশুদের মত। কোনো দিকে না তাকিয়ে হঠাৎ ছুটলেন। একজন বয়স্ক মানুষ শিশুদের মত এতগুলো কাণ্ড একসঙ্গে কিভাবে করে?

বাবু নিজের অজান্তেই ডাকল, বাবা।

শওকত সাহেব থমকে দাঁড়ালেন। সামনেই দাঁড়িয়ে, তবু তিনি যেন তাকে চিনতে পারছেন না।

তুই এখানে!

বাবু জবাব দিল না। শওকত সাহেব জবাবের জন্য অপেক্ষাও করলেন না। সহজ ভাবে বললেন, আইসক্রিম খাবি?

না।

হঠাৎ তৃষ্ণা লেগে গেল।

যেন তিনি ছেলের কাছে কৈফিয়ত দিচ্ছেন।

খা একটা আইসক্রিম। এ্যাই, এ্যাই আইসক্রিমওয়ালা।

বাবুকে আইসক্রিম নিতে হল।

আমাদের সময় লালগুলি দু'পয়সা দাম ছিল, দুধ মালাই একটা ছিল এক আনা করে। চল বাসায় যাই। হেঁটে যেতে পারবি, না রিকশা নেব?

হাঁটতে পারব।

রিকশার চেয়ে হাঁটাটাই আরাম। রিকশায় অ্যাকসিডেন্টের ভয়। পেছন থেকে একটা ট্রাক এসে ধাক্কা দিলে অবস্থা কাহিল।

বাবু সারাক্ষণই ভাবছিল এই বুঝি বাবা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন, এইখানে কী করছিলি? স্কুলে যাসনি কেন? কিন্তু শওকত সাহেব কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। বরং তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হল ছেলেকে হঠাৎ রাস্তায় পেয়ে তিনি বেশ খুশি।

রোদ লাগছে নাকি বাবু?

না।

রোদ লাগলে বলিস, সঙ্গে ছাতা আছে। তবে শরীরে রোদ লাগা ভাল। ভিটামিন ডি আছে। এতে শরীরের হাড্ডির খুব পুষ্টি হয়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এই যে ভিখারিগুলো দেখছিস? সারাদিন হাঁটাহাঁটি করে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখ অসুখ-বিসুখ হয় না।

বাবু অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাল, এমন অদ্ভুত ভাবে কথাবার্তা বলছেন কেন?

আমি সকালবেলা ঘর থেকে বের হয়েই হাঁটা শুরু করি। দুপুর পর্যন্ত হাঁটি আর শরীরে রোদ লাগাই। খুব উপকারী।

বাবু কোনো কথা বলল না। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। শওকত সাহেব খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বললেন, জেলে কত দিনের জন্যে নিয়ে রাখে কোনো ঠিক আছে? তখন রোদও পাওয়া যাবে না, হাঁটাহাঁটিও করা যাবে না।

শওকত সাহেব একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। বাবুর হঠাৎ মনে হল বাবা শুধু কথাবার্তাতেই না দেখতেও কেমন যেন অচেনা মানুষের মত হয়ে গেছেন। হাঁটছেন কেমন কুঁজো হয়ে। অস্বাভাবিক লম্বা লম্বা পা ফেলছেন।

## ১৩

অনেক দিন পর জলিল মিয়ার চায়ের দোকানে বাকের এসে ঢুকল। আগে রোজ সন্ধ্যায় তাদের একটা আড্ডা বসত। তিন-চার বছর ধরে ভাঙন ধরেছে। একজন একজন করে খসে পড়তে শুরু করেছে। আশফাকের মত ছেলেও বিয়ে করে মদন বলে এক জায়গায় পড়ে আছে। শ্বশুরের সঙ্গে নাকি কাঠের বিজনেস করে। এক বছরের ওপর হয়েছে তার কোনো খোঁজ নেই। নির্ঘাৎ বাচ্চা বাঁধিয়ে ফেলেছে বাই দিস টাইম।

শেষপর্যন্ত টিকে ছিল ইয়াদ। তারও দিন শেষ। সকাল-বিকাল চাকরি করছে। ব্রিফকেস নিয়ে ট্যুরে যাচ্ছে। শালা। পুরোপুরি ভেড়ুয়া হয়ে গেছে। দেখা হলেই আই.এ. পাস মেয়ের কথা শুরু হয়। নানান ধরনের গল্প। পরশুদিন একটি শুনল এ রকম, ইয়াদ নিউ মার্কেটে গিয়ে দেখে তার সেই আই.এ. পাস একজন বান্ধবীকে নিয়ে শাড়ির দোকানে ঘুরছে। তারা যাতে ইয়াদকে চিনতে না পারে সে জন্যে সে চট করে সানগ্লাস পরে ফেলল। কিন্তু মেয়েটি ঠিকই চিনল। কী সব বলল তার বান্ধবীকে। সেই বান্ধবী তার দিকে চোখ ড্যাব করে তাকাতে লাগল।

অসহ্য। গল্প শুনলেই ইচ্ছা করে একটা চড় বসিয়ে দিতে। ড্যাব ড্যাব করে তাকাচ্ছিল। ড্যাব ড্যাব করে তাকানোর মাল হচ্ছ তুমি। শালা। ফকরামির জায়গা পায় না।

জলিল মিয়ার চায়ের স্টলে ইয়াদ বসে ছিল। তার গায়ে কালো কোট। গলায় লাল রঙের টাই। ক্লিন শেভড। মুখে ক্রিম ঘষেছে বোধ হয়। ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। বাকেরকে দেখে সে হকচকিয়ে গেল। বাকের অবহেলার ভঙ্গিতে বলল, তুই এখানে।

আসলাম। দেখা-সাক্ষাৎ হয় না।

সাজ-পোশাক তো মাশাআল্লাহ ভালই চড়িয়েছিস।

আর বলিস কেন। ওদের বাড়ি থেকে আমাকে দেখতে আসবে। ওর এক দূর সম্পর্কের চাচারও আসার কথা। এক্স মিনিস্টার এল রহমান।

দেখতে আসবে তো তুই এখানে কেন? চায়ের দোকানে দেখতে আসবে নাকি?

বাসায় তো আর সেজেগুজে বসে থাকা যায় না। মনে করবে ইচ্ছে করে সেজে বসে আছি। ওরা এলে রঞ্জু এসে এখান থেকে ডেকে নিয়ে যাবে। ভাবটা এ রকম যেন বাইরে ছিলাম, বাসায় এসেছি।

বাকের চায়ের অর্ডার দিল। ইয়াদের কোনোদিকে দৃষ্টি নেই। সে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। পাঁচ মিনিটের মাথায় তিনবার বলল, এত দেরি হওয়ার তো কথা না। এসে গেছে নাকি? বলে এসেছি জলিলের চায়ের দোকানে খোঁজ করতে। কোথায় না কোথায় খুঁজছে কে জানে। রঞ্জু হারামজাদা মহা বেকুব।

উত্তেজনায় ইয়াদ একটা ফাইভ ফাইভ সিগারেট উল্টোদিকে ধরিয়ে ফেলল। বাকের দেখেও কিছু বলল না। ফিল্টারের ধোঁয়া খেয়ে কেশে মরুক। বাকের উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। জলিল মিয়া বলল, বাকের ভাইকে নতুন পাত্তি দিয়া আর এক কাপ চা দেই?

না চা লাগবে না।

খান বাকের ভাই। চা এক কাপ যা দশ কাপও তা।

বাকের কিছু বলল না। জলিল মিয়া টেনে টেনে বলল, তারপর দেশের খবরাখবর কিছু বলেন।

বাকের বিরক্তমুখে তাকাল। জলিল মিয়ার স্টলে রাজনৈতিক আলাপ নিষিদ্ধ। দুই-তিন জায়গায় এই কথাগুলো ফ্রেম করে বাঁধানো, কিন্তু রাজনীতিতে জলিল মিয়ার নিজের খুব উৎসাহ। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে মার্শাল ল' ছাড়া এই দেশের কোনো উপায় নেই। কিন্তু এই কথাটা নিজে বলতে পারে না, অন্যের মুখে শুনতে চায়।

আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি কেমন হইছে দেখছেন বাকের ভাই। সিভিল গভর্মেন্টের ক্ষমতা নাই ঠিক করার। সে পরিস্থিতি ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করা ছাড়া উপায় নাই।

বাকের তিক্ত স্বরে বলল, উপায় না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করে দিলেই হয়। পায়ে ধরে কেউ সাধছে?

জলিল মিয়া খুব অপ্রস্তুত হয়। বাকেরের বিরক্তির কারণ ঠিক বুঝতে পারে না। সে কাউকে বিরক্ত করতে চায় না। বাকেরের কাউকে তো নয়ই।

ইয়াদ বলল, ক'টা বাজে দেখ তো বাকের। শালা এত দেরি করছে কেন?

বাকের কোনো উত্তর না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর মুখে বলল, যাই। ইয়াদ বলল, এত সকাল সকাল যাচ্ছিস কোথায়? বস না। শালা এ তো দারুণ টেনশনের মধ্যে পড়লাম।

কাজ আছে।

তোর আবার কী কাজ?

খুব-একটা খারাপ কথা বাকেরের মুখে এসে গিয়েছিল। সে সেটা বলল না। ইয়াদ হারামজাদাটার সঙ্গে মুখ খারাপ করে কোনো ফয়াদা নেই।

রাস্তা অন্ধকার। সব ক'টি লাইটপোস্টের বাতি আবার চুরি হয়েছে। এই এক সপ্তাহের মধ্যে দুইবার বাতি চুরি গেল। চোরের উপদ্রবটা বড় বেশি হচ্ছে। বাকেরের ধারণা কাজটা করে মিউনিসিপ্যালিটির লোকেরা। মই ফিট করে কোন চোর যাবে বাল্ব চুরি করতে? ধরতে হবে একবার শালাদের। মামদোবাজি বের করে দিতে হবে।

বাকের দেয়াশলাই বের করে ঘড়ি দেখল, ঘড়ি ঠিকই চলছে। আটটা পঁয়ত্রিশ। এত সকাল সকাল বাড়ি গিয়ে হবেটা কী? লাভের মধ্যে লাভ হবে বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। এবং লাট সাহেব বড় ভাই মুখটাকে এমন করবে যেন ভূত দেখছে। বড় অফিসার এদের মেজাজ-মর্জিই অন্য রকম।

রাত এগারটার পর বাড়িতে যাওয়ার অনেক সুবিধা। কারো সঙ্গেই দেখা হয় না। খাবার ঢাকা দেয়া থাকে। খেয়েদেয়ে লম্বা হয়ে পড়লেই সব সমস্যার সমাধান।

সকাল দশটার দিকে ঘর থেকে বেরুলে বড় ভাইয়ের সঙ্গে দেখা না করে দিন পার করে দেয়া যায়। অবশ্যি ভাবীর সঙ্গে দেখা হয়। সূর্যের চেয়ে বালির উত্তাপ বেশি, সেই কারণেই ভাবীর মেজাজ থাকে আকাশে। তিনি সহজ ভাবে বাকেরের সঙ্গে কোনো কথাই বলতে পারেন না। যাও বলেন এমন সব ভাষা ব্যবহার করেন যে বাকেরের প্রতিদিনই একবার বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে। সেই ইচ্ছা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কারণ বাকের মেয়েমানুষের কথার কখনোই তেমন কোনো

গুরুত্ব দেয় না। মেয়ে মানুষের কাজই হচ্ছে বেশি কথা বলা এবং ফালতু কথা বলা। ফালতু কথাকে এমন গুরুত্ব দিলে চলে?

বাকের সিগারেট ধরাল। প্যাকেটে আর তিনটা সিগারেট আছে, রাত কাটবে না। ঘুম ভাঙলেই তার সিগারেটের তৃষ্ণা হয়। কিন্তু এখন আবার হেঁটে হেঁটে মোড় পর্যন্ত যেতে ইচ্ছা করছে না।

ফজলু সাহেবের বাসার সামনে একটা ছোটখাটো ভিড়। বাকের এগিয়ে গেল। বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েলি গলায় কান্নার শব্দ।

কী হয়েছে?

কী হয়েছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। ফজলু সাহেবের পোয়াতী স্ত্রী নাকি খাট থেকে পড়ে গিয়েছে। ফজলু সাহেব গিয়েছেন অ্যাম্বুলেন্স আনতে। বাকেরের বিরক্তির সীমা রইল না। ধামসী এক মহিলা খাট থেকে পড়ে যাবে কেন? কচি খুকু তো না। অ্যাম্বুলেন্স আনতে গেছে মানে? আনতে গেলেই অ্যাম্বুলেন্স চলে আসে নাকি? চলে এলে তো কাজই হত। হাসপাতালে সত্যি সত্যি নিতে হলে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাতে করেই নিতে হবে।

বাকের ছুটল বেবিটেক্সি ধরে আনতে। এই বেবিটেক্সিতেই টিনার যমজ ছেলে হল।

বাকের দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলল, বেকুব মেয়েছেলেদের নিয়ে মুসিবত।

বাচ্চা কার মত হয়েছে বকুল? আমার মত না তো ভাইয়ের মত?

কারো মতই না।

বকুল উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল টিনার দিকে। টিনা ভাবী কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। কী চমৎকার মায়া মায়া চেহারা হয়েছে টিনা ভাবীর।

দুজনকে সামলাবে কী ভাবে?

টিনা হাসতে হাসতে বলল, একটাকে তুই নিয়ে যা। অরুণকে নিয়ে যা। অরুণ বড্ড জ্বালায়।

অরুণ কোনটি?

বাঁ পাশেরটি।

দুজনই তো এক রকম।

দূর-দূর এক রকম হবে কেন? চেহারা দু'রকম, কাঁদে দু'রকম করে। ওদের গায়ের গন্ধও দু'রকম।

কী যে তুমি বল ভাবী।

ঠিকই বলি। নে তুই অরুণকে নিয়ে যা।

সত্যি সত্যি কিন্তু নিয়ে যাব।

নিয়ে যাবার জন্যেই তো বললাম। তুই কী ভাবছিস ঠাট্টা করছি?

বকুল খুব সাবধানে একজনকে কোলে তুলল! কী চমৎকার একটা ঘ্রাণ আসছে গা থেকে। বাসি শিউলী ফুলের ঘ্রাণ এত মায়া লাগে কেন? বকুলের চোখে পানি আসার উপক্রম হল।

তোর ভাই যমজ বাচ্চা হওয়া উপলক্ষে আমাকে যমজ শাড়ি দিয়েছে। বাচ্চা-কাচ্চা হলে বউকে শাড়ি দিতে হয় জানিস তো?

না। জানি না।

দিতে হয়। কষ্ট করে বাচ্চা আনে সেই জন্যে দেয়া। দেখ তো শাড়ি দুটো কেমন।

দুটি একই রকম শাড়ি। নীল জমিনের ওপর সাদা ফুল।

খুব সুন্দর ভাবী, তোমাকে দারুণ মানাবে।

একটা শাড়ি তুই নিবি?

বকুল বিব্রত স্বরে বলল, আমি নেব কেন? কষ্ট করবে তুমি, শাড়ি নেব আমি?

দুটাই তো আর নিচ্ছিস না। একটা নিচ্ছিস।

না ভাবী প্লিজ।

না নিলে আমি খুব রাগ করব, ক'দিন কথা বলব না তোর সাথে। তোকে দেবার জন্যেই তোর ভাইকে বলে আমি দুটি শাড়ি আনিয়েছি। শুধু শাড়ি না, ব্লাউজ-পেটিকোট সবই আছে। যা, কাপড় বদলে আয়।

বকুলকে শাড়ি পরে আসতে হল। টিনা দীর্ঘ সময় তার দিকে তাকিয়ে বলল, এখন যা ঐ ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে পেপসি খেয়ে আয়।

বকুলের মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। টিনা বিরক্ত স্বরে বলল তুই কী ভাবছিস কেউ কিছু টের পায় না। সবাই সব কিছু টের পায়। তোর ভাইয়ের কাছে শুনলাম। সে দেখেছে তুই ঐ ডাক্তার ছোকরার সঙ্গে বসে কোক না পেপসি কি যেন খাচ্ছিস, আর খুব হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করছিস।

বকুলের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। এসব কি বলছে ভাবী। কিন্তু টিনা খুব স্বাভাবিক। বাচ্চার নাভিতে বরিক পাউডার দিতে দিতে বলল, কিছু মানুষই আছে যারা শুধু অল্প বয়সী মেয়েদের সঙ্গে ছোঁক ছোঁক করতে চায়। প্রথমে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, তারপর গায়ে-টায়ে হাত দেয়।

কি যে তুমি বল ভাবী।

ঠিকই বলি। ঘাস খেয়ে তো বড় হইনি।

তুমি যা ভাবছ সে সব কিছু না।

প্রথম প্রথম এ রকম মনে হবে। তারপর দেখবি একদিন হঠাৎ হাতের সঙ্গে হাত লেগে যাবে। যেন একটা অ্যাকসিডেন্ট। তারপর একদিন আশপাশে লোকজন না থাকলে জড়িয়ে ধরবে। চুমু খাবে।

কি যা তা বলছ?

ঠিকই বলছি। না জেনে বলছি?

ওনার সম্পর্কে এরকম বলাটা ঠিক না। সব মানুষ তো এক রকম নয়।

সব মানুষই এক রকম। সবারই দুটো করে চোখ, দুটো কান, একটা নাক। খবরদার আর কোনোদিন ঐখানে যাবি না। দরকার হয় সে আসবে, তুই নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবি।

ছিঃ।

এত ছিঃ করতে হবে না। যা বলছি মনে রাখিস।

খুব মন খারাপ করে বাড়ি ফিরল বকুল। নতুন শাড়ি পরে রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসতে কেন জানি তার লজ্জা করছিল। ফার্মেসির পাশ দিয়ে আসবার সময় খুব ইচ্ছা হল একবার তাকিয়ে দেখে ডাক্তার আছেন কি না। কিন্তু কিছুতেই তাকাতে পারল না। তার কেন জানি মনে হল ডাক্তার সাহেব আছেন এবং তিনি তাকে দেখছেন অবাক হয়ে। এক্ষুণি বেরিয়ে এসে ডাকবেন - এই বকুল, এইভাবে পালিয়ে যাচ্ছ কেন?

কিন্তু কেউ ডাকল না। কেউ ডাকেনি শুধুমাত্র এই কষ্টেই তার চোখ ভিজে উঠছিল। কেন তার এ রকম হচ্ছে? এটা কি কোন অসুখ? না অন্য কিছু?

শওকত সাহেব সুন্দর শাড়ি পরা এই মেয়েটিকে কাঁদতে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। এটি তাঁরই মেয়ে এটা বুঝতে সময় লাগল।

বকুল মা, কাঁদছিস কেন?

কাঁদছি না। কাঁদব কেন শুধু শুধু।

বকুল তাকে পেছনে ফেলে তর তর করে এগিয়ে গেল। শওকত সাহেব অনেকক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইলেন একই জায়গায়। তাঁর মেয়েটি এত বড় হয়ে গেছে এটি কেন এতদিনেও তার চোখে পড়েনি?

কাঁদছিস কেন? পাড়ার ছেলেরা কিছু বলেছে? মেয়েটির জন্যে তার নিজের মন কেমন করতে লাগল। এদেরকে অসহায় ফেলে রেখে দীর্ঘ দিনের জন্যে তাকে জেলে ঢুকে পড়তে হবে। উকিল সাহেব যদিও বলছেন কিছুই হবে না, কিন্তু তিনি জানেন ব্যাটা মিথ্যা কথা বলছে। উকিলরা সত্যি কথা বলতে পারে না।

শওকত সাহেব মাথা নিচু করে বুড়ো মানুষের মত হাঁটতে লাগলেন।

মামলার আবার একটি ডেট পড়েছে। এ রকম কি অনন্তকাল ধরেই চলতে থাকবে? উকিল সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, একেকটা মামলা চার-পাঁচ বছর ধরে ঝোলে। ঝোলাটাই ভাল। যত ঝোলে, মামলা তত দুর্বল হতে থাকে। সামনের মাসে আসেন দেখা যাবে।

শওকত সাহেবকে বেশ খুশি খুশি মনে হয়। তিনি যেন সমস্ত ব্যাপারটাকেই এড়াতে চাইছেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছে বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেছে। তিনি উল্লসিত কণ্ঠে বললেন, চল রে মুনা বাড়ি যাই।

আমি যাব না, তুমি যাও। বাকের ভাইকে নিয়ে যাও।

তুই এখন কি করবি?

অফিসে যাব।

তিনটার সময় অফিসে গিয়ে কি করবি?

আমার কাজ আছে।

কি কাজ?

আছে একটা কাজ। রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘ্যান ঘ্যান করতে পারব না।

মুনা রিকশায় উঠে বসল। অফিসে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে তিনটা বেজে গেল। লোকজন বেশির ভাগই বাড়ি চলে গেছে। যারা যায়নি তারা টেবিলপত্র গুছিয়ে ফেলছে। পাল বাবু ছিলেন। তিনি হাসি মুখে বললেন, আপনার কাজ হয়েছে। লোন স্যাংশন হয়েছে। ঘণ্টাখানেক আগে এলে চেক পেয়ে যেতেন। অবশ্যি আজ পাওয়া আর কাল পাওয়া সেম। এখন তো আর ভাঙাতে পারছেন না।

এটা একটা ভাল খবর। টাকাটা পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু মুনা খুশি হতে পারছে না। টাকা খরচ হচ্ছে জলের মত। সামলানো যাচ্ছে না। রিকশা ভাড়াতেই অনেকগুলি টাকা চলে যাচ্ছে। সামনে কি অবস্থা হবে কে জানে। পাল বাবু বললেন, বিয়ে উপলক্ষে লোন নিলেন নাকি?

না।

না কেন? ঐ ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলুন।

দেখি।

উঠছেন নাকি? কোন দিকে যাবেন? আসুন এগিয়ে দেই। এই টাইমে রিকশা পাওয়া মুশকিল।

কোথায় যাবে মুনা মনস্থির করতে পারল না। বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। মামুনের খোঁজে যাওয়াও অর্থহীন। সে নিশ্চয়ই ফেরেনি। আর ফিরলেই কি। যে লোক দীর্ঘ দেড় মাস কোনো রকম খবর না দিয়ে ডুব দিয়ে থাকতে পারে তার কাছে বার বার যাওয়ার কোনো কারণ আছে কি? তারেকের বাসার ঠিকানা জানলে সেখানে যাওয়া যেত। দেখা যেত কেমন মেয়ে বিয়ে করেছে। কিন্তু ওর ঠিকানা জানা নেই। কাঁচা বাজারের দিকে গেলে কেমন হয়, বেশ কিছুদিন ধরে বাজার হচ্ছে না। ডাল ভাত আর ডিম খেতে খেমে অরুচি ধরে গেছে। মুনা ব্যাগ খুলে টাকা গুণল। বাজার করার মত টাকা নেই। তার মানে এই দাঁড়াচ্ছে তার কোথাও যাবার জায়গা নেই। মুনা একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল।

দরজায় খুটখুট শব্দ হচ্ছে। মামুন অবেলায় ঘুমিয়ে ছিল। শীতের শুরুতে বিকেল বেলার ঘুম অন্য রকম একটা আলস্য এনে দেয় শরীরে। বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছা করে না।

কে?

আমি··· আমি মুনা।

মামুন দরজা খুলে বিব্রত ভঙ্গিতে তাকাল। মুনার চোখ-মুখ কঠিন। দেখেই বোঝা যাচ্ছে রেগে আছে।

এস, ভেতরে এস। কেমন আছ বল?

মুনা শুকনো গলায় বলল, এসেছ কবে?

গতকাল। আজ ঠিক করে রেখেছিলাম যাব তোমার ওখানে। ভালই হয়েছে। দেখা হল। রোগা হয়ে গেছ মুনা।

মুনা চুপ করে রইল। মামুন বলল, বুঝতে পারছি খুব রেগে আছ।

রাগব কেন?

এই যে ডুব দিলাম দেড় মাস। এদিকে তোমার এমন দুঃসময়।

আমার দুঃসময়ের সাথে তোমার কি সম্পর্ক? আমি কি তোমাকে বলেছি আমার দুঃসময়ে আমার হাত ধরে বসে থাকতে?

জাস্ট এ মিনিট। আমি মুখ ধুয়ে চায়ের কথাটা বলে আসি। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

মুনা লক্ষ্য করল মামুন বেশ সহজ স্বাভাবিক। দীর্ঘ দিন যে ডুব মেরে ছিল তার জন্যে তার বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ নেই। যেন এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়া তার স্বাস্থ্যও ভাল হয়েছে। দেখেই মনে হয় সে সুখেই ছিল। সুখী সুখী চেহারা।

শুধু চা নয়। চায়ের সঙ্গে পিঁয়াজু এবং বেগুনী। মামুন খুব উৎসাহের সঙ্গে খেতে শুরু করল। মুনা বলল, এত দিন যে ডুব দিয়েছিলে চাকরির অসুবিধা হয়নি?

আরে দূর চাকরি। মাস্টারি করে কিছু হয় নাকি? চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছি মানে?

ছেড়ে দিয়েছি মানে ছেড়ে দিয়েছি। চাকরি করব না। ব্যবসা করব। গ্রামের বাড়িতে একটা অয়েল মিল দিচ্ছি। লোনের জন্যে অ্যাপ্লাই করব। সরিষা ভেঙে তেল করা হবে। ধান, গম, মসলা, সব ভাঙানো যাবে।

এই সব নিয়েই ব্যস্ত ছিলে?

রাইট। লোনও পেয়ে যাব।

থাকতে পারবে গ্রামের বাড়িতে?

পারব না কেন? ফাইন বাড়ি আমাদের। তুমি দেখলে মুগ্ধ হবে।

মুনা লক্ষ্য করল মামুন একবারও জিজ্ঞেস করছে না, তোমাদের খবর কি? তোমাদের মামলার কি অবস্থা? মুনা উঠে দাঁড়াল, আমি যাই। সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।

মামুন হাত ধরে তাকে টেনে বসাল। অবাক হয়ে বলল, সন্ধ্যা হয়েছে তো কি হয়েছে, আমি আছি কি জন্যে? বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসব। এবং রাতে খাব তোমাদের ওখানে। বুঝতে পারছি তুমি রাগ করে আছ আমার ওপর। রাগ ভাঙানোর সুযোগ দাও। না তাও দেবে না।

চুপ করে ছিলে কেন?

নতুন এই আইডিয়া নিয়ে খুব জড়িয়ে পড়লাম। এবং ইচ্ছা করেই তোমাকে কোনো খবর দিলাম না। কারণটা হচ্ছে আমি ভেবেছিলাম কোনো খবরাখবর না পেয়ে তুমি অস্থির হয়ে বাড়িতে এসে উপস্থিত হবে এবং সব কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে। তখন আমি বলব, না আর ফিরে যেতে পারবে না। তোমাদের ঝামেলার কথা আমার তেমন করে মনে হয়নি। আই অ্যাম সরি। রাগ করেছ মুনা?

বলেছি তো আমি রাগ করিনি। আমি সহজে রাগ কবি না।

এই বার আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। একদিনের জন্যে হলেও নিয়ে যাব। তোমার খারাপ লাগবে না, ভালই লাগবে। বাড়ি দেখেও তুমি মুগ্ধ হবে। বাড়ির সামনে বাগান করেছি। ওনলি ফর ইউ মাই ইয়ং লেডি। চল ওঠা যাক। বাইরে কোথাও খাব।

না।

চল না, প্লিজ। ফ্রায়েড স্প্রিং চিকেন। চিলি বিফ এন্ড সুইট এন্ড সাওয়ার প্রন।

মামুন কাপড় পরতে শুরু করল। সে ধরেই নিয়েছে মুনা যাবে তার সঙ্গে। মুনা তার উল্লাসের কারণটা ঠিক ধরতে পারছে না।

তোমাদের মামলার কি অবস্থা?

ভালই।

ভালই মানে কি? উকিল ভাল দিয়েছ তো?

মুনা জবাব দিল না।

উকিল ভাল হলে খালাস করে নিয়ে আসবে, গায়ে আঁচড়ও লাগবে না। সিরিয়াস সিরিয়াস সব খুনিদের বের করে নিয়ে আসছে। এই দেশে অপরাধীদের সাজা হয় না।

মুনা শীতল স্বরে বলল, আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাচ্ছি না।

কেন?

ইচ্ছা করছে না? আমার অনেক রকম সমস্যা আছে, এখন আমি তোমার সঙ্গে বসে ফ্রায়েড চিকেন খেতে পারব না।

ফ্রায়েড চিকেন না খেলে অন্য কিছু খাওয়া যাবে।

আমি বাসায় যাব, মাথা ধরেছে।

রিকশায় দুজনের কোনো কথা হল না। মামুন দু'একবার কথা শুরু করতে চেষ্টা করল, লাভ হল না কিছু।

মাথা খুব বেশি ধরেছে নাকি?

হুঁ।

আমার সঙ্গে গ্রামে গিয়ে থাকতে তোমার অসুবিধা হবে না তো? মুনা জবাব দিল না।

প্রথম কিছুদিন ফাঁকা ফাঁকা লাগবে, তারপর দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে । কি, কিছু বলছ না

কেন?

বললাম তো মাথা ধরেছে।

মুনা গলির মাথায় নেমে পড়ল। সহজ ভাবেই বলল, থাক তোমাকে আসতে হবে না। আমি নিজে নিজেই যেতে পারব। রাস্তার আলো আছে।

আমি সঙ্গে এলে অসুবিধা আছে?

আছে। তুমি এলেই তোমার সঙ্গে বসতে হবে, কথা বলতে হবে। রাতে খাবার দিতে হবে। আমার এখন এসব করতে ইচ্ছা করছে না। মাথা ধরেছে খুব।

তোমার সঙ্গে আমার অনেক পরামর্শ আছে মুনা।

পরামর্শ পরে করা যাবে। সময় তো ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

মুনা লম্বা লম্বা পা ফেলে এগুতে লাগল। মামুন তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

## ১৪

লতিফা ছটফট করছিলেন সন্ধ্যা থেকেই – মুনা এসেছে? মুনা এসেছে? বকুল বিরক্ত হয়ে বলেছে এলে তো তোমাকে বলতাম মা। একশো বার এক কথা বলছ কেন?

আজ সমস্ত দিন লতিফার শরীর খারাপ গেছে। দুপুরে একবার বিছানা থেকে নামতে গিয়ে মাথা ঘুরে উঠল। শরীরটা একেবারেই গেছে। দুপুরে কিছুই খেতে পারেননি। বমি করে উগড়ে ফেলেছেন। সন্ধ্যাবেলা তাঁর বুক কাঁপতে লাগল। পুরনো শ্বাস কষ্ট নয়, অন্য এক ধরনের কষ্ট। তাঁর ভয় করতে লাগল। তিনি চাপা স্বরে কয়েকবার বাবুকে ডাকলেন। কেউ এল না। হয়ত শুনতে পায়নি। কিংবা শুনেও আসছে না। আজকাল সহজে তাঁর কাছে কেউ আসে না।

এক সময় সখিনা এসে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করল। কি অলক্ষুণে ব্যাপার। সন্ধ্যাবেলা কেউ গৃহস্থ বাড়িতে ঝাঁট দেয়? তিনি অনেকক্ষণ উঁচু গলায় বকাঝকা করলেন। তাঁর বুকের ধরফরানি আরো বেড়ে গেল। এক সময় মনে হল ঘরের আলো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। চোখে বিঁধছে। অনেক রাতের দিকে মাঝে মাঝে এ রকম হয়। আলো হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্য বেড়ে যায়। তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন মুনার জন্যে। মিনিটে একবার করে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, দেখ তো মুনা এসেছে নাকি?

মুনা এসে তার অবস্থা দেখে বড়ই অবাক হল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ব্যাপার কী? মুনা উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, মামা ফেরেননি?

বাবু বলল – ফিরেছিলেন, আবার কোথায় যেন গেছেন।

মামি কি রকম করছে তোরা দেখছিস না? যা দৌড়ে ডাক্তার নিয়ে আয়।

লতিফা হাঁপাতে শুরু করলেন। ঘরের আলো এত উজ্জ্বল যে চোখ মেলে রাখা যাচ্ছে না।

মামি খুব খারাপ লাগছে?

হুঁ। তুই আমার হাত ধরে বসে থাক।

মুনা হাত ধরে পাশে বসল। বকুল অবাক হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছে, লতিফা তাকালেন বকুলের দিকে। কি সুন্দর একটি মেয়ে, কে বলবে তাঁর মত অতি সাধারণ একটি মায়ের কোলে এত সুন্দর একটি শিশু আসবে।

মুনা বলল, দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে এনে কপাল মুছিয়ে দে। বকুল ছুটে গেল রান্নাঘরে। লতিফা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, যত তাড়াতাড়ি পারিস বকুলের বিয়ে দিয়ে দিবি। এত সুন্দর মেয়ে ঘরে বেশিদিন রাখবি না। অনেক সমস্যা হবে।

ঠিক আছে দেব।

পড়াশোনা কপালে থাকলে হবে, না থাকলে হবে না। তুই ওর বিয়ে দিয়ে দিবি। যত তাড়াতাড়ি পারিস।

বিয়ে দিলেই সব সমস্যা সমাধান হয় নাকি মামি?

লতিফা কিছু বললেন না। বকুল মাথায় ভেজা ন্যাকড়া বুলোতে লাগল। তিনি কাঁপা গলায় বললেন – আহ্ ঠাণ্ডা লাগে।

ডাক্তার এল সাড়ে সাতটায়। তারও ঘন্টা তিনেক পরে দীর্ঘ ছ'বছরের রোগ যন্ত্রণার অবসান হল। ডাক্তার ছেলেটি বড় অবাক হল। সে এমন ভাবে সবার দিকে তাকাতে লাগল যেন ঘটনাটি সে নিজেও বিশ্বাস করতে পারছে না। তাঁর হাতে এটিই কি প্রথম মৃত্যু?

কিছু কিছু ঘটনা মানুষ দ্রুত ভুলে যেতে চেষ্টা করে। সেই চেষ্টা সচেতন ভাবেই করা হয় এবং সে কারণেই সে লজ্জিতও বোধ করে। মৃত্যু এমন একটি ঘটনা। অতি প্রিয়জনের মনে হয় না সেই প্রিয়জন কোনো কালে আমাদের মধ্যে ছিল। কেন এ রকম করা হয়? আমাদের নিজেদের ব্যবহারে নিজেরাই অবাশ্য লজ্জিত হই, যার জন্যে প্রিয়জনটির একটি বড় ছবি যত্ন করে দেয়ালে টাঙানো হয় এবং একদিন কেউ খুব রাগারাগি করে — ফ্রেমে মাকড়শার জাল, কেউ দেখছে না, ব্যাপারটা কি?

লতিফার মৃত্যুর পর তাঁর কোনো ছবি দেয়ালে টাঙানো হল না। তবে তাঁর বিয়ের একটি ছবি মুনা বের করে খুব কাঁদল। সেই ছবিতে তাঁকে দেখাচ্ছিল একটি দুষ্টু বালিকার মত। শওকত সাহেবের চোখে চশমা। কেমন ভয় পাওয়া চেহারা। ছবিটি স্টুডিওতে তোলা। স্টুডিওতে তোলা সব ছবিই কেমন মূর্তি মূর্তি হয়। এই ছবিটি সে রকম নয়। প্রাণের একটা ব্যাপার আছে কোথাও। কিংবা এও হতে পারে মানুষের মৃত্যুর পর তাদের সব ছবিতে কিছু প্রাণ সঞ্চার হয়।

লতিফার ঘর আগের মতই আছে। মৃত মানুষদের ঘর দীর্ঘদিন একই রকম থাকে। সহজে সে ঘরের কোনো কিছুতে কেউ হাত দিতে চায় না। তবু ঘরটা কেমন যেন আগের মত থাকে না। সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন হয় কোথাও। সে পরিবর্তন সূক্ষ্ম হলেও যে-কেউ ধরতে পারে।

প্রথম রাত এই ঘরে ঘুমুতে এসে শওকত সাহেবের ভয় ভয় করতে লাগল। লতিফার স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যেই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করলেন পুরনো দিনের কথা মনে করতে। সমস্তই মনে আছে কিন্তু সে সব নিয়ে ভাবতে ভাল লাগছে না। বরং শওকত সাহেবের মনে হতে লাগল এই ঘরে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুব সাবধানে পা ফেলছে। নিঃশব্দ পদচারণা। এইবার যেন বসল পাশের চেয়ারটায়। ভয় কাটাবার জন্যে তিনি শব্দ করে কাশলেন। সেই কাশির শব্দে তাঁর নিজেরই ভয় বেড়ে গেল। তিনি চোখ বন্ধ করে ঘুমুতে চেষ্টা করলেন। তখনি মনে হল মাথার উপরের ফ্যান ঘুরতে শুরু করেছে। লতিফা শীতের রাতেও ফ্যান না ছেড়ে ঘুমুতে পারত না। সেই জন্যেই কি? ঘর অন্ধকার, তবুও সব কিছু আবছা আবছা দেখা যায়। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ফ্যানটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। হ্যাঁ ফ্যান ঘুরছে। শওকত সাহেবের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। তিনি চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলেন এবং স্পষ্ট শুনলেন মশারির ওপাশে কেউ যেন মিষ্টি করে হাসল। প্রথম যৌবনে লতিফা যেমন হাসত। শওকত সাহেব ভাঙা গলায় ডাকলেন, মুনা মুনা।

মুনা সম্ভবত বারান্দায় বসে ছিল সে এসে দরজায় ধাক্কা দিল, কি হয়েছে মামা? শওকত সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, কিছু না তুই যা।

মামা দরজা খোলো।

শওকত সাহেব দরজা খুলে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

কি হয়েছে?

তিনি জবাব দিলেন না। মুনা বলল — ভয় পাচ্ছ?

হুঁ।

কেন, ভয় পাচ্ছ কেন?

ফ্যানটা ঘুরছে শুধু শুধু।

কোথায় ঘুরছে?

না এখন আর ঘুরছে না। শওকত সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, যা ঘুমুতে যা। মুনা বলল, তুমি বরং আমাদের ঘরে ঘুমাও। বাবুর সঙ্গে শুয়ে পড়। আমি এখানে ঘুমাব।

শওকত সাহেব কোনো কথা বললেন না। মুনা বলল — যাও মামা আমার কথা শোন। তাছাড়া আজ রাতটা এমনিতেই তোমার উচিত ছেলেমেয়েকে পাশে নিয়ে ঘুমানো।

শওকত সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন, তোর মামির ওপর বড় অবিচার করেছি রে মুনা।

তা করেছ।

বড় খারাপ লাগছে।

অল্প কয়েক দিন লাগবে, তারপর আর লাগবে না। মানুষ বড় অদ্ভুত প্রাণী মামা।

শওকত সাহেব কোনো কথা বললেন না। মুনা চাপা স্বরে বলল, ধর কিছু দিন পর আবার যদি তুমি বিয়ে কর তাহলে প্রথম কিছু দিন ঐ মেয়েটিকে খুব ভাল বাসবে, তারপর আবার আগের মত নানান অবিচার শুরু করবে। এবং এক সময় বিছানা-বালিশ নিয়ে আলাদা ঘুমুতে চাইবে। চাইবে না?

শওকত সাহেব একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন। মুনা বলল, যাও ওদের ঘরে গিয়ে শোও। ওরা জেগেই আছে, ওদের সঙ্গে দু'একটা কথা-টথা বল।

কি কথা বলব?

যা মনে আসে বল। ওদের সাহস দাও।

বাবু তাঁর বাবাকে পাশে শুতে দেখে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। বকুল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মশারির ভেতর থেকে। শওকত সাহেব ডাকলেন, বাবু' বাবু জবাব দিল না।

ঘুমাচ্ছিস নাকি বাবু?

না।

বকুল ঘুমাচ্ছিস?

না।

শওকত সাহেব তাদের কি বলবেন বুঝতে পারলেন না। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাঁর তেমন যোগাযোগ নেই। চিরদিন দূরে দূরে থেকেছেন। একটা আড়াল তৈরি হয়ে গেছে। আজ হঠাৎ করে ওদের কাছে আসা যায় না। ওরা কাঁদছেও না। কাঁদলে বলা যেত কাঁদিস না রে। শওকত সাহেব ক্ষীণ স্বরে বললেন গরম লাগছে, তাই না? বকুল বা বাবু কেউই কিছু বলল না।

মুনার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। পায়ের কাছে জানালাটা খোলা। খোলা জানালায় শীতল হাওয়া আসছে। সেই হাওয়ায় সিলিং ফ্যানটি অল্প অল্প ঘুরছে। ঘরে অন্য রকম একটা গন্ধ। রোগের গন্ধ, শোকের গন্ধ, মৃত্যুর গন্ধ। মুনা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে মৃদু স্বরে ডাকল, মামি। কেউ জবাব দিল না। মৃত্যুর ওপারে অন্য কোনো ভুবন আছে কী? না থাকাটা খুব কষ্টের হবে।

মুনার পানির তৃষ্ণা হচ্ছিল কিন্তু উঠে গিয়ে পানি আনার ইচ্ছা হচ্ছিল না। সে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল। কত অসংলগ্ন কথাই না তার মনে এল। যার সঙ্গে মামির কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। খুব ছোটবেলায় নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে লাল রঙের একটা প্রকাণ্ড কাঁকড়া তার দিকে হঠাৎ ছুটে আসতে শুরু করল। অনেক দিন পর সেই দৃশ্যটি পরিষ্কার মনে এল। কেন এল?

শীত করছে। এবার কি আগে ভাগে শীত পড়ে গেল নাকি? কাঁথায় শীত মানবে না। লেপ বের করতে হবে শিগগির। লেপগুলির কি অবস্থা কে জানে। তেলাপোকায় কেটেকুটে সর্বনাশ করে রেখেছে হয়ত। অনেক দিন রোদে দেয়া হয় না।

মুনা বিছানা ছেড়ে উঠল। পানির পিপাসা অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না। দরজা খুলে বের হয়ে সে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। মামা তাঁর ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ক্যাম্পখাটে বসে আছেন। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছেন দুজনকে। মামা ধরা গলায় ডাকলেন মুনা, আয় মা এদিকে।

মুনা গেল না। নিশিরাত্রির এই মুহূর্তটি ওদের। সেখানে তার স্থান কোথায়? সে রান্নাঘর থেকে পানি খেয়ে আবার শুয়ে পড়ল। আজ সারাদিন বড় পরিশ্রম গিয়েছে। বড় ক্লান্ত লাগছে। কিন্তু ঘুম আসছে না। মুনা চেষ্টা করল তার বাবার ছবিটি মনে আনতে। কিছুতেই মনে এল না। শুধু মনে পড়ল প্রচণ্ড একটা শীতের রাতে ছোট খালা তাকে ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যাচ্ছেন বাবার ঘরে। চারদিকে অনেক লোকজন, অনেক আলো। ছোট খালা বলছেন চল মা, বাবাকে একটা চুমু দিয়ে আসবে। লক্ষ্মী মেয়ের মত বাবাকে একটা চুমু দেবে।

বাবার ঘর ভর্তি মানুষ। সবাই কেমন অন্য রকম। বাবা তাকে দেখে কাঠির মত রোগা একটি হাত উঁচু করলেন। মুনা তার খালার গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠল সে কিছুতেই যাবে না বাবার কাছে। বাবা দুর্বল স্বরে বললেন, ও ভয় পেয়েছে, ওকে নিয়ে যাও। ছোট খালা ঘর থেকে বের করে এনে প্রচণ্ড একটা চড় দিয়ে বলেছিলেন, বোকা মেয়ে।

মুনা কাঁথাটা গলা পর্যন্ত টেনে দিয়ে মৃদু স্বরে বলল বাবা ঐ ভয়ংকর রাতে তোমাকে চুমু খেতে পারিনি। কিন্তু তোমাকে আমি লক্ষ লক্ষ চুমু খেয়েছি। কোনোদিন তুমি তা জানতে পারবে না। এই দুঃখ আমি সারা জীবন বুকের মধ্যে পুষে হাসি মুখে ঘুরে বেড়াব। কত রকম সুখের ঘটনা ঘটবে আমার জীবনে। ঘর-সংসার হবে, ছেলেমেয়ে হবে। ওরা বড় হবে ওদের বিয়ে হবে, কিন্তু সেই দুঃখ থাকবেই।

মৃত্যুর পর কি কোনো জগৎ সত্যিই নেই? এই একটিই জীবন আমাদের? কোনোদিন বাবার কাছে দু'হাত বাড়িয়ে যাওয়া যাবে না? শৈশবের দিনগুলি কি ভয়াবহই না ছিল। কিছু দিন এর বাড়ি,

কিছু দিন ওর বাড়ি। সাত বছর বয়সেই বুঝতে পারল সে একটা উপদ্রবের মত। কেউ তাকে দীর্ঘদিন রাখতে চায় না। তার যখন ন'বছর বয়স তখন একদিন মামা এসে বললেন- মুনা, তুই চলে আয় আমার সাথে। আমার সাথে থাকবি। ছোট খালা বিরক্ত হয়ে বললেন, তোর সাথে থাকবে মানে! তুই একা মানুষ মেসে পড়ে আছিস।

একটা ঘর ভাড়া নেব। এখানে ওর কষ্ট হচ্ছে।

মামা সত্যি সত্যি ঘর ভাড়া করে তাকে নিজের কাছে নিয়ে নিলেন। দুজন মাত্র মানুষ তারা, কত রকম সমস্যা। রাত ন'টা-দশটা পর্যন্ত মুনাকে মাঝে মাঝে একা থাকতে হত। কি যে ভয় লাগত একেক দিন। কিন্তু সে সুখে ছিল। মামা তাকে ভালবাসায় ডুবিয়ে রেখেছিলেন। যার যতটুকু ভালবাসার প্রয়োজন সে বোধহয় তা কোনো না কোনো ভাবে পেয়েই যায়। মুনার অস্পষ্ট ভাবে মনে হল সে সুখী হবে। ভালবাসার অভাব তার জীবনে হবে না।

শেষ রাতের দিকে মুনা সুন্দর একটা স্বপ্ন দেখল। রিকশা করে সে আর মামুন যাচ্ছে। রিকশা যাচ্ছে কোনো একটা পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে। অপূর্ব সব দৃশ্য চারদিকে। খুব বাতাস দিচ্ছে। সেই বাতাস অগ্রাহ্য করে মামুন সিগারেট ধরাতে চেষ্টা করছে। একটার পর একটা দেয়াশলাইয়ের কাঠি নষ্ট হচ্ছে। মামুন বড় বিরক্ত হচ্ছে। সে যতই বিরক্ত হচ্ছে মুনার ততই মজা লাগছে।

কত রকম অদ্ভুত স্বপ্নই না মানুষ দেখে।

মামুন ভেবেছিল ঢাকায় খুব বেশি হলে সাতদিন থাকবে।

বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। রাজমিস্ত্রী ঠিক করা আছে, ওরা বসে থাকবে। মেশিন রাখার বেস পাকা হবে। একটা হাফ বিল্ডিং হবে, প্রচুর কাজ। কিন্তু ঢাকা থেকে বের হবার সে পথ পাচ্ছে না। মুনার সঙ্গে সরাসরি কথা হওয়া দরকার। সমস্ত পরিকল্পনাটি তাকে ভালমত বোঝানো দরকার। তাও সম্ভব হচ্ছে না, একটির পর একাট ঝামেলা লাগছে। ছোটখাটো ঝামেলাও নয়, বিরাট সব ঝামেলা। এর মধ্যে ইন্ডাসট্রি-ফিন্ডাসট্রির কথা বলা যায় না।

তাছাড়া ঢাকায় এসে কেন জানি মনে হচ্ছে মুনা ঠিক আগের মত নেই। তাকে তেমন পছন্দ করছে না, এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছে। সেদিন ওর অফিসে গিয়েছিল। সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, কোনো কাজে এসেছ না এমনি?

জরুরি কথা ছিল কিছু।

এখন তো খুব ব্যস্ত। তুমি চলে যাও, আমি যাব তোমার কাছে।

মামুন রাত আটটা পর্যন্ত অপেক্ষা করল। মুনার পাত্তা নেই। এমন কখনো হয় না। এই মেয়েটির কথার নড়চড় হয় না। মামুন সে রাতেই মুনাদের বাসায় গিয়েছে। মুনা সহজ ভাবেই বলেছে মাথা ধরেছে কাজেই তোমার ওখানে যাইনি। তাছাড়া মন-টনও ভাল না, কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। তুমি বস, চা খাও। আমি একটু শুয়ে থাকব।

মামুন রাত প্রায় এগারোটা পর্যন্ত বসে রইল। মুনা একবার এসে শুধু চা দিয়ে গেল। শওকত সাহেব এই দীর্ঘ সময় তার সঙ্গে গল্প করলেন। সাপের গল্প। কবে বারহাট্টায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা বাইরে বেরুবেন। শার্ট গায়ে দিতেই মনে হল ঠাণ্ডা একটা কি যেন গা বেয়ে যাচ্ছে। হারিকেন আনতেই দেখা গেল কালো কুচকুচে একটা সাপ। আরেকবার চাঁদপুরে ঘুমিয়ে আছেন। মশারি-টশারি সব ফেলা। বাতি নিভিয়ে চাদর গায়ে দিতেই মনে হল ঠাণ্ডা একটা কি যেন পায়ের উপর দিয়ে যাচ্ছে...।

মামুনের মনে হল স্ত্রীর মৃত্যুর কারণেই হোক অথবা অন্য যে কারণেই হোক এই লোকটির মধ্যে বড় রকমের একটা পরিবর্তন হয়েছে। সাপের মত একটা বিষয় নিয়ে কেউ দু'ঘণ্টা একনাগাড়ে কথা বলতে পারে না। বিশেষত সেই লোক, যে কপালে বিরক্তির ভাঁজ না ফেলে আগে একটি কথাও বলত না। অথচ এখন একে দেখে কেউ বুঝতে পারবে না এর কোনো সমস্যা আছে। একবার হাল ছেড়ে দিলে যেমন একটা নিশ্চিন্ত আলস্যের ভাব চলে আসে মানুষের মধ্যে ওনারও কী তাই হয়েছে? মামুন একবার মামলার প্রসঙ্গ তুলতে চেষ্টা করল- নেক্সট ডেট কবে পড়েছে মামা?

জানি না কবে। মুনা বলতে পারবে। তারপর শ্রীপুরের গল্পটা শোন। ভাদ্র মাস, নৌকা করে যাচ্ছি শ্রীপুর...।

শ্রীপুরের গল্প শেষ হতে পনের মিনিট লাগল। মুনা এসে বলল, যেতে দাও মামা। রিকশা পাবে না। শওকত সাহেব বললেন, রাত বেশি হয়ে গেছে। থেকে যাক না।

না না থাকবে কি?

মামুন উঠে পড়ল। মুনা কি সত্যি সত্যি তাকে অপছন্দ করছে? অপছন্দ করবার মত বাস্তব কোনো কারণ কি আছে। ওর একটা দুঃসময় যাচ্ছে এবং তখন মামুন তাকে কোনো রকম সাহায্য করেনি। গ্রামের বাড়িতে গিয়ে বসে ছিল। ঝামেলা এড়াবার জন্য যে সে এটা করছে তা তো না।

ফরিদা মারা যাবার পর বাবা-মা একলা হয়ে পড়েছেন। নানান রকম কথাবার্তা বলতে শুরু করেছেন। ফরিদাকে নাকি হঠাৎ হঠাৎ দেখতে পান। অসুস্থ ফরিদাকে নয়। স্বাস্থ্য সৌন্দর্যে ঝলমলে ফরিদাকে। কখনো তাকে দেখা যায় বসে আছে লাল চাদর গায়ে দিয়ে। কখনো বা হেঁটে যায় পাশ দিয়ে। মানসিক ভাবে বাবা-মা দুজনেই বিপর্যস্ত। এমন অবস্থায় তার নিশ্চয়ই অধিকার আছে বাড়িতে থেকে যাওয়ার।

তাছাড়া বাড়ির সঙ্গে তার দীর্ঘদিন সম্পর্ক ছিল না। ফরিদার কারণেই ছিল না। বলতে গেলে সে পালিয়ে বেড়িয়েছে। এই নিয়ে তার অপরাধবোধ আছে। সেটা কাটানোর জন্যেও গ্রামে থাকা দরকার। গ্রাম তো সেই পুরনো গ্রাম নেই। পিলার বসছে, ইলেকট্রিসিটি মাস খানিকের ভেতর চলে যাবে। রেডিও-টেলিভিশন সবই চলবে। তেলের কল ঠিকমত কাজ করলে ভাল টাকা-পয়সা আসার কথা। ঢাকায় কলেজের মাস্টারির পুরো বেতনটাই তো চলে যায় বাড়ি ভাড়ায়। সেখানে বাড়ি ভাড়া দিতে হচ্ছে না। চমৎকার বাড়ি আছে নিজেদের। দোতলার দক্ষিণের ঘরটিতে একটা অ্যাটাচড বাথরুমের ব্যবস্থা করলেই পুরোপুরি শহরের বাড়ি হয়ে যাবে।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এসব কথা বুঝিয়ে বলার মত সুযোগই তৈরি হচ্ছে না। মামুনের ধারণা মুনা তাকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করছে। টেলিফোনের কথাবার্তা থেকে সেটা কিছুটা স্পষ্ট হয়েছে। টেলিফোনের রিসিভার উঠিয়েই মুনা বলেছে আমার হাতে অনেক কাজ, তুমি কি পরে একবার রিং করবে। দুটোর পর। দুটোর পর টেলিফোন করা হল। সে অফিসে নেই এর মানে কি? স্পষ্ট কথা হওয়া উচিত। মামুন এখন আর তার বিয়ের ব্যাপারটি ঝুলিয়ে রাখতে চায় না। এই নিয়েও কথা বলতে চায়।

মুনার আশংকা সে বুঝতে পারছে। মামার জেল-টেল হয়ে গেলে এরা যাবে কোথায়?

সে যদি উপন্যাসের আদর্শ নায়িকাব মত ভাবে পরিবারের বাকি সবার জন্যে জীবন উৎসর্গ করবে, বাকি জীবন চিরকুমারী থাকবে তাহলে সে ভুল করবে।

সবার আলাদা আলাদা জীবন আছে। এইসব মহৎ আদর্শ উপন্যাসে এবং সিনেমায় ভাল লাগে। জীবন উপন্যাসেও না সিনেমাও না। আর এমন তো না মুনা ছাড়া ওদের অন্য কোনো গতি নেই। অবশ্যই আছে। আত্মীয়-স্বজনরা আছে। বকুলের এক মামা আছেন যথেষ্ট ক্ষমতাবান মানুষ।

মুনার এখন যে দুঃসময় তার চেয়েও ভয়াবহ দুঃসময় মানুষের আসে এবং তখন তারা নিজেদেব এ রকম করে গুটিয়ে নেয় না। মামুন মনে মনে মুনার সঙ্গে কথাবার্তাগুলি ঝালাই করতে লাগল।

তুমি এখন আর আমার সঙ্গে দেখা করতে আস না কেন?

ভাল লাগে না সেই জন্যে আসি না।

ভাল লাগে না মানে?

মানে-টানে কিছু নেই।

তার মানে আমাকে বিয়ে করবে না?

তোমাকে বিয়ে করব কেন? কি আছে তোমার?

মনে মনে কথাবার্তা বেশিক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যায় না। তর্কে মুনা জিতে যায়। এটাও একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। বাস্তবেও তর্কে মুনা জেতে, কল্পনার তর্কেও সে-ই জেতে। অন্তত কল্পনাতে তো মামুনের জেতা উচিত।

অথচ প্রথম পরিচয়ের সময় মুনার এই তার্কিক স্বভাব তার চোখেই পড়েনি। বরঞ্চ মনে হয়েছিল বড় ঠাণ্ডা একটি মেয়ে। ঠাণ্ডা এবং লাজুক। মামুন তার বন্ধুর একটি কাজ নিয়ে গিয়েছিল অফিসে। লাজুক ধরনের মেয়েটি দ্রুত কাজটা করে দিল। মামুন বলল - মেয়েরা এত তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে জানতাম না তো। সে হেসে বলল -- মেয়েদের এত অক্ষম ভাববেন না।

এখন থেকে আর ভাবব না।

মেয়েটি তাকে এক কাপ চা খাওয়াল।

সেই কাজটি নিয়ে মামুনকে পরদিন আবার যেতে হল। মেয়েদের যতটা সক্ষম ভাবা গিয়েছিল কার্যক্ষেত্রে সে রকম দেখা যায়নি। কাগজপত্র ঠিকমত তৈরি হয়নি। মেয়েটি দারুণ লজ্জিত হল। ছোটাছুটি করে আবার নতুন কাগজ তৈরি করে দিল। তাতেও ভুল বের হল। আবার আসতে হল মামুনকে এবং সে হেসে বলল

আপনার এখানে এসে এসে এমন অভ্যাস হয়েছে যে, কাগজপত্র পুরোপুরি ঠিক হলে মন খারাপ লাগবে। মেয়েটি লাল হয়ে বলল, আপনাকে আব আসতে হবে না। এবার ঠিকঠাক না হলে আমি চাকরি ছেড়ে দেব।

কিন্তু সপ্তাহখানেক পর মামুন আবার এল। লাজুক ভঙ্গিতে বলল  আজ কোনো কাজে আসিনি। আপনাকে থ্যাংকস জানাতে এসেছি। থ্যাংকস জানাতে এসে প্রায় দু'ঘণ্টা বসে রইল। এই দু'ঘণ্টায় সে এক প্যাকেট সিগারেট এবং চার কাপ বিস্বাদ চা খেয়ে ফেলল। কি সব আনন্দের দিনই না গিয়েছে।

## ১৫

শওকত সাহেবের বাইরে হাঁটাহাঁটির পরিমাণ অনেক বেড়েছে। এখন আর আগের মত দুপুরে খেতে আসেন না। কোনো একটা সস্তা হোটেলে ঢুকে পড়েন। খাওয়া-দাওয়া সেরে চেয়ারে বসেই খানিকক্ষণ ঘুমিয়ে নেন। এই নিয়ে হোটেলওয়ালাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে মৃদু বচসা হয়। সেদিন একেবারে হাতাহাতির পর্যায়ে চলে গেল। নীলক্ষেতের এক হোটেলওয়ালা বিরক্ত মুখে বলল

এই যে ঘুমান কেন? ভাত খাইছেন এখন যান। অন্য কাস্টমাররা বসুক।

শওকত সাহেব লজ্জিত হয়েই উঠে পড়লেন। ক্ষেপে গেল অন্য কাস্টমাররা একজন বুড়ো মানুষ খাওয়ার পর বিশ্রাম করছে, আর তুমি যে জোর করে তুলে দিলে। পয়সাটাই শুধু দেখ।

দেখতে দেখতে ওদের সঙ্গে হোটেলওয়ালার তুমুল লেগে গেল। প্রায় হাতাতাতির উপক্রম। এ সব ক্ষেত্রে যা হয়  হোটেলওয়ালার পরাজয় হল। এবং সে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল- - যান ভাই ঘুমান, ঐ বুড়া মিয়ারে একটা বালিশ আইন্যা দে।

শওকত সাহেব দ্বিতীয় দফায় ঘুমুতে গেলেন না। বিল মিটিয়ে চলে এলেন। লোকজন ইদানীং তাকে বুড়ো মিয়া ডাকছে। হঠাৎ করে বুড়ো হয়ে গেছেন নাকি? পান কিনতে গিয়ে খুব নজর করে আয়নায় নিজেকে দেখলেন। চেহারা তো আগেই মতই আছে। শুধু কপালের কাছের কিছু চুল ইন্দিরা গান্ধীর মত পেকে গেছে। তবু সবাই কেন বুড়ো ভাবতে শুরু করল।

অবশ্যি বুড়ো হবার অনেক সুবিধাও আছে। বাসে উঠলে সহজেই সিট পাওয়া যাচ্ছে। গতকালই গুলিস্তান যাচ্ছিলেন। লেডিস সিটে বসা অল্পবয়সী একটা মেয়ে বলল  জায়গা আছে বসুন না। মেয়েটি সরে কিছু জায়গা করে দিল।

কোথায় যাওয়া যায়? বাইরে বেশ রোদ। রোদ না কমলে হাঁটাহাঁটি করে আরাম পাওয়া যায় না। কোনো পার্ক-টার্কে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলে কেমন হয়? শওকত সাহেব চলে গেলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এই দুপুরের রোদেও জোড়ায় জোড়ায় ছেলেমেয়ে দেখা গেল। প্রেমের সুবিধা দেয়ার জন্যেই কি সরকার এই পার্ক বানিয়েছেন? এই ধরনের কথা ভাবতে ভাবতে শওকত সাহেব একটা ফাঁকা বেঞ্চ খুঁজে বের করলেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমুলেন। বেশ লাগল তাঁর।

আজও তিনি সে রকম করবেন ভাবলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে মত বদলে চলে গেলেন নিজের অফিসে। মল্লিক বাবুর কাছে পঞ্চাশ টাকা পাওনা আছে যদি পাওয়া যায়। আজ মাসের এক তারিখ, হাতে টাকা থাকার কথা। তাঁর নিজের হাত দ্রুত খালি হয়ে আসছে। কয়েক দিনের মধ্যেই হয়ত মুনার কাছে হাতখরচ চাইতে হবে।

আরে আরে শওকত সাহেব যে, কোথায় ডুব দিয়েছিলেন?

শওকত সাহেব হকচকিয়ে গলেন। অফিসের কোথাও যেন সূক্ষ্ম একটা পরিবর্তন হয়েছে। সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। তাঁর পোস্টে যে নতুন ছেলেটির অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়েছে সে উঠে দাঁড়িয়ে স্লামালিকুম দিল। জসীম সাহেব হাসি মুখে বললেন, এসেছেন ভাল হয়েছে, অনেক কথা আছে। শরীর কেমন আপনার বলেন?

শরীর ভালই।

ভাল কোথায়? আপনি তো ভাই বুড়ো হয়ে গেছেন। এ কি অবস্থা!

সংসারে অনেক ঝামেলা গেল। আমার স্ত্রী মারা গেছেন।

তাই নাকি? আহা বলেন কি? বড় আফসোসের কথা। কোনোই খবর রাখি না। ঐদিন অবশ্যি মল্লিক বাবু বলছিলেন চলেন যাই খোঁজ নিয়ে আসি। ঝামেলার জন্য যেতে পারলাম না। অডিট হচ্ছে। কোনো কোনো দিন আটটা সাড়ে আটটা পর্যন্ত থাকতে হয়। চলেন ক্যান্টিনে চলেন। চা-টা কিছু খাই।

চা খাব না। এই মাত্র ভাত খেয়ে এসেছি।

চা না খাবেন অন্য কিছু খাবেন। পেপসি খান। ফান্টা খান? আপনার সাথে কথা আছে।

অফিসের ক্যান্টিনটিরও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাঠের চেয়ার সরিয়ে প্লাস্টিকের চেয়ার দেয়া হয়েছে। টেবিলের উপর পরিষ্কার টেবিল ক্লথ। জসীম সাহেব বললেন, ক্যান্টিনের ভোল পাল্টে গেছে, বুঝলেন তো?

জি।

ক্যান্টিন এখন ইউনিয়নের হাতে। ইউনিয়ন ক্যান্টিন চালাচ্ছে। এখন ইউনিয়ন খুব স্ট্রং। এই জন্যেই আপনাকে খুঁজছিলাম।

কেন আমাকে কেন?

শওকত সাহেব বড়ই অবাক হলেন। ইউনিয়ন তাকে কেন খুঁজছে, সেটা জেনে তাঁর বিস্ময়ের পরিমাণ আরো বাড়ল।

আপনাদের মামলাটার ব্যাপারেই খোঁজ হচ্ছে। আমরা সিরিয়াস চাপ দিয়েছি। আমরা বলেছি, আসল যে আসামি দিব্যি চাকরি করছে বেতন নিচ্ছে। তার বিরুদ্ধে কেইস তোমরা তুলে নিয়েছ। আর যে নিরপরাধ তাকে জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা করছ। আমরা এটা হতে দেব না।

আমি নিরপরাধ না।

আপনি তো এটা বললে হবে না। আমরা ব্যাপারটি জানি। আপনাকে সিগনেচার করতে বলা হয়েছে। আপনি দুর্বল মানুষ, ভয়ের চোটে সিগনেচার করেছেন। আপনার মুখ বন্ধ রাখার জন্য কিছু টাকা আপনার হাতে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে, ব্যস।

শওকত সাহেব কপালের ঘাম মুছলেন।

ইউনিয়নের চাপে ওদের অবস্থা এখন কাহিল। সাপের ব্যাঙ খাওয়ার মত অবস্থা। ফেলতেও পারছে না গিলতেও পারছে না। হা হা হা। বারবার যে আপনার মামলার তারিখ পড়ছে, কি জন্যে পড়ছে? এই জন্যেই পড়ছে। ওরা সময় নিচ্ছে। আপনি এসেছেন যখন এক কাজ করুন। বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করুন।

দেখা করব?

হ্যাঁ। জাস্ট দেখা করবেন। অন্য কিছু বলার দরকার নেই। বড় সাহেব কিছু বললে শুনবেন।

সাহস হয় না।

সাহসের এখানে কি আছে, যান তো। ব্যাটার রি-অ্যাকশনটা কি দেখেন।

বড় সাহেব তাকে প্রথম চিনতেই পারলেন না। শওকত সাহেব কাঁপা গলায় বললেন, স্যার আমি শওকত। ক্যাশ সেকশনের।

ও আচ্ছা। একি অবস্থা হয়েছে আপনার?

অনেক রকম বিপদ-আপদ যাচ্ছে স্যার। জানেনই তো। তার ওপর স্ত্রী মারা গেলেন।

তাই নাকি? কবে?

গত মাসের চব্বিশ তারিখ?

আই অ্যাম সরি। আই অ্যাম ভেরি সরি। বসুন বসুন চা খান।

জি না স্যার চা খাব না।

খাবেন না কেন-- খান। সাড়ে তিনটা বাজে, এখন অলমোস্ট টি টাইম।

শওকত সাহেব সংকুচিত ভঙ্গিতে বসলেন। বড় সাহেব বললেন, আপনার নিজের শরীর কেমন?

শরীর ভালই। মামলাটা নিয়ে ঘোরাঘুরি বেশি হয়। বারবার ডেট পড়ে। জেল-টেল যা হবার একবারে হয়ে গেলে ভাল ছিল।

জেলে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছেন?

জি স্যার।

বাসায় কে আছে?

আমার একটা মেয়ে ক্লাস টেনে পড়ে, একটা ছেলে আছে ক্লাস সেভেনে পড়ে। আর আমার ভাগ্নী আছে একটি।

বড় সাহেব হঠাৎ বললেন, ধরুন আপনাকে যদি জেলে যেতে হয় তাহলে ওদের দেখাশোনা কে করবে?

আমার ভাগ্নীই করবে স্যার। আমি সেটা নিয়ে চিন্তা করি না। ও খুব তেজী মেয়ে।

বড় সাহেবের ঘরের চা শওকত সাহেবের খুব পছন্দ হল। এই চা ক্যান্টিন থেকে আসে না। আলাদা তৈরি হয়। হালকা লিকার, মিষ্টি মিষ্টি একটা গন্ধ। আসল চায়ের গন্ধ বোধ হয় এ রকমই।

স্যার যাই।

ঠিক আছে যান। আর শোনেন, বেশি চিন্তা করবেন না। স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখবেন। ঐ মামলাটা নিয়ে কোম্পানি চিন্তা-ভাবনা করছে। হয়ত শেষ পর্যন্ত তুলে নেবে। যদিও আমি ঠিক সিওর না।

শওকত সাহেব অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

আপনি দিন সাতেক পর খোঁজ নেবেন।

শওকত সাহেবের কি করা উচিত? ছুটে গিয়ে বড় সাহেবকে জড়িয়ে ধরা? কেঁদে ফেলা? এর কোনোটাই তিনি করতে পারলেন না। বেকুবের মত চারদিকে তাকাতে লাগলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর হেঁচকি উঠে গেল।

মল্লিক বাবু ধারের পঞ্চাশ টাকা ফিরিয়ে দিলেন। গলার স্বর নিচু করে বললেন, এই টাকায় ভাল দেখে দৈ-মিষ্টি কিনে নিয়ে যান। আমোদ-ফুর্তি করেন।

শওকত সাহেব সত্যি সত্যি পঞ্চাশ টাকারই সন্দেশ কিনে ফেললেন। চল্লিশ টাকার কিনলে ভাল হত, রিকশা করে বাসায় ফিরতে পারতেন এখন যেতে হবে হেঁটে হেঁটে। কিন্তু বেশ লাগছে হাঁটতে। কিসের যেন একটা মিছিল বের হয়েছে। তিনি মিষ্টির প্যাকেট হাতে ওদের সঙ্গে মিশে গেলেন। মিছিলের সঙ্গে হাঁটা বেশ মজার ব্যাপার। নিজেকে তখন আর ক্ষুদ্র মনে হয় না। শওকত সাহেব কোনো কিছু না বুঝেই দলের সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে হুংকার দিতে লাগলেন— 'দিতে হবে দিতে হবে।'

তিনি বাসায় পৌঁছলেন সন্ধ্যাবেলা। বাসায় তখন ছোটখাটো একটা উত্তেজনার ব্যাপার চলছে। পুরনো ফ্যানটি নিয়ে আসা হয়েছে। বাকের-এর তত্ত্বাবধানে সেই ফ্যান ফিট করা হয়েছে। সুইচ টিপতেই ফ্যানে এক ধরনের কম্পন দেখা গেল। মেঘ ডাকার মত একটা শব্দ হয়ে সমস্ত ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। বাকের বলল শালা মদনা হারামজাদার সবগুলি দাঁত আমি খুলে ফেলব। বকুল খিলখিল করে হেসে ফেলল।

হাসির কি হল? এর মধ্যে হাসির কি হল? কেউ একটা মোমবাতি আনো না। আরে ব্যাপার কি?

হ্যারিকেন, মোমবাতি, কুপী কিছুই পাওয়া গেল না। এ রকম একটা বিশৃঙ্খল অবস্থায় শওকত সাহেব মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা ছিল ওরা জিজ্ঞেস করবে মিষ্টি কি জন্যে? কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না।

মুনা এক টুকরো সন্দেশ মুখে দিয়ে থু করে ফেলে দিল বাসি সন্দেশ। কোত্থেকে আনলে মামা?

শওকত সাহেব রাত আটটায় সন্দেশের দোকানে রওনা হলেন ফিরিয়ে দিয়ে পয়সা নিয়ে আসতে। বয়স হয়েছে টের পাওয়া যাচ্ছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। মুনার কাছ থেকে চেয়ে রিকশা ভাড়াটা নিয়ে এলে হত।

ঠাণ্ডাও লাগছে। এবার কি আগেভাগে শীত পড়ে গেল নাকি? গরম চাদরটা সঙ্গে আনলে হত।

## ১৬

টিনা বিরক্ত হয়ে বলল দু'ঘণ্টা আগে আসবার জন্যে খবর পাঠালাম না?

কাজ ছিল ভাবী।

টিনা রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল, অল্পের জন্যে মিস করলি, তোর ডাক্তার এসেছিল। বকুল বড়

লজ্জা পেল। ইদানীং টিনা ভাবী কথায় কথায় বলছে  তোর ডাক্তার। কি লজ্জার ব্যাপার, কারো কানে গেলে কি হবে কে জানে।

বাচ্চাদের গা গরম, ডাক্তার ডাকতে হয়। কোন ডাক্তারকে আর ডাকি, তোর ভাইকে বললাম বকুলের ডাক্তারকেই ডাক।

বকুল লাল হয়ে বলল  কি যে তুমি কর ভাবী।

টিনা বকুলের কোলে একটা বাচ্চা তুলে দিল। গা সত্যি গরম, মুখে লাল লাল কি দেখা যাচ্ছে।

ওর কি হয়েছে ভাবী?

কিছু না, মাসি-পিসি। সব বাচ্চাদের হয়। তোকে একটা বিশেষ কাজে ডেকেছি বকুল। একটা না দু'টা বিশেষ কাজ। প্রথমটা হচ্ছে নাম ঠিক করেছিস?

উঁহু।

আজকেই নাম চাই। খুব জরুরি।

কেন এত জরুরি কেন?

টিনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল  বাচ্চাদের দাদা চিঠি দিয়েছে। নাতীদের নাম যেন ফজলুর সঙ্গে মিল রেখে বজলু আর মজনু রাখা হয়। তোর ভাই বলছে, বাবা যা চান তাই রাখ। আমি মরে গেলেও ছেলেদের নাম বজলু মজনু রাখব না। এখন ছেলেদের কত সুন্দর সুন্দর নাম হয়, আর আমার দুটোর নাম হবে বজলু আর মজনু?

বকুল হেসে ফেলল।

টিনা বিরক্ত হয়ে বলল, হাসির কি হল? সুন্দর সুন্দর নাম দশ মিনিটের ভেতর বের কর।

ঠিক আছে করব, এখন দ্বিতীয় জরুরি কথাটি বল?

তোর ডাক্তারকে আজ বললাম তোর কথা।

তার মানে।

খোলাখুলি বললাম। প্রথমে চা-টা খাইয়ে ভাই সম্পর্ক পাতালাম, তারপর বললাম  তুমি বয়সে আমার ছোট হবারই কথা, কাজেই তুমি বলছি।

বকুল বলল, থাক ভাবী আমি আর শুনতে চাই না।

শুনতে না চাইলে উঠে চলে যা, আমার যেটা বলার সেটা বলে যাচ্ছি। তারপর আমি বললাম তুমি কি ভাই বকুল নামের কোনো মেয়েকে চেন? সে দেখি লজ্জায় টমেটোর মত হয়ে গেল। আমি বললাম  ওকে আমি ছোটবেলা থেকে চিনি। এ রকম মেয়ে পৃথিবীতে খুব কম জন্মায়। তুমি যদি চাও এই মেয়েটির সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করি।

বকুল ভেবেছিল সে কোনো জবাব দেবে না, কিন্তু নিজের অজান্তেই সে বলল, উনি কি বললেন?

কি বললেন সেটা শোনার দরকার নেই। শুনলে পায়া ভারী হয়ে যাবে। তোর মুনা আপা বাসায় আছে? তার সঙ্গে আমার কথা আছে। আছে বাসায়?

না।

কোথায় গেছে?

জানি না। মামুন ভাইয়ের কাছে বোধ হয়।

কখন আসবে?

সন্ধ্যার পর চলে আসবে।

ঠিক আছে সন্ধ্যার পর আমি যাব তোদের বাসায়।

বকুল জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল। তার চোখে পানি চলে এসেছে। সে টিনা ভাবীর কাছে তা গোপন করতে চায়।

টিনা হেসে বলল  কেঁদে গাল ভাসাচ্ছিস কেন বোকা মেয়ে? যা, বাসায় চলে যা। তোর আপাকে বলিস মনে করে আমি আসব। জরুরি কথা আছে তার সাথে।

টিনা এসে তাকে জড়িয়ে ধরল। বকুল দীর্ঘ সময় বসে বসে কাঁদল। দুজনের কেউই কোনো কথা বলল না।

মামুন তাকিয়ে আছে রাগী চোখে।

এমন রাগী চোখে তাকিয়ে থাকার মত তো কিছু হয়নি। মুনার মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হচ্ছিল। সে বলল - চল যাই, কথা তো শেষ হল।

না শেষ হয়নি, আরো কথা আছে।

মামুন একটা সিগারেট ধরাল। মুনা ঘড়ি দেখল আটটা প্রায় বাজে বাজে। কল্যাণপুরের হাজি সাহেবের বাসায় আসতে অনেকখানি সময় লেগেছে। এখানে না এলেও চলত। এমন কোনো জরুরি কথা মামুনের ছিল না যা শোনার জন্যে তাকে কল্যাণপুরের এই বাসায় আসতে হবে।

মুনার নিজের হাতের কেনা জিনিসপত্র চারদিকে ছড়ান। থালা বাটি চায়ের কাপ। কাঁটা চামচ। বসার মোড়া। দেখতে এমন মায়া লাগে। মুনা ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস গোপন করল। দিনের অবস্থা ভাল না। আকাশে মেঘ করেছে। বাড়ি ফেরা দরকার। মামুন হাতে সিগারেট ছুড়ে ফেলে বলল - তুমি তাহলে আমাকে বিয়ে বরবে না?

করব না এমন কথা তো বলিনি। বলেছি এখন না।

একই কথা। এখন না মানে কখনো না।

মুনা চুপ করে রইল। মামুন ধমকে উঠল - কথা বলছ না কেন?

কি বলব?

তোমার মনে কি আছে সেটা বল?

তোমাকে বলার মত তেমন কিছু আমার নেই। তুমি একজন স্বার্থপর মানুষ। আমার ভাল লাগে না।

আর তুমি কি মাদার তেরেসা?

মুনা ক্লান্ত স্বরে বলল আমার মাথা ধরেছে। বাসায় যাব। মামুন হঠাৎ উঠে দরজার ছিটকিনি তুলে দিল। মুনা বলল কি করছ?

তেমন কিছু না।

মামুন বেশ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বাতি নিভিয়ে জড়িয়ে ধরল মুনাকে। মুনা একবার ভাবল আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে। কিন্তু সে চিৎকার করল না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সত্যি সত্যি কি তার জীবনে এটা ঘটছে?

শওকত সাহেব বললেন, তোর কি হয়েছে মুনা? মুনা বলল, আমার কিছুই হয়নি মামা। আমি বেশ ভাল আছি।

এ রকম লাগছে কেন তোকে?

মাথা ধরেছে।

একা এসেছিস? মামুন আসেনি?

না। একাই এসেছি।

শওকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, একটা খবর আছে মুনা। আজ অফিসে গিয়েছিলাম। বড় সাহেব যেতে বলেছিলেন। অফিসে গিয়ে শুনলাম ওরা কেইস উইথড্র করেছে। চাকরিও ফেরত পাওয়া যাবে।

ভাল।

তোর কি হয়েছে মুনা?

কিছু হয়নি মামা। আমি ভাল আছি।

মুনা ঘর অন্ধকাব করে একা একা তার নিজের বিছানায় বসে রইল। পাশের বিছানায় বাবু শুয়ে আছে। বোধ হয় তার মাথা ধরেছে। শওকত সাহেব একবার এসে বিরক্ত স্বরে বললেন - পড়াশোনা কিছু হচ্ছে না। সন্ধ্যা না হতেই ঘুম। মুনা তুই তো কিছু দেখিস না, ডেকে তোল।

মুনা কিছু বলল না। শওকত সাহেব বললেন বকুল দেখি শাড়ি পরে সেজেগুজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মুনা সে কথারও জবাব দিল না।

তুই ভাল আছিস তো মা?

ভালই আছি মামা।

রাত দশটার দিকে আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল। শীতকালের বৃষ্টি। নামলেই ঠাণ্ডা লাগবে। তবু বকুল ফিসফিস করে বলল, বৃষ্টিতে একটু ভিজবে আপা?

বকুলের পরনে একটা নীল রঙের শাড়ি। আবার কপালে নীল টিপও দিয়েছে। তার খুব ইচ্ছে

হচ্ছে বৃষ্টিতে নামার। সে আবারও বলল, আপা এস না। পায়ে পড়ি তোমার।

আহ্ কি সুন্দর লাগছে বকুলকে!

## ১৭

পরপর তিন কাপ চা খেয়ে ফেলল বাকের।

সে বসেছে জলিল মিয়ার স্টলে। দৃষ্টি এগার নম্বরের বাড়িটির দিকে। কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়ি। এক মাস হল ভাড়া দেয়া হয়েছে। সন্দেহজনক ভাড়াটে। নজর রাখতে হচ্ছে সে জন্যেই। তার একটা দায়িত্ব আছে। চোখের সামনে বেচাল কিছু হতে দেয়া যায় না। এটা ভদ্রলোকের পাড়া। সবাই ফ্যামিলি ম্যান। ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাস করে। এলেবেলে কেউ না।

বাকের হাতের ইশারায় জলিল মিয়াকে ডাকল। জলিল মিয়া ক্যাশ সামলাচ্ছিল। সকাল বেলাটা বিজনেসের আসল সময়। ক্যাশ ফেলে হুট করে উঠে আসা যায় না। কিন্তু না গিয়েই বা উপায় কি? বাকের ভাই ডাকছেন। জলিল মিয়া বহু কষ্টে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল। বিনীত একটা ভঙ্গি করে বলল, কি বাকের ভাই?

কাছে আসতে বললাম। এক মাইল দূরে থেকে - কি বাকের ভাই? তাড়াতাড়ি আসেন। প্রাইভেট কথা আছে।

জলিল মিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস গোপন করে উঠে এল। বাকের গলার স্বর খাদে নামিয়ে ফেলল।

এগার নম্বর বাড়িটার ব্যাপার কি?

জানি না তো বাকের ভাই।

ভাল করে দেখলে কি মনে হয়।

জলিল মিয়া তাকাল এগার নম্বর বাড়ির দিকে। কিছুই বুঝতে পারল না। আর দশটা বাড়ির মতই। আলাদা কিছু না। নতুন রঙ করা হয়েছে এই যা।

বোঝা যায় কিছু?

জি না।

একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে না, বাড়ির সামনে? কালো রঙের।

হুঁ, তা আছে।

বোঝা যায় কিছু?

জ্বি না।

চোখ-কান বন্ধ করে দোকান করেন, বোঝা যাবে কি? চোখ দুটি খুলে পকেটে রেখে দিলেই হয়। সেইটাই ভাল। ব্যবহার যখন হয় না।

জলিল মিয়া এটাকে রসিকতা মনে করে হাসতে চেষ্টা করল। বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে না কি রিকশা দাঁড়িয়ে আছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তার নেই। একদল চোর নিয়ে দোকান চালাতে হচ্ছে। এদিক-ওদিক তাকাবার সময় কি আছে? চায়ের স্টল করতে গেলে ম্যানেজারের দশটা চোখ থাকতে হয়। তাকিয়ে থাকতে হয় দশ দিকে। তার দুটা মাত্র চোখ।

বাকের ভাই আমি যাই। ক্যাশ খালি।

বাকের সে কথার জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কালো গাড়িটার মালিক বের হয়ে আসছে। লোকটার ওপর চোখ রাখা দরকার। লোকটা মুশকো জোয়ান। চকচকে একটা পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে আছে। তাকে বিদেয় দিতে আঠার-উনিশ বছরের একটা মেয়ে গেটের বাইরে এসেছে; খুব হাত নাড়ছে। লোকটা গম্ভীর।

বাকের এগিয়ে গেল। তার হাতে সিগারেট। মেয়েটাকে কাছ থেকে দেখা দরকার। দুই বোন এবং এদের মা থাকে এ বাড়িতে। মেয়েদের বাবা থাকে ইরান অথবা ইরাকে। বাড়িওয়ালা তাই বলল। পয়সাওয়ালা ফ্যামিলি। এক বছরের ভাড়া অ্যাডভান্স দিয়েছে। এতেই বাড়িওয়ালা খুশি। এদের নজর শুধু টাকার দিকে। টাকা ঠিকমত পেলেই হল। অন্য কিছু দেখবে না।

বাকের গেটের কাছে পৌঁছবার আগেই মেয়েটি ভেতরে ঢুকে গেল। চিমশে ধরনের এক বুড়ো এসে গেটে তালা লাগিয়ে দিল। এটাও সন্দেহজনক। সব সময় গেটে তালা থাকবে কেন? তাছাড়া বুড়োর ধরন-ধারণও কেমন কেমন। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটে। কারো চোখের দিকে তাকায় না। মনে পাপ আছে নিশ্চয়ই। বাকেরের সঙ্গে একদিন অল্প কিছু কথা হয়েছে।

বুড়ো বাজার করে ফিরছিল। দু'হাতে দুটো ব্যাগ। ব্যাগের ভারে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। রীতিমত ঘামছে। বাকের এগিয়ে গিয়ে বলল, কেমন আছেন ভাই?

বুড়ো দারুণ চমকে উঠল। হাত থেকে বাজারের ব্যাগ পড়ে যাবার মত অবস্থা। ব্যাগ নামিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

গোটা বাজারটাই কিনে এনেছেন দেখি। এত কি কিনলেন?

আমাকে বলছেন?

আপনাকে ছাড়া আর কাকে বলব? আর কেউ কি আছে আশপাশে? এত বাজার যে— ব্যাপার কি? পার্টি-ফার্টি নাকি?

সপ্তাহের বাজার।

চলে যাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান দুটো কথা বলি। এই পাড়ায় নতুন এসেছেন আলাপ-পরিচয় হয় নাই। আমার নাম বাকের। নেন সিগারেট নেন।

আমি সিগারেট খাই না। অন্যদিন আপনার সঙ্গে কথা বলব। আজ আমার একটু তাড়া আছে।

নামটা বলে যান।

জোবেদ আলী।

মেয়ে দুটির কে হন আপনি?

চাচা। দূর সম্পর্কের চাচা।

জোবেদ আলী হাঁটা ধরল। এবং দু'বার পেছন ফিরে তাকাল। চোখের দৃষ্টি মাছের মত। খুবই সন্দেহজনক।

তালাবদ্ধ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে বাকের দ্বিতীয় সিগারেটটি ধরাল। সাড়ে দশটা বাজে। চড়চড় করে রোদ বাড়ছে। রোদের মধ্যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। সানগ্লাস সঙ্গে নেই। মাথা ধরে যাবে। বাকের গেটের ভেতর উঁকি দিল। বাড়িটা ভাল সাজিয়েছে। ফুলের টব দিয়ে ছয়লাব করে ফেলেছে। একটা কুকুরও আছে। এ পাড়ায় কুকুরওয়ালা বাড়ি তাহলে দুটা হল। বদরুদ্দীন সাহেবের বাড়িতেও কুকুর আছে। সেই কুকুরটা অবশ্যি দেশী। এদেরটার মত না। এই বাড়ির কুকুরটা উলের বলের মত, দেখলেই লাথি দিতে ইচ্ছা করে। একদিন নির্ঘাৎ লাথি বসাবে। এখনই পা নিশপিশ করছে।

বাকের দেখল মুনা হনহন করে যাচ্ছে। আজও সে দেরি করল অফিসে যেতে। রিকশা পেতে আরো আধঘন্টা লাগবে। অফিসে পৌঁছতে পৌঁছতে সাড়ে এগারটা বেজে যাবে। কেউ অবশ্যি কিছু বলবে না। মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মানোর অনেক অসুবিধা আছে।

মুনা। এই মুনা।

মুনা থমকে দাঁড়াল।

অফিসে যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ।

চল, রিকশা ঠিক করে দেই।

রিকশা আমি নিজেই ঠিক করতে পারব।

চল না, আমার চেনা রিকশাওয়ালা আছে। হাফ ভাড়ায় নিয়ে যাবে।

বাকের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। মুনা কিছু বলল না। বলে লাভ নেই। সে আসবেই। সারা পথ বকবক করতে করতে মাথা ধরিয়ে দেবে।

এগার নম্বর বাড়ির ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছ?

কি ব্যাপার?

দুটি মেয়ে মাকে নিয়ে একা থাকে।

তাতে অসুবিধা কি?

না কোনো অসুবিধা নাই। মেয়েগুলি স্কুল-কলেজ কোথাও যায় না বাড়িতেই থাকে। গাড়ি করে নানান কিসিমের লোকজন আসে প্রায়ই। আজ সকালেই একজনকে দেখলাম।

পরের ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামান কেন, বাকের ভাই?

বেচাল কিছু কিনা তাই ভাবছি। পাড়ার একটা ইজ্জতের ব্যাপার আছে না? ভেসে যেতে দেয়া

যায় না।

পাড়ার ইজ্জতের দায়িত্বটা আপনাকে দিল কে?

না, তা না। দায়িত্ব কিছু না।

বাকের খানিকটা বিষণ্ন হয়ে পড়ল। মুনার সঙ্গে দেখা হলেই তার এ রকম হয়। মন কেমন খারাপ হয়ে যায়। বাকের ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে রিকশার খোঁজে লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল। এই সময় রিকশা পাওয়া মুশকিল। বড় রাস্তা পর্যন্ত যেতে হবে।

মুনা অফিসে ঢুকতেই পাল বাবু বললেন, আজ এত দেরি করলেন যে? বড় সাহেব তিনবার আপনাকে খোঁজ করেছেন। যান তাড়াতাড়ি যান। ভাল একটা এক্সকিউজ তৈরি করুন। বলবেন রিকশা এক্সিডেন্ট হয়েছে। মুনা হাসল। বড় সাহেব কাউকে ডাকলেই পাল বাবু অস্থির হয়ে পড়েন। কত রকম অদ্ভুত সাইকোলজি থাকে মানুষের। বেশির ভাগ মানুষই কি অন্যের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামায়? পাল বাবু উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, যান। অপেক্ষা করছেন কেন?

যাচ্ছি।

যাচ্ছি বলেও মুনা তার চেয়ারে বসল। টেবিল ভর্তি ফাইল। একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিমছাম টেবিল বোধ হয় তার কখনো হবে না। রোক একগাদা ফাইল জমা হয়ে থাকবে। বড় বড় ফিগার ভর্তি ফাইল। প্রতি পাতায় দশটা করে ভুল থাকবে। ক্যালকুলেটর টিপে টিপে ফিগার চেক করতে করতে মাথা ধরে যাবে এবং বমি বমি ভাব আসবে। কুৎসিত ব্যাপার। পাল বাবু বললেন, আবার বসে পড়লেন কেন?

শরীরটা বিশেষ ভাল না পাল বাবু। ফাইল দেখে মাথা ঘুরাচ্ছে। বমি আসছে। মনে হচ্ছে বমি করে দেব।

মুনা মুখ বিকৃত করল।

স্যারের সঙ্গে দেখা করে আসেন। তারপর রেস্ট নেন। এক গ্লাস লেবুর সরবত খান। শরীর ফ্রেশ হয়ে যাবে। ভিটামিন সি আছে। খুব এফেকটিভ। যান যান দেরি করবেন না, স্যারের সঙ্গে ঝামেলাটা সেরে আসুন। আমি সরবতের ব্যবস্থা করছি।

ঝামেলা করতে হবে না। আমি অফিসে বেশিক্ষণ থাকব না। এক্ষুণি চলে যাব।

কেন?

বলেছি তো আপনাকে, আমার শরীরটা ভাল না। মাথা ঘুরছে।

বড় সাহেব কাকে যেন টেলিফোন করছিলেন। হাত ইশারা করে মুনাকে বসতে বললেন। টেলিফোন নিশ্চয়ই খুব ব্যক্তিগত। তিনি নিচু গলায় কথা বলছেন এবং মনে হচ্ছে মুনার উপস্থিতিতে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছেন। মুনার একবার ইচ্ছে হল বাইরে গিয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বড় সাহেব হাত ইশারা করে বসতে বলেছেন। মুনা ইতস্তত করতে লাগল। কথাবার্তা শুনতে ইচ্ছে করছে না, তবু শুনতে হচ্ছে। অফিসের এত বড় একজন মানুষ কেমন অসহায় গলায় কার যেন রাগ ভাঙাবার চেষ্টা করছেন। নিশ্চয়ই তার স্ত্রীর।

বসুন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

মুনা বসল। এই লোকটির অফিসে অনেক বদনাম আছে। কিন্তু মুনা কোনোটিই বিশ্বাস করে না। তার ধারণা ছোটখাটো এই মানুষটি নিতান্তই ভাল মানুষ। শুধু ভাল না, বেশ ভাল।

মিস মুনা!

জি।

ব্যাপার কি বলুন তো? তিন মাসের ছুটি চেয়েছেন।

আমার স্যার ছুটি পাওনা আছে।

সে তো সবারই আছে। আমারও হিসেব করলে এক বছরের ছুটি পাওনা হবে। তাই বলে কি আমি এক বছরের ছুটি নেব? বলুন?

মুনা জবাব দিল না। তার ধারণা ছিল ছুটি দিতে তিনি আপত্তি করবেন না।

মিস মুনা আপনার কি শরীর খারাপ?

জি না স্যার। শরীর ভালই।

তাহলে এত লম্বা ছুটি দিয়ে কি করবেন? আপনার মামার চাকরি সংক্রান্ত যে ঝামেলা ছিল তাও তো মিটে গেছে বলে আমার ধারণা। মেটেনি?

জি মিটেছে।

বড় সাহেব সিগারেট প্যাকেট নাড়াতে নাড়াতে বললেন, মেটারনিটি লিভ ছাড়া এত লম্বা ছুটি কখনো দেয়া হয় না। বুঝতে পারছেন? তবে বিয়ে-টিয়ের কোনো ব্যাপার হলে মাস খানেক ছুটি নিন।

বিয়ে-টিয়ের কোনো ব্যাপার নয় স্যার।

ও আচ্ছা।

স্যার আমি তাহলে উঠি?

ঠিক আছে যান। অফিসে কি রকম কাজের চাপ বুঝতেই পারছেন। ইয়ার এন্ডিং। নিশ্চয়ই আপনার টেবিলে দশ-পনেরটা ফাইল পড়ে আছে। আছে না?

জি আছে।

বড় সাহেব ফাইলপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুনা খুব মন খারাপ করে তার টেবিলে ফিরল। সে ধরেই নিয়েছিল আজ তার ছুটি হবে। এতটা আশা উচিত হয়নি। কেন সে করল কে জানে।

টেবিলে কি ফাইলের সংখ্যা আরো বেড়েছে? মুনা শুকনো মুখ করে তার চেয়ারে বসতেই পাল বাবু বিশাল এক গ্লাস লেবুর সরবত নিয়ে এলেন। সেটা দেখা মাত্র গা গুলাতে শুরু করল।

নিন এক চুমুকে খেয়ে ফেলুন। হেভি ট্রাবল হয়েছে জোগাড় করতে। লেবু কিনে এনে বানানো। ক্যান্টিনওয়ালাকে এক টাকা দিয়েছি চিনির জন্য। তাও ব্যাটা দিতে চায় না। যত ছোটলোক এসে জড় হয়েছে। নিন খান। চুমুক দিন।

রেখে দিন আপনি। আমি ধীরে-সুস্থে খাব। এখন ইচ্ছে করছে না।

মুনা দুপুর পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ করল। একটা থেকে লাঞ্চ ব্রেক। লাঞ্চ ব্রেকের কিছু সময় আগেই সেকশনাল ইনচার্জ মতিন সাহেব এসে বিরস মুখে বললেন, আপনি কি ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন? মুনা মাথা নাড়ল। মতিন সাহেবের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভাল নয়। কথাবার্তা তেমন হয় না।

ছুটির দরখাস্ত তো আমার মাধ্যমে যাওয়ার কথা. আপনি সরাসরি করেছেন কেন? ব্যাপার কি?

আপনি ঐ দিন ছিলেন না তাই।

ঐদিন ছিলাম না, পরে এসেছি তো। নিখোঁজ তো হয়ে যাইনি। অফিসের একটা ডেকোরাম আছে। আইন-কানুন আছে। সে সব মানা উচিত। নাকি আপনি মনে করেন উচিত না?

মুনা কিছু বলল না। আশপাশের সবাই তাকাচ্ছে। টাইপিস্ট দুজন টাইপ বন্ধ করে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছে। মতিন সাহেবের কথা শোনার জন্য টাইপ বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল না। তিনি বেশ উঁচু গলাতেই কথা বলছেন। ইচ্ছে করেই বলছেন। সবাইকে শোনাতে চান।

মিস মুনা।

জি স্যার।

বড় সাহেবের সাথে আপনার ব্যক্তিগত পরিচয় থাকতে পারে। শুধু আপনার কেন অনেকেরই থাকতে পারে তার মানে এই না যে, সামান্য ব্যাপারেও তার কাছে যেতে হবে। ভবিষ্যতে এটা দয়া করে মনে রাখবেন। প্লিজ।

মুনার চোখ ভিজে উঠল। সে কি বলবে ভেবে পেল না। সরি বলবে না চুপ করে থাকবে? মতিন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। একটা টাইপ করা কাগজ এগিয়ে দিলেন তার দিকে। থমথমে গলায় বললেন, এই নিন অর্ডার। বড় সাহেব আপনাকে দু'মাসের ছুটি মঞ্জুর করেছেন। যান বাড়ি গিয়ে ঘুমান। কাজের সময়টাতে যদি আপনাদের ছুটির দরকার হয় তাহলে অফিস খোলা রাখার মানে কি? সব বন্ধ করে দিলেই হয়।

মতিন সাহেব কি বলছেন না বলছেন তা মুনার কানে ঢুকছে না। সে টাইপ করা অর্ডারটি দ্বিতীয়বারের মত পড়ছে--- 'স্বাস্থ্যগত কারণে আপনাকে দু'মাসের ছুটি মঞ্জুর করা হল। আপনি ছুটিতে যাবার আগে আপনার দায়িত্ব ডিলিং সেকশনের জুনিয়র এসিসটেন্ট জনাব রকিবউদ্দিন ভুইয়াকে বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন।...'

অফিস থেকে বেরুতে পাঁচটা বেজে গেল। পাল বাবু সঙ্গে এলেন রিকশা খুঁজে দেবার জন্যে।

আসল কারণ অবশ্যি দু'মাস ছুটি নেবার রহস্যটা জানা। এত কৌতূহল মানুষদের? মানুষের কৌতূহল যদি কিছু কম থাকত তাহলে পৃথিবীটা আরো সুন্দর হত। কিংবা কে জানে হয়ত কৌতূহল আছে বলেই হয়ত পৃথিবী সুন্দর।

হঠাৎ ছুটি নিলেন ব্যাপার কি?

এমনি নিলাম।

আমরা আরো ভাবলাম বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার।

না ঐ ব্যাপার হলে আপনারা জানতেন। জানতেন না?

অবশ্যি ঠিক। ওদের সেই কথাই বলেছিলাম।

কাদের?

কলিগদের। সবাই জিজ্ঞেস করছিল।

মুনা রিকশায় উঠে পড়ল। ঝকঝকে সুন্দর আকাশ। অপরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাটে লোকজন গিজগিজ করছে কিন্তু আকাশটা কি নির্জন কি পরিষ্কার। মুনার বাসায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। একা একা ঘুরতে ইচ্ছা করছে। কালও অফিস থেকে ফিরে একা একা বেশ খানিকক্ষণ ঘুরেছে। শাহবাগের একটা দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেস্ট্রি কোক খেয়েছে। আজও কি সে রকম করবে? নাকি যাবে মামুনের কাছে? একদিন না একদিন তো যেতেই হবে। আজই সে দিন হতে অসুবিধা কি? এখন অবশ্যি তাকে পাওয়া যাবে না। অপেক্ষা করতে হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত। কিংবা কে জানে হয়ত পাওয়া যাবে। না পাওয়া গেলেও কোনো ক্ষতি নেই।

মামুন অবাক হয়ে বলল, বিশ্বাস হচ্ছে না তুমি এসেছ। আমার ধারণা ছিল তুমি কোনোদিনই আসবে না। তোমাকে শান্ত করবার জন্যে আমাকেই যেতে হবে। রাগ ভাঙাতে হবে। তোমার নেচার তো জানি। আজই যাব ভেবেছিলাম।

যাওনি তো।

না যাইনি। সাহস হয়নি। তোমাকে কি বলব, কিভাবে ক্ষমা চাইব তাই ভাবছিলাম ক'দিন ধরে। মারাত্মক মেন্টাল প্রেসার গেছে এই ক'দিন ধরে। ইউ কেননট ইমাজিন।

এখন কি প্রেসারটা কমেছে?

হ্যাঁ কমেছে। যখন তুমি বলবে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছ তখন পুরোপুরি কমে যাবে। এক মিনিট বস, আমি আসছি।

কোথায় যাচ্ছ?

চা-টা দিতে বলি। যাব আর আসব। রিলাক্স কর।

মামুন চটি ফটফট করতে করতে খুব ব্যস্ত ভাবে নিচে নেমে গেল। নেমে যাওয়ার ভঙ্গি কত সহজ কত স্বাভাবিক। মুনা নিজের মনেই খানিকক্ষণ হাসল। একটি দশ-এগার বছরের ছেলে কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিচ্ছে। নতুন কাজের ছেলে বোধহয়। এই মেসে দু'দিন পরপরই নতুন কাজের ছেলে আসে। কিছুদিন থাকে তারপর কোনো-এক বোর্ডারের জিনিসপত্র চুরি করে চলে যায়। একবার মামুনের জিনিসপত্র নিয়ে পালিয়ে গেল। ঐ ছেলেটার নাম ছিল রাখাল। মুনার সঙ্গে ভালই খাতির ছিল। তাকে আসতে দেখলেই ছুটে মামুনকে খবর দিত। মামুন যখন থাকত না সে ঘর খুলে দিত। মেঝেতে বসে গল্প করত।

রাখাল কি কারো নাম হয়? তুই তো আর গরু চড়াস না যে নাম থাকতে হবে রাখাল?

আপা কি করমু কন। বাপ-মায় রাখছে।

হিন্দুদের রাখাল না থাকে কিন্তু মুসলমান। নামটা বদলানো দরকার বুঝলি? সুন্দর রেখে একটা নাম দেব তোর। ঠিক আছে?

জি আইচ্ছা।

মুনা ভেবে রেখেছিল তারা যখন নতুন বাসা করবে তখন রাখালকে মেস থেকে নিয়ে নেবে। যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চাকরি করে সেখানে একটি চটপটে কাজের ছেলে দরকার। বাজার করবে, রান্না করবে, বাড়ি পাহারা দেবে।

চেহারা দেখে মানুষকে বোঝা বোধ হয় খুব মুশকিল। এই রাখাল যে এই কাণ্ড করবে কে জানত।

মামুন একগাদা খাবার-দাবার এনেছে। ডালপুরি, পেঁয়াজু। ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা।

মুনা চা খাও। নিজে ঢেলে নাও। বেশ লাগছে খেতে। মামুন তার বিছানায় পা তুলে বসেছে।

মাঝে মাঝে পা নাড়াচ্ছে। পা নাচান দেখতে ভাল লাগে না। আগে অনেকবার মামুনকে সে পা নাচাবার জন্যে বকা দিয়েছে। আজ কিছুই বলল না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মুনা!

বল।

তুমি আসায় আমি যে কি পরিমাণ খুশি হয়েছি তা তোমাকে বোঝানো মুশকিল। যা দুশ্চিন্তা করছিলাম। ঐ দিনের ব্যাপারটার জন্যে আমি খুব দুঃখিত।

দুঃখিত?

হ্যাঁ। দুঃখিত। লজ্জিত। অনুতপ্ত। ব্যথিত।

এত কিছু একসঙ্গে?

মামুন লক্ষ্য করল, মুনা চা খাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার মুখ ভাবলেশহীন। যেন সে তার কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না। তাকিয়ে আছে দূরে কোথাও।

মুনা!

মুনা তাকাল তার দিকে, জবাব দিল না। মামুন সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, ঐ দিনটার ঘটনা আমি জাস্টিফাই করতে অনেক চেষ্টা করেছি। দেখ মুনা, আমাদের বিয়ে ঠিকঠাক হয়ে আছে। আমবা দুজনে মিলে একটা বাড়ি ভাড়া করেছি। ঘর সাজাবার জিনিসপত্র কিনেছি। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা হয়নি কিন্তু ধরতে গেলে আমরা স্বামী-স্ত্রী। ঠিক না? বল তুমি, অ্যাম আই রাইট?

মুনা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল। মামুন তা লক্ষ্য করল না। যেন সে ক্লাসে বক্তৃতা করছে এমন ভঙ্গিতে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলতে লাগল, দেখ মুনা, ঐদিন আশপাশে কেউ ছিল না। তুমি এবং আমি। হঠাৎ আমার বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে গেল। তুমি ব্যাপারটা কি ভাবে নেবে কিছুই ভাবলাম না। মানে...।

থাক আমি শুনতে চাই না।

শুনতে না চাওয়াই ভাল। আমিও বলতে চাই না। তার চেয়ে ভাবা যাক এ জাতীয় কিছু কখনো আমাদের মধ্যে হয়নি. ওটা ছিল একটা দুঃস্বপ্ন।

মুনা তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। মামুনের কেন জানি মনে হল চোখ দুটিতে কোনো প্রাণ নেই। পশুর চোখের মত চোখ। যেখানে আবেগের ছায়া পড়ে না।

মুনা! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করেছ?

ক্ষমা চাও তুমি?

হ্যাঁ চাই। ক্ষমা চাব না মানে? কি ভাব তুমি আমাকে, পশু?

না পশু ভাবি না। মানুষই ভাবি।

তাহলে বল তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ।

ঠিক আছে করলাম। এখন আমি উঠব।

পাগল, এখনি উঠবে মানে? রাত আটটা পর্যন্ত থাকবে। তারপর আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব এবং তোমাদের বাসায় রাতে খাব। তোমার মামার সঙ্গে কথা বলে বিয়ের ডেট ফাইন্যাল করব। বিয়েটা এক সপ্তাহের ভেতর সেরে ফেলতে হবে। এমনিতেই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে।

মামুন অবাক হয়ে দেখল মুনা উঠে দাঁড়াচ্ছে। সে কি সত্যি চলে যাবে? মামুন হাত ধরে তাকে টেনে বসাতে গেল। মুনা কঠিন স্বরে বলল, হাত ছাড়। মামুন হাত ছেড়ে দিল। মুনা নিচু গলায় প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমি এখানে এসেছিলাম একটা কথা বলবার জন্যে। কথাটা হচ্ছে তোমাকে আমি বিয়ে করব না।

কি বলছ পাগলের মত?

যা বলছি ভেবেচিন্তেই বলছি। আমি এক সপ্তাহ ধরেই ভাবছি। আজ তোমাকে বললাম।

সামান্য একটা অ্যাকসিডেন্টকে তুমি এত বড় করে দেখছ কেন? ভিক্টোরিয়ান যুগের কোন মহিলা তো তুমি না। এ কালের মেয়ে এ যুগের মেয়ে।

আমি কোন যুগের মহিলা জানি না। যে কথাটা বলতে এসেছিলাম বলে গেলাম।

শোন মুনা, শোন আমার কথা শোন। ছেলেমানুষির একটা সীমা থাকা দরকার। আমার কথাটা শোন। শান্ত হয়ে বস।

মুনা কঠিন স্বরে বলল, আমার হাত ছাড় নয়ত আমি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করব। মামুন হাত ছেড়ে দিল। মুনা ঘর থেকে নিঃশব্দে বের হয়ে এল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না।

সন্ধ্যা হয় হয় করছে। সন্ধ্যার আগে আগে সব কিছু কেমন অন্য রকম লাগে। পরিচিত ঘর-বাড়ি এমনকি পরিচিত মানুষকেও অপরিচিত মনে হয়। মুনা রিকশা করে বাড়ি ফিরছে। তার বারবার মনে হচ্ছে নিতান্তই অচেনা একটি শহরের অজানা একটি রাস্তায় তার রিকশা যাচ্ছে। এই বোধহয় ভাল। চেনা মানুষের চেয়ে অচেনা মানুষ ভাল।

মুনা বাড়ি ফিরল সন্ধ্যা পার করে। রিকশা থেকে নেমেই দেখল, বাকের ঠিক আগের জায়গাতে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে বাকেরকে লাগছে ভূতের মত। সে মুনাকে দেখেই লম্বা পা ফেলে এগিয়ে এল। ভারী গলায় বলল, সন্ধ্যার পর মেয়েদের এমন একা একা ঘোরাফেরা করা ঠিক না। রোজ চেষ্টা করবে সন্ধ্যার আগে ফিরতে।

আপনি কি সারাদিন এই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন?

আরে না। কি যে বল। আমার কাজ আছে না?

বাকের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল। মুনা বিরক্ত গলায় বলল, আপনি আমার পেছনে পেছনে আসছেন কেন? বাকের থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বলল, তোমার কি হয়েছে?

কিছুই হয়নি। হবে আবার কি?

কাঁদছ কেন?

কি আশ্চর্য। আমি কাঁদছি কেন সেই কৈফিয়তও আপনাকে দিতে হবে?

না তা না। তোমাকে কাঁদতে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। কেউ কিছু বলেছে?

কেউ কিছু বলেনি। আর বললেও আপনার কিছু যায় আসে না। প্লিজ, আমাকে বিরক্ত করবেন না।

না না বিরক্ত করব কেন? যাও বাসায় যাও।

মুনা ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গেল। বাকের তাকিয়ে রইল। মুনাকে সে ছোটবেলা থেকে দেখে আসছে। তাকে সে কখনো কাঁদতে দেখেনি। কত রকম দুঃখ থাকে মানুষের। মানুষ হয়ে জন্মানোটাই একটা বাজে ব্যাপার।

বাকের এগিয়ে গেল। সাতটার ওপর বাজে। বয়েজ ক্লাবে নাটকের রিহার্সেল শুরু হবে। ছেলে-ছোকরাদের কারবার। বয়স্ক কারো থাকা দরকার। নাটকের জন্যে টাকা তুলে দিতে হবে। চার-পাঁচ হাজার টাকার কমে নাটক নামানো যায় না। এরা হুট করে একটা ডিসিসান নেয় ঝামেলা সামলাতে হয় তাকে।

রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে!

এত রাতে রান্নাঘরে কে? মুনা ঘড়ি দেখল। রাত দুটো। চোর নাকি? বাসন-কোসন নড়াচড়া হচ্ছে। চোররা এত শব্দ করে কিছু করবে না। তাছাড়া সে জেগে আছে। টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। চোর আসার কথা নয়। একবার দেখে এলে হয় কিন্তু কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। আগে কখনো এ রকম হত না। কিন্তু এখন কোত্থেকে একটা ভয় ঢুকে গেছে মনে। সন্ধ্যার পর পর একা একা রিকশায় চড়তে ভয় করে। দুপুর রাতে ঘুম ভাঙলে ভয় করে।

মুনা নিচু স্বরে ডাকল, বকুল, বকুল! বকুল নড়ল না। তার ঘুম পাথরের মত। টেনে বিছানা থেকে নামালেও ঘুম ভাঙবে না। বিয়ে হলে এই মেয়ের খুব ঝামেলা হবে। স্বামী বেচারা খুব বিরক্ত হবে। পৃথিবীর সব স্বামীরাই বোধ হয় চায় রাতে গায়ে হাত দেয়া মাত্র স্ত্রী জেগে উঠে আদুরে গলায় বলবে কি চাও? মুনা এসব আজেবাজে কথা ভাবছে কেন? তার নিজের ওপর রাগ লাগল। সে বকুলের শাড়ি ঠিক করে দিল। এত বড় মেয়ে কিন্তু কি বিশ্রী ঘুমুবার ভঙ্গি।

বকুল, বকুল।

বকুল পাশ ফিরল কিন্তু কোনো শব্দ করল না। তার মুখ হাসি হাসি। সুন্দর কোনো স্বপ্ন দেখছে বোধ হয়। ওর বয়সে সে শুধু ভয়ের স্বপ্ন দেখত। একটা স্বপ্ন ছিল সাপের। স্বপ্নটা এত স্পষ্ট যে সব সময় মনে হত সত্যি। সে পুকুরে গোসল করতে গিয়েছে। পানিতে পা ছোঁয়াবার সঙ্গে সঙ্গে পানিতে ভাসতে ভাসতে একটা সাপ আসতে থাকে তার দিকে। সে দৌড়াতে শুরু করে। সাপটা তার পিছু ছাড়ে না। সে পাগলের মত কত অলিতে গলিতে ঢোকে কিন্তু সাপটা থাকেই। পেছনে ফিরলেই সে দেখে লাল পুতির মত দুটি চোখ। চেরা জিব। কি কুৎসিত স্বপ্ন! এমনিতেই কত

ভয়াবহ সমস্যা মানুষের থাকে। ঘুমের মধ্যেও সেসব সমস্যা উঠে আসতে হবে? স্বপ্নটা কেন সব সময় আনন্দের হয় না?

বকুল, বকুল!

কি।

উঠ তো একটু। রান্নাঘরটা দেখে আসি। কে যেন খুটখাট করছে।

বকুল উঠে বসল, বিছানা থেকে নামল। তার ঘুম কাটেনি। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে সে হেলে পড়ে যাচ্ছে। চোখ আধবোজা। এখন মুনার মায়া লাগছে। ঘুম না ভাঙালেই হত।

স্বপ্ন দেখছিলি নাকি, এই বকুল।

না। ক'টা বাজে আপা?

দুটা পাঁচ।

তারা দরজা খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দাটা বেশ ঠাণ্ডা। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি ঠাণ্ডা হবারই কথা। কিন্তু ঘরে গুমট গরম। এখনো ফ্যান ছেড়ে ঘুমুতে হয়। যখন পুরোপুরি শীত পড়বে তখন এই ঘরটি হয়ে যাবে হিমশীতল। কি অদ্ভুত যে বাড়ি।

রান্নাঘরে কিছুই নেই। জানালা বন্ধ। শিকল তোলা। বকুল বলল, ইঁদুর শব্দ করছে আপা। খুব ইঁদুর হয়েছে। এত মোটা একটা ধাড়ি ইঁদুর দেখেছি। মুনা কিছু বলল না। বকুল হাই তুলছে। ঘুম ভাড়িয়ে ওকে তুলে আনাটা খুব অন্যায় হয়েছে।

কে? কথা বলছে কে?

শওকত সাহেবের মোটা গলা শোনা গেল। মুনা বলল, মামা আমি। শওকত সাহেব আর কিছু বললেন না। মুনা ভেবেছিল মামা জিজ্ঞেস করবেন, এত রাতে কি করছিস? তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে আসবেন। কিন্তু তিনি তা করছেন না। মামা কি বদলে যাচ্ছেন? হঠাৎ একা হয়ে পড়লে মানুষ দ্রুত বদলে যেতে শুরু করে। মুনা নিজেও কি বদলাচ্ছে না?

বকুল শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়ল। হয়ত প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে শুরু করছে। বিড়বিড় করে কি সব যেন বলছে। কেমন গম্ভীর শোনাচ্ছে তার গলা। ঘুমের মধ্যে মানুষের গলার স্বর বদলে যায় নাকি? মুনা বাতি নিভিয়ে দিল। ঘুম আসবে না। বাকি রাতটা কাটাতে হবে জেগে। ইদানীং তার ঘুমের সমস্যা হচ্ছে। সন্ধ্যায় খুব ঘুম পায়। চোখের পাতা খুলে রাখা যায় না এমন ঘুম। বিছানায় শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম কেটে যায়।

একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। ফ্যানটা বন্ধ করে দিলে হয়। উঠতে ইচ্ছা হচ্ছে না। তবু সে উঠত কিন্তু তার ধারণা হল ফ্যান বন্ধ করলেই আবার গরম লাগতে শুরু করবে। আবার বিছানা ছেড়ে নেমে যেতে হবে ফ্যান ছাড়বার জন্যে। রান্নাঘরে খুটখাট শব্দ হচ্ছে। ইঁদুর। ইঁদুরের উপদ্রব আগে ছিল না। হঠাৎ হয়েছে। শুধু নয় সেই সঙ্গে প্রচুর তেলাপোকা। এত তেলাপোকাও আগে ছিল না। ঐদিন বাবু বলছিল, মা মারা যাবার পর বাড়িটা অন্য রকম হয়ে গেছে। বলেই সে নিজেই লজ্জা পেয়ে গেল। এটা একটা সাধারণ সহজ কথা। এর মধ্যে লজ্জা পাওয়ার মত কিছু নেই। মামির মৃত্যুর পর বাড়িটা সত্যি সত্যি কিছু বদলেছে। মনে হয় বাড়িটা আগের মত নেই। পরিবর্তন কোথায় হয়েছে তা অবশ্যি ধরা যাচ্ছে না।

ভেতরের দিকে দরজা খোলার শব্দ হচ্ছে। মামা জেগেছেন। বারান্দার ইজিচেয়ারে তিনি এখন বসে থাকেন। রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে তিনি জেগে ওঠেন। তারপর তার ঘুম হয় না। বুড়ো বয়সের কত রকম সমস্যা। কিংবা কে জানে এটা হয়ত তেমন কোনো সমস্যা নয়। বুড়োদের হয়ত জেগে থাকতেই ভাল লাগে। মামা আজ ইজিচেয়ারে শুয়ে নেই। হাঁটাহাঁটি করছেন। সাড়ে তিনটা কি বেজে গেছে? মুনা ঘড়ি দেখতে চেষ্টা করল। আগের ঘড়িটায় অন্ধকারে সময় দেখা যেত। এটাতে দেখা যায় না। রেডিয়াম ডায়াল নেই। বাতি জ্বালাতে হবে। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকার চেয়ে বাতি জ্বালিয়ে ঘড়িটা দেখা যেতে পারে। কিছুক্ষণ গল্প করা যেতে পারে মামার সঙ্গে।

শওকত সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, তুই এখনো জেগে? মুনা মাথা নাড়ল।

প্রায়ই জেগে থাকিস নাকি? বাতি জ্বালা দেখি।

হুঁ থাকি।

শরীর ঠিক আছে তো?

হুঁ আছে।

একটা চেয়ার এনে আমার কাছে বস তো দেখি।

না মামা, আমি এখন শুয়ে পড়ব। ঘুম আসছে।

পাঁচ-দশ মিনিট বস।

মুনা চেয়ার নিয়ে এল। শওকত সাহেব মুনার পিঠে হাত রেখে কোমল স্বরে বললেন, শুনলাম অফিস থেকে ছুটি নিয়েছিস। কি হয়েছে?

কিছু হয়নি। হবে কি? শরীরটা খারাপ তাই ছুটি নিলাম।

মামুনকে তো আর এ বাড়িতে আসতে দেখি না।

আমি আসতে নিষেধ করেছি তাই আসে না। মামা, তোমাকে তো একবার বলেছি ওকে আমি এখন পছন্দ করি না। ঐ প্রসঙ্গ থাক।

একটা মানুষকে এত দিন ধরে পছন্দ করে আসছিস। বিয়ে ঠিকঠাক। এখন হঠাৎ করে...।

মামা, ঐ প্রসঙ্গ বাদ দাও।

বাদ দেব কেন? জানতেও পারব না?

না পারবে না? এত জেনে কি করবে? বেশি জানা ভাল না। মুনা হাসতে চেষ্টা করল। তার ইচ্ছে করছে উঠে চলে যেতে। কিন্তু যেতে পারছে না। কারণ মামা তার পিঠে হাত দিয়ে রেখেছেন। পিঠ থেকে হাত নামিয়ে উঠে চলে যাওয়া যায় না।

মামুনকে একবার আসতে বলিস। ওর সঙ্গে কথা বলব।

মামা, পিঠ থেকে হাত নামাও আমি এখন ঘুমুতে যাব।

এখন আর ঘুমিয়ে কি করবি। ভোর তো হয়ে গেল। তোর তো অফিসও নেই। আয় গল্প করে সারারাত কাটিয়ে দেই।

কিছুক্ষণ শুয়ে থাকব। চোখ জ্বালা করছে।

শওকত সাহেব হাত নামিয়ে নিলেন। তাঁর নিজেরও কেমন ঝিমুনী এসে যাচ্ছে। বয়স হয়ে যাচ্ছে। একটা বয়সের পর সবাই খুব ঝিমুতে পছন্দ করে। ঝিমুনোর মত বয়স কি তাঁর হয়েছে? রিটায়ারমেন্টের এখনো তিন বছর বাকি। বরুণ বাবুরও তিন বছর বাকি রিটায়ারমেন্টের। কিন্তু এখনো তাকে জোয়ান বলে মনে হয়। জুলপির কাছে কিছু চুল পাকা ছাড়া মাথার সব চুল কালো। ঝিমুতে ঝিমুতে শওকত সাহেব একসময় সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়লেন।

তাকে ডেকে তুলল বকুল। তিনি দেখলেন রোদে চারদিক ঝলমল করছে। এত বেলা হয়ে গেছে তিনি কল্পনাও করেননি।

ক'টা বাজে রে?

দশটা।

কি সর্বনাশ! আগে ডাকিসনি কেন?

মুনা আপা নিষেধ করে গিয়েছে।

নিষেধ করলেই হল? আমার কি অফিস-টফিস নেই?

শওকত সাহেব অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যে ভাবেই হোক এগারটার আগে অফিসে পৌঁছতে হবে। বড় সাহেব এগারটার সময় আসেন। এসেই একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে যান। কে কে এখনো আসেনি সেটা মনে মনে নোট করেন।

বকুল!

জি।

মুনাকে ডেকে আন।

আপা তো বের হয়ে গেছে।

কোথায় গেছে? অফিস থেকে তো ছুটি নিয়েছে শুনলাম।

কোথায় গেছে জানি না বাবা। কিছু জিজ্ঞেস করিনি।

জিজ্ঞেস করিসনি কেন?

কাল জিজ্ঞেস করেছিলাম তাতে খুব রেগে গেল।

রাগলে রাগবে। রোজ জিজ্ঞেস করবি। ওর ব্যাপারটা কি?

জানি না বাবা।

জানি না বললে তো হবে না। জানতে হবে।

মুনা কাঁধে কালো ব্যাগ ঝুঁলিয়ে হাঁটছে। ক'দিন ধরেই সে এ রকম করছে। উদ্দেশ্যবিহীন হাঁটা। কোনো একটি দোকানের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ানো তারপর আবার হাঁটা।

আকাশে গনগনে সূর্য। ঘামে মুনার মুখ চটচট করছে কিন্তু ভাল লাগছে হাঁটতে। মনে হচ্ছে কোথাও কোনো বন্ধন নেই। অফিসের তাড়া নেই। ঘর ফেরার আকর্ষণ নেই। শুধু হেঁটে বেড়ানো।

মুনা এগারটার সময় রিকশা নিয়ে নিল। যাবে যাত্রাবাড়ি। যাত্রাবাড়িতে তার এক চাচা থাকেন - মনিব চাচা। তার সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ নেই। হঠাৎ করেই তার কথা মনে পড়ল। মুনার দুঃসময়ে তিনি কোনো রকম দায়িত্ব নেননি। মুখ শুকনো করে বলেছিলেন, নিজের ছেলেমেয়েই মানুষ করতে পারি না আর অন্যের মেয়ে মানুষ করব কি ভাবে? অসম্ভব। মেয়ের মামারা আছে তারা দেখুক। আমি গরিব মানুষ। নিজের চলে না।

মনিব সাহেব বাড়িতেই ছিলেন। তিনি মুনাকে দেখে খুবই অবাক হলেন। ভারী গলায় বললেন, কি রে তুই কি মনে করে? ভাল আছিস?

ভালই আছি। আপনি কেমন আছেন?

আর আমার থাকা। ব্লাড প্রেসার, নড়তে-চড়তে পারি না।

আপনি একা নাকি? আর কেউ নেই?

আছে সবাই আছে যা ভেতরে যা।

সবাই যথেষ্ট খাতির-যত্ন করল। চাচি মুনাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেক দুঃখের কথা বললেন। বড় ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। বৌটা মিচকা শয়তান। এর কথা তাকে লাগাচ্ছে তার কথা ওকে লাগাচ্ছে। বড় মেয়ের এখনো বিয়ে হয়নি কিন্তু ছোটটা বিয়ে করে ফেলেছে। তার একটা বাচ্চাও আছে। জামাইয়ের কোনো চাকরি-বাকরি নাই। শ্বশুর বাড়িতে থাকে। মুরুব্বিদের সামনে সিগারেট খায়। হায়া-শরম কিছুই নাই। আদব-কায়দা তো নাই-ই।

মুনা অবাক হয়ে লক্ষ্য করল কেউ তার কথা বিশেষ জানতে চাচ্ছে না। সবাই নিজেদের সমস্যা বলতে ব্যস্ত। অন্যের ব্যাপারে কোনো মাথাব্যথা নেই। মুনা থাকতে থাকতেই ছোট মেয়ে তার স্বামীর সঙ্গে একটা কুৎসিত ঝগড়া করে ফেলল। তুই-তুকারি গালিগালাজ বিশ্রী কাণ্ড। বাইরের একজন মানুষ আছে এ নিয়ে কেউ চিন্তিত নয়। অন্যদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে যাবে।

বাড়ির মানুষজনের মধ্যে নতুন বৌটিকেই বরং ভাল লাগল। তাকে মোটেই মিচকা শয়তান বলে মনে হল না। কথাবার্তা চমৎকার। বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি আছে। মুনাকে তার ঘরে নিয়ে চা বানিয়ে খাওয়ালো। এই ছোট একটুখানি ঘরে চায়ের সরঞ্জাম এবং কেরোসিন কুকার।

বুঝলেন আপা, এই সংসারে কিছুদিন থাকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আলাদা যে বাসা করব সে উপায়ও নেই। ও যা টাকা-পয়সা পায় তাতে সকলের নাশতার খরচটাই ওঠে না।

করে কি সে?

সিনেমায় ছোটখাটো পার্ট করে।

বল কি?

হুঁ। বেশির ভাগ গুণ্ডার পার্ট পায়। মাথা কামিয়ে অভিনয় করতে হয়।

মুনা বড়ই অবাক হল। তার ধারণা ছিল না আত্মীয়দের মধ্যে কেউ সিনেমায় অভিনয় করে।

সংসার চলে কিভাবে?

চলে কোথায়? চলে না। দেশ থেকে চাল-ডাল আসে। বাবা টুকটাক কিছু ব্যবসা করেন। এখন অসুখে পড়ে সেই ব্যবসার খুব খারাপ অবস্থা। কি যে হবে ভাবতেও পারি না।

মুনাকে দুপুর বেলা খেয়ে তারপর আসতে হল। খাবার আয়োজন বেশ ভাল। মাছ, গোসত ভাজাভুজি। অনেক কয়টা পদ। বুঝাই যাচ্ছে এটা বিশেষ করে তার জন্যেই করা।

খাওয়া শেষ হবার পর মবিন চাচা নিজেই তাকে রিকশায় উঠিয়ে দিতে এলেন, তোর খোঁজখবর নেই মা। নেবার মত অবস্থা আমার না। নরকে বাস করি বুঝলি। ছেলে বিয়ে দিয়ে ডাইনি ঘরে এনেছি। সব ছারখার করে দিচ্ছে। এমনি তো খুব মিষ্টি কথাবার্তা। কিন্তু আসলে বিষকন্যা। আসিস মাঝে-মধ্যে। তোর কথা মনে হয় প্রায়ই। ঐদিনও তোর চাচিকে বলছিলাম।

রিকশা ছুটে চলেছে। মুনার ঘুম পেয়ে যাচ্ছে। বেশ কষ্ট করে তাকে জেগে থাকতে হচ্ছে। আগামীকাল কোথায় যাওয়া যায় তাই ভাবতে ভাবতে মুনার ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করতে লাগল।

১৮

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মামুনের মন খারাপ হয়ে গেল।

শার্টের পকেটের কাছে এক পয়সার সাইজের একটা ফুটো-- তেলাপোকার কাণ্ড। এই শার্ট গায়ে দিয়ে বেরুনো যাবে না। সবাই তাকিয়ে থাকবে। কিন্তু বদলে অন্য কিছু পরতেও ইচ্ছা করছে না। এটা মুনার পছন্দ করে কিনে দেয়া শার্ট। মামুন ভেবে রেখেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই এটাই পরবে। তাতে মুনার উপর এক ধরনে মানসিক চাপ তৈরি হবে। লাল স্ট্রাইপের এই শার্ট নিঃশব্দে সারাক্ষণ বলবে-- 'মুনা, তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে ভালবাসি।' মেয়েদের মনস্তত্ত্বে ছেলেমানুষী একটা ব্যাপার আছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়েরাও এ ধরনের হালকা জিনিস পছন্দ করে।

কিন্তু এটা পরে কী খাওয়া যাবে? ফুটোটা বেশ বড়। সাদা গেঞ্জি দেখা যায়। মামুন আয়নার সামনে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে মন ঠিক করল। থাকুক ফুটো। এতে একটা সুবিধা পাওয়া যাবে। মুনা এক সময় নিশ্চিত বলবে - পকেটের ওখানে কি? সে তখন মুখ কালো করে বলবে হৃদয়ের কাছাকাছি ফুটো হয়ে আছে। খুবই হালকা ধরনের কথা। তবে হালকা ধরনের কথাবার্তাও মাঝে মাঝে শুনতে ভাল লাগে।

মামুন মুনার অফিসে ঢুকে আকাশ থেকে পড়ল। মুনা নেই। সে নাকি দু'মাসের ছুটি নিয়েছে। আজ নিয়ে পাঁচ দিন হল। কিন্তু অদ্ভুত কথা! পাল বাবু চোখ কপালে তুলে বলবেন, সে কী আপনি জানেন না?

জি না, জানি না।

বলেন কি? কেন জানেন না?

মামুন বিরক্ত হয়ে বলল, আমাকে বলেনি তাই জানি না।

কিন্তু আপনাকে বলবে না কেন? হোয়াই? ঝগড়া চলছে নাকি?

না কিছু চলছে না।

বিরক্তিতে মামুনের চোখ সরু হয়ে গেল। পাল বাবু তার বিরক্তিকে মোটেও আমল দিলেন না। জোর করে তাকে ক্যান্টিনে নিয়ে আলুর চপ এবং চায়ের অর্ডার দিয়ে বসলেন। মামুন শুকনো গলায় বলল, খামোকা এসব আনছেন। আমি কিছুই খাব না।

না খেলে না খাবেন। আমার সঙ্গে দু'মিনিট বসতে তো অসুবিধা নেই। আরাম করে বসুন এবং ধীরে-সুস্থে বলুন ব্যাপারটা কি? ঝগড়াটা কি নিয়ে করলেন?

ঝগড়া হয়েছে আপনাকে কে বলল?

এসব বলার দরকার হয় না। আপনার চোখে-মুখে পরিষ্কার লেখা আছে। মান-অভিমানপর্ব বোঝা যায়। হা হা হা।

মামুন কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। আগে এই লোকটিকে ভালই লাগত। আজ কেমন গ্রাম্য লাগছে। কথার ফাঁকে থুথুর কণা ছিটকে আসছে। কিছু কিছু নিশ্চয়ই পড়েছে চায়ের কাপে এবং আলুর চপে। কুৎসিত দৃশ্য। সহ্য করা মুশকিল। মামুন সাহেব।

বলুন।

রাগ ভাঙাবার বুদ্ধি আপনাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। সোজা বুদ্ধি। জটিল সমস্যা গুলি সলভ করতে হয় সহজ বুদ্ধি দিয়ে। কঠিন বুদ্ধি খরচ করলে সমস্যাটা আরো জট পাকিয়ে যাবে। চা খাচ্ছেন না তো। ঠাণ্ডা হচ্ছে।

হোক ঠাণ্ডা। দুপুরে আমি চা খাই না।

তাহলে ঠাণ্ডা কিছু খান - লাচ্ছি আছে। এই ইনাকে ভাল করে লাচ্ছি দাও।

আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন আমি কিছুই খাব না।

আরে ভাই খান। খেতে খেতে আমার বুদ্ধিটা শুনুন। কিচ্ছু না যাবেন, সোজাসুজি পায়ে ধরে ফেলবেন এবং কান্না কান্না গলায় বলবেন ক্ষমা চাই।

রাগে মামুনের গা জ্বলে গেল। কি রকম ইডিওটিক কথাবার্তা। এ ধরনের কথাবার্তা একজন শিক্ষিত মানুষ বলে কি করে?

বুঝলেন মামুন সাহেব, এপ্রোচটা নাটকীয় কিন্তু এর নাম হচ্ছে কোরামিন ইনজেকশান। এটাতেই রোগের আরাম হবে। আর যদি কাজ না হয় তাহলে আপনি অফিসে এসে আমার ডান গালে একটা চড় দিয়ে যাবেন। হা হা হা।

এখানে বসে সময় নষ্ট করার আর কোনো মানে হয় না। যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণই এর বকবকানি শুনতে হবে।

উঠলেন নাকি?

জি উঠলাম।

লাচ্ছি তো মুখেই দিলেন না।

বলছি তো আপনাকে, কিছুই খাব না।

আপনি মিস মুনার বাসায় চলে যান। যা বললাম সেটা করেন। শ্রীকৃষ্ণের মত দেবতা যদি রাধার পা ধরতে পারে তাহলে আপনার ধরতে বাধা কী?

বকুল আজ স্কুলে যায়নি। স্কুল খোলা আছে, টেস্ট পরীক্ষার প্রিপারেশনের জন্যে ক্লাস হচ্ছে না। একা একা বাসায় তার ভয় ভয় লাগছিল। কাজের মেয়েটি তার এক খালার বাড়িতে গেছে এখনো আসেনি। বাবুর স্কুল ছুটি তিনটায়। এতক্ষণ একা একা থাকতে হবে। সে ক্ষণে ক্ষণে চমকে উঠে নিচু গলায় বলছিল কে? একা ঘরে থাকলেই যত ভূতের গল্পগুলি মনে পড়ে যায়। টিনা ভাবীর কাছে শোনা একটা গল্প তখন থেকেই মনে হচ্ছে- কাটা হাতের গল্প। কবজি পর্যন্ত কাটা একটা হাত মানুষের ঘরে এসে ঢোকে। নানান কাণ্ডকারখানা করে। বকুলের দুপুর থেকে মনে হচ্ছে হাতটা তাদের ঘরে এসেছে। রান্নাঘরে খুটখাট করছে। সে একা একা বসে আছে রান্নাঘরে। তার দুপুরের খাওয়া হয়নি। বাবু না আসা পর্যন্ত হবেও না। একা একা রান্নাঘরে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

দুটোর সময় দরজার কড়া নড়ল। বকুলের আনন্দের সীমা রইল না। যাক কেউ-একজন এসেছে। সে দরজা খুলে দেখল মামুন ভাই। হেঁটে হেঁটে এসেছেন বোধ হয়। ঘেমে লাল হয়ে আছেন।

কেমন আছ বকুল?

জি ভাল আছি।

মুনা বাসায় নেই?

জি না। আপা নেই।

কোথায় গেছে?

জানি না। কোথায় যেন ঘুরে বেড়ায়।

বল কি।

ভেতরে আসুন মামুন ভাই। আপনি আসায় যা ভাল লাগছে। একা একা খুব ভয় লাগছিল।

একা তুমি?

জি একা।

মামুন ভেতরে ঢুকল। কথাবার্তা কী বলবে ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ অবশ্যি অপেক্ষা করা যায়। মামুন বলল, সে সাধারণত কখন ফিরে?

কোনো ঠিক নেই। অনেক সময় সন্ধ্যার পর ফিরে।

বল কি?

আপনাদের ঝগড়া হয়েছে তাই না মামুন ভাই?

মামুন ইতস্তত করে বলল, হ্যাঁ হয়েছে। তোমাকে সে কি কিছু বলেছে?

না, মুনা আপা মরে গেলেও কাউকে কিছু বলবে না। আপনাকে একটু চা করে দেই?

উঁহু! ভাত খাইনি এখনো।

আমাদের এখানে খান। আমিও খাইনি।

না ভাত খাব না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে যাব। তুমি আমাকে ঠাণ্ডা এক গ্লাস পানি দাও।

মামুন মুখ কালো করে বসে রইল। বকুল ঠাণ্ডা পানি বদলে ভাত বেড়ে বলল, খেতে আসুন মামুন ভাই। মামুন নিঃশব্দে খাবার টেবিলে গিয়ে বসল। বড় মায়া লাগল বকুলের। কেমন আগ্রহ করে খাচ্ছেন। নিশ্চয়ই খুব ক্ষিধে পেয়েছে।

বকুল!

জি!

আমার ব্যাপারে তোমার আপা তোমাকে সত্যি কিছু বলেনি?

জি না।

আমি একটা অন্যায় করেছিলাম বুঝলে বকুল। তার জন্যে আমার লজ্জার সীমা নেই। আমি তো মহাপুরুষ না। সাধারণ মানুষ। মহাপুরুষেরাও ভুল করে। অন্যায় করে। করে না?

বকুল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মামুন ভাই ক্লাসে বক্তৃতা দেবার মতো ভঙ্গিতে কথা বলছেন। ওদের ভেতর কি সমস্যা হয়েছে কে জানে? বড় জানতে ইচ্ছা করছে।

মামুন খাওয়া শেষ হওয়া মাত্র চলে গেল। অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলে যাওয়া। যেন সে হঠাৎ সবার উপরে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। মনস্থির করছে কিছু-একটা করবে। কেমন থমথমে মুখ।

বাবু এল সাড়ে তিনটার দিকে। শীতের দিন। সাড়ে তিনটায় কেমন বিকেল বিকেল হয়ে যায়। বাবুকে ভাত বেড়ে দিয়ে বুকল বলল, তুই কিছুক্ষণ একা থাকতে পারবি বাবু? আমি ভাবীদের বাসায় পাঁচ মিনিটের জন্যে যাব। বাবু গম্ভীর গলায় বলল, একবার গেলে এক ঘণ্টার আগে আসবে না।

যাব আর আসব। উনার ছেলেদের জ্বর। দেখে আসা দরকার। যাই বাবু? লক্ষ্মী ময়না।

আচ্ছা যাও।

একা একা ভয় লাগবে না তো?

আমার এত ভয় নেই।

ইস কি আমার সাহসী। রাতে তো একা একা বাথরুমে যেতে পারিস না।

বাবু কিছু বলল না। কথাটা সত্যি। দিনের বেলা তার কোনো ভয় লাগে না। কিন্তু রাত হলেই দারুণ ভয় লাগে।

টিনা ভাবী ঠোঁট উল্টে বললেন, তারপর কি মনে করে? তার মনে ভাবী রেগে আছেন। রাগাই স্বাভাবিক। দু'দিন খবর পাঠাচ্ছেন আসবার জন্যে। আসা হচ্ছে না।

বাচ্চারা কেমন আছে ভাবী?

তা জেনে তোর কী হবে? ওরা জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকলেই বা কি আর ভাল থাকলেই বা কি?

বকুল বেশ লজ্জা পেল। দুটি বাচ্চার প্রচণ্ড জ্বর। হাত-পা এলিয়ে ঘুমাচ্ছে। জ্বরের আঁচে গা কেমন লালাভ হয়ে আছে।

ডাক্তার দেখিয়েছ ভাবী?

হুঁ দেখিয়েছি। তোর ডাক্তারকেই আনিয়েছিলাম। ও ডাক্তারি কিছু জানে না বলে মনে হয়, কি ওষুধপত্র দিয়েছে তাতে জ্বর আরো বেড়ে গেছে।

অন্য ডাক্তার দেখাও। দেশে কি আর ডাক্তার নেই? কত বড় বড় ডাক্তার আছে।

অন্য ডাক্তার দেখাব। চক্ষুলজ্জার জন্যে পারছি না। বেচারা রোজ দু'তিনবার এসে খোঁজ নেয় এখন যদি দেখে অন্য ডাক্তার এনেছি...। মহা যন্ত্রণায় পড়লাম বুঝলি।

তুমি আজই অন্য ডাক্তার খবর দাও।

তাই দিতে হবে। তোর ভাই চেঁচামেচি করছে। আমি আজ দিনটা সময় নিয়েছি। আজ দিনের মধ্যে না কমলে অন্য ডাক্তারের কাছে যাব।

ভাবী দেখ, গা ঘামছে। জ্বর বোধ হয় নেমে যাচ্ছে। ঠোঁট চাটছে। ওদের একটু পানি খাওয়াই।

খাওয়া। বোতলে গ্লুকোজ সরবত আছে দেখ। আমি একটু গা ধুয়ে আসি।

পাঁচ মিনিটের জন্যে এসে এক ঘণ্টার ওপর কাটিয়ে দিল। তার উঠে আসতে ইচ্ছে করছে না। টিনা ভাবী দুই বাচ্চাকে দুই পাশে নিয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প করছে। এত ভাল লাগছে দৃশ্যটি দেখতে। একই রকম দেখতে দুটি বাচ্চাকে দু'পাশে নিয়ে শোবার মতো আনন্দ বোধ হয় আর কিছু নেই। বকুলের মনে হল— ইস তার যদি এ রকম দুটি বাচ্চা হত। এটা মনে হতেই সে লজ্জায় বেগুনী হয়ে গেল। তার মনে হল টিনা ভাবী তার মনের কথাটা টের পেয়ে ফেলেছে।

বকুল!

কী ভাবী?

তো বিয়ের কথাবার্তা পাকা করতে হয়। কার সঙ্গে কথা বলব? তোর আসল গার্জেন তো বোধ হয় তোর বোন।

বকুল মাথা নিচু করে বসে রইল। উত্তর দিল না। টিনা হালকা গলায় বলল, তুই কিছু মনে করিস না বকুল— তোর এই বোনটাকে আমার পছন্দ হয় না। কেমন পুরুষ পুরুষ ভাব।

মুনা আপা খুব ভাল মেয়ে।

ভাল মেয়ে তো বটেই। তোদের ঝামেলার যেভাবে ঝড় সামাল দিয়েছে এ রকম ক'টা পুরুষ

পারবে? তবে ব্যাপার কি জানিস বকুল... তোর আপা হচ্ছে কঠিন ধরনের মেয়ে। মেয়েরা কঠিন হলে ভাল লাগে না। মেয়েরা হবে নরম ধরনের। আহ্লাদী। কথায় কথায় কেঁদে ফেলবে... যেমন তুই?

আমি বুঝি আহ্লাদী?

না আহ্লাদী না। তুই হচ্ছিস মায়াবতী।

মুনা আপা বুঝি মায়াবতী না?

না।

বকুলের মন খারাপ হয়ে গেল। মুনা আপা সম্পর্কে কেউ কিছু বললে তার ভাল লাগে না। রাগ লাগে।

বকুল, এমন মুখ কালো করে ফেলেছিস কেন?

ভাবী, আমি উঠি?

এখন উঠবি কি? আরেকটু বস। তোর ডাক্তার আসবে কিছুক্ষণ মধ্যে। তার সঙ্গে দুই-একটা কথাটথা বল।

কি যে তুমি বল ভাবী।

বিয়ের আগে কথাটথা বলা হাতের সঙ্গে হাত লেগে যাওয়া এইসব খুব ভাল লাগে। অন্য রকম একটা আনন্দ হয়। বিয়ের পর দেখবি এইসব খুব পানসে লাগছে। শরীরের সঙ্গে শরীরের পরিচয়ের আগের যে প্রেম সেটার মত ভাল আর কিছু নেই।

টিনা ছোট করে নিঃশ্বাস ফেলল। মনে মনে বকুলও একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার কেমন ভয় ভয় করে। এত রহস্য পৃথিবীতে। এইসব রহস্যের মধ্যে বড় হওয়া বেশ কষ্টে।

বকুল। একটু চা করতে পারবি। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। চোখের পাতা মেলে রাখতে পারছি না।

ঘুমাও।

উঁহু। তোর ভাই আসবে। ঘুমিয়ে আছি দেখলে মুখ ভারী হয়ে যাবে। পুরুষ মানুষদের তুই তো চিনিস না। অদ্ভুত জিনিস।

তাই নাকি?

হ্যাঁ তাই।

বাচ্চা দুটি এমন ওদের যন্ত্রণাতেই রাতে ঘুমুতে পারছি না -- শেষ রাতে একটু তন্দ্রামত এসেছে তখন তোর ভাই ডেকে তুলল তার নাকি ভীষণ মাথাব্যথা চুল টেনে দিতে হবে। উঠে গেলাম চুল টেনে দিবার জন্যে- ও আল্লা দেখি মাথা ব্যথা কিছু না তার অন্য কিছু চাই।

বকুল মুখ লাল করে বসে রইল।

পুরুষের মত স্বার্থপর জাত আর তৈরি হয়নি। নিজের বাচ্চারা এমন অসুস্থ এর মধ্যে কেউ কি পারে...

বকুল কথার মাঝেই উঠে দাঁড়াল। মৃদু স্বরে বলল, ভাবী আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসি।

লজ্জায় তুই দেখি একেবারে লাল হয়ে গেছিস। এসব খুব সাধারণ ব্যাপার। বিয়ের দু'দিন পর দেখবি ডাল-ভাত হয়ে গেছে।

বকুল চা বানিয়ে এসে দেখে টিনা ভাবী ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে ঘুম থেকে জাগানোর কোনো মানে হয় না। সে নিজেই চাটা খেল। বাচ্চা দুটির জ্বর আসলেই অনেকখানি কমেছে। এরা ঘুমের মধ্যে হাসছে। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার দুজন একই সঙ্গে হাসছে। একটি স্বপ্নই বোধ হয় দেখছে দুজন। বকুল নিচু হয়ে ওদের কপালে চুমু খেল। কেমন দুধ দুধ গন্ধ। একবার চুমু খেলে মুখ উঠিয়ে নিত ইচ্ছা করে না। বুকের মধ্যে কেমন অদ্ভুত ভাবে শিরশির করে। কেন করে? কোনোদিন বোধ হয় তা জানা যাবে না।

বকুল বেরুল চারটার একটু আগে। বেরুনো মাত্র দেখা হল ডাক্তার ছেলেটির সঙ্গে। বকুলের বুক ধ্বক করে উঠল। এক পলকের জন্যে দুলে উঠল সব কিছু।

বকুল ভাল আছ?

জি।

রুগী দেখতে গিয়েছিলে?

হুঁ।

আছে কেমন ওরা?

ভাল।

তোমার তো আর দেখাই পাওয়া যায় না। স্কুলে যাও না?

এখন আমাদের ক্লাস হচ্ছে না।

ক্লাস হচ্ছে না কেন?

টেস্টের প্রিপারেশনের জন্য।

কেমন হচ্ছে প্রিপারেশন?

ভাল। আমি এখন যাই?

এই সপ্তাহের মধ্যেই আমার মা যাবেন তোমাদের বাসায়।

বকুল কিছু বলল না। জহির হাসিমুখে বলল, মাকে তোমার ছবি দেখিয়েছি · মা কি বললেন জান? মা বললেন— মেয়েটার নাকটা এত মোটা কেন? জহির বেশ শব্দ করে হাসতে লাগল। এত লজ্জা লাগছে বকুলের। একই সঙ্গে ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে আবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনতেও ইচ্ছা করছে। সম্পূর্ণ দু'রকম জিনিস একসঙ্গে মানুষের মনে আসে কিভাবে কে জানে।

বকুল!

জি।

তুমি দেখি ঘেমে-টেমে একটা কাণ্ড করছ। এত অস্বস্তি বোধ করছ কেন? এ কালের মেয়েরা কত স্মার্ট থাকে।

আমি যাই এখন।

বকুলের পা পাথরের মত ভারী। বড্ড কষ্ট হচ্ছে পা টেনে টেনে যেতে। কান্না পেয়ে যাচ্ছে। একটা সময় আসছে যখন এই ছেলেটির সঙ্গে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করবে। উঠে চলে যাবার কোনো তাড়া থাকবে না। কে দেখে ফেলবে এই নিয়ে চাপা আতংক থাকবে না। কি প্রচণ্ড সুখের সময়ই না হবে সেটা। ঝুম বৃষ্টি নামলে তারা দুজনে বৃষ্টিতে ভিজবে। হাত ধরাধরি করে ভিজবে। ভাবতে বকুলের চোখ জলে ভর্তি হয়ে গেল। সুখের কথা ভাবতেও যে কষ্ট হয় কেন কে জানে। এত বিচিত্র কেন পৃথিবীটা। কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। কাকে সে জিজ্ঞেস করবে?

## ১৯

মামুন এসেছিল। দুপুরে ভাত খেয়েছে।

এই খবরে মুনা বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখাল না। সে আজ একগাদা জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরেছে সন্ধ্যা পার করে। তিনটা বড় বড় প্যাকেট তার হাতে। উৎসাহ নিয়ে কি কি সে কিনল তাই দেখাচ্ছে। জিনিসপত্রগুলি বিচিত্র। একটা গ্লোব। ব্যাটারি লাগান। সুইজ টিপলেই পৃথিবী ঘুরতে থাকে। একটা নব ঘুরিয়ে পৃথিবীর ঘূর্ণনের বেগ কমানো বা বাড়ানো যায়। মুনা উজ্জ্বল মুখে বলল, জিনিসটা সুন্দর না? বাবু অবাক হয়ে বলল, হ্যাঁ সুন্দর। এটা কি জন্যে কিনেছ?

পছন্দ হয়েছে তাই কিনেছি। আসল জিনিসটা দেখলে মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে।

কি সেটা?

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর দেখবি। শাড়ি কিনলাম দুটা। দেখ তো বকুল কেমন।

শাড়ি দেখে বকুল অবাক। কি চড়া রঙ চোখ ধাঁধিয়ে যায়। দেখেই বুঝা যাচ্ছে খুব দামী শাড়ি।

শাড়িগুলি কেমন কিছু বলছিস না কেন?

গায়ে কটকট করবে।

করুক কটকট। আমি কি বুড়ি হয়ে গেছি যে সাদা শাড়ি পড়তে হবে?

রাতের খাবার-দাবার শেষ হয়ে যাবার পর আসল জিনিসটা বেরুল। একটি ক্যাসেট প্লেয়ার। ছোটখাটো চমৎকার একটা জিনিস। বাবু অবাক হয়ে বলল, কত দাম আপা?

তেইশ'শ টাকা। জিনিসটা কেমন?

সুন্দর খুব সুন্দর! এত টাকা কোথায় পেলে তুমি?

ব্যাংকে যা ছিল খরচ করে ফেললাম। কি হবে টাকা জমিয়ে? পাঁচটা ক্যাসেট কিনেছি কোনটা দিব বল। রবীন্দ্র সঙ্গীত না হিন্দি। হিন্দি ক্যাসেট আছে তিনটা। একটা আছে পুরনো দিনের গান। কোনটা দেব বল?

বকুল বা বাবু কেউ কিছু বলল না। মুনা মহাউৎসাহে নিজেই একটি ক্যাসেট চালু করল।

শওকত সাহেব তাস খেলে রাত ন'টার দিকে বাড়ি ফিরে শুনলেন— গান হচ্ছে— মাটি মে পৌরণ, মাটি মে শ্রাবণ, মাটি মে তনবন জায়গা যব মাটি মে সব মিল যায়গা।

শওকত সাহেব বড়ই অবাক হলেন।

বাকের ঠিক করল আজ বিকেলে যাবে ও-বাড়িতে। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার। দুটি মেয়ে ছিল ক'দিন ধরে দেখা যাচ্ছে তিনটে মেয়ে। তিন নম্বরটি বেঁটে ধরনের। মোটাসোটা। তবে এ অন্য দুজনের চেয়েও সুন্দর, গায়ের রঙ সোনার মত। মাথা ভর্তি চুল। এর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়েছে একদিন মুদির দোকানে এসেছে কিসমিস কিনতে। কালো একটা চশমায় মুখ ঢাকা। শীতের দিনের বিকেলে যখন চারদিক এমনিতেই অন্ধকার তখন এ রকম একটা কালো চশমার মানে কি মুখ ঢেকে রাখা না?

জোবেদ আলীকে জিজ্ঞেস করেছিল মেয়েটির কথা। জোবেদ আলী গম্ভীর মুখে বলেছে- ওদের চাচাত বোন। চিটাগাং-এ থাকে। বেড়াতে এসেছে।

কি পড়ে?

বিএ ফার্স্ট ইয়ার।

এখানের দুজন ওরা কি পড়ে?

এরা আইএ পড়ে।

কলেজে-টলেজে তো দেখি না।

ভর্তি হয়নি এখনো। ট্রান্সফার নিয়ে এসেছে।

ও আচ্ছা।

ভর্তি নাও হতে পারে। বাবার কাছে চলে যেতে পারে।

ইরানে?

না ইরাকে।

এই ইরান-ইরাক ব্যাপারটাও সন্দেহজনক। পোস্টম্যানকে বাকের জিজ্ঞেস করেছিল— বিদেশী চিঠিপত্র এদের কেমন আসে? পোস্টম্যান বলেছে— এই ঠিকানায় এখনো চিঠিপত্র আসা শুরু করে নাই। এর মানে কি? দু'মাস হয়ে গেছে এর মধ্যে চিঠিপত্র দিয়ে কেউ খোঁজ করবে না?

সবচে যা সন্দেহজনক, মেয়ে তিনটি পাড়ার কোনো বাড়িতে এখন পর্যন্ত যায়নি। এই বয়সের মেয়েরা দিনরাত ঘরে বসে থাকবে কেন? তাছাড়া এরা প্রচুর গয়না পরে। অবিবাহিত মেয়েরা সাজগোজ করে ঠিকই এত গয়না পরে না। ব্যাপারটা নিয়ে ইয়াদের সঙ্গে আলাপ করলে ভাল হত। কিন্তু ইয়াদ হারামজাদাটা বিয়ের পর ভেড়ুয়া নাম্বার ওয়ান হয়ে গেছে। সেই তেজ সেই সাহসের কিছুই নেই। মাথার মধ্যে তার শুধু সংসার ঘুরছে। সেদিন গিয়ে দেখে গামছা পরে কমোড পরিষ্কার করছে। বেরিয়ে এসে বলল, কি করব বল বৌয়ের পরিষ্কার বাতিক। চাকর-বাকরের হাতে দিলে কিছুই হয় না। তুই নিজের চোখে দেখ কেমন ঝকঝকে করে ফেলেছি।

তোর বৌ কোথায়?

বাপের বাড়ি গেছে। আজ থাকবে সেখানে। আমাকে যেতে হবে। নয় তো তোর সঙ্গে জম্পেশ আড্ডা দিতাম। শালা আড্ডা দেওয়াই ভুলে গেলাম।

না গেলেই হয় শ্বশুর বাড়িতে। থেকে যা আড্ডা দেই। পাড়ায় একটা ব্যাপার হচ্ছে এটা বলি।

ইয়াদ আঁতকে উঠল। হতাশ মুখ করে বলল, কোন উপায় নেই রে ভাই। আমি না গেলে ভূমিকম্প হয়ে যাবে। ওর আবার আমি পাশে না থাকলে ঘুম হয় না। ভূতের ভয়। অল্প বয়সের মেয়ে বিয়ে করে যারা ভুল করেছি রে ভাই।

রাগে গা জ্বলে যাবার মত কথা। ইয়া ধামড়ি মেয়ে বলে কী-না অল্প বয়সের মেয়ে।

পাড়ার সমস্যা কি বল শুনি। অনেকদিন যাওয়া হয় না। সবাই আছে কেমন?

ভালই।

নাটক হচ্ছে নাকি? বদরুলের সঙ্গে দেখা হল? বই কোনটা নামাচ্ছিস?

জানি না এখনো।

তারপর বল কি ব্যাপার?

বাকের বলতে শুরু করতেই ইয়াদ তাকে থামিয়ে দিল। মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, মেঝেতে ছাই ফেলিস না রে দোস্ত। বউ রাগ করে। দাঁড়া এসট্রে দিচ্ছি। কার্পেটে ছাই ফেললে তোলা মুশকিল। আঠার মত লেগে যায়।

বাকেরের মুখ তেতো হয়ে গেল। কি ছিল আর কি হয়েছে। বিয়ে তো আরো মানুষে করে কিন্তু এ রকম কেউ হয়? হারামজাদার পাছায় লাথি দিয়ে মুখে দুধের বোতল ধরিয়ে দিতে হয়।

ইয়াদ বাহারি একটা এসট্রে এনে রাখল।

কেমন অদ্ভুত এসট্রে দেখলি। কচ্ছপের মত। সুন্দর না?

হুঁ।

দাম কত বল দেখি?

জানি না কত। আমি উঠলাম।

এখনি উঠবি? কি যেন বলবি বলছিলি।

আরেক দিন বলব।

আচ্ছা আসিস আরেক দিন।

বাকেরের আফসোসের সীমা রইল না। এত পয়সা খরচ করে এখানে আসাটা ভুল। শালা ভেড়ুয়া। পাড়ার একটা ব্যাপার কিন্তু কোনো উৎসাহ নেই। এ কি অবস্থা। অথচ এক কালে এরই আশা-ভরসা ছিল।

সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বাকের গেটে টোকা দিল। এরা একটা দারোয়ানও দেখি রেখেছে। দারোয়ানটার মধ্যে ড্যাম কেয়ার ভাব। দারোয়ান খসখসে গলায় বলল, কারে চান?

গেট খোল।

কারে চান বলেন?

আরে তুই তো মহা মাতবর দেখছি। চড় দিয়ে চাপার দাঁত ফেলে দিব। বাড়ি কোথায় তোর?

চুপ, মুখ সামলাইয়া কথা কন।

হারামজাদা বলে কি?

মেয়ে দুটির মা বের হয়ে এলেন। সাদা সিল্কের শাড়ি। পরনে চোখে রিমলেস চশমা। সিনেমার বড়লোক ছেলের মা'র মত চেহারা। ভদ্রমহিলা চিকন স্বরে বললেন, কি হয়েছে খসরু?

আম্মা ঝামেলা করতাছে।

গেট খুলে দে।

ভদ্রমহিলা এগিয়ে এসে মধুর গলায় বললেন, এস বাবা। এস। নতুন লোক, কার সঙ্গে কি ব্যবহার করতে হয় জানে না। বাকের খাতির-যত্নের বহরে হকচকিয়ে গেল।

বসার ঘরটি সুন্দর করে সাজানো। দেয়ালে তিনটা জলরঙ ছবি। ঝুলন্ত হ্যাংগারের অর্কিড। নিচু নিচু সোফা। তরমুজ আকৃতির ছ'টা বাতি রুপালি শিকলে ঝুলছে।

বাবা, তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।

আমার নাম বাকের।

ও আচ্ছা। জোবেদ আলী বলেছে তোমার কথা।

নতুন এসেছেন খোঁজ-খবর নিতে আসলাম।

ভাল করেছ। খুব ভাল করেছ। মেয়েগুলিকে নিয়ে একা একা থাকি। বস বাবা কি খাবে?

কিছু খাব না।

তা কি হয়? প্রথম এসেছ।

তিনি নিজেই উঠে গিয়ে মিষ্টি নিয়ে এলেন। রুপোর গ্লাসে পানি। কিন্তু মেয়েগুলি আসছে না, উঁকি-ঝুঁকিও দিচ্ছে না।

তুমি করে বলছি রাগ হচ্ছে না তো।

জি না।

জোদেব আলী বলছিল, তোমরা নাকি নাটক করছ?

জি একটা হচ্ছে।

কি নাম নাটকের?

নাম ঠিক হয় নাই।

নাটক তো খুব খরচান্ত ব্যাপার। টাকা-পয়সা জোগাড় হচ্ছে কীভাবে?

চাঁদা তুলে। সবাই দিচ্ছে।

কই আমার কাছে তো তোমরা কেউ আসনি?

বাকের অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে সন্দেহে ভেঙে মুখে দিল। সুন্দর একটা গন্ধ সন্দেশে। বাকের কান খাড়া করে রাখল যদি ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায়। কোনো রকম সাড়াশব্দ নেই।

বাকের উঠে আসার সময় ভদ্রমহিলা তাকে এক হাজার টাকা দিলেন নাটকের খরচের জন্য। বাকেরের মুখ শক্ত হয়ে গেল। রহস্য পরিষ্কার হতে শুরু করেছে।

আবার এস বাবা।

জি আসব।

নাটকে আমার খুব সখ ছিল। এখন কিছুই নেই।

বেরুবার সময় দারোয়ান সালাম দিয়ে গেট খুলে দিল। বাকের এই প্রথম দেখল মেয়ে তিনটি বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে তাকে। তার দিকে চোখ পড়তেই দুটি মেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। বেঁটেটা শুধু দাঁড়িয়ে রইল। এদের কারো নাম জানা হল না। জিজ্ঞেস করা দরকার ছিল।

দারোয়ান গেটে তালা লাগাচ্ছে। বাকের ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, মেয়েগুলির নাম কী জান? দারোয়ান এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারছে না।

নাম জান না ওদের?

জি না।

কী ডাক?

বড় আফা, ছোট আফা, মাইঝা আফা।

ও আচ্ছা।

বেঁটে মেয়েটি এখনো দাঁড়িয়ে আছে। বাকের গেটের কাছে দাঁড়িয়েই সিগারেট ধরাল। এই সিগারেটটা সে এখানে দাঁড়িয়েই শেষ করবে। দেখবে মেয়েটা কি করে। মেয়েটি ভেতরে ঢুকে গেল। শুধু দারোয়ান গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

## ২০

শওকত সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

আমার নাম ফজলু। ফজলুর রহমান।

আমি আপনাদের পাশেই থাকি। ঐ যে লাল দালানটা। লোহার গেট। গেটের পেছনে কামিনি ফুলের গাছ আছে। আমি আগেও কয়েকবার এসেছি আপনার বাসায়।

শওকত সাহেব খুব লজ্জা পেলেন। একই পাড়ায় পাশাপাশি থেকে চিনতে না পারাটা লজ্জার ব্যাপার। এক সময় সবার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এখন একেবারেই নেই। অফিসে যান। অফিস থেকে ফিরে এসে বারান্দায় বসে থাকেন। এ রকম হয়ে যাচ্ছেন কেন?

আমার স্ত্রীর সঙ্গে বকুলের খুব ভাব। ওরা প্রায়ই গল্পগুজব করে। আমার স্ত্রীর নাম হচ্ছে টিনা।

ও আচ্ছা। বসুন ভাই বসুন। বয়স হয়ে গেছে কিছু মনে থাকে না।

আমাকে নাম ধরে ডাকবেন। বকুল আমার স্ত্রীকে টিনা ভাবী ডাকে। আমি বলতে গেলে আপনার ছেলের মত। বকুলের সঙ্গে আমার ভাই সম্পর্ক।

তাই নাকি?

জি। কাজেই আপনিও যদি ভাই ডাকেন তাহলে ঝামেলা হয়ে যাবে। সম্পর্কটা ঠিক থাকা দরকার।

ফজলু উঁচু গলায় হাসতে লাগল। শওকত সাহেব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। কি কথাবার্তা চালাবেন? কথা বলতে ইচ্ছাও হচ্ছে না। ক্লান্তি লাগছে। শরীর ভাল না, শুয়ে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে। তাঁর আবার মনে হল বয়স হয়ে গেছে। তিনি দ্রুত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

আপনি বসুন আমি বকুলকে ডেকে দিচ্ছি।

ওকে ডাকার দরকার নেই। আমি আপনার সঙ্গেই কথা বলতে এসেছি। দরকারে এসেছি।

একটা দরকারি কথা বলব।

বলুন।

তার আগে এক কাপ চা খাব। বাসা থেকে চা না খেয়ে বেরিয়েছি। টিনা বলল, তুমি চাচার সঙ্গে কথাটা সেরে এসেই চা খাও। আমি ভাবলাম মন্দ কি।

শওকত সাহেব চিন্তিত মুখে চায়ের কথা বলে এলেন। তার সাথে এমন কি কথা থাকতে পারে? পাড়ার কোনো ব্যাপার কি? হতে পারে। মাঝে মাঝে হঠাৎ দু'একজন মানুষ এসে পাড়া দরদী হয়ে যায়। ক্লাবট্লাব করে। একবার কি একটা পরিচ্ছন্ন কমিটি হল। তিনি হলেন সেই কমিটির মেম্বার। সপ্তাহখানিক এর-ওর বাড়িতে চা খাওয়া ছাড়া সেই কমিটি কিছু করেনি। একদিনের জন্যে একজন মেথর ভাড়া করে এনেছিল সে ঘণ্টা তিনেক কোদাল দিয়ে নর্দমা নাড়াচাড়া করে কুড়ি টাকা নিয়ে ভেগে গেল। পরিচ্ছন্ন কমিটিরও সমাপ্তি।

আমি বকুলের বিয়ের একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি।

শওকত সাহেব নড়েচড়ে বসলেন। ইতস্তত করে বললেন, বকুলের বিয়ে? আমি তো ঠিক...

আগে সবটা শুনে নিন। তারপর আপনার যা বলার বলবেন। আমি এবং আমার স্ত্রী দুজনই বকুলকে খুব পছন্দ করি। আমি ওকে দেখি নিজের বোনের মত। ওর যাতে ভাল হয় তাই আমরা দেখব- এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

ফজলু থামল। কারণ বকুল চা নিয়ে ঢুকেছে। অবাক হয়ে তাকাচ্ছে তাঁর দিকে। বকুলের চোখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ।

বকুল, কেমন আছ?

জি ভাল।

তোমার ভাবী জলপাইয়ের একটা আচার বানিয়েছে, একবার গিয়ে চেখে আসবে। নিজ দায়িত্বে চাখবে। হা হা হা।

বকুল হাসিতে যোগ দিল না। কাপ নামিয়ে চলে এল। তার বুক ঢিপঢিপ করছে। আজই কি সেই দিন? হয়ত বা। টিনা ভাবী বলেছিল সে নিজেই আজকালের মধ্যে প্রস্তাব নিয়ে আসবে। তা না করে কী ফজলু ভাইকে পাঠিয়েছে? ফজলু ভাই কি গুছিয়ে কিছু বলতে পারবে? সে নিশ্চয়ই সব এলেবেলে করে দেবে। কি বলতে কী বলবে। তাছাড়া আগেই বাবার সঙ্গে কথা বলছে কেন? আগে মুনা আপার সঙ্গে কথা বলা দরকার-- মুনা আপা যদি প্রথমেই বলে 'না' তাহলে তো এ নিয়ে আগানোই যাবে না। যদি কোন কারণে 'হ্যাঁ' বলে ফেলে তবেই শুধু বাবার সঙ্গে কথা বলা উচিত। তার আগে নয়।

বকুল দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কথাবার্তা তেমন কিছু শোনা যাচ্ছে না। ফজলু ভাইয়ের কথা দু'একটা শোনা গেলেও বাবার কথা কিছুই কানে যাচ্ছে না। বাবু তার ঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে। এমন চেঁচিয়ে পড়লে কিছু শোনা যায়? বকুলের ইচ্ছে করছে বাবুকে গিয়ে বলে--- এত চেঁচিয়ে পড়ছিস কেন? মনে মনে পড়তে পাড়িস না। কিন্তু বাবুকে এসব কিছুই বলা যাবে না। সে একশটা কথা বলবে, চেঁচিয়ে পড়লে কি হয়? তোমার তো কোন অসুবিধা হচ্ছে না। হয়ত একটা ঝগড়াই বাঁধিয়ে বসবে। বাবু এখন কথায় কথায় তার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাচ্ছে।

বকুল!

বকুল চমকে উঠল। মুনা আপা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। সরু চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। কী সর্বনাশ।

কি করছিস এখানে?

কিছু না আপা।

বকুল এগিয়ে এল ভয়ে ভয়ে। তার মুখ শুকিয়ে গেছে। বুক ধ্বকধ্বক করছে। মুনা আপা নির্ঘাৎ জেরা করতে শুরু করবে।

বসার ঘরে কে কথা বলছে?

ফজলু ভাই।

ফজলু ভাইটা কে?

টিনা ভাবীর হাসবেন্ড।

তুই কি আড়ি পেতে কথাবার্তা শুনবার চেষ্টা করছিলি?

না আপা।

না আপা মানে? আমি তো বেশ খানিকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছি তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস। কি করছিলি?

চা দিতে গিয়েছিলাম আপা।

চোখ-মুখ এমন লাল হয়ে আছে কেন? ব্যাপারটা কি?

কিছু না আপা।

তোর বিয়েটিয়ে নিয়ে কোনো কথা?

আমি জানি না।

বকুল এই শীতেও ঘামতে লাগল। বড় লজ্জার ব্যাপার হয়ে গেল। তার ইচ্ছে করছে মুনা আপার সামনে থেকে ছুটে পালিয়ে যেতে। কিন্তু পা দুটি হয়ে আছে পাথরের মত। বকুল খুব সহজ ভাবে হাসতে চেষ্টা করল পারল না। মুনা আপা এখনো তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাঁর মুখ থমথম করছে। কেন যে দরজার পাশে দাঁড়াতে গিয়েছিল।

ছেলে ডাক্তার। ছেলের বাবা নেত্রকোনা শহরের নামকরা উকিল ছিলেন - আবদুস সোবহান সাহেব। রাজাকাররা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মেরে ফেলেছে। নেত্রকোনা শহরে ওদের বিরাট বাড়ি আছে। সেই বাড়িতে ছেলের মা এবং ছোট ভাই ছাড়া আর কেউ থাকে না। ঢাকাতে মোহাম্মদপুরে ওদের একটা দোতলা বাড়ি আছে। তিন হাজার টাকা ভাড়া আসে বাড়ি থেকে।

ছেলে দেখতে কেমন?

আমার কাছে তো ভালই মনে হয়। আপনি নিজেও তো দেখেছেন। এই বাড়িতে তো সে আসে। মানে অসুখ-বিসুখ হলে তাকে আনা হয়। ডাক্তার জহির।

শওকত সাহেব অবাকই হলেন। ছেলেটিকে তাঁর পছন্দ। ভদ্র ছেলে। বয়সও কমই মনে হয়। ফজলু হাসিমুখে বলল, ছেলে কেমন কি তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে, আপনার মেয়ের ছেলেকে খুব পছন্দ।

কি বলছেন এসব?

ঠিকই বলছি। আমার স্ত্রীর সঙ্গে বকুলের কথা হয়েছে। আপনি বকুলকে ডেকে জিজ্ঞেসও করতে পারেন।

আরে না। আমি এসব জিজ্ঞেস করব কেন?

জিজ্ঞেস করে নেয়াটা ভাল। তাছাড়া আজকালকার যুগে ছেলেমেয়ের নিজেদের পছন্দে বিয়ে হওয়াটাই ভাল। তাতে সমস্যা কমে যায়।

বকুল বাচ্চা মেয়ে সে আবার...।

বাচ্চা মেয়েদের তো পছন্দ-অপছন্দ থাকতে পারে। পারে না?

শওকত সাহেব ইতস্তত করে বললেন, আমি মুনার সঙ্গে আলাপ করে দেখি। মুনা রাজি হবে না।

দেখুন কথা বলে। আমার স্ত্রীও উনার সঙ্গে কথা বলবেন। আমারও মনে হয় বিয়েটা বকুলের জন্য ভালই হবে। আমি উঠি এখন।

আরে না বসুন। আরেক কাপ চা খান। বকুল, বকুল।

ফজলু উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, এখন আর চা খাব না। বাসায় গিয়ে গোসল করব। আমি আবার অফিস থেকে ফিরেই গোসল করি। অনেক দিনের অভ্যাস।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফজলু আবার ফিরে এল।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ছেলের মা এখন ঢাকায় আছেন। কয়েক দিন ঢাকায় থাকবেন। সম্ভব হলে এর মধ্যে বকুলকে দেখিয়ে দিন।

শওকত সাহেব মুখ কালো করে বললেন, মুনা কিছুতেই রাজি হবে না। ওর ইচ্ছা বকুলের পড়াশোনা আগে শেষ হোক।

রাজি না হলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করাতে হবে। দিনকাল খারাপ। মেয়ে বিয়ে দেয়া এখন মহাসমস্যা। ছেলে পাওয়া যায় না। বিয়ের যুগ্যি ছেলেদের কোন চাকরি-বাকরি নেই। বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তা ঠিক।

এই আমাকেই দেখুন না, সামান্য চাকরি তবু ডিসট্রিক্ট জজের মেয়ের প্রস্তাবও এসেছিল।

ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার ছেলেদের তো গায়েই হাত দেয়া যায় না। ঠিক বলছি না?
জি ঠিকই বলছেন।
মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দিন।
দেখি মুনার সঙ্গে কথা বলে।
শওকত সাহেব রাত দশটার সময় মুনাকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলতে লাগলেন। শীত খুব বেশি পড়েছে। তার অফিসের কে যেন বলছিল শ্রীমঙ্গলে বরফ পড়েছে। আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে। এ রকম শীত কখনও পড়ত না। বুড়ো মরা শীত একেই বলে। ইত্যাদি।
মুনা বেশ খানিকক্ষণ মন দিয়ে মামার কথা শুনল। তারপর হাসতে হাসতে বলল, এই ভদ্রলোক তোমাকে কি বললেন সেটা বল, শুনে চলে যাই। কেন শুধু শুধু দেরি করছ? শওকত সাহেব গম্ভীর হয়ে গেলেন।
উনি কি বকুলের বিয়ের কথা বলতে এসেছিলেন?
বুঝলি কি করে?
আন্দাজ করলাম। ডাক্তার ছেলে?
হুঁ।
তুমি কি বললে?
আমি না-ই করে দিয়েছি। বলেছি মেয়ের বয়স খুবই কম। পড়াশোনা করছে। এখন তুই ভেবে দেখ। তুই যা বলবি তাই। আসল গার্জেন হলি তুই।
মুনা হাই তুলে বলল, বিয়ে দিয়ে দাও।
শওকত সাহেব বুঝতে পারলেন না এটা কি সে ঠাট্টা করে বলছে না সত্যি সত্যি বলছে। তিনি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন।
বিয়ে হয়ে যাওয়াটাই ভাল।
কেন? ভাল কেন?
বকুল হচ্ছে বউ টাইপ মেয়ে। বিয়ের জন্যে মনে মনে সে তৈরি হয়েছে।
কি বলছিস তুই!
ঠিকই বলছি। ছেলেটাও ভাল। দেখি তো প্রায়ই।
তুই ভালমত চিন্তা করে তারপর বল। ফট করে হ্যাঁ বলার দরকার কি? এমন কোন তাড়া তো নেই।
চিন্তা করেই বলছি। ওরা নিজেরা আগ্রহ করে আসছে সেটা দেখা দরকার। এ রকম আগ্রহ নিয়ে বকুলের জন্যে খুব বেশি ছেলে আসবে না।
আসবে না বেন? বকুল কী দেখতে খারাপ?
খারাপ হবে কেন? বকুলের মতো রূপসী মেয়ে কমই আছে। কিন্তু বিয়ে-টিয়ের ব্যাপার শুধু মেয়েটাকে কেউ দেখে না সব কিছু মিলিয়ে দেখে। বিয়ে কোন আলাপ হলেই সবাই জানাবে তুমি চুরির দায়ে এক সময় জেলে গিয়েছিলে। চোরের মেয়েদের ভাল বিয়ে হয় না।
শওকত সাহেব মুখ কালো করে ফেললেন। এ রকম কঠিন একটা কথা মুনা এমন স্বাভবিক ভাবে বলল? মুখে এতটুকু আটকাল না।
বিয়ে দিয়ে দাও মামা। বকুলের ঐ ছেলেকে খুবই পছন্দ।
ওর পছন্দের কথাটা আসছে কেন?
আসবে না কেন? নিশ্চয়ই আসবে। বিয়েটা তো সেই করছে।
পছন্দ করবার জন্যে ছেলেকে সে পেল কোথায়?
পেয়েছে যে ভাবেই হোক। সেটা আমাদের দেখার ব্যাপার না। মামা, আমি উঠলাম।
বোস, আরেকটু বোস।
না মামা, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না।

বকুল আড়চোখে মুনার দিকে তাকিয়ে আবার নিজের বইপত্র নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যেন পৃথিবীর কোনো দিকে তার দৃষ্টি নেই। বাবু বসেছে তার উল্টো দিকে। সে পড়ছে চেঁচিয়ে। মুনা শুয়ে

পড়ল। বাবু বলল, আপা আমরা বসার ঘরে গিয়ে পড়ব? বাতি নিভিয়ে দেব এ ঘরের?

দে।

এত সকাল সকাল শুয়ে পড়লে যে আপা?

এমনি, ভাল লাগছে না।

মাথায় হাত বুলিয়ে দেব?

না লাগবে না।

বকুল এবং বাবু বাতি নিভিয়ে বসার ঘরে চলে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবার এ ঘরে চলে এল। ঘর অন্ধকার। বারান্দা থেকে আলো এসে তেরছা ভাবে মুনার গায়ে পড়েছে। সেই আলোর জন্যেই হোক বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক মুনাকে খুব অসহায় লাগছে। বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, আপা ঘুমিয়ে পড়েছ?

না।

বসি একটু তোমার পাশে?

বোস।

বকুল মাথার কাছে বসল। বেশ কিছু সময় দু'জনের কেউ কোনো সাড়াশব্দ করল না। এক সময় বাবু এসে উঁকি দিল।

আপা তোমরা এমন চুপচাপ বসে আছ কেন?

মুনা হালকা গলায় বলল, ইচ্ছে করলে তুইও এসে বোস। বাবু এল না। চলে গেল এবং আবার চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান পড়তে লাগল। মুনা বলল— হঠাৎ এমন চেঁচিয়ে পড়া ধরেছে কেন বল তো? এ রকম মাইক লাগিয়ে কেউ পড়ে? বুকল হেসে ফেলল। মুনার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলল, ওদের কোন স্যার নাকি চেঁচিয়ে পড়তে বলেছেন। এতে নাকি পড়া তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয়।

তোর পড়া কেমন হচ্ছে রে বকুল?

হচ্ছে।

ভালমত পড়। বিয়ে যদি হয় তারপরও পড়াশোনা চালিয়ে যাবি।

বিয়ের কথা উঠল কেন?

ভাল করেই জানিস কেন উঠল। তুই তো আড়ি পেতে শুনছিলি।

বকুল চুপ করে গেল। মুনা হালকা গলায় বলল, অল্প বয়সে বিয়েটা খারাপ না। মন কোমল থাকে। সংসারের খারাপ দিকগুলি চোখে পড়ে না।

তুমি হঠাৎ এমন কথা বলছ কেন আপা? আগে তো এ রকম বলতে না।

মানুষ তো সব সময় এক রকম থাকে না।

তুমি বদলে যাচ্ছ আপা।

হ্যাঁ বদলে যাচ্ছি। বয়স হচ্ছে। খুঁজে দেখলে দু'একটা পাকা চুলও বোধ হয় পাবি।

বকুল নিচু গলায় বলল, আপা তুমি কাঁদছ?

কি বলছিস পাগলের মত? কাঁদব কেন শুধু শুধু?

তোমার গলাটা অন্য রকম শুনাল।

অন্য রকম মানে?

কেমন যেন ভারী ভারী। কান্না চেপে রাখলে যেমন লাগে।

মনে হচ্ছে খুব কান্না বিশারদ হয়ে গেছিস।

মুনা নিচু গলায় হাসল। বকুলও হেসে ফেলল।

বকুল এক কাপ চা বানিয়ে আন তো। মাথা ধরেছে। আদা থাকলে আদা দিস। না থাকলে লিকার চা। আর দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে যা। আলো চোখে লাগছে।

বকুল চা বানিয়ে ফিরে এসে একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখল। মুনা ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে। কান্নার দমকে সে বারবার কেঁপে উঠছে। মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে সে কান্না চেপে রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। বকুল হতভম্ব হয়ে দরজার পাশেই দাঁড়িয়েই রইল। একবার শুধু বলল, চা এনেছি আপা। মুনা কিছুই বলল না। বকুল নিজেও তার চোখ মুছতে লাগল। কাউকে কাঁদতে দেখলেই তার কান্না পায়। সে ভাঙা গলায় ডাকল, আপা।

কি?

তোমার কি হয়েছে আমাকে বলবে?

কিছুই হয়নি। তুই এ ঘর থেকে যা। চায়ের কাপ টেবিলের উপরে রেখে চলে যা।

## ২১

বাকের একটা মোটর সাইকেল জোগাড় করেছে।

মটর সাইকেলটা মজিদের। তাকে বলেছে -- দশ মিনিটের জন্যে দে তো গুলিস্তান যাব আর আসব। মজিদ কিছুক্ষণ গাঁইগুঁই করলেও শেষটায় বিরসমুখে চাবি দিয়েছে। সেটা মঙ্গলবারের কথা। আজ হচ্ছে বৃহস্পতিবার। এর মধ্যে মজিদ দশবারের মত বাকেরের বাসায় এসেছে। নোট লিখে গেছে। জলিলের চায়ের দোকানে খবর দিয়েছে কোন লাভ হয়নি। বাকেরের কোন হদিস নেই।

মোটর সাইকেল জিনিসটা বাকেরের বেশ পছন্দ। কেনা সম্ভব নয়। এক সঙ্গে এতটা টাকা তার হাতে আসে না। ভাগ্যক্রমে মজিদের জিনিসটা যখন সঙ্গে আছে যত দূর সম্ভব ব্যবহার করা যাক। এর মধ্যে পেছনের একটা ল্যাম্প ভেঙে চুরমার। এটা ঠিক না করে মজিদের জিনিস তার কাছে ফেরত দেয়াও এক ঝামেলা। সে ল্যাম্প সারাতে দু'শ টাকার মত লাগে। এও আরেক যন্ত্রণা। দু'শ টাকা তার সাথে নেই। ইয়াদের কাছে চাওয়া যায় কিন্তু ঐ শালা খচ্চরের কাছে যেতে ইচ্ছা করছে না।

বাকের অবশ্যি শেষ পর্যন্ত যাওয়াই ঠিক করল। ইয়াদকে ধরতে হবে তার অফিসে। মিতিঝিল পাড়ায় অফিস। একবার এসেছিল, এখন কী খুঁজে বের করতে পারবে? জায়গা-টায়গা তার মনে থাকে না। দৈনিক বাংলার মোড়ে এসে সে একটা মজার দৃশ্য দেখল। হকার স্ট্যান্ডের সামনে মুনা দাঁড়িয়ে গভীর মনোযোগে ম্যাগাজিন দেখছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিনের পাতা উল্টায় পুরুষেরা। একজন মেয়েও যেন এ রকম করতে পারে তা সে ভাবেনি। বাকের তার মটর সাইকল রেখে এগিয়ে এল।

মুনা, কি করছ?

দেখতেই পারছেন কি করছি। পত্রিকা পড়ছি।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়ছ মানে?

বসে বসে পড়ার কোন উপায় নেই। চেয়ার-টেবিল দেয়নি দেখছেন না।

মুনার এই জিনিসটা বাকেরের ভাল লাগে। চটাচটা জবাব দিবে। এক সেকেন্ডও ভাববে না। যেন জবাবটা তৈরিই ছিল। বাকের এ রকম গুছিয়ে কিছু বলতে পারে না।

মুনা, একটু এদিকে আস তো জরুরি কথা আছে।

মুনা এগিয়ে এল।

বলুন কি ব্যাপার?

আইসক্রিম খাবে?

আইসক্রিম খাব কেন শুধু শুধু।

না মানে কড়া রোদ তো।

কড়া রোদ উঠলেই লোকজন আইসক্রিম খায়?

বাকের কি বলবে ভেবে পেল না। মুনা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, এটা কি আপনার জরুরি কথা?

না। ইয়ে শুনলাম বকুলের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে-- সত্যি নাকি?

হুঁ।

ডাক্তারের সাথে?

হ্যাঁ, ডাক্তারের সাথে। জহির উদ্দিন।

ভেরি গুড। ছোকরা খারাপ না ভালই। কম্যুনিটি সেন্টার ভাড়া নিয়েছ? না নিয়ে থাকলে নিও না। হাফ খরচে বাড়ির সামনে প্যান্ডেল খাটিয়ে ব্যবস্থা করে দেব। নো প্রবলেম।

মুনা হেসে ফেলল। বাকের অবাক হয়ে বলল, হাসছ কেন?

বেকার যুবকরা সামান্য একটা কাজ পেলে কেমন লাফিয়ে ওঠে তাই দেখে হাসছি।

বাকের মিইয়ে গেল। মুনা বলল, আইসক্রিম খাব না তবে চা খেতে পারি। আশপাশে ভাল চায়ের দোকান আছে?

আশপাশে না থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমার সঙ্গে মোটর সাইকেল আছে।

কি আছে?

মোটর সাইকেল। ভটভটি।

মোটর সাইকেলে আপনার পিছনে বসে চা খেতে যাব? পাগল হয়েছেন নাকি? আশপাশে কোথাও চায়ের স্টল থাকলে চলুন যাই।

তোমার অফিস নেই?

না ছুটি নিয়েছি।

কি জন্যে?

ঘুরে বেড়াবার জন্যে।

বাকের কিছুই বুঝতে পারল না। খুঁজে পেতে চায়ের স্টল একটা বের করল। মেয়েদের জেন্য কেবিন আছে। মুনা ঠোঁট উল্টিয়ে বলল, কোন নরকে নিয়ে এসেছেন আপনি?

কি করব, ভাল কিছু নেই এদিকে। উঠে পড়বে?

এসেছি যখন চা খেয়েই যাই।

আমি একটা সিগারেট ধরালে তোমার অসুবিধা হবে মুনা?

না অসুবিধা হবে না।

বাকের খুব কায়দা করে সিগারেট ধরাল · এবং এই সঙ্গে খুব সাবধানে মানিব্যাগটা ঠিক আছে কিনা দেখল। চা খাবার পর যদি দেখা যায় মানিব্যাগ আনা হয়নি কিংবা পকেট মার গেছে তাহলে সর্বনাশ। মেয়েমানুষের কাছে হাত পাততে হবে। বেইজ্জতি ব্যাপার হবে।

চা'টা ভালই বানিয়েছে কি বল মুনা?

ভাল কি দেখলেন এর মধ্যে আপনি? বমি আসছে।

কফি খাবে? কফি পাওয়া যায়। এক্সপ্রেসো কফি।

না যথেষ্ট হয়েছে। আপনি তাড়াতাড়ি শেষ করুন।

বাকের কোনো রকম তাড়া দেখাল না। তার ইচ্ছা করছে অনন্তকাল এই ঘুপসি ঘরটাতে বসে থাকতে।

মুনা।

বলুন।

মামুন সাহেবের সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে নাকি?

ঝগড়া হবে কেন?

এমনি জিজ্ঞেস করছি। আগে তো প্রায়ই আসতেন তোমাদের বাসায় এখন আসতে দেখি না।

আপনি কী দিনরাত মানুষের বাসার দিকেই তাকিয়ে থাকেন? কে আসছে কে যাচ্ছে তাই দেখেন?

না তা না। তোমাদের বিয়ে কবে?

হবে শিগগিরই। হলে খবর পাবেন। সস্তায় কোথায় ডেকোরেটর পাওয়া যায় এইসব খোঁজ তো আপনাকেই করতে হবে।

মুনা অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। বাকের বলল, এখন কি বাসায় যাবে?

হুঁ।

চল একটা রিকশা করে দি।

রিকশা আমি নিজে নিয়ে নেব। আপনার যেখানে যাবার যান।

আমার তেমন কোন কাজ নেই। একটা অবশ্যি আছে সেখানে পরে গেলেও কোন ক্ষতি হবে না। বকুলের বিয়ের তারিখ হয়েছে নাকি?

মোটামুটি ভাবে হয়েছে, তেসরা জিলকদ।

জিলকদটা আবার কি?

আরবি মাসের নাম। মোহররমের আগের মাস হচ্ছে জিলকদ। বিয়েশাদিতে আরবি মাস ব্যবহার করা হয় জানেন না?

না জানি না তো।

রিকশায় উঠে মুনার বিরক্তির সীমা রইল না। বাকের মোটর সাইকেলে করে তার পেছনে

আছে। ভাবটা এর রকম যেন পাহারা দিতে দিতে যাচ্ছে। একবার ইচ্ছা হল কড়া করে ধমক দেয়। কিন্তু ধমক দিতে মায়া লাগছে। চোখে চশমা পরে কেমন মহাকাপ্তান ভঙ্গি নিয়ে এসেছে চেহারায়। ঠোঁটে আবার একটা সিগারেট কামড়ে ধরা আছে। রিকশাওয়ালা একবার একটু বেশি স্পিড দিয়ে ফেলায় সে বাঘের মতো গর্জন করে উঠেছে-- থাবরা দিয়ে মুখ ভোতা করে দেব। একসিডেন্ট করে প্যাসেনজার মারতে চাস নাকি? অত্যন্ত বিরক্তিকর অবস্থা। মাঝে মাঝে আবার দু'হাত ছেড়ে মোটর সাইকেল চালাবার চেষ্টা করছে। এটা বোধ হয় নতুন কোন কায়দা। মুনা ভেবে পেল না। একজন বুদ্ধিমান মানুষ কী করে মাঝে মাঝে এমন বির্বোধের মতো আচরণ করে? নাকি সে ঠিক বুদ্ধিমান নয়? বুদ্ধিমান মানুষ স্বার্থপর হয়। এটাই নিয়ম। টিকে থাকবার জন্যেই তাকে স্বার্থপর হতে হয়। বাকেরকে কী স্বার্থপর বলা যাবে? না বোধ হয়।

## ২২

বকুলকে আজ তার শাশুড়ি দেখতে আসবেন।

এর মানে কি বোঝা যাচ্ছে না। জহিরের আত্মীয়-স্বজন এর আগে কয়েক দফায় তাকে দেখে গেছে। আংটি পরিয়ে দিয়েছে। বিয়ের তারিখ ঠিক করেছে। এরপর আবার মা আসছেন কেন? টিনা এসে বকুলকে খানিকটা ভয়ও পাইয়ে দিয়েছে। গম্ভীর হয়ে বলেছে, খুব ক্যাটক্যাটে মহিলা। স্কুল মাস্টারি করেছে কিছুদিন তাই মেজাজ এ রকম হয়েছে। কথাবার্তা সাবধানে বলবি। বেশি কথা বলার দরকার নেই।

বকুল বলল, উনি কী বিয়েটা পছন্দ করছেন না?

না।

বুঝলে কি করে, তোমার সঙ্গে কথা হয়েছে?

না, জহির আমাকে কথায় কথায় বলল। তোর একটা ছবি দিয়েছিল। ভদ্রমহিলা ছবির দিকে না তাকিয়েই বললেন, মেয়ের নাক মোটা।

আমার নাক কি মোটা?

নাক ঠিকই আছে। বুদ্ধি মোটা।

বকুলের মন খারাপ হয়ে গেল। তার বুদ্ধি কম এটা সে নিজেও জানে। যাদের বুদ্ধি বেশি তারা পাটিগণিত ভাল জানে। সে একেবারেই জানে না। মেট্রিকে সে যদি ফেল করে পাটিগণিতের জন্যেই করবে।

ভদ্রমহিলার সন্ধ্যাবেলা আসার কথা। তিনি বিকেলে একা একা চলে এলেন। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী একজন মহিলা। লম্বা, ফর্সা, রোগা মাথা ভর্তি ঘন কালো চুল। পান খাবার কারণে ঠোঁট টকটকে লাল। সাদা সিল্কের শাড়ি পরেছেন। শাড়ির ওপর নীলের ওপর সাদা কাজ করা একটা চাদর। তাঁকে দেখে মনেই হয় না তাঁর এত বড় একটা ছেলে আছে। তিনি রিকশা থেকে নেমেই বললেন, খুব ফর্সা ফর্সা শুনেছি, তুমি কিন্তু মা একটু কালো।

মুনা হেসে ফেলল।

আপনি ভুল মেয়েকে দেখেছেন। ফর্সা মেয়ে ঘরে আছে। আমার নাম মুনা। আমি বকুলের মামাতো বোন।

ভদ্রমহিলা মোটেই অপ্রস্তুত হলেন না। আরো শক্ত করে মুনার হাত চেপে ধরলেন। মুনার মনে হল ইনি ইচ্ছে করেই ভুলটা করছেন। তিনি ভালই জানেন এই মেয়ে তাঁর ছেলের পছন্দের মেয়ে নয়। ছবি দেখেছেন অন্যদের কাছে শুনেছেন।

মুনা, তোমার নাম?

জি।

তোমার কথা আমি জহিরের কাছে শুনেছি।

কি শুনেছেন?

তুমি নাকি খুব শক্ত মেয়ে।

আপনার কাছে কি সে রকম মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ হচ্ছে। আমি নিজেও বেশ শক্ত মেয়ে। জহিরের চার বছর বয়সে তার বাবা মারা গেলেন। তারপর আমিই এদের এত দূর টেনে তুললাম। শক্ত মেয়ে না হলে কি এটা সম্ভব তুমিই বল।

বকুলকে দেখে তিনি তেমন কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। গল্প করতে লাগলেন শওকত সাহেবের সঙ্গে। ঘর-বাড়ির গল্প, জমিজমার গল্প। পঞ্চাশ বিঘা জমি আছে তার। জমির বিলিব্যবস্থা নিয়ে যে সব সমস্যা হচ্ছে তার গল্প। ঘুরে ঘুরে প্রতিটি ঘর দেখলেন।

কে কোথায় ঘুমায় আগ্রহ করে জানতে চাইলেন। শওকত সাহেবের স্ত্রীর বাঁধানো ছবি দেখে বললেন, বেয়ান সাহেব তো খুব সুন্দর ছিলেন। ছেলেমেয়েরা কেউ তাঁর মতো হয়নি।

মুনা এক ফাঁকে বলল, বকুলকে কি আপনার পছন্দ হয়েছে?

তিনি শীতল গলায় বললেন, আমার পছন্দ-অপছন্দের তো কোনো ব্যাপার না। জহির পছন্দ করেছে, বিয়ে হচ্ছে ওর পছন্দে।

তার মানে আপনার পছন্দ হয়নি?

না মা হয়নি। আমার দরকার ছিল তোমার মত একটা মেয়ে। শক্ত, তেজী। বকুল সে রকম না। কোনো একটা ঝামেলা হলেই এ মেয়ে ভেঙে পড়বে। আমার সংসার হচ্ছে মা ঝামেলার সংসার।

কিসের এত ঝামেলা আপনার?

আছে অনেক। বলব সবই।

বকুলের ভদ্রমহিলাকে ভাল লাগছে না। ইনি এত কথা বলছেন কেন? একজন বয়স্ক মানুষ বয়স্ক মানুষের মত থাকবেন। হড়বড় করে এত কথা বলবেন কেন? তাছাড়া উনার জমিজমার সমস্যা। সে সব পৃথিবী সুদ্ধ মানুষকে জানানোর দরকার কী? বকুল রান্নাঘরে চলে এল। মুনা খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করছে। সবই বাইরের খাবার। ঘরের বলতে পায়েস। সেটা এত মিষ্টি হয়েছে যে মুখে দেয়া যাচ্ছে না।

আপা!

বল।

ভদ্রমহিলাকে তোমার কেমন লাগছে?

ভালই।

এত সাজগোজ করেছেন কেন বল তো?

সাজগোজ কোথায় দেখলি?

আমার ভাল লাগছে না আপা। তাঁর এই সমস্যা সেই সমস্যা। এ সব শুনতে কি কারো ভাল লাগে?

যা চা দিয়ে আয়।

আমি পারব না।

বাজে কথা বলবি না। নে ট্রে'টা ধর।

বকুল ট্রে নিয়ে মুখ কালো করে বের হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাবু এসে বলল, আপা, মামুন ভাই এসেছে। বসার ঘরে বসেছে। মুনা সহজ স্বরে বলল, গিয়ে বল ঘরে অনেক মেহমান অন্যদিন যেন আসে।

বাবু নিচু স্বরে বলল, এটা আমি বলতে পারব না আপা। বলতে হলে তুমি বলবে।

মামুন জড়সড় হয়ে বসে ছিল। তার হাতে এক হাঁড়ি দৈ। আসার পথে কি মনে করে সে এক হাঁড়ি দৈ কিনে ফেলেছে। এর জন্যে নিজেই সে খানিকটা বিব্রত বোধ করছে। মিষ্টি, দৈ এসব কিনে কারো বাড়ি যাওয়াটাই অস্বস্তিকর। নিজেকে কেমন জামাই জামাই মনে হয়। মুনা এসে ঢুকল। মামুন হাসতে চেষ্টা করল। হাসিটা ঠিক ফুটল না। কোথায় যেন আটকে গেল।

তোমাদের বাড়িতে কি হচ্ছে? কেউ এসেছে নাকি?

হুঁ। বকুলের বিয়ে হচ্ছে। ওর শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছে।

বকুলের বিয়ে হচ্ছে নাকি?

হুঁ।

এত তাড়াতাড়ি যে?

ভাল ছেলে পাওয়া গেছে বিয়ে দিয়ে দেয়া হচ্ছে।

এটা খারাপ না। একদিক দিয়ে ভালোই। আমি তাহলে বরং অন্যদিন আসি। কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

কথা থাকলে এখনি বল। আবার আসার দরকার কি?

আর আসার দরকার নেই, কি বল তুমি?

একবার তো বলেছি তোমাকে।

শোন মুনা, ঠাণ্ডা মাথায় একটা কথা শোন। ঠাণ্ডা মাথায় কথা বল।

আমি যা বলছি ঠাণ্ডা মাথায় বলছি।

আচ্ছা ঠিক আছে, একটা কথা রাখ, তুমি বরং আরো মাসখানেক নিজের মতো থাক। মাসখানেক আমি তোমাকে বিরক্ত করব না।

ভাল।

গ্রামের বাড়িতে চলে যাচ্ছি। মাসখানেক ওখানে থাকব। চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি।

মুনা চুপ করে রইল। মামুন সিগারেট ধরাল একটা। নিচু গলায় বলল, বাসা যেটা নিয়েছিলাম সেটা থাকবে। ভাড়া দিয়ে যাব। তোমার রাগ ভাঙলে বিয়ে করে ঐ বাড়িতে গিয়ে উঠব। উঠি এখন?

এসেছ যখন বস। চা খেয়ে যাও।

আচ্ছা খেয়েই যাই। তোমাদের জন্যে দৈ এনেছিলাম। দৈটা নাও।

মুনা দৈ হাতে রান্নাঘরে চলে গেল। বাবুকে দিয়ে চা এবং পায়েস পাঠিয়ে দিল। মামুন চা খেয়ে বেশ খানেক সময় একা একা বসে রইল। একসময় বাবু ঢুকল। মামুন নড়েচড়ে বসল।

বাবু কেমন আছ?

ভাল আছি।

তোমার যে মাথাব্যথা হত সেটা সেরে গেছে, না এখনো মাঝে মাঝে হয়?

হয় মাঝে মাঝে।

তুমি যেন কোন ক্লাসে পড়?

ক্লাস সেভেন।

বাহ্ ভাল তো। সাঁতার জানো তুমি?

না।

আমাদের গ্রামের বাড়িতে বিরাট পুকুর আছে। নিয়ে যাব তোমাকে। সাঁতার শিখিয়ে দেব, দু'দিনে শিখিয়ে দেব।

বাবু কিছু বলল না। বকুলের শ্বশুর বাড়ির আরো কিছু লোকজন এল এ সময়। সবই মেয়ে মানুষ। এরা সরাসরি ভেতরে চলে গেলেন। বাবুও উঠে ভেতরে চলে গেল। মামুন থাকল আরো খানিকক্ষণ। একটা টিকটিকি উঁকি দিচ্ছে।.কৌতূহলী হয়ে তাকে দেখছে। বিশাল তার সাইজ। সম্ভবত এটা তক্ষক।

বিদেয় নেবার আগে মুনাকে বলে যাওয়া দরকার কিন্তু মুনা আসছে না। হয়ত আর আসবে না। মেহমানদের নিয়ে ব্যস্ত। মামুনের মনে হল মুনার রাগ কিছুটা কমেছে। আজকের ব্যবহার তো খুব সহজ ও স্বাভাবিক। নিজ থেকেই চা খেযে যেতে বলল। রাগ কমে যাবে। নিশ্চয়ই কমবে। এক মাস দীর্ঘ সময়। অদর্শন কোন না কোন ভাবে মন দ্রবীভূত করায় একটা ভূমিকা নেবে।

মামুন বসেই রইল। কাউকে না বলে চলে যাওয়াটা ভাল দেখায় না। টিকটিকিটা এখনো তাকে দেখছে।

## ২৩

বাকেরের বড় ভাই হাসান সাহেব ফাইন্যান্সের জয়েন্ট সেক্রেটারি লোকটি শান্ত প্রকৃতির।

কখনো কোনো ব্যাপারে সামান্যতম উত্তেজনাও তাঁর আচার-ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। অফিস শেষে সরাসরি বাসায় ফেরেন। দোতলা থেকে পারতপক্ষে নিচে নামেন না। মাঝে মাঝে বারান্দায় গম্ভীর মুখে বসে থাকেন।

আজও তেমনি বসে ছিলেন। আজ তাঁর মুখ শুধু গম্ভীর নয় কিছুটা বিষণ্নও। বারান্দায় বসে থাকলে সাধারণত তাঁর হাতে খবরের কাগজ কিংবা কোনো ম্যাগাজিন থাকে। আজ তাও নেই। তাঁর ফর্সা গাল কিঞ্চিৎ লাল হয়ে আছে। আজ তাঁদের একটি নাটক দেখতে যাবার কথা। তিনি কিছুক্ষণ আগে সেলিনাকে জানিয়ে এসেছেন, তিনি যাবেন না। সেলিনা ব্লাউজ ইস্ত্রি করছিলেন। নাটকে যেতে হবে এই উপলক্ষেই শাড়ির রঙ মিলিয়ে ব্লাউজটি আজই কেনা হয়েছে। রঙ মিলছিল

না। বহু ঝামেলা করে পাওয়া গেছে। তিনি কিছুক্ষণ আগেই ব্লাউজ ধুয়েছেন। ভেজা কাপড়টি এখন ইস্ত্রি করে করে শুকান হচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে নাটকেই যাওয়া হবে না। তাঁর স্বভাব-চরিত্র হাসান সাহেবের মত নয়। তিনি অল্পতেই রাগেন। আজও রাগলেন। রাগ প্রকাশ না করে বললেন, কেন যাবে না? হাসান সাহেব বিরস মুখে বললেন, যেতে ইচ্ছা করছে না।

কেন ইচ্ছা করছে না। সকালেও তো বললে যাবে। আমি ইয়াসিনকে পাঠিয়ে টিকিট আনালাম। দুপুরে টেলিফোন জিজ্ঞেসও করলাম। তখনো বললে যাবে।

শরীরটা ভাল লাগছে না।

আমি তো খারাপ কিছু দেখছি না। আমার কাছে তো তোমার শরীর ভালই মনে হচ্ছে।

হাসান সাহেব কথা না বাড়িয়ে বারান্দায় চলে গেলেন। কাজের মেয়েটি চা নিয়ে এল। অন্য সময় সেলিনা চা নিয়ে আসতেন। তিনি চায়ে বেশি চিনি খান। কাজের মেয়েটির সেই আন্দাজ নেই। চায়ে চুমুক দিয়ে তাঁর মেজাজ খারাপ হল। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না।

আজ অফিসে একটা ঝামেলা হয়েছে। সামান্য ঝামেলা নয় বড় রকমের ঝামেলা। এক মন্ত্রীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। সামরিক সরকারের মন্ত্রী, এদের মেজাজ উঁচু তারে বাঁধা থাকে, সারাক্ষণই মনে করে তাদের যোগ্য সম্মান দেয়া হচ্ছে না। এই মন্ত্রীটি পান খেতে খেতে হাসান সাহেবের ঘরে ঢুকেই বললেন, এগারটার সময় আপনাকে দেখা করতে বলেছিলাম।

হাসান সাহেব বিনীত ভাবে বললেন, আমি স্যার গিয়েছিলাম আপনি ব্যস্ত ছিলেন। কাদের সঙ্গে যেন কথা বলছিলেন।

ব্যস্ত তো থাকবই। এয়ারকন্ডিশন্ড ঘরে বসে ঠাণ্ডা বাতাস খাবার জন্যে তো মন্ত্রী হই নাই। অপেক্ষা করতে পারলেন না?

আধঘন্টা অপেক্ষা করেছি।

আধঘন্টা অপেক্ষা করেই আপনার মাথায় ব্যথা হয়ে গেল। নিজের ঘরে তো বসেই থাকেন কাজকর্ম তো কিছু করেন না।

হাসান সাহেব শীতল গলায় বললেন, কাজকর্ম প্রসঙ্গে আপনি যা বলছেন তার জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য কি স্যার আপনার আছে?

তথ্য? আপনি তথ্য কপচাচ্ছেন আমার সাথে। একজন মন্ত্রীকে আপনি কি মনে করেন?

মন্ত্রীকে মন্ত্রীই মনে করি এর বেশি কিছু মনে করি না।

আপনারা সিএসপি রা মিলে দেশটাকে নষ্ট করেছেন। এটা জানেন?

না স্যার আমার জানা ছিল না।

দেশের কমন মানুষ আপনাদের ধারেকাছে যেতে পারে না। নিজেদেরকে আপনার একজন লাট-বেলাট ভাবেন।

আপনি এসব কি বলছেন?

একজন মন্ত্রী আপনাকে কল দিয়েছে আপনি দশ মিনিট অপেক্ষা করতে পারেন না? আপনি কি জানেন চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর আমি আপনার চাকরি খেতে পারি?

স্যার এটা আমার জানা ছিল না।

মন্ত্রী কোনো কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেল। ডেপুটি সেক্রেটারি আমিনুল ইসলাম বললেন, আপনি স্যার চলে যান, ক্ষমা চেয়ে আসুন। ক্ষমা চাইলেই এরা পানি হয়ে যায়।

হাসান সাহেব বিরক্ত স্বরে বললেন, ক্ষমা চাওয়ার মত কিছু হয়নি।

সময় খারাপ স্যার।

তা খারাপ।

ঝামেলা টামেলা হতে পারে।

আগে হোক। তারপর দেখা যাবে।

বাকি সময়টায় অফিসের কোনো কাজে তার মন বসেনি। এখনো বসছে না। বারান্দায় বসে থেকে মেজাজ খারাপ হচ্ছে। সেলিনার সঙ্গে গল্পটল্প করলে ভাল লাগত। সেলিনার মেয়েলি গল্প শুনতে তাঁর খারাপ লাগে না। সেলিনা আসবে না। তাকে রাগিয়ে দিয়েছেন। হাসান সাহেবের মনে হল নাটক দেখতে না যাওয়াটা অন্যায় হচ্ছে। আগে থেকে প্রোগ্রাম করা। প্রোগ্রাম ঠিক রাখা উচিত। জীবনযাত্রা ওলটপালট করে ফেলবার মত কিছু হয়নি।

তিনি সেলিনার ঘরে ঢুকলেন। হালকা গলায় বললেন, চল নাটক দেখে আসি। এখনো নিশ্চয়ই সময় আছে।

তোমার শরীর সেরে গেল?

হুঁ সেরেছে। এখন ভালই লাগছে। সাতটার সময় শুরু হবার কথা না? সাড়ে ছ'টা বাজে। আধঘণ্টা আছে এখনো। চট করে তৈরি হয়ে নাও। পারবে না?

সেলিনা হাসিমুখে বললেন, পারব। তুমি কি ভাব দু'তিন ঘণ্টা লাগিয়ে আমি সাজগোজ করি? সেলিনার মুখে রাগের চিহ্নও নেই। তার এই গুণটি হাসান সাহবের খুব পছন্দ। রাগ করে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। হাসান সাহেবের মনে হল তাদের দু'একটা ছেলেমেয়ে থাকলে মোটামুটি একটি সুখের সংসার হত। সেটা কখনো সম্ভব হবে না।

বাকের জলিল মিয়ার চায়ের স্টলের বাইরে টুল পেতে বসে ছিল। ভাই এবং ভাবীকে আসতে দেখে সে অন্য দিকে তাকিয়ে রইল যাতে চোখে না পড়ে। চোখে চোখ পড়লেই দেড় টাকা দামের সিগারেটটা ফেলে দিতে হবে। ভাইয়া হয়ত হাত ইশারা করে ডাকবে। কাছে গেলেই গম্ভীর মুখে বাণী-টানী দিবে। এরচে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকাই ভাল।

সেলিনা বললেন, তোমার মাস্তান ভাইকে দেখেছ?

হুঁ।

সেও আমাদের দেখেছে, এখন এ রকম ভান করছে যেন দেখতে পায়নি।

এটাই স্বাভাবিক। বাবার সঙ্গে আমার যখন দেখা হত আমিও এ রকমই করতাম না। না দেখার ভান করতাম।

তোমার ভাই তোমার মতই হয়েছে, তাই বলতে চাও?

হাসান সাহেব কোন কথা বললেন ন। রাস্তার মোড়ে রিকশার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কোথাও যাবার তাড়া থাকলে কখনো রিকশা পাওয়া যায় না। সেলিনা বললেন, তোমার গাড়ি কেনার কী হল?

টাকা কোথায়?

প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে লোন নেবে বলেছিলে? ব্যাংকেও তো কিছু আছে।

দেখি।

দেখাদেখি না। রোজ এমন রিকশা করে ঘোরাঘুরি করতে ভাল লাগে না।

হাসান সাহেব চুপ করে রইলেন। একটা খালি রিকশা দ্রুতগতিতে আসছে। এর তাড়া দেখে মনে হয় না এ থামবে। কিন্তু হাসান সাহেবকে অবাক করে দিয়ে রিকশা থামল। রিকশাওয়ালা গম্ভীর গলায় বলয়, উঠেন।

আমরা বেলি রোডে যাব। যাবে তুমি?

যেখানে কন হেইখানে যামু। আমারে পাঠাইছে বাকের ভাই। উঠেন।

সারাপথ দুজন কোনো কথা বললেন না। রিকশাওয়ালা অনবরত কথা বলে গেল।

দশ টাকা সের চাইল কেমনে চলুম কন দেহি। ছয়জন খানেওয়ালা। বড় মাইয়ার বিয়া দেওন দরকার। ক্যামনে দিমু কন? রিকশার জমা হইছে আফনের চল্লিশ টাকা। টায়ার ফাটলে হেই খরচ আমার, শিক ভাঙলেও আমার। অহন কন দেহি ভাইজান ক্যামনে চলি? আপনে বিচার-বিবেচনা কইরা কন।

হাসান সাহেব বিচার-বিবেচনা করে কিছুই বললেন না। পরিষ্কার বুঝতে পারছেন যা ভাড়া তার ওপর গোটা পাঁচেক টাকা দিতে হবে বকশিস। লম্বা দুঃখের পাঁচালী শুনবার এটা হবে খেসারত।

কিন্তু রিকশাওয়ালা কোন পয়সাই নিল না। চোখ কপালে তুলে বলল, না না ভাড়া দেওনের দরকার নাই। বাকের ভাই পাঠাইছে।

সেলিনা তিক্ত গলায় বললেন, আর সাধাসাধি করতে হবে না। তোমার বিখ্যাত ভাই পাঠিয়েছে পয়সা সে নেবে কেন? দেরি হচ্ছে চলে আস। ঘণ্টা দিয়ে দিয়েছে। শুরুটা মিস করতে চাই না।

বাকের সন্ধ্যা পর্যন্ত জলিল মিয়ার দোকানে বসে রইল। তার সঙ্গে আছে মাখন এবং কুদ্দুস। দুজনই গাঁজা টেনে এসেছে। বিকট গন্ধ ছড়াচ্ছে। মাখন কিছু-একটা নিয়ে চিন্তিত। সে কিছু বলছে না কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বলবে। সে দেরি করছে। কারণ তার বক্তব্য বাকেরের পছন্দ

হবে না বলেই মনে হচ্ছে। গাঁজা টেনে আসার কারণে কুদ্দুসের গলা শুকিয়ে আছে। সে কিছুক্ষণ পর পর থুথু ফেলবার চেষ্টা করছে থুথু আসছে না। জলিল মিয়া দোকানের কাজকর্মের ফাঁকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখছে এই টেবিলে। দিন দশেক আগে কোন রকম কারণ ছাড়াই কুদ্দুস এবং মাখনের মধ্যে এই চায়ের দোকানেই ধুন্ধুমার লেগে গিয়েছিল। চারটা কাপ এবং দুটা গ্লাস ভেঙেছে। একটা চেয়ারের পায়া ভেঙেছে। আজও লেগে যেতে পারে। তবে ভরসার কথা হচ্ছে বাকের ভাই আছে। তার সামনে এরা কিছু করতে সাহস পাবে না। জলিল মিয়া দাঁত বের করে বলল, বাকের ভাই, চা দিতে কাই? বাকের কিছু বলল না। মাখন বলল, সিগারেট আনান জলিল মিয়া।

জলিল বিরসমুখে পাঁচটা টাকা বের করে সিগারেট আনতে পাঠাল। মাখন বলল, বাকের ভাই একটা কথা ছিল।

কি কথা?

প্রাইভেট কথা।

বলে ফেল।

মাখন গলা নিচু করে ফেলল। কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিয়ে বলল, ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। সিদ্দিক সাহেবের রিকোয়েস্ট।

ব্যাপারটা কি?

ভাড়াটে উঠে না। ধানাই-পানাই করছে। এখন বলছে, 'উঠব না মামলা করে উঠাও।' শালা, মামলার ভয় দেখায়। সিদ্দিক ভাই খুব রেগেছেন। আমাকে বললেন, তোমরা থাকতে এই অপমান!

বাকের ঠাণ্ডা গলায় বলল, এর মধ্যে অপমানের কী আছে? মামলা করতে বলছে মামলা করুক।

বাকের ভাই, ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন না। আমরা থাকতে মামলা-মকদ্দমা কি? শালাকে একটু কড়াকে দিলে কালই বাসা ছেড়ে দিবে।

সিদ্দিক সাহেবের কাছ থেকে কত নিয়েছিস?

টাকা-পয়সার কোন ব্যাপার না। খাতিরে কাজটা করে দিচ্ছি আর কি।

খুব পিতলা খাতির জমাচ্ছিস ব্যাপারটা কি?

ব্যাপার কিছু না। ব্যাপার আবার কি? উঠিয়ে দেই শালাকে। কি বলেন বাকের ভাই?

বাকের কিছু বলল না। মনে মনে খুশিই হল। একটা কাজ করবার আগে এরা তাকে জিজ্ঞেস করছে। মান্যগণ্য করছে। তবে সিদ্দিক সাহেবের ব্যাপারটার বোঝা যাচ্ছে না। তাকে বাদ দিয়ে অন্যদের কাছে যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে রাস্তায় দেখা হল এমন ভাব করল যে চিনতে পারছে না।

কুদ্দুস বহু কষ্টে একদলা থুথু ফেলে বলল, পাঁচটা টাকা দেন বাকের ভাই। পকেট খালি।

বাকের দশ টাকার নোট দিয়ে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে গেল। এখন বাজছে আটটা। সাধারণত আটটার দিকে কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়িতে লোকজন আসে। আজও আসবে হয়ত। কারা আসছে লক্ষ্য রাখা দরকার।

গেটের কাছে জোবেদ আলি দাঁড়িয়ে আছে। বাকেরকে দেখে সে আড়ালে সরে গেল।

বাকের উঁচু গলায় ডাকল, এই যে ভাই আছেন কেমন?

ভাল।

ঘর অন্ধকার কেন? লোকজন নাই?

দাওয়াতে গেছে।

দাওয়াত কোথায়?

জানি না কোথায়? এত সব জিজ্ঞেস করেন কেন?

এক পাড়ায় থাকি। খুঁজে-খবর নিতে হয়। নেন সিগারেট নেন।

বাকের সিগারেটের প্যাকেট হাতে এগিয়ে এল। জোবেদ আলি বলল আমি সিগারেট খাই না। কথাটা সত্যি নয়। উটের মত মুখের এই লোকটিকে দেখেছ খেতে। ভাম কোথাকার!

মাঝে-মধ্যে সিগারেট টানতে দেখি।

জোবেদ আলি গম্ভীর হয়ে গেল। বাকের তার গম্ভীর মুখ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, মেয়েরা ভর্তি হয়েছে কলেজে?

কি বললেন?

মেয়েরা কলেজে ভর্তি হয়নি? আপনি বলছিলেন ভর্তি হবে।

জানি না কিছু।

বোধ হয় হয়নি। কোথাও তো যেতে-টেতে দেখি না। আচ্ছা ভাই যাই, বিরক্ত করলাম। খাবেন একটা সিগারেট?

না।

বাকের চলে গেল রিহার্সেল দেখতে। নাটকের নাম "রাতের পাখিরা"। নাম শুনেই মনে হচ্ছে বাজে মাল। টিপু সুলতানটা নামালে হয়, তা না সামাজিক নাটক। টিপু সুলতানে অনেক শেখার জিনিস ছিল। দেখলে মনটা অন্য রকম হয়। তা না রদ্দিমাল রাতের পাখি।

বাকেরকে দেখে একটা সাড়া পড়ে গেল। বাকের ভাইকে বসতে দে। চায়ের কথা বলে আয়। নাটকটির পরিচালকের নাম বদরুল আলম। বয়স চল্লিশেরর মতো। এই পাড়ায় যে ক'টি নাটক হয়েছে তার প্রতিটিতে সে পাগল কিংবা পাগলীর ভূমিকায় অভিনয় করেছে। এই একটি অভিনয় সে নিখুঁত করে। "রাতের পাখিরা" সে একটা চরিত্র আছে যে শুধু অমাবস্যার রাতে পাগল হয়ে যায়। পাগল হলেই পাগলামির ফাঁকে ফাঁকে সে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে। উচ্চমার্গের ফিলসফি।

বদরুল আলম নাটক বন্ধ রেখে বাকেরের কাছে এসে দাঁড়াল। গলা নামিয়ে বলল, আপনার সাথে একটা কথা ছিল। একটু বাইরে আসুন বাকের ভাই।

কি ব্যাপার?

জামান সাহেব আমাকে বলেছেন নাটক-ফাটক বাদ দিতে।

কেন?

তার দোকানের বিকিকিনির নাকি অসুবিধা হয়।

অসুবিধা কি? আপনি ছাড়াও তো আরেকজন কর্মচারী আছে।

এটাই একটু বলে দেবেন।

দেব বলে দেব। নাটক হচ্ছে কেমন?

ভাল। এক নম্বর। ফাসক্লাস জিনিস হবে বাকের ভাই।

বদরুল আলমের চোখ চকচক করতে লাগল। নাটকের ব্যাপারে তার উৎসাহ সীমাহীন।

আসুন বাকের ভাই, রিহার্সেল দেখুন। থার্ড সিনটা দেখাই আপনাকে। মারাত্মক সিন।

না চলে যাই।

চলে গেলে হবে না। থার্ড সিনটা দেখতেই হবে।

থার্ড সিনে দরিদ্র স্কুল মাস্টার বাড়ি ফিরে দেখে তার ছোট মেয়ে মারা যাচ্ছে। সে ছুটে যায় ডাক্তারের খোঁজে। ডাক্তার একজনকে পাওয়া যায় কিন্তু সে ভিজিটের টাকা না নিয়ে যেতে রাজি না। মাস্টার বহু কাকুতি-মিনতি করল কোন লাভ হল না। সে আবার ফিরে গেল ঘরে। চিৎকার করে বলল, কোথায় আমার নয়নের মণি। কেউ জবাব দিল না। কারণ নয়নের মণি মারা গেছে। মাস্টার চেঁচিয়ে বলতে লাগল - হায় টাকা, হায় রে টাকা।

বাকের মুগ্ধ হয়ে গেল। তার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। গলা ভার ভার হয়ে গেল। দুঃখের সিন দেখলেই তার এ রকম হয়। চোখে পানি এসে যায়। নাটক দেখতে দেখতে তার ইচ্ছা করছিল থাবড়া দিয়ে ডাক্তার হারামজাদাটার দাঁত ফেলে দিতো। শুয়োরের বাচ্চা। মানুষ মারা যাচ্ছে সেদিকে খেয়াল নাই। টাকা আর টাকা। দেশটার হচ্ছে কি?

সে আবার কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়ির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়াল। বাড়ি অন্ধকার। শুধু সিঁড়ির বাতি জ্বলছে। এরা কখন ফেরে লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না। মাথা ধরেছে।

বাকের ভাই!

বাকের চমকে তাকাল। ইউনুস মিয়া। সিগারেটের টাকা পায় বোধ হয়। নানান দিকে বাকি পরে গেছে।

কি খবর ইউনুস মিয়া?

সিদ্দিক সাহেবের বাড়িতে একজন ভাড়াটে যে থাকে তার জিনিসপত্র সব টেনে তুলে বাইরে ফেলে দিচ্ছে।

আমি কি করব? সিদ্দিক সাহেব আর তার ভাড়াটে মামলার।

তা তো ঠিকই। বাচ্চারা কান্নাটি করছে দেখে মনটা খারাপ হল।

কথা কথায় মন খারাপ হলে সংসার চলে না। এই জিনিসটা মনে রাখবেন। আর শোনেন, আপনি টাকা-পয়সা কিছু পান নাকি?

জি।

সামনের মাসে দিব। এখন একটু অসুবিধা আছে।

জি আচ্ছা ঐটা কোন ব্যাপার না। যখন ইচ্ছা দিবেন।

বাকের ঘরের দিকে রওনা হল। রাত ন'টার মতো বাজে। খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। শরীরটা জুত লাগছে না। আরেকটু দেরি করে গেলে ভাল হত ভাই-ভাবীরা খেয়ে শুয়ে পড়ত। কারো মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা থাকত না। এখন যাওয়া মানেই ভাবীর সামনে পড়ে যাওয়া। যদি তাদের খাওয়া না হয়ে থাকে তাহলে এক সঙ্গে খেতে হবে। ভাইয়া বসবে ঠিক তার সামনের চেয়ারটায়। একটি কথাও বলবে না। একবার তাকাবেও না। নিজেকে মনে হবে চোরের মত। গলা দিয়ে ভাত নামতে চাইবে না। বারবার পানি খেতে হবে।

বাকেরদের বাড়ির সামনের বারান্দায় একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। বাকেরকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন। বাকের তাঁকে চিনতে পারল না। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের রোগা কিছু মেয়েরা আসে প্রায়ই। যাদের মুখ দেখলেই মনে হয় এরা বাড়িতে প্রচুর ঝগড়া করে কর্কশ গলায় ছেলেপুলেদের ধমকায়। এবং এদের অসুখ-বিসুখ লেগেই থাকে।

আপনি বাকের সাহেব?

জি।

আমি আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।

কি ব্যাপার?

আপনার ছেলেরা আমার ঘর থেকে জিনিসপত্র টেনে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। আমার বড় মেয়েটার একশ তিন জ্বর। এদের বাবা বাসায় নেই দেশের বাড়িতে গেছে।

আপনি সিদ্দিক সাহেবের বাড়িতে থাকেন?

জি। দু'মাসের ভাড়া বাকি পড়েছে। ওর বাবা টাকার জন্যেই দেশের বাড়িতে গেছে। এর মধ্যে এই অবস্থা।

চলুন যাই। দেখি কি ব্যাপার। আসুন আমার সাথে। কাঁদবেন না কাঁদার কিছু নেই। আমি মাখনা হারামজাদার দাঁত ভেঙে ফেলব।

ভদ্রমহিলা এবার শব্দ করেই কাঁদতে লাগলেন। বাকের লক্ষ্য করল এঁর পায়ে স্যান্ডেল নেই। ঝামেলা শুরু হওয়া মাত্র ছুটে এসেছেন। বাকেরের মন অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল।

সিদ্দিক সাহেবের বাসার সামনে বেশ কিছু লোকজন। ঘরের জিনিসপত্র সব বাইরে এন রাখা হয়েছে। অসুস্থ মেয়েটা একটা চেয়ারে চোখ বড় বড় করে বসে আছে। তার ছোট ভাইটা বসে আছে একটা ট্রাঙ্কের ওপর। ছোট ভাইটা নিঃশব্দে কাঁদছে।

বাকের উঠোনে দাঁড়িয়ে শীতল গলায় ডাকল মাখনা। মাখন ভেতরে ছিল। অবাক হয়ে বের হয়ে এল। বাকের ঠাণ্ডা গলায় বলল, মেয়েটা অসুস্থ। ঘরে কোনো পুরুষ মানুষ নেই। এর মধ্যে তুই নিজিসপত্র বের করে ফেললি?

মাখন হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। সিদ্দিক সাহেব তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি নিচে নেমে এলেন। হড়বড় করে বললেন, দুই মাসের ভাড়া বাকি। আমি বলেছি দিতে হবে না। শুধু বাড়িটা ছেড়ে দাও। তাও চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলে। জিনিসপত্র তো রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে না। বারান্দায় থাকবে। পাহারা থাকবে। ঘরটা শুধু তালা দিয়ে দিব। এদের পৌঁছে দিব এদের আত্মীয় বাড়ি। গাড়ি করে পৌঁছে দিব। আমি নিজের মুখে বলেছি এই কথা। বাকের তুমি জিজ্ঞেস করে দেখ।

বাকের থমথমে গলায় বলল, মাখনা জিনিসপত্র ভেতরে নিয়ে যা।

সিদ্দিক সাহেব তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, জিনিসপত্র ভেতরে নিবে মানে। মগের মুল্লুক নাকি?

সিদ্দিক সাহেব, সাবধানে কথা বলুন।

সাবধানে কথা বলব মানে?

ভুঁড়ি নামিয়ে ফেলব। একটা কিছু বেতাল হয় যদি লাশ পড়ে যাবে। আমার নাম বাকের। মাখনা, জিনিসপত্র ঢোকা।

অতি দ্রুত জিনিসপত্র ভেতরে ঢুকে গেল। যারা দাঁড়িয়ে ছিল সবাই হাত লাগাল। মাখন মুখ

শক্ত করে দাঁড়িয়ে ছিল। বাকের এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড একটা চড় বসাল। এই জাতীয় কাজকর্ম সে ছেড়েই দিয়েছিল। আবার শুরু করতে হল। কিছু কিছু জিনিস আছে যা একবার ধরলে কখনো ছাড়া যায় না। আঠার মত গায়ে লেগে থাকে।

সিদ্দিক সাহেব হতভম্ব হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। মাখন নিজেও তাকিয়ে আছে। শুধু কুদ্দুসকে দেখা যাচ্ছে ছোটোছুটি করে আলনা-টালনা ভেতরে নিয়ে যেতে।

সিদ্দিক সাহেব মৃদু গলায় বললেন, বাকের আমার সঙ্গে ভেতরে আস। কথা আছে।

বাকের ফিরেও তাকাল না। অনেকটা সময় নিয়ে সিগারেট ধরাল। তারপর হাঁটতে শুরু করল যেন কিছুই হয়নি।

হাসান সাহেবদের ফিরতে বেশ রাত হল। দু'জনে মিলে বাইরে খেয়ে নিলেন। অনেকদিন পর তাঁরা বাইরে খেতে এসেছেন। ইদানীং দু'জনে একসঙ্গে তেমন কোথাও যান না। সূক্ষ্ম একটা দূরত্ব তৈরি হয়েছে। সেলিনার ধারণা এটা হয়েছে তার জন্যে। সংসারে শিশু না থাকলে সবাই দূরে দূরে চলে যায়। এটাই নিয়ম। সংসারে শিশু না আসার দায়িত্ব সেলিনার একার। বিয়ের পর পর টিউমারের কারণে তার জরায়ু কেটে বাদ দিতে হয়েছে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হাসান সাহেব এখন পর্যন্ত বলেননি, একটা বাচ্চাকাচ্চা থাকলে ভাল হত। সেলিনার ধারণা একদিন না একদিন সে এই প্রসঙ্গ তুলবেই। কে জানে হয়ত আজই তুলবে। সেলিনা বললেন, কথা বলছ না কেন? কি ভাবছ? হাসান সাহেব সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, চাকরি ছেড়ে দিলে কেমন হয় সেলিনা? সেলিনা অবাক হয়ে তাকালেন।

জাকরি ছাড়ার কথা বলছ কেন?

হাসান সাহেব কিছু বললেন না। ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। তাকানোর এই ভঙ্গিটি সেলিনার চেনা। এর মানে হচ্ছে তিনি আর কিছুই বলবেন না। এই প্রসঙ্গে তো নয়ই। সেলিনা প্রসঙ্গ বদলালেন, নাটক কেমন লাগল?

ভাল।

কার অভিনয় সবচে ভাল লেগেছে?

সবাই ভাল।

তবু স্পেসিফিক্যালি দু'একজনের নাম বল।

হাসান সাহেব আবার ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন। তার মানে নাটকের কিছুই তাঁর মাথায় ঢোকেনি। অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে ভেবেছেন। ব্যাপারটা কি? সেলিনার উদ্বেগের সীমা রইল না।

## ২৪

মুনা,

ভেবেছিলাম বাড়ি পৌঁছেই তোমাকে চিঠি দেব। তা সম্ভব হয়নি। কেন সম্ভব হয়নি শুনে তুমি হাসবে। কলমের অভাব। ভুলে কলম ফেলে গেছি। বাড়ির কাছে যে কয়েকটি দোকান আছে তাদের কাছে বল পয়েন্ট ছাড়া কিছু নেই। কলমের জন্যে যেতে হবে সিদ্ধিরগঞ্জ বাজারে। সেটা এখান থেকে তিন মাইল। সমস্যার সমাধান হল আজ। দেখতেই পাচ্ছ চিঠি কালির কলমে লেখা। বাড়ি এসে অনেকগুলি সমস্যার মধ্যে পড়েছি। চারদিকে কোমর উঁচু ঘাস হয়েছে। সেই ঘাসের বনে অনায়াসে মাঝারি সাইজের একটা বাঘ লুকিয়ে থাকতে পারে। তালা দিয়ে গিয়েছিলাম। তালা ভেঙে জিনিসপত্র চুরি গেছে। শুধু যে ছোটখাটো জিনিস গেছে তাই না আমাদের একটা বিশাল খাটও উধাও। আর ময়লা যে কি পরিমাণ হয়েছে কী বলব। লোক লাগিয়ে সাতদিন ধরে পরিষ্কার করছি এখনো সিকিভাগ কাজও হয়নি। সারাদিন এইসব নিয়ে থাকি। সন্ধ্যাবেলা করার কিছু থাকে না। তুমি শুনলে হাসবে তখন কেন জানি একটু ভয় ভয়ও করে।

কাজের যে মেয়েটি আছে সে আরো বেশি ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। সে নাকি কবে দেখেছে রান্নাঘরে ঘোমটা মাথায় একটা বৌ মশলা পিষছে। সে কে কে বলে চিৎকার করতেই বৌ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। দিনের বেলায় ঘটনাটা খুব হাস্যকর মনে হয় কিন্তু সন্ধ্যা মিলাবার পর ভয় ভয় করে। সারারাত হারিকেন জ্বালিয়ে রাখি।

আসলে আমাদের এই বাড়ির এখন মৃত্যু হয়েছে। জড় পদার্থেরও প্রাণ আছে। এরাও মাঝে

মাঝে মারা যায়। যেমন এই বাড়ি। যে বাড়িতে নিয়মিত জন্মমৃত্যু হয় সেই বাড়িটির প্রাণ আছে। আমাদের এই বাড়িটিতে শুধু মৃত্যুই হচ্ছে। দীর্ঘদিন কেউ জন্মায়নি। কাজেই বাড়িটির মৃত্যু হয়েছে। আমি ঠিক করেছি এটাকে বাঁচিয়ে তুলব। সব সময় লোকজনে বাড়ি গমগম করবে। নতুন শিশুরা জন্মাবে। আমার অনেক পরিকল্পনা আছে। সেই সব নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলা হয়নি। কারণ বাড়ির ব্যাপারটা তোমার পছন্দ নয়। না দেখই তুমি অপছন্দ করে বসে আছ। আগে একবার এসে দেখ। দীঘির ঘাটে গিয়ে বস। কিংবা ছাদে পাটি পেতে দূরের বিলের দিকে তাকাও তাহলে দেখবে এটা চমৎকার জায়গা।

গ্রামে, শহরের সব রকম সুযোগ ব্যবস্থাও হচ্ছে। ইলেকট্রিসিটি চলে আসছে। গ্রামীণ ব্যাংক হয়েছে। কৃষি অফিসও হবে। মেয়েদের যে মাইনর স্কুল ছিল এ বছরই নাইন-টেন চালু হবে। ইচ্ছা করলে এই স্কুলে তুমি মাস্টারিও করতে পার। স্কুলের জন্যে আমি ছ'বিঘা জমি দিয়েছি। আগ্রহ করেই দিয়েছি। আমি জায়গাটাকে বদলে ফেলতে চাই। শহর থেকে কেউ এসে যেন হাঁপিয়ে না ওঠে।

মুনা, তুমি বকুল এবং বাবুকে নিয়ে এখানে এসে কয়েকদিন থেকে যাও। আমার ওপর রেগে আছ, ঠিক আছে থাক। রাগ কমাতে বলছি না। রাগ নিয়েই আস। তোমার ভাল লাগবে। তোমরা কবে আসতে পারবে জানালে লোক পাঠাব। আমি নিজে আসতে পারছি না কারণ অনেক রকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। এলেই দেখবে। আজ এই পর্যন্ত থাকুক। দয়া করে চিঠির উত্তর দিও।

মামুন

নিতান্ত অপ্রিয় চিঠিও মানুষ দু'বার পড়ে। কিন্তু এই চিঠিটি দ্বিতীয়বার পড়তে ইচ্ছা করছে না। আবার ফেলে দিতেও মন চাইছে না। মুনা ড্রয়ারে রেখে দিল। যদি কখনো ইচ্ছা হয় আবার পড়া যাবে। ইচ্ছা না করলে পড়ে থাকবে এবং এক সময় ড্রয়ার গুছাতে গিয়ে বকুল এসব জঞ্জাল ফেলে দেবে।

বাবু এসে বলল, আপা তোমাকে বাবা ডাকে।

যাচ্ছি। তুই আজ স্কুলে যাসনি?

তুই প্রায়ই স্কুল ফাঁকি দিস তাই না?

কে বলল তোমাকে?

আমার মনে হচ্ছে।

মুনা উঠে দাঁড়াল। বাবু দাঁড়িয় রইল শুকনো মুখে।

শওকত সাহেবের হঠাৎ করে জ্বর এসে গেছে। শেষ রাতের দিকে গা কেঁপে জ্বর এসেছে। এখনো থামেনি। আজ অফিস কামাই হয়ে গেল। বড় সাহেব রাগারাগি করবে নির্ঘাৎ। কাউকে দিয়ে একটা খবর পাঠানো দরকার। খবরটা দেবে কে?

মামা, ডেকেছ কেন?

শরীরটা খারাপ হয়ে গেছে। জ্বর।

সে তো সকালেই শুনলাম। জ্বর কি আরো বেড়েছে?

হুঁ। অফিসে যেতে পারব না।

যেতে বলেছে কে তোমাকে, শুয়ে থাক। আর যদি বেশি খারাপ লাগে তোমার ভাবী জামাই তো আছেই খবর দিয়ে দেই।

তুই রেগে আছিস কেন রে?

রেগে থাকব কেন? মেজাজ খারাপ হয়ে আছে।

একটু বোস। কথা আছে।

মুনা বসল। শওকত সাহেব বলার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলেন না। বলার মতো কিছু তাঁর ছিল না।

বল মামা কি বলবে?

বকুলের বিয়ের কি হল তাই বল।

নতুন করে কি আর হবে? তারিখ মত বিয়ে হবে। চিন্তার কিছু নেই।

কেনাকাটা?

সামনের মাসে হবে। তুমি টাকা দিলে তারপর তো কেনাকাটা।

দাওয়াতের কার্ড-টার্ড তো ছাপানো দরকার।

হবে সবই হবে। যথাসময়ে হবে।

বিয়ে বাড়িটা ঠিক জমছে না। মানে ইয়ে...

মুনা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। শওকত সাহেব নিচু গলায় বললেন, হৈচৈ ছাড়া কি বিয়ে বাড়ি হয়? কোন হৈচৈ নেই। কিছু নেই।

ঐদিন তুমি বললে কোন হৈচৈ না, আর আজ উৎসব-উৎসব করছ আশ্চর্য। মামা উঠি।

যাবি নাকি কোথাও?

হুঁ। একটা শাড়ি কিনব।

আবার শাড়ি? ঐদিন না কিনলি?

আরো কিনব। আমার জমানো সব টাকা খরচ করব। দুটো সোনার চুড়ি বানাব।

শওকত সাহেব চুপ করে গেলেন। মুনার কোন-একটা সমস্যা হয়েছে যা তিনি ধরতে পারছেন না। লতিফা থাকলে ঠিকই ধরত।

মুনা বকুলকে সঙ্গে নিল। বকুলকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যাওয়া একটা সমস্যা। ইদানীং বকুলের খুব বকবকানি স্বভাব হয়েছে। বকবক করে মাথা ধরিয়ে দেয়। এখনো তাই করছে। রিকশায় উঠেই কথা বলা শুরু করেছে।

বাকের ভাইয়ের কাণ্ডকারখানা কিছু শুনেছ আপা? মারামারি করেছে। মাখন বলে একটা ছেলে আছে না, মুখটা চ্যাপ্টা, তাকে এমন চড় দিয়েছে যে চাপার একটা দাঁত নড়ে গেছে। তারপর সিদ্দিক সাহেব আছে না? ঐ যে কুঁজো হয়ে হাঁটেন তাকে গিয়ে বলেছে, আমি আপনাকে খুন করে ডেডবডি নর্দমায় ফেলে দিব। সিদ্দিক সাহেব এখন ঘর থেকে বেরুচ্ছেন না। আপা, তুমি শুনছ কী বলছি?

শুনছি।

সিদ্দিক সাহেবের একটা গাড়ি আছে না। ঐটার দুটো টায়ার কে যেন ফাঁসিয়ে দিয়ে গেছে। নির্ঘাৎ বাকের ভাইয়ের কাণ্ড। আরো কি যে করবে কে জানে।

মুনা বিরক্ত হয়ে ধমক দিল, চুপ করত।

বকুল কয়েক সেকেন্ডের জন্যে চুপ করে আবার কথা শুরু করল, মাঝখানে বাকের ভাই বেশ ভদ্র হয়ে গিয়েছিল তাই না আপা? এখন আবার আগের মতো হয়ে গেছে। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর এমন ভাবে তাকায় যেন কাঁচা খেয়ে ফেলবে। অবশ্যি আমার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করে। গতকাল স্কুলে যাবার সময় দেখা, বাকের ভাই গম্ভীর হয়ে বলল, কই যাচ্ছ? স্কুলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। বাকের ভাই বলল, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছ কেন? রিকশা নাও, দু'দিন পর বিয়ে এখন রোদে হাঁটাহাঁটি করা ঠিক না। ঘর থেকে বের হওয়াই ঠিক না। ঘরে বসে থাকবে। আমি বললাম...

চুপ কর তো বকুল।

তোমার শরীর খারাপ নাকি আপা?

হুঁ। আর শোন, তুই কি গায়ে সেন্ট দিয়েছিস? বকুল মৃদু স্বরে বলল, হ্যাঁ।

একগাদা সেন্ট দেয়ার মানেটা কি? গন্ধে বমি আসছে। বিয়ে ঠিক হলেই গায়ে বালতি বালতি সেন্ট ঢালতে হবে?

বকুল লজ্জা পেয়ে গেল। মুনা শীতল গলায় বলল, বিয়েটা এমন কোন ব্যাপার না। বিয়ে হচ্ছে বলেই জীবন-যাপনের পদ্ধতি পাল্টাতে হবে না। আগে যেমন ছিলি পরেও তেমনি থাকবি।

আচ্ছা থাকব। তুমি এমন কথায় কথায় ধমক দিও না তো আপা।

কথায় কথায় ধমক দেই?

হ্যাঁ দাও। আগে বাবা দিত এখন দাও তুমি। কি যে খারাপ লাগে তুমি সেটা কোনদিন বুঝবে না। যদি বুঝতে তাহলে এ রকম করতে না। তোমার সঙ্গে আসাই ভুল হয়েছে।

ভুল হলে চলে যা। রিকশা নিয়ে চলে যা। তোকে সাধাসাধি করে সাথে নিয়ে যেতে হবে?

বকুল কাটা কাটা গলায় বলল, মামুন ভাইয়ের সঙ্গে তোমার একটা কিছু হয়েছে। সেই রাগটা তুমি ঢালছ আমাদের সবার ওপর। রিকশা থামাতে বল। আমি নেমে যাব।

মুনা রিকশা থামাতে বলল। বকুল সত্যি সত্যি নেমে গেল। বিয়ে কী বিশেষ একটা কিছু যা সত্যি মানুষকে বদলে দেয়? মুনা নিজেও তার কিছুক্ষণের ভেতরেই ঘরে ফিরে এল। বকুলকে কোথাও পাওয়া গেল না। সে ফেরেনি। তার সেই বিখ্যাত টিনা ভাবীর কাছেও যায়নি। কোথায়

যেতে পারে? জহিরের কাছে? বসে বসে পেপসি খাচ্ছে?

রাগ করতে গিয়েও মুনা রাগ করতে পারল না। তার কেন জানি হাসি পেতে লাগল। বাবু বলল, হাসছ কেন?

হাসি আসছে তাই হাসছি।

বকুল আপাকে না করে দিও। রোজ ওখানে যায় আমার ভাল লাগে না।

রোজ যায় নাকি?

হুঁ রোজই যায়।

করে কী? বসে বসে পেপসি খায়?

হুঁ। তুমি হাসছ কেন?

আমি হাসলে তোর অসুবিধা কী?

বাবু গম্ভীর মুখে বের হয়ে গেল। অল্প বয়সে কেমন একটা ভারিক্কি ভাব এসে গেছে বাবুর মধ্যে। দেখতে মজা লাগে। মাথা নিচু করে হাঁটার ভঙ্গিটিও কেমন বুড়োটে যেন সংসারের জটিলতায় ক্লান্ত একজন মানুষ।

শওকত সাহেবের জ্বর আরো বেড়েছে। বুড়ো বয়সে জ্বরজ্বারি খুব কাবু করে মানুষকে, তাঁকে যেমন করেছে। তাঁর মনে হচ্ছে এ যাত্রা তিনি বাঁচবেন না। তিনি সারা দুপুর জ্বর গায়ে বারান্দায় বসে রইলেন। তার প্রাণ হুঁ হুঁ করতে লাগল। সংসার মোটামুটি গুছিয়ে এনেছেন এ সময় মরে যাওয়াটা অন্যায়। কিন্তু সংসারে অন্যায়গুলিই সব সময় হয়। যখন একজন সব গুছিয়ে-টুছিয়ে বসে তখনই দুম করে একটা হার্ট অ্যাটাক। চোখ উল্টে বিছানায় ভিড়মি খেয়ে পড়া। কোনো মানে হয় না।

রাতের বেলা জ্বর হুঁস করে নেমে গেল। ঘাম দিয়ে শরীর ঠাণ্ডা। শরীর বেশ ঝরঝরে লাগছে। ক্ষিধে হচ্ছে। শওকত সাহেবের মনে হল এসবও ভাল লক্ষণ নয়। এ রকম চট করে জ্বর নেমে যাবে কেন? তিনি ক্ষীণ স্বরে ডাকলেন, মুনা, মুনা।

মুনা রান্না চাপিয়েছে। সে বিরক্ত মুখ করে উঠে এল।

কি হয়েছে মামা? মিনিটে মিনিটে ডাকছ কেন?

শরীরটা ভাল লাগছে না।

জ্বরটর সেরে তুমি তো দিব্যি ভালমানুষ। এত ডাকাডাকি কেন?

বাঁচব না রে মুনা?

বুঝলে কি করে? স্বপ্নটপ্ন দেখছ? মামি কি এসে বলেছে নিয়ে যেতে এলাম?

হাসছিস কেন? এটা কী হাসির কোনো কথা?

মুনা খানিকটা বিব্রত বোধ করল। হেসে ফেলা উচিত হয়নি। সে রান্নাঘরে ফিরে গেল। বাবু উনোনের পাশে মুখ লম্বা করে বসে আছে। অন্যদিন এই সময়টার বকুল থাকে। নিজের মনে কথা বলে যায়। আজ রাগারাগির কারণে সে নিশ্চয় মুখ অন্ধকার করে নিজের ঘরে বসে আছে। বাবু মুনা আপাকে দেখে একটু হাসল। মুনা ঝাঁঝাল গলায় বলল, তুই এখানে কেন? পড়াশোনা নেই?

মাথা ধরেছে।

মুনা তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। বাবু সত্যি কথা বলছে না। তার মুখ হাসি হাসি। মাথাধরা মানুষের মুখ নয়।

কিছু বলবি নাকি?

হুঁ

কি? বলে ফেল। কথা পেটে নিয়ে বসে আছিস কেন?

শোবার সময় বলব।

একবার যখন বলেছে "শোবার সময় বলব" তখন সে শোবার সময়ই বলবে। এর আগে মরে গেলেও সে মুখ খুলবে না।

বাবু।

কি?

একটা কাজ করত একজন ডাক্তার নিয়ে আয়। মামাকে দেখাই। মামার মনে হয় ধারণা হয়েছে তাঁর অসুখ-বিসুখকে আমরা তেমন পাত্তা দিচ্ছি না।

এখন আনব?

হুঁ। এখনি নিয়ে আয়। জহিরকে আনবি।

বাবু মুখ কালো করে বলল, ওকে কেন?

ওকে আনানই তো ভাল। ভিজিট দেয়ার ঝামেলা থাকবে না। আর জামাই মানুষ শ্বশুরকে দেখবে দরদ দিয়ে।

মুনা মুখ নিচু করে হাসতে লাগল। তার কেন জানি খুব মজা লাগছে। সে ঠিক করে রাখল জহির এলে বকুলকে দিয়ে চা পাঠাবে। আগে থেকে এ রকম ছেলেমানুষি একটি চিন্তা তার মাথায় কেন ঢুকল এই নিয়েও মুনা খানিকক্ষণ ভাবল। তার মাথাটা কী খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি?

মেয়েদের মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া খুব বাজে ব্যাপার। সে যখন তার চাচাদের সঙ্গে থাকত তখন ময়নার মাকে দেখেছে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের সুন্দরী মেয়ে। মাথা খারাপ হবার পর এমন সব কুৎসিত কথা চেঁচিয়ে বলত যে শোনা মাত্র ইচ্ছা করত ছুটে পালিয়ে যেতে।

মুনা রান্না শেষ করে বারান্দায় এসে দেখল ইজিচেয়ারে বকুল বসে আছে। তার চোখে-মুখে রাগের কোন চিহ্ন নেই। সে বোধ হয় শুনেছে বাবু গিয়েছে জহিরকে আনতে।

বকুল?

কি আপা?

তোকে আমি খুব একটা জরুরি কথা বলব বকুল, মন দিয়ে শোন।

বকুল উঠে দাঁড়াল। মুনা চাপা স্বরে বলল, আমি যদি কোন কারণে পাগল-টাগল হয়ে যাই তাহলে তুই বিষ খাইয়ে আমাকে মেরে ফেলবি। চিকিৎসা করার দরকার নেই।

এসব কথা বলছ কেন তুমি?

মুনা তার জবাব না দিয়ে হাত-মুখ ধোবার জন্যে বাথরুমে ঢুকল। বকুল হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। বুঝতে পারল না আপার কি হয়েছে।

## ২৫

হাসান সাহবে শুনলেন কে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বসে আছে ড্রইং রুমে। সকাল ন'টা বাজে। অফিস যাবার তাড়া। এ সময়ে কেউ আসে? হাসান সাহেব কাপড় পরতে পরতে ভাবলেন দু'ধরনের লোক এ সময়ে তার কাছে আসতে পারে — নির্বোধ ধরনের লোক কিংবা বড় ধরনের বিপদে পড়ে লোক। প্রথমটিই হওয়ার কথা। কারণ পৃথিবীতে বড় ধরনের বিপদে পড়া মানুষের চেয়ে নির্বোধের সংখ্যা বেশি।

ড্রইং রুমে সিদ্দিকুর রহমান সাহেব বসে ছিলেন। গায়ে ধবধবে সাদা পাঞ্জাবি। পান চিবাচ্ছেন। ঠোঁট বেয়ে এক ফোঁটা পানের রস পড়েছে সাদা পাঞ্জাবিতে। তাঁর দিকে তাকালে পাঞ্জাবিতে সদ্য হওয়া পানের পিকের দাগই সবার প্রথম চোখে পড়বে। হাসান সাহেবেরও পড়ল। তিনি ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

স্লামালিকুম স্যার। আমার নাম সিদ্দিকুর রহমান। আমি থাকি আপনার...

আমি চিনি আপনাকে। কি ব্যাপার বলুন। আমার অফিসের তাড়া আছে।

বলতে একটু সময় লাগবে।

সময় লাগলে অন্য সময় আসতে হবে। এই মুহূর্তে আমার হাতে সময় নেই।

ঘটনাটা আপনার ভাই প্রসঙ্গে। বাকেরের বিষয়ে।

সেটা বাকেরের সঙ্গেই বলা উচিত। আমার সঙ্গে নয়।

ওর সঙ্গে কয়েকদিন আগে আমার একটা ঝামেলা হয়েছিল। তার পর থেকে একটার পর একটা ক্ষতি হচ্ছে আমার।

কি রকম ক্ষতি?

আমার গাড়ির উইন্ডশিল্ডটা চুরি গেল। একটা দোকান আছে আমার। স্টেশনারি শপ। তার কাচ-টাচ ভেঙে একাকার। তারপর একদিন...

আপনার ধারণা এসব বাকেরের কাজ?

জ্বি।

পুলিশে কেইস করুন। আপনার সন্দেহের কথা বলুন।

এক পাড়ায় থাকি পুলিশে কেইস...?

এক পাড়ায় থাকলে পুলিশে কেইস করা যাবে না এমন কোনো কথা নেই।

হাসান সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। তার গাড়ি এসে গেছে। আর বসে থাকা অর্থহীন। তিনি সব সময় অফিসে যাবার আগে সেলিনাকে বলে যান। আজ সেটা করতে ভুলে গেলেন। গাড়িতে উঠলেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। সারা পথে কোন কথা বললেন না।

অফিসে তাঁর জন্যে একটি বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তাঁকে ওএসডি করা হয়েছে। অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি। মন্ত্রী সাহেব ব্যাপারটা তাহলে ভুলেননি। তাঁর ক্ষমতা দেখিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। হাসান সাহেবের এই মন্ত্রীর প্রতি খানিকটা সমীহ বোধ হল। এঁর ক্ষমতা তাহলে আছে। অধিকাংশেরই থাকে না। মাঠে বক্তৃতা দিয়েই যাবতীয় ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়।

সেক্রেটারি আমিরুল ইসলাম সাহেবের নিঃশ্বাস ফেলার সময় ছিল না তবু তিনি হাসান সাহেবকে ডেকে পাঠালেন। শান্ত গলায় বললেন, কেমন আছেন?

স্যার, ভালই আছি।

নিন চা খান। চা খাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছি।

থ্যাংক য়্যু।

খুব মন খারাপ করেছেন নাকি?

তা করেছি।

মন খারাপ করবার কিছুই নেই। ব্যাপারটা খুবই সাময়িক। আমি এটা ছেড়ে দেব এ রকম মনে করার কোনোই কারণ নেই। মন্ত্রী সাহেবের যে যোগাযোগ আছে আমার যোগাযোগ তারচে কম না।

হাসান সাহেব কিছু বললেন না। আমিরুল ইসলাম সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, ক্ষমতার মধ্যে একটা চালাচালির ব্যাপার আছে। একজন একটা চাল দেবে, অন্যজন তারচে বড় একটা চাল দেবে। এটা চলতেই থাকবে।

স্যার, আমি চাকরি ছেড়ে দেবার কথা ভাবছি।

হোয়াই? "বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদিনী।" মহাভারত পড়েননি নাকি?

আমিরুল ইসলাম ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন। মুহূর্তের মধ্যে হাসি থামিয়ে শক্ত মুখে বললেন, কয়েকটা দিন বিশ্রাম করুন। আমি কেমন প্যাঁচ লাগাচ্ছি দেখুন।

প্যাঁচ লাগানোর কোনো দরকার দেখছি না স্যার।

দরকার থাকবে না মানে? অফকোর্স আছে। এদের বুঝিয়ে দিতে হবে যে আমাদের খুব কাছাকাছি আসতে নেই। একটু দূরে থাকতে হয়। পুলিশে ছুঁয়ে দিলে হয় আঠার ঘা। সিএসপি কলম দিয়ে কিছু লিখলে হয় বিয়াল্লিশ ঘা। এবং সেই ঘা'র কোনো এন্টিডোজ নেই। যান এখন বাড়ি যান। আজ আর অফিসে থাকার দরকার নেই।

হাসান সাহেব অসময়ে বাড়ি ফিরলেন। বাড়ি ফিরে তার ভালই লাগল। অনেকদিন পর ফুলের টবগুলির পেছনে কিছু সময় দিলেন। চার-পাঁচটা বিশাল বনি প্রিন্স ফুটেছে। এদের দিকে তাকালেই মন ভাল হয়ে যায়। তিনি কাঁচি দিয়ে খুব যত্নে গোলাপ চারার মরা পাতাগুলি কাটলেন। মাটি খুঁড়ে দিলেন। বনি প্রিন্সের জন্যে চায়ের পাতার সার নাকি খুব ভাল। তিনি ভেবে রাখলেন, সেলিনাকে জিজ্ঞেস করবেন, চায়ের পাতা দেয়া হচ্ছে কিনা।

সেলিনা রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। আজ তার বিশেষ রান্না করতে ইচ্ছা হচ্ছে। হাসান সাহেবের অসময়ে ফিরে আসার ব্যাপারটা তাঁর খুব ভাল লাগছে। কেন জানি বিয়ের প্রথমদিককার কথা মনে হচ্ছে। বিয়ের প্রথমদিকে এ রকম হত। অসময়ে সে এসে উপস্থিত। তার নাকি জ্বরজ্বর লাগছে তাই চলে এসেছে। খুব মনে হয় ঐসব দিনের কথা। সুখের সময়গুলি বারবার কেন ফিরে আসে না। এই ভেবে সেলিনা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।

বাকের দুপুরে খেতে এসে আকাশ থেকে পড়ল। খাবার টেবিলে ভাইয়া বসে আছে। এমন অবস্থা যে উঠে চলে আসা যায় না আবার বসাও যায় না। অসময়ে ভাইয়া কেন?

সেলিনা বললেন দাঁড়িয়ে আছ কেন, বস।

বাকের বসল। যত দূর সম্ভব নিঃশব্দে খাওয়া শুরু করল। তার লবণ নেবার দরকার ছিল কিন্তু লবণদানীটা অনেকখানি দূরে। ভাইয়ার কাছে। তাকে নিশ্চয়ই বলা সম্ভব না 'ভাইয়া লবণটা দাও।

হাসান সাহেব খাবার টেবিলে কথাবার্তা একেবারেই বলেন না। আজ নিচু গলায় সেলিনার সঙ্গে দু'একটা কথা বলছেন। যেমন, "বনি প্রিন্সগুলি তো চমৎকার হয়েছে।" "টবে কী তুমি চায়ের

পাতা দিচ্ছ।" এই জাতীয় কথাবার্তা। বাকেরের মনে হল ভাইয়া কোন একটা ঝামেলা নিয়ে চিন্তিত। নিজের চিন্তা ঢাকার জন্যেই আজেবাজে ব্যাপার নিয়ে কথা বলছে।

বাকের!

জি ভাইয়া।

বাকেরের মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল। ভাইয়া তাকিয়ে আছে তার দিকেই। ব্যাপার কি?

বিছু বলবে আমাকে ভাইয়া?

হুঁ। তুই কি কারো গাড়ির উইন্ডশিল্ড ভেঙে দিয়েছিস?

বাকেরের গলায় ভাত আটকে গেল। সে হ্যাঁ-না কিছু বলতে পারল না। হাসান স্বাভাবিক স্বরে বললেন, কারো গাড়ির উইন্ডশিল্ড তোমার যদি ভাঙতে ইচ্ছা করে তুমি ভাঙবে। এটা তোমার ব্যাপার। তোমার কি করা উচিত বা উচিত নয় সেটা তোমাকে বলা আমি অর্থহীন মনে করি। উপদেশ শোনার বয়স তুমি অনেক আগেই পার হয়েছ।

হাসান সাহেব দম নেবার জন্যে একটু থামতেই সেলিনা বললেন, খাবার টেবিলে এই আলোচনা না করলেও হবে। খেতে এসেছ খাও।

অন্য সময় তো বাকেরকে পাওয়া মুশকিল, নানান কাজে সে ব্যস্ত থাকে। খাবার টেবিলটাই কথা বলার জন্যে ভাল। বাকের!

জি।

তুই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর একটা চেষ্টা কর।

জি আচ্ছা।

তুই আমার কথাটা বুঝতে পারছিস না। না বুঝেই বলছিস জি আচ্ছা।

বাকের অবাক হয়ে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। হাসান সাহেব বললেন, তুই অন্য কোথাও থাকার ব্যবস্থা কর। যাতে তোর বিরুদ্ধে কোনো কমপ্লেইন নিয়ে কেউ আমার কাছে না আসে। তাছাড়া...

হাসান সাহেব একটু থামলেন। তাকালেন সেলিনার দিকে। সেলিনা চোখ বড় বড় করে বসে আছেন। খাবার টেবিলের এই নাটকের জন্যে তিনি একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। হাসান সাহেব পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বললেন, গুণ্ডা পোষার কাজটি আমি আর করতে রাজি নই।

সবাই নিঃশব্দ হয়ে গেল। সেলিনা ভাবলেন বাকের হয়ত খাবার টেবিল ছেড়ে উঠে যাবে। কিন্তু সে উঠল না। সেলিনা বললেন, বাকের আচারের বোতলটা দাও তো। বাকের আচারের বোতল এগিয়ে দিল।

সন্ধ্যাবেলা বাকের তার জিনিসপত্র নিয়ে মহিউদ্দিন সাহেবের দোকানে গিয়ে উঠল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, আপনার এখানে কয়েকটা দিন থাকব। মহিউদ্দিন সাহেব পান-খাওয়া হলুদ দাঁত বের করে প্রচুর হাসতে লাগলেন। ভাবলেন এটা একটা রসিকতা।

হাসছেন কেন?

মহিউদ্দিন সাহেবের হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

আমি আপনার দোকানে কিছু দিন থাকলে আপনার অসুবিধা হবে?

জি না অসুবিধা কিসের?

তাহলে একটা বোতলের ব্যবস্থা করেন বন্ধুবান্ধব নিয়ে খাব। বিদেশী জিনিস আনবেন। অনেক দিন খাওয়া হয় না।

মহিউদ্দিন সাহেবের মুখ শুকিয়ে গেল। একি যন্ত্রণায় পড়লেন।

বাকের বন্ধুদের খোঁজে বেরুল। নতুন জীবনযাত্রার শুরুটা তার খারাপ লাগছে না। ভালই লাগছে।

বিয়ের কার্ড শেষ পর্যন্ত ছাপা হল। চারশ কার্ড। দাওয়াতের এত মানুষ নেই। যেহেতু কার্ডের সংখ্যা বেশি কাজেই যাদের পাওয়ার কথা নয় তারাও দাওয়াত পেতে লাগল। বাবু চল্লিশটা কার্ড নিয়ে তার ক্লাসের সব ছাত্রকে একটি করে দিয়ে এল। শওকত সাহেব তার অফিসের চার-পাঁচজনকে বলবেন ভেবেছিলেন শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তিনি দাওয়াত করেছেন একুশজনকে। তাতেও শেষ

নয় তার মনে হল শুধু একুশজনকে বলাটা ঠিক হল না। অন্যরা কি দোষ করল। দ্বিতীয় দিনে তিনি আরো একগাদা কার্ড নিয়ে গেলেন। যাবার পথে মুনাকে বললেন, খরচপাতি কিছু হচ্ছে হোক একটাই তো বিয়ে ফ্যামিলিতে।

মুনা গম্ভীর গলায় বলল, একটাই বিয়ে মানে? আমি কি বিয়ে করব না নাকি?

শওকত সাহেব হকচকিয়ে গেলেন। মুনা বলল, কি চুপ করে আছ কেন? তোমার কি ধারণা আমি সন্ন্যাসী হয়ে যাব?

কি যে বলিস তুই।

শওকত সাহেব হাসতে চেষ্টা করলেন। মুনার আজকাল কি হয়েছে উল্টাপাল্টা কথা বলে ফেলে।

মুনা তুই মামুনকে কার্ড পাঠিয়েছিস?

মামুনকে কার্ড পাঠাব কেন?

বিয়েতে যাতে আসে সে জন্যে। সে এলে তোদের বিয়েরও একটা ডেট ফেলে দেব। শরীরের অবস্থা ভাল না। কাজকর্ম সব শেষ করে রাখতে চাই। কী বলিস?

শরীরের অবস্থা খারাপ মনে করলে তাই করা উচিত। বাবুরও বিয়ে দিয়ে দাও।

কি বললি?

বললাম, বাবুরও বিয়ে দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দাও। ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ে এমন একটা মেয়ে খুঁজে বের কর। একটা বাল্যবিবাহও হয়ে যাক।

শওকত সাহেব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইলেন। মুনা বলল, কি রাজি আছ?

তোর কি মাথাটা খারাপ হয়েছে নাকি রে মুনা?

একটা প্র্যাকটিক্যাল কথা বললাম, এর মধ্যে মাথা খারাপের কি দেখলে?

মুনা তার মামাকে গভীর সমুদ্রে ফেলে চলে এল বাবুর কাছে। বাবু স্কুলে যায়নি। দু'হাতে মাথা চেপে বসে আছে। তার চোখ লাল। দেখেই মনে হচ্ছে তার অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।

কি রে বাবু মাথা ধরেছে?

হুঁ।

তোর বিয়ের ঠিকঠাক করে এলাম। বালিকা বধূ চলে আসবে ঘরে। মাথা ধরলে মাথা টিপে দেবে? কি খুশি?

বাবু তাকিয়ে রইল। মুনা হাসতে লাগল। বাবু বলল, একটু মাথা টিপে দেবে আপা? মরে যাচ্ছি।

মাথা টেপার সময় নেই রে, এখন যেতে হবে অফিসে। বকুলের বিয়ের কার্ড ডিসট্রিবিউট করব। সবার বন্ধুবান্ধব আসবে, আমার কেউ আসবে না এটা খারাপ না? তুই ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকে। মাথা ধরা সেরে যাবে।

মুনা নতুন শাড়ি পরল। অনেক সময় নিয়ে চুল বাঁধল। কড়া করে লিপিস্টিক লাগল ঠোঁটে। বকুলকে বলল, কেমন লাগছে রে আমাকে? পেত্নীর মত লাগছে নাকি?

ভালই লাগছে। পেত্নীর মত লাগবে কেন?

আমার তো মনে হচ্ছে ড্রাকুলার মত লাগছে। ঠোঁট দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র কারোর রক্ত খেয়ে এসেছি ঠোঁটে রক্ত লেগে আছে।

কি যে তুমি বল আপা। যাচ্ছ কোথায়?

অফিসে। সবাইকে তোর বিয়ের কার্ড দেব। এই কারণেই এত সাজগোজ করলাম। এলেবেলে ভাবে গেলে সবাই মনে করবে ছোট বোনের বিয়ে হচ্ছে আমার হচ্ছে না এই দুঃখে আমি...

মুনা কথা শেষ করল না। একগাদা কার্ড নিয়ে রওনা হল। বাকেরের সঙ্গে দেখা হল পথে। মুনা হাসিমুখে বলল, বাকের ভাই আপনাকে নাকি বাড়ি থেকে গেট আউট করে দিয়েছে? বাকের চুপ করে রইল। তার মুখ শুকনো। সে ঘন ঘন থুথু ফেলছে।

কি বাকের ভাই কথা বলছেন না কেন? যা শুনছি তা কি মিথ্যা?

মিথ্যা না সত্যি।

হাতখরচ পাচ্ছেন, না তাও বন্ধ?

হাতখরচের দরকার কি?

দিন চলছে কিভাবে? ধারের ওপর?

বাকের তার জবাব না দিয়ে বলল, তোমার কি শরীর খারাপ নাকি?

মুনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, এত সেজেগুজে বের হয়েছি তারপরও বলছেন শরীর খারাপ। দেখে সে রকমই মনে হচ্ছে।

অফিসেও সবাই এই কথা বলল। পাল বাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, হয়েছে কি আপনার?

কি আবার হবে কিছু হয়নি।

গালটাল ভেঙে একাকার। অসুখটা কি?

কোন অসুখ নেই।

মুনা ভেবেছিল কার্ডগুলি দিয়েই চলে আসবে। কিন্তু সে অফিস ছুটি না হওয়া পর্যন্ত থাকল। সবার টেবিলে খানিকক্ষণ করে বসে হাত নেড়ে নেড়ে গল্প করল। সে ভেবেছিল অনেকেই তাকে জিজ্ঞেস করবে নিজের বিয়ের কার্ড নেই ছোট বোনের বিয়ের কার্ড। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার কেউ সে প্রসঙ্গ তুলল না। এখনো পনের দিনের মত ছুটি আছে তার হাতে তবু সে ঠিক করে ফেলল আগামী কালই সে জয়েন করে ফেলবে। শুধু শুধু বাড়িতে বসে থাকার কোন মানে হয় না।

তার জন্যে একটা বিস্ময়ও অপেক্ষা করছিল। অফিস ছুটির পর দেখা গেল কর্মচারীদের জন্যে ঝকঝকে নতুন বাস। পাল বাবু বললেন, ইউনিয়ন ঘাড় ধরে বাস কিনিয়েছে। এখন থেকে পায়ের উপর পা তুলে অফিসে যাবেন অফিস থেকে আসবেন। হা হা হা মুনাও উঁচু গলায় হাসতে লাগল। তার বড় ভাল লাগছে। অফিস-টফিস বাদ দিয়ে বাড়িতে বসে থাকাটা খুব বোকামি হয়েছে।

শুধু বাস নয় বুঝলেন মিস মুনা, আরো আছে।

আর কি?

আন্দাজ করেন দেখি।

মুনা আন্দাজ করতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছু বলার আগেই পাল বাবু নিচু গলায় বললেন, কর্মচারীদের জন্যে ফ্ল্যাট হচ্ছে।

বলেন কি?

বোর্ড মিটিং-এ পাস হয়েছে। ছ'মাসের মধ্যে তিনটা চারতলা ফ্ল্যাট। দুটা বেডরুম ড্রইং কাম ডাইনিং রুম। বারান্দা।

বাহ্ চমৎকার তো।

এর নাম ইউনিয়নের চাপ। রাম চাপ।

চাপ তো আগেও ছিল তখন তো কাজ হয়নি।

তখন হবে না বলে এখনো হবে না? দিনকাল পাল্টে যাচ্ছে না? আগের দিন কি আছে নাকি?

## ২৬

মামুন লক্ষ্য করেছে যাদের নাম 'ক' দিয়ে শুরু হয় তারা বেশ প্যাঁচানো স্বভাবের মানুষ হয়ে থাকে। সে 'ক' নামের ক'জনকে চেনে সবার পেটে স্ক্রুর প্যাঁচ। কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজারের কথাই ধরা যাক। তার নাম কাশেম আলী-- হাড় বজ্জাত। লোনের ব্যাপারটা নিয়ে ক্রমাগত ঘুরাচ্ছে। কলেটরেল হিসেবে জমিজমার দলিলের নকল চেয়েছিল সেগুলি দেয়া হয়েছে যথাসময়ে। এখন সে বলছে, দলিলের নকলগুলি আবার দিন। আগেরগুলি মিস প্লেসড হয়েছে। মনে হচ্ছে কাশেম আলী সাহেব পান খাওয়ার জন্যে কিছু চান মুখ ফুটে বলতে পারছেন না। নিজ থেকে না চাইলে পান খাওয়ার টাকা দেয়াও তো মুশকিল। মামুন নিশ্চয়ই বলতে পারবে না "ভাই আপনাকে আমি ঘুষ দিতে চাই। কত টাকা দেব বলুন? আপনার রেট কত?" আর একটা বলতে পারবে না। বলেই প্রতি সপ্তাহে তাকে দু'তিনবার এসে ঘন্টা খানিক বসে থাকতে হবে। আজও তাই হবে। কাশেম আলী সাহেব ভীষণ ব্যস্ততার ভান করে বললেন, আপনি কাইন্ডলি আগামী সপ্তাহে আসুন। আমাদের এজিএম সাহেব আসছেন। নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই এখন।

মামুনের ভাগ্য ভাল। আজ সে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কথা শুনল। কাশেম আলী সাহেব সরু গলায় বললেন, আপনার কাগজপত্র গুছানো হয়ে গেছে। ফাইল জাহানারার কাছে। সে আপনাকে বলবে এখন কি করতে হবে। মামুন অবাক হয়ে বলল, জাহানারা কে?

আমাদের নতুন সেকেন্ড অফিসার। পরশু জয়েন করেছেন। আপনি অপেক্ষা করুন। তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন।

মহিলা অফিসারদেরও এত দূর পাঠানো হচ্ছে?

হবে না কেন? দিনকাল পাল্টে গেছে। মেয়েদেরও এখন সমানে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে ইনটেরিয়রে। মেয়েরাও তেমন আপত্তি করছে না। ইয়াং ইয়াং সব মেয়েরা কাজ নিয়ে কোথায় যাচ্ছে।

ভালই তো।

হুঁ ভালই। মেয়েরা হচ্ছে আপনার অফিসারের শোভা। সেজেগুজে বসে থাকে। সেজেগুজে বসে থাকে, দেখতে ভালই লাগে, হা হা হা।

মামুন লক্ষ্য করল, কাশেম আলী সাহেবকে বেশ খুশি খুশি লাগছে। স্যুট-টুট পরেছেন। গ্রামের কৃষি ব্যাংকের ম্যানেজাররা এমন স্যুট পরে না।

জাহানারার বয়স তেইশ-চব্বিশ। রোগা পাতলা মেয়ে। চশমার ফ্রেমটি মুখের তুলনায় একটু বড় বলেই বোধ হয় তাকে অনেক বেশি রোগা লাগছে। গলার স্বর খুব নরম। শুনতে ভাল লাগে। টেবিল ভর্তি কাগজপত্র নিয়ে সে এমন ভাবে বসে আছে যেন মনে হচ্ছে গভীর সমুদ্রে পড়েছে। মেয়েটির নাকে একটা ফুটো, সেখানে সুতো বাঁধা এটা একেবারেই মানাচ্ছে না।

কাশেম আলী সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন। মামুনের ফাইল বের করে কি সব করতে বললেন। মামুন তার কিছুই বুঝতে পারল না। এবং তার মনে হয় মেয়েটিও বুঝতে পারছে না। পরীক্ষার কঠিন প্রশ্নের দিকে মেয়েরা যে ভাবে তাকায় সেই ভাবে তাকাচ্ছে। মামুন হাসিমুখে বলল, এ রকম পাড়া গাঁয়ে এলেন কেন?

কি করব বলুন? অন্য কোথাও ভেকেন্সি ছিল না। তবে বেশিদিন থাকতে হবে না। এজিএম বলেছেন মাস দুয়েকের ভেতর ঢাকায় ট্রান্সফারের ব্যবস্থা করবেন।

ঐ সব মুখের কথা একেবারেই বিশ্বাস করবেন না। একবার যখন এনে ফেলে দিয়েছে আর নড়াবে না।

মেয়েটি চোখ-মুখ অন্ধকার করে বসে রইল। বড় বড় নিঃশ্বাস নিতে লাগল। মামুনের বড় মায়া লাগল। মেয়েটিকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সে বাবা-মা, ভাই-বোন ফেলে এসেছে। আসতে হয়েছে অর্থনৈতিক কারণে। সংসার চলছে হয়ত বাবার পেনশন এবং মেয়ের চাকরির টাকায়।

এখানে থাকেন কোথায়?

ম্যানেজার সাহেবের বাসায়। উনি ফ্যামিলি নিয়ে থাকেন। একটা কামরা আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন।

অসুবিধা হচ্ছে না তো?

জি না।

অসুবিধা হলে বলবেন। আমি এখানকারই ছেলে।

মেয়েটি অল্প হেসে কাগজপত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ল। যেন সে কথাবার্তা আর চালিয়ে যেতে আগ্রহী নয়। মামুনের হঠাৎ করে মনে হল এই মেয়েটির সঙ্গে মুনার কোথায় যেন একটা মিল আছে। সেই মিলটি কোথায় সে তার ধরতে পারছে না। অমিলগুলি ধরা পড়ছে সহজেই। মুনার মধ্যে এক ধরনের কাঠিন্য আছে এই মেয়েটির মধ্যে সে জিনিসটা একেবারেই নেই। চেহারাও দুজনের দু'রকম। মুনার মুখ লম্বাটে, এ মেয়েটির মুখটি গোলাকার। তালে মিলের একটা ব্যাপার মনে আসছে কেন? মুনার সঙ্গে যে পরিস্থিতিতে আলাপ হয়েছিল এই মেয়েটির সঙ্গে ঠিক সেই ভাবেই আলাপ হচ্ছে। এটিই কি কারণ? একটা কাজের ব্যাপারে সে মুনাদের অফিসে গিয়েছিল। কাজটি তেমন জটিল কিছু ছিল না কিন্তু মুনা সেই সামান্য কাজ নিয়েই হাবুডুবু খাচ্ছিল। আজ যেমন এই মেয়েটি খাচ্ছে। কিছু কিছু ঘটনা কি আমাদের জীবনে ঘুরে ঘুরে আসে?

জাহানারা বলল, আপনি খানিক্ষণ বসুন। মামুন হাসিমুখে বলল, বসেই তো আছি। প্রায়ই আসি এবং বসে থাকি।

মামুন ভেবেছিল মেয়েটি কথার পিঠে কোন কথা বলবে। ইন্টেলিজেন্ট কিছু বলতে চেষ্টা করলে কিন্তু তা ঠিক ইন্টেলিজেন্ট হবে না। কিন্তু জাহানারা কিছুই বলল না। গভীর মনোযোগে ফাইল উল্টাতে লাগল। একটি মেয়ের সামনে চুপচাপ বসে থাকা কঠিন ব্যাপার। কিন্তু একা একা বকবক করাও মুশকিল।

আমাদের জায়গাটা কেমন লাগছে?

ভালই।

আগে কখনো গ্রামে কাটিয়েছেন?

না।

শহরেই মানুষ?

ঠিক শহরে না মফস্বল শহর।

কোন মফস্বল শহর?

জাহানারা তার জবাব না দিয়ে শান্ত গলায় বলল, আপনাকে আর আমাদের এখানে আসতে হবে না। কাগজপত্র সব ঢাকায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। লোন স্যাংশন হলেই আপনাকে খবর দেয়া হবে।

স্যাংশন হবে তো?

নিশ্চয়ই হবে। হবে না কেন।

ঘরে বসে থাকলেই হবে, না ধরাধরির ব্যাপার আছে?

আপনাতেই হবে।

এ দেশে আপনাতেই কিছু হয় না।

জাহানারা এ কথারও কোনো জবাব দিল না। অন্য কি সব কাগজপত্র দেখতে লাগল। মামুনের এখন উঠে পড়া উচিত। কিন্তু উঠতে চেষ্টা করছে না। এক ধরনের আলস্য লাগছে।

উঠি আজ? আবার দেখা হবে।

মেয়েটি সামান্য হাসল। মুনার হাসির সঙ্গে এই মেয়েটির হাসির কি কোন মিল আছে। আছে হয়ত। প্রতিটি মানুষ হাসে নিজের মত করে। একজনের হাসির সঙ্গে অন্যজনের হাসির কোন মিল নেই। অবশ্যি সবাই কাঁদে একইভাবে। নাকি একেকজন মানুষের কান্নাও একেক রকম।

ডাকে একটি রেজিস্ট্রি চিঠি এসেছে। মামুন মনে করতে পারল না রেজিস্ট্রি চিঠিতে সে কখনো কোনো জরুরি কিছু পেয়েছে কি না। না পায়নি। বরং আজেবাজে জিনিসপত্রই লোকে তাকে রেজিস্ট্রি করে পাঠিয়েছে। একবার সে চিঠি পেল যে কোনো এক লোক মদিনা শরিফে কি একটা স্বপ্ন দেখছে সেই স্বপ্নের কথা সাতজনকে লিখে জানাতে হবে। যদি না জানানো হয় তাহলে বিরাট ক্ষতি হবে। জানালে লটারিতে টাকা। কত অদ্ভুত ধরনের মানুষই না আছে পৃথিবীতে।

মামুন চিঠিটা খুলল না। সন্ধ্যার পর ধীরে-সুস্থে খোলা যাবে। সন্ধ্যার পর তার কিছু করার থাকে না তখন চিঠিপত্র পড়াটা ভালই লাগবে। এমনও তো হতে পারে এটা মুনার চিঠি। আবেগ-টাবেগে দিয়ে একগাদা কথা লিখেছে। যার মূল বক্তব্য হচ্ছে – যা হবার হয়েছে এখন তুমি এস। এই জাতীয় চিঠি পেলে তার তৎক্ষণাৎ ছুটে যাওয়ার কোনো কারণ নেই। বরং উল্টোটা করতে হবে। চিঠির জবাব না দিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকতে হবে। তারপর আসবে দ্বিতীয় চিঠি। দ্বিতীয় চিঠির পর তৃতীয় চিঠি। তৃতীয় চিঠির জবাবও যখন আসবে না তখন হয়ত সে নিজেই চলে আসবে। চমৎকার হবে সেটা।

মামুন সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারল না। বিকেলে চিঠি খুলে ফেলল। বকুলের বিয়ের কার্ড। সঙ্গে চিঠিপত্র কিছুই নেই। একটা লাইন পর্যন্ত না। এর মানে কি? খামের ঠিকানাও কি মুনার লেখা নয়?

ম্যানেজারের বাসায় থাকাটা জাহানারার সহ্য হচ্ছে না। ভদ্রলোক রোজ তার স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করছেন। বেগুন দিয়ে ডিমের তরকারি রান্না করার বদলে ম্যানেজার সাহেবের স্ত্রী আলু দিয়ে তরকারি রেঁধেছেন। এতেই ভূমিকম্প হয়ে যাচ্ছে।

পেয়েছ তুমি কি? যা ইচ্ছা তাই করবে? এমন তো না ঘরে বেগুন ছিল না। ছিল। আমি নিজে কিনে দিয়েছি। ঘরে থেকে জিনিস পচবে আর তুমি লোক পাঠিয়ে আলু কিনে আনবে। না এই তরকারি আমি খাব না। ফেলে দিয়ে আস। এক্ষুণি ফেলে দিয়ে আস।

অসহ্য। ভদ্রলোক কখনো বোধ হয় ভাবেন না যে এ বাড়িতে বাইরের একজন আছে। তার সামনে অন্তত কিছুটা সংযত আচরণ করা উচিত। স্ত্রীকে পশুর মত কেউ কি দেখে এই সময়ে? আর মেয়েটি এমন বোকা একটি কথাও বলবে না। নিঃশব্দে গাল হজম করবে। মাঝে মাঝে জাহানারারই বলতে ইচ্ছা করে, এসব কি শুরু করেছেন?

কিন্তু তা বলা সম্ভব নয়। অনেক কিছুই আমরা বলতে চাই কিন্তু বলতে পারি না। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হয়। অবশ্যি জাহানারা একটা ঘর নেবার চেষ্টা করছে। যদিও সে জানে একা একা একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঢাকা থেকে মা এবং ভাই-বোনদের নিয়ে আসার প্রশ্নই উঠে না। বোন দুটির স্কুল আছে। ছোট ভাই অনার্স পরীক্ষা দিচ্ছে। বাবার শরীরও

ভাল হবে না। তবু জাহানারা যাকে পাচ্ছে তাকেই বলছে, আমার জন্যে একটা বাসা-টাসা দেখবেন। কেউ তার কথার তেমন গুরুত্ব দিচ্ছে না। গুরুত্ব দেবার কথাও নয়। এ রকম পাড়াগাঁ জায়গায় লোকজন ভাড়া দেবার জন্যে গণ্ডায় গণ্ডায় বাড়ি রাখে না। ম্যানেজার সাহেব একদিন বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন, শুনছি চারদিকে আপনি বাড়ি খুঁজছেন? জাহানারা কিছু বলল না।

আমার এখানে আপনার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে?

জি না স্যার।

অল্প কিছু দিন থাকবেন বাড়ি-টাড়ি খোঁজার ঝামেলা করবেন না। একা একা থাকবেন কিভাবে?

জাহানারা চুপ করে রইল। ম্যানেজার সাহেব শুকনো গলায় বললেন, তাছাড়া এই যে আপনি বাড়ি খোঁজাখুঁজি করছেন তার একটা বাজে দিক আছে।

বাজে দিক মানে?

লোকজন নানান কথা বলবে।

জাহানারা অবাক হয়ে বলল, স্যার আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

আপনি এতদিন ছিলেন আমাদের সঙ্গে। এখন চলে যেতে চাচ্ছেন। অথচ একা মেয়ে মানুষ লোকজন আমাকে নিয়ে নানান কথা ভাববে।

জাহানারা হকচকিয়ে গেল। তার দারুণ মন খারাপ হল। এটা এমন জায়গা যে মন খারাপ হলেও কিছু করার নেই। কোথাও যাবার নেই। ঢাকায় থাকলে কত কি করা যেত। একটা গল্পের বই নিয়ে বারান্দায় বসে থাকা যেত। বই মুখের ওপর ধরে কাঁদা যেত। কেউ দেখে ফেললে অসুবিধা নেই। ভাববে পড়ে কাঁদছে।

কিন্তু এখানে কিছুই করার নেই। তবু সে মন খারাপ হলে একা একা হাঁটে। লোকজন প্রথম দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকাত, এখন তাকায় না। কাঁচা রাস্তা ধরে হেঁটে হেঁটে সে কুসুমখালি নদী পর্যন্ত যায়। মরা নদী। তবে বর্ষার সময় নদী নাকি খুব ফুলে-ফেঁপে ওঠে। ম্যানেজার সাহেবের কাছে শুনেছে সেটা নাকি একটা দেখার মত ব্যাপার। জাহানারা নিশ্চিত জানে সে বর্ষা পর্যন্ত থাকবে না কিন্তু কোনো-এক বিচিত্র কারণে মাঝে মাঝে তার মনে হয় বর্ষা পর্যন্ত থেকে গেলে ভালই হবে।

নদীর যে দিকটায় জাহানারা যায় সেখানে শ্মশান ঘাট। ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি আছে। শ্মশান যাত্রীদের বিশ্রামের জন্যে একটা শ্যাওলা ধরা পাকা ঘর আছে। তার দেয়ালে কাঠ কয়লা দিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথাবার্তা লেখা। একদিন অফিসের পিওনকে সঙ্গে নিয়ে সে লেখা পড়তে এসেছিল। রোজ রোজ তো তাকে সঙ্গে নিয়ে আসা যায় না।

শ্মশান ঘাটেই একদিন তার মামুনের সঙ্গে দেখা। মামুন চোখ কপালে তুলে বলল, এখানে কি করছেন?

জাহানারা বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, কিছু করছি না। বেড়াচ্ছি।

বেড়াচ্ছেন মানে? এটা কি বেড়াবার জায়গা?

কেন ভূত আছে নাকি?

ভূত আছে কি না জানি না তবে এখানে সেভেন্টিওয়ানের যুদ্ধের সময় বহু মানুষকে গুলি করে মেরেছে। আমরা কেউ একদিকটায় আসি না।

এই তো আপনি এসেছেন।

আমি আপনার জন্যেই এসেছি। দূর থেকে দেখলাম শাড়ি পরা একটা মেয়ে ঘুরছে। তাও শহরের মেয়ে। আপনার ব্যাপারটা কি বলুন তো?

ব্যাপার কিছু না। বেড়াচ্ছিলাম। বেড়াবার তো জায়গা নেই।

বেড়াবার জায়গা থাকবে না কেন? বিরাট একটা দেয়াল আছে। সারদেয়াল নাম। কারা তৈরি করেছে কেউ জানে না। বিশাল ব্যাপার। দেখলে অবাক হয়ে যাবেন।

জাহানারা কিছু বলল না। লোকটির তাকে বেড়াতে নিয়ে যাবার এই বাড়াবাড়ি আগ্রহ ভাল লাগছে না।

কি যাবেন সারদেয়াল দেখতে?

জি না।

এখান থেকে মাইল দুয়েক দূরে বড় গঞ্জ আছে। একটা সিনেমা হলও হয়েছে। গিয়েছেন সেখানে?

জি না।

যাবেন। যেতে চাইলে আমি নিয়ে যেতে পারি।

থ্যাংকস। আমি কোথায় যাব না।

জাহানারা হাঁটতে শুরু করল। মামুন আসছে তার পাশাপাশি। এরকম সরু রাস্তায় পাশাপাশি হাঁটার দরকার কি। একবার গায়ে গা লেগে গেল জাহানারা বিরক্ত গলায় বলল, আপনি আগে আগে যান। আমি আসছি আপনার পেছনে।

পাশাপাশি না হাঁটলে গল্প করা যাবে না তো। গল্প করার সময় মাঝে মাঝে মুখের দিকে তাকাতে হয়। অন্যের মুখের ভাবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

আপনিও কি লক্ষ্য রাখছেন?

হ্যাঁ রাখছি এবং বুঝতে পারছি আপনি আমার ওপর অসম্ভব বিরক্ত হচ্ছেন।

তা হচ্ছি।

বিরক্ত হবার কিন্তু কোনো কারণ নেই। আপনি যদি মনে করে থাকেন আপনার সঙ্গে খাতির জমানোর জন্যে বেড়াতে-টেড়াতে নিতে যাচ্ছি তাহলে ভুল করবেন। ঐ জাতীয় কোন উদ্দেশ্য আমার নেই। আপনাকে কেমন লোনলি লাগছিল তাই বলছিলাম। আচ্ছা, যাই তাহলে।

মামুন লম্বা লম্বা পা ফেলে ডানদিকে রওনা হল। জাহানারার অস্বস্তির সীমা রইল না।

## ২৭

আগামীকাল বকুলের গায়ে হলুদ। গায়ে হলুদ জাতীয় অনুষ্ঠানের আগের দিনটি যেমন জমজমাট হওয়া উচিত তেমন লাগছে না। বকুলের মনে হল সবাই কেমন যেন গা ছেড়ে দিয়েছে। মুনা আপা যথারীতি অফিসে চলে গিয়েছে। আজ অফিসে না গেলে কি হত? বাবুও রান্নাঘরে ভাত নিয়ে বসেছে। সেও বোধ হয় স্কুলে যাবে। কি আশ্চর্য এত বড় উৎসবের ঠিক আগের দিনটিতে সবাই সবার কাজ নিয়ে ব্যস্ত। যেন গায়ে হলুদ খুব সাধারণ ব্যাপার। এ বাড়িতে রোজই এ রকম একটা উৎসব হচ্ছে। বকুল বেশ মন খারাপ করে রান্নাঘরে গেল। ইতস্তত করে বলল স্কুলে যাচ্ছিস, বাবু?

হুঁ।

তোরা সবাই যদি যে যার ধান্ধায় বেরিয়ে যাস তাহলে কাজগুলি কে করবে?

ঘরের কি কাজ?

বকুলের কান্না পেয়ে গেল। কাল তার গায়ে হলুদ আর আজ বাবু বলছে ঘরের কি কাজ? কত কিছু করে লোকজন। ঘর সাজায়। কলাগাছ পুঁতে। কি কি রান্না হবে তার লিস্ট করে। তার বেলায় কিছুই হচ্ছে না। প্রথম দিকে বাবা খানিক উৎসাহ দেখিয়েছেন। বকুলের সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু একটি কথাও বললেন না। এর মানে কি এই যে বকুলের বিয়েটা কেউ পছন্দ করছে না?

বাবু হাত ধুতে ধুতে বলল, কি কাজ বললে না? বকুল মুখ কালো করে বলল, কোন কাজ নেই। কাজ আবার কি?

কিছু আনতে হলে বল।

আনতে হবে না কিছু।

বকুল তার ঘরে চলে গেল। সে আজ সারাদিন শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়বে। তিনটা গল্পের বই হাতে আছে। একটা বইয়ে নাম 'এক বৃন্তে দুটি ফুল'। খুব নাকি ভাল বই। টিনা ভাবীর মতে অসাধারণ বই। টিনা ভাবীর কথার তেমন গুরুত্ব অবশ্যি নেই। সে অতি অখাদ্য বইকেও মাঝে মাঝে বলে অসাধারণ।

দশ পাতা পড়বার পর বকুলের মনে হল সে কি পড়ছে তা নিজেই বুঝতে পারছে না। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। মন বসছে না।

বাড়িতে কোন লোকজন নেই। যে কাজের মেয়েটি ছিল সে পরশু দিন মুনা আপার দুটি শাড়ি চুরি করে পালিয়েছে। কেমন নির্জন চারদিক। বকুলের গা ছমছম করতে লাগল। তার শ্বশুর বাড়ি নিশ্চয়ই এমন নির্জন হবে না। চারপাশে লোকজন থাকবে। সেটা হবে একটা হৈচৈয়ের বাড়ি। আনন্দের বাড়ি। অদেখা সুখ ও আনন্দের কথা ভাবতে ভাবতে বকুলের চোখ ভিজে উঠতে লাগল। দরজার কড়া নড়ছে। বকুলের উঠে গিয়ে দরজা খুলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। কোন ভিখিরি নিশ্চয়ই। আজকাল ভিখিরিরা খুব গম্ভীর ভঙ্গিতে দরজায় কড়া নাড়ে, কলিং বেল টিপে ভিক্ষা চায়।

কড়া নেড়েই যাচ্ছে। এ ভিখিরি নয়। বকুল চোখ মুছে দরজা খুলল। টিনা ভাবী বিরাট একটা

প্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

ঘুমুচ্ছিল নাকি? এক ঘণ্টা ধরে দরজা ধাক্কাচ্ছি। চোখ লাল কেন?

বকুল জবাব দিল না। টিনা বিরক্ত হয়ে বলল, বাড়িঘরের এই অবস্থা কেন? এটাকে তো বিয়ে বাড়ি বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন তোদের কোনো আত্মীয়-স্বজন মারা গেছে। যা ময়দার লেই তৈরি কর।

কেন?

কেন কি? ঘর সাজাব। জানি তোরা কেউ কিছু করবি না। কাগজ নিয়ে এসেছি। কাঁচি আছে ঘরে?

জি আছে।

বের কর। বাবু কোথায়?

স্কুলে।

আজকের দিনটায় স্কুলে না গেলে হত না। কি সব অদ্ভুত ভাইবোন তোর।

নিজের বিয়েব জন্যে রঙিন কাগজের মালা বানাবো খুবই অস্বস্তির ব্যাপার। কিন্তু উপায় নেই। টিনা ভাবী ছাড়বে না।

মুখ এমন অন্ধকার করে রেখেছিস কেন রে বকুল?

কিছু ভাল লাগছে না ভাবী।

বিয়ের ঠিক আগে এ রকম হয়। হঠাৎ করে মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে যায়। ভয়টা কেটে যায় বিয়ের রাতেই।

এই বলে টিনা মিটিমিটি হাসতে লাগল।

বকুল'

কি?

তোকে কিছু কায়দা-কানুন শিখিয়ে দেব, বুঝলি?

কি কায়দা-কানুন?

বলব বলব। এত ব্যস্ত কিসের?

বকুল উঠে দাঁড়াল। টিনা বলল, যাচ্ছিস কোথায়?

চা নিয়ে আসি। তুমি তো আবার মিনিটে মিনিটে চা খাও।

চায়ে চুমুক দিয়ে টিনা প্রথম যে কথাটি বল সেটা হচ্ছে - 'বিয়ের রাতে তোর বর যখন প্রথম তোর গায়ে হাত দেবে তখন ইলেক্ট্রিক শক খাবার মত লাফিয়ে উঠবি না। বুঝলি?'

বকুল অন্যদিকে তাকিয়ে রইল। এ জাতীয় কথাবার্তা শুনতে তার অস্বস্তি লাগে আবার সেই সঙ্গে ভালও লাগে। সে এ রকম কেন? সে কি খারাপ মেয়ে? বকুলের বুক হু-হু করতে লাগল।

মুনা ভেবে রেখেছিল সে আজ লাঞ্চ টাইম পর্যন্ত কাজ করবে তারপর ঘরে ফিরে আসবে। সেটা সম্ভব হল না। সিদ্দিক সাহেব তাকে ডেকে একগাদা কাজ দিয়ে দিলেন এবং শান্ত গলায় বললেন, যে ভাবেই হোক আজ পাঁচটায় শেষ করে দেবেন। পারবেন না?

জি পারব।

গুড। ভেরি গুড। আপনি ছাড়া অন্য কেউ হলে বলত -- একদিনে সম্ভব না।

মুনা কিছু বলল না। সিদ্দিক সাহেব হাসতে হাসতে বললেন, মেয়েদের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে এরা সহজে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। তবে শেষ পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে পারে না।

আমি স্যার পাঁচটার মধ্যেই শেষ করে দেব।

গুড। পাঁচটার সময় আমি অফিস থেকে বেরুব। তখন ফাইলগুলি নিয়ে যাব।

যেদিন খুব মন দিয়ে কাজ করবার থাকে সেদিনই যত ঝামেলা দেখা দেয়; যেমন আজ একাউন্টের নতুন মেয়েটি এসে গলা নিচু করে তার এক গাদা সমস্যার কথা বলতে লাগল সেই সমস্যাও ভয়াবহ সমস্যা। তার স্বামীর ছোট ভাই তাকে একটি প্রেমপত্র লিখে বসে আছে। এই ব্যাপারটি সে তার স্বামীকে জানাবে, না জানাবে না এই হচ্ছে সমস্যা। মেয়েটির সঙ্গে মুনার তেমন কোন আলাপ নেই। আজ হঠাৎ করে এ রকম একটি জটিল সমস্যার কথা তাকে বলতে এল মুনা? মুনা একবার ভাবল বলবে- পরে তোমার কথা শুনব ভাই। আজ একটু ব্যস্ত আছি। কিন্তু এটা বলা সম্ভব নয়।

মেয়েটি যাবার পরপর এলেন পাল বাবু। তিনি কোন এক তান্ত্রিক সন্ন্যাসীর খোঁজ পেয়েছেন। যিনি মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ সবই বলতে পারে। পাল বাবুর ইচ্ছা মুনাকে নিয়ে একবার তার কাছে যাওয়া। বহু কষ্টে মুনা পাল বাবুকে বিদেয় করল তখন এসে উপস্থিত হলেন শওকত সাহেব। মুনা বিরক্ত হয়ে বলল, ব্যাপার কি মামা?

তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।

জরুরি কথা বাসায় গিয়ে শুনব। এখন কাজ আছে তুমি যাও।

না এখনই বলতে হবে।

বল তাহলে। এক মিনিটের মধ্যে শেষ করতে হবে।

এখানে বলা যাবে না। বাইরে আয়।

বাইরে কোথায় যাব?

চল তোদের ক্যান্টিনে যাই। জায়গাটা নিরিবিলি।

ক্যান্টিনে যেতে পারব না। যা বলার এখানেই বল। আমি টেবিল ছেড়ে উঠব না।

শওকত সাহেব বেশ কিছু সময় চুপ করে রইলেন। মুনা তাকিয়ে রইল। বড় ঝামেলায় পড়া গেল।

মামা বল।

বলছি।

বলছি বলেও তিনি মুখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

মুনা।

বল শুনছি।

বকুলের বিয়েটা বন্ধ করে দেয়া দরকার। ওদের খবর পাঠিয়ে দে বিয়ে হবে না।

কেন?

কাল রাতে একটা স্বপ্ন দেখলাম। খারাপ স্বপ্ন। ভোর রাতে স্বপ্নটা দেখলাম।

তুমি স্বপ্ন দেখছ এই জন্যে বিয়ে হবে না?

স্বপ্নটা শুনলে তুই বুঝবি?

কিছু শুনতে হবে না। তুমি বাড়িতে গিয়ে ঘুমাও।

আমার কথাটা পুরোপুরি শোন- স্বপ্নে দেখলাম তোর মামি এসে আমাকে বলছে, জহির ছেলেটা ভাল না। ও আমার মেয়েকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। তারপর দেখলাম বকুল শুয়ে আছে আর জহির একটা বটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকছে এই সময় ঘুমটা ভেঙে গেল।

মুনা বলল, চা খাবে মামা? শওকত সাহেব কিছু বললেন না।

চা এনে দিচ্ছি। খাও। তারপর বাড়িতে চলে যাও।

আর কিছু বলবি না?

না। খবরের কাগজে আজকাল প্রায়ই খবর উঠছে 'যৌতুকের জন্যে স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন' এইসব খবর পড়ে পড়ে স্বপ্ন দেখেছ।

শওকত সাহেব রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। মুনা শান্ত স্বরে বলল, বাড়িতে গিয়ে কোনো খোঁজ নিয়ে দেখ, যে রাতে তুমি স্বপ্ন দেখেছ আগের দিনের পেপারে এ রকম কোন খবর আছে।

কথা সত্যি। এ জাতীয় একটি খবর সত্যি সত্যি আছে। শওকত সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

চলে যাচ্ছ মামা?

হুঁ।

চা খাবে না?

না।

বিকেল পাঁচটায় সিদ্দিক সাহেব এসে দাঁড়ালেন টেবিলের সামনে। নিচু গলায় বললেন, কাজটা শেষ করতে পারেননি। তাই না? মুনা বিব্রত স্বরে বলল জি না স্যার।

## ২৮

বকুলের বিয়ে হয়ে গেল।

শওকত সাহেব বিয়ের অনুষ্ঠানে খুব মনমরা হয়ে রইলেন। বকুলকে নিয়ে যাবার সময়ও

তেমন কোন উচ্ছ্বাস দেখালেন না। মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন না। কেমন যেন শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। বকুল খুব কাঁদল। সে সারাদিনই কাঁদছিল। কনে বিদেয়ের সময় হতেই তার হেঁচকি উঠতে লাগল। মুনা তাকে একপাশে নিয়ে গিয়ে বলল, এ রকম করছিস কেন? মরা কান্না কাঁদছিস। বিশ্রী লাগছে শুনতে। কান্না থামা।

বকুল ধরা গলায় বলল, বাবার কি হয়েছে? বাবা এ রকম করছে কেন?

কি রকম করছে?

দেখ না কেমন করে তাকাচ্ছে।

কোন রকম করে তাকাচ্ছে না। মামা ভালই আছে। তুই কোন রকম হৈচৈ না করে তোর বরের বাড়ি যা।

বকুলের কান্না থামল না। জহিরকে দেখা গেল ফিসফিস করে কয়েকজনকে কি সব বলছে। নিশ্চয়ই কোন হাসির কথা। কারণ সেই ফিসফিসানি শুনে সবাই হাসছে। মুনার মন খারাপ হয়ে গেল। যার স্ত্রী এমন ব্যাকুল হয়ে কাঁদছে সে হাসির কথা বলবে কেন? কেন সে এই কিশোরী মেয়েটির দুঃখ বুঝবে না?

মুনা জহিরকে ডেকে ভেতরে নিয়ে গেল। আলাদা করে কিছু বলার উপায় নেই। বাড়িতে মানুষ গিজগিজ করছে। বর ভেতরে এসেছে কাজেই অল্পবয়সী মেয়েগুলি চেষ্টা করছে গা ঘেঁষে দাঁড়াতে। মুনা অনেক চেষ্টা করে ওদের সরাল। জহির বলল, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে ভাবী, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন। মুনা তার ভাবী নয় কিন্তু সে ভাবী ডাকছে। বিচার-বুদ্ধি কমে এসেছে। সেও নিশ্চয়ই একটা ঘোরের মধ্যে আছে।

ভাবী ডাকছ কেন জহির? আমি তোমার আপা।

সরি আপা। আপনি কি আমাকে কিছু বলবেন?

হ্যাঁ বলব। বকুল খুব বাচ্চা মেয়ে একটু খেয়াল রাখবে। বিয়ে হয়ে গেছে বলেই কিন্তু সে বড় হয়ে যায়নি। বকুলের স্বভাব-চরিত্র অনেকদিন পর্যন্ত কিশোরীদের মত থাকবে।

এইসব আপনি আমাকে কেন বলছেন?

যাতে তুমি বুঝতে পার সেই জন্যেই বলছি।

বুঝতে পারব না কেন? আমার যথেষ্ট বুদ্ধিবিবেচনা আছে বলেই আমার ধারণা

জহিরের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। গলার স্বর হল কঠিন। মুনা ভেবে পেল না তার কথায় এই ছেলেটি রাগ করছে কেন। এই ছেলেটিকে সে এখন রাগাতে চায় না।

আপা আমাদের তো এখন যেতে হয়। ন'টা বেজে গেছে।

চল দেখি যাওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা।

যাবার ব্যবস্থা খুব সহজেই হল। বকুলকে আরো খানিক্ষণ এ বাড়িতে ধরে রাখার কেউ নেই। রাত হয়ে যাচ্ছে। উৎসব শেষ হলেই যেন সবাই বাঁচে। নিজের নিজের বাড়িতে ঘুমুতে যেতে পারে।

রাত দশটার মধ্যে বাড়ি খালি হয়ে গেল। একেবারেই ফাঁকা। বকুলের মামির বোধ হয় থাকার ইচ্ছা ছিল। মুনা কোনো রকম আগ্রহ দেখাল না। মুখ ফুটে বলে ফেলল, বাড়িতে বিছানা নেই মামি আপনার কষ্ট হবে। মুনার ইচ্ছা নয় কেউ থাকুক। একা হয়ে যেতে মন চাইছে।

ডেকোরেটরের ঘর থেকে দুইজন ছোকরা এসেছে। অল্প বয়সের কিন্তু ভারি ছটফটে। রাত এগারটার মধ্যে সব এঁটে থালাবাসন ধুলে ফেলল। ঠেলাগাড়ি এনে চেয়ার-টেবিল সরিয়ে ফেলল। বাসি খাবারের গন্ধ ছাড়া বিয়ে বাড়ির আর কোন চিহ্ন রইল না। সে অনায়াসে চলে যেতে পারে কিন্তু গেল না। তার এই বাড়িতে আরও কিছুক্ষণ থাকতে ইচ্ছা করছে। বিয়ের সমস্ত ঝামেলা সে একা কি করে সামাল দিয়েছে সে বিষয়ে মুনার কাছ থেকে কিছু শোনার ইচ্ছা করছে। মুনা কিছুই বলেনি। এখন হয়ত বলবে।

বাকের নিতান্ত আপনজনের ভঙ্গিতে রান্নাঘরে উঁকি দিল। মুনা উনোনে চায়ের পানি বসিয়েছে। বিজবিজ শব্দ হচ্ছে। সে বসে আছে মাথা নিচু করে। কাঁদছে নাকি? অস্বাভাবিক নয়। বোন চলে গিয়েছে, কাঁদাই উচিত।

মুনা অবশ্যি কাঁদছিল না। বাকেরকে দেখে বলল, কিছু বলবেন?

না কিছু বলব না। খাওয়া-দাওয়া কেমন হয়েছে?

ভালই তো। খারাপ কেউ বলেনি।

বাচ্চু বাবুর্চিকে ধরে এনেছি খারাপ বলবে মানে। মারাত্মক বাবুর্চি।

তাই নাকি?

এক নাম্বার যাকে বলে। হাই ডিমান্ড। এক মাস আগে থেকে বলে না রাখলে পাওয়া যায় না। আমাকে না করে দিয়েছিল শেষে পা চেপে ধরলাম।

মুনা হেসে ফেলল। বাকের অপ্রসন্ন মুখে বলল, হাসছ কেন?

বাবুর্চির পা ধরতে হল তাই হাসছি। চা খাবেন? চা হচ্ছে।

দাও এক কাপ চা খাই।

বাকের মুনার সামনে উবু হয়ে বসে পড়ল। তার মুখ হাসি হাসি।

আপনার খুব কষ্ট হল বাকের ভাই।

আরে না। কষ্ট কিসের? বকুল হচ্ছে আমার বোনের মত। তার বিয়েতে কষ্ট না করলে কার বিয়েতে কষ্ট করব?

এই পাড়ার সব মেয়ের বিয়েতেই তো আপনি কষ্ট করেন। খাটাখাটি করেন। করেন না?

তাই নাকি?

আমার বিয়েতেও কি করবেন?

বাকের জবাব দিল না। আড়চোখে তাকাল মুনার দিকে। মুনা কাপে চা ঢালছে। আগুনে আঁচে তার মুখ লাল হয়ে আছে। কি সুন্দর লাগছে দেখতে।

কি জবাব দিচ্ছেন না যে? করবেন আমার বিয়েতে খাটাখাটনি?

কেন করব না? নিশ্চয়ই করব।

এত মরা গলায় বলছেন কেন? শক্ত করে বলুন।

বাকের চায়ের কাপে চুমুক দিল। এই কি যে অদ্ভুত কথাবার্তা।

বাকের ভাই।

বল।

একটা কথা বোধ হয় আমি আপনাকে কোনোদিন বলিনি, কথাটা হচ্ছে আমি আপনাকে খুব পছন্দ করি। আপনি আবার এটাকে প্রেম বলে ধরে নেবেন না। প্রেম অন্য জিনিস।

বাকের একবার ভাবল জিজ্ঞেস করে — প্রেম কি জিনিস? সে জিজ্ঞেস করল না। গম্ভীর মুখে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। গুছিয়ে কিছু-একটা বলতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কোনো কথা মনে আসছে না। সে নিজের অজান্তেই বলে বসল-- রোস্টটা বেশ নরম হয়েছিল তাই না?

মুনা অবাক হয়ে বলল, হঠাৎ রোস্টের কথা বলছেন কেন?

না মানে...

অনেক খাবার বেঁচে গেছে। আপনি খাবেন?

দাও খাই।

বাকেরের খিদে বিন্দুমাত্র ছিল না। বিয়ে বাড়ির খাবার দ্বিতীয়বার খাওয়া যায় না। কিন্তু মুনা খাবার বেড়ে দেবে বসে থাকবে সামনে এর জন্যেও দ্বিতীয়বার খাওয়া যায়।

আপনি হাত-মুখ ধুয়ে আসুন আমি খাবার গরম করছি।

এখানে বসে খাব?

না এখানে কেন? খাবার টেবিলে যান।

বাকের উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, এগার নাম্বার বাড়িতে ঐ মেয়ে তিনটি আসলে কি জিনিস জানো?

না জানি না। জানার ইচ্ছাও নেই।

ওরা হচ্ছে বাজারের মেয়ে।

বাজারের মেয়ে মানে?

খারাপ মেয়ে।

কি সব আজেবাজে কথা যে আপনি বলেন বাকের ভাই। অসহ্য। যান হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসুন। আপনাকে খাইয়ে আমি শুয়ে থাকব। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে।

প্যারাসিটামল খাও।

প্যারাসিটামল আমি এখন পাব কোথায়?

এনে দিচ্ছি। নো প্রবলেম। ময়না মিয়া রাত এগারটার আগে দোকান বন্ধ করে না।

মুনাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই সে রাস্তায় নেমে পড়ল।

আজ সন্ধ্যায় 'রাতের পাখিরা'র অভিনয় হবে। বাকের তার কিছুই জানে না। কেউ তাকে বলেনি। এর মানে কি? তাকে কেউ কিছু বলবে না কেন? সারা বিকাল ব্যাপারটা নিয়ে সে চিন্তা করল। পরিষ্কার কোন কারণ সে ভেবে পেল না। একটা হতে পারে তাকে খবর দেয়ার কথা মনে নেই। থিয়েটার মানেই অসম্ভব ঝামেলা। ঝামেলাতে কথা এলোমেলো হয়ে যায় সব কিছু মনে পড়ে না। কিন্তু এই সহজ যুক্তিটি বাকেরের মনে ধরছে না। কারণ জসীমের সঙ্গে তার কয়েকবার দেখা হয়েছে। জসীম তাকে এড়িয়ে গেছে। স্পষ্ট মনে আছে একবার সে জিজ্ঞেস করল বই করে নামাচ্ছ? জসীম তার উত্তর দেয়নি। ফ্যাকাশে ভঙ্গিতে হেসেছে। ফট করে তো আর ঠিক করা হয়নি আজ সন্ধ্যায় অভিনয় হবে। নিশ্চয়ই অনেক আগে থেকে ঠিকঠাক করা।

জলিল মিয়ার চায়ের স্টলে সে উপস্থিত হল সন্ধ্যার আগে। তোলা-উনুনে পেঁয়াজু ভাজা হচ্ছে। জলিল মিয়া এই ব্যাপারটি নতুন শুরু করেছে। সন্ধ্যা হতেই পেঁয়াজু, ডালপুরি ভাজা। ভাল বিক্রি হচ্ছে। ভাজাবুজির জন্যে নতুন লোক রাখা হয়েছে। জলিল মিয়া ভালই দেখাচ্ছে। বাকের বারান্দায় চেয়ার টেনে বসল। জলিল মিয়া উঁচু গলায় বলল, বাকের ভাইরে পেঁয়াজু দে। চা দে।

বাকের ইশারায় নিষেধ করল। জলিল মিয়া বলল, বই শুরু হতে দেরি আছে বাকের ভাই। আটটা বাজবে। মিনিস্টার আসতাছে।

কে আসছে?

মিনিস্টার।

মিনিস্টার মানে? কি মিনিস্টার?

মিনিস্টারের কি আর দেশে অভাব আছে ভাইজান?

কথা খুবই ঠিক। দেশে প্রচুর মিনিস্টার আছে কিন্তু এরা নিশ্চয়ই পাড়ার নাটকে উপস্থিত হয় না। এদের অন্য কাজ আছে।

মিনিস্টারের কথা আপনি কিছু জানেন না বাকের ভাই?

না।

হুলস্থূল হয়ে যাচ্ছে। সিদ্দিক সাহেব ব্যবস্থা করলেন। কার্ড-টার্ড ছাপিয়েছে।

তাই নাকি?

আপনি কিছুই জানেন না?

বাকের গম্ভীর মুখে বসে রইল। তাকে কিছু না বলার রহস্যটা বোঝা যাচ্ছে। সিদ্দিক সাহেবের চাল। মিনিস্টার-ফিনিস্টার আনছেন। ভবিষ্যতে কোন পরিকল্পনা আছে নিশ্চয়ই।

বাকের ভাই!

বল।

চা খান এক কাপ। স্পেশাল পাত্তি আছে। কাস্টমারদের দেই না। দিতে বলি?

বল।

জলিল চায়ের কথা বলল। তার বেশ মজা লাগছে। সে বুঝতে পারছে সিদ্দিক সাহেবের সঙ্গে বাকেরের একটা ঝামেলা শুরু হয়েছে। বাকের একা পড়ে গেছে। এই সময়ে থাকা মানেই ডুবে যাওয়া। সামনে দিনগুলিতে বাকেরকে আর ডেকে ডেকে চা-পিঁয়াজু খাওয়াতে হবে না। স্পেশাল পাত্তির চা বানাতে হবে না। কিন্তু তাতে তার কোন লাভ নেই। নতুন দল আসবে। স্পেশাল পাত্তি তাদের জন্যে রাখতে হবে।

বাকের ভাই।

উঁ।

মিনিস্টার সাহেব নাকি যুব সমিতিতে অনেক টাকা-পয়সা দিচ্ছেন। ঘর দিচ্ছেন।

ভালই তো।

যুব সমিতির পাঠাগার হবে। বিশ ইঞ্চি টিভি দিবে পাঠাগারে।

ভাল।

এরশাদ সাহেবের দলটা খারাপ না কি বলেন? খরচপাতি করছে। জিয়া সাহেবের সময়

এত খরচপাতি করে নাই। খালি খাল কাটা হয়েছে। কি বলেন বাকের ভাই?

বাকের জবাব দিল না। জলিল মিয়া হৃষ্টচিত্তে বলতে লাগল, মিলিটারি ছাড়া এই দেশ ঠিক রাখা যাবে না। এরশাদ সাব মিলিটারি মানুষ। দুই মেয়ে পলিটিশিয়ানদের কেমন চরকি বাজি দেখিয়ে দিল। ঠিক বললাম কিনা বলেন বাকের ভাই?

ঠিকই বলেছেন।

মেয়ে মানুষের কাজ হইল বাচ্চা দেওয়া। এই কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ মেয়ে মানুষ দিয়ে হয় না। ঠিক বললাম না বাকের ভাই?

বাকের উত্তর না দিয়ে উঠে এল। জলিল মিয়ার দোকানে এখন কাস্টমার নেই। সে অনবরত বকরবকর করতে থাকবে। পলিটিক্স তার প্রিয় বিষয়। প্রেসিডেন্ট জিয়ার সময় সে ছিল জিয়া ভক্ত। এখন এরশাদ প্রেমিক। এরশাদ সাহেবের একটা বাঁধানো ছবি দোকানে ঝুলছিল। লোকজন হৈচৈ করাতে ছবি সরিয়ে ফেলেছে। এই দেশের মানুষগুলি অদ্ভুত যে ক্ষমতায় থাকে তাকে কেউ সহ্য করতে পারে না। সবাই তার বিরুদ্ধে চলে যায়। কেন যায়?

বাকের অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রাস্তার এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত কয়েকবার হাঁটল। রাস্তার মোড়ে টর্চ হাতে দুজন ট্রাফিক পুলিশ। এই রকম জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ? নির্ঘাৎ মিনিস্টার সাহেব আসছেন সেই উপলক্ষে। একবার গিয়ে দেখে আসবে নাকি কেমন জমেছে সব কিছু? বাকের মনস্থির করতে পারল না। মুনাদের বাসায় গেলে কেমন হয়? না, তাদেরও পাওয়া যাবে না। সেজেগুজে দল বেঁধে হয়তো গিয়েছে থিয়েটার দেখতে। বাকের রওয়ানা হল কম্পাউন্ডওয়ালা বাড়িটির দিকে। এই বাড়ির কেউ থিয়েটারে যাবে না। এরা ঘরে থাকবে। সে যদি গিয়ে বলে, চলুন থিয়েটার দেখে আসি তাহলে কেমন হয়? চশমা পরা বুড়ি তার উত্তরে কি বলবে? মেয়ে তিনটিই বা কি করবে? এদের সঙ্গে এখনো কথাবার্তা হয়নি? নাম পর্যন্ত জানা নেই। এদের নিশ্চয়ই খুব বাহারি নাম। ফুলেশ্বরী, রত্নেশ্বরী এ রকম। এর নিশ্চয়ই কণা, বীণু এ রকম নাম রাখবে না। রাখলেও বদলে ফেলবে।

গেট তালাবন্ধ। গেটের ভেতরে একটি কালো রঙের গাড়ি। জোবেদ আলিকে দেখা গেল গাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে হেসে হেসে কি বলছে। জোবেদ আলির হাতে সিগারেট। অথচ কয়েকদিন আগেই সে বলেছে সিগারেট খায় না। বাকের গেটের পাশে দাঁড়িয়ে উঁচু গলায় ডাকল, এই যে জোবেদ আলি সাহেব। একটু শুনে যান।

জোবেদ আলি গম্ভীর মুখে এগিয়ে এল।

কেমন আছেন ভাই?

ভাল। কি চান?

কিছু চাই না। গল্পগুজব করতে আসলাম।

জোবেদ আলি তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল। বাকের হাসিমুখে বলল, থিয়েটারে যান নাই? 'রাতের পাখিরা' হচ্ছে।

জি না। থিয়েটার দেখি না।

মেয়েরাও যায় নাই?

না।

যান নাই কেন? কাস্টমার এসেছে নাকি?

কি বললেন?

বললাম কাস্টমার এসেছে নাকি? মেয়ে তিনটা তো ব্যবসা করে তাই না?

জোবেদ আলি চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। বাকের গম্ভীর গলায় বলল, ভদ্রপাড়ায় বেশ্যাবাড়ি খুলে ফেললেন?

জোবেদ আলি থমথমে গলায় বলল, পাগলের মত কি বলছেন? বাকের ঠাণ্ডা গলায় বলল, ঠিক বলছি। একটা কথাও ভুল বলি নাই। গেট খুলেন। বুড়ির সঙ্গে কথা বলব।

আপনি সকাল বেলায় আসেন। যা বলার সকালে বলবেন।

বাকের সিগারেট ধরিয়ে উদাস স্বরে বলল, বেশ্যার দালালি কতদিন ধরে করছেন?

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ আপনাকেই। আপনি ছাড়া আর কে আছে। নেন সিগারেট নেন।

আমি সিগারেট খাই না।

একটু আগেই তো দেখলাম সিগারেট টানছেন।

জোবেদ আলি নিচু গলায় বলল— বাকের ভাই, আপনি সকালে আসেন। এখন হৈচৈ করবেন না।

হৈচৈ? হৈচৈ কোথায় করলাম?

ভাই আপনি এখন যান।

সাদা শাড়ি পরা ফর্সা মহিলা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সে রিনরিনে গলায় বলল, কে কথা বলে রে?

জোবেদ আলি বলল, কেউ না আম্মা।

জোবেদ আলি এই মহিলাকে আম্মা ডাকে নাকি? এটা জানা ছিল না। বাকের সিগারেট টানতে টানতে রাস্তার দিকে রওনা হল। এখন তার বেশ একটা ফূর্তির ভাব হচ্ছে। কালো গাড়িতে করে যে ভদ্রলোক তিন কন্যার কাছে এসেছেন তার শার্টের কলার চেপে ধরলে কেমন হয়? বাকের নিজের মনে খানিক্ষণ হাসল। দলবল জুটিয়ে বাড়ি ঘেরাও করলে হয়। কিন্তু সবাই গেছে 'রাতের পাখিরা' দেখতে। সেখান থেকে হাতী নিয়ে টেনেও কাউকে আনা যাবে না। বাকের মুনাদের ঘরের দিকে রওনা হল। কাউকে ঘটনাটা বলতে না পারলে রাতে ঘুম হবে না।

অনেক্ষণ কড়া নাড়ার পর দরজা খুলল। বাকের হাসিমুখে বলল, খবর কি মুনা? মুনা বিরসমুখে বলল, কোনো কাজে এসেছেন?

না কোনো কাজ নেই। যাচ্ছিলাম এদিক গিয়ে ভাবলাম....।

আমার শরীরটা ভাল না। এখন চলে যান।

বাসায় কেউ নেই?

না। মামা কোথায় যেন গেছেন। বাবু গেছে বকুলের শ্বশুর বাড়ি।

ও আচ্ছা। একা একা ভয় লাগছে না?

আমার এত ভয়টয় নেই।

একটা মজার খবর আছে মুনা। রহস্যভেদ হয়েছে। ভূতের কাছে মামদোবাজি। ফটাস করে হাড়ি ভেঙে ফেলেছি। অপেন মার্কেট পট ব্রেকিং হয়ে গেছে।

কি বকবক করছেন?

শুনলে লাফ দিয়ে উঠবে।

লাফ দিয়ে উঠার কোনো ইচ্ছা আমার নেই। এখন যান তো।

বেশিক্ষণ না এক মিনিট বসব।

বাকের ঘরে ঢুকে পড়ল। সহজ গলায় বলল, চা কর এক কাপ। চা খেয়ে জুত হয়ে বসে গল্পটা করি।

আপনি বড্ড বিরক্ত করেন বাকের ভাই।

বিরক্ত করব না। এক মিনিটের মামলা। তুমি নাটক দেখতে যাওনি।

যাইনি। সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। শুধু শুধু কথা বলা আপনার একটা বদ অভ্যাস।

তা ঠিক। নাটকে মিনিস্টার সাহেব আসছেন জানো নাকি?

না জানি না। আসুক যার ইচ্ছা।

সিদ্দিক সাহেবের চাল। ব্যাটা ইলেকশন করবে। ফিল্ড করছে। বুঝলে মুনা? লোকজনদের খেলাচ্ছে।

খেলাক। আপনি চুপ করে বসুন। চা এনে দিচ্ছি খেয়ে বিদেয় হোন।

নাটক যদি দেখতে চাও নিয়ে যেতে পারি। ঘরে তালা দিয়ে চলে যাব। নো প্রবলেম।

কিচ্ছু দেখতে চাই না।

মুনা ভেতরে চলে গেল। বাকের সিগারেট বের করল। পকেটে দেয়াশলাই আছে। তবু সে রান্নাঘরে উঁকি দিল ম্যাচ আছে? সিগারেট ধরাতে পারছি না। মুনা নির্বিকার ভঙ্গিতে দেয়াশলাই এগিয়ে দিল।

কাজের একটা মেয়ে ছিল না? সেও নেই?

না। দেশের বাড়ি গেছে। আপনি এখানে বসছেন কেন? বসার ঘরে গিয়ে বসুন।

তুমি একা একা আছ!

বাকের ভাই, বসার ঘরে গিয়ে বসুন তো।

বাকের উঠে গেল।

মিনিস্টার সাহেব চলে এসেছেন। অনেক মাইক-টাইক লাগানো হয়েছে। এখান থেকেও পরিষ্কার শুনা যাচ্ছে। সব মিনিস্টাররা এক ধরনের ভাষায় বক্তৃতা দেন। গলা উঠানামা করে এক ভঙ্গিতে। এক এক সরকারের মন্ত্রীদের এক এক ধরনের বক্তৃতা। শেখ মুজিবের মন্ত্রীরা আঙুল দেখিয়ে বক্তৃতা করতেন। রেসকোর্স ময়দানে মুজিবের ভাষণের নকল করতেন। এরশাদ সাহেবের মন্ত্রীরা সবাই খুব আল্লাহ ভক্ত। সবাই কোরান শরীফ থেকে উদ্ধৃতি দেন। তাদের বক্তৃতায় ইহকালের চেয়ে পরকালের কথা বেশি থাকে। বক্তৃতা শুনলে মনে হয় ওয়াজ করছেন।

বাকের শুনল মিনিস্টার সাহেব বলছেন— 'যুবকদের সমাজের প্রতি দায়িত্ব আছে। যুবকদের অনুসরণ করতে হবে রসুলুল্লাহর নির্দেশিত পথ। কারণ সেই পথেই ইহকাল ও পরকালের জন্যে মঙ্গল নিহিত...'

মুনা চা এনে সামনে রেখে ক্লান্ত গলায় বলল, বাকের ভাই, আমার শরীরটা ভাল না। চা খেয়ে আপনি চলে যান।

হয়েছে কি?

কি জানি কি। বমি বমি লাগছে।

নো প্রবলেম দুটি এভোমিন ট্যাবলেট নিয়ে আসছি।

আপনাকে কিছু আনতে হবে না, প্লিজ।

বাকের চায়ে চুমুক দিল। মুনা তার সামনেই বসে আছে। চোখ ঈষৎ রক্তাভ। সন্ধ্যা বেলাতেই ঘন ঘন হাই তুলছে। কেমন কঠিন একটা ভঙ্গি তার চারদিকে। মেয়েরা এমন কঠিন হলে ভাল লাগে না।

রাত সাড়ে এগারটার দিকে শেষবারের মত চা খাবার জন্যে বাকের বের হল। ভাইয়ের বাসায় থাকার সময় তাকে এই কষ্টটা করতে হত না। শোবার আগে এক কাপ চা খাওয়া যেত। এখন বাইরে থেকে খেয়ে আসতে হয়। অস্বস্তিকর ব্যাপার। বিছানায় বসে চা খাওয়া আর দোকানের চেয়ারে বসে চা খাওয়া একটা বড় রকমের পার্থক্য আছে।

জলিল মিয়া তার স্টল বন্ধ করে দিয়েছে। সাধারণত বারোটার দিকে বন্ধ হয়। আজ সকাল সকাল বন্ধ হল। বাকের এগিয়ে গেল মেইন রোডের দিকে। সেখানে 'হোটেল আকবরিয়া' সারারাত খোলা থাকে।

বাকের ভাই। বাকের ভাই।

বাকের থমকে দাঁড়াল। জসীম লম্বা পা ফেলে এগিয়ে আসছে। তার মধ্যে ব্যস্ত একটা ভঙ্গি। মনে হচ্ছে বেশ ফুর্তিতে আছে।

কি খবর জসীম?

জি খবর ভাল।

তোমাদের নাটক কেমন?

জসীম খানিকটা চুপসে গেল। নিচু গলায় বলল, ভাল হয়েছে।

ভাল হলেই ভাল। মিনিস্টার এসেছিল নাকি?

হুঁ।

গুড, ভেরি গুড।

আমি আপনাকে খুঁজছিলাম বাকের ভাই। দু'বার আপনার ঘরে গিয়ে খুঁজে এসেছি।

কি জন্যে?

জসীম ইতস্তত করতে লাগল। যেন কোন একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গ তুলতে চায় কিন্তু সাহসে কুলুচ্ছে না। সে অকারণে কাশতে লাগল।

বলে ফেল কি ব্যাপার।

আপনি জোবেদ আলিকে কি বলেছেন?

বাকেরের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আজ সন্ধ্যার কথা বলছ?

হুঁ।

তা দিয়ে তোমার কি? জোবেদ আলির সঙ্গে তোমার কি? জোবেদ আলি বেশ্যার দালাল। তুমি কর দোকানদারি। তাকে কি বললাম না বললাম তাতে তোমার গায়ে লাগছে কেন বুঝলাম না।

না আমার কিছু না। সিদ্দিক সাহেবের কাছে ওরা গিয়েছিল। সিদ্দিক সাহেব আমাকে খবর দিয়ে আনলেন। আমাকে আর মাখনা ভাইকে। বললেন...

জসীম থেমে গেল। বাকের গম্ভীর স্বরে বলল, কি বললেন?

বললেন আপনাকে সাবধান করে দিতে। ঝামেলা করলে অসুবিধা হবে।

কি অসুবিধা হবে?

জসীম চুপ করে রইল। বাকের কড়া গলায় বলল, তোমরা সিদ্দিকের সঙ্গে গিয়ে জুটেছ?

তা না। উনি পাড়ার একটা মাথা।

কবে থেকে পাড়ার মাথা হল? কি, কথা বলছ না যে? গিয়ে বলবে তোমার পাড়ার মাথাকে, আমি তার মুখে পেচ্ছাব করে দেই।

জসীম রুমাল দিয়ে তার ঘাম মুছতে লাগল। বাকের বলল, কি বলতে পারবে না?

এটা কেমন করে বলি বাকের ভাই?

অসুবিধা কি? আমি যেমন বললাম সে রকম বলবে। তোমাদের কাজই তো হচ্ছে একজনের কথা অন্যজনকে বলা।

আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

চা খেতে যাই। হোটেল আকবরিয়ায়। খাবে নাকি?

জি না।

না খেলে চলে যাও। সিদ্দিক সাহেবকে খবরটা দাও। মুখে পেচ্ছাবের কথাটা গুছিয়ে বলবে। ওটা বাদ দিও না।

জসীম শুকনো মুখে চলে গেল। হোটেল আকবরিয়ার মালিক দিলদার মিয়া খুবই যত্ন করল। নিজে উঠে গিয়ে চা নিয়ে এল। বসল মুখোমুখি। দিলদার মিয়ার মুখে বসন্তের দাগ। চিবুকের কাছে এক গোছা কুৎসিত দাড়ি। তবু বাকেরের দিলদার মিয়ার সঙ্গে গল্প করতে বেশ লাগল। সে ঘরে ফিরল রাত একটায়। রাত দু'টায় পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। অভিযোগ গুরুতর। বেআইনি অস্ত্র রাখা। জনগণের ওপর জোরজবরদস্তি। সে ধরা পড়ল গুণ্ডা আইনে। তার কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না কিন্তু পরদিনের পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হল। তার সঙ্গে যে সব অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গেছে তার ছবিও উঠল। একটি পিস্তল, দুটি ন'ইঞ্চি ড্যাগার এবং তিনটি তাজা হাতবোমা।

## ২৯

বকুলের বিয়ে হয়েছে এক সপ্তাহ হয়ে গেল। এক সপ্তাহ অনেক লম্বা সময় নয়। কিন্তু তার কাছে মনে হচ্ছে অনন্তকাল ধরে সে বৌ সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাতে ঘুমুতে যাচ্ছে একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে। মানুষটিও যেন তার সঙ্গে অনন্তকাল ধরেই ঘুমুচ্ছে। গায়ে ঘামের গন্ধ। সে বলে উঁচু গলায়। রেগে ওঠে অল্পতে। বিয়ের দ্বিতীয় দিনেই সে বলল, পিঠটা একটু চুলকে দাও তো বকুল। কী অদ্ভুত কথা! ঘর ভর্তি মানুষজন। সে বসে আছে টানা বারান্দায়। লোকজন আসা-যাওয়া করছে এর মধ্যে পিঠ চুলকে দেবে কী? কিন্তু জহির শার্ট তুলে খালি গায়ে বসে আছে। অসহিষ্ণু গলায় বলল, আহ্ দেরি করছ কেন?

নতুন বৌকে কেউ এমন কড়া গলায় কিছু বলে। বকুলের চোখে পানি এসে যাচ্ছিল। সে বহু কষ্টে পানি সামলাল এবং হাত রাখল জহিরের পিঠে। জহির বিরক্তমুখে বলল, এ রকম শান্তিনিকেতনি কায়দায় সুড়সুড়ি দিচ্ছ কেন? ভালমত চুলকাও।

কি বিশ্রী কথা বলার ভিঙ্গি। বিয়ের পর মানুষটিকে বকুলের মোটেও ভাল লাগছে না। দুপুরের পর থেকেই তার শুধু মনে হতে থাকে সন্ধ্যা এসে পড়ছে। এক সময় সন্ধ্যা মিলাবে এবং জহির সবার সামনেই দরজা বন্ধ করে ঝাপটা-ঝাপটি করতে করতে বলবে তুমি এমন মাছের মতো পড়ে থাক কেন? তোমার অসুবিধাটা কি? বকুল শুধু মনে মনে বলবে, আহ্ আজকের রাতটা পার হোক। এক সময় সেই রাত পার হয় কিন্তু আবার নতুন একটি রাত আসতে শুরু করে। একটি বিবাহিত মেয়ের জীবন মানেই কী একের পর এক গ্লানিময় ক্লান্তির দীর্ঘ রজনী?

কাউকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কাকে করবে? টিনা ভাবী নেই। তাকে চিঠি লেখা যায়। কিন্তু চিঠি লিখতে ইচ্ছা করে না। ইদানীং তার বারবার মনে হয় সবাই ইচ্ছা করে তাকে জলে ফেলে দিয়েছে। সবাই জানত তার এই অবস্থা হবে কিন্তু কেউ তাকে বলেনি।

বিশাল এই বাড়িতে তার শুধু হাঁফ ধরে। প্রায়ই মনে হয় নিঃশ্বাস নেবার মতো বাতাস নেই কোথাও। অথচ কি খোলামেলা বাড়ি। তাদের শোবার ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালা খুলে দিলে বাতাসে বিছানার চাদর সব উড়িয়ে নিয়ে যায়। টানা বারান্দা এত প্রশস্ত যে নেট টানিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়।

একতলার বেশির ভাগ ঘরই তালাবদ্ধ। থাকার লোক নেই ব্যবহার হয় না। তার শাশুড়ি প্রথম দিনেই সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। সারাক্ষণই কথা বললেন

এই যে দেখ মা। পাশাপাশি দুই ঘর। তোমার শ্বশুর বলতেন অতিথি ঘর। অতিথি এলে থাকবে। কত বড় ঘর দেখলে? ইচ্ছা করলে বাইজী নাচানো যায়। তোমার শ্বশুর সাহেবের মাথাটা ছিল খারাপ। টাকা-পয়সা যা ছিল সব ঢেলেছ এই বাড়িতে। তা না করে যদি জমিজমা করত তাহলে আজ তোমরা পায়ের ওপর পা তুলে থাকতে পারত। বুঝলে মা এই বংশই হচ্ছে পাগলের। আমার ছেলেও পাগল। এখন বুঝতে পারছ না, কয়েকদিন যাক বুঝবে। এই যে দেখ এটা দেখ। লাইব্রেরি ঘর। রাজ্যের বই আছে এখানে। পোকায় কেটে সব শেষ করেছে। একটা বই আস্ত নেই। বই পড়ার অভ্যাস আছে? থাকলে আমার কাছ থেকে চাবি নিয়ে যেও। তবে মা রাতের বেলা একা একা এ ঘরে আসবে না। সবাই বলে কী সব নাকি দেখে। আমি নিজে কোনোদিন দেখি নাই। তোমার শ্বশুর সাহেবকে নাকি দেখে ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়ছে। যত বানানো কথা। শুনলে রাগে গা জ্বলে যায়।

জহির নিজেও বাড়ি প্রসঙ্গে অনেক কথাটথা বলল। বকুলকে খানিক ঘুরিয়ে দেখাল, ছাদে নিয়ে গেল। হৃষ্টচিত্তে বলল, বাড়ি কেমন দেখলে?

ভাল।

একুশটা ঘর আছে। অথচ দু'টা মাত্র বাথরুম, তাও একতলায়। বাবার একটা নেশাই ছিল ঘর বানানো। কি করে রুমের সংখ্যা বাড়ানো যায়। অথচ মানুষ মাত্র তিনজন।

এ রকম অদ্ভুত সখ হল কেন?

কে জানে কেন। গৌরীপুরের মহারাজার বাড়ি দেখে বোধ হয় এই নেশা চেপেছিল। লোকজনের বাড়ির সামনে পেছনে খোলা জায়গা-টায়গা থাকে, বাগান-টাগান করে। এইসব কিচ্ছু নেই। সবটা জায়গা জুড়ে বাড়ি। কিছুদিন পর এটা হবে ভূতের বাড়ি। কেউ থাকবে না।

বকুল ক্ষীণ স্বরে বলল, মা আমাকে লাইব্রেরি ঘরে একা একা যেতে নিষেধ করেছেন। জহির বিরক্তমুখ বলল, যত ফালতু ব্যাপার। যেখানে যেতে ইচ্ছা হয় যাবে। ভূত-প্রেত গল্পের বই ছাড়া অন্য কোথাও নেই। তুমি আবার ভূত বিশ্বাস কর না তো?

অল্প অল্প করি।

এখন থেকে আর করবে না। তবে শোন, রাতের বেলা বাথরুমে যেতে হলে আমাকে ডেকে তুলবে। একা একা যাবার দরকার নেই। আমি দোতলায় বাথরুমের ব্যবস্থা করছি। কালই রাজমিস্ত্রী লাগাব।

সত্যি সত্যি ভোর হতেই রাজমিস্ত্রী চলে এল। বকুলের শাশুড়ি মুখ কালো করে ফেললেন। এত টাকা খরচ করে বাথরুম বানানোর তার কোনো ইচ্ছা নেই। দিন তো চলে যাচ্ছে। ওদের দোতলায় অসুবিধা হলে একতলায় চলে এলেই পারে। ঘর তো সব খালিই পড়ে থাকে।

মা এবং পুত্রের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই হয়ে গেল। এ জাতীয় লড়াই বকুল আগে দেখেনি। সে কী করবে বুঝতে পারল না। শাশুড়ি তার ঘরে শুয়ে কাঁদছেন। জহির চায়ের কাপ হাতে রাজমিস্ত্রীদের কাজের তদারক করছে হাসিমুখে। বকুল শুকনো মুখে একবার যাচ্ছে শাশুড়ির কাছে একবার আসছে জহিরের কাছে।

বাড়িতে আর লোকজন বলতে দুটি কাজের মেয়ে এবং শমসের নামের একজন গোমস্তা ধরনের মানুষ। যার একমাত্র কাজ হচ্ছে বাজার করে এনে রোদে পিঠ মেলে বসে থাকা। বিয়ে উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন যা এসেছিল তারা একদিন পরই বিদেয় হয়েছে। বকুলের শাশুড়ির তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ঝগড়া হয়েছে। ঝগড়ার কারণ হচ্ছে বিয়েতে দেয়া উপহার।

তিনি বকুলের চাচি শাশুড়িকে সবার সামনেই বললেন, দশটা না পাঁচটা না একটামাত্র ছেলে আমার। তার বৌয়ের জন্যে যে শাড়ি আনলেন সেই শাড়ি তো আমার কাজের মেয়েও পরে না। আমার একটা ইজ্জত নেই। ছেলের বৌয়ের কাছে আমার মুখ ছোট হল না? আপনি দু'মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন। এদের প্রত্যেকের বিয়েতে আমি সোনা দিয়েছি। দেইনি? আমার ছেলে কী নদীর পানিতে ভেসে এসেছে?

কঠিন কঠিন কথা খুব সহজ মুখে বলে যাচ্ছেন। রোগা ফর্সা ও সুন্দর মহিলাটি কাঁদতে লাগলেন। কী অস্বস্তিকর অবস্থা।

পাঁচ দিনের মাথায় বাবু এসে উপস্থিত। একা একা চলে এসেছে। হাতে নতুন কেনা স্যুটকেস। বকুলের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিস্ময় এবং আনন্দ। তার ইচ্ছা করছিল ছুটে গিয়ে বাবুকে জড়িয়ে ধরে খানিকক্ষণ খুব কাঁদে। কিন্তু তা সম্ভব নয়। শাশুড়ি বাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। জহির দোতলা থেকে নেমে এসেছে।

বাবুর শোবার জায়গা হল একতলায়। বকুল অবাক হয়ে লক্ষ্য করল বাবুর ঘর গোছগাছ করে দেবার জন্যে জহির নিজেই উদ্যোগী হয়েছে। বকুল এটা ঠিক আশা করেনি। তার কেন জানি মনে হচ্ছিল জহিরের এখন আর তার বা তার পরিবারের কারোর প্রতি কোন আগ্রহ নেই। রাতের বেলা বকুলকে খানিকক্ষণ কাছে পেলেই তার হবে। সমস্ত ভালবাসাবাসি রাতের খানিকক্ষণ সময়ের জন্যে। সে ভেবে পাচ্ছে না এই ব্যাপারটি শুধু কী তার ক্ষেত্রেই সত্যি না পৃথিবীর সব মেয়েদের বেলাতেও সত্যি।

বকুলের আনন্দের সীমা রইল না যখন জহির বলল, তুমি বরং আজ তোমার ভাইয়ের সঙ্গে ঘুমাও। বকুল তাকিয়ে রইল। জহির বলল, বেচারা একা একা ভয়টয় পেতে পারে। তাছাড়া তোমার নিজেরও ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছা করছে নিশ্চয়ই। রাত জেগে গল্প কর।

আনন্দে বকুলের চোখে পানি এসে গেল। সে কী বলবে বুঝতে পারছে না। তার ইচ্ছা করছে এমন কিছু বলতে যাতে জহির খুব খুশি হয়। কিন্তু তেমন কোনো কথা তার মনে আসছে না। সে শুধু বলল, তোমার অসুবিধা হবে না তো?

অসুবিধা? অসুবিধা হবে কেন?

ঠিকই তো তার অসুবিধা হবে কেন। বকুল কথাটা বলেছে খুব বোকার মতো। জহির বলল, এক কাজ করলে কেমন হয়? বাবুকে এখানে রেখে দেয়া যায় না?

এখানে রেখে দেব?

হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে থাকবে। পড়াশোনা করবে। বিরাট বাড়ি খালি পড়ে আছে। তাছাড়া ও থাকলে তোমার একজন সঙ্গী হবে।

সত্যি বলছ?

সত্যি বলছি মানে?

না মানে তুমি চাও ও এখানে থাকুক?

না চাইলে শুধু শুধু বলব কেন? চাই বলেই তো বলছি। তাছাড়া আমি যখন এখানে থাকব না তুমি তখন খুবই লোনলি হয়ে পড়বে।

বকুল অবাক হয়ে বলল, তুমি এখানে থাকবে না মানে? মা যে বলল, তুমি এখানেই থাকবে।

আমি কি এই মফস্বলে পড়ে থাকব নাকি? কি যে তুমি বল। ঢাকা ছাড়া আমি থাকতে পারি না।

তুমি ঢাকা থাকলে আমিও ঢাকা থাকব।

জহির নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলল, পাগল হয়েছ। মা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন তোমার এখানেই থাকতে হবে।

কেন?

এই শর্তেই মা তোমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে মত দিয়েছেন।

বকুল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। জহির হাসতে হাসতে বলল, মা বড় কঠিন জিনিস। যত দিন যাবে ততই বুঝবে। তুমি শোবার আগে এক জগ পানি এবং একটা গ্লাস দিয়ে যাবে। জহির ঘুমুবার আয়োজন করল।

রাতে বাবুর সঙ্গে তেমন কোন কথাবার্তা হল না। ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে আসছে। তাছাড়া এমনিতেও তার বোধ হয় কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, এই ঘরে ঘুমাতে

হবে না।

বকুল বলল, ঘুমালে কি অসুবিধা?

বাবু তার জবাবে মুখ অন্ধকার করে বসে রইল।

বাসার খবর কি?

একবার তো বললাম বাসার খবর।

মুনা আপা কোন চিঠি দেয়নি?

না দেয়নি। দিলে তো তোমার কাছেই দিতাম। লুকিয়ে রাখতাম নাকি?

চিঠি দিল না কেন?

আমি কী জানি কেন দেয়নি।

বকুল ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল, আমার কথা বোধ হয় সবাই ভুলেটুলে গেছে। বাবু চুপ করে রইল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে সে বকুলের এই কথা সমর্থন করছে। বকুল বলল, তোর মাথাব্যথা এখনো হয়?

হয়।

এখন হচ্ছে?

না।

হলে বলিস। তোর দুলাভাইয়ের কাছ থেকে ওষুধ এনে দেব।

আমার কোন অষুধ-টুষুদ লাগবে না।

বাবু চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে ফেলল। বকুল নরম গলায় বলল, তুই আমার সঙ্গে কথা বল বাবু। এর রকম করছিস কেন? তুই এসেছিস আমার এত ভাল লাগছে।

বাবু মুখের ওপর থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল। বকুল হঠাৎ বলে ফেলল, আমি এখানে খুব কষ্টে আছি রে বাবু। আমার কিচ্ছু ভাল লাগে না ; মরে যেতে ইচ্ছা করে।

কেন?

তাও জানি না।

বিয়ে করার জন্যে তুমি তো পাগল হয়েছিলে।

বকুল চুপ করে রইল। অনেক রাত পর্যন্ত তার ঘুম এল না। একবার ইচ্ছে করল জহিরের কাছে ফিরে যেতে। এই ইচ্ছেটা কেন হল তাও সে ঠিক ধরতে পারল না। সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অর্থহীন সব চিন্তা-ভাবনা আসৃছে মাথায়। বাইরে কাক ডাকছে। কাকের ডাকের সঙ্গে নানান রকম পাখ-পাখালির ডাকও কানে আসছে। ভোর হয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। ঘুমহীন রাত একটি কেটে গেল। তার কেন যেন মনে হল এ রকম নিদ্রাহীন রজনী আরো অনেক আসবে তার জীবনে। সে খানিকক্ষণ কাঁদল। এই কান্নাও কেমন অন্য রকম। আগে কাঁদলে মন হালকা হয়ে যেত। ভাল লাগত। এখন লাগছে না। মন ভারী হয়ে যাচ্ছে। বিয়ে কি মানুষকে এমন ভাবে বদলে দেয়?

টিনা ভাবী বিয়ে নিয়ে কত গল্প করেছে। এ রকমও যে হয় তা তো কখনো বলেনি। এটি সে লুকিয়ে রাখল কেন? নাকি সবার জীবনে এ রকম হয় না? বেছে বেছে বকুলদের মতো মেয়েদের বেলাতেই এ রকম হয়? বকুলের ধারণা হল সে নিশ্চয়ই খুব খারাপ মেয়ে। খারাপ মেয়েদের এ রকম শাস্তি হয়। হওয়াই উচিত।

ভোরবেলা এক কাণ্ড হল। জহির এসে বলল, এই বাবু ঘোড়ায় চড়বে?

বাবু অবাক হয়ে বলল, ঘোড়া পাবেন কোথায়?

কোথায় পাব সেটা আমি দেখব। তুমি চড়বে কি না বল?

না চড়ব না।

দারুণ ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আমরা ছোটবেলায় চড়তাম। একটা বেতো ঘোড়া আছে। নড়েচড়ে না।

বাবু হাসিমুখে বলল, আপনার ছোটবেলার ঘোড়া সেটা কি আর এখনো আছে? মরে ভূত হয়ে গেছে।

তাও তো কথা। দাঁড়াও খোঁজ নিয়ে দেখি। এসব জায়গায় ঘোড়া পাওয়া যায়। শীতের সময় ঘোড়ার পিঠে করে ভাটী অঞ্চলে মাল যায়। আধমরা ঘোড়া। চড়তে খুব আরাম। লাফ-ঝাঁপ নেই।

বকুল অবাক হয়ে দেখল সত্যি সত্যি দুপুর নাগাদ এক ঘোড়া উপস্থিত। দাড়িওয়ালা এক

বুড়ো ঘোড়ার দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছে। বাবু ঘোড়ার পিঠে বসে আছে। মুখ ভর্তি হাসি। বাবুর মুখে এমন হাসি বকুল আগে দেখেনি। বকুলের মনে হল, জহির বাবুকে মুগ্ধ করতে চেষ্টা করছে। মাকড়সার সূক্ষ্ম জালের মতো জাল। চোখে দেখা যায় না। কিন্তু আটকা পড়ে যেতে হয়। একবার আটকা পড়ে গেলে বেরুবার পথ থাকে না।

৩০

পুলিশের হাঙ্গামায় বাকের এর আগেও দু'বার পড়েছে। প্রথমবার ভয় ভয় করছিল। জিপে করে থানায় যাবার সময় তার বুক কাঁপছিল এবং প্রচণ্ড রকম পিপাসা বোধ হচ্ছিল। থানায় পৌঁছে অবশ্যি ভয়টা কেটে গেল। ওসি সাহেব চমৎকার ব্যবহার করলেন। এমন ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলেন যেন বাকের তাঁর দীর্ঘদিনের চেনা মানুষ। চা-সিগারেট খাওয়ালেন। ঘণ্টা দু'এক পর বললেন, আচ্ছা ভাই যান।

কেনই বা তাকে এনেছিল কেনই বা ছেড়ে দিয়েছিল তা বাকের জানতে পারেনি। জানার চেষ্টাও করেনি। ইয়াদ অবিশ্যি খুব ছোটাছুটি করেছে। নানান জায়গায় টেলিফোন করেছে। সেই সব টেলিফোনের একটি ভূমিকাও হয়ত আছে। থানার সেকেন্ড অফিসার বাকেরকে নামিয়ে দিতে জিপ নিয়ে এলেন। লোকটির বয়স অল্প। বয়সের তুলনায় চেহারা বেশ কঠিন। কথা বলে খ্যাসখ্যাসে গলায়। কিন্তু লোকটিকে বাকেরের পছন্দ হয়েছিল। সে জিপে আসতে আসতে বলল, সব সময় মাস্তানরা কি করে জানেন? ক্ষমতায় যে দল থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তাদের টিকে থাকার স্বার্থেই তারা তা করে। ক্ষমতাসীন দলের ওদের দরকার। ওদেরও সরকারি সাপোর্ট দরকার। মাঝখান থেকে আমরা বসে বসে কলা চুষি।

বাকের বলল, সরকারি দলের সাথে আমার কোন সর্ম্পক নেই।

সেকেন্ড অফিসার সেই কথার তেমন কোন গুরুত্ব দিল না।

বিরসমুখে সিগারেট টানতে লাগল। সস্তা সিগারেট। গন্ধে মাথা ধরে গেল বাকেরের। পুলিশের অফিসারও যে সস্তা সিগারেট খায় তা বাকেরের জানা ছিল না। সে সেপাইদের হাতেও ফাইভ ফাইভের প্যাকেট দেখেছে।

দ্বিতীয়বার পুলিশ হাঙ্গামা হল মইনুদ্দীন বেপারী নামের এক লোকের জন্যে। সে বাকের এবং ইয়াদের নামে কেইস করে দিল। দোকানের ক্ষতিসাধন ও লুণ্ঠন। অভিযোগও গুরুতর। মইনুদ্দীনের কোমরে জোর ছিল। তার এক খালাতো ভাই প্রতিমন্ত্রী। কাজেই পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল বাকের এবং ইয়াদকে। সেবার পাঁচ ঘণ্টার মতো থাকতে হল থানায়। এই পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কে বা কারা যেন মইনুদ্দীন বেপারীর দোকানে আগুন লাগিয়ে দিল। পাঁচ ছ' লাখ টাকার জিনিস নিমিষে উধাও। দিনদুপুরে তিনটা বোমা ফাটল মইনুদ্দীন সাহেবের বাড়ির সামনে।

বাকের ছাড়া পেয়ে আসামাত্র মইনুদ্দীন সাহেব কাঁদো কাঁদো মুখে দেখা করতে এলেন। জড়িত গলায় বললেন— একটা মিস আন্ডারস্টেনডিং হয়ে গেছে। অন্যের পরামর্শে পড়ে এই ব্যাপার। এখন আপনি যদি জিনিসটা ক্ষমার চোখে না দেখেন তাহলে তো মুশকিল। আপনি আমার ছোট ভাইয়ের মতো। বড় ভাই যদি না বুঝে একটা কাজ করে...

জিপে করে পুলিশের কাছে যাওয়াটাই এক সময় একটি আনন্দের ব্যাপার ছিল। লোকজন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। নেতা নেতা একটি ভাব হচ্ছে মনে।

কিন্তু আজ সে রকম মনে হচ্ছে না। বাকেরের মনে হল এবারের ব্যাপারটা অন্যরকম। কারণ থানার ওসি এক পর্যায়ে তাকে বলল, এইবার আপনার তেল কমাব।

একটা থানার ওসি তার সঙ্গে এই ভাবে কথা বলবে কেন?

রহস্যটা কোথায়? এই লোকই তো আগের দু'বার তাকে ভাই বলেছে। চা এবং গরম ডালপুরী এনে খাইয়েছে। ফেরত পাঠিয়েছে পুলিশের জিপে।

আজ সে তিন ঘণ্টা যাবত কাঠের একটা বেঞ্চিতে বসে আছে। ওসির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে তাকে চিনতেই পারছে না। একটা লোককে ধরে নিয়ে এসেছে এ নিয়ে কারোর কোনো মাথাব্যাথা নেই। ওসি সাহেব বিয়ে বাড়ির এক লম্বা-চওড়া গল্প ফেঁদেছেন। সবাই আগ্রহ করে গল্প শুনছে। সেতাবগঞ্জে বরযাত্রী যাবে ভুলে গিয়ে উঠেছে নবীগঞ্জে। সেখানেও এক মেয়ের বিয়ে। সাজানো বাড়ি দেখে সবাই গিয়ে বর নিয়ে উঠল। মাইকে গান-টান বাজছে। কনে পরীয়রে মধ্যে

কানাঘুঁষা হচ্ছে। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। অচেনা বর, অচেনা লোকজন। দীর্ঘ গল্প। শেষই হতে চায় না। যারা শুনছে তারা হেসে গড়িয়ে পড়ছে। উৎসহ পেয়ে ওসি সাহেব রসাল জায়গাগুলি দ্বিতীয়বার করে বলতে লাগলেন। বাকেরের মনে হল এই গল্প শেষ হবা মাত্র দ্বিতীয় একটি গল্প শুরু হবে। সে শুকনো মুখে বলল, এক গ্লাস পানি খাব।

ওসি সাহেব বললেন, পানি খেলেই পেচ্ছাব পেয়ে যাবে। চুপচাপ বসে থাকেন। ঠাণ্ডার দিনের এত কিসের পানি খাওয়া-খাওয়ি?

এতেই হাসির স্রোত বয়ে গেল। বাকেরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। দুপুর একটা পর্যন্ত বাকের একই জায়গায় বসে রইল। একটা সময় ওসি সাহেব বললেন, ওকে হাজতে ঢুকিয়ে দিন।

বাকের বলল, কী ব্যাপার আমাকে বলুন?

ওসি সাহেব বললেন, সময় হলে সবই শুনবেন। সময় হয় নাই। এখনো বাকি আছে।

এই কথাতেও একটি হাসির স্রোত বইল। এ থানার ওসি সাহেব যে একজন রসিক ব্যক্তি সে পচিয় বাকের এর আগে পায়নি। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষের বিভিন্ন পরিচয় পাওয়া যায়।

হাজতে ছোট্ট ঘরটায় ন'জন হাজতি। এর মধ্যে একজন অসুস্থ। সে বিকট শব্দে বমি করছে। বমির চাপে চোখ উল্টে আসছে। কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। সবার চোখের দৃষ্টিতে এক ধরনের উদাস ভাব।

দরজার পাশে সেন্ট্রি পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। চোখে-মুখে রাজ্যের নির্লিপ্ততা। বমি করার ব্যাপারটি সে দেখছে কিন্তু সে দৃশ্য তার মনে কোনো ছাপ ফেলছে না। বাকের বলল, ভাই এসব পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করুন। লোকটাকে একটা ডাক্তার দেখান।

পুলিশটি কোনো শব্দ করল না। বাকের দ্বিতীয়বার বলল, কি ব্যাপার ভাই? কিছু করুন।

সন্ধ্যাবেলা জমাদার আসবে তখন পরিষ্কার হবে।

লোকটাকে এক গ্লাস পানি এনে দিন।

পুলিশটি বড় একটি টিনের মগে এক মগ পানি এনে দিল।

বাকেরের ধারণা ছিল সন্ধ্যার আগেই অনেকে আসবে তার কাছে।

তার ভাই হয়ত আসবে না কিন্তু লোক পাঠাবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হবে কষ্ট করে।

ঘরে বমির কুৎসিত গন্ধ। সবাই নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বসে আছে। টাক মাথার গোঁফওয়ালা একটি লোক বলল, বড় ভাই আপনার কাছে সিগারেট আছে?

বাকের বলল, না।

টাকা তো আছে। সেন্ট্রিকে দেন সিগারেট এনে দিবে। ওকে পাঁচটা টাকা দিতে হবে। আমার কাছে দেন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বাকের একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে দিল। টাক মাথার লোকটি বলল, আরো পাঁচটা টাকা দেন তাহলে ভাল কম্বল পাবেন। নয়, এমন কম্বল দিবে ঘুমাতে পারবেন না।

আপনি কতদিন ধরে আছেন এখানে?

তের মাস।

তের মাস? বলেন কি?

এতদিন হাজতে রাখার কোনো নিয়ম নাই। কোর্টে নিতে হয়। জামিন দিতে হয়, জামিন না হলে জেলখানায় হাজত আছে। কিন্তু

কিন্তু কি?

না কিছু না।

দুইটা খুন করেছি। টাকা খেয়ে করেছি। যাদের টাকা খেয়ে করেছি তারাই ধরিয়ে দিয়েছে। বড় ভাই, গোটা দশেক টাকা ধার দিতে পারেন? আমার ছেলে টাকা নিয়ে এলেই পেয়ে যাবেন।

আপনার নাম কি?

আমার নাম কবীর উদ্দিন। বাড়ি হচ্ছে গিয়ে মুন্সিগঞ্জ। মুন্সিগঞ্জ গিয়েছেন কখনো?

না।

ভালই করেছেন না গিয়ে। যাওয়ার মতো জায়গা না। আমি নিজেই যাই না।

বাকের মানিব্যাগ খুলে দশটি টাকা দিল। ব্যাগে আরো ত্রিশ টাকার মত আছে। তার জন্য যথেষ্ট। সন্ধ্যার আগেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

সন্ধ্যার আগে কোন ব্যবস্থা হল না। কেউ এল না বাকেরের কাছে। অসুস্থ লোকটি বিকট শব্দে বমি করতে লাগল মাঝরাতে। বাকের ভেবেছিল এখানেই মরে পড়ে থাকবে। তা অবশ্যি হল না। ওসি সাহেব এসে তাকে হাসাপাতালে পাঠালেন। হাজতঘরে কোনো বাতি নেই। বাতির দরকারও নেই। বারান্দার আলো এসে পড়ছে। এতেই দেখা যাচ্ছে। তবু ওসি সাহেব কি মনে করে যেন পাঁচ ব্যাটারির টর্চলাইট সবার মুখের ওপর কিছুক্ষণ করে ধরতে লাগলেন। বাকেরের মুখের ওপর তাও অনেকক্ষণ ধরা রইল।

এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার যে হাসান সাহেব বাকেরের গ্রেফতার হবার খবর পেলেন দেড় দিন পর। তাও পত্রিকার মাধ্যমে। ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। কোন খবরই তিনি দু'বার পড়েন না। এটিও পড়লেন না। যদিও তাঁর মন বলতে লাগল এ খবরটা আবার পড়া উচিত। এবং কিছু করলেন না। এগারটা বাজার আগেই বাসায় চলে এলেন। অফিসে তাঁর কিছুই করার ছিল না।

সেলিনা অসময়ে তাঁকে ফিরতে দেখে মোটেই অবাক হলেন না। যেন তিনি জানতেন হাসান সাহেব অসময়ে ফিরবেন। এবং এ জন্যেই যেন সেজেগুজে অপেক্ষা করছিলেন। সেলিনা বললেন, তুমি কি আট ঘণ্টার নোটিসে চিটাগাং যেতে পারবে?

কেন?

পারবে কিনা আগে বল।

না পারার তো কোনো কারণ দেখি না।

তানিয়ার বিয়ে। এখন আবার বলে বোস না যে তুমি তানিয়াকে চেন না। চেন তো?

হ্যাঁ চিনি। তোমার খালাতো বোন।

না হয়নি। আমার ফুফাতো বোন। হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমাকে টেলিফোনে বলল। আমি বলে দিয়েছি যে ভাবেই হোক তোমাকে নিয়ে আমি কাল সকালে চিটাগাং উপস্থিত হব।

হাসান সাহেব কিছু বললেন না। সেলিনা বললেন, কথা বলছ না কেন?

কি বলব?

যেতে পারবে কিনা? বিয়েটা সেরে সেই রাতেই না হয় ফিরে আসব। রাত দশটায় ট্রেন আছে। আমি টিকিট কাটতে পাঠিয়েছি। অনেক দিন ট্রেনে চড়া হয় না? তোমার ট্রেনে চড়তে ইচ্ছা করে না?

করে।

তুমি যে প্রায়টা একটা কবিতা বলতে 'কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম। রজনী নিঝুম।'

হ্যাঁ বলতাম।

রাতের ট্রেনে জাস্ট আমরা দুজন। ইন্টারেস্টিং হবে না? আমার তো মনে হয় খুব ফান হবে।

হবে হয় তো।

আমি তোমার স্যুটকেস গুছিয়ে রেখেছি।

কাজ তো তাহলে অনেক দূর এগিয়ে রেখেছ।

হ্যাঁ তা রেখেছি।

ট্রেন ছাড়ল রাত দশটায়। হাসান সাহেবের বেশ ভালই লাগছে। কামরায় গাড়ি ভরা ঘুম রজনী নিঝুম। কবিতাটি বারবার মাথায় ঘুরছে। দু'জন মাত্র প্রাণী এ কামরায়। তাদের কেউ ঘুমুচ্ছে না। তবু এই কবিতার চরণটিই মাথায় আটকে গেল কেন? সেলিনা কি সব যেন বলছে। কিছুই মাথায় ঢুকছে না। কিন্তু শুনতে ভাল লাগছে। সেলিনার গলার স্বর চমৎকার।

এ্যাই তুমি কথা বলছ না কেন?

শুনছি। দুজনে কথা বললে কে শুনবে?

বাকেরের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করেছ?

হাসান সাহেব বললেন, তুমি জানতে?

জানব না কেন?

কবে জানলে?

যেদিন ধরে নিয়ে গেল সেদিনই। তুমি অফিসে চলে গেলে। একটা ছেলে এসে আমাকে বলল।

আমাকে তো কিছু বলছিন। আমি জানলাম খবরের কাগজ পড়ে।

সেলিনা চুপ করে রইলেন। হাসান সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, আমাকে জানানো উচিত ছিল।

আমার জানাতে ইচ্ছা করেনি।

হাসান সাহেব আবার চুপ করে গেলেন। ট্রেন চলছে দ্রুতগতিতে। ঝিকঝিক শব্দ হচ্ছে। ছোটবেলায় এই শব্দে কত রকম গান মিশে যেত। এখন যাচ্ছে না। শুধু রজনী নিঝুম কথাটা এসে মিশেছে।

সেলিনা বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছ?

না।

বাকেরকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ওর বন্ধু-বান্ধবরা ওকে ছাড়িয়ে আনবে।

আমি বাকেরকে নিয়ে ভাবছি না।

কি ভাবছ তাহলে?

নিজের কথা ভাবছি।

কোর্টে বাকেরের জামিন হল না। তার বিরুদ্ধে চারশত আটচল্লিশ এবং উনিশ অবলিকের এফ ধারায় দুটি অভিযোগ। এই দু'টি অভিযোগই জামিনযোগ্য নয়। কোর্টে থেকে পুলিশ রিমান্ডে উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে আরো জিজ্ঞাসাবাদ করা। তার সহযোগী অপরাধীদের সম্পর্কে তথ্যাদি নেয়া। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে রকম কিছু হল না। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপরার পুলিশের কোন রকম আগ্রহ দেখা গেল না। এরমধ্যে ইয়াদ এল তাকে দেখতে। স্যুট-টুট পরা ভদ্রলোক। চুলের স্টাইল বদলে ফেলেছে কিংবা কিছু একটা করেছে। তাকে চেনা যাচ্ছে না। সে চোখ কপালে তুলে বলল, অবস্থা কি?

অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছিস।

হেভি পিটন দিয়েছে মনে হয়। মুখ ফোলা।

মারধর করেনি। মশার কামড়ে মুখ ফুলেছে।

মশারি দেয় না।

বাকের উত্তর দিল না তার প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে গারদের ফাঁক দিয়ে হাত বের করে প্রচণ্ড একটি চড় কষিয়ে দিতে। সে দাঁতে দাঁত চেপে মনে মনে বলল, হারামজাদা।

আমি খবর পেয়েছি পরশু বুঝলি। খবর শুনে আমার মাথায় থান্ডার এসে পড়ল। বিনামেঘে বজ্রাঘাত। আমি ভাবলাম ব্যাপারটা কি। কোন ঝামেলায় জড়ালি। নে সিগারেট নে।

বাকের সিগারেট নিল। টাক মাথার কবীর উদ্দিন বলল, স্যার আমারে একটা দেন। আমি বাকের সাহেবের খোঁজখবর করছি।

ইয়াদ সিগারেটের প্যাকেট বাকেরের দিকে এগিয়ে দিল। রাজা মহারাজাদের মতো ভঙ্গি করে বলল, রেখে দে তোর কাছে। আর শোন কোনরকম চিন্তা করবি না। আমি আমার শ্বশুর সাহেবকে বলছি। সে কানেকশনওয়ালা আদমি। দুই তিনটা টেলিফোন করলেই দেখবি জামিন হয়ে গেছে। তোর ভাই কিছু করছে?

জানি না।

বোধ হয় কিছু করছে না। শুনলাম তার চাকরি নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।

কি সমস্যা?

তা জানি না। বাংলাদেশে কি সমস্যার শেষ আছে নাকি? হা হা হা।

বাকের পেট কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। এর মধ্যে তার একটা নাদুস নুদুস ভুঁড়িও হয়েছে। দেখলেই হাত বুলাতে ইচ্ছা করে।

বাকের।

বল।

আমার একটা নিউজ আছে। শ্রীলংকা যাচ্ছি।

তাই নাকি?

হুঁ, আমার এক মামাশ্বশুর ম্যানেজ করে দিলেন। ব্যবসার ব্যাপার। ওখান থেকে নারকেল তেল আনব।

ভাল।

আমার বউও সঙ্গে যেতে চাচ্ছে বুঝলি। দিনরাত ঘ্যান ঘ্যান করছে।

নিয়ে যা।

মেয়েছেলে কোথাও সঙ্গে নিতে আছে? ঐ যে কি যেন বলে... "পথে নারী বিবর্জিতা"। আমিও

চেষ্টা করছি। কিছু লাভ হবে না। এঁটেল মাটির মতো লেগে গেছে।

বাকের চুপ করে রইল। ইয়াদ তার সিগারেট শেষ করে উঠে থু করে একদলা থুথু ফেলল। চোখ মুখ কুঁচকে বলল, বড় গান্ধা জায়গা, বমি এসে যাচ্ছে। তুই কোন চিন্তা করিস না। চিব্বশ ঘণ্টার মধ্যে ছুটিয়ে নিয়ে যাব। কাউকে কোন খবর টবর দিতে হবে?

না। তুই যাচ্ছিস?

হুঁ।

কবীর উদ্দীন বলল, স্যার আপনি বাকের সাহেবকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে যান। উনার হাতে একটা পয়সা নাই।

ইয়াদ আশ্চর্য হয়ে মানিব্যাগ বের করল। দুইটি একশ টাকার নেট এবং কিছু খুচরা ছিল। একশ টাকার দুটি নোটই এগিয়ে দিল। বাকের টাকা নেবার ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখাল না। হাত বাড়াল কবীর উদ্দীন। মুখ ভর্তি হাসি দিয়ে বলল, যাবার আগে ওসি সাহেবকে একটু স্যার বলবেন আমাদের দেখাশোনার জন্যে। একটা এক্সট্রা কম্বল পেলে স্যার খুব ভাল হয়।

সাত দিনের পুলিশ রিমান্ডের সময়সীমা শেষ। কিন্তু পুলিশ আরো সাত দিনের সময় চাইল। কোর্ট সময় মঞ্জুর করল। বাকের পুরনো হাজতঘরে ফিরে এল। কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে এল না। প্রথম সাতদিন পার করতে যতটা খারাপ লাগছিল। দ্বিতীয় সাতদিনে ততটা খারাপ লাগল না। কারণ কবীর উদ্দীন কী ভাবে যেন গাঁজার ব্যবস্থা করে ফেলেছে। গাঁজাটা বেশ ভাল জিনিস। টানার জন্যে কলকে লাগে না। সিগারেটের তামাক ফেলে দিয়ে তার ভেতর গাঁজা ভরে চমৎকার টানা যায়। ভালই লাগে।

প্রথম খানিকক্ষণ মন খুব কোমল হয়ে যায়। কাঁদতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে খুব ভাল ভাল কাজ করতে। মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিতে। সেই কোমল ভাবটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। খানিকক্ষণের মধ্যেই জগৎ-সংসার সম্পর্কে একটি বৈরাগ্য এসে পড়ে। এই বৈরাগ্যের ভাব সাধারাণত দীর্ঘস্থায়ী হয়। সবচে বড় কথা রাতের ঘুমটা ভাল হয়। এক ঘুমে রাত কাভার। ঢং ঢং করে এরা যে ঘণ্টা পিটে সেই শব্দও কানে যায় না।

অন্যান্য হাজতিদের সম্পর্কে প্রথমদিকে তার খানিকটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। এখন সেটা নেই। সবার সঙ্গেই তার এখন ভাল সম্পর্ক। মতিলাল নামে একজন হাজতি ছাড়া পেয়ে চলে যাবার দিন বাকেরের বুক হু-হু করতে লাগল। আর মতিলাল হারামজাদাও এমন গরু, ছাড়া পেয়েছিস বগল বাজাতে বাঁজাতে চলে যা, তা না সবাইকে জড়িয়ে ধরে আকাশ-পাতাল কান্না। এই ভাবে কাঁদলে অন্যদের চোখে পানি আসবেই। বাকেরের গাল ভার হয়ে গেল। চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। বহু চেষ্টায় গলার স্বর কর্কশ করে সে বলল, কী এত দেরি করছেন? বাড়ি চলে যান। আর এত কাঁদছেন কেন? মেয়েছেলে নাকি? চোখ মুছেন রে ভাই!

## ৩১

জাহানারা অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার?

মামুন হাসিমুখে বলল, কোন ব্যাপার না এমনি এসেছি। এদিকে একটা কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম এসেছি যখন দেখে যাই কেমন আছেন।

ভালই আছি।

করছেন কি?

দেখতেই পাচ্ছেন ফাইল নিয়ে বসে আছ।

জাহানারার ঠোঁট বিরক্তিতে বেঁকে গেল। মামুন অবাক হয়ে মুনার সঙ্গে জাহানারার অদ্ভুত একটা মিল খুঁজে পেল। মুনাও মাঝে মাঝে বিরক্তিতে ঠোঁট বাঁকাত। ঠিক এই ভঙ্গিতে বাঁকাত। মামুন বলল, লোন স্যাংশন হয়ে গেছে সেই খবরটাও দিতে এলাম।

পুরনো খবর আগেই একবার দিয়েছেন।

ও আচ্ছা।

মামুন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। তার উঠে যাওয়া উচিত কিন্তু উঠতে ইচ্ছা করছে না। বসে থাকতে ভাল লাগছে।

আপনি বাড়ি খুঁজে পেয়েছেন?

না।

এখনো খুঁজছেন? না খোঁজা বন্ধ করে দিয়েছেন?

খুঁজছি। আপনি কী চা খাবেন?

জি খাব।

জাহানারা নিজে উঠে গিয়ে চায়ের কথা বলে এল। মামুন লক্ষ্য করল শুধু চা নয়, চায়ের সঙ্গে বিসকিট দেবার কথাও বলছে। এবং ফিরে এসে বসেছে হাসিমুখে। আগের বিরক্তির লেশমাত্র নেই।

আপনি কি এখনো শ্মশানে বেড়াতে যান?

না যাই না। আপনার কথার পর ভয়ে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি।

বিকালে কি করেন—ঘরেই বসে থাকেন?

হুঁ। বসে থাকা ছাড়া আর কি করব। গল্পের বই পড়ি। আপনার কাছে গল্পের বই আছে?

আছে। কাল নিয়ে আসব। অনেক আছে।

বলেই মামুন একটু চমকাল। কারণ গল্পের বই তার কাছে নেই। খুঁজলে-টুজলে এক-আধটা পাওয়া যেতে পারে কিন্তু অনেক বই আছে এটা পুরো মিথ্যা। এত বড় একটা মিথ্যা কথা সে কেন বলল। এই মেয়েটার আচার-আচরণ অনেকটা মুনার মতো সেই কারণেই কী?

জাহানারা বলল, কালই আপনাকে বই নিয়ে আসতে হবে না। পরের বার যখন এদিকে আসবেন নিয়ে আসবেন।

আচ্ছ ঠিক আছে।

আপনার কাজকর্ম কেমন এগুচ্ছে?

কোন কাজকর্মের কথা বলছেন?

ব্যাংক থেকে লোন নিয়েছেন যে কাজকর্মের জন্যে। আমাদের তো রিপোর্ট করতে হবে।

কাজ চলছে পুরোদমে। জিনিসপত্র আনতে ঢাকা যাব।

জাহানারা কৌতূহলী হয়ে তাকাল।

কবে যাবেন?

এখনও ঠিক করিনি শিগগিরই যাব। আপনার কোন খবর থাকলে দিবেন আমি পৌছে দেব।

কাকে পৌছে দেবেন?

আপনার মাকে। তাঁরা তো ঢাকাতেই থাকেন তাই না?

আমার কোন খবর নেই।

কোন জিনিসপত্র দিতে চাইলে দিতে পারেন। কোন রকম সংকোচ করবেন না। এখানে মোক্তার পাটি বলে এক রকম পাটি পাওয়া যায়। মোক্তা গাছের ছাল দিয়ে তৈরি ভাল জিনিস। আমি যোগাড় করে দেব।

আপনাকে কিচ্ছু জোগাড় করতে হবে না। আমি কোন কিছু পাঠাতে চাই না।

আপনার বদলির কী হয়েছে?

হয়নি কিছু।

হেড অফিসে দরখাস্ত করেছিলেন যে তার কী হল?

জানি না। কিছু হয়নি নিশ্চয়ই। হলে কি আর এখানে পড়ে থাকতাম? নিন চা খান।

চা খাবার পরও মামুন ঘণ্টা খানিক বসে রইল। সে বুঝতে পারছিল জাহানারা বিরক্ত হচ্ছে। কিন্তু তার উঠতে ইচ্ছা করছে না। জাহানারা একবার বলেই ফেলল, চলে যান কেন শুধু শুধু বসে আছেন? এই যাচ্ছি বলেও মামুন বসে রইল। জাহানারা চশমা পরে মাথা নিচু করে কাজ করছে। চশমা নাকের ডগার দিকে অনেকটা নেমে এসেছে। সুন্দর লাগছে দেখতে। এই মেয়েটির চোখ দুটি সুন্দর। কিন্তু চশমার জন্যে সুন্দর চোখ আড়ালে পড়ে থাকে। যে ভদ্রলোক এই মেয়েটিকে বিয়ে করবে সে হয়ত বুঝতেও পারবে না তার স্ত্রীর চোখ কত সুন্দর।

আজ তাহলে যাই?

আরেক কাপ চা খেতে চাইলে খেতে পারেন।

মামুন উঠে দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল। ইতস্তত করে বলল, আরেক কাপ চা অবশ্যি খাওয়া যায়। জাহানারা হেসে ফেলল।

হাসছেন কেন?

এমনি হাসছি। আপনি আরাম করে বসুন। আমি চায়ের কথা বলে আসি।

মামুন ঠিক আরাম করে বসতে পারল না। ম্যানেজার তার ঘর থেকে আড়চোখে বারবার তাকাচ্ছে। তার চোখে-মুখে এই বিরক্তির কারণটি কী? একজন মহিলা কর্মচারীর সামনে বসে কাজের ক্ষতি করছে এইটিই কী বিরক্তির কারণ?

গল্পের বই খুঁজতে গিয়ে মামুন বাড়ি চষে ফেলল, কিছুই নেই। পুরনো কিছু মাসিক পত্রিকা পাওয়া গেল নাম-সোনার দেশ, উইপোকা সে সব ঝাঁঝড়া করে ফেলেছে। মার ঘরে পাওয়া গেল হযরত আলীর জীবনী এবং তপসী রাবেয়া। হযরত আলীকে ইউপোকা কাবু করতে পারেনি কিন্তু তাপসী রাবেয়াকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। মামুন নিশ্চয়ই হযরত আলীর জীবনী নিয়ে জাহানারার কাছে যেতে পারে না। অথচ সে বলে এসেছে অনেক বই আছে। এখন যদি গিয়ে বলে কোনো বই নেই তাহলে ব্যাপারটা খুব খারাপ হবে। বানিয়ে কিছু-একটা বললে কেমন হয়?

চোখ কপালে তুলে বলতে পারে, আর বলবেন না সব বই উধাও। কয়েক দিন ছিলাম না এখানে বাড়ি সাফ করে দিয়েছে। ধর্মের কয়েকটা বই ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু কথাটা কি বিশ্বাসযোগ্য হবে? এই অজ জায়গায় লোকজনদের এতটা সাহিত্য প্রীতি থাকার কথা নয়। কিছু বই আনিয়ে নিলে কেমন হয়?

মুনাদের বাড়ি ভর্তি বই। বকুলের বই পড়ার সখ। মুনাকে কতবার দেখেছে বই কিনছে। সেই সব বই বকুল নিশ্চয়ই শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যায়নি।

মামুন রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চিঠি লিখতে বসল। অনেক দিন পর মুনাকে লিখছে। কেমন যেন সংকোচ লাগছে লিখতে। আগে কত সহজে লিখত -প্রিয় মুনা। কিন্তু এখন প্রিয় শব্দটি পর মনে হল শব্দটা মানাচ্ছে না। কিন্তু শুধু মুনা দিয়ে চিঠি শুরু করতে ইচ্ছা করছে না। দু'এক লাইনে চিঠি শেষ করবে ঠিক করেও দীর্ঘ চিঠি লিখে ফেলল।

প্রিয় মুনা,

একটি বিশেষ প্রয়োজনে লিখছি। চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি আমাকে গোটা দশেক ভাল গল্প-উপন্যাস ভিপি করে পাঠিয়ে দিবে। তোমার অফিসের কোন বেয়ারাকে বললেই সে ভিপি করে দেবে। আমার অত্যন্ত প্রয়োজন। একা থাকি তো কিছুই করার নেই। সন্ধ্যার পর মনে হয় ভূতের বাড়িতে বাস করছি। রাত দশটা পর্যন্ত জেগে থেকে ঘুমুতে যাই। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম এলে বাঁচতাম। তা আসে না। কোনো কোনো দিন বারোটা পর্যন্ত বেজে যায়। গ্রাম দেশে রাত বারোটা ভয়াবহ ব্যাপার। মনে হয় অন্য কোন ভুবনে বাস করছি। গল্পের বই থাকলে সময়টা কাটবে।

মুনা একটু আগে যে কথাটা লিখেছি সেটা ঠিক না। বইগুলি আমার জন্যে নয়। জাহানারা নামের এক মেয়ের জন্য। তোমাকে আমি এক সময় বলেছিলাম যে আমি কোনো দিন তোমার সঙ্গে মিথ্যা কথা বলব না। তবু শুরুতে বলে ফেলেছি। কেন বললাম? কারণ আমার মনের মধ্যে একটা ভয় ছিল তুমি কি না কি মনে কর। যদিও আমি জানি তোমার মধ্যে এইসব ক্ষুদ্র ঈর্ষার কোন ব্যাপার নেই।

এইবার জাহানারার কথা বলি। কৃষি ব্যাংকের সেকেন্ড অফিসার। এখানে একা একা থাকে। তোমার সাথে মিল আছে। তার মধ্যে কঠিন একটা ভাব আছে। যখন বিরক্ত হয় তোমার মতো ঠোঁট বাঁকিয়ে দেয়। তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ মেয়েটিকে নিয়ে এত কথা লিখছি কেন? লিখছি কারণ লেখার কিছু নেই। অথচ আমার ইচ্ছা করছে বিরাট একটা চিঠি লিখতে।

মুনা আমি খুব একা হয়ে পড়েছি। রোজ রাতে ঘুমুতে যাবার সময় খুব মন খারাপ হয়। তুমি ঐ ব্যাপারটা নিজের মনে গেঁথে রেখে নিজে কষ্ট পাচ্ছ, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছ। আমি কতবার তোমাকে বলব আমি ফেরেশতা নই। আর তাছাড়া ফেরেশতারাও মাঝে-মধ্যে ভুল করে। করে না? তুমি কি বলতে পারবে যে এ জীবনে তুমি কোনো ভুল করনি। না তুমি বলতে পারবে না।

আচ্ছা মুনা...

এ পর্যন্ত লিখে মামুন চিঠিটা গোড়া থেকে পড়ল এবং মনে হল চিঠিটা খুব বাজেভাবে লেখা হয়েছে। এই চিঠি পাঠানোর কোনো মানে হয় না। সে চিঠি টুকরো টুকরো করে ফেলল।

জাহানারা অফিসে নেই। ম্যানেজার সাহেব বললেন, উনি আসেননি। আপনার কিছু বলার থাকলে আমাকে বলুন। মামুন বলল, উনার জন্যে একটা বই এনেছিলাম।

আমার কাছে দিয়ে যান পৌঁছে দেব।

উনি আসেননি কেন?

শরীর ভাল নেই। গাল ফুলেছে। বোধ হয় মামস।

বলেন কি? তাহলে তো দেখতে যেতে হয়।

ম্যানেজার বিরক্ত চোখে তাকিয়ে রইল। মামুন বলল, বেচারী বিদেশে অসুখে পড়েছে স্থানীয় মানুষ হিসেবে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে, কী বলেন?

ম্যানেজার সাহেব কিছুই বললেন না।

ডাক্তার দেখছে তো?

হ্যাঁ দেখছে।

মামসের একটা ভাল কবিরাজি চিকিৎসা আছে। ধুঁধুল পাতার রস, বটগাছের শিকড় এবং মধু এই তিনটা একত্রে মিশিয়ে পুলটিস করে দিতে হয়। আমার একবার মামস হয়েছিল। দেওয়া মাত্র আরাম হয়েছে।

তাহলে যান আপনার ওষুধ দিয়ে আসুন। আমার বাসা তো চেনেন। চেনেন না?

হ্যাঁ চিনি।

জাহানারা মামুনকে দেখে মোটেই অবাক হল না। যেন সে জানত সে আসবে। মামুন বলল, আপনাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানেন? মনে হচ্ছে দু'গালে দুটি কমলা লেবু ঢুকিয়ে বসে আছেন। তাকানো যাচ্ছে না।

কই আপনি তো দিব্যি তাকিয়ে আছেন।

বই এনেছি আপনার জন্যে।

কি বই?

হযরত আলীর জীবনী।

জাহানারা তাকিয়ে রইল। মামুন হাসিমুখে বলল, ঐ দিন আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম। বাড়িতে কোনো বই নেই। আমি ঢাকা থেকে নিয়ে আসব।

আপনি বসুন।

মামুন বসল। ছোট্ট একটা ঘর। সুন্দর করে সাজানো। বুক শেলফ ভর্তি বই। জাহানারার হাতেও একটা বই। সে বইয়ের পাতা মুড়তে মুড়তে বলল, বেশিক্ষণ থাকবেন না আপনারও হবে।

হলে হবে। নো প্রবলেম। খাওয়া-দাওয়া কী করছেন?

বার্লি খাচ্ছি। সলিড কিছু গিলতে পারি না। আপনি কী চা খাবেন?

চা দেবে কে?

কে দেবে সেটা আমি দেখব। আপনি খাবেন কি না বলুন।

খাব।

জাহানারা উঠে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল চা নিয়ে।

এত তাড়াতাড়ি কিভাবে করলেন?

আমি করিনি। ভাবী করে দিয়েছেন। আপনি চা খেতে খেতে একটি সত্যি কথা বলবেন?

বলুন কি জানতে চান?

আপনি কেন আসেন আমার কাছে?

মামুন কিছু বলতে পারল না। চায়ে চুমুক দিতে লাগল। জাহানারা শাড়ি দিয়ে ফোলা গাল ঢেকে চুপচাপ বসে আছে। তার বসার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে সে প্রশ্নের জবাব চায়।

বলুন কেন আসেন?

আমি আজ উঠি?

উঠবেন তো বটেই। সারাদিন আমার ঘরে বসে থাকার জন্যে আপনি নিশ্চয়ই আসেননি? কেন আপনি আমার কাছে বারবার আসেন একটা বলে চলে যান।

মুনার সঙ্গে আপনার চেহারার খুব মিল আছে। আচার-আচরণও দুজনের এক রকম। দুজনের প্রকৃতিই খুব কঠিন। আপনার সাথে যখন কথা বলি তখন মনে হয় মুনার সঙ্গেই কথা বলছি। এই

জন্যেই আসি।

মুনা কে?

ওর সঙ্গেই আমার বিয়ের কথা।

বিয়েটা কবে?

ওসব চুকে-বুকে গেছে। বিয়ে হচ্ছে না।

কেন, উনার কী অন্য কোথাও বিয়ে হয়েছে?

না তা হয়নি। ও সে রকম মেয়ে নয়।

এর পরের বার আমি যখন ঢাকা যাব তখন আমাকে উনার ঠিকানা দেবেন। আমি উনাকে বুঝিয়ে বলব।

আপনার ওকালতির কোনো দরকার নেই। আচ্ছা আমি উঠি।

মামুন উঠে দাঁড়াল। জাহানারা বলল, প্লিজ আপনি একটু বসুন। আমার কথায় রাগ করে এ ভাবে চলে গেলে আমার খুব খারাপ লাগবে।

মামুন বসল। দীর্ঘ সময় দুজনের কেউই কোনো কথা বলল না।

## ৩২

শওকত সাহেবের মনে হল কে যেন এসে তাঁর বুকে বসেছে। যে বসেছে সে মানুষ নয়। বিশাল কোন একটি জন্তু যার গায়ে বোটকা গন্ধ। জন্তুটি শুধু বসেই নেই, প্রকাণ্ড থাবা বাড়িয়ে তাঁর গলা চেপে ধরতে চাইছে। তিনি বুঝতে পারছেন গলা চেপে ধরা মানেই মৃত্যু। কাজেই তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন যাতে জন্তুটি তাঁর গলা চেপে ধরতে না পারে। শওকত সাহেবের মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল। তিনি গোঙানির মত শব্দ করতে লাগলেন। ঠিক তখন মুনা ডাকল, মামা দরজা খোল কি হয়েছে? চিৎকার করছে কেন?

শওকত সাহেব চোখ মেললেন। জন্তুটি নেই। স্বপ্নই দেখছিলেন। কিন্তু ঠিক স্বপ্নও বোধ হয় নয়। সমস্ত ঘরময় বোটকা গন্ধ কোত্থেকে এল?

মামা দরজা খোল। কী হয়েছে তোমার?

তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। ঘড়ি দেখলেন দু'টা দশ। অনেকখানি রাত সামনে পড়ে আছে। জেগে বসে কাটাতে হবে। বাকি রাতটা এক ফোঁটা ঘুম আসবে না। তিনি ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন।

স্বপ্ন দেখছিলে নাকি মামা?

হুঁ।

নাও পানি খাও।

শওকত সাহেব পানি খেয়ে বিড়বিড় করে বললেন, তুই কি এই ঘরে কোন বোটকা গন্ধ পাচ্ছিস?

না তো।

আমি পাচ্ছি। ইঁদুর মরে পড়ে থাকেল যে রকম গন্ধ হয় সে রকম গন্ধ।

বলেই শওকত সাহেবের মনে হল এই গন্ধের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর আগে এই জাতীয় গন্ধ ছিল এই ঘরে। এত তীব্র ছিল না কিন্তু ছিল।

মুনা, কোনো রকম গন্ধ পাচ্ছিস না?

উঁহু। তুমি কী বারান্দায় ঠাণ্ডা বাতাসের মধ্যে বসবে?

শওকত সাহেব হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। বারান্দায় ইজিচেয়ারে এসে বসলেন। উঠোনে জ্যোৎস্না হয়েছে। দিনের মতো আলো। ফকফক করছে চারদিক।

মামা, এক গ্লাস গরম দুধ নিয়ে আসি দুধ খাও। ঘুম আসবে।

কিচ্ছু আনতে হবে না। তুই আমার পাশে বসে থাক।

মুনা তার পাশে বসতেই তিনি নরম গলায় বললেন, বেশিদিন বাঁচব না। ডাক এসে গেছে।

মুনা তরল গলায় বলল, এটা তো তুমি গত পাঁচ বছর ধরে বলছ।

আজ নিশ্চিত হয়েছি।

তাহলে তো ভালই হল। কবে মারা যাচ্ছ জেনে গেলে । আমরা যারা জানি না তাদের হচ্ছে

অসুবিধা। সব সময় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে হয়।

শওকত সাহেব মৃদু গলায় বললেন, সব সময় ঠাট্টা করিস না মা। তিনি মুনার হাত ধরলেন। মুনা লক্ষ্য করল, মামার হাত অস্বাভাবিক শীতল। তিনি অল্প অল্প কাঁপছেন।

কি স্বপ্ন দেখেছ বল তো শুনি।

একটা জন্তু বুকের ওপর বসেছিল।

এই থেকেই তোমার ধারণা হয়ে গেল তুমি আর বাঁচবে না?

তিনি কিছুই বললেন না। মুনা সহজ ভঙ্গিতে বলল, ধর তুমি যদি মরেই যাও তাতে খুব আফসোস থাকার কথা নয়। বড় সমস্যার সমাধান করেছ। মেয়ের ভাল বিয়ে দিয়েছ। কারো কাছে তোমার কোন ধার-দেনা নেই। তাছাড়া–

শওকত সাহেব মুনাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুই একটা বিয়ে করলে আমি খুব সহজে মরতে পারব।

বলতে চাচ্ছ আমি তোমাকে মরতে দিচ্ছি না?

তিনি কিছু বললেন না। মুনা বলল, আমাকে নিয়ে কোনো রকম চিন্তা করবে না মামা। আমি বেশ আছি। তুমি মরে গেলেও আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

শওকত সাহেব থেমে থেমে বললেন, আমি মামুনকে একটা চিঠি লিখেছি। ওকে আসতে লিখেছি।

এই কাণ্ড আবার কবে করবে?

পরশু দিন। ও এলে আমি তোর কোনো কথা শুনব না।

মুনা মাথা নিচু করে বসে রইল। শওকত সাহেব বললেন–ঝগড়াঝাটি ঝামেলা এইসব হয়। এটাকে এত বড় করে দেখলে পৃথিবী চলে? চলে না। কমপ্রমাইজ করতে হয়।

তুমি ব্যাপারটা জান না বলে এসব বলছ। জানলে এ রকম করতে না। শোন তোমাকে আমি বলি। এর পরও যদি তুমি ওকে বিয়ে করতে বল আমি করব। মন দিয়ে আমার কথাটা শোন মামা।

আমি মামুনকে নিয়ে বাড়ি দেখতে গিয়েছিলাম কল্যাণপুরে। একটা বাড়ি পছন্দ হল আমাদের। ও বাড়ি ভাড়া করল। একদিন বিকেলে ঐ বাড়িতে গিয়েছি। জিনিসপত্র সাজাচ্ছি। ও হঠাৎ দরজা বন্ধ করে ফেলল। বাকিটা তোমাকে তো আর বলতে হবে না মামা। খুবই সহজ গল্প। এ ধরনের একটা ঘটনা আমার ছেলাবেলাতেও ঘটেছিল। তখন আমার বয়স তের। তোমাদের কাউকে কিছু বলিনি। আমার মনটা অসাড় হয়ে গেছে মামা। ঘেন্না ধরে গেছে।

মুনার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল। শওকত সাহেব কোন কথা বললেন না। উঠোনের জ্যোৎস্নার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। মুনা নিজেকে চট করে সামলে নিল। শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে বলল, একটা কাজ করা যাক মামা। আমি বরং বকুলকে লিখে দেই এখানে আসবার জন্যে। হঠাৎ ঘর খালি হয়ে গেছে তো তাই তোমার এ রকম লাগছে। ওরা এলে ভাল লাগবে। এখন আর তোমার মনে হবে না কোনো জন্তু তোমার বুকে বসে আছে।

মুনা খিলখিল করে হেসে ফেলল। পরমুহূর্তেই হাসি বন্ধ করে গম্ভীর মুখে বলল, বকুল বোধ হয় কোনো কারণে আমার ওপর রাগ করেছে।

এ কথা কেন বলছিস?

বিয়ের পর আমাকে একটি চিঠিও দেয়নি।

শওকত সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কোনো চিঠি লিখেনি?

না। কেউ আমাকে পছন্দ করে না মামা। আমার মধ্যে কিছু একটা বোধ হয় আছে যা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়।

আজেবাজে কথা বলিস না।

আজেবাজে কথা না মামা, খুব সত্যি কথা।

মুনা ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। হালকা গলায় বলল, যখন ছোট ছিলাম তখন খারাপ লাগত এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। মামা, যাও শুয়ে পড়।

আমি আর শোব না।

সারারাত বসে থাকবে এখানে?

হ্যাঁ।

বেশ থাক। আমি ঘুমুতে গেলাম। সকালে অফিস।

বিছানায় গিয়েও ঘুম এল না। মুনা এপাশ-ওপাশ করতে লাগল। মর্নিং অফিস হয়েছে। সাতটার আগে ঘর থেকে বেরুতে হয়। কাল নির্ঘাৎ অফিস কামাই হবে।

সত্যি সত্যি তাই হল, ঘুম ভাঙল ন'টায়। তার বিরক্তির সীমা রইল না। শওকত সাহেব এখনো বারান্দায় চেয়ারে।

মামা, আমাকে ডাকলে না কেন?

আরাম করে ঘুমুচ্ছিলি তাই ডাকিনি? তোর কাছে একটা ছেলে এসেছে।

কে এসেছে?

চিনি না, গিয়ে দেখ। বসার ঘরে আছে।

মুনাও ছেলেটিকে চিনল না। লুঙ্গী পরা খালি পায়ের একটি ছেলে জড়সড় হয়ে চেয়ারে বসে ছিল মুনাকে দেখে লাফিয়ে উঠল। তের-চৌদ্দ বছর বয়স। সবে গোঁফ উঠতে শুরু করছে।

কে তুমি?

আপা আমার নাম গোবিন্দ। জলিল মিয়ার চায়ের স্টলে কাম করি।

আমার কাছে কী?

বাকের ভাই আপনারে যাইতে কইছে।

বাকের ভাই আমাকে যেতে বলেছে মানে? সে তো জেলখানায়।

জি না থানা হাজতে।

থানা হাজতে আমাকে যেতে বলেছে?

জি।

সখ তো কম না দেখি। থানা হাজতে আমি কি জন্যে যাব? খবরটা তোমাকে দিয়ে পাঠিয়েছে?

জি। আমি গেছিলাম। বাকের ভাই কষ্টের মধ্যে আছেন।

কষ্টের মধ্যে তো থাকবেই, থানা হাজতে কে আর তাকে কোলে করে বসে থাকবে?

বিরক্তিতে মুনা ভ্রূ কুঁচকাল। গোবিন্দ বলল, আমি যাই আপা?

আচ্ছা যাও।

মুনা স্বপ্নেও ভাবেনি সে বাকেরকে দেখতে যাবে। অসুখ-বিসুখ হয়ে হাসপাতালে পড়ে থাকলে দেখতে যাওয়া যায়। কিন্তু চোর-ডাকাতের সঙ্গে বাস করছে এমন একজনের কাছে যাওয়া যায় না। বাবু এখানে থাকলে একটা কথা হত। তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যেত। বাবু নেই। গেলে তাকে একা যেতে হয়। থানার লোকজনদের গিয়ে বলা আমি একজন আসামীকে দেখতে এসেছি-সেও একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার। তারা নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবে- আসামি আপনার কে? তখন যদি সে বলে - "কেউ না" তাহলেও ঝামেলা। ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে। নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে কথা বলার চেষ্টা করবে। জঘন্য। মুনা ঠিক করল যাবে না। কিন্তু তবুও বিকেলে চলে গেল। ওসি সাহেবকে সহজ স্বাভাবিক গলায় বলল, আমি বাকের সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। আপনাদের হাজতে আছেন। দেখা করা কী সম্ভব হবে?

বাকের ভাই কেমন আছেন?

ভাল।

দাড়ি রেখেছেন কেন?

রোজ রোজ শেভ করা মুশকিল। তুমি ভাল আছ?

আমি খারাপ থাকব কেন? আমি তো আপনার মতো গুণ্ডামিও করিনি, বন্দুক- বোমা নিয়ে লাফ-ঝাঁপও দেইনি।

তা ঠিক।

আমি তো দেখেছি ধরা পড়লেই ছাড়া পেয়ে যান। এবার পাচ্ছেন না কেন?

কেউ ছাড়াবার চেষ্টা করছে না। তুমি কি একটু দেখবে?

আমি দেখব?

কেউ কিছু করছে না মুনা। আমার ভয় ধরে গেছে।

বাকেরের গলা কেঁপে গেল। মুনা বলল, মামা যখন ঝামেলায় পড়ল তখন আপনি অনেক কিছু করেছিলেন। আমার পাশে আপনি ছাড়া কেউ ছিল না। কাজেই এবার তো সেই উপকারের শোধ

দিতেই হবে।

সে সব কিছু না মুনা।

কিছু না হবে কেন? এটা আপনার প্রাপ্য। আপনি এ রকম রোগা হয়ে গেছেন কেন? অসুখ-বিসুখ?

না অসুখ-বিসুখ না। এখানে খাওয়া খুব খারাপ। হোটেলের খাওয়া তো সহ্য হয় না।

আপনার ভাই আপনার কোন খোঁজখবর করছে না?

বাকের জবাব দিল না। মুনা বলল, আজ উঠি, আমি কাল আবার আসব।

বাকের বলল, তোমার সঙ্গে কোনো টাকা-পয়সা থাকলে দিয়ে যাও, খুব কষ্টে আছি। টাকার অভাবে সিগারেট খেতে পারি না।

মুনা দীর্ঘ সময় বাকেরের দিকে তাকিয়ে রইল। ছোট সেল ঘরে বাকের ছাড়াও আরো চারজন মানুষ। এদের একজনের জন্যে টিফিন কেরিয়ারে করে খাবার এসেছে। ভাত গোসত। এই সন্ধ্যাবেলায় সে গপগপ করে খাচ্ছে। ঝোলে তার হাত-মুখ মাখামাখি হয়ে গেছে। সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। একজন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে সঙ্গীর খাওয়া দেখছে। অন্য সবাই তাকিয়ে আছে মুনার দিকে।

মুনা তার হাত ব্যাগ খুলল। টাকা-পয়সা কিছু নিয়ে আসেনি। ফিরে যাবার রিকশা ভাড়াটা শুধু আছে। মুনার অসম্ভব মন খারাপ হয়ে গেল। সে লক্ষ্য করল তার চোখ ভিজে উঠতে শুরু করেছে। কেন এ রকম হবে? সে চাপা গলায় বলল, কাল আমি আপনার জন্যে টাকা নিয়ে আসব।

## ৩৩

সকাল ন'টার মতো বাজে।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ উঠেছে। মামুন দোতলার বারান্দায় বসে দাড়িতে সাবান লাগাচ্ছে। আজ তাকে অনেকগুলি কাজ করতে হবে। রাজমিস্ত্রীকে খবর দিতে হবে। সেতাবগঞ্জে যেতে হবে সিমেন্টের জন্যে। চাইনিজ সিমেন্টের বস্তা পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি ব্যাগে বিশ-ত্রিশ টাকা কম পড়বে। আকিল মিয়ার রড দিয়ে যাবার কথা। সে আসেনি। তার খোঁজেও যেতে হবে। আজ দিনের মধ্যে কি কি করতে হবে একটা কাগজে লিখে ফেললে হয়। মামুন ঠিক করল দাড়ি শেভ করার পরই পয়েন্ট বাই পয়েন্ট সব লিখে ফেলবে। সামনে প্রচুর কাজ। ভালই লাগছে। কাজ ছাড়া মানুষ থাকতে পারে?

আয়নাটা ভাল না। মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে চোয়াল ভাঙা অচেনা একটি লোক বসে আছে। স্বাস্থ্য বোধ হয় খারাপ হয়েছে। মামুন গালে ব্লেড ছোঁয়াতেই অনেকখানি কেটে গেল। টপটপ করে রক্ত পড়তে লাগল। আরে কি কাণ্ড? নতুন ব্লেড। গাল কাটার কথা না। সে কি দাড়ি শেভ করাও ভুলে গেছে? মামুন তোয়ালে দিয়ে গাল চেপে উঠে দাঁড়ানো মাত্র অদ্ভুত একটি দৃশ্য দেখল। মুনা আসছে। কাঁধে পাটের একটি ব্যাগ। এই ঝাঁ ঝাঁ রোদেও গায়ে একটা চাদর। বিস্মিত চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে এগুচ্ছে। দ্বিধার ভঙ্গিটি স্পষ্ট। মামুন উঁচু গলায় চেঁচাল-এ্যাই এ্যাই। মুনা তাকাল চোখ তুলে। হাসল। মামুন ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলল মুনা নয়, জাহানারা। এত বড় ভুলও হয় মানুষের। মুনা কেন এখানে আসবে? তার এত কী দায় পড়েছে?

কী ব্যাপার এ্যাই এ্যাই করে চেঁচাচ্ছিলেন কেন?

মামুন হাসল। জাহানারা বলল, এত বড় অসুখ দেখে এলেন তারপর তো একদিনও এলেন না।

নানান রকম ঝামেলায়...।

কোন ঝামেলা ছিল না। আপনি ইচ্ছে করেই যাননি। মামুন কী বলবে বুঝতে পারল না। আপানার গাল দিয়ে তো টপ টপ করে রক্ত পড়ছে। তুলা দিয়ে গাল চেপে রাখুন। ঘরে তুলা নেই?

না এটা কি ডাক্তারখানা। তুলা, জগ ওষুধপত্র এইসব থাকবে। আসুন ভেতরে আসুন।

না আমি বসব না। হযরত আলীকে ফেরত দিতে এসেছি।

পড়েছেন নাকি?

আপনি এত কষ্ট করে নিয়ে গিয়েছেন আর আমি পড়ব না। মেয়েদের আপনারা কি ভাবেন, পাষাণ?

মামুন বলল, আপনি একটু বসুন। দেখি আমি চায়ের ব্যবস্থা করি। এই পাঁচ মিনিট।

জাহানারা বসে রইল। মামুন প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল। চা তাকেই বানাতে হবে। কাজের যে মেয়েটি আছে সে ভাত-তরকারি ছাড়া অন্য কিছু রাঁধতে পারে না।

জাহানারা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, আমার খুব একটা ভাল খবর আছে।

কী খবর?

দেখি আন্দাজ করুন তো?

মেয়েটি হাসছে মিটিমিটি। তার চরিত্রের সঙ্গে এই হাসিটি ঠিক মিশ খাচ্ছে না। মামুন ধাঁধায় পড়ে গেল।

বলতে পারলেন না? আমার ট্রান্সফার অর্ডার হয়েছে।

বলেন কি?

আমি শনিবারে ঢাকায় চলে যাচ্ছি।

আমিও ঢাকায় যাচ্ছি। আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। কোনো চিন্তা করবেন না। গল্প করতে করতে যাব। ফাইন হবে।

জাহানারা হাসল। মামুন অবাক হয়ে বলল, হাসছেন কেন?

আপনার মধ্যে একটা ছেলেমানুষি আছে তাই দেখে হাসছি।

কি ছেলেমানুষি করলাম?

তা বলব না।

জাহানারা আবার হাসতে লাগল। কিশোরীদের হাসি ; যা শুধু শুনতে ইচ্ছে করে।

আপনি খুব খুশি হয়েছেন?

খুশি হব না মানে! কী বলছেন আপনি?

এই জায়গাটা কী এতই খারাপ?

হ্যাঁ খারাপ। আর কিছুদিন থাকলে আমি মরে যেতাম।

মানুষ খুব কঠিন জিনিস। মানুষ এত সহজে মরে না।

আমি মরি। আপনার গাল দিয়ে কিন্তু এখনো রক্ত পড়ছে। ঘরে ওষুধপত্র কিছুই নেই?

না।

গাঁদা ফুলের পাতা কচলে গালে দিন না।

গাঁদা ফুলের পাতা আমি পাব কোথায়?

জাহানারা আবার হাসতে শুরু করল। তার আজ এত আনন্দ হচ্ছে। সে বেশিক্ষণ থাকবে না বলে এসেছিল কিন্তু সে বিকাল পর্যন্ত রইল। অনবরত কথা বলল। যাবার সময় কেমন যেন বিষণ্ন হয়ে গেল। হালকা স্বরে বলল, আপনি যতবার ঢাকা যাবেন ততবার আমাদের বাসায় আসবেন। আসবেন তো?

হ্যাঁ আসব।

আমি আপনাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন উনাকে দেখতে যাব।

কাকে দেখতে যাবেন?

ঐ যে মেয়েটি যে আমার মত দেখতে।

ও মুনাকে?

হ্যাঁ। উনি আমাকে দেখে আবার রেগে যাবেন না তো?

না রাগবে না। ও অন্য ধরনের মেয়ে।

জাহানারা নিঃশ্বাস ফেলল।

## ৩৪

মুনা বলল, আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

ভদ্রলোক সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। যেন প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারছেন না। মুনা বলল, আমি অন্য একটা কেইসের ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছিলাম। আমার মামা একটা ঝামেলায় পড়েছিলিন...

ভদ্রলোক মুনাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, মনে আছে। ক্রিমিনাল মিস এপ্রোপ্রিয়েশনের মামলা। চারশ তিন ধারা। আপনার মামার নাম শওকত হোসেন কিংবা শওকত আলি।

মুনা যথেষ্ট অবাক হল। এই উকিল ভদ্রলোক অসম্ভব ব্যস্ত। চেম্বারে লোকজন গিজগিজ করছে। তার পক্ষে এতদিন আগের একটা মামলার কথা মনে থাকার কথা নয়। এর রকম স্মৃতিশক্তি

মানুষের থাকে?

আপনার নামও মনে আছে। মিস মুনা। এখনো কি মিস আছেন না মিসেস হয়েছেন?

হইনি এখনো।

কেন অসুবিধা কি?

ভদ্রলোক গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন। যেন সত্যি সত্যি জানতে চান। কত বিচিত্র স্বভাবের মানুষই না থাকে পৃথিবীতে।

অসুবিধাটা কি বলুন।

ব্যক্তিগত অসুবিধা। সেটা এই জায়গায় বলতে চাই না।

আরে এই জায়গা কি দোষ করল? উকিলের চেম্বারে সব কথা বলা যায়। এ টু জেড।

আমি যে সমস্যা নিয়ে এসেছি তার সঙ্গে আমার মিস বা মিসেসের কোনো সম্পর্ক নেই।

ও আচ্ছা।

আমি কি সমস্যাটার কথা বলব?

আজ শুনতে পারব না। আজ ব্যস্ত। আগামী সপ্তাহে আসুন। সোমবার। এ্যাপয়েন্টমেন্ট করে যান। কাগজপত্র কী আছে?

কিছু কিছু আছে।

সেই সব রেখে যান। আমার এসিসটেন্ট আছে। জুনিয়র দুই উকিল। বুদ্ধিশুদ্ধি মিলিটারিদের মত। মাথার খুলির ভেতরে সাবানের ফেনা ছাড়া আর কিছু নেই। নো ব্রেইন। কিন্তু উপায় কি বলুন? এই শমসের চা দে। ইনারে চা দে।

মুনা বলল, আমি চা খাব না।

কেন খাবেন না?

কারণ কিছুই না। খেতে ইচ্ছে করছে না।

আপনি বললেন কারণ নেই আবার খেতে ইচ্ছে করছে না। দু'রকম কথা বলেন কেন? খেতে ইচ্ছে করছে না এটাই হচ্ছে কারণ। কথাবার্তা চিন্তা-ভাবনা করে বলা উচিত।

উকিল ভদ্রলোক থু করে একদলা থুথু ফেললেন এ্যাসট্রেতে। চারদিকে এ্যাসট্রের ছাই ছড়িয়ে পড়ল। ভদ্রলোক বিরক্ত হবার বদলে মনে হয় আরো খুশি হলেন। ছাই কি করে উড়ে সেটা পরীক্ষা করবার জন্যে আরেক দফা থুথু ফেললেন।

মিস মুনা।

জি।

ছাই ফেলবার জন্যে সব টেবিলে এ্যাসট্রে থাকে। কিন্তু থুথু ফেলবার জন্যে কিছু থাকে না। কিছু থাকা উচিত। পিকদান টাইপ কি বলেন?

মুনা কিছু বলল না। উকিল সাহেব হাই তুলে বললেন চলে যান, বসে আছেন কেন? সোমবারে আসবেন। দেখে দেব। আমার ফিস কিন্তু আরো বেড়েছে। জেনে যাবেন। শেষে আমড়াগাছি করবেন সেটা হবে না। উকিলের চেম্বার কোনো মাছের বাজার না। মুহুরির কাছে সব জেনে-টেনে যান।

জি আচ্ছা।

সোমবারে ফিসের টাকার গোটাটাই নিয়ে আসবেন। খালি হাতে আসবেন না। মুনা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আপনার কাছে যারা আসেন তাদের সবারই নামধাম কি আপনার মনে থাকে?

হুঁ থাকে। নাম মনে থাকে আর কোনো ধারার কেইস ঐটা মনে থাকে। করে খাচ্ছি তো এই কারণেই। হা হা হা।

মুনা বের হয়ে গেল। অফিসের সময় হয়ে আসছে। এখান থেকে একটা রিকশা নিলে ঠিক সময় পৌছান যাবে। মুনা খানিকক্ষণ ভেবে ঠিক করল আজ অফিসে যাবে লাঞ্চ টাইমের পর। এই সময়টায় সে চেষ্টা করবে বাকেরের বড় ভাইকে ধরতে। হাসান সাহেব বোধ হয় নাম। আগের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে সার্কুলার রোডে বাড়ি নিয়েছেন। সেই ঠিকনা বের করতে মুনার কম ঝামেলা হয়নি।

একটি কাজের লোক মুনাকে বসতে বলে ভেতরে চলে গেল। তারপর আর কারোরই কোন খোঁজ নেই। বাড়ি নিঃশব্দ। ইংরেজিতে এই ধরনের পরিবেশকেই বোধ হয় পিন ড্রপ সাইলেন্স বলা

হয়। মনে হচ্ছে শুধু এই বাড়ি নয় আশপাশের কয়েকটি বাড়িতেও লোকজন নেই।

সুন্দর করে সাজানো বসার ঘর। পর্দা টেনে রাখার জন্যে আধো আলো আধো আঁধার। তবু এর মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে এ ঘরে একবিন্দু ধুলো নেই। রোজ দু'বেলা কিংবা কে জানে হয়ত তিন বেলা এই ঘর ঝাড়পোচ করা হয়। অডিকোলনের গন্ধের মতো মিষ্টি একটা গন্ধ আসছে নাকে। গন্ধটাও ঘরের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। যেন এটা না থাকলেই মানাত না। অনেকক্ষণ বসে থাকার পর কাজের লোকটি আবার ঢুকল। তার হাতে চমৎকার একটি ট্রে। ট্রেতে এক কাপ চা অন্য একটি প্লেটে কিছু বিসকিট। রুটিন কাজ। যারা এখানে আসে তাদের সবার জন্যেই বোধ হয় এই ব্যবস্থা। মুনা বলল উনার কি দেরি হবে? আমার অফিস আছে।

কাজের লোকটি বলল, আসতেছেন। তারপরও আধঘণ্টার মত বসে থাকতে হল।

মানুষকে বসিয়ে রাখার মধ্যে এরা কি কোনো আনন্দ পায়?

হাসান সাহেব ঘরে ঢুকলেন অফিসের পোশাক পরে। ঢুকেই ঘড়ি দেখলেন, এর মানে সময় বেশি দেওয়া যাবে না।

আপনি কি আমার কাছে এসেছেন?

জি।

আপনার সঙ্গে কি আমার পরিচয় আছে?

জি না। তবে আমরা এক পাড়ায় থাকতাম।

ও আচ্ছা। কি ব্যাপার বলুন?

আমি এসেছি আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে।

বাকের? নতুন কোনো ঝামেলা বাঁধিয়েছে নাকি?

জি না।

হাসান সাহেবের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল। তিনি দ্বিতীয়বার ঘড়ি দেখলেন কিন্তু বসলেন। ভঙ্গি থেকে মনে হচ্ছে তিনি সমস্ত ব্যাপার মন দিয়ে শুনবেন।

বলুন কি বলবেন?

বাকের ভাই অনেকদিন ধরে হাজতে পড়ে আছে। কেউ বোধ হয় কিছু করছে না। দেখতে-টেখতেও যাচ্ছে না।

বাকেরের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা ঠিক বুঝতে পারছি না।

সম্পর্ক কিছু নেই। এক পাড়ায় থাকতাম। অনেক সময় আমাদের অনেক উপকার করেছেন।

ও তো গুণ্ডামি করে জানতাম। উপকারও করে নাকি?

মানুষের চরিত্রের অনেকগুলি দিক থাকে।

তা থাকে। এ ম্যান হ্যাজ মেনি ফেসেস। ভালই বলেছেন। বাকেরের ব্যাপারটায় আমি ইচ্ছা করেই নীরব আছি। এর কারণ আছে। আমার মনে হয় আপনাকে বুঝিয়ে বললে বুঝবেন। আমি মনে প্রাণে চাচ্ছি যাতে ওর একটা শিক্ষা হয়। হাজতে ঢোকা মাত্র বের করে আনলে ঐ শিক্ষাটা হবে না :

আপনি চাচ্ছেন বিচার-টিচার হবার পর বাকের ভাই বেশ কিছু দিনের জন্যে জেলে চলে যাক।

হাসান সাহেব ঘড়ি দেখলেন। কিন্তু তার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল না। তিনি সিগারেট বের করলেন এবং কাজের লোকটিকে চা দিতে বললেন। মুনা সহজ স্বরে বলল, আপনি বোধ হয় জানেন না এটা সাজানো মামলা। বাকের ভাইয়ের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছুই ছিল না।

আপনি কি করে জানেন?

বাকের ভাইয়ের অনেক দোষ আছে কিন্তু সে মিথ্যা কথা বলে না।

হাসান সাহবে হেসে ফেললেন। মুনা লক্ষ্য করল হাসিটি খুব সুন্দর। সহজ স্বাভাবিক।

আপনার নাম কি?

মুনা।

আমি কি আপনাকে তুমি করে বলতে পারি? বয়সে আমি অনেক বড়।

নিশ্চয় তুমি করে বলবেন।

আমি এখন অফিসে যাব। গাড়ি এসে গেছে বোধ হয়। হর্ন দিচ্ছে। তুমি কোথায় যাবে বল তোমাকে নামিয়ে দেব।

আমাকে নামিয়ে দিতে হবে না। আমি রিকশা নিয়ে চলে যাব।

রিকশা নিয়ে চলে যাবার কোন দরকার নেই, এস, তুমি। আর শোন, আমি একজন এডভোকেটের সঙ্গে কথা বলছি। ও বাকেরের ব্যাপারটা দেখছে। তুমি হয়ত ভাবছ আমি ভাই হিসেবে কোন দায়িত্ব পালন করছি না। এটা ঠিক না। দেখছি। আড়াল থেকে দেখছি। তাছাড়া...

তাছাড়া কি?

আফিসে আমার নিজের একটা সমস্যা যাচ্ছে। আমার পায়ের নিচে মাটি নেই। অনেক গল্প। তুমি আরেকদিন এস, তোমাকে বলব।

হাসান সাহেব মুনাকে শুধু যে অফিসে নামিয়ে দিলেন তাই নয় নিজে গাড়ি থেকে নামলেন। মুনা কোথায় বসে তা দেখলেন। মুনা যখন বলল, এক কাপ চা খাবেন? তিনি বললেন-- মন্দ কি। চা খাওয়া যেতে পারে।

৩৫

তিনদিন ধরে শওকত সাহেবের জ্বর।

খুব বেশি নয় একশ, একশ এক। তবু বয়সের কারণেই তিনি বেশ কাহিল হয়ে পড়লেন। শারীরিক অসুবিধা ছাড়াও কিছু কিছু মানসিক অসুবিধাও দেখা গেল। পর পর দু'দিন মুনাকে বললেন লতিফাকে তিনি পর্দার ফাঁক থেকে উঁকি দিতে দেখছেন। মুনা কিছুই বলেনি। ঠোঁট বাঁকিয়েছে যা থেকে মনে হয় সে বিরক্ত। অথচ এর মধ্যে বিরক্ত হবার কী আছে। তাঁর কথা সে বিশ্বাস না করতে পারে সেটা ভিন্ন কথা-কিন্তু বিরক্ত হবে কেন? আগে তো শুনবে তিনি কী বলতে চান তাও শুনেনি। ঠোঁট বাঁকিয়ে ঘরের কাজ করতে গেছে। অথচ লতিফাকে তিনি দেখেছেন। নিশি রাতে ঘুম ভেঙে দেখা। তিনি শুয়ে ছিলেন। জানালা দিয়ে রোদ আসছিল বলে জানালা বন্ধ করে দিতেই ঘর খানিকটা অন্ধকার হয়ে গেল। ঠিক তখন ঘরের পর্দা নড়ে উঠল। শুধু শুধু পর্দা নড়বে কেন? তিনি তাকালেন এবং দেখলেন পর্দার নিচে স্যান্ডেল পরা রোগা রোগা দুটি পা। লতিফার পা। তিনি ডাকলেন -কে লতিফ! লতিফা! পর্দা আবার নড়ে উঠল। তিনি বিছানায় উঠে বসতেই পা সরে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে কাউকে দেখলেন না। মুনা অফিসে। ঘর খালি। একটি প্রাণীও নেই। শুধু রান্নাঘরে ইঁদুর খুটখুট করছে।

অথচ সেই কথাটি মুনা শুনতেই চাইল না। বিরক্তি দেখিয়ে চলে গেল। সেদিনকার পুঁচকে মেয়ে অথচ ভাবটা এ রকম যেন পৃথিবীর সব রহস্য তার জানা। মুনার ওপর তিনি গত ক'দিন ধরে বেশ বিরক্ত। সে স্পষ্টতই তাকে অবহেলা করছে। তিন দিন ধরে তাঁর জ্বর যাচ্ছে এই নিয়েও তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। একবার বলল না, ডাক্তার দেখাও। কিংবা নিজে গিয়ে কোনো ওষুধ-বিষুধ আনল না।

গতকাল সন্ধ্যায় তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুনাকে শুনিয়ে বললেন, বাঁচব না। দিন শেষ। মুনা বলল, খামোকা আজেবাজে কথা বল কেন?

তিনি দুঃখিত গলায় বললেন, বাঁচব না এই কথাটা বলছি। এটা কি আজেবাজে কথা?

হ্যাঁ। বাঁচবে না সেটা তো সবাই জানে। বারবার বলা দরকার কী?

তিনি চুপ করে গেছেন। মেয়েটা এমন অদ্ভুত এককেবার এককেটা জিনিস নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে যে রীতিমত রাগ লাগে। এখন যেমন বাকেরের ব্যাপারটা নিয়ে করছে। সেদিন দেখলেন টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার ভরছে। তিনি অবাক হয়ে বললেন, কার জন্যে খাবার নিচ্ছিস?

বাকের ভাইয়ের জন্যে।

কেন?

খাবে সেই জন্যে। আজ ছুটির দিন আছে। কাজেই নিয়ে যাচ্ছি।

তিনি আর কিছুই বলেননি। কিন্তু জানেন কাজটা ভাল হচ্ছে না। লোকের চোখে পড়বে। নানান জনে নানান কথা বলবে। কিন্তু এই সহজ জিনিসগুলি মুনাকে কে বোঝাবে? কিছু বলতে গেলে ফোঁস করে উঠবে। দিন দিন মেয়েটার আকাশ-ছোঁয়া মেজাজ হচ্ছে। একদিন কড়া করে ধমক দিতে হবে।

শওকত সাহেব জ্বর গায়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন। ক্ষুধা হচ্ছে। সকালে কিছু খাননি। মুনা যাবার সময় বলে গেছে মিটসেফে খাবার ঢাকা দিয়ে গেছে। মিটসেফে কয়েকটা রুটি আর কিছু ভাজি ঢাকা দেয়া। সেখানে কয়েকটা তেলাপোকা। ঢাকনির ওপর হাঁটাহাঁটি করছে। শওকত সাহেবের

বমি এসে গেল। সেই বমি চাপতে গিয়ে বুকে চাপ ব্যথা। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। শওকত সাহেব বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। আলো মরে আসছে, ঘর অন্ধকার। আজও কী লতিফা আসবে নাকি। শূন্য ঘরে তাঁর কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। মুনা কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। হয়ত সন্ধ্যা পার করে ফিরবে। ঐ দিন মামুন এসেছিল। একদিনের জন্যে এসেছে। হাতে সময় নেই। তবু সে সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইল। মুনার দেখা নেই। মুনা এল সন্ধ্যা মিলাবারও আধঘণ্টার পর। মামুন তখনো বসে আছে। মুনা শুকনো হাসি হেসে বলল, কখন এসেছ?

মামুন বলল, অনেকক্ষণ।

কোন কারণে এসেছ, না এমনি।

মামা চিঠিতে লিখেছিলেন একবার আসার জন্যে।

কথা হয়েছে মামার সঙ্গে?

হুঁ। তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা বলবার জন্যে বসে আছি।

আজ না বললে হয় না? প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। দাঁড়াতে পারছি না।

আজ রাতের ট্রেনে চলে যাচ্ছি।

তাহলে এর পরের বার যখন আস তখন কথা হবে।

শওকত সাহেব দেখলেন মামুন শুকনো মুখে চলে যাচ্ছে। একি কাণ্ড! সব বদলে যাচ্ছে। বকুল? বকুলও কী কম বদলেছে! প্রথম প্রথম চিঠি লিখত। এখন তাও লেখে না। যদিও লেখে দু'তিন লাইনে সব কথা শেষ 'বাবু ভাল আছে। মন দিয়ে পড়াশোনা করছে। বাবুকে নিয়ে কোনো চিন্তা করবেন না।' যেন বাবু ছাড়া তাঁর আর কোনো চিন্তা নেই।

শওকত সাহেব শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেলেই চমকে উঠলেন। দরজার পর্দা আবার কাঁপছে। তিনি ভয়ে ভয়ে নিচের দিকে তাকালেন। রোগা রোগা দুটি পা দেখা যাচ্ছে। শওকত সাহেবের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। প্রচুর ঘাম হতে লাগল। তিনি মৃদু স্বরে ডাকলেন, কে লতিফা!

টুনটুন করে দু'বার কাচের চুড়ির শব্দ হল। লতিফা কাচের চুড়ি পরত। তার হাত ভর্তি ছিল নীল রঙের চুড়ি।

লতিফা। ও লতিফা।

পা দুটি চট করে সরে গেল। শওকত সাহেব দরজা খুলে বাইরে এসে শুনেন খুব শব্দে বাইরের দরজার কড়া নড়ছে। দরজা খুলতেই দেখলেন মুনা দাঁড়িয়ে আছে। মুনা বিরক্ত হয়ে বলল, কতক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি দরজা খুলছ না কেন?

শওকত সাহেব কিছু বললেন না।

দরজা খুলছে না দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

কি ভেবেছিলি মরে গিয়েছি?

তা না ভাবলাম অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেছ বোধ হয়।

তোর মামলার কি হল?

মামলা তো এখনো শুরু হয়নি। উকিলকে কাগজপত্র দেখতে দিয়েছি।

উকিল কে?

তোমার উকিল। তোমার বেলায় যিনি ছিলেন।

ও আচ্ছা।

হাসান সাহেব আছেন না? উনিও একজনকে বলছেন। মামলা কে চালাবে এখনো ঠিক হয়নি।

তুই এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশি ছোটোছুটি করছিস। যাদের করার তারা করবে তোর এত কিসের মাথাব্যথা।

মুনা হাসল। শওকত সাহেব বললেন, সামলে-সুমলে চলতে হয়। সমাজ সংসার দেখতে হয়। কঠিন জায়গা।

আমিও তো মামা কঠিন মেয়ে।

শওকত সাহেব কিছু বললেন না। মুনা বলল, তোমাকে কেমন অন্যমনস্ক লাগছে। কী হয়েছে বল তো?

তিনি ইতস্তত করে বললেন, আজ আবার দেখলাম। এই কিছুক্ষণ আগে। দশ মিনিটও হয়নি।

কি দেখলে?

তোর মামিকে দেখলাম।

তুমি কি পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছ নাকি মামা? কি ধরনের কথাবার্তা যে বল। রাগে গা জ্বলে যায়।

ঘটনাটা না শুনলে তুই...

কোন কিছু আমি শুনতে চাই না।

শওকত সাহেব ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেললেন। মুনা বলল, জ্বর কমেছে?

শওকত সাহেব সেই প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। মুনা রাতের খাবার তৈরি করে তাকে খেতে ডাকল। তিনি উঠে এলেন কিন্তু খেতে পারলেন না। খানিকক্ষণ পরই উঠে গিয়ে একগাদা বমি করলেন। চারদিক কেমন দুলছে। শরীরটাকে অসম্ভব হালকা মনে হচ্ছে। তিনি মৃদু স্বরে ডাকলেন ও লতিফা, লতিফা। মুনা এসে তাঁর পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলি।

মুখ ধোয়ার পানি দে রে মা।

মুনা পানি নিয়ে এসে দেখল তিনি বিড়বিড় করে নিজের মনে কি সব কথা বলছেন।

মামা কী বলছ?

কিছু বলছি না। পরিষ্কার দেখলাম বুঝলি। মনটা একটু ইয়ে হয়ে আছে।

ইয়ে হয়ে থাকলে তো খারাপ। মনটাকে ঠিক কর। আমার মনে হয় বকুলের কাছ থেকে ঘুরে এলে তোমার সব ঝামেলা মিটে যাবে।

তুই যাবি আমার সঙ্গে?

পাগল হয়েছ? মামলা-মোকদ্দমা ফেলে আমি যাব কোথায়? ঘুম থেকে উঠেই আমাকে যেতে হবে উকিলের কাছে।

শওকত সাহেব শব্দ করে নিঃশ্বাস ফেললেন।

উকিল সাহেব আজ উদ্ভুত একটা পোশাক পরে এসেছেন। জিনিসটা পাঞ্জাবির মত। কিন্তু শার্টের কলারের মত কলার আছে। ভদ্রলোককে দেখাচ্ছে সার্কাসের ক্লাউনের মতো। মুনাকে দেখেই তিনি বললেন- হবে না।

মুনা বলল, কী হবে না?

এফআইআর দেখলাম। এই মামলায় লাভ নেই।

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

কথা তো বাংলাতেই বলছি, বোঝেন না কেন? পুলিশের সাজানো মামলা। কর্নভিকসন হয়ে যাবে। উকিল-মোক্তার কিছু করতে পাববে না।

মুনা তাকিয়ে রইল। উকিল সাহেব মুখখানা অনেকখানি সরু করে টেনে বললেন, ধরন-ধারণ দেখে মনে হয় পলিটিক্যাল কেইস। কাউকে দীর্ঘ সময়ের জন্যে আড়ালে সারিয়ে রাখতে হলে এইসব মামলা করা হয়। পুলিশ যদি নিজেরাই কিছু অস্ত্রশস্ত্র জমা দিয়ে বলে এইসব পাওয়া গেছে তাহলে কি করার আছে বলুন। এটা কোর্টে প্রমাণ করা মুশকিল যে, অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায়নি। তাছাড়া আমার ধারণা এই ছেলেটির আগের রেকর্ডও ভাল না। ঠিক না?

জি ঠিক।

আপনার যা করা উচিত তা হচ্ছে বড় কোন নেতা-ফেতার কাছে যাওয়া। আছে তেমন কেউ?

জ্বি না।

খুঁজে বের করুন। বাংলাদেশ ছোট জায়গা। খুঁজলেই কাউকে পাবেন যার আপন দুলাভাই কিংবা ভায়রা ভাই হচ্ছেন কোনো তালেবর ব্যক্তি। তার মাধ্যমে কাজ করুন। আইন? আইনের হাত বেঁধে ফেলা হচ্ছে। অন্তত চেষ্টা চলছে। বুঝবেন। নিজেই বুঝবেন। হা হা হা। উঠলেন নাকি?

জি উঠছি।

মামলাটা আমি নিচ্ছি না --কিছু মনে করবেন না। প্রথম দিন যে টাকা দিয়েছিলেন সেটি ফেরত দেয়া উচিত কিন্তু দিচ্ছি না। কারণ আমি কিছু উপদেশ দিয়েছি। প্রফেশন্যাল এডভাইস। ওর একটা চার্জ আছে। আচ্ছা বিদায়।

## ৩৬

বাকেরের চেহারায় আজ বিরাট পরিবর্তন। মাথার চুল কামিয়ে ফেলেছে। চকচক করছে মাথা। বাকের হাসিমুখে বলল, উকুনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে এই কাণ্ড করেছি। খবু খারাপ লাগছে?

মুনা কিছু বলল না। এই জায়গায় ভাল লাগা খারাপ লাগার কোনো ব্যাপার নেই।

শোন মুনা, সুন্দর দেখে একটা ছেলের নাম দাও তো।

কেন?

ইয়াদ এসেছিল। ওর একটা ছেলে হয়েছে। আমার কাছে নাম চায়।

মুনা বিরক্ত হয়ে বলল প্রথম ছেলে হলে ছেলের বাবার সঙ্গে যার দেখা হয় তার কাছেই নাম চায়। ওটা কোন ব্যাপার না। আপনার কি ধারণা আপনি নাম দিলেই উনি সেই নাম রাখবেন?

বাকের চুপ করে গেল।

আজ যাই।

এখনই যাবে?

থেকে করবটা কী?

তাও তো ঠিক। আচ্ছা মুনা ঐ মেয়েগুলি আছে কেমন?

কোন মেয়েগুলি?

ঐ যে তিনটা মেয়ে?

কি আশ্চর্য। আমার কি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে নাকি যে বলব কেমন আছে।

তাও তো ঠিক।

আপনার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। উনি চেষ্টা-চরিত্র করবেন। ধৈর্য ধরে থাকুন।

বাকের কিছু বলল না। নিজের চুলশূন্য মাথায় হাত বুলাতে লাগল।

টাকা-পয়সা কিছু লাগবে?

না। মুনা চলে আসবার সময় বাকের বলল, চুলগুলি ফেলে দেওয়ায় একটা অসুবিধা হয়েছে।

আগে একটা টাকা দিলেই মাথা বানিয়ে দিত। খুবই আরামের ব্যাপার। এখন চুল না থাকায় কোনো আরাম পাই না।

## ৩৭

শ্রাবণ মাসের গোড়াতে শওকত সাহেবের শরীর খুব খারাপ করল। তিনি প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। কাজের মেয়েটিও নেই। খুব ঝামেলা। মুনা অফিসে চলে গেলে সামান্য এক গ্লাস পানিও নিজেকে গড়িয়ে খেতে হয়। তাতেও কষ্ট হয়। এক সন্ধ্যায় তার অসুখ বেশ বাড়ল। প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে গা কাঁপিয়ে জ্বর। বাইরে ঘোর বর্ষা। বৃষ্টিতে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে। সন্ধ্যা থেকেই ইলেকট্রিসিটি নেই। মুনা হারিকেন জ্বালিয়ে মামার ঘরে নিয়ে গেল। তিনি বললেন, কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। তুই এখানে খানিকক্ষণ বসে থাক।

মুনা বসল। শওকত সাহেব এলোমেলা ভাবে দু'একটা কথাটথা বলতে চেষ্টা করলেন। সবই বকুলকে নিয়ে। গত মাসে বকুল এসেছিল। খবর না দিয়ে আসা। জহিরের মামাতো ভাইয়ের বিয়ে নারায়ণগঞ্জে সেখানে যাবার পথে ঘণ্টা তিনেকের জন্যে এ বাড়িতে থাকা। মুনা সে সময়টা বাসায় ছিল না। শওকত সাহেব বকুলের গল্প পঞ্চাশবার করেছেন। প্রতিবারেই নতুন নতুন কিছু তথ্য যোগ হয়েছে। মুনার কেমন সন্দেহ হয় বেশির ভাগই বোধ হয বানানো। আজও সেই গল্পই শুরু হল।

মেয়েটা সুন্দর হয়েছে খুব, বুঝলি মা খুব সুন্দর।

সুন্দর হবারই তো কথা। বিয়ের পর মেয়েরা সুন্দরী হয়। এটাই নিয়ম।

সবাই হয় না। যারা সুখী হয় তারাই হয়। মেয়েটা সুখী হয়েছে। আর হবে না কেন বল ছেলেটা তো ভাল। ভাল না?

হ্যাঁ ভাল।

এসেই পা ছুঁয়ে সালাম করল।

কী যে তুমি বল মামা। তোমার জামাই আর তোমাকে পা ছুঁয়ে সালাম করবে?

না মানে সবাই তো করে না। আজকালকার ছেলে। জহির বিদেশ যাচ্ছে বুঝলি।

কবে যাচ্ছে?

এখনো ঠিক হয়নি। চেষ্টা চলছে। তার এক চাচা থাকেন ইংল্যান্ডে। তিনিই ব্যবস্থা করছেন।

ভাল।

একবার গেলে বকুলকেও নিয়ে যাবে তাই না?

নেওয়াই তো উচিত।

দেশ বিদেশ দেখা হবে মেয়েটার ভাগ্যের ব্যাপার তাই না?

তাতো বটেই। আচ্ছা মামা আমার কথা বকুল কিছু জানতে চায়নি, তাই না?

শওকত সাহেব থতমত খেয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, জানতে চাইবে না কেন? চেয়েছে। অনেক কথা জিজ্ঞেস করেছে।

কি জিজ্ঞেস করেছে?

তিনি সে সব কিছু বলতে পারলেন না। মুনা মৃদু হাসল। বকুল কিছুই জানতে চায়নি। কিন্তু কেন চাইবে না?

মামা। তুমি শুয়ে থাকে। আমি খাবার তৈরি করি। রুটি খাবে তো?

হ্যাঁ। আরেকটু বস। ঝড় কমুক।

ঝড় কোথায় দেখলে তুমি! বাতাস দিচ্ছে। তুমি শুয়ে থাক। কয়েকটা রুটি বানিয়ে চলে আসব। বেশিক্ষণ লাগবে না। তুমি খানিকক্ষণ থাকতে পারবে অন্ধকারে? হারিকেনটা নিয়ে যাই।

রুটি বানাতে মুনার অনেকক্ষণ লাগল। চুলায় কি একটা হয়েছে। বারাবার নিভে যাচ্ছে। রান্নাঘরের জানালার কবাট একটা ভাঙা। বাতাসের ঝাপটায় হারিকেন নিভে যাচ্ছে। যন্ত্রণার এক শেষ।

মুনা রুটি বানিয়ে মামার ঘরে এসে দাঁড়াল। হালকা গলায় ডাকল, মামা ঘুমিয়ে পড়েছ?

মামা জবাব দিল না। দ্বিতীয়বার মামাকে ডাকতে গিয়ে তার গলা কেঁপে গেল। কেউ তাকে বলে দেয়নি কিন্তু সে জানে মামা আর কোনো প্রশ্নের জবাব দেবেন না। মুনা খুব সাবধানে হরিকেনটি মেঝেতে নামিয়ে রাখল। সে বুঝতে পারছে না এখন কি করবে। চিৎকার করে কাঁদবে? ছুটে যাবে রাস্তায়? কিন্তু কোনটিই করতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে বারান্দায় বেরিয়ে এল। বৃষ্টির ছাঁট এসে গায়ে লাগছে। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তার আলোয় চারদিক ঝলমল করে উঠছে। আবার সব ঢেকে যাচ্ছে অন্ধকারে। বৃষ্টির শব্দ, বাতাসের শব্দ, বজ্রপাতের শব্দ তবুও কী অসম্ভব নীরবতা চারদিকে।

ছোটবেলায় মুনা যখন একলা হয়ে পড়েছিল তখন তার এই মামা তাকে নিয়ে এসেছিলেন নিজের কাছে। ঝড়-বৃষ্টির রাতে তার বড় ভয় লাগত। মামা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতেন নিজের বিছানায়। ফিসফিস করে বলতেন, ভয় কি রে পাগলী, আমাকে শক্ত করে ধরে থাক। মুনা তাঁকে শক্ত করে ধরে থাকত তবু ভয় কাটত না। মুনা বারান্দায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এক সময় তার পা ভার হয়ে এল। সে বাচ্চা মেয়েদের মত পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মেঝেতে। ফিসফিস করে সম্ভবত নিজেকে শোনাবার জন্যেই বলল, তোমাকে কতটা ভালবাসি এই কথা কি মামা আমি কোনোদিন তোমাকে বলেছি?

## ৩৮

চার মাস হাজতবাসের পর হঠাৎ বিনা নোটিশে বাকের ছাড়া পেয়ে গেল। দুপুর বেলা রুটি আর ডাল খেয়ে সবে বিড়ি ধরিয়েছে. ডিউটির একজন সেপাইকে ডেকে নরম স্বরে বলেছে, ভাইজান একটা পান এনে দেন। রিকোয়েস্ট। বমি বমি লাগছে। ঠিক তখন ঘটনাটা ঘটল। জমাদার হাজতের দরজা খুলে বলল, ওসি সাহেব ডাকে।

বাকেরের খুব ইচ্ছে হল বলে, তোমার ওসিকে এখানে আসতে বল। বলেই ফেলত শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলাল। সময় খারাপ। মারধর করবে। রুল দিয়ে আচমকা পেটে এমন গোঁতা মারে যে চোখ অন্ধকার হয়ে যায়। গত শুক্রবারে একজন পেটে গোতা খেয়ে রক্ত পেচ্ছাব করতে লাগল। হাসপাতালে নিয়ে যাবার নাম করে বের করে নিয়েছে। হাসপাতালে নিশ্চয়ই নেয়নি রাস্তায় নিয়ে ফেলে দিয়ে এসেছে। এর নাম পুলিশ। এদের যত কম ঘাটানো যায় ততই ভাল।

ওসি সাহেব বাকেরকে দেখে হাই তুললেন। বিকট হাই। বাকের বিনীত ভঙ্গিতে বলল, কী জন্যে ডেকেছেন স্যার?

বসুন।

বাকের চমকে উঠল এতদিন এই লোক তুমি তুমি করেছে। আজ আপনি বলছে। কেউ কলকাঠি নেড়েছে কি না কে জানে। তুমি-আপনির এই ব্যাপারটা বেশ ভাল। অনেক কিছু বোঝা যায়। বাকের বসল।

খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

জি স্যার।

বাড়ি যেতে চান?

যেতে দিলে যাব।

তাহলে কাগজ-কলম নিন। মুচলেকা দিতে হবে। লিখুন রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কাজে লিপ্ত থাকিব না। আইন-শৃঙ্খলা মানিয়া চলিব। লিখে সই করুন। এই নিন কলম।

বাকের হাসিমুখে বলল, রাষ্ট্র বানান কি স্যার?

যা মনে আসে লিখে ফেলেন। বুঝতে পারলেই হল আর আসল কথাটা মন দিয়ে শুনুন। এখন থেকে প্রতি মঙ্গলবারে একবার হাজিরা দিতে হবে। পারবেন তো?

জি পারব।

ঐটাও লিখুন- প্রতি মঙ্গলবার একবার থানায় হাজিরা দিব। থানার নাম লিখুন।

ওসি সাহেব আবার একটা বিকট হাই তুললেন। বাকের ওসি সাহেবের পাশে বসা সেকেন্ড অফিসারকে বলল, স্যার রাষ্ট্র বানানটা কি হবে একটু কাইন্ডলি বলবেন?

চৈত্র মাসের ঝাঁঝাঁ রোদে বাকের রাজকীয় চালে হাঁটছে। দু'টাকা পঁচিশ পয়সা দিয়ে সে একটা বেনসন কিনেছে। হাজতে যাবার আগে দেড় টাকায় পাওয়া যেত—চার মাসে এতটা দাম বেড়েছে দেশটার হচ্ছে কি? দেশের চিন্তা তাকে খুব বেশি বিচলিত করল না। তার বড় ভাল লাগছে। চৈত্র মাসের তপ্ত হাওয়াও বড়ই মধুর মনে হচ্ছে। পকেটে পঁচিশ টাকার মতো আছে। এখন আর অতি সাবধানে এই টাকা খরচ করতে হবে না। ব্যবস্থা একটা হবেই।

মীরপুর রোডে উঠে সে রিকশা নিল। হুড ফেলল না। মাথার উপরের কড়া রোদও ভাল লাগছে। চমৎকার দিন। আকাশ ঘন নীল। দৃষ্টি পিছলে যায় তবু তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগে। বাকের হালকা গলায় রিকশাওয়ালাকে বলল, রিকশা কোন জায়গার?

রিকশাওয়ালার সঙ্গে কথা শুরু করার জন্যে এটা হচ্ছে সবচে ভাল ডায়ালগ। সব রিকশাওয়ালাই এই প্রশ্নের জবাব খুব আগ্রহ করে দেয়। আজকের এই রিকশাওয়ালা জবাব দিল না। বাকের দ্বিতীয়বার বলল, রিকশা কোন জায়গার ভাই? রিকশাওয়ালা তিক্ত গলায় বলল, হেইটা দিয়া আপনের কী দরকার?

অন্য সময় হলে চট করে বাকেরের মাথায় রক্ত উঠে যেত। আজ সে রকম হল না। বরং রোগা আধবুড়ো রিকশাওয়ালার জন্যে সে মমতা বোধ করল। কেমন টপটপ করে ঘামছে। ন্যায্য ভাড়ার উপরেও ব্যাটাকে দু'টাকা বকশিস ধরে দিতে হবে। ভাগ্যিস সে রিকশাওয়ালা হয়ে জন্মায়নি। প্যাসেঞ্জার নিয়ে এই দুপুরে রোদে বেরুতে হলে সর্বনাশ হয়ে যেত। বাকের দরাজ গলায় বলল, আস্তে চালাও ভাই। তাড়াহুড়ার কিছু নাই। সিগ্রেট খাবে?

বাকের তার আধখাওয়া বেনসন বাড়িয়ে ধরেছে। রিকশাওয়ালা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কিন্তু সিগারেটের জন্যে কোনো আগ্রহ দেখাল না। ব্যাটা নবাবের বাচ্চা একটা চড় দিলে হারামজাদা তার বাপের নাম ভুলে যাবে। বাকের অবশ্যি চড় দিল না। দু'টাকা বকশিসের জায়গায় এক টাকা বকশিস দিল। বেয়াদবি না করলে দু'টাকাই পেত। হারামজাদার কপালে নেই কি করা যাবে।

জলিল মিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। জলিল মিয়ার চোখে চশমা, গায়ে ধবধবে পাঞ্জাবি। পেট আরো বড় হয়েছে। সে দোকানের বাইরে গ্যাসের চুলার কাছে বসে আছে। বিশাল কড়াইয়ে তেল গরম হচ্ছে। কারিগর এলেই জিলিপি ভাজা শুরু হবে। গত এক মাস ধরে তার দোকানে প্রতি বিকালে জিলিপি ভাজা হচ্ছে। সস্তায় ভাল কারিগর পাওয়া গেছে। রোজ আধমণের ওপর জিলিপি বিক্রি হয়। অবস্থা দেখে মনে হয় এই ব্যবসাটা তার কপালে লেগে গেছে। একবার যদি নাম ফেটে যায়- "জলিল মিয়ার জিলিপি" তাহলে আর দেখতে হবে না।

এই সব ব্যবসা হচ্ছে ভাগ্যের ব্যবসা। একই কারিগর তিন জায়গায় জিলিপি বানাবে এক জায়গায় লাগবে দু'জায়গায় লাগবে না। লেগে গেলেও যন্ত্রণা, কারিগরকে চোখে চোখ রাখতে হবে। কে কখন ভাগিয়ে নিয়ে যায়। এখন বাজছে তিনটা। কারিগর আসছে না। লোক পাঠানো হয়েছে। জলিল মিয়া মনের উদ্বেগ চাপতে পারছে না— এর মধ্যে উপস্থিত হয়েছে বাকের। আবার কোন যন্ত্রণ করবে কে জানে?

বাকের দোকানে ঢুকতে ঢুকতে বলল, তারপর কেমন চলছে?

জলিল মিয়া শুকনো গলায় হাসল। অতিরিক্ত দরদ ঢেলে জিজ্ঞেস করল, কবে ছাড়া পেলেন বাকের ভাই?

বাকের এই প্রশ্নের জবাব দিল না। হাজত প্রসঙ্গটা সে ভুলে থাকতে চায়। সে উদাস দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, এখানকার খবর কী জলিল মিয়া?

জ্বি ভাল।

সিদ্দিক হারামজাদা কেমন আছে?

জলিল মিয়া চুপ করে রইল। বাকের উদাস গলায় বলল, হারামজাদাটাকে খুন করবার জন্যে এসেছি? বডি ফেলে দেব। টপ করে ফেলে দেব। আমার সাথে হুজ্জত। শালার পোঁদ পেকে গেছে। পোঁদ পাকার ওষুধ আমার কাছে আছে।

ইলেকশন করবেন। কমিশনার ইলেকশন। ৬নং ওয়ার্ড।

ছয় নম্বর ওয়ার্ড আমি শালার পাছা দিয়ে ঢুকায়ে দেব। ছয় নম্বর ওয়ার্ড। শালা খবিস।

একটু আস্তে কথা বলেন বাকের ভাই।

আস্তে কথা বলব কেন? এটা কী মসজিদ নাকি?

না মানে লাগানি-ভাঙানির লোক আছে তো।

আমি ভয় খাই নাকি? আমি ভয় খাওয়ার লোক?

জলিল মিয়া বিমর্ষ মুখে তাকাতে লাগল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে বড় রকমের ঝামেলা শুরু হতে যাচ্ছে। শুরুটা তার দোকান থেকে না হলেই ভাল হত। সিদ্দিক সাহেব বর্তমানে পাড়ার মুরুব্বি। মানী লোক। উঠতি গুণ্ডা প্রায় সব ক'টাকে হাত করে ফেলেছেন। দু'একটা অচেনা মুখ আজকাল তাঁর সঙ্গে দেখা যায়। ওদের চালচলন ভাল না। একজন সেদিন তার স্টলে এসে চা ওমলেট খেল। দাম না দিয়ে চলে যাচ্ছিল। আটকানোর পর দাম দিল ঠিকই কিন্তু এমন করে হাসল যে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যায়। নির্বিঘ্নে ব্যবসা করার দিন শেষ। জলিল মিয়া একা ক'দিন সামলাবে।

জলিল মিয়া!

জি বাকের ভাই।

ঐ বাড়ির খবর কি?

কোন বাড়ির?

ঐ যে তিন কন্যার বাড়ি?

কিছু জানি না তো।

কিছু জানি না মানে? খোঁজখবর রাখ না?

নানান ধান্ধায় থাকি। ব্যবসাপাতির অবস্থা খুব খারাপ।

কি বল ব্যবসাপাতির অবস্থা খারাপ। দশ সের গোসত লেগেছে তোমার শরীরে। আধাসের আধাসের করে তোমার দুই গালেই আছে একসের। গোসত তো আর আপনা-আপনি হয় না।

চা দিব বাকের ভাই? ক্লোন চা আছে। ইসপিসাল।

বাকের জবাব না দিয়ে উঠে পড়ল। পাড়ায় একটা চক্কর দেবে। এর মধ্যে পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে তো ভালই দেখা না হলেও ভাল। ভালমত সাবান দিয়ে একটা গোসল দেয়া দরকার। ইয়াদের বাসায় যাওয়া যেতে পারে। গোসলের পর গরম চা আর একটা বেনসন খেয়ে লম্বা ঘুম।

পরিচিতদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে দেখা হল একজন হচ্ছে মোহসিন। বেশ কিছু দিন সে বাকেরের শাগরেদী করে এখন জগন্নাথ কলেজে বি কমে ভর্তি হয়েছে। শুক্রবারে জুম্মার নামাজ পড়ে। বাকেরের সঙ্গে দেখা হলে না চেনার ভান করে। আজ অবশ্যি তা করল না। চোখ কপালে তুলে বলল, বাকের ভাই না?

হুঁ। আছ কেমন?

কবে ছাড়া পেলেন বাকের ভাই?

বাকের গম্ভীর গলায় বলল, ছাড়া পাইনি। ছুটি নিয়ে এসেছি। সিদ্দিক হারামজাদাকে খুন করার জন্যে ছুটি নিলাম। খুন করে আবার গিয়ে ঢুকে পড়ব।

কি যে বলেন বাকের ভাই।

কথাবার্তা পছন্দ হয় না? সত্যি কথা বললাম।

আপনার চেহারা খারাপ হয়ে গেছে বাকের ভাই।

চেহারা দিয়ে আমি করব কী বল, আমি তো আর সিনেমায় পার্ট করব না।

বাকের তাকে আর কিছু বলার সময় না দিয়ে এগিয়ে গেল। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হবার ইচ্ছাটা মরে যাচ্ছে। তবু দ্বিতীয়জনের সঙ্গে দেখা হল জোবেদ আলি। এই চার মাসে লোকটা যেন আরো বুড়ো হয়ে গেছে। যে ভাবে মাথা নিচু করে হাঁটছে তাতে মনে হয় পিঠে কুঁজ গজিয়ে যাবে। জোবেদ আলি বাকেরকে না দেখার ভান করে সরে পড়তে চাইছিল। বাকের সে সুযোগ দিল না। এগিয়ে গেল এই যে ব্রাদার, পালাচ্ছেন নাকি?

জোবেদ আলি আমতা আমতা করে বলল-- কে?

চিনতে পারছেন না? ভাল করে দেখেন। মাথাটা কামিয়ে ফেলেছি। বাকি সব ঠিকই আছে।

আমার কিছু মনে থাকে না।

সুন্দরী সুন্দরী মেয়ে চারপাশে নিয়ে থাকেন মনে না থাকারই তো কথা। আমার নাম বাকের।

ও আচ্ছা বাকের সাহেব।

চিনতে পারছেন তাহলে?

জি। অনেকদিন আপনাকে দেখি নাই।

দেখবেন কি করে-- আমি হাজতে ছিলাম। আপনাদের দোয়ায় আজ ছাড়া পেয়েছি।

জোবেদ আলির চোখ সরু হয়ে গেল। চশমা ঝুলে পড়ল। সে প্রায় ফিসফিস করে বলল, এখন যাই। কাজ আছে।

আরে ভাই এই চৈত্র মাসের দুপুরে কিসের কাজ? দাঁড়ান একটু গল্পগুজব করি। মেয়ে কি আপনাদের এখনো তিনটাই না আরো বাড়িয়েছেন?

আপনার কথা বুঝলাম না।

বিজনেস আরো বড় করেছেন না আগের মত ছোটখাটো আছে?

আপনি খুব বেতালা কথা বলেন।

তাই নাকি?

বেতালা কথা বেশি বলা ভাল না।

জোবেদ আলি হাঁটা শুরু করল। মাথা নিচু করে চোরের মতো ভঙ্গিতে হাঁটা। একবার শুধু থমকে দাঁড়িয়ে পেছনে ফিরল। বাকের তাকিয়ে আছে। তার মুখ হাসি হাসি। কিছুক্ষণ আগে যে বিরক্তি তাকে ঘিরে ছিল এখন আর তা নেই। তার বেশ মজা লাগছে। ইয়াদের বাসায় যাবার ব্যাপারে এখন বেশ আগ্রহ বোধ করছে।

ইয়াদ বাসায় ছিল না।

দরজা খুলল তার বৌ। ছোটখাটো একটা মেয়ে মাত্র গোসল করে এসেছে। চুলে গামছা জড়ানো গায়ের শাড়িও ভালমত পরা নেই। সে ভেবেছে ইয়াদ। কড়া নাড়া মাত্র দরজা খুলে এমন হকচকিয়ে গেছে। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, উনি বাসায় নেই।

কোথায় গেছে?

অফিসে।

আমার নাম বাকের। আজ হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছি।

মেয়েটি কিছুই বলল না। সে শাড়ি দিয়ে নিজেকে ভালমত ঢাকতেই ব্যস্ত।

ইয়াদ আসবে কখন?

সন্ধ্যার পর আসবে। আপনি সন্ধ্যার পর আসুন।

মেয়েটি এমন ভাবে দরজা বন্ধ করল যেন সে একজন ভিখিরিকে পয়সা দিয়ে বিদেয় করে দিচ্ছে। বাকেরের মন অসম্ভব খারাপ হয়ে গেল। মেয়েটা বলতে পারত আপনি বসুন। বসুন বললেই তো সে খালি বাড়িতে হুট করে ঢুকে যেত না। মেয়েটি তাহলে এ রকম করল কেন? কোথায় যাওয়া যায়? সারা গায়ে প্রচুর ফেনা তুলে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল কবার জন্যে মন কেমন করছে। গোসলের পর গরম এক কাপ চা। একটা ফাইভ ফাইভ কিংবা বেনসন।

বাকের আবার রাস্তায় নামল। সূর্য হেলে পড়েছে। কিন্তু এখনো তার কী প্রচণ্ড তেজ। রাস্তায় পিচ গলে যাচ্ছে। জুতার সঙ্গে লেগে সমান মোটা হলে একটা কথা ছিল-- একটা বেশি উঁচু অন্যটা কম। যার জন্যে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে।

বাকের ভাই না? কবে ছাড়া পেয়েছেন?

অচেনা একটা ছেলে। দাঁত বের করে আছে ইয়ারকি দিতে চায় সম্ভবত। কিংবা তাকে দেখে যে কোন কারণেই হোক মজা পাচ্ছে।

আপনাকে অবিকল কোজাকের মতো লাগছে।

তাই নাকি?

ছেলেটি মাথা ঝাঁকাল। বাকের একবার ভাবল ব্যাপারটা গুরুত্ব দেবে না। চেংড়া ছেলেপুলের সব কথা ধরতে নেই। তবু শেষ সময়ে মাথায় কি যেন হল বাকের প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল। ছেলেটি ছিটকে পড়ল রাস্তায় - সেখান থেকে গড়িয়ে গেল আরো কিছু দূর। সে হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে। কপাল ফেটে গলগল করে রক্ত পড়ছে।

বাকের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। চায়ের পিপাসা হচ্ছে। জলিল মিয়ার স্টলে গিয়ে এক কাপ চা খেলে হয়। মুখের ভেতরটা তেতো লাগছে। সারা শরীরে ঘামের কটু গন্ধ। আশ্চর্য কোথাও গিয়ে সে কি শান্তিমত একটা গোসলও করতে পারবে না? মুনার কাছে গেলে কেমন হয়?

ঠিক এই অবস্থায় মুনার সামনে উপস্থিত হবার কোন মানে হয় না। তাছাড়া মুনাকে এখন নিশ্চয়ই পাওয়াও যাবে না। অফিস করছে। সন্ধ্যার আগে ফিরবে না। অফিস করা মেয়েগুলি আবার অফিস ছুটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসায় ফিরতে পারে না। সাজানো-গোছানো দোকান দেখলেই তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঘণ্টা খানিক চলে যায়।

বাকের সন্ধ্যার পর পর মুনাদের বাসার দিকে রওনা হল। ইতিমধ্যে তার বেশভূষা পাল্টে গেছে। গায়ে ইস্ত্রি করা পাঞ্জাবি (ইয়াদ দিয়েছে), নতুন স্যান্ডেল (কেনা হয়েছে,), পকেটে নতুন রুমাল (কেনা)। গালে আফটার শেভ দেয়ায় ভুরভুর করে গন্ধ বেরুচ্ছে। এটা একটু অস্বস্তিকর। আফটার শেভ না দিলেই হত।

মুনাদের বাসায় বিরাট এক তালা ঝুলছে। বাকের তালা ধরেই খানিকক্ষণ ঝাঁকাঝাঁকি করল। অফিস থেকে এখনো ফিরেনি তা কি করে হয়? আটটা বাজে। রাত আটটা পর্যন্ত মুনা বাইরে ঘুরবে নাকি? তালার সাইজ দেখে মন হয় মুনা বেশ কিছু দিন ধরেই বাইরে। অফিসযাত্রীরা এত বড় তালা লাগায় না।

রাত ন'টার দিকে বাকের আবার গেল। এখনো তালা ঝুলছে। ঘর অন্ধকার। বাড়িওয়ালার কাছ থেকে জানা গেল দিন দশেক আগে মুনা তাকে বলেছে সে কিছু দিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কবে ফিরবে কিছু বলে যায়নি।

বাকের থমথমে গলায় বলল, কোথায় গেল জিজ্ঞেস করলেন না?

বাড়িওয়ালা বিরক্ত স্বরে বলল, আমার এত ঠেকা কিসের?

কথার ধরনে বাকেরের রাগ উঠে যাচ্ছিল। অনেক কষ্টে সে রাগ থামাল। মনে মনে কয়েকবার বলল-- লাশা, লাশা। উল্টো করে শালা বললে রাগ নাকি কমে যায়। এই জিনিসটা সে হাজতে শিখে এসেছে। ব্যাপারটা সত্যি না। বাকেরের রাগ কমল না। তবুও সে কয়েকবার বলল -- লাশা লাশা।

বাড়িওয়ালা হারামজাদা, মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল।

## ৩৯

জাহানারা গা ধুয়ে ছাদে গিয়ে বসেছে।

কদিন ধরেই অসহ্য গরম। গা ধুয়ে ছাদে বসে থাকলে কিছুক্ষণ ভাল লাগে তারপর আবার শরীর ঘামতে থাকে। ইচ্ছে করে বিরাট কোনো দিঘিতে ডুবিয়ে বসে থাকতে। পদ্মদিঘি-- যার জলে টাটকা পদ্মের গন্ধ।

আজ ছাদে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। বাতাস একেবারেই নেই। অনেক দূরের আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। লোক দেখানো বিদ্যুৎ। বৃষ্টি বাতাস হবে না। জাহানারা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। ছাদে বসে থাকার কোনো অর্থ হয় না। এরচে বসার ঘরে ফ্যানের নিচে বসে থাকা ভাল। বাতাস খানিকটা লাগবে।

বড় আপা।

জাহানারা চমকে তাকাল। মীরা উঠে এসেছে। সে তার স্বভাবমত পা টিপে টিপে এসে কানের কাছে চেঁচিয়েছে। বড় আপা।

চমকে দিয়েছি আপা?

হুঁ। খুব খারাপ অভ্যাস মীরা। মানুষকে চমকে দিয়ে তোর লাভটা কি হয়? কেন এ রকম করিস?

আর করব না। নিচে যাও আপা। তোমার কাছে একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

আমার কাছে এত রাতে?

রাত তো বেশি হয়নি আপা। মোটে ন'টা একুশ। ভদ্রলোক আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ি দেখলাম।

কে সে?

জানি না কে? খুব ভীতু ভীতু চেহারা। আমাকে আপনি আপনি করে কথা বলল। এটা কি মিস জাহানারার বাসা? উনি কি আছেন? তাঁকে দয়া করে বলবেন মামুন সাহেব এসেছেন। নিজেকে চমৎকার করে সাহেব বলল। আমি আর একটু হলে হেসে ফেলেছিলাম।

জাহানারা বিস্মিত হয়ে নিচে নেমে এল। এত রাতে হুট করে বাসায় উপস্থিত হবার কোন মানে হয়? তার সঙ্গে এমন কোন ঘনিষ্ঠতা নিশ্চয়ই নেই।

মামুনের মুখে অপ্রস্তুত একটা ভঙ্গি। এত রাতে উপস্থিত হবার কারণে সে নিজেও যে লজ্জিত তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কাজটা যে ভাল হয়নি চলে যেতে পারলে সে বাঁচে এই ভাবটা স্পষ্ট। জাহানারার একটু মায়াই লাগল।

আরে আপনি।

অসময়ে এসে পড়েছি। খুবই লজ্জিত। এত রাত হয়েছে বুঝতে পারিনি।

দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন। রাত এমন কিছু বেশি হয়নি।

আগেও কয়েকবার এসেছি আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি। একবার অবশ্যি বাসাতেও এসেছিলাম।

কই আমাকে তো কেই কিছু বলেনি।

না মানে আপনাকে বলবার কথাও নয়। আমি রাস্তা থেকে চলে গেছি।

কি আশ্চর্য কেন?

সেবারও রাত হয়ে গিয়েছিল। ভাবলাম এত রাতে বিরক্ত করা।

আপনার বান্ধবী কেমন আছেন?

প্রশ্নটা করে জাহানারা নিজেই খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে গেল। হঠাৎ করে বান্ধবীর প্রসঙ্গ নিয়ে আসার কোনোই কারণ নেই। কিংবা কে জানে হয়ত কারণ আছে। হয়ত তার অবচেতন মনে এই প্রসঙ্গটা আছে।

মুনার কথা বলছেন?

জি।

ওর কোন খবর পাচ্ছি না। বাসায় তালা। দু'দিন গিয়ে ঘুরে এসেছি। কোথায় গেছে তাও কেউ জানি না।

অফিসে যান। অফিসে গেলেই নিশ্চয়ই খোঁজ পাবেন। অফিসে গিয়েছিলেন?

জি না।

মামুনের মন একটু খারাপ হল। অফিসের কথা তার মনে আসেনি।

চা খান।

জি না চা খাব না। আজ উঠি।

এসেই উঠবেন কেন? বসুন গল্পটল্প করুন। আপত্তি না থাকলে রাতে আমাদের সঙ্গে খান।

মামুন কিছু বলল না। জড়সড় হয়ে বসে রইল। তার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খাওয়ার ব্যাপারে তার কোনো আপত্তি নেই। অথচ খাবার কথাটা জাহানারা নিতান্তই ভদ্রতা করে বলেছে। ঘরে আয়োজন খুবই সানান্য। দুপুরের তরকারির অবশিষ্ট দিয়ে রাতে চালানোর কথা। জাহানারা একবার ভাবল বলবে থাক আপনার খাওয়ার দরকার নেই মেনু খুব খারাপ। অন্য একদিন এসে খেয়ে যাবেন। কিন্তু এ জাতীয় কোন কথা বলাও সম্ভব নয়। একটু আগে খেতে বলে পরমুহূর্তে না বলা যায় না। জাহানারা তাকে বসিয়ে রেখে রান্নাঘরে চলে গেল।

অসহ্য গরমে রান্নাঘরে ঢোকা মানে নরকে প্রবেশ করা। নতুন কিছুই তৈরি করাও ঝামেলা। কয়েকটা শুকনো বেগুন ছাড়া কিছুই নেই। মা ভাল থাকলে এই নিয়েই কিছু-একটা করে ফেলতেন। মার শরীর দু'দিন থেকে খুব খারাপ। হাঁপানীর টান উঠেছে। ঘর অন্ধকার করে পড়ে আছেন।

রান্নাঘরে জাহানারার সামনে মুখ নিচু করে মীরা বসে আছে। সে একটু পর পর ফিক করে হেসে ফেলছে এবং সেই হাসি গোপন করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। জাহানারা বিরক্ত হয়ে বলল, হাসছিস কেন?

মীরা বলল, ঐ লোকটা কে আপা?

কেউ না। একজন চেনা লোক।

মীরা আবার হেসে ফেলল। জাহানারা ঝাঁঝাল গলায় বলল, গ্রামে যখন পোস্টিং হয়েছিল তখন এই ভদ্রলোক অনেক সাহায্য করেছেন। এখানে বেড়াতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভদ্রতা করে খেতে বলেছি তাতেই রাজি হয়ে আমাকে বিপদে ফেলেছেন-- এর মধ্যে হাসির কি আছে?

তুমি কৈফিয়ত দিচ্ছ কেন আপা?

কৈফিয়ত দিচ্ছি না। কৈফিয়ত দেবার কি আছে? তুই এখানে বসে না থেকে ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প কর। একা একা বসে আছেন।

আমি বরং লায়লা আপাদের বাসা থেকে এক বাটি তরকারি নিয়ে আসি?

কিছু আনতে হবে না।

মীরা তার আপার কথা শুনল না। পাশের বাসা থেকে তরকারি নিয়ে এল। সে ভেবেছিল আপা রাগ করবে। রাগ করল না। মুখ দেখে মনে হল খুশিই হয়েছে। মীরা চলে গেল বসার ঘরে। মামুন হাসিমুখে বলল, এস খুকি? কি নাম তোমার? মীরা বিরক্ত হল। লোকটা এখন আবার তুমি করে বলছে।

আমার নাম মীরা।

দু'বোন তোমরা?

দু'বোন এক ভাই। ভাই গেছে নানার বাড়ি বেড়াতে।

কি পড় তুমি?

ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ার। সাবজেক্ট হচ্ছে ফিলসফি।

কি সর্বনাশ। আমি ভেবেছিলাম এইট নাইনে বোধ হয় পড়; আগে টের পেলে খুকি বলতাম না। তোমার আপা কোথায়?

রান্নাঘরে। খেতে রাজি হয়ে আপনি আমাদের বিপদে ফেলেছেন। ঘরে খাবার কিছু নেই। পাশের বাড়ি থেকে বাটিতে তরকারি আনতে হল।

সে কি!

অবশ্যি ওরাও মাঝে মাঝে নিয়ে যায়। এটা কোন ব্যাপার না। শোধবোধ হয়ে যায়।

মামুন এই চমৎকার চেহারার ফুটফুটে মেয়েটির প্রতি গাঢ় মমতা বোধ করল। কি সুন্দর মুখে মুখে কথা বলছে। জাহানারা এ রকম নয়। কথা সে প্রায় বলেই না।

আপনি নাকি আপাকে অনেক সাহায্য-টাহায্য করেছেন। কি সাহায্য করেছেন?

আমি তো কোনো সাহায্য করিনি। উল্টো উনি আমাকে সাহায্য করেছেন। ব্যাংকের একটা লোনের ব্যাপারে খুব সাহায্য করেছেন।

উনি কিন্তু আপনার কথা আমাকে একবারও বলেননি।

আমার কথা কি বলবেন? আমার সম্পর্কে বলার তো কিছু নেই। আমি বরং উনার সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারি।

বলুন শুনি।

মামুন হেসে ফেলল। মীরা কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে আছে। অপরিচয়ের সংকোচ বলে কিছুই তার মধ্যে নেই। মামুনের মনে হল এই মেয়েটি তার বোনের কিছুই পায়নি। বালিকাভাব তার মধ্যে প্রবল। কেমন অবলীলায় পা নাচাচ্ছে।

মীরা বলল, চুপ করে আছেন কেন? আপার কথা বলুন।

তোমার আপা একা একা শ্মশানে ঘুরুত খুব পছন্দ করত।

সে কি?

হ্যাঁ, গ্রামের লোকজনের ধারণা--- তোমার আপার সঙ্গে জ্বীন আছে।

কি বলছেন এসব?

সত্যি কথাই বলছি। কেউ অদ্ভুত কিছু করলেই গ্রামের লোকজন মনে করে তার সঙ্গে জ্বীন আছে। অদ্ভুত কাণ্ডটা সে করছে না। জ্বীন তাকে দিয়ে করাচ্ছে।

আপনি কি কখনো জ্বীন দেখেছেন?

না। তবে জ্বীন নামানোর একটা আসরে ছিলাম।

ঐ গল্পটা বলুন।

অনেক লম্বা ব্যাপার-- আরেকদিন না হয় বলব।

আপনি আবার কবে আসবেন তার কি কোনো ঠিক আছে? আজই বলুন।

গল্প শুরু করা গেল না। জাহানারা শাড়ির আঁচলে ঘাম মুছতে মুছতে বসার ঘরে ঢুকল। ক্লান্ত গলায় বলল, খাবার নিয়ে আয় মীরা। রান্না হয়ে গেছে।

একটু পরে আনি আপা? উনি একটা জ্বীনের গল্প মাত্র শুরু করেছেন।

জাহানারা বিরক্ত গলায় বলল, গল্প আরেকদিন হবে। রাত হয়ে যাচ্ছে না? ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে।

ঝড়-বৃষ্টি হলে উনি থেকে যাবেন। অসুবিধা কি? ভাইয়ার ঘর তো খালিই আছে।

অকারণে বকবক করিস না তো।

মীরা উঠে গেল। মামুন বলল, আপনার বোনটিকে চমৎকার লাগল। একেবারে বালিকা স্বভাব। ইউনিভার্সিটিতে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে, বিশ্বাস হয় না।

ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আপনাকে কে বলেছে? ও এইবার মাত্র ক্লাস টেনে উঠেছে। ওর কথটাও বিশ্বাস করবেন না।

মামুন হেসে ফেলল। প্রথম বারেরমত জাহানারার মনে হল এই লোকটার হাসিটা তো বেশ সুন্দর। সহজ হাসি। সব মানুষ সরল ভঙ্গিতে হাসতে পারে না। মনের মধ্যে কুটিলতা তাদের হাসির মধ্যেও অদৃশ্য ভাবে ছায়া ফেলে।

মামুন বলল, আমি হুট করে আসায় আপনি কি আমার ওপর রাগ করেছেন?

না। রাগ করব কেন?

বিরক্ত যে হয়েছেন এটা বুঝতে পারছি। তবু যেতে ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা কি বলবে ভেবে পেল না।

মীরা এসে বলল, ভাত দেয়া হয়েছে।

জাহানারার মা হাসিনা বিছানায় শুয়ে থাকলেও কোথায় কি হচ্ছে সব বুঝতে পারেন। আজ তাঁর হাঁপানীব টান উঠেছে। শ্বাস নেবার কষ্টের সঙ্গে যোগ হয়েছে গরমের কষ্ট। সন্ধ্যাবেলায় আধকপালী মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। তবু এর মধ্যেও টের পেলেন অপরিচিত একজন যুবকের জন্যে এ বাড়িতে রান্নাবান্না হচ্ছে। তিনি বুঝতে পারছেন যুবক জাহানারার পরিচিত। অফিস করা মেয়েদের অনেক পরিচিত পুরুষ থাকে। এটা স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু তাই বলে তারা রাতে ভাত খাবার জন্যে থেকে যাবে কেন? তারা কি জানে না একজন অবিবাহিতা মেয়ের কাছে রাত-বিরাতে যেতে নেই। মেয়ে বা মেয়ের আত্মীয়-স্বজন কিছু মনে না করলেও আশপাশে লোকজন আছে না? কেউ যতি হঠাৎ করে একটা কথা বলে ফেলে তখন? মানুষের মুখেই জয় আবার মানুষের মুখেই ক্ষয়। মেয়ের নামে বদনাম বের হতে সময় লাগে না। কেউ একটা কথা বললে দশজন সেই কথাটা দশ রকম করে একশজনকে বলবে।

হাসিনা বিছানায় উঠে বসে বেড সুইচে বাতি জ্বালালেন। এটা তাঁর সংকেত। বাতি জ্বালানো মানে তিনি চান কেউ আসুক তার ঘরে। অন্ধকার ঘরের অর্থ হচ্ছে তিনি কারোর সঙ্গ কামনা করছেন না।

মীরা ঘরে ঢুকল। হাসিনা বললেন, কে এসেছে? মীরা গম্ভীর গলায় বলল, আপার বন্ধু।

আপার বন্ধু আবার কে?

আছে একজন। এতদিন আপা কাউকে বলেনি বলে আমরা জানতে পারিনি। এখন জানলাম।

তুই কি বলছিস?

ঠিকই বলছি মা। খুব শিগগিরই এ বাড়িতে বিয়ে লেগে যাবে। হলুদ বাট, মেন্দি বাট বাট ফুলের মউ।

হাসিনা কাতর গলায় বললেন, জাহানারাকে ডেকে আন তো।

মীরা আপা পাশে বসতে বসতে বলল, এখন ডাকা যাবে না। ওরা দুজন সুখ-দুঃখের কথা

বলছে।

হাসিনা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইলেন। জাহানারার মত মেয়ে নিজে একটা ছেলেকে পছন্দ করেছে, আলাদা একটা ঘরে বসে গল্পগুজব করছে এই ব্যাপারটা তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না। এখন যদি ইলেকট্রিসিটি চলে যায়? ইলেকট্রিসিটি চলে গেলে অবস্থাটা কি হবে? ঢাকা শহরের ইলেকট্রিসিটির কি কোন ঠিক আছে? হাসিনার প্রায় দম বন্ধ হয়ে আসছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ইচ্ছা করছে উঠে বসার ঘরে চলে যান এবং কঠিন গলায় বলেন - এই ছেলে, তুমি কেমন ভদ্রলোক বল তো এত রাত পর্যন্ত...হাসিনা আর ভাবতে পারলেন না। ভাবা সম্ভবও নয়। দিনকাল পাল্টে গেছে। কিছু বলতে ইচ্ছা করলেও বলা যায় না।

জাহানারা ঘরে ঢুকে শান্ত গলায় বলল, মা উনি আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

হাসিনা তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। এই ঘরের বাল্ব চল্লিশ পাওয়ারের। পরিষ্কার কিছু দেখা যায় না।

উনার নাম মামুন। গ্রামে যখন পোস্টিং ছিল তখন আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন।

মামুন এগিয়ে এসে পা ছুঁয়ে সালাম করল। হাসিনা তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ চোখে। ছেলেটা লম্বা আছে একটা ভাল দিক। তবে বয়স বেশি। জাহানারার চেয়ে সাত আট-বছরের বড় তো হবেই আরো বেশিও হতে পারে। গায়ের রঙ ময়লা। পুরুষ মানুষের গায়ের রঙ ময়লা হলে যায় আসে না। সভ্য ভদ্র বলেও মনে হচ্ছে পা ছুঁয়ে সালাম করল। কেউ করে না। নিজের ছেলেমেয়েরাই করে না তো অন্য মানুষ করবে। ছেলেটিকে তিনি তুমি বলবেন না আপনি বলবেন ভেবে পেলেন না।

মামুন বলল, আপনার শরীর কেমন?

বাবা আমি ভাল। তুমি বস।

আমি এখন যাই অন্য আরেকদিন এসে আপনার খোঁজ নেব।

এই ভদ্রতাটুকু হাসিনার ভাল লাগল। আবার আসব বলেনি - বলেছে আবার এসে আপনার খোঁজ নেব। ছেলেটা মন্দ হবে না। বিয়েশাদী অবশ্যি পুরোটাই ভাগ্য। কিছুই বলা যায় না।

হাসিনা আগ্রহ নিয়ে বললেন, বস একটু বস। বলেই মনে হল এতটা আগ্রহ দেখানো কি ভাল? মোটেই ভাল না। বসতে চাইলে বসবে। বসতে না চাইলে বসবে না।

মামুন বসল না। সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিল। যাবার আগে আরেকবার পা ছুঁয়ে সালাম করলে হাসিনার ভাল লাগত। করল না। পুরানো দিনের মত আদব-কায়দা কি আর এখন আছে? নেই। ভাল ভাল জিনিস কিছুই থাকবে না।

মামুন ঘর থেকে বেরুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। মুষলধারে বৃষ্টি। জাহানারার কেন যেন বার বার মনে হচ্ছিল আধভেজা হয়ে মামুন এক্ষুণি ফিরে আসবে। লেডিস ছাতা একটা ঘরে আছে তা নিয়ে দেয়া যাবে। কিংবা থেকেও তো যেতে পারে। অসুবিধা কি?

মামুন অবশ্যি ফিরল না।

## ৪০

মুনা জহিরের চিঠি পেয়ে নেত্রকোনায় চলে এসেছে। চিঠিতে সে ভেঙে কিছু বলেনি ; অস্পষ্ট ভাবে কিছু কথাবার্তা লেখা যা পড়ে মুনা চমকে উঠেছে। সাতদিনের ছুটি নিয়ে রওনা হয়েছে। সঙ্গে আছে বাবু। বাবু কয়েকবার ভয়ে ভয়ে জানতে চেয়েছে চিঠিতে কি লেখা? মুনা বিরক্ত হয়ে বলছে কিছু লেখা নেই।

লেখা না থাকলে তুমি এত ব্যস্ত হয়ে রওনা হচ্ছ কেন?

লেখা নেই বলেই রওনা হচ্ছি। কি হল বুঝতে পারছি না। বেশির ভাগ মানুষই হল বোকা এরা গুছিয়ে একটা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারে না। হয়ত গিয়ে দেখব কিছুই না। জহিরের চিঠিটা ছিল এ রকম--

শ্রদ্ধেয়া আপা,

আমার সালাম জানবেন। আশা করি ভালই আছেন। কয়েকদিন পূর্বে বাবুর এক পত্রে আপনাদের কুশল জানতে পেরে সুখী হয়েছি।

এখানকার খবর একমত। বকুলের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সমস্যা হয়েছে। আচ্ছা আপা, বকুলের কি মানসিক অসুস্থতার কোন পূর্ব ইতিহাস আছে? আমি ডাক্তার হিসেবে জানতে চাচ্ছি। দয়া করে অন্য কোন ভাবে নেবেন না। মাঝে মাঝে সে অর্থহীন কথাবার্তা বলে। তেমন উদ্বিগ্ন হবার কিছু

নাই। সাক্ষাতে সব বলব। ইতি।

তারা নেত্রকোনা পৌছল সন্ধ্যাবেলা। জহিরের বাড়ি শহরের একটু বাইরে। নেত্রকোনা কোর্ট রেল স্টেশনে নেমে রিকশায় আধঘণ্টার মত লাগে। বাড়ি দেখে মুনা মুগ্ধ। বিশাল বাড়ি। রাজ্যের গাছপালা বাড়িটা ঘিরে জঙ্গলের মত করে রেখেছে। পুরানো আমলের খিলান দেয়া বাড়ি। লোহার ভারী গেট। গেট থেকে বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত সুড়কি বিছানো পথ। জাফরি কাটা রেলিং-এ মাধবীলতার ঝাড়। মুনা মুগ্ধ গলায় বলল, চমৎকার। মাবু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, চমৎকার কোথায় আপা এ তো ভুতুড়ে বাড়ি।

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ানোর পর এটাকে সত্যি সত্যি ভুতুড়ে বাড়ি বলেই মনে হতে লাগল। কোনো সাড়াশব্দ নেই। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অথচ কোথাও বাতি জ্বলছে না। দু'তিন জায়গা থেকে এক সঙ্গে তক্ষক ডাকছে।

কামলা ধরনের একজন কে বারান্দায় বসে দড়ি পাকাচ্ছিল। বাইরে মানুষজন দেখেও তার কোনো ভাবান্তর হল না। দড়ি পাকানোর মনোযোগ যেন আরো বেড়ে গেল।

মুনা বলল, এই যে ভাই ভেতরে গিয়ে বলুন-- আমরা এসেছি।

লোকটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাড়িতে কেউ নাই।

সেকি! কোথায় গেছে?

মিরামপুর খালার ছোড মাইয়ার বিয়া।

আসবে কখন?

ঠিক নাই রাইতের টেরেনে আসত পারে আবার নাও আসতে পারে।

বাড়িতে আপনি ছাড়া কেউ নেই?

ময়নার মা আছে।

আমরা ঢাকা থেকে এসেছি। আমি বকুলের বড় বোন। থাকব এখানে। কিছু-একটা ব্যবস্থা করুন। এখন দড়ি পাকানোটা কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ রাখা যায় না? আপনি উঠে দাঁড়ান ময়নার মাকে খবর দিন।

লোকটি নিতান্ত অনিচ্ছায় দাঁড়াল। মুনা উঁচু গলায় বলল, কি রকম কাণ্ডকারখানা কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে বাতি জ্বলছে না কেন?

ইলেকট্রিক নেই। রাইত দশটার পরে ইলেকট্রিক আয়।

রাত দশটার পরে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে হবে কি? হারিকেন জ্বালান। নাকি ঘরে হারিকেনও নেই?

আছে।

মুনা নিজেই ভেতরে ঢুকে ডাকল, ময়নার মা, ময়নার মা। বাবু মুনার কাণ্ড দেখে খুব মজা পাচ্ছে। আপা কত সহজেই না কর্তৃত্ব নিয়ে নিচ্ছে। যেন সে এই বাড়িরই একজন, অপরিচিত কেউ না।

ময়নার মা এসে দাঁড়ানমাত্র মুনা বলল, গোসলের পানি গরম দাও তো ময়নার মা। ঘরে চা পাতা আছে? ভাল করে চা বানাও। আমরা ঢাকার মেহমান।

বকুলরা গিয়েছিল ঠাকরাকোনা। রাত বারোটার ট্রেনে বকুল এবং জহির এই দুজন ফিরেছে। বকুল আগে আগে বাড়ি ঢুকল। বারান্দার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল। মুনা আপার মত কে যেন বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছে। প্রথম কিছুক্ষণ সে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না। ভয় পাওয়া গলায় বলল, কে?

মুনা বলল, ভূত। কেমন আছিস রে বকুল?

আপা তুমি?

মুনা হাসল। বকুল বলল, আপা তুমি নাকি সত্যিই তুমি?

না মিথ্যা আমি।

বকুল শিশুদের মত গলায় চেঁচিয়ে উঠল আপা এসেছে আপা এসেছে মুনা আপা, মুনা আপা।

জহির বারান্দায় উঠে এসে দেখল বকুল তার আপাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে এবং কিছুক্ষণ পর পর বলছে - আপা এসেছে, মুনা আপা এসেছে।

মুনা বলল, ছাড় তো-- দম বন্ধ করে মারবি নাকি? জহির তুমি তোমার বউকে সামলাও।

জহির বিব্রত গলায় বলল, খুব নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়েছে। খবর দিয়ে এলে হত না? স্টেশনে থাকতাম।

কোন অসুবিধা হয়নি।

খাওয়া-দাওয়া করছেন আপা?

সব কিছু চমৎকার হয়েছে।

একা এসেছেন?

না। বাবুকে নিয়ে এসেছি। ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

বকুলকে দেখে মুনা বড় ধরনের একটা ধাক্কা খেল।

কি রোগা হয়েছে। কি অসম্ভব রোগা! চোখ দুটি বিশাল বড় লাগছে। কেমন অন্য রকম ভাবে জ্বলজ্বল করছে। মুনা তার মাথায় হাত রেখে মৃদু স্বরে বলল, কি হয়েছে তোর?

কি আবার হবে? কিছু হয়নি রোগা হয়েছি। কোন অসুখ-বিসুখ নেই। ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করে দেখ।

এত রোগাই বা হলি কেন?

ঘুম হয় না যে এই জন্যে রোগা হয়ে যাচ্ছি। ও মাগো বাবু কত লম্বা হয়েছে। ও এত লম্বা হচ্ছে কেন আপা? কিছু দিন পর তো তালগাছ হয়ে যাবে।

বলতে বলতে বকুল হাসতে শুরু করল। প্রথমে মৃদু স্বরে তারপর বেশ শব্দ করেই হাসতে লাগল। আঁচল মেঝেতে পড়ে গেল। জহির বিরক্ত মুখে তাকাচ্ছিল। সে গম্ভীর গলায় বলল, হাসি বন্ধ কর তো বকুল। আপা কোথায় ঘুমাবেন কিছু-একটা ব্যবস্থা কর। শুধু শুধু হাসলে তো হবে না।

ওমা— তাই তো।

বকুল প্রায় ছুটে ভেতরে চলে গেল পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এসে বলল, বাবু, হেসেছি বলে রাগ করিসনি তো? বলেই দেরি করল না আবার ভেতরে চলে গেল। বাবু অবাক হয়ে তাকাল মুনার দিকে। মুনা বলল, জহির ওর কি হয়েছে?

কিছু হয়নি আপা ঢং করছে।

ঢং করছে মানে?

নানান রকমের যন্ত্রণা আপা— এসেছেন যখন সবই শুনবেন।

ডাক্তার দেখাচ্ছ?

ডাক্তার দেখাব কি? আমি নিজেও তো একজন ডাক্তার। নাকি আপনারা তা মনে করেন না?

মুনা আর কিছু বলল না। বিস্মিত চোখে জহিরের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। জহির অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আপা কিছু মনে করবেন না— উল্টাপাল্টা কি সব বলছি। আসলে আমার নিজের মাথার ঠিক নেই। বলব আপনাকে সব। আজ রাতেই বলব। শুনলে আপনি নিজেই বুঝবেন।

জহির যা বলল তা শুনে মুনা হতভম্ব হয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, এসব তুমি কি বলছ?

সত্যি বলছি আপা। একটা কথাও মিথ্যা না। বকুল সারারাত ইচ্ছা করে জেগে থাকে— ওর ধারণা ঘুমুলেই আমি ওর গলা টিপে দম বন্ধ করে মেরে ফেলব।

কদিন ধরে এ রকম হচ্ছে?

তিন মাসের বেশি।

আগে জানাওনি কেন?

ইচ্ছা করেনি আপা। তাছাড়া...

তাছাড়া কি?

আমার ধারণা পুরো ব্যাপারটা তার সাজানো। আমাকে যন্ত্রণা দেবার একটা চেষ্টা।

তোমাকেই বা শুধু শুধু যন্ত্রণা দিতে চাচ্ছে কেন?

জানি না আপা। আপনি এসেছেন এখন দেখুন কিছু করতে পারেন কি না।

ও আজ রাতে আমার সঙ্গে ঘুমুক— কি বল জহির?

নিশ্চয়ই আপা, আপনার বলার দরকার ছিল না আমি নিজেই পাঠাতাম।

মুনার শোবার জায়গা করা হয়েছে দোতলার সবচে দক্ষিণের ঘরে। বিশাল ঘর। তিনটি বড় বড় জানালায় খুব হাওয়া খেলে। ঘরের ঠিক মাঝখানে বিশাল পালঙ্ক। উঠতে কষ্ট হয় এমন উঁচু। মুনা হাসতে হাসতে বলল, গড়িয়ে পড়লে তো মাথা ফেটে যাবে রে বকুল।

বকুল এই কথাও মুখে শাড়ির আঁচল গুঁজে খুব হাসতে লাগল। কোনমতে হাসি থামিয়ে বলল, তুমি যা হাসাতে পার। হাসতে হাসতে পেট ব্যথা করছে আপা।

মুনা প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, বাবু কোথায় শুয়েছে?

ওর দুলাভাইয়ের সঙ্গে। আরো ঘর ছিল— একা ঘুমুলে ভয় পায় যদি, সেজন্যে ও বলল ওর সঙ্গে ঘুমুতে।

তোর শাশুড়ি— উনি কোথায়?

আটপাড়া বলে একটা জায়গা আছে সেখানে গেছেন। ভাটি অঞ্চল। ভাটি অঞ্চলে উনাদের অনেক জমি আছে, দেখাশুনা করতে গেছেন।

উনাদের জমি বলছিস কেন? বল আমাদের জমি।

বকুল হাই তুলে বলল— ঐ একই হল।

ঘুম পাচ্ছে নাকি রে?

না। রাতে ঘুম হয় না তো। পান খাবে আপা? আমার শাশুড়ির কাছ থেকে আমি পান খাওয়া শিখেছি। আমার শাশুড়ির একটা পানের বাটা আছে তাতে আঠার রকমের মশলা রাখার জায়গা আছে।

খুব পান বিলাসী মনে হচ্ছে।

হুঁ খুব পান বিলাসী— জয়পুরী মশলা ছাড়া তিনি পান খেতে পারেন না।

জয়পুরী মশলাটা আবার কি?

দাঁড়াও নিয়ে আসছি। খেয়ে দেখ।

আনতে হবে না – আমি পান খাই না। আয় আমরা শুয়ে গল্প করি।

আমার পান খেতে ইচ্ছে করছে। যাব আর আসব।

মুখ ভর্তি পান নিয়ে বকুল ঢুকল। পানের রস উপচে পড়ছে। মুখ হাসি হাসি। হাতে পানের ডাটা।

নাও আপা খেয়ে দেখ। অল্প একটু জর্দা দিয়েছি। প্রথমবারের রস ফেলে দিও তাহলে আর কিছু বুঝতে পারবে না।

বকুল পালঙ্কে উঠে এল। মুনা বলল, মশারি ফেলবি না?

মশা নেই আপা – মশারি লাগবে না।

একটু আগে একটা মশা আমার কানে কামড় দিয়েছে। এখনো জ্বলছে।

দু'একটা আছে। থাকুক না। ওদেরও তো খেয়ে বাঁচতে হবে। তাই না আপা?

তা তো বটেই।

বকুল পানের বাটা নিয়ে বসেছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে পান সাজাচ্ছে। কথা বলছে নিজের মনে।

মাত্র কয়েক ঘণ্টা হয় তুমি এসেছ, তাই না আপা? অথচ আমার মনে হচ্ছে তুমি যেন এ বাড়িতেই থাক। তোমারও এ রকম মনে হচ্ছে না?

না। হচ্ছে না। অপরিচিত একটা ঘরে শুয়ে আছি বলেই তো মনে হচ্ছে তুই মাঝ রাতে পান সাজাচ্ছিস কার জন্যে?

নিজের জন্যে। আর কার জন্যে? তুমি তো একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়বে। আমাকে জেগে থাকতে হবে।

জেগে থাকতে হবে কেন?

ও তোমাকে কিছু বলেনি?

বলেছে – তোর মুখ থেকে আরেকবার শুনতে চাই আয় আমার পাশে শুয়ে বল।

বকুল সঙ্গে সঙ্গে শুয়ে পড়ল। মুনা বাতি নিভিয়ে দিল। বাইরে চাঁদ নেই। ঘরের ভেতর অসম্ভব অন্ধকার। ঝিঁঝি ডাকছে। গ্রাম গ্রাম ভাব।

বকুল।

কি আপা? তোদের এই জায়গাটা এত অন্ধকার কেন? কাল থেকে ঘরে একটা হারিকেন-টারিকেন কিছু রাখিস তো?

এখন নিয়ে আসি?

না এখন আনতে হবে না তোর ঘুম না হওয়ার গল্পটা শুনি।

বকুল ফিসফিস করে বলতে লাগল- মাস তিনেক আগের কথা আপা সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়েছি— দোতলায় একেবারে পশ্চিমে একটা ঘর আছে ঐ ঘরে। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। শুনি কি দরজায় টুকটুক করে কে যেন টোকা দিচ্ছে। আমি খুবই অবাক। দরজা হাট করে খোলা, টোকা দেবে কে? আমি বললাম— কে ওখানে?

কেউ কোন শব্দ করল না। তখন শীতের সময়। সূর্য ডুবতেই সব অন্ধকার হয়ে যায়। খুব কুয়াশাও পড়ে। ঘরটা একদম অন্ধকার আবার মনে হচ্ছে ঘরের ভেতরেও কেমন যেন কুয়াশা। আমার বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। আমি আবার বললাম, কে?

তখন খুব পরিষ্কার গলায় বাবা কথা বললেন বললেন, বকুল আমি। কেমন আছিস রে মানিক?

আমি ভয়ে থরথর করে কাঁপছি, একটা কথাও বলতে পারছি না। বাবা তখন বললেন তোকে সাবধান করে দিতে এসেছি রে মা— জহির ছেলেটা তোকে গলা টিপে মেরে ফেলবে। খুব সাবধানে থাকিস। খুব সাবধানে রে মা। খুব সাবধান মা।

তারপর?

তারপরের কথা আমার কিছু মনে নেই আপা। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান হলে দেখি সবাই ভিড় করে আছে। আমার শাশুড়ি আমার মাথায় পানি ঢালছেন।

ব্যাপারটা তাদের বলেছিলি?

না। কিচ্ছু বলিনি। শুধু ওকে বলেছি রাতে ঘুমুলে তুমি আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলবে এই জন্যে ঘুমাই না।

আর কিছু বলিসনি তো?

না।

খুব ভাল করেছিস। এই ঘরে আমার সঙ্গে শুয়েছিস এখন তোর আর ভয় নেই। এখন ঘুমো।

না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমার অভ্যেস হয়ে গেছে তুমি ঘুমাও।

বলতে বলতে বকুল গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল। জেগে রইল মুনা। সারারাত এক পলকেব জন্যেও ঘুম এল না। বিশাল ঘরের বিশাল পালঙ্কের শুয়ে তার গা ছমছম করতে লাগল।

মুনা দু'দিন থাকার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিল, থাকল সাত দিন। বকুলের শাশুড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়েই দেরি। কথা ছিল, উনি আটপাড়া থেকে ফিরলে মুনা ঢাকায় রওনা হবে। উনি ফিরলেন না।

এই সাত দিনে বকুল পুরোপুরি স্বাভাবিক। রাতে ঘুমুতে আসে মুনার সঙ্গে। খানিক্ষণ গল্প করেই গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যায়। মুনা বলল, তোর অসুখ আমাকে ধরেছে। তুই ঘুমুচ্ছিস আর আমি জেগে আছি। বিশ্রী অবস্থা।

বকুলের শরীর একটু ভাল হয়েছে। সব সময় দিশেহারার যে ভাব তার চোখে-মুখে লেগে থাকত তা নেই। জহিরের ধারণা এটা একটা মানসিক ব্যাপার। মুনা চলে গেলেই বকুল আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। এই সন্দেহ মুনার কাছেও অমূলক মনে হয় না। ঢাকায় রওনা হবার আগের দিন মুনা জহিরকে বলল, ওকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই জহির? আমার সঙ্গে কিছু দিন থাকুক। আমি ভাল ভাল ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলব। তুমি নিজেও চল।

জহির গম্ভীর হয়ে বলল, বাড়িঘর ছেড়ে আমার পক্ষে যাওয়া তো সম্ভব না আপা। মা নেই এত বড় বাড়ি। নেত্রকোনা কোর্টে জমিজমা নিয়ে বেশ কয়েকটা মামলা চলছে। দুদিন পর পর হিয়ারিং হয়।

বেশ তো তুমি কিছু দিন কষ্ট করে থাক। আমি বকুলকে নিয়ে যাই। আমার মনে হয় এত বড় বাড়িতে একা একা থেকে তার এ ঝামেলাটা হয়েছে।

আপনার কাছে গেলেও তো সেই একা একাই থাকবে। আপনি যাবেন চাকরিতে, বাবু স্কুলে।

আমি মাস খানিকের ছুটি নিয়ে নেব। আমার ছুটি পাওনা আছে।

বকুল কি যেতে চাচ্ছে আপনার সঙ্গে?

না সে কিছু বলেনি- আমিই বলছি।

মা ফিরে আসুক। তারপর মার সঙ্গে কথা বলে দেখি। তবে মা রাজি হবেন না।

রাজি হবেন না কেন?

আপনি একা থাকেন। পুরুষ কেউ নেই -- একটা কোন ঝামেলা যদি হয়?

মুনা আর কিছু বলেনি। বাবুকে রেখে ঢাকায় রওনা হয়েছে। সে ভেবেছিল বিদায়ের সময় বকুল খুব হৈচৈ করবে। তেমন কিছু হল না। বকুল শুকনো মুখে মুনার স্যুটকেস গুছিয়ে দিল। টিফিন বক্সে খাবার, পানির বোতল। মুনা বলল, যাবার আগে তোকে কয়েকটি কথা বলে যাই বকুল, খুব মন দিয়ে শোন।

বকুল ক্লান্ত গলায় বলল, তোমাকে কিছু বলতে হবে না আপা। তুমি আমার কথা ভেবে মন খারাপ করো না। আমার যা হবার হবে।

তোর কিছুই হবে না। ভাল থাকবি, সুখে থাকবি।

সুখেই তো আছি। খারাপ আছি নাকি? এত বড় বাড়িতে রানীর মত থাকি। এদের লাখ লাখ টাকা আপা। আমার শাশুড়ির গয়না যা আছে দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। শাশুড়ি থাকলে তোমাকে দেখিয়ে দিতাম। সিন্দুকের চাবি তার কাছে। কাজেই দেখতে পেলে না।

গয়না দেখার সখ নেই। বকুল আমি কি বলছি মন দিয়ে শোন। বোস আমার পাশে।

বকুল বসল। মুনা তার পিঠে হাত রাখল। শান্ত স্বরে বলল, তুই যা দেখেছিলি তা স্বপ্ন ছাড়া কিছুই না। আমরা স্বপ্ন দেখি না? দেখি। ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখি। সেটা ছিল একটা দুঃস্বপ্ন। স্বপ্নটা তোর কাছে সত্যি বলে মনে হয়েছে।

বকুল কিছু বলল না। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলল। মুনা মৃদু গলায় বলল, একটা স্বপ্নকে কেউ যদি দিনের পর দিন সত্যি ভাবে তাহলে সেটা তার কাছে সত্যি হয়ে যায়। তোর বেলা তাই হয়েছে। বুঝতে পারছিস?

পারছি আপা।

জহির ভাল ছেলে। বুদ্ধিমান ছেলে -- তোর সমস্যা সে বুঝবে। যে সমস্যাটা তোর হয়েছে তুই একা তার সমাধান করতে পারছিস না। কাজেই জহিরের সাহায্যে তোকে নিতে হবে। দুজন মিলে সমস্যার সমাধান করবি।

আচ্ছা করব।

মনে থাকবে তো?

থাকবে।

তোর শাশুড়ি এলে তাকে বলে ঢাকায় চলে আসবি। কিছু দিন থাকবি আমার কাছে।

উনি রাজি হবেন না।

রাজি হবেন। আমি তাকে গুছিয়ে একটা চিঠি লিখেছি। চিঠিটা তোর কাছে দিয়ে যাব তুই তোর শাশুড়িকে দিবি। মনে থাকবে।

থাকবে।

লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে থাকবি।

লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে তো থাকি।

বকুল মুনাকে ট্রেনে তুলে দেবার জন্যে স্টেশনে গেল না। কাউকে চলে যেতে দেখতে তার খুব খারাপ লাগে। এমন কি মুনা যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে তখনও সে সামনে পড়ল না। একা একা পুকুর পাড়ে বসে রইল।

রাতে খুব সহজ ভঙ্গিতে জহিরের সঙ্গে ঘুমুতে এল। খাটে এসে বসল। মুখ ভর্তি পান। জহির মামলার দলিলপত্র দেখছিল। সে ফাইল বেঁধে ফেলল। কাল একটা হিয়ারিং আছে কিন্তু এখন আর সেইসব নিয়ে মাথা ঘামাতে ইচ্ছা করছে না। সে সহজ গলায় বলল, একটা পান খাওয়াও তো বকুল, জর্দা দিও না।

বকুল পান সাজাতে বসল।

আপা চলে যাওয়াতে খুব মন খারাপ?

হুঁ।

আরো কিছু দিন রেখে দিতে পারলে ভাল হত। অফিস আছে আমি আর জোর করলাম না। তাছাড়া এখানে তার ভালও লাগছিল না। বড় শহরে বেশিদিন থাকলে এ রকম হয়। অন্য কোথাও থাকলে ভাল লাগে না। এটাকে বলে কনডিশানিং।

বকুল হাই তুলল। জহির বলল, ঘুম পাচ্ছে নাকি?

হুঁ পাচ্ছে।

খুবই ভাল কথা। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়। তার আগে একটা কাজ কর, ওষুধ খেয়ে নাও।

কি ওষুধ?

মাইল্ড একটা ঘুমের ওষুধ।

বকুল বিনাবাক্যে ওষুধ খেয়ে গুটিগুটি মেরে শুয়ে পড়ল। জহির বলল, মা এলে তোমাকে ঢাকায় নিয়ে যাব। দুজন বেশ কিছু দিন কাটিয়ে আসব। আমি নিজেও হাঁপিয়ে উঠেছি। মামলা-মোকদ্দমা, জমিজমা এসব আর ভাল লাগে না। কুৎসিত ব্যাপার। বকুল জবাব দিল না।

ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?

বকুল সাড়া দিল না। জহির অবাক হয়ে লক্ষ্য করল বকুল সত্যি সত্যি ঘুমুচ্ছে। বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলছে। ঠোঁট কাঁপছে। গাঢ় ঘুমের লক্ষণ। জহির বাতি নিভিয়ে কাগজপত্র নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। কাগজগুলি ভাল রকম দেখে রাখা উচিত। দাগ নম্বরে কি সব ওলট-পালট নাকি আছে— কিছুই তার মাথায় ঢুকছে না। অনুকূল মুহুরিকে আসতে বলেছিল— সে আসেনি। লোক পাঠিয়ে আরেকবার ডাকবে না সে নিজেই যাবে? রাত খুব হয়নি। দশটা পঁয়ত্রিশ। যাওয়াই উচিত— দাগ নম্বর পোর্চা ফোর্চা কিছুই মাথায় ঢুকছে না। বকুল ঘুমাচ্ছে ঘুমাক। এটাও একটা শুভ লক্ষণ।

জহির বাড়ি ছেড়ে বেরুবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বকুল উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। বারান্দায় চল্লিশ পাওয়ারের একটা বাতি জ্বলছে তার খানিকটা আলো পর্দার ফাঁকে ঘরে এসেছে। দরজা ভেজানো। খুট করে দরজার ওপাশে শব্দ হল। বকুল অবাক হল। বকুল ভয়-পাওয়া গলায় বলল— কে?

কেউ উত্তর দিল না কিন্তু মনে হচ্ছে কে যেন খুব সাবধানে দরজা খোলার চেষ্টা করছে। ক্যাঁচক্যাঁচ করে একটু শব্দ হচ্ছে আবার থেমে যাচ্ছে। বকুল বলল কে? কে? দরজার ওপাশ থেকে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ হল। সিগারেটের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বাবা ঘরে ঢুকলে ভক করে খানিকটা সিগারেটের গন্ধ নাকে লাগে। অবিকল সে রকম। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ বকুলের চেনা। সে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল - কে? কে ওখানে?

খুব নিচু স্বরে জবাব এল। প্রায় অস্পষ্ট কিন্তু বকুলের শুনতে কোন ভুল হল না।

কেমন আছিস রে মা?

ভাল আছি বাবা।

তুই এমন রোগা হয়ে গেছিস কেন?

আমার ঘুম হয় না। জেগে থাকি।

সেটাই তো ভাল। ঘুমুলেই সর্বনাশ হবে রে মা। গলা চেপে ধরবে। বলেছিলাম না? তার পরেও ঘুমিয়ে পড়লি? তুই এত বোকা কেন?

তুমি চলে যাও বাবা আমার ভয় লাগছে।

আমাকে ভয় কিসের রে বোকা মেয়ে। যাকে ভয় পাওয়ার তাকে ভয় পাবি।

দরজায় আবার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে। দরজা খুলেও যাচ্ছে। ঐ তো দেখা যাচ্ছে পর্দার ওপাশে চাদর গায়ে রোগা একজন মানুষ। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একটা হাত রেখেছে পর্দায়। যেন এক্ষুণি পর্দা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকবে। বকুল কাতর গলায় বলল, আমার বড় ভয় লাগছে বাবা। তোমার পায়ে পড়ি ভেতরে এস না। বড় ভয় লাগছে।

জহির রাত বারোটার দিকে ঘরে ফিরে দেখে বকুলের মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। সে হাত-পা ছুড়ছে। পুরোপুরি হিস্টিরিয়ার লক্ষণ। ঘুমের ইনজেকশন দিয়ে তাকে ঘুম পাড়াতে হল।

সারারাত তার পাশে জহির এবং বাবু বসে রইল। জহির কয়েকবারই বলল, তুমি ঘুমিয়ে পড় বাবু। আমি তো জেগেই আছি।

বাবু নড়ল না। সে খুব ভয় পেয়েছে। মাঝে মাঝে অল্প অল্প কাঁদছে। জহির বলল, বকুলকে কিছু দিনের জন্যে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়াই ভাল। কি বল বাবু?

বাবু তারও জবাব দিল না। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছে।

## ৪১

বাকের নেত্রকোনা স্টেশনে নেমেছে ভোর আটটায়। তার সঙ্গে একটা হ্যান্ডব্যাগ। হাতে চিত্রালী পত্রিকা। ময়মনসিংহ রেলওয়ে বুক স্টলে মাসুদ রানা একুশ নম্বর কিনে ছিল। পড়াও হয়েছে চল্লিশ

পৃষ্ঠা পর্যন্ত। নামার সময় বইটা ভুলে ফেলে আসায় তার মেজাজ খুবই খারাপ। একা দারুণ ইন্টারেস্টিং জায়গায় এসে বইটা হারিয়ে গেল। মাসুদ রানা একজন সুন্দরী স্প্যানিশ তরুণীর ঘরে ঢুকেছে। সেই তরুণীর কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক নেই। মাখনের মত শরীরের প্রায় সবটাই দেখা যাচ্ছে। তরুণী মাসুদ রানাকে দেখে হেসে বলল তারপর রানা আবার দেখা হল? বলতে বলতে এক ঝটকায় বের করেছে ল্যুগার ফিফটি নাইন পিস্তল। মাসুদ রানা নির্বিকার। সিগারেট ধরাতে ধরাতে সে বলল - এমন সুন্দর হাতে অস্ত্র মানায় না। ওটা ফেলে দাও। তরুণী তীব্র স্বরে বলল, নিশ্চয়ই ফেলব কিন্তু তার আগে তপ্ত দুটি সিসের টুকরো তোমার মগজে ঢুকিয়ে দেব।

এই রকম একটা জায়গায় এসে বই ফেলে ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার কোন মানে হয়? বাকের বিরস মুখে সানগ্লাস চোখে দিল। সানগ্লাসটা সে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন থেকে কিনেছে। রাতের বেলা কেনা বলে দেখেশুনে কেনা যায়নি এখন দেখা যাচ্ছে দুই চোখে দু রকম রঙ একটা হালকা সবুজ আরেকটা গাঢ় নীল। ঢাকায় ফিরে টান দিয়ে ঐ হারামজাদার কান ছিঁড়ে ফেলতে হবে।

বাকেরের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। এই অবস্থায় বকুলের শ্বশুর বাড়ি উঠার কোন মানে হয় না। বাড়ি খুঁজে বের করতে কতক্ষণ লাগবে কে জানে। সারাদিন লেগে যাবে বলেই বাকেরের ধারণা। ঠিকানা ছাড়া হুট করে রওয়ানা হওয়াটা বোকামি হয়েছে। বিরাট বোকামি। বাকের শেভ করার জন্যে নাপিতের দোকানে ঢুকল। ক্ষিধেও লেগেছে। নাশতা শেষ করে সারাদিনের চুক্তিতে একটা রিকশা ঠিক করতে হবে। এখানে উপস্থিত হবার অজুহাত হিসেবে সুন্দর একটা গল্পও বানাতে হবে। এলেবেলে কিছু বলে মুনার কাছ থেকে পার পাওয়া যাবে না। ধরে ফেলবে। দারুণ ইন্টেলিজেন্ট মেয়ে। ঠাণ্ডা মাথায় ভাবা দরকার। মাথা ঠাণ্ডা করা যাচ্ছে না — বইটা হারানোর পর থেকে মাথা গরম হয়ে আছে।

আজ বুধবার। বুধবার দিনটাই বাকেরের জন্যে খারাপ। নাপিত শেভ করতে গিয়ে খুচ করে গাল কেটে ফেলল। রক্ত পড়ছে সেদিকে লক্ষ্য নেই।

পাশের লোকের সঙ্গে খুচরা আলাপ জমিয়েছে। আলাপের বিষয় হচ্ছে পিঁয়াজের সের বিশ টাকা। এত দামে পিঁয়াজ এর আগে কখনো বিকায়নি। হুনছ কোনোদিন কুড়ি টেহা সের পেয়াইজ?

বাকের গলার স্বর যথাসম্ভব সংযত করে বলল, এই যে দাড়িওয়ালা ভাই। গাল কেটে তো রক্তারক্তি করেছেন তার ওপর খেজুরে আলাপ জুড়েছেন। আর একটা কথা যদি বলেন, যে ক্ষুর দিয়ে গাল কেটেছেন সেই ক্ষুর দিয়ে পেট ফাঁসায়ে দিব।

হতভম্ব নাপিত বলল, কি কন আপনে?

এক্কেবারে খাঁটি কথা বলি--- মুখ দিয়ে যেন আর একটা শব্দ বের না হয়। যদি হয় জিব টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলব।

মনের রাগ খানিকটা বের হয়ে যাওয়ায় বাকের একটু আরাম পেল। গাল কাটার দুঃখটাও বেশ কমে গেল। প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিতে পারলে আরো কমত। তবে নতুন জায়গা, হাবভাব না বুঝে কিছু করা ঠিক না।

বাকের চা-নাশতা খেয়ে বাড়ি খোঁজার কাজে নামল। বুড়ো কিন্তু গায়ে শক্তি আছে এমন একজন রিকশাওয়ালা বের করল।

ঠিকানা জানা নাই এমন একটা বাসা খুঁজে বের করবে পঞ্চাশ টাকা চুক্তি সারাদিন লাগলে সারাদিন ঘুরবে। খাওয়ার খরচ আমার। এই নাও টাকা নগদানগদি কারবার ভাল। বিরাট বড় বাড়ি। সেই বাড়ির ছেলে ডাক্তার। বিয়ে করেছে ঢাকায়। স্ত্রীর নাম বকুল। ডাক্তার ছেলের নাম জহির। আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু কর।

বুড়ো রিকশাওয়ালা হ্যাঁ-না কিছুই বলল না - উল্কার বেগে খানিকক্ষণ রিকশা চালিয়ে বলল নামেন এই বাড়ি।

বল কি তুমি এই বাড়ি?

হু উকিল সাহেবের বাড়ি -- ছেলে ডাক্তার। নাম জহির।

বল কি জেনেশুনে পঞ্চাশ টাকা নিলে।

জোর কইরা নেই নাই মিয়াভাই। আপনে দিছেন।

বলার কিছু নেই কিন্তু বাকেরের গা জ্বালা করছে। আজ বুধবার। এই জাতীয় কাণ্ড যে ঘটবে তা সে জানত। নেত্রকোনা শহরের সমস্ত রিকশাওয়ালার ওপর তার মেজার খারাপ হয়ে গেল। আবার

দাঁত বের করে হাসছে।

খবরদার। নো লাফিং। বিদেয় হয়ে যাও। বিদায়।

বাকের কল্পনাও করেনি কি প্রচণ্ড সমাদর তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে কে? কেউ না। বলতে গেলে একজন রাস্তার ছেলে। জেল হাজত খাটা লোক। এই বাড়ির সাথে তার সম্পর্ক কি? কোনই সম্পর্ক নাই। আপদে-বিপদে ছুটে এসেছে সে তো সবখানেই যায়। তাতে কি। তবু সে সংকুচিত ভঙ্গিতে বাড়ির উঠোনে এসে দাঁড়াল এবং বিশাল বাড়ি দেখে খানিকটা ঘাবড়েও গেল ঠিক তখন দোতলা থেকে বকুল তীক্ষ্ণ স্বরে চেঁচাল-- কে বাকের ভাই না? পর মুহূর্তেই ছুটতে ছুটতে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে এল--- বিস্মিত গলায় বলল, ওমা কি আশ্চর্য সত্যি তো বাকের ভাই। আপনি কোথেকে?

কাজে যাচ্ছিলাম পথে পড়ল নেত্রকোনা ভাবলাম...

ইস আর দুদিন আগে এলে মুনা আপার সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। মুনা আপা পরশু সকালেও ছিল।

বাকেরের মনটা খারাপ হয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, মুনা এখানে ছিল? বলিস কি? জানতাম না তো! তোর এই অবস্থা কেন? স্কেলিটন হয়ে গেছিস। কংকাল বুঝলি কংকাল?

আমার ঘুম হয় না বাকের ভাই।

ঘুম হবে না কেন? কি কথাবার্তা বলছিস? স্লিপ না হবার কি আছে? বিছানায় শুলেই স্লিপ অটোমেটিক চলে আসে।

জহির বাসায় ছিল না। বকুল বাবুকে পাঠাল খোঁজ নিয়ে আসতে। জহির বিরাট এক কাতল মাছ কিনে আনল। দুপুরে তার পাতে প্রকাণ্ড মাছের মাথা দেয়া হল। গরম ভাত ঠাণ্ডা করার জন্যে পাখা নিয়ে বসল বকুল। এত আগ্রহে এত যত্নে কেউ কোনোদিন তাকে খাওয়ায়নি। কেন তাকে এত যত্ন করবে? সে কেউ না - রাস্তার ছেলে--- হাজত খাটা লোক। বাকেরের চোখে পানি এসে গেল। সে ধরা গলায় বলল-- তোরা নেত্রকোনার লোক এত ঝাল খাস? আশ্চর্য ঝালের চোটে চোখে পানি এসে গেছে। এর মধ্যে আবার মরিচে কামড় পড়ে গেছে। বকুল লজ্জিত গলায় বলল, বাকের ভাই, একটু দেখে খান। এর সঙ্গে একটু ডাল নিন। ঝাল কম লাগবে। রান্না কেমন হয়েছে বাকের ভাই?

উত্তম হয়েছে। অতি উত্তম।

আমি রেঁধেছি।

ভাল হয়েছে খুবই ভাল। নাম্বার ওয়ান হয়েছে।

বাকেরের চোখ থেকে টপ টপ করে এক ফোঁটা পানি তার প্লেটে পড়ে গেল। ভাগ্যিস কেউ দেখতে পেল না।

রাতে কি খাবেন বাকের ভাই? যা খেতে চান বলুন বাঁধব।

পাগল হয়ে গেলে নাকি? বিকেলের ট্রেন ধরব, মেলা কাজ ঢাকায়।

আপনার কি কাজ আমার জানা আছে। যখন যেতে দেব তখন যাবেন। তার আগে না।

বকুল বড় একটা মাছের পেটি পাতে তুলে দিল। বাকেরের চোখ আবার ভিজে উঠছে। মমতা পেয়ে তার অভ্যাস নেই অল্পতেই সে কাতর হয়ে পড়ে। মন হু-হু করে।

বাকের বাড়িঘর দেখে মুগ্ধ। জহিরের ব্যবহারে মুগ্ধ। বকুলের ভালবাসায় মুগ্ধ। বাড়ির পেছনের বাঁধানো পুকুরের সাইজ দেখে মুগ্ধ। দুপুরে তার ঘুমিয়ে অভ্যেস নেই। ছিপ ফেলে সারা দুপুর পুকুর ঘাটে বসে রইল। সঙ্গে বাবু।

কেমন ঘাই দিচ্ছে দেখেছিস? মাছে পুকুর ভরতি। চার বানিয়ে ফেলতে হবে।

চার কি করে বানায় জানেন?

হুঁ। মেথি-ফেতি কি সব দিতে হয়। দেখি আগামীকাল জোগাড়-যন্ত্র করে ছিপ ফেলব। মাছ মারা সহজ ব্যাপার না বুঝলি— খুবই শক্ত। খুবই হার্ড কাজ। ভেরি হার্ড।

আজ বুধবার। মাছ ধরা পড়ার কথা নয় কিন্তু কি আশ্চর্য সন্ধ্যার আগে আগে দেড় সের ওজনের একটা মৃগেল মাছ ধরা পড়ল।

বাকের আবেগজড়িত গলায় বলল, নেত্রকোনা জায়গাটা খুবই ভাল বুঝলি বাবু। অসাধারণ একটা জায়গা। বাংলাদেশের মধ্যে এক নম্বর। এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। নো ডাউট। খুব ভাল জায়গায় বকুলের বিয়ে হয়েছে। খুবই ভাল জায়গা। গুড প্লেইস।

বাকেরের প্রতি বকুলের উৎসাহের বাড়াবাড়ি জহিরের ভাল লাগছে না। সে যা হৈচৈ করছে

তাতে যে কেউ বিরক্ত হবে। রাতে পোলাওয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, মুরগী জবাই করা হয়েছে। অথচ দুপুরের মাছের প্রায় সবটাই আছে। এ সমস্ত হচ্ছে অসুস্থতার লক্ষণ। অথচ অসুস্থতার কোন ভিত্তি নেই। এবং অসুখটা এমন যে কারো সঙ্গে আলাপও করা যায় না।

গত দু'রাত ধরে বকুল আলাদা শুচ্ছে। আলাদা মানে আলাদা ঘর। সন্ধ্যা হতেই সে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু ঘুমায় না জেগে থাকে। যতবার জহির নিজের ঘর থেকে বের হয় ততবারই বকুল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে-- কে কে?

আমি ভয় নেই।

ও আচ্ছা।

বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড় বকুল।

আচ্ছা।

বাতি নিভে যায়। কিন্তু বকুল ঘুমায় না। জেগে বসে থাকে। এ যন্ত্রণার কোন মানে হয়? যতই সময় যাচ্ছে অবস্থা ততই খারাপ হচ্ছে। কিছুদিন পরে হয়ত কাউকে চিনতে পারবে না। মুনা আপার সঙ্গে তাকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়াই উচিত ছিল। জহির নিজে যেতে পারছে না। মামলা-মোকদ্দমায় অস্থির হয়ে যাওয়ার জোগাড়। জহির কি করবে ভেবে পেল না।

বাকের পাঁচদিন কাটিয়ে দিল। এই পাঁচ দিন সে যে সমস্ত কাজকর্ম করল তার মধ্যে আছে - পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার। বাড়ির পেছনে জঙ্গল পরিষ্কার। দুটি সাপ মারা (এই সাপ দুটি জঙ্গল পরিষ্কারের সময় বের হয়ে এসেছিল)।

সন্ধ্যাগুলিও বাকেরের খুব ভাল কাটছিল। বাড়ির কাছেই যুব নাট্যদলের অফিস। সেখানে 'পথের সন্তান' নাটকের রিহার্সেল হয়। বাকের গত চার রাত ধরে রিহার্সেলে উপস্থিত। যুব নাট্য দলের লোকজন ঢাকার এই মানুষটির গভীর আগ্রহে খুবই খুশি। নাট্যকারের বয়স অল্প। সে নিজেও বাকেরকে খুব খাতির করে। যাওয়া মাত্র চেঁচিয়ে বলে বাকের ভাইকে চা দাও-বিনা দুধে। নাটকে হাস্যরসাত্মক অংশগুলি বাকেরের খুবই পছন্দ। যতবারই হাসির অংশগুলি হয়, বাকের ঘর ফাটিয়ে হাসে। নাট্যকার এবং নাটকের লোকজন তাতে বড়ই উৎসাহিত হয়। বাকেরের ধারণা এটা একটা অসাধারণ নাটক। এবং ঢাকার কোন নাটকের দল এদের ধারে কাছেও যেতে পারবে না। বাকেরের ইচ্ছা হচ্ছে এক মাস পর যখন নাটক হবে তখন সে উপস্থিত থাকে। সে তার ইচ্ছা ব্যক্তও করেছে। নাট্যকার অত্যন্ত অবাক হয়ে বলেছে কি বলেন বাকের ভাই, আপনাকে ছাড়া নাটক হবে নাকি? আপনাকে ঢাকা থেকে ধরে নিয়ে আসব না? ভেবেছেন কি আমাদের? তাদের আন্তরিকতায় বাকেরের মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। বড় উদাস লাগে।

বাকেরের আরো কিছু দিন থাকার ইচ্ছা ছিল কিন্তু থাকতে পারল না, ঢাকায় চলে আসতে হল। কারণ বকুলের অবস্থা খুবই খারাপ। তাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া দরকার। জহির যেতে পারছে না। তার মামলার তারিখ পড়েছে।

বকুলের যে বিরাট একটা অসুখ বুঝতেই পারেনি। তার ধারণা ঠিকমত খাওয়া-দাওয়া না করায় এই হাল হয়েছে। ট্রেনে উঠার পর বকুল যখন ফিসফিস করে বলল, আপনি আসায় আমার জীবনটা রক্ষা হয়েছে।

বাকের অবাক হয়ে বলল, কি বলছিস তুই?

সত্যি বলছি আমাকে মেরে ফেলত।

কে মেরে ফেলত?

জহির।

তুই পাগল হয়ে গেলি নাকি?

পাগল হব কেন? সত্যি কথা বলছি - ও আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে চায়।

চুপ করে থাক। নয়ত চড় দিয়ে চাপার দাঁত ফেলে দেব।

বকুল চুপ করে গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে জানালায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। বাকেরের দুশ্চিন্তার সীমা রইল না- ভালয় ভালয় ঢাকা পৌঁছতে পারলে হয়। ঢাকায় পৌঁছে দেরি করা যাবে না -- ডাক্তারের কাছে ছোটাছুটি শুরু করতে হবে। মুনা একা ক'দিক সামলাবে? ভাগ্যিস সে সময়মত ছাড়া পেয়েছিল। এখনো হাজতে থাকলে তো বিরাট প্রবলেম হয়ে যেত।

বাকেরের জন্যে ট্রেনে কেউ কোন সাড়াশব্দ করতে পারল না। কেউ সামান্য কথা বললেও

বাকের চেঁচিয়ে ওঠে — মরণাপন্ন রুগী নিয়ে যাচ্ছি— দেখতে পাচ্ছেন না? মা-বোন তো আপনাদের আছে? রোগ-শোক তো আপনাদেরও হয়, নাকি হয় না?

এই প্রচণ্ড ভিড়েও সে বেঞ্চ খালি করে বকুলকে শুইয়ে দিল এবং সারা পথ একটা খবরের কাগজ দিয়ে বকুলকে হাওয়া করল। একজন বুড়োমত যাত্রী একবার জিজ্ঞেস করল, উনার কি হয়েছে? বাকের বিরক্ত মুখে বলল, তা দিয়ে আপনার কোন দরকার আছে?

বুড়ো চুপ করে গেল।

ঢাকায় পৌঁছে বকুল পুরোপুরি সুস্থ। যেন তার কিছুই হয়নি। মুনার ক্ষীণ সন্দেহ হল অসুখের ব্যাপারটা পুরোপুরি বানানো - বকুলের একটা চমৎকার অজুহাত।

বাকেরের অবশ্যি খুব সুবিধা হয়েছে। দিনের মধ্যে তিনবার চারবার আসছে রুগীর খোঁজ নিতে এলাম মুনা। অবস্থা কেমন?

মুনা বিরক্ত হয়ে একবার ঝাঁঝিয়ে ওঠে— আপনি বড় ঝামেলা করেন বাকের ভাই। সকালবেলা তো একবার দেখে গেলেন বকুল সুস্থ। এই তিন ঘণ্টার মধ্যে আবার কী হবে?

তবু একটু খোঁজ নেয়া- মনের মধ্যে টেনশন থাকে।

টেনশনের কিছু নেই বাকের ভাই, যদি কিছু হয় আপনাকে খবর দেব। দয়া করে বিরক্ত করে মারবেন না।

আমি বিরক্ত করি?

কেন- আপনি নিজে বোঝেন না?

আচ্ছা আর করব না।

মুখ কালো করে বাকের চলে যায়। মনটা অসম্ভব খারাপ হয়। জলিল মিয়ার স্টলে তিন কাপ চা খেয়ে ফেলে। মনস্থির করে ফেলে আর না। কী দরকার? যাদের ব্যাপার তারা বুঝবে। তবু সন্ধ্যার পর মনে হয়— খোঁজ নেয়া বিশেষ প্রয়োজন। দুটা মেয়ে মানুষ একা একা থাকে। কত রকম সমস্যা হতে পারে। সন্ধ্যার পর দরজায় টোকা দেয়। মুনা গম্ভীর মুখে দরজা খোলে। বাকেরকে দেখেও কিছু বলে না।

দরজা-টরজা ভাল করে বন্ধ করে ঘুমুবে। চুরি হচ্ছে। দেশে বাস করা মুশকিল।

রাগ করতে গিয়েও মুনা রাগ করতে পারে না। হেসে ফেলে। বাকের বিস্মিত হয়ে বলে- হাস কেন?

কেন হাসি তা বোঝার ক্ষমতা আপনার নেই বাকের ভাই। বসুন। চা খাবেন?

খাব।

মুনা চা বানাতে যায়। বাকের বসে থাকে। তার বড় ভাল লাগে।

## ৪২

সিদ্দিক সাহেবকে আজ একটু বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

কোন কারণে তিনি চিন্তিত এবং বিরক্ত। বিরক্ত হলে তাঁর মুখে ঘন ঘন থুথু ওঠে। এখন তাই উঠছে। তিনি চারদিকে থু থু ছিটাচ্ছেন। সরকারি দলের নমিনেশন তিনি পাবেন, এই নিয়ে তাঁর কোনো চিন্তা নেই। এক লাখ টাকার চাঁদা দেয়া ছাড়াও অন্য এক কায়দায় বিশেষ একজনকে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা নগদ দেয়া হয়েছে। তিনি হিসেবি লোক পুরোপুরি নিশ্চিত না হলে এতগুলি টাকা বের করতেন না। সমস্যা এখানে নয় সমস্যা ভিন্ন জায়গায়। সরকারি দল মানেই বেশির ভাগ লোকের অপছন্দের দল। এই দেশের মানুষদের সাইকোলজি হচ্ছে ক্ষমতায় যে আছে তার বিপক্ষে কথা বলা। যতদিন পর্যন্ত তুমি ক্ষমতায় নেই ততদিন পর্যন্ত তুমি ভাল। যে মুহূর্ত ক্ষমতায় চলে গেলে সেই মুহূর্তে থেকে তুমি খারাপ। তোমার বিরুদ্ধে জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন। বড় বড় বক্তৃতা।

সরকারি দলে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে কিনা এটাই সিদ্দিক সাহেব বুঝতে পারছেন না। চালে ভুল হলে মুশকিল। রাজনীতিতে প্রতিটি চাল ভেবেচিন্তে নিতে হয় এবং ভবিষ্যতের কথা মনে রাখতে হয়। আওয়ামী লীগের এক সময় রমরমা ছিল- কোথায় গেল সেই রমরমা? তবে কিছুই বলা যায় না রমরমা ফিরেও আসতে পারে।

কোন রকম দলে না গিয়ে স্বতন্ত্র থেকে ইলেকশন করাই ভাল। তাহলে সব দলকেই বলা যায় - আছি তোমাদের সাথে। তবে স্বতন্ত্র থেকে দাঁড়ালে ইলেকশনে জেতা কষ্টকর। প্রশাসনের

সাহায্য দরকার। প্রশাসন শুধু শুধু সাহায্য করবে কেন? তাদের কী ঠেকা?

এই ইলেকশন সিদ্দিক সাহেবের কাছে খুবই সামান্য ব্যাপার। কিন্তু বড় কিছুতে যাওয়ার এটা হচ্ছে প্রথম সিঁড়ি। নামটা প্রথম ভাসতে হবে। মুখে মুখে ফিরতে হবে। খুনখারাবি হবে। হাঙ্গামা হবে। খবরের কাগজে লেখালেখি হবে - তখন সবাই বুঝবে এই কনসটিটিয়েনসি একটা জটিল জায়গা। সিদ্দিক সাহেব সেই জটিল জায়গা পানি করে দিয়েছেন। তাঁর চেহারা এবং কার্যকলাপে বোঝা যাওয়া চাই যে তিনি মহা ধুরন্ধর এবং মহা কঠিন ব্যক্তি।

আগেকার অবস্থা এখন নেই- হেঁ হেঁ করে ভোটারের সামনে হাত কচলালে হবে না। হাত কচলান ক্যান্ডিডেটের দিন ফুরিয়েছে। এখনকার ভোটাররা শক্তের ভক্ত।

শুধু ভোটাররা না সবাই এখন শক্তে ভক্ত।

সিদ্দিক সাহেব বসে আছেন তাঁর বসার ঘরে। তাঁর সামনে একগাদা পোস্টার। ছাপানো নয় আর্টিস্ট এনে লেখান হয়েছে। নগর কমিটির পোস্টার। নগর কমিটি তিনি কিছুদিন হল করেছেন। সরাসরি এই কমিটিতে তিনি নেই। কাজ করছেন উপদেষ্টা হিসেবে। যদিও সমস্ত কিছুই তাঁর করা। পোস্টারগুলিতে নানান ধরনের বক্তব্য

"এই নগর আপনার
একে সুন্দর রাখুন।
যেখানে সেখানে ময়লা ফেলবেন না।
নির্দিষ্ট ডাস্টবিনে ফেলুন।"

নগর কমিটি

"আপনার আশপাশে কী অসামাজিক
কার্যকলাপ হয়? অসামাজিক কার্য
কলাপ প্রতিরোধ করা আপনার
সামাজিক দায়িত্ব।"

—নগর কমিটি

"আপনার আশপাশে কী বখাটে
ছেলেপুলেরা আড্ডা দেয়? নেশা করে?
নগর কমিটিতে খবর দিন।"

নগর কমিটি

"হিরোয়িন, মদ, গাঁজা আপনার
শত্রু। যারা এসবের ব্যবসা করছে
তারাও আপনার শত্রু। শত্রু নির্মূল করুন।"

নগর কমিটি

"ধূমপান মনে বিষপান। পয়সা খরচ করে
কেন বিষপান করছেন? ধূম্রমুক্ত নগর
সৃষ্টি করুন।"

নগর কমিটি

প্রায় একশর মত পোস্টার। লাল কাগজে ঘন কালো রঙে লেখা। আর্টিস্ট ছোকরা লিখেছে ভাল। জায়গায় জায়গায় পোস্টার পড়লে দেখতে ভালই লাগেব।

সামনের সপ্তাহে তিনি শিশু নিকেতনের উদ্বোধন করতে মন ঠিক করেছিলেন সেখানে একটা ঝামেলা বেধেছে।

শিশু নিকেতনের চেংড়াগুলি উদ্বোধনের দিন কোন কবিকে নাকি আনতে চায়। প্রস্তাবটা তাঁর মন্দ লাগেনি। তিনি সভাপতি কবি প্রধান অতিথি। এখন আবার বাতাসে অন্য রকম কথা ভাসছে। শিশু নিকেতনের সেক্রেটারি নাকি সভাপতি, কবি শামসুর রাহমান প্রধান অতিথি, সওগাত

পত্রিকার নাসিরুদ্দিন সাহেব বিশেষ অতিথি।

সিদ্দিক সাহেবের মেজাজ খারাপ হওয়ার মূল কারণ এটা। ওরা করতে চাইলে করুক তাঁর কোন আপত্তি নেই কিন্তু তিনি ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছেন। তাঁর ধারণা এর পেছনে নুরুদ্দিনের হাত আছে। নুরুদ্দিন তার সঙ্গে কনটেস্ট করছে। তার পেছনে আছে আওয়ামী লীগ। নরুদ্দিন খুবই ঘুঘু লোক। পুরনো আওয়ামী লীগার। শেখ সাহেবের মৃত্যুর পর পর অবশ্য সে আওয়ামী লীগের সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথাবার্তা বলতে থাকে যার একটা হচ্ছে দেশটা লিজ দেয়া হয়ে গিয়েছিল ইন্ডিয়ার কাছে। আল্লাহ পাকের দয়ায় রক্ষা পেয়েছে।

জিয়াউর রহমান সাহেবের সময় নুরুদ্দিন কঠিন বিএনপি হয়ে যায়। তাতে তাঁর আওয়ামী লীগে আবার ফিরে যাওয়াতে কোন অসুবিধা হয়নি। ঘুঘু লোক বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে সাবধান থাকা ভাল। সিদ্দিক সাহেব যথেষ্ট সাবধান। তবুও অস্বস্তি লেগেই থাকে। সিদ্দিক সাহেব শিশু নিকেতনের সেক্রেটারিকে আসতে বলেছেন ব্যাপারটা পুরোপুরি পরিষ্কার করে নিতে চান। ব্যাটাকে আসতে বলা হয়েছে চারটার সময় এখন বাজে পাঁচটা। এখনো আসছে না। সিদ্দিক সাহেবের মেজাজ ক্রমেই খারাপ হচ্ছে।

সেক্রেটরি ঢুকল পাঁচটা পঁচিশে। মুখে তেলতেলে ধরনের হাসি। পরনে নকশাদার পাঞ্জাবি। পাতলা গোঁফের জন্যে চেহারাটাই কেমন ধূর্ত ধূর্ত হয়ে গেছে। লোকটির নাম মনোয়ার হোসেন তবে সবাই ডাকে মনু ভাই।

স্লামালিকুম স্যার।

ওয়ালাইকুম সালাম। কী ব্যাপার?

মনোয়ার হোসেন অবাক হয়ে বলল, আপনি তো ডেকে পাঠালেন।

ও আচ্ছা আচ্ছা মনেই ছিল না। আরেকটু হলে চলে যেতাম। ভাগ্যিস এসেছ। হাজার ঝামেলা নিয়ে থাকি কিছু মনে থাকে না। বস বস।

মনোয়ার হোসেন বসল। তার মুখের হাসি আরো বিস্তৃত হল।

তোমাদের শিশু নিকেতন সম্পর্কে জানার জন্যে ডাকলাম। কত দূর কি করলে?

হাঁটি হাঁটি পা পা অবস্থা স্যার। তবে একটা ঘর পাওয়া গেছে এটা একটা বড় উপকার হয়েছে।

ঘর কোথায় পেলে?

নুরুদ্দিন সাহেব দিয়েছেন। কিছু ফার্নিচারও পাওয়া গেছে। আপনাদের দশজনের সাহায্য ছাড়া তো স্যার হবে না। দশের লাঠি একের বোঝা।

সিদ্দিক সাহেব শুকনো গলায় বললেন, তা তো বটেই।

আপাতত ছবি আঁকা, নাচ আর গান শিখানো হবে। একটা শিশু লাইব্রেরি থাকবে। শিশুদের জন্যে হাতে লেখা দেয়াল পত্রিকা বের হবে। পত্রিকার নাম স্যার অনির্বাণ।

ভাল খুবই ভাল।

অনির্বাণ প্রথম সংখ্যায় স্যার আপনাকে একটা বাণী দিতে হবে। না বললে হবে না স্যার।

উদ্বোধনের কী ব্যবস্থা করলে?

এখনো ফইন্যাল কিছু হয়নি। শামসুর রাহমান সাহেব প্রধান অতিথি। এটা শুধু ফাইন্যাল হয়েছে।

ভাল ভাল খুবই ভাল।

আপনাকে স্যার উদ্বোধনীর দিন থাকতে হবে।

থাকব। নিশ্চয়ই থাকব। কেন থাকব না?

মনোয়ার হোসেন চা-বিসকিট খেয়ে বিদায় হল। সিদ্দিক সাহেব দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইলেন। ঝামেলা বাড়ছে— এত সব ঝামেলা সহ্য করা কঠিন। ব্যবসার ঝামেলা, জমিজমার ঝামেলা; প্রতিষ্ঠার ঝামেলা। একটা পরিত্যক্ত সম্পত্তি তিনি কিনেছেন। কিন্তু দখল পাচ্ছেন না। চারতলা বিল্ডিং ভাল জায়গায় গ্রিন রোডে। দখল না পেলে লাভ কি? সম্পত্তি, আসল মালিকের কাছ থেকেই কেনা। বলাই বাহুল্য জলের দামে কেনা। কত দামে কেনা সেটা বড় কথা নয়। কাগজপত্র ঠিক আছে এটাই বড় কথা। কাগজপত্রে থেকেও লাভ হচ্ছে না।

বাড়িতেও ছোটখাটো অশান্তি লেগে আছে। মন টেকে না। তাঁর স্ত্রী দশ বছর আগে হঠাৎ করে

মোটা হতে শুরু করেছিলেন - এখন মৈনাক পর্বত। দুই হাত দিয়ে বেড় পাওয়া যায় না। গাড়িতে উঠলে গাড়ি খানিকটা ডেবে যায়। এক মেয়েও মায়ের পথ ধরেছে। বয়স তেইশ  এর মধ্যেই হুলস্থূল কারবার। ছোট মেয়েটা এখনো ঠিক আছে ভবিষ্যতে কী হবে কে জানে?

সিদ্দিক সাহেব রাত আটটার দিকে বেরুলেন। তাঁর মন-মেজাজ খুব যখন খারাপ থাকে তখন এগার নম্বর বাড়িতে কিছু সময় কাটান। মেয়ে তিনটার সঙ্গে হালকা গল্পগুজব করেন। এর বেশি কিছু না। সেই সাহস তাঁর নেই। মেয়ে তিনটার বয়স তাঁর বড় মেয়ের বয়সের চেয়েও কম। এদের নিয়ে অন্য কোন চিন্তা কেমন যেন দানা বাঁধতে পারে না। তাছাড়া ভয়ও আছে। জানাজানি হয়ে যেতে পারে। কে জানে কিছুটা জানাজানি ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে কি না। বাকের বড় যন্ত্রণা করছিল। হাজতে যতদিন ছিল ভাল ছিল  এখন আবার ছাড়া পেয়েছে। এগার নম্বর বাড়ি প্রসঙ্গ তুলে তাকে বেইজ্জত করবে কী না কে জানে? সম্ভাবনা আছে। নুরুদ্দিন এই সুযোগ ছাড়বে না। তার আগেই একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।

জোবেদ আলি তাঁকে দেখে ছুটে এসে তালা দেয়া গেট খুলল। এই ব্যবস্থাটা সিদ্দিক সাহেবের খুব পছন্দ। গেট সব সময় তালাবদ্ধ থাকে। লোকজন আসছে যাচ্ছে এ রকম কোনো ব্যাপার নেই। বাড়ির চেহারাও এরা পাল্টে ফেলেছে। চারদিকে ফুলের টব - রঙ-বেরঙের পাতা বাহার, অর্কিড মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয়। পাড়ার মধ্যে এমন একটা সুন্দর বাড়ি দেখতে ভাল লাগে। আরো ভাল লাগে যখন মনে হয় এই বাড়িটা তাঁর। বেনামীতে কেনা।

জোবেদ আলি হাত কচলাতে কচলাতে বলল, বাড়িতে তো কেউ নাই।

তাই নাকি?

জি কক্সবাজার গেছে।

বৈশাখ মাসে কক্সবাজার?

ভিড় কম থাকে। নিরিবিলি। আসেন বসেন চা খান।

না চা খাব না। আসবে কবে?

তা তো জানি না। ইতালির দুই সাহেব আছে সাথে  বাংলাদেশ ঘুরতে আসছে।

ও আচ্ছা আচ্ছা।

সিদ্দিক সাহেবের বেশ মন খারা হয়ে গেল। সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলিকে নিয়ে কোথাকার কোন বিদেশী ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ তিনি নিজে গায়ে হাত রাখার মত সাহস সঞ্চয় কবতে পারেননি। কোনো মানে হয় না।

সব দিকেই তার সাহস আছে এই একটা দিকে শুধু সাহস হচ্ছে না। তাঁর ধারণা মেয়েগুলি অতিরিক্ত সুন্দরী বলেই সাহস হয় না। তেমন সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ তাঁর হয়নি। আর এই তিনটি মেয়ে দেখতে পরীর মতো। হারামজাদি বুড়ি এদের কোথেকে জোগাড় করেছে কে জানে?

স্যার বসবেন না?

না না বসব না। কোন রকম ঝামেলা-টামেলা আছে?

জি না  শুধু বাকের মাঝে-মধ্যে...

কি করে সে?

কিছু না গেটের সামনে দাঁড়ায়ে থাকে সিগারেট খায়। আফারা ভয় পায়।

অন্য কিছু করে না?

জি না।

বাকেরের সাথে আর কেউ আসে?

জি না  উনি একা।

আচ্ছা আমি দেখব ব্যাপারটা।

আম্মা বলছিল  বাকেরকে মাসে মাসে হাতখরচের টাকা কিছু দিবে কিনা  আপনার সঙ্গে আলাপ করতে বলছিল।

হাতখরচ দিতে হবে না ঐটা আমি দেখব। এই পাড়ার কেউ আসে এই বাড়িতে?

জি না।

কেউ কিছু জিজ্ঞেস করে?

জি না।

ঠিক আছে। তারা কবে কক্সবাজার থেকে আসবে কিছু জান না?

জি না।

আসলেই খবর দিবে।

আমি আম্মারে টেলিফোন করতে বলব।

টেলিফোন এসেছে নাকি?

টেলিফোন তো কবেই আসছে।

সিদ্দিক সাহেবের ভ্রূ কুঞ্চিত হল। টেলিফোন এসেছে অথচ টেলিফোনের খবর তাকে জানানো হয়নি। নম্বর পর্যন্ত দেয়নি। এর মানে হচ্ছে এরা তাঁকে খুব মুরুব্বি ধরছে না। তার চেয়েও অনেক বড় মুরুব্বি এদের আছে। কে সেই বড় মুরুব্বি?

তিনি জলিল মিয়াকে ডেকে পাঠালেন। কাস্টমারের যন্ত্রণায় জলিল মিয়ার দম ফেলার ফুরসুত হয় না-- এর মধ্যে কেউ ডেকে পাঠালে মেজাজ খিচড়ে যায়। মুখের ওপর বলতে ইচ্ছে করে যা শালা ভাগ। চায়ের দোকানের মালিকের পক্ষে যা কখনো বলা সম্ভব নয়। জলিল মিয়া ক্যাশ অন্য একজনকে বুঝিয়ে দোকান থেকে বেরুল। তাকে দেখলে মনে হবে সিদ্দিক সাহেব ডেকে পাঠানোয় সে আনন্দে আত্মহারা।

স্যার ডাকছেন?

কি খবর জলিল?

জি আপনাদের দশজনের দোয়া।

দোকান তো দেখি ভালই চলছে। সব সময় দেখি কাস্টমার।

আড্ডা দেওউন্যা কাস্টমার স্যার।

চায়ের দোকানে আড্ডাটাই প্রধান। যেখানে যত বেশি আড্ডা হবে সে দোকান তত তাড়াতাড়ি জমবে।

জলিল মিয়া উসখুস করতে থাকে মূল বিষয়টা জেনে চলে যেতে পারলে বাঁচা যায় ক্যাশে যাকে বসিয়ে এসেছে সে বিরাট চোর। ইতিমধ্যেই টাকা-পয়সা নিশ্চয়ই কিছু সরিয়েছে।

জলিল মিয়া।

জি স্যার?

ঐ যে তোমার দোকানের সামনের বাড়ি, এগার নম্বর বাড়ি। কিছু জানো তুমি?

কী জানব স্যার?

না মানে এই পাড়ার লোকজন কারোর সঙ্গে এ বাড়ির যোগাযোগ আছে?

কিছুই তো স্যার জানি না। আমার স্যার মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা। ক্যাশে বসে নজর রাখতে হয় চাইর দিকে। গতকাল স্যার রান্নাঘর থেকে ডালডার টিন চুরি গেল। চার কেজি ডালডা।

সিদ্দিক সাহেব অপ্রসন্ন মুখে বললেন ঠিক আছে, তুমি যাও। জলিল মিয়া ইতস্তত করতে লাগল। কাউকে অপ্রসন্ন করে চলে যাবার মত মনের জোর তার নেই।

কিছু বলবে?

জি না তবে স্যার বাকের ভাই কিছু জানলে জানতে পারে।

বাকের জানবে কেন? বাকেরের কি যোগাযোগ আছে?

মনে হয় আছে।

বাকের এখন থাকে কোথায় জান?

জি না।

শুনেছি তার ভাইয়ের বাসায় থাকে না।

আমি বলতে পারি না স্যার নিজের দোকানের যন্ত্রণায় অস্থির। চোখের সামনে থেকে ডালডার টিন নিয়ে গেল-- পাঁচ কেজি ডালডা ছিল।

একটু আগে তো বললে চার কেজি।

জলিল মিয়া হকচকিয়ে গেল।

ঠিক আছে তুমি যাও।

বাকের ভাইকে কিছু বলতে হবে স্যার?

না কিছু বলতে হবে না।

জলিল মিয়া চিন্তিতমুখে বের হয়ে এল। সবাইকে খুশি রাখা এই দুনিয়ার বিরাট কঠিন কাজ। তবে খুশি রাখতেই হবে। কেউ বেজার হলে দোকানদারি করা যাবে না।

## ৪৩

স্যার আমার নাম বাকের।

চিনতে পারছি। কী ব্যাপার?

মঙ্গলবার মঙ্গলবার করে থানায় হাজিরা দিতে বলেছিলেন তাই এলাম। আজ স্যার মঙ্গলবার।

মাঝখানে তো বেশ কয়েকটা মঙ্গলবার চলে গেল।

ঢাকার বাইরে ছিলাম স্যার। নেত্রকোনা গিয়েছিলাম।

আপনাকে কি হায়ার করে নিয়ে গেল?

কি বললেন বুঝলাম না।

আগে মফস্বলের লোকজন ঢাকা থেকে ফুটবল প্লেয়ার হায়ার করে নিত। আজকাল মাস্তান হায়ার করে। মাস্তানি এখন মোটামুটি লাভজনক ব্যবসা।

আমার ছোটবোনের বিয়ে হয়েছে নেত্রকোনা। দেখতে গিয়েছিলাম।

ভবিষ্যতে ঢাকার বাইরে গেলে আমাদের ইনফরম করে যাবেন।

জি আচ্ছা। এখন কি উঠব?

উঠুন বসে থেকে কি করবেন?

বাকের চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল একটা কথা স্যার, যদি কিছু মনে না করেন।

বলে ফেলুন কিছু মনে করব না।

মাঝে মাঝে স্যার মন্ত্রীরা মাস্তান হায়ার করে নিজেদের জায়গায় নিয়ে যান। গত ইলেকশনের সময় এই অধমকেও একজন নিয়েছিল। এই রকম কেইসেও কী থানায় খবর দিয়ে তারপর যাব? নাকি সরাসরি চলে গিয়ে কাজকর্ম মিটিয়ে আপনাদের খবর দিব?

ওসি সাহেব কিছু বললেন না। ওসি সাহেবের বাঁ পাশে বসা সেকেন্ড অফিসার উচ্চস্বরে হেসে উঠেই ওসি সাহেবের গম্ভীর মুখ দেখে হাসি গিলে ফেলল। বাকের বলল, স্যার তাহলে উঠি? আগামী মঙ্গলবার ইনশাআল্লাহ দেখা হবে।

ওসি সাহেব কিছু বললেন না। সেকেন্ড অফিসার দ্বিতীয় দফায় হেসে ফেলে আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। ওসি সাহেব বললেন, থানা হাসি-তামাসার জায়গা নয় এটা মনে রেখে কাজকর্ম করলে ভাল হয়।

বাকের থানা থেকে খুশি মনে বের হল। বেশ ফুর্তি লাগছে। যদিও ফুর্তি লাগার তেমন কোন কারণে নেই। তার থাকার জায়গাই এখনো ঠিক হয়নি। একেক রাত একেক জায়গায় কাটাচ্ছে। গত রাতে বড় ভাইয়ের বাসায় গিয়েছিল। বুক ধকধক করছিল যদি ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। আল্লাহতালার অসীম অনুগ্রহ দেখা হয়নি। কোথায় যেন গিয়েছে রাত দশটার আগে ফিরবে না। ভাবী ছিল। তাকে দেখে ঠাণ্ডা গলায় বলল, তুমি যে? কী মনে করে?

বাকের হকচকিয়ে গেলেও নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ভাবী ভাল আছেন?

হ্যাঁ ভালই আছি।

একটু রোগা রোগা লাগছে।

আমার শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে তোমাকে কনসর্নড হতে হবে না। কোন কাজে এসেছ?

ভাইজান কি আছেন?

সে আছে কী নেই সেটা তুমি বাড়ি ঢুকবার আগেই খোঁজখবর করেছ। আমি দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখান থেকেই শুনছিলাম।

ভাবলাম দেখা করে যাই। হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছি।

সে তো পনের দিন আগেই ছাড়া পেয়েছ। পনের দিন পর দেখা করতে এলে যে?

ঢাকার বাইরে ছিলাম। আচ্ছা ভাবী যাই।

দাঁড়াও।

সেলিনা ভেতর থেকে মুখ বন্ধ খাম এনে দিল। গলার স্বর আগের চেয়েও শীতল করে বলল,

তোমাব ভাই দিযে গেছে। নিযে তোমাব ভাইকে ধন্য কব।

এত বাগ কবছেন কেন ভাবী?

বাগ কবছি না। বাগ কবলে সংসাব ছেড়ে অনেক আগেই চলে যেতাম। ঝুলে তো আছি। তুমি থাক কোথায়?

ঠিক নেই ভাবী। একেক দিন একেক জাযগায।

এক জাযগায বেশিদিন থাকতে অসুবিধা হয তাই না? লোকজন খোঁজ পেযে যায।

তা না। ভাবী চা খাব, যদি আপনাব অসুবিধা না হয।

ফবিদা চাযেব কথা বলতে গেল। এই ফাঁকে বাকেব খাম খুলে আনন্দে প্রায লাফিযে উঠল। বাবশো টাকা, সব চকচকে নোট। ভাইযেব কাছ থেকে সে মাঝে মাঝে এ বকম পায। তবে ব্যাপাবটা খুবই অনিযমিত।

খুবই অবাক কাণ্ড ফবিদা নিজেই চাযেব কাপ নিযে ঢুকল। পিবিচেব এক কোণায এক টুকবো ঠাণ্ডা কেক। দীর্ঘ দিন ফ্রিজে ছিল আজ গতি হতে যাচ্ছে।

তোমাব ভাইযেব কথা শুনেছ বোধ হয।

জি না কি ঝামেলা?

চাকবি নিযে ঝামেলা হচ্ছে।

বলেন কি? কে ঝামেলা কবছে? নামধাম দেন। বডি ফেলে দেব

বাজে কথা একদম বলবে না। বডি ফেলে দেবে মানে? কাব বডি তুমি ফেলে দেবে? চা খেতে চেযেছ চা খাও। চা খেযে বিদেয হও। বড় বড় কথা বডি ফেলে দেব।

বাকেব নিঃশব্দে চা শেষ কবে উঠে এল। মেজাজ খুব খাবাপ কবা উচিত ছিল কিন্তু কবতে পাবেনি কাবণ পকেটে এতগুলি টাকা। তাছাড়া ভাই ভাবী এই দুজনেব ওপব সে বাগ কবতে পাবে না।

আজও একবাব যাবে বলে ঠিক কবল। চাকবিব ঝামেলা মানে কী ঝামেলা জানতে ইচ্ছা কবছে। তবে খোঁজখবব নিযে যেতে হবে। ভাই থাকলে যাবাব প্রশ্ন ওঠে না

বাকেব জলিল মিযাব স্টলেব সামেন এক মুহূর্তেব জন্য দাড়াল জলিল মিযা ক্যাশ সামলাতে ব্যস্ত তাব দম ফেলাব সময নেই তবু বাকেবেব দিকে তাকিযে দাঁত বেব কবে দিল।

চা খাইযা যান বাকেব ভাই।

বাকেব উত্তব না দিযে হাটতে শুরু কবল। বড়বেবড়েব নানান পোস্টাব চোখে পড়ছে। মহানাব কমিটি' এই বস্তুটি কি কে জানে। পাড়ায অনেক কিছুই হচ্ছে সে খবব বাখে না ইযাদেব কাছ থেকে ভেতবেব খবব কিছু নেযা উচিত কিন্তু তাব সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না। যে ক'বাব গিযেছে ইযাদেব বউ মুখ কালো কবে বলেছে উনি বাসায নাই মিথ্যা কথা বলছে না তো? না মিথ্যা কেন বলবে? বাকেব অন্যমনস্ক হযে পড়ল তখনি চোখে পড়ল ইযাদ মাথা নিচু কবে হনহন কবে যাচ্ছে। বগলে একটা দুধেব টিন। চোখে চশমা। ব্যাটা চশমা নিল কবে।

ঐ শালা। ঐ ইযাদ।

ইযাদ থমকে দাড়াল, বাকেব এগিযে গেল।

দেখাই পাওযা যায না ব্যাপাব কী? চাব দিন গেলাম।

দারুণ ব্যস্ত, কেমন আছিস বে দোস্ত।

ভালোই আছি। আয চা খাই।

আজ না দোস্ত বাসায দুধ নেই। দুধ নিযে যাচ্ছি। দেবি হলে বউ মাইণ্ড কববে।

দুধ বউযেব কাছে দিযে আয, তাহলে তো আব মাইড কববে না। নামিযে দিযে ফুট কবে চলে আসবি।

আজ বাদ দে দোস্ত। এক জাযগায যেতে হবে। আমাব বড়শালীব ছেলেব জন্মদিন। না গেলে খুব মাইন্ড কববে। গাড়ি পাঠিযে দিযেছে। বিশ্বাস না হয আমাব সঙ্গে এসে গাড়ি দেখে যা। ডাইহাটসু গাড়ি।

বাকেব উল্টো দিকে হাঁটা ধবল। মেজাজ খুব খাবাপ হবাব আগেই সবে যাওযা ভাল। মুনাদেব বাসায কি একবাব যাওযা যায? সকালে অবশ্যি একবাব দেখা হযেছে। তাতে কি? রুগী আছে একজন খোঁজখবব কবা দবকাব। মুনা রাগ নাও করতে পাবে। সব সময যে তাকে দেখলেই মুনা

রেগে যায় তাও তো না। মাঝে মাঝে খুবই ভাল ব্যবহার করে। যেমন আজ সকালে বাকের ঘরে ঢোকা মাত্রই মুনা বলল, বাকের ভাই চা খাবেন?

বিস্মিত বাকের বলল, হ্যাঁ।

তাহলে এক কাজ করুন। ফ্লাক্স দিচ্ছি, ফ্লাস্ক ভর্তি করে দোকান থেকে চা নিয়ে আসুন। ঘরে চা নেই, চিনি নেই, দুধ নেই। বিশ্রী অবস্থা। কাল থেকে চা না খেয়ে আছি।

বাকের ফ্লাস্ক ভর্তি করে চা নিয়ে এল - সেই সঙ্গে হাফ কেজি চা। দুই কেজি চিনি এবং একটা কনডেন্সড মিল্ক। বাকের ভেবেছিল সঙ্গের জিনিসগুলি দেখে মুনা রাগ করবে। তা সে করেনি। হাসি মুখে বলেছে, থ্যাংকস।

মুনার কাছে যাওয়া যায়। অবশ্যই যাওয়া যায়। দুটো মেয়ে মানুষ একা একা আছে এই কারণেই তো যাওয়া দরকার। রাগ করলেই বা কি। তার একটা দায়িত্ব আছে না?

বাকের লম্বা লম্বা পা ফেলতে লাগল।

আকাশ ঘোলাটে। বৈশাখ মাস শুরু হয়েছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হবে। বৎসরের প্রথম কালবৈশাখী। ভাল। খুবই ভাল। ঝড়বৃষ্টি হোক। মাঝে মাঝে ঝড়বৃষ্টি হওয়া দরকার। তা না হলে সব ন্যাতা মেরে যায়। লাইফ হেল হয়ে যায়। বাকের গুনগুন করে একটা সুর উঠাবার চেষ্টা করছে। গানের কথাগুলি হচ্ছে - ইয়ে হ্যায় আখেরি জামানা। আখেরি শব্দটার ওপর লম্বা টান আছে। টান দিয়ে গলা ভেঙে ফেলতে হয়। টানটা ভালই আসছে - গলা ভাঙাটা আসছে না। তর গুনগুন করতে ভাল লাগছে - ইয়ে হ্যায় আখেরি জামানা। এটা হচ্ছে শেষ সময়। হে প্রিয়তম এই শেষ সময়ে তুমি আমাকে ফেলে চলে যেও না। অভিশপ্ত জীবন থেকে তুমি আমাকে মুক্তি দাও।

খুব আধ্যাত্মিক গান।

## ৪৪

ঝড় মাথায় করে মামুন জাহানারাদের বাসায় এসে উঠল। হলুস্থূল কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। চোখের সামনে একটা ইলেকট্রিসিটির পিলার ভেঙে পড়ল। এত পলকা ধরনের পিলার বানায় নাকি আজকাল? ধক করে আগুন বের হয়ে বিকট শব্দ। তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাহানারাদের বাড়ির সামনের কাঁঠাল গাছের একটা ডাল ভেঙে টিনের চালে পড়ল। আগের বারের চেয়েও বিকট শব্দ হল। তারপর শুরু হল শিলাবৃষ্টি। গত পাঁচ বছরে ঢাকা শহরে এ রকম শিল পড়েনি।

জাহানারাদের ঘরে দরজা-জানালা সব বন্ধ। অনেকক্ষণ দরজায় ধাক্কাধাক্কি করার পর ভেতর থেকে জাহানারা ভীতগলা শোনা গেল - কে?

আমি। আমি মামুন।

বিস্মিত জাহানারা দরজা খুলতে খুলতে বলল, আপনি এখানে কী করছেন? আসবার আর সময় পেলেন না?

এ রকম ঝড় হবে বুঝতে পারিনি। টর্নেডো-ফর্নেডো কিনা কে জানে।

টর্নেডো নয় কালবোশেখি। ভেতরে আসুন। দরজা বন্ধ করে দেব।

জাহানারাদের বাড়ির একটা অংশ টিনের চাল। শিলা বৃষ্টির কারণে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। একটা ঘরের জানালা খুলে গেছে। সেই জানালা আছড়ে পড়ছে বারবার। জাহানারা বলল, অন্ধকার বাদে থাকুন। আমি আগে ঘর সামলাই। মামুন কৈফিয়তের ভঙ্গিতে বিড়বিড় করে কী যেন বলল, শব্দের কারণে কিছু বোঝা গেল না। ভেতর থেকে জাহানারার মা চেঁচাচ্ছেন - কে এসেছে - কার সঙ্গে কথা বলছিস?

জাহানারা জবাব না দিয়ে ভেতরে চলে গেল। মামুন এই রকম সময়ে চলে আসায় তার একটু লজ্জা লজ্জা করছে আবার ভালও লাগছে। ঘরে শুধু সে আর মা। অন্যরা ফুপুর বাসায় বেড়াতে গেছে। রাতে থেকে যাবে। এতক্ষণ ভয় ভয় করছিল - এখন ভয়টা কমেছে।

জাহানারা কিছুক্ষণ পর আবার এসে ঢুকল। হাসিমুখে বলল, আমাদের ছাদে প্রচুর শিল পড়েছে। শিল কুড়াবেন?

মামুন অবাক হয়ে বলল, শিল কুড়াব কেন? শিল কি আম নাকি?

আমি শিল কুড়াতে যাচ্ছি আপনি আমার সঙ্গে আসুন তো। একা একা ভয় ভয় লাগছে।

শিল দিয়ে কি করবেন?

কিছু করব না। ছোটবেলায় কুড়াতাম এখন আবার ইচ্ছা করছে।

ঝড় কমুক।

ঝড় কমেছে। শুধু বাতাস দিচ্ছে। আসুন তাড়াতাড়ি, এত অনুরোধ করতে পারব না।

মামুন উঠে দাঁড়াল। আশ্চর্য কাণ্ড উঠে দাঁড়ানোমাত্র জাহানারা বলল, থাক থাক এমনি বলছিলাম। ঠাট্টা করছিলাম। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ঠাট্টা করতে ভাল লাগে।

তাই নাকি? আমি অবশ্যি জানতাম না। আমি ভেবেছি আপনি বুঝি সত্যি সত্যি...

আমাকে কি আপনার কচি খুকি বলে মনে হয়?

না তা না। তবে আমার বড়রা অনেক সময় ছোটদের মত আচরণ করি।

তা অবশ্যি করি। এখন কি আপনি বড়দের মত একটা আচরণ করবেন? আপনাকে একটা টেলিফোন নম্বর দিচ্ছি ঐ নম্বরে টেলিফোন করে খোঁজ নিয়ে আসবেন মীরারা ভাল আছে কিনা। মা চিন্তা করছেন। কোন একটা দোকানে বা ফার্মেসিতে টেলিফোন পাবেন।

নম্বরটা বলুন।

খুব সহজ নম্বর ৪৪২৩৪৫ মনে থাকবে না কাগজে লিখে দেব?

মনে থাকবে।

টেলিফোন করে আসুন তারপর চা খাবেন। নাকি আজও ঐ দিনের মত ভাত খেতে চান?

মামুন বিস্ময় বোধ করছে। জাহানারা কথা বলার ভঙ্গি তার স্বভাবের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। বড় বেশি তরল গলায় কথা বলছে।

আজ খাবার কিন্তু ঐ দিনের চেয়েও খারাপ। ডিমের তরকারি এবং আলু ভাজা। খেতে পারবেন?

পারব।

জাহানারা হেসে ফেলল। তার হাসিটা খুব সুন্দর। যার হাসি সুন্দর তার কান্না নাকি কুশ্রী। জাহানারা কাঁদলে কেমন দেখাবে কে জানে। জাহানারা বলল, এ রকম মুখ গম্ভীর করে কী ভাবছেন?

মামুন বলল, কিছু ভাবছি না। আপনার জন্যে সামান্য একটা উপহার এনেছি। গল্পের বই। আপনার জন্মদিনের উপহার হিসেবে।

জাহানারা অবাক হলে বলল, আজ আমার জন্মদিন আপনাকে কে বলল?

মীরা বলেছিল। গতবার যখন এসেছিলাম ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ওর কোনো কথা বিশ্বাস করবেন না। আজ হচ্ছে ওর জন্মদিন। ফুপু এই উপলক্ষে তাকে দাওয়াত করেছেন। গল্পের বইয়ে কী আপনি আমার নাম লিখেছেন?

জি না।

তাহলে এটা তাকেই দিন। এখন যান টেলিফোন করে আসুন। নম্বরটা মনে আছে?

জি আছে -- ৪৪২৩৪৫

আপনার স্মৃতিশক্তি তো চমৎকার।

মামুনের স্মৃতিশক্তি মনে হচ্ছে তেমন ভাল নয়। পানিতে ভিজে, কাদায় মাখামাখি হয়ে সে যখন টেলিফোনের একটা ব্যবস্থা করল তখন দেখা গেল নম্বর মনে নেই। ২৩ এবং ৪৫-এ গণ্ডগোল। কোনটা আগে কোনটা পেছনে কিছু মনে নেই। সব তালগোল পাকিয়ে গেছে।

হাসিনার শরীরটা আজ অন্য দিকে চেয়ে অনেক ভাল। ঝড়বৃষ্টির সময় ছোটাছুটি করে দরজা-জানালা বন্ধ করেছেন। অন্য সময় অল্প একটু হাঁটাহাঁটিতেই হাঁপ ধরে যেত। আজ তেমন হচ্ছে না। বরং অনেক দিন পর ঝড়বৃষ্টিটা তাঁর ভালই লাগল।

এখন আর তেমন ভাল লাগছে না। জাহানারা ছেলেটির সঙ্গে খুকিদের গলায় কথা বলছিল। কেন বলছিল? জাহানারা এ রকম করে কখনো কথা বলে না। ছেলেটির সম্পর্কে তার মনে কি আছে তা পরিষ্কার জানা উচিত। জিজ্ঞেস করতে যেন কেমন বাধো বাধো লাগে। মীরা হলে এতক্ষণে হড়বড় করে সব বলে ফেলত।

জাহানারা।

বল মা।

ঐ ছেলে চলে গেছে?

হুঁ আবার আসবে। টেলিফোনে মীরার খোঁজ নেবে তারপর আসবে।

ও।

রাতে এখানে খাবে মা। চট করে কিছু কী করা যায়?

হাসিনা একবার ভাবলেন — বলবেন, রাতে খাবে কেন?

তিনি তা বলতে পারলেন না। শীতল গলায় বললেন, দেখ কিছু আছে কিনা।

রাতে খাবে বলে কি তুমি বিরক্ত হচ্ছ নাকি মা?

না। বিরক্ত হব কেন? ঢাকা শহরে কি এই ছেলের কোনো আত্মীয়-স্বজন আছে?

কেন বল তো?

না এমনি। একটু খোঁজখবর করতাম।

কিসের খোঁজখবর?

হাসিনা জবাব দিলেন না। জাহানারা সহজ গলায় বলল, তুমি যা ভাবছ সে সব কিছু না মা।

সে সব কিছু হলেই বা ক্ষতি কী?

হাসিনা তীক্ষ্ণ চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতে রাগ ছিল, অভিমান ছিল, বিষাদ ছিল এবং কিছু পরিমাণে মিনতিও ছিল। জাহানারা একটি নিঃশ্বাস ফেলল।

হাসিনা নরম স্বরে বললেন - ছেলেটা ভাল। আমার পছন্দ হয়েছে।

জাহানারা বলল, পছন্দ হলে কী করতে হবে? জাহানারা গলার স্বরে রাজ্যের বিরক্তি। হাসিনা অবাক হলেন। এর রকম তো হবার কথা না। তাঁর ধারণা জাহানারাও ছেলেটিকে পছন্দ করে। এই পছন্দ সাধারণ পছন্দেরও বেশি। তাহলে কি তাঁর ধারণা ভুল। ভুল তো হবার কথা না। এই সব ব্যাপারে মা'রা সচরাচর ভুল করেন না। তিনিও করেননি। ছেলেটি যে ক'বার এসেছে জাহানারার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে কথা বলেছে কিশোরীদের তরল গলায়। শব্দ করে হেসেছে। এসব কিসের লক্ষণ তা তিনি জানেন। তাহলে জাহানারা এমন করছে কেন? অন্য কোনো গোপন রহস্য আছে কি? তাঁর জানতে ইচ্ছে করে। তবে জানতে ইচ্ছা করলেও লাভ নেই। জাহানারা মুখ খুলবে না। মুখ তালাবন্ধ করে রাখবে। দশটা কথা জিজ্ঞেস করলে একটা জবাব দেবে। সেই জবাব থেকে কিছু বোঝা যাবে না।

হাসিনা ক্ষীণ স্বরে বললেন, জাহানারা তুই আমার পাশে বস তো। জাহানারা সহজ গলায় বলল, পাশেই তো বসে আছি মা।

হাসিনা পাশ ফিরে মেয়ের কোলে একটা হাত রাখলেন। কোমল স্বরে বললেন, ছেলেটাকে আমার খুব পছন্দ। ঠাণ্ডা ছেলে। আজকাল এ রকম দেখা যায় না।

আজকাল বুঝি ছেলেরা সব গরম হয়ে গেছে?

তুই এমন রেগে যাচ্ছিস কেন রে মা? রেগে যাবার মতো কিছু বলেছি? ছেলেটাকে ভাল লেগেছে এইটা শুধু বললাম। এতে দোষের কী হল?

না দোষের কিছুই হয়নি। আমি রাগ করিনি। একজনকে ভাল বলবে তাতে আমি রাগ করব কেন?

আমরা আগের কালের মানুষ। এ কালের কাণ্ডকারখানা কিছু বুঝি নারে মা।

জাহানারা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। মার রোগশীর্ণ হাতের ওপর নিজের হাত রাখল। তারপর খুবই নিচু গলায় প্রায় অস্পষ্ট স্বর বলল, ছেলেটাকে নিয়ে তুমি যা ভাবতে শুরু করেছ তা না ভাবলেই ভাল হয় মা। মামুন সাহেবের বিয়ে ঠিক হয়েছে আছে। কিছু দিনের মধ্যেই বিয়ে হবে।

হাসিনা তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে হবে তাহলে এখানে এসে বসে থাকে কেন? এটা কি ধরনের ভদ্রতা?

বিয়ে হচ্ছে বলে সে এ বাড়িতে আসবে না এমন তো কোন কথা নেই মা।

হাসিনার চোখে পানি এসে গেল। তিনি সেই লুকুবার কোনো চেষ্টা করলেন না। তিনি ভেবেই নিয়েছিলেন জাহানারার সঙ্গে এই ছেলেটির বিয়ে হবে। সংসারের ভিত পাকা হবে।

জাহানারা বলল, চা খাবে নাকি মা?

না।

শরীর খারাপ লাগছে?

উঁহু।

তুমি এমন ভেঙে পড়ছ কেন? এই ছেলে ছাড়া কি দেশে ছেলে নেই? মেয়ের বিয়ে দিতে চাও দেবে। আমি তো কখনো না বলিনি। একদিন শাড়ি গয়না পরে বরের বাড়িতেই চলে যাব। তখন হায় হায় করবে।

হাসিনা জবাব দিলেন না। মেয়ের কোল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে পাশ ফিরলেন। জাহানারা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে এখন আর ইচ্ছা করছে না।

জাহানারা রান্নাঘরে চলে গেল। রান্না করতে ইচ্ছা করছে না। তবু করতে হবে। এর থেকে মুক্তি নেই।

মার জন্যে তার বেশ খারাপ লাগছে। এই মহিলার ভাগ্যটাই এ রকম। দু'দিন পর পর শুধু আশাভঙ্গ হয়। বছর দুই আগে একবার হল। চমৎকার ছেলে। ফর্সা লম্বা, হাসি-খুশি। এমন একটা ছেলে যে, দেখলেই পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ইচ্ছা করে। বিয়ের সব ঠিক ঠাক। ছেলের এক মামা পাথর বসানো একটা আংটি দিয়ে জাহানারার মুখ দেখে গেলেন।

বিয়ের দিন-তারিখ হল, ১৭ কার্তিক। বিয়েটা হল না। কেন হল না সে এক রহস্য। তারা হঠাৎ জানাল — একটু সমস্যা হয়েছে। কী সমস্যা কিছুই বলল না। কি লজ্জা কি অপমান লাল পাথর বসান আংটি জাহানারা খুলে ট্রাংকের নিচে লুকিয়ে রাখল। একবার ভেবেছিল নর্দমায় ফেলে দেবে। ফেলতে পারেনি। আংটিটা হাতে নিলেই ফর্সা, লম্বা, কোঁকড়ানো চুলের ছেলেটির ছবি মনে আছে। শত অপমানের মধ্যে কেন জানি ভাল লাগে।

কত দিন কত জনের সঙ্গে দেখা হয় এই ছেলেটির সঙ্গে কখনো দেখা হয় না। জাহানারা ঠিক করে রেখেছে যদি কখনো দেখা হয় তাহলে সে হাসিমুখে এগিয়ে যাবে। খুব পরিচিত ভঙ্গিতে বলবে কী কেমন আছেন? চিনতে পারছেন আমাকে?

জাহানারা কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। আর ঠিক তখন ছোটখাটো একটা দুর্ঘটনা ঘটল। বাঁ পায়ের ওপর কেতলি উল্টে পড়ল। কেতলি ভর্তি ফুটন্ত পানি। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ঝলসে গেল। জাহানারা কোন শব্দ করল না। দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করল।

রাতে প্রচণ্ড জ্বর এল। জ্বরের ঘোরে মনে হল যেন লম্বা, ফর্সা, কোঁকড়ানো চুলের ছেলেটি তার পায়ের কাছে বসে আছে। বিরক্ত গলায় বলছে, তুমি এত অসাবধান কেন? পা সম্পূর্ণ ঝলসে গেছে আর তুমি একজন ডাক্তার পর্যন্ত দেখালে না? এ রকম ছেলেমানুষী করার কোন অর্থ হয়? ইস কী অবস্থা হয়েছে পায়ের।

জাহানারা বলল, ছিঃ, তুমি পায়ে হাত দিচ্ছ কেন?

পায়ে হাত দিলে কী হয়?

লজ্জা লাগে।

এত লজ্জা লাগার দরকার নেই।

জ্বরের ঘোরে সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। ফর্সা, লম্বা, কোকড়ান চুলের ছেলেটিকে এক সময় মামুন বলে মনে হতে থাকে।

জাহানারার বড় ভাল লাগে। তার বলতে ইচ্ছে করে, তুমি এত দূরে বসে আছে কেন? ব্যথায় মরে যাচ্ছি আর তোমার একটু মায়া লাগছে না? আরো কাছে আস। দেখ তো জ্বর আর বাড়ল কিনা। কপালে হাত দিলে কোন পাপ হবে না।

দুর্ঘটনা শুরুতে যত সামান্য মনে হয়েছিল দেখা গেল তা মোটেই সামান্য নয়। পা ফুলে উঠল। দু'দিনের মাথায় ঘা বিষিয়ে গেল। তৃতীয় দিনের দিন ভর্তি করতে হল হাসাপাতালে। হাসপাতালের ডাক্তাররা ঘা দেখে চমকে উঠলেন।

এক রাতে আধো ঘুম আধা জাগরণের মধ্যে জাহানারা শুনল বুড়ো মতো একজন ডাক্তার বলছেন — আর একটা দিন দেখব তারপর এম্পুট করে ফেলব। গ্যাংগ্রিনের সূচনা।

জাহানারা চেঁচিয়ে বলতে চাইল — দয়া করুন, আমার পা কাটবেন না। বলতে পারল না। তার কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। সমস্ত শরীরে ভয়াবহ ক্লান্তি পায়ে কোন ব্যথা নেই। মাথায় ভোতা যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার ধরনটাও অদ্ভুত। তেমন যে নেশা লেগে যায়।।

মনে হয় থাকুক না। আর শুধু ঘুমুতে ইচ্ছা করে। শরীরের প্রতিটি কোষ আলাদা আলাদা ভাবে ঘুমুতে চায়।

এগার দিনের দিন জাহানারা পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পেল। তার বিছানার পাশে মামুন বসে

আছে। ঘরে অনেক লোক। মা আছেন, মীরপুরের বড়খালা আছেন। বড়খালার ছেলে যে আর্মির অফিসার সেও আছে। জাহানারা বলল, আমার পা কেটে বাদ দিয়েছে তাই না?

মামুন বলল, না।

জাহানারার বিশ্বাস হল না। অথচ বিশ্বাস না হবার কানো নেই ঐ তো রোগা রোগা পায়ের পাতা দু'টি দেখা যাচ্ছে। মামুন তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। এত সুন্দর লাগছে কেন মামুনকে? কি সুন্দর তাকে লাগছে। সাদা পাঞ্জাবিতে তাকে এত সুন্দর লাগে। জাহানারা চোখ বন্ধ করল। আবার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে তলিয়ে যাবার আগ মুহূর্তে শুনল, মামুন বলছে খালা আর ভয় নেই। আপনারা বাসায় যান। বিশ্রাম করুন। আমি আছি।

আহ্ কী চমৎকার শব্দ-- আমি আছি। আমি আছির মত সুন্দর আর কোন শব্দ কী বাংলা ভাষায় আছে? না নেই।

জাহানারা সুস্থ হবার পনের দিনের মাথায় মামুনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। হাসিনা মেয়ের বিয়ে উপলক্ষ করে যতটা হৈচৈ করবেন বলে ভেবে রেখেছিলেন তার কিছুই করতে পারলেন না। একটা কমিউনিটি সেন্টার পর্যন্ত ভাড়া করা গেল না। আলো দিয়ে বাড়ি সাজানো হল না। মেয়েকে নতুন একসেট গয়নাও দিতে পারলেন না। তবু তাঁর মনে কোন অপূর্ণতা রইল না। দীর্ঘদিন পর গভীর আনন্দ বোধ করলেন। তাঁর ভাড়া বাড়ির প্যালাস্তরা ওঠা কুদর্শন একটা কোঠায় বাসর হবে। মেয়েরা ছোটাছুটি করে গর সাজাচ্ছে। এক ফাঁকে সেই ঘরও তিনি দেখে এলেন। অপূর্ব লাগল। চোখ ভিজে উঠল।

কি সুন্দর লাগছে জাহানারাকে। তাঁর এই কালো মেয়ের মধ্যে এত রূপ কোথায় লুকিয়ে ছিল? নাকি তাঁর এই মেয়ে রূপবতীই ছিল শুধু তাঁর চোখে পড়েনি? হাসিনার চোখ বারবার ভিজে উঠতে লাগল। তাঁর বড় বোন তাঁর হাত ধরে মেয়ের সামনে থেকে তাঁকে সরিয়ে নিলেন। রাগী গলায় বললেন, আনন্দের দিনে এ রকম কাঁদে কেউ। কাঁদতে কাঁদতে তুই দেখি চোখে ঘা করে ফেলবি।

বাসর রাতে ঘোর বর্ষণ। পৃথিবী ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মত বৃষ্টি। খুব আনন্দ করছে সবাই। পাড়ার মেয়েরা বৃষ্টিতে ভিজে হৈচৈ করছে। এ ওকে ধরে কাদা পানিতে মাখামাখি করছে। অকারণে হাসছে। হাসিনা ঘর অন্ধকার করে একা একা তাঁর ঘরে শুয়ে আছেন। সমস্ত দিনের উত্তেজনায় তাঁর হাঁপানীর টান প্রবল হয়েছে। খুব কষ্ট হচ্ছে। হোক কষ্ট আরো কষ্ট হোক। শুধু মেয়েটা সুখী হোক। আজ রাত হোক তার জীবনের শ্রেষ্ঠতম রাত।

হাসিনার কেন জানি গা ছমছম করতে লাগল। মনে হচ্ছে অন্ধকার ঘরে কে যেন এসে ঢুকেছে। নিঃশব্দে হাঁটছে। উৎসবের দিনে মৃত আত্মীয়-স্বজনরা এসে উপস্থিত হন। তাই নিয়ম। তাঁরাই কি এসেছেন? জাহানারার বাবা তো আসবেই। কে বলবে এই মুহূর্তে এই ঘরেই হয়ত সে আছে। মেয়েকে দেখে ফিরে যাবার মুহূর্তে অসুস্থ স্ত্রীকে দেখতে এসেছে। হাসিনা কাতর গলায় বললেন, কে? কে ওখানে?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। কিন্তু হাসিনার মনে হল কেউ-একজন এসে যেন তাঁর পাশে বসল। শব্দহীন স্বরে বলল, আমি। চিনতে পারছ না হাসু?

পারছি। পারব না কেন?

অনেক দিন তো হয়ে গেল, ভয় হচ্ছিল হয়ত চিনতে পারবে না।

হাসিনা ধরা গলায় বললেন, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি।

খুব ভাল করছে। একা একা অনেক কষ্ট করলে হাসু।

হাসিনা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, তুমি পাশে ছিলে না এইটাই একমাত্র কষ্ট। এছাড়া অন্য কোন কষ্ট-কষ্টই না। তুমি কেমন আছ?

রাত বাড়ছে। ঝড়বৃষ্টির চমৎকার একটি রাত।

## ৪৫

মুনা লক্ষ্য করল আজ সারাদিন বকুল মুখ শুকনো করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দুপুরে ভালমত খেল না। খানিকটা মুখে দিয়েই উঠে পড়ল। মুনা বলল, কি হয়েছে রে?

বকুল হাসিমুখে বলল, ক্ষিধে নেই। ক্ষিধে হলেই আবার খাব। তুমি আজ অফিসে গেলে না কেন আপা?

আজ শুক্রবার। অফিস বন্ধ।

ও আচ্ছা। আমার কিছু মনে থাকে না।

বকুল উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। হাতে গল্পে বই। পাড়ায় পাবলিক লাইব্রেরি হয়েছে। বাবু তার মেম্বার। রোজ বই নিয়ে আসছে। সাত আট পাতা পড়ে বকুল সে সব বই ফেরত পাঠাচ্ছে। পড়তে ভাল লাগে না। অথচ আগে কোনো একটা বই হাতে পেলে শেষ না কর উঠতে পারত না।

আজও পড়তে ভাল লাগছে না। হাই উঠছে। বকুল বই নামিয়ে রাখল। ঘুম ঘুম আসছে। অথচ ঘুমুতে ইচ্ছা করে না। কারো সঙ্গে গল্প করতে পারলে ভাল লাগতে গল্প করার মানুষ নেই।

ঘুমুচ্ছিস নাকি বকুল?

বকুল বিছানায় উঠে বসল। মুনা আপা গম্ভীর মুখে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে।

কিছু বলবে আপা?

তোর কি হয়েছে বল তো?

কী আর হবে কিছু হয়নি।

জহির কী রাগ করে চিঠিতে কিছু লিখেছে?

না তো। বিশ্বাস না হলে তুমি চিঠি পড়ে দেখ আপা। এনে দেই? ড্রয়ারে আছে।

না এনে দিতে হবে না। তোর কি বাচ্চা-কাচ্চা হবে? বল তো ঠিক করে।

বকুল অবাক হয়ে বলল. বাচ্চা-কাচ্চা হবে কী জন্যে?

মুনা বিরক্ত গলায় বলল, যা জিজ্ঞেস করেছি তার জবাব দে। হ্যাঁ বা না বল।

না।

নেত্রকোনা যেতে ইচ্ছে করছে? জহিরের কাছে?

না।

ইচ্ছা না করলেও যেতে তো হবে। সারা জীবন এখানে পড়ে থাকবে? তোর নিজের ঘর-সংসার আছে না?

কী করে যাই আপা। আমার তো শরীর খারাপ। মাথার ঠিক নেই।

মাথা খুব ঠিক আছে।

আজেবাজে জিনিস যে দেখি।

এখন তো আর দেখছিস না।

ঐখানে গেলেই দেখব।

তাহলে আবার চলে আসবি।

আচ্ছা। তুমি যা বল তাই

বকুল একটু আগে বন্ধ করা বই আবার মেলে ধরল। রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। আপা মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে যে মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

মুনা বলল, একটা দিন ঠিক করে বাবুকে নিয়ে চলে যা। বাকের ভাইও সঙ্গে যাবে। নয়ত জহির রাগ করবে। কে জানে হয়ত করেও বসেছে। রাগ না করলে এর মধ্যে এখানে একবার আসত।

রাগ করেনি।

রাগ না করলেই তো ভালই।

মামলায় হার হয়েছে এই জন্যে মনটন খারাপ। আরেকটা কী মামলা দিয়েছে। ঐটাতোও হারবে।

কে বলল হারবে?

আমার মনে হচ্ছে। একবার হারতে শুরু করলে হারতেই হয়।

তোকে বলল কে?

কেউ বলেনি। আমি জানি আপা। পান খেতে ইছে হচ্ছে। বাবুকে পাঠিয়ে একটা পান আনাও তো। ঐ বাড়িতে থেকে থেকে আমার পান খাওয়া অভ্যাস হয়ে গেছে। তুমিও একটা খাও আপা। ঠোঁট লাল হবে। দেখতে সুন্দর লাগবে।

মুনা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ঘর থেকে বেরুল। যতই দিন যাচ্ছে বকুলের ছেলেমানুষি ততই

বাড়ছে। মানুষের বয়স বাড়ে বকুলের বয়স কমছে। শরীরও খারাপ হচ্ছে। এই বয়েসী মেয়েদের চোখে-মুখে যে উজ্জ্বল আভা থাকে বকুলের তা নেই।

রাতে খেতে বসেও খানিকক্ষণ ভাত নাড়াচাড়া করে বকুল উঠে পড়ল। মুনা বলল, কী হয়েছে রে?

পেট ব্যথা করছে আপা?

পেট ব্যথা করছে?

হুঁ।

বেশি?

না বেশি না।

দুপুরেও তো খাসনি।

শোবার আগে এক গ্লাস দুধ খাব আপা ওতেই হবে।

মুনা দুধ নিয়ে নিজেই গেল। বকুল বিনা বাক্যে ব্যয়ে দুধ শেষ করে হঠাৎ নিচু গলায় বলল, তুমি যা বলছিলে তাই সত্যি আপা।

আমি কি বলীছলাম?

ঐ যে দুপুরে বললে। বাচ্চা হবার কথা।

সে কি?

এখন কি করব আপা?

কি করবি মানে? করাকরির কি আছে?

বাবুকে মিষ্টি দিয়ে একটা পান আনতে বল তো আপা। খেতে ইচ্ছে করছে। আলাদা করে যেন জর্দা আনে। আমি নিজেই বাবুকে বলতাম কিন্তু এখন ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়ে হয়েছে সমস্যা।

বকুল হাসছে। কেমন অদ্ভুত ভয় এবং সংকোচ মেশানো হাসি। মুনা এসে বলল বকুলের পাশে। বকুল প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, রাগ করনি তো আপা?

রাগ করব কেন?

বাচ্চা হচ্ছে যে এই জন্যে।

পাগলের মতো কথা বলছিস কেন রে বকুল? তুই কী পাগল হয়ে যাচ্ছিস নাকি?

হ্যাঁ আপা পাগল হয়ে যাচ্ছি। পুরোপুরি যেদিন হব সেদিন বুঝবে। আমাকে একটা পাগলাগারদে রেখে আসতে হবে।

বকুল এবার কাঁদতে শুরু করল। শিশুদের কান্না। সবাইকে জানাতে হবে যে কান্না শুরু হয়েছে। চোখে পানি তেমন থাকবে না ফুপানোর  শব্দ থাকবে, না ফুপানোর শব্দ থাকবে, শরীর বারবার দুলে উঠবে। আশপাশের সবাই বুঝবে ভয়াবহ কিছু ঘটে গেছে।

কাঁদছিস কেন রে বকুল?

মনের দুঃখে কাঁদছি।

এত কি তোর মনে দুঃখ যে কাঁদতে হবে?

তাহলে যাও মনের আনন্দে  কাঁদছি।

মুনা হেসে ফেলল। তার হাসি দেখে বকুলেরও হাসি পেলে গেল। অনেক কষ্টে সে হাসি থামিয়ে রাখল। মুনা বলল, কাল ভোরে তোকে একজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব। তারপর জহিরকে টেলিগ্রাম করব চলে আসতে। বাচ্চা না হওয়া পর্যন্ত তুই থাকবি আমার কাছে।

আমার বুঝি ঘর-সংসার নেই আপা?

একটু আগেই না থাকতে চাচ্ছিলি।

একন চাচ্ছি না।

বেশ  তো জহির এসে নিয়ে যাবে।

মুনা, বকুলের হাত ধরে খানিকক্ষণ বসে রইল। মুনার মুখ এখানো হাসি হাসি। বকুল খাকিনকটা গম্ভীর হয়ে আছে। কিছু একটা বলতে চাচ্ছে কিন্তু বলতে পারছে না।

কিছু বলবি বকুল।

হুঁ।

কী বলবি বলে ফেল।

বাবু যেন কিছু জানতে না পরে আপা।

বাবু জানলে কী?

লজ্জা লাগে আপা।

বকুল, মুনাকে জড়িয়ে ধরল। তার গা কাঁপছে। হয়ত আবার কাঁদবে। কিংবা কে জানে হয়ত আনন্দে হাসছে। বকুলের হাসি কান্নার কোন ঠিকঠিকানা নেই।

বুড়ো ডাক্তার সাহেব খুব আগ্রহ করে বকুলকে অনেক কিছু বললেন, সকাল-বিকাল হাঁটতে হবে। শারীরিক পরিশ্রম খুব প্রয়োজন এতে রক্তের অক্সিজেন বহন করার ক্ষমতা বাড়ে। শরীর সুস্থ থাকে। সুষম খাদ্যও খুব ইম্পর্টেন্ট। সেই সঙ্গে দরকার মানসিক প্রশান্তি।

তিনি বকুলকে একটা চটি বই দিলেন-- মা ও শিশু। বইটির মলাটে একটি শিশুর ছবি যে মার দুধ খাচ্ছে। লজ্জায় লাল হয়ে বকুল বই হাতে নিল। ডাক্তার সাহেব অবাক হয়ে বললেন, তোমার বয়স কত?

ষোল।

এত অল্প! আজকাল তো এ বয়সে মেয়েরা মা হচ্ছে না। তবে মা হবার জন্যে বয়সটা খারাপও না। তুমি কিন্তু খুকি প্রথম বাচ্চার পর খুব সাবধান হবে। শিশু দিয়ে দেশ ভর্তি করে ফেলার কোন মানে হয় না। এক মাস পরে আবার আসবে।

বকুল মাথা কাত করল। লজ্জায় তার মুখে কথা ফুটছে না। ডাক্তার সাহেব বললেন, এক মাস পর যখন আসবে তখন বাচ্চার হার্টবিট তোমাকে শুনিয়ে দেব। আর এক মাস পর থেকেই হার্টবিট করতে শুরু করবে। নিজের বাচ্চার হার্টবিট শোনা একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা।

বকুল ফিসফিস করে বলল, কিভাবে শুনব?

খুব সোজা। ঐদিন টের পাবে।

মুনা ডাক্তার সাহেবের কথাবার্তায় বেশ অবাক হচ্ছে। কোন ডাক্তার রুগীর সঙ্গে এত আগ্রহ নিয়ে কথা বলেন না। ইনি বলছেন। এমন না যে এর কাছে রুগী আসে না অনেকদিন পর একজন রুগী পাওয়া গেছে। ডাক্তার সাহেবের চেম্বার রুগীতে ভর্তি। নম্বর লেখার স্লিপ হাতে নিয়ে সবাই অপেক্ষা করছে।

বকুলের জন্যে এই ডাক্তার এতটা আগ্রহ কেন দেখালেন?

চলে আসবার সময় দরজা পর্যন্ত এগিয়ে মৃদু গলায় বললেন, রিকশায় চলাফেরা করলে সাবধানে করবে যেন ঝাঁকুনি না লাগে। কেমন?

পৃথিবীতে অনেক রহস্য আছে। সেই সব রহস্যের একটা হচ্ছে মানবিক সম্পর্ক। এর কোনো ধরাবাধা নিয়ম নেই। হঠাৎ যে কোনো একজন মানুষের জন্যে হৃদয় মমতায় উদ্বেলিত হতে পারে।

মুনা, ডাক্তারের ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, চল বকুল তোর বাচ্চার জন্যে কিছু একটা কেনা যাক।

বকুল লজ্জিত গলায় বলল, কি কিনবে?

চল নিউ মার্কেটে গিয়ে দেখি কি পাওয়া যায়। আমি তো ছাই জানিও না।

লজ্জা লাগে যে আপা।

লজ্জার কী আছে? তাছাড়া তোরই যে বাচ্চা তাও তো কেউ বুঝবে না।

নিউ মার্কেট থেকে কিনবে না কিনবে না করেও অনেক কিছু কেনা হয়ে গেল। যাই দেখে তাই বকুলের পছন্দ হয়ে যায়। নিচু গলায় বলল, এটা কিমব আপা, বেবি সোপ। এত দাম নিচ্ছে। থাক লাক্স সাবান দিয়ে গোসল করলেই হবে। এত বাবুয়ানির দরকার নেই। বকুলের মুখের দিকে তাকিয়ে মুনাকে বাধ্য হয়ে বলতে হয়— কিনে নে।

এই টাওয়াল কিনব আপা? হাত দিয়ে দেখ কত নরম।

পছন্দ হলে নে।

পরে কিনলেও তো হবে। এত আগেভাগে কিনে লাভ কী আপা?

তাহলে পরে কিনব।

কিন্তু পরে যদি না পাওয়া যায়। ভাল জিনিস কিছুই থাকে না।

তাহলে কিনে ফেলাই ভাল।

গভীর সুখ ও গভীর আনন্দে বকুলের চোখ ঝলমল করে। তার দিকে তাকিয়ে মুনার বড় মায়া লাগে। পুঁটলা পুঁটলি সব বকুলের নিজের হাতে। মুনার কাছে দিতে রাজি না। মুনা বলল, তোর কষ্ট হচ্ছে কিছু আমার কাছে দে।

বকুল হাসিমুখে বলল, কষ্ট হচ্ছে না আপা। তাছাড়া পরিশ্রম করার দরকার। ডাক্তার সাহেব তো তাই বললেন।

কিছু খাবি ক্ষিধে পেয়েছে?

হুঁ পেয়েছে? ঝাল কিছু খেতে ইচ্ছ করছে।

চল কিছু খাই।

ঝাল খেলে বাচ্চার আবার ক্ষতি হবে না তো আপা? ডাক্তার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করার দরকার ছিল। বাসায় ফেরার পথে একবার থেমে জিজ্ঞেস করে যাব আপা?

তা করা যেতে পারে।

কাঠের একটা দোলনা বানাতে দিতে হবে। তুমি এ রকম করে হাসছ কেন আপা?

যা আর হাসব না।

তোমার অনেক টাকা খরচ করিয়ে দিলাম।

তা দিলি। কি আর করা।

তুমি আবার মনে মনে আমার ওপর রাগ করছ না তো?

করছি।

বকুল হাসল। চমৎকার হাসি। মুনার মনে হল এত সুন্দর করে বুকল এর আগে কখনো হাসেনি। সকালবেলার রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। গায়ে হালকা নীল রঙের একটা শাড়ি। সেই নীল রঙের আভা পড়েছে তার মুখে-চমৎকার ছবি।

জহির বৃহস্পতিবার ভোরে এসে উপস্থিত। তার দিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠতে হয়। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনেক দিন চুল কাটা হয়নি বলেই মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল। এই গরমে গায়ে হলুদ রঙের ময়লা একটা কোট। বাসায় পা দিয়েই প্রথম যে কথাটি বলল তা হচ্ছে -- বিরাট ভুল হয়ে গেল। নিতান্ত বেকুবের মতো কাজ করেছি। ছিঃ ছিঃ।

বেকুবের মতো কাজ আর কিছুই না সঙ্গে সে একটা মাছ নিয়ে এসেছিল। রুই মাছ। ট্রেনে সিটের নিচে রাখা ছিল। নামার সময় মাছ না নিয়েই নেমে এসেছে।

মুনা বলল, এখন আর আফসোস করে কি হবে? মাছ গেছে গেছে। রুই মাছ ঢাকাতেও পাওয়া যায়। তোমার এই অবস্থা কেন? দেবদাসের মতো লাগছে।

গালে অ্যালার্জির মত হয়েছে আপা-- ব্লেড ছুঁলেই ফুলে ওঠে। এই জন্যে দাড়ি কাটা বন্ধ। মন মেজাজও খারাপ।

কেন?

পর পর দুটো মামলায় হেরেছি। তৃতীয় একটা শুরু হয়েছে। এটাতেও মনে হচ্ছে হারব। ঢাকা আসার মূল কারণ হচ্ছে বড় বড় উকিল ধরব।

টেলিগ্রাম পাওনি?

না তো। কিসের টেলিগ্রাম?

ঠিক আছে - পরে শুনবে। যাও মুখ ধোও। দয়া করে কাপড়গুলিও বদলাও। এত ময়লা কাপড় তোমার আছে জানতাম না।

জহির টেলিগ্রামের বিষয়ে কোন রকম আগ্রহ প্রকাশ করল না। গোসল করে পর পর দু'কাপ চা খেয়ে চাদর গায়ে ঘুমিয়ে পড়ল। টানা ঘুম। মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন সে আরাম করে ঘুমুতে পারছে না।

মুনা অফিসে যাবার আগে বকুলকে বলে গেল ঘুম ভাঙলেই সব গুছিয়ে বলবি। জহিরের মনটন খুব খারাপ। খরবদার ঝগড়া-টগরা করবি না।

বকুল অবাক হয়ে বলল, শুধু শুধু ঝগড়া করব কেন?

জহির রেগে কিছু বললে ও চুপ করে থাকবি।

ওইবা রেগে রেগে কথ বলবে কেন? রাগ করবার মত আমি কী করলাম?

তুই বড়ই বোকা বকুল। এই রকম বোকা হলে তো মুশকিল।

তোমার মতো চালাক হলে আপা মুশকিল। চালাক মেয়েরা বিয়ে-টিয়ে কিছুই করতে পারে না একা একা থাকে এবং মনে করে বিরাট একটা কাজ করা হল।

মুনা, অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কি অদ্ভুত কথা বকুলের। চোখ-মুখ শক্ত করে কথা বলছে। আগের বকুলকে এখন আর চেনা যাচ্ছে না। মুনা কিছু বলল না। বাবুকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল। বাজার করে বাবুকে পাঠাবে। ঘরে প্রায় কিছুই নেই। আজও নিশ্চয়ই অফিসে যেতে দেরি হবে।

দুপুর বেলা জহির ঘুম থেকে উঠল। হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসল। খেতে খেতেই বকুলের খবর শুনে সহজ গলায় বলল, ভালই তো। আমি অবশ্যি আগেই সন্দেহ করেছিলাম। ডাক্তারকে দিয়ে কনফার্ম করিয়েছ তো?

হুঁ।

এখন খাওয়া-দাওয়া ঠিক করবে। তোমার এনিমিয়ার ভাব আছ।

নতুন শিশু প্রসঙ্গে এখানেই তার আগ্রহের সমাপ্তি। যেন যা বলার বলা হয় গেছে। আর কিছু বলার নেই। নতুন একটি শিশু আসার ঘটনাটা যেন কোনো ঘটনাই না। জ্বর বা সর্দি হবার মতো একটা ব্যাপার।

বকুল।

বল।

তোমার ঐ অসুখটা সেরেছে। স্বপ্নটপ্ন কী যেন দেখতে।

সেরেছে।

গুড। আমি ভেবেছিলাম এসে দেখব তোমাকে পাগলাগারদে ট্রান্সফার করা হয়েছে। কিছুক্ষণ পর পর হা হা হি হি করছ।

বকুল কিছু বলল না। ডালের বাটি এগিয়ে দিল। জহির বলল, যন্ত্রণা যখন শুরু হয় চারদিক থেকে এক সঙ্গে শুরু হয়। আটপাড়ার জল মহাল হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে।

কেন?

আরে কাজগপত্র কিছু নেই। সরকারি রেকর্ডে গণ্ডগোল। আমি তো এইসব নিয়ে কখনো মাথা ঘামাইনি। মা দেখত। কি করে রেখেছে। এখন আমার মাথায় হাত। পথের ফকির হচ্ছি বুঝলে। স্ট্রিট বেগার। এমন অবস্থা হয়েছে শান্তিমত ঘুমোতে পারি না।

ঘুমোতে পার না কেন?

মা সারাক্ষণ কাঁদে। দরজায় মাথা বাড়ি দেয়। এর মধ্যে ঘুমোব কী করে বল। একদিন আবার পুকুরে ডুবে মরতে গিয়েছিল। বিরাট কেলেংকারি।

এইসব কথা তো কিছু লেখনি।

লেখার মত কোনো কথা তো না। চা কর তো বকুল। ভাতটা শেষ করেই চা খেয়ে রওনা হব।

কোথায় রওনা হবে?

তিনজন দেওয়ানি উকিলের এ্যাড্রেস নিয়ে এসেছি। দেখি ব্যাটাদের কাউকে রাজি করানো যায় কিনা।

জহির চা পুরো শেষ করল না। দু'চুমুক দিয়ে বের হয়ে গেল। তার ভাবভঙ্গি পুরোপুরি স্বাভাবিক, এ রকম বলা যাবে না। কিছুক্ষণ পরপর বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। বকুলের বড় মায়া লাগছে সারাক্ষণ তার ইচ্ছা হচ্ছিল বলে তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও কিন্তু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও। আমি সারাক্ষণ তোমার সঙ্গে থাকব। বলা হল না। লজ্জা লাগতে লাগল।

জহির ফিরল রাত এগারটার দিকে। বিধ্বস্ত চেহারা। বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে অনেকটা কেটে গেছে। হলুদ শার্ট রক্ত জমে কালচে হয়ে গেছে। জহির বিব্রত স্বরে বলল, রিক্শা থেকে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে এই অবস্থা।

বকুল গরম পানিতে হাত ধুইয়ে দিল। ঘরে ডেটল ছিল না। বাবু এক বোতল ডেটল, তুলা, গজ কিনে আনল।

জহির বলল, এ্যাকসিডেন্ট হওয়ায় মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল বুঝলে বকুল। ভাবলাম অযাত্রা। আসলে তা না। বেনী মাধব বাবুকে পেয়ে গেলাম।

বেনী মাধব কে?

খুব নামকরা ল ইয়ার। দিনকে রাত করতে পারে। ঘাগু লোক। কাগজপত্র দেখেই সব বুঝে

ফেলল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইল, তারপর বলল দাগ নম্বরে গণ্ডগোল আছে। তখনি বুঝলাম- এ হচ্ছে আসল জিনিস। এর কাছে হেংকি- পেংকি চলবে না।

বকুলের বড় মায়া লাগছে। জহিরের কথা বলার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে সে গভীর জলে পড়েছে উদ্ধারের আশা নেই। ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটো ধরে ও তেমনি ধরেছে বেনী মাধবকে।

রাতে ঠিকমত খেতেও পারল না। একগাদা ভাত মাখিয়ে দু'এক নলা মুখে দিয়েই বলল খেতে পারছি না বকুল।

কেন খেতে পারছ না?

বুঝতে পারছি না। খুব ক্ষিধে লেগেছিল। হঠাৎ ক্ষিধেটা মরে গেল।

একটু দুধ দেই। দুধ গুড় মাখিয়ে খাও।

দাও।

দুধ দেয়া গেল না। ঘরে দুধ ছিল না।

বকুলের কেমন জানি কান্না পেতে লাগল। আহ বেচারি দুধ ভাত খাবার জন্যে হাত গুটিয়ে বসে ছিল। বকুল ভেবে রেখেছিল রাত জেগে অনেক গল্প করে জহিরের মনটা সে ভাল করবে। গল্প ছাড়াও তো পুরুষদের অন্যসব দাবিও থাকে সেই সব সে খুব আগ্রহ করেই মেটাবে। ঘুমুবার সময় ঘুমুবে জহিরকে জড়িয়ে ধরে। আহা বেচারা একা একা কত ঝামেলা সহ্য করছে। আর তাকে একা ঝামেলা সহ্য করতে দেবে না। এবার সে নিজেও সঙ্গে যাবে।

জহির বলল, এক কাপ আদা চা খাওয়াবে বকুল। শরীরটা কেমন ঝিম মেরে আছে। কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

তুমি বিছানায় শুয়ে থাক। আমি চা বানিয়ে আনছি।

মাথা ধরার ট্যাবলেট থাকলেও একটা নিয়ে এস। মাথাটা কেমন ধরা ধরা মনে হচ্ছে।

বকুল চা নিয়ে এসে দেখে জহির ঘুমুচ্ছে। ক্লান্ত-শ্রান্ত মানুষের ঘুম। বড় বড় করে নিঃশ্বাস ফেলছে। মাথাটা বালিশ থেকে খানিকটা সরে গেছে। বকুলের ঘুম এল না।

জহিরকে জড়িয়ে ধরে সে জেগে রইল। পুরানো কথা মনে পড়তে লাগল। প্রথম যখন পরিচয় হয় জহিরের সঙ্গে কথা বলতে কেমন ভয় ভয় লাগত আবার ভালও লাগত। জহিরের ফার্মেসির সামনে দিয়ে যাবার সময় সে হাঁটতে মাথা নিচু করে যাতে জহির তাকে দেখতে না পায় অথচ মনে মনে সারাক্ষণ চাইত জহির তাকে দেখে ফেলুক। প্রায় সবদিনই জহির তাকে দেখতে। যেদিন দেখতে না সেদিন এমন কষ্ট হত চোখে পানি এসে যেত। আবার চোখে পানি আসার জন্যে নিজের ওপর রাগ লাগত। কী অদ্ভুত সময় গেছে। ইস এই সময়টা আর ফিরে আসবে না। ভালবাসার মানুষের সঙ্গে বিয়ে না হওয়াটাই বোধ হয় ভাল। বিয়ে হলে মানুষটা থাকে ভালবাসা থাকে না। আর যদি বিয়ে না হয় তাহলে হয়ত বেশি প্রিয়।

বকুল।

কি?

ক'টা বাজে দেখ তো?

জহির বিছানায় উঠে বসল। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে যেন ঠিক বুঝতে পারছে না সে কোথায়। বকুল বাতি জ্বালাল। ঘড়ি দেখল।

ক'টা বাজে?

দেড়টা। চা এনে দেখি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ-তাই আর জাগাইনি।

ঠাণ্ডা পানি খাওয়াও তো। গরম লাগছে খুব। জানালা খোলা না?

হ্যাঁ খোলা।

দমবন্ধ দমবন্ধ লাগছে।

বকুল পানি নিয়ে এসে দেখে জহির সিগারেট ধরিয়েছে। দু'চুমুক পানি খেয়েই সে গ্লাস নামিয়ে রাখল। করুণ গলায় বলল, শরীরটা কেমন যেন লাগছে।

কেমন লাগছে?

বুঝতে পারছি না।

শরীর খারাপ লাগছে তো - সিগারেট টানছ কেন?

জহির সিগারেট ফেলে দিল। বকুল লক্ষ্য করল জহির খুব ঘামছে। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, তল

পেটে কেমন জানি চিনচিনে ব্যথা হচ্ছে। বমি বমি লাগছে।

আপাকে ডেকে আনব?

উনাকে ডেকে এনে কি হবে? উনি কি করবেন? তুমি বরং চিনির সরবত করে দাও। তৃষ্ণা লাগছে।

বকুল চিনির সরবত করে আনল। দু'চুমুক দিয়ে সরবতের গ্লাস নামিয়ে জহির ক্লান্ত গলায় বলল, বোধ হয় মারা যাচ্ছি।

কী বলছ তুমি? মারা যাবে কেন?

আপাকে ডাক। শরীরটা বেশি খারাপ লাগছে। মনে হচ্ছে স্ট্রোক। আমাকে সোহরাওয়ার্দীতে নিতে বল। আমি নিজে ডাক্তার।

মুনা বাবুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাকেরকে খুঁজে বের করতে হবে। জহিরকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেত হবে। এক একটা মিনিটও এখন মূল্যবান।

•বাকের ঘরে ছিল। স্যান্ডেল খুঁজে বের করার সময়ও সে নিল না। খালি পায়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। কোথায় যাচ্ছে কি করার জন্যে যাচ্ছে তাও সে জানে কি না কে জানে।

বাকের অসাধ্য সাধন করল। চল্লিশ মিনিটের মাথায় জহিরকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারল। বড় রকমের একটা ঝাপটা সামলান গেল। তবে জহিরের শরীরের বাঁ অংশ অচল হয়ে গেল।

বকুল ক্রমাগত কাঁদছিল। জহির ক্ষীণ স্বরে বলল, কাঁদার কিছু নেই। ঠিক হয়ে যাব। আমি ডাক্তার আমার কথা বিশ্বাস কর।

বকুল কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না সে শুধু দেখছে একজন সুস্থ সবল মানুষ হঠাৎ পা নাড়াতে পারছে না। এটা কেমন করে হয়।

মুনা বলল, এ রকম বিশ্রী করে কাঁদছিস কেন?

বকুল থমথমে গলায় বলল, সুন্দর করে কাঁদাটা কেমন আমি জানি না আপা। তাই বিশ্রী করে কাঁদি। তোমার ভাল না লাগলে তুমি অন্য ঘরে যাও।

জহিরের শরীর যত দ্রুত সারবে ভাবা গিয়েছিল তত দ্রুত সারল না। মাস খানেক পর দেখা গেল ডান পা কিছু কিছু নাড়াতে পারে; বাঁ পায়ের আঙুল নাড়াতে পারে এর বেশি কিছু না।

এভাবে হাসাপাতালে পড়ে থাকার কোন মানে হয় না। জহির নেত্রকোনায় ফিরে গেল। সঙ্গে গেল বকুল এবং বাবু।

মা হবার লক্ষণ বকুলের মধ্যে স্পষ্ট হতে শুরু করেছে- বেশি পরিশ্রম করতে পারে না হাঁপিয়ে উঠে। কিন্তু তবু জহিরের সব কাজ নিজের হাতে করতে চায়। তার শাশুড়ির এই জিনিসটা কেন জানি ভাল লাগে না। একদিন তিনি বলেই ফেললেন, আলগা আদর কিন্তু ভাল না বৌমা। বকুল সঙ্গে সঙ্গে বলল, আলগা আদর কাকে বলে মা?

তুমি যা করছ তার নাম আলগা আদর।

এর নাম আলগা আদর কেন?

দু'দিন আগের কথা ভুলে গেছ। দু'দিন আগে তো এক ঘরে ঘুমুতে পর্যন্ত পারতে না।

এখন পারি তাতে অসুবিধা কি?

অসুবিধা কিছুই না। মুখের ধার একটু কমাও তো বউ। এত ধরা ভাল না।

বকুলের মুখের ধার কমে না। বরং বেড়েই চলে। বাবু অবাক হয়ে বোনকে দেখে। অবাক হয়ে ভাবে কত দ্রুত একজন মানুষ বদলায়। কত ভাবেই না বদলায়।

বাবুকে এখানকার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়েছে। তার কিছুই ভাল লাগে না। ঢাকায় যেতেও ইচ্ছা করে না। মাঝে মাঝে প্রচণ্ড মাথাব্যথা হয়। তখন শুধু মরে যেতে ইচ্ছা করে। মরণের কথা ভাবতে তার বড় ভাল লাগে।

জোবেদ আলি শুকনো মুখে অনেকক্ষণ ধরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। মাথা অন্য দিনের চেয়েও নিচু করে রেখেছে। মনে হচ্ছে পিঠের কাছে একটা কুঁজ বের হয়েছে। তার হাতে একটা আধখাওয়া সিগারেট। সিগারেট টান দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে থুথু ফেলছে। তার গায়ে হলুদ রঙের চাদর। পরনের পায়জামা ইস্ত্রি করা। তবে গায়ের চাদর বেশ ময়লা।

জলিল মিয়া ব্যাপারটা লক্ষ্য করল। যদি সে তার নিজের দোকান ছাড়া অন্য কিছুই লক্ষ্য করে না। চাদরের হলুদ রঙটাই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মনে মনে বলল, দুপুরের এই গরমে গায়ে চাদর কেন? অসুখ-বিসুখ নাকি? অসুখ-বিসুখের কথা মনে হবার কারণ হচ্ছে তার নিজেই আজ জ্বর এবং তার গায়েও হলুদ খদ্দরের চাদর। দোকানে তার আসার কোন ইচ্ছাই ছিল না তবু এসেছে। ক্যাশে বসে ঝিমুচ্ছে। জলিল মিয়া লক্ষ্য করল জোবেদ আলি দু'বার তার দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। মাথা নিচু করেই আড় চোখে তাকাল তার দিকে। লোকটা কী কাউকে খুঁজছে? কাকে খুঁজবে?

খুঁজুক যাকে ইচ্ছা। তোর কি? জলিল মিয়া মাথা ধরার দুটো ট্যাবলেট খেয়ে চোখ বন্ধ করল। কোন কাস্টমার নেই। তিনটার পর থেকে দোকান খা খা করে। এ রকম হলে তো ব্যবসা তুলে ফেলতে হবে। জলিল মিয়া বেশিক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখতে পারল না। একজন এসেছে দশ টাকা ভাংতি নিতে। কর্কশ গলায় বলা যেতে পারে-ভাংতি নাই কিন্তু বলাটা ঠিক হবে না। এরা হচ্ছে কাস্টমার। এদের সঙ্গে ভদ্র ও বিনয়ী আচরণ করতে হবে। সে দুটা পাঁচ টাকার নোট দিয়ে তেলতেলে ধরনের হাসি হাসল আর ঠিক তখন দোকানে ঢুকল জোবেদ আলি। চিঁচিঁ করে বলল, ভাই সাহেব চা হবে?

জলিল মিয়া হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। জ্বর চেপে আসছে। কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। শরীর ভাল থাকলে দু'একটা টুকটাক কথা বলা যেত যেমন— এতদিন এই অঞ্চলে আছেন, আর আজ প্রথম চা খেতে আসলেন ব্যাপার কী ভাই? গায়ে চাদর যে? অসুখ-বিসুখ নাকি? এই দেখেন আমারো একই অবস্থা। নির্ঘাৎ একশ' তিন জ্বর। তবু দোকানে আসতে হয়। উপায় কী ভাই বলেন? একটা বিশ্বাসী লোক নাই। সব চোর।

জোবেদ আলি চায়ে দুটা চুমুক দিয়েই বসে আছে। সিগারেট ধরিয়ে খুঁক-খুঁক কাশছে। কেমন ভয়পাওয়া চোখে তাকাচ্ছে। জলিল মিয়া নিঃসন্দেহ হল এই লোক চা খেতে আসেনি। অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। থাকুক উদ্দেশ্য। তার তা দিয়ে কোনো কাজ নেই। সে ব্যবসা করতে এসেছে ব্যবসা করবে। তার বেশি কোন কিছুতেই কাজ কী?

জোবেদ আলি চায়ের দাম দিল চকচকে একটা এক টাকার নোট দিয়ে। এতে জলিল মিয়ার মনটা খানিকটা ভাল হল। কাস্টামাররা তাদের ছেঁড়াখুড়া পচা নোটগুলি তাকে দিয়ে পার পায়।

জলিল মিয়া বলল, ভাল আছেন?

জোবেদ আলি আগের মতোই চিঁচিঁ স্বরে বলল, জ্বি ভাল। আপনি বাকের সাহেব কোথায় আছে বলতে পারেন?

জি না।

কোথায় পাওয়া যাবে উনাকে?

জানি না।

জোবেদ আলি খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, খুব দরকার ছিল। যদি বলতে পারেন উপকার হয়।

ইদরিসের ওখানে খোঁজ করেন। ফার্নিচারের দোকান দিয়েছে যে ঐ ইদরিস। দুপুর বেলায় ঐ দোকানের দু'তলায় ঘুমায়।

জি আচ্ছা। আপনার এখানে আসবে না?

জানি না। ইনার চলার তো কোন ঠিকঠিকানা নাই।

খুব দরকার ছিল।

শরীর ভাল থাকলে জলিল মিয়া বলত, কী দরকার? শরীর ভাল নেই বলেই সে কিছু বলল না। তাছাড়া জোবেদ আলি মুখের কাছে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। অসুস্থ শরীরের কারণে ধুঁয়া সহ্য হচ্ছে না। নাড়ির ভেতর পাক দিয়ে উঠছে। কিছু বলাও যাচ্ছে না। এরা কাস্টমার ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে হলে এদের খাতির করে চলতে হয়। জোবেদ আলি বলল, আপনার সঙ্গে দেখা হলে একটা খবর দিতে পারবেন?

কি খবর?

জোবেদ আলি বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, থাক কিছু বলতে হবে না। সে ইদরিসের ফার্নিচারের দোকানে গেল। ইদরিস একটা সোফাসেটে বার্নিস ঘসছে। সে জোবেদ আলিকে অনেক

কথাই বলল, যার সারমর্ম হচ্ছে বাকের ভাই ঘুমুচ্ছে তাকে ডাকা যাবে না। ডাকলে খুব রাগ করবে।

খুব দরকার ছিল ভাই।

দুই ঘণ্টা পরে আসেন– মাত্র ঘুমাইছে।

আমি না হয় বসি?

ইচ্ছা হইলে বসেন।

জোবেদ আলি আধঘণ্টার মত বসল, এর মধ্যে সে পাঁচটা সিগারেট খেয়ে ফেলল। ৬ষ্ঠ সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, এক কাপ চা খেয়ে আসি। এর মধ্যে ঘুম ভাঙলে বলবেন আমার কথা। আমার নাম জোবেদ আলি। উনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন।

সন্ধ্যার আগে ঘুম ভাঙবে না আপনার যেখানে ইচ্ছা যান।

জোবেদ আলি চা খেতে গিয়ে আর ফিরল না। রাত ন'টার দিকে আবার তাকে দেখা গেল বিভিন্ন জায়গায় বাকেরের খোঁজ করছে। তাঁকে আরো চিন্তিত ও বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও বাকেরের সে কোনো হদিস পেল না।

সন্ধ্যা মেলানোর পর বাকের ঘর থেকে বেরুল। জোবেদ আলি তাকে খোঁজ করছে এই খবরে সে বিশেষ আগ্রহ বোধ করল না। খোঁজ করছে বলেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে যেতে হবে নাকি? যার দরকার সে আসবে।

বাকের চা খেতে খেতে ভাবতে লাগল আজ রাতে করার কিছু আছে কী না। অনেক ভেবেও করার মত কিছু পেল না। মুনার সঙ্গে দেখা করা যেত কিন্তু মুনা খুব একটা অন্যায় কাজ করছে। বাকেরকে কিছু না বলে তার কোনো এক মামার বাড়িতে গিয়ে উঠেছে। মামার বাড়িটা কোথায় তা অবশ্যি সে জানে। কী দরকার আগ বাড়িয়ে যাওয়ার? যে আমাকে চিনে না। আমিও তাকে চিনি না। মরে গেলেও মুনার বাড়ি সে খোঁজে বের করবে না। তার দায়টা কী?

রাত আটটার দিকে সে ইয়াদের বাসায় গেল। পুরানো বন্ধু-বান্ধব সব একেবারে ছেড়ে দেয়া ঠিক না। খোঁজখবর রাখা দরকার। ইয়াদের বাসার ভোল পাল্টেছে। নতুন রঙ করা হয়েছে। দরজার ওপর কায়দার একটি কলিং বেল। টিপলেই মিউজিক বাজে। বেশ লম্বা-চওড়া মিউজিক। কলিংবেল টেপার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াদ দরজা খুলে দিল। হাসি মুখে বলল, আরে দোস্ত তুই। বাকেরের মনে হল ইয়াদের হাসিটা আসল নয়, মেকি মাল। তাছাড়া ইয়াদ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। যেন বাকেরকে ভেতর ঢুকতে দিতে রাজি না।

খোঁজখবর নিতে এলাম। আছিস কেমন?

ভাল। আরেকদিন আয় দোস্ত। আজ একটা ব্যাপার আছে। মানে একটা ঝামেলা।

কি ঝামেলা?

আমার ওয়াইফ বাচ্চার জন্মদিন না কি যেন করছে। শ্বশুর বাড়ির দু'একজনকে বলেছে। মানে...

আমি থাকলে অসুবিধা কি?

মেয়েদের কারবার তোর ভাল লাগবে না।

অপমানিত বোধ করার মত কথা কিন্তু ইয়াদের ফ্যাকাশে মুখ দেখে বাকেরের মজাই লাগছে। ইয়াদ অপ্রস্তুত গলায় বলল, তুই কাল আয় দোস্ত। ভাত খা আমাদের সাথে।

ঠিক আছে আসব।

সন্ধ্যা বেলা চলে আসিস- - এক সঙ্গে ছবি দেখবে। ভিসিআর কিনলাম একটা, জি টেন।

ভিসিআরও কিনে ফেলেছিস? বাকি রইল কী?

নিজে কিনি নাই দোস্ত। আমার এক শালা প্রেজেন্ট করেছে। যা মুশকিলে পড়েছি...

মুশকিল কী?

রোজ ছবি আনতে হয়। এমন অভ্যাস হয়েছে দোস্ত- - শোয়ার আগে একটা ছবি না দেখলে ভাল লাগে না। বোম্বের লেটেস্ট ছবি সবই পাওয়া যায়। ওদের হলে রিলিজ দেয়ার আগে ঢাকায় চলে আসে।

ভালই তো।

পয়সা যার যায় সেই বুঝে ভাল কী মন্দ। তিনটা ভিডিও ক্লাবের মেম্বার হয়েছি। পঁচিশ টাকা করে ক্যাসেট। জলের মত টাকা যাচ্ছে রে দোস্ত।

তুই ভেতরে যা। তোর বউ বোধ হয় রেগে যাচ্ছে।

যাচ্ছি। চল তোকে একটা সিগারেট খাওয়াই। ঘরে সিগারেট টোটেলি স্টপড। কোত্থেকে শুনেছে ক্যানসার মেয়েছেলের কারবার।

ইয়াদ রাস্তা পর্যন্ত এল। দুটা সিগারেট কিনল। বাকেরকে একটা দিয়ে নিজে একটা ধরাল, ফুর্তির ভঙ্গিতে বলল, কাল তোর জন্যে ছবি এনে রাখব আন্ধা-কানুন। মারাত্মক।

বাকের বলল, সিগারেট খাচ্ছিস গন্ধে তোর বউ বুঝে ফেলবে?

বাথরুমে ঢুকে হেভি ওয়াসিং দিব কেউ টের পাবে না। বিয়ে করা বড় যন্ত্রণা রে দোস্ত। ভাল কথা ঐ তিন মেয়েওয়ালা বাড়ির ব্যাপারটার খোঁজ পাওয়া গেছে। তুই যা ভাবছিলি তাই। পাক্কা খবর আছে আমার কাছে।

তাই নাকি?

হাই ক্লাস মেয়েছেলে— শুধু মালদার পার্টির জন্যে। রুই-কাতলাদের জিনিস। তবে দোস্ত একটা রিকোয়েস্ট তুই এদের ঘাঁটাস না। বিপদে পড়বি।

কি বিপদ?

রুই-কাতলা ঘাঁটালে বিপদ হয় না? পাগলামি করবি না। খবরদার। কাল বলব সব কিছু। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চলে আসবি।

বাকের ঘড়ি দেখল। মাত্র আটটা দশ। সময় কাটানোই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বারোটার আগে ঘুম আসে না। বারোটা পর্যন্ত সে করবে কী? মুনার খোঁজে যাওয়াটা খুবই উচিত। মামার কাছে থাকলেও তো মেয়েটা একা তাছাড়া আপন মামাও নিশ্চয়ই না। আপন মামা হলে ভাগ্নীর খোঁজখবর করত। এর মধ্যে একবারও তো খোঁজ করতে দেখেনি।

এদিকে বকুলদেরও একটা খবর নেয়া দরকার। জহিরের অবস্থাটা কী। এত বড় রুগী গ্রামে নিয়ে ফেলে রেখেছে বেকুবীর চূড়ান্ত করছে। মুনার সঙ্গে কথা বলে আবার ঢাকা আনার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কথাটা বলার জন্যেই মুনার কাছে যাওয়া দরকার। অনন্য কিছু না। রাগ করে ঘরে বসে থাকার কোন অর্থ হয় না। রাগ বড় না রুগী বড়?

মুনা খুব সহজ স্বরে বলল, ভেতরে আসুন বাকের ভাই। মুনার গলায় মাফলার জড়ানো। মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। চোখ ঈষৎ লাল। বাকের চিন্তিত মুখে বলল, অসুখ নাকি?

হ্যাঁ জ্বর। গতকাল মাত্র কমেছে। এখন আবার শরীর খারাপ লাগছে। আবার জ্বর আসবে কী না কে জানে। এ বাড়িতে এসেই জ্বরে পড়লাম। এই জন্যেই আপনাকে খবর দিতে পারিনি। কিছু মনে করবেন না বাকের ভাই।

আরে কি মুশকিল। মনে করার কি আছে?

এ বাড়ির দোতলার একটা ঘরে মুনা থাকে। মুনা বাকেরকে সরাসরি তার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরটা বেশ বড়। মুনার যাবতীয় জিনিসপত্র গাদাগাদি করে রাখা। কিছুই গোছানো নেই। বাকের বিস্মিত হয়ে বলল, এই অবস্থা কেন?

টেম্পোরারি থাকার জন্যে আসা তাই কিছুই গুছাইনি। হোস্টেল টোস্টেল কিছু আমার জন্যে পান কী না দেখবেন তো। অবিবাহিত মেয়েদের একা থাকা যে কি সমস্যা।

হুট করে চলে এলে একটা খবর দিলে না।

মামা জোর করে নিয়ে এল। একা একা একটা বাড়িতে থাকি শুনেই মাথা খারাপের মতো হয়ে গেল। আমার নিজেরও ভয় ভয় লাগছিল। কাজের মেয়েটা চলে গেল তো। বাকের ভাই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন বসুন। খাটটায় বসুন। আমি চট করে আসছি।

চা-টা কিছু খাব না কিন্তু।

চা আনছি আপনাকে বলল কে?

বাড়ি একদম খালি খালি লাগছে। লোকজন নাই।

অনেক লোক। বিয়ের দাওয়াতে গেছে। এগারটার দিকে আসবে।

মুনা নিচে নেমে গেল। বাকের দীর্ঘ সময় একা একা বসে রইল। মেঘ ডাকছে। ঝড়বৃষ্টি শুরু হলে মুশকিল। এতক্ষণ ধরে মুনা নিচে কী করছে কে জানে। একটা সিগারেট খেতে পারলে হত। সিগারেট পকেটে আছে। দেয়াশলাই নেই।

অনেক দেরি করে ফেললাম তাই না বাকের ভাই?

মুনার হাতে ট্রে। ট্রেতে রাতের খাবার।

এসব কী?

ভাত নিয়ে এসেছি। বসে যান।

আরে কি মুশকিল।

কথা বাড়াবেন না তো বসে পড়ুন। আপনার জন্যে আলাদা কিছু করিনি। আমারটাই আপনাকে দিচ্ছি। আমি রাতে কিছু খাব না। জ্বর আসছে।

আবার জ্বর আসছে?

হ্যাঁ আসছে। এই দেখুন কত জ্বর।

মুনা বাকেরকে স্তম্ভিত করে দিয়ে বাকেরের হাত ধরল। সত্যি সত্যি জ্বর এবং অনেক জ্বর। এতটা জ্বর নিয়ে কেউ এমন স্বাভাবিক ভাবে কথা বলছে কী করে কে জানে।

হাত ধরায় লজ্জা পেলেন নাকি বারেক ভাই?

না লজ্জা পাব কেন? জ্বর দেখাবার জন্যে হাত ধরেছ। অন্য কিছু তো না।

মুনা হাসতে হাসতে বলল, তা ঠিক। ভাত নিয়ে বসুন। আপনাকে কেউ তো আদর করে খাওয়ায় না। আদর করে খাইয়ে দি।

বাকেরের চোখ ভিজে উঠল। সে আতংকে কাঠ হয়ে গেল। টপ করে যদি এক ফোঁটা চোখের পানি পড়ে যায় বড় মুশকিল হবে। মুনা দেখে ফেলবে। আর সে যা মেয়ে এই জিনিস দেখলে সর্বনাশ।

বাকের ভাই!

বল।

আপনি কি আমাকে পছন্দ করেন?

বাকেরের অস্বস্তির সীমা রইল না। এইসব আবার কি ধরনের কথা? জ্বরে কি মেয়েটার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ভাত শেষ করে একজন ডাক্তার নিয়ে আসতে হবে। ডিলে করা ঠিক হবে না।

কথা বলছেন না কেন? আমাকে পছন্দ করেন?

কেন করব না। করি।

কতটুকু পছন্দ অল্প না অনেকখানি?

অনেক।

আমি কিন্তু আপনাকে পছন্দ করি না বাকের ভাই।

জানি।

আপনি একজন অপদার্থ মানুষ। অকাজের মানুষ।

জানি।

জানেন তো নিজেকে বদলান না কেন?

বাকের জবাব না দিয়ে ভাত মাখতে লাগল। সে এখন বেশ আরাম পাচ্ছে। চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। এ্যাকসিডেন্ট হবার সম্ভাবনা নেই।

নিজেকে বদলান না কেন?

বদলেছি তো।

কিছুই বদলাননি। আগে যেমন এখনো তেমনি আছেন। ভবঘুরের মতো চলাফেরা, গুণ্ডামি, বড় বড় কথা। এইসব ছাড়ুন তো।

আচ্ছা ছাড়ব।

আর ছাড়বেন। এই জীবনে ছাড়বেন না; বরং এক কাজ করুন খুব ভাল, খুব লক্ষ্মী এ রকম একটা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলুন। তাতে কাজ হতে পারে। মেয়েরা মানুষ বদলাতে ওস্তাদ।

বাকেরের খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তবু থালা হাতে বসে আছে। মুনা তার সামনে। কী সুন্দর সরল মুখ অথচ কি কঠিন একটা মেয়ে।

বাকের ভাই।

উঁ।

কয়েকদিন জ্বরে খুব কষ্ট পেয়েছি। জ্বরের সময় মনে হত আমার মতো একলা এই পৃথিবীতে কেউ নেই। খুব কষ্ট হত।

কি যে কাণ্ড তোমার। একটা খবর দিলে চলে আসতাম না? রাত দিন থাকতাম। খবর দিবে না কিছু না।

জ্বরের সময় আমি আরেকটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে আপনাকে আমি খুব পছন্দ করি। আপনার মত বাজে ধরনের একজন মানুষকে এতটা পছন্দ করি ভেবে নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছিল।

রাগ হওয়ার কথা।

তারপর মনে হল আপনার মত ভাল মানুষই বা ক'জন আছে। আপনি যে একজন ভালমানুষ সেটা কী আপনি জানেন?

কি সব কথাবার্তা তুমি বলছ?

সবদিন কি এইসব কথা বলা যায়? হঠাৎ এক আধদিন বলতে ইচ্ছা করে। বাকের ভাই আমি খুব একলা হয়ে পড়েছি। আর পারছি না।

মুনার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। বাকের কি বলবে কিছু বুঝতে পারল না। কী বললে মুনা খুশি হবে? সে যা করতে বলবে তাই করবে। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়তে বললে লাফিয়ে পড়বে।

ঝড়বৃষ্টি আসবে বাসায় চলে যান। আপনার বাসা তো আবার নেই। কোন একটা দোকানে-টোকানে গিয়ে উঠে পড়ুন ঐ কাঠের দোকানেই তো এখন থাকেন?

হ্যাঁ।

আপনাকে এই রকম আর আমি থাকতে দেব না। সুন্দর একটা একতলা বাড়ি ভাড়া করব। সারাদিন যত ইচ্ছা গুণ্ডামি করবেন সন্ধ্যার পর ফিরে আসবেন। রাতে দুজন মুখোমুখি বসে ভাত খাব।

মুনার গলা ধরে এল। কথা শেষ করতে পারল না। বাকের একটা ঘোরের মধ্যে তার ঘরে ফিরে এল। বৃষ্টি হচ্ছিল সে পুরোপুরি ভিজে গেছে। কাদায় পানিতে মাখামাখি অথচ কিছুই বুঝতে পারছে না। ভেজা কাপড়েই সে তার বিছানায় বসে আছে। ঘোর কাটল রাত তিনটার দিকে।

পুলিশের বাঁশি বাজছে। ওসি সাহেব দরজায় লাথি দিচ্ছেন। পুলিশ কর্কশ গলায় ডাকছেন— বাকের, এই বাকের।

বাকের দরজা খুলতেই তাকে অ্যারেস্ট করা হল। অভিযোগ গুরুতর। জোবেদ আলি খুন হয়েছে। খুন করার দৃশ্য এবং খুনির পালিয়ে যাবার দৃশ্য তিনজন দেখে ফেলেছে। তিনজনই বলছে খুন করছে বাকের।

বাকেরের এই মামলা দীর্ঘদিন ধরে চলল। ডেটের পর ডেট পড়ে। মামলা পরিচালনা করলেন মুনার সেই পরিচিত উকিল। কখনো তিনি মুনাকে বললেন না যে মামলা টিকবে না। উল্টোটাই বললেন। একবার না অনেকবার বললেন। বলার সময় প্রতিবারই কিছুটা বিষণ্ন হলেন।

ব্যাপারটা কি জানেন-- ওরা মামলাটা খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে। আমি কোন ফাঁক ধরতে পারিনি। মোটিভ আছে প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষী আছে। মিথ্যা মামলার সাজানোটাই হয় অসাধারণ। এই ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আমি আপনাকে মিথ্যা কোন আশ্বাস দিতে যাচ্ছি না। মনে হচ্ছে কনভিকশন হয়ে যাবে।

উকিলের মুখ বিষণ্ন দেখা যায়।

বিষণ্ন দেখায় না শুধু বাকেরকে। মুনার সঙ্গে তার যতবারই দেখা হয় সে ততবারই বলে, কোনমতে যদি বের হতে পারি তাহলে সিদ্দিক শালাকে পুঁতে ফেলবে। তবে আমাকে আগেই যদি ঝুলিয়ে দেয় তাহলে তো কিছু করার নেই।

ভয় লাগে না বাকের ভাই। যদি সত্যি সত্যি...

আরে না। ভয় লাগে না।

সত্যি ভয় লাগে না।

রাতের বেলা একটু গা ছমছম করে। রাতের বেলা ফাঁসি দিলে একটা ভয়ের ব্যাপার হত। ফাঁসিটা তো দিনে দেয় তাই ভয়টা থাকে না।

পাগলের মত কথাবার্তা বলছেন বাকের ভাই।

পাগলের মতো বলব কেন এটা হচ্ছে ট্রুথ। রাতের বেলা মরা খুবই ভয়ংকর। দিনের মৃত্যু কিছু না। সিদ্দিক শালাকে আমি রাতের বেলা মারব। ওয়ার্ড অব অনার।

মামলা চলতে থাকে।

মুনা অপেক্ষা করে।

ক্লান্তির অপেক্ষা। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী কিছুতেই যেন মার কাটে না।

আশা ও আনন্দের কথায় ভর্তি করে সুন্দর সুন্দর চিঠি লেখে বকুল। তার ছেলের কথা লেখে, ছেলের দুষ্টামির কথা লেখে, জহির যে ক্রমে ক্রমেই সেরে উঠছে সে কথাও লেখে। সে নিজেও সেরে উঠোছে সেই কথাও থাকে।

এখন সে আর পুরনো দুঃস্বপ্ন দেখে না। স্বামীর গায়ে হাত রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমায়। তাকে সাবধান করে দিতে অশরীরী কেউ আর আসে না। কত সুন্দর সুন্দর চিঠি কিন্তু মুনার পড়তে ভাল লাগে না।

চিঠি লিখে জাহানারা নামের অপরিচিতা একটি মেয়ে। অচেনা একজন কিন্তু বড় চেনা একজন। বড় সুন্দর করে সে লেখে -- আপা, আমরা দুজন কিছু কী করতে পারি আপনার জন্যে? আপনার জন্যে ও বড় কষ্ট পচ্ছে। একটা কিছু করার সুযোগ আপনি ওকে দিন। বাকের সাহেবের মামলা যেদিন কোর্টে উঠে ও সেই সব দিনগুলিতে মামুন কোর্টে উপস্থিত থাকে। লজ্জায় আপনার সামনে যেতে পারে না। একদিন সে বলল, আপনি নাকি খুব কাঁদছিলেন -- বলতে বলতে সেও খুব কাঁদল। আপা, আপনি ওকে কিছু করার সুযোগ দিন।

এই মেয়েটির চিঠি পড়তে তার ভাল লাগে। কিন্তু জবাব দিতে ইচ্ছা করে না। বড় আলস্য লাগে। মাঝে মাঝে এমন ক্লান্তি লাগে যে কোর্টে যেতে পর্যন্ত ইচ্ছা করে না। তবু তাকে যেতে হয়। এক কোণে বসে থেকে সে প্রাণপণে চেষ্টা করে হাই গোপন করতে। কোর্ট থেকে বেরুতে বেরুতে কোন কোন দিন তিনটা সাড়ে তিনটা বেজে যায়। ক্ষিধেয় শরীর কেমন করতে থাকে কিন্তু কিছু খেতে ইচ্ছা করে না। ঝিম ধরা দুপুরে সে রাস্তায় একা একা হাঁটে।

হাঁটতে হাঁটতেই কোনো কোনো দিন হঠাৎ সুখের কোনো কল্পনা মাথায় চলে আসে -- যেন সে রিকশা করে যাচ্ছে হঠাৎ পথে বাকেরের সঙ্গে দেখা। বাকের তাকে দেখে হাসিমুখে এগিয়ে আসছে। উৎসাহ নিয়ে বাকের বলল -- যাচ্ছ কোথায়?

মুনা বলল, তা দিয়ে আপনার দরকার কি?

না কোনো দরকার নেই। এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

বলতে বলতে বাকেরের মুখ একটু যেন বিষণ্ন হয়ে গেল। মুনা বলল, আপনার কোনো কাজ না থাকলে আসুন তো আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাব।

বাকের রিকশায় উঠল। আনন্দে তার চোখ ঝিকমিক করছে। বৃষ্টি শুরু হল তখন। তারা হুড তুলল না। বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে দুজন এগুচ্ছে। হাওয়ায় মুনার চুল উড়ছে। বাকের বলছে বাতাসটা খুব ফাইন লাগছে তো। বড় ফাইন।

মুনার কোনো কল্পনাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ঝিম ধরা ক্লান্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে সে ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে। আকাশের রঙ ঘন নীল। সেখানে -- সোনালি ডানার চিল চক্রাকারে ওড়ে।